

৯৫৬-১০৫২৭৭-১৫-৮৩০০/৭

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

14

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

দ্বাদশ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩১৯

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

• বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

প্ৰবাসী

বৰ্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন ১৩১৯)

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
(কবিতা)—শ্ৰীদেবেন্দ্ৰনাথ মহিষ্ঠা	২৭৯	চিত্ৰপল্লি—শ্ৰীচাক্ৰ চক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬, ২২৫, ৩৪৭, ৪৭৮, ৫৮৬, ৬৮৯
গাসেব অট্টহাস — শ্ৰীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়			
এম-এ, বিজ্ঞানবন্ধ	৫৩৭, ৬১৯	চীনে খাষ্ট্ৰবিপ্লব (সচিত্ৰ)—শ্ৰীৰামলাল সরকার	১৫৫ ২৮৯, ৩৬৬, ৪৯১, ৫২১
শ্ৰীমদ (কবিতা)—শ্ৰীববীজনাথ ঠাকুৰ	৩১৭	জগতেব বন্ধ স্বৰ্গীয় মহাত্মা ষ্টেড্ (সচিত্ৰ)—	
শ্ৰীমদ (কবিতা)—শ্ৰীপৰিমলকুমার ঘোষ	২৭	শ্ৰীববীজনাথ চৌধুৰী, এম-এ	২০২
শ্ৰীমদ পৰে ভোজন (সচিত্ৰ)	১১৩	জনসাধাৰণেব মণ্ডে শিক্ষাবিত্তাব—সম্পাদক	৩৬১
শ্ৰীমদ ও বিষয়জ্ঞান (আলোচনা)—শ্ৰীমনোবজ্ঞান		জন্ম, কৰ্ম এবং অবচাব—শ্ৰীবিজয়চক্ৰ মজুমদাব,	
শ্ৰীমদ ঠাকুৰতা	৩১২, ৪৪০	বি-এল	৬১
শ্ৰীমদ লাচনা—	৮৪, ২১২, ৩১২, ৫৬৮, ৬৮৭		
শ্ৰীমদ সাহিত্যসম্ৰাট শ্ৰীববীজনাথের সম্বৰ্দ্ধনা		জন্ম (সচিত্ৰ)—শ্ৰীকৃষ্ণচক্ৰ কুণ্ডু, এম-এ, বি-এল,	৪৮১
(সচিত্ৰ)—	৫৬১	জলুঙি (কবিতা)—শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত	৬৭১
শাধ (গল্প)—শ্ৰীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৪	জগদ্বল—শ্ৰীববীজনাথ ঠাকুৰ	৪৩১
শ্ৰীমদ শ্ৰীমদী কাৰপানা (সচিত্ৰ)—	৭৩	জাহাজ চুৰি—শ্ৰীনবকুমার কবিত্ত	২০২
শ্ৰীমদ বা জাপানী পাবিত্তা (সচিত্ৰ)—		জীবনবিজ্ঞান ইন্দ্ৰজাল (সচিত্ৰ)—	১১৬
শ্ৰীমদ বৈশাখ চক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭	জীবন-স্মৃতি—শ্ৰীববীজনাথ ঠাকুৰ	৩২, ১৩৭, ২৩৯, ৩৫১
শ্ৰীমদ (কবিতা)—শ্ৰীপৰিমলকুমার ঘোষ	৩৮০	জেনাবেল বৃথ (সচিত্ৰ)—শ্ৰীঅমলচক্ৰ হোম	৬৮১
শ্ৰীমদ এবং স্বাৰ্জ—শ্ৰীদ্বিজদাস দত্ত, এম-এ	৬৫৫	জৈন-কবিতা—চৈতন্য-বন্দনা, ধূপাবতি, নমস্কাৰ,	
শ্ৰীমদ থৰ—মণিতত্ত	১১৮, ২১৬, ৩৪৮, ৪৬৫, ৫২৯, ৬৬২	(কবিতা)—শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত	৩৩২
শ্ৰীমদ কাতা চীনাবাসিনের কাৰখানা (সচিত্ৰ)—	৬৭৬	জ্যোৎস্না (কবিতা)—শ্ৰীচাক্ৰ চক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়	
শ্ৰীমদ ছব সাধী (কবিতা)—শ্ৰীববীজনাথ ঠাকুৰ	৫৯৮	বি-এ	৪২
শ্ৰীমদ নক্ষের মুষ্টি (সচিত্ৰ)—শ্ৰীবিনোদবিহারী বিজ্ঞান		ঝড় (কবিতা)—শ্ৰীববীজনাথ ঠাকুৰ	৩৮৯
শ্ৰীমদ বিনোদ	৬৭২	টাইটানিকের হিসাবনিকাশ—শ্ৰীঅবনোজনাথ ঠাকুৰ	৪৩৬
শ্ৰীমদ দৰ্শন—শ্ৰীমৃত্যুঞ্জয় বারচৌধুৰী, রায় বাহাদুৰ,		ঢাকা স্কোলাৰ কলেজটি প্ৰাচীন স্থান (সচিত্ৰ)—	
শ্ৰীমদ এম-আৰ-এ-এস	৪২৯	শ্ৰীদীনেশচক্ৰ সেন, বি-এ	২৬৯
শ্ৰীমদ দীপ্ত পণ্ডিত (সচিত্ৰ)—শ্ৰীকৃষ্ণচক্ৰ কুণ্ডু, এম-এ	৬২৭	তাড়িতেব সাহায্য চাষ (সচিত্ৰ)—	১১৭
শ্ৰীমদ জয় (সচিত্ৰ)—শ্ৰীবৈশাখ চক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৮	তাৰহীন টেলিফোন (সচিত্ৰ)—শ্ৰীযোগেশ মিত্ৰ	৪২৭
শ্ৰীমদ ভক্ত-লিপি (সচিত্ৰ)—শ্ৰীঅক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয়,		তীৰ্থযাত্ৰা (কবিতা)—শ্ৰীববীজনাথ ঠাকুৰ	২২০
বি-এল	৫৬৯	দম্ভজমৰ্দ্দন দেব (সচিত্ৰ)—শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ	৩৮০
দেব গাড়ীৰ গান (কবিতা)—শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত	১১৮	দম্ভজমৰ্দ্দন দেব ও মচেন্দ্ৰ দেব (সচিত্ৰ)—	
দীপাৰ্ঠ—শ্ৰীদ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ	৪৪০	শ্ৰীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ	৩৮১
দীপ-খেজুৰে (গল্প)—শ্ৰীচাক্ৰ চক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫	দিদি (উপজ্ঞাস)—শ্ৰীনিৰূপমা দেবী	১২৬, ১৯২, ২৫১, ৪১৭, ৫১৫, ৬৩৫
দীপ-বাজমালা (সন্মালোচনা)—শ্ৰীবাখালদাস			
বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ	৫৬৭	ছই ইচ্ছা—শ্ৰীববীজনাথ ঠাকুৰ	৪৩৭
দীপ-পৰ্যবেক্ষণ—শ্ৰীগিৰিশচক্ৰ দে, বি-এ	৪৫৬	নববৰ্ষে (কবিতা)—শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত	১৩৭
দীপ-বাণকোড়ার ইতিবৃত্ত—শ্ৰীদ্বিজদাস পালিত	২২১		

বিষয়	পৃষ্ঠা।
'নবমী গাওয়া'-উৎসব (আলোচনা)—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ...	৮৭
নট্টোদ্ধার (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ...	৩২৮
নাট্যপন্থীর গান—অরুণ গুপ্ত, আত্মনিবেদন (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৩০০
না-জানা (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০১
"না ফুটত আঁহা যদি!" (কবিতা)—শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার ...	৩১
নিকটের যাত্রা (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৬২
নিবেদন (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৬৫৫
নিবেদিতা—শ্রীসরলাবালা দাসী ...	১০২
নীলকুঠী (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ...	৯৪
পরভূত (সচিত্র)—শ্রীপ্রদীপকর দেব ...	১৭৬
পরভূত (আলোচনা)—শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, শ্রীজ্ঞানকৌবল্লভ বিশ্বাস ...	৩১৫, ৫৬৮,
পরভূত (আলোচনা)—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিলাসমোহন চক্রবর্তী ...	৬৮৮
পিতৃপুত্র—শ্রীসোদামিনী দেবী ...	২৩২
পুস্তক-পরিচয়—মুদ্রাবাক্স, খাতির নদারত, ডাক্তার, শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিঃপিসারু ও সম্পাদক প্রভৃতি ১৩৩, ২১৯, ৩৫৮, ৪৫২, ৫৮২, ৬৯৩	
পূজার বণ্টা (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ...	৩৫৮
পৌৰ-সংক্রান্তি (আলোচনা)—শ্রীহেমচন্দ্র বন্দী ...	৮৭
" শ্রীপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮৪
" শ্রীপ্রফুল্লমণী দেবী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ...	২১২
" শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২১২
প্রবাসী-বাল্যলী (সচিত্র)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ...	২৩৭
প্রশ্ন (কবিতা)—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১৭৬
প্রাচীন ঐতিহ্য—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল ...	১৮৩
প্রাচীন জায়—শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ, এম-এ ...	৩১৭
বর্ষাপেষে (কবিতা)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ...	৫০৩
বাঙ্গালা পঞ্চকোষ—শ্রীবোগেশচন্দ্র রায়-বিজ্ঞানিদি ২৬১	
"বাঙ্গালীর গ্রহণযোগ্য কি দেখিরাছি"—সম্পাদন ৪৫৮	
বানরের নরলীলা—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ ...	২৮০
বিকাশ (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪২৯
বিদায় (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০৪
বিফলতা (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়দর্শী দেবী ...	২১৯
বিবিধ প্রসঙ্গ (সচিত্র)— ১২২, ২২৮, ৩৬২, ৪৭২, ৫৭৬, ৬৯৯	
বিস্মহাত্ত (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৩২৪
বিশাট (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৪৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বিশ্বকর্মা বিজয়-যাত্রা (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৬৮
বিশ্ববন্ধু (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	২১
বৈজ্ঞানিক সীতানাথ (আলোচনা)—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি-এ ...	২৫
ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৭১
ভক্ত প্রকাশচন্দ্র (সচিত্র)—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ...	২৮
ভারত-ইতিহাসের জন্মকথা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি এল ...	৬৭
ভারতবর্ষীয় আর্থ্যাদিগের পূর্বাভিমুখী পথযাত্রার নূতন একটি প্রমাণ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৫
ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ—শ্রীঅজিত-কুমার চক্রবর্তী, বি-এ ...	৪৫
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (আলোচনা)—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৫
ভারতীয় বিমান-নাবিক (সচিত্র)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৮
ভারতীয় স্থাপত্যের দাবী (সচিত্র)—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ ...	৪১
যথাস্থগের ভারতীয় সভ্যতা—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০, ১৫০, ২৪৬, ৩৬৩, ৫২০
মনোমোহন বসু (সচিত্র)—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ ...	৪১
মহৎ (কবিতা)—শ্রীবল্লীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪১
মহাপুরুষের উক্তি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৪১
মাছের সন্তানবাৎসল্য (সচিত্র)— ...	৪১
মিকাদো-মুংহুহিভো (সচিত্র)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪১
মুন্সিল আসান (গল্প)—শ্রীমণীলকুমার পাণ্ডে ...	৪১
মুকুসুম্য (কবিতা)—শ্রীমণীমোহন ঘোষ, বি-এল, ...	৪১
মৌনীবাবা—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ ...	৪১
যাত্রাগান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি-এ ...	৪১
যাত্রী (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪১
রজনী (কবিতা)—শ্রীকুমারনাথ লাহিড়ী ...	৪১
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুত্বতাহীন —শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী, বি-এ ...	৪১
রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী, বি-এ ...	৪১
রহস্য-চিত্র ...	৪১
রূপ ও ধূপ (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, ...	৪১

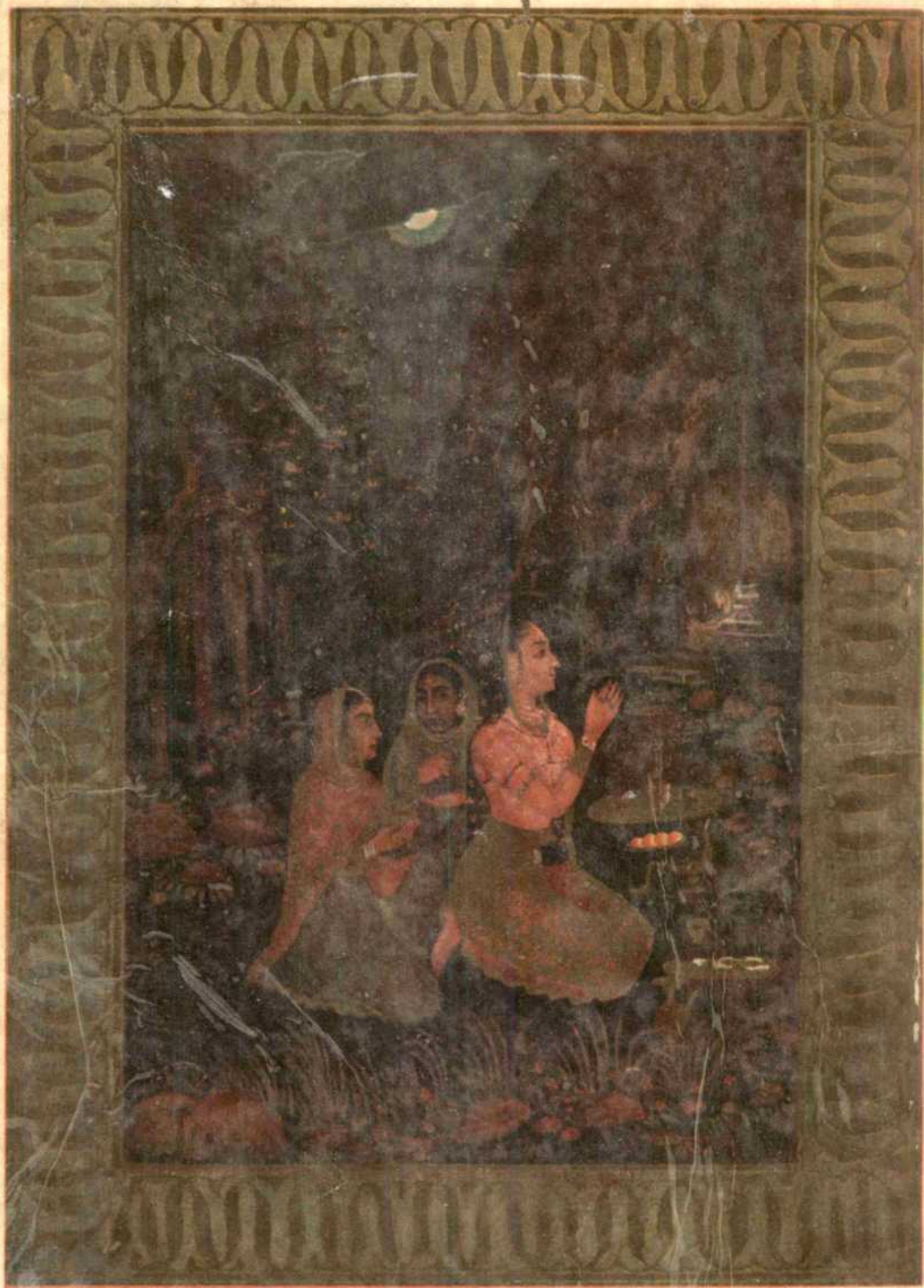
বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
সেনেব সমর—শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,		সাংখ্য-দর্শনেব উপাখ্যানমালা—শ্রীশরচ্চর বোবাল,	
এম্ এ ৩৯৫		এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ, সরস্বতী, ভারতী,	
ন—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর ৪৭৯		বিভাভূষণ ইত্যাদি ৫৫৬	
(কবিতা)—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর ৪৯১		সাধারণ কবির সহিত গোপালন ও গব্য ব্যবসায়ের	
প্রভাতে (কবিতা)—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর ৬৪৬		তুলনা—শ্রীবিজ্ঞানদাস দত্ত, এম-এ, ... ২২৫	
বোধ—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর ৫৮৭		সাপুড়িয়া (কবিতা)—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর ১৮২	
ন্দব (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী ২৯৭		সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (সচিত্র)—শ্রীনিধিনাথ	
এ (কবিতা)—শ্রীকরণানিধান বন্দ্যো-		রায়, বি-এল ২২৮	
পাধ্যায় ৫১৪		জ্ঞানব (কবিতা)—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর ৫৫২	
সম্রাট সেবাস্ত্রম, কাশীধাম (সচিত্র)—		সেকালের অতিকার জন্ত (সচিত্র)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ	
সরদাস দত্ত ৩৯৯		মুখোপাধ্যায় ৩৮৯	
এ (কবিতা)—শ্রীকুমদনাথ লাহিড়ী ২১৫		স্নেহবিদ্য (কবিতা)—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০	
এ (গল্প)—শ্রীচাকচর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৬		হেমকণা—শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ,	
		২৩৫, ৩২৪, ৫৫১, ৬৫৭	

বর্ণানুক্রমিক চিত্রশূচী

অবোধকামিনী দেবী—দর্গায়া	...	১৬৮	কুকু-শাবকের রাকসী কুধা, ও পালকপক্ষীর “আধার”	...	...
অবসব প্রাপ্ত জেনাবেল চাং ও তাঁহার পুত্র	...	২২০	আহারণ	...	...
আবতুল বসু	...	১০৫	কুকু-শাবককে পালকপক্ষী কর্তৃক “আধার” দান	...	...
আলবার্ট হিল—জয়পূর্ব	...	৬২	কুকু-শাবককে পিঠে চড়িয়া পালকপক্ষী কুকু-শাবককে	...	...
আলেকজান্ডার ফোমা য়োবস	...	৫৮০	ছরস্ত কুধা শান্ত কবিতা	...	...
উড়কথু কুকু-শাবক	...	১৭২	ক্যান্টিনি হেচ্ছা-টৈনিক বা ভগাণ্ডিয়া	...	২১
এতা গ্রাম—একটি	...	২৮	ক্যাপ্টেন আমাও সেন	...	১৫
এতাপণ চন্দ্র পবিত্রাব করিতেছে	...	২৯, ৩০	গকড়ন্ত	...	৫৭০
এতা-পল্লীর পণ্ডব যোয়াড়	...	৩১	গলাকাটা সিপাহী ও তাহার গুজরাণকাবী সিপাহী	...	২৯
কনিষ্কেব প্রতিমূর্তি	...	৬৭৩	গোষ্ঠলীলা	২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮	...
কনিষ্কেব প্রতিমূর্তি-লিপি	...	৬৭৪	চিত্রলিঙ্গ উইলিয়ম বদেনটাইন	...	৫৬৭
কপিল মুনি (প্রাচীন প্রতিমূর্তিব প্রতিকপ)	...	২৮৫	চীনদেশের বিজ্ঞানসেব বালক-বালিকাদিগের প্যাভেড	...	...
কবি উইলিয়ম বাটলার রীটম্	...	৫৬১	ও উৎসব	...	...
কমিশনারেব বড কেবাণী মিষ্টার টাট-লুং-সিন ও	...	...	চীন পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব অধিনায়ক মিঃ ওয়েন	...	১৫
তাঁহার পুত্রকন্যা	...	২৮৯	চীন প্রজাতন্ত্রীয় প্রধান সেনাপতি	...	৩৫
কলিকাতা চীনা বাসনেব কারখানাব দৃশ্য	...	৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪	চীন রাষ্ট্রবিপ্লবে নিযুক্ত কয়েকজন সৈন্য	...	১৫১
কর্ণেল ছেন-চিব-ধোয়ে	...	৩৭৮	চীন রাষ্ট্রবিপ্লবেব সর্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের মাতা	...	৪১
কাস্টেন শ্বিথ...	...	৩৪৩	চীনা কেপ্তা	...	...
কাবুলিওয়ানা—শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত	...	৪৫৯	চীনা পোয়াকে ডাঃ রামলাল সরকার	৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬	...
কালীয় দমন (দণ্ডিন)—মোলাবাম কর্তৃক অঙ্কিত	...	৪৭২	চীনা ভিক্ষুক	...	১৭
কাশ্মীরি বোধ—শ্রীযুক্ত	...	৫৭৮	চীনা মন্দিরেব পুরোহিত	...	২৯১
কাশ্মীরি একটি প্রস্তব তোরণ	...	৬৬	চীনের বালক ছাত্রদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদানের	...	১৫৭
কাশ্মীরী ক্ষেত্রী	...	৬৩১	মিছিল	...	...
কাশ্মীরী পণ্ডিত—আধুনিক	...	৬৩০	চীনেব বালিকা ছাত্রীদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদানের	...	১৫৬
কাশ্মীরী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ	...	৬২৯	মিছিল	...	...
কাশ্মীরী পণ্ডিত পূজারী	...	৬২৯	চীনেব বিদেশী কনসাল বা কমিশনারের পাকী	...	৩৭৩
কাশ্মীরী পণ্ডিতানী	...	৬৩১	চীনের মুসলমান	...	৩৭৭
কাশ্মীরী পণ্ডিত বধ	...	৬৩২	“চোক বুজে হাঁ কর তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি”	...	২৮২
কাশ্মীরী বব ও বধু	...	৬৩৩	চ্যাং ওয়েন কোয়ান (দেশী-পোয়াকে)	...	৩৬১
কাশ্মীরী বর ও ববযাত্রা অভ্যর্থনা	...	৬৩৪	চ্যাং ওয়েন কোয়ান (যুরোপীয় পোয়াকে)	...	৩৬২
কাশ্মীরী বিবাহভোজ	...	৬৩৪	চ্যাং ওয়েন কোয়ানের শরীরক্ষী সৈন্য	...	৩৬৪
কাশ্মীরী পণ্ডিতের পরিবাসমণ্ডলী	...	৬২৮	জন জেকব এষ্টব ও ইসিদোর ট্রিস	...	৩৫৩
কাশ্মীরী রমণীব বেণীবন্ধন	...	৬৩৫	জম্মুনগরেব উর্দ্ধ হইতে সাধারণ দৃশ্য	...	৪১
কাশ্মীরেব একাংশেব দৃশ্য	...	৬২৭	জম্মুনগরেব বহুনাথজীব মন্দির	...	...
কুকু শাবক পালকপক্ষীর ডিম পিঠে তুলিয়া বাসা	...	...	জম্মুর কেবিশওয়াল...	...	৪৫
হইতে কেলিয়া দিতেছে	...	১৭৭	জম্মুব মুসলমান রমণী	...	...
কুকু-শাবক বাসার নিকট কাহাকেও আসিতে	...	১৭৭	জম্মুব বাঙ্গপুত ব্রাহ্মণী	...	...
দেখিলে সন্দেশ মন্তন গর্জন করে	...	১৭৭	জম্মুর কলওয়ালী	...	...
			জম্মুনগরেব নহরেব দৃশ্য	...	...

অশ্বিনগবের বহিঃতোরণ ...	৪৮৪	পুরুষ যোদ্ধা নাছ কেন-বাসার পাহারা দিতেছে ...	১১৫
অশ্ব মহারাজার তৃতীয়বর্তী বামনগর প্রাসাদ		"পূজা" (চারপাশে ছাপা, স্বর্ণমণ্ডিত) —	১
ও সবকারী দপ্তরখানা	৪৮৫	ফেনী জেরীকে দুধ খাওয়াইতেছে ...	১২৫
অশ্ব মহারাজার দপ্তরখানা	৪৮৬	ফেনী তাহার রক্ষককে চুষন করিতেছে ...	১২৬
পানের ভূতপূর্ব সন্ধ্যাট ...	৫৪৩	ফেনী দুধ খাইয়াছে বলিয়া জেরীর রাগ ...	১২৭
পানের বর্তমান সন্ধ্যাট ও সন্ধ্যাজী ...	৫৪৫	ফেনী নিজের আপেলের ভাগ জেরীকে খাওয়াইতেছে ...	১২৮
কব তাহার খাঁচার জাল ছিঁড়িতেছে ...	২৮৮	বানরের নয়লীলা ...	১২৯
জেনেরাল বৃথ ...	৬৮৩, ৬৮৪	বিখ্যাত (রঙিন) — ক্রিশ্চিয়াননাথ দে কর্তৃক	
জেরী রক্ষকের পকেটে হাত ঢুকায় আঙুর		অঙ্কিত ...	১৫৩
খুঁজিতেছে ...	২৮৩	বুলন্দশহরের মিউনিসিপাল উজানের তোরণ ...	৬২
জেরী ও ফেনী সেলাম করিতেছে ...	২৮১	বুলন্দশহরের সৌধ ...	৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫
জেরীর-নাকের উপর আঙুর রক্ষা ...	২৮১	বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির	
টাইটানিক জাহাজ ...	২৩১	কারখানার দৃশ্য ...	৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ১২, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪
টাইটানিকের পুত্রগণ ও কর্মচারীগণ ...	৩৬৮	বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মাননীয় রায়বাহাদুর	১৪১
টাইটানিকের প্রভাততরঙ্গ টাওটাই ...	৩৬৯	ব্যাঙাচির ক্ষতস্থানে পদ উদগম ও মাথায় মাথায়	
টাইটানিকের শহরের কাঠম বা গুড় আপিস ...	১৬৫	জোড়কলম ...	১১৩
টাইটানিকের শহরের বাজার ...	১৬০	জয়লীলা ...	১৭০
ডাইটিক্স নামক কীট ...	১১৫	ক্রকল্যাণ্ড উদ্ভয়নক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সেটি ও তাহার	
ডাক্তার লাইম্যান জে ব্রিগ্‌স উদ্ভিদ বৃদ্ধির ক্ষমতা		০ "অ্যাড্রো" বাইমেন বিমান ...	১০১
তাড়িতের ভাব সংবোধন করিতেছেন ...	১১৭	ভারতবর্ষেই প্রজাবদ্ধ উইলিয়ম জেনিংস ব্র্যান	
গবিলদীর-পুল ...	৪৮২	কলিকতায় কলে কথ্য বলিতেছেন ...	১২৭
জাহাঙ্গীরের কালেক্টরী ...	৬১	ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ, মাদ্রাজ ...	৫২
তারকনাথ পালিত — শ্রীযুক্ত —		ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের সমুখ দৃশ্য ...	৬০
ঘোবন বয়সে ...	৪৭২	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মাননীয় মহারাজা বাহাদুর	১৪৬
বর্তমান বয়সে ...	৪৭৩	মৎস্যপিতা শিশু মাছদিগকে চরাইতেছে ...	১১৪
তারহীন টেলিফোনের আবিষ্কার মিঃ কলিন্স	৪২৭	মনোমোহন বসু — স্বর্গীয় ...	১২৭
তারামণ্ডলের কণ্ঠিত জ্বলন্ত হইতে নতুন তারামণ্ডলের		মশাল-আলোকে (রঙিন) ...	১৩৯
উদ্ভবের ক্রমবিকাশ ...	১১৬	মাদ্রাজ হাইকোর্ট ...	৫৭
ভৌ-ছোয়েন-ইয়ে ...	৩৭৯	মেজর চ্যাং, তোপখানার অধ্যক্ষ ...	১৫৭
দল্লজমর্দিন নামাঙ্কিত মুদ্রা ...	৩৮১	মাজামোহন সেন — শ্রীযুক্ত ...	১২৯
দল্লজমর্দিন মেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা ...	৩৮৬	মামিনী সেন — ডাক্তার শ্রীমতী ...	১৪৭
দশ অবতারণার চিত্র ...	২৭১	মামিনীকান্ত সেন শ্রীযুক্ত ...	১২৫
দেবী-যুদ্ধ ...	২৭২, ২৭৩	রজনীকান্ত গুপ্ত — স্বর্গীয় ...	১২৯
রেন্দুখার সরকার — শ্রীযুক্ত ...	৫৭৮	রহস্য চিত্র ...	১৩০
শব — শ্রীমতী মৃণালতা রাও কর্তৃক অঙ্কিত	১৭১	রামচন্দ্র ও শবরী (রঙিন) — শ্রীমদলাল বসু কর্তৃক	
সারিকার ভগ্নহস্ত ...	২৭৮	অঙ্কিত ...	১৮৭
নেপালের প্রধান মন্ত্রী ...	৩৪০	রামনাথ বা মল ভাণ্ডারী ...	১৭৭
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র		রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বে চীন কর্মচারীর পাকী চড়িয়া	
রায় ...	১৬৮	শোভাবাত্রী ...	১৭২
ইন্দ্রকুমার ...	১৭৯	রিপন শহরে রিপনের প্রতিমূর্তি ...	১৭৪
সম্ভ্রম অত্যাচারী কৃষীকলসাক সৈন্যদিগকে		রেডডিং, সুব্বা ...	১৭৭
তাঁহা সন্নিহিত প্রদেশ হইতে বিভাজিত		দাদার তাতার ...	১৯০
করিবার ক্ষমতা যুদ্ধ করিতেছে ...	২৩০		

লি-ই-পিয়াও	৩৭৬	সেকালের অতিকায় জন্তু	৩৮২, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৬
লি-কেন-ইয়ে... ..	৩৬৭		
শবাধার বহন	৩৮০	সেট্রি, প্রথম ভাবতীর বিমান-নাবিক—শ্রীযুক্ত	৫০৭
শ্রীমহেশ দেব নামাঙ্কিত মূর্তি	৩৮১	সেট্রি ক্রাফ্ট "অ্যাভ্রো" বাইপ্লেনে উড্ডয়নের উপক্রম	৫০৭
শ্রীশচন্দ্র বসু, বায়বাত্তব	৮২	কবিভেদেন	৫০৭
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সৈবাশ্রম	৪০৩	সেট্রি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া বিমানের পার্শ্বে	৫০৭
সত্যেন্দ্র দেব—শ্রীযুক্ত	৬৪৮	দণ্ডায়মান	৫০৭
সরস্বতী	২১	স্টেড—স্বর্গীয় মহাশয়	২০৬, ৩৫৬
সরোবরতীরে হংস (চন্দ্র-রঙে ছাণী, উজ্জল স্বর্ণমণ্ডিত)	১০৭	হাব্রি আলি, পারস্ত সংবাদপত্র সম্পাদক	২২৯
সুখীন্দ্র বসু	১২৩	হিউম—আর্থার এলেন	৬৮২
স্বরেন্দ্রনাথ বল—শ্রীযুক্ত	৫৭৯	হেমেন্দ্রনাথ সেন—শ্রীযুক্ত	৬৪৭



পূজা ।

শ্রীযুক্ত আনন্দ কে, কুমারস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে ।

Three colour blocks by U. Ray & Sons.

Kuntaline Press, Calcutta.

একবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নারায়ণা বলহীমহে নভাঃ ।”

১২শ ভাগ

১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৯

১ম সংখ্যা

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

একজন বিখ্যাত চিত্রকরের মুখে শুনিয়াছিলাম, চূড়িশস্ত্রিংশ অত্যন্ত প্রখরতা ছবি আঁকার পক্ষে অসুক্লম অবস্থা নহে। সমস্ত খুঁটিনাটিই যদি বেশি কবিতা চোখে পড়ে তবে মোট জিনিষটাকে মনের মধ্যে এক বসিয়া লইয়া দেখা গুরু হয়—তখন খুঁটিনাটিগুলো সমগ্রের অন্তর্গত হয় না, সমগ্রটা কেবলমাত্র খুঁটিনাটির সমষ্টি হইয়া উঠে।

ঐ মোট জিনিষটাকে মনের মধ্যে দেখার দিকেই ভারতবর্ষের বড় দোষ—সেই জন্ত ঐ চোখের দেখাটাকে আমাদের দেশে যথাসম্ভব খাটো করিয়া গইয়াছে। তাই ভারতবর্ষ, কি জ্ঞান কি কর্ম সকল দিকেই উপকরণের ভিড়টাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে—নহিলে এই সময়ের দিকে যখনটাকে চালনা করিবার খোলসা জায়গা পাওয়া যায় না।

সকল সমস্যা তাতিই আপনাব ইতিহাসের ছোট বড় সমস্ত উপকরণ জমাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই উপকরণসমূহ দেখি না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে তারিখ ও নামের পুঞ্জীকৃত তালিকা পাওয়া অসম্ভব। ইহায় অসুবিধা নাই যে তাহা নহে—কিন্তু সুবিধাও আছে। বাহুল্যের দ্বারা প্রচ্ছন্ন না থাকাতে ইতিহাসের সমগ্রটাকে ভারতবর্ষে মোট দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া লওয়া সহজ।

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস,

নিমেষ ও উদ্যেগ, নিদ্রা ও জাগরণের পাল্লা আছে—একবার ভিতরের দিকে একবার বাহিরের দিকে নারী উঠার ছন্দ নিরন্তরই চলিয়াছে। ধামা এবং চলার ভাবভঙ্গি সেই নিমেষের গতিবিধি সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলা হস্ত সত্যই সহিষ্ণু, অর্থাৎ “আছে” এবং “নাই” এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার আশ্রয়। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রশ্বাস ও অপ্রশ্বাস—এনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে তাহাতে সৃষ্টিকে বিভিন্ন করিতেছে না। তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির ফলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিংবা চলিতেছেই না। কিন্তু নেকেশের কাঁটা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহা টুকটুক করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। ফেলন-দণ্ডটা যে একবার বামে ধামিয়া দক্ষিণে গমন, একবার দক্ষিণে ধামিয়া বামে আসে তাহা ঐ নেকেশের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমবা ঐ মিনিটের কাঁটা ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি কিন্তু যদি তাহাব অগুণিতাণ-কালের সেকেশের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে ধানিতেছে ও চলিতেছে—তাহাব একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে ঘর পড়িতেছে। সৃষ্টির স্বন্দোলকটির এক প্রান্তে হাঁ জগৎ প্রান্তে না, একপ্রান্তে এক অজ্ঞ প্রান্তে ছুট, একপ্রান্তে আকর্ষণ অল্প প্রান্তে বিকর্ষণ, একপ্রান্তে কেন্দ্রের অতিদূরী

ও অল্প প্রাপ্তে কেন্দ্রেয় প্রতিমূখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিবোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদেব অসাধ্য ব্যাঘ্রামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহার সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্কটনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিষটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের একঝোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উদ্ধতবেগে সোজা চলিতে থাকে, ডাইনে বাঁয়ে ক্রক্ষেপমাত্র করে না; কিন্তু শক্তিকে জগতে একাধিপত্য দেওয়া হয় নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই দুইয়ের উল্টাটানে বিশ্বের সকল জিনিষই নয় হইয়া গোল হইয়া সুসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ ক্লান্ততা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারেব সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। এই এক শক্তিব একাধ সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না—তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুকেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; ক্রান্তেব প্রলয়গিনাক্তেব মত তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সঙ্গীত নাই; এই অল্প শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির বোগেই বিশ্বের মত কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাকর—পদে পদে তাহার জুড়িজুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। সেখানেও এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে—কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে বাখিতে পারি না! বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে হৃদয়ের এক প্রাপ্তে আসিয়া এমনি হুঁকিয়া পড়ি যে অল্প প্রাপ্তে ফিবিতে বিলম্ব হয় তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ক্রটি সারিয়া লইতে গলদঘর্ষ হইয়া উঠিতে হয়। একদিকে আশ্রয়, একদিকে পথ; একদিকে অর্জন, একদিকে বর্জন; একদিকে সংযম, একদিকে স্বাধীনতা; একদিকে আচাৰ, একদিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই ভাগ-অভ্যাসের ইতিহাসই

মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনাব ছবিটিকে স্পষ্ট কবিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস বোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুৰাতন মহা-সভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুৰামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ কঠিক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাস্থেই আমরা আর্ঘ্য-অনার্য্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্য্যের প্রতি আর্ঘ্যের যে বিেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্ঘ্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারত-বর্ষে আর্ঘ্যেরা কালে কালে ও দগে দলে প্রবেশ করিতে ছিলেন। তাহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহিব হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্ঘ্য উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহাবা আপনা-দিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহু ভেদগুলিকেই বড় করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্ঘ্যেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিতেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মত সংঘাত পদার্থেবও দুই প্রাপ্ত আছে—তাহাব একপ্রাপ্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রাপ্তে মিলন। তাই এই সংঘাতেব প্রথম অবস্থায় স্বর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্ঘ্যদের যে আত্মসঙ্কোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থাকিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দতত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিবিতে হইয়াছিল।

অনার্য্যদের সহিত বিরোধেব দিনে আর্ঘ্যসমাজে বাঁহারা বীব ছিলেন জানিনা তাহারা কে? তাহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া ত বর্ণিত হয় নাই। হয় ত জনমেজয়ের সর্পসত্ত্বের কথা

মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষাভ্যুত্থানিক শক্ততার প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সর্প-উপাসক অনার্য্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমৈত্র্য নিদারুণ উদ্যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণ-কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে তবু এই রাজা ইতিহাসে ত কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্য্যদের সহিত আর্য্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসারে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্য্য জনার্য্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটা মহা উদ্যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্যোগের নেতাক্রমে আমরা তিনজন কল্পিতের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিন জনের মধ্যে কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে একটা একঅভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা—এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরম্পরের সম-সাময়িক ছিলেন সে কথা হয় ত বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরম্পরের নিকটবর্তী। আকাশের-যুগ্মনক্ষত্র-গুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাক্ষধানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়—তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য হারাইয়া যায়—কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া নিসিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণকথায় যেমন রাজা অর্থাৎ। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া

ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ ভাব্য-ইতিহাসগত একটা বিশেষ ভাবের রূপ হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা অর্থাৎ মধ্যযুগের যুরোপীয় কল্পিতদের একটা বিশেষ ধর্ম্মীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিকল্প পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন কল্পিতদল ধর্ম্মে এবং আচরণে একটা বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধীদের সহিত দীর্ঘকাল বোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবকল্পিতদের এই ভাবটা কি, তাহার পুরাপুরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয় পরাজয়ের পরে আবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া বহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত নীচ জোড়া লাগিতে পারে তাহারি চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলেব আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ কল্পিতের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কি আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিজ্ঞ। এক এক কুলের আর্য্যদের মধ্যে একএকট কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্বত্বমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। বাহ্যিক এইসমস্ত ভাল করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ বশ ও ধনলাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্ম্মকর্ম্ম্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রপণের ধনের মত ইহা সকলের পক্ষে স্বেচ্ছা ছিল না। এই সমস্ত বস্ত্র ও যজ্ঞাঙ্গষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটা বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে বাহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ ইহা দীর্ঘকাল

অধ্যয়ন ও অভ্যাস সাপেক্ষ। কোনো এক শ্রেণী এই-সমস্তকে বন্ধা কবিবার ভার যদি না লয়, তবে কৌলিকস্থত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের একশ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নব নব অধ্যবসায়ের নিযুক্ত তখন আর একশ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত অন্নীয় ব্যাপারকে বিস্মৃত ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখন বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখন সমস্ত জাতির চিন্তাবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্ম-বিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পুড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে বাঁধের মত একজায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদল ব্রাহ্মণেরা যখন আর্ধ্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপ্রকৃতিকে আগলাইয়া বলিয়াছিলেন, যখন সেইসমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুসিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতে-ছিলেন এবং তখন আর্ধ্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে বাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মত এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। যুদ্ধের সম্মুখে বাহারা একত্র হইয়া তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড় করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে হুম্মাতিহুম্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্যের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বহুদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব স্বাভাবিকতার মধ্যে মানুষ্য, এই কারণে প্রথামূলক বাহ্যস্থানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ বিস্তারের উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্ধ্যদের মধ্যকার ঐক্যস্থত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে

সত্যপদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিজ্ঞা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিজ্ঞা হইয়া উঠিয়া ঋক যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিজ্ঞা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণকর্তৃক সময়ে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিম্নল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড় ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে না। আর্ধ্যজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ বতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্বত্রই এই অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে দেবতার নামে নানা কিন্তু সত্য এক;—অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সজ্জ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিজ্ঞা অমুকুল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিজ্ঞা রাজবিজ্ঞা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখন আমরা কেবলি বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখন একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহ্যশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্মকার্য এবং এই অনুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গূঢ়শক্তিঅনুসারেই কলের ভারতম্য কল্পনা।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল—সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরগ্রহস্বরূপে আমরা ছই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডেব দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারিমুখ

চারিবেদ—তাহা চিরকালের মত ধ্যানবস্ত স্থির ;—আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়ানীল হস্ত কেবলি নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্য্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতার। যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মা বসে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অমুভূত না হয় তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনা'র সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রু-পরাস্তব চাই ; যোগযজ্ঞ-অমুষ্ঠানের ক্রটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অগ্রসর হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদের অভিভূত করিয়া বাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়—সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিজ্ঞার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নিম্ণ ও ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিজ্ঞা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ বুকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই এককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না। ঈশ্বরবাদী যিহুদিদের দূরবর্তী দেবতা ভবের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেষ্টামেন্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনি তিনি প্রেমের দেবতা ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলার এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনি সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এইজন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞার আনুযায়িকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্ম্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্ম্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন কবিতা লইয়াছেন কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন নাই • তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনো অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর

বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্ত্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেবে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রাহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন—বহুপল্লবিত যোগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তিধর্ম্মের যুগ যখন ভাবতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই নক্ষিক্ণে একটা বড় ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার ধারাহার হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া ধারাহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম্ম, তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণে • এই ধর্ম্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই—এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই—প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয় দলের এই ভক্তিধর্ম্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ভেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমার আনিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নিউজ্জ্বাস উদ্গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল,

হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দুর্ভাগ্য আবো আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ম্ম-কাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে অরাসন্ধকে বধ করেন। সেই অরাসন্ধ রাজ্য তখনকার ক্ষত্রিয়দের শত্রু-পক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করাইয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্থাৎ দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের অন্ত নিযুক্ত ছিলেন পরবর্ত্তীকালের সেই অত্যাশ্রিত প্রায়সেই পুরকালীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ—দ্রোণ রূপ ও অশ্বখান্য ও বড় সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্ম্মই ছিল রামের কুলধর্ম্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিত-বংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত

বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে হিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে এই কাব্য কখন জাতীয়সমাজের বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো এক বাজবংশের পারিবারিক বরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্দলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত জৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া ঘটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আব এক প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুব বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়েব এই দুর্দ্বন্দ্ব শত্রুকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এই নির্ভর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ কবিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীৰ্য্য-বলে কতক ক্ষমাশূণ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্য্যেই এই উদার বীৰ্য্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্তাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইসমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়ত তথ্য খুঁজিলে ঠিকিবে কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিজ্ঞা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এ বিজ্ঞা কেবল মাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না ; এ বিজ্ঞা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারেব বিচিত্র কৰ্ম্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্ণিত হইয়াছে। চব্বমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোট বড় সমস্ত কৰ্ম্মের আশ্রয় যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্বোচ্চ

কীৰ্ত্তি। আমাদের দেশে যাহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ত্যাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কৰ্ম্মকেই মুক্তি-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অন্বেষণ, আর এক দিকে সহস্রে হলাচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানিতে পারি কৃষিবিজ্ঞানের দ্বারা আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আৰ্য্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই খেচুই অরণ্য-শ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বন-ভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকত তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েবা আৰ্য্যাবৰ্ত্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদেব স্থলে কৃষি-সম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় যুৰোপীয় উপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ কবিয়া কৃষিবিজ্ঞানেব ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন যুগযাজ্ঞবীষী আরণ্যক-গণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল—ভারতবর্ষেও সেইরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষি-ব্যাপার কেবলি বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে বাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন—ইহা হইতে জানা যায় আৰ্য্যাবৰ্ত্তের পূৰ্ব্বপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত আৰ্য্য উপনিবেশ আপনায় সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন চুৰ্গম বিদ্যাচালের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং জাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আৰ্য্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীৰপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আৰ্য্যদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। বুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেবই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে—কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ আৰ্য্যদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন এই যে লোকশ্রুতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি

বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বাবস্থায় পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিলে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আৰ্য্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া বিনি দক্ষিণ-বঙ্গে আৰ্য্যদের কৃষিবিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অসামান্য মানস কজ্জাব সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ কবিস্থায় হুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল চুৰ্গম শৈববীরকে নিহত করিলেন তখন তিনি হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখন তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলাচালন-রেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীৰ রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ কবিস্থায় রক্ত উদ্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্যই রাজর্ষি জনকের কজ্জাকে লাভ কবিস্থায় নৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই হুঃসাধ্য ব্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বিগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষস-দিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলাচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাবাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামী-দের মধ্যে অন্ততম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়া ছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথবকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যেব পবিচয় দিয়াছিলেন; তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দের বিবন্ধে ব্রাহ্মণদেব

“অরুণ হইল ‘রাক্ষস-রহস্ত’ নামক একটি স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আশ্রিত পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই ‘অহল্যা’ শব্দের

যে বিদ্যেব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রধর্মি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভূজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেক বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ তখনকার ছই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বুদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও বান্ধবদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

আর্য্য অনার্য্যের বিরোধকে বিদ্যেবের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন ছুশ্চেটা। প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হঠতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড় বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিষটা ত ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম্ম যখন বাহিরের জিনিষ হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মত অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই বৃচিত্তে চায় না। জ্যু-দের সঙ্গে জেন্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না। কেননা জ্যু-রা জিহোতাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোতার সমস্ত অনুরাসন, তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে জ্যু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল। তেমনি আর্য্য-দেবতা ও আর্য্য-বিধিবিধান যখন বিশেষ জাতিগতভাবে সঙ্কীর্ণ ছিল তখন

আর্য্য অনার্য্যের পরস্পর-সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া, কিছুতেই মিটিতে পারিত না। কিন্তু ক্ষত্রিয়দেব মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল—বাহিরের ভেদ বিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল তখনই আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল। তখন বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম্মের দেবতা অন্তরের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন শুধক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্ত্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিত্রের দুর্দান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র স্নেহে চুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের অমুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পবিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উত্তরকাণ্ডে এই কাহিনী-সৃষ্টির দ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্য্য জাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অমুকুল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিত্রের মধ্যে যে একটি সন্ন্যাস-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্ত্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অন্তর্গত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিত্রকে গৃহধর্ম্মের ও সমাজধর্ম্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্যেবের সন্মোচন হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষয় সমস্তার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মত বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং

এই ভাণ্ডপর্ধ্যব্যাখ্যা আমি দেখিলাম। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ক্রমে ইহাই ঠাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও সোকাহুমোদিত আচারেব রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্বুত বাণীর এই, এককাল বে-রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিজ্ঞানে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী-কালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অমূল্য করিয়া ব্যবহাব করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষ বীর্ষ্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর-বলিয়া প্রচাব করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্য্যে এই গতিস্থিতিব সামঞ্জস্য ঘটনাছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসঙ্গেও এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালেব মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণেব বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষম কবিয়াছিলেন এ তাঁহাব গৌরব নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিধেবেব বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্থ্য অনার্য্যেব মধ্যে প্রীতির সোত বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নূতন আলোচনা কবিলে দেখা যায় বর্কর জাতির অনেকেরই মশ্য একএকটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আপ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিঙ্কিধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্য্যদলকে বশ কবিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বাল্লী পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল ত বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবল্লুকচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই যে বানবদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা বাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হুমানবেব ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহু-ধর্মের জ্বলে ভক্তিধর্মকে আগাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন। ক্রীষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি

তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, সূফী, কীরপাই প্রভৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি বাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অমূল্যদের কাছে তাঁহারা দেবত্ব গ্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের সম্ভবতম যোগ উদ্ভাটন কবিতো গিয়া তাঁহাও যেন দেবত্বের সহিত মল্লযুদ্ধের তেদনীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে হুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত কবিয়া রাজ্য বিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচাব করিয়াছিলেন। তিনি সেই যে বীজ রোপন করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পবেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দক্ষিণাত্যে ক্রমে দাক্ষিণ্য শৈলধর্মও ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দক্ষিণাত্যে হইতেই ব্রহ্মবিজ্ঞারী এক ধারায় ভক্তিশ্রোত ও আর এক ধারায় অশ্বৈত্তজ্ঞান উচ্ছৃষিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্রাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্থ্যদের ইতিহাসে সন্ধান ও প্রসারণে এই একটি রূপ দেখিলাম। মাছুষের একদিকে তাহার নিষেধ আর একদিকে তাহার বিশ্বাস এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আশ্রয়ক্ষণ শক্তির দিকে ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণ শক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাধিয়া লইয়াছে। যুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী দলের চক্কা।

তাহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্বার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলণ্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারেল ও কংগ্রেসভেটব এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে—ক্ষমতা লাভের জন্য এই দুই শাখার মধ্যে প্রতियোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন কি, ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধাও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মত করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়—বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির মত বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তরে একই স্বজনশক্তির এপিঠ ও পিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি-শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে—কোনো পক্ষই তাহা কৃত্রিম নহে।

তবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি-শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই—সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্য্যই তাহা কারণ এমন অদ্ভুত কথা নিতান্তই ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতি-সংঘাত ঘটয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতাব আঘাতে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষণীশক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতারূপে পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

ভূমারারূত আর্য্য গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর হয়—তাহা চালাইতে চলিতে আপনাকে বাঁধে, বাঁধিতে বাঁধিতে চলে—সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকের কৌশল নহে। বন্দীশালায় যে বন্দনে ধরিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্দনই গতির সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলি দড়িদড় লইয়া আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়াছে

কেননা আপনার পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্তের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এই জন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্ম-প্রসাধনীশক্তির অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন আলোচনার আমরা ইহাই দেখিলাম যে ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্ম্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্য্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাহা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না—হয় এক পক্ষকে মারিতে, অন্য দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্য্যে অনার্য্যে যখন অন্ন অন্ন করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্য্যদের ধর্ম্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটয়াছিল। এই সময়ে অনার্য্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য্যউপাসকদের একটা বিবোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্য্যেরা কখনো অনার্য্যেরা জয়ী হইতেছিল। ক্রমের অমুভবী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ অশুরের কণ্ঠা উধাকে ক্রমের পোত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন—এই সংগ্রামে ক্রম জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই সেই উপলক্ষ্যে শিবের অনার্য্য অমুচরণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক ক্রমের সহিত মিলাইয়া একদিন তাহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য্য অনার্য্যের এই ধর্ম্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাহাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে ক্রমের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে—সেই সংগ্রামে ক্রম বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের রক্তের মিলন ও

ধর্মের মিলন ঘটতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসঙ্ঘ ও ধর্মসঙ্ঘ উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মবক্ষণী-শক্তি বারম্বার সীমানির্ধারণ করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাধ বাধিয়া দিয়াছে। * মনুতে বর্ণসঙ্ঘের বিবন্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মুক্তি-পূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিবন্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মের অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনো দিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণেব পরমুহূর্তেই সঙ্কোচন আপনাকে বারম্বার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহাবই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভাবতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসম্রাটকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়ম মাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিহ্নিত সত্য বলিয়া গণ্য কবিত্তে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বৃদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভাবতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবে ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিস্রুত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভাল হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ একপক্ষের ঐকান্তিকতার জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া বৈষ্ণব সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্য্য অনার্য্যের যে মিলন ঘটতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংঘম ছিল—নাথের মাঝে বাধ বাধিয়া প্রলয় স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। * আর্য্যজাতি অনার্য্যের কাছ হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিতে-

ছিল তাহা আর্য্য করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অসুগত করিয়া লইতেছিল—এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্য্যে অনার্য্যে একটি অসুস্থরিক সম্ভব ঘটবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিসন-ব্যাপারেব মাঝখানে কোনো এক সময়ে বাধা বাধি ও বাহ্যিকতাব মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নইলে এত বড় বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং যে বিপ্লব কোনো সৈন্তবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র হস্তবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তৎপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও গাছের অশ্ববে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া অস্বাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিবন্ধন, চিকিৎসাব আক্রমণও তেমনি সাংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বস্ত্রা যখন সুরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজেব সমস্ত বেড়াগুলো ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল—যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতবর্ষে কোনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনো উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এই জন্ত তখনকার জাতিরচনাকার্য্য অধিদের হাতের ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ব্রাহ্মণ-বর্ষের ভিতরকার অনার্য্যেরা নহে ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনার্য্যদের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্য্যদের সহিত তাহাদের কুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধ-ধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য, অস্বাস্থ্য অকার্য্য, প্রকাশ পায় নাই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল হইয়া পড়িল

তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসঙ্গতিরূপে অবোধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনার্যোবা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে সুতরাং এখন তাহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বনে আর্থসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল কারণ আর্থজাতির স্বাভাবিক বন্ধন ভাঙা চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভাবতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনো ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনার্যের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এইজন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশে ক্ষত্রিয়-বংশ নহে।

এদিকে শক জন প্রভৃতি বিদেশীয় অনার্যগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবোধে মিশিয়া যাইতে লাগিল—বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই সমস্ত বৃত্তার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, তখন বাধা দিবার ব্যবস্থাটা সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্বল। এইরূপে ধর্মের কর্ণে অনার্যসম্মিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যখন কোনো সঙ্গতির সূত্র রহিল না তখনই সমাজের অন্তরস্থিত আর্থপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্থপ্রকৃতি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটি চেষ্টা উদ্ভূত হইয়া উঠিল।

আমরা কি এবং কোন্ জিনিষটা আমাদের—চারিদিকের বিপুল বিপ্লবিতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া দীর্ঘাচিন্তিত কবিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধ-

সমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেন না। এইজন্য আর্থ জন-শ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্য-সীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্যকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়-ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহকর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্থসমাজেব স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। যথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত্ন করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিজ্ঞা মাত্র ছিল এবং সে বিজ্ঞাকেও সকলে পবাবিজ্ঞা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিপ্লবিত সমাজকে বাধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দরকার হইয়াছিল যাহাব সম্বন্ধে নানা লোক নানা প্রকার তর্ক করিতে পারিবে না—যা আর্থসমাজের সর্ব পুরাতন বাণী; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই জন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিষ বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মন্ত্র করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্থ-সমাজে এতদিনকার যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সঙ্কলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি

ধার্মাবাহিক পরিধিসম্বন্ধে ত চাই সেই পরিধি স্বত্বই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্ধ্যসমাজের বত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক কবিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্ধ্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনৈতিকতাও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিবৃতি মূর্তি এক জায়গায় থাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্ধ্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধি চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা স্বার্থেই আর্ধ্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিশেষের রচিত ইতিহাস নহে ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এইসমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিলিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা কবিবার চেষ্টা করিত তবে আর্ধ্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্ধ্যজাতির ইতিহাস আর্ধ্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখা আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা স্ফুটন কিছু বা পবম্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্দিষ্টারে জনশ্রুতি সঙ্কলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতসকাচের এক-পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আরএকপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরশ্মি আরএকদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয় যোগ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্তার মীমাংসা কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেক মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস,

যুগ অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন কি, পবম্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধে বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জয়গায় তাহাব সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্‌খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাধ্যম সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধবিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে যুরোপীয় পণ্ডিতেরা কৃত্তিকগত অসঙ্গতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহার মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার—অর্থাৎ গ্রীকদের মতে ইহাব মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার প্রবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে মূল ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারতসঙ্কলনের যুগ সেই মূলের বিস্তৃতিতাবন্ধাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ন—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক কবিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হোক যোগই হোক বেদান্তই হোক সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ বানব-জীবনের পবমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌছিতে পারে না; স্বতএব ভাবতচিন্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্ত্বের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতাব মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি স্বাতন্ত্র্য জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সঙ্গতি ও অসঙ্গতির মধ্যে গভীরবস্ত্র এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে সমস্তকে লইয়াই সত্য,

অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন কি, গীতার যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতার যজ্ঞ-ব্যাপার এমন একটি বড় ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সঙ্গীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যেসকল জিন্মাকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, শক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমাব সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বাবে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইরূপে ইতিহাসেব নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলত্ব খুঁজিয়া বাহিব করিয়াছিল তেমনি বেদেব মধ্য হইতেও তাহা একটি ত্ব উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মত্ব। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্তি। তিনি যেমন একদিকে ব্যষ্টিকে রাখিয়াছেন আরএকদিকে তেমনি সমষ্টিকেও প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন; তাহার সঙ্কলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে তাহা সংযোজন, শুধু সংঘ নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিন্তেব একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে একটি দ্বৈতেরও দিক আছে একটি অদ্বৈতেরও দিক আছে কারণ এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো একটি দিকও সম্ভব হইতে পারে না। লজ্জকে ইহার কোনো সমন্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমন্বয় সেখানে ইহাকে অনির্কটনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মত্ব এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিকেই রক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য পরবর্তীকালে এই একই ব্রহ্মত্বকে লজ্জিক নানা বার বিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মত্বের আর্থধর্মের মূলত্বটি সমস্ত আর্থধর্মশাস্ত্রকে এক আলোকে

আলোকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কেবল আর্থধর্ম কেন সমস্ত মানবের ধর্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিকৃততার দ্বারা পীড়িত আর্থপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল একটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্ন প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, আর্থ জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন—ইহা ভাবগতযুগ—অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সঙ্গীর্ণ কাহ্নে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আবৃত্ত কবে তাহা স্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব—শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহাব আয়োজন চলিতেছিল এবং তাহার পূর্বেও যে অস্ত্র বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধাপপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পবিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগেও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির কবিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও কুড়ানো এক সঙ্গের চলিতেছে। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। একপক্ষ বলিতেছেন যেসকল মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহাব দ্বাবাই চরমসিদ্ধি লাভ করে যায়—অপব পক্ষ বলিতেছেন জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় লবিয়া এই দুই মত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার বচনাকাল যখনই হোক এই মতবৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আর্থসমাজেব যে উত্তম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা স্মৃদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সঙ্কলন কবিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত কবিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আর্থ অনাথ্যেব চিরন্তন সংমিশ্রণের

সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিবকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে; ইহাই আমাদের বক্তব্য।

একথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্যরা আমাদের দিগকে দিগাব মত কোন জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতার হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দু সভ্যতা রূপে বিচিত্র, ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিশ্ভার তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধু ছিল কলাবধু। আর্যদেব বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সম্মিশ্রণ-চেষ্টার একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্য্যও নহে সম্পূর্ণ অনার্য্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সম্মিশ্রণের ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অনন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মৃত্যু ও অন্ধ সংস্কারের আর অন্ত থাকে না; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিস পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যাত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মৃত্যুর ভারে ধূলিলুপ্তিত করিয়া দেয়। আর্য্য ও দ্রাবিড়ের এই চিন্তা-বৃত্তির বিন্দুভিত্তিক সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কর্তব্যতার সীমা দেখি না। একথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে বরং অনার্য্যদেব সামগ্রীও একদিন ঘাব খোলা পাইয়া অসঙ্কোচে আর্য্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই অনধিকারপ্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে স্তবীভূত হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিবে নহে যুদ্ধ এখন মেহেব মধ্যে—কেন না অন্ধ এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আর্য্য সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন এক-

মাত্র। এইজন্য এই সময়ে বেদ যেমন অভ্যস্ত ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনকার পুণ্যে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আকারে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইতেছে যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজানপ্রোতে গুণটানা, এইজন্য গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিয়ামনাজ নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সঙ্কটগ্রস্ত আর্য্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা অস্বৈবকার প্রাণপণ প্রয়াস। তখন সমস্ত সমাজের লোবেব মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল এক, পূর্বধারাকে রক্ষা করা, আর এক, নূতনকে তাহা সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্য্যদেবতাকে বেদেব প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য্য দেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মার আর্য্য সমাজেব আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাহার মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই মূর্ত্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্য্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর কামকে ভ্যস্ত করিয়া নিকর্য্যগের আনন্দে নিমগ্ন, তাহার দিগ্বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্য্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙ ধুতুরা উন্মত্ত। আর্য্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিক্রম এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন,

অন্তদিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিত্তী-
মিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি
আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তাম-
সিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। একদিকে
প্রবৃত্তিকে শাস্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা;
অন্তদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত
করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত
করিয়া নিদাকণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আর্য্য অনার্য্যেব ধারা গঙ্গাধর্ম্মনার মত একত্র
হইল তবু তাহার ছই রং পাশাপাশি বহিয়া গেল। এইরূপে
বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যেও কৃষ্ণেব নামকে আশ্রয় করিয়া যে-
সমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা ভাগবতধর্ম্ম-
প্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণব
ধর্ম্মের একদিকে ভগবদগীতার বিস্তৃত অবিশিষ্ট উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব
রহিল আর একদিকে অনার্য্য আতীর গোপজাতির লোক-
প্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল।
শৈবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিষগুলি মিলিত হইল
তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শাস্তি এবং তাহার
মত্ততা, তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্ধাম
তাণ্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া
গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন
ও মৃত্যু, অন্তরবেব দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই
আর্য্য সভ্যতার অধৈতনুত্ব। ইহাই নেতি নেতির দিক—
তাগই ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব
ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী
আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্য্যের
এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়পিণাকের স্থলে সেখানে বাঁশির
ধ্বনি; ভূত প্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস;
সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলোকধামের চির
ঐশ্বর্য্য; এইখানে আর্য্য সভ্যতার দৈতনুত্ব।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আতীর-
সম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত মিশিয়া
গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার
একটি সত্যপথ ছিল। নায়ক নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও
ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানেই

মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্য্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে
অনার্য্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেইসমস্ত
কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উদ্ভীর্ণ করিয়া
লইল। অনার্য্যেব চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতাকপে
ছিল আর্য্য তাহাকে সত্যেব মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া
দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণ-
কথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবেব একটি চিরন্তন
আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আর্য্য
এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের
সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে
জ্ঞানেব ব্রহ্মিত রসের একের সহিত বিচিত্রের অন্তর্বর্তর
সংযোগ ঘটিয়াছে।

আর্য্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্য্যসমাজের
মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে জীদেবতাব প্রাধান্য
নাই। আর্য্যসমাজে অনার্য্য প্রভাবের সঙ্গে এই জীদেবতা-
দের প্রাধৃত্যব ঘটতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে
বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন
দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও একদিকে
হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্য্যমূর্ত্তি অন্তদিকে করালী
কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্য্যমূর্ত্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্য্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনা-
কাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্য্যভাবের ঐক্যনুত্রে
আদ্যোপান্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর
হয় না—তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার
মধ্যে শত সহস্র অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। এইসমস্ত
অসঙ্গতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না—কেবল কালক্রমে
তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে
অসঙ্গতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার
প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই
সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি
সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাকুক। ইহা একপ্রকার
হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি। যখন বিকল্পগুলিকে পাশে
রাখিতেই হইবে অথচ কোনো মতেই মিলাইতে পারা
যাইবে না তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই
পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধযুগের প্রলয়বসানে বিপর্যস্ত সমাজের নূতন পুৰাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাট্টিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। বাহাবা স্বতই স্বতন্ত্র, বাহারী নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাধিতে গেলে বাঁধন অত্যন্ত আঁট করিয়া রাখিতে হয়—তাহারা জীবনধর্মের নিষম অল্পসারে আপনদের যোগ আপনাই সাধন করে ন।

ভারতবর্ষে ইতিহাসেব আরম্ভযুগে যখন আৰ্য্য অনার্য্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এই প্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সম্বন্ধকতা থাকে। মানুষ বাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে ভীতভাবে দেখ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পাবে না। এইজন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্য্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধবিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী যুগে যখন আরএকদিন অনার্য্য বিবোধ ভীত হইয়া উঠিয়াছিল অনার্য্যেরা তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুত্ররাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এইজন্য সেই অবস্থায় বিদেব একান্ত একটা ঘুণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘুণাই তখন অস্ত্র। ঘুণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দুর্মে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, বাহাকে সকল প্রকারে ঘুণা করা যায় তাহারো মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেও আপনার হীনতার সঙ্কোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবী করে না। এইরূপে যখন সমাজের একভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর একভাগ আপনার আদিপত্যে কোনো বাধাই পায় না—তখন নীচে যে থাকে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে আত্মপ্রসারণের দিনে যে অনার্য্যবিদেব ছিল এবং আত্মসঙ্কোচনের দিনে যে অনার্য্যবিদেব আগিল, উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম

বিদেবের সমতলটানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে দ্বিতীয় বিদেব নীচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। বাহাকে মারি সে যখন করিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, বাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে মাঝ মাঝা পাতিয়া লয় তখন বড় হুঁশি। বেদে অনার্য্যদের প্রতি যে বিদেব প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌকষ দেখিতে পাই, মনুষ্যসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অস্ত্রাণ ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিকক্ষ কহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনো দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাঁধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘুণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমনি নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আৰ্য্য ও অনার্য্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, যুরোপীয় ও এশিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুইটিনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং শক্ততা শ্রেয় কিন্তু ঘুণা ভয়ঙ্কর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজেব একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া রাখিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সঙ্কোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার বোগে সমাজের গতি মধ্যপথে-নিরস্তিত হইতেছিল; এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না। সমাজের অনার্য্য-শক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না—ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়ন্তস্ত স্থাপিত করিল। এদিকে বাহিব হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের

প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মগণ অজ্ঞান অনাথীদের জ্ঞান তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মগণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আৰ্য্য ক্ষত্রিয়দের জ্ঞান সমাজের সৃষ্টিকার্য্যে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মগণশক্তির সহায় ও অনুবর্তী হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ বোঁগ দিল।

এরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষণীশক্তি সঙ্কোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতিব প্রতিভা ক্ষুণ্ণিত পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ; এইরূপ শিকল দিয়া বাঁধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুক্রমে জাতির মধ্যে কলের ধর্ম্মই জাগে ও জীবনের ধর্ম্মই হ্রাস পায়; এরূপ জাতি চিন্তার ও কর্ম্মে কর্তৃত্বভারের অযোগ্য হইয়া পরাবীনতার জন্তই সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আৰ্য্যইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাস-প্রবণতা বিস্তার বাহিরের জিনিষ জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিন্তাবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া ঐক্যের পথ সন্ধান করিয়া এই বহুর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর একদিন আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিষ আরো অনেক বেশি এবং আরো অনেক অসঙ্গত। তাহা আমাদের জাতির চিন্তাকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা বা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিতেছে, বাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, বাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এইসকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না; ইহা মানুষের চিন্তাকে সঙ্গীর্ণ ও কর্ম্মকে সংরুদ্ধ করিবেই;—সেই হুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্ত এইকালেই সকলের চেয়ে সেই চিন্তাশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে বাহা

জটিলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিন্তাশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। ছেলে একদিন ঘরের বাহির হইয়াছিল বলিয়া বাপ তাহাকে আজ লোহার সিন্দুকে পুরিয়া আধমরা করিয়া নিজকে নিশ্চিন্ত রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চূপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সঙ্কোচনেন্ন, অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্য যুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জ্ঞনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী-কেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভূতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যান-যোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্য যুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় হইয়াছে—তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল বাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইহারাই লোকাচার শাস্ত্রবিধি, ও সমস্ত চিন্তাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেটনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনো চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীন-কাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিক্ষেপে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে;—ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম্ম সমুদয় এই মহাযুদ্ধে জয়লাভ সামগ্রী; তাহার ত্রিকূল তাহার ত্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক;

আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বছর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহ্যল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতবর্ষ সাধনা। ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভাবতক্কে এই সমস্ত নিরর্থক বাহ্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই। তাহার ইতিহাস তাহার পক্ষে যতই অসাধারণ বাধাসঙ্কুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্ত্ত-প্রমাণ বিঘ্নব্য বোঝ কবিরাই বাহির হইয়া যাইবে—যত বড় সমস্ত ভত বড়ই তাহার তপস্বী হইবে—যাহা কালে কালে জন্মিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিবকালের মত হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাক যদি শুদ্ধমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনো মতে সহ করা যাইত—কিন্তু তাহাকে যে ধোরাক দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত—সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুণিব তবে এত রত্নশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পাবে না। যে সমস্ত নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জ্ঞান মূঢ়তা, দুর্ব্বলের জ্ঞান দুর্ব্বলতা, অনার্যের জ্ঞান বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাত জোগাইতে হয় তখন জাতির বাহ্যিকিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্ব্বল ও বীৰ্য্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্ন উচ্চের প্রতি তাহাই বর্ণনা;—কখনই তাহাকে ওদার্য্য বলা যাইতে পারে না; ইহাই তামসিকতা—এবং এই তামসিকতা কখনই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী

• নহে।

ধোরতর দুর্ঘ্যোগের নিশীথ অন্ধকারে এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যেসমস্ত অদ্বিতীয় দুঃস্বপ্নভার তাহার বৃত্ত চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে লাগিয়া উঠিবার জ্ঞান তাহার অভিজুত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে-কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে-কালকে বাহির হইতে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না, তবু অল্পভব কবিত্তেছি ভারতবর্ষ আগনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জ্ঞান উজ্জত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাধের উপর বাধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর শ্রোত খেলিত্তে ছিল না, আজ কেশধার তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সঙ্গ পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার-ভাটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনি দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তশোতের মত একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপন্যের দিকে ফিরিতেছে। একবার সার্বজাতিকতা তাহান্ন ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাভাতিকতা তাহাকে ঘর ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্ব্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয় সর্ব্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাল আরম্ভ হইবার এই ত লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কা মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতী জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব্বজাতিকে ও সর্ব্বজাতিই মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।*

শ্রীমদ্বীক্ষনাথ ঠাকুর।

* চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে, গুস্তাইন হলে, ওরা চৈতন্য সম্প্রদায় পঠিত।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere ফরাসী-গ্রন্থ হইতে)

দ্বিতীয় খণ্ড।

অবতরণিকা।

মধ্য-এসিয়ার লোকসমূহ—সামন্ত-তন্ত্র—মুসলমান-ধর্ম।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় জনসমাজের অবনতি অরাজকতার পর্য্যবসিত হইল; বাহির হইতে আক্রমণ ঘন-ঘন আবদ্ধ হইল। সেইসব সময়ে, এতটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল যে, শিল্প ও সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশের অবসর মাত্র হয় নাই। ভারতের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় প্রামাণিক দলিলপত্রের একান্তই অভাব। একাদশ শতাব্দী হইতে, আবার প্রমাণ-লেখ্যসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে দেখিতে পাই, ভারত অনেকটা রূপান্তরিত। তিনটি উপাদান, এই রূপান্তরীকরণে সাহায্য করিয়াছিল; মধ্য-এসিয়ার আদিমবাসী জনপুঞ্জের ভাবতে বাসস্থাপন, সামন্ততন্ত্র, মুসলমান-ধর্ম।

মধ্য-এসিয়া।—ভূগোল। উরাল—আল্টায়িক প্রদেশের লোক।

উহাদের বৈদিক গঠন। উহাদের স্বভাব। উহাদের আচার ব্যবহার। উহাদের ভাষা।—উহাদের ইতিহাসে বিপুল বংশাবলী।—সাধারণ সভ্যতার ইতিহাসে, উরাল-আল্টায়িক প্রদেশনিবাসীদের বিশেষ কার্য।—উরাল-আল্টায়িক লোকপুঞ্জের উপর পারস্ত ও চীনের প্রভাব।—তুর্কদিগের সাম্রাজ্য।—উইগুরদিগের সাম্রাজ্য।—রাজ্য-শাসনের কলাকৌশল।—মোগোল-সাম্রাজ্য।—ভারতের উপর আক্রমণ—মুসলমানের পূর্বে:—শক (যু-চি) ও বেত হন বা তুর্কম্যান। রাকপুত। মুসলমানের পর তুর্ক, আফগান, মোগল।—ভারতীয় সভ্যতার উপর মধ্য-এসিয়াবাসী জনপুঞ্জের প্রভাব। (১)

(১) তুর্করা, বৈকাল হ্রদ ও উনহুরি হ্রদ (লিয়াও) এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়; পূর্বদিকে তুঙ্গ জাতি। ঐ প্রদেশ হইতে উইগুর জাতিও নিঃসৃত হয়; উহার ষ: পু: দ্বিতীয় শতাব্দীতে, পূর্ব হইতেই, চামি ও বকুলের সরিকটে একটা রাজ্য স্থাপন করে। চতুর্থ শতাব্দীতে, তুর্ক জাতীয় হিউ-মুগু—হনরা বাহাদের ভাবী বংশধর—চীন আক্রমণ করে; কিন্তু প্রথম চীন সম্রাট সিং-পি হ্যাং-টি (২২১—২১০), বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেন—সেই অবধি পশ্চিমদিকেই আক্রমণ চলিতে থাকে। ৫: পু: ১৫৭ অব্দে, হ্যাং-মু ও উহুনেরা, তারিনের অববাহিকা হইতে হিম্ম-শকদিগকে (জের্ভ বা যু-চি) দূরীভূত করে। এই যু-চিদিগের উৎপত্তির কথা ভাল জানা নাই। শকেরা প্রথমে টান্সুক্সিয়ানা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৮: পু: প্রথম শতাব্দীতে উহার বাজিরানার (বাজিক) ঐক্য রাজ্য বিলুপ্ত করিয়া, ভারতে কনিকের প্রভুত্বাধীনে একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পরে পূর্বদিকে হইতে অভ্যন্ত অভিবান আরম্ভ হয়; সিরেন-পি, যুয়ান-যুয়ান, (সিরেন-পিদিগের এক শাখা), তুর্ক বা তুর্কিউ,—ইহারা ষষ্ঠ শতাব্দীতে

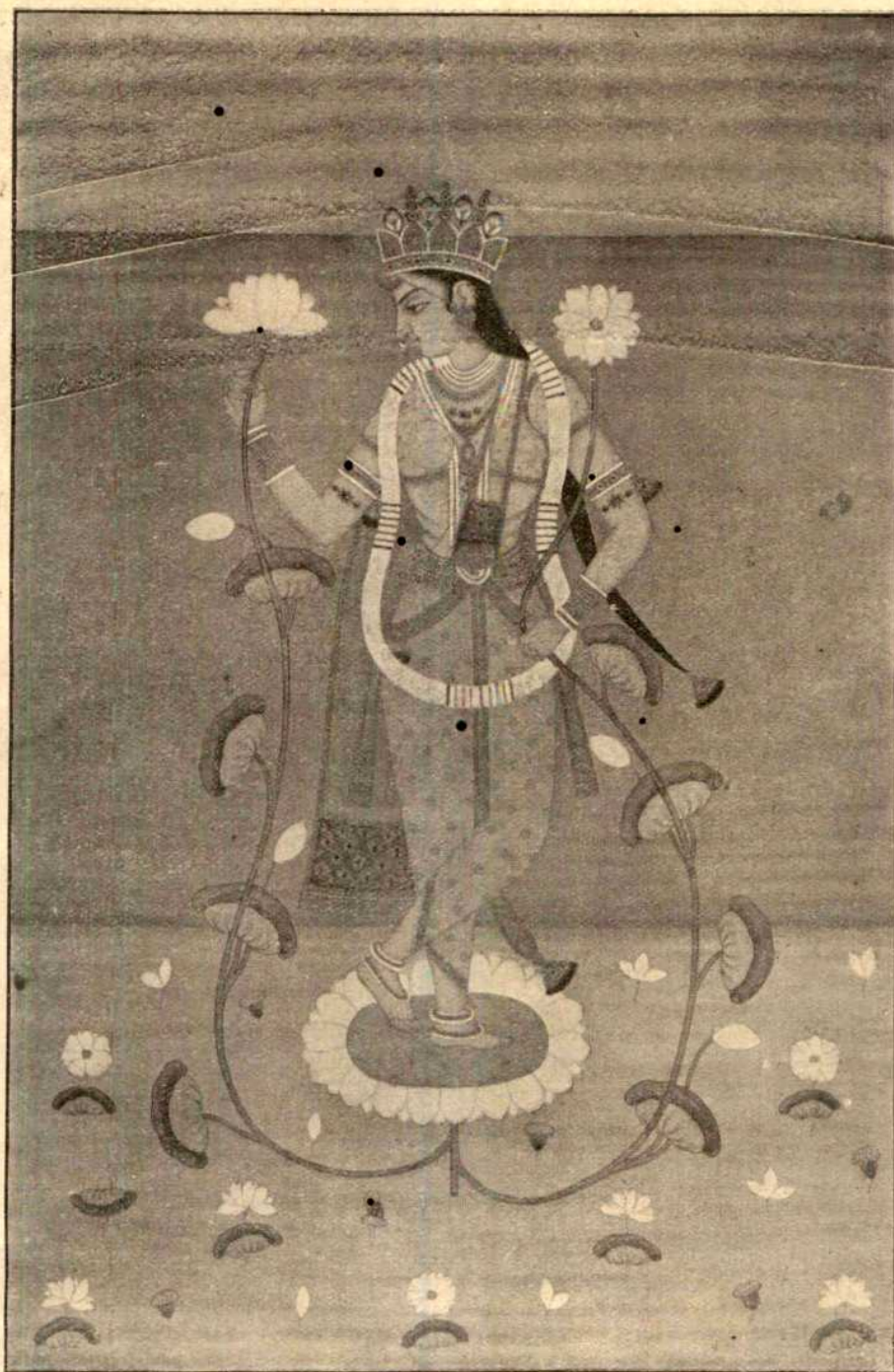
আধুনিক যুরোপের ছায়, আধুনিক ভারত,—প্রাচীন সভ্যজাতি ও কতকগুলি অসভ্যজাতি—এই দুয়ের সংমিশ্রণে, এবং পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি ও চরিত্রের ব্যাপ্তপ্রতিঘাতে সংগঠিত হয়।

প্রাচীন মহাদেশের সভ্যতা, সাগর উপকূলেই বিকাশ লাভ করে; কালক্রমে উপকূলবাসী লোকেরা অসভ্যদিগকে এবং নৈঋতদিককে জয় করিয়া বা হটাইয়া দিয়া যুরোপ

ক্যাস্পিয়ান পর্য্যন্ত বকীর রাজত্ব বিস্তার করে; এবং যুইগুর,—ইহারা ৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে তুর্ক-সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করে। ক্রমাগত মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া তুর্কদিগের বিভিন্ন জনপুঞ্জ, পুরোবর্তী-এসিয়াকে আক্রমণ করে এবং তথায় শক্তিশালী কতকগুলি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে: যখা, খোরাস্মনেব তাহিবিদবংশ; তুঙ্গুসিড-বংশ এবং ইজিষ্ট ও সিদ্ধিয়ার ইজিবি-বংশ; রাজনেভিড-বংশ—বাহাদের সাম্রাজ্য জর্জিয়া হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; সেলজুকিড-বংশ, পারস্ত দেশে ও ট্যান্সুক্সিয়ানার খওয়ারেজ-মিরেন-বংশ।

পূর্বদিকে, অভ্যন্ত উরালনিবাসী লোক, চীনের অরাজকতার সম্বন্ধে সুযোগ পাইয়া চীনদেশ আক্রমণ করে; তন্মধ্যে কেহ কেহ চীন সম্রাটদিগের সৈন্তবিভাগে নিযুক্ত হয়। এইরূপে, বেসকল তুর্ক বৃহৎ প্রাচীরের এধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারা হান্-বংশের পতনে (৫: পু: ২০৬, ২২০,) সুযোগ পাইয়া উত্তর-চীন দখল করিয়া বসে; ৩০৮ হইতে ৫৮১ অব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি তুর্ক রাজবংশ পবিদৃষ্ট হয়। তাহাদের বাহারা চীনের একতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাদের অবনতিতে খিটানরা চীন আক্রমণ করে; ৮৭২ অব্দে উহার উত্তর-চীনে একটা রাজ্য স্থাপন করে। হুঙ্গেরা (৯৬০ হইতে ১২৮০ পর্য্যন্ত) উত্তর চীনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু মাং-জাতীয় এক জনপুঞ্জ,—খিটান বা লিয়াওদিগের বিজেতা—পেকিন দখল করে, হুঙ্গেরা যাংসি নদী দক্ষিণে সরিয়া যায় এবং মাং-বা উত্তর বিভাগে স্বর্ণ-রাজ্য (কিন) স্থাপন করে। আরও উত্তরে কারাখিতাইদিগের রাজ্য দৃষ্ট হয়। বোধ হয় নেটোরীয় সম্রাটের ষষ্ঠধর্মে দীক্ষিত কারাখিতাইদিগের বে রাজ্য, তিনিই মধ্য যুগের কাহিনীতে পুরোহিত জোহান নামে খ্যাত।

তেমুজিন, জেঙ্গিস খাঁ, মধ্য মালভূমির মোগোল ও তুর্কদিগকে একত্র করিয়া, কারাখিতাইদিগের রাজ্য ধ্বংস করে; উত্তর-চীন ও তুর্কিহান জয় করে (১২০৯-১২) এবং মোগোল-সাম্রাজ্য স্থাপন করে। জেঙ্গিস খাঁর পুত্রপণ পেকিনে মোগোল-সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করে। এই সাম্রাজ্য জর্জান দেশ হইতে চীন সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং বনক-স্তপের সমুদ্র হইতে আরব ও হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যুয়ান-রাজবংশই মোগোলদিগের চীন-রাজবংশ (১২০৯ বা ১২৮০ হইতে ১৩৬৮ পর্য্যন্ত)। বে সময়ে মিজেরা (১৩৬৮—১৬৪৪) মোগোলদিগকে চীন হইতে বিদূরিত করে, তখন রাজধানী কারাকোরনে উঠিয়া যায়। কারাকোরনের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয় (ইহাই জেঙ্গিস খাঁর সম্রাজ্য)। ষষ্ঠে ষষ্ঠে বিভক্ত হইবার পর মোগোল-সাম্রাজ্য তাইমুর লঙ্গ কর্তৃক মধ্য-এসিয়ার পুনর্গঠিত হয়। তাইমুর লঙ্গের জন্ম ১৩৬০ অব্দে এবং মৃত্যু ১৪০৬ অব্দে। সমরখন্দ তাহার রাজধানী ছিল। তাহার বংশধরেরা তাহার উত্তরাধিকারী হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে, সমরখন্দ জেঙ্গিস খাঁর বংশধরদিগের দখলে আসে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে,—তুর্ক-সাম্রাজ্যের মধ্যে আটোম্যান-সাম্রাজ্যই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সাম্রাজ্য (১২৯৯—১৬২৬) অধমান-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।



সরস্বতী

প্রাচীন চিত্র হইতে, চিত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

P30019

ও এসিয়ার অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করে ; রুস-সাম্রাজ্যের বিস্তৃত অমর্রর ভূমিতে ও মোঙ্গলিয়ার মরুভূমিতে এখনও কতকগুলি পণ্ডারোপজীবী অস্থিবাস জাতি পরিলক্ষিত হয়। যেসকল অসভ্যজাতিদিগের উপর প্রাচীন রুসভ্য-জাতিদিগের বিজয়-কাহিনী প্রাচীন ইতিহাসে বিবৃত হয়, সেইরূপ রুসভ্যজাতিদিগের উপর অসভ্যজাতিদিগের বিজয়-বার্তা ও অসভ্যজাতিদিগের সভ্যতার উন্নতির কথা আধুনিক ইতিহাসে বিবৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে,—গ্রীক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর হইতে, ইরাক-সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত, বৈদেশিক আক্রমণ হই সত্বে বৎসর কাল স্থায়ী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভ হইতে আক্রমণকারীরা কেবল উত্তর পশ্চিমাংশে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র দেশের বিজয়সাধন ও রূপান্তরীকরণের আরম্ভ হয়।

এসকল আক্রমণকারীরা কোন্ কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন এবং উহাদের রীতিনীতি কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করা আবশ্যিক।

০০

প্রথমে উহাদের উৎপত্তির কথা। মধ্য-এসিয়া একটি মালভূমিরূপে গঠিত ; উহা হিমালয় হইতে, উত্তরের বিস্তৃত অমর্রর ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে। এই অমর্রর সমভূমি Dniepre হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত। পার্শ্ব ও বৈকাল-স্রোত—এই দুয়ের মধ্যবর্তী একটি গিরিমালা, ঐ মালভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। উহার পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, এবং চীনের সমভূমির উর্দ্ধে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে ; উহা পশ্চিমাংশ কাস্পিয়ান পর্যন্ত, যুদ্ধ-তালে নামিয়া আসিয়াছে। দুইটি গিরিপথের দ্বারা এই গিরিমালা বিখণ্ডিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটা সুগম—আলতাই পর্বতের দক্ষিণে, এবং অপরটি হুগম—পার্মীরের মধ্যে অবস্থিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যেসকল লোক মধ্য-মালভূমিতে বাস করে তাহারা ভারত ও চীন সহজে আক্রমণ করিতে পারে, অথবা অমর্রর সমভূমির উপর দিয়া, যুরোপ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

সম্ভবতঃ এইসমস্ত জনপুঞ্জের একই উৎপত্তিস্থান।

উহার উরাল-আলতায়িক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহাদের ভাষার শব্দশাস্ত্রগত লক্ষণগুলি একই ; এই সকল ভাষা সংলগ্নবান্ধক (agglutinant) ; উহাদের বাক্যরচনা-পদ্ধতি অনুসারে, বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণ, কর্তৃপদের পূর্বে কর্মপদ, এবং বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়। উহাদের দৈনিক গঠন এইরূপ :—উহাদের উচ্চতা মধ্যপ্রমাণ, কাঁধ চওড়া, মাথা লম্বা, মুখ চ্যাপটা, চোখের অস্থি দৃঢ়, চোখ ছোট ও নাকের পাশে ত্যাচ্চা, চোখের পাতা অপ্রশস্ত, গালের হাড় ‘বাহির-করা’, চুল কক্ষ, শব্দ বিবল, মেহের পূর্বার্দ্ধ দীর্ঘ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হৃৎ। উহার নির্ভীক অখারোহী, সর্বপ্রকার কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত ; এত অধিক বোড়ার চড়ে বে, উহাদের অনেকেরই পা ধমকের মত বাঁকিয়া যায়। উহাদের পরিচ্ছদ গদি-ভবা, অ-সংস্কৃত চর্মের আলখাল্লা, ‘সিন্ধ-করা’ চামড়ার কোমরবন্দ ; ভারী ইস্পাতের শিরজ্ঞাণ, অথবা ‘কসাক’-জাতীয় লোমশ টুপী। নৈতিক হিসাবে মূলফটি, কিন্তু বুদ্ধিমান ; উদাসীন কিন্তু নিষ্ঠুর ; সাহসী, শ্রমনিষ্ঠ, অতিচার-মজ্জতন্ত্রে ও মূর্ত্তিপূজায় উহাদের বিশ্বাস ; কিন্তু প্রকৃত ধর্মভাব উহাদের আদৌ নাই ; সকল ধর্ম-পদ্ধতিই অনুসরণ করিতে উহার প্রস্তুত। বিশেষতঃ উহার বুদ্ধিপ্রিয় ও কঠোর নিয়মশাসনের প্রতি প্রস্রাবান। উহার রমণীর অবস্থা প্রায় পুরুষেরই অবস্থার সমান করিয়া তুলিয়াছে। প্রধানের হুঁহিতারা, উত্তরাধিকারীস্বত্বে, ভূমি গোদন ও সৈন্তের ভাগ পায়। মধ্য-এসিয়ার কতকগুলি প্রভাবান্বিতা রাজ্যেরাও আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে, জেকিস বীর মাতা একটি দৃষ্টান্ত।

এইসমস্ত লোকের মধ্যে পরিবারই সমাজের আদিম রূপ ; পরিবার ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া গোত্রে পরিণত হয়। এই গোত্র কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি। আবার কতকগুলি গোত্র লইয়া একটি শাখা-জাতি গঠিত হয়। কিন্তু কালক্রমে অবিবাহিত যুবাযুবির কলে, শাখা-জাতি ও গোত্রগুলি উচ্ছিন্ন হয়,—এমন কি পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে। যেসকল সর্দার সর্কাপেক্ষা সাহসী ও সৌভাগ্যবান, যোদ্ধৃগণ তাহাদিগকেই বিব্রিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূপে একপ্রকার সাম্রাজ্যতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

একান্ত বাধ্য ও অসুগত থাকিবে বলিয়া বোধগ্ণ সর্দারের নিকট শপথ গ্রহণ করিত। তাহার বিনিময়ে সর্দার তাহাকে আশ্রয়দান করিবে,—লুটের কিঞ্চিৎ ভাগ দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিত। যাহারা অস্থিরবাস তাহাদের সম্পত্তি—গোমহিষাদি; এবং যাহারা স্থিরবাস তাহাদের সম্পত্তি—ভূমি। কালক্রমে রাষ্ট্রিকপদ্ধতি সংগঠিত হইল। উরাল-বাসীদিগের মধ্যে, সম্রাট বা রাজা ছিল, বড় বড় সামন্ত ছিল, বড় বড় জাইগিরদার ছিল, দলের সর্দার ছিল, অস্ত্রধারীদিগের নায়ক ছিল,—সামন্ততন্ত্রের শ্রেণী-পরম্পরা সমস্তই ছিল।

°°°

উৎপত্তিস্থত্র এক হইলেও, এইসকল জাতিদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই চরিত্রগত লক্ষণ বিভিন্ন। উহাদের জাতিগত প্রভেদ ইতিহাস আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। উরালীয়দিগের মধ্যে কোন কোন জাতি, সাইবিরিয়ায় ভূবার-সম্ভাব-বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে, কেহ বা মোঙ্গোলিয়ায় মকছুমে কেহ বা মধ্য-মালভূমের শিখরদেশে, অথবা • ট্রান্সকাসিয়ানার উর্বর ক্ষেত্রে বাস করিত। উহারা সকলেই সভ্যতার রাজ্যের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইত; এবং উভয়ই কতকটা পরস্পরের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

যেসকল জাতির ইতিহাসে কিছু ক্রতিস্থ আছে, তন্মধ্যে তুরানীদিগের (তুর্কম্যান) নাম, (২) যু-চি বা শকদিগের নাম, অ্যাটিলার হুন্দিগের নাম, (চীনদিগের কর্তৃক অভিহিত—হিয়ং-হু), তুর্কজাতির বিভিন্ন জনসংঘের নাম, উইগুর, মোগল, মাছু-তাতার, কারাখিতাই ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এইসকল জাতি আপনাদিগের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিত, প্রতিবেশীদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। প্রতিবেশী যথা, আক্গান, বেলুচি, তিব্বতী; (৩) উহারা সভ্য-সাম্রাজ্যসমূহকে আক্রমণ করিত, অথবা এইসকল সাম্রাজ্যের

(২) যু-চিগণ বোধ হয় উরাল-আষ্টারিক জাতি হইতে উৎপন্ন নহে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, যু-চি শক হইতে ভিন্ন।

(৩) আক্গান ও বেলুচিরা ইরাণী জাতি হইতে উৎপন্ন; তিব্বতীদের স্বতন্ত্র জাতি—উহারা মোগোলীয় জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। উহাদের ভাষা একাক্ষরিক।

অধীনতা স্বীকার করিত। কি জয়, কি পরাজয়—উভয় স্ত্রেই এইসকল জনসংঘ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পার্শ্ববর্তী দেশ ছাইয়া ফেলিল। প্রাচীন যুগে, দারায়ুস, আলেকজান্ডার এবং চীনসম্রাট শি-হুয়াং-টি—ইহাদেরই অভিযান উল্লেখযোগ্য; সেলিউকস্-বংশের পতনে, পারস্ত-দেশ, শক-বংশীয় পার্থীরদিগের হস্তগত হয়। আধুনিক যুগের প্রথম শতাব্দীতে চীন-সৈন্য, চীন-তুর্কিস্থান ও খাশগারিয়া জয় করে; পরে, হান্স-সম্রাটদিগের পতনে, মাছু, তুর্ক ও মোগোলরা চীনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায়। পরে তাং-রা উহাদিগকে দুরীভূত করিয়া সমরখন্দ পর্য্যন্ত ত্রান্সকাসিয়ানা দখল করে। কালিফ-আধিপত্যের অবনতি হইলে, ঐ রাজ্য সেলজুকদিগের হস্তগত হয় ও তাহার প্রায় সমস্ত প্রদেশই দখল করে। মাছুগণ কর্তৃক খুং-সম্রাটেরা উত্তর-চীন হইতে দূরীভূত হইলে, খুং-সম্রাটেরা তুর্ক ও মোগোলের সাহায্য প্রার্থনা করে। জেঙ্গিস্ খাঁ মধ্য-এসিয়া হইতে, তত্রত্য সমস্ত লোকপুঞ্জকে সেখানে প্রেরণ করেন;—তাহারাই একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত হয়। জেঙ্গিস্ খাঁ ও তাহার পুত্রের সৈন্যগণ চীন, মধ্য-এসিয়া, এসিয়া ও যুরোপের রুসিয়া, পারস্ত আশুটোলি জয় করিয়া, সিলেসিয়া ও মোরাভিয়া পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসে। জেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যুর পর, মোগোল-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে; পরে তৈমুর লঙ্গ্ ঐ বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য কতকটা পুনর্গঠিত করেন। তৈমুর লঙ্গের বংশধরেরা ঐ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারে নাই। বহুশতাব্দীব্যাপী অরাজকতার পর, মোগোলিয়া, খাশগারিয়া, তিব্বত ও প্রাচ্য তুর্কিস্থান, মাছুদিগের চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

°°°

মধ্য-এসিয়ায় জনসংঘের অভিযান মানবসাধারণ-সভ্যতার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারাই এসিয়া ও যুরোপের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে স্থলপথ দিয়া যোগাযোগ স্থাপন করে। একবার লভ্যের আশ্রয় পাইয়া তাহারা বাণিজ্যের আহুকূল্য করিতে লাগিল, যাহারা “বেশমের পথ” অনুসরণ করিত—সেই স্বার্থবাহদিগকে তাহারা রক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে, প্রাচীন যুরোপ ও আধুনিক যুরোপ, চীনের দ্রব্যজাত পাইতে

লাগিল, এবং চীনদেশ ভারতের পারস্যের ও যুরোপের জবজ্বলিত পাইতে লাগিল। কৃষিজাত ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসামগ্রীও উহার লুপ্ত করিতে লাগিল:—চীন ও জাপানে,—পাৰ্বত্যদেশীয় ধাতু-ঢালাই কাজ, মিনার কাজ, কুম্ভকারের কাজ—এইসকল কাজের অমুকরণ আরম্ভ হইল।

তুর্ক ও মোগলদিগের প্রসাদে, এশিয়া ও যুরোপের জাতিদিগের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানেরও বিনিময় হইতে লাগিল।

বেসকল জাতি সম্মিলিত হইয়া একীভূত হইয়াছিল, তুর্ক ও মোগলেবা তাহাদের শিল্প, তাহাদের প্রতিষ্ঠান-সকল গ্রহণ করিল। স্বকীয় প্রাচীন বর্ণমালা পরিভ্যাগ করিয়া, উহার ছই প্রকার লিপি গ্রহণ করিল—একটি সংস্কৃত, আর একটি সিরিয়াক; আরও কিছুকাল পরে, আরব-লিপিও গ্রহণ করিল; উহার বিভিন্ন জাতির গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিল। উহাদের প্রাকৃতিক শক্তিমূলক পৌত্তলিকতার সহিত চীনের, বৌদ্ধ, ও খৃষ্টীয় মত বিশ্বাস জড়িত হইয়া পড়িল। খাস্‌গাবিরায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ-ধর্মসামবেশ পাওয়া গিয়াছে। এই পথ দিয়াই চীনদেশ, —বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জোরোয়াষ্টার-ধর্মের সহিত পরিচিত হয়। ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নেইব-সম্রাটের খৃষ্টানেরা তুর্কদিগের অনেককেই খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত করে। কারাখাভাইদিগের মধ্যেও একজন খৃষ্টান রাজা ছিল—যাহাকে যুরোপীয়েরা জোহান গুরোহিত নামে অভিহিত করিত।

বিশেষতঃ ছইটি দেশ, উরালীয়দিগের উপর প্রভাব বিস্তার করে;—চীন ও পাবস্ত। চীন ও পাবস্তের কেন্দ্রগত রাজ্যশাসনপ্রণালী উহাদিগকে মুগ্ধ করণে ষষ্ঠ-শতাব্দীতে, তুর্ক জাতীয় সমস্ত লোক একটি সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে একত্র সম্মিলিত হয়। এই সাম্রাজ্য কাস্পীয়-সাগর পর্যন্ত প্রসাৰিত ছিল। এই সাম্রাজ্যের গঠন-প্রণালী, তুর্কদিগের সামন্ততন্ত্রের প্রথা ও চীনদেশীয় শাসন-তন্ত্র—এই দুয়ের মাঝামাঝি। সম্রাটের শাসনাধীনে, ঐ সাম্রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি সামন্ত স্বাধীন সৈনিক-রাজপুরুষ ও কতকগুলি স্বাধীন মনুষ্য ছিল। একাদশ

শতাব্দীতে, খাস্‌গাবিরায় উইগুরেরা—যাহারা খুব ধনশালী ও উরালীয়দিগের অপেক্ষা সভ্যতর, তাহারা তুর্ক-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করে। একজন উইগুর গ্রন্থকার “রাজ্য-শাসনের কলাকৌশল,” এই নামে একটি কাব্য বচনা করে। এই রূপক জাতীয় বচনায়,—মুর্তিমতী রাজশক্তি আসিয়া প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক ব্যবসায়ের কর্তব্য সম্বন্ধে রাজার নিকট ব্যাখ্যা কবিতোছে। একজন প্রকৃত তুর্কের ধরণে, কবি বলিতেছেন;—“যুদ্ধে মৃত্যু, সম্মানেব মৃত্যু”; কিন্তু এদিকে আবার চীনের ভাব প্রবেশ কবায়, দেওয়ানী বিভাগের রাজপুরুষগণ পদমর্যাদায় ফৌজদারী বিভাগের রাজপুরুষদিগের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ী মৈনিকদিগের পদ, কাবিগর ও কৃষকদিগের পদ অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কবি রাজাকে বলিতেছেন:—“কৃষক ও কারিগরদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার কবিবে কিন্তু সাবধান, তাহাদের সহিত বেঈ ঘনিষ্ঠতা করিবে না। তাহাদের কিসেব উপব অনুসরণ?—না, উদরের উপর। তাহদের প্রিয় আসক্তি কি?—না, ঈদরিকতা। উদর পূর্ণ হইলেই উহার চুপ্ কবিতা থাকে; ক্ষুধিত হইলেই, বিদ্রোহী হয়। উহাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় দিবে।” (৪) জেজিস্‌ খাঁর সামরিক বন্দোবস্তের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহার রাজ্যশাসন-প্রণালী, তাঁহার জগৎচর নিয়োগ-প্রথা, চীনকে স্মরণ কবাইয়া দেয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, মোগলেরা একটা চীনের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে; সেই রাজবংশ দেড়শত বৎসর রাজত্ব করে:—কুলাই খাঁ একটি বৃহৎ খাল খনন করেন, এবং কাগজ-মুদ্রা বাহির করেন; মোগলদিগের মধ্যে চীনের প্রভাব প্রবল ছিল।

(৪) “রাজ্যশাসনের কলা-কৌশল” এই অনূদিত গ্রন্থটি আমি M. Cahun-এর গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ঐ গ্রন্থের নাম—“এশিয়ার ইতিহাসের অবতরণিকা” (পৃ ১৮৭)। “কুদাৎকু” নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার যদিও মুসলমান,—উহাতে মুসলমানধর্মের প্রভাব বড় একটা লক্ষিত হয় না। বরং এখান মন্ত্রী আবু আলি হুসেন রচিত “নিয়াসেং নামা” অর্থাৎ রাজ্যশাসনের গ্রন্থে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য তুর্কেরা, আরব ও পারস্তবাসীদিগের মতামতে ও রীতিনীতিতে দীক্ষিত হইয়াছিল। সেলজুকদিগের প্রথম সুলতানম্বর—আল-আস্‌দীন ও মালিক-শা—ইহাদেরই এখান মন্ত্রী-উল্লিখিত আবু-আলি-হুসেন। (১-৬০-২২)।

উবালীয়গণ মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে, যে সভ্যতা রূপ হইলেও একটু জটিল ধরণের—সেই উবালীয় সভ্যতার মধ্যে মুসলমানধর্ম, একটি নূতন উপাদান প্রবেশিত কবে। মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইতে উহাদিগের আটশত বৎসর লাগিয়াছিল। প্রথম কালিফদিগের রাজত্বকাল হইতে আবু বকর কবির, এই ধর্মাস্তরগ্রহণ-কার্য্য তৈমুর লঙ্গ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয়। কিন্তু তথাপি মুসলমানধর্ম মোগোলদিগের মধ্যে বহুকাল ভিত্তিতে পারে নাই; ষোড়শ শতাব্দীতে উহারা তিব্বতীয় লামাগণ কর্তৃক পুনর্গঠিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। আমেরিকার আবিষ্কার, উত্তরাংশ অন্তরীপের আবিষ্কার, বড় বড় কেন্দ্রীভূত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, —এইসমস্ত কাবণে মধ্য-এসিয়ার উরালীয়দিগের ঐতিহাসিক লীলার অবসান হয়। উরালীয় বংশের অন্ত্যস্ত জাতি, যুরোপে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে:—যথা, অটোমান তুর্ক, হঙ্গারীয়, বুলগারীয় ইত্যাদি।

০০

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ দেশের লোক ভারত আক্রমণ কবে, এবং তাহাদিগের ভারতবিজয়ের ফলে কিরূপ সভ্যতা ভাবতে আনীত হয়।

এইসকল বিজয়-অভিযান, দুই কাল-বিভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে, আক্রমণকারিগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে মিশিয়া যায়।

প্রাচীন যুগের প্রায় শেষ ভাগে, যু-চি বা হিন্দ-সীথীয় বা শক জাতির আবির্ভাব (৫) একশত বৎসর পূর্বে,

(৫) হিন্দ-সীথীয় বা শক জাতির উৎপত্তি, অন্ত্যস্ত সীথীয় জাতির উৎপত্তির স্তায় কুহেলিকাঙ্কর। উহাদিগকে মোগোল জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা হয় কিন্তু উহাদিগের ভাষার যে শব্দগুলি আমরা জানি (প্রায় ৬০ শব্দ) উহা উরালো-আল্টায়িক ভাষার শব্দ নহে; এবং দক্ষিণ কসিয়ার 'সমাধি-মন্দিরে' যেসকল মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেইসকল মূর্তির দৈহিক গঠনাদর্শের সহিত, মোগোলীয় দৈহিক গঠনাদর্শের অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। লাহোরের যাদুঘরে যে মূর্তিটি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উহা শকজাতীয় এক রাজার মূর্তি;—দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, দীর্ঘকুল, ঘনবিশ্রুত শুক, নিষ্ঠর-ভীষণ মুখের ভাব, আরত নেত্র, ধুতি সমুখদিকে প্রসারিত, ললাটি ও নাসিকার "মুমুর" প্রাডিয়েটারের" সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তথাপি ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক, প্রাচীনরা রমানিয়া ও দক্ষিণ-রুসের সমস্ত লোককে সীথীয় নামে অভিহিত করিত, এবং উহাদের উৎপত্তিস্থলও অজ্ঞাত বিভিন্ন। তা হাড়া, বাহারিা ষ্ট্রাবোনের বহু শতাব্দী পূর্বে বাসগারিয়ার প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল সেই যু-চিগণ যদি মলভাভিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত

উহারা উইগুরদিগের কর্তৃক খাসগারিয়া হইতে বিদূরিত হইয়া ট্রান্সকসিয়ানায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পার্থিয়দিগের বিজয়-অভিযান,—যু-চিদিগকে পঞ্জাবে, হিন্দুস্থানে, গুজরাটে ঠেলিয়া লইয়া যায়। সীথীয় বা শকেরা পারস্ত ও চীনের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করে; বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া, উহারা ভারতকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। বহুসংখ্যক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মতবাদটি জোরোস্ত্রাবাদের ধর্ম হইতে; এবং বুদ্ধ ও মারের যুদ্ধ ব্যাপারটা ঐ ধর্মের অন্তর্গত অমঙ্গলের দেবতা হইতে, গৃহীত হয়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধদিগের "স্ববির" পদবীর উৎপত্তিস্থল চীনিয়।

তুর্ক ও উইগুর সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার অভিযানের নূতন পর্যায় আরম্ভ হয়; ওসাদিগের,—বিশেষতঃ—আরব-দিগের বিজয়-অভিযান। খেত হুনার তুর্কজাতীয়—যাহাদিগকে বৈজ্ঞানীগণ (Byzantine) এফটালিট-নামে অভিহিত করিত। উহারা পঞ্জাবে, ও হিন্দুস্থানের পূর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। খেতহুন, শক ও আফগান—ইহারা হিন্দুদিগের ধর্ম ও রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া, রাজপুত নাম গ্রহণ করে।

পঞ্চম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে, রাজপুত রাজারা, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরভাগে কতকগুলি রাজ্য জয় করে। রাজপুতদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল সামন্ত-তন্ত্র বা জাইগিরদারি-পদ্ধতি।

একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারত-

আবহু ছিল এইরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, মোগোল জাতিব সহিত সাক্ষ্য সংঘটিত হইয়া উহারা একটু পরিবর্তিত হইয়াছে।

সাধারণের বিশ্বাস, পঞ্জাবের জার্নের প্রাচীন সীথীয়দিগের বংশধর। এবং Ibbetsএর মতে, জাতি ও রাজপুতের একই উৎপত্তি-স্থল। সে বাহাই হউক, রাজপুত-নাম অনতিবিলম্বে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত জাইগিরদারের প্রতিশব্দ হইয়া ধাঁড়ায়। নয় শত বৎসর হইতে, সকল জাতিরাই রাজপুত ছিল:—যথা, হিন্দু, সীথীয়, তুর্ক, তর্কমান আফগান, ত্রাবিড়ার। ডাক্তার Trumppএর মতে, রাজপুত আর্ধ্যজাতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অনেক জাতিতত্ত্ববিৎ, সীথীয়দিগকেও আর্ধ্য বলিয়া থাকেন। পঞ্চাশত্রে, রাজপুতদিগের মধ্যে, শুকচকু নাসা বিরল নহে; উহাদের গঠন-ছাঁচ, আফগান গঠন-ছাঁচকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আফগানেরা আর্ধ্য হইলেও, উহাদের উৎপত্তি সেমিটিক জাতি হইতে, এইরূপ সাধারণ মত। Macudiএর মতে রাজপুতদের প্রকৃত দেশ—কান্দাহার। (*Barlierde Meynard, I. p. 372) কিন্তু রাজপুত-দিগের রাজ্যগুলি ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

আক্রমণকারিগণ মুসলমানধর্মের দীক্ষিত হইয়া, ভারতবাসী-দিগের ধর্ম ও সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। কি তুর্কি আফগান—যেসকল জনসঙ্খ্য ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা মুসলমানধর্মের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও পারস্য-সভ্যতা গ্রহণ করে। এই যুগে, বাবর মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এবং কুবলাই খাঁর চীনদেশীয় কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে, কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠানও প্রবর্তিত করেন।

যদি এ কথা সত্য হয় যে,—সকল দেশেই যুদ্ধবিগ্রহ ও বিজয়াভিযান সভ্যতার উন্নতিকল্পে অনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের সম্বন্ধে এ কথা আরও বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভারত কেবল পরাজয়ের দ্বারাই বহির্জগতের সংস্রবে আইসে* এবং বৈদেশিকদিগের রীতিনীতি ও শিল্পকলার সহিত পরিচিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অসময়ে

ক্ষুদ্র শিশু হর্ষে যবে ছুটি'
আঁচল ধরি' বাড়া'ল হাত ছুটি,
মলিন ছেলে, — অঙ্গে তাহার ধূলি,
আমি তারে লইনি' বৃকে তুলি'।

চেয়ে তাহার সজল আঁখির পানে,
মুখখানি তার বাজল বড়ই প্রাণে,—
মলিন সে যে, — অঙ্গে তাহার ধূলি—
তবু তারে লইনি' বৃকে তুলি'।

বৃথাই আজি সারা সকাল মাঝে,
খুঁজে তা'রে বেড়াই ধুলার মাঝে;
ক্ষুদ্র শিশু আজকে ভুবন-যোড়া,
বাহুর পাশে দেয়না সে তো ধরা!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

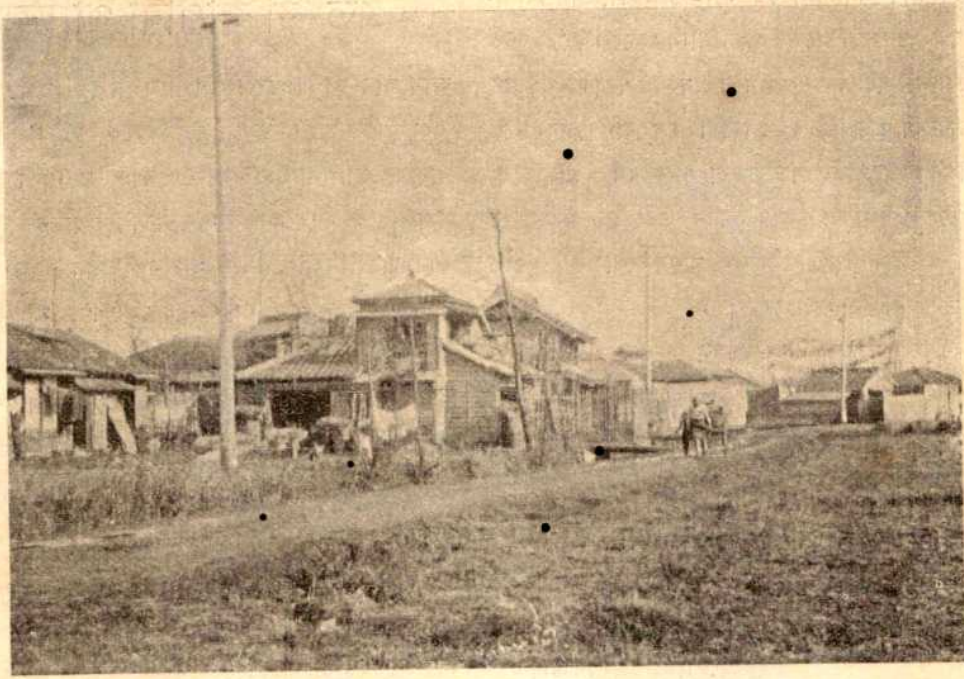
এতা বা জাপানী পারিআ*

আবহমান কাল হইতে জাপানে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত এক শ্রেণীর লোক ছিল; ইহাদিগকে 'এতা' বলা হইত। সাধারণ জাপানী ইহাদিগকে একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সমাজ ইহাদিগকে নিষ্পন্নভাবে দূরীভূত করিয়াছিল। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সাধারণ ব্যবসায় অবলম্বন করা ইহাদের পক্ষে আইনত নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণ জাপানী ও 'এতা'র মধ্যে ব্যবধান এত বিস্তৃত ছিল যে তাহাদের নিকট হইতে কেহ কর্ত্ত্ব লইতে পারিত না, বা তাহাদিগকে চুরি ধরাইবার আশঙ্কনটুকুও দিত না। সমাজ হইতে বিতাড়িত তাহাদের দুঃসহ জীবন যুরোপের মধ্যযুগের ইহুদীদের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। বর্তমান মিকাদোর করুণাময় শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন পর্য্যন্ত এতাদের অযোগ্যতা দূরীকৃত ও তাহাদিগকে উন্নত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হয় নাই। ১৮৭১ সালে এতাদের মুক্তিদান করা হইল। তাহাদের

- প্রতি সামাজিক নিষেধাজ্ঞাগুলি রহিত করা হইল, ও সাধারণ জাপানীর সহিত তাহাদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হইল। 'এতা' এই নামটি ক্রমশ অব্যবহার্য হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু জাপানীর চিন্তে 'এতা'বংশজাত লোকমাত্রেরই প্রতি একটা স্বাভাবিক বিভ্রম এখনও বিদ্যমান; কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই নীচবংশজাত লোকেরা তাহাদিগের নূতন অধিকার লাভ করিবার যে অনুপযুক্ত নয় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে, এবং সাধারণ জাপানী কর্তৃক আশাতীত হৃদয়তার সহিত গৃহীত হইয়াছে।

এই সতন্ত্র শ্রেণীর উৎপত্তি সমাজ-বিজ্ঞানেতিহাসের একটা বিশেষ চিন্তাকর্ষক প্রশ্ন। খুব সম্ভবত সর্বপ্রথম 'এতা'গণ যুদ্ধের বন্দী ছিল, কারণ সে সময়ে বন্দীরূপে গৃহীত ব্যক্তিগণ দাসরূপে ব্যবহৃত হইত। সেই হেতু মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক কালের আক্রমণকারী ম্যামাতোগণ যুদ্ধে যেসব জাতিকে জয় করিয়াছিল হয়ত তাহারাই আদিম 'এতা'। হোকুইদোর আইনুগণ এই আদিম অধিবাসীদিগের অবশেষ; প্রথম বীপটিতে ইহাদের পূর্ব-পুরুষদের কিছু প্রতিপত্তি ছিল। আধুনিক জাপানীর

* রাজ্য প্রবেশের অস্পষ্ট জাতিদিগকে পারিআ বলে।



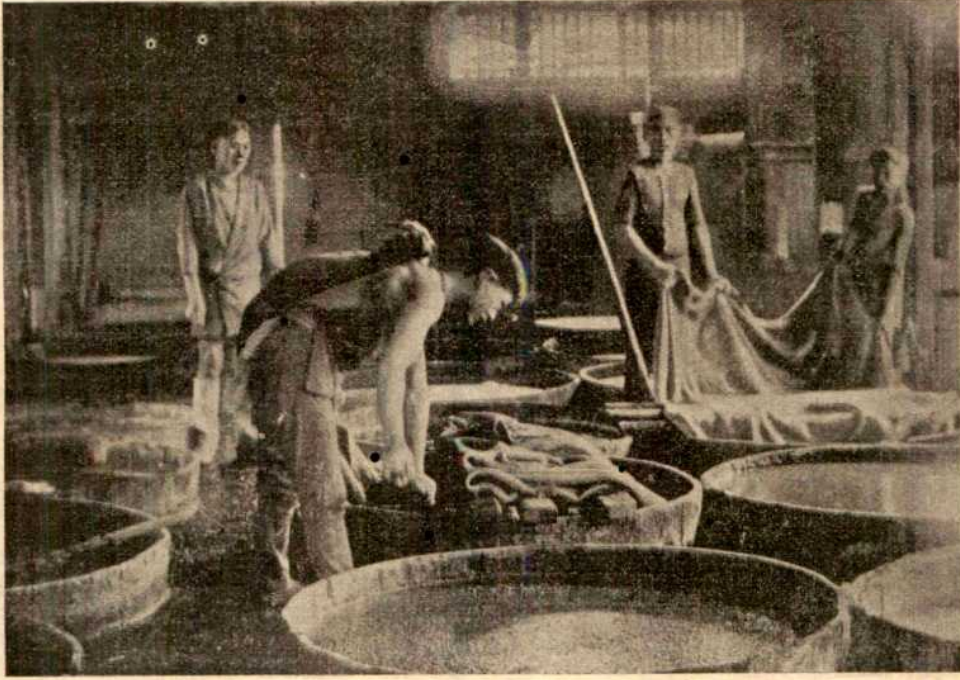
একটি এতা গ্রাম।

পিতৃপুরুষদের সহিত অবিরাম সংগ্রামের ফলে আদিম অধিবাসিগণ উত্তরদিকে বিতাড়িত হইয়াছিল; কেবল যাহারা বিজ্ঞতাদের হস্তগত হইল তাহারা 'এতা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। স্বনামধন্য সম্রাজ্ঞী জিন্সের রাজত্বকালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানের ফলে সেখান হইতে বহু বন্দী জাপানে আনীত হইয়াছিল, পরে হিদেওয়ের অভিযানের ফলে বন্দীসংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর এই হতভাগ্য বন্দিগণ ও তাহাদের সন্তানসন্ততির প্রতি নির্কাসনের ব্যবস্থা আরো কঠোর রূপ ধারণ করিয়াছিল, কারণ বৌদ্ধধর্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ এবং তখনকার জাপানী সভ্যতার ব্যবস্থা অনুসারে 'এতা'রাই কশাইয়ের কার্য করিত। ইতিপূর্বে জাপানীরা মাংসাহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল কিন্তু নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এ রীতি উলটাইয়া গেল, ও জীবহিংসাপরায়ণ 'এতা' পূর্কোপেক্ষা ঘৃণিত হইতে লাগিল। জাপানীদের মধ্যে মৃতদেহ ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যের প্রতি যে একটা ঘৃণা ছিল—মৃতদেহের স্পর্শ অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত

হইত ও যে বাটীতে মৃত্যু হইত সে বাটীখানি সাধারণত নষ্ট করিয়া ফেলা হইত—তাহা এই নবধর্মের জীবহিংসা-নিষেধমূলক শিক্ষার প্রভাব সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছিল।

জাপানী সভ্যতার অগ্রাগ্র কতকগুলি রীতি 'এতা'-দিগকে সমাজ-গণ্ডির বাহিরে বহু দূরে বিতাড়িত করিয়াছিল। অপরাধীদিগকে 'এতা'দের মধ্যে নির্কাসিত করা একটি বিধি ছিল। সমাজের অকর্মণ্য লোকগণও প্রায়ই ইহাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত; কারণ ছর-বহুয় পড়িয়া যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইত তাহারা সমাজ-দুগিত এইসব লোকেদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বোধ করিত। 'এতা'-কুমারীকে যে হৃদয় দান করিয়াছে এমন ব্যক্তিকে প্রেমের মধুর বন্ধনও নির্কাসনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিত না; সমাজচ্যুতা ললনার পাণিগ্রহণ করিয়া সে আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। 'এতা'র পক্ষে সভ্যতার উচ্চধাপে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উঠান মাড়ানও নিষিদ্ধ ছিল।

'এতা'রা দেশের কেবল এক অংশে আবদ্ধ ছিল এমন নহে; শহরের নিকটে দেশের সর্বত্রই তাহাদিগকে



এতাগণ চর্ম পরিষ্কার করিতেছে।

দেখা যাইত। আমাদের মনে হইতে পারে যে-স্থানে তাহারা বিশেষরূপে দ্বিগিত হওয়াই সম্ভব এমন স্থান তাহাদের পরিত্যাগ করাই উচিত; কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও সুবিধা ছিল না, কারণ তাহাদের যে ব্যবসায় তাহাতে নগরসামিধ্যে বাস করা একান্ত প্রয়োজন। পুরাতন তোকিওতে আসাকুসা ও মিনাগাওয়া নামক স্থানে দুইটি 'এতা' গ্রাম ছিল। অধুনা এ দুটি স্থান সাম্রাজ্যের বিরাট রাজধানীর অন্তর্গত হইলেও, সমাজে যা কিছু হীন তাহার সহিত নাম দুটি কতক পরিমাণে জড়িত। কিওতোয় 'এতা'গণ বর্তমান শহরের উত্তর প্রান্তে, কিওতো রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে তানাকা-মুরা নামক স্থানে বাস করিত। ওসাকায় সমাজচ্যুতেরা নিবিহানামাচি নামক স্থানে বাস করিত।

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত 'এতা'গণকে প্রাণিহীন, চর্মপরিষ্কৃতকরণ ও কবরখনন করিবার একচেটিয়া অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চামড়ার চটিজুতা প্রস্তুত করিত। সাধারণ জাপানী মৃত পণ্ডর চামড়া লইয়া কাজ করা দ্বারা মনে করিত। পরে তোকুগাওয়া

য়ুগে 'এতা'রা ডিটেক্টিভ ও জেলরক্ষীর কাজ করিত; প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মৃতদেহ বহন করিত। লোকে বলে আজকালও 'এতা'দের বংশধরেরাই এইরূপ কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাজি দেখাইয়া বেড়াইত; তাহাদের ভাগ্যহীনা স্ত্রীলোকেরা দ্বারে দ্বারে সানিসেন্ বাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিত। 'এতা' গ্রামের বাটগুলি নিতান্ত আদিম ধরণের ছিল; খড়ের কুঁড়ে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে, প্রত্যেক দিকে আট হাতের অধিক হইবে না; মাটির মেঝেগুলি মোটা খড় বা নল-খাগড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত।

'এতা'রা সভ্য জাপানীর ভাষায় কথা কহিত, তাহাদের উচ্চারণও অগ্ৰা জাপানীর মতই ছিল। কিন্তু জাপানীরা এ কথা স্বীকার করিত না, তাহারা বলিত 'এতা'দের কথা বিদেশী কর্তৃক কথিত জাপানীর মত শুনায়।

সাধারণত 'এতা'রা বৌদ্ধধর্মের 'যোদো' ও 'মিন্' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ধর্ম তাহাদের গভীর বিশ্বাস ছিল; সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া সামান্য জন্ত তাহারা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক কুটার-



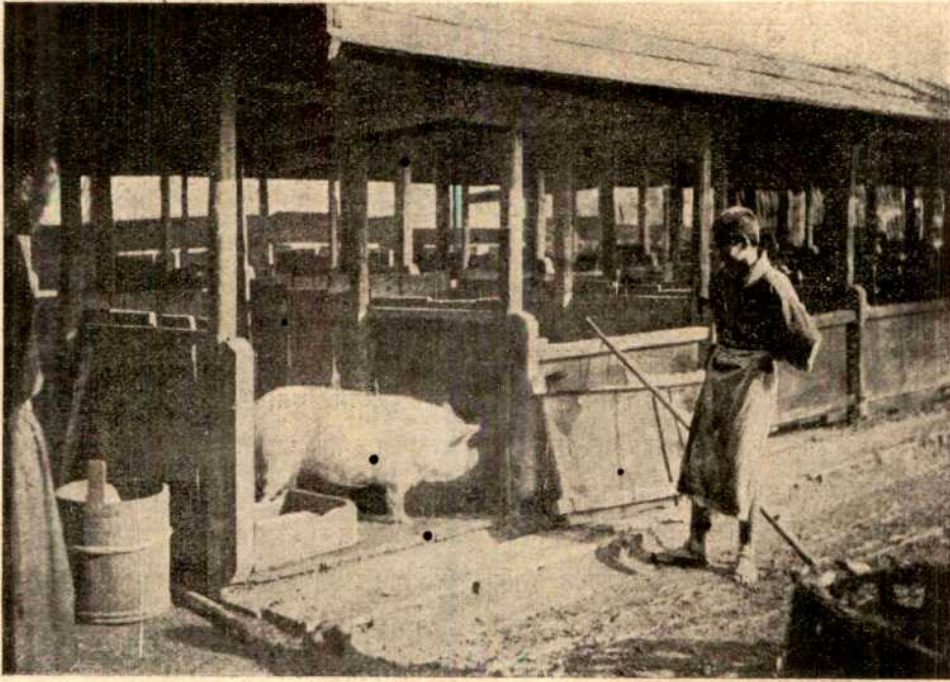
এতাগণ চর্ম্ম পরিকার করিতেছে

মধ্যেই সুসজ্জিত বেদীর উপর বুদ্ধের প্রতিমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইত। উপরিউক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার কারণ এ সম্প্রদায় দুটি অগ্রাভ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, ও তাহাদের সহজবুদ্ধির উপযোগী ছিল। উপরন্তু বৌদ্ধেরা, এ জগতে তাহারা যে সাধুনা ও সমাদর পায় নাই তাহা পরজগতে পাইবে, এরূপ আশ্বাস দিত।

আশ্চর্য্য এই যে এত বাধা সত্ত্বেও এই ঘৃণিত জাতির মধ্যে কতবার এমন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে বাহাদের গুণাবলী সভ্য জাপানীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কেহ কেহ স্বজাতীয় হতভাগ্যদের মধ্যেও সচ্ছল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তোকুগাওয়া যুগে প্রত্যেক 'এতা' গ্রামের একজন করিয়া প্রধান নির্বাচিত হইত; সে দেশশাসকদিগের নিকট তাহার এলাকায় ঘটিত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাত দায়ী থাকিত। আসাকুসার 'এতা' গ্রামের দানজাএমোন নামক এক ব্যক্তি প্রধান ঐতিহাসিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আর একজন বিখ্যাত 'এতা' সর্দারের নাম জেন্‌হিচি। কথিত আছে তাহার ধর্ম্মনীতে সামুরাই-রক্ত

প্রবাহিত ছিল; তাহার পিতা নাকি দাইমো সাতাকে ঘোষিনোবুর সভাসদ ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ইয়েয়াসু সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার হস্তে বন্দী হন, ও পরে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়। পুত্র জেন্‌হিচি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইল; কিন্তু উদারহৃদয় ইয়েয়াসু তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এই অসাধারণ উদারতায় সে এত কৃতজ্ঞ ও লজ্জিত হইল যে সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া এতাদিগের মধ্যে বাস করিতে লাগিল। ইয়েয়াসু তাহাকে সে গ্রামের মোড়ল করিয়া দিলেন। সেও অনতিবিলম্বে দানজাএমোনের মত প্রসিদ্ধি লাভ করিল, ও এতাদের সম্মানের পাত্র হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছিল। কিন্তু তোকুগাওয়া যুগেই এতার বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল। এমন কি কেহ এতাকে গৃহে স্থান দান করিলে বা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাশ দিন কারাবাস করিতে হইত।

তাহাদের মুক্তির পর স্বভাবতই তাহাদের অবস্থায় এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত



এতা-পল্লীর পশুর খোঁয়াড়।

হইলে এই পতিত জাতির বংশধরগণ উচ্চশ্রেণীর জাপানী শিশুগণের সহিত পাঠের সময় ও ক্রীড়াপ্রাপ্তি মিশিবার সুযোগ পাইল। শিক্ষার প্রভাবে কত ‘এতা’-বংশধর আজ দেশের পার্লামেন্ট বা মহাসভার সভ্য। তাহাদিগকে সাধারণ জাপানী প্রজার সকল অধিকার যখন দেওয়া হইয়াছিল তখন তাহারা সংখ্যায় সর্বসমেত ৪০০,০০০ ছিল; কিন্তু এখন পরস্পর বিবাহের দ্বারা তাহারা এমন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে আজকাল কে ‘এতা’-বংশজাত, কে নয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জাপানী পরিবারেরা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্ত সচেষ্টিত। ইহারা এবং কৃষিপল্লীবাসীরা একদা-ঘণিত ‘এতা’ স্বেচ্ছায় কোনো কিছুই বিরুদ্ধে তাহাদের পূর্ব-সংস্কার এখনো সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কোবেতে কেহ কেহ বলিত যে কেবল ‘এতা’-বংশীয়েরাই বিদেশীর ভৃত্য হয়; এই কারণে কোবের বিদেশী পরিবারে উচ্চ শ্রেণীর জাপানী ভৃত্যেরা অনেকে কার্য গ্রহণ করিত না। সে যাহাই হোক, সকল দিক দিয়া দেখিলে, জাপানী সমাজে আজকাল ‘এতা’-বংশজাত ও অন্ত জাপানীর মধ্যে কোনো

ইতর-বিশেষ করা হয় না। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে জাপ-জাতি সমাজের অতি পুরাতন এই ঘৃণ্য জাতিকে কিরূপ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

“না ফুটিত আহা যদি !”

(১)

আছিল ফুটি কুড়ি যতদিন,
মন ছিল মোর ভালো ;—
সুখী ছিহু ভাবি’—ফুটিবে এখন
উজান করি’ আলো।

(২)

আজ সে ফুটেছে ঢল ঢল রূপে ;
আজ ভাবি নিরবধি—
কখন বরিবে—ভূমিতে লুটা’বে !—
না ফুটিত আহা যদি !

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

জীবনস্মৃতি

লোকেন পালিত ।

বিলাতে যখন আমি যুনিভারসিটি কলেজে ইংরাজি-সাহিত্য-ক্লাসে, তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। সে বয়সে আমার চেয়ে প্রায় বছর চারেকের ছোট। যে বয়সে জীবনস্মৃতি লিখিতেছি সে বয়সে চার বছরের তারতম্য চোখে পড়িবার মত নহে ; কিন্তু সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এত বেশি যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছু মাত্র ছোট বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।

যুনিভারসিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে ; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে কাজটা চুপি চুপি সারিলে কাহারো আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না—কিন্তু হাসির প্রভূত বাস্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্বদা পরিস্ফীত হইয়া ছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত। সকল দেশেই ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠায় অব্যাহত আতিশয্য দেখা যায়। আমাদের কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভৎসনাকটাক্ষ আমাদের সরব হান্তালাপের উপর নিষ্ফলে বর্ষিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আজ আমার মনে অনুতাপ উদয় হয়। কিন্তু তখনকার দিনে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাতপীড়া সম্বন্ধে আমার চিন্তে সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। কোনো দিন আমার মাথা ধরে নাই এবং বিধাতার প্রসাদে কোনো দিন বিছালয়ের পড়ার বিষয়ে আমাকে একটু কষ্ট দেয় নাই।

এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হান্তালাপ চলিত বলিলে অতুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্কচাঁদ বলিয়া মনে

করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল, কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।

আমাদের অত্যাশ্র আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কল্পা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গুরু করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধন্দ্বজ্ঞান আছে—পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম ইংরেজি বানানরীতির অসংখ্য নিত্যসূত্রই হান্তকর হইতে পারিত যদি তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদের গকে পরীক্ষা দিতে না হইত। কিন্তু আমার গুরু টিকিল না। দেখিলাম বাংলা বানানও বানান মানে না ; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়মব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যুনিভারসিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিশ্বাস বোধ হইত।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরিল তখন, সেই কলেজের লাইব্রেরিঘরে হাতোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত যে আলোচনা সুরু হইয়াছিল তাহাই ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মত অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণ যৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক হইয়া অবিশ্রাম গতিতে যখন গল্প পড়ার জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উত্তমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই। তখনকার কত পঞ্চভূতের ডায়ারি এবং কত কবিতা মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সঙ্গীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে সুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোয়ের হাওয়ার মধ্যে রাত্রে দীপশিখার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। সুরস্বতীর পদ্যবনে বন্ধুত্বের পদ্মটির পরেই দেবীর বিলাস বুঝি সকলের চেয়ে বেশি। এই বনে স্বর্ণরেণুর

পরিচয় বড় বেশি পাওয়া যায় নাই কিন্তু প্রণয়ের স্মৃতি মধু সম্বন্ধে নালিশ করিবার কাবণ আমার ঘটে নাই।

ভগ্নহৃদয় ।

বিলাতে থাকিতে আরএকটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা কিব্বার পথে জাহাজে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সন্ধান করি। “ভগ্নহৃদয়” নামে ইহা ছাপান হইয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভাল হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতার ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহাবাজ বীচন্দ্রমাণিক্যের মজা আমাব সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহাবাজের ভাল লাগিয়াছে, এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার এই আঠাৰো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমাব ত্রিশ বছর বয়সেব একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করি :—“ভগ্নহৃদয় যখন লিখিতে আবস্ত কবেছিলেম তখন আমাব বয়স আঠাৰো। বালাও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটুএকটু আভাস পাওয়া যায় এবং ধানিকটানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিষ্কৃত হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আঙ্গুরি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠাৰো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠাৰো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতাম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখঃখণ্ড এবং সুখঃখণ্ডের মত। অর্থাৎ তাব পরিমাণ ওজন করবাব কোনো সত্য পদার্থ ছিল না কেবল নিজের মনটাই ছিল ;—তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।”

আমার পনেরো বোলা হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ

তেইশ বছর পর্য্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জল-স্থলের বিভাগ ভাল করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কজের উপবে বৃহদায়তন অদ্ভুতাকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চার করিয়া ফিরিত। আমার অপরিণত মনের প্রাচীনা-লোকে আবেগগুলি সেইরূপ পরিমাণ-বহির্ভূত অত্মমুষ্টি ধারণ করিয়া এটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানেনা, বাহিরে আপনাব লক্ষ্যকেও জানেনা। তাহারা নিজেই কিছুই জানেনা বলিয়া পদে পদে আরএকটাফিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য, সত্যের অভাবকে অসত্যের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সেই অনুদগত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জবেব দাঁহ আনয়ন কবে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁতগুলি বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তবস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনেব আবেগগুলিও সেই দশা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরেব সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মত মনকে পীড়া দেয়।

তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে—কিন্তু তাই বলিরাই সেটা অবজ্ঞাব যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে যাহা কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেব না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষ পরিণাম পর্য্যন্ত হাইতে দেব না—তাহাকে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে চান না—এইজন্য সকলপ্রকার আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থ-সাধনের সাথের সাথী। মঙ্গলকর্মে যখন তাহারা একেবাবে মুক্তিলাভ কবে তখন তাহাদের বিচার

যুচিয়া যায়—তখন তাহার স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে—আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

নিজের মনেব এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাওয়া পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্সপিয়ার, মিল্টন ও বায়রন। ইহাদের লেখা ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদের কাছে খুব কবিতা নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়বেগের প্রবলতা। এই হৃদয়বেগের প্রবলতাটা ইংবেজি লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়বেগকে তাহার একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অয়িকান্ডে শেষ কবা এই সাহিত্যেব একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই উদ্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংবেজি সাহিত্যের সার বলি। গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাণ্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোব হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিওরার অক্ষম পরিতাপের বিকোন্ড, ওথেলোর জর্জানলেব প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উদ্ভেজনার সঞ্চাব করিত।

আমাদের সমাজ, আমাদের ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিত্য একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের বড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না,—সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপ চাপ; এই জন্তই ইংবেজি সাহিত্যে হৃদয়বেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদের কাছে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যিকলার সৌন্দর্য্য আমাদের কাছে স্পষ্ট দেখ, ইহা সে স্পষ্ট নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরস্থির

মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই স্বর্থ। তাহাতে যদি তলাব সমস্ত পাক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।

যুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন যুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া স্বরূপে বেনেসাঁশের যুগ আসিয়াছিল শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্যে সেই বিপ্লবের দিনেবই নৃত্যগীতা। এ সাহিত্যে ভালমন্দ স্কন্দ-অঙ্কুরের বিচারই মুখ্য ছিল না—মানুষ আপনার হৃদয়-প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত কবিতা দিয়া তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এইজন্তই এই সাহিত্যে, প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। যুরোপীয় সমাজের সেই হোলি খেলার মাতামাতির স্রব আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদের চুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলি আচাবেব ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধলীলার দীপক রাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

ইংবেজি সাহিত্যে আর একদিন যখন পোপের কালের চিহ্নাত্তালা বন্ধ হইয়া ফরাসিবিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপড়ালের পালা আরম্ভ হইল বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়বেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভাল মানুষ সমাজের ঘোমটাগরা হৃদয়টিকে, এই কনে বউকে উত্তলা করিয়া তুলিয়াছিল।

তাই, ইংবেজি সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার চেউটাই বাল্যকালে আমাদের কাছে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংঘর্ষের দিন নহে, তাহা উদ্ভেজনারই দিন।

অথচ যুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। যুরোপীয় চিন্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়ম-বন্ধনের বিকল্পবিদ্ভোহ সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিকলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই বড় উঠিয়াছিল বলিয়াই

ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্য স্বরটি মর্ম্মর ধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না—কিন্তু সেটুকুতে ত আমাদের মন ভূণ্ডি মানিতেছিল না, এই জন্যই আমরা ঝড়ের ঢাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তি বদিক বাইতেছিলাম। এখনো সেই বোঁকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহজে কাটিবে না। তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংঘম এখনো আসে নাই; এখনো সেখানে বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রাচুর্য্যই সর্ব্বত্রই। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে, সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য্য, সুতরাং সংঘম ও সরলতা, একথাটা এখনও ইংরেজি-সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল মাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। যুরোপের যেসকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্যাদা সংঘমের সাধনার পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এইজন্যই সাহিত্য-রচনার বীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভুল করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তখনকার কালের ইংরেজিসাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মুষ্টিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেই যেন তাহার সার্থকতা হইল এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্ম্মে তাঁহার কোনো আস্থা ছিল না, অথচ শ্রামবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এ স্থলে কোনো সত্য বস্তু তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে কোনো কল্পনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহাকেই তিনি সত্যের মত ব্যবহার করিতে চাহিতেন। সত্য উপলব্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই যাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল না।

তখনকার কালের যুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিক-তাব প্রভাবই প্রবল। তখন বেহাম, মিল ও কৌতের আশ্রিত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তর্ক করিতেছিলেন। যুরোপে এই মিলের যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্য্যায়। মানুষের চিন্তের আবর্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টারূপেই এই তান্ত্রিক ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছু দিনের জন্য উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া পাওয়া জিনিষ। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইব বলা বাবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র কেটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনাক্রমেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্য তখন আমরা দুই দল মানুষ দেখিয়াছি। একদল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অঙ্গে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্ব্বস্বিই গারে পড়িয়া তর্ক করিতেন। পাণ্ডী শিকাবে শিফারীর যেমন আশ্রয়, গাছের উপরে বা তলায় একটা সস্তীবা শাণী দেখিলেই তখনই তাহাকে নিকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য শিকারীর হাত যেমন নিশ্চিন্ত করিতে থাকে, তদ্রূপে যেখানে তাঁহারা দেখিতেন কোনো নিরীহ বিশ্বাস শোণীও কোনো বিপদের আশঙ্কা না করিয়া আরামে বসিয়া আছে তখনই তাহাকে পাড়িয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাদের উত্তেজনা জন্মিত। অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাস্টার হিন্সন, তাঁহার এই আশ্রয় ছিল। আমি তখন নিভাত্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও তিনি ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহার বিজ্ঞা সামান্যই ছিল—তিনি যে সত্যাহুসন্ধানের উৎসাহে সকল মতামত আলোচনা করিয়া একটু পক্ষাঙ্কণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; তিনি আরএকজন সক্রিয় মুখ হইতে তর্কগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি প্রাচীন-তাই তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার নিভাত্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড় হুঃখ পাইতে হইত। একএকদিন এত রাগ হইত যে কঁপিত হইয়া করিত।

আর একদল ছিলেন তাঁহার ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এইজন্য ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত কলাকৌশল, যতপ্রকার শব্দগুরুপন্থার আশ্রয়

আছে, তাহাকে ভোগীর মত আশ্রয় করিয়া তাঁহার আবিষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস। এই উভয়দলেই সংস্কারবাদ ও নাস্তিকতা সত্য-সন্ধানের তপস্জাজাত ছিল না, তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

যদিও এই ধর্মবিদ্বেষ আমাকে পীড়া দিত তথাপি ইহা আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রাৰম্ভে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে এই বিদ্বেষিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়বেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মন্ত একটা আগুন জ্বলাইতেছিলাম। সে কেবলি অগ্নিপূজা; সে কেবলি আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহাব আর কোন লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই, ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানোই চলে।

যেমন ধর্মসম্বন্ধে তেমনি নিজের হৃদয়বেগ সম্বন্ধেও কোনো সত্য থাকিবাব কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজনা থাকিলেই যথেষ্ট। তখনকার কবির একটি শ্লোক মনে পড়ে :—

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়

বেচিনি ত তাহা কাহারো কাছে,

ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা'হোক

আমার হৃদয় আমারি আছে।

সত্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অস্ত্র কোনো প্রকার ছুঁটনা নিতান্তই বাহ্যিক, কিন্তু যেন তাহা ভাঙিয়াছে এমন একটা ভাবাবেশ মনের নেশার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যিক;—ছুঁথবেরাগের সত্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহার ঝাঁকটুকু উপভোগের সামগ্রী,—এইজন্ত কাব্যে সেই জিনিষটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল—ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু হাঁকিয়া লওয়া। আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘুচে নাই। সেইজন্তই আজও আমরা ধর্মকে যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি

সেখানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন কবি। সেইজন্তই বহুল পরিমাণে আমাদের দেশ-হিতৈষিতা দেশের স্বার্থ সেবা নহে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করার আয়োজন করা।

সম্ব্যাসঙ্গীত।

নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থাব কথা পূর্বে লিখিয়াছি, মোহিত বা কুর্ভুক, সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থাব কবিতাগুলি “হৃদয়-অবগ্য” নামের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে “পুনর্মিলন” নামক কবিতায় আছে—

“হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে

দিশে দিশে নাহিক কিনারা,

তারি মাঝে হয় পথহারা।

সে বন আধাবে ঢাকা, গাছেব জটিল শাখা

সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে

আঁধার পাগিছে বুকে নিয়ে।”

“হৃদয়-অরণ্য” নাম এই কবিতা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপে, বাহিবেব সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার করুনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে—কেবল “সম্ব্যাসঙ্গীত”—এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

এক সময়ে জ্যোতিষাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যেসব কবিতা ভাল বাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবাব ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যেসব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে বাইতেই আপনা আপনি

সেইসকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিন্তা মুক্তি লাভ করিল।

একটা সেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহাব আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহাব মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিশেষর পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্তের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবাব একটা চিন্তা ছিল। কিন্তু সেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। সেট জিনিষটা বলে, ভয় কি তোমাব, যাহা খুসি তাহাই লেখনা, হাত বুলাইলেই ছ মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমন করিয়া দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অঙ্ককরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমাবই।

ইহাকে কেহ যেন গর্কোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না কবেন। পূর্বের অনেক রচনায় ববঞ্চ গর্ক ছিল—কারণ, গর্কই সেসব লেখার শেব বেতন। নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অহুভব করিবার যে পবিভূক্তি তাহাকে অহঙ্কার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপেব প্রথম যে আনন্দ, সে-ছেলে সুন্দব বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ স্বরণ করিয়া তাঁহাবা গর্ক অহুভব করিতে পাবেন কিন্তু সে আবএকটা জিনিষ। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবদ্ধকে আমি একেবারেই খাতিব করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটা খালের মত সীধা চলেনা—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য কবিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহাব পবে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে—তখনই সে যথার্থ আপনাব অধীন হয়।

আমার সেই উচ্ছ্বাল কবিতা শোনাইবাব একজন মাত্র লোক তখন ছিলেন, অক্ষয় বাবু। তিনি হঠাৎ

আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভাবি খুসি হইয়া নিয়ম প্রকাশ করিলেন। তাঁহাব কাছ হইতে অনুমোদন পইয়া আমার পথ আবার প্রশস্ত হইয়া গেল।

বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দে প্রবর্তন কবিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক—যেন

একদিন দেব তরুণ তপন

হেরিলেন সুবনদীর জলে

অপরূপ এক কুমাবীরতন

খেলা করে নীল নলিনী-দলে।

তিনমাত্রা জিনিষটা দুইমাত্রার মত চোকা নহে, ত্রাহা গোলাব মত গোলা, এই জন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝঙ্কারে নুপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার কবিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকলে ধাবমান হইয়া মত এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

সম্ভাষ্যসঙ্গীতে আমি ইচ্ছা কবিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন কবিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোন ভয়ভর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে ত্রাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিবিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিন্যাকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতলিকে যেমন খুসি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দলীকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেষ্ট ছুঁড়িয়াছি।

আমার কাব্যলেখার ইতিহাসেব মধ্যে এই সমস্তই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্বরণীয়। কাব্যহিমাবে সম্ভাষ্যসঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচ। উহার ছন্দ ভাষা ভাব মূর্ত্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে—এই

যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভবসায় ঘা-খুসি-তাই লিখি গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুসিটার মূল্য আছে।

গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

ব্যাবিষ্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্ত পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরো একজন আত্মীয় ছিলেন। ব্যাবিষ্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর কবিতা দিলেন যে বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না—বিশেষ কারণে রাজ্যাজ্জের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিবিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যত বড় গুরুতর, কারণটা তদন্তরূপে কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে হাস্যটা বোল আনা আমারই প্রাপ্য নহে; এই জন্তই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না। যাহা হউক লক্ষ্মীর প্রসাদ-লাভের জন্ত দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার-লাইবেরির ভুঁ-ভাঁরবুদ্ধি না কবাতো আইন-দেবতা আমাকে সদয়চক্ষে দেখিবেন।

পিতা তখন মন্দির পাহাড়ে ছিলেন। বড় ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ কবিলেন না, বরং মনে হইল তিনি খুসি হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনে কবিতাছিলেন ফিবিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল জৈশ্বর-অ-শীর্ষাদেই ঘটয়াছে।

দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলাম বুদ্ধ রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল সঙ্গীত। বঙ্গ-সঙ্গীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সঙ্গীত সম্বন্ধে

ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পবিশ্রুত করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থন করিয়া প্রায় আগাগোড়াই নানা প্রকারে সুর দিয়া নানা ভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় “বন্দে বাঙ্গালী-কোকিল” বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহাব প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককর্ত্তে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পষ্টভাবে সঙ্গ্রে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয় সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিম্নেই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্য্যেই বড়—বাক্যের দাসত্ব সে কেন কবিতাে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভাল। চিন্তাহীন গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার কবিতাে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পাবে নাই। সেইজন্য এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাসুর গান পর্যন্ত সকলেবই স্বাধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বাতন্ত্র্য অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামী উপব কর্ত্তব্য কবিতাে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কবিবার ন্যায় লইয়া বাক্যকে

ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা কবিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। শুন শুন করিতে করিতে যখন একটা লাইন লিখিলাম—“তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে”—তখন দেখিলাম স্বপ্ন যে জারগার কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পাবে হাঁটয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার ক্ষমতাধারী করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্রামলিম্বর মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সূর্য্যভার মধ্যে অবশুষ্টিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জলস্থলআকাশের নিষ্কৃত গোপন কথা। বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম “তোমার বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!” সেই গানের ঐ একটীমাত্র পদ মনে এমন একটি অপক্লপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম—“আমি চিনিগো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী”—সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কি ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সুরের মন্ত্রণে বিদেশিনীর এক অপক্লপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে কোন্ রহস্য-সিদ্ধ বরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে, মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—স্বপ্নের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কর্ণস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিশোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে

এসেছি তোমারি দেশে,

আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী!

ইহার অনেক দিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া বাইতেছিল—

“খাঁচার মাঝে অচিন্ পাখী কমনে আসে যায়

ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখী ব পার।”

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বহু খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন্ পাখী বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন্ পাখীর নিঃশব্দ বাওয়া আসার ধবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

এই কারণে চিবকাল গানেব বই ছাপাইতে সঙ্কট বোধ করি। কেননা গানের বহিতে আসল জিনিষটিই বাদ পড়িয়া যায়। সঙ্গীত বাদ দিয়া সঙ্গীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মুখকটাকে ধরিয়া রাখা।

গঙ্গাতীর।

বিলাতযাত্রার আরম্ভ পথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন—আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্তে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতার ভেদিত, স্নিগ্ধ শ্রামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরূপ দিনরাত্রি। এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্তর্যবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখান দ্বার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতই অত্যাৱশ্যক ছিল। সে ত খুব বেশি দিনের কথা নহে—তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তবচ্ছায়া-প্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা, উচ্ছৃঙ্খলা সাপের মত প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিঃশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন ধরমধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধছায়া সঙ্গীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া চুকিয়া পড়িয়াছে। হয় ত সে

ভালই—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমরা গঙ্গাভীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গকরা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোব বর্ষার দিনে হার্শোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিজ্ঞাপিত “ভরাবাদর মাহভাদর” পদটিতে মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন জ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা স্বর্ধ্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতির্বিদ্যা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম; পুরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহুগে গিয়া পৌছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনাস্থ হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরেব ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতীরে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীব তরঙ্গহীন প্রবাহেব উপর আলো বিকৃতিক করিতেছে।

আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা মোরান্ সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথবে বাধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দার গিয়া পৌছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বাবান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে—কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে জুইচাবি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানা ঘরের সাসিগুলিতে বড়ী ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলার রোজছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে হুজনে চলিতেছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো হুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী কেহ বা উঠিতেছে কেহ বা নামিতেছে। সাসির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড় উজ্জল হইয়া দেখা দিত। এই ছবি ছবি সেই গঙ্গাভীরের আকাশকে

যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর দেশেব কোন্ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে খলমল করিয়া মেলিয়া দিত—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃতছায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীব মধ্যে একটি অপরিষ্কৃত গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাড়িব সর্বোচ্চতলে চারিদিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমাব কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘন গাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আব কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

অনন্ত এ আকাশেব কোলে

টলমল মেঘের মাঝার—

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর

তোর তরে কবিতা আমার।

এখন হইতে কাব্য সমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙাভাঙা ছন্দ ও আধআধ ভাষার কবি। সমস্তই তখনকাব ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমাব পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলিব মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া মাতুষ্য হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়? কিন্তু একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাঁহারি আমাব কবিতাকে যখন ঝাপসা বলিতেন তখন সেই সঙ্গে এই খোঁচাটুকুও ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে যোগ করিয়া দিতেন—ওটা যেন একটা ক্যাশান্। বাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভাল সে ব্যক্তি কোনো যুবককে চশমা পবিত্তে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে ও বৃদ্ধি চশমাটাকে অলঙ্কার রূপে ব্যবহার করিতেছে। বেচারি চোখে কম দেখে এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু কম দেখার তান কবে এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।

যেমন স্নিহাবিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না কারণ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থান সত্য—তেমনি কাব্যের

অক্ষুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা ‘অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপবিক্সুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাহা সত্য সত্তরং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কি করিয়া। এরূপ কবিতাব মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কি না মূল্য নাই বলিয়া তর্ক কবা চলিতে পাবে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অতুক্তি হইবে না? কেননা কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকৃতিকে ব্যক্ত করার পাপ নাই—যত অপবাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভাল কবিতা চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে ত লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সূন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্ত ইহা যে বোধনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথাই চেষ্টে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে বিবাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনো মতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিজায় অভিভূত চৈতন্য যেমন হৃৎস্পন্দের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনো মতে জাগিয়া উঠিতে চায়—ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাওয়াই নিজেই উদ্ধার করিবার জন্ত যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অজ্ঞান প্রবেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত

হইয়াছে। সকল সৃষ্টিতেই যেমন দুই শক্তির লীলা; কবিতা-সৃষ্টির মধ্যেও তেমনি। যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা-সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্যলক্ষণা বোধ হয়-চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবল ভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিত-হে সেইখানেই কবিতা বাশির। অবরোধের ভিতর হইতে নিঃস্রাবের মত রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের জন্ম হইলে পর-সৃষ্টিকাগৃহে উন্নতের শাখা বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্ত তিনো প্রবন্ধ আমি বলিয়াছি—রমেশদত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ বস্তুর বিবাহ-সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিম বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন;—বমেশবাবু বঙ্কিম বাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিম বাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, “এ মালা ইহারই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ।” তিনি বলিলেন “না”।—তখন বঙ্কিম বাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা শব্দে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

প্রিয় বাবু।

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাহার উৎসাহ অমুকুল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্ন-হৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীত তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে বাহাদুরের পরিচয় আছে তাঁহার জ্ঞানের সাহিত্যের সত্য সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভ্রমর সকল সাহিত্যের বড়রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাচরিত্র আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক বুরদগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য শব্দে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবল মাত্র ব্যক্তিগত

কথা নচে । একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও
অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই
বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে
কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না ।
তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে
সুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতা-
গুলির অভিষেক হইয়াছে । এই সুযোগটি যদি না পাইতাম
তবে সেই প্রথম বয়সের চার আবাদে বর্ষা নামিত না এবং
তাঁহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা
শক্ত ।

শ্রীববীজনাথ ঠাকুর ।

জ্যোৎস্নায়

(পল ভ্যালেনের মূল কবিতা হইতে)

বজ্রত শশধর
হাসিছে বন 'পর,
প্রতিটি শাখে শাখে
পাতার কাঁকে কাঁকে
উঠিছে গুঞ্জন,
হে হৃদি-বজ্রন ।
সরসী সুরিমল
মুকুর অবিকল,
তমাল-কালোকায়
তাহাতে মুরছায়
বায়ুর ক্রন্দনে,
ডুবি এস স্বপনে !

গভীর কোমলতা
নিবিড় নীরবতা
রঙিন আলিপন
হতেছে বরিষণ,
গগন নিমগন,

এই ত স্নলগন !

চান্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মুন্সিল আসান

(গল্প)

ট্রেন ছাড়িতে যখন দশ মিনিট মাত্র দেৱী—সেই সময়
গোবিন্দ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকন্যাদিকে বহন করিয়া এক-
খানি বয়েল গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইল ।—
মোটমোটারীগুলিকে টানাটানি করিয়া কেলিতে কেলিতে
বাবু ডাকিলেন—“কুলী—কুলী ।—ইথার ! ইথার—কুলী-
লোগু ইথার !”... ..

ছুইজন বালক কুলী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার
মধ্যে একজন ঠোট মুচ্কাইয়া একটু হাসিল, আর একজন
বলিল, “ট্রেনে ত আ গিয়া বাবু ! অব্—”

বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে গোবিন্দবাবু বলিলেন—“ট্রেন
এয়েছে তা ত দেখতেই পাচ্ছি বাপু !—কিন্তু কতক্ষণ
দাঁড়াচ্ছে তা বলতে পারিস্ ! আজ এগাড়ীতে যে আমার
না গেলেই নয় !”—

কুলী উত্তর করিল—“বিশ মিনিট তীশ মিনিট হোগা

• মালুম ! অব্ ছোড়েকা কুছ্ দেৱী নেহি হায় ।”

“বিশ না ত্রিশ রে ? ঠিক করে বল না ।—জামাল-
পুরে যে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে !—তাহোক—তোরা
আমার বাক্স দুটো আর এই বিছানার লগেজটা ট্রেনে তুলে
দিবি চল ! ভাগলপুরে গিয়ে ওজন দেব এখন !”—পুরে
বয়েল গাড়ীর কাছে আসিয়া ছোট টিনের হাতবাক্সটি লইয়া
বলিলেন ।—“নেবে এস ... শীগ্গীর চলে এস ! আর
গাড়ীর সময় মোটে নেই, বহুম ত তখনি, ছেলের পা
কাটল ত কাটলই, গাড়ীতে উঠে জলপটা দিও, তা না
করে তুমি সাতঘণ্টা দেৱী কল্লো.....এখন বোঝ টেরটা !”

আলোরানের ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ কবিতা উত্তর
হইল, “ও মা ! চৌকাটে লেগে ছেলের আঙ্গুলটা অমন
করে কেটে গেল, রক্তে রক্তগল্গা—হু-হুটো নখ একেবারে
উঠে গেছে,—সে নিজে বুঝি কোথাও যাওয়া যায় ?—কি
যে বল !”.....

“হ্যাঁ আমি ত অমনি বলি । এখন কিরে যাও, গিয়ে
সোমবারে খুবড়ো মেয়ের বিয়ে কি করে দাও দেখ্
তখন !.....যাক্ শীগ্গীর নেমে পড়.....চল চল ষ্টেশনে
চল,—তুমি থোকাকে নাও—আর মন্দা ।—তুই এই

পোঁটলা ছুটো নিয়ে খুকীর হাত ধরে চলে আস.....আমি টিকিট কিনতে যাচ্ছি।—আ—হা দাঁড়িয়ে কেন—? যা যা, ইন্টার ক্লাস থার্ড ক্লাস যাতে হোক একথানা মেয়েগাড়ীতে উঠে পড় গিয়ে—চিনিস্ ত সব।”

মায়ে মেয়েতে একবার চোখে চোখে চাহিল; পরে একটু উষ্মগেব স্ববে মন্দা বলিল, “তুমি ঠিক আসবে ত বাবা?”

“আসবে না ত বাব কোন্ চুলোয়?—যা না তোরা,—সংএর মত দাঁড়িয়ে তবু! যাবি ত যা নৈলে থাক পড়ে, আমি চম্ভম।”

বলিতে বলিতে বাবু টিকিট ঘরের দিকে ছুটিলেন। ব্যস্ততায় সমুখ পশ্চাৎ লক্ষ্য নাই, বাবান্নায় উঠিতে একটা নীচু গ্যাসের লঠনে ঠক্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল। “উহঃ উহঃ পেচুম বে।”—বলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি আবার ছুটিলেন।

নিকটেই একজন রেলওয়ে কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল, পুলিশস্বভাবসিদ্ধ ধীর গন্তীর স্বরে সে বলিল, “তিস্ৱা ঘণ্টা বাজ্ৱতা হ্যায় বাবু! অব ভিতর যানেকা হকুম নেহি।” এবং দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

“হকুম নেই? বলকি বাপু? এ যে নূতন কথা!—মরুক গে, এই নাও, পান খেও। আমার ছেড়ে দাও,—আমার মেয়ে ছেলে সব গাড়ীতে উঠেছে।—”

পুলিস সরিয়া দাঁড়াইল। বাবু আবার ছুটিলেন। একজন ভদ্রবেশী মুসলমান বলিতেছিল, “কাহে হালাকান্ হোতে হেঁ বাবুসাব। হুস্ৱা টিরেনমে বাইয়ে,.....ইসবস্ত টিকিট মিল্ৱা ঐর গাড়ীপর চচ্ৱনা দোনো জুলুম হোগা।”

“চুপ্ কর বাবু তোরা একটু চুপ্ কর! আমি যেন এমনি বোকা তাই সবাই মিলে কেবলি আমার শেখাতে এসেছেন।—খালি বাধা আর বাধা!.....একবার টিকিট-ঘরে পৌছতে পারলে যে বাঁচি।”—তখন টিকিটঘরের জানালায় আর রোল নাই,—তরুণ টিকিটমাস্টারটি মুখে চুপ্ লইয়া নিশ্চিন্তভাবে যেন স্টেশনমাস্টার ও গার্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন সময় ক্রান্ত গোবিন্দ-বাবু আসিয়া বলিলেন, “এই যে নরেন। দাওত বাবা,

চারখানা বর্ধমানের ইন্টারের টিকিট.....দাও শ্রীচন্দ্র দাও, তোমাব ভরসাতেই—”

আর তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, রেলিং ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

“মামা যে! এত তাড়াতাড়ি!—আর সময়—”

“দে বাবা, আগে টিকিট ক’খানা ফেলে দে, তারপর সেসব কথা হবে এখন! তোরা মামা গাড়ীতে বসে আছে—তন্তু মন্দার বে, না গেলেই নয়। বর্ধমানের টিকিট!—”

নরেন একবার স্বরিতচক্ষে আপনার টেবিলের দ্রুতি চাহিল—পবে চারিদিকে চাহিয়া নিরস্বরে বদিল, “বর্ধমানের ত টিকিট কাটা নেই—এই নিন্ হুগলির,—ক আনা পরসা—”

“তায় জল আটকাবে না!—নাও—এস বাবা!—তোমার ভাল হোক!—মন্দার বিয়ের যাচ্ছ ত?”

বলিতে বলিতে ততক্ষণ তিনি ট্রেনের নিকট আসিলেন। দেখিলেন জীকন্তা গাড়ীতে উঠিয়াছে কিন্তু ট্রাক হুইটা তখনো পড়িয়া—ওজন ওজন করিয়া কুলীতে ও একজন স্টেশনের লোকের মধ্যে কি বচসা হইতেছে।

“তোদের তাতে কি রে বাপু! যেখানে নান্ৱ সেখানের লোকেরা তা বুঝে নেবে।—দে রে তুলে দে।”—

বাক্স ছুটি কোনমতে গাড়ীতে ঠোঁলয়া দিয়া—হাত-বাক্সটি জীর হাতে দিয়া বলিলেন, “সাবধান, এটাকে যেন কাছছাড়া কোরো না! দেখো।”—

গাড়ী তখন মুছ মুছ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তিনি স্বরিতহস্তে পাশের কক্ষের ছন্ন্যার টানিয়া উঠিয়া পড়িলেন। নরেনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছিল; মুখ বাড়াইয়া গোবিন্দবাবু তাহাকে বলিলেন, “যেও নরেন! নিশ্চয় যেও।”

নরেন মুছ হাসিয়া ষাড় নাড়িল।

গাড়ী স্টেশন ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। হুই পার্শ্ব জামালপুরের বহুবিস্তৃত কলকারখানা; অনতিদূরে একট প্রকাণ্ড পর্কত মাথা ভুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রেলপথের দুইধারে নিয়তুমি প্রস্তরকঙ্করাবৃত।

গায়ের কাপড় খুলিতে খুলিতে মন্দার মাতা বলিলেন

“মা গো! এই গরমে কি এই ধোকড় গায়ে দেওয়া যায়? -”

গাড়ীতে আরও কএকটি জীলোক ছিলেন, তাহাব মথো একজন ফুলকায়া প্রোটা কিছু গম্ভীর স্বরে বলিলেন; “একখানা সিঙ্কের চাদর নিলেই পার, এত গীরিস্থিতি ও চট গায়ে দেওয়া কেন।”

মন্দার মা এই বমণীর বলিবার ভঙ্গী ও অঙ্গের বহর ও স্বর্ণালঙ্কারের স্তূপ দেখিয়া বুঝিলেন যে ইনি কিছু ধনের গর্ভও রাখেন। মনে একটু হাসিয়া মুখে সরল হাসিব সহিতই বলিলেন, “আর মা, সিঙ্কের চাদর নেব কোথেকে। একটা প্রাণীর ওপর এতগুলো মানুষের ভাঁব, তারপর আবার মাথার আগুন—মেরের বিয়ে না দিলে নয়,—এখন-কাব দিনের কার্যস্থ বস্তির বিয়ের ব্যাপার ও আপনারা সবই জানেন—,কি কবে কি কবি মা! বাইরে আসা—তাই এটা জড়িয়েছি।”

প্রোটা তাহাব কথায় কিছু সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। ফুল শরীরখানি টানিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন, “ওঃ এই বুঝি তোমার মেয়ে?—বিয়ে দিচ্ছ কোথায়?—বর কী পাশ?—কি কি চায়?”

“দেশেই বিয়ে হবে। আমরা পাশকরা বর কোথা পাব মা!—ছেলের বাপ কি চাকরী করেন, ছেলেও রেলে কি কাজ কচ্ছে—এতেই খরচ কবে মেজে তবুও হাজারটি টাকার কম ত নয়! এই দেখুন না গয়নাতেই ত আটশ টাকা পড়ল।”

“হাজার টাকা?” প্রোটার চোখে মুখে অবজ্ঞার হাসি খেলিয়া উঠিল। “মোটো হাজার টাকা? ই-ই তোমার খবচ! আমার বীণার বিয়েতে শুদ্ধ বিয়ের খবচই পড়েছিল চার হাজার! তাবপরে তবু তব্বির ত আলাদা।”

মন্দার মা হাসিয়া উঠিলেন, “ওমা চার হাজার টাকা যে আমরা চোখেও দেখিনি মা?—ওঁর মোটে পঞ্চাশটি টাকা মাইনে—এতটা খরচ—আমরা অত টাকা কোথায় পাব? এই যা দিতে হচ্ছে তাতেই আমাদের হাড় ভেঙ্গে গেছে।”

প্রোটা আর কিছু বলিলেন না। এই পরিবারটির প্রতি যেন কিছু উদাস হইয়া বাহিবে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবটি যেন—“তবে আর তোমবা কী।”

প্যাসেঞ্জার গাড়ী স্বভাবত ধীরে ধীরে চলতেছিল।

ক্রমে আরও গতি হ্রাস হইল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন খিড়কীরোয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে আবস্ত করিল। বালক বালিকারা মুখ বাহির করিয়া চোঁচাইতে লাগিল। একটা যুবতী প্রসন্ন মুখে বলিতে লাগিলেন, “ও মা! ঠিক যেন সাঁঝ হয়ে গেছে?”—মন্দার মাতা মুহূর্ত্ত হাস্য করিয়া বলিলেন, “ছপু বোলায় এতটা আঁধার দেখায় না, সন্ধ্যাও হয়ে এল কি না।”

সন্ধ্যার একটু পূর্বেই ট্রেন সুলতানগঞ্জ স্টেশনে থামিল। এখানে বাঙ্গালী যাত্রী মোটে নাই, তৃতীয় শ্রেণী হইতে কএকজন লোটাকম্বলধারী উঠিল ও নামিল।—একজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ওড়নামণ্ডিতা দুইজন জীলোককে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছিল, সে এই কামরাধানির সম্মুখে একবার দাঁড়াইয়া বলিল, “ইয়ে কোঠলী জানানা লোগকা বাস্তে,—তুমলোক্ এহি গাড়ীমে উঠ্যাও,—হাম্ দুসরা—”

ব্যাপাব দেখিয়া প্রোটা জীলোকটি ব্যস্ত হইলেন, এই অপরিচ্ছন্ন “ছোটলোকদের” সহিত বসিতে হইবে ভাবিয়া তিনি পূর্বাঙ্কেই সাবধান হইলেন। বৃদ্ধ হাতলে হাত দিতেই তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—“থাম থাম।—সব জানানা গাড়ীই তোমাদের জন্ত নয়।—তোমবা কি এই ক্লাশের টিকিট কিনেছ?—উঠলেই হ’ল নাকি?”—পরে আপন মনে গন্গন করিয়া বলিলেন—“চোরের আক্কেল দেখে দেখি। ইষ্টিশানে ইষ্টিশানে নেবে খোঁজ নেয় না! কোথাকার কে সব উঠে পড়ছে!”

বৃদ্ধও একটু চটয়া বলিল, “টিক্‌স্ নেই লিয়া তব্ আপনে হকুম্‌সে চড়নে আয়া? বাঙ্গালীকা কোড়ি হার ওব হাম্-লোগকা কুছ নেই হার?—হাম্‌লোগ এইসা গরীব—”

গতিক মন্দ দেখিয়া মন্দার মা বলিল,—“সে কথা ত হচ্ছে না বাবা! তোমবা ক’ নম্বব গাড়ীতে উঠবে তাই জিজ্ঞাস্‌ কছেন উনি।”

“লম্বব? আবে গাড়ীমে ত অব্ লম্বব উম্বব কুছ নেই বহতা হায়—কীস আংরেজী হব্‌প লিখ্‌ দিয়া যো কি পড়ে নেই শর্কে—হামরা তিন লম্বব কা ঠেকস্—হাম্—”

এই সময় তাহাব কথায় বাধা পড়িল—আব একজন যুবক হিন্দুস্থানী সেইদিকে আসিতেছিল, বৃদ্ধকে দেখিয়া

দ্রুত নিকটে আসিয়া বলিল,—“কাঁহা মিশরজী! কাঁহা? আপকে সাথ্ ইহা মূল্যাকাং হোগা হাম্ নেহি জাস্তাখা,—দর্শনলাল নে চাব ধরকা জামট আপ্কে লিয়ে হামারা পাশ ধব দিয়া.—আব্ তলুক মেনেকা ফুরসৎ—”

“রাখি দহু মুহু?—যানেকা বখৎ লেলে যাদ্গে! মগর গাড়ী পর চচনা আব মুন্সিল হুয়া! বাঙ্গালী জানানী সানি কহতে হেঁ ই গাড়ী হুসরা,—আব্ সমে ভি কম্”—

বুদ্ধ বলিতে বলিতেই টিকিট বাহিব করিতেছিলেন, যুবক চট্ করিয়া তাহার হাত হইতে টিকিট টানিয়া লইল। পরে একটু হাসিয়া বলিল “খাট কিলাস্ক টিকস্! আপ-লোগ ইহার আইয়ে”;—বলিতে বলিতে বুদ্ধের হাত ধরিয়া সে টানিয়া লইয়া চলিল, রমণীর তাহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইল।

ঘণ্টা বাজিতেছিল—এক্সিনেও বাঁশী দিল, মেয়েরা স্ব স্ব স্থানে স্থির হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় দেখা গেল, অর্দ্ধ অর্দ্ধকাবের মধ্যে কে একজন দ্রুতপদে সেই দিকে আসিতেছে—মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্কাজে বস্ত্রাবৃত একজন জীলোক আসিয়া শিক্ষিতপটুতার সহিত হাতল ঘুরাইয়া নিমেষ মধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ কবিল। গাড়ীর আবোহিগীবা একবার হাঁ না কবিবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পূর্বেই সে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে এবং ট্রেন মুহু মুহু চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে জীলোক, স্ততরাং আপত্তি করিবার কোন কারণও নাই।—কিন্তু সকলে বিস্মিত চক্ষে দেখিতেছিলেন—এ কোন জাতীয়া?—সর্কাজে এমনভাবে চাদর জড়ান যে সে পশ্চিমে কি বাঙ্গালী বা মারহাট্টা তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সঙ্গে কোন পুরুষ বা কিছু দ্রব্যাদিও নাই। সহসা কোথা হইতে সাঁঝের আধারের মধ্য দিয়া ঐ অদ্ভুত জীবটি তাহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইল? এ কে? কোথায় যাইবে?

তাঁহার সকলেই তাহাকে দেখিতেছিলেন কিন্তু সে কাহাবও প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য কবিল না, স্থিরপদে তাঁহারেব মধ্য দিয়া চলিয়া এক কোণে গেল—তাঁহার পর শান্তিত শিশুটিকে ধীবে ধীরে সরাইয়া, ষ্ট্রয়ের কাছে পোটমাণ্টটা ভিতবে চেষ্টা দিয়া একপাশে গিয়া বসিল

এবং মুক্ত জানালাব বাহিরে মুখ বুলাইয়া ঘোমটাটি বঁধৎ তুলিয়া দিল।

গাড়ী তখন ছুটিতেছে। বাহিরে অন্ধকার, নবাগতার মুখ দেখা যায় না। কিন্তু ঘরখানির ভিতবে উজ্জল আলো কর মধ্যে সেই নূতন শালুৰ ওড়নাঢাকা রহস্তটির পরিচয় লইবার ক্ষম্ত সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ হুতী তাঁহাব ছেলেটির অকাল নিদ্রাভঙ্গে কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ননদিনীর সহিত গোপনে—“দেখ্ চিদি, মাগীর দেমাক্! ছেলেটাকে না নড়ালে কি হত না? আমাদের বল্লৈ ত আমি সরে বসতাম্!” বলিয়া নিবিক্ত প্রকাশ করিতে করিতে তাহার মুখ দেখিবার ক্ষম্ত অর্ধাৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিবিক্ত সংযত করিয়া তিনিই প্রথমে বলিলেন, “হ্যাঁগা তুমি কি লোক? ফোথা বাচ্চ?”

নবাগতা উত্তর দিল না।

হুতী আবাব বলিলেন, “শুন্? তোমাকেই বল্ছি?”

পূর্বোক্তা প্রোচা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “কি মেয়ে বাচ্চা তুমি! দেখ্ছ ও কথা কবে না তবু তোমার কি যেচে কথা না বল্লৈ নয়?”

ননদিনী বলিলেন, “তুই থাম্ বো! আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি?” বলা বাহুল্য বধু অপেক্ষা তাঁহার কৌতূহল আবও বেশি হইয়াছিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রমণী যেমন অটলভাবে বসিয়া ছিল তেমনি থাকিল, কাহারও কোন কথা উত্তর দিল না। মন্দার মা একবার “হে বাচ্চা! তুমলে কেব্ব ধর কি সুলতান্‌গঞ্জমেই হায় না আর কাঁহা থেকে আস্তা?” বলিয়া তাঁহার প্রবাসবাসের পরিচয় দিতে চেষ্টা কবিলেন। তাহা শুনিয়া মন্দা হাসিয়া বলিল, “তুমি হিন্দুস্থানী কথা বোলো না ত মা! একটুও বদ্বি হয়!” কিন্তু বস্ত্রাবৃত তাহারও কোনো উত্তর দিল না।

তখন একজন বৃদ্ধা বিরক্তস্বরে বলিলেন—“মরগ আর কি। কি জাতের মেয়ে তারও ঠিক নেই,—নাকট ঠেলে এনে আমার বুড়িটার ছুইয়ে দিয়েছে একে-নাবে! বাবাব পেসাদী সন্দেশ চন্মামেস্ত আছে আমার, সব গেল বুঝি!”

সকল বমণীর মুখেই বিরক্তিচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। কিন্তু আগন্তকের অটলতা দেখিয়া তাঁহারা তাহার পরিচয় লাভের আশা ত্যাগ করিলেন। গাড়ীও ক্রমে দুইটা ছোট ছোট ষ্টেশন পাব হইয়া ভাগলপুরে থামিল। এই ষ্টেশনটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং জনতাও তদনুরূপ। এখানে ট্রেন থামিতেই অল্পবয়স্কারা কেহ কেহ মাথায় কাপড় টানিয়া মুখ ফিরাইল। কেহ বা সেটুকুরও অপেক্ষা না রাখিয়া যথেষ্টভাবে দেখিতে লাগিল। দুই এক দলের সঙ্গী বা অভিভাবহেরা আসিয়া জীলোকদের কোন-কিছুর প্রয়োজন বা অসুবিধা আছে কিনা খোঁজ লইয়া গেলেন। গোবিন্দ বাবু আসিয়া বলিলেন, “এখানে মাল, ওজন হবে না, একেবারে নেবেই হবে—দোকড় খরচ পড়বে—তা কি করব?”

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্লাটফর্মে যথারীতি চা চুরুট, সোডা বরফের সঙ্গে “গম্বাগরম পুরী মিঠাই” “অবাক্জলপ্যান” “লিঙ্গ বাবু পাকা তরবুজা” ইত্যাদি ফেরিওয়ালারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সঙ্গীদের নিকট জানাইয়া জীলোকেবা সকলেই কিছু কিছু কিনিল। বালক বালিকারা অধৈর্য্য ভাবে “মা আমি কলা নেব”—“ঐ ঞাখ পিসি মা! সোলাব পাখী বিক্রি হচ্ছে—আমি নেব”—“ঐ বড় জিলিপী ছানা নাওনা মা!” ইত্যাকার বাহানা ধরিয়া তাঁহাদিগকে উত্সাহ করিয়া তুলিল।

প্রোচা জীলোকটির সঙ্গী আসেন নাই, অথচ বিবক্তির সহিত তিনি কেবলই বাহিবে চাহিতেছিলেন। সকলেরই লোক আসিল এবং ফিরিল দেখিয়া জলিতচক্ষে ক্রুদ্ধিত করিয়া বলিলেন,—“চেবোর আক্কেল দেখছ—এ পর্যন্ত নাকি একটা উকিও দিলে?—ওর সঙ্গে আসাই আমার বোকানী হয়েছে? তখনই আমি ওনাকে বগেছিলাম যে চাকুটার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই, ছুটি হলে তুমিই আমার রেখে এস,—তা না এ কী বিপদে পড়লাম?”

মন্দাব মাতা বলিলেন,—“আমাদের গুঁকে বলব কি মা তাঁকে ডেকে দিতে?” তাহাতেও তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইল দেখিয়া আব কেহ কিছু বলিলেন না।—ক্রমে গাড়ী আবার চলিল।

তখন রাত্রি হইয়াছে। বালকবালিকা বা ঘুমাইতে লাগিল। জীলোকেবা জিনিষপত্র গোছ করিয়া কেহ ট্রাকে কেহ বিছানার লগেজে বসিয়া ছেলেদের শুইবার স্থান করিয়া দিলেন। দুই একজন বা মেজেতেই একটু বিছানা বিছাইয়া শিশুকে লইয়া শয়ন করিল।

তখন মন্দার একজন সমবয়সী কিশোরী—তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের সহিত কানের কাছে প্রসন্ন করিল—“হ্যাঁ ভাই! তোমার নাকি বিয়ে?”

কিশোরী বিবাহিতা। মন্দা তাহার প্রবেশ কোন উত্তর না দিয়া জৈবৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বিবাহের কথাটা এতক্ষণ টীপাই ছিল,—এইবার কথা উঠিতেই, একজন যুবতী বলিলেন,—“দিব্যি মেয়েটি!—কি কি গয়না দিচ্ছে?”

একমুখ হাসিয়া মন্দাব মা বলিলেন, “ও আমার অদেষ্ঠ! গয়না আর কি দেব ভাই? এই দ্যাখই না, গয়না ত সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি।” বলিয়া হাতবান্ধটি সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।

তখন সকল জীলোকই একসঙ্গে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে; বাহারা শয়ন করিয়াছিল তাহারাও উঠিয়া বসিল, সহসা শুভচ্যুত হইয়া নিদ্রাতুর শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল। জননীদের কিন্তু সেইদিকে লক্ষ্য নাই,—“হার দিয়েছে কেন নেক্লেস দিলেই ত ঠিক হত”—“আব কি কেউ ও পাতাকাকের চুড়ি পরে? কুচো চুড়ি দাওনি কেন?” প্রভৃতি মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রোচা জৈবৎ অবজ্ঞার স্ববে বলিলেন, “নেহাৎ ‘কনে গয়না,’ তা যেমন মাছুষ তেমনি ত দেবে!—বেশ হয়েছে!” মন্দার মাও হাসিয়া বলিলেন, “আর পাব কোথা ভাই! এর জন্তেও সেক্কার কাছে টাকা ধাব রইল, চেনা লোক তাই দিয়েছে!”—বাক্সে বিবাহের অলঙ্কার ছাড়া আরও গহনা ছিল, প্রসন্ন হইল “ওই গহনাগুলো বুঝি তোমার?”

“হ্যাঁ ও কথানা আমারই বটে! কেবল এই হার ছড়াটা খোকার—আর”.....

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া একজন বলিল, “তোমার মোটে এই কথানা গয়না! শুধু বালা অনন্ত—”

তাঁহার কথাতেও হাসি বাধা দিয়া মন্দাব মা বলিলেন,

“কি বলছ ভাই—পা-ব কোথা! বিয়ের সময় বাপের বাড়ীর গয়না ভেঙে চুবে ঐ কথানা পা-ঢাকা কবে রেখেছি! পরি ত তেমনি! যেমন হয়েছে অমনি ধরাই রয়েছে! গবীষ মাছুষের গহনা—জান ত ‘কখনো বা আভরণ কখনো বা পেট-ভরণ!’”

এ কথাব পর আর কেহ কিছু বলিলেন না, কেবল বিশ্বনাথনন্দিনী একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া মূঢ় হাস্ত করিলেন। মন্দা-বা বাজ্ঞটি বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, “বড় চুঃখের জিনিষ ক’টা ভাই! ভাই সাথে সাথে নিয়ে যাকি। যাদের সামগ্রী তাদের হাতে হাতে সঁপে দিয়ে তবে আমার নিষ্ঠার! নেরে ত পরের জিনিস বৈ নয়! এতদিন খাইরে মাথিরে—সাজিরে পরিরে পরের যবে পাঠাতে চলেছি।”

মন্দাব মুখখানি ম্লান হইয়া উঠিল কিন্তু তাহার পার্শ্বের সঙ্গিনী তাহাব কানে কানে বলিল “আর স্ভাকাম কর কেন ভাই? মনের কথা ত মনই জানছে।”

তখন আব মন্দা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, আঁধারে মুখ ফিরাইয়া মূঢ় হাস্তে তাহাকে আনন্দের ভৎসনা করিয়া বলিল, “বাও! তুমি বড় ছষ্ট!”

সঙ্গিনী বলিল, “তা ত বুঝলাম, কিন্তু একটা কথা বলি, বর্জমানের ঐ দিকে তোমাদের বাড়ী গুল্লাম, আমার খণ্ডর-বাড়ীও ঐ দিকে, বাধানতলা জানত? তারই কাছে, তোমাদের বাড়ী কি ঐ দিকে?”

তাহার পর দুই জনে একমনে বাক্যালাপ আরম্ভ হইল, কিশোরীর নাম কনকলতা, তাহার পিতা বাকীপুরের উকীল, সম্প্রতি সে মাতার সহিত পিতালয়—ইংরাজ-বাজার চলিয়াছে। তিনপাহাড় ষ্টেশনে নামিবে। স্ত্রিয়া মন্দা অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার। যে আরও অনেক দূর যাইরে। কনকের জন্ত সত্যি তাহার মন খারাপ করিবে ইহা সে মাইরি দিয়া করিয়া জানাইয়া দিল! কনক তাহার গাল টিপিয়া আদর করিল এবং যখন একদশে বাড়ী তখন কখনো না কখনো দেখা হইবেই বলিয়া আশ্বাস দিল।

ক্রমে প্রায় সকলেই নিদ্রালু হইতেছিলেন; মন্দার মা বলিলেন “তুই ঘুমবি ত ঘুমো না মন্দা, আমি জেগেই থাকব।”

কিন্তু মন্দাই ঘুমাইল না, সমান উৎসাহে কনকের সহিত গল্প করিতে লাগিল, এবং তাহার জননী জানালার পশে মাথা দিয়া চুলিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট ষ্টেশন আসে ও পার হইয়া যায়, যাত্রীর ভীড় মোটে নাই। একস্থানে আসিলে মন্দা বলিল, “এটা আবাব কি ইষ্টেশান? নাম যে ছাই বরে ডাকলে বুঝতেই পারলাম না।”

কনক বলিল, “কেন? লর্ডনের গায় লেখা পড়নি?” মন্দা হাসিয়া উঠিল। বলিল “ওমা, সে যে ইংরিজি। পড়ব কি কবে?—”

কনক একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, “এটা ‘পিরপান্টা’ ষ্টেশন।”

মন্দা বিশ্বনাথনন্দে বলিল, “তুমি ইংরিজি জান নকি ভাই?”

কনক বলিল “হ্যাঁ জানি বৈকি, আমরা দাদার কাছে পড়ি। তুমি জান না?”

মন্দা শুষ্ক হাস্তে বলিল “না!”—তখন গাড়ী ছাড়িয়া আবাব চলিতেছে, বধুটি তাহাদের কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “কি নাম বলে গা?—পিরপান্টা? কেন ঐ যে বাংলার ‘পীরপৈতী’ লেখা দেখছি?”

তাহা কনকও দেখিয়াছিল, একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, “তা হল ত কি? ইংরিজিতে অমনি উচ্চারণই হয়?”

কনকের মাতা হাসিয়া বলিলেন, “তোব মাথা হয়।”

“হয় না? তুমি দাদাকে জিজ্ঞেস করো দিকি?” কনক রাগিয়াছিল।

তাহাকে অস্তমনা করিবার জন্ত মন্দা বলিল, “অচ্ছা ভাই ঐবে আলোগুলো জ্বলছে—ও কি জান?—”

কনক কথা বলিল না। মন্দা আবাব বলিল “পাহড়ে ঐ রকম আলো বড় জ্বলে—দেখেছ?”

কনক শীঘ্র কথা কহিত না, কিন্তু উপস্থিত একটি ঘটনায় সকলেই যেন চঞ্চল হইয়া পড়িলেন! সেই বৃদ্ধা জীলোকটি বেঞ্চের একপাশেই জড়সড় ভাবে শুইয়া ছিলেন, সম্প্রতি তিনি এত ধাবে আসিয়াছেন যে প্রতি মুহূর্তে পড়নাশঙ্কা—এবং দেখিতে না দেখিতে পড়িয়াও গেলেন।

—বুঝা হাঁউমাউ করিয়া উঠিলেন—ঠাহার কত্তা ও বধু তাড়াতাড়ি ধবিসা তুলিতে তুলিতে বলিলেন, “আহা হা বুড়ো মানুষ, কোথাও লাগল কি মা?” বুঝাব কিন্তু সেকথায় কান নাই, ঠাহার বক্তব্য যে তিনি ত ঘুমান নাই। ঐ কাপড়-জড়ান মাগী ঠাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।”

বুঝাব কত্তা পূত্রবধু যদিও স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে কেহ ঠাহাকে ফেলিয়া দেয় নাই—তথাপি সেই নীবব জীলোকটিকে গালি দিবার এই সুবিধাটুকু ঠাহারা ত্যাগ করিলেন না। নিজেদের দল পুক দেখিয়া, “ও মাগী কি কম। পেটে পেটে বজ্জাতি নিয়ে কেমন গাড্ডিল হয়ে বসে বয়েছে দেখছ না।” “দে না পোড়ামুখী মখখানা দেয়ালে ঠুকে।” প্রভৃতি বোম্বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি সে পোড়ামুখী বা সোনামুখী আপনার মুখ ফিরাইল না।

এই গোলমালে তন্দ্রাতুবা প্রৌঢ়া জাগিয়া বলিলেন, “এটা কি এন্টেশন গা, দেখেছ তোমরা?”

মন্দা মুহূ হান্তেব সন্তিত বলিল, “একুনি কি একটা ছোট্ট ইন্টিশান গেল, কি ভাই?”

কনক বধুটিব প্রতি রোষকটাক্ষে চাহিয়া বলিল, “কি জানি ভাই, আমি জানি না।”

বৌ তাহা দেখিয়া মুহূ হান্তে বলিলেন—“দেখবেনা আবার কেন, পষ্ট মিরজাচৌকী লেখা, দেখলে না আবার”—

নন্দিনী হাসিয়া উঠিলেন—বৌকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, “নে নে আব ছেলে মানুষেব সঙ্গে ঝগড়া করে না। জিনিসপত্তবগুলো শুছিয়ে নে! এইবার আমবা নাব্ব। তুই খুকীকে কোলে নিয়ে বস, আমাকে আবার মার হাত ধরে নাবাতে হবে।”

মন্দা মা বলিলেন, “তোমরা কোথায় নাববে ভাই?”

“এই যে সায়েবগঞ্জ। হ্যাঁগা নিশে আসবে ত?”

বধু বলিলেন, “কেন—আসবে না কেন?—আমি নিজে চিঠি দিয়েছি?”

প্রৌঢ়াও একটু মুখ ভাব করিয়া বলিলেন, “আমিও ঠিক হয়েই থাকি—সকুবীগলিতে আমাকে নামতে হবে।”

মন্দার মা চোখ মেলিয়া মুহূ হান্তে বলিলেন, “ওমা, সবাই তোমরা চলে যাবে—এতটা পথ আমবা এই একা যাব?”

বিছানা কাপড় ভাঁজ কবিতে করিতে বুঝাব কত্তা বলিলেন, “তাব আব ভাবনা কি ভাই, কত মানুষ উঠবে এখন, বসবার ঠাই মেলা তখন ছুফব হবে হয় ত।”

“সেও ভাল ভাই। একা যেতে আমবা বড় ভয় করে।”

ট্রেন ষ্টেশনে ধামিতেই বুঝাব পুত্র দ্বারে আসিয়া বলিলেন “তোমরা ঠিক হয়ে আছ ত?—ভাল, তাড়াতাড়ি দরকার নেই—এখানে অনেকক্ষণ গাড়ী থামবে, ততক্ষণ আমি খোঁজ নিই নিশি এল কি না?”

“কে বমানাথ বাবু কি?—এই যে আমি নিশীন্দ্র—” বলিতে বলিতে মাথায়-চাদবজড়ান জিনের-কোট গায়ে—একজন শীর্ণকায় যুবক আসিয়া রমানাথেব সহিত মিলিত হইল। স্বাগতসম্ভাষণাদির পর নিশীন্দ্র বলিল “পাকী ত কিছুতেই জোগাড় কর্তে—”

বাধা দিয়া রমানাথ বলিল, “দরকার কি!—এইত বাসা, এটুক—রাস্তির বেলা—দেখে নেওয়া যাবে। এস গো তোমরা নেবে এস।”—গায়ে চাদব জড়াইয়া ছেলে কোথো করিয়া বধু নামিয়া গেল, কন্যা বুঝাকে নামাইতে লাগিলেন, বুঝা বলিলেন, “তুই ছাড় মা। আমি নিজেই যাচ্ছি এখন।”

বমানাথ বলিল—“না না; অততে কাজ কি। তুমি ওব হাত ধরেই এস না।”—তখন জীলোক তিনজনকে প্রাটকর্সেব পাশে দাঁড় করাইয়া পুরুষ ছইজনে জিনিস সবাইতে লাগিলেন। গোলমালে বধুব কোলে শিশু কাদিতে লাগিল।

সাহেবগঞ্জ প্রকাণ্ড ষ্টেশন। দীর্ঘ দালানে উজ্জল বাতি জ্বলাইয়া কন্সচাবীরা বসিয়া আছে। বড় বড় ঘরগুলি বিলাতি প্রথায় উৎকৃষ্ট ভাবে সজ্জিত। দেয়ালে নানাবিধ খাঙ্গ ও ঔষধ প্রভৃতিব বিজ্ঞাপন বিচিত্র বর্ণে শোভা পাইতেছে। সর্কাপেক্ষা মেম ও ঠাহাদের শিশুদের মুক্ত আনন্দের দ্রুত পদচালনার লীলাভঙ্গীই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

মন্দা অনেক লোক দেখিয়া একটু মুখ ঢাকিয়াছিল কিন্তু

কনক পূর্ববৎ নিশ্চিত ভাবে ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া ছিল। সহসা সে মুখ তিরাইয়া মন্ডাকে চিম্‌ট কাটিয়া বলিল, “ও ভাই ও ভাই! খুব মজা হয়েছে দেখলি না? ঐ বোটের গা ঘেসে দুটো সাহেব চলে গেল, যাগী একেবারে আঁৎকে উঠেছে।”

কথাটার হাসিবার কাষণ কিছুই নাই—বরং ভাবিতে মন্ডার ভরই পাই, সে শিহরিয়া বলিল, “ও মা সত্যি না কি?”—

“হ্যাঁ, সত্যি না ত কি? বেশ হয়েছে—যেমন কর্ম—”

অর্ধসমাপ্ত কথা মুখে লইয়া কনক খামিল কিন্তু মন্ডা তাহাতে সায় দিল না। কনক বলিল “তুমি অমন গোঁজ হয়ে বসে কেন আছ ভাই—এদিকে এসে ত্যাখ না কত মেম সাহেব—আব ছেলেগুলি কি সুন্দর ভাই?”

হাসিয়া মন্ডা বলিল, “সত্যি। আমাদের জামালপুবেও ঢেব সাহেব মেম—আব ভাই, সন্ধ্যা বেলায় মুন্সেরে যদি ত্যাখ—উঃ সে বেন সাহেব বিবি হাট বসে যায়।”

একটু মুখ ভার কবিয়া কনক বলিল, “আমাদের বাঁকী-পুবেও মেলা সাহেব আছে।”

গাড়ী ছাড়িতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল—কনকের মাতা বলিলেন, “গাড়ী ছাড়বে ত কখন? গরমে যে মাথা ধবে উঠল।”

মন্ডার মা বলিলেন, “এখানে সারেবরা থানা খায় কিনা তাই দেখা হচ্ছে।” এমন সময় হঠাৎ একটা বড় কাঁকুনী দিয়া পাড় চলিল।—প্রোচ অসাবধান ছিলেন—তাহার মাথা সজোবে জানালায় আসিয়া পড়িল। তিনি কষ্ট স্ববে বলিলেন, “কেন বাছা, এই ত গাড়ী চলেছে, আব তুমি বন্ধে এখন ছুটবে না।”

মন্ডার মা অমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন “তাই ত! এত নীগুগীর ত কখনো চলে না।” বলিতে বলিতে গাড়ী আবার থামিল।

কনকের মা বলিলেন, “নাও! আবাব থামল যে।”

কনক হা হা শব্দে হাসিয়া বলিল—“লাইন বদলাচ্ছে মা লাইন বদলাচ্ছে! ওই দেখ আর একখানা গাড়ী এসে পড়ল।”

• অপর পার্শ্ব দিয়া মেল ট্রেন হু হু শব্দে আসিয়া

দাঁড়াইল এবং প্যাসেঞ্জারও হু হু চলিয়া ষ্টেশন ছাড়াইল।—

সক্রীগুলির ক্ষুদ্র ষ্টেশনে প্রৌঢ়াব আয়ীয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, ট্রেন হইতেই তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন। গাড়ী থামিবামাত্রই উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “এই যে নরেশ! বাবা, চেবোর আক্কেল শোন”—

যুবক কিন্তু আব বলিতে দিগেন না,—বাধা দিয়া “চুপ কর মা! এখানে গোল কোরো না,—নীগুগীর নবে এস, এখানে বেলীক্ষণ গাড়ী দাঁড়ায় না।” বলিয়া কুলী ডাতিয়া জিনিস পত্র নামাইয়া লইলেন।

হুইটা ক্ষুদ্র ষ্টেশনের পরই তিনপাহাড় জংসন। অপর পার্শ্ব বাজমহলের ট্রেন দাঁড়াইয়া আছে। কনক বলিল, “ঐ যে আমাদের গাড়ী! এইবার ত আমরা চলুম ভাই।”

মন্ডা মুখ হেঁট করিল।—কনক মুখ স্ববে বলিল—“ও মা! আবার এত কেন ভাই!—পথেব সাধা বৈ ত নই। তা হুঃখু কি—গিয়েই আমি চিঠি দেব—তুমি দেবে ত?”

মন্ডা ঘাড় নাড়িল। কনকের মাও “আসি দিদি!” বলিয়া মন্ডার মার কাছে বিদায় লইলেন।—কনকের গায়ে চারি গাছা মল বন্‌ বন্‌ করিয়া বাজিতেছিল, পা হুশানি আলতায় সম্ভবজিত, মাঝেব আঙ্গুল ছুটিতে সুন্দর ডাম্‌ম-কাটা আঙ্গুটি—মন্ডা বিষাদজড়িত চক্ষে তাহাই দেখিতে ছিল। তাহাবা গিয়া অপর পার্শ্বের ট্রেনে চাপিল।

তখন ষ্টেশনেব ঘড়িতে বাজিতেছিল,—এক টাই তিন—চার পাঁচ ছয়—সাত আট নয়।—“ও মা নটা বাজল এতক্ষণে—রাত যে কত দেখাচ্ছে।—মন্ডা! ভাল হয়ে বস, তামি থোকাকে এখানে শুইয়ে দিই।”—বলিতে বলিতে মন্ডার ম নিজেও শুইবার উপক্রম করিলেন। গাড়ীতে আর কেহই নাই—যথেষ্ট স্থান। সবিস্ময়ে তাহারা দেখিলেন এতক্ষণ পরে সেই বস্ত্রাবৃত ধীরপদে মাঝের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। মন্ডার মা বলিলেন, “বস বাছা! একটু গড়িয়ে নাও, এখুনি হয়ত লোক এসে পড়বে।—মন্ডা, তুইও একটু শুয়ে নে না।”—

“আমার ঘুম পায়নি, তুমিই শোও।” নবপরিত্ত সখীর বিদায়শোকে মন্ডা তখনও ব্যথিত;—গাড়ী চাউড়ে

লাগিল, সে মুখ ফিরাইয়া জানালায় বাহিবে চাহিয়া ছিল,—
তিনপাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া তিনটা
কালো দৈত্যের মত চলিয়া গেল।—সহসা কি একটা
অকারণ দুর্ভাবনার বালিকার চিত্র পীড়িত হইতেছিল তাহা
সে ভাল কবিতা বুঝিতে পারিতেছিল না।

এজিনেব ধূমায় পাথর কয়লার গুঁড়া উড়িয়া
আসিতেছিল, কখনো কখনো বা চোখে পড়িয়া পীড়াও
দিতেছিল, মন্দা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বসিয়াই থাকিল।
দম্কা বাতাসে তাহার সম্মুখেব চুলগুলি হাওয়াভাবে উড়িতে
লাগিল। বাহিবে আঁধার—কেবল প্রত্যেক কক্ষের
জানালাপথে বহিস্চ্যুত আলোকচতুষ্কগুলি গাড়ীর সমান
দৈর্ঘ্যে সারি বাঁধিয়া তাহার সহিতই ছুটিয়া চলিতেছিল।

মন্দার চিত্র ক্রমেই স্থির হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে
পূর্বাকাশের আঁধার ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিল, মাঠের বৃকে
দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষছায়া গাড়ীর বিপরীত মুখে ছুটিতে দেখা
যাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলার শীর্ণ জল-
ধারা চিক্‌ চিক্‌ করিয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় দশটা।

সহসা গাড়ীর ভিতরে একটা হুড়াহুড়ি শব্দ উঠিল,—
ও কি?—মুখ ফিরাইয়া মন্দা দেখিল, অন্ধৃত কাণ্ড। সেই
বজ্রাত্যুত জ্বীলোকটা হঠাৎ আসিয়া তাহার মাতার মুখ
চাপিয়া ধরিল। এবং তিনি তাহাব হাত ছাড়াইবার জন্য
ছট্‌ ছট্‌ করিতেছেন!

“ও কিরে মাগী; আমার মাকে তুই ধবেছিস্ কেন?”
বলিয়া মন্দা ছুটিয়া তাহাদের নিকট আসিল। তখন
পুরুষবৎ পুরুষস্বরে সে বলিল, “চুপ কর ছুঁড়ি! তা না হলে
সবাইকে খুন কর্ক্স আজ—দেখেছিস্!” সময়ে মন্দা দেখিল
তাহার হাতে দীর্ঘ ছুরিকা—আলোকে ঝকঝক করিয়া
উঠিল। তাহার মাতা অজ্ঞান, সম্ভবত তাহাকে ক্রৌরোকর্ষ
করা হইয়াছে।—দেখিতে দেখিতে সেই দম্কা তাহাদের
সর্বস্বের আধার সেই গহনাব বাক্সটি হস্তগত করিল।—
মন্দা প্রথমত হতবুদ্ধি হইয়াছিল, সহসা তাহার মনে হইল,
“দরজার পাশের ঐ শিকলী টানিলে ত গাড়ী খামে! এবং
বিপদেরও অবসান হয়!” তখন সে ধীরে ধীরে সেইখানে
গিয়া হাত বাড়াইল।

কিন্তু দম্কা তাহা অপেক্ষাও চতুর ও ক্রিপ্রহস্ত,—মুহূর্ত্ত

মধ্যে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতে ছুরি বসাইয়া দিল,
মন্দা চীৎকার করিয়া মেঝের পড়িয়া গেল। বাক্সটি তখন
তাহার হস্তগত,—সে একবার এক নিমেষে সমস্ত দৃষ্টটী
দেখিয়া লইল, তাহার পর দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইবার
চেষ্টা করিল।—কিন্তু বোধ হয় চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইতে
সাহস হইল না, কপাট খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল।

বারহারোয়া স্টেশন। গাড়ী থামিতেই চোর নিঃশব্দে
প্লাটফর্মের বিপরীত পার্শ্বে নামিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র স্টেশন,
তাহাতে রাত্রি—সে সম্ভব নিরাপদেই যাইত কিন্তু তাহা
ঘটিল না। অস্তকার ঘটনার পূর্বে ক্রমাগতই ট্রেনে
এইরূপ ছুরি ডাকাতির সংবাদে রেল-কর্তৃপক্ষ চিন্তিত ও
সাবধান হইয়াছিলেন, প্রায় প্রত্যেক ট্রেনেই একএকজন
বেল-পুলিশ-কর্মচারী থাকিতেন, অস্ত্র স্বয়ং সর্বপ্রধান
কর্মচারীই ছদ্মবেশে যাইতেছিলেন।

চোর ফাটরাশের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, সাহেব তাহার
ভাব দেখিয়াই সন্দেহ করিলেন,—সদৌদিগকে বলিলেন,
• “এ নিশ্চয় হুট্‌ লোক—নামিয়া পড়!”

চোর ধীরে ধীরেই যাইতেছিল, তখন সে গুড়নাখানি
খুলিয়া ঘাড়ে লইয়াছে, সম্পূর্ণ পুরুষ-বেশ। সাহেব
নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহার দুইজন সঙ্গী গিয়া
দম্কাকে চাপিয়া ধরিল।

“কে রে?—কেন আমার ধরিল?” চোর বলিল। দুই
হইতে সাহেব তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন “উহার পরিচয়
না লইয়া ছাড়িও না!” চোর বিলম্বিত বুঝিল যে এইবার
তাঁহার সমুদ্র বিপদ উপস্থিত। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে ছুরি টানিয়া
একজনের বাহুতে বিদ্ধ করিয়া দিল!—

তখন চাঁদেব আলোয় সমস্ত পরিষ্কার দেখা
যাইতেছিল,—আহত সিপাহী ঈকিল “হুজুর! আমার
খুন করিল!” সে আহত তবু চোরকে ছাড়ে নাই, দম্কা
আবার তাহার স্বন্ধে আঘাত করিল। এইবার সে
ভূপতিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়া চোর দৌড়
দিল।

সাহেব তখন উচ্চকণ্ঠে—“পুলিশ-পুলিশ-কুলি!” বলিয়া
ডাকিতেছিলেন।—চোর পলাইতে পারিল না অল্পদূরেই
কএকজন পুলিশ ও কুলিতে তাহাকে ধরিল।

মুহূর্ত মধ্যে ক্ষুদ্র ষ্টেশনটি কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল। গাড়ী থামাইয়া গার্ড ও ষ্টেশনমাষ্টার সেইখানে আসিলেন। চোরের নিকট গহনাপূর্ণ বাক্স পাওয়া গিয়াছে—তাহা কোন্ আরোহীর সর্কাগ্রে তাহাই অন্বেষণ আবশ্যক।

অল্পসময়ের মধ্যেই জীলোকদের কক্ষের ভীষণ অবস্থা জানা গেল এবং অল্পসন্ধান করিয়া ঐ জীলোকদের অভিভাবককেও পাওয়া গেল।—জীকন্টার ছদ্মশা দেখিয়া গোবিন্দবাবু বেন উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। তিনি মাথা কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—“দোহাই ছক্কুর! আপনারাই বিচার করুন, আমার যা সর্বনাশ-হল তার উপায় আপনারাই করুন।”

সাহেব বলিলেন, “নিশ্চয়!” পরে দল্ল্যব দিকে চাহিয়া বলিলেন “তোমার কিছু বলিবার আছে?”

সে উত্তর দিল না, ক্রুর দৃষ্টিতে আহত চাপরাশীর প্রতি চাহিয়া অস্ত্র দিকে মুখ ফিরাইল। গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “ও আব বলবে কি আমার মাথা!—মেয়েটাকে যা চোট দিয়েছে—হাতখানা ভাল হলে বাঁচি,—আইবড় মেয়ে—তাতে অমন হয়ে হাত কেটে গেল—এই বিপত্তি, কি করে যে কি হবে ভাও ত বুঝি’ না!”

ততক্ষণ সাহেব তাঁহার পার্শ্ববর্তী একজন পুলিশ-পরিচ্ছদধারী বাঙ্গালী বাবুর সহিত কি পবামর্শ করিতে ছিলেন,—তাহার পব ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া ও সম্মোচিত উপদেশ দিয়া গোবিন্দ বাবুকে বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই বাবু! আমি তোমার বিষয় সমস্ত ইহাদিগকে বলিলাম, বাহা কর্তব্য সমস্তই হইবে—তুমি কোন ভাবনা করিও না!”

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “তবে আমার গহনার বাক্সটা আমার দিতে ছক্কুর হোক—এই ট্রেনেই আমি বাড়ী যাব।”

“পাইবে—পাইবে”—বলিতে বলিতে সাহেব গিয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন, চাপরাশীকে লইয়া আর দুই জন লোক অস্ত্র কক্ষে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

গাড়ী চলিতে দেখিয়াই গোবিন্দ বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“আঁ, হল কি? গাড়ী যে চল!—আমার জী পলিবার সব থেঁ চল—”

বাধা দিয়া সেই বাঙ্গালী ইন্সপেক্টর বলিলেন—“না

না—তাও কি হয়? তাঁরা ও পাশে নেমেছেন, আপনার জী আর মেয়ে ত বড় অসুস্থ—তাঁদেরকে রীতিমত ডাক্তার দেখাতে হবে—তা ছাড়া”—

“এই বনগাঁয়ে আবার ডাক্তার কোথা পাব? থাকবেই বা কোথা?—কেন মশাই আপনারা সুস্থ আমার পিছনে লাগুনেন বলুন ত?—এক ত ভগবানই মেয়ে দেখেন—তার উপর এ পুলিশের হাঙ্গামা—আমি এখন করি কি?”

গোবিন্দ বাবুর কথায় হাসিয়া ইন্সপেক্টর বলিলেন, “এতবড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, মামুষের প্রাণ নিয়ে টানটানি—এর পর আপনার সমস্ত বজায় থেকেও যে কেবল এই হাঙ্গামটুকু মাত্র পোহাতে হবে এ ভাবনার কাতর হলে চলবে কেন মশায়?”

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন,—“এখানে আর কেন, চলুন এ খুনেটার একটা বন্দোবস্ত করে এঁর মেয়ে ছেলের সব এঁর জিন্মা করে দিতে হবে।”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন—“গাড়ী ত চলে গেল, আমি এখন মেয়ে ছেলে নিয়ে যাই কোথা বলুন ত?”

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন, “তা আমি কি করে জানব?—খানিকক্ষণের জন্ত ষ্টেশনেও থাকতে পারেন অথবা গ্রামে”—

ইন্সপেক্টর হাসিয়া বলিলেন, “গ্রামের কথা ছেড়ে দিন—এই ত গ্রাম!”

সকলে আসিয়া ষ্টেশনে উঠিলেন। ক্ষুদ্র ষ্টেশনে কিছু মাত্র আড়ম্বর নাই,—ঘরও বেশি নাই,—ষ্টেশনের একখানি ঘরে এক পাশে ষ্টেশনমাষ্টারের জী থাকেন—সেই ঘরের সম্মুখে গোবিন্দবাবুর পরিবারেরা বসিয়া ছিলেন।—মন্সার মার চৈতন্ত হইয়াছে, তিনি শুইয়া শুইয়া কাঁদিতেছিলেন,—মন্সার আহত হাতখানিতে কে একটা জলপটি বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হয় নাই, যন্ত্রণায় তাহার মুখ নীল হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি ভাবিয়া সে নীরবে তাহা সহ করিতেছিল, রক্তে তাহার কাপড়ের অর্ধেকটা রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে—সে বার বার তাহাতেই হাত মুছিতেছিল।

কপাট একটু খুলিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের জী বসিয়া ছিলেন এবং মন্সার সহিত মুহু স্বরে কথা বলিতেছিলেন। এমন

সব্ব সময়ে আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন।—ষ্টেশন-মাষ্টার পত্নী ঘাব রুদ্ধ করিলেন।—মন্দা বীবে বীবে সরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল—তাহাব জননী কাদিয়া উঠিলেন।

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “এখনি কান্নার হয়েছে কি?—এখনও যে কতটা ভোগ বাকী আছে তাত জানই না!—খুব মেয়ে বিয়ে দিতে এসেছিল—এখন এই রাস্তার ছেলে গিলে নিয়ে চল বুনো ঝাঁপতালদের বাড়ী—মাথা জঁজ্বার ঠাই ত একটা চাই?... আসবার সময় যখন বাধা পড়েছে, রক্তারক্তি হয়েছে, তখন জানি একটা বিষম অমঙ্গল হবে” ..

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “সেসব কথা পরে হবে, এখন আগে দেখুন আপনাব মেয়েব হাতে কতটা আঘাত লগেছে। রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে।”

“রক্ত?—বস্ত্রের কথা আর বলবেন না;—রক্ত দেখেই আজ যাত্রা কবেছিলাম—তাই পথে এ বিপদ ঘটল।—আব এট মেয়ে!—হিঁদুর ববে মেয়ে যে কি কাল হয়েই জন্ম নেয়—সে বাব মেয়ে হয় সেই জানে।—কি রে মন্দা!—কতখানি কেটেছে বগ ত?”

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন, “না না আঘাত নিশ্চয় বেশি নয়, বেশ বসে আছে, বেশি হলে ছেলে-মানুষ কেঁদে অস্থির হত!—তা আপনি ইচ্ছে করলে ডাক্তারবাবুর বাসাতেও গিয়ে দেখাতে পাবেন।—এই কুলি!—বাবুকে ডাক্তারবাবুর বাসা দেখিয়ে দিস!”—পরে ইন্সপেক্টরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন “চলুন আশুবাবু! ততক্ষণ আমরা চৌবটার বন্দোবস্ত করে ফেলি।”

আশুবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, “তার আর বিশেষ কি করব? এই আসছে প্যাসেঞ্জারে ওকে বাজমহলে চালান দিতে হবে। চারজন কন্স্টেবল আছে তার কাছে! ভয় কি?”—

ষ্টেশনমাষ্টার বলিল—“না না! বড় ভয়ানক লোক সে! তাই সাবধান হতে বলছিলাম!—দেখলেন ত হু-হুজন লোককে খুন করবার চেষ্টা কবেছে!”

“যা করেছে তা করেছে আর করতে হবে না! এইবার বাছাধন টের পাবেন!—কিন্তু এ ভদ্রলোকটির এখন কি উপায় হয় বলুন দেখি?”—পরে মুহু হাসিয়া অতি মুহু স্বরে

বলিলেন—“ডাক্তার যে এই রাস্তার বেয়েবে তা ত বুঝতেই পারছেন?”

“তা আমিই বা আর কি করব মশায়?”—ষ্টেশন-মাষ্টারের মুখ অপ্রসন্ন। আশুবাবুও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দবাবু এতক্ষণ কজ্জার ক্ষত দেখিতে ছিলেন—এইবাব বলিলেন “না, এ রক্ত সহজে বন্ধ হবে না।—মেয়ে আবার বাহাহুরী করে গাড়ী ধামাতে গিয়েছিলেন!—বেশ হয়েছে। একরাস্তি মেয়ে গিয়েছে ডাকাতের সঙ্গে টক্কর দিতে? যেমন ক’রু—”

তখন কিস্ কিস্ করিয়া মন্দার মা বলিলেন, “তুমি কি বলচ?—রক্ত পড়ে মেয়েটা খুন হয়ে যাচ্ছে আর তুমি এলে তাকে বক্তে?”

“বক্ত কেন?—কি বললাম?—কিন্তু আমি কি করব তাই আগে বল।”

“কেন? একটু চিনি কি দু ফোঁটা সর্ষের তেল হলেও কতকটা রক্ত পড়া বন্ধ হয়। জাখনা কোথাও যদি—”

“চিনি?—রাস্তার ত কোথাও ভিক্ষেও মিলবে না চুরি কর্তে যেতে হয়।”

মন্দার মা বলিলেন “কেন? এখানে দোকান নেই?”

তখন সহসা ব্যগ্রভাবে গোবিন্দবাবু বলিলেন—“ঠিক বলেছ। ও মশাই! কি আপনার নাম!—আশুবাবু হাঁ ও আশুবাবু! আমার হাতবান্সট দিন মশায়!—আমার সমস্ত টাকা কড়ি সব এতেই আছে।”

আশুবাবুর মুখে একটা বিষম হাসি দেখা গেল—দীর্ঘ স্বরে তিনি বলিলেন “বান্স?—এ বান্স—দেখুন গোবিন্দ বাবু! রাস্তামত এন্কোয়ারার পূর্বে এ বান্স ত আপনাকে দেওয়া হবে না। এ বান্স নিয়ে এখন ঢের গোল”—

গোবিন্দবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—“কি?—বান্স আমি পাব না? অ্যা বলেন কি! হাঁ বান্স যখন চোরের হাত থেকে পুলিশের হাতে গিয়ে পড়েছে তখন ও বান্স আর পেতে হবে না তা ঠিক জানি।”

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন—“পাবেন বৈ কি নিশ্চয় পাবেন।—কিন্তু আজই—এখন”—

গোবিন্দবাবু বলিলেন—“বুঝেছি বুঝেছি—আর বলতে হবে না।—পুলিশের হাতে জিনিস পড়লে তাব খালাসেই

উপায়—তা আমার না জানা নয়।—কি করব বাবা! হাতে আব ফানা কড়িও নেই যে তোমাদের পূজা করি।”

আন্তাবু কিরংকাস নির্ভাক থাকিয়া বলিলেন,—
“আমাকে এতটা ছোট লোক ভেবে নিচেন কেন? আমার যদি কোন ক্ষমতা থাকত তবে আপনাব এই অবস্থা দেখে—বাক সে কথা পবে হবে এখন”—

‘এখন তবে আমি করি কি?—ছেলে মেয়েব হাত ধরে ভিক্ষে না গেলে ত একটু ছুনও মিলবে না।—দাঁড়াই কোথা—ডাক্তার না হয় চুলোর গেল।’—এই সময় সমুখের ঘরের দরজা খুলিয়া একটি ছোট মেয়ে বাহিরে আসিয়া বলিল “মা এই চিনি পাঠিয়ে দিলেন—আর বলেন”—

ষ্টেশনমাষ্টার গুনিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া উগ্রস্বরে বলিলেন—“কি বলেন তোর মা?—ভারি ত ইরে হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।—চল—” বলিতে বলিতে তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া হাঁকিলেন—“হ্যাঁ গা।”—

আর কথা শোনা গেল না। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাঁহাদের মধ্যে মুহূর্ত্তের কোন বচসা চলিয়াছে—এবং কংকাল পবেই সপক্ষে গৃহঘাবে অর্গল বদ্ধ হইল।—আন্তাবানু মুহূর্ত্ত হাসিতে লাগিলেন।

মন্দার মার এতক্ষণও আশা ছিল যে ষ্টেশনমাষ্টারের জীৱ নিকট স্থান পাইবেন কিন্তু এইবার নিবাস ভাবে নিবাস ফেলিয়া বলিলেন, “নেহাতই পথে দাঁড়ান অদৃষ্টে ছিল, হা ভগবান।”—

গোবিন্দবাবু আন্তাবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—
“সকালের এদিকে কি আর ট্রেন আছে বলতে পারেন?—
মেল—মেল বুঝি ভোবেই আসে—না?”—

এই সময় মন্দা মাতার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—“হাতটা বেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে মা।”—

গোবিন্দ বাবু গুনিতে পাইয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—
“বেশ হচ্ছে! ফের যদি গোল করেছিস ত তোর ভাল হবে না মন্দা।”—

পিতার মুখতন্ত্রী দেখিয়া বালিকা চুপ করিল—তাহাব চোখে জল আসিয়াছিল। তাহার মাতা বলিলেন, “কেন তুমি ওকে অমন কর বলত?—ওর যা হচ্ছে তাওই জানছে। কিন্তু মেয়ে হ’লে এতক্ষণ হাট বসিয়ে দিত!—বাও—তুমি

একটু জল নিয়ে এস—আমি চিনি বেধে দিই।”—মন্দা আর থাকিতে পারিল না।—“এমা আমাব হাত খসে গেল মা।—আর আমি পাবছিনে গো।” বলিয়া মুক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।—

গোবিন্দ বাবু হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া ছিলেন।—দৃঢ়স্বরে আন্তাবাবু বলিলেন—“আমার বাসা এই কাছেই—মেথানে আমি একলা থাকি; কোনো জীলোক পরিবার মেথানে নেই; তাই আমি বলতে এতক্ষণ ইতস্তত করছিলাম, মনে করেছিলাম, ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরেই আপনারা আশ্রয় পাবেন। তা যদি ইচ্ছে করেন ত আমার বাসাতে আশ্রয় পাবেন।”—

চমকিত ভাবে গোবিন্দ বাবু বলিলেন—“ইচ্ছে করি ত?—বলেন কি মশায়!—আপনি কি সত্যি এতটা দয়া করবেন?”

হাসিয়া আন্তাবাবু বলিলেন—“এ আর দয়া কি বলুন? এতবড় বিপদগ্রস্ত আপনি—এ সময় যদি—একটু স্থানও দিতে না পারি”—

“একটু স্থানই আর ক’জন দায়?”—বলিয়া গোবিন্দ বাবু ষ্টেশনমাষ্টারের দ্বাভের দিকে চাহিলেন।

আন্তাবাবু হাসিয়া বলিলেন—“বেতে দিন সে বখ।—আপনারা আমার সঙ্গে আছেন—এই পথ দিয়ে বাইরে চলুন আমি চোরটাকে একবার দেখেই যাচ্ছি।”—

পথে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন আন্ত একজন জীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া বলিলেন—এ আমাদের মালীর জী—আমাদের ব্যতীতে ত জীলোক নেই—আর আপনার জী কত্নাও কাতর—তাই—”

“বেশ করেছ বাবা—বেশ করেছ! তুমি দেবতা—”

আন্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন—“বটে।—আচ্ছা, মনিয়ার মা—তুই এদের নিয়ে আমার বাসায় যা।—পাঁচুকে বলিস—সে বিছানা টিছানা ঠিক করে দেবে... ..আমি ডাক্তার বাবুকে নিয়ে শীগগীর যাচ্ছি।”—

তিনি চলিয়া গেলে চলিতে চলিতে মন্দার মা বলিলেন—“আহা, এ ছেলোট কে গা?”—

“পুলিশ। কিন্তু সত্যি বড় ভাল লোক,—পুলিশ যে এমন হয় তা আমি জানতাম না।”—

আশুবাবুর বাসাটি ছোট-কিন্তু পরিষ্কার; লঠনের বাতি নামাইয়া তাঁহার ভৃত্য প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া চুলিতেছিল, নূতন অভ্যাগতদেব দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কাঁহাকেও অভ্যর্থনা করিল না। তাঁহার বাবান্দা-তেই বসিলেন।

অলক্ষণের মধ্যেই আশুবাবু ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ডাক্তার মন্দার হাতের অবস্থা দেখিলেন!—“কোন আশঙ্কা নাই। তবে আঘাত কিছু গভীর ও অনেকক্ষণ ধরিয়া রক্তপাত হইয়াছে সেইজন্য রোগী বড় দুর্বল হইয়াছে—তাঁহার শুষ্কতা আবশ্যক” বলিয়া হাতে ঔষধ দিয়া বাধিয়া দিলেন।

গোবিন্দ বাবু মুহূর্ত্তেরে আশুবাবুকে বলিলেন, “ডাক্তার ত ডাকলেন—কিন্তু ভিজিট? আমার কাছে যে—”

বাধা দিয়া আশুবাবু বলিলেন, “সে কথা এখন কেন? আমার বাড়ীতে যখন এয়েছেন”—পরে হাসিয়া বলিলেন, “চলুন মেয়েটির রক্ত বন্ধ হল কিনা দেখি।”—

সে রাত্রি নির্ঝঞ্জে কাটিল কিন্তু সকালেই দেখা গেল মন্দার জ্বর আসিয়াছে,—হাতেও খুব ব্যথা, দেখিয়া মন্দার মা হতাশ ভাবে স্বামীকে বলিলেন—“এইবার ত বিষম বিপদ! এখন কি করা যায়?”—

“আমায় কেটে লুন লজ্জা দিয়ে খাও!..... পরশু বিয়ে—আর আজ এই বনে আমরা গড়ে রইলুম—গহনার বাস গেল.....সব গেল।”—

মন্দার মা বলিলেন—“বরেরা কি ভাববে? অ্যা? একটা উপায় কিছু ঠাওরাও।”.....

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “আমাকে আর একটি কথা বলোনা বলছি!—থাকবে মেয়ে নিয়ে পড়ে—আমার যে দিকে ছটোখ্ থাকবে চলে যাব তাহলে।”—

সে ভয়ে মন্দার মা নীরব হইলেন।—অনতিদূরে আশুবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন—“এক কাজ করুন,—বরপক্ষকে একখানা টেলিগ্রাম দিন যে এই অবস্থা—তাঁহার যেন লগ্নটি আর কিছুদিন পিছিয়ে দে! ততদিনে আপনার মেয়ে ভাল হয়ে উঠবেন।”—

“ততদিন? কতদিন?—গহনা ফেরত পাব ত ততদিনে?”

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন,—“গহনা? তা ঠিক বলতে পারছি—কিন্তু তাতে আর কি—পাবেনই যখন তখন আর কথা কি?”

শুক হাতের সহিত মুখভঙ্গি কবিতা গোবিন্দবাবু বলিলেন—“কথা?—যথেষ্ট কথা আছে। সে বরের বাবা এমন লোকই নয় যে যা পণ করেছে তার একপয়সা কমে মেয়ে নেয়! এ গহনা ফেরত না পেলে মেয়ের বিয়েও বন্ধ!”

আশু কি ভাবিতেছিলেন।—মন্দার মাতা দূর হইতে দেখিতেছিলেন এই পুলিশের বাবুটির বয়স বেশি নয়—মুখখানিও অত্যন্ত মৃদু—তাঁহাকে দেখিলে লজ্জা না হইয়া কলং স্নেহই জন্মায়!—তিনি ঈশ্বর ঘোমটা টানিয়া নিকটে আসিয়া আশুবাবু ছুটি হাতে ধরিয়া বলিলেন, “তুমি মনে করলেই ফিরে দিতে পাব বাবা!—গবীবদের উপর একটু দয়া কর—ভগবান তোমার ভাল করবেন।”—

সসজ্জমে মাথা নীচু কবিতা আশুবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন,—চকিত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“সে কথা আপনাকে বলতে হত না মা!—আমার যদি—সাধ্য থাকত তবে—কিন্তু তা ত হবার জো নেই—এই বাক্স মহকুমায় যাবে... হয় ত জেলাতেও তলব হতে পারে—গোবিন্দবাবুকেও কিছু বেগ পেতে হবে—তবে গহনা ফেরত পাবেন নিশ্চয়। এখন আর কোন উপায় নেই।”

আশুবাবু নীরব হইলেন। মন্দার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। গোবিন্দবাবু বলিলেন, “ও মেয়ের বিয়ে খাওয়া সব চুকে গেছে গো? কি আব ভাবছ ছাই?—ও মেয়ে চিরকাল খুবড়ো হয়েই থাকবে... ও মেয়ে কি কম অলক্ষণে.....তা যাত্রার সময়ে রাস্তারজি দেখেই বুঝেছি..”

মন্দার মা গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“মা চণ্ডী, তোমার মনে এই ছিল মা।”—

আশুবাবু বলিলেন, “এখন হতাশ হলে চলবে কেন? এখন প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বরপক্ষকে একটা খবর দেওয়া—তাঁরা হয় ত প্রস্তুত হবেন—খামোখা ভদ্রলোকদের হায়রান্ করা কেন?—ঠিকানাটা বলুনত দেখি তাঁদের, একটা তার দিয়ে আসি?”.....

মন্সার মা বলিলেন,—“তার চাইতে ও বাড়ীর মেজ খুঁড়খুঁড়কে তার দিলে ভাল হয় না গা ?”—

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “তিনি আর কি করবেন ?”—

“কেন ? বরের বাপের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে— বলে করে যদি দিনটে ফিবিয়া দিতে পারেন !”—

ষাড় নাড়িতে নাড়িতে গোবিন্দবাবু বলিলেন—“তোমাদের যাখুঁসি কর—কিন্তু গহনা না পেলে কিছুতে কিছু হবেনা জেনো ।”—

আন্তবাবু বলিলেন,—“গহনা ত পাবেনই !—এখন ঠিকানা ছুটোই দিন,—বিপদের কথা সকলকেই বলা ভাল ।—যদি আপনাব আত্মীয়রা কেউ আসেন বা কিছু—”

বিকৃত হাসির সহিত গোবিন্দবাবু বলিলেন—“সে শুড়ে বালি !—আমার আত্মীয়রা তেমন কাঁচা নন ।”—তথাপি আন্তবাবু ছাড়িলেন না,—ঠিকানা লইয়া চলিয়া গেলেন ।—দিনমানে তাঁহার অবসর নাই তথাপি দুই-তিন বার আসিয়া মন্সার খবর লইতেছিলেন । ডাক্তার বলিলেন “যদিও কোন ভয় নাই তবু আরোগ্য হইতে প্রায় দশবার দিন লাগিবে ।”—

পরদিন দুইখানা টেলিগ্রামেরই উত্তর আসিল ; বরের পিতা লিখিয়াছেন “তাঁহাব পুত্রের গাত্রহস্তি হইয়াছে—এবং অস্ত্র কস্তা স্থির করিয়া কলাই বিবাহ ।” আর কোন কথা নাই ।—

শুনিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন,—“দেখলে আমি ত বলেছিলাম যে তার তেমন পাত্রই নয় !—কস্তার ত আর অভাব নাই—যেমন একটা ছেড়েছে অমনি দশটা লাফিয়ে পড়েছে !—তারের আর ভাবনা কি ?—থাকলেন এই মন্দাই—বুড়ো মেয়ে—আবার কোথায় বর পাব—কি কষ্ট—কত কষ্টে এটা হয়েছিল তা ত জানই !”—

মন্সার মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“আগে মন্দা বাঁচুক ত ঢের বর মিলবে !”—

“মরবে ? কে ?—সেদিকে নিশ্চিন্ত থাক—বাকালীর ঘরে মেয়ের কিছু হয় না ।”—

মুহুর্গমে তাঁহার পত্নী বলিলেন, “তোমার কথা শুনে আমার সর্দীজ জলে যায় !—নিজের মেয়ে—ও সব

বলতে তোমার কি একটুও ব্যথা হয় না ?—যিনি স্রীব দিয়েছেন—”

“সেই ভেবেই তবে চুপ কবে থাক !—তিনিই তে-নার মেয়ের বর খুঁজে দেবেন !—আমাকে ধরে যদি কব জামালপুর আর বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান আর জামালপুর—দৌড় করিয়েছ ত জানবে তখন ।”—

মন্সার মা আর কোন কথা বলিলেন না,—বিস্ত্রিপূর্ণ মুখে ছেলোটিকে তেল মাখাইতে লাগিলেন । আন্তবাবু চাহিয়া দেখিলেন অনতিদূরে শায়িত ক্রপা বালিকার মুদিত চক্ষু বহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে !—পাঁচ চাকর তখন ডাকিতেছিল, “মা ঠাক্কন, আখার জাল বয়ে যাচ্ছে—শীগগির আসুন ।”—

গোবিন্দবাবু বলিলেন “দেখুন আন্তবাবু !”—কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—আন্ত চলিয়া গিয়াছেন ।—

পাঁচ দিনে মন্সার জব ত্যাগ হইল ।—ইতিমধ্যে গোবিন্দবাবু জামালপুর গিয়া আবশ্যকীয় খরচপত্র আনিয়া-ছিলেন—কিন্তু আন্ত কিছুই লইতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন “আপনারা আমার অতিথি, অতিথির কাছে কিছু লইলে আমার পাপ হইবে, আমি হিন্দু !”—

মন্সার মা সবিস্ময়ে দেখিতেন এই অপরিচিত যুবক তাঁহাদের প্রতি যে যত্নসমাদর করিতেছে তাহা ভ্রাতৃত্ব হৃদয়ের সহিত ও তাহা আত্মজনের নিকটও বিরল ।—তিনি দিনে দশবার করিয়া তাহাকে—“ভগবান তোমার ভাল করবেন বাবা ।” বলিয়া শুভবাচন করিতেন, আন্ত মুহু হাসিতেন ।

আরও তিন দিন চলিয়া গেল ।—সেদিন আন্তর আপত্তি অগ্রাহ করিয়া ডাক্তারের সঙ্গে অনেক যচসার পর পোনেব টাকা ফি ও বার টাকা ঔষধের মূল্য দিয়া গোবিন্দবাবুর মেজাজ অভ্যস্ত বিরক্ত, প্রায় বারটার সময় আন্তর সহিত বাঁটা আসিয়া দেখিলেন, মন্দা বসিয়া রুটি খাইতেছে—ও তাইটিকে একটু একটু খাওয়াইতেছে ।—পিতাকে দেখিয়া আরোগ্য ভ্রাতের আনন্দে বালিকা মিষ্ট হাসিল, বালক বলিল—“বাবা দিদি উঠি খাচ্ছে ।”

“আমার স্বর্গে তুলছেন তা’ হলে ।”—তাঁহার মুখে স্পষ্ট

বিবস্ত্রি।—জীকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভাত দাও ত,—
বারটা বেজে গেছে।”—

মন্দার মা জানিতেন যে তাঁহার স্বামীর সকাল সকাল
খাওয়া অভ্যাস—কিন্তু পরের বাড়ীতে ও রুগ্না কস্তার পথ্য
দিতে আজ কিছু বিলম্ব হইয়াছে,—বাগ্রভাবে বলিলেন,
“এই যে ফেন গড়াচ্ছি! বস তোমরা...আমি এই
চললাম”—

গোবিন্দবাবু যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন,—“ভাত হয় নি
তা আমি আগেই বুঝেছি।—রাক্ষসী মেয়ের উদর টাইটুয়
কবে না ভবে ত আর কাক ভাত পাবার উপায় নেই—
এখন বল ত শুনি কতক্ষণ বসতে হবে।—ভদ্রলোকের ছেলে
আশুবাবু—তোমার দায়ে তাঁরও পিড়ি চুঁইয়ে গেল”—

আশুও তাঁহাদের স্বজাতি,—এ কয় দিন তিনিও
মন্দার মার রান্নাই খাইতেছেন। তাঁহার পাচক কনষ্টেবলটি
জল তোলা, বাজার করা প্রভৃতিতে ব্যস্ত ছিল। গোবিন্দ
বাবুর কথায় বাধা দিয়া তিনি বলিলেন—“আমার জন্তে
ভাবনা কেন করছেন, আমার খাবার কোন সময় বাধা
নেই—যেদিন যখন জোটে খাই, কোনো দিন বা জোটেও
না।”—

“দায়ে পড়েই জোটে না!—নে তোর খাওয়া হল মন্দা?
—টাইটুকুও ত জুড়ে বসে আছ!”—মন্দার মুখ শুকাইয়া
গিয়াছিল—সে তাড়াতাড়ি—জল খাইয়া থালা তুলিল।
রান্নাঘর হইতে তাহার মা বলিলেন,—“ওকি রে মন্দা!
উঠিছ কেন? এই যে এখনি বসি। আট দিনেও উপোস
—উঠিস নি উঠিস নি।” সত্যি তাহার পাতে সমস্ত আহাৰ্য্য
পড়িয়াই ছিল, কিন্তু সে আব বসিল না থালা হাতে ধীরে
ধীরে কুপের দিকে চলিয়া গেল। ডানহাতে ব্যাগেজ বাধা,
—বাহাতে জলের বটী ও একটু গোময় লইয়া সে উচ্ছিষ্ট
পবিত্র করিতে বসিতেই আশু বলিলেন—“ও আবার
কি?—তুমি এঁটো নিতে এলে কেন?—পাঁচু গেল
কোথা?—পাঁচু—পাঁচু।”—পাঁচু নাই। তখন নিকটে
আসিয়া ব্যগ্রভাবে আশুবাবু বলিলেন—“ছেড়ে দাও, তুমি
জল ঘেঁটোনা।”—“তুই আবার কেন অত করতে গেলি?
এই যে আমিই আসছি।”—বলিতে বলিতে তাহার মাতাও
নিকটে আসিলেন। গোবিন্দবাবু বলিলেন,—“একটু বাহাজরী

ত দেখান চাই? জলটল ঘেঁটে আবার জর আসুক, আর
তুই ব্যাটা ডাক্তারের টাকা গুণে মর।”—

মন্দা আর দাঁড়াইল না।—হাতে জল দিয়া ঘবে ঢুকিল।

আহাবাস্তে পান লইতে গিয়া বিরলে আশুবাবু মন্দার
মাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা গোবিন্দবাবু কি সব
দিনই এমনি বকেন আপনাকে?”—

হাসিয়া মন্দার মা বলিলেন, “বকেন বৈ কি বাবা।—

ওঁর স্বভাবই অমনি।”—

“আর মেয়েটিকে?—তাকেও কি?”—বলিতে বলিতে
আশুবাবু একটা ঢোক গিলিলেন, মুখখানি দ্রব্য বিবর্ণ
হইল।—মন্দার মা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন,
“মেয়েকে?—না মেয়েকে কেন অমন কর্কে সব দিন?
এই বিয়ের কথাব পর—অনেক পণ চেয়েছিল তারা
বাবা।—কতকষ্টে গবীষমাস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম,—
তারপর এই বিপদ ঘটল,—রক্ষ মেজাজী মাস্ত্র—সব
চোট মেয়ের উপরই দিচ্ছে—কিন্তু দেখচ ত বাবা
মেয়ের আমার কোন দোষ নেই!—কি করব ওর
কপালই মন্দ—তা ছাড়া আর কি বলব।—একটা বর
হাতছাড়া হয়ে গেল—এই বিদেশে বাস—তাবনা হয়না মা-
বাপের?”—

আশুবাবু আর কিছু বলিলেন না। পান লইয়া চলিয়া
গেলেন। সন্ধ্যার পর বাসার আসিয়া দেখিলেন গোবিন্দ-
বাবু তখন আরও চটিয়া বসিয়া আছেন।—বৈকালের
ডাকে দেশের চিঠি আসিয়াছে।—দুখ ও সন্দেহের জন্ত
যাহাদিগকে বায়না দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যথাসময়ে সে-
সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিল এবং নষ্ট হইয়াছে—অতএব
তাহাদিগকে মূল্য সমানই দিতে হইবে নতুবা তাহারা
নাশি করিবে বলিয়াছে।—এইরূপ অনেক হুঃসংবাদ দিয়া
গোবিন্দবাবুর কাকা শেষে সেই বরের “শুভবিবাহ জাম্ভা
গ্রামের নরনাথ বাবুর কস্তাব সহিত নির্বিবাদে সন্মপন্ন
হইয়া গিয়াছে।”—লিখিয়া মনুবেশ সমাপন করিয়াছেন।

গোবিন্দবাবুর বকুনি আপ্শোষ ও বিরক্তির আর অন্ত
নাই।—মেয়ের যে আর বিবাহ হইবে না তাহাও তাঁহার
স্থির বিশ্বাস।—মন্দার মাতা বা মন্দা কেহই সেখানে
ছিল না।—আশুবাবু নীরবে ঘরে গিয়া লঠনের আলোকে

কি লিখিতে বসিলেন।—গোবিন্দবাবু তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—আজকালের ছোকরারা লোকের দুঃখ বুঝে না!—তাহার এত কথার লোকটা একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করিল না!—

অন্ধকারের মধ্যেই আশুবাবু বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি ভাঁজকরা চিঠি দিল। গোবিন্দবাবু বলিলেন “কার চিঠি এল আবার! আবার কার কি চাই! আমাকে সবাই কেটে কেটে ভাগা দিয়ে শেষ করে ফেলুক!”.....

আশুবাবু কোনো জবাব না দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোবিন্দবাবু চিঠি খুলিয়া আলোর দিকে ঝুঁকিয়া প্রথমেই নাম দেখিলেন—আশুতোষ রায়!—“তুমি আবার কি লিখেছ আশুবাবু!” আশু তখন দূরে অস্ত্র দিকে চাহিয়া ছিলেন। গোবিন্দ বাবু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন। পাঠান্তে আবার আশুর প্রতি চাহিলেন। খামের আড়ালে তাঁহার মুখখানি অর্দ্ধাবৃত।

তাঁহার নিকটে আসিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন, “এ কি সত্যি আশুবাবু!”

আশুবাবু হুহ হাসিলেন।—গোবিন্দবাবু বলিলেন, “সত্যি কি তুমি মন্দাকে বিয়ে করতে চাও?”

একবার চারিদিকে ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া আশু বলিলেন,—“তাতে আপত্তি কি গোবিন্দ বাবু?—আমিত আপনাদের স্বঘর!”—

“আপনি—বাবা—তুমি ত আমার সব অবস্থাই শুনেছ। এর পরও বিয়ে কর্তে চাও?”

“আপনার অবস্থা ভগবান আপনায় দিয়েছেন—তার উপর আর কথা নাই! তার জন্তে আপনার মেয়েটি ত কোনো অপরাধ করেনি?—আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি আপনার মেয়েকে.....আপনার টাকাকে ত নয়!.....

আপনি আমাকে অতটা ছোটলোক ভাবছেন কেন?”

“ছোটলোক?—দেবতা তবে আর কাকে বলব?”

গুগো—গুগো!—শুনচু?”

রান্নাঘর হইতে মন্ডার মা উত্তর করিলেন, “কাকে ডাকছ—আমাকে?”

পুলকচঞ্চলস্বরে গোবিন্দ বাবু বলিলেন,—“এস—হাঁ—শোনই আগে!”

আশু পুনরায় ধীরপদে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পার্শ্বের কক্ষে মন্ডার কনিষ্ঠা ভগ্নী তখন ডাকিতেছিল—“দিদি ওঠ না, দিদি ওঠ না, একটা গল্প বল আজ! দাই যে সেই গল্পটা বলে! সেই—রাজারে মূল্যকাৎ হয়—ঘর দিয়া বানায়কে!”

সুশীলকুমার পাড়ে।

রূপ ও ধূপ

গুগো রূপ,—অপরূপ!

তোমার দেউলে আপনা দহিল

কত যে স্মরতি ধূপ।

অচল নিঠুর! চরণের মূলে

তবু একবার চাহিলেনা ভুলে,

পড়িল না দাগ কঠোর তোমার

ধাতুর বক্ষ'পরে।

কামনা-উজল বদন তোমার,

কিসের গরব? ধূপ আপনার

পরানের পুত সৌরভ-ধূমে

দিয়েছে মলিন করে'।

ঐ পুড়ে যায়—একটুকু বাকী,

যেল একবার পাষণের আঁধি,

তুলিতেছে শরে লোচন-রাজীব

তা'ও কি অর্ঘ্য নিবে?

হবে না কি দেহে কৃপা-শিহরণ?

বিঁধিছে বক্ষ: কেড়ে প্রহরণ!

হোমানলে ঐ ঘেরিয়া ঘুরিছে

আপনা আহতি দিবে।

গুগো রূপ—অপরূপ!

যেল একবার পাষণ লোচন,

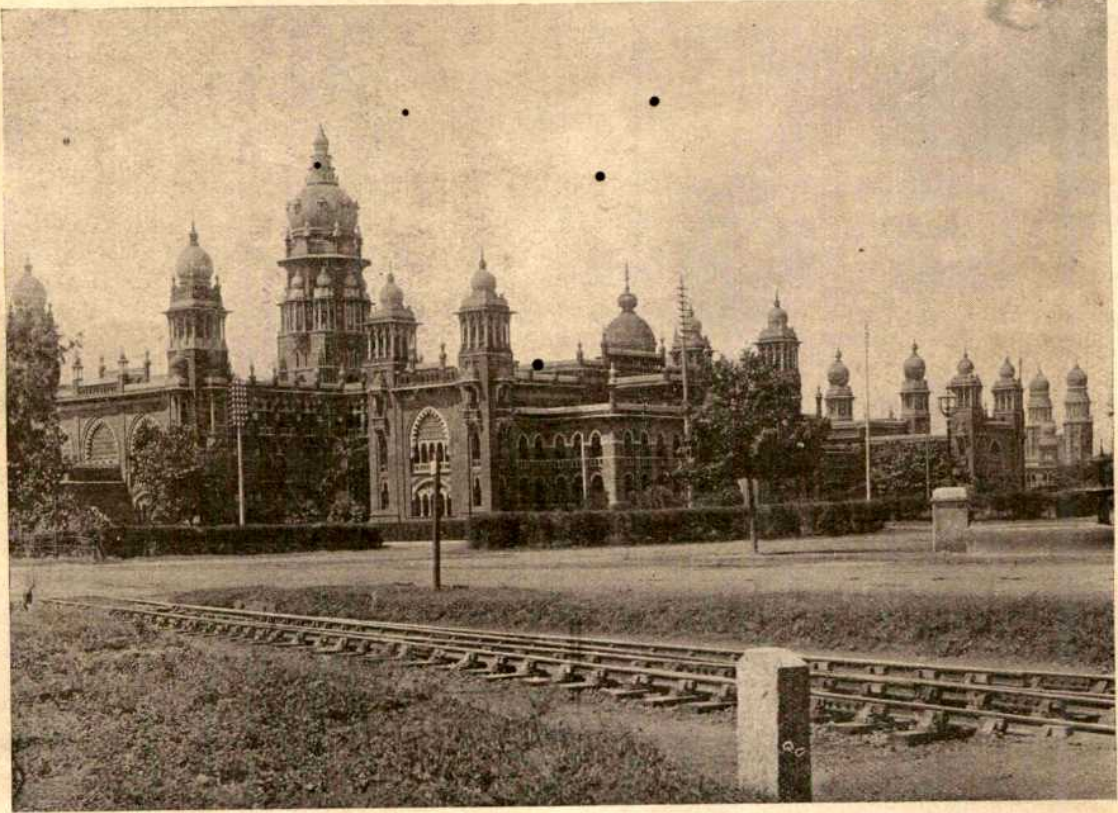
দহে ম'লো কত ধূপ!

শ্রীকালিদাস রায়।

ভারতীয় স্থাপত্যের দাবী

ফাগু'সন-প্রণীত ভারতীয় ও প্রাচ্যদেশীয় স্থাপত্যবিষয়ক ইতিবৃত্তের (History of Indian and Eastern Architecture) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের গৃহাদি নির্মাণে দেশীয় স্থাপত্যের দাবীসম্বন্ধীয় পুরাতন প্রশ্নটি পুনরায় জনসাধারণের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

মৰ্ম্ম প্রণিধান করিতে পারিলে পাশ্চাত্য শিল্পীগণও যে তদ্রূপ স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, ফাগু'সন অকপটে তাহা বিশ্বাস করিতেন। তাই, এদেশে ইহাতে বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এই মত তত্ত্ব বিধানমণ্ডলী ও কলাবিদগণের মধ্যে প্রচার করিতে যত্নবান হ'ন এবং এহেন সৰ্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন ভারতীয় শিল্পকে সজীব রাখিবার জন্য সরকারবাহাদুরকে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে, লর্ড ক্যানিংয়ের সময় আধ্যাবর্তে জেনারেল ক্যানিংহামের

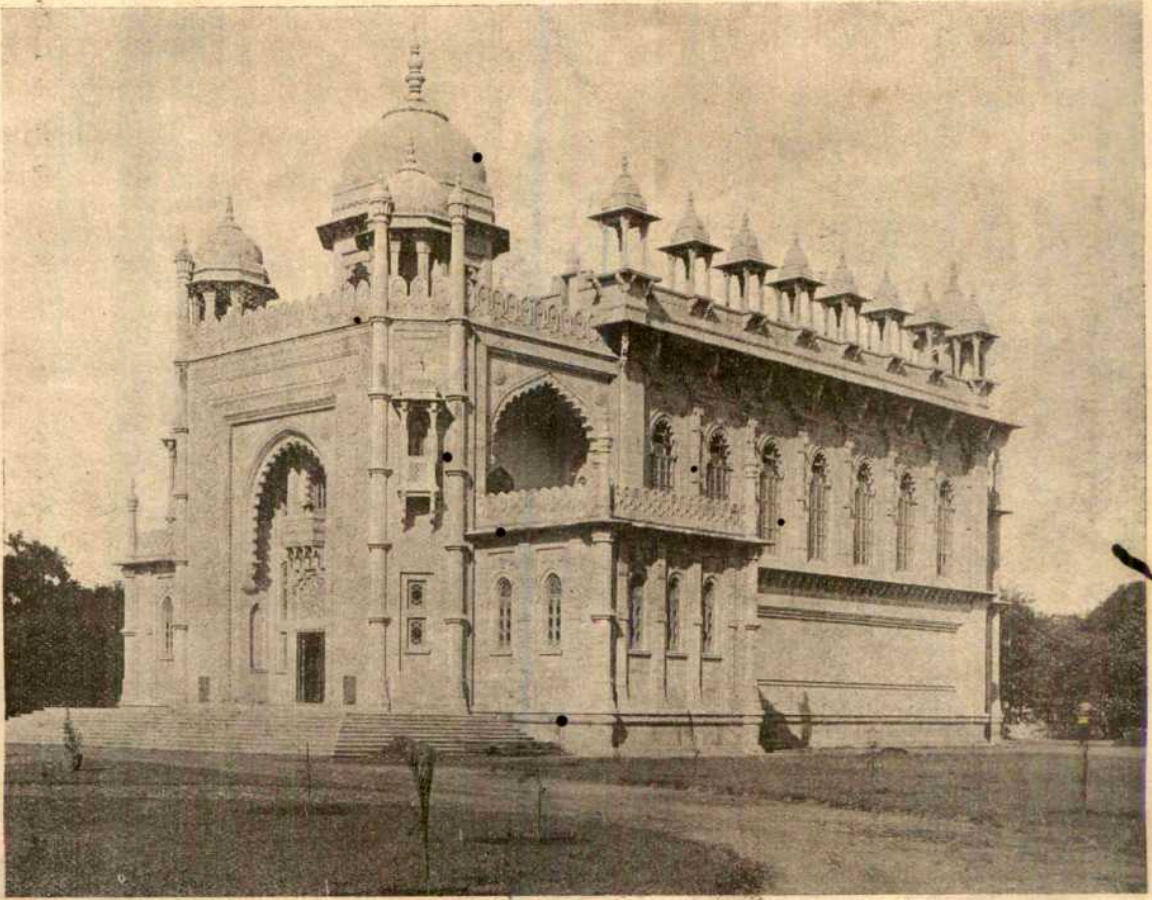


মাদ্রাজ হাইকোর্ট।

ফাগু'সন সাহেবই সর্বপ্রথম এদেশের স্থাপত্যকলার প্রতি অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন; এবং প্রাচ্য সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তমান জনসাধারণের ধর্ম্মমত ও আদর্শের সহিত ইহার সম্পর্ক বিচার করিয়া এই শিল্পটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার মতে ভারতীয় বাস্তুশিল্পের বিভিন্ন গঠনপ্রণালী বিভিন্ন স্থানীয়বাসী রচিত এবং ঐ স্থলগুলির প্রত্যেকটাই বিশেষ ভাবগোতক। ঐসকল স্থত্রে

অধীনে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় পুরাকীর্তিসমূহকে তালিকাভুক্ত ও সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকারবাহাদুর এক ইতাহারও জারী করেন এবং প্রাদেশিক জেলাসমূহে নিয়মিত সার্ভের কার্য চালাইবার আদেশ দেন। পুরাকীর্তিসম্বন্ধীয় এই বিভাগ লর্ড কর্জনের সময় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভারতের স্থাপত্যসম্বন্ধে ফাগু'সনের প্রথম গ্রন্থ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পর অনেকেই তাঁহার



ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-সৌধ, মাদ্রাজ।

পূর্বা অনুসরণ করিয়া এসম্মুখে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
 ঐসকল গ্রন্থে ভারতীয় স্থাপত্যবিজ্ঞানের অশেষ মহিমার
 পরিচয় পাইয়া দেশ বিদেশ হইতে পর্যটকগণ ভারতবর্ষে
 আগমন করেন এবং তাজমহল ও দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধস্তূপ-
 গুলির নয়নাভিরাম কাব্যকার্য্য দেখিয়া শতযুগে প্রশংসা
 করিতে থাকেন। হুঃখের বিষয়, ঐ প্রশংসা-এবং
 'পুস্তকস্থ'ই রহিয়া গিয়াছে—কার্য্যক্ষেত্রে ভারতীয়
 স্থাপত্যের আদর্শ বিস্তার করিবার পক্ষে কেহই কোন
 প্রকার চেষ্টা করেন নাই। এদেশের পাবলিক ওয়ার্কস্
 ডিপার্টমেন্টে তো গৃহাদি নির্মাণে ভারতীয় আদর্শ বর্জন
 করিয়াই কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর
 মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই শহরে সরকারী বা বেসরকারী
 • যেসকল গৃহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, তাহার গঠনপ্রণালী
 পঞ্চদশ শতাব্দীর বা বর্তমান কালের যুরোপীয় আদর্শেরই

অনুরূপ। এই আদর্শ অবলম্বনে গভর্ণমেন্টে প্রচলিত কার্য্য
 করিয়াছেন, কিংবা শানতিজ্ঞ কৰ্ম্মচারিগণের পরামর্শ
 গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। তবে ইহার প্রচলন
 আরম্ভ হওয়ার সময়ে ইহার বিরুদ্ধে কিছুই আন্দোলন
 যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যখন
 কলিকাতার বিবিহালয় মন্দিরটী গ্রীকস্থাপত্যের আদর্শে
 নির্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়, তখন ফাগুসন সাহেব
 ইহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। এ দেশের
 গৃহাদি নির্মাণে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের আদর্শ অবলম্বনের
 প্রয়োজন সম্বন্ধে এক বিচিত্র যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ঐ যুক্তি
 এই যে ভারতীয় বাস্তবিকের আদর্শ মন্দির ও মসজিদাদি
 নির্মাণের পক্ষেই প্রশস্ত; অধিবাসিগণের রুচি ও ধর্ম্মমতের
 পরিবর্তন হওয়ায় বর্তমানে ভারতের গৃহাদি যুরোপীয়
 আদর্শেই প্রস্তুত হওয়া শ্রেয়ঃ। উল্লিখিত যুক্তিটা যে



ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-সৌধের সম্মুখ দৃশ্য ।

কিছুপ ভিত্তিহীন, তাহা পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টেরই কতিপয় যোগ্য কর্মচারী, মাদ্রাজ ও জয়পুরে কয়েকখানি সরকারী গৃহ ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শে প্রস্তুত করিয়া, বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে কয়েকখানি সরকারী আপিসের চিত্র সন্নিবেশিত করিলাম, তাহা হইতেও ইহার অসারত্ব প্রমাণিত হইবে।

যুরোপীয় স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক আর একদল লোকের এ সম্বন্ধে অভিমত আরো অদ্ভুত। ঐ দলের অন্যতম নেতা মিঃ রোজার্স স্মিথ, এফ-আর-আই-বি-এ, মহোদয় বলেন—

‘ভারতীয় স্থাপত্য ভারতবর্ষের আবহাওয়ার পক্ষে উপযোগী হইলেও, ভারতে হুনিপুণ বাস্তুশিল্পীর অভাব না থাকিলেও, এবং ঐ শিল্প স্বভাবতঃই সুন্দর হইলেও—উহার বিরুদ্ধে এই উত্তরই যথেষ্ট যে, উহা



তাঞ্জোরের কালেক্টরী।

বিলাসী ধরণের তো নহেই, উহার মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবেরও আভাস পাওয়া যায় না।'

ভারতীয় শিল্পের তথা-কথিত পৃষ্ঠপোষক লর্ড কর্জেনও এবিষয়ে মিঃ স্মিথের সহিত একমত। ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-মন্দিরের গঠনপ্রণালী নির্ধারণ করিবার প্রস্তাব যখন কর্জেনের নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন তিনি বাকচাতুর্য্যে তাহা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অতঃপর জনৈক অভিজ্ঞ শিল্পীর সহায়তায় এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিকারের সন্ধান লইয়া তদ্বারা ঐ মন্দিরের পরিকল্পনা রচনা করা সম্বন্ধে হ্যাবেল সাহেব যখন তাঁহাকে পরামর্শ দেন, তখন তিনি এই বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করেন যে, 'কলিকাতা যুরোপীয়দের রাজধানী, সুতরাং এখানে ভারতীয় আদর্শে গৃহ নির্মিত হইলে বেমানান হইবে।'

লর্ড কর্জেনের এই কথায় আসল গুণের একেবারেই ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে। যাক্ সেজন্ত আমাদের হতাশাস হওয়ার কারণ নাই। চিরদিন কাহারই সমান যায়না— ভারতীয় শিল্পলক্ষ্যরও চিরদিন এইরূপ ছদ্মশায় অতিবাহিত হইবে না। ইতিমধ্যেই পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্টমেন্ট আপনাদের ভুল কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। বিগত ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে, রয়েল ইনষ্টিটিউট অব ব্রিটিশ আর্কিটেক্ট্‌স্‌এর এক সভায় ভারত-গভর্নমেন্টের

তদানীন্তন স্থাপত্যমন্ত্রী (Consulting Architect) জেম্‌স্‌ র্যান্সাম্‌ ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে পাশ্চাত্য আদর্শের অল্প-যোগিতা প্রমাণ করিতে বাইয়া স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন—

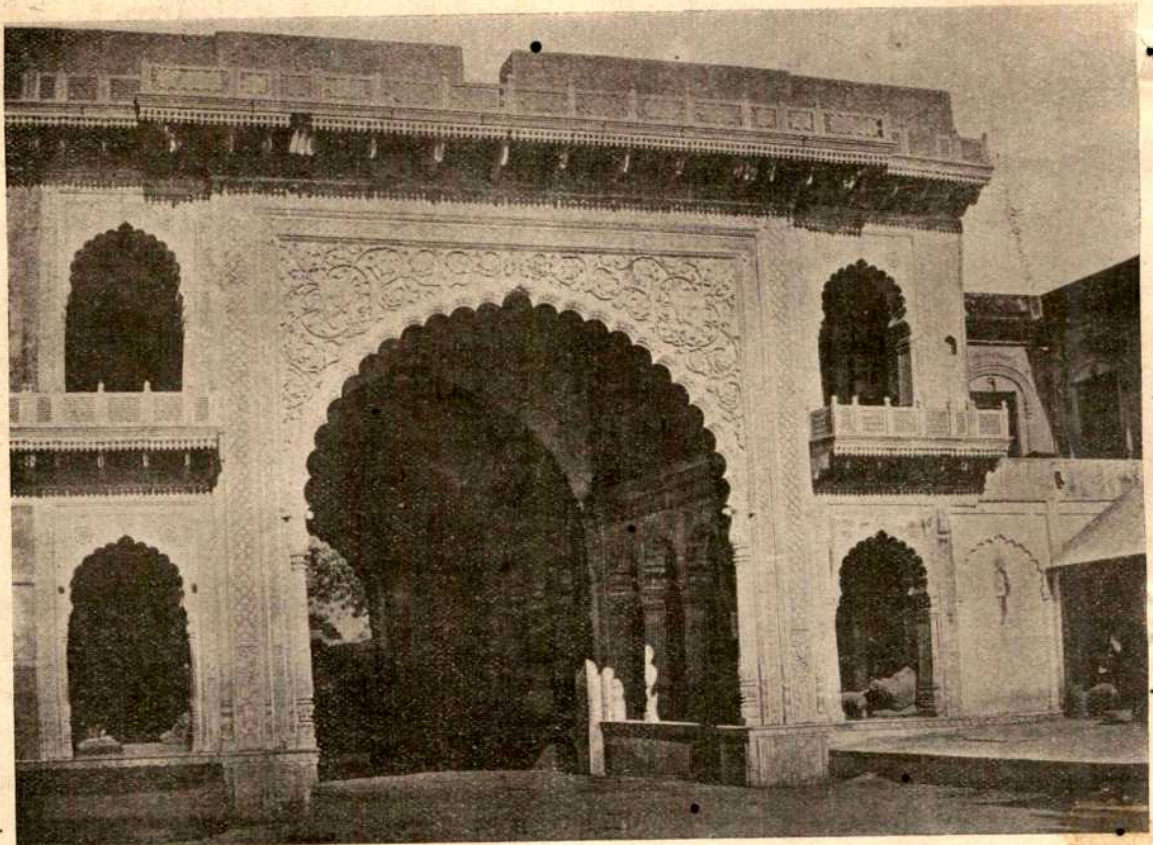
'ভারতের স্বভাব-সুন্দর দৃশ্যাবলীর পার্শ্বে গথিক বা ভোরিক ধরণে নির্মিত গৃহগুলি এমন অসমঞ্জস ও অশোভন দৃষ্ট হয় যে, যাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যবোধ আছে, তিনিই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। এসকল গৃহের গঠনপ্রণালী একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষের বীভৎস রুচির পরিচায়ক, অন্যদিকে পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্টমেন্টেরও দুর্ব্বাসার সাক্ষ্যরূপ। দেশীয় বাস্তুশিল্পের অভাব প্রবৃত্ত ভারতের স্থপতিকার্য্যে পাশ্চাত্য

আদর্শ অবলম্বিত হইয়া থাকে, এ কথা কেহ বলিলে বিষম ভুল করিবেন; কারণ, হিন্দু ও মুসলমানী স্থাপত্যের বহু নমুনা এখনও ভারতের অনেকস্থলে বিদ্যমান আছে। ঐ নমুনা একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির সহিত বেশ মানানসই, অন্যদিকে দেশের আবহাওয়ার পক্ষেও সম্পূর্ণ উপযোগী।'

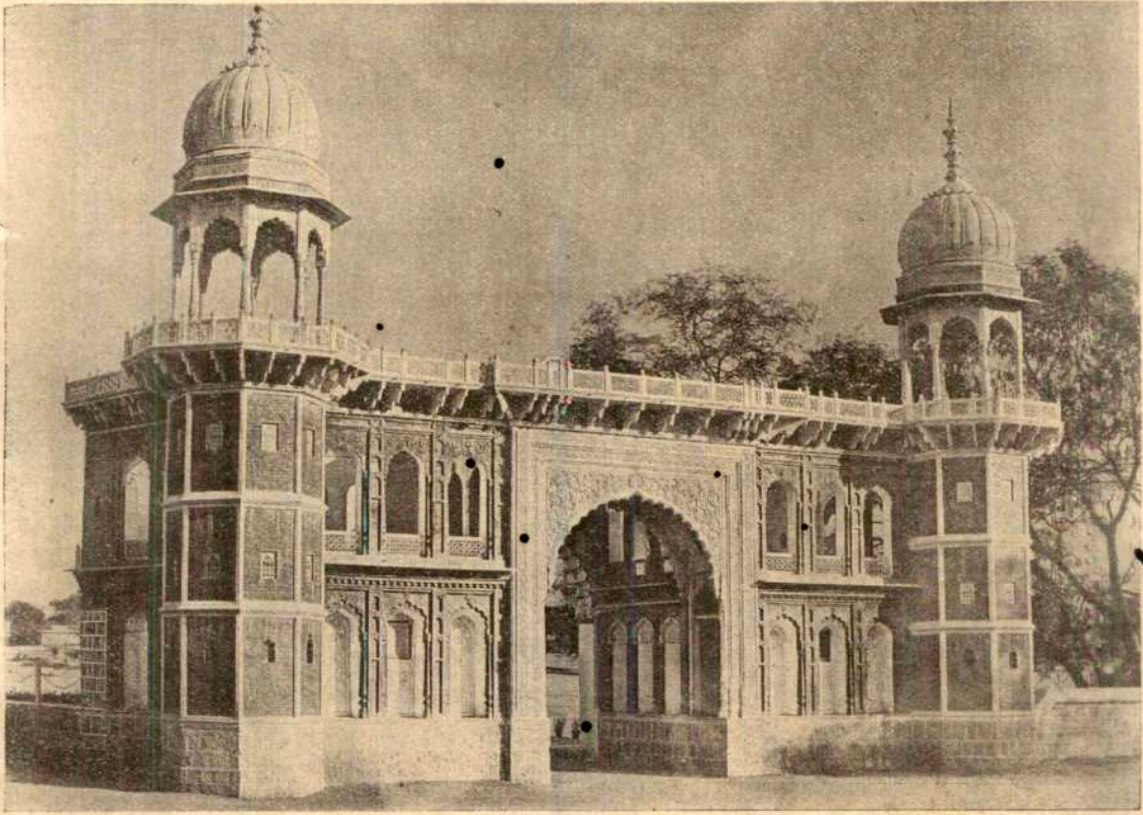
বহুদিনের জড়তাসত্ত্বেও এদেশের কারিগরগণ যে এখনও স্বল্প স্থপতিকার্য্যে নিপুণতা দেখাইতে সমর্থ, এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবলম্বিত হইলে, ভারতীয় বাস্তুশিল্পের আদর্শ যে বর্তমান কালেরও রুচির অনুরূপ হইতে পারে, বহুস্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাসিংটন, আর্ডউইন, হেরিস প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারগণের উপদেশানুসারে প্রাচ্য প্রণালীতে রচিত মাদ্রাজের হাইকোর্ট মন্দির, ওয়াই-এম্-সি-এ গৃহ, এগ্‌মোর ষ্টেশন এবং মুর বাজার এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত। মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিমন্দিরটা দাক্ষিণাত্যের স্থপতি-হস্তানুসারে পরিকল্পিত হওয়ায় কারুকার্য্যে ও গঠন-সৌন্দর্য্যে বিশেষ নয়নাভিরাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখাংশের রমণীয় শোভা স্থপতিকারের শিল্পপটুতার প্রধান নিদর্শন। তাঞ্জোরের কালেক্টরী ও মাজরার মিউনিসিপাল বাজার প্রভৃতি কতিপয় গৃহের গঠনপ্রণালীও প্রাচ্যস্থাপত্যের একতম দৃষ্টান্তস্থল। এই দৃষ্টান্ত জয়পুরের আলবার্ট হলে অধিকতর রমণীয়রূপে প্রকটিত। এই হলটি পুরাশিল্পের মিউজিয়াম।



আলবার্ট হল, জয়পুর।



বুলন্দশহরের প্রথম সৌধ।



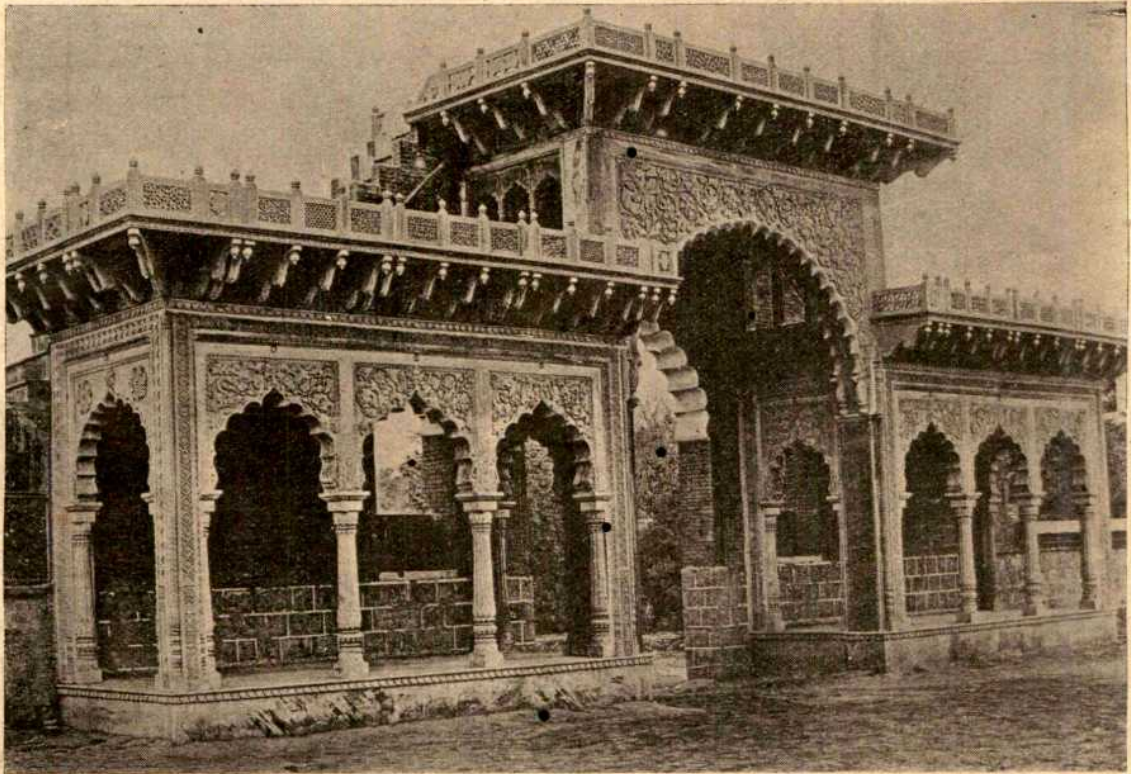
বুলন্দশহরের দ্বিতীয় সৌধ।

ইহাতে যেসকল সুন্দর সুন্দর শিল্প-নমুনা রাখা হইয়াছে মন্দিরটি তাহার উপযুক্ত ও চমৎকার আধার।

বর্তমানকালে এদেশের যেসকল স্থানে প্রাচ্যস্থাপত্যের আদর্শে নির্মিত গৃহাদি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বুলন্দশহরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৮ সালে এফ. এম. গ্রাউজ নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় সিভিলিয়ান এই শহরে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনিই সমগ্র শহরটি ভারতীয় আদর্শে গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে খাঁটি দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা উহার সংস্কার আরম্ভ করেন। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই ইহার অধিকাংশস্থলে চারু কারুকার্যখচিত বহু হর্ম্যা নির্মিত হয় এবং স্থান্য বাস্তুশিল্পের মহিমায় এ স্থানটি সমগ্র প্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এই শহরটায়ই অন্তর্ভুক্ত নিউনিসিপাল্ উজানের ক্ষুদ্র দ্বার ও বাজার-তোরণটিকে লক্ষ্য করিয়া বিলাতের সোসাইটি অব্ আর্টসের সভায় মিঃ পার্ড্ন্ ক্লার্ক ভারতীয় স্থাপত্যের

গুণকীর্তন করিয়াছিলেন। মিঃ গ্রাউজ বুলন্দশহরকে প্রাচ্যস্থাপত্যের আদর্শে গঠিত করিয়া বিকৃতকৃতি জমিদার ও জনসাধারণকে দেশীয় শিল্পের রমণীয়তা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু এ কার্যে তিনি পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের অনভিমতে দেশীয় মিস্ত্রীর সহায়তা গ্রহণ করায় কর্তৃপক্ষের অজস্র তিরস্কার লাভ করেন এবং ১৮৮৪ সালে হঠাৎ বদলীর পরওয়ানা পান। এই ঘটনায় ভারতের লুপ্তপ্রায় বাস্তুশিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে গ্রাউজের চেষ্টা অক্ষুরেই বিনষ্ট হয়। তিনি তাই এদেশের শিল্পিবৃন্দের জরবস্তার কথা স্মরণপূর্বক আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছেন—

‘দেশীয় জনবৃন্দের নিকট ইহাদের উৎসাহ পাওয়ার আশা তো নাই-ই; সরকারী গৃহাদির নিশ্চাণকার্যে অতঃপর ইহাদিগকে নিয়োগ করা সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষের নিষেধপত্র প্রচারিত হইল! অথচ শিবপুর ও রুড়কি-ফেরত যেসকল ইংরেজিনবীশকে নিয়োগকালেই আড়াই শো মুদ্রা মাসহারা দেওয়ার বরাদ্দ আছে, শিল্পজ্ঞানে বা শিল্পরচনায় এই-



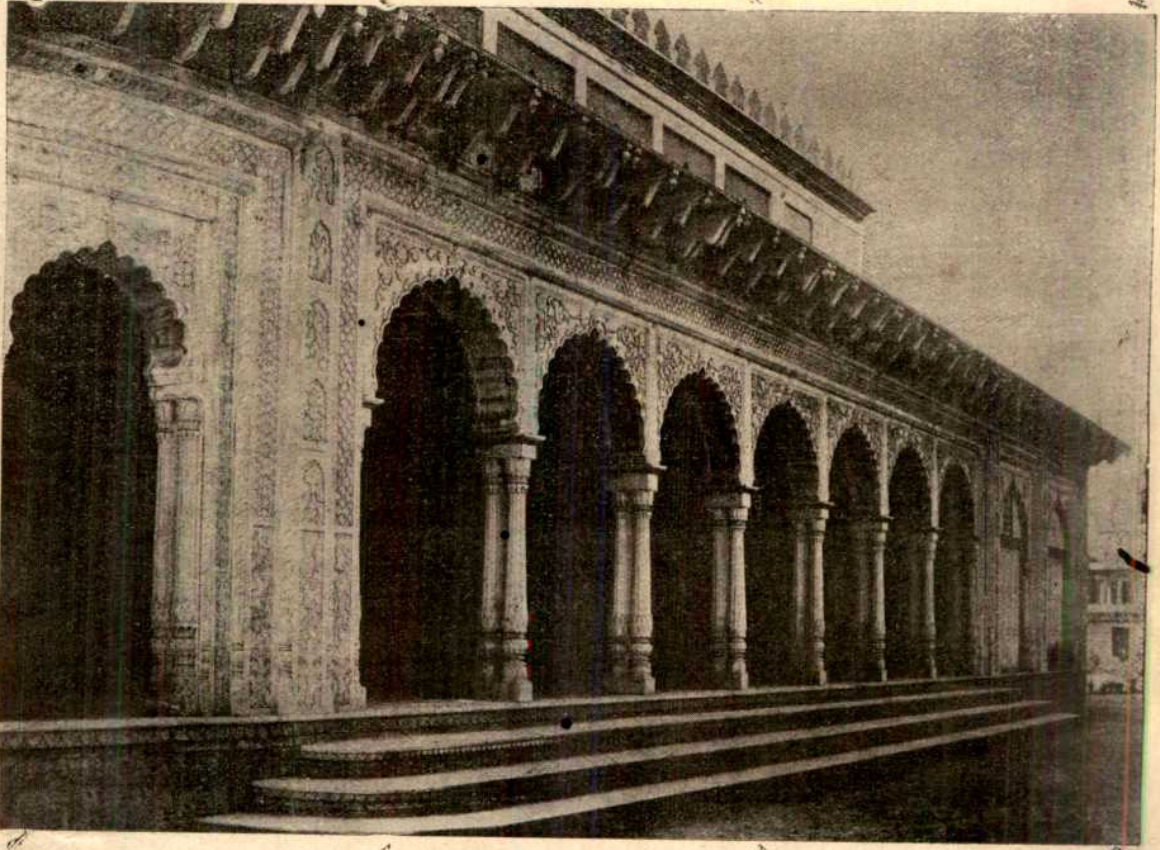
বুলন্দশহরের তৃতীয় সৌধ।

সকল নিরক্ষর কারিগরগণ তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।'

বুলন্দশহর, মাদ্রাজ, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের যেসকল বাস্তুশিল্পের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের গঠনপ্রণালী প্রধানতঃ মুসলমানী স্থাপত্যের অমুকুপ। হিন্দুস্থানত্বের নমুনা দাক্ষিণাত্যে—বিশেষতঃ উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরে—প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। হ্যাবেল সাহেব তাঁহার গ্রন্থে হিন্দুকৃত প্রস্তরশিল্পের আদর্শরূপে পুরীর এমার মঠ ও জাজপুরের বিরজামন্দিরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকীর্তি বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ মার্স্যাল ১৯০২—১৯০৩ সালের সরকারী বার্ষিক কার্যাবিবরণীতে লিখিয়াছেন—'ভুবনেশ্বরে এখনও এমন কারিগর আছে যাহারা প্রাচীনকালের শ্রায় স্থম্প-প্রস্তর-শিল্পের কার্যে সুনিপুণ।' ছুংখের বিষয়, যেসকল মিস্ত্রী ভুবনেশ্বর ও কনারকের বিখ্যাত মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া জগতে অশেষ শিল্পকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে, উৎসাহ

ও কর্মের অভাবে অধুনা তাহাদের সম্মানগণ মাচের্ট-আপিসের কেরাণীগিরীর সন্ধানে ব্যাপৃত! এদেশের ধনকুবেরগণ ও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা গৃহনির্মাণে প্রতি বৎসরই অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, অথচ একটাবার কার্যের পরীক্ষা লইবার জ্ঞাতও উহার একটা টাকা দেশীয় শিল্পীর হাতে দিতে রাজী নহেন! এবিষয়ে মাদ্রাজের চৌদাম্প্রদায় সকলের আদর্শ হওয়ার যোগ্য। এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিবর্গ লেখা পড়ায় গণ্ডমূর্থ হইলেও, দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে অসাধারণ যত্নশীল। ইহার চিদাম্বরম, রামেশ্বরম, কঞ্জিবরম প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদি নির্মাণ কার্যে স্বদেশীয় কারিগর নিযুক্ত করিয়া হিন্দুস্থানত্বের উৎকর্ষ বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

মথুরা, ভরতপুর, যোধপুর, বিকানীর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে হিন্দুস্থানত্বের অধিকার অত্মপি লুপ্ত হয় নাই। গত বৎসর এলাহাবাদ শিল্প প্রদর্শনীতে ঐসকল স্থানে প্রচলিত শিল্পের যে নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল,



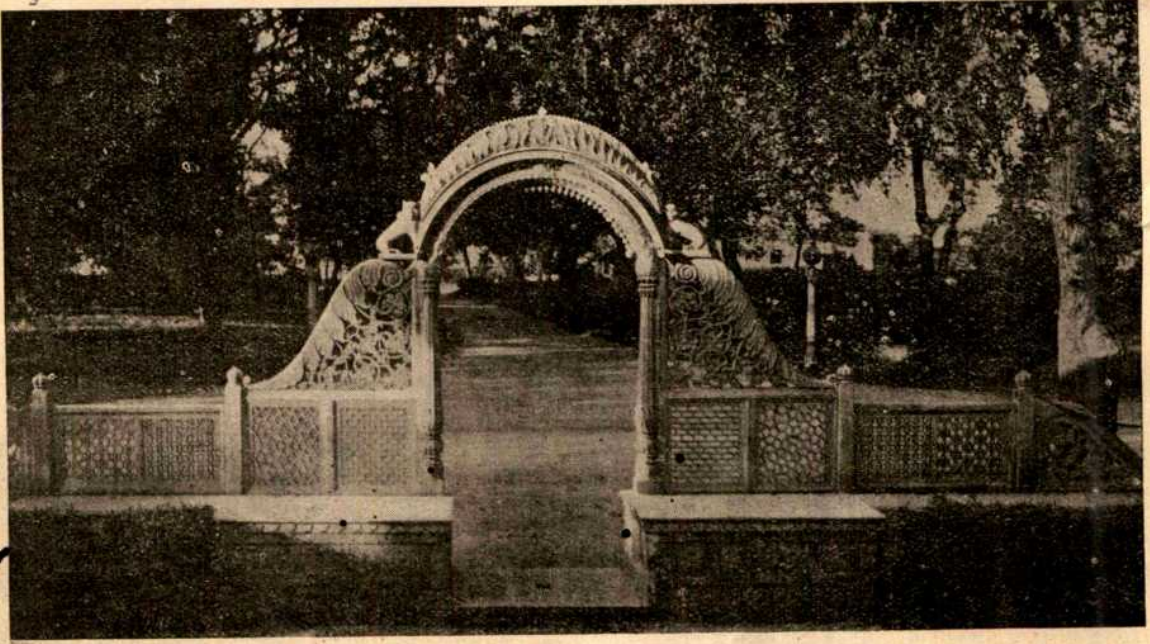
বুলন্দশহরের চতুর্থ দৌর।

তাহা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠতম। কয়েক বৎসর পূর্বে হইতে বারানসীতেও গৃহরচনায় হিন্দুস্থাপত্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধ মধ্যে আমরা কানীর যে প্রস্তর তোরণের চিত্রটি সন্নিবেশিত করিলাম, তাহা হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে গঠিত; উহার পরিকল্পনা মাধোপ্রসাদ নামক জনৈক দেশীয় শিল্পীর রচিত এবং তদনুসারে তোরণটি মল্ল নামক একজন হিন্দু মিস্ত্রীর কীর্তি।

গুনা বায়, ঢাকার লাটদপ্তর নির্মিত হওয়ার পর ভারতে সরকারী গৃহরচনার প্রণালী নির্ধারণ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উঠিয়াছে; এবং গভর্নমেন্টের বর্তমান স্থাপত্যমন্ত্রী মিঃ বেগু এ বিষয়ে প্রচলিত রীতির পরিবর্তন অনুমোদন করিয়া স্বীয় মন্তব্য সরকারে দাখিল করিয়াছেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর সভাপতি ভারতের পুরাকীর্তিসমূহের সংরক্ষণ ও স্থপতিকারগণের নাম ধামাদি সংগ্রহ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার প্রার্থনায় ভারতসচিবের নিকট

এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন—উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থনা যথারীতি ভারতসরকারে জ্ঞাপন করা হইবে। সম্প্রতি বড় লাটসাহেব মহানাত্য লর্ড হার্ডিং একটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে নূতন দিল্লী সংরচনায় দেশীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারেই গৃহাদি নির্মিত হওয়া যে উচিত তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত।

এ সমস্তই কিঞ্চিৎ আশার কথা। ইহার উপর আমাদের সম্মুখেও কয়েকটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাতে বাহাতে চিত্রবিজ্ঞা ও স্থপতিবিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়, তজ্জন্ত এখনই চেষ্টা হওয়ার আবশ্যক। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় ঐ স্থানে যেসকল হস্তা ও গৃহনির্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে তাহার কতকংশও বাহাতে যুক্তপ্রদেশের বিচক্ষণ কারিগর দ্বারা সম্পন্ন করান হয়, তৎসম্বন্ধে সরকারবাহাদুরকে বিশেষ ভাবে



বুলন্দশহরের মিউনিসিপাল উত্তরের তোরণ।



কাশীর একটি প্রস্তর তোরণ।

• অনুরোধ করা সকলেরই কর্তব্য। দিল্লী ভিন্ন উড়িষ্যা-বিহারের নূতন রাজধানী ও সরকারী গ্রীষ্মনিবাস, এবং আসামের সরকারী গৃহাদিও নূতন গঠিত হইবে। এক্ষেত্রেও ভারতীয় শিল্পলক্ষ্মী আশা ও ঐশ্বর্য্যের সরকার বাহাহুরের বিচারের অপেক্ষায় চাহিয়া আছেন। বলা বাহুল্য সরকার-বাহাহুর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদারতা প্রদর্শন করিলে ভারতীয় প্রজাবৃন্দ তাহাকে রাজার শ্রেষ্ঠতম দান (Boon) বলিয়া মনে করিবে। কলিকাতায় বাসগৃহাদির সংস্কার-কার্য্য অচিরেই আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। সে সময়ে এ দেশেরই জনবর্গের বাসপল্লীর অধিকতর পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। ভারতবাসিগণ তখন যদি বাস্তবশিল্প সম্বন্ধে “স্বদেশী প্রতিজ্ঞা” গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশীয় কারিগরগণের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষপাত করেন তবেই উপেক্ষিতা শিল্পলক্ষ্মী ও হুঃস্থ শিল্পজীবী উভয়ের যথেষ্ট হিত সাধিত হয়। শিবপুর বা রুড়্কির সাটী ফিকেটধারী ইংরেজীনবীশগণের সহিত তুলনায় এ দেশীয় শিল্পিগণ যে কোন অংশে হীন নহে, তাহা দার্ঢ্যসহকারে বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কৃতিবিজ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতায় কাহার শ্রেষ্ঠত্ব অপরাজিত, কলেজ স্কোয়ারের ব্যাপটিষ্ট মিশন হাউস ও সাকুলার

রোডের বক্সী সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরের গঠনবৈচিত্র্য লক্ষ্য
করিয়া পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

ভারতের স্থাপত্যশিল্পের সহিত অন্তর্ভুক্ত হুন্দশিল্পের
সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই শিল্পের উৎকর্ষ না ঘটিলে
ভারতের অন্তর্ভুক্ত শিল্পগৌরবও অচিরে লুপ্ত হইবে, সন্দেহ
নাই। বর্তমান ভারতে সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতির
বহুটা প্রয়োজন, স্থাপত্যসংস্কারের আবশ্যিক তদপেক্ষা ন্যূন
নহে।*

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

রজনী

নামিয়া এসেছে রাত্তি,
হৃদয় খুলিয়া বসিছে আন্ধ্রিক
তাহারে করিয়া সাথী।
নামিয়া এসেছে রাত্তি!

আহা, অকাশ সাগরে বেয়ে আসে আজ
কেরে ও জ্যোৎস্নাস্তরী,
তারি তোলা চেউ মাণিকের দাম
চলেছে মাথায় করি।

ফুলভরা যত ফুলের উপরে
পরীরা নাচিয়া গায়,
অই তাহাদের মঞ্জীর-ধ্বনি
বুঝি আজ শোনা যায়।

বাক্ত বীণা বাজে মৃদল মধুর
চরাচর ম্রছায়।

ওরে এমন রজনী—ফুল কুসুম,
মধু যে উছলি যায়।

সে মধুসাগরে সিনান করিয়ে
এক তুলে মিলন-তান,
রজনী ধরণী আকাশে বাতাসে
এক হস্তে চায় প্রাণ।

শ্রীকুমদনাথ সাহিড়ী।

* সভার রিভিউ হইতে সংকলিত।

মৌনীবাবা*

বজানসাধু, আশ্রমবৈরাগী আশ্রমপ্রতিষ্ঠা স্থাপনে অনিচ্ছুক ভ্রমবন্ত
মৌনীবাবা চিরদিন আপনাকে একান্তে মানবচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে
চেষ্টা করিয়াছেন। এমন অপরূপপ্রতিবিম্বীনা মানুষকে আমরা
প্রকাশ করিব কি করিয়া? তাহার কোন গুণ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি
অসম্ভব; বরং সে মহাজীবনের নিলিপ্ত বৈরাগ্য, একাধিকী বাহুল্যতা,
পতীত দীর্ঘরামুদ্রাপ সম্যক প্রকাশ করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য নাই,
ইহাই একান্ত ক্ষোভের বিষয়। যে মহাসাধনাব জন্ত স্বেচ্ছা বন এ
সমস্যাতে প্রেরিত হইয়াছিল, শিশুকালেই তাহার বিশেষত্ব স্বাক্ষর
পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অন্তর্ভুক্ত সঙ্গিগণ যখন খেলার চানখে
মস্ত প্রাকৃত এই শিশু-সাধু তখন একান্তে বীড়ীয়া পতীর ভাবে তাহা
দেখিতেন। উত্তরকালে ইনি ঠাকুরনাথ পর্বতে জীবনে শেষ
শুক বর্ষকাল মৌনাবলম্বন পূর্বক কঠোর তপস্যার নিমগ্ন ছিলেন।
জীবনের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে একই ভাব, একই উদ্দেশ্য এই
সাধুজীবনের বিশেষত্ব ঘোষণা করিতেছে। এমন সাধুচরিত্র প্রকাশ
করিলেও পুণ্য, পাঠ করিলেও পুণ্য লাভ হয়। এইজন্য আমরা
অযোধ্যতা সবেও ভক্তি-নতশিবে বখাসাধ্য সেই পুতচরিত্র ত্রাণোচনার
প্রবৃত্ত হইলাম।

মৌনীবাবার পিতা।

১২৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আন্ধ্রদিয়া গ্রামে গোপ-
জাতীয় এক জন্ত বৈষ্ণব পরিবারে সাধু প্যারীলালের জন্ম হয়। তাহার
পিতা ভক্ত শিবনাথ ঘোষ মহাশয় বাল্যকাল হইতে বৈরাগ্যপ্রবণ ব্যক্তি
ছিলেন। তাহার জীবনের দুইটী বিশেষ ঘটনা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।
শিবনাথের বয়স যখন বোল বৎসর, তখন তাহাদের বাসগ্রামে এক
সন্ন্যাসী আগমন করেন। শিবনাথ তাহার সঙ্গ লইয়া ভীর্থ ভ্রমণে
বাহির হইবেন স্থির করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন।
জ্যেষ্ঠ ইহাতে আপত্তি করিয়া তাহাকে বিধবকার্যে মনোনিবেশ করিতে
আদেশ করেন। কিন্তু বালক শিবনাথের বিষয়-বিমুখ হৃদয় তাহাতে
সম্মত হইল না। জ্যেষ্ঠ বিরক্ত হইয়া বলিলেন :—“যদি বিষবকর্ণে
মন না দাও তবে বিষয়ের এক কণাও পাইবে না—ইহা নিশ্চয়
দিয়া যাও।” শিবনাথ অগ্রজের ইচ্ছানুরূপ লিখিয়া দিলেন। সেইদিন
হইতে তিনি অবিরাম হইলেন।

আর একটা ঘটনা এই :—শেষ জীবনে প্যারীলালের সমস্যা ত্রাণের
সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন—“টিক টিক, আমার বা আবেই করা
উচিত ছিল প্যারী তাহা করিয়া আমাকে বড় লজ্জা দিয়াছে।” এই
বলিয়া ভারতের পুণ্যভীর্ষসমূহ পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছায় ভক্ত শিবনাথ
সেই রে গৃহ ছাড়িলেন, আর কিরলেন না। সপ্তদশ বৎসর ত্রাণীত
হইয়াছে শিবনাথ নিরুদ্ধেশ। আজ তিনি এ লোকে কিবা মোকদ্দরে
তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এরূপ পিতার পুত্র প্যারীলাল যে
বজানসাধু হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

* এই প্রবন্ধ শ্রীমতী নির্বরিণী ঘোষ প্রণীত “মৌনীবাবা” নামক
গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইল। প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা—উত্তরের জন্তই
লেখক গ্রন্থকারের নিকট গণী।

শিক্ষা ও শিক্ষকতা ।

ছাত্রবৃত্তি পাশ কবিয়া প্যারীলাল পাবনা জেলা স্কুল পড়িতে যান। এই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পাবনায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রাজসাহী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহ্যভঙ্গ হওয়ার জন্যে তাঁহার আর পরীক্ষা হইল না। শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করিলেন। শিক্ষকের কার্য গ্রহণ কবিয়া তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ী ও পরে সন্তপুষ্করিণী (রাপুৰ) গমন করেন। শেষোক্ত স্থানেই তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের আৰম্ভ এবং তথায়ই তাঁহার শেষ হয়।

প্রচার ও সম্মান ।

নরসেবা প্যারীলালের একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ছিল। আর তিনি বিষয়কর্ম হইতে অবসর পাইলেই রাপুৰ, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সৈদ্যপুর, নীলকামাবী, শিলিগুড়ী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থে বহির্গত হইতেন। কিন্তু এরূপ প্রচারে তাঁহার তৃপ্তি আত্মা পরিভূত হইল না, অমুক্ষণ ভগবৎসঙ্গ লাভের জন্ত তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল এবং এইরূপ নিত্যযুক্ত অবস্থা লাভের পূর্বে প্রচার করাকে তিনি ক্ষুদ্রতর আত্মবিনাশের কার্য বলিয়া অনুভব করিলেন; তিনি বলিতেন “আগে অধিকারী হই।” বাল্যকাল হইতেই প্যারীলাল সংসারবিমুখ ছিলেন; পত্নীবিয়োগের পূর্বে এই সংসার-বিমুখতা আরও বর্ধিত হইল। অবশেষে সর্বভোগী অনন্তকর্মী হইয়া তপস্তা কবিরেব বলিয়া সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

“জন্মসমাজই ধর্মসাধনের ঈশ্বরনির্দিষ্ট ক্ষেত্র”—বঙ্গুগণ সর্বজ্ঞা তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। বিনয়া প্যারীলাল শত বৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেন নির্জন সাধনের আবশ্যকতা কত বেশী। বুদ্ধ সাত বৎসর কঠোর তপস্তা করিয়া সত্য লাভ করেন, খৃষ্ট ৪০ দিন ৪০ বাত্রি অনায়াসে অনিদ্রায় তপস্তা করেন, মহম্মদ আড়াই বৎসর হোরা পর্যন্তের উপবেশতীর তপস্তা করিয়া মহান ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইসকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগকে যদি এত কঠোর সাধন কবিয়া ধর্ম লাভ করিতে হইতাহিল, আমাদের জ্ঞান ক্ষুদ্র লোকের ভদ্রপেক্ষা কত অধিক সাধনার দরকার আছে; এই সমুদয় কথা বলিয়া তিনি ভাষ্কর্যজননদিগকে কত বুঝাইতেন। অবশেষে তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগিনীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চিরকূট পর্যন্ত যাত্রা কবিলেন।

নরসেবা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা ।

সংসারজ্ঞান পরিচয় করিবার পূর্বেই প্যারীলালের জীবনে ধর্মভাব বিশেষভাবে পরিভূত হইতাহিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে নরসেবা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ ব্রত ছিল এবং অবসর পাইলেই তিনি প্রচারার্থে বহির্গত হইতেন। কোন বন্ধু কিংবা কোন পরিবার রোগ, শোক কিংবা অন্ত কোন প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইলে, প্যারীলাল তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। উৎসব এবং অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার জন্ত বাস্তব হইয়া থাকিতেন। মৌনাব্যাহার জীবনচরিত্রে কয়েকখানা চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে; এই চিঠি হইতে ২১টা ঘটনা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। ঐযুক্ত উদ্দেশ্যচক্র নাম লিখিয়াছেন :—

“সময়ে সময়ে কর্ম হইতে অবসর লইয়া তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গমীড়িত নরনারীর সেবার জন্ত কোন কোন স্থানে বাইতে দেখা গিয়াছে। সেবার তিনি বড় আনন্দ পাইতেন। একজন কখন নিজের হাতে রন্ধন করিয়া পবিত্রজনবর্গকে আহাৰ্য্য কবাইতেন। গরমের সময়ে আহাৰ্য্য

বসিলে নিজের হাতে না হইলে অপরের দ্বারা বাতাস করাইতেন। এই ঘটনায় সময়ে সময়ে সঙ্কট হইয়া পড়িতাম কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত করাইতে পারিতাম না। একদিনের কথা মনে আছে। সে দিন ববিবার, খুব বৃষ্টি হইতেছিল। ভোরে উঠিয়া দেখি, তিনি ধ্যানে মগ্ন। দেখিতে দেখিতে ১২টা বাজিয়া গেল, তবু আসন ত্যাগ কবিলেন না। আহাৰ্য্যাদি সমাপন করিয়া আমবা বিকালে হাটে বাইবার উদ্দেশ্যে করিতেছি, এমন সময়ে তিনি উঠিলেন এবং আমাদিগকে রাখিয়া, নিজেই বৃষ্টির ভিতবে হাটে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তৎকালের উৎকৃষ্টতা দেখিয়া মনে হইতাহিল তিনি যেন কি এক অপার্থিব বস্তু পাইয়াছেন। হাট হইতে আসিয়া স্বয়ং রন্ধন করিলেন এবং ত্রীপুঞ্চ সকলকে খাওয়াইয়া পরে রাত্রিতে নিজে আহাৰ্য্য করিলেন। এইসব কাণ্ডের মধ্যে তাঁহার যে এক নিমগ্ন-আনন্দ বিহীনতা দেখিবাছি তাহা ব্যস্ত করা যায় না। একদিন রাত্রিতে বড়ই গরম পড়িয়াছিল, একজন্ম ভাল ঘুম হইতেছিল না। মধ্য রাত্রিতে জাগিয়া দেখি, তিনি দুই হাতে দুইখানা পাখা লইয়া পাঁড়াইয়া রেহময়ী জননীৰ মত আমাদিগকে ব্যঞ্জন কবিতেন। জানিনা কতদিন এইরূপে অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা লইবাছি।”

একদিকে যেমন “নরসেবা,” অপবদিকে তেমনি ব্রহ্মনিষ্ঠা। এবিষয়ে উদ্দেশ্যবান এই প্রকাণ্ড লিখিয়াছেন :—“ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ অবধি তিনি প্রতিদিন ‘নঠাব সহিত ২১০ ঘটা উপাসনা, ধ্যান ও গ্রন্থপাঠে কাটাইতেন, ইহা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্তব্য ছিল। ইহাতে কখন তাঁহাকে শিথিল-যত্ন হইতে দেখা যায় নাই। সন্মানান্তে প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হইত এবং ইহা উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মগণের এক আকর্ষণের বস্তু ছিল। অনেক প্রস্তুতিতে তাহাতে আসিয়া যোগ দিতেন। তিনি কখন কখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ধ্যানে কাটাইতেন। রবিবারে ইচ্ছা ছিল না বলিয়া বেলা ১১টা পর্যন্ত উপাসনার কাটাইতেন। ‘তাপসমালা’ গ্রন্থ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। দরবেশদিগের কঠোর বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা তাঁহার জীবনের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যখন ‘তাপসমালা’ পড়া হইত, তখন তিনি ভাবাবেশে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, শব্দ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মনাম কবিতেন। অনেক সময়ে গ্রন্থ পাঠ বন্ধ বাধিতে হইত। তাঁহার প্রব্রাজ্য গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে তিনি অধিকাংশ রাত্রি জাগ্রৎ থাকিয়া ধ্যানাদিতে কাটাইতেন। তিনি আর আমি একত্রে শব্দ কবিতাম, সম্ভান যেমন সার নিকট আবদার করে, তেমনই ভাবে কখন কখন গভীর বাজিতে তাঁহাকে আবদার করিতে শুনিতাম। সেই আবদারে আমবা ঘুম ভাঙ্গিয়া বাইত। আমি বিশ্ব-বিমুগ্ধচিত্তে এই চিন্তা করিতাম ইনি ব্রহ্ম নামের মাধ্যমে এমন মজিয়াছেন যে আধিহা-বর্ণী নিদ্রাও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। তিনি অধিকাংশ সময় উপাসনার ভাবে থাকিতেন। যখন নাম জপ করিতেন তখন তাঁহার মুখে চোখে এক অপূর্ণ বিজলি খেলিত, শরীর কটকিত হইত। বলিতে বলিতে সে দেবমুগ্ধি আজ আমার মানস-নেত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।”

ঐযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ লিখিয়াছেন :—“তাঁহার ধর্মভূক্তা, ব্যাকুলতা ধ্যানশীলতা বাহা দেখিয়াছি, তাহা অতি অপূর্ণ। আমি সমস্ত সময় তাঁহার গৃহে সন্তপুষ্করিণীতে বাইতাম। একবার শনিবার অপবাক্তে গিয়াছি, একজন মহিলা (স্বর্ণময়ী) ছিলেন কিন্তু তবুও আগ্রহ করিয়া তিনি বহুতে রন্ধন করিলেন। নিরামিষ খাইতেন, আমি তাঁহার সহস্বে প্রস্তুত নিবাসিবার ভোজন কবিয়া বড় তৃপ্তি অনুভব করিলাম। তিনি আহাৰ্য্য করিলেন না, বলিলেন আমি পরে আহাৰ্য্য কবিত্ব। আহাৰ্য্যান্তে কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলাম।

তিনি বল্লভেন, দালা আপনি শবন করুন আমি একটু ভগবানের নাম করিব। এই বলিয়া আসন করিয়া বসিলেন; আমি অল্পকণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আসিয়া দেখি তিনি তখনও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার অপরূপ ধ্যানমগ্নতা দেখিবার আমার বড় বিস্ময় জন্মিল। আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ভোর ৪টার সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া উঠাইলেন। আমি বলিলাম 'কই আপনি ত আহার করিলেন না?' বলিলেন 'না আজ ত আব ধাওয়া হইল না।' শুনিয়াছি তাঁহার প্রায়ই এইরূপ হইত। যিনি সমস্ত রজনী ধ্যানে যাপন করেন তাঁহার ধর্মতৃষ্ণার কথা আর কি বলিব।"

ভক্তগণের দৃষ্টিও অল্প প্রকার। এ বিষয়ে একটা ঘটনা এই:—প্যাবীলাসেব একজন অল্পবয়স্ক বন্ধু তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য কিছুদিন সন্তপুর্নরূপে তাঁহার গৃহে ছিলেন। তিনি দেখিতেন প্যাবীলাস প্রতিদিন প্রাতে একটা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া দন্ত ধাবন করিতেন। একদিন দেখিলেন ডাল ভাঙ্গিতে গিয়া ডাল আর ভাঙা হইল না। বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া প্যাবীলাস বলিলেন "সবদিন ত মন জাগ্রত থাকেনা।" আজ তিনি বৃক্ষের মধ্যে আশ্রয়লাভ চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছেন। এতিনি যে তিনি ডাল ভাঙ্গিয়া লন, ইহাতে বৃক্ষ বেগুনী অনুভব করে; বৃক্ষেও চৈতন্য আছে। এই ঘটনার পর হইতে প্যাবীলাস আর দাঁতন ব্যবহার করেন নাই।

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি তিনমাসকাল ভ্রাতৃত্বগিনী-দিশেব সহিত নলহাটতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি দুই তিন ঘণ্টার অধিক নিদ্রা বাইতেন না। আর সমুদ্র সমস্ত ব্রহ্মভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। নির্জন ও সজন—উভয় অবস্থাতেই তাঁহার ঐ একই নিমগ্ন ভাব। আহার করিতেন ব্রহ্মভাবে, বিহার করিতেন ব্রহ্মভাবে এবং স্নেহ করিতেন ব্রহ্মভাবে।

তিনি নরনারীকে কি চক্ষে দেখিতেন মিল্লিখিত ঘটনার তাহা বুঝা যায়:—

সন্ন্যাস যাত্রার দিন বাড়ীর মেথরাণ্ডি বধন কাজ করিতে আসিল, মোনীবাবা তাহাকে ডাকিলেন, বলিলেন—"তুমি আমার মা। শিশুকালে মা স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন; এতদিন তুমি আমার সেই কাজ করিলে—তুমি আমার মা। আমি তপস্তার বাইতেছি—তুমি আশীর্বাদ কর যেন সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। তোমার আশীর্বাদ ভিন্ন আমার সাধনা সফল হইবে না।" এই বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে নমস্কার করিলেন।

চিত্রকূট।

যাত্রাকালে প্যাবীলাসের সঙ্গী—উপনিষদ গীতা, বাইবেল, ব্রহ্মসঙ্গীত ও আর কয়েকখনি গ্রন্থ। চিত্রকূট অবস্থানকালে মাসে মাসে তিনি পুস্তক চাহিয়া পাঠাইতেন। তিনি প্রথম কয়েকমাস বন্ধুবান্ধবদ্বিগকে চিঠি লিখিতেন এবং তাহাদের একান্ত অনুরোধে দৈনিক কাধ্যাবলী লিখিয়া বাধিতেন। আমরা ইহার অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। "পিতা আমাকে রাজপুত্র করিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাকে বেহানে রাখিয়াছেন, তাহা সাধন ভজনের পক্ষে এই চিত্রকূটের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। দুইটা অতি পরিপাটি ও নির্জন;—এমন নির্জন যে ছুখওয়ালা ভিন্ন অন্য লোকের সহিত প্রায়ই দেখা হয় না। যদিও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আসেন, খুব অল্প সময়ই থাকিয়া চলিয়া যান। স্বেচ্ছা অথবা হইতে আগত একটা সাধক বন্ধু সময় সময় আসিয়া ধর্মকথাতে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এদিকে পিতাব কুপা

প্রচুর বর্ষিত হইতেছে। যখনই তাহার চরণতলে, বসিতেছি, তখনই কুপা করিতেছেন। পিতার ইচ্ছা-শীঘ্র শীঘ্র আমাকে নবজীবন দান করিব মুক্ত করিয়া দেন। অন্ত্যস্ত-সাধকদের দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাদের অনেক সময়ই নষ্ট হয়; এবং বড় ক্রেশ পাতিতে হয়। পিতার অপার কুপাও গৃহে বসিবার আমি তাঁহার অস্ব-ধাত্ত ভক্ষণ করি। এখানে কাঁচা দুধই বিক্রয় হয়। কিন্তু পিতার কুপাও আমার দুধওয়ালা আমার দুধ পবন করিয়া দেন। মাসের মধ্যে পনের দিন ছোলা খাই। অবশিষ্ট ১৫ দিনের মধ্যে ৫ দিন ভাত খাই, বৃতরা রাস্তা দার হইতেও একপ্রকার মুক্ত। আর সে রাস্তাও অতি অল্প সারের জন্ম; কারণ কেবল ভাত ও রুটি ভিন্ন ত আর কিছু বাসা কবি না। যে জলে স্নান করি তাহাব দ্বাব নির্মল জল আর সময়ই আছে। যদিও কোপীন পরি, তাহা হইলেও বস্ত্রের অভাব অনুভব করি না; কারণ আমার কোট পবিলেই সমস্ত অভাব চম্বিয়া যায়। এই প্রকারে পিতা আমাকে পবন স্বপ্নে রাখিয়াছেন। নিমন্ত্রণেবও অভাব নাই। আমি সমস্ত ভার তাঁহার উপর নিরা নিশ্চিন্ত হইতেছি। মধ্যে মধ্যে বস্তিও অবিশ্বাস আসে। শীঘ্রই পিতা তাহা হইতেও আমাকে মুক্ত করিবেন। কারণ—আমি তাঁহারই কুপার উপর নির্ভর করিয়াছি। লোকে এমন ভুক্তকে ফেলিবার মানুষকে অধেষণ কবেরা বেড়ায়। এ শুক যে কি করেন তাহা আর কি লিখিব। মহা পার্থকে অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধারের পথে লইয়া যান; অবিশ্বাসীকে কিশোরী করেন, অধিক কি, নিরন্ত সঙ্গ থাকিয়া তাহার সমস্ত তদ্ব্যবধান করেন।"

খাত্ত।

মোনীবাবা নিজের খাত্ত বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"মহাসমের, মঙ্গলময়ের যে পাণীর সহিত কি নীলা খেলা, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমি যে দিন এখানে পৌছিয়াছিলাম, কেবল সেই দিন অনাচারে ছিলাম। ফটকশিলা দেখিবার আমি যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আর উপাযান্তর নাই, কোথাও বাইব—কাহারও সহিত ভালাপ নাই, তখন চিত্রকূটের দিকে আসিয়া উপাযান্তর না দেখিয়া, একটা ভাঙা ইঁদুরার ধারে সমস্ত রাত্রি কাটাইলাম কিন্তু যিনি কীটাপুকারেরও পর্যন্ত তত্ত্ব লন, তিনি কি তাঁহার পুত্রকে কনা-হারে রাখিতে পারেন? একবার্ত্তি খুব প্রাতে সেখানে উপস্থিত। সে আমার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সে আসিয়াই আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর সে আমার অনুরোধে পারিয়া, আমাকে উদাসীন নানকপন্থী বাবাভাদের আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে বাওয়ার পর রুটি, ভাত, পরমান প্রভৃতি পিতা আমাকে খাওয়াইলেন। এই প্রকার রুটি, দুটি, পক্ষ্মার প্রভৃতি খাওয়া চাষিদিগে সেখানে গৃহীত করিয়াছিলেন। এক-বাবে সেখানে থাকিলে এক বাবু হইয়া উঠিতাম, এইজন্য পিতা আমাকে অনুরোধ দেব মন্দিরে লইয়া গেলেন। ২০শে আগষ্ট হইতে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে কাটাইয়াছি। পীড়ার জন্য দুই দিন উপাস্য ভিন্ন আর উপাস্য নিরাছি বলিবার মনে হয় না। এখানে যেসকল ঘটনা ঘটনাছে তাহা অতি বিচিত্র। প্রথম দিন বাইরাই খাত্ত পাই-লাম। দ্বিতীয় দিন আমার সে নিম্নত স্থান হইতে আমি বড় বাহির হই নাই। সন্ধ্যার পূর্বে সিদ্ধি বাবাজির এক ঢেলা আসিয়া, আমি উপরে উঠিয়া করিতে অথবা থাকিতে বাই নাই বলিয়া। অনুযোগ কল্পিত লাগিল। তাহার পর দেখি সন্ধ্যার সময় তিনখানা রুটি ও দুধ আমার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার পরদিন বৃষ্টি উপরে গিয়াছিল, কিন্তু বাঘের উৎপাতে এবং চাকরদের তাজিল্যে আর উপরে বাইব

না ঠিক করিলাম। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে উপবাসে রাখিতে পারেন? একব্যক্তি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিল। এক শত দেড় শত হাত উপর হইতে সিঁড়ি ডাঙ্গিয়া এবং সেই ভয়ঙ্কর বীমরের উৎপাত সহ্য করিয়া কে কাহার খাদ্য আনিয়া থাকে? দুই-তিনখানা রুটি আসিত, শেষে আমার অনুরোধে একখানা দেউখানা আসিত। কোন দিন লুচি এবং অন্যান্য মিষ্ট খাদ্যও জুটিত। এইরূপে কিছুদিন অত্যন্ত হইতে হইতেই আর একব্যক্তি আসিয়া জুটিল। সেও আসিয়া পিতার আজ্ঞার আমাব সেবায় নিযুক্ত হইল। জন্মাস্তমীর দিন বাক্সি একটা কি দুইটা সময় আমার জন্ম মোহনভোগ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। পিতা এইরূপে আমার সেবায় নিযুক্ত আছেন। এই সময়ে আমার বোধ হইত, আমাকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া মঙ্গলময় পিতা বেন মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া রুটি কাপড়ে বাঁধিয়া এবং বটাতে জল লইয়া আসিয়াছেন। এইরূপে দিন যাইতেছে, এক্ষণ সময়ে কোন এক ঘটনাতে তাহা আমাকে “নাস্তিক” বলিয়া ঠাওরাইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিবে না ঠিক করিল। পরদিন বলিল “আপনি উপবে যাইবেন?” খাবার সময় উপবে গেলাম কিন্তু কেহ কথা বলিল না। পিতা ঘরে বসাইয়া আমাকে খাদ্য দিবেন এই আশা অবহেলা করিয়া উপরে আসিয়াছি বলিয়া একপ বটিল মনে করিয়া নামিয়া আসিলাম। আজ প্রাতঃকাল হইতেই পিতা আমাকে অপূর্বভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে যিনি আমার খাদ্য আনিতে, তিনি “জর হইয়াছে” বলিয়া শুইয়া কোঁ কোঁ করিতে লাগিলেন। তাহার কোঁকানি দেখিয়া ভাণ বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে এক আশ্চর্য, বাহারা কোন দিন আমাব খোঁজ লয় না (একদিন আমাব খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) একপ একব্যক্তি আমার খাদ্য দিয়া গেল। আমি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতে লাগিলাম।”

শয্যা।

শয্যার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন :—“প্রথম দিন বৃক্ষতলস্থ ভান্ডা ইদাবার পার্শ্ব। তাহার পর কোট এবং ক্ষুদ্র আসনের উপর শরীরের উপরিত্তা রাখিয়া শয়ন করিয়াই যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। অর হইবার পূর্ব হইতে কোট এবং আসনখানা বিছাইয়া শয়ন করিতাম। এখন কোট গায় দিই; হস্তরা আদান এবং তাহার উপরের কাপড়খানা প্রথমতঃ শুইবার সময় বিছাইয়া লই, কিন্তু তাহা থাকে না; প্রকৃত পক্ষে মাটিতেই শুইতে হয়। উপাধান এক্ষণও প্রস্তুত।”

মানসিক স্থখ।

নিম্নলিখিত অংশে তাহার মানসিক অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে :—

“যখন পিতার অপাব ককণার নিম্পাপ ধাক্কা, তখন সকলই আমাকে অপাব স্থখ দেয়। গৃহেব দিকে তাকাইলে গৃহ তাঁহাতে পবিপূর্ণ দেখি; বৃক্ষ, পর্বত, বন, আকাশ সকলই মঙ্গলময় দেবতার পরিপূর্ণ দেখিতে পাই। তখন আনন্দময় পিতার পুত্র হইয়া আনন্দে তাঁহার সহিত নৃত্য কবিত্তে থাকি। আমার সে সময়ের আনন্দ লিখিয়া একাক কবিত্তে পাবি না। পিতার অপার কুপার আমি দিন দিন উন্নতি লাভ কবিত্তেছি। পিতা আমার অবিবাস দূব করিত্তেছেন, আমার স্বপ্নে প্রেমের সকাব করিত্তেছেন, আমার রূপ দুপদিককে দমন করিত্তেছেন। যখন পিতার প্রেমার ভক্ষণ কবি, তখন যে কি স্থখ অনুভব করি—বলিতে পারি না। যখন মঙ্গলময়ের হস্তে আশ্র-সমর্পণ করিয়া রাখিতে ঘুমাই, তখন আর আমার কোন চিন্তা থাকে না। পীড়িত অবস্থাতে

মঙ্গলময় আমাকে কোলে করিয়া রাখেন, হস্তবা আমার আর অস্থখের সম্ভাবনা কি? বাসনা, লালসা প্রভৃতিব দিকে মন গেলে যখন পিতাকে দেখিতে পাই না, তখন যে যন্ত্রণা অনুভব কবি, তাহা অবর্ণনীয়। পাপ দুঃখব মূল। লোকে নিম্পাপ থাকিলে এই পৃথিবীতেই স্বর্গভোগ করিতে পারে; কিন্তু পিম্পাপ থাকি নিম্নের আবস্ত নয়। সম্পূর্ণ ব্রহ্মবৃপাব উপর নির্ভর না করিলে নিম্পাপ হওয়া যায় না। যে নিম্নের বলে নিম্পাপ হইতে চেষ্টা করিবে, সে আরও পাপে পড়িবে।

আমাব গৃহের সমুখে বান্দা গাছের স্তার একটা কচিকচি-পত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটা একেবারে সমুখে। বৃক্ষটার পাত্রে পাত্রে ব্রহ্মনাম লিখা। এই বৃক্ষে কত রকম ছোট ছোট পানী আসিয়া আমার চিত্তবস্ত্রন করে, বলিতে পারি না। ইহাদের মধ্যে দুইটা পানী অতি স্থলব, স্বরও মিষ্ট। ইহাদের মধ্যে একটা পানী আমাকে দেখিয়া ভব করে না, অতি নিকটে আসে। তাহাকে দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়; পূর্বকালের প্রবিশেষ আশ্রমের কথা মনে হয়। ইহারা এবং আর দুইটা অতি ক্ষুদ্র পানী নিরন্ত বৃক্ষে বাস করিয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছে। আমার চিত্তবিনোদনার্থে পিতা এই স্থলর গাছক এবং নর্তককে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন কোন স্থান হইতে প্রান্ত হইয়া আসিয়া গৃহেব সমুখস্থ প্রস্তবে বসি, তখন ইহারা আমাব ক্ষমের পিতার অপার প্রেম চালিতে থাকে। ময়ূবগণ সর্বদাই চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নদীতে মৎস্তগণও আমাকে অপার স্থখ দেয়।”

মৌনাবা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই চিঠি হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

“পীড়িত অবস্থায় লালসা প্রভৃতি কতকগুলি রিপু মাথা উঠাইয়া ছিল। সেগুলি পিতা আবার ক্রমে বশীভূত কবিয়া দিতেছেন। এখন দিন একএকাবে যাইতেছে। প্রাতে উঠিয়া, কিছুকাল পিতৃচরণ সন্তকে ধারণ করিয়া ব্যায়াম করি। তাহার পর মুখ ধুইয়া পিতার চরণতলে বসি। অধিকাংশ সময়ই কুপা স্মরণ এবং বিশেষ প্রকারে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। পিতার কুপার অনেক সময়ই সকল হই। সময়ে সময়ে পিতার মহত্ত্ব ডুব দিয়া নিম্নের ক্ষুদ্র অনুভব করিয়া পরম স্থখী হই। সময়ে সময়ে পিতা কুপা করিয়া আমাকে তাহার স্বরূপ কথঞ্চিংকণ অনুভব করান। মধ্যে মধ্যে খাবার চিন্তা এবং বাহিবেব চিন্তাও স্থান পায়; কিন্তু তাহাদের অবস্থা পিতার কুপার ক্রমে শোচনীয় ভাবে ধারণ কবিত্তেছে। এই প্রকারে আর দুই প্রহর কাটিয়া যাব। তাহার পর কিঞ্চিংকাল পাঠে রত হই। কখন কখন মোহ আসিয়া একপ করিয়া ধরে যে আমি এসকল হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া নবক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। কখন কখন আশ্রয়স্থাব প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ইহারাও ক্রমে বলহীন হইতেছে। তাহার পর আহাতি নিত্যকার্যে ব্যাপৃত হই। রাত্রা করিয়া আচ্ছা করিয়া আহাতি করি। তৎপর কিছুকাল পিতাকে স্মরণ করিতে করিতে গড়াগড়ি দিয়া কিঞ্চিংকাল পিতার চরণতলে বসি, পাত্রাধি পরিষ্কার করিয়াও কোন কোন দিন পিতার চরণতলে বসিবার সময় থাকে, কচিং দুই একদিন থাকে না। সন্ধ্যার সময় একটু গৃহের উপর ভ্রমণ করিয়া এবং ব্যায়াম করিয়া পিতার চরণাবুত পান করিবার জন্ত বসি। কোন কোন দিন ২১ ঘট্টা পিতা বসাইয়া রাখেন, কোন কোন দিন শীঘ্রই শুইয়া পড়ি। কোন কোন দিন শুইয়া শুইয়া পিতার স্মরণ মনন ইত্যাদিতে অনেক সময় পিতা বাগন করান। তাহার পর ২৩ ঘট্টা ঘুমাই, পরেই আবার উঠাইয়া যেন। তাহার পর আর বড় ঘুম হয় না। এইরূপে দিন গত হইতেছে। ক্রমেই আশা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিবাশা অন্তর্ধান হইতেছে। এই প্রকার সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু

পিতা বাহার, তাহার আবার মুক্তির জন্ত চিন্তা? পাপচিন্তা নরকভোগ যদিও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তত্বে তাহাদের শক্তি যে বর্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি। পিতা শীত্রে আমাদের জন্ত উপায় করিবেন। বাহির হইতে সাধন ভজন সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হই একপা কোন সঙ্গী এখানে নাই। কেবল মাত্র পিতা আছেন। আমি আর অস্ত্র সঙ্গী চাই না। পিতা ভিন্ন অস্ত্রদিকে দৃষ্টি করিলেই আমার সর্বনাশ উপস্থিত হয়। সর্বসাক্ষী জাগ্রত জীবন্ত দেবতা আমার গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু হইয়া আছেন। তবে আর অভাব কি? আমি তাঁহার সঙ্গেই কথা বলি, তাঁহার নিকট হইতেই অবার উপদেশ পাই। তিনি আবার দয়া করিয়া আমাকে ঘাড়ে বসিয়া এইসকল সাধনায় নিযুক্ত করেন। যখন আমাকে দেখি না তখন তাঁহাকে দেখি এবং যখন আমাকে দেখিতে পাই তখনই সর্বনাশ উপস্থিত হয়, আর পরম দয়ালু পিতা শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপেই বিশেষ ভাবে আমাব নিকট প্রত্যক্ষ হন। আমার নরকভোগ তাঁহারই ইচ্ছা। আমার অহংকারের দম্পটি উৎপাটন করিতেছেন এবং আমার মনো যে কিছু নাই, তাহাই চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন। পূর্ণ বদলময় শীত আমাকে মুক্ত করিয়া লইবেন। আমি আব কিছু চাইনা, কেবল তাঁহার অন্তর চরণ পুষা করিবার অধিকার চাই। পিতা অনেক শিখাইয়াছেন।”

ওঁকারনাথ

চিরকূটে প্যারীলালের তপস্তার প্রথমাবস্থা। ত্রয়ে জীবনের গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীর লেখা বন্ধ করিলেন। অমূল্য ব্রহ্মদ্যান ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দরসপানে বিভোব হইয়া থাকিতেন। দুইবৎসর চিরকূটে তপস্তার পর প্যারীলাল ওঁকারনাথ পর্বতে গমন করেন।

তিনি চিরকূট হইতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে নির্ঝরা পার হইয়া এই শহরের এক মিঠাইবিক্রেতার দোকানে বিশ্রাম করেন; পরে পর্বতে উঠিয়া শুভাবাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতে তিনি স্নানাহার, নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিলেন, মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নাম মৌনীবাবা হইল।

বর্তমানকালে মিঠাইবিক্রেতার দোকানে মৌনীবাবার পদাশ্রয়ের পূর্ব হইতে তাহার ব্যবসারের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। মৌনীবাবার আশীর্বাদে এইরূপ হইয়াছে মনে করিয়া সে সঙ্গীক তাঁহার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সেবাধিকার ভিক্ষা করিল। মহাত্মা বৈরাগী মৌনীবাবার কাহাবও সেবা গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল না। তিনি তাহাদের ব্যাকুলভাৱ প্রতিদিন বিকালবেলা কেবল একপোষা ছুঁষ ও কিছু বেলপাতার রস গ্রহণ করিতে সীমিত হইলেন। ইহাই তাঁহার এখনকার দৈনিক বাহার।

সেবক কোন কোন দিন আশ্রমের তিনপোষা ছুঁষ জাল দিয়া একপোষা করিয়া আনিত। মৌনীবাবা বুঝিতে পারিয়া, ইহাতে তাঁহার তপস্বির রস বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি সেবা গ্রহণ করেন না বলিয়া মিঠাইবিক্রেতা ও তাহার পত্নী বড় দুঃস্থ হইত। অবশেষে তাহারা তাঁহার জন্ত একটি ভাল শুভা নির্মাণ করিয়া দিবার অনুমতি চাহিল, মৌনীবাবা সম্মত হইলেন।

সিদ্ধপুরুষের সম্মান।

কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধপুরুষরূপে মৌনীবাবার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বিকালবেলায় একবার মাত্র শুভা হইতে বাহির হইয়া নগরীয়া আসিতেন। সেই সময় দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্ত ও তাঁহার পদ্যুলি লইবার জন্ত শুভাঘারে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

একাদশীতে সমস্ত দিন উপবাসের পর রাত লোক তাঁহার পদ্যুলি মস্তকে সইয়া জলগ্রহণ করিবার আশায় তাঁহার ঘাটে পড়িয়া থাকিত। এক একদিন মৌনীবাবা শুভার ঘর খুলিয়া বিবস জনতা দেখিয়াই খুল্কার ঘর বন্ধ করিতেন। মহারাজ হোলকার একদিন নগরীয়ায় ক্রান্ত আসিয়া মৌনীবাবাকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমঘারে আসেন। মৌনীবাবা ঘর খুলিতেই তিনি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। এক-বাস্তি হোলকারের পরিচয় জানাইলেন; শুনিয়াই মৌনীবাবা ত্রহ প্রবেশ করিতে উদ্ভত হইলেন,—হোলকার ঘর বোধ করিলেন। তিনি বলিলেন “বাবা, আমাকে উপদেশ দিন।” মৌনীবাবা উদ্বেগজনিত নির্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—“আমি কিছুই নই।” হোলকার কণ্ঠক তাঁহার চরণে অর্পিত সহস্র মুদ্রা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া মৌনীবাবা ঘর বন্ধ করিলেন। ইহার পর শুভাঘারে দেবনাগর অক্ষরে লিখিয়া দিলেন:—

“নাহ ব্রাহ্মণঃ ন চাহ সাধুঃ।”

মৌনীবাবা ওঁকারনাথে কি ভাবে জীবন বাপন করিতেন, তাহা ব্রীহৎ আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি হইতে উদ্ধৃত হইবে:—
“আমি ওঁকারনাথে উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট ভিক্ষাস্বরূপে মৌনীবাবার সাধনশুভার সন্ধান জানিয়া লইলাম। তাঁহার মন-শুভার উপরে একটা যেত পতাকা উড়িতেছিল। লোকে সেই পতাকা দেখাইয়া বলিল ঐ স্থানে মৌনীবাবা অবস্থিত করেন। তাঁহার মন-শুভার নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম তাঁহার প্রবেশদ্বার কবরাজ আছে। ঘর অবরুদ্ধ থাকায় অনেকক্ষণ আমাকে বাহিরে অস্থিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সাধনে বিশ্ব জন্মাইয়া আমার অশমন-জ্বাব প্রদান করিতে ইচ্ছা হইল না। একজ্ঞ বাহিরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। আমি বোধ হয় ২টা ১০টার সময় সে স্থান উপস্থিত হইয়াছিলাম। ২টা কি ২১টার পূর্বে তাঁহার কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তৎপর মনে হইল যেন তিনি শুভার বাহিরে আসিয়াছেন। এই সময়েই তিনি আহ্বানের জন্ত বাহিরে আগমন করিতেন। তাঁহার বাহিরে আগমনের সাড়া পাইয়া আমি ইঙ্গিতে আমার আগমন বার্তা তাঁহাকে জানাইলাম। তখন তিনি ঘর খুলিয়া আমাকে প্রবেশিত পাইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার অতিশয় ভাবোচ্ছ্বাস হইল তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি অতি আগ্রহের সহিত আমার আশ্রম করিলেন। তিনি মৌনী ছিলেন বলিয়া বাক্যে তাঁহার ভাবেচ্ছাস কিছুই ব্যক্ত হইল না; কিন্তু আকার প্রকার জেরা বিশেষ অভিব্যক্ত হইল।

“আমি তাঁহার শুভার প্রবেশের দ্বারদেশে গমন করিয়াই দেখিতে পাইলাম ঘরের চৌকাঠের মস্তকে লিখিত আছে “নাহ ব্রাহ্মণঃ ন চাহ সাধুঃ।” একপা লিখিয়া, রাধিবার অভিশ্রম সহ্য অস্বীকৃত হইল না, পরিশেষে জানিতে পারিবাছিলাম উক্ত স্থানে সাধু এবং ব্রহ্মচর্য্যগর নিকটে লোকে নানা প্রকারের প্রহ্ম ভিক্ষাসার জন্ত গমন করিয়া থাকে। মৌনীবাবার সাধু বলিয়া খ্যাতি ছিল। একজ্ঞ তাঁহার নিকটেও লোকের সমাগম হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হয় বলিয়া লোকসমাগম বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বারদেশে উক্ত বাক্য লিখিয়া রাখিবাছিলেন।

“আমাদের মৌনীবাবা শুধু সাংসারিক সুখ হবিধাব বাসনা নষ্ট্রিয়ার করিয়াছিলেন তাহা নহে—সাধু নাম গ্রহণে যে সম্মান প্রাপ্তি নভাবনা, তিনি তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকসমাগমতে তিনি কিছুতেই পক্ষপ করিতেন না, তাহাকে তিনি সাধনকণ্টক স্বরূপই মনে করিতেন; একজ্ঞ সেই তীর্থহানের যে অংশে লোকের পক্ষাশ্রম নাই বলিলেই হয় এরূপ স্থানেই তাঁহার সাধন-শুভা হইয়াছে।

“তাহার সাধন-গুহ্য অবশ্য কবিতা দেখিলাম, গুহ্যেতে উপবেশন ও শব্দেব উপযুক্ত স্থান আছে, কিন্তু দাঁড়াইবার মত ব্যবস্থা নাই। সেই গুহ্যেতে বসিবার একখানি চৰ্ম্ম। উপাধানেব জন্ত একটা পাখরের লোডা এবং মশার উৎপাত নিবারণেব জন্ত ধূনা কবিবার প্রয়োজন হয় বলিবা একটা পাখরের খামার মত জিনিস আছে; উজ্জ্বল তিনটা বটা দেখা গেল, একটা একটু বড় জল রাখিবার জন্ত, অল্প দুটোটা একটা জলপানের জন্ত ও অপবটা পৌচাতিব জন্ত। এতদ্বিন্ন তাহার গুহ্যেব অল্প কোন বস্তু দেখা গেল না। তাহার পবিধানে আলখাল্লার মত এক বস্ত্র দেখা গেল। এসকলের উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে তিনি শরীর বক্ষাব উপযুক্ত বস্ত্রবও কত নূনত্ব ঘটাইয়াছিলেন। পার্শ্বি প্রয়োজনীয় পদার্থেব প্রস্তাব তাহার উপবে কত সামান্য ছিল, এসকল দ্বারা তাহাই অনুভূত হইতে পারে। পরিচ্ছন্নামির ত এই অবস্থা। আহাবেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিবা জানিলাম, পূর্বে কখনও বেলপাতাব রস কখনও বা অল্প একটু দুগ্ধ পান করিতেন। সেবপ করিতে তাহার শরীর এমন দুশ্ল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাকে কোনও ক্রমে বৃক্ক ভর দিয়া গুহ্যেব বাহির হইতে হইত। শরীরেব সেইরূপ অবস্থা আর কিছুই কঁবা যায় না বলিয়া অবশেষে অল্প অল্প ক্রটি ও তবকাবি আহার কবিতো প্রবৃত্ত হন। যিনি তাহাকে সাধনেব জন্ত গুহ্য করিয়া দিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনিই প্রতিদিন ২০টা ওটাৰ সময় কিছু-কট ও তবকাবি পাঠাইয়া দিতেন। দিনের মধ্যে একবার ঐ সামান্য আহাৰ্য্য গ্রহণ করিয়াই তাহাকে কঠিন মানসিক পরিশ্রমে নিমুক্ত হইতে হইত।

অতি প্রভুবে একবার গুহ্য হইতে বাহির হইবা নিয়ে নন্দীয়ার অবতরণ করেন প্রাকৃতিক সমাপন পূর্বক নন্দীয়া হইতে পানীয় জল লইবা গুহ্যেব প্রত্যাবৃত্ত হন। তাহার পর গুহ্যেব এবিষ্ট হইবা নিম্নমিত সাধনে রত হন। নিদ্রার স্বতন্ত্র সময় বা ব্যবস্থা নাই। শরীর নিত্যন্ত অবসন্ন হইলে অধিকাংশ সময়ে বোগাসনে বসিবা যে একটু নিদ্রা হয়। এই ভাবে লোক-সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া দিনের পর দিন যৌর একাধিকের মধ্যে তাহার সময় অতিবাহিত হইত।

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৌনীবাবাকে দেখিবা আসিয়া বলিয়াছিলেন,—“বুদ্ধদেবের স্তায় জীবন্ত সাধক দেখিবা আসিলাম। পূৰ্ব্বে বুদ্ধেব কঠোর তপস্তার কথা পড়িয়াছিলাম, এংর বচকে দেখিবা আসিলাম।”

অপূর্ব মিছিল।

পাঁচ বৎসর ঔকারনাথ বাসের মধ্যে মৌনীবাবা একবার মাত্র শহরে গিয়াছিলেন। এক অস্বাভাবিক মেলার তাহাকে পাঙ্কীর স্তায় একপ্রকাব যানে উঠাইয়া লইবা সকলে মিলিয়া শহর পরিভ্রমণ করাইয়া আনিবাছিল। এই দিন শহরবাসী এবং বাত্রিগণ তাহার প্রতি যে সম্মান দেখাইবাছিল তাহা বর্ণনাতীত। সকলে তাহাকে জোর করিয়া বধন বান ঢুলিবা লইল, তিনি ধ্যানস্ত হইলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি করিবা সকলে টাক। পয়সা কড়ি চড়াউতে লাগিল। প্রায় আড়াই মাইল পথ এই প্রকার মিছিল হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাহকগণ তাহাকে গুহ্যেব কিরাইবা দিয়া গেল।

শেষ জীবন।

মৌনীবাবা দেহত্যাগেব তিন চারিমােস পূর্বে একখানা চিঠি লিখিবা-
তিলেন। এই চিঠিতে তাঁতাব শেষ জীবনের আধ্যাত্মিকতার পরিচয়
পাওয়া যায়। নিয়ে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

দ্ব্যমব অপাৰ কল্পণা কবিবা আমাব সমস্ত উপাধি বিনাশ করিয়া-
ছেন। আমি এবং আমার এখন কিছুই নাই। সমস্ত জগতই সেই

একমাত্র পরাৎপর পরমাত্মারই প্রকাশ। আমার কোন সমাজ নাই, জাতি নাই, কুল নাই; মান অপমান এবং ঘৃণা ও আদর কিছুই নাই। আমার নিকট সমস্ত সমাজ এবং সর্বলোক এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার শত্রু মিত্র কেহ নাই, আমাব ভাই ভগিনী, মাতা, পিতা কিছুই নাই। এক ব্রহ্মই সর্বভূতে চরাচরে স্বন্দররূপে জাগ্রত জীবন্তভাবে প্রকাশিত। আমি কাহাকে আপনার এবং কাহাকে পর বলিব এবং কাহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিব? এখন সর্বজীবে এবং সমস্ত লোকে আমার সমস্তাব এবং অতি পবিত্রতাব। আমার মন্তক শরীর, ক্রক এবং বৌগ প্রভৃতি মহাত্মাপণ হইতে একটি কাটাখুঁকীতে নিকট আমার অন্তবান্ধা দয়ালহরি প্রকৃতপক্ষে এবং ভক্তির সহিত অবনত করিতে শিকা দিয়াছেন। এখন আমি সর্বলোক সহিত সেই অখণ্ড অব্যয় পুরুষকে মন্তকে ধারণ করিতেছি। এখন আমি অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ব্রাহ্ম আমার নিকট এক হইয়াছে; পাণ্ডী এবং পুণ্ড্রা এক হইয়াছে। আহা, আমার অন্তবান্ধা দয়ালহরিব কতই দয়াল। আমি ধর্মপ্রচাৰ প্রভৃতি বেনকল মিথ্যা উপাধি ছাড়য়ে ধারণ করিবা আসিবাছিলাম তাহা সমূলে বিনাশ করিবা আমাকে কচিখোকা করিবাছেন। এখন কাহারও নিকট কিছু চাহিতে এবং জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। দয়ালহরি আপনাপনি প্রার্থনা বিনা সকল বিধান করিতেছেন এবং সংসার হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আমি বিপথে বাইতে চাহিলেও কিরাইবা আনিতেছেন।”

নির্বাণ।

পাঁচ বৎসর পরে ১৯০১ সনের মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে মৌনীবাবা কথ্য কহিলেন। সকালবেলায় মিঠাই বিক্রেতা ও তাহার পত্নীকে ডাকিবা বলিলেন—“তোমরা আমার মা বাপ। আমার শেষ তোমরা করা কর, তোমরা আমার বড় উপকার করিবাছ। ইচ্ছামত আমার সেবা করিতে পাব না বলিয়া দুঃখ কর; আজ তোমাদের বাহা ইচ্ছা আমাকে আনিয়া দাও—আমি খাইব।”

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কি খাইবেন?” মৌনীবাবা বলিলেন “খিচুড়ী করিবা আন।”

সেবক পত্নীসহ খিচুড়ী আনিতে গেল। আসিবা দেখে মৌনীবাবা সমাধিহ। ধ্যান ভঙ্গের প্রতীকার তাহাৰা সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়া রহিল, কিন্তু বাবার আর ধ্যান ভাঙ্গিল না। তাহারা বুঝিল না যে মহাসাধনা অন্তে মৌনীবাবা নির্বাণ লাভ করিবাছেন, তাহার এ সমাধি আর ভাঙ্গিবার নয়। অবশেষে বধন সব বুঝিল, সন্ত পুত্রহারা জনক জননীৰ স্তাব ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দেহান্তে বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্র হইয়া নন্দীবাটীয়ে প্রস্তর মধ্যে মৌনীবাবার পরিত্যক্ত দেহ সমাধিহ করিয়া আসিল, এদিনও ঔকারনাথে আকর্ষণ দৃষ্ট দেখা গেল। স্থানবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মৌনীবাবার গুহ্যে আসিয়া তাহাব প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিল। পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা সম্বন্ধিত কবিবা মৃতদেহ সমাধিবাটে লইয়া বাওয়া হইল। পঁচিশখান কাপড় ও পাঁচ মণ মালপুৰা বিতরিত হইল এবং মৌনীবাবার নামে মুহমূহঃ জঘদানি উঠিয়া ঔকারনাথকে কস্পিত করিয়া ঢুলিল।

এইরূপে ৩৬ বৎসর বয়সে মৌনীবাবার নির্বাণ লাভ হইল। নব্য ভাবতর এক মহাসাধক গোপনে আবির্ভূত হইবা গোপনেই জীবনের কার্য সমাপনাতে অন্তহিত হইলেন।

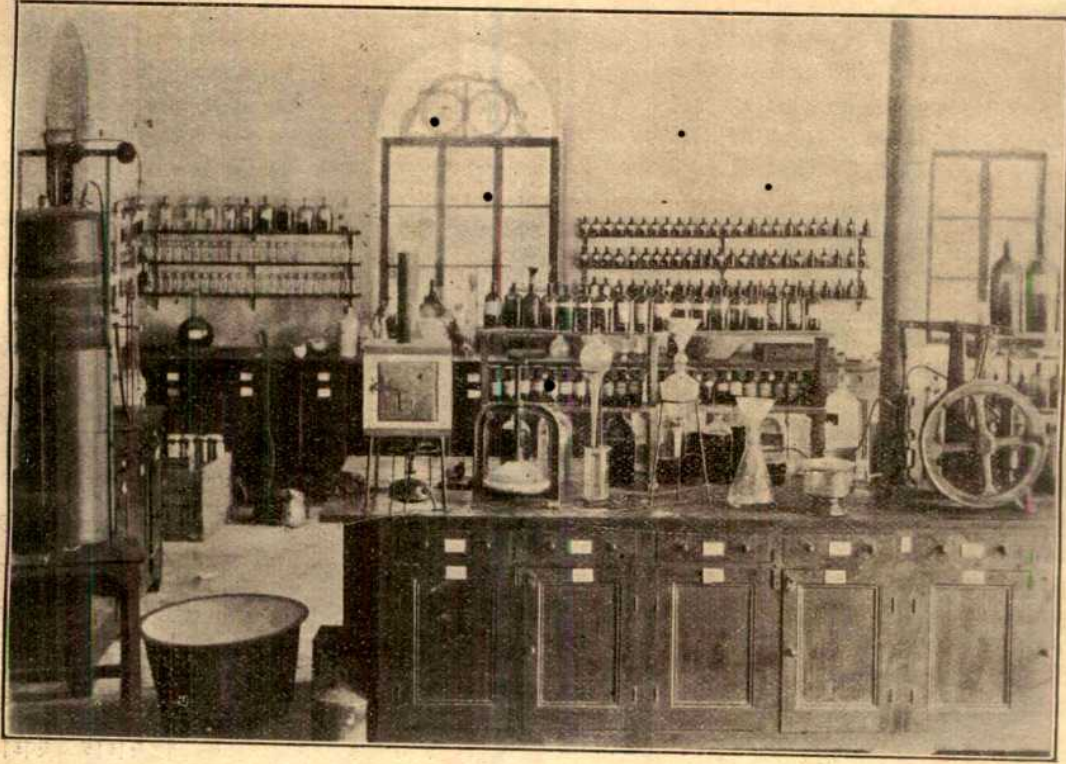
মহেশচন্দ্র ঘোষ।

একটি স্বদেশী কারখানা

সে আজ বিশ বৎসরের কথা। কলিকাতার ২১ নং আপার সাকুলার রোডে একটি একতলা বাড়ীর এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ঘরে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আবাস। বাড়ীর সামনে ও পিছনে খোলা জমি। ইতস্ততঃ খোলা, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী, কাঠের পিপা

উপক্ৰম করিতেছে। এই হাড় ভস্মীভূত হইয়া তাহার উপাদান হইতে ফসফোরস (phosphorus) ঘটত ওষধ প্রস্তুত হইবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। এই প্রকার নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। যে কারখানার বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করিতেছি, ভগবানের বিধান অনুসারে ঐ প্রকারে তাহার সূচনা হইতেছে।

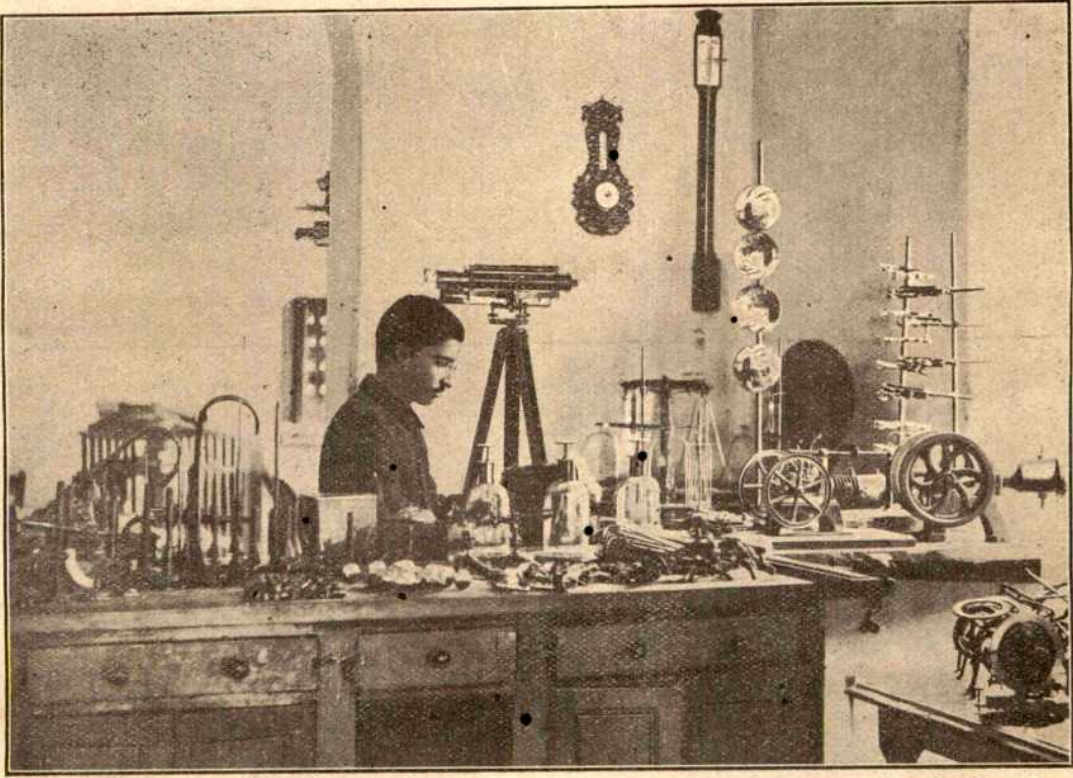
অনেক যুবকই বলিয়া থাকেন মূলধন নাই বলিয়া



বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিভাগ।

বিক্ষিপ্ত। কোথাও গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) ও লোহার ছাঁট (scrap iron) সংযোগে হীরাকষ প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও লেবুর রস হইতে সিট্রিক অম্ল (citric acid) বানাইবার চেষ্টা হইতেছে, কোথাও সোরা ও গন্ধক দ্রাবক যোগে তেজু আবু (nitric acid) চোলাই (distillation) হইতেছে। আবার ছাদের উপর মাংসবিক্রেতার দোকান হইতে সংগৃহীত কাঁচা হাড় শুকাইতেছে;—পাড়ার লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপত্তি করিতেছে এবং মিউনিসিপালিটিতে দরখাস্ত দিবার

আমাদের দেশে ব্যবসা ও কারবার চলে না। কিন্তু ইহা সর্বাংশে সত্য নয়, আসল কথাও ইহা নয়। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে “নাছোড়বান্দা” হইয়া লাগা চাই, এবং লাগিয়া সামান্য আরম্ভ হইতে শিক্ষা-নবিশী করা চাই। একেবারে মস্ত একটা কিছু করিয়া বসিব, ভাবিলেই, কার্য্যহানি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ও পরে অনেকগুলি যৌথ কারবার খোলা হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি মৃত, কোনটি বা যুঁহুঁ কত উঠিল, কত ডুবিল, ইহার কারণ কি?



বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ঠিক নির্মিত হইয়াছে, কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার ঘর।

মাড়োয়ারীরা লোটা ও রসুনী সম্বল লইয়া রাজপুতানার মরুভূমি হইতে আসিয়া বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিল কি প্রকারে? বাঙ্গালী কেবল কেরানীগিরিতে পটুতা এবং ওকালতী বুদ্ধি লাভ করিতে শিখিয়াছে।

ডাক্তার রায় যখন “বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসি-উটিক্যাল ওয়ার্কসের” সূত্রপাত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আয় ছিল, আয়কর ৬১০ বাদে, মাসিক ২৪৩১। তখন পৈত্রিক ঋণও ছিল, এবং তাঁহার দানের পরিমাণটা বরাবরই খুব বেশী। এই বেতনে তিনি ৭৮বৎসর চাকরী করিয়াছেন। অথচ তাঁহার দ্বারা এত বড় একটা কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

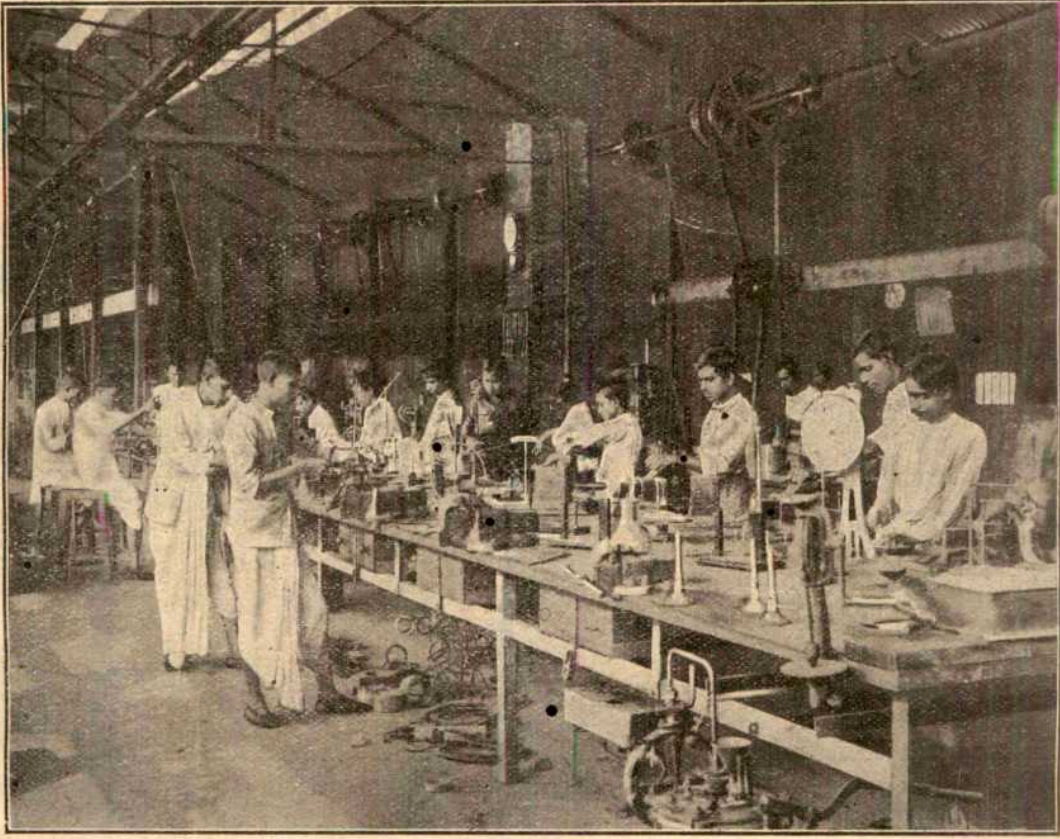
কারখানার এই প্রারম্ভাবস্থায় আর একজন উদ্যমশীল, অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও স্বার্থত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বসু। ইনি ডাক্তার রায়ের বাল্য-

সুহৃদ। উভয়ের সহযোগ মণিকাঞ্চন যোগের মত হইল। অমূল্য বাবু আসিয়া না যুটিলে কারখানাকে লাভের ব্যাপার করা আরও সময়সাপেক্ষ এবং কঠিনতর হইত। প্রথম অবস্থায় ইঁহারা ব্যক্তিগত লাভলোক্সানের দিকে তাকান নাই; স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, কাজটিকে কেমন করিয়া সফল করা যায়, একমাত্র তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

অমূল্য বাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সিংহও রসায়নে এম্-এ পাশ করিয়াই এই কাজে যোগ দেন। পরিতাপের বিষয় এই যে অল্পকাল পরেই এই উৎসাহী পুরুষের, ভ্রমক্রমে স্বহস্তে প্রসিক এসিড বিষপ্রয়োগে, প্রাণবিয়োগ হয়।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাট্টা, প্রভৃতি আরো অনেকে এই কারখানার জ্ঞান পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম করা সুসাধ্য নয়।

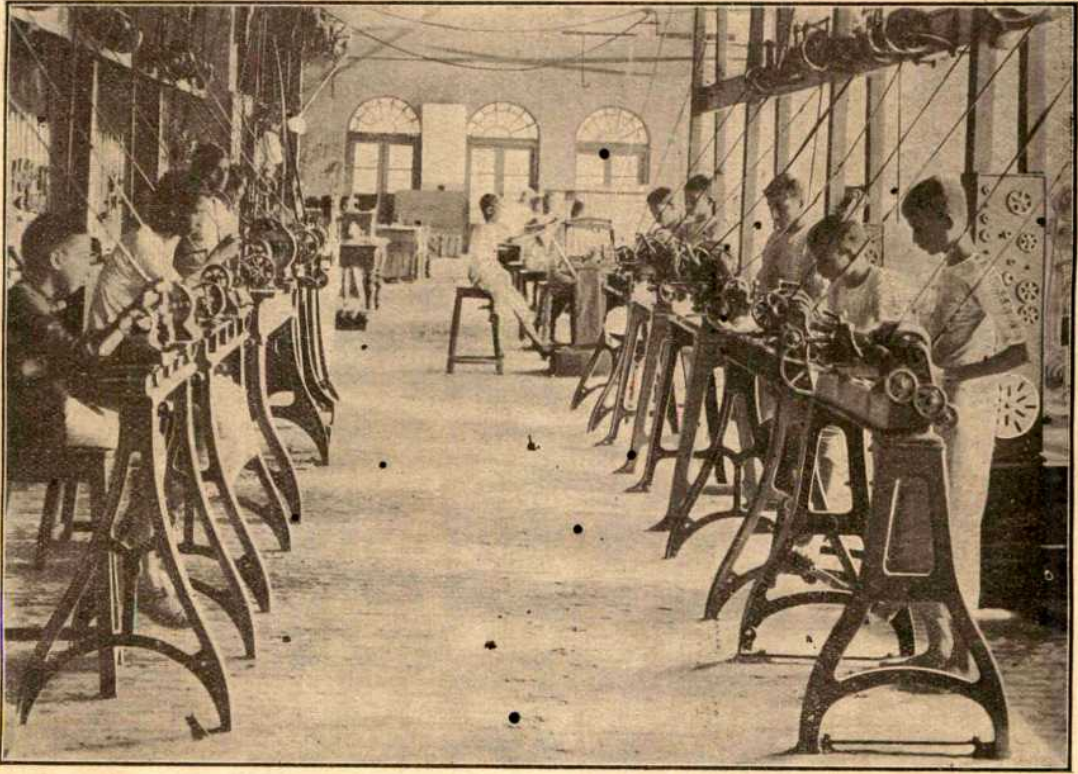
ব্যবসা দ্বারা শুধু জীবিকার্জন নয়, সম্মান ও শক্তি



যন্ত্র নির্মাণের কারখানা—স্বল্পযন্ত্র-বিভাগ।

লাভ করিতে পারি, এই কথাটা স্বদেশী আন্দোলনের দিনে সহজ ও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উৎসাহের প্রথম আবেগে একে একে অনেকগুলি কারবার জন্মলাভ করে। কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, সাবান চিনি, চামড়া, কলম, পেন্সিল, দেশলাই, ইত্যাদি কত রকমের কারখানার অন্বেষণ হইয়াছে। আজ সাময়িক উত্তেজনার অবসাদ কালে দেখিতে পাইতেছি যে কারবার আরম্ভ করা যত সহজ, স্থায়ী ও লাভবান করা তত সংজ্ঞা নহে। অনেক সজোজাত কারবারের অবস্থা আশাশ্রিত নহে। আজকাল বাঙ্গালীর যৌথ-কারবারের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ভরসার ও গোরবের স্থল। পূর্বেই দেখাইয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্বে অতি ক্ষুদ্র আয়তনে ইহার সূচনা হয়। পরলোকগত ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সন্তানোপম যত্নে এই কারবারটিকে

বর্ধিত করিতে থাকেন। পরীক্ষা কাল উত্তীর্ণ হইলে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে কারবারটি দাঁড়াইয়াছে তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিবার জন্ত ইহঁারা কারবারটিকে লিমিটেড করিয়া লয়েন। কিন্তু এই অবস্থায় আসিতে অল্পষ্ঠাতৃগণকে যথেষ্ট বাধা ও বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় দেশীয় ঔষধের উপর এখন লোকের যে আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বেঙ্গল কেমিক্যালের দরুনই হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় দেশীয় ঔষধ কোন ডাক্তারই বিশ্বাস করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। যদিও এই প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করা তৎকালে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল,—তথাপি শুধু এই গইয়া থাকিলে কারবার চালান যায় না বলিয়া এই কারখানা পেটেন্ট ধরণের বিলাতী ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এটকিনের টনিক, পারিসের



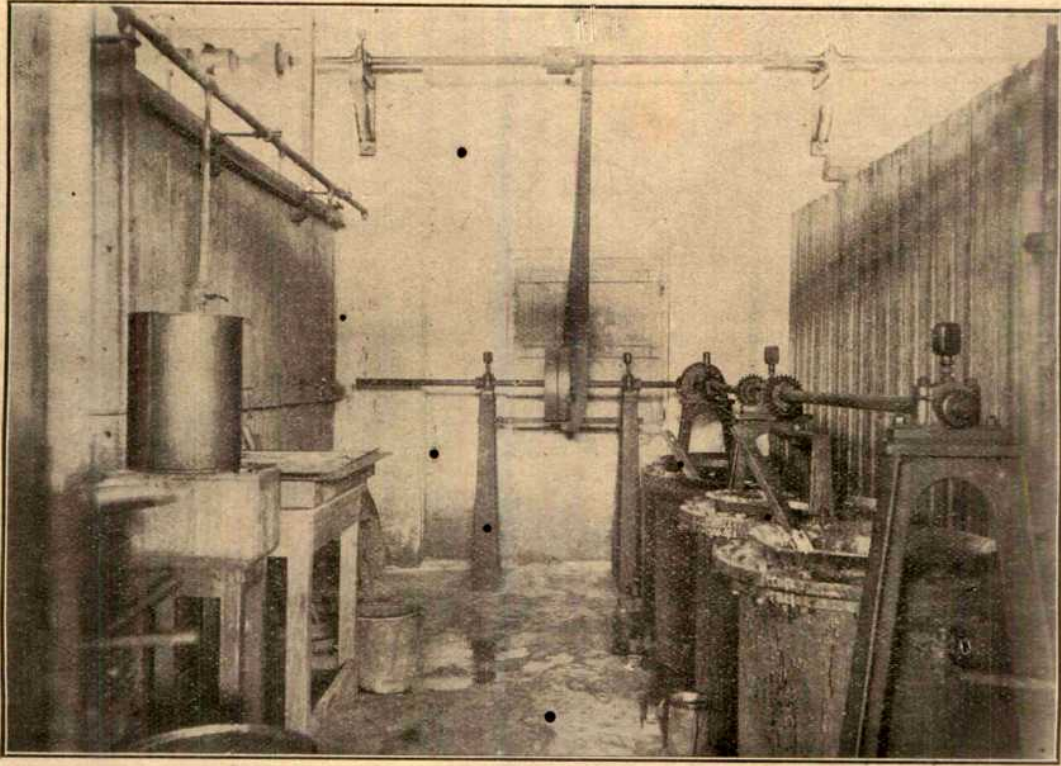
খরাদকরার ঘর।

কেমিক্যাল ফুড ইত্যাদির তৎকালে কাটুতি ছিল। এই সকল বাঁধা ধরণের ঔষধ বিক্রয় করিয়া ইহঁারা দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত করিবার ও কিছু দিন জীবিত থাকিবার উপযুক্ত সম্পদ সংগ্রহ করিতেন। “যমানি জলসার” আজকাল অনেক স্থানেই প্রস্তুত হইতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যালে এই ঔষধ প্রথম প্রস্তুত হয় এবং ইহঁরাই যমানি জলের উপকারিতা সাধারণে প্রচারিত করেন। কোম্পানীর তৎকালীন হিসাবপত্রে পাঁচ আনার বোয়ান কিনিবার রসিদ পাওয়া যায়; আজ ইহঁরা এককালে সহস্রাধিক টাকার বোয়ান কিনিতেছেন।

২৫০০ টাকা মূলধন লইয়া লিমিটেড কোম্পানী হইবার পরেও ৩৪ বৎসর কাল ৯১ নং আপার সারকুলার রোডে ইহঁাদের আফিস ও কারখানা উভয়েই ছিল। কারবার প্রসারিত হইলে সারকুলার রোডের বাড়ীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কুলান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন ইহঁরা ৯০ নং মাণিকতলা মেন রোডে কারখানা স্থাপিত করেন। এই

সময়ে ইহঁাদের মনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত দ্বারা লাভবান হইবার ইচ্ছা হয়। অদম্য সাহস ও বিচক্ষণ ব্যবসায়-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ইহঁরা গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত আরম্ভ করেন। ইহঁাদের দ্রাবক বাহির হইয়াছে বলিয়া বাজারে দ্রাবকের মূল্য শতকর ২৫ হইতে ৩০ টাকা স্থলভ হইয়াছে। আজকাল আপার সারকুলার রোডে কেবল আফিস আছে। সর্বপ্রকার প্রস্তুতকার্য মাণিকতলার কারখানায় হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে একবার এই কারখানা দেখিয়াছিলাম। আবার গত ১২ই চৈত্র তারিখে কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া ইহঁাদের মাণিকতলার কারখানা দেখিতে গিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ডাক্তার রায় এবং কারখানার সুযোগ্য কার্যাব্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়া সমুদয় ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। বিস্তৃত জমির উপর কলঘর, ফার্মেসী, এসিড ঘর, ছুতোরের ঘর, ল্যাবোরেটরী, প্যাকিং ঘর, ঢালাইঘর, গুদাম, কর্মচারীগণের মেস্ সুশৃঙ্খল ভাবে চত্বরাকারে সাজান। নানা



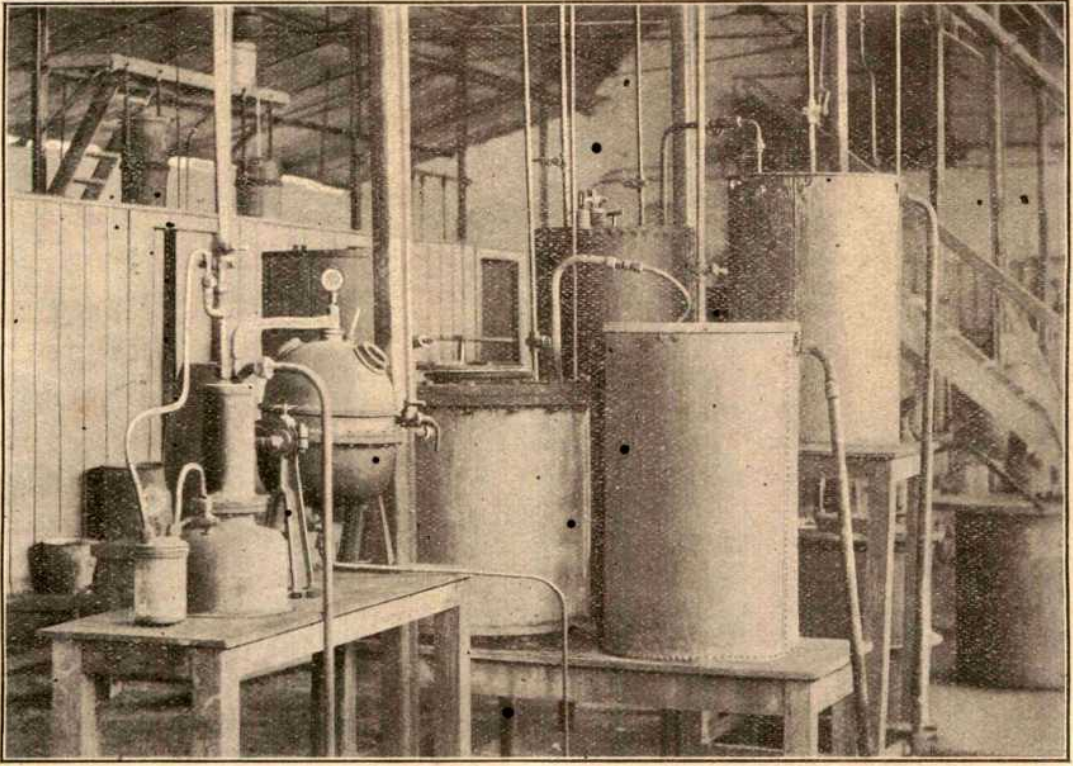
ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা। ঘনীকরণ ও নির্ঘাস বহিষ্করণের পাত্রাদি।

প্রকার শব্দে মুখরিত এই কারখানাটি জীবন্ত চিত্রের স্থায় মনে হয়। ইহাদের সকল কার্য এবং ব্যবস্থার ভিতরে একটা প্রাণ আছে, একটা সামঞ্জস্য আছে। ইহারা ঠেকিয়া শিথিয়াছেন যে কার্য পরিচালনার জন্ত যথাসম্ভব নিজেদের কারখানার উপর নির্ভর না করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সেইজন্ত এই একটা কারখানায় দশ রকমের ব্যবসায়সংঘ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রথমেই দেখি ছাপাখানা। ঔষধের কারবার আছে, আচ্ছা বেশ; কিন্তু তার ভিতর আবার ছাপাখানা কেন? ইহাদের করাত কল, চালাইখানা সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করা চলে। কিন্তু একবার ঘুরিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের সহজ উত্তর পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে কারখানার সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্ত এইসব আবশ্যক। আমরা দেখিলাম যে ছইটি বড় মেশিন প্রেস ও ছইটি ছোট প্রেসে কেবল নিজেদের বিজ্ঞাপন, লেবেল, ক্যাটালগ ছাপা হইতেছে। প্রিন্টার, কম্পোজিটার, মেশিনম্যান লইয়া এই ছাপা-

খানাকেই একটা স্বতন্ত্র কারবার মনে হয়। এত কাজ যদি বাহিরে করিতে হইত তবে ব্যয় ত বহুল পরিমাণে অতিরিক্ত হইতই, অসুবিধারও অন্ত থাকিত না। একই প্রকার ছাপার কার্য বারবার করিতে হয় বলিয়া ইহাদের ষ্টিরিওটাইপ করিবার বেশ বন্দোবস্ত আছে। ইহারা নিজেরাই উডব্লক, ইলেক্ট্রো প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

ওয়ার্কশপে গিয়া দেখি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। জানিলাম প্রথমে গুটিকতক মাত্র কল বসাইয়া অল্প স্বল্প বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও বেশীর ভাগ ইহাদের ফার্মেসীর ফিটিংএর কাজ করিতে হইত। নিজেদের কল ও ইমারতের কার্য এই ওয়ার্কশপটি থাকার দরুন সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে।

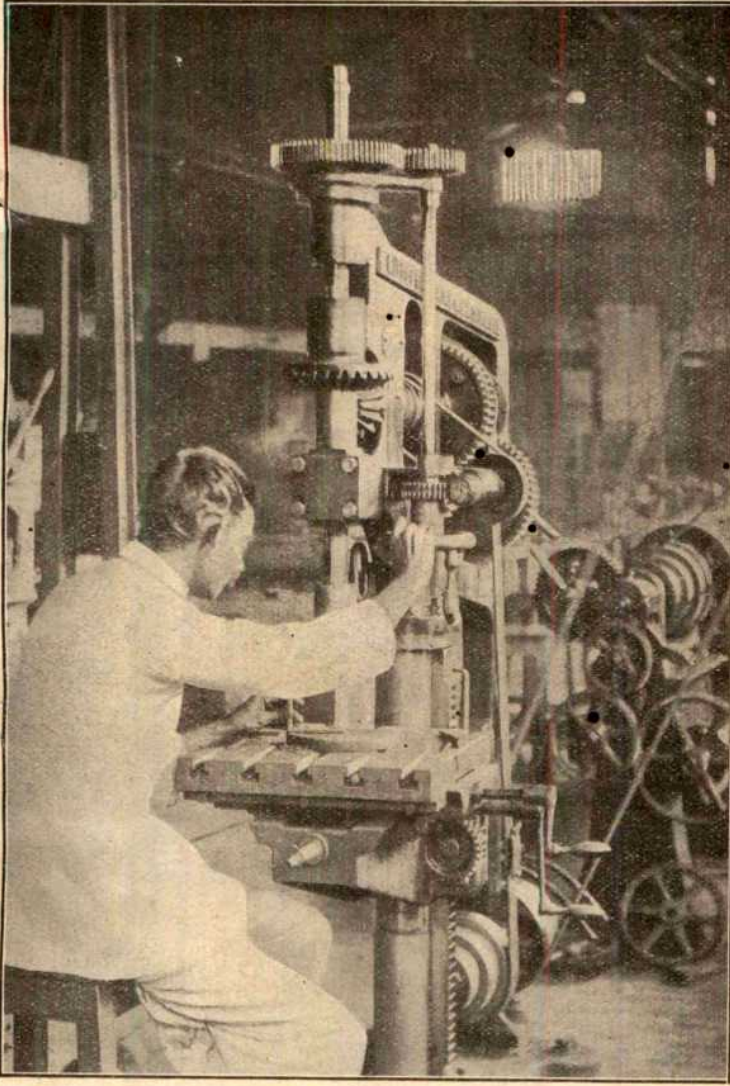
নিজেরা না করিয়া বাড়ী তৈরী প্রভৃতি কোনও কোনও কাজ হয়ত বাহিরের কণ্ট্রাক্টর দ্বারা করাইলে তুল্য ব্যয়ে সম্পন্ন হইত অথচ নিজেদের ঝগুট বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু অপরের নিকট যাহা ঝগুট ইহারা তাহাই



ঔষধ প্রস্তুত বিভাগ। বায়ুশূন্য পাত্রে নির্যাস বহিকরণ প্রক্রিয়া (Vacuum Extraction Process)।

অভিজ্ঞতার মূল্য জ্ঞানে গ্রহণ করেন। নক্সা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত এত রকমের, এত বিভিন্ন কার্যোপযোগী কল বসাইয়া ও গৃহ নির্মাণ করিয়া ইহাদের পাকা শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আজ ইহারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ল্যাবোরেটরী-ফিটাস বুলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ল্যাবোরেটরীতে ব্যবহার্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ওয়ার্কশপে প্রস্তুত হইতেছে। তদ্যতীত কলেজ-সমূহের ল্যাবোরেটরীর পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার আবশ্যকীয় কাজ করিতে ইহারা পারদর্শী হইয়াছেন। কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল হইতে বিশেষ উপায়ে গ্যাস প্রস্তুতের ব্যবস্থা ইহারা অনেকস্থানে করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, গোহাটী, কটক, বাঁকীপুর, মাদ্রাজ, লাহোর, যেখানে ল্যাবোরেটরী প্রস্তুত হইতেছে, সেইখানেই ইহারা আহৃত হইয়া প্রশংসার সহিত কার্য সম্পন্ন করিতেছেন। ল্যাবোরেটরী প্রস্তুত করিতে হইলে খ্যাতনামা

অধ্যাপকগণও ইহাদের পরামর্শ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেশ বড় রকমের একটি ওয়ার্কশপ আছে বলিয়াই এইসকল কাজ সুচারুরূপে করিতে পারিতেছেন। ওয়ার্কশপে অনেক লোক একত্র কাজ করিতেছে। এতগুলি লোকের প্রাত্যহিক কাজের হিসাব রাখা একটি গোলমালে ব্যাপার। ইহারা এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব হইতে থাকে। যখনই কোনও কাজ আরম্ভ হয় তখনই ক্রমিক সংখ্যা ও কাজের নাম দিয়া একটি খাম রাখা হয়। সকালে আসিয়া ফোরম্যান কাজ বিলাইয়া দেয়, সন্ধ্যাবেলায় কারিগরেরা নিজেদের কাজ তাহাদের নামে উঠাইয়া দেয়। ছোট ছোট ছাপান ফারামে তাহাদের কাজ লেখা হয় এবং অর্ডারের নাম ও ক্রমিক নম্বর তাহাতে ফেলা হয়। এ ফারামে কারিগরের মজুরীও ঘণ্টা হিসাব করিয়া ফেলা হয়। তারপর এই ফারামগুলি যে যে কাজের জন্ত সেই সেই খামের ভিতর রাখা হয়। গুদাম হইতে



বস্ত্র নির্মাণের কারখানা। ছিদ্র করিবার যন্ত্র।

মাল বাহির করিবার জন্ত “ম” চিহ্নিত নির্দিষ্ট ফারাম আছে তাহাতে যে কাজের জন্ত মাল লওয়া হইতেছে সেই কাজের নাম ও নম্বর দেওয়া থাকে। সমস্ত দিনে যত মাল বাহির হয় তাহা নিজের খাতায় উঠাইয়া ও চেক করিয়া জিনিষের মূল্য ফেলিয়া গুদামসরকার এই ফারামগুলি ওয়ার্কশপে ফেরৎ দেয়। যে যে কাজের জন্ত জিনিষ বাহির হইল, পুনরায় সেই সেই খামের ভিতর এই ফারামগুলি রাখা হয়। কোনও কাজ যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার খামের ভিতর মজুরী ও জিনিষের মূল্য হিসাবী ফারামও

তেমনি ভর্তি হইতে থাকে। খামের পৃষ্ঠে অভ্যন্তরস্থ ফারামের মূল্যের অঙ্কগুলি তোলা হয়। কাজ শেষ হইলে মজুরী ও জিনিষের মূল্য একুনে যে টাকা হয় তাহার উপর শপ চালাইবার ব্যয় শতকরা হিসাবে ফেলিয়া মোট খরচা বাহির করা হয়।

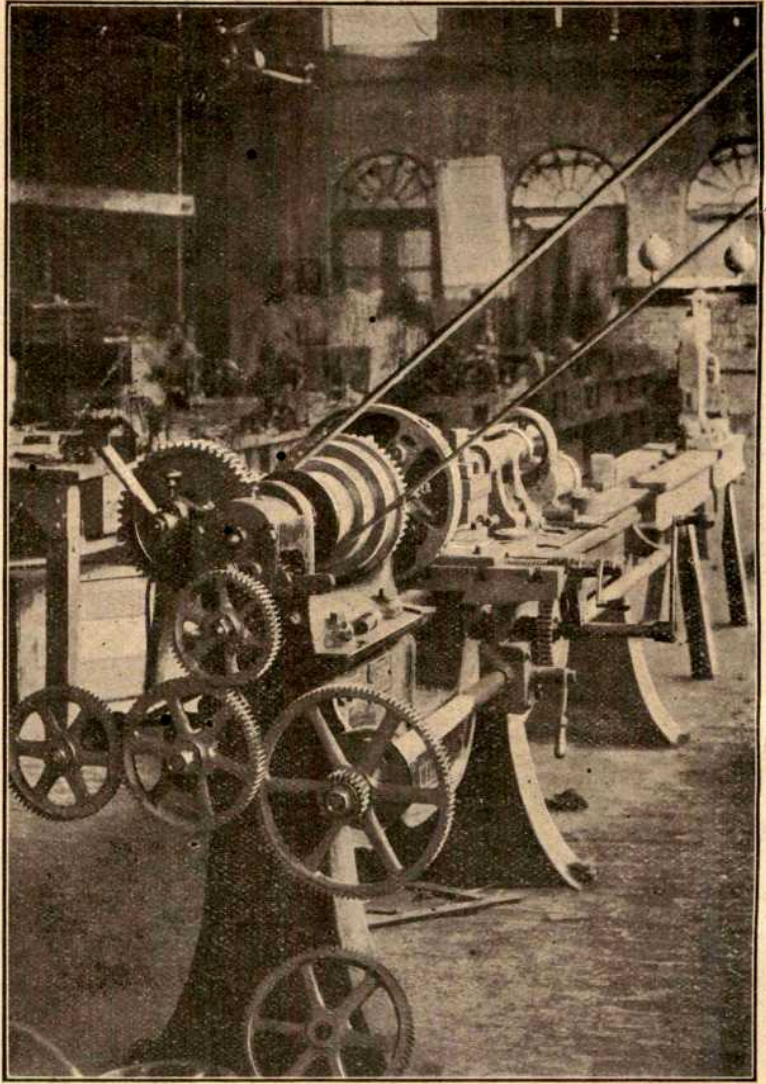
ওয়ার্কশপে দেখিলাম সুন্দর সুন্দর পাখা প্রস্তুত হইতেছে। নীচে কেরোসিনের বাতি জ্বলাইয়া দিলেই পাখা ঘুরিতে থাকে। অনেক ছোট বড় যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে যাহার নির্মাণকৌশল ও সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

এসিড ঘরে দুইটা সীসার চেম্বার আছে। চেম্বারগুলি আগাগোড়া সীসার তৈরী। সীসা ঝালিবার জন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করিতে হয়। দক্ষ লেড-ম্যানবাতী এই কাজ অপরের দ্বারা হইবার নহে। ইহারা হাতে ধরিয়া লেডম্যান তৈরী করিয়া লইয়াছেন। এমন নিপুণতার সহিত চেম্বার তৈরী যে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে বিলাত হইতে দক্ষ কারিগর আনিয়া করিলেও ইহা অপেক্ষা

সুন্দর হইত না। চেম্বারের কাজ দিবারাত্র সমান চলে এবং প্রত্যহ ৪ হাজার পাউণ্ড এসিড প্রস্তুত হয়। গিণ্টীর কাজে, সোডাওয়াটারের কলে প্রচুর এসিড বিক্রয় হয়। গবর্ণমেন্টের টাকশাল, টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ, গোলা বাকদের কারখানা প্রভৃতিতে ইহাদের এসিড সরবরাহ হয়। এ দেশে সহযোগী রাসায়নিক দ্রব্যের কারবার না থাকায় এসিডের কাটিত অনেকটা সীমাবদ্ধ। ফটকিরি, সোডা, ব্লীচিং পাউডার, গ্যালভানাইজিং প্রভৃতি কারখানায় এত এসিড লাগে যে ইহাদের একএকটা কারখানার জন্ত একটা করিয়া

এসিডের ব্যবসা চলিতে পারে। নানা কারণে এদেশে ঐসব কারবার হইতে পারে নাই—শীঘ্র যে হইবে এমন আশাও নাই। অপরিসীম রেলভাড়াই ফটুকিরী সোডা প্রভৃতি কারবার চালাইবার প্রধান অন্তরায়। মধ্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় মাল আনা হইতে যে ভাড়া পড়ে বিলাত হইতে আনিতে হইলে তদপেক্ষা কমে হয়। ইউরোপে সর্বত্র পাইরাইট হইতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়। গন্ধক হইতে এসিড প্রস্তুত এক-প্রকার উষ্ণ গিয়াছে। পাইরাইটের মূল্য অনেক কম কিন্তু এ দেশে এ পর্যন্ত ভাল পাইরাইট পাওয়া যায় নাই। স্পেন হইতে পাইরাইট আনিতে পারিলে সুবিধা হইত কিন্তু ষ্টীমার ভাড়া দিয়া আর বিশেষ লাভ থাকে না। আমরা জানিতে পারিলাম যে বোম্বেতে এখনো বিলাত হইতে সালফিউরিক এসিড আমদানী হয়। রেল ভাড়ার আধিক্য হেতু কলিকাতা হইতে বোম্বেতে এসিড পাঠান অসম্ভব। বোম্বে গিয়া ইঁহারা একটা এসিডের কারখানা খুলিলে হয়ত সুবিধা হইত।

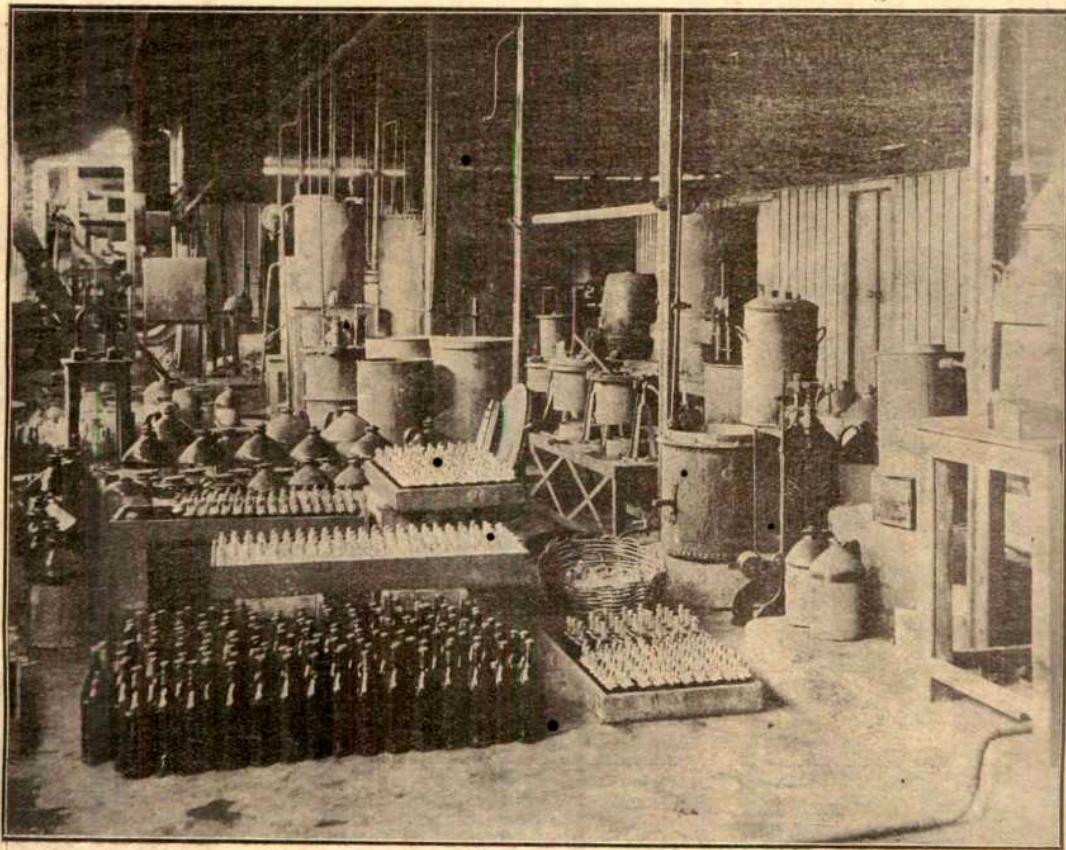
ফার্মেসীতে প্রবেশ করিলেই পাইপের অরণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষ্টীম পাইপ, হাওয়ার পাইপ, নিক্ষেপিত হাওয়ার পাইপ, অপরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ জলের পাইপ ইত্যাদি। যন্ত্রাদিরও অন্ত নাই। পারকোলেটর, একষ্ট্রাক্টর, ইভাপোরেটর, ট্যাংকার প্রেস, ফিলটার প্রেস, রকমারী ষ্টীল, ইত্যাদি। সবগুলির নাম মনে রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদেরি বাসক, গুড়ুটী, কুটজ, নিম, এইসকল কলের ভিতর দিয়া বিভিন্ন বর্ণ গন্ধ গুণ ও নাম লইয়া বাহির



খরাদ করিবার যন্ত্র।

হইতেছে। এই করিয়াই বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন একদিন ছিল যখন আরব, পারস্ত, তিব্বত, চীন, ও সিংহল হইতে চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ শিক্ষার জন্ত ভারতবর্ষে সমাগত হইতেন। ডাইয়সকর্ডেস দুই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীস হইতে এদেশে আসিয়া আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। চরক ও সুশ্রুত কোন্ সুদূর অতীতকালের অমরত্ব মণ্ডিত তাহা স্থির নির্দ্ধারণ করা হুঃসাধ্য। তবে তাহা যে ২৫০০

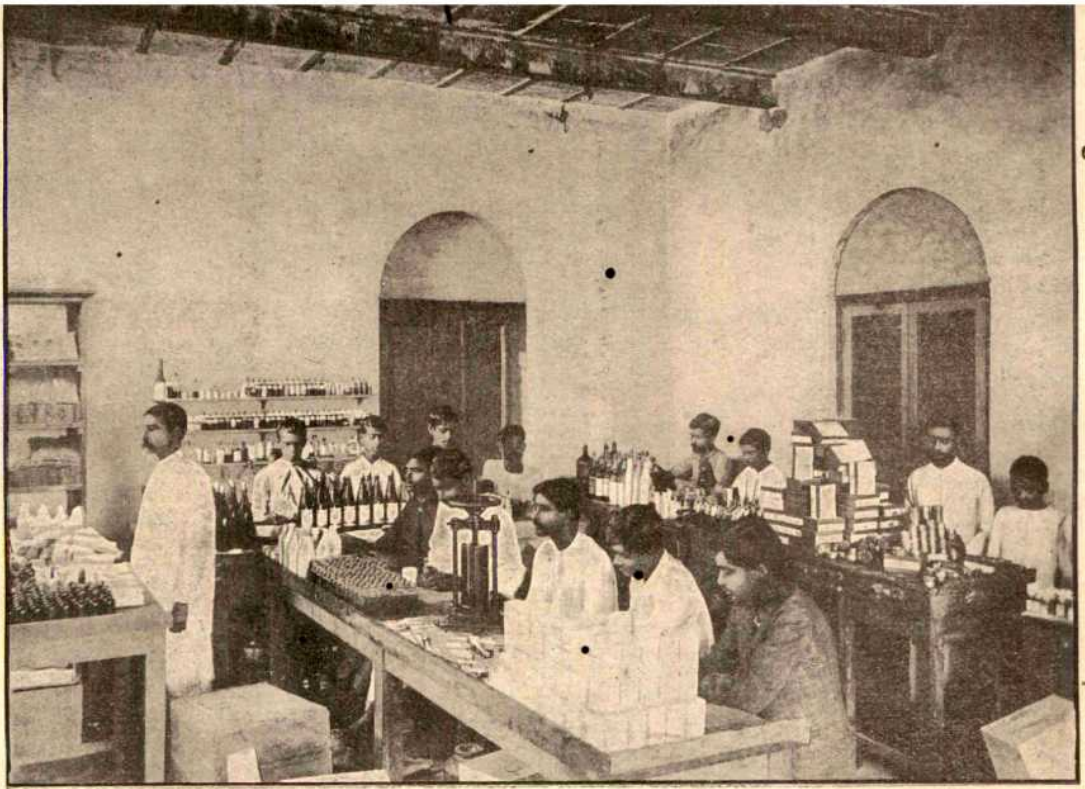


ঔষধাদি শিশ বোতলে পুরিবার ঘর।

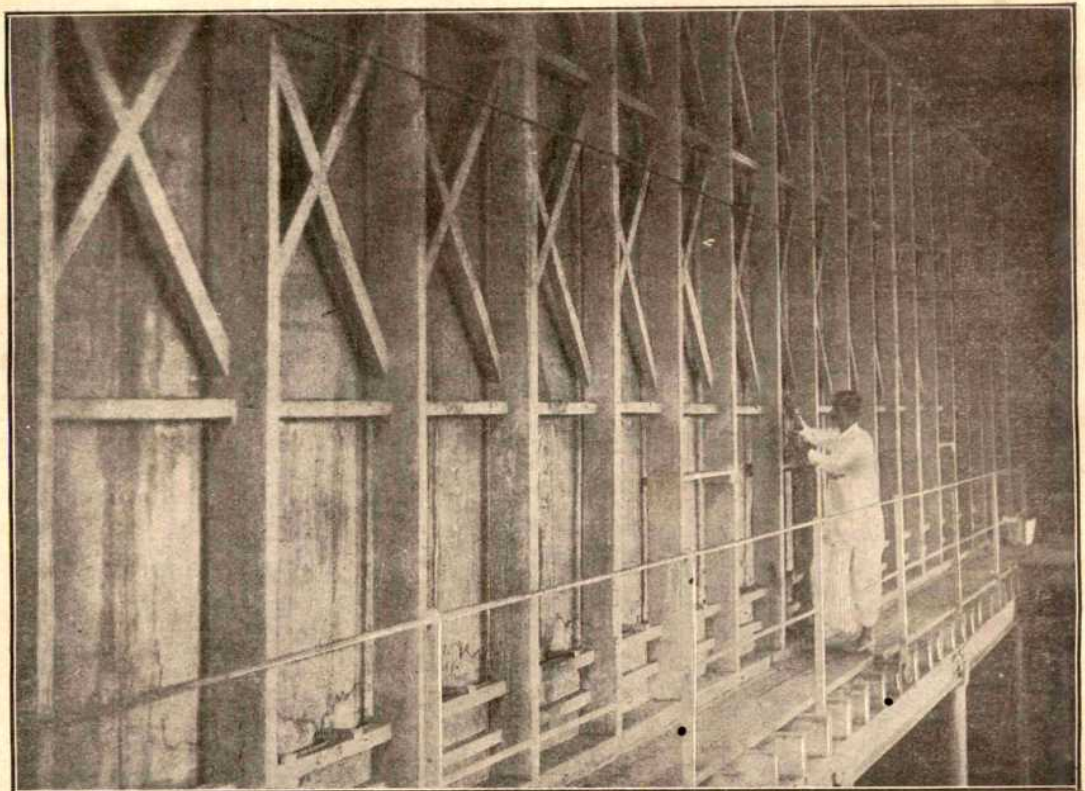
বৎসরের পূর্বের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চরক স্মৃতির পরেই বাগ্‌ভটের “অষ্টাঙ্গহৃদয়”; তাহাও একুশশত বৎসরের পুরাণে। বোম্বাদের খালিকার রাজসভায় হিন্দু কবিরাজগণ রাজবৈজ্ঞ ছিলেন; সেও আজ হাজার বছরের কথা। এই সময় হইতে কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এই সময়েই ধাতুঘটিত ঔষধ, ক্ষারাদি, পারদঘটিত ঔষধাদি কবিরাজী শাস্ত্রে স্থান পায়। যে বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধিৎসা কবিরাজী শাস্ত্রকে আদরণীয় করিয়াছিল পরবর্তী কালে তাহা লোপ পাইতে থাকে। কবিরাজগণ বংশানুক্রমে প্রচলিত ধরণে চিকিৎসা করায় কবিরাজী চিকিৎসা আজকালকার অবস্থায় আসিয়া পহঁছিয়াছে। গত শতাব্দীতেও কবিরাজী চিকিৎসা এতদপেক্ষা উন্নত ছিল। ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলিত

হওয়ার দেশীয় ঔষধের লুপ্তপ্রায় গৌরবটুকুও বুঝি বা অন্তর্হিত হয়। ডাক্তার কানাইলাল দে, উদয় দত্ত, এবং এইন্সলি (Ainslie), ওয়ারিং (Waring), ওয়াইজ (Wise), প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রশংসনীয় উত্তমের সহিত তাঁহাদের জীবিত কালে দেশীয় ঔষধের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অমুসন্ধান ফলে অনেক স্থলেই দেশীয় ভেষজাদির আয়ুর্বেদোক্ত গুণের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রস্তুত না হওয়ার দরুন ঔষধ সাধারণ্যে তেমন করিয়া প্রচলিত হইতে পারে নাই। বেঙ্গল কেমিক্যাল এই কার্য গ্রহণ করিয়া দেশের সকলের কৃতজ্ঞতাজনন হইয়াছেন।

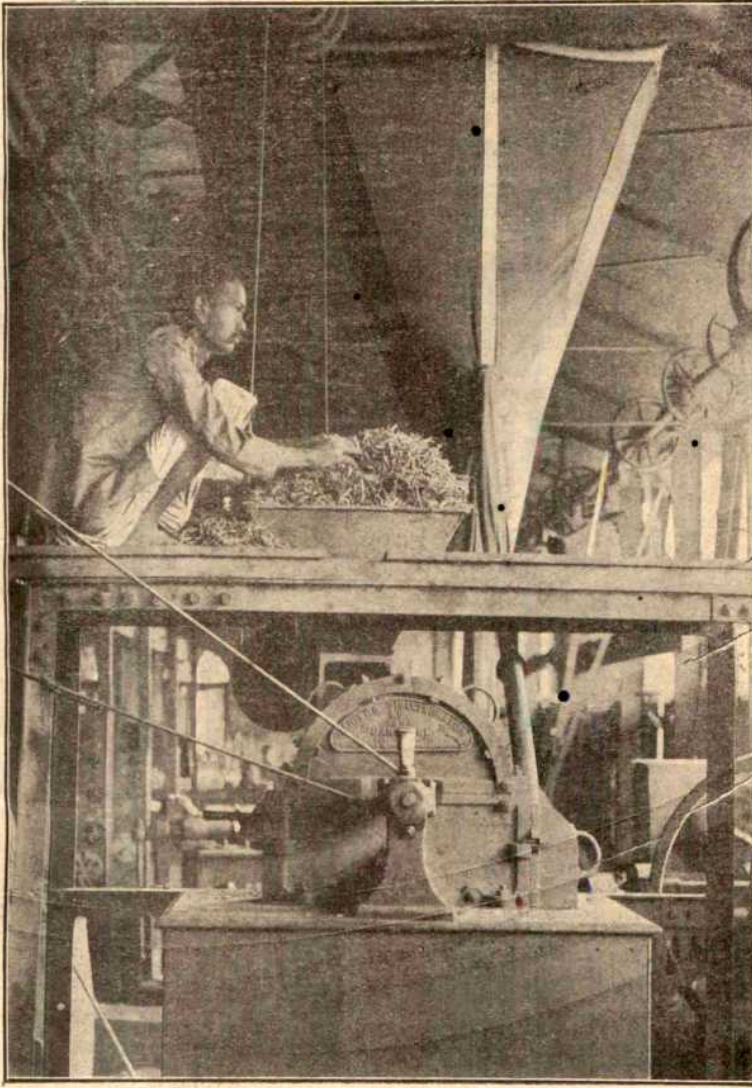
আজকাল ইহাদের ঔষধপ্রস্তুত-বিভাগে দেশীয় ঔষধই বেশী প্রস্তুত হইতেছে। বিলাতী স্পিরিট বা সুরাসার কিনিয়া



ওষধাদি কাগজে মুদ্রিয়া প্যাক করিবার ঘর।



গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত করিবার সীমানির্ধৃত চেম্বার।



দেশী ঔষধ চূর্ণ করিবার যন্ত্র।

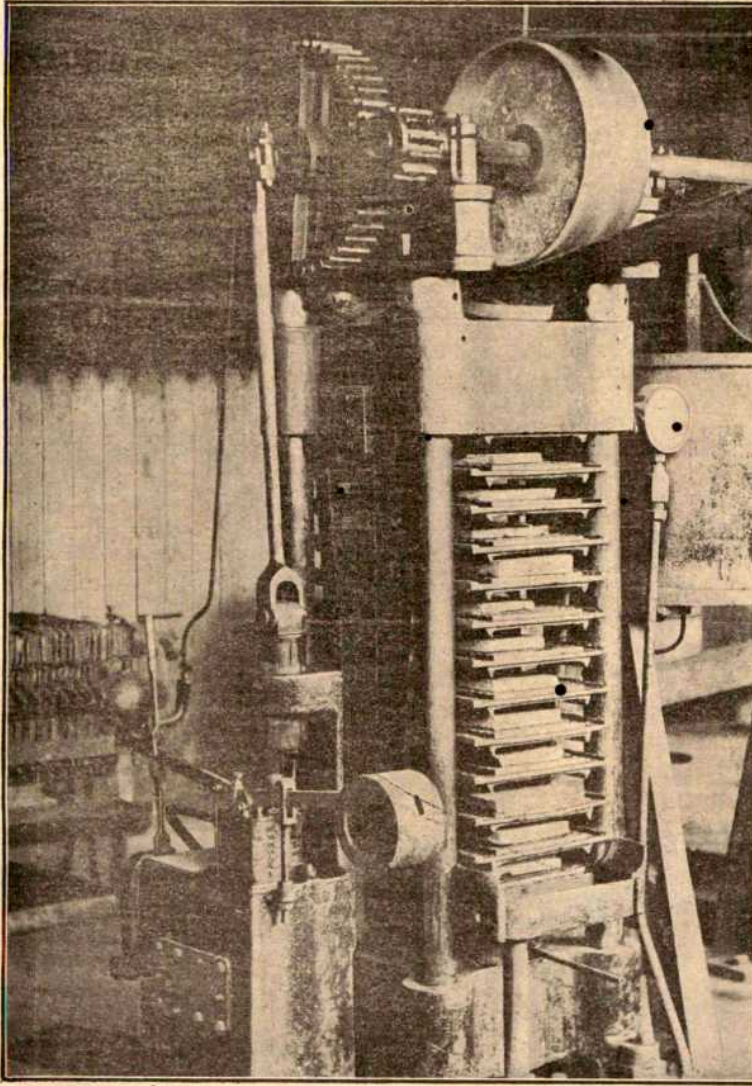
টিংচার ইত্যাদি কিছুকাল ইহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসর হইল আবগারী বিভাগের এক নূতন আইন হইয়াছে তাহাতে বিলাতী স্পিরিটের উপর এত গুরু বসিয়াছে যে ফলে বিলাতী স্পিরিট অপেক্ষা বিলাতে প্রস্তুত টিংচার ইত্যাদির মূল্য কম দাঁড়াইয়াছে। দেশে যে স্পিরিট হয় তাহার গুরু বাড়ে নাই কিন্তু তাহা এত দুর্গন্ধ যে টিংচারে ব্যবহৃত হইতে পারে না। স্পিরিটের এই অসুবিধা হওয়াতে ফার্মাকোপিয়ার টিংচার ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার আশা ইহারা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দেশীয় স্পিরিটের

উপর গুরু কম আছে বলিয়া ইহারা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে চোলাই কারখানা খুলিয়া স্পিরিট প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে শুধু ঔষধের উপযোগী বিশুদ্ধ স্পিরিট নয়, মিথিলেটেড স্পিরিটও প্রস্তুত করিবেন। প্রস্তাবটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ টাকা মূলধন বাড়াইয়া লইয়াছেন। এক্ষণে মূলধন পাঁচলক্ষ টাকা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ইহারা তিন লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৬০ হিসাবে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দিতেছেন।

আজকাল প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকার মহুয়া বিদেশে যায়। জর্ম্মানীতে গোকর, ভেড়া, শূকরের খাত্ত বলিয়া মহুয়া এত রপ্তানী হয়। ইহারা স্পিরিটের ব্যবসা খুলিলে প্রতিবৎসর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার মহুয়া কিনিবেন। ভারতে স্পিরিটের বাজার কাহার হইবে এ লইয়া আজকাল জর্ম্মানীতে ও জাভাতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দিনমারেরা স্পিরিটের দর খুব কমাইয়া দিয়াছে। ইহারা

সাহস করেন যে জাভা স্পিরিট অপেক্ষা কম মূল্যে স্পিরিট বিক্রয় করিয়াও ইহারা লাভ করিবেন। ইহারা যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাই লাভজনক করিয়াছেন। স্পিরিটের ব্যবসাও যে সফল হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। সুলভ স্পিরিটের কারবার এদেশে এ পর্যন্ত হয় নাই। ইহারা করিলে একটা নূতন জিনিষ হইবে।

সুগন্ধ প্রস্তুত বিভাগে ইহারা দেশের ফুল হইতে সুগন্ধী এসেন্স ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। জল ফুটিবার সময় হইলে গাজপুৰ, কনৌজ, কটক প্রভৃতি স্থানে যজ্ঞাদি সহ লোক



জলের চাপে তৈলান্ধাশন যন্ত্র। (Hydraulic Press-Oil Mill)।

জন পাঠাইয়া বিশেষ উপায়ে একস্ট্রাক্ট প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। একস্ট্রাক্ট হইতে এসেন্স প্রস্তুত এখানকার ল্যাবোরেটরীতে ছোট ছোট মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এই একস্ট্রাক্ট ভিন্ন অল্প উপাদানও এই এসেন্সে কিছু কিছু আছে।

কারখানাটা খালের উপর হওয়ায় জাহাজ হইতে মাল আনাগোনার বেশ সুবিধা। ফার্মেসী ও এসিডঘরের ভিতর দিয়া ও বাহিরে সর্বত্র ট্রলিলাইন আছে। তাহাতে মাল চলাচল সহজ হইয়াছে। খাল হইতে জল লইবার

যাহারা ইহার জন্ত প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন তাহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্থ। ইহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত দেখিলে বাঙ্গালীর কর্মকুশলতার উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়।

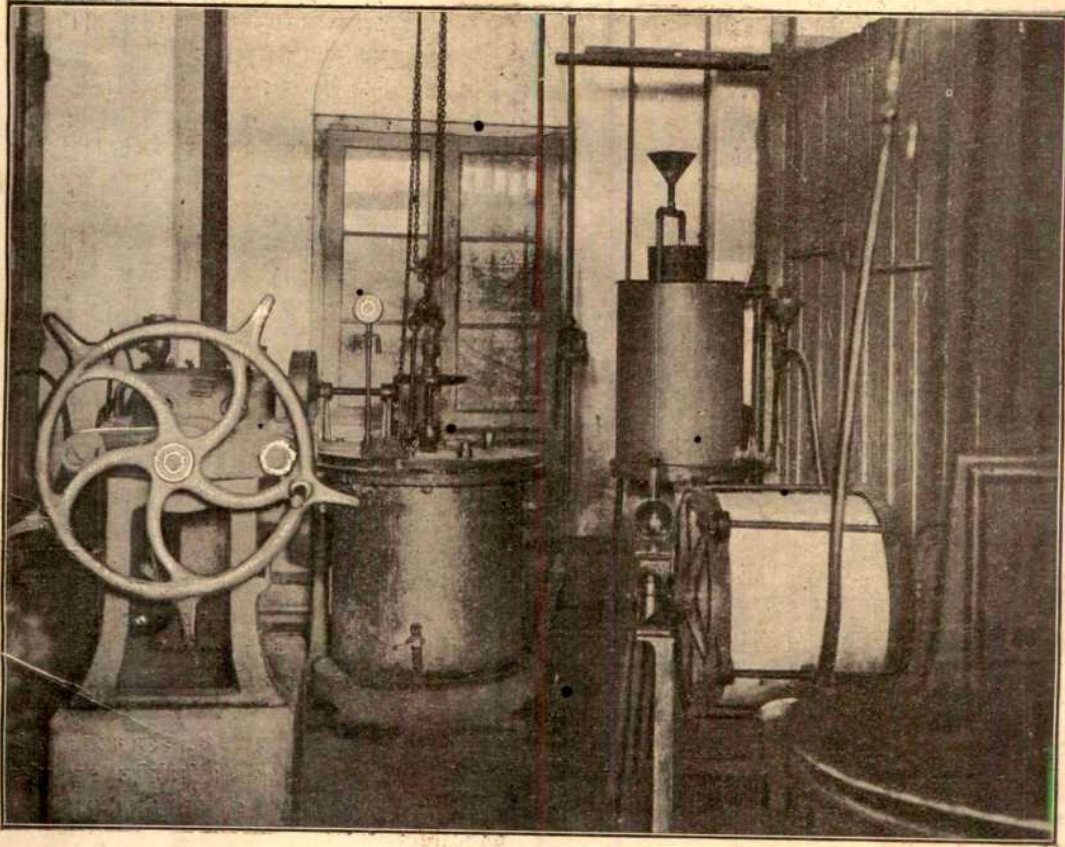
আলোচনা

পৌষ-সংক্রান্তি।

(১)

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় মুসলমান বালকেরা পৌষমাসে উৎসব করিয়া থাকে। পৌষমাসে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরেই মুসলমানবালকেরা বল

লাইসেন্স করিয়া পাইপ বসান আছে। দরকার হইলে দমকল দ্বারা খাল হইতে জল তুলিয়া পুকুরে ফেলা হয়। আফিস কারখানায় মাল যাতায়াতের জন্ত ঘরেই কতকগুলি গোরুর গাড়ী আছে। কারখানা ও আফিস প্রাইভেট টেলিফোন দ্বারা সংবদ্ধ। সরঞ্জামের কোন ত্রুটিই নাই। কুড়িজন লোক লইয়া ইহাদের একটি ফায়ার ব্রিগেড বা আগুন নিবাইবার দল আছে। লোক-গুলি নিজেদের কর্মে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। বিপদসূচক ঘণ্টা দিয়া সপ্তাহে দুই তিনবার ডিল করান হয়। যে কোন সময় বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি করিলে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে জল ফেলিতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে না। সময় সময় গভীর রাতে অতর্কিতে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মশাল জালিয়া ডিল দেওয়া হয়। এই সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কারবারটির প্রত্যেক অঙ্গটাই পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টার পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যায়।



শিশুখাত্ত প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি।

বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী বাইরা ছড়া আবৃত্তি করে। সঙ্গীতের হরের মত এই আবৃত্তিরও এক রকম সুর আছে। উহা শুনিতে বড়ই মধুর। এই বালকদলের নাম “কুলার বউর দল”। দল প্রত্যেক বাড়ী উপস্থিত হইয়া সর্ব প্রথমেই সম্বরে “কুলার বউ” “কুলার বউ” বলিয়া দুইবার উচ্চ রব করিয়া উঠে। উহা হইতেই দলের ঐক্য নাম হইয়াছে। বিগত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রকাশিত বরিশালের পৌষ-সংক্রান্তির ছড়াগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে বিক্রম-পুরের প্রচলিত ঐক্য ছড়ার সহিত বরিশালের ছড়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। নিম্নলিখিতরূপ ছড়া আবৃত্তি করিয়া বিক্রমপুরের “কুলার বউর দল” সকল বাড়ী হইতেই চাউল দাউল কিংবা পয়সা আদায় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দলের সর্দার সে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রত্যেক পংক্তি গোড়ার গাহিয়া দেয়, তৎপশ্চাৎ অস্তান্ত সকলেই সম্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে।

আইলাম রে বরণে
ঠাকুর-গোসাই-চরণে,
ঠাকুর গোসাই দিল বর(১)
চাউল কড়িবাইর কর,
চাউল আর দেও কড়ি
ঐ ঘরেতে সোনার লড়ি(২),

সোনার লড়ি রূপার ধাল
ঐ ঘরখান দেখতে ভাল,
ঐ ঘরের উঁচা(১) টুই
টাকা আছে মোচা দুই।
বাইনা বাড়ী(২) গিয়া রে
একটা টাকা পাইলাম রে।
বাইনা বাড়ী ঘুঘুর বাসা
টাকা ভাস্রায় ছু' ছু' পয়সা,
ন' ন' মাসে ন' ন' টাকা
আমরা পাইলাম ছয় টাকা।
টাকা দেও বাড়ী বাই
বাঘের বয়ান এলা(৩) গাই।
কুলার বউ - কুলার বউ ॥

তৎপরেই বাঘের গান গাহিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অনেক কথা অনীলও আছে, তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্টগুলি নিয়ে প্রকাশিত করিলাম।

আর বাঘ—আর বাঘ।
এক বাঘ চৈতা(৪)
বাগুন(৫) নাইয়া(৬) নিল পৈতা।
আর বাঘের গলায় দড়ি
সারল আঁট(৭) লড়ালড়ি(৮)।

(১) বর—প্রবাসে আশেপাশে অবস্থিত হইয়াছে। (২) লড়ি—ঘটি।

আর বাঘ হৈ চৈ
গোয়াল মাইয়া খাইল দই।
আর বাঘেরা বাপে পুতে(৯)
গাছে উঠা গায়ে মূতে(১০)।
আর বাঘ অইটা(১১)
গোয়ালের দই খাইল লুইটা(১২)।
আর বাঘেরা দিল লাফ
ঐ ব্যাটা বুড়ীর ঝাপ।
আর বাঘের গলায় কাঁটা
চাউল দিবা পাঁচ বউটা(১৩),
না দেও যদি কাউলকা(১৪) আইমু
বইকা(১৫) তোমাগো উদ্ধার করমু।

৩০শে পৌষ তারিখে বালকগণ সকল বাড়ী হইতে চাউল দাউল অথবা পয়সা সংগ্রহ করিয়া কোনও জঙ্গলের মধ্যে সমবেত হয়। জঙ্গলের কতক জায়গা পরিষ্কার করিয়া সেখানে রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করে। এইরূপ ভোজনকে তাহারা “জোলাভাতি” (চড়িভাতি) বলিয়া থাকে।

(২)

এখানে হিন্দু বালিকাদিগের মধ্যে “মাঘমণ্ডলের ব্রত”ও প্রচলিত আছে। পৌষমাসের সংক্রান্তি দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘমাসের সংক্রান্তি দিন পর্যন্ত প্রত্যহ অতি প্রত্যবে শয্যা হইতে উঠিয়া বালিকাগণ পুত্রের ধারে আসিয়া বসে। হাতে এক মুঠা দুর্বা লইয়া জল-সিক্ত করিয়া গানের সুরে ছড়া আবৃত্তি করে। বোধ হয় এতি প্রত্যবে “গাত্রোথান করা” শিক্ষা দেওয়ার জন্তই এই ব্রতের প্রচলন হইয়াছে। তাহা ছাড়া ছড়াগুলি শুনিলেই বৃষ্টিতে পারা যায় যে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া “আত্মনির্ভরতা” শিক্ষা দেওয়ার জন্তই এইরূপ ছড়ার সৃষ্টি। দুর্ব্বার মুঠা ধরা জলসিক্ত করিতে করিতে বালিকাগণ নিম্নলিখিত ছড়াগুলি গাহিয়া থাকে।

উঠ উঠ হুঁয়ামামা ঝিকিমিকি দিয়া
বামুন বাড়ীর পুত্র দিক্ দিয়া,
আইস আইস হুঁয়ামামা আমাগো বাড়ী আইস
আমাগো উঠানে রৌদ ছড়াইয়া বইস।
বড়সি বাইতে গেলাম পুকইরে(১) আজ
রাগলু বোয়াল পাইলাম মাছ।
পাইলাম পাইলাম কুটব কে?
ওরা(২) আইল কুটনী(৩) দা হাতে কইয়া
অগ(৪) দিলাম ধাক্কাধুকা দিয়া
নিজে কুটলাম যেমন তেমন কইয়া।

- (১) উঁচা=উচ্চ। (২) বাইনাবাড়ী=বেনেবাড়ী।
(৩) এলা=এখন। (৪) চেতা=চিত্রিত বা চিতাবাঘ।
(৫) বাওন্=ব্রাহ্মণ। (৬) মাইয়া=মায়িয়া। (৭) আট্=হাট।
(৮) লড়ালাড়ি=দোড়াদোড়ি। (৯) পুতে=পুত্র।
(১০) মূতে=মূত্রত্যাগ করে। (১১) অইটা=সম্ভবতঃ “হটিয়া”।
(১২) লুইটা=লুটিয়া। (১৩) বেজনিগ্নিচ চাউল রাখিবার পাত্র।
(১৪) কাউলকা=কল্যা। (১৫) বইকা=বকিয়া।

(১) পুকইরে=পুকুরে। (২) ওরা=এখানে অস্ত্র যে কোনও লোকের কথা বুঝাইতেছে। (৩) কুটনী=মাছ কুটবার লোক।

(৪) অগ=উহাদিগকে।

কুটলাম কুটলাম রাঁধব কে?
ওরা আইল রাঁধনী কড়াই হাতে কইয়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুকা দিয়া
নিজে রাঁধলাম যেমন তেমন কইয়া।
রাঁধলাম রাঁধলাম খাইব কে?
ওরা আইল খাওনী খাল হাতে কইয়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুকা দিয়া
নিজে খাইলাম যেমন তেমন কইয়া।
খাইলাম খাইলাম কাটা কুড়াইব কে?
ওরা আইল কাটা কুড়ানী গোবর হাতে কইয়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুকা দিয়া
নিজে কুড়াইলাম যেমন তেমন কইয়া।
কুড়াইলাম কুড়াইলাম খাল খুইব কে?
ওরা আইল খাল খুয়নী জল হাতে কইয়া।
অগ দিলাম ধাক্কাধুকা দিয়া
নিজে খুইলাম যেমন তেমন কইয়া।

অর্থাৎ সকল কার্যই, অস্ত্রের উপর ভার না দিয়া নিজেই যেমন পারি করিব—এই শিক্ষাই ইহার মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। তৎপরে বালিকাগণ পুত্র হইতে বাড়ীতে আসিয়া মাটিতে গোলাকৃতি “আঁক” কাটিয়া তাহাকে লাল নীল সবুজ রঙ্গের গুঁড়ি দ্বারা চিত্রিত করে। যে বালিকা যত বৎসর ধরিয়া ব্রত আরম্ভ করিয়াছে, সেই বালিকা ঐরূপ ততটি “আঁক” কাটিবে। সেই আঁকের উর্দ্ধদিকে একটি হুঁয়া এবং নিম্নে একটি অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত করা হয়। সকলগুলিকেই ঐরূপ চিত্রিত করা হয়। সকলের নিয়ে ব্রতকারিণীর বসিবার আসন অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। সেই আসনে বসিয়া ফুল হাতে লইয়া ব্রতকারিণী নিম্নলিখিত ছড়া কহিয়া সেই “আঁক” পূজা করিয়া থাকে। এই ছড়া গানের সুরে বলিতে হয় না, শুধু আবৃত্তি করিয়া যায়।

মাঘমণ্ডল—সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে চাইল্যা(১) ষি
আমরা বড়-মানুষের পুত্রের ষি।
(পুনঃ) মাঘমণ্ডল—সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে চাইল্যা মধু
আমরা বড়-মানুষের পুত্রের বধু।
(প্রণাম) হুঁয়িঠাকুর প্রণাম
পূরে যেন মনস্কাম।
হুঁয়ি ঠাকুর বৈঠ, বৈঠ, বৈঠ ॥

এই ব্রত পাঁচ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। বালিকারা যখন ভালরূপ কথা বলিতে শেখে, সেই সময় হইতেই তাহাদিগকে ব্রত গ্রহণ করান হয়। যেই বৎসর ব্রত সম্পূর্ণ হয় (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়) সেই বৎসর মাঘমাসের সংক্রান্তি দিন চন্দ্রহুঁয়াবিশিষ্ট পূর্ব্বকথিত গোলাকার “পঞ্চমণ্ডলকে” অতি উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়া পূজা করা হয়। সেই বালিকা নিজ ‘আঁক’ সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় করিয়া চিত্রিত করিতে পারে তাহার প্রশংসা হয়। সমবেত দর্শকমণ্ডলকে ক্ষীরের নাড়, নারিকেলের নাড়, বাতাসা, সন্দেশ প্রভৃতি অনেক রকম খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়।

ঐপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) চাইল্যা=চালিয়া।

পৌষ-সংক্রান্তি ।

আজ পৌষ-সংক্রান্তির একটা ছড়া পাঠাইতেছি। ইহা মরমনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে প্রচলিত। পৌষ-মাসের প্রথম হইতে রাখাল বালকেরা সন্ধ্যাবেলা এই ছড়া গাহিয়া শহরের বাসায় বাসায় ঘুরিয়া চাল কড়ি সংগ্রহ করে। দলের সব চেয়ে বড় বালকটি প্রথম গায়, তারপর কোরাসে সকলে গাহিতে আরম্ভ করে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ছড়াটি তাহারা গাহিয়া থাকে :—

আইলাম রে ভাই কান্দি ভাইয়া*

বাঘ রইছে হরিণ লইয়া;

হরিণ খাইয়া সেজা (১) খায়,

সোনার লাজল ঘরে বায়।

সোনার লাজল রূপার ফাল,

ঘর-জামাইয়া জুড়ছে হাল।

জুড়ছে হাল জুড়ছে মই

আমোন ধানের শুড়িত (২) রে।

আমোন ধানের বড় বড় পাতা,

পোলায় (৩) খায় বুড়ীর মাথা।

—ও পোলা আমার রে

বানবাসী যায়াম্ (৪) রে—।

বনেতে বেকরা (৫) বাঁশ,

সেখানেতে নীল হাঁস।

নীল হাঁস নীল পেরা (৬)

হাত বাড়াইয়া পাইলাম ঘোরা;

মাথা ভইরা (৭) পাইলাম তেল

শরীর জুড়াইয়া গেল।

আইটা-কলা (৮) ডিঙ্গার (৯) পাত,

ঘরগুটি সেলামে থাক।

খুব, খুব।

আরো অস্ত্রান্ত ছড়া আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলিতেই অস্বীকৃত্য চুকিয়াছে।

এইরূপে তাহারা চাল কড়ি সংগ্রহ করিয়া সংক্রান্তির দিন গরু বাছুর হান করাইয়া মাঠে লইয়া যায়। মাঠে গরু চরিতে থাকে আর তাহারা খেদের ছায়াযুক্ত কোনো বৃক্ষের তলে সিরি রাখিয়া সকলে মিলিয়া হাসিয়া নাচিয়া পরিতোষ পূর্বক আহার করে।

শ্রীহেমচন্দ্র বসী।

(১) সেজা-সজা। (২) শুড়িত-গোড়াতে। (৩) পোলায়-ছেলে। (৪) যায়াম্-যাইব। (৫) বেকরা-এক প্রকার বাঁশ। (৬) পেরা-পায়রা, কবুতর। (৭) ভইরা-ভরিয়া। (৮) আইটা-কলা-এক প্রকার বিচিবুস্ত কলা। (৯) ডিঙ্গা-এ।

‘নবমী-গাওয়া’-উৎসব।

পৌষ-সংক্রান্তি* ও নবান্নের† স্তায় ‘নবমী-গাওয়া’-ও বরিশালের বহু-কাল-প্রচলিত একটি সাধারণ উৎসব। এই উৎসব (দুর্গাপূজার সময়) মহানবমীর দিন বৈকালে প্রধানতঃ নমঃশূর সম্প্রদায় দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে নমঃশূরগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া,—নানাবিধ সংস্কৃত সাজিয়া খল্লনী বাজাইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং গৃহস্থের নিকট হইতে নারিকেল ও ‘কালাহস্তৈশ’‡ বকসিস লইয়া তৎবিবিধময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্বক একটি ভোজের আয়োজন করিয়া থাকে।

এই উৎসব উপলক্ষে নমঃশূরগণ যেসকল গান গাহিয়া বেড়ায়, তন্মধ্যে নিম্নরূপ বন্দনা-সঙ্গীতটাই প্রধান—ইহা সর্বত্র সর্বাস্থে গীত হইয়া থাকে।

* চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত মৎসকলিত পৌষ-সংক্রান্তি ও নবান্নসম্বন্ধীয় ছড়াগুলিতে কয়েকটি মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে। উহাদের মধ্যে ‘কুলাইরে দেবা কত ধন’ স্থলে মুদ্রিত ‘কুলাই রে দেবতা কত ধন’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্ত্রান্ত ভুলগুলি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির বৃত্তিতে কষ্ট হইবে না।—লেখক।

† গত সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত নবান্নসম্বন্ধীয় ছড়াটির একটি পাঠান্তর সংপ্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। উহা এইরূপ :—

দাঁড় কাউরারে আহ্বান করা—ইত্যাদি

.....কাক বলি লইও,

ডোকা ভরা চাউল দিমু

প্যাট্টী ভরা খাইও,

এটি এটি কলা দিমু,

পূব দিকে লইয়া যাইও।

[টীকা :—ডোকা=কলাগাছের খোলে (বেটোতে) প্রস্তুত পাত্র-বিশেষ। চাউল=চাউলের জল; বরিশালে ‘চাউলমাথা’ নামে প্রসিদ্ধ। প্যাট্টী=পেটী। এটি=একটি। পূব=পূর্ব।]

নবান্নের দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে ‘পার্বণ’ করিয়া কাককে ‘বলি’ (ডোকাপূর্ণ চাউল, কলা ইত্যাদি) দেওয়ার নিয়ম। ঐ বলি কাক কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থের আহার করা অর্থশূন্য। বলির কলা মুখে করিয়া কাক পূর্ব দিকে গমন করিলে গৃহস্থের কলাপ হুত্বিত হয়। তাই, নিমন্ত্রণ কালেই কাককে গুণপথ অবলম্বনে অনুরোধ করা হইয়াছে। ত্রিযাকর্ষ উপলক্ষে বাটীতে ‘পদধূলি’ দেওয়ার নিমিত্ত অকুলীন গৃহস্থ যেমন কুলীন বেহাইকে সাধাসাধি করিয়া থাকেন, নবান্ন উপলক্ষে কাক-নিমন্ত্রণেও সেইরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই, বেহায়া বেহাইগণের স্তায় এই নির্লজ্জ পক্ষীও নিমন্ত্রণের দিন সত্য সত্যই দুলভদর্শন হইয়া উঠে।—লেখক।

‡ কলা ও সন্দেশ (নারিকেলের লাড়ুক) ইহারা একসঙ্গে ‘কালাহস্তৈশ’ বলিয়া উচ্চারণ করে। এইরূপ উচ্চারণ ভাবহুত্রে (By association of ideas) বরিশালবাসীর মনে দুর্গাপূজার কথা সহজে স্মরণ করাইয়া দেয়।—লেখক।

বন্দোন্ম সরস্বতী দেব নারায়ণ । (১)
 পেরুথোমে বন্দিলাম নাগো দুগ গার চরোণ । (২)
 বন্দোন্ম সরস্বতী—ইত্যাদি ॥
 তারপরে বন্দিলাম মোরা অশ্বরের চরোণ ।
 বন্দোন্ম সরস্বতী—ইত্যাদি ॥
 তারপরে বন্দিলাম মোরা জয়ারি (৩) চরোণ ।
 বন্দোন্ম সরস্বতী—ইত্যাদি ॥
 তারপরে বন্দিলাম মোরা বিজয়ার (৪) চরোণ ।
 বন্দোন্ম সরস্বতী—ইত্যাদি ॥
 তারপরে বন্দি যে দেব কার্তিকের (৫) চরোণ ।
 বন্দোন্ম সরস্বতী—ইত্যাদি ॥
 তারপরে বন্দি যে দেব গোণেশের (৬) চরোণ ।
 বন্দোন্ম সরস্বতী দেব নারায়ণ ॥

বর্তমানে বরিশালে ও তৎসম্বন্ধিত জেলাসমূহে নমঃশুদ্ধজাতির ধর্ম্মঘট হওয়ায় 'নবমী-গাওয়া'-উৎসবের অনেকটা বিলোপ ঘটিয়াছে, বটে; কিন্তু ৫৭ বৎসর পূর্বেও আমরা ইহার যেরূপ ব্যাপকতা দেখিয়াছি এবং এতদুপলক্ষে পরীক্ষাকী নমঃশুদ্ধগণের যে উদ্‌যোগ-উৎসাহের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে ইহাকে বঙ্গের একতম প্রধান ও প্রাচীন সাধারণ-উৎসব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

পৌষ-সংক্রান্তি, নবান্ন ও নবমী-গাওয়ার জায় আরো অনেক উৎসব এখনও পরীগ্রামে প্রচলিত আছে। ঐসকল উৎসবের প্রধান উপাদান—ছড়া-আবৃত্তি বা নৃত্যগীত। আমরা এবিধ উৎসবের অনেক ছড়া ও গান সংগ্রহ করিয়াছি।

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

মন্তব্য :—পৌষসংক্রান্তি বা তৎসম উৎসব সম্বন্ধে এত লেখা আমরা প্রত্যেক মাসে পাইতেছি যে সেসমস্ত ছাপা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং অতঃপর এসম্বন্ধে আর কোনো নূতন প্রবন্ধ গৃহীত ও মুদ্রিত হইবে না।—সম্পাদক, প্রবাসী।

মহত্ব

(দেখ মাদৌর মূল পারনী হইতে)

অমূল নির্মূল ওই হীরক রতন
 নিজগুণে দীপ্ত করে অন্ধ ধরাতল;
 ধূলিরাশি পশে যদি ত্রিদিব ভবন
 তবুও হীনতা তার প্রকাশে কেবল।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) বন্দোন্ম সরস্বতী...নারায়ণ। (২) প্রথমে.....দুর্গার-ই চরণ।
 (৩) জয়া—লক্ষ্মী। (৪) বিজয়া—সরস্বতী। (জয়া-বিজয়া
 'পালপুতলা' নামেও পরিচিত)। (৫) কার্তিক। (৬) গোণেশ।

প্রবাসী-বঙ্গালী

রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু

আজ আমরা ষাঁহার জীবনের গুটিকতক কথা সাধারণের গোচর করিতে উপস্থিত, তিনি ধর্ম্মজগতের একজন নিভৃত সাধক, কর্ম্মজগতের অনাড়ম্বর কর্ম্মা, সমাজের প্রচ্ছন্ন সংস্কারক, এবং বীণাপাণির নীরব সেবক। তিনি যদি আজ সভাসমিতির পীঠস্থানে বক্তৃতার বন্ধারে সহস্র চক্ষুর লক্ষ্য হইতেন, অথবা সাহিত্যসেবাব্রতে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেন, তাহা হইলে আজ গুণিগণের অগ্রীমঙ্গিগের চরিতাভিধানের প্রকৃষ্টস্থান তাঁহার প্রাপ্য হইত। বঙ্গের সাহিত্যরসগ্রাহিবর্গ তাঁহার প্রতিভার কঁতদূর আদর করিয়াছেন তাহার নিদর্শন পাই নাই, কিন্তু, তিনি যে যুরোপীয় স্তম্ভীসমাজে সমাদৃত তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু। তিনি কাশীর বর্তমান জজ।

শ্রীশবাবু ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ২১ মার্চ, পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ অব্দের আগষ্ট মাসে, যখন তিনি ৬ বৎসরের শিশু, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জননীই তাঁহার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। বাল্যে ফরীদকোটের সূপ্রসিদ্ধ রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়, তাহাতে শ্রীশবাবু পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে প্রথম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া স্ববর্ণ পদক পুরস্কার পান। আরবী ভাষা তাঁহার শিক্ষণীয় দ্বিতীয় ভাষা (Second language) ছিল। ১৮৮১ অব্দের বি. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহাতে ইংরাজি, রসায়ন, জড়বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব, এবং গণিত তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই সময় লাহোরে শিক্ষাদান কার্যে শিখাইবার জন্ত সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজ (Central Training College) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশবাবু প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তথায় অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৮৩ অব্দের মে মাসে শিক্ষকতা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং



রায় বাহাদুর শ্রীচন্দ্র বসু।

লাহোর গভর্নমেন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ট্রেনিং স্কুলের সংস্কে “মডেল স্কুল” বা আদর্শ বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কিন্তু শ্রীশবাবু এমনই লোকপ্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণের হৃদয় এতদূর অধিকার করিয়াছিলেন যে যতদিন তিনি গভর্নমেন্ট স্কুলে ছিলেন, ততদিন নবপ্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলটি অচলপ্রায় হইয়া ছিল। কোন ছাত্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে গমন করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহার অবশেষে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে,

শ্রীশবাবুকে যদি ঐ নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের হেডমাষ্টার করা হয়, তবেই তাহার তথায় থাকিবে, অন্যথা নহে। ছাত্রগণের এই অভিপ্রায় কার্যে পরিণত হইলে বিদ্যালয়টির শ্রী ফিরিয়া যায়। শ্রীশবাবু তথায় সুব্যবস্থা সংস্থার ও উন্নত প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্তন দ্বারা স্কুলটিকে প্রকৃতই “আদর্শস্কুলে” পরিণত করেন। এই বিদ্যালয়টি এখনও বিদ্যমান আছে। এখন ইহার হেডমাষ্টার জনৈক ইংরাজ।

লাহোরে অবস্থানকালে তিনি ষ্টুডেন্টস ক্লাব নামে একটি ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং “ষ্টুডেন্টস ফ্রেণ্ড” নামে একখানি সাময়িক পত্রও বাহির করেন। এই সময় তিনি যে উর্দুভাষায় একখানি প্রাকৃতিক ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন তাহা তথাকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়। পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ রায় শাহেব গোলাব সিংহ শ্রীশবাবুর উক্ত সাময়িক পত্র এবং গ্রন্থ লইয়া স্বীয় যন্ত্রালয়ের কার্য্যারম্ভ করেন।

শ্রীশবাবু পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কার সম্বন্ধে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে লাহোরে “Lahore Bengali School” নামে একটি বিদ্যালয় ছিল; তিনি ঐ স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। স্কুলটি এখন নাই।

শ্রীশবাবু যখন শিক্ষকতা করিতেছিলেন সেই সঙ্গে আইন অধ্যয়নও করিতেছিলেন। তিনি ১৮৮৩ অব্দে এলাহাবাদে আসিয়া আইন পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরের শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া

মীরাটে আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বেরেলীর অস্থায়ী মুন্সেফ মনোনীত হন এবং ছয় মাস মুন্সেফী করিয়া ১৮৮৬ অব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। এখানে সাক্ষেতিক-লিখন-কলাভিজ্ঞ জনৈক (Judgment Reporter) রায় লিখিবার রিপোর্টারের প্রয়োজন হইলে সেই পদে শ্রীশবাবুই মনোনীত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেখাক্ষর বা সাক্ষেতিক (Shorthand) লেখা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার চর্চাও রাখিয়াছিলেন সুতরাং হাইকোর্টের রায়-লেখক রিপোর্টারের কার্য তিনি অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে থাকেন।

শ্রীশবাবু যখন মীরাটে ওকালতী করিতেছিলেন, তখনই সংস্কৃত ভাষাশুশীলনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুবাস জন্মে এবং এলাহাবাদে আসিয়া অধিক উত্তম ও আগ্রহের সহিত এই দুক্লভ ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভে যত্নপর হন। পরে তিনি বৈদিক সাহিত্যশুশীলন করিতে উত্তত হন এবং পাণিনি আয়ত্ত না হইলে বেদাধ্যয়ন বৃদ্ধ, ইহা বৃত্তিতে পারিয়া, প্রথমে পাণিনি অধ্যয়নেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই সুবিশাল এবং সুকঠিন শাস্ত্রশুশীলনে যথেষ্ট শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীশবাবু ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুন্সেফী পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইয়া গাজীপুর গমন করেন। সূর্যাসিদ্ধান্ত, জলসরবরাহ-কারখানা (Water Works), বৃহৎজাতকের ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বামী, সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের পূর্বে, তখন গাজীপুরে ইঞ্জিনিয়ারী করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত শ্রীশবাবুর জ্ঞাতা জন্মে এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থাবলী ও হিন্দু-সাহিত্য প্রচার কার্যে শ্রীশবাবুর সহিত স্বামিজীর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সূত্রপাত হয়।

১৮৯৬ অব্দে শ্রীশবাবু বারাণসী বদলী হন। তাঁহার পক্ষে ইহা মাহেজ-যোগ বলা যাইতে পারে। তিনি কালীর বিখ্যাত তাত্ত্বা শাস্ত্রী প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যাকরণবিদ ও বৈদিকভাষাতত্ত্বজদিগের নিকট পাণিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিন বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে, একাগ্র সাধনায়, তিনি বৈদিক ব্যাকরণশাস্ত্র সমাপ্ত করেন।

এই সময় অর্থাৎ ১৮৯৬ অব্দে শ্রীমতী এনি বেসান্ট বারাণসী আগমন করিলে, শ্রীশবাবু ইহার সহিত একযোগে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীমতীর বক্তৃতা রেখাক্ষর (Shorthand) লিখনপ্রণালীতে লিখিয়া প্রচার করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে শ্রীমতী বেসান্টের যে দিগন্তব্যাপী যশ ও কৃতকার্যতা প্রচার হইয়া পড়িল—শ্রীশবাবুর ক্ষিপ্ৰ লিখনদক্ষতা ও আন্তরিক চেষ্টাই তাহার মূল। শুনা যায় সাক্ষেতিক লিখনে তৎকালীন ভারতে শ্রীশবাবুর ত্রায় নিভুল ক্ষিপ্ৰলেখক আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার নিকট শ্রীমতী বেসান্ট স্বীয় ঋণ স্বীকার করিলে ১৮৯৬ অব্দের অক্টোবর মাসে থিওসফিক্যাল সোসাইটি সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে বারাণসীধামে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন;—

"I am indebted to Babu Shrish Chandra Bose, Munsif of Benares, for the wonderfully accurate report which he most kindly took of the discourses. I have been reported by the best London men, but have never sent a report to the press with less correction than that supplied by my amateur friend."

বারাণসীর সেন্ট্রাল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতিকল্পে শ্রীশবাবু গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ঐ কলেজের অষ্টমতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ত্রাসরক্ষক। থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামক সম্প্রদায়ের তিনি একজন অকপটকর্মী। উহার উন্নতি, বৃদ্ধি এবং সর্ববিধ হিতসাধনে তিনি কখন কুণ্ঠিত নহেন।

১৯০১ অব্দে শ্রীশবাবু এলাহাবাদে বদলি হন। এখানে আসিয়া তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও বৈদিক ব্যাকরণ সাধারণের সুগম করিবার মানসে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে থাকেন। ইংরাজি ভাষা ভারতের সর্বত্র এবং জগতের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত বলিয়া তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইংরাজিতে প্রণয়ন ও অনুবাদ করিয়া প্রয়াগস্থ স্বীয় ভদ্রাসন "ভুবনেশ্বরী আশ্রমের" একান্তে স্থাপিত "পাণিনি কার্যালয়" হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। এখানে তিনি তাঁহার বিরাট কীর্তি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী * সমাপ্ত করেন। উহা রয়াল আট-

* The Astadhyayi of Panini—complete in 1682 pages, Royal Octavo : containing Sanskrit Sutras and Vrittis with Notes and Explanations in English, based on the celebrated Commentary called the Kasika.

পেন্সী আকারে ১৬৮২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার অপর কীৰ্ত্তি "সিদ্ধান্তকৌমুদী" সটীক সাহসবাদ সংস্করণ। এই বিরাট গ্রন্থও উক্ত আকারে ২৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী প্রকাশিত হইলে কালীদাস মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভাবতের নানা প্রদেশের প্রধান প্রধান পত্রসম্পাদকগণ এবং যুরোপ ও আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীশ বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার শতযুগে প্রশংসা করেন। আমবা সেই রানীকৃত প্রশংসাপত্র হইতে বিদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের কয়েকখানি পত্রাংশ প্রকাশ করিলাম।

The Right Hon'ble F. Max Muller, Oxford, 30th April, 1896.—" * Allow me to congratulate you on your successful termination of Panini's Grammar. It was a great undertaking, and you have done your part of the work most admirably. I say once more what should I have given for such an edition of Panini when I was young, and how much time would it have saved me and others. Whatever people may say, no one knows Sanskrit, who does not know Panini."

Professor T. Jolly, Ph. D., Wurzburg (Germany), 23rd April, 1893.—" * Nothing could have been more gratifying to me no doubt, than to get hold of a trustworthy translation of Panini's Ashtadhyayi, the standard work of Sanskrit literature, and I shall gladly do my best to make this valuable work known to lovers and students of the immortal literature of ancient India in this country."

Professor W. D. Whitney, New Haven, U. S. A., 17th June, 1893.—" * The work seems to me to be very well planned and executed, doing credit to the translator and publisher. It is also, in my opinion, a very valuable (production), undertaking as it does to give the European student of the native grammar more help than he can find anywhere else. It ought to have a good sale in Europe (and correspondingly in America.)"

Professor V. Fausbol, Copenhagen, 15th June, 1893.—" * It appears to me to be a splendid production of Indian industry and scholarship and I value it particularly on account of the extracts from the Kasika."

Professor Dr. R. Pischel, Halle (Saals), 27th May, 1893.—" * I have gone through it and find it an extremely valuable and useful book, all the more so as there are very few Sanskrit scholars in Europe who understand Panini."

শ্রীশবাবুর অপর কীৰ্ত্তি সিদ্ধান্তকৌমুদী সম্বন্ধে The Indian Mirror, The Hindoo, The Indian People প্রভৃতি পত্রে উক্ত হইয়াছে—

"The next great undertaking of the Panini office was the publication of the Siddhanta Kaumudy of Bharatji Dikshit. This is a standard work on Sanskrit grammar and Sanskrit scholars spend at least a dozen years in mastering its intricacies. * * * It may be mentioned that the Oriental Translation Fund of England advertised about three quarters of a century ago as under preparation the English translation of the Siddhanta Kaumudi by Professor Horace Hayman Wilson. But perhaps he found the work too laborious for him, for he advertised translation was never published."

অধ্যাপক ম্যাকডনেল (Prof. A. A. Macdonell, M.A., Oxford), অধ্যাপক বেঙ্কল (Prof. Cecil Bendall, M.A., Cambridge) প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীশবাবুর এই গ্রন্থ এবং পাণিনি যে প্রখ্যাত পণ্ডিত বহুব্রহ্মেব পটুগিনি অপেক্ষা সরল এবং সুবোধ্য তাহাও পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক শৌহই লিখিয়াছেন,—

"I have duly received the first volume of your Siddhanta Kaumudi. I was much pleased to get such a nice present from you. I have no hesitation to confess that I found inextricable difficulties in the use of Bohtlingk's Panini before I was so fortunate as to obtain from my friend * * * a spare copy he had of your Ashtadhyayi. It is a capital book for reference, and the Siddhanta Kaumudi for study."—*Professor Louis de la Vallee Poussin, Professor at Ghent, Editor of the Museon, 13, Boulevard du Parc, Gand: le 2 Decembre 1902.*

উক্ত গ্রন্থের ব্যতীত তিনি বেদান্ত, উপনিষদ, নোং, স্মৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু ছন্দ সংস্কৃত গ্রন্থের (সটীক) ইংরাজি অনুবাদ এবং ধর্ম ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ ৫৮৮

* The Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka and Manduka Upanishads with Madhva's commentary Yajnavalkya Smriti with the commentary Mitakshara and notes from the gloss, Balambhatti.

The Chhandogya Upanishad with Madhva's Bhasya.

The Vedanta Sutras with Baladeva's commentary. An Easy Introduction to Yoga Philosophy.

Tattwa Traya of Ramanuja School.

Gheranda Sanhita.

Shiva Sanhita.

The Three Truths of Theosophy.

Daily Practice of the Hindus.

Catechism of Hinduism.

করিয়াছেন। সেসকল পুস্তক বহুপ্রশংসিত এবং যুক্ত-প্রদেশে ও প্রদেশান্তরেব হিন্দুসমাজে সমাদৃত হইতেছে। এইসকল গ্রন্থের অনেকগুলি শ্রীশবাবুর প্রকাশিত Sacred Books of the Hindus নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীশবাবুই প্রথমে মধ্যপ্রদেশের সম্ভার্য উপনিষদ ইংরাজিতে অনুবাদিত কবিতা যুরোপীয় বেদান্তাধ্যায়ীদিগের সর্ব-প্রথম জ্ঞানগোচর করেন। তাঁহার লিখিত পাণিনিব সটীক ইংরাজী গ্রন্থ কতদূর সম্মান ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা পূর্বোক্ত মতগুলি হইতে জানা যায়। উহা শুদ্ধ গ্রন্থেরই প্রশংসা নহে কিন্তু গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা এবং মনস্তিতার চিরস্মারক—তাঁহার স্থায়ী কীর্তি। এপর্যন্ত কোন যুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসীর গ্রন্থ এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয় নাই; কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীশবাবুর পাণিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ কোর্স নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তিনি যে শাস্ত্রগ্রন্থের মর্মোদ্ভেদে নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি যে ভাষা, যে বিজ্ঞা, যে বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতেই গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত “Folk-Tales of Hindostan” নামক গল্পগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশ বিদেশের গল্পপাঠক সমালোচক এবং সম্পাদকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। লণ্ডনের “Review of Reviews” পত্র, উহাকে জগৎ-বিখ্যাত আরব্যোপস্তাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লণ্ডনের “Folklore” পত্রে একজন অবসর-প্রাপ্ত সিলিগ্যান (M. M. Longworth Daine, I.C.S.) ইহার গল্পাংশ, ভাষা, কল্পনা এবং চমৎকারিত্বের প্রশংসা করিয়া ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ “আল্ফ লায়লার” সমকক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

“It is to be hoped that Shaikh Chilli will make known to the world some more gems from his treasure house.”

পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগ ও বড়োদা রাজ্য এই পুস্তকখানিকে ছাত্রগণকে পুরস্কার দিবার ও পাঠাগারের উপযোগী বলিয়া অনুমোদন এবং ক্রয় করিয়াছেন।

শ্রীশবাবু হিন্দী বর্ণপরিচয়, হিন্দীতে Alphabetical Cards প্রভৃতি বাহির করেন এবং হিন্দী সাঙ্কেতিক লিখনপ্রণালী (Hindi Shorthand) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এদেশে আবশ্যকীয় টাইপ না থাকায় উহা পিটম্যানের “শর্টহ্যান্ড প্রেসেস” মুদ্রিত হয়।

আরবী ভাষা এবং মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া অনেক মোলবীকেও বিশ্বয় প্রকাশ কবিত্তে হইয়াছে। তিনি একদিকে যেমন বৈদান্তিক, পণ্ডিত, অপব-দিকে তেমনি স্ত্রীদিগের ভাবে তন্ময়; কারণ ফারসীতেও তিনি সুপণ্ডিত। একবার ওহাবী সম্প্রদায় স্ত্রী সম্প্রদায়ের সহিত একই মসজিদে উপাসনা করিবার অধিকারী কি না, এই বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলি সবল ও সঙ্গত যৌমাংসা করিয়া দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে * প্রকাশিত হয়। বড় বেনীদিনের কথা নহে, বারাণসীতে আদালতে বিলাত-ফেবত কোন ভদ্র লোকের সমাজচ্যুতি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার কথা সংবাদপত্রে অনেকের পড়িয়াছেন। এই মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাদীর বিপরীত সমর্থন করেন, কিন্তু সুপণ্ডিত শ্রীশবাবুর জেবার তাঁহাদের কোন যুক্তিই টিকে নাই। বিশাল হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার সূর্যগভীর জ্ঞান এবং অকাটা যুক্তির সম্মুখে কাশীর সেই প্রসিদ্ধ মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়দিগকে হার মানিতে হইয়াছে। বিচারপতি শ্রীশবাবু স্ফুটিত স্মৃতিভূত রায় লিখিয়া এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সাধারণের পক্ষেও উপাদেয় পাঠ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

জনহিতকর কার্যেও শ্রীশবাবুর অল্পরোগ বড় অল্প নহে, তিনি অধ্যয়ন গ্রন্থলিখন এবং বিচারকার্যে কঠোর শ্রম কবিতাও সার্বজনিক মঙ্গলকর্মে যোগদান করিয়া থাকেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কার্যে, বারাণসী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে সহায়তা তাহার অস্তুতম নিদর্শন। তিনি যখন বেবিলীর সবজজ

* The right of Wahabis to pray in the same mosque with the Sunnies—an Important Judgment on a very disputed question of Muhamadan Law.

ছিলেন তখন সত্ৰাট সপ্তম এডবার্ড পরলোকগত হন। তিনি সত্ৰাটের স্মারক স্বরূপ তথায় “Edward Memorial School” প্রতিষ্ঠাৰ প্রধান উদ্যোগী হন। এলাহাবাদে “Indian Girls’ High School” নামে যে বালিকা বিদ্যালয় আছে শ্রীশ বাবুই তাহাৰ প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এইসকল কার্যে যথাসাধ্য প্রচ্ছন্নভাবে করিয়া থাকেন বলিয়া সাধারণে তাহা প্রায়ই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ব্রীকমেনস সপ্তদায়েৰ একজন বিশিষ্ট ও পদস্থ সভ্য, থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সম্মানিত সভ্য ও উৎকর্ষবিধায়ক, জনসাধাবণেৰ প্রিয়, ব্যবহারে অধ্যায়িক, কর্তব্যপরায়ণ কক্ষচাৰী, হস্তিচাৰক, ধর্মপ্রাণ, এবং সাহিত্যের অকপট ও অক্লান্ত সেবক। ১৯১০ অব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশবাবু স্মলকজ্জকোর্টেৰ জজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় বাবাণসী গমন করেন। তদবধি তিনি কাশী প্রবাসেই আছেন। সত্ৰাটের অভিব্যেক উৎসব উপলক্ষে গভর্নমেন্ট শ্রীশবাবুকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়া তাঁহার গুণেৰ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বাহারা তাঁহাকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন তাঁহাদের মত যে “মহামহোপাধ্যায়” বা “শম্-উল্-উলামা” বা উভয় উপাধি এক সঙ্গে দিলেই তাঁহাৰ উপযুক্ত হইত।

আমরা প্রবন্ধারম্ভে শ্রীশবাবুর জন্ম এবং ৬ বৎসব বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগের কথাই বলিয়াছি; তাঁহাৰ পিতার কথা বলা হয় নাই। শিক্ষাসংস্কারপ্রিয়তা, অধ্যয়নশীলতা, সাহিত্যাহ্বারাগ, অধ্যবসায়, স্বাস্থ্য এবং চরিত্রবল—এসমস্তই শ্রীশবাবু পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐসকল গুণ তাঁহার পিতায় বিশেষ ভাবে বর্তমান ছিল। শ্রীশবাবুর মাতাঠাকুরাণী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার মত দয়ালু, উদারহৃদয় ও অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহকর্তী সর্বদেশেই দুর্লভ। তাঁহাদের পরিবার আদর্শ হিন্দু পরিবার। আমরা ১৩০৯ সালে, “প্রবাসী”র ২য় বৎসরে, শ্রীশবাবুর পিতা স্বর্গীয় শ্রামাচরণ বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা উক্ত প্রবন্ধে ইটালি, ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপীনিয়ন প্রভৃতি হইতে যেসকল সাময়িক মন্তব্য উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে জানা যাইবে যে শ্রীশবাবুর পিতা শ্রামাচরণ বাবুই পঞ্জাব বিখ-

বিত্তালয়ের জনক এবং পঞ্জাবের সমসাময়িক বাবতীয় জন-হিতকর কার্যে সহযোগী ছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে পঞ্জাবে যেসকল প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, শ্রামাচরণ বাবু তাঁহাদের অন্ততম। পঞ্জাবের উন্নতিবিধানকল্পে তাঁহার কৃতিত্ব বড় অল্প ছিল না এবং তাহা ডাক্তার লাইটনার ও সাব লেপেল গ্রিফিন প্রমুখ বিখ্যাত বাঙ্গালপুঙ্খপণ কর্তৃক প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃতও হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপীনিয়ন পত্রিকা ১৮৬৭ অব্দের ১৬ আগষ্ট শ্রামাচরণ বাবুব মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন,—

“The deceased gentleman took considerable interest in all matters affecting the welfare of his adoptive country and together with other Bengalis threw himself actively into all movements which sometime ago reflected credit on this Province.”

১৯০৭ অব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের লাইট নামক পত্রে শ্রামাচরণ বাবুব সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। তাহাতে পঞ্জাবে শ্রামাচরণ বাবুব কীর্ষি স্পষ্টাক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বাহারা এই পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রবাসীর ২য় ভাগে পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং ১৯০৭, ২য় ফেব্রুয়ারীর “লাইট” পত্রিকার “Father of the Punjab University” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ঐ প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

“His devotion to the cause of education in the Punjab was as unflinching as that of David Hare in Bengal.”

এই শিক্ষাবিস্তার এবং জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্য প্রচার করিবাব জন্ত প্রতিভাবান্ পিতাপুত্রের উক্তরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা, অনন্তসাধারণ অধ্যবসায় ও কৃতকার্যতা পঞ্জাব এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাঙ্গালীর নাম চিরস্মরণীয় এবং চিরবরণীয় করিয়া বাখিবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

স্নেহবিদ্ব

এত যে বেদনা দে’ছ ওগো প্রিয় মোব,
কভু তাহে ঝরে নাই নয়নের লোর;
আজি তব অধাচিত দয়ার্দ্র আদবে
নয়নের জল মোর অবিরল বাবে।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নীলকুঠি

[এম্যানুয়েল আরেন্ লিখিত 'লা মের্স হু' নামক
মূল ক্রাসী গল্পের অংশস্বরূপ]

আমাব কাকা জাঁ তাঁহার জীবনের এই কাহিনীটি
আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন—

তোমাব ত জানোই টাকার ধান্দায় আমাকে ফ্রান্সের
চারিদিকেই ঘুরে বেড়াতে হ'ত। একবারকার যাত্রার
দিক্জো এলাকার কাছাকাছি একটা নেহাত বেগানা
জায়গায় একটা ছোট ষ্টেশনের ধাবে একখানি অদ্ভুত ধবণের
ছোটখাটো বাড়ী দেখেছিলাম।

সেই বাড়ীখানির বং ফিকে নীল ; বৃষ্টিবাদল, ঝড়ঝাপট
থেরে থেরে ফিকে রং আরো ফিকে হয়ে ছাতের ধুব
রঙের সঙ্গে প্রায় একাকার হবার উপক্রম হয়েছে।

প্রথমবারে যখন আমি সেই বাড়ীখানি দেখি—সে
আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা—সে রেলগাড়ীর কামরা
থেকে বসেই ; গাড়ী তখন সেই ছোট ব্রেজি-বা ষ্টেশনে
এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই নীলকুঠির সামনের ছোট বাগান-
টিতে একটি বালিকা লাটিম ঘুরিয়ে খেলা করছিল—তাব
বয়স দশ বছরের কাছাকাছি, ফুটফুটে গোলাপী তাব রং,
পোষাকটি তার বসন্তের সজ্জার মতো, আর তাব চুলগুলি
একটি নীল রেশমী ফিতার কাঁশে বাঁধা, সর্বদা তার
উচ্ছল আনন্দের চেউ,—আনন্দেরই প্রতিমা সে। ..সেদিন
সকালবেলাটার আমার মেজাজটা খুসি ছিল না ; আমাব
কারবারটা ঠিক চলছিল না, তাই আমি বদ মেজাজে চিন্তার
বোঝাই নিয়ে পারীশহরে ফিবে যাচ্ছিলাম। ..এই
কণিকের ছবিখানি আনন্দের প্রলেপ দিয়ে আমার মনের
সকল গ্লানি মুছে দিলে। ..আজ প্রভাতে নয়ন মেলেই এই
প্রকৃতি-সুন্দর কুণো দেশেব সাজানো বাগানে সুন্দরী
বালিকার মাধুরী দেখেই মনে হ'ল, আজকের দিনটা
আমার ভালোয় ভালোয় যাবে। আমি ভাবলাম—“এমন
জায়গায় যা বাস কবে তারা নিশ্চয় খুব সুখী ! ..না আছে
তাদের চিন্তা, না আছে তাদের বিরক্তির কোনো কারণ।”
আর সেই আনন্দপ্রতিমা মেয়েটির সরলতা দেখে আমার

ফিংসে হতে লাগল। যদি আমি তারই মতো আমার
ভাবনা বোঝা নামিয়ে ফেলে বিশ্বসৌন্দর্যের লীলার মধ্যে
নিজেকে হাবিয়ে ফেলতে পারতাম।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। ঠিক সেই সময়ে নীলকুঠিব একটা
জানলা খুলে একজন কে ডাকলে—“লোরিন্ !”...আর
অমনি ছোট মেয়েটি বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

লোরিন্ ! এই নামটিও আমাব কাছে বড় মিঠা লাগল।
এবং গাড়ীতে নিষ্কর্ষা বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি
কল্পনাব চক্ষে দেখতে লাগলাম সেই লোরিন্, সেই লাটিম,
সেই বাগান, আর সেই নীলকুঠি। ক্রমে ক্রমে সব ঘোলা
হয়ে ঝাপসা হয়ে এল, কুঠি বাগান লাটিম লোবিন্ সব
আমাব ভাবনার মধ্যে একশা হয়ে গেল।

তাবপর অনেকদিন ওমুখো আর হইনি। ফ্রান্সের
উত্তর থেকে পূর্ব কখনো লীল, কখনো বা জ্ঞানি, অন্ন-
চেষ্ঠায় ছোটোছুটি কবে কিবছিলাম, মাথায় আমার দোসরা
চিন্তার অবসর আর ছিল না।

প্রায় দশ বৎসব পরে। একদিন শুভদিনে আমি
মার্সেই যাত্রা করলাম। সেখানকার কাজ সেরে ফেরবার
মুখে আমাব পুৰোণো স্মৃতি জেগে উঠল। আমি বুঝে
শুনে সন্ধ্যার গাড়ীতে বসনা হলাম যেন ব্রেজি-বা ষ্টেশনে
গিয়েই আমার স্মৃতিভাত হয়। ..সেই নীলকুঠি ঠিক তেমনি
আছে, মনে হল বংটি যেন আবে কিকে হয়ে গেছে, আর
যেন কুঠিব দিকে কাবো বেশি নজর নেই। ..কিন্তু সেই
বাগানে একটি তকণী বসে ছিল, সুন্দরী গোরী, তার
চুলগুলি আজ তার মনেরই মতন গোলাপী ফিতায়
বাঁধা। ..এই ত সেই লোবিন্, আমি যে তাকে চিনি !
তাব পাশে একজন তকণ বসে ছিল—সমস্ত প্রাণ দিয়ে
যেন সে লোরিনকে দেখছিল, লোরিনের তুষ্টিব জন্তে সে
যেন আপনাকে পলকে পলকে নিবেদন করে দিচ্ছিল ;
আর তাদের দুজনকে ঘিবে সেই সরল হাসি আর মনের
শান্তি তেমনি ভাবেই বিবাজ কবছিল।

তাদের সেই তরুণ হৃদয়ের ভাববিগলিত মিলনদৃশ্য
দেখে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যখন
ট্রেন ছাড়বার সন্ধ্যাতকণী বেজে উঠল আমি তাড়াতাড়ি
জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত ছুলিয়ে মাথা নেড়ে

অভিবাদন করে টেচিয়ে বললাম -নমস্কার নমস্কার কুমারী
লোরিন! আজকে তবে আসি.....

তরুণী আমার দিকে বিষ্ময়ে বিকসিত কুবঙ্গ-নয়ন তুলে
চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণও। তাবপব তাবা দুজনে
হাসিতে যেন গলে' যবে পড়তে লাগল; তাবাও নমস্কার
কবে' তাদের ক্রমাল হুলিয়ে আমার প্রত্যভিবাদন কবলে।
.....আমি গাড়ীর জানলার মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে
সব দেখলাম। আমার মন খুঁসি হয়ে গেল।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, মাসে ঈ লাইনে
অনেকবার যাওয়াআসা কবেছি বটে কিন্তু কাজের তাড়ায়
এমন গাড়ীতে যেতে আসতে হয়েছে যে-ট্রেন গাড়ীক রাত্রে
ব্রেজি-বা ষ্টেশনে না থেমেই পেরিয়ে যায়। একবার সুবিধা-
মত সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া ঘটল, সেই যে-গাড়ী ঠিক
সকাল বেলায় ব্রেজি-বা ষ্টেশনে পৌছয়। সে আজ কত-
দিন যেদিন সেই বাগানে লোরিনকে তাব প্রণয়ীর পাশে
দেখেছিলাম? বাবো বচ্ছর, পনর বচ্ছরই বা; আমার
ঐক্য মনেও নেই।.....

এবার ট্রেন যখন সেই ছোট ষ্টেশনে এসে থামল,
দেখলাম সেই বাগানে কেবলমাত্র একটি ছোট ছেলে
ঘাসের উপর শয়ান একটা প্রকাণ্ড কুকুরকে ধরে' টানা-
টানি করে' খেলা করছে।..... তবে কি আমি লোরিনকে
একবার দেখতে পাব না?.....আমি বড়ই ক্ষুধ মনে
হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ ছেলোট চোঁচাতে লাগল—
মা! মা! বেলগাড়ী!..... কলের গাড়ী!.....

তখন একজন মহিলা বাড়ী থেকে বেবিয়ে এল।...এই
সেই, নিশ্চয়! একটু মোটা, একটু কালো, কিন্তু তবু
আমি তাকে দেখবামাত্র চিনেছি। তাকে দেখবামাত্র
আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সম্ভ্রমে সঙ্গে আমি টুপি তুলে তাকে
অভিবাদন করলাম।...সেও আমার অভিবাদন প্রত্যর্পণ
করলে, কিন্তু একটু বিষ্ময়ে ভাবে। সে চিবিদিনই সেই
একই রকম আছে, তেমনি প্রিয়দর্শন, তেমনি সবল, তেমনি
ঠিক তাবই মতন।...গাড়ী যখন ছাড়ল, তখন আমার
এই আগমনটিকে চিহ্নিত কবে রাখবার জন্তে একটা কমলা
লেবু নিয়ে ছেলোটর উদ্দেশ্যে বাগানের মধ্যে ছুড়ে ফেলে
দিলাম; কমলা লেবু ঘাসের উপর গড়িয়ে গেল আর

তার পিছনে পিছনে ছেলোট আর কুকুরটি দৌড়তে
লাগল।...

এব পরের আমার জীবনে এমন সব বিচিত্র ঘটনা
ঘটেছিল যে আজ এত বৎসব পবে সেসমস্ত যেন স্থগ্ন বলে
মনে হয়। তোমবা জানো ব্যবসা উপলক্ষে তুর্ন্তে গিয়ে
কাল-পানিতে আমার জাহাজ 'ডুবি হয়েছিল। তখন
সেই ছববস্থায় পড়ে সেই ব্রেজি-বা ষ্টেশনের ধানের সেই
নীলকুঠি কথার আমার মনে পড়ছিল কিনা তেমন
ভাবছ? মনে পড়েছিল বৈ কি! সেই জাহাজ-ডুবি পব
মৃত্যু আব আমার মধ্যে যখন একখানি তত্তামাত্র ব্যত্থান
তখন ঠিক সেই প্রথম দিনের মতনই ছব্ব সমস্ত চিন্তা
আমার মনের উপর দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে যাচ্ছিল।...
আমি তখন নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলছিলাম—হায়বে
হতভাগা জাঁ! পৃথিবী যুঁটে দৌড়ে বেড়ানোর বস্তাটা ত
এবার টের পেলি। যদি তুই অল্পে সন্তুষ্ট হতে জ্ঞানতিস
তা হ'লে হয় ত তুইও তোব অচেনা বন্ধু লোরিনের মতোই
শীঘ্রিতে থাকতে পাবতিস, চাই কি বৃগঞ্জের রত্নতপ্ত
সেই নীলকুঠির কোলেই ঠাই পেতিস। আজ আর সেসব
স্বপ্নেব সম্ভাবনাও তুই রাখিস নি!

ভাগ্যে ভাগ্যে আমি সেবার বেঁচে গেলাম। নে যেন
দৈব ঘটনা। আমি যখন অবসন্ন মৃতপ্রায় তখন এক
ওলন্দাজ জাহাজ হুদিন পবে আমার জল থেকে তুলে
নিলে।...পনর কি কুড়ি দিন পরে, ঠিক মনে নেই,
আমি আবার ক্রান্তে ফিরে এলাম। দেশে ফিরেই আমি
মার্সেই থেকে পারী শহরের ট্রেনেব যাত্রী হলাম। এই
আমার শেষ যাত্রা। এই বৃদ্ধো বয়সে এত নাক্সলের পর
টো টো কবে ঘুরে বেড়ানোর সাধ আর আমার ছিল না।

সকাল বেলা গাড়ী সেই ব্রেজি-বা ষ্টেশনে শৌছিল।
আমার হৃদয় যেন আনন্দে উত্তেজিত ফেটে পড়বার মতন
হয়ে উঠল, হৃদয় যেন বক্ষপঞ্জর ভেঙেচুরে লোরিনকে
একবার দেখবাব জন্তে ছুটে বেরিয়ে পড়তে গাচ্ছিল।
এখনি গাড়ী থামবে আর ছেড়ে চলে যাবে, এবটি মুহূর্তেব
মাত্র সুযোগ, হয় ত তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা
হবে না।

গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দূর হতেই দেখতে পেলাম

ষ্টেসনের পাশেই সেই নীলকুঠি রৌদ্র মেখে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।...হঠাৎ রৌদ্র-মাথা নীলকুঠি মেখে আমার কেমন কালাপানিতে নৌকা-ডুবির কথা মনে এল।...সে আজও এই বাড়ীতে আছে, হয় ত তেমনি শান্ত উদাসীন, আমাব ভরাডুবির খবরও সে রাখে না।...গাড়ী এসে ঠিক কুঠির সামনেই থামল। আমি দেখলাম সেই বাগানের একটি লতাবিহানের নীচে একজন বর্ষীয়সী রমণী বসে রয়েছে—তার রূপালি চুলগুলি সীঁথিতে ছুতাগ হয়ে পিঠময় ছড়িয়ে গেছে, আর তার চারিদিকে ঘিরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কলরব করছে।

এই লোরিন!...তাকে আব কেউ চিনতে পারত না; আমি কিন্তু তাকে চিনি!...এক মুহূর্তেরও দ্বিধা আমার হয় নি।—সেই বালিকা বয়সে লাটিম নিয়ে তার খেলা; তারপর তাকণ্যের লীলাচপল সেই সাক্ষাৎ; তারপর সে গৃহিণী, সে মাতা; আর আজ সে ঠাকুর-মা, দিদিমা, নাতিনাতিনী-পরিবৃত্তা; বার বার বিভিন্ন মূর্তি, কিন্তু সকল মূর্তিই সেই এক অভিন্নের!

এবারকাব এই ক্ষণিক সাক্ষাতের আসন্ন অবসানের আশঙ্কা আমার চিন্তিত্ত রসে ভরে তুলতে লাগল। আর আমি এ পথে কখনো আসব না, এই আমার এজন্মের শেষ সাক্ষাৎ! আমার বড়ই সাধ হতে লাগল আমি একটবার অল্পক্ষণের জন্তে কথা করে আমার চল্লিশ বছরের পুরাতন অচেনা বন্ধুটির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে বাই।...দৈব আমার সহায় হ'ল; এজিনিটা অল্প বিগড়ে গেল; অন্তত পক্ষে ঘণ্টাখানেক লাগবে কল সারতে; ততক্ষণ সেই ষ্টেসনেই থাকতে হবে।—আর আমার পায় কে? সাধ আমি মেটাব। আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে সঙ্কোচের ত কোনো কারণ নেই।

আমি কুঠির কটকের দিকে চললাম; আমার পা কিন্তু তখন থরথর করে কাঁপছিল। ভাবের আতিশয্যে এমন অভিভূত আমি কখনই কালেও হই নি। আর, আমি যা হই তা হই ভীক নই, এটা ঠিক, তার উপর ত তুর্কীর দেশে বিষম রকম তুর্কী নাচন নেচে এই সম্ভব আসছি।...যাক।...আমি ডাক-ঘণ্টার দড়ি ত টেনে দিগেছি। মালী এসে দরজা খুলে দিলে; আমি তাকে বললাম—“ঐ যে

লতাঘরে বুড়ী-গিন্নি বসে রয়েছেন আমি একবার তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই।”...মালী আমাকে বাগানে চুকিয়ে গিন্নিকে ডাকতে গেল।...সে এল।...

এতদিন পবে লোরিন আজ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমি তাকে বলবার মতন কোনো কথাই এখন খুঁজে পাচ্ছি না। সেই তখন আমার জিজ্ঞাসা করলে—“আপনার সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমাব লিসে হ'ল মশায়?”

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—“তুমি আমার চিনতে পারছ না?”

—ঠিক না ভ.....

—আ! আমি, আমি কিন্তু তোমায় খুব চিনি!.....

তবে দেখ!.....আমি যে তোমায় চিনেছি সে কি আশ্চর্যের কথা?...আমি তোমাকে এই বাগানে এতটুকু বেলায় লাটিম নিয়ে খেলা করতে দেখেছি; আমি সেই লোক, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, যে গাড়ীর জানলা থেকে তোমায় একদিন নমস্কার করে গিয়েছিল—তখনো তোমার বিয়ে হয়নি; আর তারপর, অনেক দিন পবে, যে লোক একটা কমলা লেবু একটা ছোট.....

সেই মহিলাটি কেমনতর ভয় পেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল; প্রথমটা কয়েক পা পিছিয়ে হটে গিয়ে সরে দাঁড়াল; আমার হয় ত পাগল কি মাতাল ঠাউরে থাকবে; কিন্তু তারপর আমার বৃদ্ধ বয়সের শান্ত মূর্তি দেখে ভরসা করে খুব কোমল শান্ত স্বরে বললে—“আপনার নিশ্চয় কোনো রকম তুল হয়ে থাকবে। আমরা সব এই এক বছর এই নীলকুঠিতে আছি।”

আমি অবাক হয়ে গেলাম।—আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম—“আপনি.....তবে.....লো.....রি.....ন.....নন?”

—লোরিন?.....আপনি মশায় কার কথা কচ্ছেন আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি নে। আমাদের এখানে ত সে নামেব কেউ নেই।

আমাব মনে হতে লাগল যেন আমার চারিদিকে স্বপ্নের ঘোঁরু লেগেছে। যখন সেই মহিলা চলে যাবার উপক্রম করলেন তখন আমি বললাম—“কমা করবেন.....

আর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান।.....আপনার আগে এ বাড়িতে কাঁরা থাকতেন ?”

—আমাদের আগে ? ... একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, চিরকুমার তিনি। দশ বছর হল তাঁর মৃত্যু হয়েছে।.....

তিনি খুব ঘটা করে’ নমস্কার করে’ আমাকে ফটকের বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফটক বন্ধ করে দিলেন। আমি একেবারে আন্তরিক বোকা বনে’ গিয়ে ব্রেজি বা গাঁয়ের গলি দিয়ে চলছিলাম, বিষম দুর্ঘটনার ছুঁথে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।.....আমাকে তল্লাস করে জানতেই হবে... নিশ্চয় আশ্চর্য্য রকম একটা ভুল এর মধ্যে জড়িয়ে আছে, সে জট সন্ধান করে খুলতেই হবে।

আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে ভদ্রলোক কিছুই জানেন না, এ ষ্টেশনে তিনি নবগত। কিন্তু তিনি সন্ধান বলে দিলেন যে এই গাঁয়ের সবার চেয়ে বড়ো একটা লোক ষ্টেশনের কাছেই নীলকুঠির সামনেই থাকে, তার কাছে খবর মিলতে পারে।

বৃদ্ধ চিন্তাসূত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বললে—লোরিন ... অ্যা, লোরিন ... আমার ত স্মরণ হয় না.....

—কিন্তু বছর পনের বোল আগে ঐ বাগানে যে একজন মহিলাকে দেখেছিলাম একটু মোটা একটু কালো, একটা ছোট ছেলে আর একটা প্রকাণ্ড কুকুরের সঙ্গে.....সে তবে কে ?.....

—ও! একটা বড় কুকুর, অ্যা, একটা খুব বড় কুকুর.....হ্যাঁ হ্যাঁ, সে যে দারোগা-গিন্নি মাদাম জিলামে। কিন্তু তার নাম ত লোরিন ছিল না, এ ত আমি খুব জানি, আমি যে বরাবর তাদের বাড়ীতেই থাকতাম। তার নাম ছিল ফ্রান্সোয়াজ।

আমি ত একেবারে মূঢ়ের মতন হয়ে গেলাম!

—আচ্ছা, মশায়, ভালো করে মনে করে দেখুন ত আচ্ছা, তারো আগে, প্রায় বছর বারো আগে, একজন যুবতী মেয়ে খুব ফরসা বেশ লম্বা, মাথার চুলে গোলাপী ফিতে, আর একজন কালো মতো যুবা পুরুষ, খুব সম্ভব সেই মেয়েটির বাগদত্ত স্বামী, এই বাগান-বাড়ীতে কি থাকত ?.....

বৃদ্ধ ভাবলে, ভাবলে, কতক্ষণ ধরে ভাবলে।....

অবশেষে সে তার বুড়ীকে ডাকলে। বুড়ী মগ্নমুখ ছোটখাটো, চোখ দুটি উজ্জ্বল জীবন্ত, চটপটে ধরণ, দেখলেই মনে হয় যে তার স্মরণশক্তি বেশ তেজালো। বুড়ো তাকে সব কথা বললে।.....

—ও! সে যে মাদমোয়াজেল স্তেফানি, কণ্ট্রাক্টার সাহেবের মেয়ে ?.....সেই ত লম্বা মতন, চুলে ফিতে বাঁধা ? এ সে বৈ আর কেউ নয়।.....দিক্জোশহরের এক সওদাগরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, আহা বেচারী! তাদের বিয়ে স্মৃথের হয় নি, তারা আলাদা হয়ে আছে। আহা, মেয়েটা এখন, ঐ যে কি বলে ভালো ওর নামটা, সোমব্যারনো, হ্যাঁ হ্যাঁ সোমব্যারনো শহরে তার বাপের বাড়ীতেই আছে, আহা বড় দুঃখ তার ...

আমি যাবার জন্তে নমস্কার করলাম।.....সময় আর নেই, ট্রেন এইবার ছাড়বে.....

—লোরিন! লোরিন! সে ত একেবারে ভ্রান্তি নয়, আমি যে তাকে এতটুকুবেলায় দেখেছি, আমি যে তার নম্র শুনেছি... আজও যেন তাকে চোখের সামনে দেখছি সে বসন্তের প্রজাপতিটির মতন হাওয়ার গানে আলোর তালে পুষ্পগন্ধের সুরে লাটিম ঘুরিয়ে নেচে খেলে বেড়াচ্ছে.....

এই কথা না শুনে বুড়ী বলে উঠল—ও! এ কথা আগে বলতে হয়, মশায়!... আপনি আগে বললেন একজন গিন্নির কথা, তারপর বলেন একজন সোমথ মেয়ের কথা,.....এখন বলছেন একটা ছোট মেয়ের কথা!... হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে ত আমার বেশ মনে আছে, ...লোরিন,.....হ্যাঁ, লোরিনই ত তার নাম বটে।..... উঃ, সে কি আজকের কথা গো, নেই কম ত ছুঁড়ি বছর হবে!.....সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি ত..... সে ডাক্তার সাহেবের মেয়ে, আমাদেরই তারা আপনার লোক।..... আহা মেয়েটা দশ বছর বয়সেই মারা গেল।.....

দশ বৎসর বয়সে, আমি তাকে দেখার কয়েক দিন পরেই, সে মারা গেছে! আর আমি? আমি তার পর এই চল্লিশ বৎসর ধরে তাকে অনুসরণ করে আসছি।.....

চার বন্দোপাশ্চাত্য।

মনোমোহন বসু

মনোমোহন বসুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একাধারে কবি, নাটককার, উপন্যাসিক, বক্তা, শিক্ষাদাতা ও স্বদেশভক্ত হারাইয়াছে। মনোমোহনের কৃতিত্ব ঐসকল বিষয়ে অল্প ছিল না, এবং তাঁহার যশ চিরকাল অম্লান থাকিবে।

চব্বিশ পরগণা জেলার ছোটজাঙলে গ্রামের প্রসিদ্ধ বসুবংশজ মনোমোহন বংশগৌরবেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার চার সহোদর, মনোমোহন কনিষ্ঠ। শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া তিনি মাতুলান্নয়ে বনগ্রামের সন্নিকট নিশ্চিন্তপুর গ্রামে লালিত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে উলঙ্গ শিশু মনোমোহন রামায়ণ ও মহাভারত মুখস্থ করিয়া তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন; এই বয়সেই তিনি নিজেই পণ্ডা রচনা করিয়া স্নেহপরায়ণ মাতামহের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্তি, অমায়িকতা ও স্নানীলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কবিত্বময় চিত্ত, এবং নির্দোষ স্বভাব আশ্রয় পর, সত্যার্থ শিক্ষক, সকলেরই প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং পুরস্কার লাভ করিয়া মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। হেয়ার স্কুলে পাঠকালে তিনি প্রসিদ্ধ শিক্ষক রিচার্ডসনের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তৎপরে তিনি জেনেরাল এসেমব্লি কলেজে ভর্তি হইয়া প্রিন্সিপাল ও গিলভি ও অধ্যাপক এণ্ডারসনের মনোমোহন হইয়াছিলেন; অধ্যাপক এণ্ডারসন প্রায়ই তাঁহাকে দিয়া কাউপার ও মিল্টনের কবিতা বাংলা পণ্ডে ভাষান্তরিত করাইতেন। একবার কলেজে একটি বাংলা প্রবন্ধের জন্ত স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব হয়; মনোমোহন সেই প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ রচনা করেন; বিচার ফলে তিনি দ্বিতীয় সাবাস্ত হইলে মনোমোহন আশ্চর্য্য হইয়া অধ্যক্ষ ও গিলভির নিকট গিয়া যে ছাত্র প্রথম হইয়াছে তাহার রচনা দেখিতে চাহিলেন। অধ্যক্ষ মুহূর্ত্তান্তর সহিত তাঁহাকে সেই প্রবন্ধ দিলে মনোমোহন বিশেষ মনোযোগের সহিত উহার আগন্ত পাঠ করিয়া বিনয়বচনে অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিলেন যে এই প্রবন্ধ ও তাঁহার



স্বর্গীয় মনোমোহন বসু।

প্রবন্ধ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান কোনো বিশেষ বিচারকের দ্বারা তুলিত হোক। অধ্যক্ষ মনোমোহনের অনুরোধে বিশেষ দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব দেখিয়া পুনর্বিচার করাইতে স্বীকৃত হইলেন। সর্বসম্মতিক্রমে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর এই বিচার-ভার অর্পিত হইল। এবারের প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে না পারিলে সকলের নিকট অপদস্থ ও উপহাস্যপদ হইতে হইবে, ইহা মনে করিয়া মনোমোহন উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তিনি কলেজে উপস্থিত হইবামাত্র অধ্যক্ষ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন— ‘মনোমোহন, পুনর্বিচারে তোমারই জয় হইয়াছে।’ মুহূর্ত্ত-মধ্যে এ সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল—কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সকলে আসিয়া মনোমোহনকে বিরিয়া জয়গান করিতে লাগিলেন এবং পুরাণ টাউনহলে এক

প্রকাশ সভা করিয়া তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক ও কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ পুরস্কার দিলেন।

পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মনোমোহন ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকবে ও অক্ষয় দত্তের তত্ত্বাবধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি নিজেও কতকদিনের জন্য বিতাকব নামক একখানি সংবাদপত্র পবিচালিত করিয়াছিলেন।

মনোমোহনের বয়স যখন ৩৪।৩৫ বৎসর তখন একবার তাঁহাদের গ্রামে নাটক করিবার প্রস্তাব হয় এবং উহার ব্যয়াদি নির্বাহের জন্য গ্রাম হইতে ৬০০ টাকা চাঁদা উঠে। এই উপলক্ষে তিনি রামাভিষেক নাটকখানি রচনা করেন। কিন্তু নাটকের বন্দোবস্তাদি শেষ হইবার পূর্বেই উড়িষ্যার ভীষণ দুর্য্যক (১৮৬৬ সালের মধ্যস্তর) দেখা দেওয়ার নাট্য-তহবিলের সমস্ত টাকা সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ফলে, রামাভিষেকের অভিনয় হইতে পারে নাই। এই নাটকখানি অতঃপর গ্রন্থকার নিজেই প্রকাশিত করেন। প্রথমতঃ ইহা অতি খাবাপ কাগজে অস্পষ্ট-হরফে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। কিন্তু উহাবই কাটুতি এত অধিক হইতে থাকে যে, পুস্তকের মূল্য ক্রমে ক্রমে তিনগুণ বর্দ্ধিত করা হইলেও অল্প দিনের মধ্যেই উহার কয়েক সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

এই সময় এদেশে হাফআখড়াই নামক একপ্রকার সঙ্গীত-সমবেব প্রচলন ছিল। ধর্ম, নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন লইয়া দুই দল গায়কের মধ্যে এই আখড়াইয়েব লড়াই চলিত। দেশেব অনেক প্রসিদ্ধ লোক ইহার কোন না কোন দলে নেতৃত্ব করিতেন। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতিব সাহিত্য-গুরু তদানীন্তন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি—ঈশ্বর গুপ্তও এক হাফআখড়াইয়েব গুস্তাদ ছিলেন।

মনোমোহন প্রভৃতির সহিত কানীধামে অবস্থানকালে গুপ্তকবি এক হাফআখড়াইয়েব আসবে অল্প উপযুক্ত লোক না পাইয়া মনোমোহনকেই প্রতিপক্ষ নির্বাচিত করেন এবং তাঁহাব সহিত সঙ্গীতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অসীম প্রতিভাবলে মনোমোহন এই লড়াইয়ে গুপ্ত কবিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুপ্তশিষ্যেব এই সঙ্গীতসময়ের কাহিনী ‘মনোমোহন-গীতাবলী’তে লিপিবদ্ধ আছে।

নাট্য-সাহিত্যে মনোমোহনেব দ্বিতীয় কীর্ত্তি—প্রায়-পরীক্ষা নাটক। এই নাটক প্রকাশের পরই নাট্যকারেব নশ সমগ্র বঙ্গভূমিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং সকলেই তাঁহাকে তখনকাব দিনের শ্রেষ্ঠ নাটককার বলিয়া অভিনন্দিত করেন। এই পুস্তকের ভূমিকা পাঠ করিয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—‘গ্রন্থকার যে একজন শক্তিশালী লেখক, ভূমিকাপাঠেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।’ এই প্রণয়পরীক্ষাব সম্পর্কেই মনোমোহনের ‘নাটুকে মনোমোহন’ খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রণয়পরীক্ষার পরবর্ত্তী রচনা—মনোমোহনের পদ্মমালা। ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহার চন্দ্র, ভাষা ও ভাব একাধারে সরল ও সুন্দর। এই পুস্তকখানি পড়িয়া ভূদেববাবু মনোমোহনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—‘পদার্থ ও জীবজন্তু সম্বন্ধীয় একরূপ সরল ও সরস কবিতাপুস্তক এপর্য্যন্ত এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা শিশুগণের কণ্ঠভরণস্বরূপ।’ বলাবাহুল্য, এই পুস্তক মালী বিক্রয় করিয়া মনোমোহনের যথেষ্ট অর্থ লাভ হইত।

রচনার জায় বক্তৃতায়ও মনোমোহনের স্বাভাবিক শক্তি ছিল। স্বভাবতঃই তিনি আমুদে ও রসিকতাপ্রিয় ছিলেন, বক্তৃতাক্ষেত্রেও অনাবিল হাস্যপ্রমোদের ভরজ তুলিয়া শ্রোতৃবৃন্দেব মনোবঞ্জন করিতেন। একবার হিন্দুমেলার সভাপতিরূপে তিনি যে বসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র ও ব্রাহ্মপ্রচারক নগেন্দ্রনাথেব জায় গুরুপণ্ডীর ব্যক্তিও হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানাগর মহাশয় একবার কোন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে না পারায়, মনোমোহন উঠিয়া তাঁহাব লাজুকতা সম্বন্ধে এমন রসিকতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া স্বয়ং বিজ্ঞানাগরও খুসি হইয়াছিলেন। বক্তৃতামালা ও হিন্দু আচার ব্যবহার নামক ডব্লুপ্ত পুস্তক দুখানিতে এইরূপ রসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

শৈশবাবধি মনোমোহন চাকরীর উপব বিতৃষ্ণ ছিলেন। দাসত্বকে তিনি স্ববৃত্তির তুল্য মনে করিয়া সর্বত্রই পরিহার করিয়াছিলেন। পরামুগ্ধহীত কিংবা পরমুখপক্ষী হইয়া থাকাকে তিনি আদর্শেই পছন্দ করিতেন না। তাই

পুস্তকপ্ৰণেতা উপাধিযুক্ত অৰ্থেৰে প্ৰতিও কোনাৰ্হিন তাঁহাৰ অম্লৱাগ দৃষ্ট হয় নাই। নিজেৰ পুস্তকাদি বিক্ৰমেই তাঁহাৰ যথেষ্ট আয় হইত। তাহাৰ উপৰ ‘মনোমোহন লাইব্ৰেৰী’ নামক প্ৰসিদ্ধ পুস্তকালয়টী ও ‘মধ্যস্থ যজ্ঞালয়’ নামক একটী ছাপাখানা স্থাপন কৰিয়া অৰ্থাগমেৰে আৰো হুযোগ কৰিয়া লইয়াছিলে। এই মধ্যস্থ যজ্ঞালয় হইতে তাঁহাৰ সম্পাদিত প্ৰসিদ্ধ ‘মধ্যস্থ’ বাহিৰ হইত। ইহা বঙ্গদৰ্শনেৰ পূৰ্বে প্ৰকাশিত একতম প্ৰাচীন সাপ্তাহিক পত্ৰিকা। পৰবৰ্ত্তী সময়ে এই পত্ৰিকা বঙ্গদৰ্শনেৰ প্ৰধান প্ৰতিযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। প্ৰথমতঃ মনোমোহন ও বঙ্কিমৰ মধ্য প্ৰগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু দীনবন্ধুৰ সহিত এক রচনাৰ প্ৰতিযোগিতায় মনোমোহনেৰ বিচাৰে বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ পৰাজয় সাব্যস্ত হইলে তিনি দাৰুণ মনোমোহনদেবী হইয়া উঠেন। এই বিদ্বেষেৰ ভাব বঙ্গদৰ্শন ও মধ্যস্থেৰ প্ৰতিযোগিতায় সম্যক পৰিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। যখন বঙ্গদৰ্শনে বিভাৰাগৰ ও ভাৰতচন্দ্ৰেৰ বিৰুদ্ধে বঙ্কিমৰ প্ৰবন্ধ প্ৰকাশিত হয়, তখন মনোমোহন মধ্যস্থে তাহাৰ প্ৰতিবাদ কৰেন। এতদুপলক্ষে বঙ্গদৰ্শনেৰ ভাৰতচন্দ্ৰ সম্বন্ধীয় প্ৰবন্ধেৰ উত্তৰে তিনি “ভাৰতচন্দ্ৰেৰ গ্ৰহণ” নামক যে কবিতাটী মধ্যস্থে প্ৰকাশিত কৰিয়াছিলে, তাহাৰ তিনিটী ছত্ৰ এইস্থলে উদ্ধৃত কৰিতেছি :—

‘বঙ্গদৰ্শনেৰ দৰ্শন-বিজ্ঞা চমৎকাৰ।
সে মোৰ দৰ্শনে মোৰ হয় না কাৰ?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন ভাৰ?’

মধ্যস্থে রাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি ও দৰ্শনাদি বিষয়ে মনোমোহনেৰ বহু প্ৰবন্ধ এবং তাঁহাৰ রচিত অনেক কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্ৰকাশিত হইত। বাঙ্গালা পত্ৰিকা সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে তিনিই সৰ্ব্বপ্ৰথম মধ্যস্থে উহাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰেন। এই পত্ৰিকায়ই তাঁহাৰ ছলীন নামক উপন্যাসখানিৰ প্ৰথমাংশ প্ৰকাশিত হয়। রচনাবৈচিত্ৰ্যে ইহা পাঠকগণেৰ এতদূৰ মনোমোহন কৰিতে সমৰ্থ হইয়াছিল যে, মহাৰাজা স্বৰ্ণ্য-কান্তেৰ জ্ঞান ব্যক্তিও ছলীনকে বাস্তবজগতেৰ জীব বলিয়া মনে কৰিয়াছিলে।

মধ্যস্থ সম্পাদনেৰ গুৰুতৰ পৰিশ্ৰমে মনোমোহনেৰ

শিবঃপীড়া জন্মে। তাই তিনি বাধ্য হইয়া পত্ৰিকাখানিকে প্ৰথমতঃ পাক্ষিকে, অতঃপৰ মাসিকে পৰিবৰ্ত্তিত কৰেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তাঁহাকে অনন্তসহায় হইয়া সম্পাদনেৰ সমস্ত কৰ্ম কৰিতে হওৱায় তাঁহাৰ ব্যাৰাম ক্ৰমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। স্তববাং স্বাস্থ্যেৰ অম্লৱোধে অল্প দিন পৰেই তাঁহাকে পত্ৰিকাখানি উঠাইয়া দিতে হয়। এইৰূপ অসময়ে বিলোপ ঘটায় মধ্যস্থে ছলীনকে সম্পূৰ্ণ কৰিয়া যাইতে পাবেন নাই—এই পুস্তকেৰ শেৰাংশ মনোমোহনেৰ পুস্তক—বোসেৰ সৰ্কাৰেৰ সম্বাদিকারী প্ৰসিদ্ধ প্ৰফেসৰ বোসেৰ সম্পাদিত ‘গান ও গল্পে’ প্ৰকাশিত হইয়াছে।

বৈবাক্কাৰ অবৈতনিক নাট্যসম্প্ৰদায়েৰ অম্লৱোধে মনোমোহনেৰ সতী-নাটক বিবচিত এবং উহাদেৰ অৰ্থালুক্যে ইহা প্ৰকাশিত হয়। এই নাটকেৰ অন্তৰ্গত শাস্তে পাগলা ভক্তি-প্ৰেম ও হাস্যৰসেৰ এক অপূৰ্ণ চিত্ৰ। স্বৰ্গীয় কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়ৱদ্ব সেন মনোমোহনেৰ সাক্ষাৎ পাইলেই শাস্তে পাগলাৰ কথাগুলি আবৃত্তি কৰিতে কৰিতে বলিতে—‘মনোমোহন বাবু, আমি আপনাকে সহজে মৰিতে দিব না, এখনও আৰো বিশ বছৰেৰ বেশি বাঁচাইয়া রাখিব।’ পত্ৰমালাৰ জ্ঞায় এই সতীনাটকও যে মনোমোহনকে চিৰদিন বাঁচাইয়া রাখিবে, সে বিষয়ে আমাদেৰও সন্দেহ নাই।

সতীনাটকেৰ পৰ বচিত হৰিশ্চন্দ্ৰ, পাৰ্থবিজয়, রাসলীলা ও আনন্দময় নামক নাটকগুলিও গ্ৰন্থকাৰেৰ অৰ্থাগমেৰ ও খ্যাতিবিস্তাৰেৰ সহায় হইয়াছিল। হৰিশ্চন্দ্ৰ ও পাৰ্থবিজয় বোবাক্কাৰ অবৈতনিক নাট্যসম্প্ৰদায়েৰ ব্যয়ে প্ৰকাশিত হয়। রাসলীলা ও আনন্দময় নামক নাটক দুইখানি এমাৰেণ্ড্ থিয়েটাৰেৰ কৰ্ত্তৃপক্ষেৰ অম্লৱোধে তিনি প্ৰণয়ন কৰেন। সতীৰ অভিমান নামক তৎকৃত আব একখানি নাটক বহুদিন যাবত অপ্ৰকাশিত ছিল—সংপ্ৰতি নাট্য-মন্দিৰ-পত্ৰে উহা মুদ্ৰিত হইয়াছে।

নাট্যরচনাৰ জ্ঞায় সঙ্গীতরচনাৰও মনোমোহনেৰ অসাধাৰণ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহাৰ সঙ্গীতগুলিৰ অধিকাংশই দেশহিতমূলক। মনোমোহন নিজে যে অত্যন্ত দেশবৎসল ছিলে, তাঁহাৰ রচিত সঙ্গীতাদি হইতেই তাহাৰ প্ৰমাণ পাওৱা যায়। বৰ্ত্তমানে এদেশে যে স্বদেশীয়তাৰ লক্ষণ

দেখা দিয়াছে, তাহার স্মরণাত্মক মনোমোহনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে কলিকাতার ঠাকুর বাবুদের প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেল্লা এ বিষয়ের প্রধান সহায় হইয়াছিল। মনোমোহনের বচিত 'দিনেব দিন সবে দীন ভারত হু'য়ে পরাধীন' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী ঐ হিন্দুমেল্লায়ই সর্ব-প্রথম গীত হয়।

কবিতাদি সমস্ত বিষয়ের রচনায়ই মনোমোহনের অসীম ক্ষিপ্ৰকারিতা ছিল। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার কবিতারচনা হইয়া যাইত। একবার জীব সহিত তীর্থ-পর্যটন উপলক্ষে একস্থানেব একটা মন্দির দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উহার গায়ে অনেকগুলি কবিতা লিখিয়া রাখেন। তাঁহার শেষ বয়সেব দৈনন্দিন লিপির মধ্যে তাঁহার বহু সাময়িক রচনা স্থান পাইয়াছে।

সামাজিক জীবনে মনোমোহন অতি অমায়িক ও স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহার অধরপুট মুহুমধুর সবস হান্তে সর্বদাই উজ্জল থাকিত। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র ও প্রাণাবিক ভাগিনেয়েব মৃত্যুতেও কণকালের জন্ত তাঁহার এই হাসির বিলোপ ঘটে নাই। অক্লান্ত কর্ম ও সদয়া উৎসাহের বলে অতীত কালের যে জীবনকে তিনি বর্তমানযুগ পর্য্যন্তও টানিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্বমুহুর্তেও তাহা পঠনানুসরণে অবিরল ছিল। পার্শ্বের সময় পৌত্র পৌত্রীগণ বিরক্ত করিলে তিনি এই বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন যে, তিনি না পড়িলে তাঁহার অন্তরের গুরুমশায়টী তাঁহার কান মলিয়া দিবে।*

শ্রীকান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

না-জানা

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম ,

কাজের পথে ।

নইলে আমার এমন দেখা

ঘটত না ত কোনো মতে ।

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ শ্রীযুক্ত কলীপ্রকৃৎ বহু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর ষাওয়া আসা,
স্বর্ঘ্য উঠে অস্ত্রে মিলায়

এই বাঙা পর্বতে ;—

প্রতিদিনের ভার বহে যাই

এই কাজের পথে ।

জেনেছিলাম কিছুই আমার

নাই অজানা ;

যেখানে যা পাবার আছে

জানি সবার ঠিক ঠিকানা ।

ফসল নিয়ে গেছি হাটে

ধেছুর পিছে গেছি মাঠে,

বর্ষানদী পার কবেছি

খেয়ার তরীখানা ।

পথে পথে দিন গিয়েছে

সকল পথই জানা ।

সেদিন আমি জেগেছিলেম

দেখে কাবে ।

পসবা মোব পূর্ণ ছিল,

চলেছিলেম বাজার দ্বাবে ।

সেদিন সবাই ছিল কাজে

গোঠের মাঝে, মাঠের মাঝে,

ধরা সেদিন ভরা ছিল

পাকা ধানের ভারে ।

ভোরের বেলা জেগেছিলেম

দেখেছিলেম কারে ।

সেদিন চলে যেতে যেতে

চমক লাগে ।

মনে হল বনের কোণে

কাহার গায়ের গন্ধ জাগে ।

পথের বাঁকে বটেব ছায়ে

কে গেল গো চপল পায়ের,

চকিতে মোর নয়ন ছুটি

ভরি দিয়ে অকণ রাগে ।

সেদিন চলে যেতে যেতে

মনে হল কেমন লাগে ।

এত কালের পথ হাবালেম

এক নিমেষে ।

জানিনে ত কোথায় গেলম

একটু পথেব বাইরে এসে !

কেটেছে দিন দিনেব পবে

এমনি পথে, এমনি ধরে,

জানিনে ত চলতেছিলেম

এমন অচিন্দ্বেশে !

চিরকালের জানাশোনা

ঘুচল এক নিমেষে ।

রইল পড়ে পসরা মোর

পথের পাশে ।

চারিদিকের আকাশ আজি

দিক্-ভোলানো হাসি হাসে ।

সকল জানাব বুকের মাঝে

দাঁড়িয়ে ছিলে না-জানা যে,

তাই দেখে আজ বেলা গেল,

নয়ন ভরে আসে ।

পসরা মোর পাসরিলাম

রইল পথের পাশে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

নিবেদিতা

নিবেদিতা চলিয়া গিয়াছেন । আজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে চোখেব জলের কালী দিয়া না লিখিলে সে লেখা সম্পূর্ণ হয় না । তিনি যে অ'মাদেরই ছিলেন, তিনি যে ভাবতবর্ষে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন এই কথাটা আমবা এখন অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারিতেছি । স্বামী বিবেকানন্দ এই চরিত্রবত্ত্ব আনিয়া জননী ভারতবর্ষের পাদপদ্মে উপহার দিয়াছিলেন ।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সহিত ভারতবর্ষেব এই

যে একান্ত সংযোগ ইহা অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় ।

কোথায় ধনজনসম্পদময় সুদূব ইংলণ্ডেব সুসভ্য সমাজে প্রতীক্ষায় জীবন—আর কোথায় ধ্বংসদশাগ্রস্ত ভারতবর্ষের কোষ এক দরিদ্রপল্লীতে নিত্যন্ত অধ্যাতভাবে জীবন যাপন । কোথায় সুখসৌভাগ্য ও আভিজাত্যের গৌরব, আব কোথায় দুঃখদারিদ্র্য ও নিন্দা অপমান । কোথায় স্বজন গৃহ পবিবারের সুখময় আশ্রয়, আর কোথায় বহু দূরদেশ, এক নিতান্ত বিভিন্ন আচারাবলম্বী ভিন্নভাষাভাষী বিদেশীর সহিত ধনী-দীন-জাতিবর্ণনির্কির্শেষে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-তার বন্ধন ! কোন্ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া নিবেদিতাব জীবনের গতি একপভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল প্রথমে তাহাই জানিতে কৌতূহল হয় । নিবেদিতা তাঁহার “The Master as I saw him” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় তাঁহার এইরূপ ভাবে জীবনের গতি পরিবর্তনের প্রধান কার ।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে গিয়া বেদান্ত প্রচার কবিতেছিলেন, সেই সময় ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের দিকে নিবেদিতাব মন কিছু কিছু আকৃষ্ট হয় । স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতা শেষ হইলে পরে শ্রোতাগণ যে যে প্রশ্ন কবিতেন তাহারও মীমাংসা করিয়া দিতেন । এইসকল বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর শুনিয়া প্রথমতঃ নিবেদিতার মনে বর্তমানকালে প্রচলিত যুরোপীয় ধর্মামুশাসনের সহিত ভারতীয় দর্শনের তুলনা উদ্ভিত হইল । স্বামীজীব নিকট এইসকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া নিবেদিতার মনের ভাব ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে স্বামীজীব প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও বাড়িতে লাগিল । নিবেদিতা কেবল যে বিম্ভাবতী ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, লোকচরিত্র অধ্যয়নে তাঁহাব দ্বার সুনিপুণা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । স্বামীজীর সহিত পরিচয়ে নিবেদিতা বুঝিতে পাবিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু সুপণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও অলোক-সাধারণ প্রতিভাশালী নহেন, তাঁহার অসাধারণ ন্যায়বোধ ও বীরত্ব-প্রভাতেই তাঁহার চরিত্র এত অধিক সমৃদ্ধ হইয়াছে ।

তিনি উচ্চকণ্ঠে অগতঃ-সমাজ আত্মবিশ্বাসনিত্তে পরিপূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন,—

“What the world wants to-day, is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder, and say that they possess nothing but God. Who will go? * * * Why should one fear? If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter?”

“আজিকার দিনে পৃথিবী কি চায়?—বিশ্বজি জন এমন বমণী এবং পুরুষ বাহাবা সাহস করিয়া একেবারে পথে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর আমারেব কিছু সম্বল নাই। কে বাইবে? * * * ঐকপ (ঈশ্বরকে ধরিয়া সর্বত্র তাগ) কবিত্তে ভয়ই বা কেন? ইহা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ ঈশ্বর যদি থাকেন) তবে অপর সমস্ত তাগে কি আসে বাব? আর ইহা যদি সত্য না হয় (ঈশ্বর যদি না থাকেন) তবে জীবনব্যাপণেই বা কি যায় আসে?”

স্বামীজীর এই আহ্বান নিবেদিতাব কর্ণে বজ্র-নির্ঘোষের ত্রায় ধ্বনিত হইয়াছিল। তখন তিনি মনে মনে এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, কে যেন তাঁহাকে এক অপূর্ণ বিশ্বাসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

স্বামীজী আবার বলিয়াছেন,—

“The world is in need of those whose life is one burning love—self-less. The love will make every word tell like a thunder-bolt. Awake, awake, great souls! The world is burning in misery. Can you sleep?”

“পৃথিবী চায় তাহারদিকে যাহাদিগের জীবন আত্মহতিনানে’ অলস্ত প্রেম স্বরূপ হইয়াছে। সেই ভালবাসাই তোমার প্রত্যেক কথাতে বজ্রতুলা বল দিবে। জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি ঘুমাইতে পার?”

স্বামী বিবেকানন্দের এইসকল বাক্য নিবেদিতার জীবনেই সফল হইয়াছিল। ধন-মান-সম্পদ গৃহ-পরিবার সমস্ত তাগ করিয়া তিনি কেবল ভগবানকেই সম্বল করিয়া জগতের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনই আত্মস্বত্ব-রহিত অলস্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিল।

“নিবেদিতা!” এই নাম তাঁহার কি সার্থকই হইয়াছিল। ভগবৎ-পাদপদ্মে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, ‘অপনার’ বলিয়া অভিমানের বেড়া দিয়া পৃথক্ করিয়া এতটুকুও রাখেন নাই। “নিবেদিতা” এই নামটীতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পবিত্র পাণ্ডা যায় তাঁহার পরিচয় দিবার স্তম্ভ অস্ত্র কিছুই আর আবশ্যক হয় না।

বোসপাড়ার একটা ছোটবাড়ীতে নিবেদিতা থাকিতেন,

এই বাড়ীতে মেয়েদের পাঠশালাও বসিত। সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয় বলিলে বাহা বুঝায় এই বিদ্যালয়টা সেমপ ধবনের নহে, স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মচারিগণের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাব সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কল্পকে ভিত্তি করিয়া নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের কার্যেই নিবেদিতা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয়ের কার্যেই নিবেদিতা তাঁহার জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। বোসপাড়ার একটা ছোট গলি,— তাহার ভিতর একটা ক্ষুদ্র বিদ্যালয়,—নিবেদিতার ত্রায় অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একান্তনিষ্ঠাত্রাবলম্বিনী রমণী,—স্বীহার পক্ষে পৃথিবীতে কোন কার্যেই সফল হওয়া অসম্ভব ছিল না, তিনি যে সমস্ত জীবন এই বিদ্যালয়ের জন্তই দান করিয়া গিয়াছেন, প্রথমে একথা স্তনিলেই আশ্চর্য্য হইতে হয়, এবং এইরূপ ভাবে জীবন উৎসর্গ করাকে অনেকে শক্তির অথবা অগচর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই জন্ত নিবেদিতাকে ও নিবেদিতার সঙ্কল্পিত কার্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ভারতের পুনর্জীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার বাহা মত ছিল প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লইতে হয়।

সকল মানবেরই একমাত্র সনাতন ধর্ম মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য একই, কিন্তু দেশ, কাল ও প্রয়োজনভেদে শিক্ষা-প্রণালী বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। ভারত-বর্ষের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষা-প্রণালী যেদ্রুপ হওয়া উচিত নিবেদিতা তাঁহার “The Web of Indian Life” এবং “The Master as I saw him” নামক পুস্তকদ্বয়ে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার মতের সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

“পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের সর্বত্র একটা অশান্ত ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই সঙ্গে উন্নতির শত শত সর্ববোগহর ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে। এইসকল উন্নতিকামিগণের ভিতর একদল সমাজসংস্কারক মনে করেন ভারতবর্ষের কতগুলি প্রাচীন সামাজিক প্রথা ধ্বংস করিলেই মাতৃভূমির উন্নতি হইবে। সমাজ সংস্কারের জন্ত এই সংস্কারকদের প্রবল উৎসাহ দেখিয়া বুঝা যায়, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রাণহীন হয় নাই। যদি ভারতের জীবনরীপ একেবারে নির্বাপিত হইয়া বাইত তাহা হইলে কি আর প্রাচ্য পাশ্চাত্য

সংঘর্ষে সংস্কারকল্প এইসকল অগ্নিশূলিক নিষ্কাশিত হইত? কিন্তু এই উপরউপরের সংস্কারের চেষ্টায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের স্থায় এখনও বিচলিত হয় নাই। তাহাতে কি ইহাই বুঝা যাবে, ভারতের আত্মসম্মান গভীরতা, গুরুত্ব ও সজীবতা এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান?

“ভারতবর্ষের উন্নতিকামী আর একদল আছেন, তাহারা রাজ-নৈতিক আন্দোলনকারী। ভারতে পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রচলনই ভারতকে সুভাষিত হইতে উদ্ধার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। বৈদেশিক রাষ্ট্রপরিচালন-প্রণালীর মধ্যে অনেক নিষমই যে ভারতের আশঙ্ক করিয়া লওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় “রাজনীতি” এই বাক্যের ব্যবহারই এককণ ক্লেশকর আত্মপ্রবঞ্চনা (painful insincerity) ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর একদল আছেন বাহাদের মতে বিভিন্ন ধর্মের কেন্দ্রগুলিকে সম্মিলিত করিয়া তোলাই উন্নতির উপায়। তাহা ভিন্ন আর এক চতুর্দল আছেন বাহাদের মতে অর্থনীতি-শাস্ত্রবলিত দ্রুতগতি (economic grievances) ভারতের শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ। এবং তাহারা ইতিহাসের দ্বারা ধর্মভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে দৃঢ় করিতে পারিলেই তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে আর বাধা থাকে না।”

“এইরূপ ভাবে সামাজিক সংশোধনই হউক, রাজনৈতিক শিক্ষাই হউক, নির্জীব ধর্মভাবের স্পন্দন অথবা অর্থনৈতিক শাস্ত্রোক্ত অভাব-পূরণ—বাহাই হউক না কেন, এইসকলেরই আধার স্বরূপ এই-সকলের অপেক্ষা অধিক বাস্তব একটি পদার্থ আছে, তাহা ভারতবর্ষের জাতীয়ত্ব। এই জাতীয়ত্ব বিশাল ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়গত নহে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কেই এই জাতীয়ত্বরূপ মিলনস্থলে বিবৃত করিয়া বাধিয়াছে। সমাজের দিক দিয়া,—অর্থনীতি রাজনীতি অথবা ধর্মনীতির দিক দিয়া যে-কেই উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা পরোক্ষভাবে জাতীয়ত্বকেই জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন। এই যে নব জাতীয়ত্বের জন্মদায়, ইহা ভারতের প্রাচীন কলাবিভার নববিকাশ স্বরূপ হইবে। ইহা ভারতের প্রাচীন পাণ্ডিত্য ক্ষমতার নব আলোচনা, পুরাতন ধর্মশাস্ত্রের একটি জীবন্ত নূতন ভাষা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিগত জাতির বর্ষাব্দ আশ্রয় স্বরূপ উহা একটি নব আদর্শ। সেই নূতন আদর্শ যুবকগণের মধ্যে জীবন্তভাবে সজাগ করিয়া তুলিবে এবং প্রাচীনগণের প্রচার ভিত্তিস্বরূপ হইবে। এই নব আদর্শের সাফল্য ইহাতেই পরীক্ষিত হইবে যে ইহার প্রভাবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্প্রদায় ও সমাজ জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত হইবে। নিজের কেন্দ্র মধ্যে আয়ত্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা এবং আগুনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা উহা দ্বারা এরূপ বৃদ্ধি পাইবে বাহা এপর্যন্ত এককণ অজ্ঞাত আছে। জাতীয় জীবনের এই নব আদর্শ বা এরূপ জাতীয়ত্ব ভারতে বিকাশ কবিয়া তুলিবার জন্য দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথম, মাতৃভূমির প্রতি প্রেম, অলস প্রেম। সে প্রেম আশ্রয় হইতে, বিস্তৃত হইতে, পূজ্য হইতেও অধিক হইবে। আপনাদের সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রেম লোকের এখন দেখা যায় তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রেম করিতে হইবে। তাহাকে—যিনি সকল সম্প্রদায়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, সকল ধর্মকেই আশ্রয় দিয়াছেন, সেই সর্বপাক্ষী মাতৃভূমিকে প্রেম করিতে হইবে, তবেই তাই যেমন তাইকে আপনাই হইতেও অধিক ভালবাসে তেমনি মাতৃভূমির প্রত্যেক সমুদ্র ধনী দরিদ্র বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন সকলেরই প্রতি এই প্রেম নির্মিতারে আপনাদের উপর অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠত-ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে। এই অলস

প্রেম সম্প্রদায়ের গতি ছাড়িয়াই সমগ্র ভারতবর্ষবাসীকেই এক করিয়া লইবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ বাহিরের দ্রব্য আহরণ নহে, আপনাদের ভিতর হইতে এই শিক্ষাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে।”

ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি ত্যাগ ও প্রেম। আত্মত্যাগই প্রেমের জীবন, এবং প্রেমই ত্যাগের উৎপত্তি ও স্রাব। ত্যাগ অর্থে নিঃস্বতা নহে, অক্ষয় ধনে ধনী হইবার পথই ত্যাগ; ত্যাগ অর্থে পরাজয় নহে, বরং জগৎসমাজে বিজয়ী হইবার একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ। কিন্তু সে ত্যাগ একেবারে স্বার্থবোধমাত্রবিহীন হওয়া চাই, বাহা ত্যাগে অজ্ঞাতসারেও অভিমানের অথবা কামনার ছায়া স্পর্শ করে তাহার অমূল্য দানও ধূলিমুষ্টিব স্তায় তুচ্ছ হইয়া যায়। নিবেদিতার মতে ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষা বংশপরম্পরা হইতে ভারতবাসীতে অন্তর্নিহিতভাবে আছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তোলাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা যখন কেবল গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকে তখন তাহা কতকগুলি বর্ষে অক্ষিত রেখা মাত্র; জ্ঞান, বুদ্ধি, তুলিকার তাহার অস্পষ্ট ছায়ায় মূর্তি কখনও অক্ষিত কবিত্তে পারিলেও উহাতে জীবন দিতে পারে না। শিক্ষা তখনই জীবন প্রাপ্ত হয় যখন তাহা মানবহৃদয়ে ভাবরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন তাহার সমগ্রজীবনে, ছোট বড় প্রত্যেক কার্যে, বাক্যে, চিন্তায়, দিনে, রাত্রে, প্রতি মুহূর্তে শিক্ষার সাফল্য প্রস্ফুটিত হয়। নিবেদিতা এই ভাবেই ভারতবর্ষীয় রমণীগণের ভিতর শিক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবের প্রারম্ভে ভারতীয়রমণীগণকে বিদ্যালয় শিক্ষা দিবার জন্য যখন প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল তখন সমাজ তাহার বিবোধী হইয়াছিল। তখন অনেকবই এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভিন্ন দেশের রমণী হইতে ভারতীয়রমণীর যে কৌলিক বিশেষত্ব তাহা এই পাশ্চাত্য অধ্যয়নের শিক্ষার ধ্বংস হইয়া যাইবে। ঐ বিরোধের ফলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বস্তায় আমাদের তৎকালীন যুবকসমাজ একেবারে ডাসিয়া যাইলেও পাশ্চাত্য-শিক্ষার ঐরূপ মোহকরী প্রভাব ভারতবর্ষের অন্তঃপুরে সেরূপভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। পতি-পুত্র-পরিবার-আত্মীয়-

স্বজন-প্রতিবাসী-গরিচিতেব নিম্নত কল্যাণধানে দেহবোধ-
পর্যন্ত-বিবহিতা নিম্নতশ্রমপরায়ণা আমাদের পূর্ব-
পিতামহীগণের জীবনযাপনের স্থিতি বিগত বকুলমালার
সৌভবেব জায় ভাবতবর্ষের অন্তঃপূর্বেই বক্ষিত ছিল,
নবশিক্ষাব প্রবল ঝটিকার তাহা একেবারে উড়িয়া যায়
নাই। ভগিনী নিবেদিতা সুদূর প্রতীচ্য দেশ হইতেও
সেই সৌভবে অক্লষ্ট হইয়াছিলেন।

বঙ্গী, জাতির জননী। একটা দীপ হইতে আব
একটা দীপ জালিবার মত মায়েব জীবনের আলো হইতেই
সন্তানের জীবনদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। নিবেদিতা তাঁহাব
পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

“রমণী সমস্ত পৃথিবীতে স্নায়ের আদর্শের বক্ষাকর্তা। বালক
নিঃসহায়ের শব্দেহ বাহ্যতে লইয়া যাইবার ক্ষমতা ব্যতী হইবে না, যদি
না যখন সে শিশু ছিল তখন তাহার জননী এইরূপ ভাবের সংকার্যের
প্রশংসায় তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ করিত। স্বামী তাহার হৃদয়ের উচ্চভাব
লইয়া গৃহে কিবিতো এত চেষ্টাশীল হইত না, যদি না তাহার স্ত্রী স্বামীর
সেইসকল চবিত্রগত উন্নত গুণগুলি স্মরণ কবিয়া স্মরণ হইত। তদ-
ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ এতোক কার্য এবং তাহাদিগের
সম্পূর্ণজীবন উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্থান করে।”

রমণী স্থিতিবিধায়িনী। কুলক্রমাগত শোণিতধারায়
প্রবাহিত যেসকল মহৎভাব আজ পর্যন্ত ভারতরমণীর
প্রকৃতিব মধ্যে বক্ষিত আছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই-
সকল ভাবকেই শিক্ষাসংস্কারেব দ্বারা নবভাবে সমুজ্জ্বল
কবিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজীব সেই ইচ্ছাকে
অম্লবর্জন করিয়াই ভগিনী নিবেদিতা এই শিক্ষালয়েব
কার্যে তাঁহাব জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও
ইহার আয়োজন বৃহৎ নহে, তথাপি নিবেদিতা জানিতেন
অগ্ন্যুৎপাদনের প্রয়োজন হইলে বাশি রাশি ইন্ধন সংগ্রহে
জীবন যাপনই একমাত্র আবশ্যকীয় নহে। সামান্য ইন্ধনে
অগ্ন্যুৎপাদন কবিয়া ধীরে ধীরে উহার পোষণ করিতে
পারিলে কালে উহা আপনা হইতেই চতুর্দিকে বিস্তৃত
হইয়া পড়ে। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, এই বিজ্ঞালয়
হইতেই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী গার্গীব পুনরুজ্জ্বল হইবে।

এই শিক্ষালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত,
বধু, গৃহিণী ও বিধবাগণ সকলকেই, যিনি যেরূপ ভাবে
শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে,
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্য, সেলাই

এবং চিত্রবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। নিম্নশ্রেণীর ছোট
ছোট মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষা দিত। উচ্চ-
শ্রেণীব মেয়েদের মধ্যে তিন চারিটা বিধবাও ছিল, ইহা
এই বিজ্ঞালয়ের কার্যেই জীবন সমর্পণ কবিবে এইরূপ
সঙ্কল্প করিয়াছিল। শ্রীমতী স্মধীবা, যিনি এই উচ্চশ্রেণী-
মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং সমস্ত বিজ্ঞালয়ের পরিচালিকা
ছিলেন, তিনি চিরকুমারীভূত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি
স্বচ্ছায় বিজ্ঞালয়ের কার্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।
তাঁহাব জায় উন্নতমনা ও ধর্মপরায়ণা রমণী অতি দুর্লভ।
সন্তানের কল্যাণে মাতার যেরূপ প্রাণপণচেষ্টা বিজ্ঞালয়ে
ছাত্রীগণের কল্যাণের ক্ষমতা তাঁহার চেষ্টাও সেইরূপ
ঐকান্তিক ছিল, এবং ছাত্রীরাও তাঁহাকে মনের যত্নে
ভালবাসিত ও সকল প্রকারে তাঁহাব আদেশ পালনে
চেষ্টা করিত। শিক্ষালয় পরিচালনে স্মধীবা দেবী
নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

এই শিক্ষালয় বাড়ীটা তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। উপরে
বরগুণি খুব ছোট ছোট, ছাতও নীচ। গ্রীষ্মকালে
দ্বিপ্রহরে সেই ঘবগুলি এত গরম হইত যে, কিছুক্ষণ
ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথা ধরিয়া যাইত। গ্রীষ্মপ্রমা-
দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ গরম অনেকটা অভ্যাস, কিন্তু
শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীব পক্ষে গ্রীষ্মকালে ঘরপ
গৃহে বাস করা কিছু কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করা
যাইতে পারে। নিবেদিতার ঘরে গ্রীষ্মনিবারণেব স্ত্র
টানা পাখাও ছিল না, কেবল একখানি হাতপাখা নক্সা
তাঁহার কাছে থাকিত। তাঁহার ছোট ঘরটা তিনি নিম্নের
ইচ্ছামত সাজাইয়াছিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিগের
অধিকাংশ সময়ই তিনি কায়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন।
বেশীর ভাগই লেখাপড়ার কায। কায়ে তাঁহাব মন এত
নিবিষ্ট থাকিত যে সে সময় শীত গ্রীষ্ম বোধ থাকিত ন।
আমরা দেখিয়াছি কখন কখনও কায ছাড়িয়া যখন তিনি
বাহিবে আসিতেন, তখন অসহ্য গরমে তাঁহার মুখপ্রা-
বাল্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে একএকবার এঘর ও
ঘরিয় ছাত্রীবা কে কোথায় কি কবিতোছে তাহা তিনি
দেখিয়া আসিতেন, কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাঁচি
ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের কেহ ক্রারণ দ্বিজ্ঞাসা

করিলে বলিতেন “মাথায় বড় কষ্ট!” আবার তখনই গিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতেন।

এই যে লেখাপড়ার কায়, ইহাও বিদ্যালয়েরই জন্ত। বিদ্যালয়ের অর্থায়ুক্ত্যের জন্তই তাঁহার পুস্তক লিখিবার অধিক প্রয়োজন হইত। যখন খবচেব টানাটানি পড়িত, তখন নিজের সম্বন্ধে কোন খবচটা কমাইতে পারা যায় সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, নিজের শরীর পোষণে যে যৎসামান্য ব্যয় তাহাও যেন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিত। ইহার ফলে, শারীরিক অনিয়মে তাঁহার শরীর দিনে দিনে যখন রক্তহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িত তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্ত স্থান পবিত্রতনে, যাইতে হইত। মনের একাগ্রতার জন্ত শরীর সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না, সেজন্ত শরীর যে দিন দিন ভগ্ন হইতেছে তাহা যেন তিনি বুঝিতেই পারিতেন না।

বিদ্যালয়ের জন্ত সাহায্যার্থী হইয়া যদিও তিনি ঘরে ঘরে দাঁড়ান নাই তথাপি বিদ্যালয়ের আর্থিক অনাটনের বিষয় আমাদের দেশবাসিগণের যে একেবারেই অজ্ঞীত ছিল তাহা নহে। এই বিদ্যালয়ের আর একটা শাখা বিদ্যালয় ছিল সেটিতে কেবল ছোট মেয়েদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্থিক অভাবের জন্ত নিবেদিতা যখন কোনরূপে সেই পাঠশালাটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন মাসিক ত্রিশটা টাকা যদি সাহায্য পান সেজন্ত কয়েকবার বেঙ্গলী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও যখন কিছু ফল হইল না তখন পাঠশালাটা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার “ভগিনী নিবেদিতা” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন “তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্ধৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরারের অংশ হইতে।” এখন আর নিবেদিতা নাই, নিজে অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিয়াও তিনি যে ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় রমণী-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন এখনও কি ঠিক দেশবাসীর সে বিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ঘটিবে না?

বড় মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভার শ্রীমতী সুধীরার উপর ছিল, নিবেদিতা যখন অবসর পাইতেন তখনই তিনি

ছাত্রীদের শিক্ষাব ভাব লইতেন। গণিত ও চিত্রবিজ্ঞা এই দুইটাই তিনি বেশী ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসরমত ইংরাজী ভাষাও শিখাইতেন। তাঁহার শিখাইবার প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর ও নূতন ধরণের। যে প্রণালীতে তিনি গণিত ও চিত্রবিজ্ঞা শিখাইতেন, তাহাতে বাহাদের শিখিবার ভুল বুদ্ধিবাব ক্ষমতা কম তাহারাও অতি সহজে বুঝিয়া লইত। ছোট ছোট মেয়েরা খেলা কবিতা করিতে তেঁতুলের বীজ অথবা অন্ত কোন ফলের বীজ দিয়া প্রথমে গণনা শিখিত। জোড় কি বিজোড় খেলাতেই প্রথমে ছোট ছোট মেয়েদের যোগ বিয়োগ অভ্যাস হইত, তাহার পূর্ব তাহারা গুলেটে অঙ্ক রাখিয়া অঙ্ক কসিতে শিখিত। শিক্ষালয়ের বড় মেয়েরা ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিত, নিবেদিতা তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন তাহার কিছু এখানে তাঁহার নিজের কথাতোই দিলাম;— “মেয়েরা যদি কিছু না জানে তবে তাহাদের বলিবে ‘আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করিব তাহা হইলে নিশ্চয় শিখিতে পারিব’। মেয়েরা যদি কিছু বলিতে পারে আব কিছু ভুল কবে তবে তাহাদের বলিবে, ‘হাঁ, হইল। কিন্তু আমরা আবও ভাল করিতে চেষ্টা করিব।’ যদি কোন মেয়ে ঠিক করিয়া বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে ‘ঠিক ঠিক।’ এবং অন্ত মেয়েদের বলিবে ‘আমরাও পারিব, আবার আমরা চেষ্টা করিব।’” কথা বলিবার সময় তিনি কতকগুলি কথার উপর জোব দিয়া বলিতেন। “নিশ্চয়!” এই কথাটির উপর জোব দিয়া বলিতেন। আবার যখন কাহারও কোন বিষয় ঠিক হইত, তখন “ঠিক ঠিক।” বলিয়া বালিকার মত আনন্দে হাততালি দিতেন। লেখার অথবা অঙ্ক যদি ভুল থাকিত তবে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া দিতেন এবং সর্বদা বলিতেন “ভুল কখনও রাখিবে না। ভুল বুঝবামাত্র কাটিয়া দিবে।”

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিজ্ঞার উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ভারতীয় ভাস্কর্য, চিত্র ও কলাবিজ্ঞা সকলেরই মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে ইহা তিনি মনের সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন। সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি চিত্র অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আঁকা পিড়ি আল্পনা তাঁহার নিকট অধিক আদরের

ছিল। একটা মেয়ের হাতের আঁকা আল্পনা তিনি তাঁহার শয়নগৃহের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই আলিপনার মধ্যে একটা বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট ঘুঁইফুলের মত ফুল ছিল। এই আলিপনা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, যে-কেহ তাঁহার স্মৃতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি সেই আলিপনা দেখাইতেন। তিনি সকলের কাছেই বলিতেন, “কুমারস্বামী এই আলিপনার অনেক প্রশংসা করিলেন,” কুমারস্বামী যে তাঁহার ছাত্রীর অঙ্কিত আলিপনার প্রশংসা করিয়াছেন এ আনন্দ তাঁহার আর রাখিবার স্থান ছিল না। পদ্মফুলের চিত্র বিশেষতঃ সহস্ররল খেতপদ্মের চিত্র তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল, তিনি বলিতেন এই ফুল ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অন্য কেহ আঁকিতে জানে না। আলিপনার পদ্মের চারিপাশের ছোট ছোট ফুল দেখাইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, “কি সুন্দর সাদা ছোট ফুল! এই ছোট ফুলগুলি সকলে ঐ বড় ফুলের দিকেই মুখ দিরাইয়া আছে, যেন বলিতেছে, ‘আমরা তোমার কাছেই বাহিতে চাই’।” নিবেদিতা মেয়েদের পাথরে ও মাটিতে ছাঁচ কাটার অভ্যাস পক্ষপাতী ছিলেন। ছাঁচ কাটিবার জন্য একরাশি মাটি ও নরুন আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে লইয়া “আমরা সকলেই শিখিব” বলিয়া অভ্যাস উৎসাহের সহিত ছাঁচ কাটিতে বসিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে অনেক মেয়ে ছাঁচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। যে প্রথম যে ছাঁচটা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত সেটা যতই ধারাল হউক না কেন তিনি অতি আদরের সঙ্গে লইতেন, এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারণ করে সেইরূপ ভাবে মাথায় ছুঁয়াইয়া নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। ছোট মেয়েরা তাঁহাকে ছোট ছোট পুতুল গড়িয়া আনিয়া দিত। সে পুতুলগুলি একটা ঘাসের করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ঘরে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত এইসকল দ্রব্য স্তরে স্তরে সাজানো থাকিত, একএকদিন সব মেয়েদের একত্র করিয়া তাহাদের হাতের শিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে তাহা দেখাইতেন। মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া সংস্কৃতশিক্ষাও হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। নিবেদিতা বলিলেন—

“বেদিন মেয়েদের হাতের ভালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরের দেওয়ালে শোভা পাইবে সেদিন ‘কি আনন্দের দিনই হইবে।’”

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথবা দুইদিন তিনি ইতিহাস পাঠ দিতেন, সে সময় তিনি এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি কোথায় আছেন ও কাহাদের নিকট বলিতেছেন তাহাও তাঁহার মনে নাই। একদিন রাজপুতানার ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি যখন উদয়পুর গিয়াছিলেন তাঁহার সেই সময়ের ভ্রমণ-কাহিনী বলিতেছিলেন। “আমি পাহাড়ের উল্লি পাথরের উপর ঝাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম”—বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতবোঁড় করিয়া বসিলেন। নিবেদিতার তখনকার মুখের ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা বলিতে লাগিলেন, “অনলকুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাতবোঁড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষচিন্তায় মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। অ! কি সুন্দর! কি সুন্দর!” বলিতে, বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা নিবেদিতা কিছুক্ষণ মুদ্রিতনেত্রে নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি যে স্থলধরে বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের ইতিহাসে পাঠ দিতেছেন, তাহা আর তাঁহার মনে নাই, পদ্মিনীর শেষচিন্তায় সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মন লয় হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার এই তন্ময়ভাব কতবার দেখিয়াছি। ভারত-বর্ষের কথা উঠিলেই তিনি একেবারে ভাবমগ্ন হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন “ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে ‘ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা!’” বলিয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিজে জপ করিতেন “মা! মা! মা!” ভারতবর্ষ যে তাঁহার কি প্রাণের প্রিয় ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইনা। কে জানে কে তাঁহার চোখে এমন সোনার কাজল পরাইয়া দিয়াছিল যে তাঁহার নিম্নে সকলই সুবর্ণময় হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাঁহার

শুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া যুগ্মীর ভিতর কি চিহ্নীয় প্রতীমার অধিষ্ঠান দেখাইয়াছিলেন, তাই ভারতের ধূলিকণার ভিতরও তিনি আধ্যাত্মিকতারূপ অমৃতবসের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সেই অমৃতপানে বিভোর হইয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, কত লোক তাহা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিবে। কিন্তু ধন মান যশঃ লইয়া যাহারা পাগল তাহারা এমন পাগলের কথা বুঝিবে কি করিয়া ?

বাংলাভাষা ভাল কবিতা শিখিবেন ইহা তাঁহার বহুদিনের বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া বাংলাভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি এক একটা ছোট ছোট কথা যখন যাহাব নিকট শিখিবার সুবিধা পাইতেন, শিখিয়া লইতেন। সে সময় যদি একটা ছোট মেয়েও তাঁহাব শিক্ষিত্রী হইত, তাহাব নিকটেও তাঁহার বিনীত ছাত্রীভাৱে আচরণ দেখা যাইত। একটা নূতন কথা শিখিলেই ক্ষুদ্র বাঁলকাব মত আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইতেন। একদিন কোন মেয়ে প্লেটে দাগ টানিতে টানিতে বলিয়াছিল “লাইন টানিতেছি।” “লাইন” এই শব্দটা শুনিবামাত্র নিবেদিতা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন “আপনার ভায় বল।” কিন্তু “লাইন”এর বাক্স প্রতীকটা যে কি তাহা কোন মেয়েই ভাবিয়া পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল “সিষ্টার, আমবা তো বরাবর লাইনই বলি।” হুঃখে, বিরক্তিতে নিবেদিতাব মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা বলিলেন “তোমরা আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে ?” তাহার পর যখন একটা মেয়ে বলিল “লাইনের বাংলা রেখা” তখন আর নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না, যেন তিনি একটা হারাণে জিনিস কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বার বার “বেখা, রেখা, রেখা” উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা যখন ছবি আঁকিতে শিখাইতেন তখন সকল মেয়েকে সারি দিয়া বসাইতেন, ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিতেন না। শিক্ষিত্রীরাও সে সময় ছাত্রীদের শ্রেণীভুক্ত হইতেন, এমন কি, সিষ্টার ক্রিষ্টিনকেও এই সময় ছাত্রীদলভুক্ত হইতে হইত। ক্রিষ্টিন ছোট মেয়েদের কাছে ঘেঁসিয়া বসিতেন। তাঁহাব বড় ভয় যে তাঁহাব আঁকা

ছবি ভাল হইবে না, তাহা দেখিয়া বড় মেয়েরা হাসিবে। মেয়েরা প্রত্যেকে রং তুলি পেঙ্গিল ও একখানা করিয়া কাগজ পাইতেন, নিবেদিতাব নিজের হাতেও তুলি আঁকা কাগজ থাকিত, তিনি প্রায়ই প্রথমে পেঙ্গিল দিয়া একটা বৃত্ত আঁকিতেন, সেই কাগজখানি হাতে লইয়া কিরকম ভাবে হস্তচালনা করিয়া বৃত্ত আঁকিতে হইবে প্রত্যেক মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া এক একবার দেখাইয়া দিতেন। মেয়েবা প্রথমে পেঙ্গিলের উল্টাপিঠ দিয়া কাগজে দাগ না পড়ে অথচ সমভাবে রেখা টানিবাব মত হস্তচালনা অভ্যাস হয় এইরূপ ভাবে কাগজের উপর দাগ ব্লাইবার মত পেঙ্গিল ব্লাইত তাহার পর দ্রুতহস্তে রেখা টানিত। এইরূপ বেখা হইতে আবস্ত করিয়া নানারূপ চিত্র আঁকা হইত। সিষ্টার ক্রিষ্টিনের ছবি ভাল না হইলে তিনি লজ্জায় হাসিয়া অস্থির হইতেন।

বিদ্যালয়টা যেন মেয়েদের একটা আনন্দনিকেতন ছিল। বড় মেয়েবা যাহাবা বিদ্যালয়ে আসিত তাহার কেহই অবস্থাপন্ন গৃহস্থের নহুঁ!বা কত্কা নহে, এজন্য তাহাদের সংসারের কাজ শেষ করিয়া তাহার পব আসিতে হইত। স্কুলে আসিতে হইবে এই উৎসাহে মেয়েবা সকাল হইতে প্রাণপণে সংসারের কাজ শেষ করিত। নিবেদিতা প্রায়ই মাঝে মাঝে তাঁহার ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর অথবা কলিকাতাব অন্ত কোন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাইতেন, সে সময় ছাত্রীদের যথাসম্ভব আতিথ্যও করিতেন। আবাব গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতির সময়েও বিদ্যালয়কালে মেয়েদের খাবার খাওয়াইতেন। ছাত্রীর সংখ্যা কম নহে, তিনিও দরিদ্র, অপরিপাণ্ড সামগ্রী কোথায় পাইবেন ? যে খাবার আনিতেন, ছাত্রীভাৱে গণনা করিয়া সকলের জন্য ছোট ছোট একটা করিয়া সুন্দর শালপাতের ঠোঙ্গা গড়িতেন, তাহারই ভিতর খাবার বাখিয়া ঝড়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেষণ করিতেন। আবাব খাওয়া শেষ হইলে মেয়েবা ঠোঙ্গা ফেলিবে বলিয়া নিজেই ঝড়ি হাতে কবিতা দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অতিথিগণের আতিথ্যসংকাবে সমাধা করিতেন।

পুখী, ভুবনেশ্বর অথবা ঐকপ কোন স্থানে মাঝে মাঝে

মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া বাইতে তাঁহার অভ্যস্ত ইচ্ছা ছিল, অনেকবার এইরূপ বাইবার প্রত্যাশা হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ বাটরা উঠে নাই। নিবেদিতা দেশভ্রমণের, বিশেষতঃ তীর্থভ্রমণের, অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি নিজে ভারতবর্ষের সকল তীর্থই প্রায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

সেইসকল ভ্রমণকাহিনী মেয়েদের নিকট গল্প করিতেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন, মেয়েদের নিকট যখন তাঁহার বদরিকাশ্রমের পথেব কাহিনী বর্ণনা করিতেন তখন মনে হইত এইমাত্র বাহা দেখিতেছেন, তাহাই যেন বলিতেছেন। নিবেদিতা পথে অলকনন্দার তীরে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা মেয়েদের কাছে বলিডেন—“তিনি (সেই বৃদ্ধা) জ্ঞান করিয়া উঠিয়াছেন, তখনও ভিজা কাপড় পরিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহ্য করেন না। অলকনন্দা নদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোড়াহাতে (বলিতে বলিতে নিবেদিতা হাত ঘোড় করিলেন) সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি প্রণাম করিতেছেন। কি সুন্দর। কি সুন্দর তাঁহার মুখ। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।” আবার বদরিকার পথে আর একস্থানে একজন প্রাচীন পথে চলিয়াছেন, নিবেদিতা তাঁহার কিছুদূরে পিছনে চলিতেছেন। নিবেদিতা বলিতেন “তুমি গলিয়া গিয়াছে, পিছলে তাঁহার পা সরিয়া বাইতেছে। আমার ভয় হইল, তিনি হয়তো পড়িয়া বাইবেন। তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন? আমি তাঁহার বাহু ধরিতে পারি কি? আমি তাঁহার নিকট অল্পমতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। আঃ কি সুন্দর সে হাসি! তিনি আপনার ষষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া গেলেন।”

“তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন?” নিবেদিতা এই কথা বেদনার মত হৃদয়ে আঘাত করে। নিবেদিতা যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাইতেন তখন যেন কত দীন হীন, এইভাবে প্রাণনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তিনি আনিতেন, মন্দিরে উঠিয়া দেবীদর্শন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। কিন্তু মন্দিরে বাইরা দেবীর

পূজা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে নিবেদিতার মত অধিকারী কি কেহ ছিল? বাইবার চরণগুলি স্পর্শে লোক পবিত্র হয়, তিনি নিজেই দেবালয়প্রবেশে অনধিকারিণী ভাবিয়া সর্বদা সঙ্কচিত হইতেন। যে সর্বভাগিনী গৃহ, সমাজ, সমাজিক সম্মান, আত্মীয়স্বজনকে ছেড়েই রেহণাশ সকলই পরিহার করিয়া ভারতের কল্যাণে নিঃশেষ ভাবে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, ভারতবাসী কি তাঁহাকে আনাগৃহে, পরিবাবে, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিল? তাহা যদি হইত তবে এত শীঘ্র আমরা তাঁহাকে হারাইতাম না।

বদরিকার তুষার-পিচ্ছল পথে প্রাচীন রমণী যে নিবেদিতার সাহায্য করিবার জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া আপনার ষষ্টির উপর ভর দিয়াই চলিয়া গেলেন নিবেদিতা তাহাতে ক্ষুব্ধ অথবা হুঃখিত হন নাই বরং আনন্দিতই হইয়াছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন “কি সুন্দর সে হাসি!” নিবেদিতার বালবার ভাণ্ডে বেধে হয় ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জননীকে সাহায্য করিতে চাহিলে মা যেমন মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসেন, সে হাসিতে উপেক্ষা প্রকাশ পায় না বরং অক্ষয় চোটার প্রতি বেহ ও আশ্বিনীর্ভরের ভাবই প্রকাশ পায়, প্রাচীনার হাসিতে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল।

এই ভাবটা নিবেদিতার বড় প্রজ্ঞার সামগ্রী ছিল। নিবেদিতা ইহাকে ভারতবর্ষের বংশগত ভাব বলিয়া গ্রহণ করিতেন। “তিনি ভারতবাসী” নিবেদিতা অতি স্নেহের সঙ্গে এই কথা উচ্চারণ করিতেন। শুনিয়াছি, নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালী ছদ্ম দিত সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কচিত হইলেন, এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া বার বার তাহাকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন, “তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিষ্ট কি উপদেশ চাও? তোমরা কি না জান? তুমি ঈশ্বরের জাতি। তোমাকে আমি নমস্কার করি।”

মেয়েদের কখন কখন তিনি বাহুবর (মিউজিয়াম) দেখাইতে লইয়া বাইতেন। মিউজিয়ামেব ফেসন গৃহে প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন আছে সেইসব গৃহই ভাণ করিয়া দেখাইতেন। বৌদ্ধধর্মের ভাস্কর্য্যনির্মিত

প্রান্তরময় মূর্তি ও শুভ প্রভৃতি যে গৃহে আছে একদিন সেই গৃহে মেয়েদেব লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নিবেদিতা একখানি শিলালিপি নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া মেয়েদের সন্ধান করিয়া বলিলেন, “এই প্রস্তরের নাম কাম্য প্রহর, মহারাজ অশোক এই প্রস্তরের নিকট বসিয়া কামনা করিয়াছিলেন, এসো আমরা সকলে এখানে কামনা করি।” বলিয়া সেই প্রস্তরমূলে মেয়েদের সকলকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং “তোমরা সকলেই মনে মনে কামনা কর” বলিয়া নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। আবার যখন মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি কামনা করিয়াছিলে?” মেয়েরা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন “ঠিক, কাম্যমন্ত্র মনে মনেই জপ করিবে।”

ধর্ম সঙ্কে কখনও তিনি কাহারও সহিত আলোচনা অথবা ভর্তকবিতর্ক কবিতেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনকেই একখানি জীবন্ত ধর্মশাস্ত্র বলা যায়। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল আধ্যাত্মিকতার পিপাসা ছিল সে পিপাসা কলসীর জলে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি যে দেশে, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে রমণীর স্বাধীনতা অব্যাহত, সমাজে তাঁহাদের উচ্চস্থান, জীবনের পথে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই পথ নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাঁহাদের আছে। নিবেদিতাও নিজের জীবনের পথের লক্ষ্য নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য বিজ্ঞাবুদ্ধি ও অনন্তসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে সমাজ তাঁহাকে রমণীকুলের বরণ্যা ও শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া গ্রহণ করিত। তথাপি নিবেদিতা জীবনের সেই পুষ্পাঙ্গীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক দুর্গম পথে চলিয়াছিলেন যে লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। প্রত্যাঙ্গদ শ্রীকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে নিবেদিতার এই আজীবন তপস্বীকে সতীর তপস্বীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিকই নিবেদিতা মূর্তিমতী তপস্বী ছিলেন। তপস্বী ও তাঁহার জীবন মিলিয়া মিশিয়া বেন এক হইয়া গিয়াছিল। তপস্বীসমূহের তীরে বসিয়া অঞ্জলি-বারি পানে তাঁহার তৃষ্ণা দূর হয় নাই, তিনি একেবারে সেই সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয়ের কথ্যেই বলিতে পারি তাঁহার চিত্র “ভাবৈকরস” হইয়া পরম কল্যাণে স্থিত হইয়াছিল।

ভাব মানবসমাজের প্রাণ স্বরূপ, ভাবহীন সমাজ মৃতপ্রায়। কর্তব্যের পাবণ মূর্তিতে ভাবই প্রাণদান করে। ভাবের তরঙ্গমালাই কর্তব্যপ্রবাহে নির্মলশ্রোতা শ্রোতবিনীর প্রাণময়ী গতি আনিয়া দেয়। নিবেদিতা বাহ্য করিতেই তাহা কেবলমাত্র কর্তব্যবুদ্ধিতেই করিতেন না, উহাতে হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দিতেন। কর্তব্যবুদ্ধি কৃতকার্য হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখে, ভালবাসা কর্তব্যের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দেয়। কর্তব্যের দান দীনের প্রতি দয়া, ভালবাসার দান পরমাত্মীরেয় জ্ঞান তাহার কল্যাণে জীবন সমর্পণ। নিবেদিতা ভালবাসিয়া ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কেবল কর্তব্যবোধে করেন নাই।

তিনি কোন কোন দিন মেয়েদের নিকট তাঁহাব গুরুদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু গুরুদেবের নামমাত্র উল্লেখে তাঁহার অন্তর ভাবরসে এতই পরিপূর্ণ হইত যে অধিক কথা বলা তাঁহাব পক্ষে অসম্ভব হইত। কেবল গুরুদেবের সঙ্কে এই একটামাত্র কথা তিনি বারবার বলিতেন “তাঁহাব নাম বীরেশ্বর, তিনি বীরদিগের দেব ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদাঙ্গুসরণ করিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট সুখ দুঃখ ছাড়িয়া বীর হও।” “বীর” এই কথাটির উপর তিনি সব সময়ই জোর দিয়া বলিতেন।

মেয়েদের পড়িবার ঘরে পরমহংস শ্রীদামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। অপরাধিকের দেয়ালে মানচিত্র টাঙ্গানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙ্গাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “দামকৃষ্ণদেব জগৎগুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকিবে।”

নিবেদিতার এই কথা তাঁহার মনের কথা। তিনি বাহ্য বুঝিতেন জগৎসমক্ষে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীদামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, “না মরিলে পুনর্জন্ম হয় না।” অর্থাৎ আপনাকে একেবারে লয় করিয়া না দিলে আধ্যাত্মিক জগতে কেহ পুনর্জন্ম

লাভ করিতে পারে না। নিবেদিতা সেইভাবে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অপার মহোদধিতে আপনায় বিন্দুই একেবারে লয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে নিবেদিতা যে ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, ততমন অপার্থিব আত্মত্যাগ জগতে কখনও সম্ভব হয় না। আত্মত্যাগের কাহিনী আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, কিন্তু নিবেদিতার আত্মত্যাগ বাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি তাহা আর কোন স্থানে দেখিয়াছি অথবা দেখিব বলিয়া মনে হয় না।

নিবেদিতা যখনই নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন “Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda” এই বলিয়া নিজেই নাম স্বাক্ষর করিতেন। উদারমতাবলম্বিগণ সম্প্রদায়ের পণ্ডিত অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন, নিবেদিতা সর্বদাই সম্প্রদায়ের নামের সহিত আপনায় নাম যুক্ত করিয়া রাখিতেন, অথচ তাঁহার মত উদার মত অতি অল্প লোকেরই আছে। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এবং এক-নিষ্ঠতা, ইহাও একটীর সঙ্গে আর একটীর আকাশপাতাল প্রভেদ। একটীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর একটীতে আত্মবিসর্জন। জগতে কেন্দ্রাভিগতির সহিত কেন্দ্রাতিগতির যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেইরূপ একনিষ্ঠার সহিত অনন্তে আত্মব্যাপ্তির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। নিবেদিতার জীবন একনিষ্ঠতার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবেদিতা যে-পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন সে-পথের কঠোরতা ব্যর্থতা তাঁহার নিঃশূল হৃদয়-আকাশে বিন্দুমাত্র সংশয়মেঘেব সঞ্চার করিতে পারে নাই। একমাত্র ঐশ্বর্য্যতাকেই লক্ষ্য করিয়া অসংশয়ে তিনি যেন আপন পথে নিয়ত চলিয়া গিয়াছেন। এক পরিপূর্ণ চক্ষের মধুর জ্যোৎস্নায় তাঁহার চিত্ত মধুময় হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি মাতৃরূপে সকলকেই বুকে ধরিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসা স্বার্থগন্ধরহিত, এজন্যই সে প্রেম প্রতিদানের কামনা রাখিত না, অপ্রতিনানেও মান না হইয় সমভাবেই উজ্জ্বল থাকিত।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্ততে নাথিকং ততঃ।

যস্মিন্ হিতো ন হুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে ॥

পার্থিব জগতে যত হুঃখই তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লউন না কেন, সংশয়গীড়ায় কখনও তাঁহার চিত্ত পীড়িত হয়

নাই। তাঁহার শেষ বাণীও ঐ ভাবের পরিচয়ক—
“The boat is sinking but I shall yet see the sunrise.”

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে অনেক সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত ভাব যেন সৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়াছে। কখনও তিনি লোক-শিক্ষয়িত্রী, কখন মেহবিগলিত জননী, কখন কর্তব্যে একনিষ্ঠ মায়ামমতাবর্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মী, কখন বিনীতা ছাত্রী অথবা সেবিকা, আবার কখনও শগবৎ-ভাবে বিতোরা। বোসপাড়ার বাড়ীতে এইরূপে দুইটি যুরোপীয় মহিলা বৎসরের পর বৎসর বাস করিয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিন। ক্রিষ্টিনের কথা আমরা ইতিপূর্বে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বাগবাজার উদ্বোধন আফিসে শ্রীমাতাদেবী (শ্রীমাকৃষ্ণদেবের সহস্রাব্দী) কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিন দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার তথায় গিয়া কিছুক্ষণ মাতাদেবীর নিকট বসিয়া থাকিতেন। সে সময়ে নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে নিবেদিতা মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন ভগিনী নিবেদিতা—বাঁহা হস্ত তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে হর্ষভ, মাতাদেবীর নিকটে তাঁহার এইরূপ শিশু মত ভাব ছিল। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সবে হাত্তে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিবেন, নিবেদিতা যদি সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার যে আনন্দ হইত সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে বুঝা যাইত। কতবার সেই আসনকে প্রণাম করিতেন, অতি যত্নে ধুলা ঝাড়িয়া তাহার পর আসনখানি পাতিতেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত এই অধিকাটুকু পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে। মাতাদেবী একদিন বিজ্ঞালয়ে আসিবেন এইরূপ কথা হইয়াছিল, নিবেদিতা সেই অবধি বিজ্ঞালয়ের সংস্কার আরম্ভ করিলেন। যেদিন মা বিজ্ঞালয়ে আসিবেন নিবেদিতা সে দিন আনন্দে একেবারে বাহুজ্ঞান হারা হইয়াছেন। এখানে ওখানে ছুটাছুটা করিতেছেন, কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া কখন

বিভাগলের শিক্ষয়িত্রীদিগের, কখন ছাত্রীদিগের এবং কখন বা দাসীর গলা পর্যন্ত জড়াইয়া ধরিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অখিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন নির্বাসিত যেদিন মুক্তিলাভ করিলেন সেদিনও নিবেদিতার এমনই আনন্দ দেখিয়াছিলাম। সেদিনও বিভাগলের ঘাবে পূর্ণ-কুস্ত কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছিল। সেদিনও আনন্দের দিন বলিয়া মেয়েদের অনায়াস হইয়াছিল।

অন্তায় অবিচারেব বিরুদ্ধে নিবেদিতা দৃষ্টাসিংহীর মত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, সে সময় তিনি জগতে কাহাকেও দৃকপাত করিতেন না। তাঁহার যোষাঙ্গদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে অতি গর্জিতকণ্ঠে মন্তক অবনত করিতে হইত। আবার অপর দিকে তাঁহার নম্রতাও অনন্তদুর্ভিত ছিল, সে নম্রতা মৌখিক বিনয় নহে, আন্তরিক সৌজন্ম। তিনি অতি দরিদ্রের সহিতও যেরূপ সসম্মম ব্যবহার করিতেন সেরূপ ব্যবহার কেবল তাঁহাতেই সম্ভব হইত।

তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটা সদাজাগ্রত ভাব ছিল, সেইটাকে তাঁহার বোধশ্বের ভাবও বলা যাইতে পারে। তিনি একদিকে যাহা বুঝিতেন তাহার ভিতর যেমন তিলমাত্র জটিলতা বা সংশয়ের সম্পর্ক বাধিতেন না, তেমনি আবার অন্যদিকে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনের প্রতিফলনেই সফল করিবার জন্য যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের সময় সর্বদাই প্রস্তুত থাকে সেইরূপ তাঁহার সমগ্র প্রকৃতিতে এই সদাজাগ্রত ভাব বর্তমান থাকিত। এইজন্য তাঁহার কথায় ও কায়ে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা যাইত না। মানুষ্যের উপর শ্রদ্ধা নিবেদিতার স্বভাবের মজাগত ভাব। মানুষ যেন মানুষ হয় ইহাই তিনি চাহিতেন। মানুষের ভিতরে যেখানে যে ভাবেই মানুষ্যের বিকাশ দেখিয়াছেন, তেজস্বিনী নিবেদিতা সেইখানেই শ্রদ্ধা সহকারে আপনায় মস্তক নত করিয়াছেন।

নিবেদিতার জীবন আলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং লেখকের সামর্থ্যে কুলায় না। তিনি যেসকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ভিতর তাঁহার পরিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে যে

ভালবাসা দিয়া তিনি ভারতকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন সেই ভালবাসা দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে হয়।

আজ নিবেদিতার কথা বলিতে গিয়া একদিকে যেমন সেই দৃঢ়তা সন্ন্যাসিনীর সত্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপূত চরিত্র স্বরণ করিয়া বিমল আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপরদিকে আবার আপনাদিগের অপৌকষ ও দৈন্ত্য স্বরণ করিয়া কোতো ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হইতেছে। ভারতবর্ষে সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে পরমাত্মীয়রূপে সে হৃদয়ের কাছে পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে নিবেদিতা যখন জগতে ছিলেন, তখন তাঁহাকে আপনায় জন বলিয়া বুঝিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পার্থিব দৃষ্টিতে আজ আমরা তাঁহাকে হাবাইয়াছি, আজ তাঁহার সেই আনন্দময়ী মুষ্টি লোকলোচনের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হই-
য়াছে, আজ বোসপাড়ার বিভাগলয়গৃহ শূন্য, নিবেদিতা আর সেখানে নাই! কিন্তু তাঁহার আজীবন সাধনার মূর্তরূপ এখনও রহিয়াছে। নিবেদিতা যাহা প্রাণ দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সেই বোসপাড়ার বিভাগলয়টি এখনও আছে; নিবেদিতার অভাবে তাহা কি শূন্যগর্ভেই মিলাইয়া যাইবে? স্বামী বিবেকানন্দের সেই বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান-ধ্বনি, “জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ, ‘পৃথিবী হঃখক্লেশে দগ্ধ হই-
তেছে, তুমি কি ঘুমাইতে পার?’—যে আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া নিবেদিতা কেবল জেধরমাত্র সম্মল করিয়া জগতের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন সে আহ্বান কি ভাবতবাসীর শ্রবণে ব্যর্থ হইবে? ভারতে কি এমন বিংশতি জন রমণী এবং পুরুষ নাই যাহারা ভগবানের নামমাত্র সম্মল করিয়া ভারতের কল্যাণকামনায় পথে গিয়া দাঁড়াইতে পাবেন? ইহা যদি সম্ভব না হয়, ভারতবাসীর এতটুকুও কি প্রাণ নাই যে নিবেদিতা অনশন অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়াও যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা বা কপর্দকমাত্র ভিক্ষা দিয়াও সেই বিভাগলয়কে রক্ষা করিতে পারেন? তপস্বিনী নিবেদিতা অনাহার অনিদ্রায় শিকাসমিধে যে হোমানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহার উজ্জল শিখা কি সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোকিত করিবে না? হব্য অভাবে তাহা কি যজ্ঞারম্ভেই নির্বাপিত হইবে? শ্রীসরলাবালা দাসী।

মাছের সন্তানবাৎসল্য

অন্তদেশের মত আমাদের দেশেও নানারকম জীবজন্তু আছে। অন্তদেশের জীবজন্তুদের যেমন বুদ্ধি আছে, আমাদের দেশের জীবজন্তুদেরও সেইরূপ বুদ্ধি আছে। অন্তদেশের জীবজন্তুদের যেমন নানা শক্তি ও গুণ আছে, আমাদের দেশের জীবজন্তুদেরও সেইরূপ আছে। অথচ আমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে যদি ঘোড়ার প্রভু-ভক্তির বিষয় লিখিতে হয় তবে আরবদেশ হইতে দৃষ্টান্তের আমদানী করিতে হয়। যদি কুকুরের কর্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার বর্ণনা করিতে হয় তবে ওয়েল্‌স্ দেশ হইতে আমরা দৃষ্টান্তের আমদানী করি। বানরের ছষ্টামি, ভাঁড়ামি ও নকল করিবার প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের জন্তু আমাদিগকে বিদেশে বাইতে হয়। ইহার কারণ এই যে আমরা জীবজন্তুদের কার্য্য প্রণালী, ব্যবহার এবং প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি না। এসকল পর্য্যবেক্ষণ করা আমাদের অভ্যাস নাই। ইউরোপ আমেরিকায় বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যন্ত এসকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বড় বড় পুস্তক লিখিয়াছেন। এমন কি যে কেঁচোকে আমরা এত নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য জীব মনে করি, ডার্কইন তাহার সম্বন্ধে একখানি বহি লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহার দ্বারা কিরূপে জমী উর্বর ও চাষযোগ্য হয়। লাবক্ পিপড়া, বোলতা ও মোমাছি সম্বন্ধে একখানি মনোরম বহি লিখিয়াছেন। রোমেন্‌জ্ প্রণীত “জীবের বুদ্ধি” (Animal Intelligence) নামক পুস্তক সাধারণ পাঠকের পরিচিত।

মাছ আমাদের দেশে খুব হয়, এবং বাঙ্গালী খুব মৎস্যমী। কিন্তু মাছের সন্তানবাৎসল্যের খবরটা আমাদিগকে ডাক্তার বিল্‌হেল্ম বার্ট (Dr. Wilhelm Berndt) নামক এক জার্মেন্ প্রাণিতত্ত্ববিদের লেখা একটি প্রবন্ধ হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে।

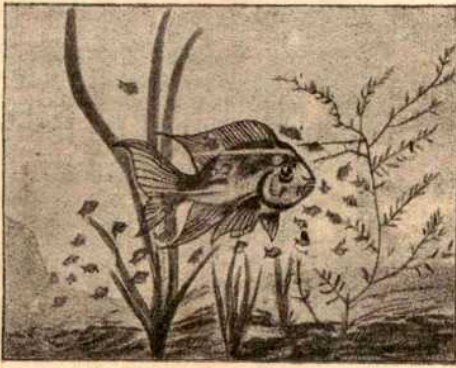
মৎস্য-পিতা অনেক মানব-পিতাকে সন্তানবাৎসল্যে পরাজিত করিতে পারে। মানবসমাজে মাতৃস্নেহ প্রায় সর্বত্রই আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, কারণ সন্তানস্নেহ-হীনা মাতা কচিং দেখা যায়। কিন্তু সন্তানবাৎসল্যবিহীন

পিতা অনেক দেখা যায়। ইতরপ্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ী জীবদের মা খুব স্নেহশীলা হয়, কিন্তু পিতাকে প্রায়ই তাহার উল্টা দেখা যায়। পাখীদের মধ্যে বড় বড় শিকারী-পাখীদের পিতারা খুব স্নেহশীল; তাহারা অনেক সময় সন্তানদের জন্ত প্রাণবিসর্জন পর্য্যন্ত করে। কিন্তু অল্প অনেক পাখীর সাদাসিধে পালকবিশিষ্ট মা শিশুগুলিকে “মানুষ” করিতেই ব্যস্ত থাকে, আর জাঁকাল পালকে ঢাকা পুরুষ পক্ষীগুলো কেবল নৃত্য গীত লইয়াই থাকে।

ভেক ও মৎস্যদের মধ্যে উচ্চ আদর্শের দাম্পত্যসম্বন্ধ ও সন্তানস্নেহ দেখা যায়। ভেকদের মধ্যে অনেক পিতা সন্তানগুলিকে খুব শৈশবে গিলিয়া ফেলে, কিন্তু তাহা খাইয়া ফেলিবার জন্তু নহে। পিতার কঠোর নিকট শিশু-গুলি আনন্দে বাড়িতে থাকে। অল্প একজাতীয় ভেকের শিশুরা মায়ের পিঠের উপরিস্থ মোচাকের মত ছেটে ছোট গর্তে শৈশবকাল কাটায়। আর একজাতীয় ভেক আছে, তাহাদিগকে ইংরাজীতে ধাত্রী-ভেক (obstetrical toad or nurse-frog) বলে। ইহাদের মধ্যে পিতা ধাইয়ের কাজ করে, সে সন্তঃপ্রসূত ডিমের মালা তাহার পিছনের পাছটিতে জড়াইয়া প্রায় দুই হপ্তাকাল নিজে গর্তে সমাহিত করে। তাহার পর ডিম ফুটিবার সময় বাহিরে আসে।

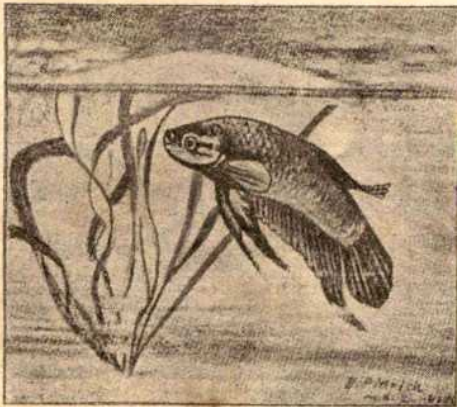
সন্তানস্নেহ ও সন্তানপালন সম্বন্ধে মাছদের মধ্যে অনেক রকমের সাদৃশ্য ও প্রভেদ আছে। ইউরোপের মাছগুলার সন্তানবাৎসল্য নাই; একমাত্র ব্যতিক্রম ষ্টিক্লব্যাঙ্ক নামক মাছ। ইহারা বাসা নির্মাণ করে, এবং পুরুষেরা সন্তানের জন্ত বহু স্বার্থত্যাগ করে। অনেক জাতীয় মৎস্যমাতা শিশুগুলি ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া কতকটা বড় হওয়া পর্য্যন্ত ডিমগুলিকে মুখের মধ্যেই রাখে। শিশুগুলি মধ্যে মধ্যে বাহিরে আসে, আবার ভয় পাইলে বা ক্লান্ত হইলে তাড়াতাড়ি গিয়া মায়ের মুখের ভিতর আশ্রয় লয়। দেখিলে বড় কোতুক বোধ হয়। মুরগী যেমন সাবধানে ও যত্নের সহিত ছানাগুলিকে চরাইয়া লইয়া বেড়ায়, অনেক মৎস্যপিতা সেইরূপ নিজের শিশুগুলিকে সঙ্গে লইয়া সঁতার দিয়া বেড়ায়। দেখিলে বড় আনন্দ হয়।

পরদেশ-মৎস্য (Paradise fish) নামক এক রকম



মৎস্ত-পিতা শিশুমাছদিককে চরাইতেছে।

মাছ আছে, তাহাদের মধ্যে পিতাই মৃদুশীল কিন্তু মাতা রাক্ষসী। ডাঃ বার্নট বলেন, তিনি অনেক সময় মাতাকে মৎস্তপিতার অগোচরে ডিমগুলি চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছেন। তখন হয় ত পুরুষ-মৎস্তটি জলের উপর হইতে ফেন-বুদ্ধ সংগ্রহ করিয়া নিজ ফেননির্মিত বাসাটির উন্নতি করিতে ব্যস্ত। পুরুষটি নারীর এই রাক্ষসীচেষ্টা দেখিবামাত্রই তাহাকে কামড়াইয়া



পুরুষ যোদ্ধা মাছ ফেন-বাসায় পাহারা দিতেছে।

তাড়াইয়া দেয়। এই মৎস্তকে যোদ্ধামাছও বলে। আমাদের ছবিতে দেখান হইয়াছে যে পুরুষ যোদ্ধামাছ কেমন আত্মোৎসর্গের সহিত ফেনের বাসার নীচে পাহারা দিতেছে। ঐ বাসায় শিশুগুলি বাড়িতেছে। ভিন্ন ফুটিয়া শিশুগুলি বাহির হইবার পর পিতৃস্নেহ উদ্ভূততার আকার ধারণ করে। তখন অল্প কোন পুরুষ মাছকে জলাশয়ে স্থাপন

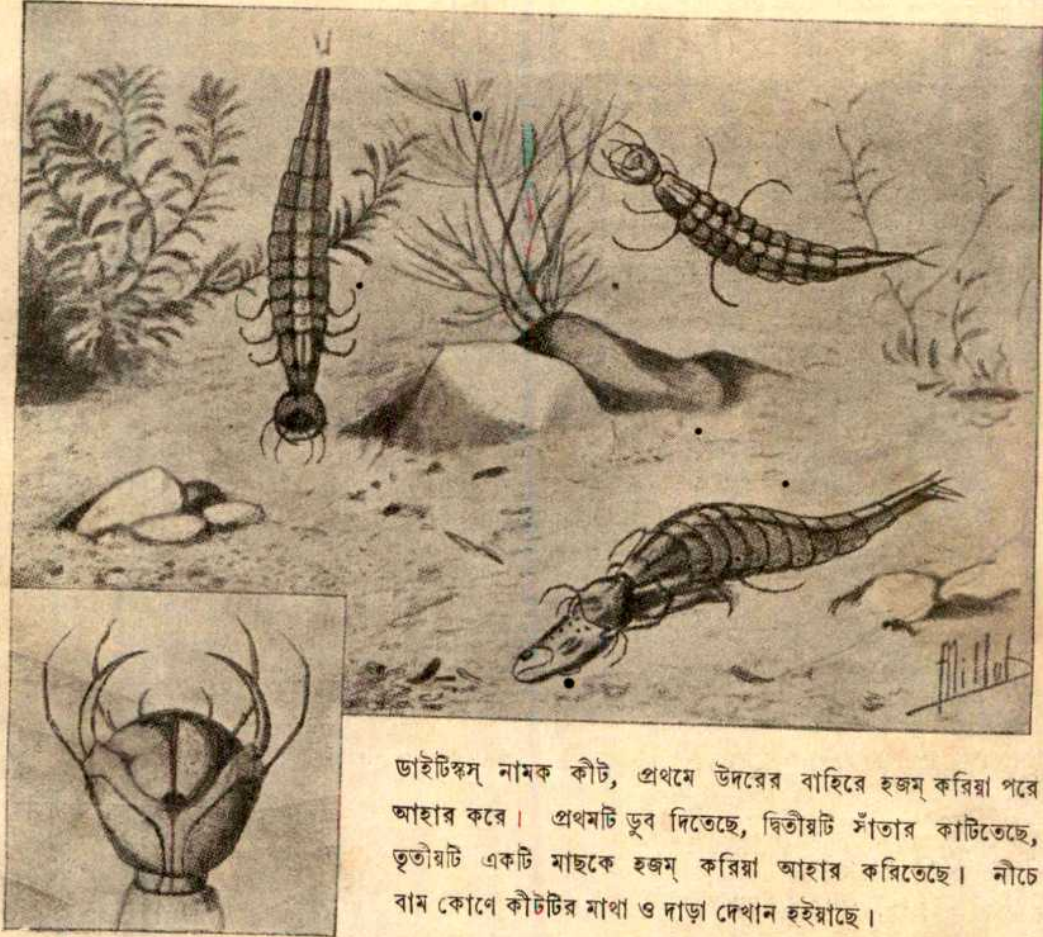
করিলে মৎস্তপিতা নির্দয়ভাবে তাহার প্রাণবধ করে। যদি কোন মানুষ জলের মধ্যে তখন আঙ্গুল দেয়, তাহা হইলে সাহসী পিতা ক্রোধের সহিত এক মিনিট ধরিয়া আঙ্গুলটার বিরুদ্ধে, কামড়াইয়া কামড়াইয়া, যুদ্ধ করে।

এদেশের সোল সাল মৎস্তের সন্তানবাংসলা সুবিদিত।

আগে হজম পরে ভোজন

অনেক কীট আছে, তাহাদের শারীরিক গঠন এরূপ যে তাহারা কেবল জলের মত তরল খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের খাদ্য উদরের মধ্যে গেলে পরে পরিপাক করিবার জন্ত রস নিঃসৃত হয়। ঐ রসের দ্বারা খাদ্য জীর্ণ হইয়া রক্তমাংসাদিতে পরিণত হয়। পূর্বোক্ত কীটগুলি কেবল তরল খাদ্য খাইতে পারে বলিয়া আগেই তাহাদের শিকারের মধ্যে জীর্ণকারী একটু রস চালাইয়া দেয়। এই প্রকারে শিকারের শরীরটা গলিয়া জলীয় হইলে, তাহা তাহারা চুষিয়া খাইতে থাকে। শেষে কেবল শিকারের শরীরের শুকনা চামড়াটী বাকী থাকে। জঁরি কুপ্যা (Henri Coupin) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক পারীর লা নাতিয়্যর (La Nature) পত্রে লিখিয়াছেন, যে, এইরূপ কীটের সংখ্যা বড় কম নয়। তিনি ডাইটস্ নামক একটি কীটের এইরূপ আহার-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন। এই কীট পুকুরে সচরাচর বাস করে বলিয়া লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা আমাদের দেশের পুকুরেও থাকে। আমরা ছবি দিলাম। পাঠকগণ চেহারা দেখিয়া সন্ধান লইতে পারেন।

এই কীটের মুখ নাই। ইহার কাঁপা দাঁড়া আছে। তাহার দ্বারা ইহা শিকার ধরে, ও তাহার পর উহার শরীরে হজমী রস চালাইয়া দেয়, এবং যখন শরীরটা জীর্ণ হইয়া গলিতে থাকে, তখন দাঁড়ার অগ্রভাগস্থিত হৃদ্র দিয়া ঐ জলীয় আহার চুষিয়া লয়। কীট প্রথমে শিকারের রক্তটা চুষিয়া খায়, তার পর পূর্বোক্ত-রূপে উহার শরীরটা আগে হজম করিয়া পরে আহার করে। মিষ্টার পোর্টিয়ার (Mr. Portier) ঐ কীটের নিকট একটি ছোট মাছ ফেলিয়া দিয়া উহার সমস্ত ভোজন প্রক্রিয়াটি দেখিয়াছেন। কীট প্রথমে মাছটাকে দাঁড়ার



ডাইটস্ নামক কীট, প্রথমে উদরের বাহিরে হজম করিয়া পরে আহাৰ করে। প্রথমটি ডুব দিতেছে, দ্বিতীয়টি সাঁতার কাটিতেছে, তৃতীয়টি একটি মাছকে হজম করিয়া আহাৰ করিতেছে। নীচে বাম কোণে কীটটির মাথা ও দাঁড়া দেখান হইয়াছে।

ঘরা ধরিয়া উহার শরীরে একটা বিষ প্রবেশ করাইয়া উহাকে অসাড় করিয়া ফেলে। তাহার পর কালো হজমী রস উহার শরীরে ঢুকাইয়া দেয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরিষ্কার দেখা যায় যে কেমন করিয়া ঐ রসের শক্তিতে মাছের শরীরের সকল অংশ অল্প অল্প করিয়া তরল হইয়া আসে। এই ক্রিয়া কতকদূর চলিলে হঠাৎ মাছের শরীরে একটা শ্রোত লক্ষিত হয়, বাহার টানে উহার শরীরের এইসমস্ত তরলীভূত অংশটা কীটের দাড়ার কাছে পৌছিতে থাকে, এবং দাড়ার অগ্রভাগস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া কীটের উদরে প্রবেশ করে। এইরূপে মৎস্য বা অল্প শিকারের শরীর হইতে সমস্ত তরল অংশ চোষা হইয়া গেলে, প্রায় আধ মিনিট কাল উহার শরীর শুষ্ক থাকে। তাহার পর আবার হঠাৎ কোটটা হজমী রস শিকারের শরীরে ঢুকাইয়া দেয়।

তদনন্তর শিকারের শরীর পুনরায় তরল হইতে থাকে এবং কীটের শোষণ হত্যাদি কৰ্ম্ম আবার আরম্ভ হয়। শেষে বারবার এইরূপ হইয়া শিকারের কেবল স্বকৃতি বাকী থাকে।

আমাদের দেশে মিহি বালি ও ধূলাতে একরকম কীট থাকে; তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার বাংলা নাম জানি না। এই কীট বালি ও ধূলায় পানের খিলির মত, বা কেরোসিন তেলের বোতলে তেল ঢালিবার টিনের কানেলের মত ক্রমসংকীর্ণ মসৃণ গর্ত নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার তলায় ও পাতিয়া বসিয়া থাকে। ঐ গর্তে কোন পিপড়া বা তদ্রূপ ছোট জীব পড়িলে তাহাকে ধরিয়া থায়। উহা পলাইবার চেষ্টা করিলে উহার গায়ে ধূলা বা বালি ছুড়িয়া উহাকে চাপা দিয়া ফেলে এবং এইরূপে

উহার পলয়ন বন্ধ করে। এই কীটকে ইংরাজীতে পিপীলিকা-সিংহ (Ant-lion) বলে। ইহার বাংলা নাম কি? এই কীটেরও ভোজনপ্রণালী পূর্কোক্ত পুকুরবাসী কীটের মত।

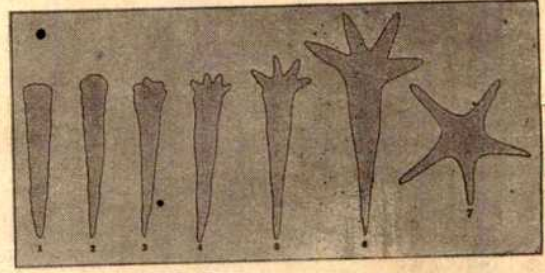
দেখিতে উকুনের মত যেসকল পোকা গাছে ছিদ্র করে, তাহারাও গাছের মধ্যে আগে হজ্মীরস ঢুকাইয়া দিয়া তাহার উপাদানগুলিকে তাহাদের ভোজনের উপযোগী খুব পাতলা-তরল করিয়া লয়।

এইসকল ব্যাপার আমাদের দেশে কেহ নিজে লক্ষ্য করিয়াছেন কি? না করিয়া থাকেন ত এখন করিতে পারেন।

জীবনবিজ্ঞান ইন্দ্রজাল

জীবনবিজ্ঞা (biology) বিজ্ঞানের একটি পুরাতন শাখা নহে, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে ও ইহার গবেষণার প্রণালীও অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে। জীবনবিজ্ঞাবিদেরা জীবনতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া যেসকল ফল পাইতেছেন, তাহা ঐন্দ্রজালিকের জাদুর মত বিস্ময়কর। কোন জীবের শরীরে ক্ষত হইয়াছে, ক্ষতস্থান হইতে একটা পা গজাইল, যাহা পূর্বে ঐ স্থানে ঐরূপ কোন জীবের দেখা যায় নাই; দুটি জীব মাথা বা লেজের দ্বারা যুক্ত হইয়া একত্র জীবন ধারণ করিতেছে; ইত্যাদি নানা ব্যাপার এই বৈজ্ঞানিক-দিগের গবেষণামন্দিরে দেখা যায়। ইহারা ঐন্দ্রজালিকের মত মজা দেখাইবার বা দেখিবার নিমিত্ত যে এইসকল পরীক্ষা করেন, তাহা নয়; তাঁহারা জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব, উহার উৎপত্তি, প্রকৃতি, ইত্যাদি বুঝিতে পারিবার আশায় এরূপ করিয়া থাকেন। এইরূপ করিতে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে যেখানে কোন জীবের চোখ ছিল, সেখানে একটি পা গজাইল; যেখানে একটি লেজ ছিল, সেখানে দুটি লেজ হইল; একটি বিচ্ছিন্ন বাহু হইতে ক্রমশঃ একটি সমগ্র জীব উৎপন্ন হইল; একটি আহত জীব ক্ষতস্থান হইতে একটি শাখা বা ফ্যাক্ড়া বাহির করিল, ইত্যাদি। উচ্চ শ্রেণীর জীবে এ পর্য্যন্ত এরূপ

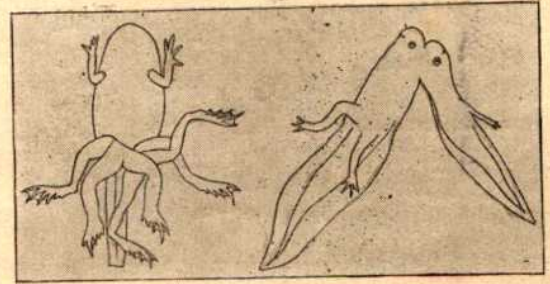
কিছু দেখা যায় নাই, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর জীবে, এমন কি ব্যাঙে পর্য্যন্ত, দেখা গিয়াছে।



তারামণ্ডলের কণ্ঠিত ভূজ হইতে নূতন তারামণ্ডলের উদ্ভবের ক্রমবিকাশ।

আমরা যে ছুটি ছবি দিলাম, তাহার একটিতে দেখা যাইবে, একটি তারামণ্ড (star-fish) হইতে তাহার একটি ভূজ কাটিয়া লওয়া হয়; ঐ ভূজটি হইতে ক্রমশঃ আরও বাহু গজাইয়া শেষে উহা স্বতন্ত্র একটি তারামণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

অপর চিত্রটিতে দেখা যাইবে, যে, একটি ব্যাঙাচির শরীরের ক্ষতস্থান হইতে চারিটি নূতন পা বাহির হইয়াছে,



ব্যাঙাচির ক্ষতস্থানে পদ-উদগম ও মাথায় মাথায় জোড়-কলম।

যাহা স্বাভাবিক ব্যাঙাচির থাকে না। আর দুটি ব্যাঙা-চিকে, গাছের মত কলম করিয়া, মাথায় মাথায় জোড় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহারা এই সংলগ্ন অবস্থাতেই জীবিত রহিয়াছে।

তাড়িতের সাহায্যে চাষ

আমাদের দেশে সাক্ষাৎ ভাবে চাষের ভার রহিয়াছে নিরক্ষর অশিক্ষিত কৃষকদের উপর। তাহারা যে কৃষি-বিষয়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, তাহা নয়। তাহাদের বাপ পিতামহ যে যে উপায়ে চাষ করিতেন, তাহারা সেসব উপায়ই জানে, এবং সে উপায়গুলি অনেক স্থলেই ভাল। তবে-কিনা, সংসারে কোন বিষয়ই এক স্থানে স্থির থাকে না, সকল বিষয়েই হয় উন্নতি নয় অবনতি হয়। অত্যাশ্চর্য্য সুসভ্য দেশে শিক্ষিত কৃষকের হাতে পড়িয়া চাষেরও উন্নতি হইতেছে, বিজ্ঞানসম্মত নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। সেইসব দেশের তুলনায় আমাদের দেশ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় অনেকে কুলক্রমাগত রীতি অনুসারেও ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিতেছে না।

আমাদের দেশে নূতন নূতন রকম চাষের প্রণালীর পরীক্ষা প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টের কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে হয়, কিন্তু এইসকল পরীক্ষার ফল চাষার কাছে প্রায়ই পৌঁছে না। জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশই নিজের নিজের ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তি ও রাজপুরুষদের মনস্তৃষ্টি সাধনই ব্যস্ত। তাহারা চাষার রক্ত শোষণ করিয়া জীবনধারণ করেন, কিন্তু চাষের উন্নতির জন্ত কিছুই করেন না।

অনেক উদ্ভিদই যে বড় গাছের ছায়ায় পড়িলে, রৌদ্র আলোক না পাইলে, “আঙতা” থাকিলে বাড়ে না, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অনেকেই দেখিয়াছেন যে ঘনপত্রবিশিষ্ট বড় বড় গাছের তলার জমি ঘাসে ঢাকা নয়। তাহার কারণ ঐ আঙতা। সুতরাং এই ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিক কারণটি বুঝাইয়া না বলিলেও ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে অনেক উদ্ভিদেরই বৃদ্ধির পক্ষে রৌদ্র আলোক আবশ্যক। পরীক্ষার দ্বারা এখন স্থির হইয়াছে যে তাড়িতশক্তির বিকিরণ দ্বারাও ঠিক এইরূপ কাজ হয়। তাড়িতের দ্বারা গাছের বৃদ্ধির সাহায্য করা যায় কিনা, তাহার পরীক্ষা গত ২০২৫ বৎসর ধরিয়া হইতেছে। তাড়িতশক্তির প্রয়োগে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়, ইহা প্রমাণিতও হইয়াছে। তবে এই শক্তিপ্রয়োগদ্বারা যে ব্যবসা-হিসাবে

লাভ করা যায়, এতদিন তাহা প্রমাণিত হয় নাই। এখন তাহাও হইতেছে।



ডাক্তার লাইম্যান জে, ব্রিগ্‌স্‌ উদ্ভিদবৃদ্ধির জন্ত
তাড়িতের তার সংযোগ করিতেছেন।

আমেরিকার অলিংটন শহরে একটি কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে লাইম্যান জে, ব্রিগ্‌স্‌ (Dr. Lyman J. Briggs) কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের রিচার্ড গ্লোয়েড্‌ (Richard Gloede) সাহেবও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষা কাচের সাসির ছাদ ও দেওয়ালযুক্ত চারাগাছগৃহে (Greenhouse) করা হয়। এই গৃহের মাটির ভিতর একটি লোহার তার বিস্তৃত থাকে। আবার ফুলের চারাগুলির চারি ফুট উপরে জালের আকারে অনেকগুলি তার বিস্তৃত থাকে। তাহাতে প্রায় ১২ ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্রবিশিষ্ট জাল নির্মিত হয়। এই জাল হইতে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পিতলের শিকল ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। যেখানে তাড়িতশক্তি উৎপন্ন হইতেছে সেখান হইতে ছুটি তারের দ্বারা পরীক্ষাগৃহে তাড়িত আনা হয়। একটি তার মাটির নীচের লোহার তারের সহিত যুক্ত হয়, আর একটি উপরের জালের সহিত যুক্ত হয়। কতকগুলি চন্দ্রমল্লিকার চারা লইয়া গ্লোয়েড্‌ সাহেব পরীক্ষা করেন। খুব ভাল বাছাই চারা লইয়া একস্থানে লাগান হয়, আর

খারাপ চারাগুলি পূর্বোক্তরূপে তাড়িত-তারযুক্ত স্থানে লাগান হয়। উভয় স্থানেরই মাটি ইত্যাদি আর সব বিষয়ে অবস্থা ঠিক একই রকমের ছিল। এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে তাড়িতশক্তির সাহায্যে খারাপ চারাগুলিও খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়াছিল, এবং তাহাদের জীবনীশক্তি ভাল চারাগুলি অপেক্ষাও ভাল হইয়াছিল।

তাড়িতশক্তিতে যে কেবল উদ্ভিদেরই বৃদ্ধির সহায়তা হয়, তাহা নহে। জার্মেনীতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিজ্ঞানজ্ঞের যে শ্রেণীতে তাড়িতশক্তি বিকীর্ণ হইবার বন্দোবস্ত থাকে, সে শ্রেণীর ছাত্রদের কেবল যে শারীরিক বৃদ্ধি ও উন্নতি অল্প ছাত্রদের চেয়ে বেশী হয়, তা নয়; পরন্তু তাহাদের মানসিক ক্রিয়াও বেশী হয়, তাহারা অল্প ছাত্রদের চেয়ে শীঘ্র ও সহজে শিক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অল্পবুদ্ধি বালকদের অবস্থা একবারে আশাশুভ নহে। তাহাদিগকে যদি মুক্তস্থানে বিশুদ্ধ বাতাসে বৈজ্ঞানিক শক্তিপূর্ণ আকাশে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া স্নেহের সহিত দক্ষ শিক্ষক শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাহাদেরও মানসিক উন্নতির খুব সম্ভাবনা আছে।

গরুর গাড়ীর গান

(Gouldsbury)

‘যাচ্ছে সময়!’ যাচ্ছে?—বটে!—আমরা কি জানি?
সাবেক চালে চলছি মোরা সাবেক বিধানী!
কাল ছুটেছে কাস্তে হাতে,—গ্রাস করিনে;
তার পিছুতে বেদম ছুটে পথে মরিনে।
থাক্তে আয়ু ভয়টা কিসের? সময় আছে ঢের;
চালের সেরা লক্ষ্যই চাল; নেই তুলনা এর।
কেউ বা ছোটো, কেউ বা হাঁটে, কেউ বা হাঁকায় রথ,
শিস্ দিয়ে কেউ আপন মনে একলা চলে পথ;
হট্টগোলের মাঝখানে সে শুন্ছে পেতে কান
মাকাতারো পূর্বযুগের গরুর গাড়ীর গান!
চলছি চালে,—যুগের কালের নেইক হিসেবই;
ঘুম-পাড়ানি মাসীর কোলে ঘুমায় পৃথিবী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (চৈত্র)।

আর্ট—শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী—

সৌন্দর্যতত্ত্বশাস্ত্র পড়িয়া আর্ট কি তাহা জানিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা— কারণ তাহার মধ্যে মতামতের জঙ্গল। সমস্ত বিশ্বভুবন জুড়িয়া যে সৌন্দর্যশাস্ত্র লেখা, তাহাকে প্রাণহীন দার্শনিক নাম ও সংজ্ঞার মধ্যে ঝঁজিবার সার্থকতা নাই। তাই রবিন্সন বলিয়াছেন, আর্টের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা বিশ্বপ্রকৃতির স্তব। মানুষের চিত্রে, কাব্যে, সঙ্গীতে বিশ্বচিত্র বিশ্বকবিতা বিশ্বসঙ্গীতের স্তব কেবলি ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভেদ-রেখা টানিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল মহৎশিল্পে নয়, প্রয়োজনের শিল্পেও একটি অজ্ঞাত স্তব আছে। থানা ঘটাতে পুষ্পপত্রবের রেখার, আকারের, হস্তপুটের আশ্চর্য্যবিবেদনের একটি পূজাপত্র আছে। তেমনি, বিশ্বপ্রকৃতির শ্রামহরিৎবসনের অনুকারে হস্ত বসনবসনের নিশ্চয় উৎপত্তি। কিন্তু রবিন্সনের এই সংজ্ঞাটি খুব চমৎকার হইলেও তাহার একটা দোষ এই যে ইহাতে মনে হইতে পারে যে আর্ট বৃষ্টি তবে প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র, তাহা স্বাধীন সৃষ্টি নয়। বস্তুত, বিশ্বপ্রকৃতির উপরেও আর্ট এক জয়গার জিতিয়া আছে, সে সম্পূর্ণতার তত্ত্ব, আইডিয়ালে। বিশ্বপ্রকৃতিতে সমস্তই পরিবর্তমান, সেখানে পূর্ণতার আদর্শকে পাওয়া যায় না। পূর্ণতার আদর্শ আইডিয়া রূপে আমাদের অন্তরে বিরাজমান। সুতরাং আমরা যখন প্রাকৃতিক দৃষ্টের ছবি আঁকি, তখন যে দৃষ্টটি চোখে দেখি, তদপেক্ষা সুন্দরতর দৃষ্টের আভাস দি। মানুষের ছবি আঁকিলে তাহার বাহ্যচোরাটা আঁকি না, কিন্তু ভিতরের অদৃশ্য সম্পূর্ণতার মানুষটিকে আঁকি। শ্রীমুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ভারতবর্ষীয় আর্টের ইহাই বিশেষত্ব বলিয়াছেন। সঙ্গীতে, কাব্যেও এই সম্পূর্ণতার একটি আদর্শ আছে। কিন্তু আর্টকে বাস্তব-বিশ্বছবির প্রতিচ্ছবি করিয়া দেখা (Realism) ও আর্টকে অন্তরের সম্পূর্ণতার আদর্শের বাহ্যপ্রকাশ করিয়া দেখা (Idealism) এই দুই মতই এককদিক-ঘাঁসা মত। কারণ বাহিরের জগতে সবই মায়া ছায়া, বাস্তবিক সত্তা কোথাও নাই বলিলে, ভিতরে বাহিরে চিরন্তন বন্দ খাড়া করিয়া রাখা হয়; বাস্তবিক সত্তা ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমনি। এই বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে আমাদের চেতনার অব্যবহিত যোগ নাই। সেইজন্য আধুনিক দার্শনিক ব্যার্মস বলেন যে আমরা সব জিনিসকেই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া দেখি, প্রত্যেকটি বস্তু যে অন্য যে-কোন বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, তাহার পরিচয় পাইনা। তিনি বলেন, আর্টের উদ্দেশ্যই সাধারণের মধ্যে কিছু জড়াইয়া না রাখিয়া একেবারে প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত বাস্তবসত্তাকে অনাবৃত করিয়া প্রকাশ করা। ব্যার্মস এই মত ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধেও খাটে। সকল জিনিসকেই অত্যন্ত একান্ত, স্বতন্ত্র ও অখণ্ড করিয়া দেখাই সে সাহিত্যের বিশেষত্ব। শেক্সপীয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া রবর্ত ব্রাউনিং পর্যন্ত সকল কবিরই মধ্যে বিশেষ বিশেষ আবেগের ঘূর্ণিপাক রচনার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই ঐকান্তিকতাকে বড় বলিয়া মানা চলে না। বিশ্বপ্রকৃতিতে যেমন প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, অখণ্ড সকলের সঙ্গে অখণ্ডভাবে মিলিত, আর্টও তাহাই হওয়া চাই। আর্ট ভিতরের পরিপূর্ণতার আদর্শের দ্বারা বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া সকল জিনিসের অন্তরতর সত্তাকে দেখাইবে কিন্তু সে সত্তা একই কালে স্বতন্ত্র এবং মিলিত হইবে, নীম ও অনীম হইবে। কেন? না, জানিতে হইবে, যে, আর্টের ক্ষেত্রে

সমস্ত মানুষ, সমস্ত বিশ্বকৃতি,—মানুষের ধর্ম, কর্ম, চরিত্র, বুদ্ধি সকল যিকের সঙ্গে আর্টের মিলন অব্যাহত হওয়া চাই। কিন্তু সেই বড় মিলন কি হইরাছে? মানুষ আজকাল আর্টকে সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। ছবি যে আঁকে, সে বিশ্বছবি যিকের তাকায় না, গান যে গায় সে বিশ্বগান শোনে না। মানুষ জ্ঞানের, যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি চিত্রকর, যিনি কবি, তাঁহার রচনার প্রযোজন-সৌন্দর্য, কর্ম-আশ্রিত সবই মিলিয়া আছে। মানুষের আর্টকেও আজ সব ভাবগায় নামিতে হইবে—কর্ম, ধর্ম, নীতিতে—সকল চেষ্টার এবং সকল বিষয়ে।

বেদান্তবাদ : জিনিষার্থ-দর্শন—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—

ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, বস্তু ও মোক্ষ সম্বন্ধে এই দর্শনের মত :—ব্রহ্ম চিৎসংস্করণ, স্বাভাবিক অনন্ত ও অচিন্ত্য কল্যাণশূণ্য-মুহুরের আশ্রয়; অত্বেব তিনি সত্ত্ব সর্বশেষ। ব্রহ্মকে যে নিঃশব্দ বলা হয় তাহাব অর্থ এই যে ব্রহ্ম কোনো হেয় বা মিথ্যা শূণ্য নাই; ব্রহ্ম অজ্ঞেয় এই অর্থে যে তাঁহার স্বরূপ ও গুণের ইয়ত্তা করা যায় না; তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন কবি জ্ঞানিবার উপায় নাই বলিয়া তিনি অজ্ঞেয়। জীব দেহ-ইঞ্জিয়-মন-বুদ্ধি-প্রাণ হইতে ভিন্ন চেতন পরার্থ। ইহা 'আমি' এই প্রত্যয়ের বিষয় ও জ্ঞানবস্তু। ইহার স্বরূপ স্থিতি ও প্রযুক্তি পবনবায়ুর অধীন, তিনিই ইহা ক সাধু ও অসাধু কর্মে প্রযুক্তি করেন, স্বয়ং ইহার কোনো কর্তৃক নাই। ইহা অপূর্ণমিহিত, অনন্তসংখ্যক ও প্রতি-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। ইহার বস্তু ও মুক্তি হয়। জীব অনাদি; পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে; ইহা তাঁহার অংশ, কিন্তু খণ্ডাংশ নহে। জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ, আর স্বয়ং ব্রহ্ম অংশী। এই জীব মর্ত্য বা প্রকৃতি :। কর্ম দ্বারা বেষ্টিত; এই অবস্থার নাম বন্ধ। সঙ্কোচ-কারণ প্রকৃতিস্বয়ং অপগত হইলে জীবের জ্ঞান যে নিজের স্বাভাবিক প্রকাশ প্রাপ্ত করে তাহাই মোক্ষ। জীবের জ্ঞানসঙ্কোচরূপ বন্ধ স্বভাবত নহে : তাহা আগন্তুক নৈমিত্তিক মাত্র; এজন্ত মুক্তিও তাহাব আপেক্ষিক, ব নৈমিত্তিক, বদ্ধাবস্থায় জীব নিজের স্বরূপ বৃষ্টিতে পাবে না; জ্ঞানিবার জন্ত জিজ্ঞাসা ও নিরীক্ষাসন করিতে হইবে এবং ভগবানের অনুগ্রহে জানিতে পারা যাইবে। এই ভগবৎপ্রাপ্তিই মোক্ষ। মন-ক বিনাশ হইলে—“আমি ভগবানের” এই বোধ আসে। সেই জন্ত মুক্তির অপর নাম ভববদ্ধতাভাবগতি।

কোহিনূর (মাঘ) ।

অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা সম্বন্ধে সংকীর্ণ—

শ্রীমোহম্মদ শহীদুল্লাহ—

স-তারকা-নবচন্দ্রকলা-চিহ্নিত পতাকা তুবক সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা; ইহা বিজ্ঞতা ভূরূপ পূর্ববর্তী ঐকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এটান ইলিরিয়া প্রভৃতি বহুদেশেও এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ইহাকে ইসলামের চিহ্ন মনে করা ভুল। পারস্ত, মরক্কো বা এশিয়া মুসলমান রাজ্যের জাতীয় পতাকা ভিন্ন রূপ। হজরত মোহাম্মদ নব্বুৎ হাদিসে উক্ত আছে যে তাঁহাব সঙ্গে দুইটি পতাকা থাকিত একটি বেতবর্ণ ও একটি কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাতে বিভিন্ন বর্ণের কোটা। এদেশের মোগল পাঠান বাগদাদিগণের পতাকা কিঞ্চিৎ ছিল তাহা বলা যায় না; তবে ইহা নিশ্চিত যে তুর্কদের পতাকাব প্রতি ভারতীয় মুসলমানের সম্মান নূতন এবং তাহার প্রথম কারণ উহা রুমের সুলতানের পতাকা বলিয়া। যদি কেহ উহাকে ইসলামের চিহ্ন মনে করেন ত তিনি ভুল করিবেন।

ভারতমহিলা (ফাল্গুন) ।

শ্রীশিক্ষা—শ্রীকাননকুমারী দেবী—

পুরুষশিক্ষার অনুপাতে এসেছে শ্রীশিক্ষা অকিঞ্চিৎকর। এজন্ত সকল দেশের ভায় এ দেশেও পৃথক মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপনের সময় আসিয়াছে। শ্রীশিক্ষার এণালী পুরুষশিক্ষার এণালী হইতে পৃথক হওয়া আবশ্যিক। কারণ (১) শ্রীপুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও কর্মক্ষেত্রের স্বতন্ত্রতা; (২) ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিল্প আবশ্যিক, কিন্তু পুরুষসাধ্য শিল্প ও শ্রীসাধ্য শিল্প এক নহে; (৩) ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক উন্নতিসাধন; (৪) এদেশেব মেয়েদের পুষ্ক বয়সেই বিবাহ হয়; সরকারী নিয়মে ১৬ বৎসরের আগে কোনো গরীর্ণ দিবার উপায় নাই; সুতরাং উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ; ইহার প্রতিকারের জন্তই দেশীয় এণালীতে দেশীয় প্রকৃতির অনুকূল মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক। যদি মহিলার নিজেদের স্বয়ং অধিকার পুরুষের নিকট হইতে দাবী করিয়া আদায় না করেন এবং উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত না হন, তবে কেবল মাত্র পুরুষের দয়ার দানে চুঁচুনা বুচিবে না ইহা মনে রাখিতে হইবে।

শিশুপ্রকৃতি—শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

শিশুপ্রকৃতিতে প্রধান গুণ দেখা যায়—(১) চকলতা; (২) অস্থ-সঙ্কোচ; (৩) সৌন্দর্যপ্রিয়তা; (৪) অশ্বনপ্রিয়তা; গঠনোচ্ছল ও বস্তুর আকার পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা; (৫) অনুকরণপ্রিয়তা এই লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিশুপ্রকৃতির অনুকূল উদ্দেশ্যে শিশুর ভবিষ্য জীবন গঠন করিয়া তোলা উচিত।

নব্যভারত (মাঘ ও ফাল্গুন) ।

ভক্তকবি হরদাস—শ্রীরসিকলাল রায়—

কেহ বলেন হরদাস সারথত ব্রাহ্মণকুলে দিল্লীর নিকট সিহীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা রামদাস ভিক্ষা দ্বারা উদরভ্রম সংস্থান করিতেন এবং গোষাট নামক স্থানে বাস করিতেন। কেহ বলেন চাঁদকবির বংশে হরদাসের জন্ম; তাঁহার পিতা আকবর শাহের সভার ভাট ছিলেন। কবির স্বরূপত পরিচয় হইতে জানা যায় ঐশ্বর্য গোবীন্দ জগত বংশীর ব্রাহ্মণ নামক একব্যক্তি তাঁহার পূর্বপুরুষ; সেই বংশে চন্দ্রবর্দে উৎপন্ন; তাঁহার উদ্ভূতন বংশে অনেকেই অমরক রাজ্যের সভাকবি ছিলেন। মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে হরদাসের ছয় ভ্রাতা নিহত হন, এবং হরদাস এক অস্বরূপে পতিত হন। চার দিন আর্থনার পর ক্রীকৃত ভগবান তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে মুহূর্তন করেন। হরদাস ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; কাহারো মতে ১৫৮০ সালে; হরদাস স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনি বঙ্গভাট্যাগ ও মির্জা দাসের সমসাময়িক। ইহা দ্বারা পূর্বমন্তই সমর্থিত হয়। হরদাস কদম্ব কিনা সে বিষয়েও মতবৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন যে তিনি কোনো যুবতীর রূপের মোহে চকলচিত্ত হওয়াতে স্বয়ং চকু বিদ্ধ করিয়া বন্ধ হন। হরদাস বাল্যাবধিই কৃষ্ণপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা ছিলেন। সেই ভাবোন্মত্ততা হইতে তাঁহাব অসাধারণ কবিত্বের স্বর্গ হইয়াছিল। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে হরদাস লোকাঙ্কুরে বাঁজা করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে হিন্দী ভাষার কতকগুলি উক্তি প্রচলিত আছে, তাহার দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্তকবি বলিয়া আজও সকলের প্রত্যাশা হইয়া আসে। এমন কি তাঁহাকে ভক্তকবি-তুলসীদাসের উপরেও স্থান দেওয়া হয়। হরদাসের প্রধান গ্রন্থ তিনখানি—হরদাস, হরদাসাবলী ও সাহিত্য-

লহরী। এতদ্বিধি বহু ঋণকাব্যও আছে। রচনার বিষয় বাণিজ্যের প্রেমলীলা ও তাঁহাদের সহিত ভক্তের প্রেমবৈচিত্র্য। হরদাস একেব-বাবী বৈকব ছিলেন।

প্রতিভা (ফাল্গুন)।

ভারতীয় দ্বারা ইমোরোপীয় বাণিজ্যের ও বর্তমান

ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূত্রপাত—

শ্রীশ্রীতলচন্দ্র চক্রবর্তী—

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে যিহুদিদিগের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। কিনিসীয়গণ বেদের পণিজ্ঞানি এবং তাহাদের নাম হইতেই বণিক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। তাহার কারণে প্রতিষ্ঠিত কবিরা বোমের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করে। তৎপরে আলেক-জান্দ্রিয়া বাণিজ্যকেন্দ্র হইল। প্রাচ্যের মসলাসম্ভার লাভের জন্তই মুখ্যতঃ প্রাচ্যের ব্যবসায়চেষ্টার সূত্রপাত। এই সূত্রে ইতালীর নাবিক হিপলাস ভারত সমুদ্রে বাণিজ্যবাস্থ্য অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তৎপরে ভেনিস ও জেনোবা বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ হইল। ইতালীর নাবিকরাই প্রথমে ভারত ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখে Indies. ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে যুরোপীয়দিগের চিন্তা হইল ভিন্ন পথে ভারতে যাওয়া যায় কিনা। পর্তুগালের রাজকুমার হেনরি আফ্রিকা পরিবেষ্টন কবিয়া পথ আবিষ্কারের জন্ত অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কলম্বাস ভারতের পথ আবিষ্কারের জন্ত যাত্রা কবিয়া আমেরিকা আবিষ্কার কবিলেন। তৎপরে ডাঙ্কো ডা পামা আফ্রিকা দ্বিবা ভারতের পথ আবিষ্কার করেন। পরবর্তী বাণিজ্য অভিযানে ক্রমে ক্রমে বহু দ্বীপ ও দেশ পর্তুগীজগণ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহাদের জ্ঞাত বহু দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক বিদ্যমান। এইসকল অভিযান-নেতার মধ্যে পেরো আলভারেস কোব্রাল, আল-মেইদা, ও আলবুকার্ক প্রভৃতির নাম। ভারতের বন্দর ও ভারতসমিহিত দ্বীপ জয়ের জন্ত, প্রসিদ্ধ। কলম্বাসের পথ আমেরিকো এবং তৎপরে মেন্ডেল ভারত যাত্রা কবিত্তে গিয়া আমেরিকা, মেন্ডেলেন প্রাণী ও প্রাশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন। মেন্ডেলেন প্রাথম মসলাবাণিজ্যে যাত্রা করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করেন এবং সেইজন্ত স্পেনরাজ তাঁহাকে পেলন মঞ্জুর করেন। ইহাদেব সাফল্যের দেখাদেখি ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি মসলা দ্বীপ ও ভারতের উদ্দেশে দিকবিদিকে ছুটিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে ভারতে আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। রবের মধ্য দ্বিবা স্থলপথে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও ইংরেজেরা করিয়াছিল এবং তাহার ফলে আরব দেশের বহু স্থানের সহিত যুরোপের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তৎপরে ভারতে আসিবার জন্ত উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ আবিষ্কার-চেষ্টা হইতে উত্তরমেরু আবিষ্কারের সূত্রপাত। দক্ষিণ সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে গিয়া অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির আবিষ্কার হয়। কথরাজ গীটারের নিযুক্ত বেরি: এসিয়া ও আমেরিকার বিবোধক প্রাণী বেরি: আবিষ্কার করেন এবং ঐ প্রাণী আবিষ্কারকের নামে পরিচিত হয়। তৎপরে বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি আবিষ্কারের চেষ্টায় বহু অভিযান প্রেরিত হইয়াছে ও হইতেছে।

মানসী (মাঘ)।

বিক্রম-সংবতের উৎপত্তি—শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ—

কাণ্ডার্ন সাহেবের মতে বিক্রমাদিত্য উপনামা উজ্জয়িনীর হর্ষনৃপতি স্বেচ্ছাদিগকে ৪৪৪ খৃষ্টাব্দে কোরুর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয়চিহ্নরূপ

বিক্রমাদিত্য সংস্থাপিত করেন। তৎপরে ডাঙ্কো বুলব, ডাঙ্কো কীট, প্রভৃতি দ্বাবা বহু শিলালিপি ও বিদেশী পবিত্রাজকদিগের উক্তি হইতে ঐ মত প্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহাকে সংবৎ প্রবর্তক না বলিয়া শকাব্দ প্রবর্তক বলিয়াছেন। অনেকের মতে বিক্রমাদিত্যের অপর নাম মালব সংবৎ। সাধারণতঃ ৩৪৪-কল্যাদ হইতে বিক্রমাদিত্যের আদিত্য গণনা করা হয়। কিন্তু বিক্রম সংবতের পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত কোনো পুস্তকে লিপিতে বা দানপত্রে সংবৎ সহ বিক্রমের নাম পাওয়া যায় নাই। ডাঙ্কো হর্নলি বলেন যশোধর্মণ বিজুবর্দ্ধন মিহিরকুলের দ্বন শক্তিকে পরাজিত করিয়া মালব অঙ্গ নাম পরিবর্তিত কবিয়া বিক্রমাদিত্য প্রচলিত করেন। ভিলেট গ্রিথ বলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া মালব নাম বিক্রমাদিত্য করেন। শালিবাহনের শক কণিক প্রচলিত করেন বলিয়া অনেকের ধারণা; ডাঙ্কো ফ্রাটের মতে কণিক বিক্রমাদিত্যের প্রবর্তক। কলহর্ষ বলেন মালবায় পরবর্তী কালে বিক্রমাদিত্য বলিয়া পরিচিত। ডাঙ্কো ভাণ্ডারকর প্রভৃতির মত এইরূপ। কিন্তু ইহা শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত হয় না। সি, ভি, বৈম্ব বলেন যে বিক্রমাদিত্য মূল মালবায় বলিয়া যদিও থাকে এবং মালব জাতি বা মালব রাজাদের স্মরণার্থ প্রচলিত হইয়া থাকে তাহাতে এমন বুঝায় না যে উহা কোনো নির্দিষ্ট রাজ্য প্রচলিত নয়; বিক্রমাদিত্য যে খ্রী: পূ: প্রথম শতাব্দীর রাজা, হলের সপ্তশতীতে তাহার প্রমাণ আছে; প্রাচীন প্রবাদে কলহর্ষ তাঁহাকে শকাবি বলিয়াছেন এবং অনেকের মতে 'কোরুর যুদ্ধ' তিনিই করেন। এইরূপ নানা প্রমাণ নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য বিক্রমাদিত্য খ্রী: পূ: হইতে প্রচলিত করিয়াছেন।

তীর্থে—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ—

ভরপুর আজি গঙ্গার কুল ফুলচন্দনগন্ধে,
পুণ্যলোমুপ বঙ্গনিবাসী চলিয়াছে মহানন্দে;
ঐ যে সূর্য্যে লেগেছে গ্রহণ, 'চুড়ামণি ঘোষ' আজ,
দলে দলে দলে চলে নরনারী ফেলিয়া শতক কান্দ;
সংসার ভ্রমে পড়িয়াছে এসে গঙ্গার ছুটি কুলে,
ভবিষ্য উঠেছে জাহ্নবীজল প্রাণে পড়ে কুলে;
ডাকে ব্রাহ্মণ—“কে আছে কোথায় কর গো গঙ্গানান,
দানদানে হও মুক্তহস্ত, লভিবে পরিদান।”

কে আজ বৃষ্টি পথের সীমায় গঙ্গামুখতি পড়ি
পুরোহিতবেশে আছে সারাদিন তাহারি নিকটে পড়ি
পথিক-রক্ত শুভিতে; ভক্ত—পুলকাঙ্কিত বুক,
চেরে দেখে তোবা নয়নে আননে উছলে কি মহাত্মা
কোথাও বা পথে 'মৃগলমুষ্টি' কোথা বা 'জগন্নাথ',
তাম্রখণ্ড পৌষপের আগে পাতিয়া রেখেছে পাঁত।
আম তোরা আর, ছুটে আয় ওরে, করে বা' মুক্তিনান
গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে দেখে বা' দেবতার অপমান।

বাসায় বাসায় কলেরার ধুম, মরে লোক দলে দলে,
বিদেশ হইতে এসেছে বিদেশী মরিতে গঙ্গাজলে।
চিরপরিচিত ঘরের নদীটা লভিয়াছে প্রাণ আজ,
জয়-আবেগ পবাবেছে তা'র মহিমাময়ীর সাজ।
ভক্তি-ধারায় ধস্ত আন্ধিকে গঙ্গার ছুটি তীর—
'কলুশাশিনী জাহ্নবীবারি' আনা গেছে আজ দ্বির—
ছুটে আয় ওরে তটদেশবাসি। করে বা মুক্তি-মান,
শত ভক্তের জয়তীর্থে গঙ্গা অধিষ্ঠান।

ভক্তি তুলেছে উজ্জল করি তীর্থের ছবিখান—

মুর্ছিত। তোব পঙ্কিলতা'র হয় কি সে কল্প রান?

কোণাখুশি আব নাযাবলী-তলে যত-চকল চোখ,

মুরিবা কিরিবা জনতার মাঝে আলামব হয় হোঁক—

তোদের লোভের আগুনে দহু দেবতার যত মুখ,

কুক বসনে ঢাকা পড়ে বাব পাখও বুদ্ধরুক।

আর জননীরা, চলে আর ওগো করে যা' মুক্তিমান,

তোদের ভক্তি উজ্জল করি তুলেছে তীর্থখান।

আজ,

ওই যে কে আসে ভাগ্নীবধী-পাশে বৃদ্ধার হাত ধরি,

কুকিত কেশ কেলেছে কাটিয়া নিঃশেষে শেষ করি।

গুজবসনে বেষ্টিত তাঁর পুণ্ডিত তনুখানি—

আঁখি দুটি, নরি, বিবাহ-উদাস—তবু সে উবার রাণী।

জাকবোজন পুলকে উজ্জল চরণ ছুঁইতে চায়।—

আর তোবা ওগো তীর্থ দেখিয়া পুণ্য লভিবি আর;

বাগিকা-বিংবা এসেছে করিতে দেবতা-দর্পচুর—

কুটিবা উঠেছে গঙ্গার জলে তীর্থের-কোহিনূর।

আজ,

নসারে তাঁর এবেশ নিবেধ, কক্ষেপ তাহে নাই,

তীর্থে তীর্থে দিমিমার সাথে করে সে সর্বদাই।

আঁখি দুটি তাঁর পবিত্রতার বিচিত্র দরপণ।

কুটিছে সেখায় শত তীর্থের উজ্জল বিবরণ।

আনন তাহাব বিনয়-কোমল শাস্তিতে হৃদয়ভীর।

গুজ বসনে কল্পনার ধারা গলিয়া হইছে ক্ষীর।

আসিয়াছে সে যে পুণ্য প্রতিমা তীর্থ-সজার মাঝে—

বিষবাসনা চাহি তাঁর পানে লুকাইতে চায় লাজে।

আজ,

ধাঁড়াবেছ মাগো জুড়ি দুটি পাণি উর্ধ্বে নয়ন ফুলি,

চেটেগুলি বৃষ্টি চরণ-পূরণে বহিতে বায় বা ভুলি।

কুলু কুলু নামে কঁপে ভাগ্নীবধী কচি পা দুটির তলে।

অঙ্গে অঙ্গে পবিত্রতার হিরণ কিরণ জলে।

ছ'পাশে বাজী দেখিছে মুকু পুণ্যের প্রতিকপ—

বর্গ হইতে তাকারে তে'মারে দেখিছে বিশ্বতপ।

পলকে লভিল মুক্তি-রানের অতুল পুণ্যরাজি,

আনন্দ হা'হা পাইনি লাবনে, তাই বে পেয়েছি আজি।

ওগো,

সন্ধ্যা উয়ার মিলন বাসরে সজ্জিত করি কায়।

প্রীতি কল্যায় মহা পরিমাণ ধাঁড়িয়েছ মহামায়া।

নাশিবাছ এসে, বাগিকার বেশে, আঁধার করিতে ঘূর—

গঙ্গার জলে ধ'মিয়া মিলেছে তীর্থের-কোহিনূর।

আজ,

আর্য্যাবর্ত (ফাল্গুন)।

আয়ুর্কর্মেদেব ইতিহাস—শ্রীব্রজবল্লভ রায়—

অধরকর্মেদেব খৃঃ পূঃ ১০১৬ অব্দে সংগৃহীত হয়। তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তৎপূর্ব্বের রচনা। ব্রাহ্মণযুগে বিলাসের ও আলাস্তের বতব্বণ ব্যাধির পশিচর পাওয়া যায়; বৈবিক যুগে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। এই সময় শলাবৈদ্যগণ পশুচিকিৎসা, ত্রণচিকিৎসা, গর্ভিণীচিকিৎসা করিতেন। বজ্রনিহত পশুর শরীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শরীরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। ঔষধের আন্তর ও বাহ্যিক প্রয়োগ হইত এবং কোনও কোনও ঔষধ ধারণ ও গ্রাণ করানো হইত। ক্ষেত্রিয় বা বংশগত রোগ: সর্পবিষ, প্রকৃতিরও চিকিৎসা হইত। জনমিশ্রিত বব (বার্জি) সর্বরোগের পথ ছিল। এই যুগে জলচিকিৎসা বা

হাইড্রোপ্যাথি উপলক্ষে ঔষধরূপে স্বর্ণপারি বা স্রোতের জল ব্যবহৃত হইত। সেকালে Psychopathyরও প্রচলন ছিল। কোর্দিসকে বশিষদ (পিচকারী) ও মুরোরোধে শলাকা প্রয়োগ করা হইত। উভয়ির কাখে রোগীকে স্নান করানো হইত। পিত্তরসের সাহায্যে অঙ্গদ্বির পরিপাক হয়, এই সত্য ব্রাহ্মণ যুগেই আবিষ্কৃত হয়। এই সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভুতপ্রভেতের ভয় নিবারণের জন্য কাষ্ঠপর্ব্বি প্রণীত কাষ্ঠপতত্র প্রভৃতি প্রহুও অপর দিকে সমুদৃত হইতেছিল।

বিজ্ঞান (ফেব্রুয়ারি)।

চা—ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু—

চায়ের ব্যবহার চীন দেশেই প্রথম প্রচলিত হয়। কনফুসিসের প্রহু (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) চা-সমূহ বুদ্ধপত্রের গুণের কথা বিবৃত আছে। কেহ কেহ বলেন ৫৪০ খ্রীঃপূঃ বোধিধর্ম্ম নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ হইতে চীনে গিয়া চা-ব্যবহার প্রবর্তিত করেন। জাপানেও এই প্রবাহ আছে। বৌদ্ধ শতাব্দীর পূর্বে যুরোপে চায়ের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। পবেও সৌধীন ধর্মীর বিশেষ বিলাসসমুদ্রী হইয়াই বহুকাল ছিল। তখন এক পাউণ্ড চা ১০০ হইতে ১৫০ নিকার বিক্রম হইত। বৈজ্ঞানিক মতে আসামের বঙ্গ চা পৃথিবীর সকল দেশের চায়ের আদি পুর্ব্ব। আসাম বাতীত কুম্রাপি বঙ্গ চা বেশ ব্যার না। চায়ের গাছ তিন হইতে ৬ ফুট, পাতা ৩৪ ইঞ্চি লম্বা হয়; বঙ্গ চা গাছ ১৫২০ ফুট উচ্চ ও পাতা ৯ ইঞ্চিরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে। ১৭৮০ সালে ডাক্তার কিত চীনে চা কলিকাতাবি বোটাংকিয়াল বীগানে প্রথম রোপণ করেন। ১৮১২ সালের পবে আসামের বঙ্গ চা মেজর ক্রস আবিষ্কার করেন। ১৮৩৫ সালে প্রথমে আসামে চীনে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। এখন আসামে ১০ লক্ষ বিঘা জমিতে চা চাষ হইতেছে; সমগ্র ভারতের চায়ের জমির পরিমাণ ১৫১৮ লক্ষ বিঘা জমি। আসামে প্রতি একর জমিতে ৪০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়; বঙ্গের বাহির অস্তান্ত অংশে ২০০১২৫০ পাউণ্ড। সমগ্র ভারতবর্ষে ২৪ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়, তাহার ১৩৪০ কোটি পাউণ্ড আসামের উৎপন্ন। চায়ের মূলধন প্রায় সমস্তই বিলাতী। আসামের চা-পাণে ৮ লক্ষ মজুর কাজ করে। আসামের চা ক্রমে চীনের চা-কে নাজার হইতে বিতাড়িত করিতেছে। চায়ের কচি পাতা বিশেষ উপায়ে শুকাইয়া ব্যবহৃত হয়; যে চা-য়ে যত কচি পাতা ও পত্রমুদ্র যত গোটা থাকে সে চা তত ভালো ও স্বগন্ধি স্ব্বাচ্ছ হয়। আসামের চা দুই প্রকারের—দেশজ ও বর্গসজর। ডাঃ স্মিথের মতে চায়ের দ্বারা শরীরের ক্ষয় ত নিবারিত হইয়া না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণ চা উত্তেজক। তবে ইহা ভুক্ত দ্রব্যকে সহজে শরীরে গ্রহণের উপযোগী করে; সুতরাং চা খাইতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ নিরবান খাদ্য আহার আবশ্যক। অধিক চা ব্যবহারে অজীর্ণ ও হেটবদ্ধ হয়; চায়ের ভিতরকার ট্যানিন বিষ ক্রয়োগ ও হিষ্টরিয়া প্রভৃতি বায়ুবোগের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। যেখানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, সেখানে জলে চা সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জলো যৌব অনেকটা কাটিয়া যায়। আহার করিবাব সময় চা পান করা উচিত নয়।

তাম্বুল—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়—

পান ভাবতের পূজার পার্শ্বণে, উৎসবে বৈঠকে, ঔষধে আহারে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। এই পানের সম্পর্কে ভিবা গঠনের শিল্পও ভারতে বিচিত্র ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বহুপ্রকারের পান পাওয়া যায়। পানের লতা কতক বরফে পালন

করিয়া ও কতক গাছের গাণ্ডে উঠাইয়া পান সংগ্রহ করা হয়। নব্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে পান উষ্ণ, পাচক, পচননিবারক (antiseptic)। পান চোরাইলে তৈল পাওয়া যায়; কফস্বক্ষীর পীড়ার, পচননিবারণে এবং রোহিণী (diphtheria) বোগে পান-তৈলের কবল ও ধূস বিশেষ উপকারী। ১ বিন্দু তৈলের বদলে ৪টি পানের রস দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় মতে পান বহু রোগের ঔষধ; পার্শ্ব্য টোটকা চিকিৎসায়ও ইহার প্রভাব যথেষ্ট। আহাৱান্তে পান চর্ষণ করিলে যেমন পরিপাকের সাহায্য হয়, অধিক সেবনে আবার অপকার হয়, দস্ত শিথিল হয়। পান উত্তেজক। পানের গাছের অংশ কাটিয়া চাড়া করিতে হয়; অবিকারশ গাছই জীপুপ-বিশিষ্ট। পান চাষের জন্য উচ্চ ভূমি এবং কৃষ্ণবর্ণ বুনো ও জান্তব-সার-যুক্ত মাটি উপযোগী। বিনা চাষে পান—প্রবাসী কতক অংশে সত্য। একবার বরষা করিয়া ফেলিতে পারিলে ১০ হইতে ৩০ বৎসর পান পাওয়া যাইতে পারে। আশাঢ়ের চাড়া হইতে আশ্বিনে, এবং আশ্বিনের চাড়া হইতে জ্যৈষ্ঠে পান পাওয়া যায়; মাসে দুইবার পাতা তোলা যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ২৪টি পাতা প্রত্যেক বারে পাওয়া যায়। বর্ষায় ৭৮৭টি পর্যন্ত। এক বিঘা জমিতে বৎসরে ২৬ হইতে ৩০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। গাছের ডগাছাটা ছোট ছোট পানও প্রচুর পাওয়া যায়। তিন বিঘা জমি চাষ করিয়া পানের বরষা করিতে আশ্বিন মাস বৎসরে ৪০০০ টাকা, অর্থাৎ বৎসরে গড়ে ৪৬০ টাকা খরচ পড়ে। তিন বিঘা জমির উৎপন্ন ৮০ লক্ষ পানের দাম টাকায় ৩০০০ পান হিসাবে দাম ধরিলে ২৪০০ টাকা। ইহার অর্ধেক কীট পতঙ্গ শুল্কগণিতে নষ্ট করিলেও খরচখরচায় সহিত মোট আর ১৬০০ টাকা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

বঙ্গদর্শন (ফাল্গুন)।

শিক্ষা, অশিক্ষা, ও কুশিক্ষা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল—

একদল স্বদেশহিতৈষী দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টার পক্ষে একটা অসঙ্গত আছে। বর্ণপরিচয় ও শিক্ষা (literacy and education) এক বস্তু নহে; আমাদের দেশে বর্ণজ্ঞান নাই তবু শিক্ষা আছে; পাশ্চাত্য দেশে বর্ণজ্ঞান আছে কিন্তু শিক্ষা নাই। বর্ণজ্ঞান নাই পাশ্চাত্য জনসাধারণ তাহাদের বৈষয়িক ব্যাপার যতটুকু যেমন ভাবে বুঝে আমাদের দেশের বর্ণজ্ঞানহীন নিরক্ষর লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ততদূর পক্ষে কম নহে। বরং আমাদের দেশের লোক যেমন জটিল ততদূর বুদ্ধিতে পারে পাশ্চাত্য সাধারণের তাহা ধারণাশীল। অক্ষবর্ণপরিচয়ই যে শিক্ষা নয় তাহা আমাদের মাতৃহানীরা ও কল্যাণহানীরাগির অস্বাভাবিক পর্ধ্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীনাগের শিক্ষা ছিল স্বদেশশক্তি-মুখী এবং নবীনাগের শিক্ষা হইতেছে বিদেশশক্তি-মুখী। এদের শিক্ষা বাহিরের বিষয় লইয়া বুদ্ধিকে বিচলিত করিতেছে, তাঁদের শিক্ষা ভিতরের বিষয় জ্ঞাপাইয়া বুদ্ধিকে স্থির করিত। এখনো সেই শিক্ষাই থাকিবে এমন কথা নয়; তবে সেই শিক্ষা ছাড়িয়া নহে, তাহার সহিতই যুক্ত করিয়া, তাহাবই স্বাভাবিক প্রসারণের দ্বারা নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাহিরের আদর্শে সমাজের উপরে সংস্কারের বোঝা চাপাইলে প্রয়োজনের পূর্বে আরোজন করিতে গেলে সমস্ত কুজিহ্বা, বহিমুখী ও অকল্যাণকর হইতে বাধ্য। বর্ণজ্ঞানবিস্তারের আরোজন এখনো আমাদের দেশে হয় নাই। জিত্ত হইতে আরোজন বোধ হইলে জনসাধারণ আপনি লেখা পড়া শিখিবে; চেষ্টা দ্বারা বা জোর করিলে সফল হইবে না। বিলাতে সাধারণের মধ্যে জোর করিয়া

যে বর্ণজ্ঞান প্রচার করা হইতেছে তাহাতে একদিকে যেমন দেশের প্রায় সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিতেছে সেইরূপ অন্যদিকে সমগ্র সমাজেব বিভাবুদ্ধি ক্রমশঃ ব্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছে। ইংরেজি সাহিত্যের বর্তমানে যে অধোগতি দেখা যাইতেছে এই সার্বজনীন লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা তাহার প্রধান কারণ। সাহিত্য পূর্বকালে সাহিত্যিকের আত্মবিকাশেই চরম সার্থকতা অন্বেষণ করিত, সাহিত্য তখন সাধনা ছিল; বাহ্যদের কিছু বলিবার থাকিত, বাহ্যরা অন্তরে বাস্তবীকরণের প্রেরণা অনুভব করিতেন, বিদ্যার প্রতি বাহ্যদের অহেতুকী অকৈতব প্রেম জন্মিত সে কালে তাহারা আপনাদের আত্মচরিতার্থতা লাভের জন্য প্রবাহিত রচনার প্রবৃত্ত হইতেন। এখন প্রবৃত্তি রচনা ব্যবসারে পরিণত হইয়াছে। এখনকার প্রবৃত্তিকারেরা ভাবার সাধনা করে, ভাবের ধারে ধারে না; বাজারের রুচি অনুসারে প্রবৃত্তি রচনা হয়। ইহাতে সমাজের চিন্তাশক্তি হ্রাস ও রুচি বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশেও লেখাপড়ার বাহ্যিক বিস্তারে এইরূপ কলেরই সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে প্রকাশিত হইবে; এবার স্থানাভাব।

—মণিভদ্র।

বিবিধ প্রশঙ্গ

বঙ্গের নূতন গবর্নর লর্ড কারমাইকেল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অভিনন্দনের প্রত্যাশ্তরে অনেকগুলি ভাল কথা সরল ভাবে বলিয়াছেন। সিতিলিয়ান সাহেব-দের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে চিনিতে এবং তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইতে চেষ্টা করিবেন। হয়ত অনেক সময়ে তাঁহাকে তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হইবে; কিন্তু “যদি এমন ঘটনা হয়, তবে একথা আমি তাঁহাদের জানাইয়া রাখিতেছি যে, তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ অন্য তাহা ঘটবে না।” তিনি আরও বলিয়াছেন :—

“আমি জানি এমনসকল বিষয় আছে বাহাতে ভারতবাসীতে ইংরেজের অনৈক্য ঘটে। কিন্তু এ রকম বিষয়ও অনেক আছে, বাহাতে আমাদের মধ্যে একতাপ্রবণতা জন্মিবার হেতু হয়। বাহাতে সকলের মধ্যে পরস্পরে একতা জন্মে, অনৈক্য ঘটবার কারণসমূহ হুচিয়া যায়, গবর্নর স্বরূপে সে পক্ষে আমার লক্ষ্য থাকিবে। আমি এই-সকল করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালার আসিয়াছি। যেসকল বিষয় আমাকে বিবেচনা করিতে হইবে সেসকলের প্রকৃত তথ্য আমি বুদ্ধিতে চেষ্টা করিব। কোন বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় শাসনকর্তার যে দিক দিয়া উহা ভাবেন, তাহাও দেখিব, এবং প্রজা-লোকে যে দিক দিয়া ভাবিয়া থাকে, তাহাও দেখিব। কলে আমার শিক্ষা ও জ্ঞান অনুসারে ঠিক মত কাজ করিতে বতদূর পারি করিব। যদি আমি ইহা করিতে পারি তাহা হইলে কলিকাতার সম্বন্ধে—

বান্দালার সম্বন্ধে—ভারতের সম্বন্ধে, আমাদের সম্রাটের সম্বন্ধে কর্তব্য পালন করা হইবে। বেশী আর কিছু করিতে পারিব না, তাহা করিবার জন্ত আপনারাও বলিবেন না; কিন্তু কমও আপনারা আশা করেন না এবং কম করিবারও অধিকার আমার নাই।”

কিন্তু সকলের চেয়ে পাকা কথা বলিয়াছেন এই যে, তাঁহাকে বঙ্গের প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত করা ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা স্থির করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে, সম্ভবতঃ অন্ততঃ পাঁচ বৎসর লাগিবে। আমরাও বলি, “ফলেন পরিচায়তে” অপেক্ষা পাকা কথা এক্ষেত্রে হইতে পারে না।

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞা-মহার্ণবের সঞ্চর্জন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যথাযোগ্য কাজ করিয়াছেন। বিশ্বকোষ নগেন্দ্র বাবুর ও বঙ্গালীর একটি সাহিত্যিক কীর্তি। যে ইংরাজ জাতি জীবনের ও বিজ্ঞার নানাবিভাগে অসংখ্য মহত্তর কীর্তি রাখিয়া যাই-তেছেন, তাঁহারাও এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একা-দশ সংস্করণ শেষ হওয়া উপলক্ষে একটা ভোজ সভার আয়োজন করিয়া লর্ড মল্লী প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের দ্বারা বক্তৃতা করাইয়াছিলেন।

সিদ্ধ দেশের মুসলমান জমিদারদের অনুরোধ ও সম্মতি-ক্রমে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভুবনী বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন, যে, ঐ জমিদারদিগের উপর একটি শিক্ষা-টেক্স বসান হউক, এবং তাহার আয় হইতে সিদ্ধদেশের মুসলমান রায়তদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারিত হউক। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু মুসলমান সমুদয় বেসরকারী সভ্য ইহার সমর্থন করিয়াছেন। বড় আনন্দের সংবাদ। অজ্ঞাত প্রদেশের হিন্দু মুসলমান জমিদারেরা দেখুন ও শিখুন।

আমেরিকার ছটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুইজন ভারতবাসী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। একজনের নাম শ্রীযুক্ত হরদয়াল। ইনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত এম্-এ। অক্সফোর্ডেও কিছু দিন পড়িয়াছিলেন। ইনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক। ইনি ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে



শ্রীযুক্ত বসু।

সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতবর্ষীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে ষ্ট্যানফোর্ডের মত ধনশালী বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। এখানে বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসাবিজ্ঞা খুব ভাল শিখান হয়। ইহার অধ্যাপকেরা জগতের বিদ্বানগুলোর পরিচিত। অপর ভারতীয় অধ্যাপকের নাম শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু। ইনি আয়োজা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা (Oriental Politics & Civilization) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। ইনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতা, এবং আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধিধারী। ইনি সংবাদপত্রের উপযোগী প্রবন্ধাদি বেশ লিখিতে পারেন।

খবরের কাগজে দেখা গেল যে গুণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন যুবক আমেরিকার সৈন্সদলে

লেক্টেজাণ্ট বা নিম্নতম সেনানায়কের কাজ পাইয়াছেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আমেরিকার বাণিজ্যদৌত্য (consular) বিভাগে কাজ লইয়া চীনদেশে গিয়াছেন। জগন্মোহন তালুকদার একটি সমুদ্রগামী বৃহৎ জাহাজের দ্বিতীয় কর্মচারী এবং হরিচরণ মুখোপাধ্যায় আপুকার কোম্পানীর একটি সমুদ্রগামী জাহাজের চতুর্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। নূতন নূতন অনভ্যস্ত রকম কাজে ভারতবাসী কৃতিত্ব দেখাইলে বড় স্মৃতির বিষয় হয়।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বসু স্বাস্থ্য-সমাচার নামে একটি মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন। ইহার বৈশাখ সংখ্যা পাইয়াছি। আমাদের মত প্রোগ্রাজীর্ণ দেশে যে এমন একখানি অতীব প্রয়োজনীয় কাগজ এতদিন ছিল না ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এখন প্রকাশিত হইয়াছে; আশা করা যায় যে ইহার খুব কাঁটিতি হইবে। কারণ, ইহার লেখাও খুব সারবান এবং বিষয়বৈচিত্র্যও খুব আছে। অধিকন্তু ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমিত কাগজের বার্ষিক মূল্য ও ডাকমাণ্ডল এক টাকা সত্তাও বটে। বৈশাখ সংখ্যায় আছে—হুচনা, রোগ কি, ডাবের জল, নিরামিষ-ভোজীর বিপদ (গর), দস্ত, বায়ুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ, খাস প্রখাস, ব্যায়াম, ম্যালেরিয়া, বিবিধ সংগ্রহ। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও বহুল প্রচার কামনা করি।

ঢাকার প্রধানতঃ কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মেম শিক্সত্রী দ্বারা অন্তঃপুরে ইংরাজী ভাষা ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া। ইহার জ্ঞাত গবর্ণমেন্ট-সাহায্যও মঞ্জুর হইয়াছে। ঢাকার অন্তঃপুরে বোধহয় বাঙ্গলা শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে, উহার আর অধিকতর বিস্তৃতির দরকার নাই; সেই জ্ঞাত এখন ইংরাজী ভাষা না শিখাইলে আর চলিতেছে না। যাহা হউক, কোন প্রকারে কিছু শিক্ষা হইলে স্মৃতির বিষয় হইবে। আর কিছু না হউক এক বা একাধিক মেমের জীবিকার সংস্থান হওয়া স্মৃতির বিষয়। আর একটা পরোক্ষ স্মৃতি এই হইবে যে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই

শিক্সত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিবেন যে আমাদের অন্তঃপুরগুলিতে বোমা প্রস্তুতের কারখানা বা রাভনৈতিক ষড়যন্ত্রের আড্ডা নাই। তাহাতে গবর্ণমেন্টও নিশ্চিন্ত হইবেন, এবং আমরা খানাতল্লাসী হইতে কতকটা নিষ্কৃতি লাভ করিব।—কিন্তু পরিতাপের সহিত এই প্রশ্নই মনে হইতেছে যে আমরা এমনই অক্ষম যে গবর্ণমেন্টের সাহায্য ভিন্ন একজন অন্তঃপুর-শিক্সত্রীও নিয়োগ করিতে পারি না? অথচ আমরা কেহ কেহ স্বাধীন হইতে চাই, অন্ততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ত চাইই। কিম্বাচর্য্যামতঃপরম্।

অর্দ্ধোদয় যোগের সময় বাঙ্গালীর ছেলের দলবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিবার শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা স্বার্থতাগ, নারীকে মাতৃজাতি বলিয়া সম্মান করা, সাহস, এবং পরসেবার জ্ঞাত প্রাণকেও তুচ্ছ করা, ইত্যাদি গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে স্নানের সময়ও বাঙ্গালী যুবকদের এইসকল গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভগবানের নিকট এই ভিক্ষা করি যে আমাদের মধ্যে এইসকল গুণ বাড়িতে থাকুক।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁহার ভৃত্যপূর্ব ও বর্তমান ছাত্রদের রাসায়নিক গবেষণার বহু দৃষ্টান্ত ও ফল প্রতিবৎসরই বৈজ্ঞানিক জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়। গতবৎসর এবং বর্তমান বৎসরেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত আবদুর রহুল। বরিশালে যখন এই সমিতির অধিবেশন হয় তখনও রহুল সাহেব সভাপতি ছিলেন। তখন পুলিশের উপদ্রব ও ঠেঙ্গাঠেঙ্গিতে সমিতির কোন কাজ হইতে পায় নাই। এবার তাঁহাকে সভাপতি করা ঠিকই হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা বেশ সারগর্ভ হইয়াছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গ স্বতন্ত্র শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ নিয়োগের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত যাজ্ঞানমোহন সেনের বক্তৃতাও বেশ হইয়াছিল।



শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন এই অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন। দর্শক ও প্রতিনিধিতে সমস্ত মণ্ডপ ভরিয়া গিয়াছিল।

ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর যে উচ্চ স্থান, তাহার একটি প্রধান কারণ বিদ্যাশিক্ষা। এই বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ কমিয়া গেলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। শিবপুরের এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব বড় আশঙ্কার কারণ। আবার গবর্ণমেন্ট এইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে বেসরকারী বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটটি উঠিয়া গিয়া সরকারী যে শিল্পবিদ্যালয় ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তাহাতে লয় প্রাপ্ত হউক। আমরা এই উভয় প্রস্তাবেরই সম্পূর্ণ বিরোধী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই বিশেষ কোন আন্দোলন হইতেছে না। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য যে যে-কোন



শ্রী আবহুল রহুল।

জাতিকে সর্ববিধ অবনত অবস্থায় লইয়া যায় ও রাখে, তাহা কি আমরা জানি না, না, ভুলিয়া আছি ?

চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কনফারেন্সের পর সমাজ-সংস্কার সমিতিরও অধিবেশন হইয়াছিল। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে সামাজিক উন্নতি ভিন্ন রাজনৈতিক উন্নতি হইতে পারে না, উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ। বালিকার বিবাহের বয়স অন্যান্য বোল বৎসর হওয়া উচিত; বালবিধবাদের পুনর্বিবাহে কোন সামাজিক বাধা থাকা উচিত নয়; বিবাহে পণগ্রহণ-প্রথা রহিত হওয়া উচিত; নিয়ন্ত্রণের লোকদের উন্নতির জন্ত শিক্ষা প্রভৃতির বন্দোবস্ত হওয়া উচিত; বালিকা ও নারীদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত; এইরূপ অনেক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অবোধায় ক্ষয়জাবাদ শহরে কায়স্থদের বার্ষিক সমিতিতে এবার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

হিন্দুস্থানী কায়স্থদের সভায় বাঙ্গালী কায়স্থ সভাপতি নির্বাচন এই প্রথম হইল। হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী কায়স্থদের একত্র ভোজও হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চালাইবারও চেষ্টা হইতেছে। আগামী বৎসর কলিকাতায় এই সভা বসিবে।

কামাখ্যায় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল। সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় বাঙ্গালার একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখক। তাঁহার বক্তৃতায়, উপযুক্ত বরকত্তা নির্বাচন দ্বারা জাতির উন্নতির প্রয়োজনীয়তা, এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিলাতেব ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের আদর্শে একটি সভা স্থাপনের আবশ্যিকতা, প্রধানতঃ এই দুটি বিষয়ের আলোচনা ছিল।

চিত্র-পরিচয়

পূর্ণিমার রাত্রে রাজকুমারী পরিচারিকার সঙ্গে বিজন অধিত্যকায় পূজা করিতে আসিয়াছেন। গিরিগাত্রে গুহার অভ্যন্তরে মহাদেবের মূর্তি—সে মূর্তি সর্বাস্তবধামীর চিরুমাত্র, ষাঁহার সন্তায় বনম্পতি গিরি সরিং প্রাণবান তাঁহারই চিরুমাত্র। এই স্থানে যেন মহেশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইয়াছে—কৈলাস পর্বতের একান্তে মহাদেবের আশ্রম; তিনি চন্দ্রচূড়, পূর্ণচন্দ্র মেঘাবরণে ধূজটির ললাটিকা চন্দ্র-কলার শ্রায় প্রতীয়মান হইয়াছে; তিনি গঙ্গাধর, নারায়ণের চরণচ্যুতা ব্রহ্মার কমণ্ডলুখলিতা গঙ্গাধারা ধূজটির জটাজালে আশ্রয় লইতেছে এবং ভগীরথের স্তবতুষ্ঠা পতিত-পাবনী ধারা জননীস্তম্ভধারার শ্রায় শুভ্রশীতল প্রবাহে ধরাতল ধস্ত করিয়া যাইতেছে—সেই ক্ষীণ জলধারাটি চিত্রে পর্বতগাত্র হইতে ক্ষরিত হইয়া মূর্তির মস্তকে পড়িয়া চিত্রের দক্ষিণ দিক দিয়া বক্রকূটল রেখায় উপলবিষম গতিতে বহিয়া উদ্ভিদহরিতে ছইকুল মণ্ডিত করিয়া বহিয়া গিয়াছে। আর পূজারিণী যেন সাক্ষাৎ তপস্তানিরতা উমা, যোগীশ্বর মহাদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য পাণ্ড অর্ঘ্য নৈবেদ্য পূজা লইয়া তদগতচিত্তা—তাঁহার আরত্ৰিকপ্রদীপের স্বর্ণশিখা শিবমন্দিরের দীপশিখার দিকে অকম্পিত উজ্জল দৃষ্টিতে

চাহিয়া আছে; পূজারিণীর আরত্ৰিকদীপের শিখার আশ্রয় আর পূজারিণীর মন্দিরের দীপশিখার আশ্রয় একই ভাবে একই দীপ্তিতে সমুজ্জল, পূজারিণীর পূজা পূজ্যের চরণে গৃহীত হইয়াছে ইহা তাহারই স্মৃতি। তাঁহাদের মিলনানন্দে সমস্ত প্রকৃতি আলোকে আনন্দে উৎসবশিহরণে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

এই চিত্রখানির অন্তরের ভাবটি আমরা এইরূপই বুঝিয়াছি।

এই চিত্রখানি মোগল চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির প্রভাবগ্রস্ত রাজপুত চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহা খুব সম্ভব ষষ্ঠীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদি

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিকার।

শীতের মধ্যাহ্ন। হিমবর্ষণসমুচিত গাছগুলি ফুলফলহীন ডাল-পালা ছড়াইয়া নির্মেষোজ্জল রৌদ্রটুকু সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া লইতেছিল। গ্রামের ঘনছায়াচ্ছন্ন বনপথটীতে বৃক্ষব্যবচ্ছেদপথে সূর্য্যাকিরণ প্রবেশ করিয়া ক্রম মুখের ক্ষীণ হস্তের শ্রায় প্রতিভাত হইতেছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া ঘুঘু তাহার করুণ তান অশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছে। পক্ষপত্রপূর্ণ দীর্ঘ সরল নিম্ন বৃক্ষের ডালে বসিয়া বহু কপোতদম্পতী তাহাদের পরস্পরকে যাহা বলিবার আছে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাই তাহাদের কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট কূজনে বৃক্ষতলটি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। পথের পার্শ্বে বিকসিত সজিনা বৃক্ষে মোমাছিদলের আনাগোনা ও গুঞ্জনের বিরাম নাই, মধ্যে মধ্যে একটা একটা দম্কা বাতাসে পক্ষ পত্রগুলির সঙ্গে ফুলগুলি পথে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বনে দোয়েল, শালিক, ছাঁতার, বুলবুলি, হাঁড়িটাচা প্রভৃতি বহু পাখীগুলি যথাসাধ্য গোলযোগ করিয়া তাহাদের মাধ্যাহ্নিক আরামটুকু

বেশ জমাইয়া তুলিয়াছিল। বনান্তরালে গ্রামখানি নীরব নিস্তর। পথের পার্শ্বে দ্বিবিজ গৃহস্থের বাটার ক্ষুদ্র অঙ্গন-টুকুতে গৃহপালিত কুকুরটা রোজে পা ছড়াইয়া আরামে ঘুমাইতেছিল। জীর্ণ চালের বাতায় ঝুলানো বংশপিঞ্জরে টিয়াপাখীটিও পাখা ছড়াইয়া রোজ পোহাইতেছে।

গভীর বনমধ্য হইতে দুইটা শীকারী গ্রাম্যপথে আসিয়া পড়িল। দুইজন্যর স্নেহে বন্দুক, হস্তে কয়েকটা মৃত পক্ষী ঝুলানো। একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল “দেবেন, এখনো চটেই আছ যে?”

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল “একি কম আপশোষ অমর!—অতগুলো চখা! তার একটা বই মারতে পারলাম না!”

“কেন? এতগুলো ভিত্তির, বটের মারা গেছে, তবু—”

“তা হোকনা—আহা সেই খাড়া চখাটা! মোবটা কিন্তু তোরি অমর, শীকার কর্তে গিয়ে আবার দয়া!”

“আহা” বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে গিয়াই অমর থামিয়া গিয়া কোতুলপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্শ্ব অঙ্গনে চাহিয়া রহিল। ব্যাপার কি দেখিবার অস্ত্র দেবেনও সেইদিকে চাহিল।

ক্ষুদ্র অঙ্গনস্থ আব্রবৃক্ষতলে একটা বালিকা বসিয়া খেলা করিতেছিল। একজন বর্ষিয়সী বিধবা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্নেহে বলিতেছিলেন “ছি মা, এমনি ক’রে কি ধুলোর খেলা করে, চুলগুলো যে ধুলোর মাখামাখি”—বলিতে বলিতে তিনি বালিকার পশ্চাতস্থ কুক্ষিত গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি তুলিয়া ধরিলেন। ক্ষুদ্র বালিকা তখন হাসি-হাসি মুখে মাতার পানে চাহিল। সে কি স্নন্দর সরল মুখখানি, কি হস্তময় স্বচ্ছ সুনীল চক্ষু, ধরিঙ্গের জীর্ণ অঙ্গনে যেন একটা গোলাপফুল ফুটিয়া উঠিল।

দেবেন অমরের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল “কি এত দেখেছিস?”

অমর মুখ কিরাইয়া হাসিয়া উত্তর দিল “তুমিও যা দেখেছ।”

“আমার তো আর নতুন নয়। চাক আমার বোনের মত! আমাদের বাড়ী কত দিন যায়।”

“চাক বুঝি ওই মেয়েটার নাম?”

“হ্যাঁ। বেশ দেখতে, নয়?”

“হ্যাঁ। এখন একটু শীগগির বাড়ী চল দেখি। এতটু চা না খেলে এখন আর কিছু ভাল লাগছে না।”

“হ্যাঁ চাএর কথা যা বলেছ—আঃ ঘুরে ঘুরে এমন পারে ব্যথা হয়েছে।”

কিছুদূর ঘুরিয়া উভয়ে একটা দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিল। দেবেন শীকার কেলিয়া বাস্তবসমস্ত ভাবে ষ্টোভ জ্বালিয়া চা’ব জল চড়াইয়া দিল, অমর ততক্ষণ খাটে হাত পা ছড়াইয়া জিরাইতে লাগিল। সহসা অমর বলিল “দেবেন, আব দেবী করা ভাল না ভাই, আমি কালই যাব, বাবা শেষে বকবেন।”

দেবেন তাড়া দিয়া বলিল “কি এত বকবেন, কাল পরশু দুটোদিন চোক্কান বুজে থাক। কতদিন আঁব তোর সঙ্গে দেখা হবেনা সেটা বুঝি একবারও মনে পড়েনা। যদি কখনো তুই সখ্ করে দেখা করতে আনিস বা আমি যাই তবেই ত। আমার তো কল্কাতা বাস শেষ হ’য়ে গেল।”

তারপরে যথারীতি উভয়ের চা পানাদি আরম্ভ হইল। পরদিন বৈকালে অমর দেখিল দেবেন ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স লইয়া উন্নয় মুখে কোথায় যাইতেছে। অমর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “কোথায় যাচ্ছ?”

“আমাদের একটা প্রতিবাসীর বাড়ী; তার মেয়েটাব ভাবি জর হয়েছে তিনি আমায় ডাক্তারে এসেছিলেন।”

“ওষুধ দিয়ে আসবে বুঝি?”

“হ্যাঁ, আমাদের মত এমন সব ডাক্তারকে সহায় সম্পত্তিহীন ভিন্ন কে আর ডাকে? মেয়েটার জবটা কিন্তু এফটু বৈকে দাঁড়িয়েছে, রেমিটেট কিবারের মত ধরণটা।—হ্যাঁ হ্যাঁ অমর, তুমি ত সে মেয়েটাকে কাল দেখেছ—নেই মেয়েটা। চল অমর দুজনে মিলে দেখে ওষুধটার ঠিক করিগ, অবস্থাটা খারাপ, অস্ত্র ডাক্তার ডাকবার তাদের ত সাধ্য নেই।”

অমর আগ্রহ সহকারে সন্মত হইল। আহা ভ্রমর স্নন্দর মেয়েটা! ঔষধের বাক্স লইয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেল।

জীর্ণ গৃহের মধ্যে একখানি নীচ তক্তপোষের উপরে অর্ধমলিন শয্যায় বালিকার অরতপ্ত রাঙা মুখখানি বেশ দেখাইতেছিল। পার্শ্বে স্নান মুখে তাহার মাতা বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। উভয় বন্ধু বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বোগী দেখিতে লাগিল। বালিকা অরুর ঘোরে অজ্ঞান অভিভূত। ঔষধ দিয়া, শুশ্রূষা সম্বন্ধে তাহার মাতাকে বেশ করিয়া উপদেশ দিয়া ছইজনে বাটা ফিরিল।

পরদিন সকালে অমরের কলিকাতা যাওয়া হইল। একটা বালিকার প্রাণটুকু তাহাদের হাতে। দেবেন একা সাহস করিতেছে না বা নষ্টামী করিয়া তাহাকে যাইতে দিতেছে না। বাহাই হোক অমর বাইতে পারিল না। ছইজনের অশ্রান্ত চেষ্টায় ও যত্নে সাতদিনে বালিকার অরত্যাগ হইল। বিধবার অজ্ঞান মেহশীর্কাদ উভয়ের মন্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল। অমরের পবিচয় লইয়া বিধবা তাকে স্বজ্ঞাতি জানিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলেন। কতকাল বসিলেন “চাক একে প্রণাম কর, ইনি তোব দাদা হন।” বালিশের উপর হইতে মাথা নোয়াইয়া বালিকা প্রণাম করিল। অমর হাসিমুখে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। চাকর বরস এগার বৎসরের বেকী নয়।

অমর কলিকাতায় চলিয়া গেল। আবার কলেজ যাওয়া লেকচার শোনা, বক্তৃতায় মাতা, থিয়েটার দেখা প্রভৃতিতে পল্লীর ছদ্মবেশে অবসর দীর্ঘ ভ্রমণের আমোদ ও অস্ত্রান্ত ঘটনা স্বপ্নের স্তায় মনের এককোণে সরিয়া গেল।

অমরের পিতা হরনাথ বাবু মাণিকগঞ্জের জমিদার। প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড যুড়ী এবং প্রকাণ্ড ভূঁড়ির অধিপতি হরনাথ বাবুর নামে সকলে জড়সড় হয় কিন্তু মাতৃহীন পুত্র অমরনাথের নিকটে তিনি একাধারে পিতা মাতা উভয়ই। পুত্র যখন যে আবদার ধরে মেহশীলা মাতার স্তায় তিনি ব্যগ্রভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়া পুত্রের হর্ষোৎফুল্ল মুখের পানে সন্মুখ নেড়ে চাহিয়া দেখেন। মাতার অভাব অমরনাথ কখনো অনুভব করে নাই। আবার তিনি অতি সদাশয় জমীদার। তাহার মুক্তহস্ততা এবং অপরিমিত ব্যয়শীলতার তাহার প্রবল প্রতিপক্ষ বঙ্গগোষ্ঠীও স্বীকার করিত, যে এইসব কারণে এবং প্রজাদের কিছুমাত্র শাসন না করায় তাহার জমীদারীর

আয়-আর বাড়িতে পায় নাই। আত্মীয়পক্ষ বলিত যে তিনি নগদ টাকাও কিছুমাত্র জমাইতে পাবেন নাই। বঙ্গগোষ্ঠী অবশ্য ইহা স্বীকার করিত না।

• পূজার সময়—অমরনাথের বাটা বাইবার উজোগের মধ্যে সহসা একদিন বন্ধু দেবেন্দ্র অমরনাথের কলিকাতায় বাসায় আসিয়া উপস্থিত। পূজার বাজারের দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে অমরকেও সে প্রায় চিনিয়া লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে সেবার ছুটিংসব। দেবেন ডাক্তারি পাশ হইলে তাহার মাতা “মাকে” আনিবেন এই তাহার বড় সাধ ছিল। দেবেন এখন তাহার সেই সাধ পূরাইতে অমরনাথেরও সাহায্য চাহিল, তাহার ভাই নাই, অমরই তাহার ভ্রাতৃস্থানীয়—তাহার মাতার কার্যে অমরেরও একটু খাটিয়া দেওয়া উচিত। অমর আর আপত্তি করিতে পারিল না। বাহার মা নাই সে জগতের “মা” শব্দ মাঝে এমনি বিগলিত হইয়া পড়ে।

পূজার কয়দন বড় আনন্দে কাটিল। অমর যদিও তাহাদের বাটার পূজা হইতে এগবীর ঘরেব উৎসর্গে অনেক ক্রটি দেখিতে পাইতেছিল কিন্তু বাহাতে সব ক্রটি ঢাকিয়া যায় সেই অনাড়ম্বর হস্ততার পুত প্রভায় সমস্ত জিনিষই যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। সামান্য গ্রাম্য যুবকের মতন সেও যুদ্ধ হৃদয়ে যখন সকলেই ফর্মাসে ঘোরা ফেরা করিতেছিল তখন গ্রামস্থ মহিলাগণের আর বিশ্বয়ের সীমা ছিল না। কেহ এ বিষয়ে তাহাকে কিছু বলিলে তাহা কিন্তু তাহার অসঙ্গত লাগিতোছিল। সকলের সহিত তাহার প্রভেদ যে কোথায় নিজে সে তাহা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বিজয়ার রাতে প্রতিমা বিসর্জনের পরে ঘরে ঘরে বৎসরের মঙ্গল, সম্ভাষণ প্রণাম আশীর্বাদ ও আলিঙ্গনের রূপে প্রবাহিত হইতেছিল। দেবেন অমরকে বাহবেষ্টনে বাঁধিয়া বলিল “নিতান্তই আজ চলি?”

“হাঁ ভাই!—বাবাকে যদিও লিখেছি সব, তিনি কিছু বলবেন না, কিন্তু আমি আমি, পুজোর আমায় না দেখলে তাঁর মন ভাল থাকে না, আর—”

“আর নিজেও থোকা আছ একটু, নিজেরও মনটা কেমন করে, না?”

“তাও ঠিক ভাই!—বাঃ—মেরেটিত ভারি সুন্দর।
কাদের মেরে রে দেবেন?”—

দেবেন চাহিয়া দেখিল একদল বালিকা তাহাদের নিকটে
অগ্রসর হইতেছে, তাহার মধ্যে নীলাশ্বরীপবা বালিকাটিই
যে বন্ধুর চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে দেবেন নিমেষে তাহা বুঝিয়া
হাসিয়া বলিল “বল দেখি কে?”—

“কোথায় যেন দেখেছি বোধ হচ্ছে!—ওঃ—মনে
পড়েছে—সেই ষাণ্ড অংশ হ’য়েছিল”—বলিতে বলিতে অমর
সহসা ধামিয়া গেল।

বালিকার দল নিকটে আসিয়া তাহাদের একে একে
প্রণাম কবিত্তে লাগিল। দেবেন সকলকে হাসিমুখে সম্ভাষণ
করিয়া বলিল “বাড়ীর ভেতরে যা, মা মিষ্টিমুখ না
করাতে গেলে রাগ করবেন।”

দলের অগ্রবর্তিনী বালিকা বলিল “আমরা আগে সব
বাড়ী নমস্কার করে আসি।”

“তবেই আর-তোরা খেয়েছিল! সবাই আগে খাইয়ে
দেবে। সে হবে না।”

চাক্র মাথা হেঁট করিয়া মুহূর্ত্তে বলিল “দেবেন দা, মা
আপনাদের একবার ডেকেছেন।”

দেবেন ব্যস্ত হইয়া বলিল “সে তো আমরা তাঁকে প্রণাম
করতে যাবই। অমর চল!”

অমর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল “ট্রেনের সময় থাকবে ত?”—

“চের চের! চল!”

উত্তরে গিয়া দেখিল সেই জীর্ণ-গৃহের অঙ্গনে অন্নান
চক্র-কিরণে দরিদ্রা বিধবা দুইখানি আসন পাতিয়া যথাসাধ্য
জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া আছেন। অমর ও দেবেনকে
আসিতে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ যেন আশাব অধিক কৃতার্থতা
লাভ করিল। অমর তাঁহার অতিরিক্ত আদরে যেন কুণ্ঠিত
হইয়া পড়িতে লাগিল। বিধবা দেবেনকে বলিলেন “বাবা
দেবেন। তোমাদের ঋণ আমি শোধ করতে পাবব না।
তুমি যে তোমার গরীব কাকিমার কি উপকার করেছ—”

দেবেন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল “সে কি—সে
কি কাকিমা! আপনাকে যে আমি কাকিমা বলেই
জানি!—ও সব কথা থাক! এখন, অমরের ট্রেনের সময়
হ’য়েছে, আর দেবী করা নয়।”

বিধবা যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন দেবেনের তাড়া-
তাড়িতে তাহা আর বলা হইল না।

উত্তরে তাঁহাকে প্রণাম কবিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।
দশমীর শুভ জ্যোৎস্নায় গ্রাম্য পথ আলোকিত। গ্রাম্য
বালক ও যুবাবুন্দ তখনো আনন্দোচ্ছ্বাসে পথ বাট মুখবিত্ত
করিয়া বাড়ী বাড়ী নমস্কার কবিয়া বেড়াইতেছিল। কোথায়
কোন কৃষক যুবক ডুবকী বাজাইয়া গাহিতেছে—

“হর তুমি আরতো আমার পর নয়,
আমি সেবে দিয়ে ছেলে পেলাম জামাই আমার মৃত্যুঞ্জয়।
প্রাণ সমা উমা আমার, আজি হ’তে হ’ল তোমাব,
আদরে রাখিবে জানি তবু মাকে বলতে হয়।”

দেবেন সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল “ওঁর আর
আপনার লোক কেউ নেই বলে আমাকে ছেলের মত
জ্ঞাধেন, সব ভাব দেন, আমি কিন্তু কিছুই করতে পারি
না। দেখতেই ত পাচ্চ আমাবও অবস্থা। যাদের খেটে
খেতে হয় রাতদিন নিজের সংসারের ভাবনায় ব্যস্ত থাকে
হয় তাদের কোন ভাল কাজ বা পরের উপকার করার
উপায়ই নেই। কিন্তু বিধবাটি এমন ভাল মানুষ যে তাঁর
সঙ্গে একটু ভাল মুখে কথা কইলেও তিনি যেন তা
কাছে নিজেকে ঋণী বোধ করেন।”

অমর বলিল “সত্যিই বড় ভাললোক! মুখে যেন এবটা
মাত্রভাব মাখানো! আমাবও বড় ভাল লেগেছে। ওঁর
অবস্থা খুব”—

বাধা দিয়া দেবেন বলিল “সেজন্য নয়। মেরেটির দিই
দেওয়াব জন্তে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।”

“এখনি?—মেরেটি তো এখনো ছোট।”

“ছোট আর কই? বছর এগাব বয়স হবে। হিন্দু
ধর্মের মেয়ে আক কতদিন রাখা চলবে? বিশেষ সময়
থাকতে না খুঁজলে যদি শেষে একটা অঘোর হাতে মেয়ে-
টিকে দিতে হয়। মা একটা ভাল পাত্র দিতে পাবলে
নিশ্চিত হন কিন্তু অবস্থা তো তেমন নয়। তোমার একটু
উপকার কবতে হবে ভাই।”

অমর সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল “অত সুন্দর
মেয়ে, অবস্থা নাই বা ভাল হল, লোকে আদর করেই নেবে
নিশ্চয়।”

“না অমর, তুমি এখনো নাবালক দেখছি। পৃথিবী

সম্বন্ধে বুঝি তোমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে ? কোন বড় লোকের ঘরে বা ভাল ছেলের হাতে মেয়েটিকে দিতে পারা তুমি বুঝি খুব সহজ মনে করছ ? কপই বল আর গুণই বল সকলেব মূল রূপচাঁদ । মেয়েটির রূপের চেয়েও গুণ এত বেশী, এত নরম সরল স্বভাব ! কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই—ঘরে যে আদত জিনিষেরই অভাব !”

অমর একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল “বলকি দেবেন ! তোমার এই বুঝি এত দিনের শিক্ষার ফল ? জগতে সর্বত্রই কি ঐ এক নীতি !”

দেবেন ব্যঙ্গের স্বরে বলিল “বিশেষ বড় লোকদের ঘরে । গবীষ ভদ্রলোকও বা এক আশ জারগায় নম্রতার দেখিয়ে থাকে, কিন্তু বড় লোকদের ঘরে ঐ নীতি আবহমান কাল চলছে—চলবে !”

“অন্তায় বলছ দেবেন ! ছ এক জায়গায় তাই বটে সত্য, কিন্তু—”

“ভায়া ওসব গ্রন্থের নজীর রেখে কর্মক্ষেত্রে নেমে এস । কই ক'টা বড় লোকের ছেলে রূপ গুণ স্বভাবের আদর করে থাকে প্রমাণ দাও দেখি । ধব এই তুমি ! তোমার জন্তে কত লক্ষপতির ঘর থেকে সম্বন্ধ আসবে ! তুমি কি সেখানে রূপ গুণের কথা বেশী মনে রাখতে পাববে ?—রূপচাঁদের রূপই কি সেখানে সব চেয়ে বড় হবেনা ?”

“এ কথাটা আরও অন্তায় বলছ দেবেন !—বাপ মাতের ইচ্ছা, আত্মীয় স্বজনের অনুমোদন, এসব কথা মনে না রেখে কেবল টাকার কথাই তুমি ভাবছ ।”

“বাই হোক হরে দরে হাঁটু জল ! তোমাদের সুবিধাই তাতে !”

“আঃ—আমাকে কেন এব মধ্যে জড়াও ভাই, আমি কি করলাম !”

“কেননা সকলের ওপর ঝাল ঝাড়তে পারিনা, তোমার ওপর পারি !”

“এরই নাম ভবিষ্যদর্শন । আমি ত এখনো বড় লোকের মেয়ে বিয়ে কবিনি, করব যখন তখন বলো ! যাক্ আমাকে কি করতে বলছিলে যে ?”

“গরীবের একটু উপকার ! মেয়েটি ত দেখলে ! একটি ভাল পাত্র যদি সন্ধান করে দিতে পার ।”

সম্মুখে মলের কুতুবুদু শব্দ এবং কলগুঞ্জন শুনিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল বালিকার দল তখনো বাড়া বাড়ী নমস্কার করিয়া ফিবিতেছে । দেবেন ডাকিয়া বলিল “চাক ! তোদের বাড়ী আমরা খেয়ে এসেছি বে ।”

সকলগুঞ্জ নয়নে চাহিয়া চাক মন্তক নত করিল । কি সে সরল সুলভ দৃষ্টি !

অমর নীরবে গিয়া শকটে আবোহণ করিল । শকট যখন ছাড়িয়া দিল তখন সহসা মুখ বাহির করিয়া দেবেনকে বলিল “তুমি যা বলেছ মনে থাকবে । পাত্রেব চেষ্টা করব”—বাকী কথাটা চাকার ঘর্ষর শব্দে মিলাইয়া গেল ।

দেবেন নিজ মনে মূহ হাসিয়া বলিল “তা জানি !”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

স্বীকার ।

অমরনাথ পিতার মেহ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করাব পর শুনিল তাহার বিবাহের সম্বন্ধ । কত কালী-গঞ্জের জমীদার শ্রীমাধাকিশোর ঘোষের একমাত্র হুঁহিতা শ্রীমতী সুরমা দাসী, সুলভী এবং বরস্থা । হরনাথ বাবু নিজে গিয়া কত দেখিয়া পসন্দ করিয়া আসিয়াছেন । প্রবীণ দেওয়ান এই কথা বলিয়া বেশ করিয়া অমরনাথকে বুঝাইয়া শেষে নিজ মন্তব্য প্রকাশ কবিলেন “বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে ।”

অমরনাথের হাসি আসিল । বলিয়া ফেলিতেছিল “জমীদারি সেবেস্তাব কাজও জানে নাকি ?” পিতৃসম প্রবীণকে পরিহাসটা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া জিহ্বা সংবরণ করিল, কিন্তু তাহার মনে কেমন অশান্তি উপস্থিত হইতেছিল । পিতা নিজে দেখিয়া শুনিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন ইহাতে তাহার আপত্তি আর কি হইতে পারে ? তবু মন কেমন খুঁত খুঁত করিতেছিল অথচ তাহার কোন সঙ্গত কারণও দেখিতে পাইতেছিল না । ছ চারবার যেন মনে মনে বলিল এত শীগগির কেন, কিন্তু সামান্য এই অসন্তোষটুকুর জন্ত নিরঙ্ক হইয়া পিতাকে কিছু বলিতে পারিল না । বড় লোকের মেয়েকে বিবাহ করার পক্ষে কোন যুক্তি-যুক্ত বাধাও তো সম্মুখে উপস্থিত নাই, যে, সেই স্বয়ে

পিতাকে নিজের কোন আপত্তি জানাইবে। কোন গরীবের কন্তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ত পিতা ধনীর কন্তাকে বধু করিতেছেন না। অল্পপস্থিত কোন গরীবের উদ্দেশে এ নূতনতর ওকালতিতে সকলে হয় ত তাহার মন্তকে কোন স্নিগ্ধকর তৈল বা প্রলেপের ব্যবস্থা করিবে এবং পিতা ততোধিক বিষয়ে পুঞ্জের মুখের পানে চাহিয়া থাকিবেন। না, সুস্থ মস্তিষ্কে এ রকম খেয়ালের বেশে চলা যায় না। অমরনাথ এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে কার্তিক মাসের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিয়া অগ্রহায়ণ মাস পড়িতেই খুব সমারোহে অমরনাথের বিবাহ হইয়া গেল। উভয় পক্ষেরই একমাত্র কন্তা পুত্র, ধুমধামটা অতিরিক্ত পরিমাণেই হইল। হরনাথ বাবু খুঁজিয়া খুঁজিয়া এ সম্বন্ধ করিয়া-ছিগেন। বহুগোষ্ঠী বলিল “বুড়ো এইবার বড় দাঁওটাই মারলে গো।” অমর কেবল দেবেনকে এ বিবাহের সংবাদ দিতে পারিল না। কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও দেবেনকে জানাইতে তাহার বড় সজ্জা করিল। সে বেন নিজেকে দেবেনের কাছে শপথ ভঙ্গের দোষে অপরাধী মনে করিতে লাগিল।

যথারীতি পাকস্পর্শ ফুলশয্যা সমস্ত হইয়া গেল। অমরনাথ ফুলশয্যার দিন জড়সড় ভাবে কোন রকমে খাটের এক পার্শ্বে শুইয়া বাত কাটাটয়া দিল। তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল। কন্তাটা নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। তের চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে পারে। পুরুষের হিসাবে অমরনাথের এখনো বালকত্ব যায় নাই। ইহার পরে বধু যে কয়েক দিন বাটাতে ছিল অমরনাথ সে কয়দিন পাশ কাটাইয়া বেড়াইল।

তায়গরে বধুও বাপের বাড়ী গেল অমরনাথও পিতার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেল। মধ্যে বহু দেবেনের পত্র পাইল, সে তাহাকে তাহাদের গ্রামে একবার ঘাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছে। অমর পত্রের উত্তর দিল না। পূজার সময় অমর বাটা গিয়া শুনিব বধুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে তাই তাহাকে এখন আনা হইল না। পিতা অনেক চুপ করিলেন। অমরনাথের মনে হইল একখানা পত্র লেখা উচিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে বাক্যালাপও

হয় নাই সহসা তাহাকে কি বলিয়া পত্র লেখা বার। অমরনাথ মনে মনে বধুর সহিত আলাপের অনেকাংশ পত্র লেখা স্বগিত বাধিল।

বিবাহের পর দেড় বৎসর ঘুরিয়া গেল। অমরনাথ গ্রীষ্মাবকাশে বাটা ঘাইবার উদ্ভোগ করিতেছে এমন সময় বহু দেবেনের এক সাহুসর পত্র পাইল “একবার ঘনি না এস তো চিরদিন অল্পতাপ করিতে হইবে। নিশ্চয় আসিবে।”

অমরনাথ দেবেনের গ্রামে গিয়া পৌছিল। কটীর সম্মুখেই দেবেনকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিল “ব্যাপার কি?”

দেবেন দীর্ঘশ্বাস হঠসিয়া বলিল “ব্যাপার আর কি, কিছুতেই আসিস না, তাই একটু জ্বল করে আনলাম।”

অমর একটু দম লইয়া বলিল, “এ ভারী অজ্ঞান—এ কি ছেলেমানুষী!”

“ওঃ এতই কি অজ্ঞান? কার কাছ তে এনো অবাবদিহি করতে হবে না, তার ভয় কি!”

অমরনাথের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

বৈকালে দেবেন বলিল, “ওহে সেই মেয়েটাকে মনে আছে—সেই চাক?”

অমরের অন্তঃকরণটা আবার ধক করিয়া উঠিল, একটু থামিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, “কেন? কি হয়েছে? মেয়েটা মারা গেছে নাকি?” বলিতে বলিতে বহুদীর্ঘ-দৃষ্ট সেই রোগপাণ্ডুর মুখখানির উপরে হাসিহাসি স্রব শোথ ছুটি মনে পড়িয়া গেল।

দেবেন অমরকে বিমনা দেখিয়া দীর্ঘশ্বাসমুখে বলিল “না, না, মেয়েটা না, তার মা মরমর, আমি তাঁর চিকিৎসা করি। চল দেখতে যাবি?”

“চল, আহা—মেয়েটার বিয়ে হয়েছে তো?”

“বিয়ে? কই আর হ’য়েছে—যে গরীব, তাদের জাত যে টাকা লাগে। তুই যে বণেছিলি পাত্রের খোঁজ দেখে। তাই ত আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।”—

অমর লজ্জিত অল্পতাপভাবে মন্তক নত করিল। এ কথা তাহার আর মনেই ছিল না।

হুই জনে সেই বহুদিনদৃষ্ট অধিক জীর্ণতর গৃহে প্রবেশ কবিল। ক্ষীণা মলিনা বিধবা কল্পশয্যায়, পার্শ্বে সেই ক্ষুদ্র বালিকা, চাক। হাসি হাসি চোখ দুটির উপরে গভীর কালির রেখা পড়িয়াছে, স্নান শুষ্ক মুখ। অমর ভাবিল ‘আহা’। বালিকা তাহাকে দেখিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া বসিল। স্নান গণ্ড দুখানি একটু বাঙা হইয়া উঠিল। এমন সময়ে লজ্জা? মেয়েটা এমন নিরীক্ষা!

কণেক পবে যখন বিধবাব সংজ্ঞা হইল, দেবেন তাঁহার সম্মুখে বসিয়া উচ্চস্বরে বলিল “কাকিমা অমর এসেছে।”

ক্ষীণস্বরে বিধবা বলিলেন “কই?”

“এই যে” বলিয়া দেবেন অমরকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিল। অমর বিধবার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন নয়নের হর্ষোচ্ছ্বাসে বিম্বিত মুখে বসিয়া রহিল।

বিধবা অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন “চাক।”

স্নান আরক্ত মুখখানি নীচু করিয়া চাক মাতার সম্মুখে আসিয়া বসিল। বিধবা কল্পিতহস্তে তাহার ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া অমরের হস্তে স্থাপন করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিলেন “তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমার চাকলতা তোমার হল, ভগবান তোমাদের সুখী করবেন।”

অমরনাথ বিম্বিত, স্তম্ভিত, ভীত। তাহার অবশ হস্তে শুভ্র ক্ষুদ্র হাতখানি কাঁপিতেছিল, শোকাচ্ছন্ন নয়ন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু তাহার উপরে পড়িয়া মুক্তার মত টল টল করিতেছিল।

অমরনাথ বাক্শক্তি ফিরিয়া পাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল “আপনি এ কি বলছেন—জানেন না কি—”

দেবেন বাধা দিয়া বলিল “চুপ্ চুপ্ একটু থুম এসেছে, জাগিও না।”

অমর উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল “আমার যে অনেক বুঝাবার আছে—আমি যে—”

দেবেন বাধা দিয়া বলিল “এবপরে এরপরে অমর, তুমি অতি হৃদয়হীন।”

রাত্রে বিধবার খাস আরম্ভ হইল। আব সময় নাই দেখিয়া অমর তাঁহার বক্ষের উপর লুপ্তিতা রোরুদ্রমানা বালিকাকে একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়া তাঁহার মুখের নিকটে

গিয়া উচ্চস্বরে বলিল “আমি বিবাহিত! আপনি কি শোনেন নি? আমি বিবাহিত।”

বিধবার প্রবণশক্তি তখন সর্বনিয়ন্তাব চরণে গিয়া মিশাইয়াছিল। প্রাণ তখন দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে সেই ধ্যানে মগ্ন।

বিম্বিত দেবেন বলিল “সে কি অমর! তুমি বিবাহিত!—সে কি? আমি কিছু জানি না।”

“হয় ত জান না। আমি তোমার লিখি নি। কিন্তু এ কি বিভাট বাধালে! যখন গুব জ্ঞান ছিল তখনো গুকে জানাতে দিলে না—প্রকারান্তবে গুব মৃত্যু-শয্যায় আমাব কি শপথ করা হ’ল? দেবেন এ কি বিভাট বাধালে!”

“দেখর সাক্ষী, আমি নির্দোষ। তোমার অববিবাহিত জেনেই গুকে আমি প্রলোভিত ক’রে রেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার বাপের অমতের কথা বলছিলে।”

প্রভৃষে বিধবার প্রাণত্যাগ হইল। দেবেন লোকজন ডাকিয়া তাঁগকে সংকারার্থ লষ্টয়া গেল। অমরনাথ শোকাচ্ছন্ন বালিকাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে তাভাব নিকট বসিয়া রহিল। আশ্রয়হীনা অসহায় বালিকা মাটিতে লুটাইতেছে। হয় ত সে কিছু পূর্বে নিজেকে এত অসহায়, এত অনাথা বিবেচনা করে নাই। এখন তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষে অসীম পৃথিবী ধূম্কার ধাবণ করিয়াছে। অমর ভাবিতেছিল সে কি এই অক্লিষ্টকর ব্যাপাবে তাহার এই শোকের উপরেও নূতন করিয়া কিছু ব্যথা অনুভব করিয়াছে?

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। অমর বলিল “দেবেন, উপায়।”

“কি জানি” বলিয়া দেবেন নীরবে রহিল।

“তোমরা কি এব বিয়ে দিতে পার না?”

“পাত্র কোথায় পাব? টাকা নইলে কি বিয়ে হতে পারে।”

অমর বলিল “টাকা আমি দিব।”

“মার অমতে কি ক’রে রাখি? তিনি বলেন স্বজাতের মেয়ে নয়, কোথায় পাত্র পাব! তুমি ভিন্ন এখন আর গুর গতি নেই। এই এক মাত্র উপায় দেখছি, তুমি সঙ্গে

নিম্নে গিয়ে—তাল পাত্র হুঁজে বিরে দিরে দাঙগে। এখানে ফেলে গেলে ভূমি যে দায়িত্বটা মনে রাখবে সে ভরসা আর কই করতে পারছি।”

দেবেনের প্লেব ইজিতে বিরক্ত ও বিরক্ত হইয়া এবং আব গত্যন্তর না দেখিয়া এবং নিজ কৃতকর্মের ফল ভাবিয়া অগত্যা অমরনাথ চাককে লইয়া কলিকাতার চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

ঐনিকুপমা দেবী।

পুস্তক-পরিচয়

কাব্যকথা—

ঐনিকচন্দ্র বহু প্রণীত। ঢাকা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১৮০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৮ টাকা। মনসার গান ও পাঁচালী বাংলার বিশেষ নিম্ন বন; সতী-শিরোমণি বেহলা সংস্কৃত পৌরাণিক কল্পনার বিশেষিনি নছেন, তিনি আমাদের নিতাই আপনার স্বপ্নের লোক; বেহলার পুণ্যচরিত্র ও উপাখ্যান এবং তাহার বর্ণনা বাংলা দেশের একেবারে ষাট আপনার জিনিষ। মনসমঙ্গল ত্রিশজনরও অধিক কবি ভিন্ন ভিন্ন জেলার নিজের মতো করিয়া কর্তন করিয়াছেন—তাহার উপাখ্যানের লক্ষ্য ঠাহারিকে সংস্কৃত পুরাণের কাছে ভিকার ধীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই। এইমত মনসামঙ্গল আমাদের বাংলা দেশের ধাস কাব্য; এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা বেহলা সতীকে আপনার কস্তা বলিয়া দাবী করিতে আত্ম প্রত্যন্ত ব্যস্ত। সেই আমাদের বঙ্গবধু বেহলার পুণ্যকাহিনী, বাণিজ্যলীর চাঁদ বর্ণের একমিষ্ট ভক্তি ও ধর্মভাব, বাঙালীর সমুদ্রব্রাজ্য ও বাসিন্দা, হুলাই স্বামীর সমুদ্রে নৌকাচালনা, প্রভৃতি বাঙালীর অমূল্যদ্রুত গুণের কাহিনী যে-মনসামঙ্গলের উপজীব্য, সেই মনসামঙ্গল কাব্যের আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে মনসামঙ্গল-রচয়িতা প্রধান কয়েকজন কবির পরিচয়, মনসামঙ্গল ইতিহাস, ঠাহাদের রচনার বিশেষত্ব ও কবিত্ব, ঠাহাদের ভৌগোলিক জ্ঞান, রসগৃহীতা ও তৎকালীন সমাজচিত্রণ, কাব্যবর্ণিত নরনরীর চরিত্রবিশেষণ ও বিশেষত্ব নির্ধারণ, এবং মনসামঙ্গলের ইতিহাস ও মূল নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বহু অনুসন্ধান, হুম্ম পর্থাৎবক্ষণ এবং সম্ভব বিচক্ষণতার সহিত বিবৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। এই ভাগে বর্ণিত প্রাচীন বঙ্গের শিকা সভ্যতা, রীতি নীতি, রন্ধন খাদ্য, নাম পরিচ্ছন্ন, ভূগোল ইতিহাস, কথা বার্তা প্রভৃতি পাঠ করিতে বিশেষ কোতূহল ও আনন্দ হয়। দ্বিতীয় ভাগে পাঁচালীর চিত্রময় উপাখ্যানটি গ্রন্থকার নিজের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থ বাধারণ ও বিচক্ষণ উভয়প্রকার পাঠকেরই উপযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও রচনারীতি ভালো। মুদ্রাক্ষর ও প্রায় নিভুল। কেবল শার্জিনের নোটগুলি অতিরিক্ত বাহুল্যে, লাইনে লাইনে নোটের ছড়াছড়িত, পাঠের বিশেষ বিঘ্নের কারণ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ শার্জিনের নোটকটক সমূলে বর্জন একান্ত বাঞ্ছনীয়,

এবং গ্রন্থের পূর্বভাগে এতদপেক্ষা একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাত্মক অবলম্বন করিলে গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইবে।

আমার-জীবনের লক্ষ্য—

ঐরাবতলাল সরকার প্রণীত ও প্রকাশিত। ডিমাংই অষ্টাংশিত ৩৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা। এখানি উপভাস। নায়কের উচ্চ ভাব ও মহৎবীরত্বপূর্ণ জীবন এমন সব ঘটনাপ্রসঙ্গের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে একমিকে যেমন নায়কের আদর্শ মনকে আনন্দ দেশ অপর-দিকে তেমনি দেশের বিবিধ কুপ্রথা, কুসংস্কার ও কাপুরুষত্ব সম্বন্ধে মনকে ভাবিয়া বুঝিবার যুক্তিচিন্তার প্রবর্তিত করে। পুস্তকখানি ঘটনাবৈচিত্র্যে আগাগোড়া কোতূহল জাগাইয়া রাখে, নায়কের adventurous জীবনকাহিনী এক নিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত জানিয়া সইবার আশ্রয় হয়। কিন্তু রচনার মধ্যে উপভাসের কোনো আঁট নাই বিচিত্র চরিত্রের-লীলা, রনমুখের বিরোধ বা ঘটনার অবশুত্বাবিধ ইহাতে নাই; বর্ণনা স্থানে স্থানে বক্তৃতায় পরিণত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে নায়কের আত্মপ্রকাশ পরিণত হইয়াছে। রচনার ভাষাও শুধু ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন নহে।

বার-ভূঞা—

ঐআনন্দনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬ সাগর ধরেঃ লেন হইতে ঐবতীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ২৫৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১১০, বাঁধা ১১০ টাকা। ষ্টীল বোড শতাব্দী বলে দেশের পৌরবের যুগ। সেই সময় বঙ্গদেশ স্বাধীনতার মুকুটে মহাবিধিত, বাঙালী রণপাণ্ডিত্যে দুর্দ্ব হইয়া উঠিয়াছিল। বাহার ফলে প্রান্তের একচ্ছত্র সম্রাট আকবর চিহ্নিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে বারো জন ভূখানী স্বদেশকে পৌরবাধিত করিতে চেষ্টা ছিলেন ঠাহারা বার-ভূঞা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই বার-ভূঞার মধ্যে তনেকেই কারয় ছিলেন এবং এককণাব অনেক কারয়ের পূর্ব-পুরুষ। হতরাং বারভূঞার ইতিহাস আমাদের আপনার ইতিহাস,—তাহা লক্ষ্য ইতিহাস নহে, আনন্দের ও পৌরবের ইতিহাস, তাহা পাঠ করিলে মনে আশার সঞ্চার হয়, আত্মপ্রত্যয় জন্মে, আপনাদের অতীত সবিধা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার মন বললাভ করে। আনন্দবাবু ইয়েঞ্জি বাংলা, কানি বত রকম ভাষায় বারভূঞা সম্বন্ধে বত কিছু আলোচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে তৎসমস্তই সংগ্রহ করিয়া, তুলনা কবিতা বিচার করিয়া নিজের স্বাধীন অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সত্য-নির্ণয়ে নত্বরণে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে পূর্বগর্তী বহু লেখকের সহিত তাহার মতভেদ হইয়াছে, তিনি অনেক নূতন মত স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দৃষ্টে প্রতিষ্ঠিত নহে; গ্রন্থকার নিজের অক্ষমতা মানিয়া লইয়া সকল মতের তুলনার সমালোচনা ও বিচারে সত্য আবিষ্কার করিবার লক্ষ্য বিশেষজ্ঞগণকে ভার দিয়াছেন। পরিশিষ্টে ইতিহাসসংক্রান্ত স্থানের ভূগোল পরিচয় দেওয়াতে গ্রন্থখানি অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—

ঐবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক চন্দ্রবর্তী টাটার্জি কোম্পানী, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১৩১ পৃষ্ঠা। মূল্য ১১০। এই গ্রন্থে নয়টি সম্ভর্ড আছে—(১) ইতিহাসের উপদেশ, (২) বিদগ্ধ, (৩) গ্রীক ও হিন্দু, (৪) ইতিহাসে শিখ জাতি, (৫) আধুনিক ভারত, (৬) বীরত্ব, (৭) ইতিহাসবিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা; (৮) ভালে-জাতিয়ার সমৃদ্ধির যুগ, (৯) ইউরোপ ও ভারত। গ্রন্থপ্রারম্ভে মনোবী ঐবল্লভ রামেন্দ্রনাথ জিবেদী মহাশয় কুদ্র অথচ স্থলর ভূমিকার প্রকল্পে এই পুস্তকের মূলমন্ত্রটি ধনিয়া দেখাইয়াছেন—“ইতিহাসকে কেনলমাত্র

ঘটনাপঞ্জী মনে করিয়া যাহারা ইতিহাস আলোচনা করেন তাহারা দ্ব্যর্থীয়া। বহু সহস্র বৎসরের মানবজাতির মৰ্মকথা ইতিহাসমুখে প্রকাশ পায়; মানবজাতির বিরাট পুরুষের জংশন ইতিহাস দ্বারা কর্ণপত হয়; সেই পুরুষের তপ্তনিশাস ইতিহাসমুখে বহির্গত হয়। হিরণ্যবান মানব তাহার শত শতাব্দের বার্ষিক অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যে ভ্রমোদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার বলে গুরুপঙ্খীর উপদেশবাণী প্রচারিত করে, তাহা ইতিহাসের মুখে শুনিতে পাই। বাস্তবিক ঘটনাপরম্পরার ষাটপ্রতিষাতে মানবজীবনের যে মূলমুহুর্তি দেশকালের পরিবেষ্টনের মধ্যে এক একটি জাতিতে বিরীয়া বিচিত্র বুননে জাল রচনা করে তাহার দ্বারা মনুষ্যজ্ঞের নিত্য সত্যটিকে ছাঁকিয়া তোলাই ঐতিহাসিকের কাজ—কেবলমাত্র ঘটনার নির্বাক রচনা ঐতিহাসিকের কাজ নহে। বড়ই আনন্দের কথা যে যে মাসে আমরা সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” প্রকাশ করিতেছি, সেই মাসেই আমরা বিনয়বাবুর “ঐতিহাসিক প্রবন্ধ” সমালোচনা করিতেছি। ইহা significant বলিয়া মনে হইতেছে। বিনয়বাবু ভূমিকায় বলিয়াছেন—

“বৈজ্ঞানিকের রীতিতে ইতিহাস আলোচনার প্রবৃত্ত হইলে এই কর্ণটি সত্য আবিষ্কৃত হয়—

“প্রথমতঃ মানব কখনও কোনো দেশেই সার্বজনীন চরম সত্যের উপলব্ধি করে নাই। সকল যুগেই মানবসমাজ কালোপযোগী সমস্তার মীমাংসা করিয়া সাময়িক ও আদেশিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে মাত্র।

“দ্বিতীয়তঃ, কোনো জাতিই জনগণকে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তিরূপে বিকাশ লাভ করে নাই। জাতীয় চরিত্র ও জাতি বিভিন্ন জাতির পরস্পর ষাটপ্রতিষাতেই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও এক জাতির উন্নতি অবনতিতে সমগ্র বিশ্বেরই ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

“তৃতীয়তঃ মানবের জীবনীশক্তি সর্বত্র এবং সকল যুগে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেখা দেয় নাই। বর্ষ সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য কলা প্রভৃতি সত্যতার বিচিত্র অঙ্গে মানবজীবনের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও এক প্রতিষ্ঠানের অভাবে সমগ্র জাতীয় জীবনই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া বাইতে পারে।

“ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনার এই কর্ণটি সত্যের প্রয়োগ আবশ্যিক। *** আমাদের সর্বপ্রথম মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ ভারতীয় মানবের ইতিহাস এখনও তাহার শেষ অধ্যায় প্রকটিত করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, অন্তান্ত সমাজের দ্বারা ভারতীয় সমাজও (প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত) সমগ্র বিশ্বের শক্তিপুঞ্জ অধীকার করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে একাকী বিকাশ লাভ করে নাই; তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা যুগে যুগে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ও ভাবসমষ্টির অভ্যন্তরে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বকীয় স্বাভাব্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে।”

ইতিহাসের মৰ্ম্ম ও রসজ্ঞ পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে আনন্দ লাভ করিবেন নিঃসন্দেহ।

রাজপুঞ্জা—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। নামেই বিশ্বের পরিচয়, রচনা পুঙ্খ। সাহিত্যে স্থায়ী হইবে না।

কবিতাগুচ্ছ—

শ্রীজগদীশ ঘোষাপাথার প্রণীত। মূল্য দুই আনা। অতি সাধারণ রকমের উপদেশ ও তত্ত্বমূলক পদার্থ ও জীবজন্তু সম্বন্ধীয় শিশুপাঠ্য রচনা।

প্রবন্ধকুসুম—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ইতিহাসের কর্ণকটি ঘটনা ও চরিত্র লইয়া নাই। ছাপা বিক্রী।

বর্ণশিক্ষা—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস বহুদর্শী আইভেট টিচার এক আনা। প্রবন্ধকার স্বয়ং পুস্তকের সার্বিকভাবে লিখিয়াছেন যে ইহা “স্বকোমলমতি বা শিক্ষার স্তম্ভর পুস্তক।” তিনি অপরের মত নাই। এবং উচ্চশিক্ষার কুবীজ হজ্জমে অক্ষ উপর তাহাব বড় আঁহাও নাই; তিনি বড় ভুবাধিপের আশা ভরসা করেন। তথ্যস্তু। ইহা শিক্ষা হইতে পারিবে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় বর্ণসম্বোধনা ও বুজাকর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পয় শিক্ষার্থীর ঐতিকর হইবে আশা করা যায়।

গল্প চারিটি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক—পাথার, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫, অপার চিংপু ইহাতে রাসমণির ছেলে, পদব্রজ, বর্ণহরণ ও মা আছে। শেষের গল্প দুটি ১৬০০ সালের বঙ্গা সম্রাতি ভারতী পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল পরিচয় প্রদান, অনাবশ্যক। “রাসমণির ছেলে” নিম্নকণ্ড করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ডঃ ক্রাঃ ১ মূল্য দশ আনা।

শিশির—

শ্রীভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক বসিহাট। ডঃ কুলক্যাপ ১৬ আশিত ৩৮+ আনা। এখানি কবিতা পুস্তক। মলিনা, ত নামক পাঁচটি কল্পিত বালক বালিকার চুখকাহি সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য ইহা বাল্য উপভোগ্য। প্রকাশক মহাশয় একটি উপায়ের বিষয় ও বিশেষণ বিবরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের পরিচয়—“শিশুর চক্ষে সুখী প্রকৃতি চিরায়ী, ভাবময়ী ও মধ্যে জগৎ আছে, তরলতা কলকল নদীনিবর্ত সত্যই মানবের সঙ্গে ভাববিনিময় করে, হৃদয়ে হৃদে হর্ষ প্রকাশ করে.....শিশুদিগের নি বিশ্বাসযোগ্য।.....সবগুলির নাথক বা নারি কবিতাই বিরোধান্ত।.....শিশুর জগৎ পয়ের হয়, তখন তাহার কল্পনার চিত্রে অতি সহজে বিকশিত হইতে পারে এবং কালে তাহা সংকল হইতে পারে।.....শিশুর জগৎ জড়ের মধ্যে বলিয়া শিশু যত্নকে পার্থিব জীবনের শেষ বা না। বর্তমান পুস্তকে বহুদলে এই ভাব অল্প ...হাসিরাশি “রাগী” সমাজচিত্র...অবরোধের ভীত তাহার কল্পন বুদ্ধি বৃদ্ধির চক্ষেও জল ও জলগ্রাহী; ছন্দে লালিত্য ও পতি আছে

আধুনিক মাত্রাবৃত্ত রীতি অনুসারে ছন্দ অল্প স্বল্প পদ্য হইয়াছে ; এই সামান্ত ক্রটি পরবর্তী সংস্করণে সহজেই নিরাকৃত হইতে পারিবে।

আফগান-আমির-চরিত—

শ্রী আবু নাসের সহীদুল্লা প্রণীত। প্রকাশক ইসলামিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, বোম্বাই, ঢাকা। ডিমাই অষ্টাংশিত ৩৬২ পৃষ্ঠা, ক্রুপাড়ে বঁধা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। ইহা আফগান-স্থানের পরলোক-গত আমির আবদুর রহমান খান মহোদয়ের সহস্রলিখিত আত্মজীবনীৰ অনুবাদ। ইহা হইতে আফগানস্থানের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইংরেজ সরকারের সহিত সম্পর্ক ও সংঘর্ষ, দেশের রীতি নীতি সভ্যতা, আমির সাহেবের স্তায়পরায়ণ সদাশয়তা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং প্রায় বিতুঙ্গ বাংলা।

কুশুম-সংগ্রহ—

লেখিকা শ্রীমতী বঙ্গমহিলা। মূল্য ১।০। এখানি হিন্দী পুস্তক। ইহার মধ্যে চার প্রকারের বিষয় আছে—(১) আধ্যাত্মিক বা গল্প ; (২) ব্রীশিকাসম্বন্ধী ; (৩) জাতিবর্ণন (৪) জীবনচরিত। এইসকল বিভাগের অধিকাংশ রচনাই রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ বাঙালী লেখকের রচনার অনুবাদ ; এবং কয়েকটি রচনা লেখিকার স্বরচিত। বাঙালী-মহিলা হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধ ও গল্প অনুবাদ ও রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা অতীব আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। লেখিকা হিন্দী সাময়িক পত্রিকার সমাদৃত প্রবন্ধরচয়িত্রী ; এবং সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই গ্রন্থ ভারতেন্দু-স্মারক গ্রন্থমালিকার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশ হওয়াতে।

মুক্তা-রাক্ষস।

নব বর্ষে

(নোঙচি)

সংসারে হেরি নূতন মাধুরী,
কালিকে ছিলনা এতো।
নূতন বরষে নূতন হরষ।
‘শিন্নেন্ ওমেদেতো’।

প্রাচীন ধরার জীনে আবাব
এসেছে শুভক্ষণ,
শুভ সময়ের শুভ সোপানে
আজিকে পদার্পণ।

শ্বেত-শতদল-তীর্থে যাইতে

মিলেছে নূতন ‘সেথো’,

নব বৎসর ! উৎসব নব।

‘শিন্নেন্ ওমেদেতো’।

কিরণ-সোপানে চরণ রাখিয়া

উর্দ্ধে উঠিব সবে,

স্বর্ঘ্যের সাথে হ’য়ে মুখোমুখি

দাঁড়াতে মোদের হবে।

অত্যায়ে আজি হান্তের তোড়ে

করিব বিসর্জন,

তাজা এ হাওয়ায় শিশু দিয়ে শুধু

ফিরিব অনুক্ষণ।

এবার মোদের যাত্রার পথে

হাসি আর আলো সাথী ;

জয় জয় জয় নূতন স্বর্ঘ্য !

জয় স্বর্ঘ্যের ভাতি।

জাগে নব শোভা নবীন শক্তি

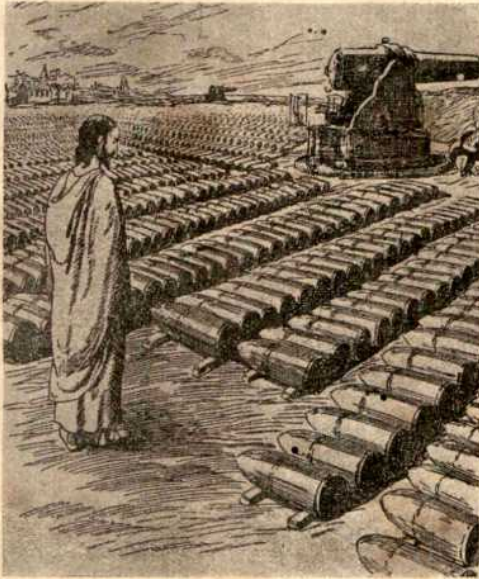
বিধির অভিপ্রেত

নূতন বরষে নূতন হরষ

‘শিন্নেন্ ওমেদেতো’।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

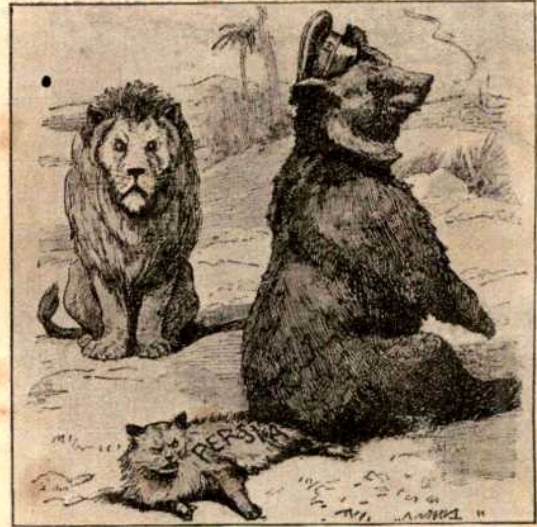
রহস্য-চিত্র



যীশু পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন,
কিন্তু দেখিতেছেন যে খৃষ্টীয় জগৎ কামান ও অত্যাচার
যুদ্ধের সরঞ্জামে পূর্ণ।



শাস্তিদেবী হিংস্র ও জার্মানীকে বন্ধন করিতে বলিতেছেন।



রুস-ভল্লুক ও ব্রিটিশ-সিংহের নিকট পারস-মার্জার
অভয় চাহিতেছে।



ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশসমূহ, এবং চীন, এই
তিন সাধারণতন্ত্রের সভাপতিত্বের নৃত্য ও গীত।

৬১ ও ৬২নং বোবাজার ষ্ট্রীট, “কুন্তলীন প্রেসে” শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



সরোবরতীরে হংস।
(একধানি প্রাচীন চিত্র হইতে)

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নাম্যাম্ভা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

২য় সংখ্যা

জীবনস্মৃতি

প্রভাত-সঙ্গীত ।

গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গল্পও লিখিতাম। সেও কোনো বাধা লেখা নহে—সেও এক-বকম বা-খুসি-তাই লেখা। ছেলেবা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেই রকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোট ছোট স্বপ্নায় বড়ীন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলোকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কি লিখিব সে খেয়াল ছিলনা কিন্তু আমি লিখিব এইমাত্র তাহার একটা উদ্দেশ্যনা। এই ছোট ছোট গল্প লেখাগুলো এক সময়ে বিবিধ প্রসঙ্গ নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে—প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাঠ্য দেওয়া হয় নাই।

বোধ করি এই সময়েই বৌঠাকুরাণীর হাট নামে এক বড় নবেল লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতি-দাদা কিছুদিনের জন্ত চৌরঙ্গি আজুথরের নিকট দশ নম্বর

সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহাব সঙ্গে হিলাম। এখানেও একটু একটু কবিতা বৌঠাকুরাণীর হাট ও একটি একটি কবিতা সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছি এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কি উলটুপালট হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোব বাড়ির ছাদের উপর অপ-রাহের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের স্নান করার উপরে সূর্যাস্তের আভাট জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলো পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি সারাক্ষেপ আলোক-সম্পাতেব একটা জাহ্নমাত্র? কখনই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়াছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে-শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছিলাম। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই ভগ্নত্বকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময় সুন্দর। তাহাব পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া ভগ্নত্বকে দর্শকের মত দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুঁচি হইয়া

উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেন্দ্র করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয় সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদরষ্টারের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেই-খানে বোধ করি ক্রী-বুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবাস্তবাল হইতে সুর্য্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত; আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিস্তার, আলোক একেবারে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্বরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্বরের মতই যেন উৎসাবিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিম্বা তাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা মশায় আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? আমাকে স্বীকার করিতেই হইত দেখি নাই—তখন সে বলিত, আমি দেখিয়াছি। যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, কিরূপ দেখিয়াছ? সে উত্তর করিত, চোখের সম্মুখে বিজ্জ্ব করিতে থাকেন। এরূপ মানুষ্যের সঙ্গে তত্ত্বালোচনার কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষতঃ তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু লোকটা ভালমানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, এস, এস। সে যে নির্বোধ এবং অদ্ভুত রকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিঃপ্রবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি তাহাকে দেখিয়া খুসি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম—সে তাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে, আমার সময় নষ্ট হইবে—তখন আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল এই আমার মিথ্যা জাল কাটিয়া গেল, এতদিন এই সঘর্ষে নিজেকে বারবার যে কষ্ট দিয়াছি তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া ঘুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমাব কাছে ভারি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গ-লীলাব মত বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষ্যের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাক্ষু্যকে সুবৃহৎভাবে শ্রবণ করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্য্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে,

শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোকব পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিশ্বের আব্বাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।

এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম :—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি

ভ্রমণ আসি সেখা করিছে কোলাকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অত্যাশ্রিত নহে। বস্তুত বাহা অসুস্থতাব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে জ্যোতিষদাদায়া স্থির করিলেন তাঁহার দার্জিলিঙে ফাইবেন। আমি ভাবিলাম এ আমার হইল ভাল—সদরষ্ট্রীর সহরে ভিড়ের মধ্যে বাহা দেখিলাম—হিমালয়ের উত্তর শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে।

কিন্তু সদরষ্ট্রীর সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আর্সল জিনিষ কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধকরি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাঙ্গ যত বড়ই অল্পভেদী হোন না তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না অথচ যিনি দেনে-গুয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্ত্তে বিশ্ব-সংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমি দেবদারুবে বুরিলাম, বরগার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশূঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রক্ত দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া এখন কোটা দেখিতেছি। কিন্তু কোটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক তাহাকে আর কেবল শূন্য কোটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাত সঙ্গীতের গান ধামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ “প্রতিধ্বনি” নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমন একটি ভাবাধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় কবিবার ভার লইয়াছিল। ইতোশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্ত আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারী যে বাজি জিতে পারিয়াছিল এমন আমায় বোধ হয় না। ইহার মধ্যে স্ত্রুথের বিষয় এই যে, দুজনের কাহাকেও হারের টাকা দিতে হইল না। হারের, যে দিন পদ্মের উপরে এবং বর্ষার মরে-বরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অত্যন্ত পরিকার রচনার দিন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে!

কিছু একটা বুঝাইবার জন্ত কেহত কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্ত কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে বুঝিলাম না তখন বিষম মুন্ডিলে গড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুকিয়া বলে কিছু বুঝিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে হয় ইহাতে বুঝিব কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, সে ত জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন; ইহার মানোটা কি? হয়, ইহার জবাব বন্ধ করিতে হয় নয়, খুব একটু ঘোঁরাশো কথিয়া বলিতে হয় প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ এমন করিয়া গন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মুন্ডিল এই যে, মাছুষকে যে কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে কথার যে মানে আছে। এই জন্তই ত ছন্দবদ্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলটপালট করিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, বাহাতে কথার ভাবটা বড় হইয়া কথার অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তুষণ নহে বিজ্ঞানও নহে, কোনো প্রকারের কার্জের জিনিষ নহে, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে—তৎজ্ঞান বিজ্ঞান কিম্বা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিষ মিশাইয়া দিতে পার ত দাত কিন্তু সেটা গৌণ। ঘেঁরা নৌকার পার হইবার সম্মত যদি

মাছ ধরিত্তা লইতে পারত সে তোমার বাহ্যুরি কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানোকা জ্বলে ডিঙি নয়—খেয়ানোকার মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিতাটা আমার অনেক দিনের লেখা— সেটা : কাহারো চোখে পড়ে না স্মরণ্য তাহার জন্ত কাহারো কাছে : আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালমন্দ যেমনি হোক এক কথা জোব করিয়া বলিতে পারি ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্ত সে কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর ভঙ্গকথা ফাঁকি দিয়া কবিতার বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। বাহার জন্ত ব্যাকুলতা তাহার আর কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

শুগো প্রতিধ্বনি

বুঝি আমি তোরে ভালবাসি

বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে, প্রিয়মুখ হইতে বিশ্বের সমুদয় স্তম্ভরসামগ্ৰী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া বাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতবে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালবাসি কেন না ইহা যে দেখা গেছে একদিন বাহার দিকে তাকাই নাই আর একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি এই জন্ত তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অনন্তের কোন্ একটি গভীরতম গুহা

হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরাব মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। শুণী যখন পূর্ণ হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বস্ত্রি যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পবিত্রাটিকে যেন অনির্বচনীয় রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানেই আমাদের প্রীতি ; সেখানে আমাদের মনও সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাধা, আকারে নির্দিষ্ট, তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমেব দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘবছাড়া করিয়া দেয়। ‘প্রতিধ্বনি’ কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কাবণ চেষ্টাটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।

আম্রা কিছু অধিক বয়সে প্রভাত-সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।—

“‘ভগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর’—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন ছন্দটা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে ছই বাহ বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায় যেমন নবোদগত-সন্ত শিশু মনে করতেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।

“ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাপ সঙ্গীর্ণ সীমা অবলম্বন কবে জলতে এবং জালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনো কিছুই মধ্যে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাত-সঙ্গীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেই ক্ষণে ওটাতে আব কিছুমাত্র রাচ বিচাব নাই।”

প্রথম উচ্ছ্বাসেব একটা সাধারণ ভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদেরকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়—বিলের জল ক্রমে বেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়—তখন পূর্বরাগ অল্পমাগে পরিণত হয়। বস্তুত অল্পরাগ পূর্বরাগেব অপেক্ষা এক হিসাবে সঙ্গীর্ণ। তাহা এক গ্রাসে সমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে চাখিয়া লইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সন্মুখকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিন্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অংশের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে বাহ্য-পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে—বাহিরের সহিত প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্বাঙ্গীন সত্য হইয়া উঠে।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত-সঙ্গীতের কবিতা-গুলিকে “নিষ্ক্রমণ” নাম দেওয়া হইয়াছে। কাবণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের রিখে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পবে স্নেহঃখআলোকঅন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্র ভাবে বিধেব মিলন ঘটাইয়াছে—অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চগিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছাবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব

একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরেব নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নশ্বাল ইক্ষুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম ঘন সজল নীলমেষ রানীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখন এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল—সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিলামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোন্মাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মত ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর ঘন স্তম্ভ হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতাব মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং বাত্রির অন্ধকারে যে মায়াপথঃ গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবেব সীমানা ছাড়িয়া রূপকথার অপরূপ বাজ্যে সাত সমুদ্র তেবোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন বৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার ধোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাশ্রু হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন সুরু হইল—চেতন তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুদ্ধ হৃদয়টার আবদারে অন্তরেব সঙ্গে বাহিরেব যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম সন্ধ্যা-সঙ্গীতে তাহারই বেদনা ব্যস্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধাব জানিয়া কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন, বাহাকে হাবাইয়া-ছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে হৃদয় কবিতা তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখন পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত-সঙ্গীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি কবিতা প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরো একটু বিচিত্র হইয়া সুরু হইয়া আবার আবে

একটা দুরূহতর সমস্তার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌছিতে চাহিবে। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পর্কে পর্কে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেব্রটা একই।

যখন সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গল্প “বিবিধ প্রসঙ্গ” নামে বাহির হইতেছিল। আর প্রভাত-সঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম কিঞ্চিৎ তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গল্প লেখাগুলি আলোচনা নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গল্পগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিন্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এই সময়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সম্বন্ধিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই এই সভার সভাপতি করা হইয়াছিল। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্ত গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন—আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মত লোককে পরিত্যাগ কর—“হোমবা-চোমরা”দেব লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না। এই বলিয়া তিনি এ সভায় বোণ দিতে রাজি হইলেন না। বন্ধিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক

পরিভাষা নির্ণয়েই আমবা প্রথম ইন্তক্কেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্ত্যন্ত সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণঅনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প আমাদের ছিল।

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল—হোমবা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এপর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নহে।

মাণিকভট্টার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ছিল সেখানে আমি যখনতখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম তিনি লেখা-পড়ার কঁজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনা-বশতই অসঙ্কোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে যুহুর্ন্তকালও অগ্রসর দেখি নাই। আমাদের দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারংপক্ষে তিনি আমাদের প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড় প্রশ্ন তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্তই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিষ পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যেসব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি

পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক এক দিন সেই রূপ বোন একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা-ভাষারীতি ও ভাষান্তর সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভাল করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল কবিতা বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করা হয়। লওয়া যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্যপরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তিদ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মহত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মত অর্ধাটীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাম্ভিক্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড় বড় বিষয়ে আলাপ করিতেন—অথচ ভেজবিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এমন কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে “যমের কুকুর” নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম; তখনকার কালের আর কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং ত্রুটি প্রসন্ন পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধা বোশে তাঁহার রক্ত মূর্তি বিপৎজনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায় সেনেটসভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস গঙ্গা ছিলেন, কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান। বড় বড় মহের সঙ্গেও ছদ্মবুদ্ধি কখনো তিনি পরাভূমুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এপ্রিয়াটিক সোসাইটি সভায় গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ববিদেষ্টা জর্জপারায়ণ অনেকেরই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহাব

যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায়, যে, যে ব্যক্তি যত্নমাত্র ক্রমশ তাঁহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী, আব যত্নটি বুঝি অনাবশ্যক শোভা মান। কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিত নিশ্চয় কোন্ এক দিন সে মনে করিয়া বলিত—লেনার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাংলা দেশের এই একজন অসামান্য মনস্বীপুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইহার মৃত্যুব অনতিকালেব মধ্যে বিষ্ণুসাগরের মৃত্যু ঘটে—সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগ-বেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না এই জন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু

সম্প্রতি কেবল আমি জর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুখাসনে বসিয়া শান্তিভোগ করিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম “ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু” এই প্রশ্নটির নীমাংসা উপলক্ষে ব্রাহ্ম-ব্রাতাদিগের মস্ত একটা সভা বসিয়াছিল। আমার মতে ঐ সোজা কথাটার নীমাংসার জন্য ওরূপ বৃহৎ আড়ম্বরের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। সত্য কথা যদি বলিতে হয় তবে উহা এক প্রকার মশা মারিতে কামান পাতা। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটিকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্ম-ব্রাতাদিগের মধ্যে বৈরূপ কর্ণ-বিত্রাস্তকারী বাদপ্রতিবাদের বাস্তোত্তম মেদিনী সম্পাদন করিতেছে—সমস্ত গোল ছই কথার মিটিয়া গিয়া নিমেষের মধ্যে ছদ্ম-কে-ছদ্ম জল-কে-জল-হইতে পারে শুদ্ধ যদি কেবল হিন্দুশব্দের প্রকৃত

অর্থ এবং তাৎপর্য কি তাহা একটু স্থির চিন্তে ভাবিয়া দেখা যায়।

পূর্বতন কালে আমাদের দেশে ব্রাহ্মবর্ষ ছিল, আৰ্য্যাবর্ত ছিল, দাক্ষিণাত্য ছিল, কিন্তু, তাহার মধ্যে কোন্ স্থানটা যে হিন্দুস্থান তাহা তখনকার ভারতবাসীরা চক্ষেও দেখে নাই—কর্ণেও শোনে নাই। পূর্বে আমাদের দেশে হিন্দুস্থান বলিয়া যেমন কোনো স্থান ছিল না, তেমনি, হিন্দুজাতি বলিয়া কোনো জাতি ছিল না, তথৈব, হিন্দুধর্ম বলিয়া কোনো ধর্ম ছিল না। যদি ষষ্ঠী-দুর্গা দ্বিবিয়া তন্ন তন্ন কবিয়া অমরকোষ অভিধানের পাতা উন্টাইয়া দেখ— দেখিবে যে তাহার কোনো পদপৃষ্ঠার কোনো ছত্রে হিন্দু-শব্দের চিহ্নমাত্রও নাই। দেশীয় ভাষা ব্রাহ্মণ গুপ্ত দুর্গ-প্রাচীরে হিন্দুশব্দের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার কর্তা যে কে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহার কর্তা আর কেউ না—মুসলমান তলোয়ার! অতএব হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় তবে একজন মসজিদের মোল্লা-সাহেবকেই তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত; তা বই, তাহার অর্থ কোনো টোলের ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর ছা'ন অতি চমৎকার! তিনি নম্র লইয়া বলেন “হীনং দুবরজীতি হিন্দুঃ” হীন জাতিদিগের আচার ব্যবহার বাহাদেব চক্ষে দৃষ্ট তাহারাই হিন্দু। তাই বলি যে, আগেভাগেই “হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ কি” জিজ্ঞাসা না করিয়া সর্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের দেশীয় ভাষার রাষ্ট্র মধ্যে হিন্দুশব্দটার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার কর্তা কে? বাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে তিনিই বলিবেন যে, তাহার কর্তা মুসলমান বাহুবল। তাহা যদি হয়—মুসলমান অধিপতিরাই যদি দেশীয় ভাষার হাতে বাজারে হিন্দুশব্দের ব্যবহার চালাইয়া দিবার কর্তা হ'ন, তবে, এ তো সোজা কথা যে, মুসলমানেরা হিন্দু বলিতে বাহা বোঝে তাহাই হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ।

মুসলমানদিগের মধ্যে একটি অনন্ত-সাধারণ নূতন কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, তাহাদের ধর্মবন্ধন জাতীয় বন্ধনকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিস্ত। এটা একটা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, পৃথিবীর আর

আর সকল স্থানেই যে রকমের জাতিভেদ আছে, মুসলমানদিগের মধ্যে সে রকমের জাতিভেদ মূল্যে নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে সামাজিক দলাদলি যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ধর্মসম্প্রদায়-ঘটিত; তা বই তাহার কোনটাই দেশ-ঘটিতও নহে, বংশ-ঘটিতও নহে। একদল মুসলমান সিয়া, একদল মুসলমান সুন্নী, একদল মুসলমান ওয়াহাবী,—মুসলমানদিগের মধ্যে এইরূপ সাম্প্রদায়িক দলাদলি বর্তই থাকুক না কেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীস্থ সমস্ত মুসলমান জাতি একই জাতি। পারসী, আরবী, মোগল, তুর্কী, এইরূপ নানা দেশের নানা জাতি মুসলমান ধর্মের টানা জালে আটক পড়িয়া গিয়া অর্ধ পৃথিবী-জোড়া একমাত্র অধঃ মুসলমান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মুসলমানদিগের শাস্ত্রমতে স্বধর্ম্মই স্বজাতি, বিধর্ম্মই বিজাতি; তা বই, কেবলমাত্র দেশভেদে বা বংশভেদে মুসলমানদিগের জাতিভেদ হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইত, তাহা হইলে দেশ হিসাবে মুসলমানেরা আমাদেরকে হিন্দু বলুক আর না বলুক জাতি হিসাবে আমাদেরকে হিন্দু বলিত না—মুসলমানই বলিত। মুসলমানেরা যেমন আপনাদের জাতি এবং ধর্ম্ম এই দুই পৃথক্ শ্রেণীর পদার্থকে একসঙ্গে জড়াইয়া আপনাদিগকে বলেন জাতিতেও মুসলমান, ধর্ম্মেও মুসলমান, তেমনি, আমাদের দেশের লোকেরও জাতি এবং ধর্ম্ম একসঙ্গে জড়াইয়া এ দেশীয় জনসাধারণকে মোটের উপরে বলেন জাতিতেও হিন্দু, ধর্ম্মেও হিন্দু; তা বই, হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুজাতির শাখা প্রশাখা যে কত প্রকার এবং তাহার কোন্ শাখা যে কি প্রকার—এ সকল বিষয়ের বোঁজ খবর লইবার জন্ত আকবর-সাহের পূর্বের আমলেব মুসলমানদিগের বিশেষ কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। মুসলমান সেনাপতিরা যখন দলবল সমভিব্যাহারে ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহারা তাহাদের আপনাদের ধর্ম্ম ছাড়া কেবলমাত্র আর তিনটি ধর্ম্মের বধাসম্ভব নিশ্চিত সমাচার অবগত ছিলেন; তাহার মধ্যে একটি ধর্ম্ম—খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, আর একটি ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্ম, তৃতীয় আর একটি ধর্ম্ম অগ্নি উপাসকদিগের ধর্ম্ম, সংক্ষেপে—পার্সীধর্ম্ম; তা বই, এদেশীয়

লোকের ধর্ম-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না—কেবল তাঁহাদের মনোমধ্যে একটা অজসংস্কারমূলক ধারণা ছিল এইরূপ যে, এদেশীয় লোকেরা প্রতিমাপূজক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা যে তাঁহাদের সেই অজ্ঞতার প্রতিবিধান-মানসে ভারতবর্ষীয় ধর্মের প্রকৃত তথ্যের অল্পসন্ধান প্রবৃত্ত হইবেন—তাঁহাদের শাস্ত্রে তাহা লেখে না;—তাঁহাদের শাস্ত্রে তাহা আবার লিখিবে। যে একটা বিকটাকার জন্তু তাঁহাদের শাস্ত্রের অস্থিমজ্জার মিশাইয়া থাকিয়া শিকারের প্রতীক্ষায় দিবারাত্রি হাঁ করিয়া রহিয়াছে—তাহার নাম শুনি-লেই জ্ঞানের রক্ত শুখাইয়া যায়। তাহার নাম গোঁড়ামি। মুসলমান দিগ্‌বিজয়ীরা ঐ ভয়ানক জন্তুর রসদ যোগাইবার জন্ত একরূপ কাজ-ব্যস্ত ছিলেন যে, এ দেশের ধর্ম-বিষয়ক তথ্যের অল্পসন্ধান দ্বারা থাকুক—মুহূর্তের জন্ত তাঁহারা যে তাঁহাদের তলোয়ার-খাণ্ডে পূরিবেন, শতক-দুইশত বৎসরের মধ্যেও তাহার অবকাশ তাঁহাদের হইয়া উঠে নাই। কাজেই, এ দেশের লোকদিগের মধ্যে বাহারা ধর্ম-হিসাবে মুসলমান ছিল না, খ্রীষ্টান ছিল না, ইহুদী ছিল না, পার্সী ছিল না, অর্থাৎ মুসলমান অধিনায়কদিগের জানাওনা ধর্মপথের অল্পপই ছিল না, সবাইকে তাঁহারা মোটের উপরে হিন্দুনামে সংজ্ঞিত করিয়াই কান্ত ছিলেন; তা বই হিন্দুধর্ম যে কিরূপ ধর্ম তাহার প্রকৃত তথ্য অল্প-সন্ধান করিয়া জানিবার জন্ত তাঁহাদের গরজ পড়ে নাই।

এখন কথা হইতেছে এই যে, ভারতীয়াভার জন্ত দুই হিন্দুশব্দের নাম গুরুত্ব ছিল না;—মুসলমান ধাতীরাই ভারতসম্ভানদিগকে মাতৃকোড় হইতে টানিয়া লইয়া তাহা-দিগকে হিন্দুশব্দটা গিলাইয়া দিয়াছে; আর, সেই জন্ত মুসলমানেরা হিন্দু বলিতে যাহা বোঝে—হিন্দুশব্দের সেই অর্থটাই এ ব্যবৎকাল পর্যন্ত আমাদের দেশে নিরবচ্ছিন্নে চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনো পর্যন্ত চলিতেছে। কাজেই—হিন্দুশব্দের মুসলমানী অর্থটাই হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ। সেই প্রকৃত অর্থটির প্রতি মূলেই দৃকপাত না করিয়া মারামুগের জ্ঞান একটা মনঃকল্পিত মারামুগ-সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিলে করা হয় আর কিছু না—মিছামিছি কেবল বাতাসের উপরে

বল্কয়। যদি তর্কচ্ছলে মনে করা যায় যে, একজন স্তম্ভ পদবীহী ইংরাজ—নৈকম্মশ্রেণীর নর্মান, অর্থাৎ যদি—এই প মনে করা যায় যে, প্রথম উইলিয়মের আমল হইতে নর্মান ঈরষ এবং নর্মান রক্ত বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়া ভব-নেবে তাঁহার শরীরে চরম গতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং জ্যাকলো জ্যাকসন রক্ত, সংক্ষেপে—ইজলি-রক্ত, কোনো পুরুষেই তাঁহার শিরাত্মান্তরে প্রবেশ করিতে পং-পায় নাই, আর, তাঁহার সেই অনন্ত-সাধারণ মহাকৌলিগ্ৰের জোরে তিনি যদি তাঁহার প্রাসাদের দ্বারদেশে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন লটকাইয়া তান্ যে, গৃহস্থানী ইজলি-ম্যান নহে, তাহা হইলে তাঁহার দেশস্থ ব্যক্তির তাহার সে কথা একটা পাগলের কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া সে কথাটির সহিত সত্যের যে, কোনো প্রকার সম্পর্ক আছে, তাহা কখনই স্বীকার করিবেন না। কেননা ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় (mediaeval) এড্‌জার্ড রাজাদিগের পূর্বের আমলের অভিধান মতে তাঁহার কথা সত্য হইলেও, বর্তমান কালের প্রচলিত অভিধান মতে তাঁহার কথা মূলেই সত্য নহে। তার সাক্ষী—বর্তমান কালের ইংরাজ শাস্ত্রমতে ডিস্ট্রাএলি, রথস্টাইলন্, প্রভৃতি বনিয়াদি ইহুদীবংশীয় ইংলণ্ডবাসীরাও ইজলি-ম্যান। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি, হিন্দুশব্দের সর্ব-বাদিসম্মত প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধে তাহার একটা নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া আমরা যদি আমাদের সেই ঘরগড়া অর্থে বলি যে, “আমরা হিন্দু নহি” তবে আমাদের সে কথা মিথ্যা কথারই আর এক নাম হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃত কথা এই যে, স্বদেশীয় ভাষার প্রচলিত শব্দার্থের পরিবর্তে নূতন শব্দার্থ সৃষ্টি করিবার অধিকার যেমন কোনো দেশের কোনো ব্যক্তিরই নাই, তেমনি, কেবল-মাত্র গায়ের জোরে এ দেশীয় ভাষার একটিও কোনো শব্দের প্রচলিত অর্থ উল্টাইয়া দিয়া সে শব্দটি নূতন অর্থে ব্যবহার করিবার অধিকার এ দেশেরও কোন ব্যক্তিরই নাই। তার সাক্ষী—যদি শব্দকে কলস-অর্থে ব্যবহার করিবার অধিকার, কিম্বা পাখা শব্দকে ঘোড়া-অর্থে ব্যবহার করিবার অধিকার, এ দেশের মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধ-বাগীশেরও নাই। যদি কোনো শাস্ত্রপুস্তকের শোক

কোনো বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান উপলক্ষে বিচারালয়ে আহৃত হইয়া বিচারপতির সম্মুখে হলপ করিয়া বলে যে, “আমি কোনো পুরুষেই শাস্তিপুরবাসী নহি”; আর, তাহা শুনিয়া বিপক্ষের ব্যরিষ্টার যদি তাহা প্রতি চক্ষু রাঙাইয়া বলেন যে, “তোমার পাড়া প্রতিবাসীরা এইমাত্র বলিল যে, তোমার পিতা শাস্তিপুরবাসী, তোমার পিতামহ শাস্তি-পুরবাসী, আর, তুমি জন্মেও শাস্তিপুর হইতে একপদও কোথাও নড়ো না; এরূপ স্থলে, তুমি এই প্রকট দিবা-লোকে সভার মাঝখানে কোন্ লজ্জায় বলিতেছ যে, ‘আমি শাস্তিপুরবাসী নহি’?” ইহার উত্তরে যদি শাস্তি-পুরের লোকটি বলে যে, “আমি যেখানে বাস করি তাহা যে, কিরূপ বিদ্যুৎ হইল তাহা আর কি বলিব! তাহার জিসীমার মধ্যে শাস্তির নামগন্ধও নাই। তাহা বিভ্রান্তির আলয়! আমার চারিদিকের দেশ-স্বর্গ লোকেরা কেহ বা অন্নচিন্তায় বিভ্রান্ত, কেহ বা অর্থচিন্তায় বিভ্রান্ত, কেহ বা মামলা মোকদ্দমায় বিভ্রান্ত। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যে-লোক তাহাকে বলে শাস্তিপুর, সেই লোকই মিথ্যা-সাক্ষ্যের অপরাধে রাজবিচারে দণ্ডনীয়। আমি বাহা সত্য বলিয়া জানি তাহাই বলি। আমি আমার বাস-স্থানকে শাস্তিপুর না বলিয়া ভ্রান্তিপুর বলি। এখনও আমি এই প্রকট দিবালোকে সর্বসম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলি-তেছি যে, আমার বাসস্থান কোনো হিসাবেই শাস্তিপুর নহে, সুতরাং আমি শাস্তিপুরবাসী নহি।” বিচারপতি শুনিয়া অবাক! খুব সম্ভব যে, দয়াময় বিচারপতি লোক-টিকে অল্প কোনো গারদে না দিয়া বহরমপুরের বা আলি-পুরের গারদ-বিশেষের রক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করিবেন! এ যেমন দেখা গেল, তেমনি—হিন্দুশব্দের প্রচলিত অর্থ অনুসারে আমি যখন সত্য সত্যই হিন্দু, তখন, আমার নিজের অভিধান-মতে আমি যদি বলি যে “আমি হিন্দু নহি,” তবে আমাব সে কথা একটা পাগলের কথা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বর্ত-মান স্থলে বেশী তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই—সহজ বুদ্ধিতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এটা যখন স্থির যে, ইহুদ-শব্দ যেমন ইংরাজি শব্দ—হিন্দুশব্দ তেমনি মুসলমানী শব্দ; আর এটাও যখন কাহারো অবিদিত

নাই যে, ঐ মুসলমানী শব্দের মুসলমানী অর্থটাই মুসল-মানদের আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্যন্ত আমাদের দেশে অক্লান্ত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তখন সেই অর্থটি ছাড়া অল্প কোনো অর্থে হিন্দুশব্দের ব্যবহার আজিকের কালের লেখাপড়া-জানা লোকের পক্ষে নিতান্তই একটা বিসদৃশ ব্যাপার ইহা বলা বাহুল্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, সে অর্থটা কি? সে অর্থটা যে, কি, তাহার কতক-মতক আভাস যদিচ আমি ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাপন করিতে ক্রটি করি নাই, তথাপি তাহার স্বরূপ বুজাস্তি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা আবশ্যক বিবেচনায় তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে; অতএব প্রণিধান করা হোক:—

সাঁওতাল, ভীল, কোল, খাসিয়া, কুকী প্রভৃতি বহু জাতিরা, এমন কি—কতক পরিমাণে মগেরাও, ভারতবাসী হইয়াও ভারতবাসী নহে; কেননা উহাদের বাসস্থান লোকালয় ছাড়াইয়া অনেক দূরে;—চূর্ণময় অরণ্যে, জনশূন্য প্রান্তরে, দুয়ারোহ পর্বত অঞ্চলে, অথবা, বর্ষা এবং ভারতের মাঝামাঝি অর্ধবৃত্ত সীমান্ত-প্রদেশে। এই সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্বাচন-কালে, আঁচিল, আবু, প্রভৃতি বাজে উপসর্গগুলি যেমন ধর্মব্যয়ের মধ্যেই নহে, তেমনি, ভারতবাসীদিগের ধর্মঘটিত, জাতিঘটিত, ভাষাঘটিত, বা, আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতি-ঘটিত কোনো প্রকার ঐতিহাসিক বুজাস্তের আলোচনাকালে উল্লিখিত বহুজাতিরা ধর্মব্যয়ের মধ্যেই নহে। এইরূপ বিবেচনায় যদি ঐসকল বহুজাতিকে গণনাব মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যায়, তবে হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ বাহা মুসলমানদিগের আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্যন্ত আমাদের দেশে নিরূপদ্রবে চলিয়া আসিতেছে তাহা কার্যতঃ (অর্থাৎ practically) ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ:—বাহারা দেশ-হিসাবে এ দেশী এবং ধর্ম হিসাবে মুসলমানও নহে, খ্রীষ্টানও নহে, ইহুদীও নহে, পার্সীও নহে, (অর্থাৎ মুসলমানদিগের পরিচিত-পূর্ব কোনো প্রকার ধর্মে দীক্ষিত নহে), সকলেই তাহার মোটের উপরে হিন্দুনামে অভিধেয়।

এস্থলে আরেকটি কথা বিবেচ্য এই যে, ইংরাজেরা

যেমন জাতিতে ইংরাজ—ধর্মে খ্রীষ্টান, মুসলমানেরা সেরূপ ধর্মে একশ্রেণীভুক্ত এবং জাতিতে আর এক শ্রেণীভুক্ত নহে; মুসলমানেরা ধর্মেও মুসলমান জাতিতেও মুসলমান। বাহার চক্ষু হলুদবর্ণ, তাহার চক্ষে সবই হলুদবর্ণ; বাহার মুখ তিক্ত, তাহার মুখে সবই তিক্ত;—অতএব মুসলমানেরা আপনাবা যেমন জাতিতেও মুসলমান, ধর্মেও মুসলমান, তেমনি, তাঁহাদের চক্ষে এ দেশের লোকেরাও জাতিতেও হিন্দু এবং ধর্মেও হিন্দু হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। এখানে দুইটি বিষয় দ্রষ্টব্য :—

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, এ দেশের মধ্যে প্রচলিত যে কোনো ধর্ম হউক না কেন—তা' সে শাস্ত্রধর্মই হোক, বৈষ্ণবধর্মই হোক, আর ব্রাহ্মধর্মই হোক—সে ধর্ম যদি মুসলমান খ্রীষ্টান ইহুদী এবং পার্সী এই চারিটি মুসলমান-জানিত ধর্মের কোনোটিই না হয়, তবে মুসলমান-দিগের শাস্ত্রে তাহারই নাম হিন্দুধর্ম।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, আমাদের দেশের লোকদিগের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি ঐক্লপ না-মুসলমান না-খ্রীষ্টান না-ইহুদী না-পার্সী-শ্রেণীর কোনো প্রকার ধর্মে দীক্ষিত—মুসলমানদিগের শাস্ত্রে তিনি ধর্মেও হিন্দু, জাতিতেও হিন্দু।

তবেই হইতেছে যে, হিন্দুশব্দটা কেবল দেশহিসাবেই ভাববাচক (অর্থাৎ conveying a positive meaning); তা বই, ধর্ম-না-জাতি হিসাবে তাহা অভাব বাচক (অর্থাৎ conveying a negative meaning)। তা'র সাক্ষী—এ দেশের লোকদিগকে যদি তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতামতাদ্বারা ধর্মের প্রকৃত কথাটির সমাচার জিজ্ঞাসা করা যায় তবে শাস্ত্রেরা বলিবেন যে, শক্তির উপাসনাই শাস্ত্রধর্মের সার কথা, বৈষ্ণবেরা বলিবেন যে, বৃন্দাবনবিহারী রাধাকৃষ্ণের উপাসনাই বৈষ্ণবধর্মের সার কথা, জৈনেরা বলিবেন যে, অহিংসাই জৈনধর্মের সার কথা, ব্রাহ্মেরা বলিবেন যে, জৈনোপাসনাই ব্রাহ্মধর্মের সার কথা;—ইহাদের এইসকল কথাগুলি ভাববাচক তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো নব্য হিন্দুধর্মীকে হিন্দুধর্মের প্রকৃত কথাটির সমাচার জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি বলিতে পারিবেন না যে,

বেদবিহিত ধর্মই হিন্দুধর্ম কেন না তন্ত্রোক্তধর্ম নিতান্তই অবৈদিক; বলিতে পারিবেন না যে, তান্ত্রিকধর্মই হিন্দুধর্ম যে হেতু তান্ত্রিকধর্ম নিতান্তই অবৈদিক; বলিতে পারিবেন না যে, পৌরাণিকধর্মই হিন্দুধর্ম, কেন না পৌরাণিকধর্ম এমন অনেক কথা আছে বাহা বেদবিরুদ্ধ—যেমন উমা (যিনি ব্রহ্মবিষ্ণুর আরেক নাম) তিনি সিংহবাহিনী দশভুজা; বিষ্ণু ব্রহ্মের ঐক্য হইয়া জন্মিয়াছিলেন; এই সকল অবৈদিক কথা। বলিতে পারিবেন না যে, তান্ত্রিক-ধর্মই বলো, পৌরাণিকধর্মই বলো, আর বৈদিকধর্মই বলো, সবই হিন্দুধর্ম; কেন না ও তিন ধর্ম যে, পরস্পর বিরোধী ইহা কাহারো অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহার জ্ঞান স্পষ্ট আর কি. হইতে পারে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে হিন্দুশব্দ নিতান্তই অভাব বাচক।

এখন ইহা কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্রাহ্মভাতাদিগের উত্থাপিত প্রশ্নটি এক মুহূর্ত্তে বীভৎস করিয়া দিতে পারিবার মতো কষ্টিপাথর যদি কোনো থাকে, তবে তাহা হিন্দুধর্মের উপরি-উক্ত প্রকৃত অর্থটি। ঐ প্রকৃত অর্থটি—কোন জাতি হিন্দু, কোন জাতি হিন্দু নহে, এটারও যেমন; আর, কোন ধর্ম হিন্দুধর্ম এবং কোন ধর্ম হিন্দুধর্ম নহে, এটারও তেমনি;—দুয়েরই কষ্টিপাথর। ঐ কষ্টিপাথরটিকে যদি কানে খাটাইয়া উহার গুণাগুণ স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই—এখনি আমি তোমাকে তাহা দেখাইতেছি; অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখ :—

[কষ্টিপাথরের দুই পৃষ্ঠের দুই নাম; এক পৃষ্ঠের নাম ভাব-পৃষ্ঠ, আরেক পৃষ্ঠের নাম অভাব-পৃষ্ঠ। দুই পৃষ্ঠের নিকষ-রেখাই পরীক্ষিতব্য।]

(১) ভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন, সবাই এদেশী।

(২) অভাবপৃষ্ঠের নিকষাঙ্ক।

ধর্মবিষয়ে, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা ন-মুসলমান, না-খ্রীষ্টান, না-ইহুদী, না-পার্সী।

(৩) অতএব

বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিতেও হিন্দু, ধর্মেও হিন্দু।

প্রশ্নোত্তর ।

নবকিশোর শাস্ত্রী।—তুমিই বলিতেছ যে, শিখেরা হিন্দু। শিখেরা আপনারা তো তা বলে না। কোনো শিখকে তাহার ধর্মবিষয়ের বা জাতি বিষয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শুধুই সে বলে “আমি শিখ”; বলে না “আমি হিন্দু।”

সত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য।—আমাকেও যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর “তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী” তবে আমিও বলিব না “আমি হিন্দু ব্রাহ্ম”; বলিব শুধু “আমি ব্রাহ্ম।” কোনো বৈষ্ণবকে যদি জিজ্ঞাসা কর “তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী”, তিনিও বলিবেন না “আমি হিন্দু বৈষ্ণব”; বলিবেন শুধু “আমি বৈষ্ণব।” কোনো শাক্তকে যদি জিজ্ঞাসা কর “তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী” তিনিও বলিবেন না “আমি হিন্দু শাক্ত”; বলিবেন শুধু “আমি শাক্ত।” হিন্দু না বলিবার কারণ আর কিছুই না—কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি অন্তর্নিগূঢ় আছে, তেমনি সম্প্রদায়বাচক বৈষ্ণবাদি শব্দের মধ্যে জাতিবাচক হিন্দু শব্দটি অন্তর্নিগূঢ় আছে। আবার কাঠের মধ্য হইতে অগ্নি পদার্থটিকে প্রকাশ্যে টানিয়া বাহির করিলে কাঠখানার যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি, জাতিবাচক হিন্দু শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ করিলে বৈষ্ণবাদি বিশেষণগুলির ভাবান্তর ঘটিয়া দাঁড়ায়। অথ বালিলেই যেমন চতুস্পদ অথ বুঝায়, তেমনি, বৈষ্ণব বালিলেই হিন্দু বৈষ্ণব বুঝায়। কিন্তু তাহা সত্বেও একজন নবশাস্ত্রী যদি বলেন যে, “আমি অমুক স্থানে একটা চতুস্পদ অথ দেখিয়াছি” তবে তাহাতে বুঝাইবে এই যে, যেন তিনি চতুস্পদ ছাড়া আর কোনো প্রকার অথ আর কোথাও দেখিয়াছেন। এই জ্ঞাত স্বজাতির পরিচয় দিবার সময় ইংরাজেরা বলে শুধু “আমি ইংলিশ-ম্যান”, বলে না “আমি ব্রিটিশ ইংলিশম্যান”;* স্বচেরা

বলে “আমি স্কচম্যান”, বলে না “আমি ব্রিটিশ স্কচম্যান”; আইরিশেরা বলে শুধু “আমি আইরিশম্যান”, বলে না “আমি ব্রিটিশ আইরিশম্যান।” তবে যদি ঐ তিন ম্যানের কোনো ম্যান আরেক ম্যান হ’ন—ম্যাডম্যান হ’ন, আব সে অবস্থায় তিনি যদি বলেন, “আমি ব্রিটিশ ইংলিশম্যান” বা “ব্রিটিশ স্কচম্যান” বা “ব্রিটিশ আইরিশম্যান” তাহা হইলে দণ্ডশাস্ত্রের বিধানমতে তাঁহার সাত খুন মাপ। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি স্বধর্মের পরিচয় দিবার সময় শিখেরাও বলে না “আমি হিন্দু শিখ,” বৈষ্ণবেরাও বলে না “আমি হিন্দু বৈষ্ণব,” ব্রাহ্মেরাও বলে না “আমি হিন্দু ব্রাহ্ম” জৈনেরাও বলে না “আমি হিন্দু জৈন।” কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, কেহই তাঁহারা হিন্দু নহেন। উল্টা বরং—কোনো নব্য হিন্দুধর্মী যদি বলেন “আমি হিন্দু ব্রাহ্ম” বা “হিন্দু শিখ” বা “হিন্দু শাক্ত” বা “হিন্দু বৈষ্ণব” তবে তাহাতে প্রমাণ হইবে কেবল এই যে, তিনি একজন স্ফটিকাচ্ছাদিত লোক।

নব শাস্ত্রী।—তবে কি এদেশীয় বৌদ্ধেরাও হিন্দু?

সত্যকিঙ্কর।—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে, আমাদের দেশের কোন্ স্থানে দণ্ডবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে তাহা আমার ধ্যানের অগোচর। কিন্তু তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! তুমি হয় তো একটা মগকে ধরিয়া আনিয়া আমাব সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিবে যে, “ইনি এ দেশীয় বৌদ্ধ!” ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, ভারতবর্ষ যেমন মগের মূলুক নহে, মগের মূলুকও তেমনি ভারতবর্ষ নহে। তবে, মগেরা যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ দেশীয় লোক—সেটা একটা সমস্তা-বটে। গোয়ালার নিকট হইতে পয়সা দিয়া প্রাপ্ত পাংশু-বর্ণের তরল পদার্থটা ছব কি জল, অথবা অখতর নামক জন্তুটা (অর্থাৎ muleটা) অথ কি গর্দভ, এইরূপ বৈধাত্মক দেশীয় প্রসঙ্গগুলার মীমাংসা যেমন এক কথার “হাঁ” কিবা “না” বলিয়া তড়ি-তড়ি চুকাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না, মগ এ দেশীয় কি বর্ষাদেশীয় এ প্রশ্নের মীমাংসাও অবিকল সেইরূপ। এটা যেমন সত্য যে, মগেরা ভারতের পূর্বসীমান্তবাসী (Eastern-borderland বাসী), এটাও তেমনি সত্য যে, “ভারতের পূর্বসীমান্তবাসী” বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয়

* প্রচলিত প্রথামতে “ব্রিটিশ” না লিখিয়া তাহার পরিবর্তে “ব্রিটিশ” লেখা হইল কেন—তাহার কারণ এই যে, মূর্তপ্য ব-এরই প্রকৃত উচ্চারণ sh; পক্ষান্তরে, তালব্য শ এর উচ্চারণ—s এবং sh—ছ এর বাবানামি নূতন এক প্রকার। তালব্য শ এর উচ্চারণ-জিজ্ঞাসকে আমি তালব্য শ এর প্রকৃত উচ্চারণ বুঝনিঃসৃত করিয়া অনার্যাসে শুধাইতে পারি; তা বই, তাহা লিখিয়া দেখানো আমার সাধ্যাতীত।

যে, এদেশ এবং বঙ্গদেশেব মাঝামাঝি-স্থানীয় মগেব মূলকের অধিবাসী। তাহা সত্ত্বেও তুমি যদি অশ্বতরকে অশ্ব বলিতে ইচ্ছা কর, অথবা মগকে এ দেশী বলিতে ইচ্ছা কর, তবে দণ্ডবিধি-গ্রন্থে এমন কোনো আইন আশ্রিত লিপিবদ্ধ হয় নাই যে, গুরুপ একটা অর্দ্ধমিথ্যা কথা বলিলে তোমাকে কোনে প্রকার অপরাধের দ্বায়ে পড়িতে হইবে।

নব শাস্ত্রী।—কোনো মগের পূর্ব পুরুষেরা যদি দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া চট্টগ্রামবাসী হয় ?

সত্যকিঙ্কর।—অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার মতে তাহাকে এদেশী বলা উচিত। বিগত শতাব্দীর একজন টোলের ভ্রমরস্ব যখন বলিয়াছিলেন যে—

“কলুর বলদ যদি দাঁড়াইয়া ঘটা নাড়ে ?।”

তখন তাঁহার মুখে যদিচ উহা বিলক্ষণই শোভা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া গুরুপ ধাঁচার কুটতর্ক তোমার আমার ভ্রাতৃ-এ-এ-ভ্রাতৃ-এ-ভ্রাতৃর মুখে শোভা পায় না। কেন না ঐ বা তুমি বলিলে—যে, মগেরা দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া চট্টগ্রামে বাস করিতেছে, তোমার ও কথা যদি সত্য হয়, তবে বর্তমান শতাব্দীতে চট্টগ্রাম মগে গিস্ গিস্ করিত। কেন না কান্তকুঞ্জের পাঁচটি মাত্র ব্রাহ্মণের গুণসে আমাদের এই বঙ্গভূমি চাঁটুঘে মুখ্যোতে ছয়লাপ্ হইয়া গিয়াছে ইহা সকলেরই জানা কথা। ও সকল কালতো কুটতর্কের অবতারণা না করিয়া তুমি যদি তোমার প্রকৃত প্রশ্নটির একটা সহজর আমার নিকটে গুনিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি বলি এই যে, বোদ্ধেরা যদি মগদিগের ভ্রাতৃ এদেশ এবং বঙ্গদেশের মধ্যস্থানীয় সীমান্ত এদেশের লোক না হইয়া জৈনদিগের ভ্রাতৃ প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় হইতেন, তাহা হইলে অর্দ্ধবৈষ্ণব জৈনেরা যেমন লোকের নিকটে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হ'ন, তাঁহারাও তেমনি হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

নব শাস্ত্রী।—জৈনেরা যে লোকের নিকটে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয়, এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার খুবই সন্দেহ আছে।

সত্যকিঙ্কর।—সে বিষয়ে সন্দেহ তোমার খুবই আছে, তাহা তো দেখিতেই পাইতেছি; কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এটাও দেখিতে পাইতেছি যে, ও তোমার সন্দেহ নিতান্তই

অমূলক। তাহা যে অমূলক তাহার প্রমাণ এই যে কেননা সংবাদপত্রের সম্পাদককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে “হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ জাতি সর্বাধিক বাণিজ্য ব্যবসারে পটু ?” তবে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন “মাদোয়ারি জাতি।” পূর্ব হইতে যদি তাঁহার মনে এরূপ একটা ধারণা থাকিত যে, জৈনেরা হিন্দু নহে, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রশ্নটির উত্তর দিতেন এইরূপ যে, বাণিজ্য ব্যবসারে উত্তমশীল জাতি হিন্দু-দিগের মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নব শাস্ত্রী।—ও সকল কথা যাক! এখন একটা কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি :—একজন মুসলমান যদি ব্রাহ্ম হয়, তবে কি তাহাকে হিন্দু বলা সঙ্গত হইবে ?

সত্যকিঙ্কর।—খুবই সঙ্গত হইবে যদি মুসলমানটি পাবনা জেলার মুসলমানদিগের ভ্রাতৃ এদেশী মুসলমান হয়। সত্য কি মিথ্যা—কষ্টপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হয়। অতএব দেখ :—

(১) ভাবপৃষ্ঠের নিকষাক্ষ।

মুসলমান সন্তানটি ডাহা এদেশী।

(২) অভাবপৃষ্ঠের নিকষাক্ষ।

মুসলমান সন্তানটি ধর্মবিষয়ে মুসলমান নহে, খ্রীষ্টান নহে, ইহুদী নহে, পার্সী নহে।

(৩) অন্তঃপ্রব

মুসলমান সন্তানটি ধর্মোৎ হিন্দু জাতিতেও হিন্দু ॥

এতদ্ব্যতীত, চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাম্বুজ বৈষ্ণব মুসলমানসন্তান হরিদাস বাবাজি হিন্দু কি অহিন্দু তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে জিজ্ঞাস্তা বিষয়টির সমাসত্য কষ্টপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রকৃত বুঝান্তি তোমার নিকটে ঢাকা থাকিবে না। অতএব দেখ :—

(১) ভাবপৃষ্ঠের নিকষাক্ষ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাম্বুজ হরিদাস নামক মুসলমান-সন্তানটি ডাহা এদেশী।

(২) অভাবপৃষ্ঠের নিকষাক্ষ।

ধর্মবিষয়ে হরিদাস বাবাজি মুসলমান নহেন, খ্রীষ্টান নহেন, ইহুদী নহেন, পার্সী নহেন।

(৩) অন্তঃপ্রব

বৈষ্ণব মুসলমান-সন্তানটি ধর্মোৎ হিন্দু জাতিতেও হিন্দু ॥

ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, হরিদাস বাবাজি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দু বলিয়া পবিগৃহীত হইয়া ছিলেন।

পক্ষান্তরে মার্কিন দেশীয় ধর্মব্রাজক পার্কর—নামে ব্রাহ্ম না হউন—কাজে ব্রাহ্মদিগের আদর্শ স্থানীয় সেবা ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তাহা সর্বোৎকৃষ্টপাথে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে যে, তিনি জাতিতেও হিন্দু নহেন, ধর্মেও হিন্দু নহেন। তার সাক্ষী :—

‘‘... ভাবপুঠেব নিকষাঙ্ক।

পার্কর মার্কিন দেশীয় জ্ঞাতএব তিনি ধর্মেও হিন্দু নহেন; জাতিতেও হিন্দু নহেন।

প্রশ্নোত্তর এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট; এক্ষণে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের প্রতি আমার সর্বনিম্ন নিবেদন এই যে, তাঁহারা মিছামিছি বাতাসের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত না হইয়া সকল দেশেব সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা বাহা করিয়া থাকেন তাহাই করুন—অন্তরের ত্রিগুণগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন এবং জৈশ্বরপ্রসাদে জয়যুক্ত হইয়া ব্রাহ্ম নামের সার্থক্য সম্পাদন করুন; তাহা হইলে আমাদের দেশে সত্য এবং মঙ্গলের দ্বার আপন হইতেই উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে, এবং জৈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইয়া আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া দিবে।

শ্রীম্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

সামন্ততন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ।—আজর-আজিত-তন্ত্র।—ভূমির অধিকারী।—ভারতীয় সামন্ততন্ত্র।—উদারীয়দিগের প্রবাসমূহ—ভারতীয় সমাজের মধ্যে অরাজকতা।—কি কারণে সামন্ততন্ত্র ভারতীয় সমাজকে রূপান্তরিত করিতে পাবে নাই।—ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব ও বর্ণভেদপ্রথা সামন্ততন্ত্রকে প্রতিরোধ করে।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার অনুলীলন কবিত্তে হইলে আর একটি উপাদানের প্রতি লক্ষ্য কবা আবশ্যিক।—সেটি সামন্ততন্ত্র। ‘নবম শতাব্দীর পূর্বে, ভারত খণ্ড খণ্ড

হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই-সকল রাজ্যেব ব্রাহ্মদিগেব অনিয়ন্ত্রিত অসীম প্রভুত্ব ছিল। শাস্ত্রতঃ রাজাই ভূমির প্রকৃত অধিকারী; তবে রাজাকে রাজত্ব দিয়া, গ্রামবিশেষ, বর্ণবিশেষ, ব্যবসায়ী-মণ্ডলবিশেষ অথবা বংশবিশেষ ঐ ভূমির উপসব্ব ভোগ করিতে পারিত। ইহাব বিপরীতে, একাদশ শতাব্দী হইতে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত পদমর্যাদার সোপান-পরম্পরা ও জাইগিরদারী স্বত্বাধিকারের প্রথা পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজের ভাবতবিজয় পর্য্যন্ত, এইরূপ পদমর্যাদাব পর্য্যায় ও জাইগিরদারী স্বত্বাধিকারপ্রথা বজায় ছিল। এখনও রাজপুতানায়, এবং অযোধ্যা, পঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মিরাবাবের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন অতীত যুগে ও বিভিন্ন দূরদেশে সামন্ততন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বত্রই, আশ্রয়-আশ্রিতসম্বন্ধমূলক সামাজিক গঠনই তাহার আদিম লক্ষণ। একজন মনুষ্য আর একজন মনুষ্যকে স্বকীয় প্রভু ও স্বকীয় সামরিক সৈন্য বলিয়া স্বীকার করে; ইহার বিনিময়ে সেই প্রভু, কোন সম্পত্তির উপসব্ব ভোগ করিবার অধিকার সেই অধীনজনকে প্রদান করে, এবং সে তাহা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পাইবে এইরূপ তাহার নিকট অঙ্গীকার করে। সে সম্পত্তি গো-মেবাদি হইতেও পারে,—যেমন, আইরিসদিগের মধ্যে ও তুর্কদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ইহা ভূসম্পত্তি; কখনবা ইহা চুক্তিকারী প্রজাব সহিত বন্দোবস্ত-করা ভূমি; চুক্তিকারী প্রজা, আশ্রয়লক্ষণের উপায়হীন স্বাধীন ভূমি অপেক্ষা, প্রভুর আশ্রিত ও সংরক্ষিত জাইগির ভূমিই অধিক পছন্দ করে।

যে দেশে সামন্ততন্ত্র পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, সেখানে তাব একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভূমির স্বত্বাধিকারের সহিত স্বামিত্বের অধিকার আসিয়া পড়ে। অধীনস্থ প্রজার নিকট হইতে ভক্তিও সেবা ভূমীর প্রাপ্য। কিন্তু আবার সেই প্রজার ভূমিতে সেই প্রজাই ভূমায়ী, সেখানে তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য। পরে, এই সামন্ততন্ত্রের ক্রম-বিকাশ হইতে অস্ত্রান্ত পরিণামও সমুৎপন্ন হয় :—রাজ্যের



প্রব ।

শ্রীমতী সুখলতা রাও কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুসারে ।

বিশেষ বিশেষ কার্য বংশাধিকারিক হইয়া পড়ে, ব্যক্তি-বিশেষের পদমর্যাদা অন্তর্হিত হয়, কেবল ভূমিসংলগ্ন পদমর্যাদাই রহিয়া যায়। যে-কেহ কিয়দংশ ভূমি রাখিতে পারে, সে-ই ভূমি-সংক্রান্ত পদমর্যাদারও অধিকারী হয়। বাহ্যিক অধিকারে কোন ভূমি নাই, ভূমিই তাহার অধিকারী হইয়া দাঁড়ায়, ভূমিই তাহাকে পোষণ করে—সে ভূমিরই দাস (serf), ভূমিরই মজুর হইয়া পড়ে।

সামন্ততন্ত্রের একমাত্র তেজ—অরাজকতা। যে জন-সমাজ অবনতিগ্রস্ত বা যথোচিত পরিমাণে পরিপুষ্ট নহে, সেই জনসমাজে স্বভাবতই অরাজকতা উপস্থিত হয়। যেরূপ অসভ্যসমাজে আশ্রয়-আশ্রিততন্ত্র সেইরূপ অবনতি-গ্রস্ত সমাজে সর্কগ্রাসী অধিস্বামিত্বই পরিণতি লাভ করে; কেননা, রাজস্বগ্রহণমূলক ভূস্বামিত্বের ধারণা কেবল উন্নত জন-সমাজের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই যুরোপ ও ল্যাটিন দেশ-গুলি ব্যতীত আর কোথাও সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার কারণ কি?—কারণ,—কেবল গ্রীক-ল্যাটিনদিগের মধ্যেই ভৌমিক স্বামিত্ব সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেও উহাদের এই ধারণা বিদ্যমান ছিল। উহাদের যেরূপ পারিবারিক গঠন-প্রণালী, উহাদের যেরূপ পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস, তাহাতে স্বকীয় বংশধর ব্যতীত আর কেহই পুরুষপুরুষদিগের সমাধিসন্ধির নিকটে গেলে গুণ্যস্থানকে অপবিত্র করা হয় এইরূপ উহারা মনে করিত। যখন অস্থাবর সম্পত্তিমূলক স্বত্বাধিকারের কোন ধারণা ছিল না তখনও যে ভূমিতে মৃতেরা কবরস্থ হইত, সেই ভূমিসংক্রান্ত স্বামিত্বের ধারণা গ্রীক ও ল্যাটিনদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শত্রুর শব্দ-দেহের পরিচর্যা অপহরণ করা অধিকারের মধ্যে গণ্য হইত, কিন্তু তাহার সমাধিস্থানে অনধিকারপ্রবেশ করা অপরাধের মধ্যে ধর্তব্য ছিল। ভূম্যধিকারের ধারণা ও ভূস্বামিত্বের ধারণা—এই দুয়ের মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে তাহা ল্যাটিনেরা কখনই সম্যক্রূপে বুঝিতে পারে নাই।

২৬০

এক্ষণে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা আলোচনা করা যাউক।

মধ্য-এসিয়ায় লোকেরা আশ্রয়-আশ্রিততন্ত্র অবগত ছিল :—সামন্ততন্ত্রের বন্ধনযুগে আবদ্ধ হইয়া, অল্পে-অল্পে পুরুষেরা সর্দারদিগের অধীনে এবং সর্দারেরা রাজার অধীনে একত্র সম্মিলিত হইত। ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শক ও তুর্কমানেবা রাজপুতজাতিভুক্ত হইল, এবং রাজপুতদিগের মধ্যে স্বকীয় সমাজপদ্ধতি প্রবর্তিত করিল। কিন্তু একস্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করার ও ভূমির অধিকারী হওয়ার, উহাদের সমাজ-পদ্ধতি একটু পরিবর্তিত হইল। আব একটি পার্থক্যের কথাও আমরা নির্দেশ করিব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর তুর্কদের সম্বন্ধে আমরা যেসকল প্রমাণলেখ্য পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায়, উহাদের শাখাবংশগুলি পুরুষে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; পরে সৈন্তদল লইয়া যে জনসমাজ গঠিত হয়, সেই জনসমাজ বিভিন্ন জাতিভুক্ত, বিভিন্ন দেশীয় লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদ্বিপরীতে, আজিকার রাজপুতদিগের মধ্যে, কোন-এক শাখার অন্তর্গত ব্যক্তিমাত্রই একই বংশের লোক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বৈসাদৃশ্যের দুইটি হেতু অল্পমান করা যাইতে পারে :—হয়,—রাজপুতগণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পবে তুর্কশাখাগুলি মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, নয়—আর্য্যবংশ সম্বন্ধে যে একটা সাধারণ ধারণা ছিল সেই ধারণার প্রভাবে, বর্ণভেদপ্রণালীর প্রভাবে, একস্থানস্থায়ী বাস প্রভাবে, ভূসম্পত্তির প্রভাবে, বৈদেশিকদিগের মধ্যে পৃথকভাবে অবস্থিতির প্রভাবে, রাজপুত শাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত লোকদিগের এই বিভাজন ঘটিয়াছিল যে উহারা সকলেই কোন এক সাধারণ পুরুষের বংশধর।

কিন্তু, ভারতে রাজপুতদিগের প্রতিষ্ঠাই কি সামন্ততন্ত্রের একমাত্র কারণ? রোমকদিগের জ্ঞান হিন্দুরা বিকরিয়া আশ্রয়-আশ্রিততন্ত্র অবগত হইল? নবম ও দশম শতাব্দীর অরাজকতার সময়ে, নিম্নবর্ণের লোকেরা, রাজপুত আশ্রয়, শক্তিশালী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয়, ধনশালী বণিকদিগের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছিল? হিন্দুদিগের অত্যাচারের ভয়ে, অসভ্যদিগের অত্যাচারের ভয়ে, ক্ষুদ্র রাজারা কি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিল? প্রমাণলেখ্যগুলি হইতে এই সমস্ত

কোন সমাধান হয় না। সে বাহাই হউক, হিন্দুরা রাজপুতদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। পোটুগীজ রাজ-দূতের মুখে শুনা যায়, বিজয়নগরের রাজা তাঁহার অধীনস্থ ভূম্যধিকারীদিগকে একত্র করিয়াছিলেন; মার্কোপোলো বর্ণনা করেন, মালাবাধাধিপতির বারাজ্ঞা ও সৈনিকেরা, তাঁহার চিতার পুড়িয়া মবে। অধীন ভূম্যধিকারীদিগের এইরূপ আত্মহত্যা একটা তাহার-প্রথা। এই প্রথা চীন ও জাপানেও পরিলক্ষিত হয়। আরও কিছুকাল পরে, তুর্ক ও মোগলেরা সমস্ত ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রবর্তিত করে। (১)

(১) Baden Powell প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধকারের মতে (Land System of British India) প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রিক গঠনপদ্ধতি,—সামন্ততন্ত্রমূলক; অধ্যাদিগের ভারত-বিজয়ের কালেই বোধ হয় এইরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহাকাব্যের যুগে নিশ্চয়ই এ পদ্ধতি আর দেখা যায় না। প্রাচীন ইতালি, প্রাচীন গ্রীস, ও রোমীয় বিসম্বিজের পূর্বে গল ও প্রেট্রিটেনের জায়, অবশ্য ভাবত তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু কি ধর্মগ্রন্থ, কি সাহিত্যগ্রন্থ—কোথাও সামন্ততন্ত্রের কোনপ্রকার নির্দেশ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ আমরা মহাসাহিত্যের দেখিতে পাই যে, রাজার বাজ্যের চতুর্দিকে কতকগুলি পার্শ্ববর্তী বিজিত রাজ্য থাকা চাই। কিন্তু উহা “বিজিত” রাজ্য—(vassal) “পেটীও” রাজ্য নহে। উহার একস্থানে মহৎ-বংশোদ্ভব ও বংশানুক্রমিক সচিবদিগের কথা আছে, কিন্তু তাহার পেরেই আছে—রাজারই সর্বময় প্রভুত্ব এবং তাহাকে একজন ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহার আর এক স্থানে, কেন্দ্রীভূত শাসনকার্যের কথা;—সামন্ততন্ত্রের বিপরীত পদ্ধতির কথাই পাওয়া যায়।—“বাজা প্রত্যেক গ্রামের জন্ত, দশটি গ্রামের জন্ত, বিশটি গ্রামের জন্ত, একশত গ্রামের জন্ত, সহস্র গ্রামের জন্ত, এক একটি শাসনকর্ত্তী নিযুক্ত করিবেন।” এইরূপ পদ্ধতির প্রয়োগকালে সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন হওয়াই সম্ভব, কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভবও, ভারতে সেই সময়ে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। অনেকগুলি নাটকের কাহী রাজবাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছে; সকল নাটকেই রাজারা মন্ত্রিণ দ্বারা, ব্রাহ্মণ বরজদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কোন নাটকেই অভিজাতবর্ণের কথা, সামন্ততন্ত্রের হিসাবে কোন আশ্রিত ভূম্যধিকারীর (vassal) উল্লেখ নাই। যদিও হিউয়েন-সিয়াং বলেন, দ্বিতীয় শিলাদিত্যের দরবারে, করদ ও মৈত্রীবদ্ধ রাজারা সমবেত হইত; কিন্তু তাহাদিগকে আশ্রিত রাজা (vassal) বলা যাইতে পারে না। পরে শিলাদিত্যের যুগে, বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশে, শক ও হুনদিগের কতকগুলি প্রথা হিন্দুদিগের উপর চাপানো হয়। তা’ছাড়া হিউয়েন-স্যাং যে শাসন-পদ্ধতির বর্ণনা করেন, তাহাতে সামন্ততন্ত্রের কোন লক্ষণই নাই। তিনি আমীর-ওমরার কোন উল্লেখ করেন না। তিনি বলেন, কুবকেরা ভূমির মজুর (serf) ছিল না। আরও তিনি এই কথা বলেনঃ—“শাসনকর্ত্তারা, মন্ত্রীরা, নগরপালেরা এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরা, স্বকীয় ভরণপোষণের জন্ত কিছু কিছু ভূমি পাইত।” কিন্তু এমনও হইতে পারে, নবম ও দশম শতাব্দীর অরাজকতার সময়ে, এইসকল ভূমি জাইগিরে পরিণত হয়।

সম্ভবতঃ উরালীয় জাতি হইতেই আশ্রয়-আশ্রিততন্ত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারত খণ্ড খণ্ড হইয়া কতকগুলি জাইগিরে যে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রধান হেতু—সম্রাটের স্বসংস্কার। ভারতে স্বাধীনরাজ্য কতগুলি ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। অধুনা, ইংরাজের কেন্দ্রীভূত শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইবার একশত বৎসর পরে—এখনও ৬০০ মাত্র রাজ্যশাসনকারী রাজা আছে। আর পূর্বে, জাইগিরদার ভূস্বামী অসংখ্য ছিল। মোগল সম্রাটদিগের আমলে, সহস্র সহস্র আমীর-ওমরা ছিল, মুনসব্দার ছিল, জমিদার ছিল। জমিদারদের অধিকার কিছু কম থাকিলেও, মুনসব্দারদিগের সহিত তাহারা সমান কর্তৃত্ব ভোগ করিত।

কতকগুলি উপকরণ সামন্ততন্ত্রের শক্তি ও স্থায়িত্ব বিধান করে সহায়তা করিয়া থাকে, যথাঃ—দেশের আকার অভিজাত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চারিত্রগত বৈলক্ষণ্য, জ্যোতিষিক-প্রথা সামন্ততন্ত্রাভ্যুদয়ী উচ্চনীচ পদমর্যাদার প্রতি লোকের অনুবাগ।

মোটের উপর ভারতভূমির আকৃতি ও সামাজিক গঠন সামন্ততন্ত্র স্থাপনের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে। সে বাহাই হউক, হিন্দুরা রাজপুতদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু যে সমতল ভূমি লইয়া বড় বড় নদীর অববাহিকা গঠিত, তাহা কখন দীর্ঘকাল ধুলাংশে বিভক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। নবম শতাব্দীতে কল্লিয়ারাজাতি বিলুপ্তপ্রায়; তখন শাস্ত্রপ্রকৃতি হিন্দুদিগের দুঃসাহসিক ব্যাপারে বা সৈনিক বৃত্তিতে আর অভিক্রটি ছিল না। উহাদের ব্যবহার-গ্রন্থে জ্যোতিষিকারের নিয়ম ছিল না, এবং যে বর্ণভেদ-পদ্ধতিতে, ব্রাহ্মণেরাই পদমর্যাদার সর্ব-প্রধান সেই বর্ণগত পদমর্যাদা, সামন্ততন্ত্রগত পদমর্যাদার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল।

কেবল, যে সমাজ রাজপুতগণকর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই প্রকৃত সামন্ততন্ত্রাভ্যুদয়ী সমাজঃ—সকলেই অভিজাতশ্রেণীর, সকলেই সৈনিক; সকলেই বনজ নিজ গৃহের ও নিজ নিজ ক্ষেত্রভূমির অধিস্বামী; সকলেই জাইগিরদারী-শপথস্বত্রে স্ববীর ভূস্বামীর অধীন। এবং সেই ভূস্বামী এরূপ আর

এক ভূস্বামীর অধীন—যে তাহা অপেক্ষাও শক্তিশালী।
আবার এই শ্রেণীভুক্ত ভূস্বামীর যে অধিবাসী সে একজন
হিন্দু রাজা, রাজপুত রাজা, বা মুসলমান রাজা।

ভারতের অধিকাংশ স্থানে, এই সামন্ততন্ত্রের প্রথা
সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না। যুরোপে এই সামন্ততন্ত্রপ্রথা
তত্ত্ব্য রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পদ্ধতিকে, খৃষ্টীয়সমাজের
গঠনপ্রণালীকে, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনকে, রীতি-
নীতিকে, লোকের ধারণা-সংস্কারাদিকে, হৃদয়ের অনুরাগ
সমূহকে, সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিল। ভারতে
ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ছিল, বর্ণভেদপ্রথাগত পদমর্যাদার পর্যায়
ছিল, তাহাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার ছিল
এবং গ্রাম-সাধারণ ভূসম্পত্তির সহিত বংশগত ভূসম্পত্তির
পদ্ধতিও ছিল। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোকই
কৃষিজীবী; এই সামন্ততন্ত্র উহাদিগকে ভূমির মজুর
(serf) করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতের অনেক প্রদেশে
এখনও উহাদের অবস্থা এইরূপ মজুরের অবস্থা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

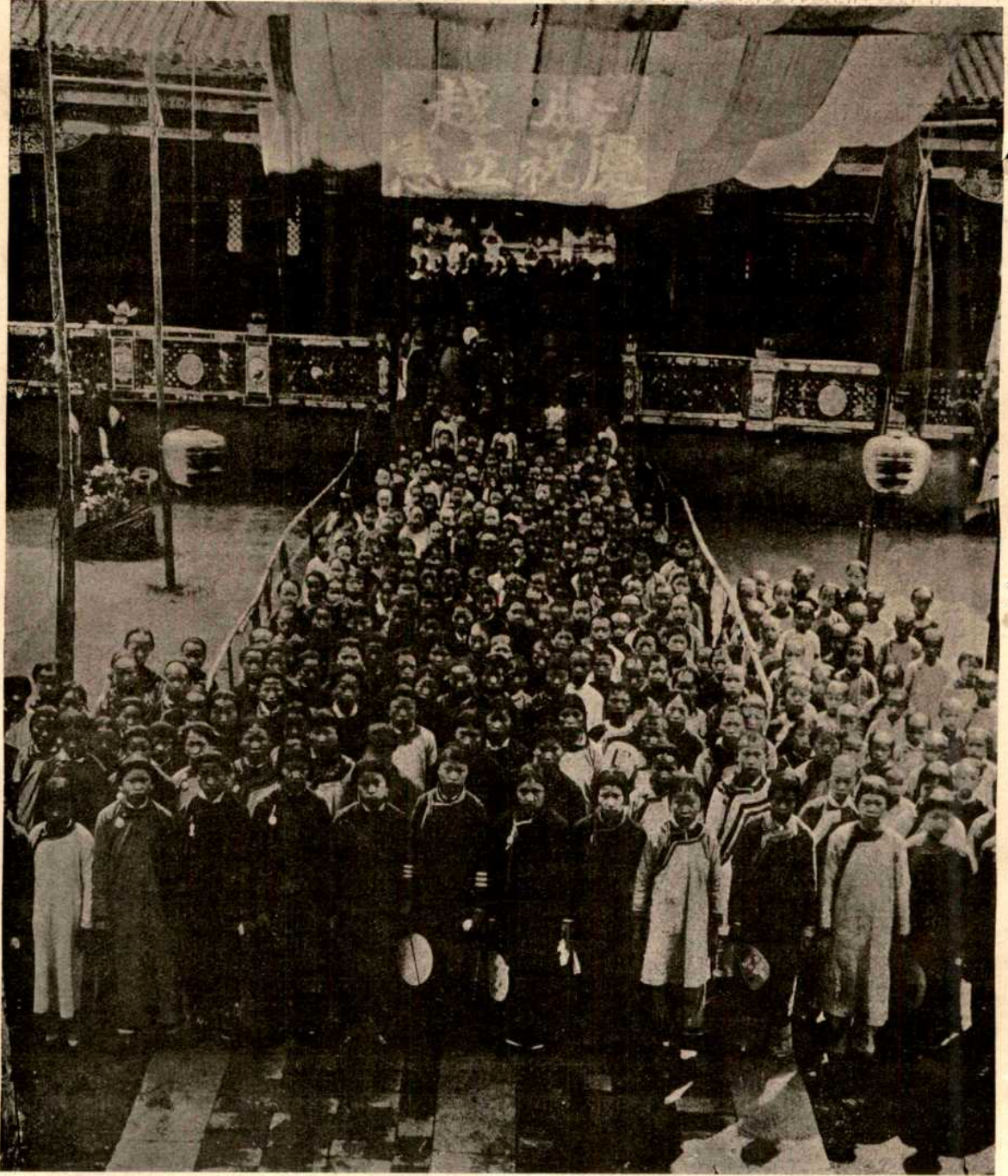
(ইউনান প্রদেশের কথা ।)

(১)

আমরা সকলেই জানি যে রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে সমস্ত
এসিয়ায় চেতনা সঞ্চার হইয়াছে। তাহারই ফলে চীনের
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিষম পরিবর্তনের
চেউ খেলিতেছিল। তাহারই ফলে তুর্কীর স্থলতান
আবদুল রহমানকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল এবং
পারস্যের শাহকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইতে হইল এবং
সাহেবগণের মতে তাহারই ফলে তথাকথিত অশান্তি
ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু চীনে যে এরূপ
অসম্ভব রাষ্ট্রবিপ্লব এত সত্বর উপস্থিত হইয়া এত শীঘ্র
প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইবে তাহা
চীনদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়াও একদিনের জন্ত মনে
ধারণা করিতে পারি নাই।

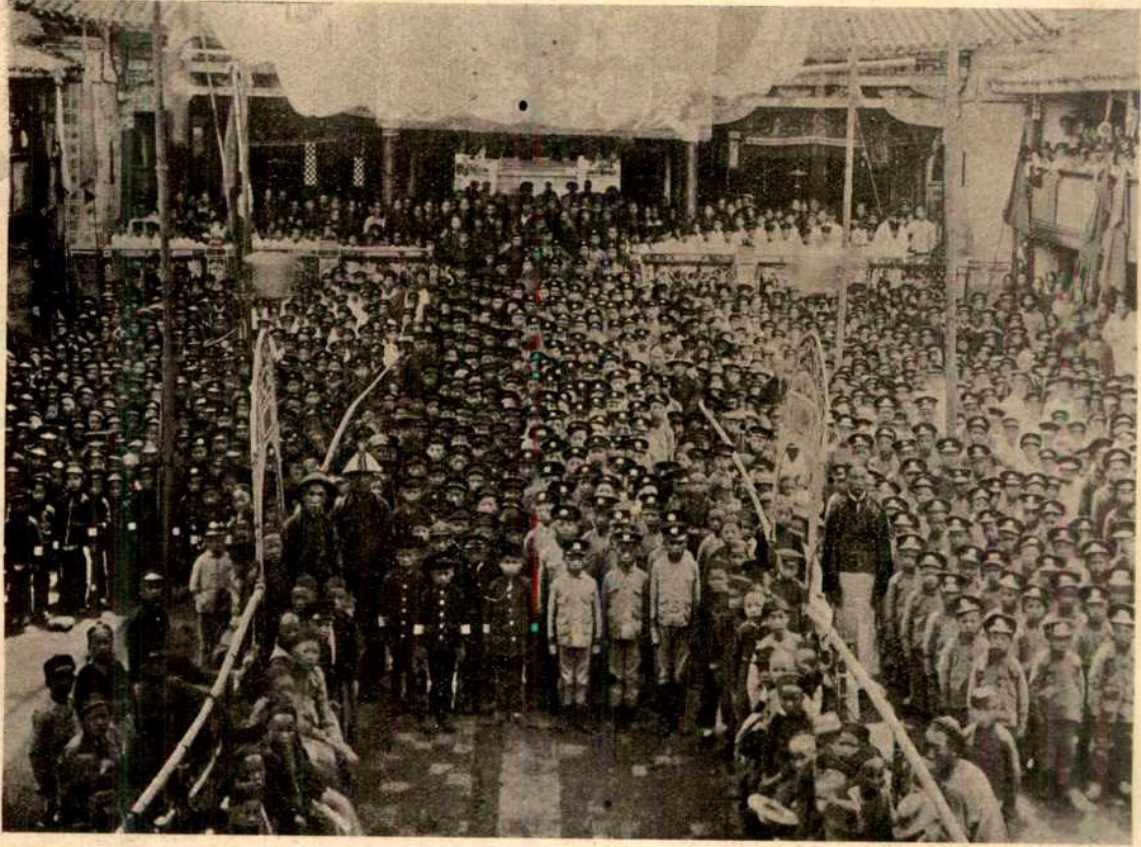
গত বৎসর এপ্রিল মাসে আমি যখন রেঙ্গুন হইতে
পরিবার আনিবার প্রস্তাব করি তখন এখানকার কোন
বন্ধু ও তাঁহার পত্নী আমাকে গোপনে কহিলেন যে
“আপনি সম্প্রতি পরিবার এখানে আনিবেন না, কারণ
একটু গোলমালের আশঙ্কা আছে।” আমি তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলাম যে “কি প্রকার গোলমালের আশঙ্কা?”
তাহাতে তিনি অনেক পীড়াপীড়ির পর কহিলেন যে
“প্রজাগণ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।” তখন
আমি তাঁহার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ করি নাই।
কিন্তু মনে মনে একটু চিন্তার উদয় হইল। ইহার পর
পাঁচ ছয় মাস কটিয়া গেল, কোথায়ও কিছুই সন্ধান
পাইলাম না। মাঝে মাঝে দুইএকজন সৈনিকপুরুষের
সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের মনের ভাব যাহা বৃষ্টিতে
পারিতাম তাহা কেবল মাঝু রাজবংশের ও রাজকর্মচারী-
দিগের প্রতি বিদ্বেষ। তাঁহারা বলিতেন যে “বর্তমান
রাজবংশের দুর্বলতার জন্ত চীন অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে।
বিশেষগণ যখন যে বিষয়ে আবদার করিয়া যাহা চায়
পেকিন হইতে তাহাই মঞ্জুর করে। রাজকর্মচারিগণ
নিজেরা অত্যন্ত কলুষিত, তাহারা প্রজার মঙ্গলের প্রতি
দৃষ্টি করেনা, কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও প্রজার অর্থে
আপন পকেট পূর্ণ করাই তাহাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য।
মফঃব্বলের কর্মচারিগণ কি করে, পেকিন গবর্ণমেন্ট তাহার
খোঁজ খবর রাখেন না। প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া
রাজস্ব আদায় করিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। এ সম্বন্ধে হং
টিন্জে বা লাল বোতামধারী মাণ্ডারিনগণই দেশের
প্রধান শত্রু।” এইরূপ কথায় প্রজাসাধারণের মনের ভাব
স্পষ্ট বৃষ্টিতে পারিয়াছিলাম।

অপরদিকে মাণ্ডারিনগণ নিজেরা কলুষিত হইলেও,
সমগ্র চীন রাজ্যে বাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, বাহাতে
প্রজাসাধারণ শক্তিশালী হইয়া উঠে সে চেষ্টায় তাঁহারা
বিস্রব্ত ছিলেন। গত বৎসর দেখিতাম একদিকে রাজকীয়
সৈন্যগণ বিদেশী ধরণে যুদ্ধ শিক্ষায় সর্বদা নিযুক্ত, অপরদিকে
মাণ্ডারিনগণ শিক্ষাবিস্তার ও পার্লামেন্টের ধরণে শাসন-
প্রণালী বাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা শিক্ষা দিতে ব্যগ্র।
টেজিয়ে-টিং বা টেজিয়ের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়েন-লিরাং-ইউর



চীনের বালিকা ছাত্রীদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদানের মিছিল,—টেঙ্গিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ।

যত্নে বহুসংখ্যক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতি বিদ্যালয়ের ত কথাই নাই। এমন রক্ষণশীল চীন গ্রামেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বালক-জাতি যাহাদের মধ্যে জীশিক্ষা আদবেই ছিল না, সেই



চীনের বালকছাত্রদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদানের মিছিল।—টেম্পিমে স্কুলের নূতন উর্দি বা ইউনিফর্ম পরিহিত ছাত্রগণ।

জাতির মধ্যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সফল উৎপন্ন করা সহজ ব্যাপার নহে। আট বৎসর হইতে সতের বৎসরের বালিকা পর্য্যন্ত স্কুলে যাইবার নিয়ম। তদূর্দ্ধ বয়সের বালিকাদিগকে গৃহে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বালিকাদিগের লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমাজের নানা কুরীতির অপকারিতার বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগের পা বাধিয়া ক্ষুদ্র করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রলোভন হইতে বিরত করার চেষ্টা হইতেছে। আমরা দেড়শত বৎসর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যাহা করিতে পারি নাই, চীনারা আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই সকল কার্য্য করিয়া তুলিল।* আমাদের দেশের বালিকা-বিদ্যালয়ের অবস্থা কি প্রকার তাহা সকলেই জানেন। যেখানে যেখানে বালিকা-বিদ্যালয় হইয়াছে তথায় বারো

বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের বালিকা পাওয়া কষ্ট। থাকিলেও সংখ্যা সামান্য।

গত বৎসর পার্লেমেন্টের অনুকরণে প্রজার প্রতিনিধি-সভা স্থাপন উপলক্ষে তিন দিন উৎসব হয়। প্রথম দিন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া সভার অধিবেশন হইলে সভাপতি মিঃ ওয়েন সকলকে উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় দিন সমস্ত বিদ্যালয়ের বালকদিগকে উপস্থিত করা হয়। এক এক গ্রাম হইতে বালকগণ নিশান ও ব্যাণ্ড (Band) সহ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সমস্ত স্কুলের বালকগণ উপস্থিত হইল। সকলে একত্র হইলে নিয়ম ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বালকদিগের কোমল হৃদয়ে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বীজ নিহিত করিয়া দেওয়া হইল। তৃতীয় দিনে সমস্ত স্কুলের বালিকাদিগকে উৎসবে আহ্বান করা হয়। যেমন বালকগণ



মিঃ ওয়েন, টেক্সাসে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও চীন পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব অধিনায়ক। ইনি রাষ্ট্রবিপ্লবের স্বত্রপাত সময়ে ২৭শে অক্টোবর রাতে উত্তর ফটক দিয়া ভিক্ষুকবেশে পলায়ন করেন।

শ্রেণীবদ্ধভাবে প্যারেডের ধরণে আসিয়াছিল, সেই মত বালিকাগণও নানা গ্রাম হইতে নিশান লইয়া মিছিলের ধরণে আসিতে লাগিল। সে এক মনোহর দৃশ্য! এই দৃশ্য দেখিলে প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তির হৃদয়ই আনন্দে পূর্ণ হয়। এই দিবস আমি এই উৎসব দেখিতে গিয়া ছিলাম। মিঃ ওয়েন এবং অগ্রান্ত সভ্যগণ আমাকে সঙ্গে করিয়া বক্তৃতা-হল, শিক্ষাবিভাগের আফিস প্রভৃতি দেখাইলেন। আমি ফটোগ্রাফ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি সম্মত হইয়া স্থান নির্বাচন করিতে বলিলেন। মিঃ ওয়েন নিজের ফটোগ্রাফ লইয়া থাকেন। তিনি বালক ও বালিকাদিগের যে ফটো লইয়াছিলেন তাহারই প্রতিকল্প এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। অবশ্য ফটো ভাল হয় নাই।

মিঃ ওয়েন আট বৎসর যাবৎ আমেরিকায় চীন লিগেশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি ইংরেজী বেশ বলিতে পারেন এবং লিখিতেও পারেন। ইহার সঙ্গে চীনের রাজনীতি সম্বন্ধে আলাপ হইলে ইনি বলিয়াছেন যে



মেক্সিকোয়, তোপখানার অধ্যক্ষ। বিদ্রোহী সৈন্যগণ ইহার শিরশ্ছেদ করিয়া বক্ষ-চিরিবা হুংপিও বাহির করিয়া লয়; চীনাধর্ম বিশ্বাস অত্যন্ত দুর্বল লোকের হুংপিওর দ্বারা আঘাত-জনিত ক্ষত অব্যর্থ আরাম হয়।

“আমাদের দেশের শাসনপ্রণালী ইংলণ্ডের ধরণে করিতে হইবে। রাজা থাকিবেন কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া পার্লামেন্টের দ্বারা রাজা শাসিত হইবে।” চীন গবর্নমেন্ট এই আদর্শ লইয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু সুন-ইয়াট-সেনের মনে যে আমেরিকার ধরণে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প ছিল তাহা কেহই তখন জানিত না।

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে এবং অক্টোবরের প্রথমে চীনের নানা প্রদেশ হইতে নানা প্রকার সংবাদ আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে ছি-ছোয়ান প্রদেশের চেংচৌ সহরের সংবাদ গুরুতর। তথায় রাজকীয় সৈন্তের সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সৈন্তের বিষম যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। এইসকল বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছি-ছোয়ান প্রদেশের রেলওয়ে



চীন রাষ্ট্রবিপ্লবে নিযুক্ত কয়েকজন সৈন্য, বালক হইতে প্রোট পর্যন্ত ।

লাইন নাকি চীন গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাহাতে ভয়ানক আপত্তি করিয়া অবশেষে বিদ্রোহী হয়। এইসকল সংবাদও আমরা বড় গ্রাহ্য করি নাই। কারণ চীন দেশে সর্বদাই কোন না কোন দেশে বিদ্রোহ প্রভৃতি অশান্তি লাগিয়া থাকেই। ইহা এদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বিশেষ। গত ২৭শে অক্টোবর রাত্রি ৯টার পর যথারীতি তোপ পড়ার পর কিছুকাল নিস্তর ভাবে কাটিল। প্রায় দশটার সময় পশ্চিমদিকে শহরের বাহিরে হঠাৎ ঘন ঘন কতকগুলি বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল, আমরা তাহা চীনাদের পটকার শব্দ মনে করিয়াছিলাম। ইহার কিছুকাল পরেই বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে আবার কতকগুলি বন্দুকের আওয়াজ হইল। ইতিমধ্যে আমার হস্পিটালের একজন গলা-

কাটা চীনা সিপাইয়ের গুশাধাকারী আর একজন সিপাই দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে তাহাদের উপরস্থ কর্মচারী কর্ণেল ছাউকে সিপাইগণ হত্যা করিয়াছে। লোকটা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইহার পরই নগরপ্রাচীরের ভিতর ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমরা আহা করিয়া আগুনের পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, তাড়াতাড়ি সদর দরজা খুলিয়া দেখি অনেক লোক নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে দৌড়িয়া পলাইতেছে। শহরের ও বাজারের সকল লোক, গ্রামাভিমুখে ছুটিয়াছে। কেহ পৃষ্ঠে ছেলে, কাঁধে ভার ও হাতে বিছানাদি লইয়া পড়ে কি মরে ভাবে উদ্ধ্বাসে ছুটিয়াছে। চীনা রমণীগণও পৃষ্ঠে ছেলে করিয়া টিক টিক করিতে করিতে দ্রুত যাইতেছে। সকলেই নিস্তর, কাহারো মুখে কথাটা নাই। আমার

বাড়ীর পার্শ্বস্থ বাড়ীওয়ালা ছাড়া আর সকলেই পলাইতে আরম্ভ করিল। একএকবার সদর দরজা খুলিয়া ছই একজন লোককে কোথায় কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করি আবার দরজা বন্ধ করি। ইতিমধ্যে একজন সংবাদ দিল যে নূতন সৈন্তের কর্ণেল চ্যাংকে তাঁহার অধীনস্থ সিপাইগণ হত্যা করিয়াছে। তাহার কারণ তিনি বিদ্রোহিগণের পরামর্শে যোগ দিতে নারাজ হইয়াছিলেন। ইনি বড় ভদ্রলোক ছিলেন। ইহঁার জ্ঞাত অনেকেই দুঃখিত।

ইহার পরই নূতন সৈন্ত পুরাতনের সঙ্গে একযোগে নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ সরকারী ইয়াশেন বা আফিসাদি আক্রমণ করিল। নগর মধ্যে তখন শত শত রাইফল-ফায়ার হইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, সমস্ত শহরে জনমানবের সাড়া নাই, হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ নাই, সকলেই আসন্ন বিপদ মনে করিয়া এবং ধনে প্রাণে মায়া যাইবে আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। সে বিপদময় কালরাত্রির নিস্তব্ধতা কেবল রাইফল-ফায়ারের শব্দ দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইতে লাগিল। এবং মাঝে মাঝে বিউগল বাজানর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। আমার একটি চীনা ভৃত্য আমার বিনা আদেশে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার মাতা ও জীদিগকে লইয়া দূরে কোন গ্রামে পলাইয়া গেল, অপর একটি চাকরও তাহার পরিবার রক্ষার জ্ঞাত আমার বাটী পরিত্যাগ করিল। অপর একটি চাকর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; তাহার পলাইবার স্থান নাই, সে অগ্র দেশের লোক, স্মৃতির বাধ্য হইয়া আমার নিকটই থাকিতে বাধ্য হইল। আমাদের বিদেশীদিগের বাড়ী নগরপ্রাচীরের বাহিরে, পূর্ব দরজার পার্শ্বে। চতুষ্পার্শ্বে রাইফলের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। তখন আমি ব্যস্ত ভাবে কিসে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এস্থলে আমার বাড়ীর একটু পরিচয় না দিলে কেহ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবেন না। রাস্তার ধারে সদর বড় দরজা, তাহা পার হইয়া যাইতে বাম দিকে ডিস্পেনসারি এবং তাহার পার্শ্বে রোগী থাকিবার স্থান, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র আঙ্গিনা তাহার দুই পার্শ্বে আস্তাবল। সেই আঙ্গিনা



টেন্সিয়ে শহরের বাজার।

পার হইলে লম্বালম্বি এক গৃহ। তাহার মধ্য কক্ষে বৈঠকখানা, এক পার্শ্বের কক্ষে বিশেষ-দস্তচিকিৎসালয়, অপর পার্শ্বে রন্ধনশালা। সেই কক্ষ অতিক্রম করিলে আর এক আঙ্গিনা, তাহার এক পার্শ্বে স্নানাগার। সেই আঙ্গিনা পার হইলে সম্মুখে লম্বালম্বি আর একটি বৃহৎ গৃহ। সেই গৃহই আমার বাসস্থান। তাহার মধ্য কক্ষে আর একটি বৈঠকখানা। এক পার্শ্বের বড় কক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার একটি ভোজনাগার। অপরটি ফটোগ্রাফের ও অগ্নি দ্রব্য রাখিবার জ্ঞাত। অপর পার্শ্বের বড় কক্ষটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার একটি আমার আফিস, অপরটি শয়নকক্ষ। এই গৃহের মধ্য কক্ষের উপরে দ্বিতল গৃহ। এই মধ্য কক্ষ পার হইলে একটি ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় ফুলের বাগিচা। তাহার সম্মুখে উচ্চ এক প্রাচীর। সেই প্রাচীর ভেদ করিয়া যে দরজা আছে, তাহা দ্বারা বাহির হইলেই আমার শাক শবজীর বাগিচা। সেই বাগিচার প্রাচীরগাত্র ভেদ করিয়া আর এক ক্ষুদ্র দরজা, সেই দরজা দিয়া বাটীর পশ্চাৎ দিক হইতে বাহিরে যাওয়া যায়। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে চীন দেশের সমস্ত বাড়ীই প্রাচীর-বেষ্টিত, আমাদের দেশের বাটীর স্থায় স্থায়ী বাড়ী নহে; সদর দরজা বন্ধ করিলে সহসা লোক ভিতরে যাইতে পারে না; প্রাচীর কিন্তু কাঁচা ইটের দ্বারা নির্মিত।

এই বিপদের সময়ে কন্সাল (consul) এখানে ছিলেন না। কমিশনার ও তাঁহার এসিষ্ট্যান্ট ছিলেন। এই রাস্তার ধারেই তাঁহাদের বাড়ী কিন্তু তাঁহাদের কোন

খোঁজ খবর জানিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে জেনারাল চাংকে বিদ্রোহিগণ গুলি করিয়া মারিয়াছে; এবং তাঁহার ইয়ামিনের যথাসর্বস্ব লুট করিয়াছে। পরে টাওগাইয়ের* (কমিশনারের*) ইয়ামিন ও টিং বা মাজিষ্ট্রেটের ইয়ামিন লুট করিয়া উত্তর কক্ষচারীকেই হত্যা করিয়াছে। ইহাদের জন্ত বড় দ্রুত হইল। ইহার কিছুকাল পরেই ইয়ামিন হইতে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নি জেলখানায়। জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাস করিয়া তবে জেলে আগুন জ্বলিয়া দিয়াছে। ক্ষণকাল মধ্যে জেল ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাস্তায় যাইলে কেহ কেহ কহিল যে বিদ্রোহিগণ ইয়ামিন লুটিয়া পরে শহরের অন্যান্য সকল বাড়ী লুটবে। এইরূপ আশঙ্কা ও উত্তেজনার সময় আমি বিন্দু মাত্রও ভীত বা আত্মহারা হই নাই। এখানে আমার জামাতা শ্রীমান্ নীতীশচন্দ্র রায় ছিল। স্বপ্নের বিষয় তাহার মুখেও কোন ভয়ের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। একজন পাঞ্জাবী দরজী ছিল তাহার নাম তাজদীন। তাজদীন ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। চীনারা সকলেই ভীত। বাহির হইতে দুই একটা রমণী আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরে আশ্রয় লইয়াছে। আমি সকলকে কহিলাম “তোমরা ভীত হইও না। শত্রু আক্রমণ করিলে প্রথমত আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রাণপণে করিব।” আমার দুইটা কার্তুজের বন্দুক, তাহার একটা আমি, অপরটা শ্রীমান্ নীতীশকে দিলাম; একখানি কাচিন খড়্গা তাজদীনকে এবং গুরখা দা খানি চীনা ভৃত্যকে দিয়া কহিলাম যে বিপদ উপস্থিত হইলে সাহসে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শত্রু যদি আক্রমণ করে, তবে সদর দরজা ভাঙ্গিয়া প্রথম আঙ্গিনায় আসিবে; তথা হইতে অপর একটা দরজা দিয়া ভিতরকার আঙ্গিনায় আসিতে আসিতে আমার ইঙ্গিত মতে তাহারা ফুলের বাগিচার দরজা দিয়া তরকারী বাগিচার মধ্যে যাইয়া তথা হইতে পশ্চাদিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া যে স্থানে যাইবে তাহাও বলিয়া দিলাম। তাহারা পলাইতে পলাইতে আমি এদিকে বন্দুক ফায়ার করিয়া

* টাওগাই কমিশনারের মধ্যাধিষিষ্ট কক্ষচারী।



চ্যাং ওয়েন কোয়ান, চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের টেকিয়ে দলের নেতা,

চীনা পোষাকে।

শত্রুর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে হটিয়া পশ্চাতে যাইব। মূল কথা তাহারা নিরাপদ হইলে আমার অদৃষ্টে বাহা থাকে তাহাই হইবে। হয় আত্মরক্ষা করিতে পারিব, না হয় মৃত্যু। সকলে এক স্থানে গোলমাল করিয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিলেই

সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়। আর যদি শত্রু বাটার সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক দিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে বাগিচার ভিতর প্রাচীরগাত্রে যে মই ফেলিয়া রাখিয়াছি তাহার দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পার্শ্বের বাড়ীর বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে লুকাইতে হইবে। এই প্রকার আদেশ করিয়া আমরা পাঁচ ছয়জন লোক আমার মধ্য কক্ষে অশ্রুনের পার্শ্বে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া কোন্ দিকে কোন্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল তাহার সন্ধান লইতে লাগিলাম। সম্মুখের তিন দরজা ও পশ্চাতের তিন দরজা বন্ধ। মাঝে মাঝে সম্মুখের সদর দরজার নিকট আসিয়া সংবাদ লই, আবার বাগিচার মধ্যে গিয়া শুনি। বাগিচার পশ্চাতের দরজা খুলিয়া মাঝে মাঝে দেখিতেছিলাম লোক জন বা বিদ্রোহিগণ যাইতেছে কি না। ইতিমধ্যে এক গুলি আসিয়া বাগিচার প্রাচীরগাত্রে লাগা মাত্র আমি দৌড়িয়া ভিতরে গেলাম। চীন সৈন্ত বিদ্রোহী হইলে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিহীন হয়। তাহাদের নরহত্যার ভয় নাই। তাহাদের কেবল অর্থে লোভ, অর্থ পাইলে তাহারা সকল কার্যই করিতে পারে। বিদ্রোহিগণের মধ্যে লুণ্ঠের লোভে অনেক বদমাইস যোগ দিয়াছে। রাইফলধারী বিদ্রোহিগণ আক্রমণ করিলে আমার দুইটা কার্তুজের বন্দুক দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য। তবু মন্দের ভাল। “প’ড়ে মরা অপেক্ষা ল’ড়ে মরা ভাল।” বিপদে সকলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে ধনে প্রাণ নষ্ট হইবার কথা। বিপদে ধৈর্য চাই, সাহস ও দৃঢ়তা চাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশপন্নমতিত্ব চাই। এইসকল থাকিলে সহজেই লোকের অনিষ্ট হইতে পারে না। শত্রুর আক্রমণে হতাশ হইয়া পড়িলে মরণ অনিবার্য। আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিলে অনেক সময় রক্ষা পাওয়া যায়, আর যদিই রক্ষার কোন উপায় না থাকে, তবুও “যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।” লড়িয়া মরিলে পৌরুষ আছে, যে লড়িয়া মরিতে পারে শত্রুও তাহাকে সম্মান করে। এইসকল বিবেচনা করিয়া, মন দৃঢ় করিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া অটল অথচ সাবধান ভাবে রহিলাম। কেহ বলিতে পারেনা কোন্ মুহূর্ত্তে কি ঘটে। আজিকার রাত্রি যে প্রভাত হইবে এমন আশা কেহ করে নাই।



চ্যাং ওয়েন কোয়ান, চীন রাষ্ট্রবিলম্বের টেন্সিয়ে দলের নেতা,
ইউরোপীয় পোষাকে।

রাত্রি প্রায় ২টার সময় অস্বাভাবিকভাবে একজন সৈনিকপুরুষ কতকগুলি সৈন্ত সহ আসিয়া আমার সদর দরজায় আঘাত করিয়া দরজা খুলিতে বলিতে লাগিল। তখনকার সকলের মনের ভাব কি প্রকার হইল তাহা লেখা অপেক্ষা অল্পমানে বুঝিয়া লইতে পাঠকগণকে অল্প-রোধ করি। তখন আমার মনও কতক বিচলিত হইল। আমার লোকেরা বাহিরের সৈন্তদিগকে কহিল যে দরজা খুলিতে আমরা সাহস করি না। তাহারা পুনঃ

পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমরা দরজা না খোলার, তাহারা কহিল যে “আমরা তোমাদের শত্রু নহি, আমরা তোমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।” এই বলিয়া কনসাল ও কমিশনারের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। নগর মধ্যে গুলির শব্দ ক্রমে কম হইতে লাগিল। যে সিপাইটা প্রথম সংবাদ দিয়াছিল সে ভয়ে পাগলের মত হইয়া গেল। সে কেবল বলিতে লাগিল বিদ্রোহিগণ আমার উপরস্থ কক্ষচারীকে মারিয়াছে, তাহারা জানে আমি এখানে আছি, আমাকে হত্যা করিবার জন্তই ঐ সিপাইরা আসিয়াছিল। আমি তাহাকে কিছুতেই শাস্ত করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি কহিলাম যে “যদি কেহ তোকে হত্যা করিতে আসে তাহা হইলে আমি অগ্রে গিয়া পড়িব, তুই এই অবসরে পলাইবি। আমার সম্মুখে তোকে কিছুতেই হত্যা করিতে দিব না।” ইহারই কিছু পর প্রাচীরের উপর কিসের শব্দ হইল, সে অমনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া কহিল “ঐ! পাঁচীর ডিক্কাইয়া সিপাই আসিতেছে।” বাহির হইয়া দেখি যে একটি বিড়াল লাকাইয়া অস্ত্র প্রাচীরে গিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত রাত্রিটা এই লোকটা এই প্রকার আতঙ্কে কাটাইল।

আমরা প্রভাতের তারা দেখিবার জন্ত বারে বারে বাহিরে যাইতে লাগিলাম কিন্তু মনে হইল যে প্রভাতের তারা বুঝি আজ আর উঠিবে না। তারা বুঝি বা বিদ্রোহিগণের ভয়ে লুকাইয়াছে। এই প্রকার উদ্বেগের সহিত ঘর বাহির করিতে করিতে অবশেষে প্রভাতের তারা দেখা গেল এবং ক্রমে প্রভাতের রশ্মি টেল্লিয়ে শহরে পতিত হইল। সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তখন নিদ্রায় চক্ষু আঁটরা ধরিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

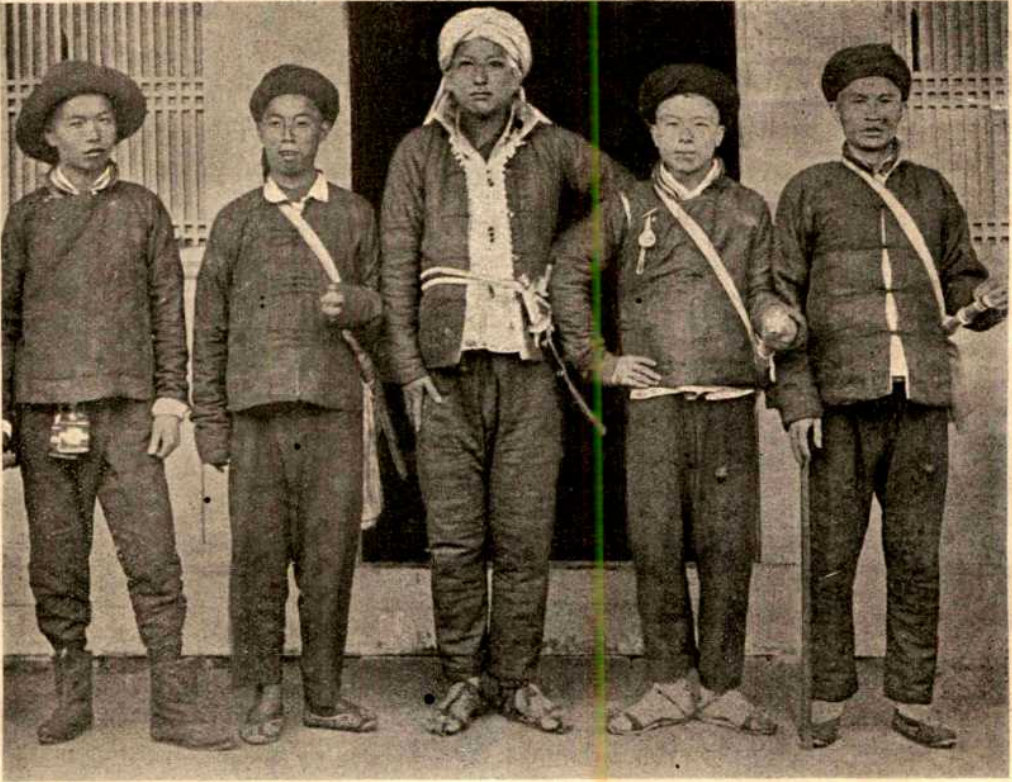
কিছুকাল পরে সংবাদ পাইলাম যে কাষ্টম কমিশনার মিঃ হাওয়েল, তাহার এসিষ্ট্যান্ট মিঃ জলি এবং নবাগত ইঞ্জিনিয়ার গ্রোভ সাহেব গত রাত্রিতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে মনে বড় দুঃখ হইল কেন সাহেব আমাদের এ বিষয় কিছুই জানাইলেন না? কাষ্টম আফিস এখান হইতে আর অর্ধ মাইল দূরে। তথায় দুইটা সাহেব এবং

একটা মেম ছিলেন। মেমওয়ালা সাহেবের নাম মিঃ ক্রেগ। ক্রেগসাহেব ও মেম বড় ভীত হইয়া পলায়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু অপর সাহেব মিঃ নিসবট্ট খুব সাহসী। ইনি স্কট-হাইল্যান্ডার এবং বহুদিন যাবত নৌসেনাবিভাগে কার্য করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার সাহসের জন্ত ইহার কহ পলায়ন করেন নাই। আমিও অনায়াসেই পলাইতে পারিতাম। সে রাত্রি পলায়নের কথা সহজে মনেও স্থান দিই নাই। তাহার কারণ আমি একে ভারতবাসী তাহাতে আবার বাঙ্গালী। প্রাণভয়ে পলাইলে লোকে কাপুরুষ ও ভীকু ছাড়া বলিত না।

শুনা গেল বিদ্রোহিগণ গত রাত্রিতে টাওঠাই বা কমিশনারের ইয়ামিন হইতে প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকার রৌপ্য অপহরণ করিয়াছে। এই টাকার অধিকাংশ কাষ্টম আফিসের শুদ্ধ আদায়ের টাকা। একএক জন এত রূপা লইয়াছে যে অনেকে রূপার ভারে চলিতে অক্ষম হইয়াছিল। টাওঠাই হত হন নাই তিনি পলাইয়াছেন। মিঃ ওয়েনকে হত্যা করিয়াছে এরূপ কথা শুনা গেল, কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন। তাহার সঙ্গে পরে দেখা হইয়াছিল। ইয়ামিনের ভিতর আরো অনেক লোক হত হইয়াছিল। জেনারাল চ্যাংকে গুলি করিয়া মারিলে তাহার স্ত্রী এক বৎসরের একটি ছেলে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন। ছেলেটাকে বিদ্রোহিগণ দয়া করিয়া হত্যা করে নাই। জেনারাল চ্যাংর বন্ধু লণ-বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ফোং (Mr. Fong) ছেলেটাকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

টাওঠাইর কোমরে রসি বাঁধিয়া ত্রিশফুট উচ্চ নগর প্রাচীর হইতে বাহিরে নামাইয়া দেওয়ার তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং মিঃ ওয়েন ভিক্ষকের বেশে নগরের উত্তর দরজা অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন।

বেলা আটটার সময় একজন আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল যে একজন বিদেশীলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। আমি বহির্কোঠিতে গিয়া দেখি যে কৃষ্ণবর্ণের একজন লোক অপেক্ষা করিতেছে, তাহার মাথার ইংরেজী টুপি, গারে বড় ওভারকোট, পরিধানে



চাং ওয়েন কোয়ানের শরীর-রক্ষক সৈন্য ।

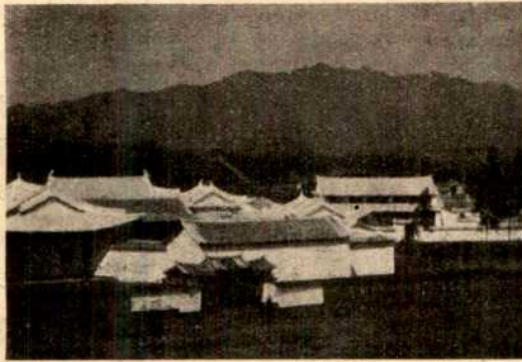
একখানা বন্দী লুঙ্গি, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া জুতা। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল তাহার নাম আপল স্বামী ওরফে জন (John)। সে অল্প ইংরাজী বলিতে পারে, হিন্দি ও বন্দী কথা বেশ জানে। সে বলিল “আমি গতকল্য মিঃ গ্রোভ, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বন্দী হইতে এখানে পৌঁছিয়া কনসালের বাড়ীতে ছিলাম। রাত্রি দশটার সময় শহরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কমিশনার হাওয়েল সাহেব, এসিষ্ট্যান্ট জলি সাহেব এবং আমার সাহেব দুইতিনজন চীনা চাকর সঙ্গে লইয়া পলায়ন করেন। ঘরের বাহির হইয়া কিছু দূর গেলে নিকটে একটা বন্দুক ফায়ার হয়, তাহাতে সকলেই ভীত হইয়াছিল এবং সাহেবদের কেহ কেহ আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। শহর ছাড়িয়া পাহাড়ের উপর ঘাইতে আমার মনে এই ভয় হইল যে চীনারা টের পাইলে সাহেবদিগকে ত মারিবেই সেই সঙ্গে আমাকেও হত্যা করিবে। আমি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য আস্তে আস্তে

পাছে পড়িয়া অন্ধকারে সাহেবগণ হইতে কিছু দূরে গিয়া পাড়লাম। সাহেবগণ আমাকে তল্লাশ করিয়া আর পাইলেন না। আমি এদেশে নূতন, পথ ঘাট চিনি না, অন্ধকারে কোথায় যাই। তাই সমস্ত রাত্রি দূরন্ত শীতের মধ্যে এক কবরর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইয়াছি। আজ প্রাতঃকালে পথ না জানিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই। চীনা কথা জানিনা, তাই বন্দীকথায় জিজ্ঞাসা করিলাম যে গত রাত্রে তিন জন সাহেব যে পলাইয়াছিলেন তাঁহারা কোথায়? বাজারের মধ্যে গত রাত্রের বিদ্রোহি সিপাইগণ উন্মত্তের মত দলে দলে বেড়াইতেছে, অনেকেই মদ খাইয়া এবং রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া চুলিয়া চুলিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিল না। আমি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলাম যে তিন জন সাহেব। অবশেষে এক ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাড়ী দেখাইয়া দিল। সাহেবদের পলাইবার কারণ এই যে

তাহাদের চাকর সংবাদ দিয়াছিল যে বিদ্রোহিগণ ইয়ামিন আক্রমণ করিয়া তাহাদের কর্মচারিদিগকে হত্যা করিয়া পরে বিদেশীদিগকে হত্যা করিবে।”

আমি ইহাকে বস্ত্র পরিবর্তন করাইয়া চা ও রুটি খাইতে দিয়া ক্ষুধ করিলাম। এবং কহিলাম তাহার মনিবকে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলেও তাহার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমি যখন এখানে আছি তখন তাহার কোন চিন্তার কারণ নাই।

এ দিকে বিদ্রোহিগণের সর্দার শহরে ঘোষণা করিয়াছে যে “প্রজাসাধারণের কোন ভয় নাই, বাণিজ্য ব্যবসা যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে। বিদেশী লোকের আমরা অনিষ্ট করিব না। আমরা কেবল কলুষিত মাগু রাজবংশ



টেঙ্গিরে শহরের কাষ্টম বা গুজ আপিস।

চাই না, এই রাজবংশ আজ ২৬৮ বৎসর রাজত্ব করিতেছে এখন তাহার শেষ। এবং তাহাদের কর্মচারিগণকেও চাই না। আমরা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিব।” বিদ্রোহিগণের সর্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানকে আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম। তখন তাঁহাকে সাধারণ লোক মধ্যে গণ্য করিয়া গ্রাহ্য করি নাই। তাঁহার এমন অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল না যাহাতে তাঁহাকে দশের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। তবে হঠাৎ এ লোকটা এমন গণ্য মান্ত হইল কি ক্ষমতায়? কাহার মধ্যে কি পদার্থ আছে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বিচার করা যায় না এবং সন্মোহ উপস্থিত না হইলেও লোকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকটা যে খুব সাহসী,

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক তাহার আব কোন সন্দেহ নাই।

সাহেবদিগের খোঁজ না পাইয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। বেলা দুই প্রহরের পর তাঁহাদের এক ভৃত্য তাঁহাদের ঘোড়া লইবার জন্ত আসিয়াছিল। সেই লোক মারফত নিসবেট সাহেব তাঁহার নিজের পত্র ও বিদ্রোহী সর্দারের পত্র পাঠাইয়া জানাইলেন যে তাঁহাদের কোন ভয় নাই। তাঁহারা নিশ্চিত চিন্তে টেক্সিয়ে ফিরিয়া আসিতে পারেন। পত্র ও ঘোড়া সহ লোক চলিয়া গেল। সেই সঙ্গে আপল



চীনা ভিক্রুক।

স্বামীর সংবাদ তাহার মনিব গ্রেভ সাহেবকে দিলাম। পর দিন বেলা ৪টার সময় অর্থাৎ ২৭শে রাত্রিতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, আর সেদিন ২৯শে অক্টোবর, তাঁহারা টেক্সিয়ে ফিরিলেন। তাঁহারা পলাইয়া প্রথমতঃ এক পর্বতগুহায় লুকাইয়াছিলেন এবং শীতে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। তৎপরে ষোল মাইল দূরে এক উষ্ণ প্রস্রবণের নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়া আশ্রয় লন।

এদিকে গত রাত্রির ঘটনায় লোকের মনে এমন আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। লোকের

মনে ধারণা হইয়াছে যে যখন রাজকর্মচারিগণ ধৃত হইয়াছেন বা পলায়ন করিয়াছেন তখন প্রজার রক্ষাকার্য্য এই বিদ্রোহীদের দ্বারা হইবে না। গত রাত্রিতে তাহারা ইয়াসিন লুটে ব্যস্ত ছিল, আজ তাহারা শহর লুট করিবে। এই ভয়ে যাহারা গত রাত্রিতে পলাইতে পারে নাই তাহারা আজ পলাইতেছে। মহাজনগণ আপন আপন টাকাকড়ি ও মালপত্র খচ্চরপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে। গুজব উঠিল আজ রাত্রে লুট ও হত্যা আরো ভয়ানক হইবে। প্রত্যেকের মনেই বিবাদের চিহ্ন। আমার কোন কোন চীনা বন্ধু কহিলেন যে “আপনি অল্প রাত্রে কোন গ্রামে কোন পরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করুন।” বন্ধুটি আরো কহিলেন যে “এখানে বিদেশী-দিগের রক্ষক কনসাল সাহেব নাই, কমিশনার পলায়ন করিয়াছেন, সুতরাং আপনার একাকী আজ এখানে থাকা কর্তব্য নহে।” আমি কহিলাম যে “আমি অস্ত্র যাইব না, তবে আমার জামাতার জন্ত একটু আশঙ্কা, তাহাকে অস্ত্র পাঠাইব।” কিন্তু আমার জামাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সাহসে ভর করিয়া রহিলাম কিন্তু মনে বড় আশঙ্কা রহিল। নিস্বেটে সাহেবকে কহিলাম যে আজ রাত্রি বড় আশঙ্কার রাত্রি। আমাদের বাড়ীতে পাহারা থাকে তজ্জন্ত বিদ্রোহীর সর্দারকে অনুরোধ করিলাম। পাহারা আসিবে এমন অঙ্গীকার পাইলাম কিন্তু কোন পাহারা আসিল না। সন্ধ্যার সময় আহালাদি করিয়া বাড়ীর সমস্ত দরজা বন্ধ করিয় ভিতরে আমরা পূর্ব রাত্রের মত আত্মরক্ষার সমস্ত আয়োজন করিয়া উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কোন স্থানে একটু গোলমাল শুনিলে বা বন্ধুকের আওয়াজ শুনিলে অমনি যেন প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আজ আমিও অনেকটা বিচলিত হইলাম। আপনাকে আপনি নিন্দা করিলাম যে আমার রূপ হুঃসাহসে নির্ভর করা অস্ত্রায়। ভয়েতে আপলস্বামী কাঁদিতে লাগিল যে সে কেন তাহার জ্বী পুত্র ফেলিয়া এখানে মরিবার জন্ত আসিয়াছিল, সে মরিলে তাহাদের কি উপায় হইবে? তাজদীনও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। এই ভাবে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিল। কিন্তু কোন প্রকার

ঘটনা কোথায়ও ঘটে নাই। তাহা সর্দার চাংএর বাহাদুরী বটে। তিনি এই রাত্রে সমস্ত রাত্তার অস্ত্রধারী পাহারা রাখিয়া দিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে রাত্রি নয়টার ভোপ পড়িবার পর কেহ যেন রাত্তার বাহির না হয়। তখন যাহাকে রাত্তার পাওয়া যাইবে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইবে। সুতরাং এই কড়া শাসনে বদমাইস্গণ রাত্তার বাহির হইতে সাহস পায় নাই।

কানসালের কেরাণী মিঃ হানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিদ্রোহীর গত রাত্রিতে আঘাত করিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহাকে দেখিবার জন্ত তাঁহার লোক আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিল। তিনি কেল্লার ভিতরে। তথায় বিদ্রোহিগণ কাণ্ডাকাণ্ডজনীন হইয়া বেড়াইতেছে। তথায় যাইতে আমাকে সকলে নিষেধ করিল। কিন্তু আমি তাহা না শুনিয়া কর্তব্যের অনুরোধে গেলাম। গিয়া দেখি মিঃ হানের সদর দরজার সম্মুখে রাত্তার ধারে একটা অল্পবয়স্ক লোককে বিদ্রোহীগণ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবিধ অবস্থায় এমন স্থানে যাওয়া কতদূর বিপদসঙ্কুল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হানের ভ্রাতাকে ঔষধ দিয়া ফিরিলাম।

একটুক টেলিগ্রাফ পাঠান বন্ধ। বিদ্রোহিগণ গত রাত্রে টেলিগ্রাফ আফিসের সমস্ত সামগ্রী লুটিয়া লইয়া কল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এত বড় একটা ঘটনা হইল, তাহা টেলিগ্রের বাহিরের লোকে কেহ জানিতে পারিল না। আমি ঘটনাটী সংক্ষেপে লিখিয়া ডাকে ভাসো পাঠাইয়া আমার এজেন্টকে লিখিলাম তাহা রেজুন গেজেটে এই সংবাদ যেন পাঠাইয়া দেয়।

কমিশনার ফিরিয়া আসিবার পরদিন বিদ্রোহীর সর্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বন্দী গবর্ণমেন্টকে এক টেলিগ্রাম পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই টেলিগ্রাম না পাঠাইলে আন্তর্জাতিক বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে এই ভয়ে সর্দার চাং নাকি উহা পাঠাইয়াছিলেন। সাহেবদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলাম যে গত রাত্রি অত্যন্ত আশঙ্কায় কাটিয়াছে। তাহাতে কমিশনার সাহেব কহিলেন যে আপনি যদি ভয় পান তাহা হইলে রাত্রিতে আমার বাড়ীতে আসিয়া শয়ন করিতে পারেন। আমি তাঁহাকে

ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম যে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি। আবার জলি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনিও ঐ কথা বলিলেন। তখন আমি কহিলাম “আপনারা নিজে ভয়ে পলাইলেন আবার আমাকে আপনার বাড়ীতে বাইরা থাকিতে কহিতেছেন।” এখানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া ফ্রেন্স ও তাঁহার মেম, শ্রীমান নীতীশ ও দরজা তাজদীন, ইঞ্জিনিয়ার গ্রোভ ও আপল স্বামী প্রভৃতিকে বন্দায় ১লা নবেম্বর পাঠান হইল। তাঁহাদের জন্ত পাসপোর্ট পাওয়া গেল।

২রা নবেম্বর আমি ডিম্পেনসারিতে কার্য্য করিতেছি এমন সময় পাদ্রী ফ্রেজার সাহেব আসিয়া আমাকে কহিলেন যে “ডাক্তার, কমিশনার প্রভৃতি ভামো চলিলেন, আমিও চলিলাম, আপনিও চলুন।” আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম যে সেকি, আমি এক মুহূর্তের নোটিশে টেক্সিয়ে ত্যাগ করিতে পারি না। তিনি কহিলেন “আমিও সমস্ত ফেলিয়া চলিলাম।” আমি কহিলাম “আপনার কার্য্য ও আমার কার্য্যে অনেক প্রভেদ। আপনার কার্য্য বহুত্ব করা ও ধর্ম্মপ্রচার করা, আর আমার কার্য্য রোগ চিকিৎসা করা। কএকটা সম্ভ্রান্ত রোগী আমার হাতে, অনেকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদিগকে না বলিয়া বা তাঁহাদের অর্থ ফিরিয়া না দিয়া পলাইলে তাঁহারা কি মনে করিবেন? বিদেশীর নামে কলঙ্ক হইবে।” তিনি তখন কহিলেন যে “আপনি কাষ্টম হাউসে যান আমি তথায় চলিলাম।” আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া কাষ্টম আফিসে গিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করার তিনি কহিলেন “You better come chop chop.” তখন অন্ত্রোপায় হইয়া বাসায় ফিরিয়া চাকরদিগকে বেতন দিয়া কয়েকখানা বিস্কুট সঙ্গে লইয়া এবং একটি ওভারকোট লইয়া তাড়াতাড়ি কাষ্টম হাউসে উপস্থিত হইলাম। তথায় সর্দার চাং ও বিদ্রোহী সৈন্তের দলপতিগণ সাহেবদিগের সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে টেক্সিয়ে পরিত্যাগ না করিতে পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন যে আপনাদিগকে আমরা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আপনাদের কোন ভয় নাই। অনেক পীড়াপীড়ির পর হাওয়ারেল

সাহেব রাজি হইলেন। সেদিন আর যাওয়া হইল না।

আবার পরদিন ৩রা নবেম্বর সাহেব আমাকে ডাকিয়া কহিলেন যে “আমরা আগামী কল্য টেক্সিয়ে পরিত্যাগ করিব। আপনি প্রত্যুষে ৬টার সময় প্রস্তুত থাকিবেন।” আমি কহিলাম “আমার সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ঔষধপত্রাদি এবং নিজের মূল্যবান দ্রব্যাদির কি করিব?” তিনি কহিলেন যে “মূল্যবান দ্রব্যাদি মাটির নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখুন। তাহাতে যদি কোন দ্রব্য ধোয়া যায় তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ পাইবেন।” আমি তথাস্ত বলিয়া বাড়ী আসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাত্রি কালে প্রস্তুত হইলাম। দুই-জন চাকরকে বাড়ী রক্ষার জন্ত এক মাসের অগ্রিম বেতন দিয়া রাখিয়া পরদিন প্রত্যুষে দেখি যে হাওয়ারেল সাহেব ও জাল আমার দরজায় হাজির।

(ক্রমশঃ)

টেক্সিয়ে, চীন।

শ্রীরামলাল সরকার।

ভক্ত প্রকাশচন্দ্র

উপনিষদের প্রাচীন ঋষি ঈশ্বরকে বলিয়াছেন “রসো বৈ সঃ” অর্থাৎ তিনিই রসস্বরূপ। তাঁহার সত্তার মধ্যে ভুবিশা প্রেমের অমৃতরস পান করিতে পারিলেই জীবনের অনন্ত তৃষ্ণা নিবারণ হয়, প্রাণ তৃপ্তি লাভ করে।

কিন্তু বর্তমান কালে এই কথাটা আমাদের কাছে বিশ্বাস করানো বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভ্রমর যেমন মধুপানের জন্ত ফুলে ফুলেই ঘুরিয়া বেড়ায়; আমরা তেমনি স্নুথের জন্ত সংসারের ভোগের বস্তুর মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। চক্ষুর সন্মুখের এইসকল রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ব্যতীত আর যে কোন অদৃশ্য অনন্ত পুরুষের মধ্যে অসীম রূপ ও অমৃত রস আছে এবং উহার জন্তই যে জীবনের অনন্ত তৃষ্ণা ও অন্তরাশ্বা ব্যাকুল, এ কথা কয় জন লোকই বা বিশ্বাস করে, কয় জন লোকই বা অনন্ত পুরুষের সত্তার মধ্যে ভুবিসার জন্ত সাধনে প্রবৃত্ত হয়?



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায়।

সুতরাং এই সংশয়ের যুগে যে চক্ষুয়ান্ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহার স্বরূপমাপুর্নো মুগ্ধ হন, তাঁহার প্রেমে ডুবিয়া অমৃতরসে জীবনকে মধুময় করেন এবং সেই জীবনের আকর্ষণে নরনারীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল পুরুষের সমীপে লইয়া যান, তিনি আমাদের সকলেরই সমাদরের পাত্র। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র এই রকমের একজন সমাদরের পাত্র ছিলেন। সেই জন্ত তাঁহার জীবনের ভক্তির কাহিনী ও প্রেমের কথা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রকাশচন্দ্র দেশের সমস্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কোন বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করেন নাই; এক একটি ফুলের গাছ যেমন আপনার ফুলগুলিকে সবুজ পাতার মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, তেমনি প্রকাশচন্দ্র তাঁহার সুন্দর জীবনটিকে ব্রাহ্মসমাজের গুটিকয়েক মণ্ডলীর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই জন্ত বাকিপুর বাতীত দেশের অনেক স্থানের লোকেরাই তাঁহার বিষয় তেমন কিছুই জানেন না।



স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী দেবী।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বিস্তার পুরুষ ও নারী তাঁহার জীবন-পুষ্পের মধুর সৌরভে আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের মেহের পাত্র, প্রতাপচন্দ্রের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরম সহৃদয় এবং অনেক ব্রাহ্ম পুরুষ ও রমণীর পথ-প্রদর্শক ও পরম আশ্রয় ছিলেন। আমরা অনেকেই তাঁহার জীবনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া ভক্তি শিক্ষা করিয়াছি। বলিতে কি, প্রকাশচন্দ্রের ত্রায় উদারচিত্ত, সরলহৃদয়, নিকামকর্ম্মী, ঈশ্বরভক্ত ও মানব-প্রেমিক ব্রাহ্মসমাজে যে খুব বেশী আছে, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্ত তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমরা আজ চোখের জল ফেলিতেছি এবং তাঁহার জীবনের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিতে আপ্ত হইতেছি।

প্রকাশচন্দ্র ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে বহরমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস চব্বিশপরগনার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে। তিনি ১৮৬৩ সালে হেয়ার স্কুল

হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮ বৎসর বয়সের সময়ই প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিধাতা তাঁহার হৃদয়পাত্র প্রেমে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে এই প্রেম দেখিব ও মানবের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তরুণ বয়সে এই প্রেম একমাত্র পত্নীর হৃদয়খানি অধিকার করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জী মেশে থাকিতেন, আর তিনি কলিকাতায় থাকিয়া প্রেমমুগ্ধ চিন্তে পত্নীর কথা ভাবিতেন। এই প্রেম হইলে আর পড়াশুনা হয় কেমন করিয়া? প্রকাশচন্দ্র পরিণত বয়সে তরুণ জীবনের প্রেমস্বপ্নটি স্বপণ করিয়া বাল্যবিবাহের নিন্দা করিতেন। তিনি এফ-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া আব বেশি পড়া শুনা করিতে পারেন নাই। অর্থের অভাবও ইহার একটি কারণ ছিল।

প্রকাশচন্দ্রের বাল্যকালে দেবদেবতাব প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল। কিন্তু কোন ঘটনায় সেই ভক্তি হ্রাস হইয়া গেল। তাহার পর খ্রীষ্টান ধর্মের দিকেই তাঁহার মন ফুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এক দিন কয়েকটি ব্রাহ্ম-যুবকের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দেওয়ার তাঁহার মনের পরিবর্তন হইল। তিনি চোখেব জল ফেলিতে ফেলিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন—“ঈশ্বর! তোমার নিকট সকলে প্রার্থনা করিল, আমি তোমাকে চিনিও না, জানিও না, যদি তুমি থাক এবং তোমার ইচ্ছা হয়, ত আমাকে দেখিতে ও চিনিতে দাও।”

প্রকাশচন্দ্রের বাহিবে কোন ধর্ম নাই, কিন্তু অন্ধরের ভিতর যে কি মহত্ব ও মধুর ভাব লুকানো আছে, ব্রাহ্ম-যুবকেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের শ্রীতি ও সত্তাবে আকৃষ্ট করিয়া প্রকাশচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া আসিলেন।

এই সময় কেশবচন্দ্র ধর্মের মহাশক্তিতে শক্তিশালী হইয়া শিক্ষিত যুবকদিগেব অন্ধরে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার উপাসনায় যোগদান করিয়া ব্রাহ্মধর্মের অমুরাগী হইয়া উঠিলেন। শুধু তিনি নিজেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ভূপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী অঘোরকামিনীকেও ব্রাহ্মধর্মের

কথা শুনাইলেন। এই সময় অঘোরকামিনীর বয়স স্ত্র, শিক্ষাও অতি সামান্য; কিন্তু শিক্ষা সামান্য হইলে হইবে কি? এই অসামান্য নারীর ভিতবে যে বলিষ্ঠ আত্মা বিরাজ করিতেছিল, তাহার শক্তি ত নিতান্ত অল্প নহে। অল্প নহে বলিয়াই পরিণত বয়সে তিনি সেবা ও দানের দ্বারা বাকিপুরবাসী বাঙ্গালী ও বিহারী, হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরই প্রকার পাঞ্জী হইতে পারিয়াছিলেন। এই রমণী ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনিয়া উহার মহত্তাব হৃদয়স্থ করিতে পারিলেন; স্বামীর সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি নীতি মানিয়া চলিবাব জন্য সংকল্প করিলেন। তিনি শান্তদ্বীর সঙ্গে শ্রুতশ্রাবণে বাস করিতেন। এই সংকল্প রক্ষা করিতে গিয়া সকলের গজনা সঙ্ঘ করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি তাঁহার বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

অতঃপর প্রকাশচন্দ্র বিষয়কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিছুদিন পোষ্টাফিসেব কার্য করিয়া ও প্রেস চলাইয়া হরিনাতি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া উক্তস্থানে কর্ম করিলেন। তৎকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র স্বীয় পত্নীকে লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। ইহার পূর্বে অঘোরকামিনী দেবী কোন ব্রাহ্মপরিবারে মিশিনার সুযোগ পান নাই। এখন তাঁহারা দুই স্বামী জী শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্মভাব দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে একত্র উপাসনা করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। অঘোরকামিনীর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রজ্ঞা বাড়িয়া গেল। অবশেষে প্রকাশচন্দ্র সরকারি কর্ম পাইয়া মতিহারি গমন করিলেন। এই স্থানে সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে তাঁহা মিলন হইল। সাধু অঘোরনাথ ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঐ দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের দুই শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিতে প্রমত্ত এবং অঘোরনাথ যোগে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতেন। ইহাদের জীবনের সংস্পর্শে শত শত পুরুষ ও রমণীর চিত্ত ঈশ্বরোন্মুখী হইয়াছে। প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী, অঘোরনাথের বৈরাগ্য, কঠোর দান এবং উন্নত জীবন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের অন্ধরে সাধনের স্মৃতি বলবতী হইল। তাঁহারা হৃদয়ে

পাবিলেন, সংসারের কুহুমোন্তান ও ভক্তির অমৃত-নিরুর ইহার মাঝখানে তপস্তার একটা মরুভূমি আছে। দৃঢ়সংকল্প, সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই মরুভূমি পার হইতে না পারিলে প্রকৃত ভক্তি লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য হুজনেই কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সুখস্পৃহা ধর্ম করিতে লাগিলেন। একটু একটু করিয়া আসক্তির পাশ ছিন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার স্বপ্ন আশ্রয়দৃষ্টির দ্বারা অস্তরের ত্রিপুণ্ডলিকে চিনিয়া লইলেন। বৈরাগ্যের অগ্নিতে সেগুলি ভস্ম হইতে লাগিল; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় উপাসনা, নামগান, ভক্তসঙ্গ ও ব্রহ্মোৎসব ইহাদের জীবনের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছুই স্বামী জী উপাসনায় বসিয়া প্রেমে ও পুলকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। বাঁকিপু্রে ব্রহ্মোৎসব ও ভক্ত সনাগম হইলে হুজনেই ব্যাকুল হইয়া সেখানে গমন করিতেন। তৎকালে তাঁহার মাস্তোহের উপর কতটা জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করিব। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় প্রকাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই সুবোধ মতিহারিতে তরুণবয়স্ক বালক ছিলেন। তাঁহার পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া প্রকাশচন্দ্র ও অধোরকামিনী দেবী তাঁহাকে মতিহারি রাখিয়া বাঁকিপুর্ গমন করিলেন। তখন বাঁকিপু্রে ব্রহ্মোৎসব। কলিকাতা হইতে খ্যাতনামা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য বাঁকিপু্রে গিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী উৎসবে যোগদান করিয়া নব নব ভাব লাভ করিতে লাগিলেন। উৎসবের শেষ দিন মতিহারি হইতে একটি টেলিগ্রাম আসিল; হঠাৎ সুবোধের কলোবা হইয়াছে। সুবোধের কাছে আপনার লোক কেহই নাই। সুতরাং মা বাপের প্রাণ সন্তানের জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহা বলাই নিম্প্রয়োজন। সেই সময়ই মতিহারি বাইবার ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে রওনা হইলে তাহার পরদিন সকালেই মতিহারি পৌঁছিতে পাব যায়, কিন্তু তাঁহা বা উৎসবের শেষ উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না।

উৎসবের শেষ উপাসনায় যোগ দিবার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান, তাহা কি সন্তানের জন্য অগ্রাহ্য করা যায়? সন্তানকে ঈশ্বরের করুণাব হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উৎসবের উপাসনায় ডুবিয়া গেলেন। ভক্তের সন্তানকে স্বয়ং ভক্তবৎসল রক্ষা করিলেন।

এই সময় অধোরকামিনী দেবী রমণীর আসক্তির সামগ্রী উত্তম বসন ভূষণ ত্যাগ করিলেন। অতি যত্নের স্বর্ণভরণধারি হুর্ভিক্ষ-ক্ষেপে দান করিলেন। ইহার পর তিনি যে বেহারের তৈরী সামান্য বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাঁহার অঙ্গে মূল্যবান বস্ত্র অথবা স্বর্ণভরণ কেহ দেখিতে পাইল না। তিনি যখন সেবাত্রিত গ্রহণ করিলেন, তখন বাঁকিপু্রের কমিসনারের সম্মুখেও সেই সামান্য পোষাক পরিয়াই আসিতেন। সাহেবেরা তাঁহার সেবাত্রিতের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রকাশচন্দ্র মতিহারি হইতে বাঁকিপু্রে বদলি হইলেন। বাঁকিপু্রেই তাঁহার কর্মের উন্নতি হইল। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদলাভ করিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সেবার ও সাধনের ক্ষেত্র নিরূপিত হইল।

এই বাঁকিপু্রের সাধনক্ষেত্রে প্রকাশচন্দ্র ও অধোরকামিনী দেবী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। এই সময় প্রকাশচন্দ্রের বয়স ৩৪ বৎসব এবং তাঁহার জীবন বয়স ২৬ বৎসর। তাঁহাদের তিনটি পুত্র, দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে; আর অধিক সন্তান হইলে কিরূপে দীর্ঘকাল সাধনে কাটাইবেন? কিরূপে ঈশ্বরের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিবেন? কিরূপে সেবাত্রিত অবলম্বন করিবেন? সুতরাং তাঁহারা গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ শুধু কল্পনায় নয়। যে রাজগৃহকে মহাত্মা বুদ্ধদেব পবিত্র করিয়াছিলেন, ইহার সেই রাজগৃহে গমন করিলেন। সেখানে স্বামী জী উভয়ে মস্তক যুগুন করিয়া “আধ্যাত্মিক বিবাহ” নামক নবসংহিতার লিখিত একটি অমুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। কঠোর সাধনই এই অমুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এই অমুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁহাদের পার্থিব স্ত্রের লালসা যেন চরণতলে ধুলির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল এবং তাঁহাদের আত্মা শুভ্র কপোতের জায় উর্দ্ধে প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্যে উঠিয়া বাইতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পূর্বেই প্রকাশচন্দ্রের বড় মেয়ে সুসাবের বিবাহ হইয়াছিল। সুসার ধর্মশীলা রমণী ছিলেন। আনরা তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। এই সুসাবের জন্ত প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীকে ঘোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া উহাতে জয় লাভ করিতে হইয়াছিল। সেই জন্তই সুসারের জীবনের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিব। ইহা পাঠি কবিতা বিরোগান্ত উপজ্ঞাসের মর্যাস্তিক কাহিনী বলিয়া মনে হইবে।* কিন্তু তাহা হইলেও এই ঘটনা সত্য। ব্রাহ্মসমাজেব অনেক পুরুষ বমণী এই ঘটনা জানেন; সকলে জানেন বলিয়াই আজ লিখিতেছি।

সুসারের বিবাহের বরস হইল; পিতা মাতা পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার মনেব ইচ্ছা জানিতে চাহিলেন। সুসার একটুকু কাগজে লিখিয়া দিলেন—“আমি বৃন্দাবনকে ভালবাসি।”

এই বৃন্দাবন নির জাতির একটি সচরিত্র যুবক। সে হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র বৃন্দাবনকে ভাল ছেলে বলিয়াই জানিতেন। সুতরাং তাঁহার সরল ও উদার চিত্ত বৃন্দাবনের হস্তেই কস্তা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু আত্মীয় স্বজনবর্গ ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিলেন। প্রকাশচন্দ্র উচ্চ বংশের বঙ্গজ কায়স্থ; তাঁহার পত্নী রাজা প্রতাপ-আদিত্যের বংশের কস্তা; এখন কি না ছোট জাতির ছেলের সঙ্গে মেয়েব বিবাহ দিবেন! হিন্দুসমাজের আত্মীয়েরা কেমন কবিতা এই দৃষ্ট দর্শন করিবেন? কিন্তু প্রকাশচন্দ্র কোমলহৃদয় কস্তার অনুরোধই রক্ষা করিলেন; বৃন্দাবনের সঙ্গেই সুসাবের বিবাহ হইয় গেল।

ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, তাহা কে বলিবে? এই বিবাহের পরিণাম অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমময়ী সাধবী পত্নীকেও ত্যাগ করিয়া সে পুনর্বার প্রাচীন হিন্দুসমাজস্থ আর একটা বালিকার পাণিগ্রহণ করিল।

বৃন্দাবনের বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছিল। আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইলেই তাহাকে কঠিন শাস্তি পাঠিতে হইত। কিন্তু সুসার কি

সেই বকমের মেয়ে? তিনি স্বামীর বিবর্ত্তে একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না, নিজেব অদৃষ্টকেও থিকার দিলেন না; স্বামীর প্রতি যে প্রেম এবং সেই প্রেমের প্রতি উপেক্ষায় যে ক্লেশ—এই উভয়কেই নিভৃত মর্শ্বস্থানে গোপন রাখিয়া ঈশ্বরের সেবিকা হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি আপনার অপ্লেব আভরণ খুলিয়া রাখিয়া সুখের স্মৃতি বর্জন করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইলেন।

এই ঘটনার প্রকাশচন্দ্রের অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। অনেকেই বলিলেন, “আমরা ত আগেই এই বিবাহে বাধা দিয়াছিলাম; কিন্তু প্রকাশ বাবু সর বিষয়েই বাড়াবাড়ি। তিনি আমাদের কথা ত শুনিলেন না; এখন তাহার ফল ভোগ করুন।”

বিধাসী প্রকাশচন্দ্র লোকের এই তিবন্ধারে কি অনুতাপ করিলেন? যাহা করিয়াছেন তাহা কি অমায় কার্য বলিয়া বুঝিলেন? একটি দিনের জন্তও না। এই ঘটনার মূলে যে ঈশ্বরের গৃহ উদ্বেগ আছে, ঈশ্বরে যে সুসারকে সেবার গৌরবে গৌরবাবিভা করিবেন—প্রকাশচন্দ্র তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সুতরাং তাঁহার আর কোন্ডের কাষণ রহিল না। প্রকাশচন্দ্রের বিশ্বাসের বল ও হৃদয়ের শক্তি যে কত, তাহা আমরা এই ঘটনার দ্বারা অনুমান করিতে পারি।

সৌভাগ্যবশতঃ সুসারের সঙ্গে আমাব আলাপ হইল। আমি তাঁহার মহত্বের কথা জানি। বিধাতার গৃহ কোশল অকল্যাণের মধ্য দিয়াই কল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুসার স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা হইয়া ঈশ্বরের প্রেমেই ছুড়-ইল চাহিয়াছিলেন; তিনি জননীর মৃত্যুর পর ব্রতধারিণী হইয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্যকেই সমাপ্ত করিয়া তুলিতে ছিলেন। হায়, এমন সময় নির্দিয় মৃত্যু আসিয়া সুসারের জীবনকুসুম ছিন্ন করিল! এই সেবাপরায়ণা কস্তার মৃত্যুতে প্রকাশচন্দ্র ঈশ্বরকে কি বলিলেন? তিনি কন্যার শ্রাদ্ধের দিন বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া ভগবানকে বলিলেন—“আমার ডান হাতখানি * এখন লইয়া গিয়াছ, তখনও অভিযোগ করি নাই; এখন অপর হাতখানি লইয়া গেলে, তথাপি আমার কোন অভিযোগ নাই—”। আজ আর

প্রকাশচক্রের সকল কথা মনে নাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসোচ্ছল ও প্রেমোদ্বীগিত মুখচ্ছবিতে যে স্বর্গের শোভা দেখিয়াছিলাম, তাহা এখনও মনে আছে।

জুসারের বিবাহ ব্যাপারের পর প্রকাশচক্র ও তাঁহার পত্নী বেহারের একটি বিশেষ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেহার অঞ্চলে স্রোজাতির দুঃখের আর সামান্য নাই। ভক্ত পরিবারের মহিলাগণও অশেষ নির্ধাতন সহ করেন। তাঁহাদের মধ্যে একটুকু জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে নাই। ঐসকল মহিলাগণের শিক্ষার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। কিন্তু প্রকাশচক্র গবর্ণমেন্টের কার্যেই অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন। একজন তাঁহার অজ্ঞানিনী দেবী অধোরকামিনীই উক্ত কঠিন কার্যের জন্য কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন,—তিনি গৃহসংসার-স্বামী ও পুত্রকন্যা সকলই দূরে রাখিয়া লক্ষ্যে চলিয়া যাইবেন; সেই প্রোঢ় বয়সে লক্ষ্যে ঐষ্টানদিগের বোর্ডিঙে থাকিবেন এবং ট্রেনিং স্কুলে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিবেন; তাহার পর বাঁকিপুর আসিয়া মেয়েদের জন্য স্কুল ও বোর্ডিং খুলিবেন।

একটি বঙ্গমহিলার প্রোঢ় বয়সের এই সংকল্পের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাঁকিপুরের অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার এই সংকল্পে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“সে কি কথা? ঘর-সংসার ফেলিয়া কোথায় যাইবেন? এই বয়সেও কি মেয়েদের কাছে গিয়া লেখাপড়া শেখা সম্ভব?”

তাঁহারা তখনও এই মনস্বিনী নারীর শক্তির পরিচয় ভাল করিয়া পান নাই। প্রকাশচক্র প্রেমের সাধন দ্বারা এই রমণীর হৃদয়ে এমন এক শক্তি উৎপন্ন করিয়াছিলেন, যে শক্তির সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিত না। দেবী অধোরকামিনী একবার স্বামীর সঙ্গে দেশভ্রমণে ব্যক্তি হইয়াছিলেন। চিত্রকূট গমন করিয়া পাকী কি গাড়ী কিছুই পাইলেন না, অথচ পথ চলিতে হইবে অনেক। ছুটি ঘোড়া পাওয়া গেল; কিন্তু অধোরকামিনী ত কোন দিনই ঘোড়ার চড়েন নাই। ঘোড়ায় না চড়িলেও সেদিন যে অবস্থায় পড়িলেন, সাহসের সহিত তাহারই মত ব্যবস্থা করিলেন; তিনি বীরাদনার স্তায় অস্বাভাবিক করিয়া

চলিতে লাগিলেন। এই তেজস্বিনী রমণী এখন আবার স্কুল চালাইবার মত শিক্ষা লাভ করিবার জন্য লক্ষ্যে চলিলেন। লক্ষ্যের বোর্ডিংএর কর্তী একজন ইংরাজ মহিলা। তিনি এই নূতন রকমের বাঙ্গালী জীলোকটির বৈরাগ্য ও সংকল্পের বল এবং আশ্চর্য ধর্মতাব দেখিয়া ইহঁার প্রাণ অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে প্রকাশচক্রের মহত্বের বিষয় একবার চিন্তা করা আবশ্যিক। তিনি ডেপুটি কালেক্টর; সরকারি কর্মে প্রায়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়। ধর্মসাধনে সময় অতিবাহিত হয়; অথচ স্বয়ং সংসার ও সন্তানদিগের ভার গ্রহণ করিয়া পত্নীকে হিন্দুস্থানী নারীদিগের দুঃখ মোচনেন জন্য লক্ষ্যে পাঠাইয়া দিলেন। ‘ঈশ্বর-প্রেমিক ধার্মিক লোক ব্যতীত এ রকম কার্য কি যে-সে লোকের পক্ষে করা সম্ভব? এই সময় দেবী অধোরকামিনী লক্ষ্যে হইতে প্রকাশচক্রকে যেসকল পত্র লিখিতেন, তাহার একখানি পত্রের কিয়দংশ এখানে প্রকাশ কবিতোহি :—

“তুমি যাঁহা বলিয়া দিবে, এ দাসী শ্রাণ দিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। * * আর কি কঠিন কাজ মা দিবে, যা আমরা করিতে পারিব না? না পারি করিতে করিতে তো যাইতে পারিব? * * যদি আমাদের দ্বারা তাঁহার করাইতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই পারিব। * * সমস্ত রক্ত দিলেও কি যার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না? * * তোমার সাধ পূর্ণ কবিবার জন্য মা যে এ জীবন কিনিয়াছেন। যখন ভাবি, তখন যে কি হৃদয় পাই, তোমাকে কি বলিব? * * যতই নিকট হইতেছি, ততই আরও নিকট হইতে ইচ্ছা করে। নৈকট্যের কি শেষ নাই?”

অধোরকামিনী দেবীর লক্ষ্যের শিক্ষাও শেষ হইতে লাগিল, আর কার্যকল্পনার তাঁহার এবং প্রকাশচক্রের চিন্তা আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ভবিষ্যতের কার্য সম্বন্ধে ইহঁারা কি রকম কল্পনা কবিতেন, তাহা “অধোর-প্রকাশ” গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কবিতোহি। দেবী অধোরকামিনী তাঁহার ডায়েরিতে লিখিতেছেন :—

“এই ত কাজের বিনিয়োগ পড়িল। কত কাজ যে করিতে হইবে, তাহাও জানি না; কিন্তু করিতেই হইবে। একটি উপাসনা-গৃহ, একটি মেয়েদের স্কুল, একটি পীড়িতাশ্রম, একটি ছাত্র-আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। স্কুল ত অতি শীঘ্র কবিতোহি হইবে। ধন্য আপাততঃ মাদে আর ১০০ শত টাকা করিয়া লাগিবে।”

অবশেষে অধোরকামিনী দেবী লক্ষ্যে হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বাঁকিপুরে বধ্যত

নামা উকিল গুরুশ্রাদ্ধ সেন মহাশয় অধোরকামিনী দেবোকে অতিশয় শ্রদ্ধা বরিতেন। তিনি বাকিপুরের পুরাতন বালিকা স্কুলটির ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় পনেরটি হিন্দুস্থানী বালিকা আসিয়া স্কুলে ভর্তি হইল। ধীরে ধীরে দেবী অধোরকামিনী মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং খুলিলেন। স্কুলটি এণ্টেন্স স্কুলে পরিণত হইল। এই সময়ে প্রকাশচন্দ্রের উপাধিকৃত অর্থ হইতে কিছু কিছু টাকা দিয়া বোর্ডিংএর ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। প্রকাশচন্দ্র ও দেবী অধোরকামিনীর কার্যের চিত্র-স্বরূপ স্কুল ও বোর্ডিংটি এখনও বাকিপুরে রহিয়াছে। বোর্ডিংএর মেয়েদের জন্য প্রকাশচন্দ্র তাঁহার নয়টোলায় বাড়ীর একটি অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন বোর্ডিং-অন্ত বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে।

ইহারা শুধু স্কুল ও বোর্ডিং করিয়াই সেবার কার্য সমাপ্ত করেন নাই। দুঃখী ও পীড়িত লোকেরা ইহাদের গৃহে আশ্রয় পাইত। প্রকাশচন্দ্র মধুর ধর্মোপদেশের দ্বারা দুঃখীদিগকে সাহুনা দান করিতেন; তাঁহার পত্নী সেবা দ্বারা কষ্ট ব্যক্তিদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিতেন। আমি বহু বৎসর পূর্বে বাকিপুর গমন করিয়া প্রকাশচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। তৎকালে একজন বক্ষারোগগ্রস্ত ভক্তলোক সপরিবারে প্রকাশচন্দ্রের গৃহে বাস করিতে ছিলেন। বলিতে গেলে প্রকাশচন্দ্র দুঃখী, পাপী ও জীবন-সংগ্রামে কষ্ট বিক্ষত এবং শাস্তিহারা নরনারীমাত্রেয়ই পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য করিতেন। কিন্তু তাঁহাকে ধর্ম ও পদস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে দেখি নাই। তিনি শোকার্ত ও শাস্তিহারা একদল পুরুষ ও রমণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশাইয়া দিতেন।

প্রকাশচন্দ্রের এইসকল সেবার কার্য সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় ব্যারিষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—

“শিশুদেবের সমগ্র জীবন ঈশ্বরচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। যত দিন পূর্ণবয়স্কের চাকুরী করিয়াছেন সমুদয় অবসর সময়ে ধর্ম সাধনে, ধর্ম প্রসঙ্গে, বাগ্মন্য সভাঙ্গে, ব্রাহ্মসমাজের ও জনসমাজের সেবার ব্যয় করিয়াছেন। এসকলের জন্য শরীরকে শরীর, অর্থকে অর্থ জ্ঞান করেন নাই। সরকারি কর্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া

বিশ্রাম করিবার জন্য একটি দিনও অপেক্ষা করেন নাই; বরং শীত ঈষতের সেবার গৃহীত হইবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন।”*

প্রকাশচন্দ্র মৃত ও জীবিত দুই জন মহাপুরুষের জীবনের আদর্শ আপনার হৃদয়-পটে আঁকিয়া লইয়াছিলেন। মহাত্মা বিত্ত তাঁহার ধর্মগুরু ও স্বামী কাউন্ট টলষ্টয় তাঁহার জীবনের পরম বন্ধু ছিলেন। সকলে জানেন উক্ত দুই মহাত্মা পাপী ও অসহায়ের পরম সুহৃৎ। বিত্ত শিষ্যদ্বিতীয়ক পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন—“আমি দুঃখী পাপীর জন্যই এই পৃথিবীতে আনিয়াছি। লোকের সেবা পাইতে আমি আসি নাই, কিন্তু আমিই লোকের পরিত্রা করিব। নরনারীর মুক্তির মূল্য স্বরূপ আমিই আমার জীবন দান করিব।”

এই মহতী বাণী ভক্ত ও সেবাপরায়ণ খ্রীষ্টানদিগের অন্তরে কিরূপ করুণা ও সেবার ভাব জাগ্রত করিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। এই মহতী বাণী প্রকাশচন্দ্রের অন্তরে করুণা ও প্রীতি উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত। আমি এখন বাকিপুরে বাস করিতাম, তখন পাপপঙ্ক পতিও এক অভাগিনী নারী প্রকাশচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই জীলোককে আশ্রয় দেওয়ার প্রকাশচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহাকে তীব্র ভৎসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র করুণায় আর্জ হইয়া অপ্রসিক্ত নহেন বলিয়াছিলেন—“আমি পাপীদের জন্য। আপনারা আমায় দুঃখী ও পাপীদের দলেই রাখিয়া দিবেন। আমি নেন তাহাদের জন্যই অপ্রবিসর্জন করিতে পারি।”

আমরা জানি প্রকাশচন্দ্র পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া বন্ধুদিগের সহানুভূতি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন। দুঃখী ও শাস্তিহারা নরনারীর প্রতি প্রকাশচন্দ্রের সহানুভূতি কিরূপ প্রবল ছিল সে বিষয়ে আমি স্থানে স্থানে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

একবার শীতকালে বাঙ্গলাদেশে একটি সার্কানের দল বাকিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর শীতে ঐ দলের একটি যুবকের নিউমোনিয়া রোগ জন্মিল। যুবকটি বিদেশে অসহায় অবস্থায় রোগে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ঐই অসহায় যুবকের কঠিন পীড়ার কথা প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী শুনিতে পাইলেন। আর কি তাঁহারা

* ব্রাহ্মসভায় পঠিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

হিব থাকিতে পারেন? যুবক কোথাকাব কে? কি রকম চরিত্র? সেসকল বিষয়ে চিন্তা না করিয়া যুবকটিকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন; এবং চিকিৎসা ও সেবা দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিলেন। যুবকটি সবল হইলে পর তাহাকে পাথের খরচ দিয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রকাশচন্দ্রের পত্নী বাকিপুত্রের কোন অসহায় লোকের গৃহে জীলোকদিগের ও শিশুদের পীড়ার সংবাদ পাইলেই সেবার জন্ত সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি এমন কোমল মেয়ে পূর্ণ হইয়া রুগ্না রমণীদিগের সেবা করিতেন যে তাহারা তাহাদের অন্তরস্থিত ভাবাবেগে আকুল হইয়া তাঁহাকে মাতৃ সন্ধান করিত। দেবী অঘোরকামিনীর সেবা ও সাধনা সম্বন্ধে খ্যাতনামা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তৎপ্রণীত “জীচরিত্র” গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

“অঘোরকামিনী অতি শীঘ্রই পরোপকার ব্রতে এতাদিক অধু-
রাসিগ্ন ও উৎসাহী হইয়া উঠিলেন যে, অস্ত্রের সেবা তাহার জীবনের প্রধান কার্য হইয়া উঠিল। * * * একদিন সমাচার আসিল বাকিপুত্রের কোন উচ্চ বর্ণসম্বন্ধীয় পত্নী এসম্প্রদায়ের পীড়িত অবস্থার পড়িয়া আছেন, তাহাকে এবং তাহার রুগ্ন শিশুকে সেবা করিবার লোক নাই, কিন্তু শুনিবা মাত্র তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। এবং যদিও এই পরিবার তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি সমস্ত দিন ইহাদের সেবা করিলেন। কিন্তু শিশুটিকে বাচাইতে পারিলেন না। তিনি আর এক দিন গুনিলেন একটি অতি নীচ জাতীয় জীলোক এসম্বন্ধে অতিশয় রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। জন্তপতি সেখানে গিয়া দেখেন * * * ঘরে ভরানক দুর্গন্ধ, শব্দ নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই। উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি নিজ পরিচিত চিকিৎসকের জন্ত লোক পাঠাইলেন, নিজের গৃহ হইতে শয্যা ও বস্ত্র আনাইলেন এবং স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া মলিন ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইলেন। * * * অঘোরকামিনী অতি বৎসর অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু সঙ্গে করিয়া রান্নাঘর-নামক বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন করিতে যাইতেন। ধর্মসাধন করাই এই পর্যটনের এক মাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন সেখানে অবল উৎসাহে ধর্মোৎসব করিতেন, গম্য পথে লোকদিগের নিকট প্রকাশ উপদেশ ও নগর সন্মোহন করিতেন। এইরূপে তিনি ধর্মপ্রাণ স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চতর ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরোপাসনার অঘোরকামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * * * জীবন্ত প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁহাকে সহধর্মিণী রূপে পাইয়া বস্ত্র হইয়াছেন, তিনি প্রকাশচন্দ্রকে পতিক্রমে পাইয়া বস্ত্র হইয়াছিলেন এবং আমরা তাহাদের উভয়কে প্রজ্ঞা স্মৃতি অর্পণ করিয়া স্বধী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি। কৃতার্থ হইয়াছি।”

আমার এই বচনার মধ্যে সকলেই হয় ত একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। আমি সর্বত্র প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পত্নীর কথাও লিখিয়া যাইতেছি। লেখাই প্রয়োজন

হইয়াছিল। কারণ, প্রকাশচন্দ্র তাঁহার প্রেমময়ী পত্নীর জীবনের সঙ্গে আপনাব জীবন এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেহ মনে কবিবেন না যে এইসকল উপজ্ঞানের কল্পিত কথা অথবা কাব্যের ভাবময় কবিত্ব। প্রকাশচন্দ্র ও দেবী অঘোরকামিনী এক হৃদয় হইয়া দুজনই দুজনের সাহায্যে ভক্তির সাধনা এবং সেবার কার্য সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং পত্নীর সমস্ত কথা ত্যাগ করিয়া শুধুই স্বামীর কথা বলা এক রকম অসম্ভব।

কিন্তু আর আমাকে সেই পুণ্যবতী নারীর কথা লিখিতে হইবে না; কঠোর বৈবাগ্য এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম দেবী অঘোরকামিনীর সহ্য হইল না; শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল; তিনি স্বামী ও কন্তার হস্তে তাহার কার্যভার অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রকাশচন্দ্র তাঁচার জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া কি অবসর হইয়া পড়িলেন? তাহা নহে। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের অর্দ্ধাঙ্গ কাড়িয়া লইয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন। তিনি মৃত্যুর আলোকে প্রকাশচন্দ্রের নিকট অমৃতলোক উজ্জল করিয়া তুলিলেন। প্রকাশচন্দ্র এই ঘটনার পর কল্পনাময়ের আশ্চর্য্য রূপায় ধর্মরাজ্যের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন।

অন্তঃপর প্রকাশচন্দ্র কয়েক বৎসর চাকুরি করিয়া, সম্মান ও আশ্রিত লোকদিগের প্রতি যে কিছু কর্তব্য ছিল, তাহা সম্পন্ন করিলেন। অবশেষে বর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রচার-ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি বিশেষ কোন সমাজের প্রচারক ছিলেন না বটে কিন্তু প্রচারকের কার্য কবিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রকাশচন্দ্র নিজে যে ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া হৃৎ ও প্রলোভনকে জয় করিয়াছিলেন এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, নরনারীর নিকট সেই প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্ত আকুল হইয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশেই বা জানে কে, আর আসামই বা জানে কে? যেখানেই ধর্মের জন্ত ত্রুটি নরনারীর সংবাদ পাইতেন, সেইখানেই প্রেমের সমাচার লইয়া উপস্থিত হইতেন। রুগ্ন শরীরের দিকে একবারও দৃকপাত করিতেন না। তিনি যখন ভক্তিতে বিগলিত হইয়া চোখে-জল ফেলিতে ফেলিতে

প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন, তখন কোন্ পুরুষ কোন্ নারী অশ্রু সংবরণ কবিত্তে পারিতেন? তাঁহার মত মিষ্ট উপাসনাও খুব কম লোককেই কবিত্তে দেখা যায়। বাদ্গালী বই অতি অল্পই পড়িতেন, তবুও তাঁহার উপাসনা ও উপদেশের ভাষা যেন মধু বর্ণন কবিত। এইসমস্ত কাৰণেই তিনি তৃপ্ত নরনারীর চিত্ত অমৃতবসে পূর্ণ করিতে পারিতেন।

প্রকাশচন্দ্র শান্তিহারী নবনারী ও শোকার্তদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। যেসকল পুরুষ ও রমণী জীবনের পরীক্ষায় ভীত ও হৃদয়ের সাংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতেন, এবং শান্তিহারী হইয়া মানসিক যন্ত্রণায় ছটকট কবিতেন, প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদের মনের ভাব অবগত হইতে পারিলেই প্রেম লইয়া তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইতেন। পুরুষই হউন আর স্ত্রীলোকই হউন প্রকাশচন্দ্রকে আপনাদিগের লোক মনে করিয়া নিঃসঙ্কোচে মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনা ও ধর্মালোচনা করিয়া তাঁহাদের চিত্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিতেন। তখন ঈশ্বরের প্রীতির অমৃতধারায় তাঁহাদের হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। আরি আট বৎসব বাঁকিপুরে বাস করিয়া-ছিলাম; ঐ সময়ে দেখিতাম কোন ব্রাহ্মপরিবারে মৃত্যু এবং শোক উপস্থিত হইলেই প্রকাশচন্দ্র ছুটিয়া সেই পরিবারে গমন করিতেন। তাঁহার উপাসনা ও ধর্মোপদেশের এমনই একটি মোহিনী শক্তি ছিল যে, শোকার্ত ব্যক্তির সহজেই সাধনা লাভ করিতেন।

প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই অল্পদিন হইল শিলংপ্রবাসী ব্রাহ্মগণ ঢাকায় তাঁহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ দিবস কতিপয় ব্রাহ্ম এবং একটি শ্রদ্ধেয়া নারী তাঁহার সাধনাদানের কথা বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিম্বিত করিয়া-ছিলেন। সেদিন একজন বি-এ উপাধিধারী যুবক বলিতেছিলেন “প্রকাশচন্দ্র আমার পিতা, আমার গুরু এবং আমার বন্ধু ছিলেন।” যথার্থই প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে কোন কোন পুরুষ ও নারী এই রকম সম্বন্ধই স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্য আজ আমরা কত লোক তাঁহার জন্য অশ্রুবিসর্জন করিতেছি।

প্রকাশচন্দ্রের হৃদয় যে কি উদার ও মহৎ ছিল, আমি

তাঁহা সকলক্ষেত্রে বুঝাইতে পারিব না। তিনি সাধারণ ও নববিধান এই উভয় সমাজের লোকদিগকেই সমান ভাবে ভালবাসিতে পারিতেন। তিনি সাধারণ ও নববিধানের মতভেদের গতি অতিক্রম করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান, বেহারবাসী ও বাদ্গালী সকল লোককেই উদার ভাবে ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেন। “মিলনই” তাঁহার জীবনের মহামন্ত্র ছিল। তিনি তাঁহার পতাকায় “নববিধান” এই সাম্প্রদায়িক শব্দটি অঙ্কিত না করিয়া “মিলন” শব্দটি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও মুসলমান এই সকল সম্প্রদায়ের লোক ঈশ্বরপ্রেমে একপ্রাণ হইয়া কবে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে—ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল।

প্রকাশচন্দ্রের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুরবোধচন্দ্র বায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

“প্রেম তাঁহার জীবনের যেন মূল মন্ত্রস্বরূপ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন ধর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রেম। এই সম্পদে তিনি ক্রুরপন্থী ছিলেন। তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন, সকলেই জয়ন। ক্রুরপন্থী আকুল প্রেমের সহিত তিনি তাঁহার সহধর্মিণীর, বন্ধুজনের ও তাঁহার সম্পর্কিত প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক সেবা করিতেন, তাঁহাদের মুখে সামান্য দুঃখের কথা শুনিলে তিনি ক্রুরপন্থী ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, সকলেই তাঁহা লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেমের খাতিরে তিনি সকল লাঞ্ছনা, সকল কঠোরতা, সকল পবিত্র অসুবিধা সহ্য করিতেন। যেখানে দুইটি হৃদয় কোনও কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই তিনি তাঁহার আকুল প্রার্থনা ও অশ্রুবল লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। * * বিপত্নী কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়াছেন, কত আত্মাকে সাহায্য ও সাধনা দিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের পত্র পাইয়া মনে হইত, আজ পিতৃদেবের তিরোধানে তাঁহাদের শোক আমাদেব অপেক্ষাও গভীর।”

অনেক বৎসব পূর্বেই প্রকাশচন্দ্রের বহুমুখ বোঝা জন্মিয়াছিল। এবাব সেই বোঝা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তিনি জীবনের শেষ পঁচিশ দিন কঠিন পীড়ায় একেবারে শক্তিশীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় রোগের যন্ত্রণাব মধ্যেও তিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া প্রসন্ন মুখে থাকিতেন। তাঁহার পুত্র ব্যারিষ্টার সুরবোধচন্দ্র বায় লিখিয়াছেন -

“অহুতের শেষ পঁচিশ দিন তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু যে দু-একটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জীবন্ত ব্রাহ্মবোঝা ও অপবের কল্যাণের জন্য ব্যাকুলতারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অভিযোগের কথা শারীরিক যন্ত্রণাব পরিচায়ক একটি

কথা, একটি অক্ষব, একটি কাতরধ্বনিও কখনও শ্রুত হইতে রাহির করেন নাই। মুখের ভাবেও কখনও কোন যন্ত্রণার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার গম্ভীর প্রসন্ন মুক্তি যেন সে রোগশয্যাকে এক দেব-আভ্যাস আলোকিত রাখিত। * * এইরূপে পিতৃদেব পৃথিবীতে নিত্য ঈশ্বর সহবাসেব ও মধুব প্রেমের জীবনের চূড়ান্ত দেখাইয়া, শান্তি ও আনন্দ সন্তোষ কবিত্তে করিতে গন্ত ৭ই ডিসেম্বর পূর্ণিমা রজনীর প্রদ্যোত সময়ে ধীরে ধীরে এ মর্ত্যধাম হইতে চলিয়া গেলেন; অমরধামে শিরা জীবনের দেবতার সহিত, সাধুভক্তগণের সহিত ও জননীদেবীর সহিত চিব-মিলনে মিলিত হইলেন।” *

এ সংসাবে প্রকাশচন্দ্র এক কন্যা ও তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায় বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ইংলণ্ড হইতে এম-ডি পদবীকায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমবা আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের ধার্মিক পিতার একখানি জীবনচরিত প্রকাশ কবিবেন। উহা যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আবৃত্ত হইবে, তাহাতে আব সন্দেহ নাই।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

প্রশ্ন

(জাপানি কবিতা)

আবার কবে মিলন হবে?

প্রশ্ন করে বঁধু—ধরিয়া দুই কর;

আকাশ পানে চাহিয়া থাকি

কহিতে নারি, শুধু নয়ন বর বর!

অশ্রুধারা মুছারে দিয়ে

কহিল বঁধু ধীবে—হবেই সে মিলন;

কিন্তু কোথা কত সে দূরে

জানি না হার কোন সে শুভক্ষণ!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

* শ্রীকৃষ্ণভট্ট পণ্ডিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

পরভূত

কোকিলের সংস্কৃত নাম পরভূত, পরপুষ্ট, অন্তপুষ্ট, ও কাকপুষ্ট। কোকিলশাবক ভিন্নজাতীয় পাখী দ্বারা পালিত হয় বলিয়া পরভূত নাম পাইয়াছে, আব কাক দ্বারা পালিত হয় বলিয়া কাকপুষ্ট নাম পাইয়াছে। কোকিলের পরভূত ও কাকপুষ্ট প্রভৃতি নাম কাল্পনিক নহে।

Darwin লিখিয়াছেন “* * * instinct impels the cuckoo to migrate and to lay her eggs in other birds' nests”

কুকু অস্ত্র পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়, নিজে কোন বাসা প্রস্তুত করে না, শাবককে মোটেই পালন করেনা, ডিম মাটিতে পাড়ে, Wagtail, Hedge Sparrow প্রভৃতি পাখীর বাসায় ডিম রাখিবাব সুবিধা প্রতীক্ষা কবিত্তে থাকে, সুবিধা পাইলে তাহাদের বাসায় ডিম রাখিয়া আসে এক বাসায় দুইটা ডিম রাখে না, ইত্যাদি অনেক বিষয় কুকু সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

কোকিল কুকু জাতীয় পাখী। আমাদের দেশের কোকিলের ব্যবহার কুকু পাখীর ব্যবহারের মতন কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

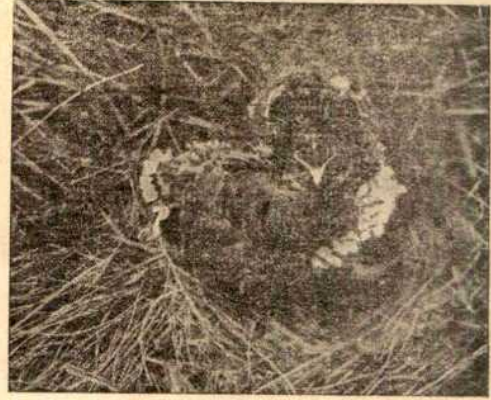
কোকিল বাব মাস আমাদের দেশে থাকে না ইহা সকলকেই স্বীকার কবিত্তে হইবে। উহারা কোথা হইতে আসে, আব কোথায়ই বা চলিয়া যায় তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। সকলেই মনে করেন যেখানে বসন্তের রাজত্ব সেইখানেই কোকিল থাকে। বসন্তকালে কোকিল আমাদের দেশে আসে তাই কোকিলের অস্ত্র নাম বসন্ত-দূত। ইংরেজেরাও কুকুকে messenger of the spring বলিয়া থাকেন। কুকু এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে ইংলণ্ডে আসিয়া থাকে এবং জুলাই কি অগষ্ট মাসে ইংলণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আমাদের কোকিলও তাহাই করে, মার্চমাসে এদেশে আসিয়া জুলাই মাসে এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। উৎকল দেশে ও মধ্যপ্রদেশে কোকিলকে কোইল বলিয়া থাকে। আমের আট্রিস ভিতরকার সবেও কোইল বলে। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে



কুকু-শাবক পালকপক্ষীর ডিম পিঠে তুলিয়া তুলিয়া বাসা
হইতে ফেলিয়া দিতেছে।

আমের মধ্যে কোইলি না হইলে কোকিলের কুছবর
শ্রুতিগোচর হয় না; বস্তুত তাহাই সত্য। মার্চমাসের
মধ্য বা শেষ ভাগে আমের কোইলি হইয়া থাকে, আর
প্রায় সেই সময়েই কোকিল এদেশে দেখা দেয়।

কুকু ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবার সময়ে Hedge Sparrow,
Wagtail প্রভৃতি পাখীর বাসায় ডিম রাখিয়া যায়, আর
আমাদের দেশের কোকিল কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া
যায়। কাক ডিমের উপর তা দেয়, শাবক হইলে যত্ন সহ-
কারে পালন করে ও সবদে উহাদিগকে আহার দেয়।
কোকিল-শাবক সবল ও পুষ্ট হইলে এবং বহুদূর উড়িয়া
যাইতে ও নিজের আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলে
পালনকর্তাকে তাগ করতঃ জন্মস্থান ছাড়িয়া বসন্তলীলায়িত
স্থানে পলায়ন করে। পার্শ্বতা প্রদেশবাসী অধিকাংশ
লোকেই কাক দ্বারা কোকিল-শাবককে পালিত হইতে
দেখিয়াছে। পুষ্টিবার অভিপ্রায়ে অনেককে কাকের
বাসা হইতে কোকিল-শাবক আনিতে দেখা গিয়াছে।
আমার বাড়িতে একটি নারিকেল গাছ আছে। তাহার
উপরে প্রতি বৎসর কাকে বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে।
তুই বৎসর যাবৎ উক্ত বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া
যাইতেছে। গত বৎসর যখন কাকের ছানাগুলি বড়
হইল, বাসা হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষের শাখায় বসিতে
আরম্ভ করিল তখন আমরা দেখিতে পাইলাম উহাদের
একটি কাক ও একটি কোকিল-শাবক। কিন্তু কাক উভয়
শাবককেই অতিশয় যত্ন সহকারে পালন করিতেছিল। এক



কুকু-শাবক বাসার নিকট কাহাকেও আসিতে দেখিলে সাপের
মতো গর্জন করে।

দিন কোকিল-শাবকটি কোথায় পাইলাম গেল আর আমরা
দেখিতে পাইলাম না। এবারেও তাহাই ঘটয়াছিল। যখন
কাক শাবক দুইটিকে বাসা হইতে বাহির করিল, তখন
দেখিলাম একটি কাক আর একটি কোকিল-শাবক।
উহার উভয়ে অনেক সময় বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকিত,
কাক যত্নসহকারে উভয়কেই খাওয়াইত। পরে কিছু
দিন শাবক দুইটি কাকের সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত উড়িয়া
বেড়াইল। একদিন কোকিলটি কোন দিকে উড়িয়া গেল
আমরা আর দেখিতে পাইলাম না। কাক-শাবক এখনও
তাহার মার সঙ্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহার মা এখনও
তাহাকে আহার দিয়া প্রতিপালন করিতেছে। ছেলেরা
এখনও এই কাক-শাবককে কোকিলের ভাই বলিয়া পরি-
চিত করিয়া থাকে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, কোকিল
কাক ভিন্ন অপর কোন পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে না।
নিম্নোক্ত কারণ দৃষ্টে তা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে
হইবে।

কোকিল আমাদের দেশে মার্চ হইতে জুলাই পর্যন্ত
অবস্থান করে। এই সময়ে যে সব পাখী বাসা নির্মাণ
করে ও ডিম প্রসব করে, তাহাদের বাসায় কোকিলের
ডিম রাখিয়া যাওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতে পারে।
যেসকল মাংসাশী পাখী ঐ সময়ে বাসা প্রস্তুত করে,
তাহাদের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িবে একরূপ মনে করা
অসঙ্গত। বুলবুল, পাঁপিয়া প্রভৃতি যে কয়েকটি পাখী

মে মাসে বা তৎপূর্বে ডিম পাড়িয়া থাকে, তাহাদের বাসা এত ছোট ও এরূপ কোশলে নির্মিত যে তাহাতে প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়িয়া আসা কোকিলের পক্ষে অসম্ভব। অবিকল্প কোকিল-শাবক ঐসমস্ত পাখী অপেক্ষা বড়, কাজেই কোকিল এরূপ ছোট বাসায় ও অক্ষম পালনকর্তার উপর নিজের শাবকের পালনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং বুলবুলের মতন পাখীর বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। বড় জাতীয় টিয়াপাখী আকারে কোকিলের মত। তাহারা মার্চ মাসে ডিম পাড়ে। কিন্তু টিয়াপাখী বৃক্ষের কোটরে ডিম পাড়ে সুতরাং সেখানে কোকিলের প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে।

কোকিল মার্চ মাসে আমাদের দেশে আসে, সুতরাং আসিবানাত্র টিয়া পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। এক প্রকার ময়না আছে তাহারা চৈত্র মাসে ডিম পাড়ে, সুতরাং তাহাদের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ধনেশ পাখী বৃক্ষকোটরে বাসা নির্মাণ করিয়া মে মাসের মধ্যেই ডিম পাড়ে। ভিমরাজ পাখী আকারে ও বর্ণে কতকটা কোকিলের মতন; ইহারা মে ও জুন মাসে ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহাদের বাসায় কোকিল ডিম রাখে বলিলে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এদেশে এত অল্প ও এরূপ নিভৃত স্থানে ইহারা বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে যে কোকিল ইহাদের বাসায় ডিম পাড়ে বলিয়া অনুমান করা যায় না। কেহ কখনও কোকিল-শাবককে ভিমরাজ পাখী কর্তৃক পালিত হইতে দেখে নাই।

কাক বাসা নির্মাণ করিবার অল্পদিন পূর্বে শলিক পাখী বাসা নির্মাণ করে। ইহারা আকারে কোকিল হইতে বেশী ছোট নয়; সুতরাং ইহাদের বাসায় কোকিল ডিম রাখিতে পারে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু কোকিল তাহা করে না। হয়ত যখন শালিক পাখী বাসা নির্মাণ করে তখন ইহাদের ডিম পাড়িবার সময় হয় না, কিম্বা ইহাদের বাসায় ডিম রাখিয়া যাইতে কোকিল আদৌ ইচ্ছা করে না, কেন না ইহাদের সহিত কোকিলের বর্ণের সামঞ্জস্য নাই। বহুসংখ্যক শালিকের বাসা দেখিয়াছি, কিন্তু

কখনও শালিকের বাসায় কোকিল-শাবক দেখিতে পাই নাই কিম্বা শালিককে কোকিল-শাবক পালন করিতে কেহ দেখে নাই।

কাক বর্ষার প্রারম্ভে জুন মাসের মধ্যভাগে বাসা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তখন গ্রীষ্মের প্রারম্ভ ক্রমিতে থাকে, আর কোকিলও আমাদের দেশ ছাড়িয়া যাইবার জন্ত ব্যস্ত হয়। তখন অল্প কোন পাখীর বাসা থাকে না। কিন্তু কাকের বাসা অনেক থাকে। তখন কোন কাক বাসা নির্মাণ করিতে থাকে, কেহ বা ডিম পাড়িতে থাকে। সুবিধা বুঝিয়া কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়। অল্প কোন পাখীর বাসায় ডিম না পাড়িয়া কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া যাইবার নিম্নোক্ত কয়েকটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

১। কাকের সহিত কোকিলের বর্ণবৈষম্য কিছুই নাই, আকারেও সামান্য পার্থক্য বলিলে চলে।

২। কুকু দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে ডিম পাড়ে। কোকিলও পেটে ডিম লইয়া এদেশে আসে না কিছুকাল এদেশে অবস্থানের পর ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। কাক ভিন্ন কোকিল-শাবক পালন করিতে পারে এমন কোনও পাখী সে সময়ে বাসা নির্মাণ করে না কিম্বা ডিম পাড়ে না, কাজেই কোকিল কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া যায়।

৩। মুরগী ও পাতিহাঁস কিম্বা মুরগী ও কবুতরের ডিমের মধ্যে আকারের যতটা পার্থক্য কোকিল ও কাকের ডিমের মধ্যে ততটা পার্থক্য নাই; বর্ণেরও বিশেষ কোন তারতম্য আছে বলিয়া অনুভব করা যায় না। ডিমের বর্ণ ও আকার দেখিয়া পালনকর্তার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয় তৎপ্রতি কোকিলের প্রধান লক্ষ্য থাকা সম্ভব। বর্ণ ও আকারের সাদৃশ্য দেখিতে গেলে কাক ও কোকিলের ডিমের মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য দেখা যাইবে অল্প কোন পাখীর ডিমের মধ্যে ততটা দেখা যাইবে না। সুতরাং কোকিল কেবল কাকের বাসায় ডিম পাড়িতেই পছন্দ করে। ক্রমে তাহাই ইহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪। Darwin লিখিয়াছেন—“That the common

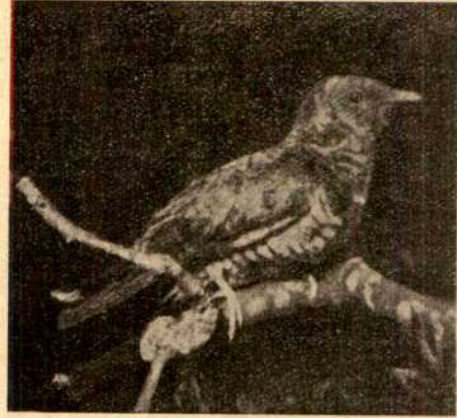


উড় কুখু-শাবক।

cuckoo * * lays only one egg in a nest so that the large and voracious young bird receives ample food."

পালনকত্রী কুখু-শাবককে খাওয়াইতে সক্ষম হইবে বলিয়া কুখু একটি মাত্র ডিম এক বাসায় রাখিয়া যায়; আমাদের কোকিলেরও এ বিবেচনাটুকু থাকিতে পারে; সুতরাং শাবককে যে পাখী ভালরূপ খাওয়াইতে ও পালন করিতে পারিবে তাহার বাসায় ডিম রাখিয়া যাইতে অবশ্যই চেষ্টা করিবে। অত্যাশ পাখী অপেক্ষা কাক কুখু-শাবককে খাওয়াইতে অধিকতর সক্ষম দেখিয়া কোকিল কাকের বাসায়ই ডিম রাখিয়া যাইতে অভ্যাস করিয়াছে।

৫। আমাদের দেশ কাকবহুল দেশ। এদেশে যত কাক আছে অত্যাশ কোন পাখী তত নাই। যে স্থানে ১০০ জোড়া কাক বাস করে সে স্থানে ৫ জোড়া কোকিল অবস্থান করে কিনা সন্দেহ। কোকিল দেশ ছাড়িয়া যাইবার সময় যে স্থানে ডিম রাখিবার জন্য পাঁচটি বাসার প্রয়োজন সেখানে ১০০টি কাকের বাসা মিলিতে পারে সুতরাং কাকের বাসা ছাড়িয়া অত্যাশ পাখীর বাসায় কোকিল ডিম পাড়িবে কেন? কাক যে-কোন গাছে বাসা নির্মাণ করে, নিভৃত স্থান খুঁজিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না, কোকিলের পক্ষে কাকের বাসা যত সুলভ এমন আর কোনও বাসা নয়।



পরিপুষ্ট কুখু-শাবক দেশত্যাগ করিয়া যাইবার উপযুক্ত।

৬। "That there is a reasonable probability of each cuckoo most commonly putting her eggs in the nest of the same species of bird and of this habit being transmitted to her positively, does not seem to be a very violent supposition."

যে পাখীদের অপর পাখীর বাসায় ডিম রাখিয়া যাওয়ার প্রয়োজন তাহারা স্বশ্রেণীর পাখীদের বাসায় ডিম রাখিতে সম্ভবতঃ প্রথমে যত্নশীল হইয়া থাকে। যেখানে বর্ণ ও আকারে সদৃশ স্বশ্রেণীর পাখী রহিয়াছে সেখানে পরভূতদের বাসা নির্বাচন করিতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। আর যেখানে আকার ও বর্ণে সদৃশ সমশ্রেণীর পাখীর অভাব সেখানে পরভূতদিগকে আকার ও বর্ণে বিসদৃশ স্বশ্রেণীর পাখীর বাসা খুঁজিয়া লইতে হইয়াছে এবং তাহাই অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাক ও কোকিল এক শ্রেণীর পাখী, সুতরাং কোকিলকে আকার ও বর্ণে সদৃশ স্বশ্রেণীর পাখী পাইয়া অত্যাশ বিসদৃশ পাখীর আশ্রয় অন্বেষণ করিতে হয় নাই। বাসা যত্নক্রমে পাওয়া যায় বলিয়া কোকিলের পক্ষে আরও সুবিধা হইয়াছে।

কুখু একটি বাসায় দুইটি ডিম রাখে না। আমাদের দেশের কোকিলও তাহাই করে। যেখানেই কাকের বাসায় কোকিলশাবক দেখা গিয়াছে সেখানেই একটি কাক-শিশু আর একটি কোকিল-শিশু দেখা গিয়াছে। এক বাসায় দুইটি কোকিল-শিশু কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি একজন



কুকু-শাবকের রাক্ষসী ক্ষুধা ও পালকপক্ষীর "আধার" আহরণ।

লোকের নিকট হইতে দুইটি কোকিল-শাবক এক সঙ্গে ক্রয় করিয়াছিলাম। একবাসায় ঐ দুইটি শাবক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া সে প্রকাশ করিয়াছিল।

একবার একটি কাককে দুইটি কাক-শিশু ও একটি কোকিল-শিশুকে খাওয়াইতে আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। সর্বসাধারণের বিশ্বাস যে কোকিল একবাসায় একটি মাত্র ডিম পাড়ে এবং কাক দুইটি ডিম পাড়িয়া থাকে—কাক যখন বাসায় না থাকে তখন কোকিল যাইয়া একটি কাকের ডিম ফেলিয়া দিয়া নিজে একটি ডিম পাড়িয়া রাখিয়া আসে।

একথা নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না, কারণ যে বাসায় কোকিল-শিশু থাকে সেখানে একটি বই কাক-শিশু প্রায় দেখা যায় না। কাকের ডিম নীচে পড়িয়া থাকে বলিয়া অনেকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু নিজে কখনও দেখি নাই। ক্রিঃ এক বাসায় দুইটি কোকিল-শাবক পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই বলা যাইতে পারে যে কাক হয় ত বাসা প্রস্তুত করিতেছে শেষ হয় নাই, কিংবা শেষ হইয়াছে তখনো ডিম পাড়িবার হুঁক দিন বিলম্ব আছে, এমন সময়ে কোকিল আসিয়া এক বাসায় উপস্থাপর দুই দিন ডিম পাড়িয়া গেলে, কিংবা শূন্য বাসায় একটি কোকিল একটি ডিম পাড়িয়া গেলে

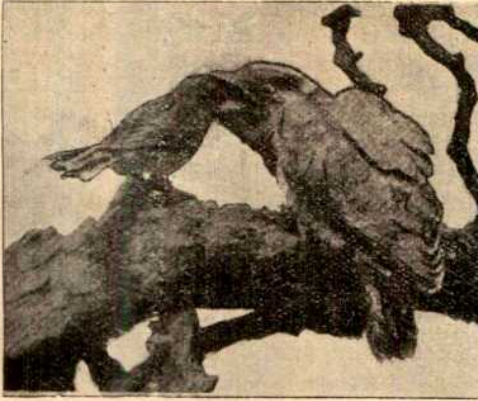
পরে আর একটি কোকিল আসিয়া আর একটি ডিম পাড়িয়া গেল, তার পরে কাক ডিম পাড়িয়া তা দিতে বসিল। বাসা নির্মাণের পর পক্ষীদের এত মমতা জন্মে যে পরের ডিমকেও তাহারা ফেলিয়া দেয় না। আপন ডিম বলিয়া মনে করে আর একটি কোকিল ও দুইটি কাক-শিশু যে স্থলে দেখা যায় সে স্থলে কাক একটি ডিম পাড়ার পরে কোকিল ডিম পাড়ে, তারপর কাক আর একটি ডিম পাড়িয়া তা দেয়।

কুকু মাটিতে ডিম পাড়ে আর তাহা মুখে করিয়া লইয়া অস্থায়ী বাসায় রাখিয়া আসে। বোধ হয় আমাদের কোকিল এমন করে না। কোকিল ঘেন

মাটিতে বসিতেও ঘৃণা করে। প্রায় সকল পাখীকে মাটির উপর বসিতে দেখিয়াছি কিন্তু জীবনে একবারও কোকিলকে মাটিতে বসিতে দেখি নাই।

কুকু-শাবকের প্রবল ক্ষুধা নিবারণ করিতে বিলাতের পাখীদিগকে যত কষ্ট পাইতে হয়, আমাদের কাককে তত কষ্ট পাইতে হয় না। যে কাক-শিশুর ক্ষুধা নিবারণ করিতে সক্ষম সে কোকিল-শাবকের ক্ষুধা অনায়াসে নিবারণ করিতে পারে, ইহারা পালনকর্ত্তাকে বিশেষ কষ্ট দেয় না।

কাক-শিশু অপেক্ষা কোকিল-শিশু শীঘ্র সবল ও পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠে—শৈশবাবস্থা হইতেই তাহাদিগকে নিজের খাওয়া ভোজন করিতে হইবে, বহুদূর যাইতে হইবে বলিয়া কাকশাবক অপেক্ষা তাহার সবল ও পূর্ণাবয়ব হওয়া আবশ্যিক। শৈশবকালীন আত্মনির্ভরতা ক্রমে পরম্পরাগত অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্ত কোকিল-শাবক অল্প দিনের মধ্যে পালনকর্ত্তাকে ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া যায়, আর কাক-শিশু প্রায় দুই মাস যাবত খাওয়ার জন্ত মার মুখাপেক্ষী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুইটি কারণে কোকিল আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করিয়াছে। (১) বৃষ্টির সময় এদেশে থাকিতে পারে না। (২) অত্যন্ত কাকেরা যখন কোকিলকে কাকের দলে মিশিতে দেখে তখন চিৎকারিত হইয়া তাহাকে কাকের



কুকু-শাবককে পালকপক্ষী কর্তৃক "আধার" দান।

দলে থাকিতে দেয় না। ঠোঁকরাইয়া তাড়াইয়া দেয়।

পাখীরা নিজে বাস করিবার জন্ত বাসা নির্মাণ করে না। ডিম পাড়িয়া শাবক রক্ষা করিবার জন্ত বাসা নির্মাণ করে। সুতরাং যে বাসায় ডিম নাই অর্থাৎ যে বাসার শাবকেরা বড় হইয়া উড়িয়া গিয়াছে সে বাসায় যদি কুকু বা কোকিল ডিম পাড়িয়া আসে তবে তাহা নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ অল্প কোনও পক্ষী ঐ ডিমে তা দিবে না। কিন্তু যদ্যপি কোন পাখী বাসা নির্মাণ করিতেছে কিম্বা বাসা তৈয়ার হইয়াছে অথচ তখনো ডিম পাড়ে নাই এরূপ সময়ে কুকু বা কোকিল ডিম পাড়ে, তাহা হইলে বাসা-নির্মাণকর্তা তা দিয়া উক্ত ডিম ফুটাইয়া দেওয়া সম্ভব। হয়ত কেহ একবার কি ছুইবার দেখিয়াছে কোন পাখী-মাতা একটি কুকু-শাবককে পালন করিতেছে, বাসায় একটিও নিজের শাবক নাই। ইহা হইতে এরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত নহে যে কোন তান্ত বাসায় কুকু ডিম পাড়িয়া গিয়াছিল আর পাখী-মাতা তাই দেখিয়া আগ্রহ সহকারে ডিমের উপর তা দিয়া ডিম ফুটাইয়া শাবক প্রতিপালন করিতেছিল। হয়ত পক্ষী-মাতার নিজের ডিম নষ্ট হইয়া গিয়াছে আর সে শুধু কুকু-শাবককে পালন করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে শূন্য বা পরিত্যক্ত বাসায় কুকু বা কোকিল ডিম পাড়িয়া আসিলে অল্প পাখী সে ডিমে তা দিবে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে।



কুকু-শাবকের পিঠে চড়িয়া পালকপক্ষী কুকু-শাবকের দ্বরন্ত কুখা শাস্ত করিতেছে।

পাখীদের ডিমের উপর যত মমতা শিশুর প্রতি, ততটা মমতা নাই। মনে কর ছুইটা ডিম ফুটিবার উপযুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে একটি ডিম স্থানান্তরিত করিয়া তৎপরিবর্তে একটি নূতন ডিম রাখিয়া দিলে পক্ষী তাহা বুঝিতে পারিবে না, পূর্বের ডিমটি ফুটিয়া গেলেও সে নূতন ডিমটিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না, তা দিতে থাকিবে। শাবককে উড়াইবার পূর্বে বাসায় ডিম দিলে পক্ষী মাতা তা দিতে পারে, কিন্তু বাসা ত্যাগ করিয়া গেলে সেই পরিত্যক্ত বাসায় ডিম দেখিয়া আবার তা দিতে আসিবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাখীরা বাসা ত্যাগ করিলে পুনরায় সেখানে যায় না। তবে হাঁস মুরগী সম্বন্ধে ভিন্নরূপ ঘটয়া থাকে। মনে কর এক সঙ্গে ছুইটা হাঁস ডিম দিতেছে, আমি প্রত্যহ ডিম লইয়া আসি। একটি হাঁস সাত দিন ডিম দিল, অপরটি নয়দিন ডিম দিল, আমি নয়দিনের পর কয়েকটা ডিম বাসায় রাখিয়া দিলাম, তখন দেখা যাইবে উভয় হাঁস ডিমগুলিকে তা দেওয়ার জন্ত চেষ্টা করিবে। উভয়েই উহাদিগকে নিজের ডিম বলিয়া মনে করিবে। এ স্থলে নির্দিষ্ট বাসা আছে বলিয়া এইরূপ ঘটিল কিন্তু বৃক্ষবাসী পক্ষীদের মধ্যে তাহা নাই। বাসা হইতে ডিম ছুইটা

লইয়া আসিলে পক্ষী ও পক্ষী বাসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে আর সে বাসার মুখে হইবে না। তাহার যদি উড়াদের ডিম পাড়িবার সময় থাকে তাহা হইলে নূতন বাসা নির্মাণ করিবে, কিন্তু পুরাতন ত্যক্ত বাসায় আর যাইবে না।

ডিমের সঙ্গে অপর ডিমের আকার ও বর্ণের সাম্য না থাকিলেও পাখীরা নিঃসন্দেহচিত্তে ডিমে তা দেয় ও শাবককে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কাক ও কোকিলের ডিমের মধ্যে তাদৃশ বৈষম্য নাই, সুতরাং কাক নিঃসন্দেহে কোকিলের ডিম ফুটাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? তবে বিলাতের পাখীরা যেমন বিসদৃশ ও আকারে বড় কুকুর ডিম ফুটাইয়া দেয় সেইরূপ অপর কতকগুলি পাখীকে আকারে ও বর্ণে বিসদৃশ ডিম তা দিয়া ফুটাইতে আমি দেখিয়াছি। কবুতর দ্বারা পাতিহাঁসের ডিমে তা দেওয়াইয়াছি, মুরগী দ্বারা পাতিহাঁসের ডিম তা দেওয়াইয়া ফুটাইয়াছি। মুরগী ময়ূরের ডিম তা দিয়া ফুটাইয়াছে।

একটা কবুতর দুইটা ডিম পাড়িয়াছিল, আমি তাহার সঙ্গে একটা পাতিহাঁসের ডিম রাখিয়া দিলাম, কবুতর নিঃসন্দেহে তা দিতে লাগিল; কিছু দিনের পর পায়রার ডিম দুইটা ফুটিল, পক্ষী-মাতা তখনও হাঁসের ডিমে তা দিতে লাগিল। একটা পায়রাশিশু মরিয়া গেল, আমার আর ধৈর্য্য রহিল না, ডিম ফুটাইয়া দেখিলাম ভিতরে হাঁসের শাবক জীবিত ছিল। আর সাত আট দিন অপেক্ষা করিলে বোধ হয় ডিম ফুটিতে পারিত। ইহার পর আর কখনও এ পরীক্ষা করি নাই। প্রতি মুরগীর ডিমের সহিত হাঁসের ডিম দেই, মুরগী তাহা তা দিয়া ফুটাইয়া দেয়। আমি হাঁস দ্বারা কখনও হাঁসের ডিম তা দেওয়াই না। একবার তিনটা ময়ূরের ডিম পাইয়াছিলাম। ঐ ডিম আনিয়া একটা মুরগী দ্বারা তা দেওয়াইলাম এক সঙ্গে তিনটা মুরগীর ডিম ও তিনটা ময়ূরীর ডিম দিলাম। ঘটনাক্রমে প্রায় এক সঙ্গে ডিমগুলি ফুটিল। মুরগী নিঃসন্দেহে ও আত্মলাদের সহিত ছয়টা শাবককে সঙ্গে করিয়া বেড়াইত। রাত্রে সকলকে ডানার নীচে রাখিত। চরিবার সময়ে কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে বা

চিল দেখিলে সকলকে পেটের ও ডানার নীচে রাখিত। অপর মুরগীর শাবক নিকটে আসিলে তাড়া দিত অথচ ময়ূর-শাবকগুলিকে অতি যত্নে রাখিত। লোয়া (সংস্কৃত ভাব) কুকুট জাতীয় অতি ক্ষুদ্র পাখী। তাহাদের ডিমও মুরগীর কাছে দিয়াছিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুরগী অতি ক্ষুদ্র লোয়ার ডিম ফুটাইয়া শিশুটিকে পালন করিত। কবুতর যখন পাতিহাঁসের ডিম, মুরগী পাতিহাঁস ময়ূর ও লোয়ার ডিম তা দিয়া ফুটায় তখন বিলাতের Wagtail, Pipit, Hedge-sparrow প্রভৃতি কুকুর ডিম ফুটাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীজলন্ধর দেব।

সাপুড়িয়া

কে গো তুমি বিদেশী।

সাপ-খেলালো বাণী তোমার

বাজালো স্বর কি দেশী?

নৃত্য তোমার তুলে তুলে,

কুন্তলপাশ পড়চে খুলে,

কাঁপচে ধরা চরণে।

ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে

উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে

ইন্দ্রধনুর বরণে।

আজকে ত আর ঘুমায় না কেউ,

জলের পরে জেগেছে ঢেউ,

শাখায় জাগে পাখীতে।

গোপন গুহার মাঝখানে যে

তোমার বাণী উঠছে বেজে

ধৈর্য্য নারি রাখিতে।

মিলিয়ে দিয়ে উচু নীচু

স্বর ছুটেছে সবার পিছু,

রয়না কিছুই গোপনে।

দুবিয়ে দিয়ে স্বর্ধ্য চক্রে

অন্ধকারের রন্ধে, রন্ধে

পশিছে স্বর স্বপনে।

নাটের লীলা হায় গো একি,
পুলক আগে আজকে দেখি
নিদ্রাচাকা পাতালে ।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে ।
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিহ্বাতেবে মাতালে ।
লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটিল ডাক মাটির নীচে,
ছুটাল ছুঁইচাঁপারে ।
রুদ্ধ ঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে ।

কত কালের আধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহাও নাগিনী ।
নত মাথায় লুটিয়ে আছে
ডাক' তারে পায়ের কাছে ।
বাজিয়ে তোমার রাগিনী ।
তোমার এই আনন্দনাচে
আছে গো ঠাই তারো আছে,
লগণো তারে ভুলায়ে ।
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা ছুলায়ে ।
মিলবে সে আঁধা চেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন-সমীরণে,
মিলবে আলোর আকাশে ।
তোমার বাঁশি বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস মেনেছে
রবে না আর ঢাকা সে ।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রাচীন ঐতিহ্য

ভাবতবর্ষেব প্রাচীন অলঙ্কৃত কাব্যশাস্ত্রেব মধ্যে অৰ্ধবোধ-
রচিত বুদ্ধচরিত কাব্যেব পূৰ্ববর্তী অল্প কোন কাব্য পাওয়া
যায় না । উহার পূৰ্বেও যে বহুতর কাব্য রচিত হইয়াছিল,
তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে ; কিন্তু সেগুলিও অস্তিত্ব
লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । অৰ্ধবোধ-প্রণীত বুদ্ধ-
চরিত সম্ভবতঃ খৃষ্টপূৰ্ব্ব প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ । সাত
আট বৎসর পূৰ্বে আমি ঐ কাব্যখানির কিঞ্চিৎ পদ্ম
অনুবাদ “নব্যভারতে” মুদ্রিত করিয়াছিলাম । তথাপি ঐ
কাব্যের প্রতি পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি
নাই ।

একটি বিশেষ বিষয়ে পাঠকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ
করিবার জন্য আজ আবাব ঐ কাব্যেব কয়েকটি শ্লোক
উদ্ধার করিয়া একটি কথার বিচার করিবার জন্য উদ্যোগ
করিতেছি । খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর কাব্যে সাহিত্য-
বিষয়িক যে প্রবাদ বা ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল, তাহাব যে
অনেক মূল্য, এ কথা অস্বীকৃত হইবে না । প্রথম সর্গের ৪৭
শ্লোকে আছে :—

সারথতস্তাপি জ্ঞানং নষ্টং বেদং পুনৰ্যং বদন্তঃ পূৰ্বং ।
ব্যাসস্তথৈবৈব বহুধা চকার ন বং বশিষ্ঠঃ কৃতবানশক্তিঃ ।

অর্থঃ—

অল্প কেহ বাহা পূৰ্বে বুঝিয়া পান নাই, সারথত সেই নষ্ট
বেদ গান করিয়াছিলেন । এই বেদকে ব্যাস বহুধা বিভক্ত করিয়া-
ছিলেন, বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ তাহা করিতে পারেন নাই ।

কেবল এই শ্লোকটি নয় ; যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার
দিব, তাহার সকলগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে
পূৰ্ববর্তী কবিতাশালী লোক দ্বারা যাহা সাধিত হয় নাই,
তাহা যে পৰবর্তী লোক দ্বারা হইয়াছে, একপ কথাব অনেক
দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । বেদ পূৰ্বকালে এক সময়ে নষ্ট
হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্র হারাইয়া ফেলিয়া-
ছিলেন, এ প্রবাদ পৌরাণিক সাহিত্যে আছে ; কিন্তু
কোন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না । ভিন্ন ভিন্ন বংশের
ব্রাহ্মণদিগের গৃহে হস্ত অসম্পূর্ণভাবে বেদমন্ত্র রক্ষিত ছিল,
এবং পরে-সেকালের প্রকৃতবিশ্ববিদের হাতে উহার উদ্ধার
হইয়াছিল ; এই শ্লোকের মর্ম হইতে এইরূপই অনুমিত

হয়। ঋষি সারস্বতের নাম বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মনসী দ্বারা নষ্ট বেদেব উদ্ধার হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদটি পাইতেছি, তাহাতে নূতনত্ব আছে। “পূর্ববর্তী বশিষ্ঠ যাহা কবিত্তে পারেন নাই, ব্যাস সেই বেদ বিভাগ কবিয়াছিলেন,” এই প্রবাদটিও একটু নূতন বেশে উপস্থিত। বশিষ্ঠ বংশের কোন ঋষি সারস্বত বর্জক পুনঃপ্রচাষিত বেদমন্ত্রগুলিকে একবার শ্রেণীবদ্ধ করিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন, এবং তাহার পব ব্যাস উহা বহু ভাগে বিভক্ত কবিয়াছিলেন, এইরূপই এই শ্লোক হইতে অনুমিত হইতেছে। সারস্বত এবং বশিষ্ঠ-সম্বন্ধের প্রবাদবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে কয়েকটি কথা আছে। বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখটি দেখিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এই উল্লেখ অশ্বখোষের কাব্যের উল্লেখের যে কেবল পর-বর্তী তাহাই নহে; যখন বিষ্ণুপুরাণের ঐ উল্লেখটি হইয়াছিল, তখন মূল প্রবাদটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উল্লিখিত হইয়াছে যে যুগে যুগে বেদবিভাগ চলিতেছিল এবং অষ্টাবিংশতিবার দ্বাপর যুগ আসিয়াছিল এবং আঠাশটি বেদব্যাস ভিন্নভিন্নবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেদবিভাগ কবিয়াছিলেন। এই গণনায় অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠরূপী ব্যাস এবং নবম সারস্বতরূপী ব্যাস বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন বর্ণিত আছে। ইহাতে এ কথাও আছে যে চতুর্বিংশ দ্বাপরে সুপ্রসিদ্ধ বাম্পীকি বেদব্যাস হইয়াছিলেন, এবং অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদৈবায়ন ঐ উপাধি পাইয়াছিলেন। ভবিষ্য দ্বাপর যুগে অশ্বখোষা বেদব্যাস হইয়া জন্মিবেন, লেখা আছে, কিন্তু তিনি ইউরোপে কি ভারতবর্ষে জন্মিবেন, তাহা লেখা নাই।

৪৬ শ্লোকে আছে :—

যদ্ব্যজ্ঞশাস্ত্রং তুগুরজিবা বা ন চক্রতুর্বংশকরাবুধী তো।

ভদ্রোঃ হুতো তো চ সর্গতুগুর-কালেন গুরুত্ব বৃহস্পতিশ্চ ।

অর্থঃ—

বেদে তুগুর এবং অগ্নিরা ঋষি বংশপ্রবর্তক ঋষিগণ; এমন কি যজ্ঞের অগ্নি অগ্নি ঋষি হইতে উৎপন্ন। উহাদের বংশজাত গুরু এবং বৃহস্পতি রাজশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

মহাভারতে শুক্র এবং বৃহস্পতির প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন রাজশাস্ত্রের কথা ধ্বনিত হইয়াছে। এখন শুক্রনীতি বলিয়া যাহা প্রাণ্ডা যায়, তাহা যে মহাভারতে উল্লিখিত

শুক্রের রাজশাস্ত্র নহে, তাহার প্রমাণ এই যে মহাভারতে শুক্রের নামে যেসকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে, শুক্রনীতিতে তাহার একটুও প্রাণ্ডা যায় না। চাণক্যের নামে প্রচলিত “অর্থশাস্ত্র” গ্রন্থের বিচারে এই ঐতিহ্যটির অনেক মূল্য আছে।

৪৮ শ্লোকটি বাম্পীকির সময়বিচারে উপযোগী হইতে পারে। ঐ শ্লোকটি এই :—

বাম্পীকিনীমণ্ড সর্গ পদ্মং ব্রহ্ম যদ্র চাবনো মহর্ষিঃ ।

চিকিৎসিতং বচ চকার নাম্নিঃ পশ্চাত্তমাত্রেব ঋষির্জগাদ ॥

সুবিধার জন্য প্রথমতঃ শেষ ছত্রটির কথা বলিব। এই ছত্রে চিকিৎসিত কথা লইয়া pun আছে। অত্রি ঋষি যাহা করিতে পারেন নাই, আত্রেয় বা অত্রি-পুত্র তাহা পরে রচনা করিয়াছিলেন বা গাহিয়াছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র বা চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি আত্রেয় হইতে বলিয়া এ দেশের প্রাচীন প্রবাদ আছে। এবং ঐ প্রবাদ চব্বসংহিতার ভূমিকাতেও পাওয়া যায়।

প্রথম ছত্রে আছে যে মহর্ষি চাবন যাহা কবিত্তে পারেন নাই, বাম্পীকির ‘নাদ’ সেই পদ্ম সৃষ্টি কবিয়াছিল। বেদে চাবন ঋষির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বাম্পীকির নাম পাওয়া যায় না। বাম্পীকি যে চাবনের পুত্র, সেই চাবন যে আধুনিক, তাহা মনে করিতে পারি। কারণ নির্দেশ করিতেছি।

বাম্পীকি এবং বাম্পীকি শব্দের বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ভাষা যত দিন প্রচলিত ছিল, ততদিন ঐ শব্দের ব্যবহারেই হইতে পারিত না। বেদের ভাষায় ‘বম্’, ‘বম্বক,’ ‘বম্বী’ শব্দের অর্থ পিপীলিকা এবং উই। পববর্তী সময়ের ভাষায় বর্ণব্যত্যয় (metathesis) হইয়া ‘বম্’ স্থলে ‘বম্ব’ হইয়াছিল। কাজেই বাম্পীকি নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রথম বেদবিভাগ যখন চলির প্রথমভাগে ব্যাস কর্তৃক হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত, তখন বেদের টীকায় যেসকল ব্রাহ্মণসাহিত্য হইয়াছিল, তাহা কলিযুগ কিছুদূর আগ্রসর না হইলে হয় নাই। কাজেই অন্ততঃপক্ষে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাম্পীকি নামে কোন লোকের উৎপত্তি কলিযুগের কিঞ্চিৎ প্রসারের

পরে হইয়াছিল; তিনি ত্রেতাযুগের ঋষি বা কবি হইতে পারেন না।

বাস্তবিক আদিকবি বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, অখণ্ডোষেব গ্রন্থে তাহার প্রাচীনতম উল্লেখ পাইলাম। যে সাহিত্য বেদশাস্ত্রের টীকার জন্ত বচিত হইয়াছিল, তাহারও অনেকগুলিতে অবৈদিক অর্থাৎ নূতন ধরণের অল্পটুপ ছন্দেব রচনা আছে। ঐ বচনা বাস্তবিক নামধারী ব্যক্তির পূর্ক সময়ের হইতেই হইবে। এ স্থলে ক্রৌঞ্চবধ দেখিয়া প্রথম অবৈদিক অল্পটুপ ছন্দে বাস্তবিক পঞ্চ বচনা করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যায় না। অখণ্ডোষের নির্দেশ হইতে মনে হয় যে, যাহাকে লৌকিক পঞ্চ বা কাব্য বলা যায়, তাহার প্রথম রচনা বাস্তবিক হাতে। পঞ্চ, কাব্য প্রভৃতি শব্দ খুব প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। অন্ততঃ চারিশত খৃঃ পূঃ গ্রন্থে সাধারণলোকচরিত্রের কথার কাব্য রচনা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। বাস্তবিক আদিকবি বলিয়া যে প্রবাদটি আছে, তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া এই কথা মনে হয় যে ঐ কবি কর্তৃক বহু পূর্ককালে যে রচনা হইয়াছিল, হয় ত বা তাহা আর নাই। প্রচলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাস্তবিক পদ্যস্বরূপ করিয়া হইলেও উহা যে আদি কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, সে কথা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতে যাওয়াই অসম্ভব। যাহা হউক, এ বিষয়ে নানা সময়ে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছি বলিয়া সে কথার আর উল্লেখ করিব না।

অখণ্ডোষের সময়ের অনেক পূর্ক হইতে যে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে জানা যায়। ব্রাহ্মণেরা লোকশিক্ষক হইলেও ক্ষত্রিয় জনক ভারতবর্ষে যোগবিধি স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং সুরগণের পক্ষে যাহা সম্ভবপর হয় নাই, শৌরী (কৃষ্ণ) তাহা সাধন করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই :—

আচার্য্যক যোগবিধৌ বিজ্ঞানাস্রাণ্ডমর্জ্জেনকো জগাম।

খ্যাতানি কর্ণাণি চ বানি শৌরোঃ শুরাদয়ন্তেবলা বভূবুঃ॥

আর্য্য সমাজে কৃষ্ণপূজার সময় সম্বন্ধে প্রবাসীতে পূর্ক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এখন উহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। কয়েকটি ঐতিহ্য সম্বন্ধে যেসকল নিদর্শনের

উল্লেখ করিলাম, এ দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন আশা করি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

গোঁপ-খেজুরে

[আলফল দোদে লিখিত "লা কিং এ ল্য পারসুত"]

নামক মূল কবিতা গল্প অনুসরণে]

কুড়েমির বাথান আর আরাম আরেসের আড্ডা ছিল সেই ব্রিডা শহরটি। সেখানে একজন মূর ভদ্রলোকের বাস ছিল,—বাগে মায়ে তাহার নাম রাখিয়াছিল সিদি লাকদার, আর শহরের সুবাই তাহার নাম রাখিয়াছিল 'আলসে কুড়ে'।

পৃথিবীর মধ্যে অল্জেরিয়া কুড়েমির জন্ত নামজনা; তাহার মধ্যে ব্রিডা শহরটি বিশেষ; আর তাহার মধ্যে সিদি লাকদার সবিশেষ। এই মহামহিমাবিত্ত ব্যক্তিটি আল্জকেই নিজের আসল পেশা করিয়া তুলিয়াছিল,—অল্প লোকেরা কেউ বা দবজি কেউ বা ভিত্তি কেউ বা মরাইখানার বাবটি, কিন্তু সে, সিদি লাকদার, আলসে কুড়ে;—এতেই তাহার গৌরব।

পিতার মৃত্যুর পর সিদি লাকদার ওয়ারিস-বৃত্তে একখানি বাগান-বাড়ীর মালিক হইল। সংসার অস্বাভ ও অন্ত্য, এখানে মেহনত করা মিথ্যা—এই মহাত্মা সিদি লাকদারের বেশ মালুম হইয়াছিল। সে হাত পা এলাইবা বাড়ীর মধ্যে পড়িয়া থাকাটাই উপযুক্ত মনে করিল। তাহার কুড়েমির তাড়সে অল্পদিনের মধ্যেই অতি সঙ্কল্পে বাড়ীটির মাটিব দেহ মাটিতে মিশাইল; বাগানের চুনকাম-করা নীচু প্রাচীরটিও খসিয়া খসিয়া এলাইবা পড়িতে লাগিল; বাগানের দরজা আগাছার আক্রমণে আটক হইয়া জল হইয়াই রহিল;—কুড়েমির এমনি ছোঁয়াচে মহিমা। বাগানে বাঁচিয়া রহিল এত অবদেও গোটাকত আজোর আর খেজুর গাছ, আর বাসের মাঝে গোটা দুই তিন ঠাণ্ডা জলব নদীর। বাড়ী বখন দেহত্যাগ করিল, তখন নির্বিকারচিত্তে সিদি লাকদার আসমানের সামিয়ানার তলে বাসের ফরাশের উপর হাত পা ছড়াইয়া অনড় অচল নির্দাক

জড় পড়িয়া পড়িয়া জীবনের মেয়াদ কাটাওয়া দিবে
সকল করিল।

ক্ষুধা লাগিলে সিদি লাকদার হাতড়াইয়া এক আখটা
পাকিয়া-পড়া আজীর কি খেজুর মুখে তুলিয়া অতি কষ্টে
নাচার ভাবে গিলিয়া কেলিত; ক্ষুধা তৃষ্ণার মরিবার মতন
হইলেও গা তুলিয়া আপনার এত কষ্টের অর্জিত নাম
হাসাইত না। বাগানে আজীর আর খেজুর, গাছে পাকিয়া
গাছেই শুকাইত; ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক ফলগোথে
গাছে কলরব করিত, ঝটাটি করিত, তাহাতেই যে ছুই
চারিটা পাকা ফল খসিয়া ঝরিয়া পড়িত তাহাই সিদি
লাকদারের ভোগে লাগিত; আর লাল লাল ক্ষুদি গাঁপড়ে
মিষ্ট রসে আকৃষ্ট হইয়া তাহার বিপুল দাড়ির কাঁদির
ভিতর গাঁধি লাগাইত।

এই অপূর্ণ রকমের বাদশাহী কুড়েরি লাকদারকে
দেশবাসীর কাছে সমাদৃত সম্মানিত করিয়া তুলিয়াছিল।
দেশে তাহার খ্যাতি আর খ্যাতির সাধু সন্ত নবী পরম্পরের
চেয়ে কম ছিল না। তাহার আন্তানার সমুখ দিয়া কেহ
ঘোড়ার চড়িয়া বাইত না, তাহার আন্তানার কাছাকাছি
আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পথিক পদব্রজে ঘোড়ার
লাগাম ধরিয়া চলিত; এমন কি তাহার আন্তানার কাছে
শহরে মেয়েরাও ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় ঝগড়া
করিত; মকতব মদরসার পড়ুয়ারা পাঠশালার ছুটির
পর ক্ষুধা খেলা বাড়ীঘর সব তুলিয়া ডুরে ছিটের চাপকান
আর লাল লাল টুপি পরিয়া উৎসুক কোতুকে তীর্থযাত্রীর
মতো দলে দলে আসিয়া পাঁচিলের উপর চড়িয়া এই
মহাপুরুষকে দর্শন করিত।

ছোড়ারা কিন্তু এই মহাপুরুষের মর্যাদা অধিকক্ষণ রক্ষা
করিতে পারিত না; তাহারা তাহার নিশ্চল শয়ন লক্ষ্য
করিয়া হাসিত, নাচিত, কলরব করিয়া হাততালি দিত,
লাকদারের আটপৌরে ডাকনাম ধরিয়া ডাকিত, নেবু
খাইয়া তাহার খোসা ছুড়িয়া তাহাকে মারিত। পণ্ডপ্রম।
আলসে কুড়ের নড়নও নাই চড়নও নাই। মাঝে মাঝে
সে ঘাসের ভিতর হইতে অতি কষ্টে গেড়াইয়া শাসাইত
বটে “রোস ত ছোড়ারা, আমি যদি উঠি ত...” কিন্তু ওঠা
তাহার কখনো ঘটনা উঠিত না।

ভবিতব্যের লিখন আর খোদাতালাংর মর্জি, পূর্বজন্মের
পুণ্যফলে একটা ছোড়ার উপর আল্লার নেকনজর পড়িল,—
তাহার মনে হঠাৎ খেয়াল হইল যে সিদি লাকদারের
মতন সেও সটান শুইয়া জীবনটাকে ফাঁকি দিয়া ফুকিয়া
দিবে। সকাল বেলা উঠিয়া সে বাপেব কাছে এতেনা
করিল যে সে অতঃপর আর পাঠশালার চৌহদ্দি মাড়াইবে
না, সে আলসে কুড়ে হইবে।

তাহার পিতা পরিশ্রমী শিল্পী, গুলি গাঁজা খাইবার
হকার নল তৈরি তাহার ব্যবসা। সে মোরগের সঙ্গে
জাগিয়া আপনার খরাদকলে নলের গায়ে নক্সা কৌদে। সে
বেটার বায়না শুনিয়া ত অবাক। সে বলিল,—ইয়া আল্লা!
আলসে কুড়ে হবি, তুই? তোকা মতলব!
বহুত আচ্ছা বাচ্চা! জিতা রহ।

—হাঁ বাবা, আমি সিদি লাকদারের মতন নাম করব।

—আরে তোবা তোবা! এও কি একটা কথা! তুই
হলি আমার বেটা, তুই বাপের ব্যবসা শিখে খরাদ করবি,
গুলিগাঁজার নল কুঁদবি। আমরা ছুনিয়ার লোককে
আলসে কুড়ে বানাই, আর তোর সাধ গেল কিনা নিজে
আলসে কুড়ে হতে? পৈত্রিক ব্যবসা তোর ভালো না
লাগে, তুই তোর আলি চাচার মতন কাজির দপ্তরখানার
দস্তর মতো দপ্তরী হবি। কিন্তু আলসে কুড়ে, সে কখনো
না। যা যা, মকতবে যা, নইলে দেখেছিস এই
আনকোরা কোড়া, এই দিবে তোকে বিত্তিয়ে লাল
করে দেবো।

কোড়ার কড়াকড়িতে পড়িতে যাওয়ার কড়ার করা
ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর রহিল না। সে পড়িতে গেল,
মকতবে নহে, বাজারের এক রাস্তায়,—একটা গালিচার
ধোকানের গাঁটরির আড়ালে সটান চিতপাত হইয়া।
চিতপাত পড়িয়া পড়িয়া মুর-বাজারের লঠনের গায়ে রোদের
ঝলকানি, নীল রঙের টাকার তোড়ার বনঝনানি, বুকের
উপর জরির কাজ-করা জামা জোব্বার ঝকঝকানি দেখিয়া
শুনিয়া, আর গোলাপ-জলের কার্কার আর ভেড়ার
লোমের বস্তার মিঠে কড়া গন্ধ শুকিয়া দিনের পর দিন সে
ফুকিয়া দিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরেই গুল্লের কীর্ষিকাহিনী পিতার নিকট

পৌছিল। সে চীৎকার করিয়া আশ্চর্যন করিয়া আঁদার নামে গালাগালি করিয়া দোকানের পুঁজিপাটা নল কঞ্চি একে একে সমস্ত ছেলের পিঠে পিটিয়া পিটিয়া ভাঙিল। পশুশ্রম! মহাভ্রমের সঙ্কটের দৃঢ়তা অসাধারণ! বালক পিতাকে বেশনাকাতর তারস্বরে বলিতে লাগিল—আমি আলসে কুড়ে হব আমি আলসে কুড়ে হব।

এত নাকার পবেও হররোজ সে আপনার কুড়েমির কোণটিতে হাজিরি দিতে লাগিল।

নাচার হইয়া পিতা পুত্রকে বলিল—চল, নেহাতই যখন আলসে কুড়েই হবি, তখন চল তোকে সিদি লাকদারের সাগরেদ করে দিয়ে আসি। সে তোকে কুড়েমিতে তালিম করে দেবে। যতদিন তুই শিক্ষানবিশ থাকবি ততদিন আমিই তোর খোরপোষ চালাব।

পুত্র আনন্দে লক্ষ দিয়া বলিল—সাবাস! বাহবা! হোফা! এই ত আমার বাবার মতন কথা। ভালা মোর বাপরে।

পরদিন প্রভাতেই ছুজনে সেই মহাপুরুষ দর্শনে বাজা করিবার উদ্বেগ করিতে লাগিল; সুর দিয়া আছা করিয়া টাটকা সন্ম মাথা চাচিয়া, একটু নেবুর তেলে তুলা ভিজাইয়া কানে শুঁজিয়া, আঙুলে আতর মাখাইয়া মধ্যহাঁটা দীর্ঘ-প্রান্ত গৌপে চাড়া লাগাইয়া, দীর্ঘ দাড়িতে মেহেদি গাতার রং মাখাইয়া ছুজনে ফিটফট হইয়া বাজা করিল।

বাগানের দ্বার অব্যাহত। অভ্যাগত পিতাপুত্র অবাধে ঝোপঝাড় কাঁটাচৌঁচা ডিঙাইয়া বাগানে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু বাগানের মালিকের সন্ধান লম্বা ঘাসের অঙ্গলের মধ্যে অনেক চেষ্টায় তবে মিলিল; তাহার দেখিল আজীর গাছের তলে, উপরে পাখীর নীচে গাঁপড়ের কাকের মাঝে, আগাহার বিছানার একটা জরদা রঙের ছোঁড়া-কাপড়ের গুলিন্দা পড়িয়া আছে—সেটা তাহাদিগের আগমনে গেঙাইয়া অভ্যর্থনা করিল। যেখান হইতে আগাহার আসিল সেখানটা লালচে কালো কি কালচে লাল, স্পন্দ দর্শনে জানা গেল সেটা সিদি লাকদারের বিপুল দাড়ি আর গাঁপড়ের গাঁথি।

খরাদগর রাজা ছমড়াইয়া কপালে কমতল ঠেকাইয়া সন্দেহে সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর মেহেরবান ও

কদরদান। এই আমার বেটা, খেয়াল ধরেছে আলসে কুড়ে হবে; এ-কে কত ক'রে বুঝিয়ে বললাম আলসে কুড়ে হওয়া কেবলমাত্র সিদি লাকদার আপনাকেই সাজে, গরীবের ছেলের পক্ষে এমন জরাজীর্ণ ঘোড়ারোগের চেয়েও সর্বনেশে। কিন্তু এ একেবারে নাছোড়বান্দা। তাই হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, আপনি মেহেরবানি করে' পরীক্ষা করে' দেখুন এর আলসে কুড়ে হবার মতন হিন্দুত ও হুনর আছে কি না।

সিদি লাকদার কোনো কথা না বলিয়া তাহাদিগকে ঘাসাসনে বসিতে ইয়াসা করিল। পিতা বসিল, পুত্র ঘাসের উপর একেবারে শুইয়া পড়িল। বাঃ! কি চমৎকার সিদ্ধির সঙ্কেত। ইহাই তাহার সফলতার প্রথম প্রধান ও প্রবল লক্ষণ। বারনার নমুনাতেই সিদি লাকদার সাগরেদের উপর খুসি হইয়া গেল।

তিন জনেই নির্বাক নিম্পন্দ। ঠিক দুপুর বেলা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ, আর কাঠকাটা গরম। কমলা আর বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধ অগ্নে অগ্নে তজ্জার মতো বহিয়া আসিতেছিল। আগাহার ডগায় ডগায় শুক হুটাগুলি বাতাসে নাড়া পাইয়া কম কম বুহুর বুহুর করিয়া বাজিতেছিল আর মাঝে মাঝে একএকটা ফট ফট করিয়া ফাটিয়া বীজগুলি ঝর ঝর করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গাছে গাছে পাখী পাখা মেলিতেছিল বুজিতেছিল। পাকা পাকা আজীর আর খেজুর ডালে ডালে ঠেকিয়া ঠেকিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। জলের নহর ঘাসের বনে কুল কুল করিয়া বহিতেছিল। চারিদিকে ঘুরে আলস্তের আরামের বিশ্রামের যেন একটা ঘোর লাগিয়াছিল। খরাদগর বসিয়া বসির' চুলিতেছিল। সিদি লাকদার হাত বাড়াইয়া যে ফলটার নাগাল পাইতেছিল তুলিয়া তুলিয়া মুখে পুরিতেছিল। ছোঁড়া কিন্তু নির্ভিকার উমাসীন নিশ্চল নিম্পন্দ। একটা গাছপাকা ডগডগে আজীর ছোঁড়ার কানের কাছে পড়িল, মুখ কিরাইলোই তাহা মুখে ধার, কিন্তু সে তবু নিশ্চল। ওস্তাদ শুইয়া শুইয়া মুক্ত নেত্রে সাগরেদের এই নবাবী ধরণের আশ্চর্য মধুর কুড়েমি উপভোগ করিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা এমনি ভাবেই চুপচাপ কাটিয়া

গেল। কৰ্মকুশল খন্ডাদগরের নিকট এই “বৈঠক” (৭) নিতান্তই দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তবু সে নীরব নিশ্চল, আসনপীড়ি হইয়া বসিয়া বসিয়া চুলিতে চলিতে পড়িতে পড়িতে এক একবার আগিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখে ওস্তাদ-সাগরের লীলা আর মহাত্মা। ওস্তাদের আত্মনার গরম বাতাস পাকা কলের গন্ধভারে অলস মন্থর, আপনার চারিদিকে আলস্ত ছড়াইতেছিল।

হঠাৎ একটা মস্ত বড় খুব পাকা আজীর টপ করিয়া ছোকরার ঠোঁটের উপর পড়িয়া চেপ্টা হইয়া গেল। ইয়া আল্লা! এক গণ্ডুষ মধুব মতো আজীরটির কিবা রং, কিবা স্বাদ, আর কিবা চমৎকার গন্ধ! জিভ বাহির করিয়া মুখের মধ্যে টানিয়া লওয়ার ওস্তাদ। কিন্তু ছোকরার ঠোঁটের উপর মাধুর্যের প্রলেপের মতো আজীরটি লাগিয়াই রহিল, জিভ দিয়া টানিয়া লইতেও তাহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। থাকিতে থাকিতে লোভ যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখন সে পিতাকে চোখের ইসারা করিয়া গেঁড়াইয়া গেঁড়াইয়া বলিল—“বাবা, ‘গোঁপের ওপর আজীরটি নামিয়ে দাও ত খাই’।”

এই কথা শুনিবামাত্র সিদ্দি লাকদার মুখের গ্রাস হাতেব মুঠার পাকা আজীরটি টানিয়া কেলিয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালকের পিতাকে সক্রোধে তর্জন করিয়া বলিল—“বে-আক্কেল আহাম্মক! এই ছেলেকে এনেছিস আমার সাগবেদ করে দিতে।”

তারপর ছোকরার সম্মুখে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া তাহার চরণতলেব মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সবিনয়সঙ্গমে বলিল—“প্রভু, গুরু, তুমি কুড়ের বাদশা, আলসের ওস্তাদ, এই সাগরের প্রণাম গ্রহণ কর!.....”

চাক বন্দোপাধ্যায়।

কুমেরু জয়

নরসিংবাসী ক্যাপ্টেন রোয়ালড্ আমাণ্ডসেন দক্ষিণ
মেরু আবিষ্কার করিয়া সভ্যজগৎকে চমৎকৃত ও স্বদেশকে
খুশী করিয়াছেন। তিনি গত ১৪ ডিসেম্বর (১৯১১)

দক্ষিণ মেরুতে পৌছিয়া ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পূর্বে বহুলোক বহুবার দক্ষিণ মেরু পৌছিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকাব্য হন নাই। তাঁহাদের সেই সব চেষ্টা অদম্য উৎসাহ, প্রাণ-পাত পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায়ের কথা; তুষার-সমুদ্রের পিচ্ছিল পথের উপর দিয়া অনাহাবে অনিদ্রায়, ঝড়ঝঞ্ঝার মুখে অগ্রসর হইবার সুদীর্ঘ কাহিনী। দাক্ষিণীতে তাঁহাদের দেহ কম্পিত হইয়াছে কিন্তু হৃদয় টলে নাই; অনাহার তাঁহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের অগ্রগমনে বাধা দেয় নাই; অকৃতকাব্যতা তাঁহাদিগকে পদে পদে ব্যথিত করিয়াছে কিন্তু তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। সাধনার জয় অবশ্যস্তাবী, অবশেষে দক্ষিণমেরু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের চেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক ভূগোলজ্ঞেরা বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার-জানিত পৃথিবী উত্তর গোলার্ধের অত্যন্ত অংশই অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণ গোলার্ধের সমস্তটারই আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৪১৮ সালে পর্তুগালের রাজকুমার প্রিন্স্ হেন্রি ঐশ্বর-মণ্ডল বিদীর্ণ কবিয়া ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণ কবিয়া ভারতবর্ষে পৌছিবার অভিপ্রায়কে উৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে দক্ষিণ গোলার্ধ অনুসন্ধানের আরম্ভ। এই দক্ষিণ মহাদেশের অনুসন্ধানই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের আবিষ্কারকদের প্রধান চেষ্টা ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনো নাবিকই কুমেরু-বৃত্তে পৌছিতে পারেন নাই। ১৭০০ সালের জানুয়ারি মাসে হ্যালি ৫২° (দ) পৌছিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী নাবিক ৫৫° (দ) পৌছিয়াছিলেন। জেমস কুক ও অপর এক জন ১৭৭২ সালে দুইখানি জাহাজে যাত্রা করিয়া ১৭৭৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি সর্বপ্রথম কুমেরু বৃত্ত অতিক্রম কবিয়া ৬৭° ১৫' (দ) পৌছিলেন। এই স্থানে বরফ তাঁহাদের গতিরোধ কবিল। ১৭৭৪ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁহারা ৭১° ১০' (দ)

পৌছিল। সে চীৎকার করিয়া আশ্চর্যান করিয়া আশ্রয়-
নামে গালাগালি করিয়া দোকানের পুঁজিপাটী নল কক্ষি
একে একে সমস্ত ছেলের পিঠে পিটিয়া পিটিয়া ভাঙিল।
পশুশ্রম! মহাজনের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অসাধারণ! বালক
পিতাকে বেমনাকাতর তারত্বের বলিতে লাগিল—আমি
আলসে কুড়ে হব আমি আলসে কুড়ে হব।

এত সাক্ষার পরেও হররোজ সে আপনার কুড়েমির
কোণটিতে হাজিরি দিতে লাগিল।

নাচার হইয়া পিতা পুত্রকে বলিল—চল, নেহাতই
যখন আলসে কুড়েই হবি, তখন চল তোকে সিদ্দি লাকদারের
সাগরেদ করে দিয়ে আসি। সে তোকে কুড়েমিতে
ভালিম করে দেবে। যতদিন তুই শিক্ষানবিশ থাকবি
ততদিন আমিই ভোর খোরপোষ চালাব।

পুত্র আনন্দে লক্ষ মিচা বলিল—সাবাস! বাহবা!
তোকা! এই ত আমার বাবার মতন কথা। ত্যাগা মোর
বাপরে।

পরদিন প্রভাতেই ছুজনে সেই মহাপুরুষ দর্শনে যাত্রা
করিবার উদ্ভোগ করিতে লাগিল; ক্ষুর দিয়া আচ্ছা করিয়া
টাটকা সম্বা মাখা টাটিয়া, একটু নেবুর তেলে তুলা ভিজাইয়া
কানে শুঁজিয়া, আঙুলে আতর মাখাইয়া মধ্যাহ্নে দীর্ঘ-
প্রাস্ত গৌপে চাড়া লাগাইয়া, দীর্ঘ দাড়িতে মেহেদি
পাতার রং মাখাইয়া ছুজনে ফিটফাট হইয়া যাত্রা করিল।

বাগানের দ্বার অব্যবহিত। অভ্যাগত পিতাপুত্র
অবাধে ঝোপঝাড় কাঁটাখোঁচা ডিঙাইয়া বাগানে অগ্রসর
হইতে লাগিল, কিন্তু বাগানের মালিকের সন্ধান লম্বা
ঘাসের জঙ্গলেব মধ্যে অনেক চেষ্টায় তবে মিলিল; তাহারা
দেখিল আজীর গাছের তলে, উপরে পাখীর নীচে
পীপড়ের ঝাঁকে মাঝে, আগাহার বিছানার একটা
জরায় রঙেব ছেঁড়া কাপড়ের পুলিন্দা পড়িয়া আছে—
সেটা তাহারিগের আগমনে গেলাইয়া অভ্যর্থনা করিল।
যেখান হইতে অশ্রয়াল আসিল সেখানটা লালচে কালো
কি কালচে লাল, স্বল্প দর্শনে জানা গেল সেটা সিদ্দি
লাকদারের বিপুল দাড়ি আর পীপড়ের গাঁথি।

ধরাদগর মাজা ছমড়াইয়া রূপালে করতল ঠেকাইয়া
সসঙ্কমে সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর মেহেরবান ও

কদরদান। এই আমার বেটা, খেয়াল ধরেছে আলসে
কুড়ে হবে; একে কত ক'রে বুঝিয়ে বললাম আলসে কুড়ে
হওয়া কেবলমাত্র সিদ্দি লাকদার আপনাকেই সাজে, গম্বীষের
ছেলের পক্ষে এমন ছুরাশা খোড়ারোগের চেয়েও সর্বনেশে।
কিন্তু এ একেবারে নাছোড়বান্দা। তাই হুজুরের দয়বাসে
নিরে এসেছি, আপনি মেহেরবানি করে' পরীক্ষা করে'
দেখুন এর আলসে কুড়ে হবার মতন হিন্দুত ও হনর
আছে কি না।

সিদ্দি লাকদার কোনো কথা না বলিয়া তাহারিগকে
ঘাসাসনে বসিতে ইসারা করিল। পিতা বলিল, পুত্র
ঘাসের উপর একেবারে শুইয়া পড়িল। বাঃ! কি চমৎকার
সিদ্ধির সঙ্কেত। ইহাই তাহার সকলতার প্রথম প্রশ্ন
ও প্রবল লক্ষণ। বায়নার নমুনাতেই সিদ্দি লাকদার
সাগরেদের উপর খুসি হইয়া গেল।

তিন জনেই নির্বাক নিম্পন্দ। ঠিক দুপুর বেলা।
ঝাঁঝী রোদ, আর কাঠকাটা গরম। কমলা আর বাতাবি
লেবুর ফুলের গন্ধ ক্রমে ক্রমে তরুর মতো বহিয়া আসিতে-
ছিল। আগাহার ডগার ডগায় শুষ্ক হুটীগুলি বাতাসে
নাড়া পাইয়া কম-কম বুহুর বুহুর করিয়া বাজিতেছিল
আর মাঝে মাঝে একএকটা কট-কট করিয়া ফাটিয়া
বীজগুলি ঝর ঝর করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।
গাছে গাছে পাখী পাখী মেলিতেছিল বুজিতেছিল। পাকা
পাকা আজীর আর খেজুর ডালে ডালে ঠেকিয়া ঠেকিয়া
গড়াইয়া গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। জলের নহর ঘাসের
বনে কুল কুল করিয়া বহিতেছিল। চারিদিকে ঘুঘুর
আলস্তের আরামের বিশ্রামের যেন একটা ঘোর লাগিয়া-
ছিল। ধরাদগর বসিয়া বসিয়া হুলিতেছিল। সিদ্দি লাকদার
হাত বাড়াইয়া যে ফলটার নাগাল পাইতেছিল তুলিয়া
তুলিয়া মুখে পুঁজিতেছিল। হোঁড়া কিন্তু নির্বিকার উল্লাসী
নিম্শল নিম্পন্দ। একটা গাছপাকা ডগডগে আজীর হোঁড়ার
কানের কাছে পড়িল, মুখ ফিরাইলেই তাহা মুখে ধর,
কিন্তু সে তবু নিম্শল। ওস্তাদ শুইয়া শুইয়া মুখে নেড়ে
সাগরেদের এই নবাবী ধরণের আশ্চর্য্য মধুর কুড়েমি
উপভোগ করিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা এমনি ভাবেই চুপচাপ কাটিয়া

গেল। কর্ণকুশল খরাদগরের নিকট এই “বৈঠক” (১) নিতান্তই দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তবু সে নীরব নিশ্চল, আসনপীড়ি হইয়া বসিয়া বসিয়া টুলিতে চলিতে গড়িতে পড়িতে এক একবার জাগিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখে ওস্তাদ-সাগরের লীলা আর মহাভাব। ওস্তাদের আত্মনার গরম বাতাস পাকা ফলের গন্ধভারে অলস মন্থর, আপনার চারিদিকে আলস্ত ছড়াইতেছিল।

হঠাৎ একটা মস্ত বড় খুব পাকা আঞ্জীর টপ করিয়া ছোকরাব ঠোঁটের উপর পড়িয়া চেপ্টা হইয়া গেল। ইয়া আন্না! এক গণ্ডু মধুর মতো আঞ্জীরটির কিবা রং, কিবা স্বাদ, আর কিবা চমৎকার গন্ধ! জিভ বাহির করিয়া মুখের মধ্যে টানিয়া লওয়ার ওস্তাদ! কিন্তু ছোকরার ঠোঁটের উপর মাথুরের প্রলেপের মতো আঞ্জীরটি লাগিয়াই রহিল, জিভ দিয়া টানিয়া লইতেও তাহার ক্রেশ বোধ হইতেছিল। থাকিতে থাকিতে লোভ যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখন সে পিতাকে চোখের ইসারা করিয়া গেঙাইয়া গেঙাইয়া বলিল—“বাবা, ‘গৌপের ওপর আঞ্জীরটি নামিয়ে দাও ত খাই’।”

এই কথা শুনিবামাত্র সিধি লাকদার মুখের গ্রাস হাতের মুঠার পাকা আঞ্জীরটি টানিয়া কেলিয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালকের পিতাকে সজ্ঞে তর্জন করিয়া বলিল—“বে-আক্কেল আহাম্মক! এই ছেলেকে এনেহিস আমার সাগরের করে দিতে।”

তারপর ছোকরার সমুখে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া তাহার চরণভূলের মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সবিনয়সম্মমে বলিল—“প্রভু, গুরু, তুমি কুড়ের বাদশা, আলসের ওস্তাদ, এই সাগরের প্রণাম গ্রহণ কর!.....”

চাক বন্দোপাধ্যায়।

কুমেরু জন্ম

নরওরেবাসী ক্যাপ্টেন রোয়ালড্ আমাণ্ড্‌সেন্ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিয়া সভ্যজগৎকে চমৎকৃত ও স্বদেশকে ধস্ত করিয়াছেন। তিনি গত ১৪ ডিসেম্বর (১৯১১)

দক্ষিণ মেরুতে পৌছিয়া ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্য অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাহার পূর্বে বহুলোক বছবার দক্ষিণ মেরু পৌছিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকাব্য হন নাই। তাহাদের সেই সব চেষ্টা অদম্য উৎসাহ, প্রাণ-পাণ্ড পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসারের কথা; তুমার-সমুদ্রের পিছিল পথের উপর দিয়া অনাহারে অনিদ্রায়, কড়বন্ধায় মুখে অগ্রসর হইবার সুদীর্ঘ কাহিনী। দারুণ শীতে তাহাদের দেহ কম্পিত হইয়াছে কিন্তু হৃদয় টলে নাই; অনাহার তাহা দিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে কিন্তু তাহাদের অগ্রগমনে বাধা দেয় নাই; অকৃতকাব্যতা তাহাদিগকে পদে পদে ব্যর্থ করিয়াছে কিন্তু তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। সাধনার জয় অবশ্যস্তাবী, অবশেষে দক্ষিণমেরু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের চেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক ভূগোলজ্ঞেরা বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার-জানিত পৃথিবী উত্তর গোলার্ধের অত্যন্ত অংশই অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণ গোলার্ধের সমস্তটারই আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা তাহারা অল্পতব করিয়াছিলেন। ১৪১৮ সালে পর্তুগালের রাজকুমার প্রিন্স্ হেন্রি গ্রীষ্ম-মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে পৌছবার অভিপ্রায়কে উৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে দক্ষিণ গোলার্ধ অন্বেষণের আরম্ভ। এই দক্ষিণ মহাদেশের অন্বেষণই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের আবিষ্কারকদের প্রধান চেষ্টা ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনো নাবিকই কুমেরু-বৃত্তে পৌছিতে পারেন নাই। ১৭০০ সালের জানুয়ারি মাসে হ্যালি ৫২° (দ) পৌছিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী নাবিক ৫৫° (দ) পৌছিয়াছিলেন। জেমস কুক ও অপর এক জন ১৭৭২ সালে দুইখানি জাহাজে যাত্রা করিয়া ১৭৭৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি সর্বপ্রথম কুমেরু-বৃত্ত অতিক্রম করিয়া ৬৭° ১৫' (দ) পৌছিলেন। এই স্থানে বরফ তাহাদের গতিরোধ করিল। ১৭৭৪ সালের ৩০ জানুয়ারি তাহারা ৭১° ১০' (দ)



ক্যাপ্টেন আমাণ্ডসেন।

পৌঁছলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার দক্ষিণে আর কেহ যাইতে পারেন নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জেমস ওয়েডল ৭৪° ১৫' (দ) পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি কুমেরু দেশস্থ জীবসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ সালে রস ৭৮° ১০' (দ) পৌঁছিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী নরওয়ে দেশের “গ্যান্টার্টিক” নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন সর্বপ্রথম কুমেরু-মহাদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। “সাদারন ক্রস” নামক জাহাজে আর একটি অভিযান ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কেপ্‌ গ্যাডেরার পৌঁছিয়াছিল। এই অভিযানে প্রায় পঞ্চাশটি কুকুর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা দশজন এক বৎসর কুমেরু-দেশে বাস করিয়াছিলেন। ইহাই মানবের কুমেরু-দেশে বাস করার প্রথম উদাহরণ। কুকুরটানা গাড়ী চড়িয়া মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা কৃতকার্য হইলেন না, কেবল জীবজন্তুর বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ফিরিলেন। ১৯০১ সালের শরৎ-কালে কমান্ডার স্কটের অধীনে আর একটি অভিযান

প্রেরিত হইল। লেফটেন্যান্ট ব্যাকল্টনও এই দলে ছিলেন। ৭৭° ৪৯' (দ) জাহাজ রাখিয়া তীরে একখানি কুটার নির্মাণ করিলেন। কুকুরটানা গাড়ী চড়িয়া তাঁহারা ভূমি আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন। পথে মাঝে মাঝে ভাঙার স্থাপন করিয়া আহাৰ্য্য দ্রব্য সংরক্ষিত হইল। পথে তাঁহারা নেকড়ে, ভল্লুক বা শেয়ালের সাক্ষাৎলাভ করেন নাই, শীকারও হুপ্রাপ্য ছিল। তাঁহারা গাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ১৯০২ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁহারা ৮২° ১৭' (দ) পৌঁছিয়াছিলেন। ৫৯ দিনে তাঁহারা ৩৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁহারা জাহাজে আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্যাকল্টনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত একখানি জাহাজে বৈশে ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা দ্বিতীয় বৎসর শীতের অন্ধকার মাসগুলো গ্যাসেটিলিন্‌ গ্যাস জ্বালাইয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিলেন। ১৯০৮ সালের ১ জানুয়ারি ব্যাকল্টন পুনরায় যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গ্যাসেটিলিন্‌ গ্যাস ও মাধুরীর টাটু বোড়া ছিল। এবার বোড়াগুলি সঙ্গে থাকিতে গাড়ীটানা দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হইয়াছিল। পথে অগ্রসর হইবার সময় কোনো বোড়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে সেটিকে গুলি করিয়া মারিয়া তাহার মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। ১৯০৮ সালের বড়দিনে তাঁহারা ৮৫° ৫৫' (দ) ও ১৯০৯ সালের ৯ জানুয়ারি ৮৮° ২৩' (দ) পৌঁছিলেন। এস্থানটি সমুদ্র হইতে ১১,৬০০ ফুট উচ্চ। আরো কিছু আহাৰ্য্য থাকিলে মেরু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ৯৭ মাইল যাওয়া অসম্ভব হইত না। কিন্তু খাদ্যভাবে দারুণ দুর্গতি ভোগ করিয়া ৭০০ মাইলের উপর পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা জাহাজে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকল্টনের প্রত্যাবর্তনের পরে ক্যাপ্টেন আমাণ্ডসেন মেরু আবিষ্কারের সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করেন। ক্যাপ্টেন আমাণ্ডসেনের দলে উনিশ জন লোক ছিল। তাঁহার জাহাজের নাম ‘ফ্রাম’—এই জাহাজ উত্তরমেরু আবিষ্কার-যাত্রী প্রসিদ্ধ গান্সেনের জন্য নির্মিত হইয়াছিল; তাঁহার শেষ মেরু-অভিযানে তিনি এই জাহাজ ব্যবহার করিয়া-ছিলেন।

আমাগুসেন্ তাহার শীতের আড্ডা হইতে কুকুরটানা গাড়ী চড়িয়া দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে ছয় সাত শত মাইল পথ গিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের আরো চারিটি অভিযান এই একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল। ইংরাজ অভিযান ক্যাপ্টেন স্কটের অধীনে “টেরা নোভা” নামক জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল। এ দলে ষাট জন লোক ছিল। স্থলপথে ভ্রমণের জন্য কুকুর, টাটুঘোড়া ও “মোটর স্নেজ” ছিল। অপর অভিযানগুলির মধ্যে একটি জার্মান, একটি জাপানী ও একটি অষ্ট্রেলীয়।

আমাগুসেনের বয়স চল্লিশ বৎসর মাত্র। তিনিই সর্বপ্রথম (১৯০৩-০৫) আটল্যান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে উত্তর-পশ্চিম পথ দিয়া জাহাজ লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পথটিই খুঁজিতে খুঁজিতে কলম্বাস দৈবক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আমাগুসেনের (১৯০৩-০৫ সনের) অভিযানে লক্ষ টাকার বেশী খরচ হয় নাই। তিনি মাত্র ধরিবার ৭০ ফুট লম্বা এক ক্ষুদ্র পোতে আরোহণ করিয়া তিনি এই কাব্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আমাগুসেন্ নিজ মুখে দক্ষিণ মেরুযাত্রার যে বিবরণ বলিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল।

“স্কট যে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন তাহার কোনো নিদর্শন দেখিতে পাই নাই। হয়ত তিনি সেখানে পৌঁছিয়া এমন কোনো সামান্য নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছিলেন যাহা ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একপ ঘণ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কারণ যে তিন দিন আমি সেখানে ছিলাম সে কয় দিনই বায়ুর অবস্থা বেশ শান্ত ছিল। ইহাই সেখানকার বায়ুর সাধারণ অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। চারিদিকেই অসীম তুষারমণ্ডিত সমতলভূমি, সে হেতু সেখানে প্রস্তুতস্বপ্ন স্থাপন করা অসম্ভব।

“প্রথম প্রথম প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টায় পনের মাইল গিয়া দুই ঘণ্টা নিজেরা আহার করিতে ও কুকুরগুলোকে খাওয়াইতে ব্যয়িত হইত; বাকি ১৭ ঘণ্টা ঘুমাইয়া কাটাইবার চেষ্টা করা হইত। বিশ্রামের সময়টা আমাদের পক্ষে ও কুকুরদের পক্ষে নিতান্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হওয়াতে স্থির করা গেল, প্রায় ছয় ঘণ্টায় পনের মাইল যাওয়া হইবে; তৎপরে দুই ঘণ্টা আহার করিতে

ও কুকুরগুলোকে আহার করাইতে যাইবে; তৎপরে ছয় ঘণ্টা নিদ্রা, তৎপরে পুনরায় ভোজন ও যাত্রা। এইরূপে ফিরিবার সময় আমরা দিনে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি। শেষাংশে প্রায় ছয় সপ্তাহ খুব উচ্চ কাটাইয়াছি, কখনো কখনো ১৬,৭৫০ ফুট উচ্চ। এখানে নিখাস ফেলিতে কষ্ট হইয়াছিল, উঠিবার সময় খুব হাঁপাইয়া ছিলাম। ঠিক মেরু স্থানটি ১০,৫০০ ফুট উচ্চ অবস্থিত।

“পথিমধ্যে কখনো আমাদের আহাৰ্য্যের অনাটন হয় নাই। কিন্তু অনাটন হয় নাই বলিলে ইহা বুঝিবেন না যে আমরা পেট ভরিয়া খাইতাম, কারণ কুকুরটানা গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় ক্ষুধাটা মাত্রা ছাড়াইয়া ওঠে। ফিরিবার সময় কিন্তু ৮৬° পার হইয়া তবে আমরা ভাণ্ডার হইতে পেট ভরিয়া খাইয়াছিলাম। মেরু যাইবার সময় ৮৫½°তে প্রথম কুকুরের মাংস খাওয়া হইল। এইখানে ২৪টি কুকুর মারা হইয়াছিল। সর্বদা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলেও তাহারা খুব জটপুষ্ট ছিল; কুকুরের মাংস খাইতে অতি সুস্বাদু; সে মাংস খাইতে কোনো কষ্টই বোধ হয় নাই। ৮৫½°তে দুইটি ‘স্কুয়া গাল’ পাখী দেখিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় পথ চিনিবার জন্য একটা স্থূপ স্থাপনা করিয়াছিলাম। আমরা যেই যাত্রা করিয়াছি অমনি পাখীগুলো উড়িয়া আসিয়া স্থূপের উপর বসিল। তিনটি ভাল কুকুর ৮০°তে আমাদের সঙ্গে ত্যাগ করিল। ৮২½°তে আমরা একটি কুকুরীকে মারিয়াছিলাম, কুকুরগুলো তাহারই সন্ধানে গিয়াছে। আমাদের ভাবনা হইল যে কুকুরগুলো আমাদের ভাণ্ডার লুট করিয়া খাইবে। মেরু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ৮০°তে পৌঁছিয়া ভাণ্ডার-চাপা বরফের স্থূপের চারিদিকে কুকুরের পদচিহ্ন দেখা গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় ভাণ্ডার মধ্যস্থ পেমিক্যান (মাংসের বড়) কিছুতে স্পর্শও করে নাই, যেমনকার তেমনি আছে। কুকুরগুলোর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ৮২½°তে যাওয়া গেল। এখানে কুকুরীটিকে মারিয়া একটা বরফের গাদার উপর আহাৰ্য্যের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কুকুরগুলো সেটিকে আহাৰ্য্য করিয়া ৮২°তে ভাণ্ডারে গিয়া একটা ‘পেমিক্যানের’ বাক্স সাক্ষাৎ করিয়াছে; তত্পরি খাওয়ার জন্য আরো দুইটি কুকুর মারিয়া রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেগুলোও

খাইয়াছে, এমন কি চামড়ার দড়ি ও অন্যান্য ছপাচা বস্ত্রও বাদ দেয় নাই। মাত্র এগারোটা কুকুর আমাদের সঙ্গে আহাঙ্গে কিরিয়াছিল।

“মেরুর অদূরে উচু পাহাড়ের উপর আমি ও আমার চারজন সঙ্গী ক্রিষ্টমাস উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলাম। সে দিনকার ভোজে কিছু বেশী বিকুটের বরাদ্দ ছিল। নরওয়ার ক্রিষ্টমাসের সহিত কত প্রভেদ, কিন্তু আনন্দের কমতি ছিল না। কিরিবাব সময় আমরা এক দিনও বিশ্রাম করিতে পাই নাই, এমন কি ক্রিষ্টমাসের দিনও নয়। দিনের পর দিন বায়ুর সকল অবস্থাতেই চলিয়াছি। আমাদের কোনো বিপদ ঘটে নাই, কিন্তু খুব কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

“আমার সহচরেরা ও কুকুরেরা আমার কৃতকাৰ্য্যতার মূল। ‘ক্র্যাম’ জাহাজে কুকুরগুলোকে যথেষ্ট সাবধানতার সহিত রাখা হইয়াছিল, সেই হেতু তাহারা যখন কুমেরুদেশে পদার্পণ করিল তখন তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট ছিল। মেরু-যাত্রার আহারের কষ্ট হয় নাই, বরং তাহার বিপরীত; কারণ আমার সঙ্গীরা যখন জাহাজে ফিরিলেন তখন তাহারা মোটা হইয়াছেন বলিলেও চলে। যাত্রা করিবার সময় তাহারা যে পরিমাণ আহার করিতেন এখন আর ভেমন পায়েন না। কুকুরগুলোও মোটা হইয়াছিল। তাঁবুর গোড়ায় অনেক শীল-মাংস পড়িয়া ছিল তাহারা তাহা স্পর্শ করে নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যাত্রার শেষভাগে তাহাদের আহারের কোনো কষ্ট হয় নাই। ঘান বা দাড়ি কামানো কখনো ঘটনা উঠে নাই। দাড়ি লম্বা হইলে নিখাস প্রস্থানে দাড়ির উপর বরফ জমে বলিয়া দাড়ি ছাটিয়া ফেলা হইত; আমাদের সঙ্গে দাড়িছাটা কলটি খুব কাজে লাগিয়াছিল। আর একটি বস্ত্র আমাদের সঙ্গে ছিল; এটি দাঁত উপড়াইবাব বস্ত্র। একটি লোকের দাঁত ধারাপ হইয়া গিয়াছিল, সেটি উপড়ান নিতান্ত প্রয়োজন; বস্ত্রটি না থাকিলে এটি উপড়াইবার জো ছিল না। আমাদের দলের কয়েকজন একরকম নুতন জাতের পাখী দেখিতে পাইয়াছিল।”

“কুমেরু-দেশ প্রধানত স্থলদ্বারাই গঠিত। এ দেশে আগ্নেয়গিরির উৎপাত বর্তমান। সেখানে প্রবল-তুষার-

ঝটিকা বহে; ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৪০—৬০ মাইল হয়। যখন তুষার-ঝটিকা বহে তখন আকাশ হইতে তুষারপাত হইতেছে, কি ভূমি হইতে তুষার উড়িতেছে তাহা বলা অসম্ভব। অনাবৃত স্থানে শৈবাল, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। ফুলের গাছ একেবারেই নাই। জলজন্তু নানাপ্রকার আছে। নানাপ্রকার তিমি ও শীল দেখা যায়। জলে স্থলে পাখীও যথেষ্ট আছে, তন্মধ্যে পেঙ্গুইন্ উল্লেখযোগ্য। স্থলচর জন্তু নাই—কেবল একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র পক্ষবিহীন পোকা দেখা যায়।”

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে মেরু আবিষ্কার হওয়াতে আমাদের অনেক লাভ হইবে। বায়ুবিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূকম্পবিজ্ঞান—বিজ্ঞানের এই তিনটি শাখার অন্তত প্রভূত লাভ হইবে। বায়ুর অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আরো নিতুল হইবে। কটিকার আগমনবার্তা সময় থাকিতে নিরূপিত হইবে ও দেশে দেশে প্রচারিত হইয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিবে। মেরুদেশের ভূকম্পের ধারী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্তই কুমেরুতে জাপানী অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। পৃথিবীর এই কঠিন আবরণের বিকম্পন পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত তুষারময় দেশে ভূকম্প-নিরূপণস্থল স্থাপিত হইয়াছিল। একটি কথা উঠিয়াছে যে কুমেরুদেশে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আছে; একজন ফরাসী না কি সোনারং সন্ধান পাইয়াছেন। পার্সী “নেশন” বলেন যে কুমেরুদেশে ঐশ্বর্যের খনি। ইহা যদি সত্য হয় ত ভবিষ্যতে জাতি-সমূহের মধ্যে ইহার জন্ত বিবাদের বিসম্বাদ, এমন কি রক্তারক্ষাও অসম্ভব নহে। জাংসেন বলেন :—

“মেরুদেশের জলস্থলের অবস্থার সঠিক পরিচয়ের উপর বায়ুবিজ্ঞান পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি, সামুদ্রিক স্রোত ও ভূমণ্ডলের প্রাকৃত ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের নীমাংসা নির্ভর করিতেছে।”

হরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

অমরনাথ প্রথমে মনে করিয়াছিল চারুকে কোনো বন্ধুর বাটীতে বাধিয়া দিবে কিন্তু দেবেন তাহার ভাব গ্রহণ করিতে স্বীকার না করায় আর কোনো বন্ধুর নিকট সাহায্য চাহিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কে কি বলিবে, হয়ত কত কৈফিয়ৎ সাক্ষ্য সফিনার তলব পড়িবে। শেষে হয়ত তাঁহারা বলিবেন—না বাপু! পরের বালাই কে ঘাড়ে করে। বিশেষ হিন্দুর ঘরের বিবাহযোগ্য অনুচ্চ কস্তা! এত বড় বালাই আর নাই। অগত্যা অমর চারুকে নিজের বাসাতেই লইয়া গেল। ঐশ্ব্যাবকাশ অমরের এই ব্যাপারেই কাটিয়া গেল, বাটা যাওয়া হইল না। হরনাথবাবু কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। অমর কোনো রকমে তাহা কাটাইয়া দিল।

অমরের বৃহৎ বাসাবাটীতে চারুর জন্ত কোনো নূতন বন্দোবস্তের দরকার হইল না। কেবল তাহার জন্ত একটা বরীয়াসী ঘি রাখিতে হইল। চারুকে নানারূপ সম্মেহ বাক্যে জঁমৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অমর নিজে বথারীতি কলেজ যাইতে আরম্ভ করিল এবং তাহার পাত্রাচরসন্ধানের জন্ত সচেষ্ট রহিল। কি জানি কেন পিতাকে এসব কথা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। সে ভাবিয়াছিল শীঘ্রই একটা সুপাত্রের সহিত চারুর বিবাহ দিয়া ফেলিয়া তারপরে পিতাকে সে অনাবশ্যক কথা বলিলেও চলিবে, না বলিলেও ক্ষতি হইবে না। এখন সকলের কোতুহলী রূপাধুটির উপরে অসহায় চারুকে ভিখারিণীর জায় দাঁড় করাইতে তাহার অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই মুহূর্ত্তশ্যা-শারিনীব সন্মুখে প্রকারান্তরের অঙ্গীকারও মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উদ্ভিত হইয়া তাহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিতেছিল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সে উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততার সহিত পাত্রই খুঁজিতে আরম্ভ করিল। দেবেন মধ্যে একখানা পত্রে চারুর কি ব্যবস্থা সে করিয়াছে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,—বিস্তি ও ক্রোধ-ভরে অমরনাথ তাহার কোনো উত্তর দেয় নাই।

নববর্ষা সমাগমে মহানগরী নবীন শ্রী ধারণ করিল।

সৌধমালা তাহা। জানালা দরজা রুদ্ধ করিয়াও নববর্ষার আগমন-সংবাদকে লুকাইতে পারিতেছিল না। খোলা ছাদেব উপরে গাঢ় কজ্জল আকাশ, মুক্তাধারার জার তাহা হইতে অশ্রান্ত মুহূর্ত্তাবা বর্ষিত হইতেছে, পার্শ্বে কদম্ব ও শিরীষ গাছ ছুটি ফুলে ফুলে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। ছাদের টবে চাকর অচেনা ফুলগুলি হইতে মুহু মুহু পঙ্ক মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিতেছিল। খোলা জানালার স্রুমে চাকলতা দাঁড়াইয়া। মুহু বারিকণা গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তাহার সন্মুখে বন্ধন-বিস্রংস কুঞ্চিত কেশে সজ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা বিদ্যুৎ জ্বালা শোভা পাইতেছিল।

চারু ভাবিতেছিল তাহাদের গ্রামের কথা। এই বর্ষায় সে তাহাদের চালেব ঘরের দাওয়ার বসিয়া বারি বর্ষণ দেখিত। সন্মুখে বম্ বম্ শব্দে অশ্রান্ত বারিপতনের সঙ্গে চারিধারে ভেক ও ঝিল্লি গভীর শব্দ, চারিধারে বনফুলের কেমন মধুর গন্ধ উদ্ভিত হইত। একএকবার মেঘ গড়্ গড়্ করিয়া ডাকিয়া উঠিত, অমনি মা ঘরেব ভিতর হইতে ডাকিতেন ‘ওমা চারু, ঘরে আয়।’

পশ্চাৎ হইতে অমরনাথ বলিল, “একি চারু ভিজ্জ কেন?”

চারু মুখ ফিরাইয়াই এক পাশে সরিয়া গেল। অমর ঘুরিয়া সন্মুখে গিয়া তাহাব মুখেব দিকে চাহিল।

“চারু কাঁদছে?”

চারু নীরব রহিল।

“কেন কাঁদছে? এখানে কি তোমাব কোনো কষ্ট হচ্ছে?”

চারু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল “না।”

“তবে কেন কাঁদছে? বল্বে না? মা’র জন্তে মন কেমন করছে?”

“হ্যাঁ।”

অমরনাথ জানালাব নিকটে গিয়া শাসি বন্ধ করিল। তার পরে নিজে একখানি চেয়ারে বসিয়া অস্ত্র একখানি চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল “বোস।”

চারু সঙ্কুচিত ভাবে বথুস্থানে উপবেশন করিল।

“চাকী, এখনো তুমি মা’র জন্তে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ?”

“না।”

“এই যে কাঁদছিলে ?”

“আজ হঠাৎ কেমন মন কেমন করছিল।”

“কেমন মন কেমন কবল চাক ?”

“কি জানি, এই বর্ষা দেখে মন কেমন করছিল।”

“কেমন ?”

“বাইবে থাকলে মা আমার ঘবে যেতে ডাকতেন।
আব—” বলিতে বলিতে চাক অশ্রুধৌত মুখখানি নীচু করিল।

অমর স্নেহে দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—

“আব কেউকি তোমার তেমন ভাল বাসেনা চাক ?”

চাক নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল।

“আর কেউ কি তোমার জন্তে তেমন ভাবেনা চাক ?”

চাক অর্ধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—“আমার আর কে
আছে ?—আপনি ছাড়া !”

অমর চাককে একটু প্রফুল্ল করিবার জন্ত হান্তমুখে
বলিল—“এ আপনি ছাড়া কথাটা বুঝি এখনি ভেবে নিলে ?

যখন কাঁদছিলে তখন মনে ছিলনা—না ?”

চাক মুখ তুলিল—ঈশ্বর আনন্দ ও লজ্জার আভাসে
পাণ্ডু মুখখানি রক্তিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে বলিল,—
“না।”

অমর আবাব হাসিয়া বলিল—“কথাটা এখনি ভেবে
বলনি, সেই না, না, মনে ছিলনা, সেই না ?”—

চাক আবাব একটু প্রফুল্লমুখে নত মুখে বলিল, “আমার
কথা আপনি ভাবেন—আমার ভালবাসেন—সেকথা আমার
সর্বদাই মনে থাকে। মা যে আমার আপনাকেই দিয়ে
গেছেন ?”—

কি কথার কি কথা আসিয়া পড়িল !—অমরের
বুকে আবার একটা আঘা লাগিল। সরলা বালিকা
হয়ত ঘুবাইয়া ফিরাইয়া বলিতে জানেনা বলিয়াই কথাটা
এমন ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছে। অমরনাথ সেটুকু মন
হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় চেয়ারখানা চাকর নিকট
হইতে একটু দূরে লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ তাহাতে স্থির ভাবে
বসিয়া রহিল।

চাকও তেমনি নতমুখেই বসিয়া রহিল। ক্রমে পরে
অমরনাথ গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীর স্বরে

বলিতে লাগিল—“আমিও সেই জন্তেই একটা ঘর তাৎ
হাতে তোমায় ফেলে দিতে পারছি না ; এত দিন খুঁজে
খুঁজে এখন একটা ভাল পাত্র পেয়েছি, উপযুক্ত পাত্র দিনে
তোমার স্ত্রী দেখতে পেলেই আমি এখন ঋণ থেকে
মুক্ত হই। চাক অত লজ্জিত হয়োনা, তুমি ত বড় হয়েছ,
সব ত বুঝতে পার, বুঝে জ্ঞাপ, এসব কথা তোমার
শাস্তিতে না বলে আর কাকে বলতে পারি এমন তোমার
কে আছে ? কেমন চাক, তোমার বোধ হয় অমত
হবে না ?”

অমরনাথ বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে এগুলি তাহার
অনর্থক বকা মাত্র হইতেছে, কেন না এসব কথার চাল
যে কিছু উত্তর দিবে ইতিপূর্বে সে এমন কোনো শ্রম
পায় নাই—বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্রেরি চাক মুকের মত মৌন
হইয়া পড়ে। বালিকাসুলভ লজ্জা ?—কিন্তু কি এ ?—
অমরনাথের মনে কেমন একটা কৌতূহলও ক্রমশঃ বৃদ্ধি
পাইতেছিল।

“চাকলতা !—মা বললাম বুঝতে পারলে ত ? কোনো
অমত নেই ত তোমার ?”

চাক নিষ্পন্দ হইতে ক্রমে নিষ্পন্দতর হইয়া বাইতে
লাগিল। অমরনাথের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না।
তাহার ভাবের ব্যতিক্রমে অমরনাথের মনে একটা অনির্দিষ্ট
আশঙ্কা ধীরে ধীরে আগিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহ সম্বন্ধে
চাকর এ নীরবতা যেন কি এক বকমের,—ইহাকে ঠিক
লজ্জার সঙ্কোচও বলা যায় না। এ যেন মৃতবৎ নিশ্চেষ্টতা।
অমরনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল কিন্তু কোন উদ্যোগ
দেখিতে পাইতেছিল না। সহসা অমরনাথের মনে হইল
চাক ভালবাসা সম্বন্ধীয় কথার বেশ উত্তর দেয়, এবং সে
প্রসঙ্গে বেশ একটু প্রফুল্লও হইয়া উঠে, অতএব সেই দিক
দিয়াই কথাটা আরম্ভ করিলে যদি এ সমস্তাৰ মীমাংসা হয়
তো চেষ্টা দেখা যাক। অমর গল্প জুড়িয়া দিল।—

“আচ্ছা চাক ! তুমি তোমাদের গ্রামের কাকে কাকে
খুব ভাল বাসতে ?”

চাক প্রথম উত্তর দিল না ; অমরনাথ আরও ত্রু এতদান
সে প্রশ্ন করায় শেষে অতি মুহূর্ত্তে কাসিয়া কাসিয়া
বলিল—“কাকে কাকে ? মাকে, ভুলো কুকুরকে,

টিয়াটিকে, দেবেন দাদাব বোন জুথুকে, দেবেন দাদাকে, আপনাকে—”

“আমাকে? সে কি চাক? তোমাদের গ্রামে আমার কোথাক পোলে?”

“কেন? আপনি যে ছবার গিয়েছিলেন। আমাকে সেবার অস্থখ থেকে ভাল কবেছিলেন। মাও আপনাকে কত ভাল বাসতেন, কত আপনাব নাম কবতেন, দেবেন দাদা কত আপনার গল্প, আপনাদের বাড়ীর গল্প বলতেন।”

অমরনাথ দেখিল সে যাহা এড়াইতে গিয়াছিল সেই ঘটনাই সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মনে মনে আবার একবার দেবেনের অবিস্মৃতকাবিতার নির্দা কবিতা অমর আবার গল্প করার মত ভাবে প্রাণ কবিল—

“আচ্ছা চাক! আমার মতন এই রকম কিছা আমার চেয়ে ভালো একটা লোকের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে দিয়ে দিই তো কেমন হয়? তাকে খুব ভালবাসবে?”

“না।”

অমরনাথ শিহরিয়া উঠিল। “কেন চাক?”

“আপনি যে আমার ভালবাসেন।”

“সেও তোমার আমার চেয়ে বেশী ভাল বাসবে।”

চাক আবার কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল। অমরনাথ নীরবে থাকিতে চেষ্টা কবিল, পারিল না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। আবার বলিতে লাগিল—

“হ্যাঁ লতা, সে তোমায় নিশ্চয় খুব ভাল বাসবে। সে খুব বড় লোক। তার মস্ত বাড়ী, কত চাকর চাকরাণী। তোমার খেলার সঙ্গী বোধ হয় সেখানে অনেক পাবে। বিয়ে হয়ে গেলেই সেখানে সে নিয়ে যাবে। শুনে বেশ আশ্চর্য হচ্চে, না চাক? সে দেখতেও খুব সুন্দর,—খুব ভাল লোক।”—অমর সহসা চাহিয়া দেখিল চাক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের হাতায় মাথা রাখিয়াছে। অক্ষুট রোদনধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেছে। অমর তাড়তাড়ি তাহার নিকটে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া সম্মুখে ভৎসনার স্ববে বলিল “ওকি চাক। ওকি ওকি।”

চাক উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“আমি যাব না, আমি যাব না।”

“সেকি? কেন? চাক?”

• “আমি তা হলে মরে যাব।”

অমর স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল। যাহা এতক্ষণ সবলে নিজের মন হইতে তাড়াইতেছিল এই তো তাহা স্পষ্ট ভাবে তাহার সম্মুখে। আর তো তাহাকে অলীক সন্দেহ বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে পাবা যায় না। ঐ তো বেদনা-ক্লিষ্টা ক্রন্দনকম্পিতা অশ্রুযুক্তী বালিকা নীরব নতমুখে জানাইতেছে তাহারই সে, সে অস্ত্র কাহারও হইতে পারিবে না।

একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও অমরনাথ কি ইহাতে দুঃখিত হইল? দুঃখ? এমন সরল স্নিগ্ধ অক্ষুটপুষ্পের মত কিশোর ছদ্মবেশ এমন দেবভোগ্য প্রথমোখিত শুভ্র প্রণয়ের আভাসটুকু কি সে অনাদব করিতে পারে? এমন ভালবাসা সে কাহার নিকটে পাইয়াছে বা কাহাকে এমন ভালবাসিয়াছে যে তাহার অস্ত্র প্রণয়ের প্রতিদান করিতে পারিবে না বলিয়া সে দুঃখিত হইবে? আর সেও কি এখন পর্য্যন্ত তাহার কি কর্তব্য স্থির করিতে পারিয়াছিল? নিজের বিবাহের কথা, পিতার ক্রোধ, এইসব নানা কাবণ পর্যালোচনা করিয়া সে পাত্র খুঁজিতেছিল সত্য, কিন্তু সেই স্বচ্ছ নীল সরল চক্ষু দুটা কি একএকবার সব গোলমাল করিয়া দিতেছিল না? তথাপি হয় ত অমর নিজের কর্তব্য একবকমে করিয়া ফেলিত। কিন্তু এখন? এখন আবও বিল্টাট। বিল্টাট বটে, তবু সেই বিল্টাটটুকুতেই কি তাহার শোণিত-সমুদ্র স্বেচ্ছাস্থ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল না? চাক—চাকলতা তাহারই। চাক তাহাকেই ভালবাসে। সে কি আর জানিয়া শুনিয়া তাহার সে ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? মাহুঘের যখন মনের ইচ্ছা কর্তব্যের ভাবে প্রকাশিত হয় তখন সে তাহার পায়ে পৃথিবী বলি দিতে পারে। অমর বুঝিল চাক তাহাকে বরাবরই ভালবাসে। তাহা অসম্ভবও নয়, কেন না মাতার নিকটে অমরের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে এইকণ্ঠই সে বরাবর শুনিয়া আসিতেছিল। অমরনাথ তাহার অস্ত্র পাত্র খুঁজিতেছে কিন্তু সে এখনো হয় ত

তাহাকেই স্বামী ভাবে। আর সে অস্তিমশয্যাশায়িনীর নিকট প্রতিজ্ঞাও অববনাথের মনে হইল।

প্রতিজ্ঞা বই কি। আপত্তি তো তাঁহার কর্ণে প্রবেশ কবে নাই। তিনি অমরেন্দ্র বিপ্লবিত ভাবকে সম্মতি বুঝিয়াই অস্তিমশয্যায় কত আবাম পাইয়া গিয়াছেন। সেই সত্য এখন অমরনাথ তাঁহার স্নেহের ধনকে কষ্ট দিয়াও ভাঙিতে চাহিতেছে? অমরনাথ নিমেষে আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। বহু বিবাহ! হিন্দুসমাজে তাহা এমনই কি দুঃখী? আধুনিক সমাজ দোষ দিতে পারে? তাহাতে অমরেন্দ্র এমন কি ক্ষতি। এক ভয় পিতা আব জী ক্ষুণ্ণ হইবেন! তবু কর্তব্যই সকলের উপবে। পিতা ও জী হয় ত ঘটনা শুনিয়া অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমাও করিতে পারেন। সে ত আর ইচ্ছা-স্বপ্নে কোন অপকর্ষ করিতেছে না। কর্তব্যের কঠিন অল্পরোধে সে ধর্ম বক্ষা কবিতোছে।—ইহার জন্য তাঁহার বাগ করিবেন কেন? যদি কবেন অমরনাথ নাচার! অমরনাথ তখন ছুই হাতে চাকব মুখ ধরিয়া তুলিয়া স্নেহগদগদকণ্ঠে ডাকিল, “চাকু।”

চাক সজল চক্ষু তাঁহার পানে চাহিল।

“চাক আমার তুমি খুব ভালবাস, না?”

চাক সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া অক্ষুণ্ণবে বলিল “হ্যাঁ।”

“আমার ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না, না?”

“হ্যাঁ।”

“তবে আমার বিয়ে করবে? তা’ হলে আর কোথাও যেতে হবে না।”

চাক নীরবে ঘাড় নাড়িল, বিবাহ করিবে। অমর গম্ভীর মুখে বলিল—“জান চাকু, আগে আর একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে—আমার জী আছে?”

“জানি। আপনি দেবেন দাদাকে বলছিলেন।”

“তবু আমার ভাল বাস? তবু বিয়ে করতে চাও?”

“আপনি যে আমার ভাল বাসেন।”

“ভাল বাসি, তবু দেখ আমি অজ্ঞের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করছি, সেখানেই তুমি বেশী সুখী হবে। আমার আগের জীব সঙ্গে তোমার যদি না বনে তা হলে যে তোমার বড় কষ্ট হবে, আমিও তাতে সুখী হব না।

তুমি একলাই যার ঘরের লক্ষী হবে তাব কাছেই তোমার যাওয়া ভালো। তাব ভালবাসা পেয়ে সহজেই আমার তুমি ভুলে যেতে পারবে।”—

চাক আবার চেয়ারের হাতাব মধ্যে মুখ লুকাইয়া অক্ষুণ্ণবে বলিল—“আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না, —তাহ’লে আমি মরে যাব।”

“বিয়ে না হ’লে কি চিরদিন একসঙ্গে থাকা যার পাগলী?”

“তবে বিয়েই হোক। মা তো আমার আপনাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন।”

“আমাব একবার বিয়ে হয়েছে, অত জী আছে, তবু আমার ভালবাসতে, বিয়ে করতে পারবে?”

চাক ঘাড় নাড়িল।

“তবে তাই হোক। চিরদিন আমার এমনি ভাল বাসবে তো চাক? সংসাবে নানা ঝগড়ার মধ্যেও আমার এমনি প্রেম মুখে সকল দুঃখ সহ কবেও ভাল বাসতে পারবে ত’ চাক?”—বলিতে বলিতে অমরনাথ ছুই হাতে তাহার পুষ্পাগম মুখখানি আর একটু তুলিয়া ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া স্থির সপ্রেম দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে জিজ্ঞাস্ত হইয়া চাহিয়া রহিল।

চাক আবার মুখ লুকাইয়া মুহূর্ত্তে বলিল “হ্যাঁ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুসজ্জিত কক্ষ উজ্জল আলোকে আলোকিত ঈষৎমুক্ত গবাক্ষপথে উজ্জানস্থ সান্দ্র সেফালীর গন্ধ মৃদু ভাবে কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। ঠাকুরবাড়ীর বোধন নবমীর সানাইয়ের মৃদু সুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বলিত একটি অপূর্ণ স্নেহের আবেশ বিতরণ কবিতোছিল। একখানা কৌচে অর্ধশায়িত ভাবে বসিয়া অমরনাথ।

অমর সেইদিন মাত্র বাটী আসিয়াছে। চাককে অনেক বুঝাইয়া কলিকাতাতেই রাখিয়া আসিয়াছে। এখন পিতা ও জীকে তাহার শপথের গুরুত্বটা বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারিলে আব কোন বাধা নাই। এ বিষয়ে জীরই অল্পমতির বেশী প্রয়োজন, তাই পিতাকে এখনো কিছু

জানায় নাই, অগ্রে জীব নিকটে কথাটা পাড়িবার জন্য অমরনাথ তাহার অপেক্ষা করিতেছে।

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, অর্দ্ধাবশুণ্ডিত একটা যুবতী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গালিচা-মোড় মেজের নিঃশব্দ পদক্ষেপে পালঙ্কের নিকট গিয়া একটু ধমকিয়া দাঁড়াইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেখানে অমরনাথ অর্দ্ধশায়িত ভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন রহিয়াছে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল; চক্ষু বুলিবামাত্র দেখিল একজন অপরিচিতা তাহার বৃহৎ কৃষ্ণতারক উজ্জ্বল চক্ষুতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। অমরনাথ হতভাবে উঠিয়া বসিল। অজ্ঞাতসারে অশ্রুট স্বরে মুখ হইতে বাহির হইল “কে?” যুবতী চক্ষুন্নত করিয়া এবং অমরনাথের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া সহসা শ্রুতিত মুখে আর একটু অবশুণ্ডন টানিয়া দ্বিধাজড়িত মুহূর্তে বলিল “আমি।” একটু থামিয়া সে আবার অমরনাথের পানে চাহিয়া তদপেক্ষা পরিষ্কার স্বরে বলিল “আমি সুরমা।”

সুরমা! সে তো তাহার জীব নাম! সেই কুলশয্যার রাত্রি দেখা সুরমা এখন এত বড় হইয়াছে। অমরনাথ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। স্বপ্নেব সঙ্গে বাস্তব ঘটনার অভ্যস্ত বৈপরীত্য দেখিয়া স্বপ্ন হইতে সত্তজাগ্রত ব্যক্তি যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে অমরনাথ তেমনি চঞ্চল হইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে তন্দ্রাচ্ছন্ন নেত্রে যেন দেখিতেছিল এই সুসজ্জিত কক্ষে, এমনি সেকাণীর গন্ধ ও সানাইয়ের মৃদু শব্দের মধ্যে একটা মুখা কিশোরী লজ্জাকালিত পদে, তাহার সুনীল চক্ষুতে তাহার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সহসা জাগিয়া দেখিল তাহা নহে, একটা সঙ্কোচহীন যুবতী তাহার অচঞ্চল অসহনীয় জ্যোতিপূর্ণ কৃষ্ণতার চক্ষুতে স্থির ভাবে তাহার পানে চাহিয়া আছে এবং এখানে তাহারই স্থির অধিবার, আর সেই লজ্জানম্রা বালিকা এখানে অপরাহীনী অভিসারিকা যাত্র।

অমরনাথ গভীর মুখে স্থির ভাবে বসিয়া রহিল।

সুরমা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যেন কার্য ন্যাপদেশে সজ্জিত টেবিলের নিকটে সরিয়া গেল। সেখানে এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া যেন সে কি করিবে তাহা স্থির করিয়া

লইতে লাগিল। তাহার পরে তাহাকে দ্বারাভিমুখে যাইতে দেখিয়া অমরনাথ বলিল—“শোন।”

সুরমা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

“বোস।”

এমিক ওদিক চাহিয়া শেষে সুরমা অমরনাথের অধিকৃত কোচেরই এক পার্শ্বে সসঙ্কোচে বসিল। বহুকণ স্বামীকে নীরব দেখিয়া তাহার সেই অচঞ্চল চক্ষে আবার অমরের পানে চাহিয়া বলিল—“আমাকে তুমি ডেকেছিলে?”

অমরনাথ তথাপি নীরব।--

কিছুক্ষণ পরে সুরমা বলিল—“আমাকে তোমার কি কোন কথা বলবার আছে?”

“হ্যাঁ।”

“কি?”

অমরনাথ তথাপি নীরব।

আবার সুরমা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল—“কোন সঙ্কোচেব কথা কি?”

এবার অমরনাথের কথা ফুটিল। “আমি ত তেমন কিছু সঙ্কোচ বোধ করিনি।”

“তবে আমারই সঙ্কোচজনক কোন কথা কি?”

“না। তোমার নয়। আমারি কথা বটে, তবে সঙ্কোচের নয়—কর্তব্যের। তোমার বেশ মন দিয়ে শোনার দরকার। ঠিক ভাবে বোঝার দরকার।”

“বল।”

তখন অমরনাথ ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য যতটা বলা যাইতে পারে। প্রথমবার গ্রামে গিয়া চাকর ব্যারাম আরোগ্য করা; আবার দেবেনের অনুরোধে একবার পূজার সময় যাওয়া; তখনকার কথাবার্তা; পরে বাটী আসিয়া সুরমার সহিত বিবাহ; ওদিকে তাহাদের প্রাপ্ত আশা পোষণ এবং শেষে চাকর মাতার মৃত্যুশয্যায় প্রকারান্তরে তাহাকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করান; এই সমস্ত ঘটনা অমরনাথ একে একে জীব নিকটে বলিয়া গেল।

সুরমা নীরবে শুনিল। “অমরনাথ নীরব হইলে ক্ষণেক পরে সুরমা বলিল—“সে মেয়েটা এখন কোথায়?”

“মেয়েটা? চাকর। সে আমার কলকাতাবাসী।”

“কলকাতার বাসায় ? তা হলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস থেকেই সে সেখানে আছে ! কই এতদিন তো আমরা এর কিছুই জানি না ?”

অমরনাথ এবটু গরম হইয়া উঠিল। সুরমার কথাটারে বেন একটু কেমন কর্তৃত্ব ও তিরস্কারের ভাব মিশানো বলিয়া অমরনাথের মনে হইল।

“তা না জানামতে বেশী অন্তায়ের বিষয় কিছুই হয়নি। তখনো জানানো য় এখনো তাই।”

“ঠিক তা নয়। চাক-সারু বুঝি সেই মেয়েটাব নাম ? —তাকে এখানে এনে রাখলেও ত-পারতে।”

অমরনাথ আরও একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল —“সেখানে রাখলেও যা, এখানে রাখাও তাই। একই কথা নয় কি ?”

“এক কথা নয়। এখানে তোমার বাপ আছেন, জী আছে।”

“যাকে আমি বিয়ে করতে পারি তাকে আগে থেকে কাছে রাখলেও কোন দোষ হয় না।”

“দোষ হয় বইকি একটু। যাক্ সে কথা। এখন, তুমি তাকে বিয়ে করবে স্থির ?”

“এখন স্থির হ'ব না নয় তখনি এটা স্থির ছিল। এস্থলে বিয়ে করা ভিন্ন কি কর্তব্য হতে পারে ?”

“এখন হয়ত বিয়ে করাই কর্তব্য ! কিন্তু তখন অল্প কোনো সুপাত্রের বিয়ে দিতে পারতে।”

“তখন আর এখনে কি প্রভেদ ?”

সুবতী দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—
“এখন তুমি তাকে ভাল বাস।”

অমরনাথ সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল,—
“নিতান্ত স্বার্থপরের মত কথা। আমি, আমি না হয় তাকে ভাল বাসি, কিন্তু তাকে বিবাহ করা আমার তখনো কর্তব্য ছিল এবং এখনে কর্তব্য।”

“বেশ। তবে তুমি কি আমার সম্মতি চাইতে এসেছ ? এটাও কি তোমার কর্তব্যের অঙ্গ ?”

“আমি এত নির্বোধ নই। তবে তোমার জানান আমার কর্তব্য।”

“ভাল। বাবাকে বোধ হয় এখনো জানাওনি। সেটাও একটা কর্তব্য।”

“সে তোমার স্মরণ কবিয়ে দেবার অপেক্ষা করছে না।”

“তুমি কি আশা কর তিনি সম্মত হবেন ?”

“না হোন, তবু আমার কর্তব্য আমি করব।”

“তিনি সম্মতি না দিলেও তোমার মূল কর্তব্য তা হলে স্থির ?

“নিশ্চয়ই।”

“বেশ। তবে এখন আমি যেতে পারি ?”

“তোমার খুসী” বলিয়া অমরনাথ পরিত্যক্ত কোচে শুইয়া পড়িল। সুরমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তারপরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর। কর্তা হরনাথবাবু ভোজনে বসিয়াছেন, পার্শ্বে অর্দ্ধাবশুষ্ঠনবতী পুত্রবধূ সুরমা তালবৃন্ত হস্তে বজ্রন করিতেছে। হরনাথ বাবু অতিশয় উন্নয়ন ভাবে আশ্রয় করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা বধূর পানে চাহিয়া ডাকিলেন “মা !”

বধূ মুখ তুলিয়া স্বস্তরের দিকে চাহিল।

হরনাথ বাবু একটু থামিয়া বলিলেন “অমর বাড়ী এসেছে জান ত মা ?”

বধূ মুখ নত করিল দেখিয়া স্বস্তর বুঝিলেন বধূ সে সংবাদ জানে।

“কাল তোমার সঙ্গে সে দেখা করেছিল কি ?”

সুরমা নতমুখে নীরবে রহিল।

হরনাথ বাবু পুনর্বার প্রশ্ন করার অগত্যা বলিল “হঁ।”

“কিছু বলেছে ?”

বধূ নীরবে শুধু মাথা নাড়িল।

হরনাথ বাবু আবার কিয়ৎক্ষণ থামিয়া মুহূর্তে বলিলেন—
“তুমি তাহ'লে সব শুনেছ ?”

সুরমা মুহূর্তের নতমুখে বলিল—“শুনেছি।”

সহসা পক্ষ কণ্ঠে হরনাথ বাবু বলিয়া উঠিলেন—
“হতভাগাটার লজ্জাও কি করেনি ! বুদ্ধিগুদ্ধির মাথা একেবারে খেয়ে ফেলেছে। নিজের মাথা খেয়ে বুঝি এমনি ক'রে প্রীতিজ্ঞা রাখে ? ব্যাটা একেবারে ভীষ্মদেব হ'লে উঠেছেন। ওসব কলকাতার দোষ। ওকে একা পড়তে

দেওয়াটাই আমার অন্তার হয়েছিল। যাক্। আমি বেশ করে' বুঝিয়ে দিয়েছি যদি সে সে কাজ করে তো তাকে নিঃসন্দেহ ত্যাগাপূত্র কব্ব। তাব মুখও কখনো দেখব না। আর যদি সে এক মুহূর্তের জন্তও সে চিন্তা মনে বাথে তো যেন এখনি আমার বাড়ী থেকে চলে যায়, আর জানে যেন যে সেই সঙ্গে আমার সঙ্গেও জন্মের মত সম্বন্ধচ্ছেদ হবে।”

বধু নীববে ব্যগ্রন কবিত্তে লাগিল। আবার হবনাথ বাবু ঈষৎ মুহূর্তে বধুকে যেন সাস্থনা দিবার জন্তই বলিতে লাগিলেন,—“এত সাহস সে করবে না বোধ হয়। আমি তাকে আজই কলকাতা গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছি। একটা পাত্র দেখে মেয়েটার বিয়ে দিলেই সব আপদ চুকে যাবে।”

স্বরমা কিছুক্ষণ চুপ কবিত্তা রহিল, তারপরে মুহূর্তে বলিল—“তা আর হবার জো নেই বাবা!—আপনি তাঁকে ত্যাগাপূত্র করা কি বিষয় থেকে বঞ্চিত কবার ভর না দেখালেই ভালো হত।”

“সেকি? বল কি মা?”

“আপনার নিষেধের চেয়ে কি বিষয়ের দাম বড়! ও ভয়টা না দেখালেই ভাল হ'ত বাবা।”

কর্তা কিয়ৎক্ষণ নীবব থাকিয়া শেষে বলিলেন—“যে সে ম'শান রাখে তার পক্ষেই ওটা খাটে মা।”

“সে সম্মান যে না রাখে সে যা ইচ্ছা তাই করুক না কেন বাবা।”

“না মা। একথা তুমি এখন বলতে পার বটে কিন্তু যখন আমার মত হ'বে তখন বুঝবে আজন্মের স্নেহের ধনকে কি তুচ্ছ মান অপমান নিয়ে এত বড় একটা ভুল করতে দিতে পারা যায় না? সে যদি সমুদ্র দেখে শিশু মত লাফিয়ে তাতে ঝাপ দিতে যায়, আমি কি তাকে প্রাণপণ বলে বুকে চেপে ধরে নিবারণ না ক'রে থাকতে পারি? হয় ত সে সে বেষ্টনে পীড়িত হচ্ছে, বেদনা পাচ্ছে, তবু আমি তাকে ছেড়ে দোব' না। আদর ক'রে না পারি, কান্দিয়ে, ভয় দেখিয়ে তাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করব।”

স্বরমা রুদ্ধস্ববে বলিল—“বাবা, আমারও আপনি স্নেহ কর্তেন—”

“করতেন কি মা—এখনো কি করি না? তুমি যে এখন আমার তাব চেয়েও বড়, তুমি অসুখী হবে বলেই তো আরও”—

• “আমিও সেই জন্তেই বলছি বাবা,— মা নেই তাই এসব কথা আপনাকেই বলতে হচ্ছে।—আপনার কথায় স্পষ্ট বোঝাচ্ছে যেন আমিই প্রধান বাধা। আমি কি সত্যি এতই স্বার্থপর?”

“তোমার যদি কেউ তা ভাবে বা বলে তো সেই জনতে সর্বাপেক্ষা স্বার্থপর। বড় দুঃখ হচ্ছে মা আমি হয়ত তোকে এনে সুখী কবতে পাবলাম না। তা যদি হয়—”

“কই আপনি কিছুই খেলেন না যে? মাছটা কি ভাল হয়নি! বাবা ওটা আমি নিজে রোধেছি। একটুও খাননি—ডালনাটাও ভাল লাগল না?”

“এই যে খাচ্ছি মা। না, বেশ হয়েছে, কিন্তু শোন মা—”

“দুখটা নিয়ে আসিনি এখনো। হয়ত বেশী গরম হয়ে গেল।” স্বরমা উত্তিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে দুই লইয়া কবিত্তা আসিয়া হাত্মমুখে বলিল “না, ঠিক আছে। বাবা আপনাকে আজ দুখ খেয়ে বলতে হবে মিটি দিয়েছি কি না।”

বধুর হস্তোৎকল্ল মুখ পুনঃ পুনঃ মলিন কবিত্তে হয়নাথ বাবু অব ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি বুঝিলেন স্বরমা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাহিতেছে। তিনিও কথটা চাপা দিয়া দুইয়ের বাটিতে চুমুক দিয়া বলিলেন—“নিশ্চয় আজ বেশী মিটি দিয়েছিস বেটা। জালও বেশী দিয়ে ফেলেছিস নিশ্চয়।”

“না বাবা মোটে না, জালও বেশী দিইনি।”

“তবে এত মিটি আর ঘন হ'ল কি ক'রে?”

“ঐ নতুন কেনা গাইটার দুখ আপনার জন্তে জাল দিতে নিয়েছিলাম।”

সহসা হয়নাথ বাবু বলিলেন—“সে—সে বুঝি না খেয়েই কলকাতা চলে গ্যাছে?”

বধু নীরবে রহিল। কর্তা বাহ্যিক কোপভাব প্রকাশ কবিত্তা বলিলেন—“গ্রহ আর কি।”

কর্তা আহাবাস্তে বহির্কীর্ষাটে চলিয়া গেলেন। স্বরমা

ধীরে ধীরে যথাকর্তব্য সম্পাদন করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। হয়ত সে স্থান ভাল লাগিল না, অশ্রু একটা কক্ষে গিয়া রেশম সূচ মঞ্চল প্রভৃতি লইয়া গবাক্ষের নিকটে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সেলাই করিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে সেদিন পূজার যষ্ঠী তিথি। সুরমা ঠাকুরবাড়ীর একটা কক্ষে বসিয়া নিপুণ ভাবে বরণের ডালা সাজাইতেছিল চাষিধারে নানা আত্মীয় কুটুম্বিনীগণ, নানা কার্যে ব্যস্ত। সকলেই সুবমাব আত্মাক্রমে ফিরিতেছে ঘুরিতেছে। মুক্ত বাতাসের সন্মুখপথে অদূরস্থিত পল্লবপতাকাময় তোবণে মধুর শব্দে নহবতে আগমনী বাজিতেছিল। প্রান্তরে মিষ্টান্নলোভী বালকবালিকাব হস্ত চীৎকার উঠিতেছিল। ঠাকুরদালানে মালাকরে ও কুমারে ঘোর বিবাদ বাধিয়াছে। কুমারবনন্দন সাদৃশ্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, মালাকরের রাংতার আঁচলা ও গহনার শ্রীহীনতার জন্তই তাহাব প্রতিমার তেমন ‘খোলতাই’ হইতেছে না। কুমারের এই মতে বাধা দিয়া মালাকর বলিতেছে, “আরে তুমি কেহে বাপু! তোমার বাপ আমার চিন্ত। আমার ‘ডাকের’ গহনা এ পৃথিবীতে না জানে কে? চন্দ্রমালীর নাম এ সাতখানা গায়ের মধ্যে কে না জানে। আব এই জমীদারবাড়ীর ঠাকুরপু সাজিয়ে আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, তুমি কিনা এসেছ আজ দোষ ধরতে।” মাতব্বর মুকব্বারা মধ্যে পড়িয়া উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেছেন। পরিচারকেরা সামিয়ানার তলে ঝাড় লঠন লইয়া ব্যস্ত। কেহ টাঙাইতেছে, কেহ তেল ভরিতেছে, কেহ সাফ করিতেছে, ঝাড়ের কাচময় ফলকের আন্দোলনে বেশ শ্রুতিমধুর টুং টাং শব্দের মধ্যে কোন সর্দার খানসামাব হস্ত হইতে কোন ছবি বা দেয়ালগির পড়িয়া গিয়া বন্ বনাং শব্দটি কোমল স্বরে কড়িমধ্যমেব মত মিশাইতেছে। কয়েক জন শুভ্রউপবীতধারী ভট্টাচার্য্য বৃহৎ বৃহৎ টিকী নাড়িয়া ‘বার বেলা’ লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিয়াছেন। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা কেহ বা বহুগোষ্ঠীর বাড়ীর যাত্রাব আরোজনের সালঙ্কার বর্ণনা করিতেছেন, কেহ বা অশ্রুকে বলিতেছেন “হাঁ হে বলতে পার এবার

যাত্রা কেন আনা হ’লনা?” প্ৰবোহিত রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আরে ওসব তো তামসিক ব্যাপাব। উত্তমরূপে মহামায়ার ভোগ পূজাদি ও বলিদানাদি দেওয়া এই হচ্চে • সাম্বিক পূজা। নাচ গান ওসব তামসিক তামসিক” “আরে বলেন কি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, একি একটা কসা হ’ল? দেবী পুরাণেই তো লিখেছে ‘বাস্ততাও নৃত্য গীত’—‘আবে রাথ রাথ বাপু! যা বোরনা তাত্তে বাক্যব্যয় করতে যাও কেন?” একটা ধুষ্ট যুবক বলিয়া ফেলিল “ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাংসাহার করেন না কি? সেটা খুব সাম্বিক, না?” তৎক্ষণাৎ তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী আসিয়া তখন তাঁহাদের বিবদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। একজন বলিলেন “হ্যাঁহে, অম্বক দেংছিনা যে? সেকি আসেনি?” দেওয়ানজী জড়িত স্বরে বলিলেন “পড়ার ক্ষতি হবে বোধ হয়। কর্তাকে পত্র দিরেছেন।”

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সুবমাকে বলিল “মা, কর্তাবাবু ডাকছেন আপনাকে।”

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাসীকে বলিল,—“বেন বলতে পারিস?”

“না।”

সুরমা ধীরে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বাবান্না ছাড়াইয়া সিঁড়ীর নিকটে আসিতেই দেখিল সম্মুখে স্বস্তব। তাঁহার মুখ বনান্ধকারময়, হস্তে একখানি পত্র। সুরমা চকিত ভাবে বলিল “বাবা?”

“এই পত্র পড়ে দেখ, বুঝতে পারবে।”

“পত্র আর কি পড়ব। আপনি বলুন।”

“না, না, পড়ে জাখ সে কুলাজাব কি লিখেছে।”

স্বস্তরের ক্রোধ কম্পিত হস্ত হইতে পত্র লইয়া সুরমা পাঠ করিল—

“শ্রীচরণেযু বিবাহ করা শিন্ন আমি আর উপায়ান্তর দেখি না। আপনার আদেশ রাখিতে পারিলাম না আমি এমনি অধম। ইতি।—হতভাগ্য অমর।”

পত্রপাঠ শেষ করিয়া সুবমা স্বস্তরকে পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া মাথা নুত করিয়া দাঁড়াইল।

“কিন্তু সে হতভাগা মনে করেনা যেন যে আমি তাকে

কমা কব্ব। এই আগমনীতে আমার এই বিসর্জন।”
পত্রখানা শতছিন্ন কবিতা ফেলিয়া দিয়া হবনাথ বাবু
সবেগে চলিয়া গেলেন।

সুখমা ধীর পদে ফিরিয়া গিয়া আপনার আরক্কে কর্ণে
নিবুস্ত হইল।

শ্রীনিবাস দেবী।

যাত্রাগান

প্রায় ৩০ বৎসব পূর্বে ৮সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
তাঁহার “বঙ্গদর্শনে” যাত্রাগানের সমালোচনা কবিতাছিলেন।
এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যাত্রাগানের কিরূপ উন্নতি বা
অবনতি হইয়াছে তাহার খতিয়ান কবিতা দেখিলে মন্দ
হয় না।

আমি যাত্রাগানের একজন ভক্ত। আমার মতে
যাত্রাগানে ঞ্জায় সর্বজনপ্রিয় আমোদ আব নাই। কথ-
কতার ঞ্জায় যাত্রাগান লোকশিক্ষার এক প্রধান উপায়।
যাত্রাগানে একসঙ্গে চিত্রবর্ণনী বৃত্তির অল্পশীলন এবং
ধর্ম ও নীতিশিক্ষা হয়। একাধারে কাব্য ও সঙ্গীতকলার
চর্চার সহিত জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় যাত্রা-
গানের এখন আব সে দিন নাই। সঞ্জীব বাবুর সমা-
লোচনা পাঠে জানা যায়, তাঁহার সময়ে যাত্রা বলিতেই
সাধারণতঃ বিভাশূন্যের পালা বুঝাইত, নচেৎ কালীয়-দমন
কিবা রাম-বনবাস। তখন যাত্রাগান নিতান্ত crude
(অপরিণত) অবস্থায় ছিল। সেই অতীতের সহিত
তুলনায় এখন যাত্রাগানের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।
সঞ্জীব বাবুর সমালোচনার পর যাত্রাগানের দুইটি যুগ
অতীত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী যুগকে পৌৰাণিক
যুগ বলা যায়। এই পৌৰাণিক যুগেই যাত্রাগানের প্রকৃত
উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মতি রায়, ব্রজ রায়,
নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যাত্রার অধিকারিগণ সর্বপ্রকার ধর্ম ও
নীতিশিক্ষার অক্ষয়ভাণ্ডার রামায়ণ ও মহাভারত হইতে
বাছিয়া বাছিয়া পালায়না করিতেন। তাঁহাদের রচিত
“ভীষ্মের শরণশা,” “দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,” “অভিমত্যাধ,”

“দক্ষযজ্ঞ,” “সাগিজী সত্যবান,” “লক্ষ্মণের শক্তিশেল,”
“সীতার বনবাস,” প্রভৃতি পালা একসময়ে বান্দালীর চিত্ত
মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের সময়েই যাত্রাগানের
চরম উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হুঃখের
বিষয়, সেইসকল গুণবান ও রসজ্ঞ অধিকারিগণের তিরো-
ধানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার ক্রমেই অবনতি হইতেছে। যাত্রা-
গানের বর্তমান যে যুগ চলিতেছে, তাহাকে “নাটকীয়
যুগ” বলা যাইতে পারে। এযুগে যাত্রা হইতেছে নাটকের
ব্যর্থ অনুকরণ। এখন যাত্রা আব “গান” নাই, এখন
যাত্রা হইতেছে “অভিনয়” বা “অপেরা,” অথবা ষ্টেজ-
বিহীন থিয়েটার। যেমন যাত্রা থিয়েটারে পরিণত হই-
তেছে, সেইরূপ থিয়েটার আবার সার্কাসে পরিণত হই-
তেছে। কালে সার্কাসই সকলের আরাধ্য দেবতা হইবে,
এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

কিছুকাল পূর্বে আমি কলিকাতার থিয়েটার দেখিতে
গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম হাতীর নাচ। তখন
মনে হইল, থিয়েটার দেখিতেছি না সার্কাস দেখিতেছি।
অবশ্য আমি যাহাকে হাতীর নাচ বলিতেছি, অনেক
দর্শক তাহাকে শৈবলিনীর প্রতাপের সহিত গজা গর্ভে
সম্ভরণ অথবা চৈতন্যলীলার নিত্যানন্দের হরিপ্রেরে
নৃত্য মনে করিয়া করতালি দ্বারা রঙ্গভূমি মুখরিত করিয়া-
ছিলেন। আমার কিন্তু সেই সম্ভরণ ও নৃত্য দেখিয়া
সার্কাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু অধু এ কারণে
নহে, আধুনিক থিয়েটারকে আমি অল্প কারণে সার্কাস
বলিতেছি। আধুনিক থিয়েটার ও যাত্রায় যে নাচ ঢুকি-
য়াছে, তাহাকে সার্কাসের জিমন্যাস্টিক (Gymnastic)
ভিন্ন আর কি বলিব? আর থিয়েটারে আজকাল নাচেরই
প্রাধান্য দেখা যায়, সুতরাং থিয়েটার সার্কাসে পরিণত
হওয়ার বাকী কি?

সঞ্জীব বাবু পুরাতন যাত্রার নৃত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

“যে কোন সমাজেই হউক, নৃত্য বলিলে পদযন্ত্রের সঞ্চালনজনিত
দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়, কিন্তু বঙ্গসমাজে কেবল দেহের
* * * * * যে যুগিত আন্দোলন, তাহাকেই
নৃত্য বলে।”

কিন্তু এখন আর সে হুঃখ নাই! এখনকার নৃত্য দেহের
অঙ্গবিশেষের সঞ্চালন নহে, এখনকার নৃত্য কোন অঙ্গের

সঞ্চালন না হইয়াও সাধিত হইতে পারে। এখনকার নৃত্য শুইয়া হয়, বসিয়া হয়, অর্দ্ধেক শুইয়া, অর্দ্ধেক বসিয়া হয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হয়, হেলিয়া দাঁড়াইয়া হয়, আবার একজনের ঘাড়ের উপর আর একজন চড়িয়া হয়— ঠিক যেন মহিষদক্ষিনী, সিংহ ও অশ্বরের উপর দণ্ডায়মান। এখনকার নৃত্যে সিস দেওয়া, বাঁশি বাঁজান, পাখীর ডাক ও আরও কত কিছু অশ্রুত-ধ্বনি শুনা যায়। সে কালের নৃত্য কেবল দেহের অভ্যন্তরীণের স্থগিত আন্দোলন ছিল, এখনকার নৃত্য বহুবিধ হাবভাব সহকারে যুগল মিলন। ইহাই নাকি সভ্যসমাজের স্তরচিহ্নিত প্রকৃষ্ট রীতি। স্তরায় এ সম্বন্ধে কাহারও কথা কহিবার অবসর নাই। সেই নৃত্যের যে তাল, তাহা আবার গাছ হইতে পাকাতাল পড়ার শব্দকে শ্রবণ করাইয়া দেয়। অর্থাৎ কথা নাই বাক্য নাই, একটা স্তর হঠাৎ “ধপ্” করিয়া থামিয়া পড়িল। বাহাদের কান স্তরপ্রায়ের ক্রমিক আরোহ ও বিলম্ব শুনিতে অভ্যস্ত তাহাদের কাছে হঠাৎ এই ধপ্ করিয়া থামিয়া বাঁওয়াটা যেন কেমন বর্ধরতা মনে হয়। কে যেন হঠাৎ একটি কলনাদী কোকিলকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল, তাহার অকোচ্চারিত কলকুজন আকাশের মধ্যপথে থামিয়া গেল।

এই বিলম্বী নাচের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, আমি সেই পূর্বতন খেমটা নাচকে আবার আসরে আনিতে বলিতেছি। খেমটা নাচ খাঁটি স্বদেশী জিনিষ নহে। সঞ্জীব বাবু বলেন উহা আধুনিক আমদানী জিনিষ। তিনি যে পৌরাণিক মহারাজীয় নৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, আমি উড়িষ্যাদেশে তাহা এখনও প্রচলিত দেখিয়াছি। আমার উড়িষ্যার চিত্র গ্রন্থে তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। সে নৃত্যে কিছুনাচ স্তরচিহ্নিত হাবভাব নাই, তাহা যেমন স্তম্ভর তেমন গভীর। আমাদের যাত্রার সেই নৃত্য প্রচলিত করিলে ভাল হয়।

সঞ্জীব বাবুর সময়ে যাত্রায় নৃত্যই প্রবল ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

“এখনকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি যেহেতু কি ভিত্তি, কি নাগিনী কি বিভা, সকলেই নৃত্য করে। কুক নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য

করেন,—বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন কিন্তু তিনি আর সকল যাত্রার দলে “বেহালাগুয়াল”। নৃত্য করিতে গেলে বেহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ক্রটি ঘটিত না।”

এখনকার যাত্রা এবিষয়ে অনেক সভ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই, এখন এই নৃত্যরোগের তেমন বাড়াবাড়ি নাই। তবে এতাব যে বেশী দিন থাকিবে তাহারই বা ভরসা কি? যাত্রার খোদ গুণ্ডাম যে থিয়েটার তাহার মধ্যেও যখন সময় অসময়ে নৃত্যের বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তখন যাত্রাও তাহার অলঙ্করণ না করিয়া ছাড়িবে কি? সঞ্জীব বাবু বৃদ্ধ রাজা দশরথকে নৃত্য করিতে দেখেন নাই কিন্তু আধুনিক থিয়েটারে এক বৃদ্ধকে তাহার পুত্রের সহিত একত্র নাচিতে দেখিয়াছি। আরুহোসেনের বৃদ্ধা জননীর সহিত তাহার নৃত্য ও গানের সুরে কথোপকথন সেই প্রাচীন যাত্রাকেও হার মানায়। অথচ সেই আবু হোসেনের এখনকার শিক্ষিত সমাজে কত আদর! লাট বেলাটের অভ্যর্থনার তাহার অভিনয় হইতেছে। আত্মকাল অনেক শ্রোতা মত এই—যদি নাচগান না শুনিলাম তবে থিয়েটারে গিয়া কল কি? সেইসকল শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতে গিয়া থিয়েটারের পালা লেখকগণও অল্পকাল নৃত্যের বাড়াবাড়ি করিতেছেন। এই শ্রেণীর নাটকবার সাবিত্রী নাটকের মধ্যেও নাচ না চুকাইয়া পারেন নাই। সাবিত্রী নাটকেও ধাঁহার নাচ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সে নাটক না দেখাই ভাল।

নাচের সঙ্গে গানের কথাও আলোচ্য। কিন্তু নাচই বলুন আর গানই বলুন আমি এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ত। আমার এসম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনর্থক চর্চা। তবে আমি বাহা বলিতেছি তাহা কেবল ফর্ক বা শ্রোতার ভাবে বলিতেছি, সমজ্ঞানের ভাবে নহে। পূর্বকালে যাত্রার গানের বড় দৌরাত্ম্য ছিল। কথার কথার গান, সময়ে অসময়ে গান, অভিনেতার গান, হোকবার গান, জুড়ীর গান। ইহাতে অভিনেতব্য বিষয়ের রসভঙ্গ হইত। শ্রোতাদিগের কান ঝালাপালা হইত। যাত্রার শেষ পর্যন্ত দেখা বা শুনা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই গান সম্বন্ধে সঞ্জীব বাবু একটি স্তম্ভর উদাহরণ দিয়াছেন,—

“শ্রীমদ্ভাগবত লক্ষণ সমভিযাহারে জানকীকে বনে পঠাইলেন। জানকী পূর্ণগর্তী, পদব্রজে কতদূর গমন করিয়া বড় ব্রাহ্ম হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—লক্ষণ, আর যে আমি চলিতে পারি না।

লক্ষণ। কি বলিলেন, যা জানকী, আর আপনি চলিতে পারেন না ? জানকী। না লক্ষণ, আর আমি চলিতে পারি না। আমার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে।

লক্ষণ। সে কিরূপ ? প্রকাশ করিয়া বলুন।

সে কিরূপ, তাহা ত জানকী প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আবার কি অধিক প্রকাশ করিয়া বলিবেন ?

প্রকাশ করিয়া বলার অর্থ গীত গাইয়া বলুন। অমনি গীত আরম্ভ হইল—“গর্ভবতী নারী, চলিতে না পারি, হইয়াছে অঙ্গ অবশ।” ইত্যাদি।

এখন নাটকের অম্লকরণে যাত্রা হওয়াতে এই গীতের উৎপাত অনেক কমিয়াছে। এখন আর কথায় কথায় জুড়ী নামধারী চোগা-চাপকান-পরা পিরালী-পাগড়ী-মাথার “মোক্তার লোক” (এক দলে দেখিয়াছি হাতকাটা গাউন-পরা ভাকীল লোক) উঠিয়া দাঁড়ান না, এবং একজনের পর আর একজন ক্রমাগত রাগিণী ধরিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান না। ছোকরার দলও এখন ঘন ঘন উঠিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কান কালাপালা করে না। কোন কোন দলে এমন সুন্দর নিয়ম দেখিয়াছি, একটি গায়ক একলা দাঁড়াইয়া আগে গানটি গাইয়া যায়, পরে ছোকরার দল কি জুড়ীর দল উঠিয়া সেই গানটি গায়। ইহাতে গানটি কি তাহা বেশ বুঝা যায়। আব অধিকাংশ ভাল গানই এখন থিয়েটারের স্ত্রায় অভিনেতা নিজে গাইয়া থাকে।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? এখনকার গানের সুর তেমন মর্ম্মস্পর্শী হয় না। যাত্রার পৌরাণিক যুগে এত একটি ভাল গান শুনিয়া শ্রোতাগণের অজস্র অশ্রুপাত হইত, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই গান বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রতিধ্বনিত হইত, ও ক্রমে তাহা সাহিত্যের স্থায়ী-সম্পদে (classics) পরিণত হইত। এখনকার গানে না আছে ভাব, না আছে মর্ম্মস্পর্শী সুর। অনেক গানের সুরই থিয়েটারের অম্লকরণে মিশ্রিত রাগিণীতে (জঙ্গলা) বাধা। বিস্তৃত তৈরবী, পুরবী, খাম্বাজ, বেহাগ, বিভাস প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সুর এখন যাত্রার আসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। যে সুর গান্ধীর্থে অস্তোধিনির্ঘোষ, মাধুর্থে পিককুজন, উচ্চতার পাণীয়ার ধরলহরী, কোমলতার চাতকের ফটিকজল, শালিত্যে সলিলের কুলু কুলু ধ্বনি এখনকার যাত্রাগানে তাহা আর শুনা যায় না। যে সুর শ্রোতার

হৃদয়েব অন্ততলে প্রবেশ করিয়া জন্মজন্মান্তরের সুখঃখের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, বাহা মর্মে মর্মে জড়িত হইয়া ভাবী সুরের সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখে, এখনকার যাত্রায় সে সুর নাই। তাই এখনকার যাত্রার আসরে শ্রোতাগণকে আর বড় কাদিতে দেখি না। সম্ভাব বাবুও এ বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

“বাঙ্গালার আর বড় শোকের সুর নাই। হুচিহু। শোকে সম্বরণতা জন্মে। ঐক্য হয়। আন্তরিক শোক সকলের অন্তরে ঘটে না; শোক পবিত্র; শোক স্বর্গীয়; শোক আবশ্যক।”

এখন অধিকাংশ সুরেই গান্ধীর্ষ্য নাই, প্রায় সুরই হালকা। যেমন দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে আমরা গান্ধীর্ষ্য হারাই-তেছি, সম্মুখেও তাই। জীবন আমাদের কেবল “কুর্জিতে” ভরা, তরল উল্লাসে মাতোয়ারা, আমাদের আমোদ প্রমোদও সেইরূপ। কেহ হয় ত বলিবে,—আমোদ করিতে গিয়া কাদিব কেন ? কিন্তু বাহার কাদিবার উপযুক্ত হৃদয় আছে, তিনি হাসিতে হাসিতে কাদেন আবাব কাদিতে কাদিতে হাসেন। নিরবচ্ছিন্ন হাসি ও নিঃবচ্ছিন্ন কান্না কোথায় আছে ?

নাচ ও গানের পর অভিনয়। বলা বাহুল্য অভিনয়ই আধুনিক যাত্রার প্রাণ। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, যাত্রা এখন “গান” নহে, অভিনয় অর্থাৎ নাটকের অম্লকরণ। উৎকৃষ্ট যাত্রার দলে এখন অনেক ভাল অভিনেতা দেখা যায়। এ বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর অভিনেতাগণের পোষাক পরিচ্ছদের পূর্বাপেক্ষা বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। সম্ভাব বাবুর সময়ে পরিচ্ছদের বড় দৈন্ত ছিল। তিনি বলেন,—

“যাত্রার রাণী পরিচ্ছদে মেতরাণী।”.....“রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকার; ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান, আব তৈলাক্ত জরির টুপি। যে পরিচ্ছদে নকিব বা জমাদার সাজিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন।”

এখনকার যাত্রায় রাজার পোষাকের পারিপাট্য অনেক খেতাবী মহারাজাকেও হারি মানায়। রাণী কিম্বা রাজ-কস্তার অঙ্গে বেনারসী সাড়ী শোভা পায়। এখনকার “নৃসিং দেব” কি “হনুমান” আর চাপকান পরেন না। তবে তাঁহার গেলি না পরিয়া পারেন না। আবাব পাড়া-কৌদলী বালবিধবা “বিধি” নাপতিনীও এই গেঞ্জির মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এখন জুড়ীদিগের অঙ্গে

“ভাকীলেব” গাউন উঠিয়াছে। এখন বাকী কেবল জজের “কলাব”। তবে সেই গাউনপরা হাত বখন কল্কী খবরা টান দেয় তখন শ্রীমাতিকাব তামাক খাওয়ার মতনই বীভৎস দেখাব। হাল ফেসনের রাধিকাব কিন্তু সে বালাই নাই। কারণ সিগারেট এখন খুব সস্তা এবং সর্বত্রই পাওয়া যায়।

অভিনয়েব প্রধান অঙ্গ হইতেছে কথাবার্তা। কিন্তু সেই কথাবার্তার জন্য অভিনেতার দোষ দেওয়া যায় না, যত দোষ পালাপ্রণেতা করিব। এইসকল কবিপুঞ্জবের বিকল্পে আমাব অনেক অভিযোগ আছে, ক্রমে তাহা বলিতেছি।

আমাব মতে এইসকল পালা-লেখকই যাত্রা-গানের পবন শব্দ। সম্প্রতি আমাব কলিকাতার দুইটি প্রধান দলের গান শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু হুঃখের বিষয় একটি দলের একটি পালাও তেমন জমিল না। সেসকল দলে ভাল অভিনেতার অভাব ছিল না, ভাল গায়কও যথেষ্ট ছিল, আবার উৎকৃষ্ট পোষাক পবিচ্ছন্ন আসবাবও বিস্তার ছিল। গান জমিল না কেবল পালা রচনাব দোষে। এইসকল দলের সঙ্গীতকারিগণ আমার মতে বুধা অর্থব্যয় ও শক্তিৰ অপচয় করিতেছেন। আর যাহারা এইসকল দল বায়না করেন তাহাদেরও দুর্ভাগ্য; সাত আট শত বা হাজার টাকা দিয়া এইরূপ যাত্রা গান না দিয়া সেই অর্থে অনেক সংকাজ হইতে পারে। যাত্রাগানের প্রধান উদ্দেশ্য যে লোকশিক্ষা (mass education) তাহা আর এখনকার যাত্রাগান দ্বারা সাধিত হয় না। বরং উল্টা উৎপত্তি হয়। এইসকল যাত্রা দ্বারা পল্লীর সর্বসাধারণের রুচি দূষিত হয়। সহরবাসীদিগের রুচি ত ধিরেটোবের সম্পর্শে অনেক কালই দূষিত হইয়াছে। এইসকল যাত্রাগান দিয়া পল্লীর পবিত্রতা আর কলুষিত করা কেন?

মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যে লিখিয়াছেন—

“কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূট ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে, (তোর হৃৎখে হৃৎখী)
পাবকশিখারপিঙ্গী জ্বলকীরে আমি
আনিব এ হৈম গেহে ?”

আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি—

“কি কুক্ষণে, মাইকেল, বচেছিলে তুমি
মেঘনাদবধ কাব্যে, অমিত অক্ষবে ;
কি কুক্ষণে, তোমা অমুকরি,
বরিল গিরিশ ঘোষ,
সেই ছন্দে
বঙ্গালর মাঝে !”

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্য রচনা করিয়া বশস্বী হইয়াছেন। স্মৃতবাং নাটক রচনা করিতে হইলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজন। আর যাত্রা বখন শুধু যাত্রা নামে সন্তুষ্ট না থাকিয়া নাটক হইতে যাত্রা করেন, তখন যাত্রাব পালাও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত না হইলে তাহাকে লোকে নাটক বলিয়া মানিবে কেন? তাই যাত্রাব রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ইহাব সবলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন কবেন। ইহাদের মুখে কতকটা সে ছন্দ মানায়, কারণ ইহাবা প্রায়ই বীরবসের অভিনয় কবেন। কিন্তু রাজা বখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন রাণীব সঙ্গেও সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন? হবে না কেন? বাঙ্গালীর বৈবত অনেক সময়ে অন্তঃপুরেই প্রকাশ পায়। রাজা রাণী বাসকন্তা নাবদম্বি ইহারা সকলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন করুন কতি নাট। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই, যাহাদের শুনাইবাক্ষর শুনাইবাক্ষর এই শ্রম স্বীকার তাহাদের অধিকাংশ লোকেই এই কটমট বুলি বুদ্ধিতে না পারিয়া হা করিয়া তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা প্রায়ই দাঁতভাঙ্গা সম্প্রদায়বহুল। বিভাগলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগেরও সময় সময় তাহার অর্থ বুঝা কষ্টকর হয়। গ্রাম্য শ্রোতা গোবিন্দ সরকার, মুকুন্দ সাহা, জগা ভেলী, পরাণ নাগিত, মধো ধোপা, ক্ষেমী, বামী, রামীর ত কথাই নাট। এমন কি আমাদের মাসী পিসী মামীদিগেরও সে ভাষা বোধগম্য নহে। বাঙ্গালানডেল-পাঠনিরতা নবা মহিলাগণ অবশ্য কতক কতক বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে হইল কি? শৈল্পিক যুগের যাত্রা গান শুনিতে শুনিতে যেসবল জী পুঙ্কবের গণ্ডস্থল অশ্রুপ্লাবিত হইত, তাহারা এখনকার যাত্রাগানের কিছুমাত্র রস গ্রহণ করিতে পারেন না। তবে তাহাদের জন্য যাত্রাগান?

আধুনিক যাত্রার ভাষা যেমন দুর্লভা, পালার প্ৰট ততোহধিক জটিল। অনেক পালা পৌরাণিক নামে প্রচলিত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যায়িকাব অতি অল্প অংশই বিদ্যমান আছে। হুঁকাব নলিচা ও খোল দুইই বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ পালা-রচয়িতা মৌলিকতা দেখাইয়া কবি নাম সার্থক করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু র'সো, দাদা, একটু থাম দেখি। কালিদাস ত একজন কবি ছিলেন? সেই কালিদাস স্বয়ং কবিশব্দ-প্রার্থী হইয়া উপহাসকে কত ভয় করিয়াছিলেন, আর তুমি কি একেবাবেই "নিরঙ্কুশ"? স্বয়ং বাম্বীকি ব্যাস যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তুমি কোন্ সাহসে তাহার উপর কলম ধরিতে যাও? মহাকবি কালিদাস ও কীর্তিবাসও যতদূর সম্ভব সেই ঋষিদিগের পদাঙ্ক অমুসরণ করিয়াছেন।

পৌরাণিক পালা যদি বা কতক লোকে বুঝিতে পারে, তথাকথিত ঐতিহাসিক ও মনগড়া পালার প্ৰট আরও দুর্লভা। আব তাহার সবগুলিই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। এখানে একটা নমুনা দিতেছি। ছিলেন এক রাজা, ছিল তাঁহার এক সেনাপতি ও এক মন্ত্রী। রাজা থাকিলেই তাঁহার এক বা ততোহধিক রাণী থাকেন। সেনাপতির সহিত ছোট রাণীর জন্মিল প্রেম। সেনাপতি ইচ্ছা করিলেন রাজা হইতে। রাজা ছোট রাণীর বাধ্য—যেমন হইয়া থাকে। তিনি ছোট রাণী ও সেনাপতির চক্রান্তে পড়িয়া মন্ত্রীর কথা না মানিয়া বড় রাণীকে পাঠাইলেন বনবাসে। বড় রাণীর এক শিশুপুত্র ছিল, সে প্রহ্লাদ বা ক্রবের জ্ঞান হরিভক্ত। ব্যাধেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া কালীর কাছে বলি দিতে গেল। এদিকে সেনাপতি অস্ত্র দেশেব এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত যড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিল। রাজাও কাদিতে কাদিতে বনে গেলেন। সেনাপতি ও ছোট রাণী রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। রাজার সেই হরিভক্ত শিশুকে স্বয়ং হরি আসিয়া উদ্ধার করিলেন। রাজা ও বড় রাণী ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার খুব অল্পতাপ হইল। মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া রাজা হবির রূপায় আবার নিজরাজ্য উদ্ধার

করিলেন। সেনাপতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল। ছোট রাণী বিব খাইয়া মরিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মন্ত্রীর একটি বয়ঃস্থা অনুচা কন্তা ছিল। সে হয় সেনাপতি না হয় আব কাহারও প্রেমে পড়িয়া চিরকুমারী থাকিল, নয় বিব খাইয়া মরিল। এই যে সেনাপতিকে হত্যা করা হইল, তাহার কাটামুণ্ডটা আসরে আনিয়া সকলকে একবার দেখান হইল। কেবল মুণ্ড দেখাইয়াই নিস্তার নাই, সেনাপতি রাজা হইয়া যেসকল লোককে অস্ত্রায় করিয়া বধ করিয়াছিল, তাহাদের কয়েক-জনের প্রেতাত্মা আসিয়া সেই কাটামুণ্ডের রক্তপান কবিত্তে লাগিল। হরিঠাকুর তাঁহার ভক্ত শিশুকে উদ্ধার কবিবার সময় একবার মাত্র দেখা দিয়া থাকেন যদি তুমি মনে কর, তবে তুমি হরিকে চিনিতে পার নাই। হরি কি তেমন নির্ভূব? তিনি কথার কথার যখন তখন স্ত্রীরাধিকাকে বামে লইয়া যুগল মূর্তিতে দেখা দেন। এই আখ্যায়িকাব মধ্যে ছাম্লেটের পিতার প্রেতাত্মা ও কিং লিয়ার নাটকের সেই পাগলকে যে বসান হইল না, সে কেবল আমার নিজের জট বশতঃ, পালালেখকগণের সে বিষয়ে কোন জট লক্ষিত হয় না।

যাত্রার পালার এই যে নমুনা দিলাম ইহাই যথেষ্ট। ইহাতেই পালাবচকগণের কবিত্ব স্পর্শিত। একটা "নূতন কিছু" না করিলে কবিকীর্তি স্থায়ী হইবে কেন?

কিন্তু এদেশের নরনারী নূতন কিছু চায় না। তাহারা চায় পুরাণকাহিনী শুনিতে। পুরাণকাহিনী তাহাদের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত। রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণাৰ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমুখ্য, সুভদ্রা-দ্রৌপদী, সীতা-সাবিত্রীর লোক-পাবন কাহিনী সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন হইলেও তাহা নিত্য নূতন। কারণ বাহা উচ্চতম আদর্শ, বাহা লোকে আদর করিতে পারে না, তাহা চিরদিনই নূতন। হিমালয়ের উচ্চচূড়া ছরধিগম্য বলিয়া চিরদিনই অভিনব ভাবের romanceএর রাজ্য থাকিবে। তুমি যাত্রাকর, লোকশিক্ষার মহাত্রত যদি তুমি গ্রহণ করিয়া থাক, তবে সকল মজ্জাগত ভাবের স্মরণ করিতে পারিলেই তোমার উদ্দেশ্য সকল হইবে। তুমি নাটকের অনুকরণে মনগড়া কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া সরলপ্রাণ

পল্লীবাসীর চিত্ত কলুষিত করিও না। জগতে কবিত্বশক্তি বড়ই দুর্লভ বস্তু, নূতন আখ্যায়িকা গঠন ও নূতন চরিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা একমাত্র কবিরই আছে। পয়্যারের চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারিলেই যেমন কেহ কবি হয় না, ছই একটি গান রচনা করিতে পারিলেই কেহ উত্তম পালা রচনা করিতে পারে না। উত্তম পালা রচনা করিতে হইলে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন। যাত্রার অধিকারিগণ অনধিকারীর হাতে পালা রচনার ভার দিয়া তাঁহাদের শক্তির অপচয় করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অপকার করিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত লোকের দ্বারা পালা রচনা সম্ভব না হয় ততদিন সেই পৌরাণিক যুগের পালাই চলুক। এখনও দেশে সেই-সকল ভক্তি ও করুণরসাত্মক পালার প্রোতার অভাব হয় নাই। এইসকল পালায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয়। আমার মনে পড়ে একদিন “দণ্ডীপক্সের” স্মৃতিচরিত্রের মহিমায় আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত সেই যাত্রাগান শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখন সেসব পালা আর বড় শুনি না। এখন আমাদের রুচির পরিবর্তন হইতেছে। আমাদের রুচির এই নাটকাত্মিক গতি রোধ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের খাঁটি স্বদেশী জিনিষ এই যাত্রাগানকে অধোগতি হইতে রক্ষা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। কারণ যাত্রাগান লোকশিক্ষার এক প্রধান উপায়। কলিকাতার প্রধান প্রধান দলের অধিকারিগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যাত্রাগানকে এই অধোগতি হইতে উদ্ধার করুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বিদায়

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,

সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

ফিরিয়ে দিহু দ্বারের চাবি, রবে না আর ঘরের দাবী,

সবার আমি প্রসাদবাণী চাই।

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী

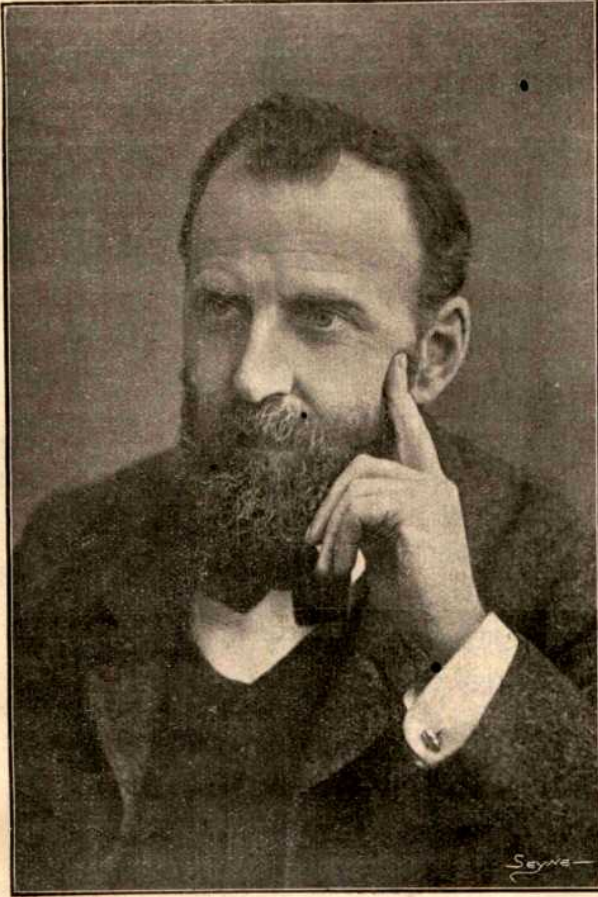
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।

প্রভাত হয়ে এসেছে রাত, নিবিয়া গেল কোণের বাতি
পড়েছে ডাক চলেছি আজি তাই ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জগতের বন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ফেড্

যোগ্যতমের উত্তরনের নিয়ম জীবজগতের সর্বত্রই খাটে। যাহার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা আছে, জীবন-সংগ্রামে দশজনকে ধ্বংস করিয়া যে সেই যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, সেই এই জগতে টিকিয়া থাকিবার অধিকারী। আর, যাহার সে শক্তি নাই, তাহার জন্ত বিনাশের মুক্তদ্বার অনন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, সে সেই পথে যাইবে, কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইতর জীব যখন মানবের পদবীতে প্রথম প্রবেশ করে তখনই যে হঠাৎ এই নিয়ম স্বগিত হইয়া যায়, তাহা নহে। তাহা যদি হইত তবে ‘দারৈরপি’ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না। সুতরাং মানুষ কোনো অবস্থাতেই উক্ত নিয়মের অতীত নহে। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ (Natural man) ও নৈতিক মানুষ (Moral man) একটা অনতিক্রমণীয় পার্থক্য বর্তমান রহিয়াছে। কেবল এই নৈতিক মানুষকেই ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে। এই মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিকশিত হয় যাহার আলোকে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যোগ্যতমের উত্তরনের নিয়ম নীচ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার রাজত্বের অবসান হইয়াছে। এমন যদি কোন স্থান থাকে যেখানে দাঁড়াইয়া জড় বলিতে পারে, যে, সে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অতিক্রম করিয়াছে, তাহা হইলে যেকোনটি হয়, নৈতিক জীবনে প্রবেশ করিয়া মানবও সেইরূপ জীবজগতের এই মাধ্যাকর্ষণী শক্তির অতীত হইয়া যায়। এখানে আসিয়া মানব যেন একটা বিপরীত ভাবাপন্ন নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে। যে ‘অযোগ্য,’ শক্তিতে যে হীন অর্থাৎ রুগ্ন, দুর্বল, আহত, অক্ষম - ইহা-দিগেরই যেন বাঁচিবার দাবী বেশী দাঁড়াইয়া যাইতেছে।



স্বর্গীয় মহাত্মা স্টেড্.

সমর্থের সমস্ত শক্তি অক্ষমের উদ্ধারে নিয়োগ করিতে হইবে; নতুবা ক্ষমতার সার্থকতা হইল না, তাহার অপব্যবহারই হইল। মানুষের মনে এ ভাব এতই প্রবল যে সে ইহার ব্যভিচার সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্তই দুর্বলের জন্ত সবলের আত্মত্যাগ এমন করিয়া মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তাই তো, ঈশ্বারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াও, আত্মরক্ষায় অসম্পূর্ণ অপারগ নারী ও শিশুদিগের জন্ত স্থান করিয়া দিয়া, সে দিন 'টাইটানিকে'র সঙ্গে অতলান্তিক মহাসাগরের অতল গর্ভে আত্মবিসর্জন করিলেন, তাঁহাদিগকে মানুষ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। ঈশ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া

স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। আত্ম-রক্ষার জন্ত ব্যাকুলতাতে নহে, কিন্তু আত্ম-তাগের জন্ত যে স্পৃহা, তাহারই মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত।

স্ব স্ব জীবন রক্ষার উত্তমে পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহা যোগ্যতমের উদ্বর্তন নিয়মের বাহ্যপ্রকাশ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তাহাতে সহসা মনে হইতে পারে যে, সভ্যতার শ্রেণীবিভাগে উক্ত সভ্যতা সভ্যতার নিয়ন্ত্রণে অবস্থিত। কিন্তু "টাইটানিক নিমজ্জন" আমাদেরকে অল্প বার্তা শুনাইতেছে। অদৃষ্টবাদী যখন হঠাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন সে ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হয়। তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হইবার নাই। উহাতে তাহার শিক্ষার মর্যাদাই রক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখকেননিভ শয্যায় শায়িত আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিত পুরুষকারবাদী যখন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ঝাণ অকস্মাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও আত্মহারা হয় না, পরন্তু আত্মরক্ষার সামর্থ্য সত্ত্বেও আনন্দিত মনে দুর্বলের জন্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া নির্ভীকচিত্তে "আমি আমার

কর্তব্য করিলাম" এই আত্মপ্রসাদের মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, তখন বুঝিতে হয় যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাহ্যাবরণ লইয়াই শিক্ষা ও সভ্যতা মনুষ্যত্বের অতি উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। কি নারী কি পুরুষের মধ্যে দেশকালের বিচারের অতীত হইয়া যেসমস্ত সুকুমার বৃত্তির বিকাশ হইলে মানুষকে আমরা মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, 'টাইটানিক' যদি চকিতে তাহা দেখাইবার অবসর দিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করিয়া দিয়া থাকে, তবে যুরোপ ও আমেরিকা কোটি কোটি টাকা তাহার জন্ত বুথায়ই ব্যয় করে নাই।

এই টাইটানিকের নিমজ্জনে জগৎময় একটা মহা হাহাকার উথিত হইয়াছে। এ হাহাকার কিসের জন্ত?

কত লক্ষপতি ক্রোড়পতি আপনাদের অর্থের স্তূপের মধ্যে বসিয়াই ডুবিয়া গেলেন তাহাতেই কি এই শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে? মানুষ আসে মানুষ চালায় যায় ইহা নিত্য ঘটনা। নিত্য ঘটনা হইলেও এত বড় একটা দুর্ঘটনায় মানুষ শোক না কবিয়া পারে না। কত অর্থ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। শোক কি সেই জন্ত? ক্রোড়পতি লক্ষপতি গিয়াছেন, আবাব কত ক্রোড়পতি লক্ষপতি বহিয়াছেন, অর্থ গিয়াছে সে কতি পূরণ হইতে বেশী দিন লাগিবে না। মানুষের জন্ত মানুষের ক্রন্দনও থামিবে। কিন্তু টাইটানিক এক জনকে লইয়া সাগরগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে যাহার দোসব আর চক্ষে দেখিতেছি না। আর যে সম্বর দেখিব সে আশাও হইতেছে না। তাই শোক সম্বরণ কবা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মনের মধ্যে একদিন একটা হাহতাশ লাগিয়াই রহিয়াছে। মানুষ তো সকলেই। কিন্তু সময়ে সময়ে একএকজন এমন মানুষ দেখিতে পাই যাহারা সাধাবণ জনমণ্ডলী হইতে একটু উচ্চ ভূমিতে বাস করেন। আর্কিমিডিস্ বলিয়াছিলেন, আমার পৃথিবীর বাহিরে একটু স্থান দাও আমি পৃথিবীটা উল্টাইয়া দিতেছি। যাহারা পৃথিবীর গায়ে থাকা দেন, যাহারা পৃথিবীকে নাড়াচাড়া দেন, তাহারা যে পৃথিবী ছাড়িয়া একটা স্বতন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারেন না। টাইটানিকের মধ্যে এমনই একজন লোক ছিলেন। স্ততঃসং সমস্ত জগৎ আজ শোক-বসন পরিধান করিয়াছে। আর্জেন্টের বন্ধু, নিপীড়িতের সহায়, জগৎবিখ্যাত Review of Reviews পত্রের সম্পাদক মহামনা ষ্টেড সাহেব এই জাহাজে ছিলেন। যখন কাগজে পড়িলাম ‘কার্পেথিয়া’ একদল যাত্রীকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছে, তখন ক্ষণকালের জন্ত একটা আশার ক্ষীণ বস্মি হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল অসম্ভব। যতক্ষণ না শেষ কুকুরটি পর্যন্ত জীবনরক্ষার বোটে নিরাপদে আশ্রয় পাইতেছে, ততক্ষণ ষ্টেডকে কেহ আহ্বান হইতে বাহির করিতে পারিবে না, তাহা নিশ্চিত! যিনি সমস্ত জীবন অস্ত্রের জন্ত জীবনপাত করিলেন, তিনি আসন্নকালে অস্ত্রের উপবে আপনায় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে

বাইবেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তখনই বুঝিলাম কোন আশা নাই। পরে তাহাই প্রমাণিত হইল। ভিড়েব মধ্যে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। একবার মাত্র তিনি স্বীয় কামবার দ্বার পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া নিঃশব্দে নির্ভীকচিত্তে স্বীয় বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাবপব সব ফুরাইয়া গিয়াছে। শেষ খবর যাহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে ভয় কাষ্ঠাবলম্বনে ভাসমান দেখিয়াছে। আত্মবক্ষার চেষ্টা তো করিতেই হয়। “আত্মানন্দের সত্যতঃ গোপালিত” তাহা সত্য, কিন্তু ‘দাবৈবপি’ নহে।

এবাব যখন এপ্রিল মাসেব Review of Reviews হাতে আসিল, অতর্কিতে হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দু আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তো শেষ বাব ষ্টেডের লেখা পড়িতেছি। অত্যাচারীর মস্তকের উপর উত্ততবজ্র সেই সতেজ লেখনীর জ্বালাময়ী ভাষা আর তো পড়িতে পাইব না। ভাষাব তেজ অনেকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের রক্ত দিয়া না লিখিলে তাহা হৃদয়কে আঘাত করে না। Review of Reviewsএব প্রথম কয় পৃষ্ঠার মস্তব্যব মধ্যে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে জগতের কর্মক্ষেত্রের সকল কথাই থাকিড, যাহা অস্ত্র কাগজেও থাকিতে পারে; কিন্তু ভাষা ও বিষয়ের অন্তবালে এমন কিছু থাকিত যাহা অস্ত্র কোনও কাগজে পাই না। কি তেজ, কি বীর্ঘ্য! যেন বিশ্বব্ধেব প্রধান সেনাপতি, হটিবার সম্ভাবনাই নাই। যাহার সত্যের জয়ে ঐববিশ্বাস নাই, যাহার বিশ্বাস নাই যে সত্যের পশ্চাতে বিশ্বপতির অনন্তশক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার লেখনী একপ ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। ষ্টেড সাহেবের কলমেব সম্মুখে কোন বাধা বিদ্যই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। সত্যের পক্ষ সমর্থনে, জ্ঞানের মর্যাদা রক্ষার তাঁহাব লঘুশব্দ জ্ঞান ছিল না। যেখানে অত্যাচার, অত্যাচারী যতই বড় হউক না, ষ্টেড সেখানে বজ্রহস্তে উপস্থিত। নিপীড়িত যতই ক্ষুদ্র হউক না, ষ্টেডের সহায়ত্ব হইতে সে বঞ্চিত নয়। অত্যাচার-পীড়িত যিনিই কেন হউন না, - মহামুহিমায়িত “রুমের বাদশা” অথবা সামান্য “বিশি পাল”—ষ্টেডের সহায়ত্বভূতির কাছে সকলেই সমান।

তিনি সর্বদাই মনুষ্যত্বের উচ্চভূমিতে বিচরণ করিতেন, তাই কোন দিন ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় স্বার্থ কখনও তাঁহার দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্তায় সর্বাবস্থাতেই অন্তায়। তিনি কখনও অন্তায়ের প্রতিবাদ করিতে বিরত হন নাই। সামসারিক লোকে কলাকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সুবিধার (Expediency) খাতিরে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় স্বার্থের জন্ত অন্তায়কে চাপা দিতে চেষ্টা করে, অসত্যকে প্রসন্ন দেয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের এই চিহ্নিত পুরোহিত, সত্যের সেবক ও জ্ঞানের অন্বেষক কখনও এই সংসারিকতার দোষে দুষ্ট হন নাই। তাঁহার মত দুর্বলের এমন প্রবল সহায় আর কে ছিল। তাই বলিয়া তিনি দুর্বলের অন্তায় কখনও সমর্থন করেন নাই। শ্রীমতী এনি বেনাশ এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনকেই পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াও বিলাতে বাইরা রাজনৈতিক-অধিকার-প্রয়াসিনী রমণীদিগের জানালা আর মাথা ভাঙ্গা সমর্থন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ষ্টেড্ নারীজাতির সর্বপ্রকার অধিকার সম্প্রদায়ের এক প্রধান পাণ্ডা হইলেও রমণীগণের এই কার্য তিনি সমর্থন করেন নাই। বাহা জ্ঞান, বাহা সত্য তাহারই সমর্থন করিতে হইবে, বাহা অন্তায়, বাহা অসত্য তাহারই প্রতিবাদ করিতে হইবে, কাহার দ্বারা কৃত তাহা দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। সেই জন্তই তিনি ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসনের দাবী সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু আমাদের সামাজিক অন্তায়ের সমর্থন করেন নাই। তিনি পারস্তে অবিচারের প্রতিবিধানের জন্ত বহুপরিকর ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান-গণের সাম্প্রদায়িক স্বার্থপ্রণোদিত অন্তায় আবদার কখনও সমর্থন করেন নাই। রুসিয়ার প্রতি অবিচার না হয় সেজন্ত তিনি সর্বদাই সজাগ থাকিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া ‘পোলিস্’দের উপর রুসিয়ার ব্যবহার কখনও তিনি মার্জনীয় মনে করেন নাই। তিনি বাহা সত্য বুঝিয়াছেন তাহারই সমর্থন করিয়াছেন, বাহা জ্ঞান বুঝিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন—ধনীর ভ্রুকুটা বা দরিদ্রের গালাগালি কিছুই গ্রাহ করেন নাই। তিনি একবার সামাজিক দুর্নীতি দমন করিতে বাইরা জেলে গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের

বড়লোকেরা কেমন করিয়া রমণীদিগকে কুপথে লইয়া যায় তাহার বিরুদ্ধে তিনি একবার ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করেন। মাছুষ চুরি করা কেমন সহজ তাহা হাতে কলমে দেখাইতে বাইরা তিনি কারাগারে নিক্ষেপ হন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রক্ষেপও নাই। কেন না, যিনি মানবজাতির মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, নিজের কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর কোথায়? বুয়ার যুদ্ধের সময় যখন তাঁহার সমস্ত দেশবাসী একেবারে কেপিয়া উঠিল, বাহারা পূর্বে বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও যখন যুদ্ধের পক্ষপাতীদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন একমাত্র ষ্টেড্ সাহেব তাহার ভীষণ প্রতিবাদ করিলেন। কোন দিকে দৃকপাত করিলেন না। তিনি যখন বুঝিয়াছেন এ যুদ্ধ অন্তায়, তখন আব কে তাঁহাকে প্রতিবাদ হইতে নিরস্ত করে? স্বজাতির সন্ত্রম বা ব্যক্তিগত লাভালাভ কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। Cecil Rhodesএর উত্তরাধিকারী বুয়ার যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া বার ক্রোড় টাকা হইতে বঞ্চিত হইলেন। বাহারা কি সত্য, কি জ্ঞান তাহা জানিয়া সুবিধার (Expediency) অনুবোধে অগ্রসর হইতে অসমর্থ তাঁহারা মানবজাতির এই অগ্রজ (first-born) ভ্রাতার তর্পণের অধিকারী নহেন। এবং বাহারা ষ্টেডের অশৌচ গ্রহণ করিতে অসমর্থ তাঁহা-দিগকে নিতান্তই কৃপাপাত্র মনে করিতে হইবে।

মাতা বহুব্রা এমন পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন। মানবাকাশ হইতে এমন উজ্জল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যত্বের অগ্রদূত আজ চলিয়া গিয়াছেন। সে বীর্ষ, সে তেজ আজ অতলান্তিক মহাসমুদ্রেব বিশাল বক্ষে বিশ্রামলাভ করিয়াছে। ইহা যুক্তিসংগত হইয়াছে। সে বহি মহা-সাগরের বারিরাশি ভিন্ন আর কিছুতে নিক্ষেপিত হইলে বুঝি তাহার যথেষ্ট সম্মান হইত না। সে তেজ যিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সম্বরণ করিলেন, তাঁহারই নাম যন্ত হউক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

জাহাজ ডুবি

নবনির্মিত যাত্রীজাহাজ টাইটানিকের প্রথম সমুদ্রযাত্রা মহাবাত্রার পর্য্যবসিত হইয়াছে। আরামপ্রিয়ের লোহার বাসব, ধনকুবেরের অর্পব-প্রাসাদ, নৌগঠনবিদ্যার চরম চেষ্টার ফল টাইটানিক চলন্ত বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া ছুই টুকরা হইয়া গিয়াছে। বরফের মৈনাক! স্বয়ং ইন্দ্র ইহাদের দমন করিতে পারেন নাই; স্রোতের মুখে ইহারা এখনও উড়িয়া বেড়ায়, যাত্রী জাহাজের সর্কনাশ সাধন কবে, মানুষের অনিষ্ট ঘটায়।

তিন শ' গজ বহরের টাইটানিক ইংলণ্ড হইতে প্রায় আড়াই হাজার যাত্রী লইয়া আমেরিকার অভিমুখে যাইতেছিল। পথে ঝড়বজ্রের নাম গন্ধও ছিল না। হঠাৎ গায়েবী ভায়ে খবর আসিল “সাবধান! সমুদ্রে বরফের পাহাড়।” কাপ্তেন অমনি দূরবীণ সহ লোক মোতায়েন কবিতা দিলেন “দেখ, বরফের পাহাড় কোন্ দিকে, কোন্ মুখে তাহার গতি।”

আকাশ নির্মল, বাতাস পরিষ্কার, তুত্রাচ লোকটা কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। যখন ঠাহর হইল তখন বরফের স্তূপ একেবারে জাহাজের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে; জাহাজ থামাইবার আর অবসর নাই। ধাক্কায় পর আবার ধাক্কা, আঘাতের উপর পুনর্বার আঘাত। লক্ষ্মীছুরের লোহার বাসরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছিদ্র হইয়া পড়িল; ইঞ্জিনঘরে জল ঢুকিল, জাহাজ আর চলিতে পারিল না।

বিপদমুচক ঘণ্টা কাপ্তেনের হুকুমে ঘন ঘন বাজিতে লাগিল; রাত্রি তখন প্রায় দশটা, যাত্রীরা অনেকেই তখন আঁগিয়া; কেহ গান গাহিতেছে, কেহ তাস খেলিতেছে কেহ চুপ্ত হুঁকিতেছে। ঘণ্টা শুনিয়া অনেকেই বাহিরে আসিল। উহারা বিপদের কথা মোটেই বুঝিতে পারে নাই। শেষে কাপ্তেনের কথায় ক্রমে সকলে বাহিরে আসিয়া ডেকের উপর জমায়েৎ হইল। প্রায় শতখানেক খালাশীও ঐসঙ্গে ৩টা করিতেছিল, জাহাজের কর্মচারীরা বন্দুক দেখাইয়া হাড়া দিতে উহারা আবার নিজের জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে, লাইফ-বোটগুলো জলে নামাইতে না নামাইতে, জাহাজের সমস্ত আলোক নিবিত্তা গেল এবং শীতল জলের সংস্পর্শে তপ্ত বয়লার ঝাটরা টাইটানিক ছুই টুকরা হইয়া গেল।

যে লোকটি তারঘরে ছিল সে কিন্তু নড়ে নাই, সে ক্রমাগত তারহীন তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে চতুর্দিকে খবর পাঠাইতেছে “টাইটানিক ডুবিল, বাঁচাও, বাঁচাও।”

তিন শ্রেণীর যাত্রীই কর্কের কোমরবন্ধ পরিয়া জলে ঝাঁপ দিবাব ভ্রম প্রস্তুত। হঠাৎ কাপ্তেনের হুকুম হইল, “পুরুষেরা পিছাইয়া যান, প্রথমে বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁচাইতে হইবে।”

ধনকুবের ট্রাস্ট এবং গগনহীম, কর্ণেল আষ্টার এবং জগদ্বিখ্যাত স্টেড সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বহির্ভূত শ্রেণীর যাত্রী পর্য্যন্ত সমস্ত পুরুষ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই নীববে যন্ত্রচালিতের মত নৌকাব-দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; কেবল কয়েক জন সর্বা কোনোমতেই স্বামীকে ছাড়িয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে সন্মত হইল না; তাহারা সহমৃত্যু হইবার জন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প। ইহাদের মধ্যে আবার ছুই একজন, গৃহস্থিত সন্তানের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার, স্বামীর সনির্বন্ধ অনুরোধে ও স্নেহে অনুরোধে, অশ্রুধারা শেষ বিদায় গ্রহণ কবিতা নৌকার অভিমুখে চলিল।

এই সময়ে ব্যাণ্ডে বাজিতে লাগিল—

“আরো কাছে, প্রভু! তোমার আরো কাছে” কেহ হৈ চৈ করিল না, ছড়াছড়ি করিল না; কেহ কাঁদিল না, আর্দ্রনাদ করিল না! ধীরে ধীরে টাইটানিক ডুবিতে লাগিল। আর, দেড় হাজার বলবান পুরুষ উন্মুক্ত মস্তকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বীরের মত বীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ওদিকে তার ঘরে জল ঢুকিয়াছে, তারের সাহেব তবুও চেম্বার ছাড়ে নাই; কাপ্তেন বলিলেন “তুমি কর্তব্য তো পালন করিয়াছ, এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও।” বেচারী তবু নড়িল না, শেষে একটা ডেউ আসিয়া উহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। কাপ্তেনেরও শেষে ঐ গতি। তিনি একটা ডেউয়ের ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া পুনর্বার উঠিয়া

দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু, তাহার পর যখন আর একটা চেউ আসিল তখন আর সামলাইতে পারিলেন না। দেখতে দেখিতে জাগাজগ ডুবিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে দেড়হাজার মূল্যবান জীবন অকাল-বর্ষণে দীপান্বিতার আলোকমালাব মত নিঃশব্দে নির্বাপন লাভ করিল।

আতঙ্ক উইদগিগকে অভিভূত করিতে পারে নাই এই উইদেব গৌরব, উইরা। সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। উইরা মরণভয় ভয় করিয়া মৃত্যুভয় হইয়াছেন। আমরা বিদেশী, আমরাও উইদের আত্মার কল্যাণে অশ্রু-তর্পণ করিতেছি।

বাঁহারা বাঁচিয়া ফিরিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বালক এবং জীলোকের সংখ্যাই অধিক। প্রথম শ্রেণীর একশত চুরাশি জন বাজিগীর মধ্যে ফিরিয়াছেন একশত উনচলিশ জন; শিশু পাঁচটিই ফিরিয়াছে এবং পুরুষ বাজী একশত বায়াস্তর জনের মধ্যে বাঁচিয়া ফিরিয়াছেন মোটে উনবাট জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাজিগী মোট তিরানব্বই জন, ফিরিয়াছেন আটাস্তর জন; চব্বিশটি শিশু, সকল গুলিই ফিরিয়াছে; পুরুষ বাজীর সংখ্যা এক শত বাট, ফিরিয়াছে মোটে তের জন। তৃতীয় শ্রেণীর বাজিগীব সংখ্যা এক শত উন-আশী, জীবিত মোট আটানব্বই; পুরুষ বাজীর সংখ্যা চারি শত চুরাশি, জীবিত মোট পঞ্চাশ জন। তৃতীয় শ্রেণীতে শিশুর সংখ্যা মোট ছিয়াস্তর অথচ বাঁচিয়া ফিরিয়াছে মোট তেইশটি। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল শিশুকেই বাঁচান হইল অথচ তৃতীয় শ্রেণীর অর্ধেক শিশুকেও যে কেন বাঁচান গেল না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রিপোর্টে তো দেখিতেছি উদ্ধারের সময়ে ঐশ্বর্য্যের তারতম্য হিসাবের মধ্যেই ঘরা হয় নাই। তিন শ্রেণীর হিসাব মিলাইয়া দেখিলে রিপোর্টারের ঐ কথাটার খুব যে বেশী মূল্য আছে তাহা মনে হয় না। যাক সে কথা, ধনী যখন আপনার জীবন বাঁচাইবার দাবী তুলিয়া দরিদ্রকে নোকাই উঠাইয়া দিয়া মৃত্যুস্বীকার করিয়াছে, বলবান যখন অবলা জীলোক এবং দুর্বল শিশুদিগকে বাঁচাইবার জন্য জীবনের চরম সময়েও নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছে, এবং ষ্টেডেব মত সমাজের পরম

উপকারী জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যখন কোন এক অধ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য নিজের জ্ঞান্য দাবী অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তখন গুরুপ একটা বেতলা আলোচনা নাই করিলাম। যাহা দেখিলাম যাহা পাইলাম তাহার তুল্য জিনিস তো এ সংসারে বড় বেশী মেলে না।

প্রায় তের শত বৎসর পূর্বে বঙ্গোপসাগরে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন চীন জাপান, জাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি নানাদেশ হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভারতবর্ষে তীর্থ করিতে আসিতেন। ভারতবর্ষ তখন এসিয়ার হৃদয়কেন্দ্র। সেই সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অজ্ঞাত বাজীর সঙ্গে ‘হুড়ি’ বা উড়ুপে চড়িয়া সাগর লঙ্ঘন করিতেছিলেন। মধ্য শৈলের চূড়ার ঠেকিয়া হঠাৎ হুড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজ ডুবুডুবু এমন সময়ে আর এক খানা হুড়ি আসিয়া পৌছিল। হুড়ির মালিক সকলের আগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করিতে চাহিল, উইরা বলিলেন “আগে আর সকলে উঠুক, তাহার পর দেখা যাইবে। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, জগতের ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত যতক্ষণ না মোক্ষলাভ কবে ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা বৌদ্ধ হইয়া নিজের প্রাণ আগে বাঁচাইব? অসম্ভব।”

যখন আর সকলে উঠিল তখন আর হুড়িতে জাহাজ নাহি। সন্ন্যাসীরা বোধিজ্ঞানমূলে যেগমন্ত সামগ্রী উৎসর্গ করিবেন বলিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহা অজ্ঞ বাজীদের হাতে সঁপিয়া দিয়া প্রসন্নমনে ‘অমিতাভ’ নাম জপ করিতে করিতে অনায়াসে তল্লুত্যাগ করিলেন। দুইটি ঘটনার মধ্যে তেরশত বৎসরের ব্যবধান। একটি ঘটনার প্রাণ জলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস অপ্রমের মৈত্রী করুণা ও জীবহিতৈষা; আর একটি ঘটনার মূলতত্ত্ব—ঠিক এক কথায় প্রকাশ করা যায় না।

হয় তো উহা জাতিগত শৌর্য্যজনিত সংযম, হয়তো উহা বৃহৎ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকার মাহাত্ম্য,—গৌণ মহত্ব হয় তো অল্পকিছু। ঠিক যে কী, তাহা জোর করিয়া বলিবার জো নাই। কেহ মরিয়াছেন মহাত্মা ষ্টেডেব মত পরলোকে আত্মবশতঃ; কেহ মরিয়াছেন কাপ্তেন স্মিথের

মত আন্তরিক কর্তব্যনিষ্ঠাবশতঃ ; কেহ মরিয়াছে ইঞ্জিনের কয়লাবাহী কুলির মত উপরওয়ালার রিভলভারের ভয় বশতঃ। আবার নীরোর সমসাময়িক অতি গর্বিত পেট্রোনিয়সের মত, কেবল 'গোলা' লোকের প্রতি তাচ্ছিল্যবশতঃ,—বাঞ্চে লোকের সম্মুখে প্রাণের মারা প্রকাশ করিবার প্রভীর অনিচ্ছাবশতঃ যে একজনও মরে নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। আবার মহৎ দৃষ্টান্ত সময়ে সময়ে সংক্রামক। এইলমন্ত নানা সম্মেহ সম্মেহ, মনস্তত্ত্বের এইসমস্ত পাংশুল প্রশ্ন সম্মেহ এই আত্মদানের অবদান মানবেতিহাসে স্মরণীয়।

টাইটানিক ডুবিয়াছে। লতামণ্ডপ, ব্যারান-গৃহ, স্তম্ভসং সস্তরণকুণ্ড, বিসর্পিত অর্ধকোশাচ্যাপী পাশ্চাত্যগার জু-নির্মিত বন্ধু, অসংখ্য ভোজনমন্দির, অসংখ্যজন্মের সহস্র উপকরণ বকে করিয়া টাইটানিক ডুবিয়াছে। গরম জলেব কোয়াবা, ঠাণ্ডা জলের ঝর্ণা, মেহগির সজ্জাগৃহ, দর্পণখচিত নৃত্য গৃহ, এই সমস্ত লইয়া, এবং তন্নিম্ন দেড়হাজারের উপর নরনারী, অশাশ্রুক স্নেহপ্রীতিবিশিষ্ট, স্নেহপ্রীতির আধারস্বরূপ দেড়হাজার নরনারীকে লইয়া টাইটানিক ডুবিয়াছে। তবুও ইহা ভরাডুবি নয়। যে সাত শত লোক বাঁচিয়া ফিরিয়াছে আমরা তাহাদের কথা বলিতেছি না। টাইটানিক ডুবিল, কিন্তু উহার যাত্রীরা যে মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল তাহাতে স্মরণে ধনী হইয়া উঠিবে, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতি ধন্য হইবে।

উন্নত শোক যে একমাত্র শূদ্রের পক্ষে—তথা দাসের পক্ষে শোভনীয় তাহা এতদিনে স্পষ্ট বুঝিলাম। 'বিপদী বৈধর্ম্য' কথাটা যে পাঠশালার গড়িবার এবং পাঠশালার বাহির হইয়াই ভুলিবার জিনিস নয়, তাহাও আচ্ছন্নমান দেখিলাম।

স্বাধীন স্বর্গের সিঁড়ি করিতে গিয়া হার মানিয়াছিল। মনেকের মতে প্রাকৃতিক শক্তির উপব প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা মানুষের পক্ষে, স্বাধীন স্বর্গসোপান গড়িবার মত ক্ষেপ্তা মাত্র ; গুরুত্ব ধৃষ্টতা দেবতার সঙ্ক করেন না। এইতো টাইটানিক আহাঙ্গ—মানুষ গড়িয়াছিল, বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছিলেন "সোলা জলে ডুবিবে, তবু টাইটানিক ডুবিবে না।" কোথায় রহিল সে গর্ব ? মানুষের গর্বের এই

মূল্য। আমরা একবার উত্তর দিব না, শুধু এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, যে মানুষ টাইটানিক গড়ে সেই তো তারাবহীন তাবের খবর আবিষ্কার করে এবং তাহারি বলে তো 'কার্পেথিয়া' আকৃষ্ট হইয়া আসিল, এবং সাতশত মানবের জীবন বক্ষা করিল। নহিলে সবই তো গিবাছিল।

ঐসের জুপিটার মর্ন্তলোকে অগ্নি-স্থাপনের অপরাধে প্রমিথিসকে অশেষরূপে নির্ধাতিত করেন। আর তারত-বর্ষের ইন্দ্র স্তেনরূপে স্বয়ং নরলোকে অগ্নি আনিয়া দেন। আমাদের দেবতা হিংস্রক দেবতা নহেন। মানুষের মধ্যে যে শক্তি কাজ করিতেছে, যাহার ফলে সে পঞ্চভূতের উপব প্রভুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে তাহা কখনই দেবতার অনভিপ্রেত নহে, তাহা দৈবশক্তিরই ফলিঙ্গ। ইহাই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বিশ্বাস।

তবে 'শ্রোয়াংসি বহুবিদ্যানি' সিদ্ধির পথ দুর্গম। যবদীপে হিন্দু-অধিকাংশ-সময়ে একটি পণেশমুষ্টি নির্মিত হই, মুষ্টিটি বহুসংখ্যক নবকপালের উপর প্রতিষ্ঠিত। কলনাট চমৎকাব। প্রাণপাত ভিন্ন সিদ্ধিলাভ করা যায় ন, অনেকের হাড় মাটি হইয়া না গেলে সিদ্ধিলাভের পীঠ নির্মাণ হয় না। সত্য কখনো সত্য দবে বিকার না। তা' সে বৈজ্ঞানিক সত্যই হোক আর আধ্যাত্মিক সত্যই হোক। জীবন দিয়া সত্য কিনিতে হয়। টাইটানিকের যাত্রীরা জীবন বিসর্জন দিয়া যে সত্য শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গেল তাহার ফলে স্মরণের অনেক অমঙ্গল কুণ্ঠিত্যকার কুঠারের মত নিস্তেজ হইবে, বহু কল্যাণ বর্ধিত হইবে। ইহা পরম লাভ এবং ইহাই পরম সাধনা।

শ্রীমদ্রামানন্দ কবিরাম

বিশ্ববন্ধু

(ট্রেড সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষে)

গ্রহণ-বর্জিত শুচি স্বর্গসম নিত্য-নির্ণিমেষ নিরন্তর নেত্রবিন্দু পশেছিল ও তব পরাণে, তাই জানি নাই শকা, তাই ভূমি মান নাই ক্রেশ, বিবাদ, বিপদ, বিষ, টল নাই নিন্দা অপমানে।

হে তেজস্বী! অগ্নিমান্ত! হে তপস্বী! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে; তোমার নাহিক আত্মপর;
বোষণা করেছ শুধু নিত্য সত্য; চিত্ত স্বার্থলেশ-
শূন্য তব চিরদিন; ধৃতব্রত তুমি অতন্তর।

“জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়ে জ্ঞান-নিষ্ঠ ভূচি অহুষ্ঠানে”
এ তোমার মূলমন্ত্র, এ তোমার প্রাণের সাধনা;
জয়ডঙ্কা নাশে তাই আতঙ্কিত হ’তে তুমি প্রাণে
হৃর্জলের পীড়া ভয়ে। বিশ্বমানবের আরাধনা;—

সনাতন জ্ঞান ধর্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত,
কত অভিচার মন্ত্র নষ্টবীৰ্য্য তব শঙ্করবে,
হে বিধাসী! বিশ্ববন্ধু! জগো কর্মী উদারচরিত!
নিঃস্ব নির্জিজ্ঞাসের পক্ষে একা তুমি স্ববেছ গৌরবে।

হে ধর্মিষ্ঠ! আত্মনিষ্ঠ! লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি
অন্তে তুমি সমুদার। মাহুঘের রাজ্যের বাহিরে;
উর্কে শুধু নীলাকাশ, সীমাহীন অনন্ত অনাদি
নিম্নে লীলারিত নীল, উচ্ছ্বসিত চন্দ্রমা বিহিরে।

তোমার সমাধি ভঙ্গ করিবে না তরঙ্গ হৃর্জর,
আত্মপ্রাণ দানে তব আর্তত্রাণ ঘটেছে সুক্ষণে;
কীর্তনীয় তব নাম, কীর্তি তব অমর অক্ষর,
ক্ষান্তধর্ম মূর্ত তুমি হে বশবী জীবনে মরণে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

পৌষ সংক্রান্তি।

পূর্ববঙ্গবাসিনী কোন বৃদ্ধা মহিলা ঋণ প্রকাশ করিয়া বলিতেছিলেন, তাঁহাদের দেশীয় আত্মকালকার ছেলেরা দেশপ্রচলিত “কুলাই”র গীত প্রভৃতি হড়াগুলি ক্রমেই ভুলিয়া বাইতেছে। এবং তাহা জানে না বলিতেই বেশী গৌরব বোধ করে। ভবিষ্যতে সেসব হড়া একেবারে লুপ্ত হইবে মনে হয়। তাঁহাকে “প্রবাসী”তে প্রকাশিত, “পৌষ-সংক্রান্তির” উপলক্ষে গীত হড়াগুলি পড়ির’ শুনাইলাম। বলিলাম, তাঁহাদের দেশীয়েরা “বাকালিয়া” কথা ও হড়া ভুলিতে চার বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ তাহা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, এদেশীয় ভাষা ঠিক রাখিয়া প্রকাশিত হওয়ার্তে বিক্রম মনে হয়। বাহা হউক, সাধাবণতঃ “কুলাইর” নামে আবণ্ড দুইটা গদ গায়, যথা :—

“ঠাকুর কুলাই ভৌ।
হরসিরা, পরসিরা,
লড়া বাইগুন তরাসিরা।
লড়া বাইগুন খল পাতে,
ভিখ্ ভাও আত্মা (আনিরা) লক্ষ্মীর হাতে।
ভাও ভিখ , ভাও বর,
খানে চাউলে বরক্ গর।

হরসিরা নালের চাছ কলাই, মাণিকনালের বেড়া,
লক্ষ্মীর হাতে ভাও ভিখ বাই আলা (হালিমা-কুবক) পাড়া,
আলা পাড়া বাইতেরে গাঙ্গে লাগল ঠোস্,
(কোরস্) ঠাকুর কুলাই ভৌ।

(২)

অটি, অটি,
সোনার বাঁকা লাড়ি (লাটি)।
সোনাও বালো (ভাল) কুপাও বালো,
এগর হান (ঘরখানি) ছাইছে বালো,
এগর হান ছাইছে ছোনে,
লক্ষ্মী বইছেন চারি কোণে,
বইছেন লক্ষ্মী মিহন বর,
খানে চাউলে বরক্ গর (ভরক্ ঘর)।

হরসিরা নালের চাছ কলাই, মাণিকনালের বেড়া

লক্ষ্মীর হাতে ভাও ভিখ বাই আলা পাড়া,

আলা পাড়া বাইতেরে গাঙ্গে লাগল ভাডি, (ভাটি)

এবেশের মাহুঘল্লা অক্ষব লোহার (লোহার) কাড়ি (কাটি)।”

কুলাইর গীত আরও আছে। বাহ্য ভয়ে দুইটা মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। এ উৎসবে তত্র ইতর সকল জেগীব বালকেরাই যোগ দিয়া থাকে।

শ্রীপ্রফুল্লমণী দেবী।

ফরিদপুরের গ্রাম্য ছড়া।

গত বৎসর চৈত্র মাসে প্রবাসীতে শ্রীমুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত পূর্ব-বঙ্গে—প্রধানতঃ ফরিদপুরে—গীত কুবকবালকমিগের একটি গ্রন্থপ্রাণ্য ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ছড়াটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

নলিনী বাবুর উদ্ধৃত ছড়াটিতে কয়েকটা ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইল। ছড়াটি কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল এ কথা নলিনী বাবু স্বীকার করিয়াছেন, আমরাও এইরূপই শুনিয়া আসিতেছি। তবে নলিনী বাবু যে বলিয়াছেন—“অখচ নামগুলি পরিবর্তিত হইয়াছে” ইহা ঠিক নহে। মূল ছড়াটির মধ্যে কোন মিথ্যা নাম স্থান পায় নাই আমরা বিষমস্তম্ভে অবগত আছি। নলিনী বাবুর নিজের উদ্ধৃত ছড়াটিতে মূল ছড়াটির নাম-গুলি নাই। মূল ছড়াটি আমরা বহমিন বাবু শুনিয়া আসিতেছি এবং বেশ স্পষ্ট ভাবেই মনে আছে।

নলিনী বাবু যেখানে যেখানে “মহিম বাবু” লিখিয়াছেন সেখানে সেখানে “ললিত বাবু” হইবে এবং “ওসমান ওরে ভাই” না হইয়া “ঈশান ওরে ভাই” হইবে।

ফরিদপুর সহরের অন্তর্গত মাপিকদহ ইত্যপূর্বে বেশ একখানি বড়িচ্ছ পল্লী ছিল। এই পল্লীতে জমিদার ৮মহিমচন্দ্র রায় ওবকে মহিম বাবু বাস করিতেন। ইনি সবিকো বিবাদের ফলে তাঁহার জাতি

ললিত বাবু কর্তৃক উপভাষিত হইত হন। ললিত বাবু মহিম বাবুকে হতা করিয়া পুলিশের চক্রে এড়াইয়া বহুদিন পলাতক ভাবে কলিকাতায় নাকি কোন জমিদারভবনে ছদ্মবেশে বাস করিতেছিলেন—পরে সেখানে ধৃত হইয়া কবিরপুরে আনীত হন। বিচানে তাঁহার আশংকা হইত। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ছড়াটি রচিত হইয়াছিল—প্রায় ৩০।৭০ বৎসর পূর্বে।

মাপিকরহের এই জমিদার-বংশ বেশ খ্যাতিমান এবং কীর্তিমান। এই মহিম বাবুবই পোষাপুত্র ৩৭শতাব্দীর একজন বদাম্ত ও উদারচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহিম বাবু স্বী ৩৭শতাব্দী করিমপুর সহর-বাসীদের পানীয়জলের হ্রিধা করণার্থে সহরতলীতে “Dhanamani Chaudhury Filtration” স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ইতি—

রাজশাহী কলেজ।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌষ সংক্রান্তি।

গত চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীহরেন্দ্র কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বরিশালের বাস্তুপূজার কয়েকটি ছড়া প্রকাশিত করিয়াছেন। কার্তিক বাবু নলিমা-পূজার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। আমরা বতদূর আনি নলিমাপূজা এবং বাস্তুপূজা অভিন্ন।* কার্তিকবাবু প্রকাশিত ছড়া বরেন্দ্রের ভিন্ন আরও ছড়া পৌষ-সংক্রান্তিতে বরিশালের গ্রামে গ্রামে গীত হয়; একব্যক্তির পক্ষে তাহার সকল জানা সম্ভব নহে। নিম্নে কয়েকটি ছড়া প্রদত্ত হইল,—

আয়বে নলিয়া।

অস্ত্রি (হস্তি) গোড়াব চড়িয়া।

অস্ত্রি গোড়াব কি কাজ করে।

রাভান মাখন (বেতন) খাইয়া লড়ে।

রাভার বাড়ী হাড়ার বাঁসা।

তা দেখা (দেখিয়া) ওড়ে হাঁসা।

হাঁসা ওড়ে দিয়া মোড়া।

পাহারা ওড়ে বস্ত্রি মোড়া।

ও গায়রা তরাসিয়া (জাসিত)।

লোহার (লোহার) বাইগন (বেগুন) তরাসিয়া।

লোহার বাইগন সরল পথে।

ভিন দেও আন্যা (আনিয়া) লক্ষীর আতে (হাতে)।

বাস্তুপূজা আরম্ভ হইবার পূর্বে কুবকগণ খোলা (পূজার স্থান) পবিত্র, ছড়াটি দিবা এবং সূর্য্য তুলিবার নিমিত্ত স্বর্গে হাড়িকে নিম্নলিখিত গান গাহিয়া আহ্বান করে।

স্বর্গে হাড়ি হাড়ি, হাড়ি রে।

মকে (মকে) লামিয়া (লামিয়া) খোলা চাঁচা (চাঁচিয়া) দে।

বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা খোলা চাঁচা দে।

স্বর্গে হাড়ি, হাড়ি, হাড়ি রে।

মকে লামিয়া ছড়াখাট দে।

বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ছড়াখাট দে।

স্বর্গে হাড়ি, হাড়ি, হাড়ি রে।

* বাস্তুপূজা ও নলিমাপূজা মূলতঃ এক হইলেও, উহাদের উৎস-প্রণালী এক নহে। নলিমাপূজার অগ্রীভূত বে অমুষ্ঠান হয়, বাস্তুপূজার তাহার সম্পূর্ণ অভাব। অথচ এই অগ্রীভূত নলিমাপূজা একতম প্রধান ভঙ্গ। এতদ্বারা অষ্টাষ্ট্র একটা বিবরণে উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

মকে লামিয়া সূর্য তুল্যা (তুলিয়া) দে।

বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা সূর্য তুল্যা দে।

আর একটি ছড়ার কিয়দংশ এইরূপ—

সোনা বালো (ভাল) না রূপা বালো।

এই ঘর হানি (খানি) ছাইছে বালো।

ঐ ঘর হানি ছোনে বোনে।

লক্ষী বইছেন (বসিবাছেন) চাইর (চারি) কোণে।

আইছেন লক্ষী দিহন (দেন) বর।

ধানে চাউলে বরক (ভরক) পব (ঘর)।

পৌষের শেষে বাধরপঞ্জের প্রতি গৃহ সোনার শস্ত্রে বধন করিয়া উঠে, তখন বরিশালের কুবকগণ প্রতি গৃহ হইতে ধান ভিক্ষা করিয়া বাধ-পূজার আয়োজন করে। এই পূজা উপলক্ষে বাধরপঞ্জ জিলার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছড়া গীত হয় স্তবরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকের চোঁপ ভিন্ন সকল ছড়া সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন।

দ্রষ্টব্য—পৌষ সংক্রান্তি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত লেখা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাই ক্রমশঃ অল্প অল্প তরিনা প্রকাশিত হইবে, আর নূতন লেখা গৃহীত হইবে ন।—
প্রবাসী-সম্পাদক।

বৈজ্ঞানিক সীতানাথ।

গত ১২৪৮ সনের ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বশোহরের অন্তর্গত রায়গ্রাম নামক প্রাচীন পল্লীর ঘোষবংশে সিরিধর ঘোষ মহাপ্রভুর ঔরসে এবং ৩৭শতাব্দীর গর্ভে সীতানাথ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকাল হইতেই সীতানাথের মস্তক অসাধারণিক বুদ্ধিমানের ছিল।

কিছুদিন ঐশ্বর্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া, সীতানাথ তাঁহার পিতৃ-দেবের চাকুরীস্থল নোয়াখালিতে গমন করেন এবং তত্রস্থ জিনিসপত্র ভণ্ডি হন। কিন্তু শীঘ্রই গীড়িত হইয়া পড়াতে পিতা সিরিধর ওহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেন। স্বদেশে প্রত্যাপননের পর সীতানাথ নজরুলেই স্থপতিজ্ঞ জমিদার বাবুদের ইংরাজি শুলে ভণ্ডি হন এবং সেই শুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার সম্মানেব সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ লাভ নাই আনিয়া এবং বাশ-কাল হইতেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের স্পৃহা থাকতে, তিনি ডাক্তারী পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, বারংবার বাত রোগে আক্রান্ত হওয়াতে, তিন কালেক্স পরিত্যাগ করিয়া রায়গ্রামে প্রত্যাপন করেন। রোগমুক্ত হইলে তিনি কিছুদিন আবুর্গের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন; কিন্তু কি কারণ তাহাও শীঘ্র ছাড়িয়া দেন।

সীতানাথ তৎপরে শুলের শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হন এবং গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কিছুদিনের জন্য চাকুরী করেন। যখন তিনি কলিকাতায় কট্টোলায় আধিসে কার্য করিতে, তখন এফসিস কাঞ্চালয়ে বাইবার পথে চাকুরীকণ দাস-বৃত্তির উপর যুগা হওয়া, সেই-দিনই কার্যে ইস্তফা দেন।

চাকুরী ত্যাগ করিয়া সীতানাথ বিদ্যাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন। কিছুদিন ‘হিন্দুপত্রিকা’ নামক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত নূতন মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিতে থাকেন। এই পত্রিকার

বিদ্যাৎ ও অন্ত্যস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে শ্রীত হইয়া শ্রীমদ্বর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ১৮৭২ সনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব প্রদান করেন।

ইহার একবৎসর পূর্বে ১৮৭১ সালে সীতানাথ National Societyর দুইটি সভায় বিদ্যাৎ সম্বন্ধে দুইটি গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।* এই বক্তৃতার পরে, তিনি ১৮৭২ সনে পত্রিকা সম্পাদন কালে উহার ৩৫১, ৩৫২ ও ৩৫৩ সংখ্যায় বিদ্যাৎ ও চুম্বকের গুণাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরবর্তী সনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ৩৬৫ সংখ্যায়ও অন্ত্য একটা প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলিতে সাধারণ পাঠকের মনোনিবেশার্থে চারিখানি চিত্র দেওয়া হয় কিন্তু সাধারণ পাঠক এই প্রবন্ধগুলির উৎসাহ না পাইলেও শ্রীমদ্বর্ষি ও মনীষিগণ এইসকল প্রবন্ধ পাঠে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

সম্পাদকতা করিতে কবিত্তে হঠাৎ তিনি বিমরীচিকা বোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। আরোগ্য লাভ কবিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একটা দাঁতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বলা যাইতে পারে, যে সীতানাথ অর্থবান ছিলেন না কিন্তু পবের ক্লেম মোচনের জন্ত তিনি সদাশ্রম্যই চেষ্টা করিতেন এবং এই জন্তই তিনি স্বপ্নপ্রসূ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্বর্ষি তাঁহাকে ৭০০০ টাকা দিয়া সাহায্য করেন, এ সম্বাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর তাঁহার “পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনকৃতি” নামক প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮) উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময় সীতানাথ একটা নূতন ধরণের বস্ত্রবন্ধনের কল আবিষ্কার করেন। তৎকালে এই কল বখেট খ্যাতিও অর্জন করিয়াছিল; এমন কি বেথিয়ার মহারাজ সাহেবও অর্ধ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই কল ধরিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সীতানাথ বিক্রয়ও করিলেন না কিন্তু অর্থাভাবে উহা চালাইতেও পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে সীতানাথ গম হূর্ণ করিবার নূতন ধরণের একটা কল ও পরে কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করেন। শেষোক্ত কলে, একটা মাত্র গো-সাহায্যে লাঙ্গল ঘরা অসি

* “In summer of the year 1871, being requested by some of my friends, I delivered two successive addresses at the National Society's meeting in the Calcutta Training Academy's Hall on the ideas I conceived about the electrical and magnetical importance of the said practices.”—*Medical Magnetism* by S. N. Ghosh.

† “The Essays were illustrated by four engraved plates viz. (1) A temple with an iron *Trisul*; (2) A naked man with a long trifurcated iron bar in his right hand and a buffalo-horn bugle on his left shoulder, making in fact, the picture of a *Silary* or hailstone preventer; (3) An asthmatic patient with a *manduli*; (4) A man lying down on the surface of the northern sphere of the earth with his head placed southward. The singularity of the explanations combined with the oddness of the plates, excited, as I learnt, laughter and ridicule among the ordinary readers and applause and admiration mingled with doubts among the more intelligent class of readers.”

চাব হইত। একখানি কলের নোকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লিখিত-বার এবং মুদ্রাবস্ত্রের জন্তও কয়েক প্রকার কালি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বাল্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় মহাশয়কে এই কালি প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শিক্ষা দেন। আজকাল A. L. Royর কালির বাজারে বেশ নাম আছে এবং রায় মহাশয় কালি বিক্রয় করিয়া বখেট অর্থো-পার্জনও করিয়াছেন; কিন্তু প্রস্তুতকারক ইচ্ছা করিয়াই উহাকে লাভেব ব্যবসায়ে পরিণত করেন নাই। সীতানাথের অকালমৃত্যুতে তাঁহার উদ্ভাবিত অন্ত্য বস্ত্রগুলির দ্বারা দেশ ও দেশবাসীর কোনই উপকার হয় নাই। সীতানাথের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক মাছলি বিক্রয় করিয়া ব্রহ্মমোহন কর (Late B. M. Kerr) মহাশয়ও বখেট খ্যাতি ও অলোভ করিয়াছিলেন।

নিজ গ্রামের উন্নতিকল্পে সীতানাথ প্রভুত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সীতানাথই গ্রামে মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়, লাইব্রেরী এবং পোস্টাফিস স্থাপিত করেন। স্কুলটিকে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ অকালে বিদ্যায়মে গমন না করিলে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন। সীতানাথেরই উদ্ভোগে বাঘগ্রামে কৃষি ও শিল্প প্রশ্রয় হইত। মেলায়ালে তিনি ভাটিখানা খুলিতে বা বেড়াদেয় আসিতে বা থাকিতে দিতেন না। এক সময়ে কয়েকজন বেজা মেলায়ালে থাকিবাব জন্ত তাঁহাব নিকট দরবার ও এক সহস্র মুদ্রা প্রণামী বাবদ দিবার প্রার্থনা করে। সীতানাথ ঘৃণাতরে তাহাদেব ‘মোক্তারকে দূরীভূত করেন। বর্তমানে অপব সকল স্থানের প্রশ্রয়দায়ী উদ্যোগগণ সীতানাথের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিলে অনেক উপকার হইবে সম্ভব নাই। যখন এই প্রশ্রয়ী খোলা হইত, তখন নদীর বাট হইতে প্রশ্রয়ী কার্যালয়ে সীতানাথ টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেন। খ্যাতিনামা ব্যক্তিগণ ঘাটে উপস্থিত হইলেই কার্যালয়ে সর্বাঙ্গ হাইত এবং উপস্থিত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়ের সম্মান করিতেন। সীতানাথ একাই এ সকল কার্য নির্বাহ ও তত্ত্বাবধান করিতেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীমদ্বর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সীতানাথকে বখেট মেহ করিতেন। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রারম্ভাবের কাল। সীতানাথ শ্রীমদ্বর্ষির সংসর্গে থাকিবা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিলেন। যখন গ্রামে প্রশ্রয়ী হইত, তখন সীতানাথ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। সীতানাথেরই বস্ত্রে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় রায়গ্রামে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছিলেন।

সীতানাথ ১২৯০ বঙ্গাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সাত দিবস পূর্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার আর অধিক সময় নাই। হৃদপিণ্ডেব ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ার তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সীতানাথ Magnetic Healer নামক যে বস্ত্র আবিষ্কার করিয়া বেশ মধ্যে এসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আমরা সেই বস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠকগণের নিকট হইতে বিচার গ্রহণ করিব। সীতানাথ “Medical Magnetism” নামক যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই দুঃখাপ্য গ্রন্থ হইতে আমরা এইসকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

কোন শিশুকে উত্তরাস্ত করিয়া শয়ন করাইলেই, সীতানাথের মাতা গৃহের বধূগণকে তিরস্কার করিতেন! সীতানাথ প্রথমতঃ এ প্রথা দেশাচার বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু কিয়দ্বিবস পরে আফিকত্তবে নিমোদিত দুইটি লোক দেখিতে পাইলেন—

প্রথম স্বর্গহঃ প্রাক্শিরাঃ খেতে
আয়ুরো দক্ষিণা শিবাঃ,
প্রত্যেক শিরাঃ প্রবাসে ভু,
ন কদাচিছুদক শিরাঃ।

অর্থাৎ স্বর্গহে পূর্ব দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা বাইবে, কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিবে। প্রবাসে পশ্চিমে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা বাইতে পারা যায়। কিন্তু কদাপি উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা বাইবে না।

দ্বিতীয়— প্রাক্ শিবাঃ শরনে বিভাৎ,
বলমায়ুশ্চ দক্ষিণে,
পশ্চিমে প্রবলাং চিত্তাং,
হানিঃ মুকুয়াশোভবে।

অর্থাৎ পূর্ব দিকে মস্তক রাখিয়া শরন করিলে মনুষ্য জ্ঞানী হয়, দক্ষিণে রাখিলে মনবান ও দীর্ঘজীবী হয়, পশ্চিমে রাখিলে চিন্তিতা হয় এবং উত্তর দিকে রাখিলে মুক্ত আনন্দন করে।

সীতানাথ পনে বিষ্ণুপূরণেও উপরুক্ত বর্ণের একটি স্লোক পাওয়াইলেন, যথা—

প্রাচ্যঃ দিশি শিরঃ শতঃ,
বাম্যাম্মম্বা নৃপ,
সংঘেব স্বপতঃ পুংসঃ,
বিপরীতস্ত রোগদঃ।

অর্থাৎ হে রাজন, পূর্ব বা দক্ষিণে মস্তক জড় করিয়া শরনই প্রশস্ত। যে ব্যক্তি অপর দিকে মস্তক জড় রাখিয়া শরন করে, সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

সীতানাথ অনেক চিন্তাব পর স্থির করিলেন, যে, শাস্ত্রকারগণ বিদ্যা ও চূষকের গুণ অবগত থাকাতাই এইসকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এবং এই কারণেই তাঁহারা মন্দিরাদির দীর্ঘদেশে ত্রিশূল স্থাপনের ব্যবস্থা দিরাছিলেন।

যাহা হউক, অনুরক্ত হইয়া ১৮৯১ সনে তিনি দুইটা বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপরে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা কালে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ কবী লেখেন। নানারূপ প্রক্রিয়া অন্তে তিনি স্থির করিলেন যে মনুষ্য-শরীরেও চূষকের গুণ আছে* এবং চূষক ও বিদ্যুতের ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্যশরীর হস্ত ও নীবোপ রাখা বাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮০ সনে তিনি ৫৫নং বাহুরাবাজার স্ট্রীটে চিকিৎসাপার স্থাপন করেন এবং বিলাত হইতে ৬০০০ ফুট তাপনির্মিত (insulated) ‘অপরিচালক’ তার আনয়ন করেন। এবং একটি Magnetic Healer যন্ত্র প্রস্তুত করেন। কাঠের ফ্রেমের উপর এই ১৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট তার চারিবার জড়ান হয়। এই তারের দুই প্রান্ত ফ্রেমের পিতলের ইজুপের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ফ্রেমের অভ্যন্তরে পাটী (মাদুর) বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং ফ্রেমের বহির্দেশে তারের উপর চট, মোমজাম ও চর্কের আবরণী দেওয়া হয়। যন্ত্রটি ২৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং দুই পার্শ্বের পরিধি ১০ ও ২৪ ইঞ্চি। সীতানাথ পরে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ আকারের কতক একটি যন্ত্রও নির্মাণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত যন্ত্রটি ৪ ফুট দীর্ঘ এবং উহার দুই পার্শ্বের পরিধি ১৪ ও ২১ ইঞ্চি ছিল। দশ সহস্র ফুট তার দিয়া ইহা জড়ান হইয়াছিল। যন্ত্র পিতলের ইজুপের সহিত গ্যালভানিক ব্যাটারীর (Galvanic battery) তার

দুইটা যোগ করিয়া দিলে, যন্ত্রটি চূষকশক্তি লাভ করে। এই বস্তু মনুষ্য রোগীকে শরন করান হইত। উদ্দেশ্য যে যন্ত্রমধ্যস্থ রোগীর শরীরে তাড়িত-প্রবাহ কার্য করিবে। সীতানাথ বলিয়াছেন যে এই প্রকারে রোগীকে চিকিৎসা করিলে সকল রোগ আরোগ্য করান বাইতে পারে।*

ব্যাটারীর ‘ধনপ্রান্ত’ ও ‘ঋণপ্রান্ত’ তাড়িত তার যন্ত্রে যে ভাবে ভোগ করিয়া দেওয়া হইত তাহাতে রোগীর মস্তক দক্ষিণ দিকে থাকিলে রোগ উপশম হইত, কিন্তু তাহাব ব্যতিক্রম করিলেই রোগ বৃদ্ধি পাইত। ইহাব কারণ অল্প কিছুই নহে। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ ধরিতে গেলে মনুষ্যের মস্তক উত্তরমেরু এবং হস্তপাদ দক্ষিণমেরু বলিয়া পরিগণিত করা বাইতে পারে। এ অল্প ব্যাটারীর তার ধনপ্রান্তের দিকে ঋণপ্রান্ত ও ঋণপ্রান্তের দিকে ধনপ্রান্ত যোগ করিয়া দিলে স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিরেক হইত এবং সে ক্ষণে রোগী আরও যতনা ভোগ করিত।

সীতানাথের যে পুস্তকখানি কথ্য আমবা কবেকবার উল্লেখ করিয়াছি উহাতে তিনি আর দুই শত রোগীর চিকিৎসার কথ্য উল্লেখ করিয়াছেন। মাত্র দুই বৎসরের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে; এই তালিকা দুইটে ‘স্টাই’ প্রতীকমান হয় যে সীতানাথ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে আরও অনেক লোকের উপকার করিতে পারিতেন। ঈশ্বরহর্ষি সীতানাথকে চিনিরাছিলেন, তাই তাঁহাকে অমানবদনে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

কবিজননী ও বীরজননী বশোহর তাঁহার হৃদয়নকে অকালে কালের কোড়ে দিয়া যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহা নিবারণের আর কোনই উপায় নাই। আমাদের আবার এমন দেশ যে আমরা “পিত্ত থাকিতে দাঁতের মর্দ্যাদা বৃদ্ধি না।” ঈশ্বরহর্ষির ভ্রাতৃ বধি আরও স্বেহ কেহ সীতানাথকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, সীতানাথও বর্তমান বঙ্গ-সৌরব বৈজ্ঞানিকদিগের ভ্রাতৃ সমাজপংকে সম্বন্ধিত না কবিতো পারিতেন?

ঐবোধীন্দ্রনাথ সমাদান।

সমুদ্র-প্রেম

হুলাও হুলাও মোরে।
বিশ্বজননি, আবাব পরাণ ভরে’,
হুলাও হুলাও মোবে।
লাখে বাহু দিয়ে কল্লোল তানে,
মেহবাণী ফিবে বাজাইয়ে কানে,
বহু দিবসের ছিন্ন মালিকা
বেঁধে দিয়ে নব ডোবে,
হুলাও হুলাও মোরে।

* It has been found by experiments that the human body is a magnetizable object, though far inferior to iron or steel.—Medical Magnetism, p. 17.

* “Every description of indisposition known or unknown, felt or sighted by the patient, is partially or entirely removed, as it is slight or serious,”

২

তোমার দোনার সুখ

ভুলিয়া গিয়াছি, তাই স্নেহময়ি,

প্রেম ভবা নহে বুক।

জীবন মরণ সীমা বাধা তাই,

যেই জলে' উঠি, সেই নিভে বাই,

তুমি ধরে' তোল—দেখিবারে দাও

তোমার প্রসাদ-মুখ,

সসীম হইতে অসীম পুলকে

ভরে' দাও মোর বুক।

শ্রীকুমুদনাথ শাহিড়ী।

কষ্টিপাথর

ভারতী (বৈশাখ)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী—

পরমানন্দ সাংসারিক হইতে ধর্মের তত্ত্ব ধাঁহারা লাভ করেন তাঁহারা ইহা। ইহা দেব ধর্ম লোকাচারে নহে, শাস্ত্রাদেশে নহে, গুরু-উপদেশে নহে, কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকালে। দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা তাঁহার ধর্মবিশ্বের অপর অঙ্গ। তাঁহার পিতামহীমৃত্যুর পর শ্রমশান-দুস্ত দেখিয়া তাঁহার মনে বিষয়ের অসাবতা ও অনিত্যতা জাগিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে যে আনন্দবার্তা তিনি পাইলেন তাহাতে তিনি তদন্ত হইয়া গিয়াছিলেন; যখন এই আনন্দময়তা হইতে ভ্রষ্ট হইতেন তখন যে বিবাদ অনুভব করিতেন তাহা এমনি তীব্র যে রোজ কক্ষবর্ণ দেখাইত। এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার তাঁহার প্রথম মৌলিকতা। ব্যাকুল চিন্তে ধর্মসাধন আরম্ভ করিয়া তিনি কোনও গুরু শরণাপন্ন হইলেন না, সাধননিষ্ঠা ও বাৎসল্য তাঁহার দ্বিতীয় মৌলিকতা। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার যুগে বঙ্গসমাজ যখন পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত সেই সময়েও তাঁহার দৃষ্টি স্বদেশ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই, তিনি ধর্মসাধনের অস্ত্র উপনিষদের ধর্মবিশ্বের শরণাপন্ন হইলেন। ইহাই তাঁহার তৃতীয় মৌলিকতা। তিনি উপনিষদের শরণাপন্ন হইয়া জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়াও উপনিষদের অমৈতবাদ গ্রহণ করিলেন না; জ্ঞানার্হুণ্ডা ভক্তিতে স্নেহভিত্তিক থাকিলেন। উপনিষদের সহিত হাফেজ ও বাবা নানক প্রভৃতি সকল দেশের সকল কালের মহাপুরুষদিগের উক্তিভেদে তাঁহার সমান পুলক ও ভাবাবেশ হইত। ইহা তাঁহার চতুর্থ মৌলিকতা। সমাজবিমুখতা আমাদের দেশের প্রাচীন জ্ঞানমার্গের একটি প্রধান লক্ষণ। তিনি জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী হইয়াও সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া বীর জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্তব্যের সমন্বয় করিয়া পঞ্চম মৌলিকতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি ভাবোচ্ছ্বাস রাজ ছিল না; ভাবুকতা ভক্তি নহে; ভাবুকতা কবিক, তাহাতে স্রোতার তাঁটা আছে, কিন্তু ভক্তি অবিচলিত; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি জ্ঞানপ্রসূত। এই তাঁহার ষষ্ঠ মৌলিকতা। তাঁহার ভক্তি যে নীতি উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা লৌকিক মতামতের অপেক্ষা রাখিত না; তাঁহার নীতি ছিল

পারমার্থিক; ইহাই তাঁহার সপ্তম মৌলিকতা। ধর্মসাধনে নিমগ্ন ব্যক্তি-গণ জগতের সৌন্দর্য ও মানবজীবনের সুখসুখের প্রতি, প্রায়ই উদাসীন হইয়া পড়েন; মহর্ষির ভক্তি জগৎকে ও মানবকে তাঁহার নিকট হৃদয় ও মনোরম করিয়া দিয়াছিল। ইহা তাঁহার অষ্টম মৌলিকতা। তাঁহার প্রধান মৌলিকতা ছিল এই যে ধর্ম তাঁহার সাধনের সামগ্রী ছিল, প্রদর্শনের সামগ্রী নহে; এতদ্ব্যতীত গুরু বসন প্রভৃতি ধার্মিকের তেজ তাঁহার ছিল না। লোকে কি চাষ তাহা না দেখিয়া ঈশ্বর কি চান তিনি তাহাই দেখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইসকল কারণে আধুনিক যুগের ধর্মসাধকদিগের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।

মহাকবি দণ্ডী—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল—

দণ্ডী বাণ্মীকি ও ব্যাসের পরেই সম্মানিত। তিনি তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিবা প্রমাণ পাওয়া যায়; কাব্যাদর্শ ও দশকুমারচরিত নামক গ্রন্থের এখনো প্রচলিত আছে; তাঁহার তৃতীয় ও অন্ত্য লুপ্ত গ্রন্থের নাম খুব সম্ভব ছন্দোবিচিত্তি। যুবোপায় পণ্ডিতদের মত যে তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক; কিন্তু তাঁহাদের প্রমাণ প্রাপ্ত বলিয়া দেখা যাইতেছে।

শারীর-স্বাস্থ্য-বিধান—শ্রীচুণীলাল বসু—

শরীর ধর্মসাধনের আদি উপায়, অতএব স্বাস্থ্যবিধি পালন ধর্মাসম্মত। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রধান সুখভাস প্রাপ্তকথান। প্রত্যবে উঠিয়া মুখ হাত দুইয়াক্ষীত জল পান করিয়া ভ্রমণ করিলে শরীর ও মন সুস্থ হয়। ধাঁহারা প্রত্যবে উঠেন তাঁহারা এক হিসাবে ধাঁহারা বেলায় উঠেন তাঁহাদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। শুধু যে প্রাতঃপ্রণামকারী ব্যক্তি অধিক দিন জীবিত থাকেন তাহাই নহে, প্রত্যহ দেড় গন্টা অতিরিক্ত সময়ের সব্যবহার করিবার সুবিধা পান বলিয়া তিনি প্রতিমাসে দুই দিন, সম্বৎসবে ২৪ দিন এবং ৭০ বৎসর জীবনের সীমা ধরিলে ৫ বৎসর অধিক জীবন ভোগ করিতে সমর্থ হন। সুতরাং প্রাতঃপ্রণাম অবহেলার বিষয় নহে।

গণনাপদ্ধতির মূল সংখ্যা—শ্রীশচন্দ্র সিংহ—

সংখ্যাপ্রণালীর অষ্ট নানাদেশে নানাক্রম পদ্ধতি প্রচলিত। প্রত্যেক গণনাপদ্ধতিতে একটি সংখ্যা মূলরূপে গণ্য হয়। বহু জাতির মধ্যে দশমিক গণনাপদ্ধতি প্রচলিত। মাগুদের গণনার সাধন হস্তাকুলি; দশমিক হইতেই দশমিক প্রথার প্রচলন হইয়া থাকিবে। অনেক জাতি আবার ১২ মূল সংখ্যা ধরিয়া গণনা করে; ২, ৩, ৪, ৫, ৬ প্রভৃতি প্রধান ভগ্নাংশগুলি ১২ দ্বারা বিভাজ্য বলিয়া এই দশমিক গণনা পদ্ধতি অনেক সুবিধাজনক মনে কবে; যুবোপে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভ্রম, প্রোঁস প্রভৃতি গণনা এই দশমিক গণনাই প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাচীন রোমক জাতি হইতে আধুনিক টিউটন জাতি পর্যন্ত সকলেই এই দশমিক গণনার পক্ষপাতী। আফ্রিকা জাতি ১২ পর্যন্ত গণিত পাবে, তদুর্দ্ধ গণনা ১২ এক, ১২ দুই, ১২ তিন ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত কবে। শিশুর বেশে জরিপ কার্যে ২ মূল সংখ্যা রূপে ব্যবহৃত হইত। ইংরেজি ভাষায় Couple, brace, pair ও আমাদের ভাষায় জোড়া জুড়ি প্রভৃতি শব্দ ইহার অন্তর্ভুক্ত। চীনদেশেও এই বিমূলক গণনার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় জিঙ্গু (Xingu) প্রদেশে বাকারাইবি জাতি মাত্র ছয় পর্যন্ত গণিতে পারে; তাহারা ৫-২=২; ৫-২=২+১, ৬-২=২+২ এই ভাবে ব্যক্ত করে। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক অসভ্য জাতিও এইরূপ গণনা করে। কলো-রৈডোর কুচাউস জাতির মধ্যে জিম্বুলক গণনার প্রচলন, ইহার

৩=২×৩, ২=৩×২ এই ভাবে ব্যক্ত কবে; ইহাদের মধ্যে চতুর্ভুজক গণনাও প্রচলন দেখা যায়, ৮ প্রকাশ করিতে হইলে ২×৪ দ্বারা প্রকাশ করে। দক্ষিণ আমেরিকার লুনাট্টিন্বে, এণ্ডি পলিনেশীয় জাতি ৪ পর্যন্ত সংখ্যাব্যাক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে; তদুচ্চ সংখ্যা ৪+১, ৪+২ ইত্যাদি রূপে ব্যক্ত করে। এণ্ডি-পলিনেশীয় জাতি ৮ সংখ্যাব্যাক একটি শব্দ ব্যবহার করে বাহার জুর্জ ২×৪। ওকালসোরান জাতি ১৮কে দ্বিগু-স (২×৯) বলিয়া প্রকাশ করে। ব্রোনেরা ১৮কে ট্রানসে (৩×৬) বলিয়া প্রকাশ করে। পশ্চিম আফ্রিকার বোলান জাতির মধ্যে ৬ মূল সংখ্যা। নিউজিল্যান্ডের মাওরি জাতির মধ্যে একাদশক গণনাপদ্ধতির প্রচলন। ১১ পর্যন্ত অত্যন্ত সংখ্যার দ্রুত পৃথক পৃথক শব্দ আছে; তদুচ্চ কোন সংখ্যা ১১ এক, ১১ দুই—ইত্যাদিরূপে ব্যক্ত করে। বাবিলোনিয়ানদের মধ্যে ৬০ মূল সংখ্যা; বোধ হয় এই দুটাদের অনুসরণে আধুনিক জ্যোতিষজ্ঞানে এই গণনাপদ্ধতি প্রচলিত। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেসকল জাতির গণনার সংখ্যা পাঁচের বেশি তাহার গণনাপদ্ধতিতে আরই ৫, ১০, অথবা ২০ মূল সংখ্যা রূপে ব্যবহার করে। অনেক অসভ্য জাতি ৫ সংখ্যা “একহাত”, “হাতের শেষ” বা “হাত” বলিয়া প্রকাশ করে; সেইরূপ ৬, ৭, ৮, ৯ যথাক্রমে “হাত এক”, “হাত দুই”, “হাত তিন” বলিয়া ব্যক্ত করে; ১০ “দুইহাত”; দশ গণনা করিয়া হাতের অঙ্গুলি শেষ হইয়া গেলে পায়ের অঙ্গুলির বা অপরের হস্তাঙ্গুলির পরগণন হয়। ১১=পায়ের এক; ২০=এক মানুষ। এই ভাবে অনেক জাতি ১০০ পর্যন্ত গণনা করিয়া থাকে; ৪০, ৬০, ৮০, ১০০ যথাক্রমে ২ মানুষ, ৩ মানুষ, ৪ মানুষ, ৫ মানুষ। পঞ্চমূলক গণনারীতি সাইরিবাসী, কাম্বাটকবাসী, আলিউট জাতি, নিউ হেরিডিসবাসী, আফ্রিকার ওলোক জাতি, কাহুরি, টেমনি, আইকিক, ফিইরাই, কি-নিয়াসা প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত। দিছু, কুলাবি ও পিগমি জাতির মধ্যে পঞ্চক ও দশক উভয় রীতিই প্রচলিত। অষ্ট্রেলেশীয় ও পলিনেশীয় দ্বীপবাসীদের মধ্যে পঞ্চক-পদ্ধতির প্রচলন। এক্সিমে ও আমেরিকার অনেক জাতির মধ্যেও ৫ মূল সংখ্যা। অনেক জাতি সমস্ত বিকাশের সঙ্গে ৭ ছাড়া ১০ মূল সংখ্যা করিয়াছে তাহার পরিচয় তাহাদের ভাষায় পাওয়া যায়। হোমসের সময় গ্রীকদের মধ্যে পঞ্চকগণনার পরিচয় পাওয়া যায়; সেইরূপ রোমকদের মধ্যেও। বিদ্রোহ পঞ্চকপদ্ধতি কোনো জাতি অবলম্বন করে নাই, পঞ্চকের সহিত দশক বা বিংশক রীতি মিশ্রিত রাখিয়াছে। আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক জাতির মধ্যে বিংশক-গণনাপদ্ধতি দেখা যায়, তবে ইহা পঞ্চক ও দশক প্রকার সহিত মিশ্রিত। আকটেক, বোগোটের সুইসাস ও উত্তর স্পেনের বাক্স জাতি দশক প্রকার সহিত বিংশকপদ্ধতি ব্যবহার করে। উত্তর সাইবেরিয়ার আইনাস ও অনেক ককেসীয় জাতির গণনা-বিংশকপদ্ধতিতে। ফিনিশীরা ও কার্বেলবাসীর নসর্গে পশ্চিম যুরোপের অনেক কেল্টিক জাতির মধ্যে বিংশকপদ্ধতি চলিত; ব্রোনেবা Unnek ha tringent অর্থাৎ এগার এবং তিনকুডি বলিয়া ৭১ প্রকাশ কবে; ফরাসীরা quatre vingt বা ৪ কুডি বলিয়া ৮০ প্রকাশ কবে; ওয়েলশ, গেলিক মান্দ্র প্রভৃতি কেল্টিক জাতির ভাষাতে এই বিংশক গণনার বিবর্তন আছে। আশাশুনি দেশের অশিক্ষিত লোকেরা এককুডি দুকুডি, ত্রুকুডি সাত বলিয়া থাকে; অনেক সামগ্রী কুডি ধরনে বিক্রয় হয়, অনেক সামগ্রী ৫ কুডি অর্থাৎ ৫০ খরদ্বি বিক্রয় হয়, অনেক সময় এই ১০০ নয়, ১২০। ইংলণ্ডেও এক কালে Long hundred বা Great hundred বলিলে ১২০ বুঝাইত। ইংরেজি Score শব্দটি বিংশতি-মূলক সম্বন্ধে দশমিক গণনার প্রচলন। অনেক অসভ্য দেশেও

দশমিক গণনা দেখা যায়। শূন্য-পূর্ণ দশমিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা এই ভারতবর্ষ। অনেক জাতির মধ্যে একগুণ গণনাপদ্ধতি দেখা যায় যেখানে কোনো মূলসংখ্যা নাই; সংখ্যাগুলির পরস্পরের মধ্যে সেরূপ কোন সম্পর্কও নাই, অত্যন্ত সংখ্যাই স্বতন্ত্র। এরূপ গণনারীতি বিরল।

লেখক এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে একটি নিম্ন ছাড়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পূরণ করিয়া দিতেছি। অনেক দেশে টাকা পরমা গণনা করে দুই দুই বা চার চার করিয়া; অনেক যুরোপীয় ও মাদ্রাজী তিন তিন করিয়া গণনা করে। অনেক জিনিষ গণনা হয় গণা হিসাবে—সে গণা কখনো চারটিতে কখনো বা পাঁচটিতে।

নীল ভূধর—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়—

পুরী শহরের মধ্যস্থলে যে উচ্চ ভূমির উপর জগন্নাথের মহানন্দিত প্রতিষ্ঠিত তাহার উচ্চতা ২০ ফুট হইলেও তাহার নাম নীল ভূধর রাজা অনন্তদেব ১১১৯ শকে এই মন্দির নির্মাণ করেন; (বিস্তৃত এ সম্বন্ধে মন্তব্য দৃষ্ট হয়)। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হয় ১৪ বৎসর সময় ও ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মন্দির-বেষ্টন প্রাচীর দৈর্ঘ্য ৬৫২ ফুট, প্রস্থ ৬০০ ফুট, ও উচ্চতা ২০ ফুট। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে ছোট বড় ১২০টি মন্দির আছে। চারিদিকে চারিটি তোরণ। উত্তর তোরণে হস্তীপৃষ্ঠে বাহত গঠিত আছে, আকাব ৫ ফুট, ইহার নাম হস্তিধার। দক্ষিণ তোরণে ঘোড়া আছে, তাহার নাম অম্বধারি। পূর্ব তোরণে সিংহ আছে, তাহার নাম সিংহধার এই তোরণটি কাংকারণের মন্দির। পশ্চিম তোরণে কোনো মূর্তি নাই, তাহার নাম শাশ্বাধার। মন্দিরের বেষ্টনী ছুটি। ভোগমণ্ডপ পর্যন্ত ধরিয়া সমস্ত মন্দিরের অঞ্চল বিস্তার প্রায় ৩০০ ফুট। মন্দিরে তিনটি প্রকাণ্ড কুলঙ্গী আছে, তাহার পশ্চিমবেষ্টিতে নুসিংহ, উত্তরে বমন ও দক্ষিণে বরাহ মূর্তি আছে। মন্দিরদ্বারে অনেক মূর্তি খোদিত, তাহদের অধিকাংশই অন্নীল। জগন্নাথের দিকে দরবার সমুদ্রেই মার্কেল গঠিত রত্নবেদীর উপর ত্রিমূর্তি বিরাজমান। মন্দিরের উচ্চতা ২০০ ফুট। মূলমন্দিরের সম্বন্ধিত নাট্যমন্দির, ভোগমণ্ডপ প্রভৃতি। অন্যান্য মন্দিরের নবগ্রহ মূর্তি মহারাষ্ট্রগণ আনিয়া এখানে সংলগ্ন করিয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় (১৫০৪-৩২) মন্দির প্রথম মেরামত হইল। ১৬৪৭ সালে নুসিংহদেব পুনরায় মেরামত করেন। মূলমন্দির অন্তঃপ্রাচীরের পর কুকদেব (১৭১৬-১৮) দেবালয় সংস্থাপন করেন। ৫০ বৎসর পরে বীরকেশব দেবের পত্নী মেরামত করেন। অসাধনের এলোপে মন্দিরের আদিম শিল্পসৌন্দর্য্য ক্রটিগ্রস্ত হইয়াছে। অল্প ভ্রমটিও কনারক হইতে আনা; ইহার মূলের পরিধি ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি; সমগ্র স্তম্ভটি ৩০ ফুট ৮ ইঞ্চি; স্তম্ভের মাথার বানরের মূর্তি; স্তম্ভটি সর্বাসিদ্ধা হইলেও যক্ষ্মার শ্রীসম্পন্ন। নবপ্রস্তাভা ও বা চন্দনসরোবর স্ত্রী নরেন্দ্র মহাপাত্র কর্তৃক নির্মিত প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, চারিদিকে বাঁধাঘাট, মধ্যস্থলে কুন্ডিন ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; পুরীর অপর দুই বিখ্যাত বৃহৎ পুষ্করিণীর নাম ইন্দ্রদ্বার ও মার্কেলের সর্বোবর; এ দুটিরও চারিদিকে বাঁধা ঘাট। পুরীর নিকটে আশারনালা নামক সেতু, জগন্নাথের ঐশ্বর্য্য প্রস্তাবিত বা গুণ্ডিচাপদ, বেকটাচাঁদীর মঠ, শঙ্করাচার্যের মঠ, প্রভৃতি চর্চনীয়। জগন্নাথদেবের রথের মাপ প্রস্থ ৩৫ ফুট ও উচ্চতা ৪৮ ফুট, ১৬ ধনি চাকা, বক্র ৭ ফুট; হস্তপ্রা ও বলরামের রথ তদপেক্ষা ছোট। মন্দির প্রধানকার জগন্নাথ ঠাকুর, তাহার ভায়ে বসিলে জগন্নাথকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

কোহিনুর (কাল্পনিক)

বাক্সালী জীবনে কোল ও মুসলমান প্রভাব—

শ্রীমোহনদাস শতীদ্রাক্ষ—

বঙ্গ নামটি আমরা বাংলার আদিম অধিবাসীর নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও মরমনসিংহের প্রান্তে বং নামক অসভ্য জাতি বাস করিতেছে; বোধ হয় এক সময়ে তাহারা সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত ছিল, পরে বিতাড়িত হইয়া পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে।

বাক্সালার পশ্চিম ও পশ্চিম-উত্তর কোণে কোল ও সাওতাল-গণের বাস; তাহাদের নিকট হইতেও অনেক ক্রয় বাক্সালী পাইয়াছে। কদলী (মুন্ডারি, কালা), মারিকেল (মু—মরিরব) ও মধুর (মু—মর) সংস্কৃতের আশ্রয়ে ভাবায় প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ‘পুসি’ কোলদিগেরই। নৌকার প্রচলন মিলিত আৰ্য্যগণের সময় হইতেই আছে। সংস্কৃত—নৌ, আভেদিক—নাভি, গ্রীক—নৌস (neus), লাতিন—নাবিস (navis), প্রাচীন উচ্চমধ্যযুগ—নাকো (nacho), কেটিক—নৌ (nau)। কিন্তু ‘ভোজার’ (মু—ভোজা) ব্যবহার আমরা কোলদিগের নিকট শিখিয়াছি। ‘লড়াই’ শব্দ কোলদিগের। প্রাচীনকালে বর্ষ শরীরে বেষ্টিত হইত (বৃ—বাতু আবরণ অর্থে) কিন্তু হাতে করিয়া লড়াইবার ‘চাল’ আমরা কোলদিগের নিকট হইতে লইয়াছি। আৰ্য্যদিগের চূর্ণ চূর্ণ হানে নির্মিত হইত। কিন্তু ‘গড়’ নির্মাণ প্রাণী কোলদিগের নিকট হইতে শেখা। হিন্দুব প্রাচীন গৃহস্থালির জিনিস উৎখলি (সং—উৎখল); এখনও তাহাই বাক্সালার বাহিরে প্রচলিত। বাক্সালী কিন্তু উৎখলি ছাড়াই অসভ্যদিগের নিকট হইতে ‘চেকি’ (মু—ডিকি) গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমানের সর্বাপেক্ষা মহৎ দান ‘হিন্দু’ এই নাম। আত্মরক্ষণ চণ্ডাল আৰ্য্য-অনার্য্য—ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মপ্রাপ্ত সকলের ‘হিন্দু’ এই এক আখ্যা প্রদান করিয়া মুসলমান হিন্দুর জাতীয়তা গঠনে সাহায্য করিয়াছেন।

এতদ্বির জীবনযাত্রার অনেক ক্রয়ের নাম ও ব্যবহার বাক্সালী মুসলমানের নিকট শিখিয়াছে তাহার প্রমাণের অসম্ভাব নাই।

বিস্তান (মার্চ)—

নক্ষত্রের সংখ্যা গণনা—

খালি চোখে একেবারে আকাশে যতগুলি নক্ষত্র দেখা যায় তাহা ২৭০ হাজারের বেশী নহে। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্বে জ্যোতির্বিদ্য-দিগের ধারণা ছিল যে নক্ষত্রের সংখ্যা ঐ রকমই; ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে টাইকো বাহির নক্ষত্রচিহ্নে ১০০০টি নক্ষত্র নির্দেশিত হইয়াছিল। গ্যালিলিও যে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করেন তাহা আধুনিক অপেরা গ্লাস বা বাইনকুলার সর্বশ্রেষ্ঠ; তাহা দ্বারা এক লক্ষ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়। পরে ক্রমের উন্নতি হওয়াতে এখন নক্ষত্র অগণ্য হইয়াছে বলিলেও চলে। আমেরিকার লিক-দূরবীক্ষণ দ্বারা ১০ কোটি নক্ষত্র দেখা যায়; ইয়াকিন্স, লর্ড রোজ, ও বেলগোবর্ন দূরবীক্ষণে আবার অধিক সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়; সেগুলি আকাশে সূর্য সন্ধ্যা বা তাহাদের তুলনায় সূর্যও নগণ্য। নক্ষত্রের অবস্থিতির স্থান নিরূপণ জন্য জ্যোতির্বিদদের মধ্যে মধ্যে চিত্র অঙ্কিত করেন। হিপারকাস কৃত (১৬০ পৃঃ ৭ঃ) চিত্রই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। তাহার পরে আলমগেস্ট, টলেমি, পারস্য পণ্ডিত অলুফকী, তাইমুর লঙ্গের পোজ উলাখ বেস, প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নক্ষত্রের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তৎপরে বিখ্যাত জ্যোতিষী হালি পরিশিষ্টরূপে চিত্র সংকলন করেন। এক্ষণে নক্ষত্র-মানচিত্রের অভাব নাই। এক্ষণে কটোগ্রাফীর সাহায্যে

নক্ষত্র ধ্রুবকেন্দ্র প্রভৃতিরও চিত্র সংগৃহীত হইতেছে। এইসমস্ত বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র ভুলনা করিয়া নক্ষত্রের গতি ও স্থান পরিবর্তন প্রভৃতি ধরা পড়িতেছে। সমস্ত নক্ষত্রই গতিমান; কিন্তু খালি চোখে হাজার বৎসরেও সে গতিব কোনো চিহ্ন ধরা পড়ে না। খুব সম্ভব এমন কোনো সূর্য কেন্দ্র হইবা আছে বাহ্যর চাষিকের আমাদের মতন শত শত সৌরজগৎ সপরিবার গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ঘুরিয়া কিরিতেছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

শিবের গাঞ্জন—শ্রীহরিদাস পালিত—

গাঞ্জন বৌদ্ধ উৎসবের অঙ্গ। ধর্ম্মপুস্তকধর্ম্মের উৎসবের গর্ভজন শব্দের অপভ্রংশ। বৌদ্ধ উৎসব বলিয়া তাহার মন্ত্র সংস্কৃত না হইয়া বাংলা ভাষায় রচিত। সেন রাজগণের সময় ইহা পরিগণিত প্রাপ্ত হইয়াছিল। সর্বত্র ধর্ম্মপণ্ডিত রাহাইয়ের শুল্কপুরাণের পূজাপদ্ধতি পালিত হয়। গাঞ্জন ও গভীরা সমার্থক; গভীরা শব্দ এখন মালয় জেলায় প্রচলিত আছে; গভীরা মানে দেবগৃহ বা চতুষ্পদ, তাহার প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। গভীরা বৌদ্ধদের ভজনগৃহ ছিল; সেখানে আত্মদেবী নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর পূজা হইত; ইনি ক্রমশ পৌরাণিক চূর্ণা ও পার্বতীতে পরিণত হইয়াছেন; এবং ঈশ বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশ শৈবধর্ম্মে আত্মবিলোপ করিয়াছে; ধর্ম্মপুস্তকধর্ম্ম হিন্দু-দিগের কোশলে এক্ষণে ডোম ও অস্পৃগ হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধ প্রভাবে এখনো সকল জাতিই গ্রীপুত্র অস্ত্রের গাঞ্জনে সন্মানী হইতে পারে।

ব্যবসা ও ব্যাগিজা (বৈশাখ)।

আমরা এই নবপ্রকাশিত মাসিকপত্রখানিকে সাধরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছি “বিশ্বাস”। এই সংখ্যার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—(১) সম্পাদকের নিবেদন, (২) আলোচ্য বিষয়, (৩) মূলধন—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৪) সাবান ও সাবান প্রস্তুতপ্রণালী—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, (৫) জাপানের কৃষি ও শিল্প—শ্রীমদ্ব্যনাথ ঘোষ, (৬) ব্যবসারে জুরাচুরী (ট্যাবলরেড কুইনাইন, স্ট্রাটোনাইন, কলিকাতার নোকারের তৈরী চা)—শ্রীকদম্বরী, (৭) কটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রণ ও কটোগ্রাফ তোলা শিক্ষা (সচিত্র)—শ্রীহরুমার মিত্র, (৮) কয়েকটি পরীক্ষিত মুদ্রারোগ, (৯) আমার কর্ম্মভূমি (হাসির কবিতা)—শ্রীসত্যীশচন্দ্র ঘটক; এ কবিতাটি পূর্বে ভারতীতে একবার প্রকাশিত হইয়া গেছে; (১০) বৈষ্ণবী (জুহু জুহু হাসির গল্প)—শ্রীরাজকুমার বল্লভ্যাপাধ্যায়, (১১) গৃহহারা (গল্প) (১২) পরলোকগত জামশেদজী টাটার জীবনী (সচিত্র)—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন (বৈশাখ)।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ—শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র—

ভারতবর্ষের হিন্দু ইতিহাস ঘটনার পৌরাণিক বা সম্পূর্ণতা মানিয়া চলে নাই। মুসলমান হইতেই ধারাবাহিক ইতিহাসের আনুমানিক। একই সময়ের ঘটনা একাধিক ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করিতে সত্যাসত্য বিচারের সুবিধা হইয়াছে। স্যর হেনরী ইলিংট ভারতবর্ষীয় মুসলমান ইতিহাসগুলির অবিকল প্রতিলিপি করিয়াব প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ; ‘ব্যববাহ্য্য ভয়ে শুধু তালিকা, প্রত্নকারের পরিচয় ও প্রত্নের বিষয় নির্দেশ, রচনার আদর্শ ও টীকা টিপ্সনী সংগৃহীত হয়। এই তালিকার ১৫৯ জন প্রত্নকারের মধ্যে ১০৮ জন মুসলমান, ২০ জন হিন্দু, ১ জন ইরানী। সাধারণ ইতিহাস

৩৮, বিশেষ স্থান বা রাজত্বের ইতিহাস ৭৮, ঐতিহাসিক উপভাস ১, ভূগোল ও ভ্রমণকাহিনী ১২, অনুবাদ ২, জীবনী ২০, আশ্চর্য ৪, বিবিধ ৪, মোট ১৫৯ খানি। ইহার পরেও অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছে। অসংখ্য মুসলমান ঐতিহাসিকের মধ্যে যাদব জন বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য—(১) তারিখ-উল-হিন্দু নামক গ্রন্থে প্রণেতা আলবিরুদী। (২) তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা নূরুজ্জ-উল-সিরাজ। (৩) তারিখ-ই-আলহি প্রণেতা আমীর খসরু। (৪) তবারিখ-ই-রসিদীর গ্রন্থকার নীলী হাইদর। (৫) তবকাৎ-ই-আকবরী প্রণেতা নিজামউদ্দীন বরী। (৬) মুস্তথাব-উল-তারিখ প্রণেতা আবদুল্লাহকারি বখাউদী। (৭) আকবরনামার গ্রন্থকার আবুলকজল। (৮) ওয়াকিয়াৎ প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি ও গদিত সেখ ফৈজী। (৯) তারিখ-ই-কেরিয়ার গ্রন্থকার মহম্মদ কাসেম হিন্দু সাহ কেরিয়ার। (১০) সাহ-জাহান-নামার গ্রন্থকার ইনায়েৎ খাঁ। (১১) মুস্তথাবুল-মুবাব প্রণেতা মুহম্মদহাসিম কাকি খাঁ। (১২) সৈয়র-উল-মুতাক্করী প্রণেতা গোলাম হোসেন। ইহাদের প্রত্যেকের জীবনীর সহিত তৎসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

গৌড়কবি মদন-বালসরস্বতী—শ্রী অক্ষয়কুমার

মৈত্রায়—

মালবের পরমার-রাজপুত্রের রাজধানী ধারনগরে কমল-মৌলি নামে একটি মসজিদে একখানি প্রস্তরফলকের অপরপৃষ্ঠে সংকৃত ও প্রাকৃত ভাষায় একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা গৌড়কবি মদন-বিরচিত পারিজাত-মঞ্জরী নামক নাটিকার অর্দ্ধাংশ প্রথম দুই অঙ্ক; অবশিষ্টাংশ এখনো অনাবিষ্কৃত আছে। এই নাটিকার অপর নাম বিজয়শ্রী। এই বাঙালী কবি কেবল রাজকবি ছিলেন না, রাজপুত্রও ছিলেন। ইনি অর্জুনদেব নামক রাজার সভাকবি ও গুরু। অর্জুনদেব হুস্তটবর্নার পুত্র; ১২১১, ১২১৩ ও ১২১৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইহা তিনখানি তারিখানসন আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেগুলি রাজপুত্র-মদন-বিরচিত বলিয়া উল্লেখ আছে। অর্জুনবর্ষা অমরকণ্টকের রসিক-মঞ্জরী নামী চীকা রচনা করিয়া তাহাতে মদন-বালসরস্বতীর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখা যায়। পারিজাতমঞ্জরী নাটিকা রূপকার সিংহকের পুত্র রামদেব নামক শিল্পীর মধ্যে প্রস্তরফলকে উৎকর্ষ হইবার কথা বিতীরাঙ্কের শেষ শ্লোকে আছে। শিল্পী বক্তারের রূপভেদ করেন নাই বলিয়া তাহাকেও গৌড়ায় বলিয়া মনে হয়।

—সমিচ্ছ।

বিফলতা

আসিতেছে সন্ধ্যা হয়ে ধূসর আকাশ,
কোথাও জীবৎ শ্রান্ত আরক্ত আভাস,
তরলতা বনপ্রণী নিষ্পন্ন নীরব,
সাজ দিবসের কাজ, সমাপ্ত উৎসব।
উড়ে চলিয়াছে পাখী হু-একটি করে
অতি ধীরে, ভেঙে যেন পড়ে ক্লাস্তি ভরে

পক্ষ দুটি তার। ঘিরে আসে অন্ধকার
ছায়াচ্ছন্ন ত্রিভুবন, মৌন চারিদিক
প্রশান্ত বৈরাগ্যে, যেন অসীম আকাশ
ব্যাপ্ত করি আছে তব বিষন্ন উদাস
গভীর করুণ দৃষ্টি, হার প্রিয়তম,
হে আমার ব্যথিত বসন্ত, স্নেহ মম
নিরন্তরপ্রবাহ, তবু সমুদ্রের প্রায়
পিপাসার বারি দিতে নাবিল তোমার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গদেশে শিশুপ্রতিপালন—

ভারতবাসী প্রবীণ চিকিৎসক কর্তৃক লিখিত। ব্যাপ্টিষ্ট মিশন দ্বারা মুদ্রিত। প্রকাশক ম্যাকেন্সি লারাল কোম্পানি। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য মেডিকেল স্কুলের উপকারিতা ও গুণপ্রচার; এবং সেই সঙ্গে সন্তান-পালন, জননীর কর্তব্য, শিশুর খাওয়া ও পরিচ্ছন্ন প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্কতা, চীকা ও গুণ, সহজ চিকিৎসা, প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় বিষয়ে যেটাবুটি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভাষায় সাহেবী বাংলায় ছাপা হুপট—বেমন, বোতলপারী শিশু, মাতৃভক্তের স্থানীয়বরণ প্রভৃতি; তাখানি ভাষা সহজবোধ্য। ছাপা কাগজ পরিষ্কার; বিশেষতঃ বাঁধাইটি। মূল্যের কোন নির্দেশ নাই।

জৈন ধর্ম—

প্রকাশক কুমার শ্রীম্বেজপ্রসাদ জৈন, মন্ত্রী—বঙ্গীয় সার্বভৌম-পরিষৎ, কাম্বী। ইহা লোকমুখে পণ্ডিত বালগদ্বার তিলক মহাশয়ের মহারাষ্ট্র বক্তৃতা অনুবাদ। বিনামূল্যে বিতরিত। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মই এবং কোনো কোনো বিষয়ে (বেমন জীবনলি ও বর্ণাধিকার ভিন্নতায় প্রভৃতি বিষয়ে) ব্রাহ্মণ ধর্মের অপেক্ষা স্রেষ্ঠ—ইহাই বক্তৃতা প্রতীপাধ্য। অনুবাদের ভাষা একটুখানি ইংরেজী হাঁচি ঢালা।

নবাব হরেকৃষ্ণ—

ঐসারবাচরণ ধর প্রণীত। কলিকাতা ১৮২০ বাঙ্গালার ষ্ট্রীট প্রজিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। প্রায় সহস্র বৎসর পুরাতন ঐহট্ট শহর এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ বাংলার ১৯ হুবার এক নবাব ছিল; এখানে বহু বাণিজ্যপ্রবৃত্তি ও সমুদ্রযাত্রী নৌকা উৎপাদ ও নির্যাস হইত। এখানকার মোসল শাসনকর্তার কৌশল্যের জামিন বা নবাব নামে অভিহিত হইতেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠাদশ শতাব্দীতে কারহুললপ্রবীণ মহারাষ্ট্র সমসের-উল-মূলক হরেকৃষ্ণ দাস উত্তরবঙ্গের প্রোগ্রা বাগশাহ মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ঐহট্টের নবাবীর সন্য প্রাপ্ত হন; আড়াই বৎসর পরে তিনি গুপ্ত শত্রুর দ্বারা নিহত হন; কারণ ইহার উদ্দেশ্য ছিল ঐহট্টে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপন করা। এই মূল্য পুস্তিকার সেই বর্ণন ও বঙ্গাভি-প্রেমিকের ইতিহাস সম্বলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই দত্তিয়ার বংশের এক বংশতালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

বৈদেশী-প্রচার—

শ্রীচাক্র প্রকাশ্য প্রণীত। মূল্য দুই পয়সা মাত্র। প্রবন্ধকারের নিকট কালনা, জেলা বর্ধমান টিকানাব পাওয়া যায়। এই পুস্তিকাখ্য বৈদেশী সামগ্রী ব্যবহার করিতে সকলেই যে কেন অটলপ্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত, দেশী জিনিষ বিদেশী জিনিষ অপেক্ষা দুর্গম্য হইলেও দেশী জিনিষ কিনিয়া দেশের পয়সা দেশে রাখা উচিত, কোন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে বৈদেশী জব্যের অভাব মোচন হইতে পারে এবং বিদেশী জব্যের আমদানি কম হইতে পারে তাহাই সহজভাবে দুটোই দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভাব ও গাথা—

শ্রীমদগুরুদাস সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশ্রীদাস চট্টোপাধ্যায়। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা পুস্তক; ইহাতে পদ্যোপদ্য পদ্যসেবতা ও পৌরাণিক বোধস্থ মাহুকার মধ্যে অনেকের স্তব এবং খোকা ও ফুল, উবারাণী সঞ্চয়ী হড়া ও পদ্ম আছে।

বনতুলসী—

শ্রীমদগুরুদাস সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্তী, চাটজি কোম্পানী, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা। ইহা আধ্যাত্মিক ভাব ও তত্ত্বমূলক কবিতাকথার সমষ্টি; তাই নামটি বেশ উপযুক্ত ও কবিতাময় হইয়াছে। ছাপা কাগজ পরিষ্কার। তবু ও উপদেশ হিসাবে কবিতাগুলি ভালই হইয়াছে; তবে সর্বত্র কবিত্ব স্বর্গে পায় নাই; স্থানে স্থানে ছন্দ (বদিও আগাগোড়া পয়ার) ও রচনা আড়ষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর বইখানি স্মরণীয়।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়—

শ্রীমদগুরুদাস সেনগুপ্ত প্রণীত। মূল্য চার আনা। এখানিও পদ্ম পুস্তক; ৩৪টি সনেটের সমষ্টি; সনেটগুলি হয় তত্ত্বমূলক, নয় ভগবদ্-ভক্তি বিষয়ক; সকলগুলিই কবিত্ব বর্জিত।

নিবেদন—

শ্রীমদগুরুদাস সেনগুপ্ত প্রণীত। মূল্য চার আনা। এখানিও পদ্ম পুস্তক; ৩৪টি সনেটের সমষ্টি; সনেটগুলি হয় তত্ত্বমূলক, নয় ভগবদ্-ভক্তি বিষয়ক; সকলগুলিই কবিত্ব বর্জিত।

সিদ্ধার্থ—

শ্রীমদগুরুদাস সেনগুপ্ত প্রণীত। ২৪নং মিডিল রোড ইটালী, কলিকাতা হইতে শ্রীকেশবনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এখানি কাব্য নাটিকা। সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের আহত হংস সঞ্চয়ী কাহিনী ও সিদ্ধার্থের জরায়ুহা দর্শনে মনোবিকার সঞ্চয়ী কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত; নাটিকার কেন্দ্রসত্ত ভাবটি এই যে করুণা-বিপ্লবিত চিন্তা নিখিল ধর্ম্মের দুঃখ দৈন্ত মোচনে ব্যগ্র ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। তখন “বিষমপং আমারে মার্গিলে কে মোর আত্মপরি।” মিত্র ও অমিত্র হৃদয়ে রচিত। রচনা তৃপ্তিকর ও কবিত্বময় হয় নাই।

ইডেন হিন্দু হোটেলে কবিসম্মিলনী—

কবিতা-প্রতিযোগিতার রচিত পুরস্কৃত সনেট-সমষ্টি। অবিকাল

কবিতাই অতি সাধারণ; কোনোটির মধ্যে ভাবী কবির প্রতিভাশুদ্ধন প্রকট হয় না। -মামাতুল হুদ কোনো লেখকই আশঙ্ক করিতে পারেন নাই।

চিড়িয়াখানা—

শ্রীবিজ্ঞাননাথ বসু প্রণীত। একাশক সিন্ধু বুক সোসাইটি। মূল্য চার আনা। ইহাতে বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি অনেক প্রকার পশুর আকৃতি প্রকৃতি বর্ণিত ও চিত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। রচনা প্রাঞ্জল; চিত্রগুলি স্থলর। শিশুগণ এই পুস্তক আনন্দে পাঠ করিয়া জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনায়াসে জ্ঞান অর্জন করিবে। এই পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য পাওয়া মাত্র শিশুসমূহে ক্রোধাকাণ্ডি লাগিয়া গিয়াছিল; অনেক কষ্টে দুই মাস পরে ইহার ছিন্ন কলেবর সমালোচকের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আদর-চিহ্ন অঙ্কিত।

মূল্য-রাক্ষস।

তীর্থ-যাত্রা

এমনি করে ঘুরিব ঘুরে বাহিরে

আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।

যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া

আপনা হতে কুহুম উঠে ভরিয়া,

চক্রে ছুটে ঘুরা ছুটে, সে পথ-তলে পড়িব লুটে,

সবার পানে রহিব শুধু চাহিরে।

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো—

কমল সেখা ধবে না, নাহি ধরে গো—

জলের ঢেউ তরল জানে, সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে,

বিবিয়া তারে ফিরিব তরী বাহিরে।

যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে

সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে,

তাকাসে রব ঘরেব পানে, সে-তানখানি লইয়া কানে,

বাজারে বীণা বেড়াব গান গাহিবে।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

চড়কে বাণ ফোঁড়ার ইতিবৃত্ত

গঙ্গারী বা গাঙ্গনে সন্ন্যাসিগণ ‘বাণফোঁড়া’ নামক অমুষ্ঠান করিয়া থাকে। ‘বাণ’ বলিতে ধনুকের সাহায্যে যে তীর বা বাণ নিক্ষেপ্ত হয় তাহা বুঝায় না। এক্ষেত্রে ‘বাণ’ আকারে ও ব্যবহারে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে।

গাঙ্গনে যে কয়েক প্রকার বাণ ব্যবহার হইয়া থাকে তন্মধ্যে (১) কপাল বাণ (২) ত্রিশূল বা অগ্নিবাণ (৩) * জিহ্বা বা সর্পবাণ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(১) কপাল বাণ—ইহা ক্ষুদ্র, প্রায় এক হস্ত পরিমাপ দীর্ঘ ও স্থল স্ফটিক ভাঙ্গ, এক প্রান্ত স্থম্মাগ্র ও এক প্রান্ত স্থল বা ভোঁতা। লৌহনির্মিত। এই বাণের স্ফটিক প্রান্তে স্বতন্ত্র চুঙ্গী ও তাহাতে ক্ষুদ্র লৌহব প্রদীপ সংবদ্ধ থাকে।

ব্যবহার—কপাল বাণ কপালে বিদ্ধ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম ‘কপালবাণ’ হইয়াছে। এই অমুষ্ঠান বাজে হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী স্থিরভাবে দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিলে, কর্ণকর (কামাব) বাণটি ছুই দ্রুত মধ্যভাগে কপালের চর্মে বিদ্ধ করিয়া দেয় এবং চর্ম হইতে অগ্রভাগ ছুই ইঞ্চি আন্মাজ বাহির করিয়া রাখে। তৎপরে একখানি কচি কলাপাতের অগ্রভাগ (আঙুটপাতা) দিয়া সন্ন্যাসীর মুখ আবৃত করিয়া উক্ত বাণাঙ্গে সংবদ্ধ করিয়া দেয়। তৎপরে স্বতন্ত্রচুঙ্গীযুক্ত লৌহপ্রদীপটি স্থত ও সলিতাসহ, বাণাঙ্গভাগে পরাইয়া দেয়। বাণের অগ্রভাগস্থ চুঙ্গীর উপর বাণের সামান্য অগ্রাংশ বাহির হইয়া থাকে, বাণের উক্ত অংশে একটি জবাফুল বিদ্ধ করিয়া দেয়। অপর কোন সন্ন্যাসী বাণসংলগ্ন প্রদীপটি আলিয়া দেয়।

(২) ত্রিশূল বা অগ্নিবাণ। লৌহনির্মিত, কপাল বাণের ত্রায় আকৃতি বিশিষ্ট, দীর্ঘে কপাল বাণ হইতে অর্দ্ধ হস্ত অধিক। কপাল বাণে ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র চুঙ্গীবদ্ধ লৌহপ্রদীপ আবদ্ধ থাকে ইহাতে তাহা না থাকিয়া একটি লৌহ-ত্রিশূলবৎ অংশ থাকে। ইহার আকৃতি ত্রিশূলের মত বলিয়া ইহাকে ত্রিশূলবাণ বলে।

* এই বাণ পার্শ্ববাণ বা পাশবাণ নামেও খ্যাত হইয়া থাকে।

ব্যবহার—এই অমুষ্ঠান কোথাও রাত্রে কোথাও দিবসে শোভাযাত্রার সময় হইয়া থাকে। দুই বাহর নিয়ে পাঁজরের উভয় পার্শ্বে, বাণদ্বয়ের অগ্রভাগ সম্মুখে দিকে রাখিয় পার্শ্বেভেদ করে, এবং স্থম্মাগ্রভাগে চুঙ্গীবদ্ধ ত্রিশূলবৎ অংশ পরাইয়া দেয়। সন্ন্যাসী দুইটি বাণের অগ্রভাগ সম্মুখে ক্রিষ্ণ উচ্চ করিয়া ধরিয়া দুইটি বাণের অগ্রভাগ একত্রে সংযুক্ত করিয়া দুই হাতে দুইটি বাণ ধারণ করে তৎপরে দ্রুতসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ত্রিশূলাংশে জড়াইয়া দিয়া অগ্নি সংযোগ করে। সন্ন্যাসী উহা লইয়া পূজা করিতে থাকে মধ্যে মধ্যে ধূনাচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে।

জিহ্বা বা সর্পবাণ* লৌহনির্মিত, বৃদ্ধাকৃষ্ঠের ত্রায় স্থল, দীর্ঘে ছয় হাত হইতে নয় হাত পর্যন্ত হইয়া থাকে। গাঙ্গন উৎসবে জিহ্বাবাণ ফোঁড়া শালভর দিবসে প্রাতঃকালে অমুষ্ঠিত হয়। এই বাণের এক প্রান্ত সর্প-ক্ষণার ত্রায়, অপরপ্রান্ত স্থল অথচ অতি স্থল নহে, অগ্রভাগ ভোঁতা, এই বাণ জিহ্বা ভেদ করিতে ব্যবহার করে।

ব্যবহার ও প্রয়োগ—পূর্ববর্ণিত বাণের ত্রায় ইহা বিদ্ধ করা হয় না। প্রথমে জিহ্বা দ্রুতসিক্ত করিয়া কামান জিহ্বাটির নিয়মিত উন্টাইয়া ধবে তৎপরে শিরার সংস্থানাগ্র ভাগ করিয়া ‘বেলকাটা’ নামক স্বতন্ত্র একটি তীক্ষ্ণ প্রেকবৎ লৌহশলাকা দিয়া জিহ্বার এক পার্শ্বে নিয়মিত দিয়া বিদ্ধ করে; তৎপরে সেই বিদ্ধ অংশের ছিদ্র পথ দিয়া ‘জিহ্বাবাণ’টির ভোঁতা স্থম্মাগ্র প্রবেশ করাইয়া বাণটির ঠিক মধ্যভাগ মুখগহ্বরে রাখে। এই বাণটির উভয় প্রান্ত সমতুল-ভার নিশিষ্ট রাখিতে হয়।

এই সর্পকণাকৃতি প্রান্ত সিম্বলিষ্ট ও অপর প্রান্তে কোন প্রকার ফল বিদ্ধ করে। সন্ন্যাসী উভয়হস্তে বাণের উভয় পার্শ্ব ধরিয়া নাচিতে থাকে। এই সময়ে বাস্তভাও বাজিতে থাকে। এইপ্রকারে অনেকেই জিহ্বাবাণ বিদ্ধ করিয়া নাচিতে থাকে। সময়ে সময়ে দর্শকবর্গের নিকট জিহ্বার মধ্য দিয়া বাণ চালাইয়া নৃত্য করে।†

* ‘বড় বাণ’ নামেও কোথাও কোথাও খ্যাত আছে।

† আসি বাঁকালে এই ভীষণ উৎসব একবার মাত্র দেখিবারি। তৎপরে রাজ্যদেশে ইহার ব্যবহার নিবারণ হইয়াছে। পরবর্তীকালে কেবল মূখে কামড়াইয়া বাণফোঁড়া দেখান হইত। এখনে তাহাও হয় না। কেবল বাণের পূজা হয় মাত্র।

সেই সময় দর্শকমণ্ডলী কর্তৃক টাকা, পরস, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

বাণ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম—ব্যবহারের পূর্বে বাণ-গুলি মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, যেন কোন প্রকার মরিচা না থাকে। তৎপরে দ্ব্যতন্ত্রী প্রলেপ দেয়। বাণের পূজা হয়। তৎপরে কর্মকার জ্ঞান করিয়া, দেবতাব পুষ্প লইয়া, কার্যে ব্রতী হয়। ‘বেলকাঁটা’ কর্মকার নিজ গৃহ হইতে লইয়া আসে। ইহাবও পূজা হয় ও দ্ব্যতন্ত্রী প্রলেপ দিতে হয়। দেহে বাণ বিদ্ধ করিবার সময় প্রোগাংশটি দ্ব্যতন্ত্রী দ্বারা মর্দন করে; তৎপরে কর্মকাব হাতে খুঁটের ছাই লইয়া উক্ত স্থানে ও নিজ অঙ্গুলীতে মাখিয়া বাণ বিদ্ধ করে। বাণ খুলিবার সময় কর্মকার নিজহস্তে বাণ খুলিয়া কতস্থানে দ্ব্যতন্ত্রিত্ব তুলী লাগাইয়া দেয়; ও ক্ষণকাল টিপিয়া ধবে। জিহ্বা হইতে বাণ খুলিবার সময়ও দ্ব্যতন্ত্রিত্ব ব্যবহার কবে। বাণ খুলিয়া মুখগহ্বর দ্ব্যতন্ত্রিত্ব করিয়া দেয়। কোথাও কোথাও তিলচূর্ণ দ্ব্যতন্ত্রিত্ব সহিত মিশাইয়া মুখগহ্বরে ধারণ করিতে হয়। সম্যাসী এক দিবস কাঁচাবও সহিত বাক্যলাপ করে না। এক বৎসর জিহ্বার যে অংশে বাণ বিদ্ধ করা হয়, পর বৎসর সেই অংশ বাদ দিয়া ছুঁড়িতে হয়।

এই অঙ্কুষ্ঠান চড়কের সময় হয়। পূর্বে বঁড়লী আকারের ছোট বা ‘একটি লৌহবাণে পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া উহার সহিত রজ্জু বদ্ধ করিয়া চড়কে খুলিবার ব্যবস্থা ছিল।

পৃষ্ঠের মধ্যভাগে মেরুদণ্ড বাদ দিয়া উত্তর পার্শ্বের স্থল চর্ম ‘বেলকাঁটা’ নামক অস্ত্র দিয়া ভেদ করিয়া বঁড়লীবাণ পরান হইত। পৃষ্ঠদেশ দ্ব্যতন্ত্রী দ্বারা মর্দন করিয়া তৎপরে খুঁটের ছাই দিয়া পৃষ্ঠের চর্ম উন্নত করিয়া ধরিয়া ‘বেলকাঁটা’ বিদ্ধ করিত, সেই ছিদ্রপথে বঁড়লী পরান হইত। এক্ষণে চড়ক আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।

মহাভারতে ভীষ্মের পরশযায় বাণকোঁড়ার কথা মনে হইলেও উহা প্রকৃত বাণকোঁড়া নহে। কিন্তু ঐ প্রকারের বাণ কোঁড়া হইতেই এই বাণকোঁড়া প্রচলিত হইয়াছে।

হরিবংশে বাণরাজ্যের উপাখ্যানে বাণবিদ্ধ অবস্থায় শোণিতাশ্রিত দেহে শিবের নিবটে গমন ও নৃত্যের কথা আছে।

উহা ও অনিরুদ্ধ ব্যাপার লইয়া শোণিতাপ্রাধিপতি বাণরাজ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বোর বৃদ্ধ হয়। তাহাতে বাহুচ্ছেদ ও বাণবিদ্ধ হওয়ার পর শোণিতাশ্রিত দেহে লইয়া বাণ শিবের নিবটে নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহাতে শিব বাণকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। শিব বাণকে অমর বর প্রদান করেন এবং বাণ শিবভক্তগণের জ্ঞাত ও একটি বর প্রার্থনা করেন।

‘বেব। আমি যেমন ব্রহ্ম-পীড়িত ও দুঃখাৰ্হ হইয়া শোণিতাশ্রিত কলেবরে আপনীর সমুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এই-রূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্র লাভ করিতে পারে।

‘মহাদেব বলিলেন, বৎস। সত্যপারায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে তাহার এইরূপ কল্যাণ হইবে।’*

এই ধর্মসংহিতার বাণোপাখ্যান হইতে সম্যাসিগণ শিবপ্রীত্যর্থে বাণবিদ্ধ শোণিতাশ্রিত দেহে শিবসকাশে নৃত্য করে। ‘বাণ রাজা’ ইহার পথপ্রদর্শক বলিয়া, তাহার নামে এই উৎসবের নাম ‘বাণকোঁড়া’ হইয়াছে। গাঙ্গনে দেহ হইতে যে কোন উপায়ে শোণিতাপাত করিলেই তাহাকে বাণকোঁড়া বলে।

সংহিতা মধ্যে শিবপূজা উপলক্ষে ‘বাণ’ পূজারও প্রসঙ্গ দেখিতে পাই—‘শিবপূজার জ্ঞান কোণে শ্রীমান ত্রিশূ-লেম, পূর্বদিকে বজ্রের, অগ্নি কোণে পরশুর, দক্ষিণে সার্কের, নৈঋতে খড়্গের, পশ্চিমে পাপের, বায়ু কোণে অঙ্কুরের, ও উত্তর দিকে পিনাকের পূজা করিবে।’

রামাই পণ্ডিতের বর্ণিত হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা ব্যাপারে বাণ উপাখ্যানের জ্ঞায় কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

‘করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে।

চেরা না জাঅ রাম সত্তরে করতায়।’^{১০}

—বনপূরণ।

‘চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কোটাল।’^{১১}

—বনদূতসংবাদ।

‘সেল ডকবুল হাতে খুঁরজ কোটাল।’^{১২}

—ঐ

‘খাটি বগড়া হাথ গরুড় কটাল।’^{১৩}

—ঐ

‘জীবনাম চুড় হাথ উল্লুক কটাল।’^{১৪}

—ঐ

‘ধর্ম-পূজা-পদ্ধতি’ নামক পুঁথি রামাই পণ্ডিতের প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বাণকোঁড়ার কথা আছে।

* ধর্মসংহিতা—বঙ্গবাসী কাথালয় হইতে প্রকাশিত।

ষাটশ দিবস পর্যন্ত ‘কুণ্ডসেবা,’ হিন্দোলন, জিহ্বা-স্তেদ, পঞ্চ ভেদের কথা উক্ত পুঁথির ‘গ্রহভরণ’ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

জিহ্বা-স্তেদ ও পঞ্চ স্তেদ, জিহ্বাবাণ কোঁড়া, ও অপরাপর পঞ্চ প্রকাব ভেদনের কথায়, ক্ষুদ্র বাণকোঁড়ার কথা বলা হইয়াছে।

গাজন ও গজীরা উৎসবে আজিও ‘বাণকোঁড়া’ উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু এখন জিহ্বাবাণ কোঁড়া ও চড়কে-পুঁঠ-কোঁড়া হয় না। ক্ষুদ্র কপালবাণ, জিশূলবাণ, ইত্যাদি হুঁড়িতে দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া বেগকাটা শরীরের বহুস্থানে বিদ্ধ করিয়া তাহা ভবা পুণ্য দ্বারা শোভিত করাও বাণ-কোঁড়ার অন্তরূপ বলিয়া মনে হয়।

বাণ কোঁড়া ব্যাপার বীরত্বপ্রকাশক। বর্তমান গজীরা ও গাজনে তরবারি, ব্লম, ইত্যাদি লইয়া ভক্তগণ নৃত্য করে। কুটচক নামক শৈব পন্থিগণ আজিও খনিজ ও কুপাণ ধারণ কবিয়া থাকে। শৈব নাগা সন্ন্যাসীগণ প্রকৃত প্রস্তারে ঘোষের জাতি; তাহারাজিও কুপাণ খনিজ ব্যবহার করে। বীরকর্ণে সমাজকে প্রবুদ্ধ রাখিবার জন্য জলাচরণীয় সমাজেও এই প্রশংসাত্মক বীরকর্ণ বাণকোঁড়ার প্রচলন ছিল। এই সকল জাতিরাই তখন হিন্দু জমিদারগণের পদাতিক দলভূক্ত ছিল। সময়ে সময়ে এই দলই দেশে ডাকাতি করিত।

শ্রীহরিদাস পালিত।

সাধারণ কৃষির সহিত গোপালন ও গব্য ব্যবসায়ের তুলনা

১। কৃষি।

‘স বোহরং ব্রহ্মভূ পাতংহরবতা বৈ স লোকান্
পানবতোহভিসিদ্ধতি ॥’

‘অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানে যে তাহার পুঞ্জা-করে, সে অন্নবৃদ্ধ এবং পানবৃদ্ধ লোকসকল অবিকার করে’—২—১—৭ম প্রপাঠিক—ছানোগ্য ॥

বিভক্ত উপায়ে বাহাতে আমাদের যুবকগণ অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের প্রধান

কর্তব্য। আমাদের শাস্ত্র বলে চিত্তশুদ্ধিই ধর্মের মূল। সেই সঙ্গে আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে অন্নশুদ্ধিই চিত্তশুদ্ধির মূল। অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন চতুর্বর্গ লাভের উপায়। বিভক্ত উপায়ে যে পরিবারে অন্ন সংগ্রহ না হয়, সে পরিবারে ধর্ম বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশের পক্ষে বিভক্ত উপায়ে অন্ন সংগ্রহের একমাত্র কৃষিই সনাতন রাজপথ।

‘বার্ভার্যো নিত্যযুক্তঃ স্ত্রাং পশুনাকৈব রক্ষণে ॥’

(৩২১—১—মহু)

দেশের জন্য অন্ন উৎপাদন করিবার অধিকার দেবলোকেরও ব্যুৎপন্নীয়। কৃষকই দেশের জ্বংপিণ্ড-স্বরূপ। শরীরের রক্ত যেমন জ্বংপিণ্ড দ্বারা ই সর্কাজে সংক্ষারিত হইয়া শরীরকে সজীব রাখে, সেইরূপ অন্নও কৃষক দ্বারা উৎপন্ন এবং দেশময় বিস্তৃত হইয়া দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। নিশ্চয়ই কৃষক আমাদের সকলেরই নমস্ত। জ্বংপিণ্ড দুর্বল হইলে রক্তাভাবে আমাদের সর্কাজ বেক্ষণ দুর্বল হয়, সেইরূপ কৃষকশ্রেণী দুর্বল হইলে সমস্ত দেশ উৎসন্ন হয়। ইংলণ্ডবাসীরা ইহা বেশ জানে। তাহাদের পরম্পরের মতবৈধের সীমা নাই কিন্তু আমাদের স্ত্রায় বাহাতে তাহাদেরও কৃষিজমির জন্য রাজস্ব দিতে না হয় সেই জন্য তাহারা সকলেই বদ্ধপনিকর। কৃষিই ভারতের প্রধান অবলম্বন। কৃষিই রাজ্যের ধনাগমের মূলভূত কারণ। রাম-বনবাসের পর ভারত যখন রামের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন রাম সম্মুখে ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—

কচিৎ তে দ্রুতিতঃ সর্কঃ কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ।

বার্ভার্যো সান্ত্র্যস্ত তাত লোকোহস্য হুখমেধতে ॥ ৪৭ ॥

অ ১০০—অবোধা—রামায়ণ ॥

কৃষক এবং গোপালনজীবীগণ তোমার উপরে সন্তুষ্ট আছে ত? বৎস, সত্যই কৃষির উপরে জনসাধারণের হুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

ঠিক এই কথাই আবার নারদও যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

• ‘কচিৎ বদ্রুতিতঃ স্ত্রাং বার্ভার্যো নিত্যযুক্তঃ ॥’

বার্ভার্যো সান্ত্র্যস্ত তাত লোকোহস্য হুখমেধতে ॥’

১—অ ১—সত্য—মহাভারত

আমরা যত অর্থ উপার্জন করিয়া থাকি, তাহার উৎপত্তি অধিকাংশই কৃষি হইতে। জমিদার বল, তালুকদার বল, মহাজন বল, উকিল বল, আর কৰ্মচারীই বল, সাক্ষাৎভাবেই হউক বা গোপনভাবেই হউক কৃষক হইতেই তাহাদের সকলের ধনাগম। কৃষিজন্তু ফলের বিনিময়েই তাহাদের ধনের উৎপত্তি। ভগীরথ জলধারা প্রবাহিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন—কৃষকগণও অন্নপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। কৃষিই আমাদের উন্নতির প্রধান সাধন—এবং সর্বপ্রথমে কৃষিশিক্ষা বিস্তার করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

২। কৃষি-নানাবিধ।

কৃষিযোগ্য জমি নানা প্রকার। কোন কোন স্থান বর্ষাতে জলমগ্ন থাকে এবং কাস্তিক মাসের মধ্যেই আবার শুষ্ক হয়। কোন কোন জমি বর্ষাকালেও জলমগ্ন হয় না। অনেক জমি টিলা, অনেক জমি জলের অভাব প্রযুক্ত শস্ত উৎপাদনের অযোগ্য, অনেক জমি জঙ্গলাকীর্ণ। আবার অনেক জমিতে পুকুর, দীঘি, বিল, বিল ইত্যাদি জলাশয় আছে। জমির এইসকল প্রকার ভেদ অনুসারে তাহার উপযোগী কৃষিও নানা প্রকার, যথা :—(১) শস্ত কৃষি (২) গব্য কৃষি, (৩) গো, মেঘ, ছাগ, অশ্ব, মহিষাদি পশুপালন কৃষি, (৪) গৃহপালিত হংস, কপোত, কুহুটাদি পক্ষীর কৃষি, (৫) মৎস্য কৃষি, এবং (৬) মোমাছি, লাঙ্গা বা রেশমেব কৃষি ইত্যাদি। কৃষি শব্দের বাস্তবিক বাহাই হউক এসকলই কৃষি ব্যবসায়ের অন্তর্গত। জমির উপযোগিতা দৃষ্টে কৃষকে এইসকল হইতে একটি কি দুইটি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়। অতি নিকৃষ্ট জমি—যাহাতে জল সেচনের কোন সুবিধা নাই, যেমন টিলা প্রভৃতি—পশুপালনেই যোগ্য। মধ্যম শ্রেণীর জমি যাহা বর্ষাভায়ে জলে ডুবিয়া না যায় এবং যাহাতে পানীর জলেবও সুবিধা আছে, তাহা গব্য ব্যবসায়ের বিশেষ উপযোগী। উৎকৃষ্ট জমি যাহাতে গ্রীষ্মকালেও জলাভাব হয় না, অথচ বর্ষাকালেও হাজা শাগিয়া শস্ত নষ্ট হইবার আশঙ্কা না থাকে তাহাই শস্তকৃষির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্ষুদ্রাকারে কৃষিকার্য্য পরিচালন করিবার

পক্ষে মিশ্রকৃষিই বিশেষ উপযোগী। এসকল কৃষি সম্বন্ধীয় সাধারণ সূত্র। উল্লিখিত নানা শ্রেণীর কৃষিব মধ্যে শস্ত-কৃষি এবং গব্যকৃষিই প্রধান। আমাদের বিশেষ ভাবে দেখা আবশ্যক এই দুয়ের মধ্যে কোনটি গ্রহণ ভদ্রসন্তান-দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহাদের অবস্থা দৃষ্টে আমরা শস্তকৃষির সহিত গব্যকৃষির তুলনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব—যে, তাহাদের জন্ত গব্যকৃষিই বিশেষ উপযোগী এবং তাহাব সঙ্গে কতক পরিমাণ শস্ত-কৃষি মিশ্রিত থাকা সম্ভব হইলে আরও বিশেষ।

৩। শস্তকৃষি।

শস্তকৃষি বলিতে আমাদের দেশে প্রধানতঃ ধান এবং পাটের চাষকেই বুঝায়। ধান বা পাটের চাষে বৈষ্ণব পরিশ্রম এবং বর্ষাতপ সঙ্গ করিতে হয়, বা কাঁচা এবং জলে নামিয়া কার্য্য করিতে হয় ভদ্রসন্তানদের পক্ষে তাহা প্রায় অসম্ভব। চাকরের উপরেই তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। মাস্কাতার আমলেও বিশ্বস্ত পরিশ্রমী চাকর আত্মকাল হ্রাসিত। আবার ঠিক প্রয়োজন হইলেই যে উপযুক্ত সংখ্যক চাকর পাওয়া যায় তাহাও নয়। শস্তকৃষিতে সময় বিশেষে অনেক লোকের প্রয়োজন হয়, অনেক সময়ে আবার চাকরের কোন দরকারই থাকে না। একরূপ অবস্থায় সারা বৎসর বেতন দিয়া উপযুক্তসংখ্যক চাকর নিযুক্ত রাখা কোন মতেই পোষাইতে পারে না। এতদ্বিধ চাষী চাকরেরাও নিজেদের এবং পরিবারের সারাবৎসরের অন্নের জন্ত আমাদের দেশ সামান্ত অনিশ্চিত বেতনের উপরে নির্ভর করিতে পারে না। তাহার সকলেই বৎসরের খোরাকীর জন্ত কিছু কিছু জোৎ জমি বাধিয়া থাকে। এবং ‘বো’ বা ‘বুফা’ লাগিলে যে মুহূর্ত্তে তোমার জমিতে লোকের প্রয়োজন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সম্ভবতঃ চাষার নিজ জোৎ জমিতেও লোকের প্রয়োজন। তখন কোন চাষাই নিজের জমি ফেলিয়া তোমার দেশ ২৫ দিনের বেতনের লোভে তোমার জমিতে কার্য্য করিতে সম্মত হইবে না। তাহার নিজ জমি শেষ করিতেই হয়ত ‘বো’ চলিয়া গিয়াছে। ঠিক ‘বো’ মত তোমার জমির কার্য্য হইতে পারিল না। ‘বো’ মত

কৃষিকার্য না হইলে যে কত ক্ষতি কৃষক ভিন্ন অপরে তাহার কি বুঝিবে? ধান বা পাটের চাষে ভদ্রসন্তানদের ক্ষতির ইহাই একটি প্রধান কারণ। আবার চাষী চাকরেরা নিজের জমিতে কৃষি পরাম্পরের জমিতে যেকপ ক্ষুণ্ণিত সহিত মন দিয়া কার্য্য করে, ভদ্রলোকদের কৃষিবিষয়ক অজ্ঞানতা বা ঔদাসীন্য বশতঃই হউক, অথবা নিজেদের আলস্য বশতঃই হউক, ভদ্রলোকদের জমিতে মজুরী কবিবার বেলা সেকপ ক্ষুণ্ণিত বা মনোযোগের সহিত কার্য্য করেনা। এদৃষ্ট সচরাচরই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। আর এক কথা এই, লাভ সম্বন্ধে ধান এবং পাটের তুলনা করিলে দেখা যায় ধান অপেক্ষা পাটের চাষেই লাভ কিছু বেশী, কিন্তু তাহাও প্রতি বিধা ১০ টাকার বেশী হইবে না। একরূপ অবস্থায় বেশী পরদা খরচ করিয়া প্রয়োজন মত এক সময়েই বেশী লোক সংগ্রহ করিয়া নিযুক্ত করিলে লাভ প্রায় থাকিবে না। অথবা “শুড়ের লাভ পিপড়ার” খাইয়া যাইবে। ধান সম্বন্ধেও ঐ কথা। অতএব মোটের উপরে বলা যায় ধান বা পাটের চাষ দ্বারা গরিব ভদ্রসন্তানদের পক্ষে লাভবান হওয়া অসম্ভব।

আলু, কপি, ইক্ষু, কলা, তামাক প্রভৃতিব চাষে ধান বা পাট অপেক্ষা বেশী লাভ হয় বটে। তাহাতে বর্ষাভণের কষ্ট অথবা জলে বা কাদায় থাকিয়া কার্য্য কবিবার কষ্টও নাই। লাভ প্রতি বিধা ২০ টাকা হইতে ৪০ টাকা। গড়ে ৩০ টাকা বৎসরে লাভ হইতে পারে। একজন ভদ্রসন্তানের কিন্তু মাসিকই ৩০ টাকার কমে চলে না। বৎসবে ৩৬০ বা ৪০০ টাকার প্রয়োজন। শস্তকৃষি দ্বারা এই ৪০০ টাকা বৎসবে লাভ কবিত্তে হইলে প্রায় এক দ্রোণ জমির আবশ্যক। সে জমি স্বাস্থ্যকর স্থানে হইবে, কথঞ্চিৎ উচ্চ হইবে, অথচ জলসেচনের উপযোগী উপযুক্তসংখ্যক জলাশয় থাকিবে। তদন্তি মাল বিক্রীত জন্ত নিকটে বড় বাজার থাকিবে কিংবা মাল রপ্তানীর জন্ত নিকটে বেলগেটন, নদী কিংবা গাড়ী চলাচলের রাস্তা থাকা আবশ্যক। আরও চাই,—গর ছাগলের উৎপাদ হইতে শস্ত বক্ষা করিবার ব্যবস্থা। সেজন্য বেড়া দেওয়ার

সুবিধা চাই অর্থাৎ ঐ এক দ্রোণ জমি সমস্ত এক চাপে* হওয়া আবশ্যক।

“৯ মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না।” উল্লিখিত সমস্ত সুবিধা আছে, এইরূপ জমি একচাপে এক দ্রোণ পাওয়া একরূপ অসম্ভব। তাবপর জমি পাইলেও এক দ্রোণ জমি একজন ভদ্রলোকের ভাসুরপে চাষ আবাদ করিতে প্রায় ১০০০ টাকার মূলধনের প্রয়োজন। এইরূপ নানাদিক পর্যালোচনা করিলে সাধারণ গরিব ভদ্রসন্তানদের পক্ষে শস্তকৃষি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। একদিকে দেখা যাইতেছে কৃষিই আমাদের দেশে ধনাগমের প্রধান সাধন; অপরদিকে দেখা যাইতেছে যে দেশের মস্তিষ্কস্বরূপ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের জন্ত বিত্তীয় আকারে শস্তকৃষির দ্বার রুদ্ধপ্রায়। সভ্যজগতে নানা-বিধ নুতন বৈজ্ঞানিক সত্য এবং নুতন কলাকৌশল আবিষ্কৃত হইয়া বিশেষতঃ বৌদ্ধবিদ্যাবিক্রী ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে শস্তকৃষির আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় লাঘব সাধিত হইতেছে। শিক্ষিত কৃষক ভিন্ন সেসকল সুবিধা গ্রহণ করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। দেশের হৃদপিণ্ডস্বরূপ ভারতের শস্ত-কৃষি মূর্খ পরম্পর-বিচ্ছিন্ন দরিদ্র কৃষকদিগের হাতে জন্ত হওয়াতে সমাজদেহে নিতান্ত রক্তশূন্য দুর্বল এবং রক্ত। অবস্থা যথার্থই শোচনীয়।

৪। গোপালন ও গব্য ব্যবসায়।

এখন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের পক্ষে গোপালন এবং গব্য ব্যবসাতে কিরূপ সুবিধা তাহাব আলোচনা করা কর্তব্য। গোপালন সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে জমি দুস্থাপ্য হইলে অতি যৎসামান্য জমিতেই এ ব্যবসায় চলিতে পারে। এমন কি এক একটা গাই গরুর জন্ত ঘরের ভিতরে ৬ হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত প্রশস্ত একটু দাঁড়াইবার এবং শুইবার স্থানই যথেষ্ট—অর্থাৎ ১৬ হাত

* ১৫ কি ২০ বৎসর পূর্বে আমাদের ছাষ জাপানী কৃষক-দিগের জমি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু তাহারা চেষ্টা করিয়া সরকারের সাহায্যে পরম্পরের সহিত জমি বিনিময় করিয়া সে ঘোষ সংশোধন করিয়া লইয়াছে। আমাদের পক্ষে কি তাহা সম্ভব?

দীর্ঘ এবং ৬ হাত প্রশস্ত একটি ঘরে চারিটা গাই বেশ আরামে থাকিতে পারে। স্থান পরিবর্তনের জন্ত বাহিরেও ঐরূপ একটু স্থান প্রয়োজন—অর্থাৎ ১৬ হাত দীর্ঘ এবং ৬ হাত প্রশস্ত একটু উঠান বা আঙ্গিনা হইলেই চারিটা গাই তথায় সময় সময় দাঁড়াইতে পারে। অর্থাৎ ৩২×৬ হাত জায়গায় ৪টা গাই থাকিতে পারিলে $৮০ \times ৮০ = ১$ বিঘা স্থানে ১২০টা থাকা সম্ভব হয়। যাহা হউক জমি দুপ্রাপ্য হইলে ১ বিঘা মাত্র জমিতেই সময়ে সময়ে ৪০।৫০টা গাই গরুর স্থান করা যায়। অপর দিকেও আবার জমি জুলভ হইলে গরুর খাণ্ডব্যয় লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গাই গরুর জন্ত ৩ বিঘা পর্যন্ত চরিবার জমি দেওয়া বাইতে পারে। তাহাতে দুধের পরিমাণ বাড়িবে এবং দুধে মাখনের ভাগও বেশী থাকিবে। গোপালন এবং গব্য ব্যবসায়ের জমি সম্বন্ধে ইহাই বিশেষ সুবিধা। বেশী জমিই হউক আর কম জমিই হউক তাহাতে এ ব্যবসায়ের বড় কিছু আসে যায় না।

জমি সম্বন্ধে ত এই কথা। গব্য ব্যবসায়ের মূলধন সম্বন্ধে কথা কি? গরুর সেবা যত্ন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছে এরূপ একজন ভদ্রসন্তান মাসিক পূর্বোক্ত ৩০ টাকা স্থলে যদি ৫০ টাকাও লাভ পাইতে চায় তবে তাহার কি পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন? সকলেই জানেন যে গাইগরু নানাশ্রেণীরই আছে। আমাদের দেশে সচরাচর একটি গাই দৈনিক ২ সেরের বেশী দুধ দেয় না। তাহার দামও ৩০।৪০ টাকা। এসকল গরু দ্বারা গব্য ব্যবসায় চলিতে পারে না, কারণ তাহারা যখন দুধ দেয় তখন যাহা লাভ হয়, দুধ ছাড়াইলে তাহাদের খোরাকী খরচেই তাহা প্রায় কাটিয়া যায়। অপর পক্ষে আমাদের দেশেই নানাশ্রেণীর পশ্চিমা গাই আছে যাহারা দৈনিক ১০ সের পর্যন্তও দুধ দেয়। অষ্ট্রেলিয়ানেশীয় গাইও সময়ে সময়ে কলিকাতাতে পাওয়া যায় তাহারা দৈনিক আধমণেরও বেশী দুধ দেয়। যাহা হউক পশ্চিমা গাই সচরাচরই উপযুক্ত সেবা যত্ন পাইলে দৈনিক ৬ সের হারে দুধ দিয়া থাকে। কলিকাতার চিংপুর বাজারে ঐরূপ একটি গাই প্রতি সের ২০ টাকা হিসাবে ১২০

টাকার পাওয়া যাইবে। তাহা আনাইবার রেলভাড়া প্রভৃতি খরচও আরও ২০ টাকা লাগিবে। মোটের উপর একটি ৬ সেরি দুধের গাই গরুর দর ১৪০ টাকা ধরা যায়। কুমিল্লার মত ক্ষুদ্র শহরেই দুধের দর টাকাতো ৬ সের, তাহাও অনেক সময় “দুধে জল, কি জলে দুধ” ক্রেতাগণ গভীর গবেষণা দ্বারাও ঠিক করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, একটি ছয় সেরি দুধল গাই যোজ্ঞ এক টাকার এবং মাসিক ৩০ টাকার দুধ দিবে। উপযুক্ত সেবা যত্ন করিতে জানিলে এবং করিলে এই দুধ সাধারণতঃ প্রসবের এক সপ্তাহ পর হইতে গাভী হওয়ার পর আরও ৪।৫ মাস কাল পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। অবশ্য শেষভাগে পরিমাণে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। উপযুক্ত রূপ যত্ন পাইলে বাঙ্গলার যেরূপ জল বায়ু ‘নাগরা’ কি ‘মুলতানি’ এমন কি অষ্ট্রেলিয়া দেশের শর্টহর্ন (short-horn) গরুরও তাহা বেশ সহ হয়। আমরা চট্টগ্রামে মেষুর গুড় নামক জনৈক ভদ্রলোকের অনেকগুলি অষ্ট্রেলিয়ানেশীয় গরু দেখিয়াছি। সেগুলি বেশ সুস্থ ছিল। যাহা হউক ১৪০ টাকা দামের একটি ছয় সেরি দুধের গাই উপযুক্তরূপ সেবা যত্ন পাইলে প্রসবের ২।১ সপ্তাহ পর হইতে গাভীন হওয়ারও ৪।৫ মাস পর্যন্ত গড়ে দৈনিক ৬ সের হিসাবে দুধ দিবে। গরু গাভীন হওয়া সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র এই যে প্রসবের ছয় সাত মাস পরে গাই গাভীন হয়। তবে দেশীয় গাই সম্বন্ধে অনেক স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কোন কোন গাই ‘দোয়াশ’ যায়। যাহা হউক সাধারণ সূত্র অনুসারে ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়া গাই খরিদ করিতে পারিলে এবং উপযুক্তরূপ সেবা যত্ন করিতে পারিলে একটি ছয় সেরি দুধল গাই প্রায় ১১ মাস কাল গড়ে দৈনিক ৬ সের হিসাবে দুধ দিবে। মফঃস্বল শহরে ঐরূপ দুইটা গাই ২৮০ টাকা মূল্যে খরিদ করিলে ঐ ১১ মাস কাল প্রত্যেক গাই মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে ৬০ টাকার দুধ দিবে। মাসিক খোরাকী কত লাগিবে দেখা যাক। মফঃস্বল শহরে সস্তার সময়ে বৎসরের খুদ, কলাই, খড়, কি তুলার বিচি প্রভৃতি গরুর খাণ্ড খরিদ করিয়া রাখিলে প্রত্যেক গরুর জন্ত মাসিক ছয় টাকাই যথেষ্ট—দুইটাতে

মাসিক ১২ টাকা। চাকর সম্বন্ধে কি হইবে? “স্বত্ত্বিং ন কদাচন”—মহুর এই ইঙ্গিত শিরোধার্য করিয়া যাহারা বিত্ত উপায়ে জীবিকা উপার্জন করিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার পবিত্রমেই সম্মান বোধ করেন, তাহারা অবশ্য নিজেই গাই ছহিতে শিখিবেন এবং নিজ হাতে তাহার সেবা যত্নও করিবেন। এমন কি দৈনিক বার সেব দ্বি নিজ হাতে বিলি করিতেও অপমান বোধ করিবেন না। তবে যাহারা প্রকৃত আত্মমর্যাদা অপেক্ষা বাস্তুগিরিই বেশী মূল্যবান মনে করেন তাহারা চাকর দ্বারাই গো-দোহন এবং গরুর যত্নাদি করাইবেন, নিজে মাত্র তত্ত্বাবধান করিবেন এবং তদুপযোগী শিক্ষা অবশ্য গ্রহণ করিবেন। এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে একটি আট টাকা বেতনের চাকর পশ্চিমা গাই ছহিটির এবং দেশী ছোট গাই নয়টির সেবা যত্ন এবং চিকিৎসা প্রভৃতি করিতে পারে। ছইটি গাইএর উপরে তাহার সমস্ত বেতন চাপান অত্যন্ত হইবে। হার মত ৬ সেরি দুধল ছইটি গাইএর চাকরের বেতন ৩ টাকার বেশী ধরা যায় না। এই হিসাবে দেখা যায় চাকর রাখিলে ১১ মাসে মাসিক ৩৮ টাকা এবং চাকর না রাখিলে মাসিক ৪৫ টাকা লাভ থাকে, তাহাতে মূলধন মাত্র ২৮০ টাকা দরকার। এখন প্রশ্ন এই—গাই ছইটির দুধ বন্ধ হইলে কি হইবে? একটি গাই গড়ে নয় মাস কাল গর্ভধারণ করে। গর্ভসঞ্চারণের পরেও ৪৫ মাস কাল দুধ দেয়। বাকি পাঁচ মাস কাল প্রায়ই দুধ দেয় না। তখন পূর্বের মতন ২৮০ টাকা খরচ করিয়া আরও ছইটি নবপ্রসূতা ছহি সেরি দুধের গাই খরিদ করিতে হইবে। যদি মাসিক পূর্বে ১১ মাসেই আয় হইতে ২৮০ টাকা সঞ্চয় করিয়া থাকেন তবে ত কথাই নাই। যদি কতক কৰ্জ করিতে হয় এবং মালিকের এক আধ বিধা জমি বন্ধক দিবার থাকে তবে ৫০ বার আনা কি এক টাকা শতকরা হুদে টাকা ধার করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। বন্ধুগণেই হউক ২৮০ টাকা খরচ করিয়া আরও ছইটি ছহি সেরি দুধের গাই ক্রয় করিলে সেটুকু গাই ছইটি দ্বারা পূর্বের মত মাসিক ৬০ টাকা আয় বাহাল রাখা যাইবে। তবে পার্থক্য এই যে এখন হইতে পাঁচ মাস কাল পূর্বের দুধ-

ছাড়ান গাই ছইটির খোরাকী খরচ মাসিক ১২ টাকা হিসাবে বহন করিতে হইবে। পাঁচ মাস পরে ঐ গাই ছইটি আবার প্রসব করিলে ঐ ক্ষতি সহজেই পূরণ হইবে, কারণ তখন দৈনিক ১২ সেরি দুধে ২৪ সেব দুধ হইবে এবং মাসিক আয় ৬০ টাকা হলে ১২০ টাকা হইবে। এইরূপে দুধ বন্ধ হইলে যে সামান্য ক্ষতি হইবে, প্রসবের পর তাহা পূরণ হইয়া আয় বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইবে। উপরে আমরা যে হিসাব দিলাম তাহাতে দেখা যায় ৬৬০ টাকা মূলধন—অথবা মোটামুটি ৬০০ টাকা মূলধন এবং সুবিধামত স্থানে যৎসামান্য কৃষ্ণ জমি হইলেই গোপালন এবং গব্য ব্যবসায় দ্বারা গড়ে মাসিক ৫০ টাকা লাভ পাওয়া যাইতে পারে। জমির সুবিধা থাকিলে মিশ্রকৃষি দ্বারা লাভ আরও বৃদ্ধি করা যাইবে। শস্তের পরিত্যক্ত অংশগুলি গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং গরুর মলমূত্র শস্তের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্বিধি বিস্তারিত আকারে গব্য ব্যবসায় করিলে তাহার জন্ত যেসকল চাকর নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে সমনে সময়ে তাহাদের দ্বারা শস্তকৃষির বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। এইসকল নানা কারণে গব্যকৃষি এবং শস্তকৃষি পরস্পর সংযুক্ত হইলে উভয় কৃষিরই ব্যয় লাঘব এবং আয় বৃদ্ধি করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে অধিক বলা এ স্থলে নিম্নয়োজন।

৫। গব্য ব্যবসাতে শিক্ষা।

যাহা হউক যদিও ৬০০ টাকা মাত্র মূলধন এবং যৎসামান্য জমিও লইয়া গোপালন ও গব্য ব্যবসায় আশ্রয় করিলে মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত লাভ হইতে পারে, তথাপি একথা সকলেরই জানা আবশ্যক যে তদ্বিত্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরি যে এই ব্যবসায় করিয়া কলঙ্কাঘ্য হইবে তাহা বলা যায় না। এ ব্যবসায়ের মূলই শিক্ষা। ব্যবসায় মাত্রেরি শিক্ষার প্রয়োজন। বিশেষতঃ এ ব্যবসায় জীবন্ত প্রাণীদেহ লইয়া, মাছেরই মত শরীরবিশিষ্ট গরু লইয়া। “শরীরং ব্যাধিমন্দিরং”—মাছেরের নতদূর ইহাদেরও প্রায় ততদূর। খাত্তর দোষে, কিংবা বর্ষায় ভিজিলে, কিংবা ভিজা দুর্গন্ধময় ঘরে বাস করিলে মাছেরের

মত ইহাদেরও জর, উদরাময় প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ হয়। মাত্রা অতিক্রম করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইলে, অথবা অপরদিকে কম খাওয়াইলে দুধ কমিয়া যায়। সামান্য অল্পে বাছুর মরিষা যায়, বাছুর মরিলে দুধ কমিবার কথা, তাহার প্রতিকার আবশ্যক। গরুরও গর্ভ নষ্ট প্রভৃতি দোষ ঘটে কিংবা জননশক্তি হ্রাস হয়। তখন কি কর্তব্য তাহা জানা আবশ্যক। দুগ্ধবতী গাভীর কি কি লক্ষণ অথবা গাই গাভীন কিনা তাহার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আবার যে দুগ্ধ লইয়া গব্য ব্যবসায় চলিবে, সে দুগ্ধ যে উৎপন্ন হইবে মাত্র সকল সময়েরই বিক্রি হইয়া যাইবে তাহা বলা যায় না; অথচ ৪৫ ঘণ্টা কাল থাকিলেই দুধ নষ্ট হয়। কি উপায়ে দুধ অনেকক্ষণ ভাল থাকে, অথবা নানা প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী গব্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী কি, এসকলও বিশেষ জ্ঞাতব্য। গব্য ব্যবসায়ের কৃতকার্য হইতে হইলে এইরূপ নানা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। “সব্ জ্ঞান্তা” মনে করিয়া বাহারা নিজেদের জ্ঞানভিমানের বিস্তার সেই শ্রেণীর ভদ্রসন্তানেরা গব্য ব্যবসায় স্বকীয় শিক্ষাকে সামান্য জ্ঞানে তুলু কবিয়া এই ব্যবসায় গ্রহণ করিলে পরিণামে সর্বস্বান্ত হইয়া এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক ঘটিয়াছে। তাহাতেই এই ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেকের মনে কিঞ্চিৎ বিভীষিকারই উদয় হয়। কৃষি যদিও দেশের উন্নতির মূল, তথাপি বর্তমান অবস্থাতে ভদ্রসন্তানদের পক্ষে শস্ত্রকৃষির দ্বার বন্ধ। স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক স্থানে জমি মেলা বেরূপ দুর্ঘট তাহাতে মিশ্রকৃষিরও অনেক সময়ে সুবিধা হয় না। এরূপ অবস্থায় গোপালন এবং গব্যকৃষিতেই ভদ্রসন্তানদিগের বিশেষ আশা। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন সে আশা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যুবকদিগের জন্ত সেই শিক্ষার সুবিধা করা জনসাধারণেরই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে জনসাধারণ যেন এখনও নিদ্রিত। আমরা আপাততঃ আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে বতদূর সম্ভব সেই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কুমিল্লাতে একটি গোপালন এবং গব্য বিদ্যালয় খুলিতেছি। তাহার শিক্ষা-

তালিকা (Syllabus) সহ অনুলিখন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাহারা এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহারা আমাদের কাছে জানাইবেন।

শ্রীবিজ্ঞানদাস দত্ত।

চিত্রপরিচয়

সরোবরতীরে হংস।

সন্ধ্যায় স্বর্ণচ্ছটার আকাশ ও ভূমি যখন অমূল্য তখন গৃহাভিমুখী হংস সরোবর ত্যাগ করিয়া তীবে উঠিয়াছে, কেবলমাত্র এই ভাবটিই এই চিত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। চিত্রে বর্ণবৈচিত্র্য, বস্তুগত সাদৃশ্য, স্বর্ণচ্ছটার দীপ্তি এমন একটি কোমল শাস্ত উজ্জল ভাবের সংমিশ্রণে অঙ্কিত হইয়াছে যে শিল্পীর পর্যবেক্ষণ ও তুলিকা-কুশলতা মনকে বিস্ময়প্রসঙ্গায় পূর্ণ করিয়া তুলে। এই চিত্রখানি প্রাচীন, ভারত-চিত্রকলার সুন্দর নিদর্শন।

প্রব।

অসহায় হিরণ্যপ্রতিভা ভক্তিমান শিশুর তপস্যার ভাবটি চিত্রে চমৎকার ফুটিয়াছে। এ চিত্রখানি ভারত-চিত্রকলা পদ্ধতিতে অঙ্কিত।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধপ্রসঙ্গ

শাসনকর্ত্তারা রাজ্যশাসনকার্যে কি পরিমাণে আমাদের মত অল্পসময়ে চলেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের মত তাঁহাদিগকে জানাইতে দোষ নাই। তাহা জানাইতে গেলে দেশবাসী সকলকেও জানাইতে হয়; এবং সকলের মত বাহাতে এক হয়, এবং সেই মত বাহাতে শাসনসঙ্গত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রকারে শাসনপ্রণালী ও শাসনকার্য সম্বন্ধে সর্ব-সাধারণের পরোক্ষভাবে শিক্ষার সাহায্য হয়। শাসন-কর্ত্তারা যদি আমাদের মত দ্বারা একটুও চালিত না হন,



শ্রীযুক্ত বাত্রামোহন সেন, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর
অভ্যর্থনা সমিতির মুখপাত্র।

তাহা হইলেও দেশবাসীর শিক্ষালাভ কম লাভ নহে। এই জন্ত দেশের হিতাহিত বাহাতে হইতে পারে, এরূপ বিষয়ের আলোচনা সর্বদা হওয়া দরকার। কিছুদিন পূর্বে এরূপ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনার জন্ত টাউনহলে সভা হইয়াছিল, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আবার দেশবাসী সকলে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছেন। এ সময়ে খুব সজাগ ও কনিষ্ঠ ভাবে ভারতসভার কাজ করা উচিত!

পারস্যদেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে রুশিয়া বাণিজ্যব্যাপদেশে ও অত্যাশ্র উপায়ে আর সেই দেশের ঐশ্বর্য্য লুটিয়া থাইতে পাইবে না। এই জন্ত অনেক দিন হইতে রুশিয়া নানা প্রকারে পারস্তে গোলযোগ ঘটাইতেছে। কিছু দিন পূর্বে পারস্তের নৈনতুমানীয় কতকগুলি স্বদেশপ্রেমিক লোককে রুশীয়েরা ফাঁসি দেয়।



হাজি আলি, পারস্য দেশীয় সংবাদপত্র-সম্পাদক। ইনি স্বদেশে স্বায়ত্তশাসননীতি প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সমর্থন করিয়া আলোলন করিতেছিলেন বলিয়া রুশীয়েরা ইঁহাকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করিয়াছে।

তন্মধ্যে হাজি আলি নামক একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে তাত্ত্বিক ও অত্যাশ্র সহরের নিকট পারসীক ও রুসীয় সৈন্যদের মধ্যে অনেকগুলি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এইরূপ একটি যুদ্ধের ছবি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

“টাইটানিক্”জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্মচারিগণ মনে করিয়া ছিলেন যে উহা কখনই জলমগ্ন হইতে পারে না। কিন্তু একটি তুবারশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া উহা সামান্য একটি নৌকার মত ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গেল। প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের নৈপুণ্য এতই অকিঞ্চিৎকর! অতএব মানুষের দস্ত করা ভাল নয়। এই পর্য্যন্ত সকল জাতির



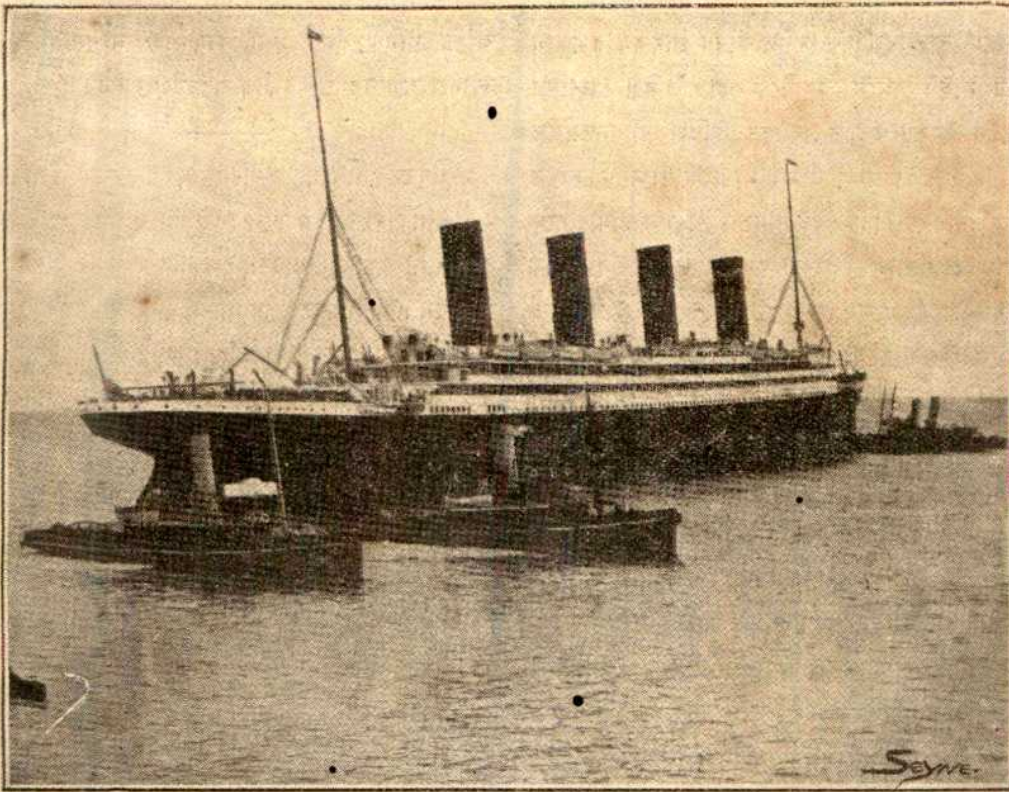
পারস্ত সৈন্যেরা অত্যাচারী রশীয় কসাক সৈন্যদলকে তাজিকের সহিত প্রদেহ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাজেরই মত এক হইবে। কিন্তু পুরুষ ও কাপুরুষের মধ্যে ইহার পর মতভেদ ও আচরণভেদ দৃষ্ট হইবে। পুরুষ বলিবে, প্রাকৃতিক শক্তি অপরাজেয় বটে, কিন্তু উহারই সাহায্যে উহাকে বশে আনিয়া কতদূর পর্য্যন্ত স্বার্থ সাধন করিতে পারি তাহা দেখিব; নতুবা জন্মই বৃথা, বাঁচিয়াই বা লাভ কি? কাপুরুষ বলিবে, বিপদের মুখে আপনাকে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; যে ক' দিন পরমায়ু আছে, কোন প্রকারে আরামে কাল কাটানই ভাল। কাপুরুষ বলিবে, যখন মরিতেই হইবে, যে ক' দিন পারা যায়, বাঁচা ভাল; মরিবার সময় নিজের বিছানায় শুইয়া আত্মীয়স্বজনের সেবা লইতে লইতে মরা ভাল। পুরুষ বলিবে, যদি মরিতেই হয়, রোগে ভুগিয়া, আত্মীয়স্বজনকে ভোগাইয়া মরায় কি লাভ? পুরুষের মত যুঝিতে যুঝিতে মরায় তীব্র আনন্দ আছে;—তাঁ সে যুদ্ধ মানুষের সঙ্গেই হউক, হিংস্রজন্তুর সহিতই হউক, বা প্রাকৃতিক শক্তির সহিতই হউক।

কথিত আছে, একবার একজন ডাক্তার মানুষ এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ভাই, তোমার প্রপিতামহ কিরূপে মারা যান? “সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হওয়ায়।”

তোমার পিতামহ? “সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে।” “তোমার পিতা? “সমুদ্রে জাহাজ ভাঙিয়া যাওয়ায়।” তখন সেই ডাক্তার মানুষ বলিল, “তবু তুমি নাবিক হইয়াছ?” নাবিক জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, তোমার সাত পুরুষ কিরূপে মরিয়াছে?” ডাক্তার মানুষ বলিল, “কেন, ঘরের মধ্যে, বিছানায় শুইয়া, কোন না কোন রোগে।” তখন নাবিক বলিল, “তবুও তুমি প্রতিদিনই ঘরে থাক, ও বিছানায় শোও? ভয় করে না?”

যে জাতির পুরুষ আছে, শত জাহাজ ডুবিয়া লক্ষ লোক মরিলেও তাহারা সমুদ্রযাত্রা ছাড়িবে না। আরও ভাল জাহাজ তৈয়ার করিবে, আরও স্বদক্ষ নাবিক হইতে চেষ্টা করিবে, জাহাজ ডুবিবার পর প্রাণরক্ষার জন্য শত উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করিবে। পুরুষে তত মানুষ মরে না; স্মেরক, কুমেরক, নানা অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় তত মানুষ মরে না; আকাশে উড়িবার চেষ্টায় তত মানুষ মরে না; যত মরে নিরুপদ্রব, মূর্খ, অলস, পৌরবহীন জাতির মধ্যে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, প্লেগ ও অনাহারে। উনবিংশ শতাব্দীর সমুদয় যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীতে যত মানুষ মরিয়াছে, শুধু ভারতে ঐসময়ে তার চেয়ে বেশী মানুষ মরিয়াছে প্লেগ আদি নিবার্য (preventible) রোগে ও



টাইটানিক জাহাজ।

হৃদয়ে। অতএব, হে ভারতবাসী, টাইটানিক জাহাজ ডুবিয়া
১৫০০ লোক মরিয়াছে বলিয়া, শোক করিও, কিন্তু ভয়
পাইও না। যাহাদের আত্মীয়স্বজন ডুবিয়া মরিয়াছে, সেই
শ্বেতকারেরা ভয় পায় নাই। তুমি গৃহকোণে বসিয়া ভয়ে
আড়ষ্ট হইও না, সমুদ্রযাত্রা হইতে বিরত হইও না। শ্বেত-
কারদের মত যদি তোমরা পুরুষ হও, উত্তমশীল হও, তাহা
হইলে, তাহাদের দেশে যেমন এখন আর প্লেগ ও হৃদয়ে
নাই, তোমাদের দেশেও তেমনি থাকিবে না। জাহাজ
ডুবি, অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার, পুরুষোচিত ক্রীড়া, আকাশে
উড্ডয়ন, ইত্যাদিতে যদি ২০০।৫০০ লোক মরা সহিতে
পার, তবেই তোমরা বড় জাতি হইতে পারিবে।

টাইটানিক জাহাজে দুই হাজারের উপর পুরুষ নারী
শিশু ছিল। তাহাদের মধ্যে ২১৪ জন ভীক্স নিজপ্রাণ-
রক্ষায় ব্যগ্র লোক পাছে জীবনতরী (life-boat)

গুলিতে লাফ দিয়া পড়িয়া সেগুলি উল্টাইয়া দিয়া শত শত
লোকের প্রাণহানির কারণ হয়, তজ্জন্তু জাহাজের কর্মচারী-
দিগকে রিভল্ভার হস্তে পথ আগুলাইতে হইয়াছিল বটে;
কিন্তু এই ২১৪ জন ভীক্স কাপুরুষতায় অবশিষ্ট শত শত বীর
পুরুষ ও বীরনারীর স্থিরচিত্ততা, সাহস ও আত্মত্যাগের
কাহিনী নিশ্চয় হইতে পারে না। হে টাইটানিকের
বীর মাঝি মাল্লা ও বীর কর্মচারীগণ, হে টাইটানিকের
বীরহৃদয় পুরুষ ও নারীযাত্রীগণ, তোমাদিগকে প্রশংসা
করি, তোমাদের বন্দনা করি। ধন্য তোমরা, ধন্য
তোমাদের জননীগণ!

কি কারণে কতকগুলি নারী ও বালকবালিকা এবং
দরিদ্র লোকের প্রাণরক্ষা হয় নাই, তাহা এখনও জানিতে
পারি নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে জীলোক এবং শিশুদের
প্রাণরক্ষার চেষ্টাই সর্বপ্রায়ে হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় যে
দরিদ্র লোকদিগকে বাদ দিয়া আগে লক্ষপতিদের

প্রাণরক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই, অজ্ঞাতনামা, যশোহীন লোকদিগকে বাদ দিয়া বিখ্যাত লোকদের প্রাণরক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই। অনেক নারীকে জোর করিয়া তাঁহাদের স্বামীদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবনতরীতে ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল, অনেক নারীকে স্বামিসঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল; তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়া জগতে সন্তীর্ণের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল আষ্টরের মত ক্রোড়পতি অনেক গরিব লোককে, অনেক স্ত্রীবিবাহিতা বধূকে জীবনতরীতে তুলিয়া দিয়া, নিজে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলেন। তাঁহারা বিলাসসুখ ভোগে অভ্যস্ত, ভোগের কোন বস্তু তাঁহাদের আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা আসন্ন মৃত্যুতে ভীত হইলেন না, নিজের প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত হইলেন না, অস্ত্রের প্রাণরক্ষাতেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলি ক্ষেপণ করিলেন। ষ্টেড সাহেবের মত ভুবন-বিখ্যাত কৰ্ম্মবীর, পাছে জীবনতরীতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইলে আর একজন সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়, সন্তুষ্টতঃ এই কারণেই অপর অনেকের প্রাণরক্ষাকার্য্যে সাহায্য করিয়া, শেষে নির্বিকার চিত্তে নিজ কক্ষে গিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জাহাজের কাপ্তেন অবিচলিত ভাবে নিজ কর্তব্য করিতে করিতে, এক ঢেউ খাইয়া পড়িয়া গিয়া আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া যাত্রীদের প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই আর এক ঢেউ তাঁহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের কৰ্ম্মচারীকে যখন কাপ্তেন বলিলেন, তুমি নিজ কর্তব্য করিয়াছ, এখন আত্মরক্ষা কর, তখন জাহাজের উপর সমুদ্রের জল উঠিয়াছে, সমুদ্রের ঢেউ খেলিতেছে; তখনও যুবক নিজের কর্তব্য করিতেছেন! কাপ্তেন মরিবার সময়ও মাঝিমালাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—“তোমরা ব্রিটিশ হও,” অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতি যেমন আত্মোৎসর্গপরায়ণ বীর হয়, তাহাই হও।

মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যে আত্মহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় সে মানুষ নামের অযোগ্য; যে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, সে উচ্চতর শ্রেণীর অধিকারী; যে গতান্তর নাই জানিয়া স্থির চিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, সে মানুষ নামকে কলঙ্কিত

করে না। কিন্তু মানুষের মত মানুষ তিনি যিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, নিরুদ্বেগ থাকেন, এবং আপনার কথা না ভাবিয়া অপরের প্রাণরক্ষার জন্যই ব্যস্ত হন।

শ্রীযুক্ত গোথ্লে বলিয়াছেন, বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাপুলি দ্বারা আরও ভাল কাজ হইতে পারে, যদি আরও অধিক সংখ্যক স্বাধীনচেতা, যোগ্য ও অবসরবিশিষ্ট লোক সভ্য হন। তাঁহার মতে এক্ষণ স্বাধীনচেতা, যোগ্য লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবসার জন্য, এই কাজে যথেষ্ট সময়ে দিতে পারেন না। তাঁহারা যাহা সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব সাধারণের হিতার্থে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে সমস্ত সময় যদি নিয়োগ করেন, তাহা হইলে খুব ভাল কাজ হয়।

ইহা অতি সত্য কথা। দুকূল রক্ষা, কোন কাজেই, কোন কালেই হয় না।

পিতৃস্মৃতি

(৩)

পিতামহ প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগান যুরোপের ধনীদিগের প্রমোদকাননের অনুকরণে সাজাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। বহুমূল্য ছবি, মূর্ত্তি, গৃহসজ্জা এবং ঝিল, কৃত্রিম পাহাড় ও চিড়িয়াখানায় তাহার সমতুল্য বাগান কলিকাতায় বোধ হয় আর ছিল না। এই বাগানে প্রতি শনিবার রাত্রে পিতামহ শহরের বড় বড় সাহেব মেমদের ভোজ্য দিতেন, অনেক সম্রাস্ত হিন্দুও গোপনে তাহার ভাগ লইয়া যাইতেন। তখনকার কাগজে বিজ্ঞপ করিয়া একটা কবিতা বাহির হইয়াছিল তাহার এক অংশ আমার মনে আছে :—

“বেলগেছের বাগানে হয় ছুরি কাঁটার বনবানি,
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা কি জানি।

জানেন ঠাকুর কোম্পানি।”

পিতামহের মৃত্যুর পক্ষে এই বাগানে মেজকালা এবং কাকীমা প্রায় থাকিতেন। তখন আমরা সেখানে এক-একদিন বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে সেই ঝিলের মধ্যে

পদ্মবন ও চিড়িয়াখানার পক্ষ পাখী আমার স্বপ্নের মত মনে পড়ে।

কিন্তু পিতৃদেব এই বাগানের জাঁকজমকের মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন না। পলতায় গজার ধারে একটা ঘাগান ছিল। সেটা একটা বৃহৎ আশ্রয়। সেখানে সাজ সজ্জা কিছুই ছিল না, কেবল সামান্ত একটা ছোট বাড়ি ছিল। সেই আমবাগানে গিয়া তিনি প্রায় থাকিতেন। গ্রীষ্মের সময় সেখানে তিনি বহুবান্ধবদের লইয়া গঙ্গার স্নান করিতেন ও গাছ হইতে আম পাড়িয়া খাইতেন ও খাওয়াইতেন। ঐশ্বর্যভোগ তাঁহার মনের সঙ্গে মিলিত না, অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যভোগেই তাঁহার আনন্দ ছিল।

পিতামহ দ্বিতীয়বার বিলাতে যাওয়ার পর বেলগেছের বাগানে সাহেবের ভোজ বন্ধ হইয়া গেল। তখন শহরের অনেক খানালোলুপ সম্রাট লোক পিতার ডিনার টেবিল আশ্রয় করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন এবং জ্ঞান বৃত্তির রাধিয়া চলিতেন। যখন সুনিয়ন ব্যাক ফেল হওয়ার পরে একসময় ঐশ্বর্যভোগের মধ্যে পড়িতে হইল তখন এক রাজ্বেই পিতা ডিনারের সমারোহ বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজ-নারায়ণ বাবু প্রায় তাঁহার সঙ্গে খাইতেন। সেদিন তিনি আসিয়া দেখিলেন টেবিলে ভাল রকমি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, এই খাইয়া আপনার চলিবে কি করিয়া? পিতা কহিলেন, ঈশ্বর যখন যে অবস্থার মধ্যে ফেলেন তখন সেই অবস্থার মত চলিতে পারিলে তবেই সব ঠিক চলে। এখন হইতে পিতা সংসারের সকল প্রকার ধরচ-সম্বন্ধেই অত্যন্ত চিন্তাচর্চা করিয়া চলিতে লাগিলেন—পুরাতন চাল বজায় রাখিয়া লোকসমাজে অভিমান বাঁচাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না—এবং পিতামহ তাঁহার উইলে দ্বিগুণ অঙ্কদের সাহায্যের জন্য যে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ শোধ করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি সামান্ত পরিমাণ দেনাকেও অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহার ছেলেকে কেহ ঐশ্বর্য করিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য ধরিলে তিনি বলিতেন আমি কি চিরজীবন কেবল ঐশ্বর্য খোঁখাই করিব? সীতানাথ ঘোষ মহাশয় ঐশ্বর্যপ্রস্তু হইয়া যখন তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি এককালে সাত হাজার

টাকার কোম্পানির কাগজ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন—ঐশ্বর্যের চূর্ণ যে কত বড় তাহা তিনি জানিতেন বলিয়াই ঐশ্বর্য প্রতি তাঁহার সমবেদনা এত প্রবল ছিল।

পিতৃদেব ছোট বড় সকল কাজেই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার নিজের আহার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত কাজই ষড়্ধি ধরিয়া সম্পন্ন হইত। তিনি যখন পাহাড়ের ছিলেন আমাদের বাড়িতে বাঙালী শরের প্রচলিত নিয়ম অর্থাৎ অনিয়ম অনুসারে নিত্যকর্মে সময়রক্ষার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি সেইসমস্ত বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য বাড়িতে বর্ণা-বাহাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইবার জন্য ঘণ্টার ঘণ্টা বাজিত। দালানে গিয়া প্রাত্যহিক উপাসনার যোগ দিবার জন্য সাতটার ঘণ্টার আহ্বান পড়িত। স্নান করিবার সময় জানাইতে বেলা দশটার সময় ঘণ্টা বাজিত। সেই সময় কাছারির কর্মচারীরা আসিয়া কাজে নিযুক্ত হইত। মধ্যাহ্নে বাবোটার ঘণ্টায় আমাদের আহারের সময় জ্ঞাপন করিত। চারিটার ঘণ্টায় জানা যাইত এইবার ছেলেরা স্কুল হইতে আসিয়া আহাবাদি করিবে। পাঁচটার সময় কাছারি বন্ধ হইত। অবশেষে রাজি দশটার ঘণ্টায় শয়নের জন্য ডাক পড়িত। এইরূপে পরিবারিক কর্মের তালটি বেতাল হইত। না ঠাঁড়ায় সেই জন্য তিনি এইরূপ তালরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্যদের মধ্যেও কর্মবিভাগ ছিল। বাহার প্রতি যে কর্মের ভার থাকিত, কেবল সেইক্ষেত্রে সম্বন্ধেই তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ছিল। এলোমেলো দায়িত্ব-বিহীন ভাবে কাজ হইবার জো ছিল না।

কোনো বিষয়ে তিনি কোনোপ্রকার অপব্যয় ভাব-বাসিতেন না। কারণ, অপব্যয় একটা প্রধান অব্যবস্থা, এবং অব্যবস্থা মাত্রই তাঁহার কাছে কুৎসিত ঠেংকিত; সেইসমস্ত শৈথিল্যে জীবনযাত্রার যে ছন্দভঙ্গ করে তাহা তাঁহার কাছে পীড়াজনক ছিল। আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম, তখন বৎসরে আমাদের যে কয় জোড়া কাপড় বরাবর ছিল তাহা পুরাতন হইলে সেই পুরাতন কাপড় সরকারকে দেখাইয়া তবে আমরা নূতন কাপড় পাইতাম। এমন কি পুরাতন সাবানের টুকরা সরকারকে না দিয়া

আমরা নূতন সাবান পাইতাম না। তখনকার কালের প্রাথমিক পাতলা শাড়ি পরিবার হুকুম আমাদের ছিল না। আমাদের জ্ঞাত বিশেষ করিয়া ফবমাস দিয়া ফরাসডালা হইতে কাপড় তৈরি কবাটয়া আনা হইত। জমকালো জরিজড়াও কাপড়ের বিলাসিতা পিতা পছন্দ করিতেন না—ভদ্রতারক্ষার উপযোগী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজই তাঁহার মনঃপূত ছিল। পিতামহের আমলে পূজার সময় বৎসরে বৎসরে ছেলে মেয়ে ও বধূরা খুব দামী দামী জরি দেওয়া কাপড় পাইতেন। দুই তিন মাস আগে হইতে বাড়িতে দর্জি কাজ করিতে বসিয়া যাইত। প্রত্যেক ছেলেব জরির টুপি, একটি স্টুট চাপকান ইজাব ও একখানি রেশমী রুমাল প্রতিবৎসর বরাদ্দ ছিল। পিতামহের মৃত্যুর পরেও এই বরাদ্দ কিছু কাল চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ঐশ্বর্যের ক্ষাড়ম্বর পিতার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না বলিয়া এসকল প্রথা অধিককাল টিকিতে পারে নাই। অথচ বাহা স্বার্থ আবশ্যক তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল। তখন শীতকালে গায়ে গরম কাপড় পরার রীতি মেয়েদের মধ্যে ছিল না, আমরা পাতলা কাপড় পরিয়াই শীত যাপন করিতাম। মিশনরি মেমরা শীতের সময় আমাদের সেই পাতলা কাপড় পবা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইত—তাহারা বলিত, তোমাদের কি শীত করে না? পিতা আমাদের জ্ঞাত রেশমের রেজাই তৈরি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এমন আমাদের অভ্যাস, সে রেজাই আমরা পরিতে পারিতাম না, গরম হইত, খুলিয়া ফেলিতাম। একবার শীতে আমাদের জ্ঞাত শালের জামিয়ার তৈরি করাইয়া দিলেন—কিন্তু সেও আমরা গায়ে দিতে পারিতাম না। তাহার পরে জামার ব্যবস্থা হইল। মা একবার আমার ছোট দুই ভগিনীর নাক বিধাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও, কর্তাকে দেখাইয়া নোলক চাহিয়া আন। তিনি নাক বৈধান দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এ কি সং সাজিয়াছ! যাও যাও খুলিয়া ফেল। বয় বর্ষররাই ত নাক কান ছুঁড়িয়া গহনা পরে—এ কি ভদ্রসমাজের যোগ্য। মা তাহাই শুনিয়া লজ্জায় মেয়েদের নোলক পরাইবার সাধ মন হইতে দূর করিয়া দিলেন। পূর্বে আমাদের বাড়ীতে মেয়েদের কর্ণ-বেধের সময় সমারোহপূর্ব্বক মেয়েদের ডাকিয়া থাওয়ানো

হইত। এই কান বিধাইবার উৎসব পিতা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোষাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত—আমরা মেয়েরা সেই দিন তেতালার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম। তখন বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতালার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম। তখন বন্ধন এমন কঠিন ছিল যে পুরাতন চাকর ছাড়া বাহিরেব অস্ত্র কোন পুরুষ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না। মেজদাদা সেই বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি যে দিন সিভিলসার্ভিসের জ্ঞাত বিলাতে যাত্রা করিবেন সেই রাত্রে আমাদের অন্তঃপুরের উপাসনা-ঘরে আমরা পরিবারের সকলে মিলিয়া উপাসনা করিয়াছিলাম। সেই উপাসনা-সভায় কেশব বাবু বাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমাদের সকলের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহার পর মেজদাদা সিভিলিয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মেজদাদা সিংহুল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেবেলা হইতেই মেজদাদা অবরোধ-প্রথার বিরোধী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া তাঁহার উৎসাহ আবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। মেজবোঠাকুরাণী স্বভাবতই অত্যন্ত বেশি লজ্জাবতী ছিলেন; তাঁহার সেই চিরদিনের সঙ্কোচ দূর করিয়া দেওয়াই মেজদাদার বিশেষ অধ্যবসায় হইল। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইবে মেজদাদার এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া পিতৃদেব একটি বড় ঘরে খাইবার স্থান নির্দেশ করিয়া আমাদের সকলের একত্রে থাওয়া নিয়ম করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম আমরা লজ্জায় খাইতেই পারিতাম না—অল্প কিছু মুখে দিয়া বসিয়া থাকিতাম, ক্রমে ক্রমে আমাদের লজ্জা ভাঙিল। মেজবোঠাকুরাণীই বধাই ধরণের শাড়ি পরা আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন।

আমাদের বাড়িতে নাচ বা স্কটচবিরুদ্ধ যাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু পরিবারের মধ্যে বিস্তৃত আমোদপ্রমোদে পিতৃদেব কোনো দিন বাধা দেন নাই। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা মিলিয়া আপনা আপনির মধ্যে অভিনয় করিবার

উদ্দেশ্যে বাহিরের বড় ঘবে ঠেঙ্গ বাঁধিবার অস্ত্র যখন তাঁহার অল্পমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইল, তখন আমাদের মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি পাছে তিনি বিরক্ত হন। তিনি সন্মতি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে উপর সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। একবার এইরূপ পাবিবাবিক অভিনয় দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা করিতে গেলাম তিনি আমাকে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার একটি নাথবো পুঙ্খ সাজিয়াছিলেন ও সেই সজ্জায় তাঁহাকে সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল শুনিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রতিপালিত আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতবার কত অপরাধই করিয়াছে, সেসমস্ত তিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করিয়াছেন। বাহির হইতে বল-পূর্বক কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রতিরোধ করা তাঁহার স্বভাবসঙ্গত ছিল না। যে আদর্শ অন্তরেব মধ্যে থাকিয়া মানুষকে সত্যভাবে নিয়মিত করে তাহাবই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কৃত্রিম উপাসনাপ্রথা যেমন তিনি পরিহার করিয়াছিলেন কৃত্রিম শাসনপ্রথা তেমনি তাঁহার কচিকর ছিল না। অথচ তিনি তেজস্বী পুঙ্খ ছিলেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা-অক্ষমেব দুর্বল সহিষ্ণুতা নহে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার ক্ষমতাব কোথাও কোনো ব্যাঘাতের কারণ ছিল না, তাঁহারই প্রসাদের উপর সকলের নির্ভর ছিল; তাঁহাকে সকলে ধণেষ্ঠ ভয়ও করিত। তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অনভিপ্রেত সকল কর্মকেই অনায়াসে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্মের বল ছাড়া অস্ত্র বলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না, এই জন্য তিনি নিজের শুভইচ্ছা প্রবর্তন করিবার অস্ত্র অস্ত্রের শুভবুদ্ধির অপেক্ষা করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম অত্যাশ্রয়ের পূর্বে দেশের ধর্ম ও সমাজনীতিব প্রতি যখন শিক্ষিত লোকের অশ্রদ্ধা সঞ্চাব হইয়াছিল তখন অনেক ভদ্র হিন্দুঘরের ছেলে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদেরই কোনো আত্মীয় যুবক এইরূপে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আমার পিতা স্বয়ং গিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া পুনরায় তাহার মতি ফিরাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার উপদেশে

দৃষ্টান্তে ও ধর্মোৎসাহে যে তখনকার অনেক যুবকের দ্বিধা দূর করিয়াছিল ও স্বদেশীয় ধর্মের উচ্চতম আদর্শেব প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার হিন্দুসমাজের যেখানে দুর্গতিব কারণ আছে সেখানেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। একদিন আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আমি ব্যবসায়ী গুরু হইতে হইতে রক্ষা করিয়াছি। যাহারা অর্থলোলুপ হইয়া ধর্মকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, মস্ত পড়ায় কিন্তু মস্তের অর্থই জানে না, শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি যাহাদেব কোনো লক্ষ্যই নাই, তাহাদিগকে ভক্তি কবিতা ভক্তির অবমাননা করা হইতে আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি।

জীলোকদিগকে তিনি বিশেষভাবে সম্মান করিতেন। যে কোনো মহিলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সকলকেই মাতৃসম্বোধন করিয়া অত্যন্ত যত্ন আদর করিতেন। তাঁহার যে যেমন কথা শুনিতে আসিতেন সকলকে তাহা বুঝাইয়া বলিয়া সকলের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন। একবার আমি কোনো আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তুমি সেখানে গেলে তিনি কি করিতেছিলেন? আমি বলিলাম, তিনি শুইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন না? আমি বলিলাম, না। তাহাতে তিনি বিষম হইলেন। সেই আত্মীয়টি জীলোকের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই বলিয়াই পিতার মনে ক্ষোভ জন্মিল।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

হেমকণা

(১)

আমার নববয়স দেখিয়া বা নবীন রাজমুদ্রা দেখিয়া ভাবিও না যে আমি গত বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি যদি তোমাকে এখন বলি যে আমি তোমা অপেক্ষা প্রাচীন, তোমাদিগের অতি বৃদ্ধ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহা

হইলে তুমি বিশ্বাস করিবে না, হাসিবে, বলিবে নবীন যৌবনে মস্তিষ্কবিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে। যদি সমস্ত কথা বলি তাহা হইলে হয়ত উহা উদ্ভাদের প্রলাপ হইবে। তুমি ভাবিবে যে আমার উজ্জ্বল হেমকান্তি, সুগঠিত দেহ, তাহার উপর সুন্দর বাজমুদ্রা আমাব নবীনত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, রাজমুদ্রার তারিখে আমাব জন্মপত্রিকা রহিয়াছে, সুতরাং আমার বয়স সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। আমি বলিব তুমি বাহিরেব চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়াছ; অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছ না। গত বৎসর আমি নূতন অবয়ব পাইয়াছি মাত্র, যে রাজমুদ্রা আমার নবীন যৌবনের কারণ তাহা গত বৎসর জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি সহ প্রাচীন, এমন কি তোমাদিগের মানবজাতি অপেক্ষাও প্রাচীন। তুমি যদি বিশ্বাস কব তাহা হইলে আমার জন্মকথা বলি, তুমি শুনিয়া যাও।

অনেক দিন পূর্বে দিন, মাস, বৎসর, কাল প্রভৃতি নামকরণ হইবাব বহু পূর্বে, ভীষণ অন্ধকাবের মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম। জন্মের পরে বহুকাল অস্তিত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু বোধ করিতে পারিতাম না, চারিদিকে নিশ্চলতা ও অন্ধকার আমাকে বেঁটন করিয়া ছিল। যুগব্যাপী নিশ্চলতার মধ্যে জন্মগ্রহণ কবিয়া বহুযুগ তদবস্থ ছিলাম। আমার পার্শ্ববর্তী কণাসমূহের মুখে শুনিতাম, দূরে বহুদূরে কণাসমূহ আলোক দেখিতে পায়; যাহাদিগকে আলোক স্পর্শ করিয়াছে তাহারা জল, বায়ু প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পায়। তাহারা বলে যে দূরে কণাসমূহের উপর দিয়া একটা ক্ষুদ্র জলশ্রোত বহিয়া যায়। প্রতিদিন শত শত কণা জলের শ্রোতে ভাসিয়া যায়। যে পাষণ মধ্যে কণাসমূহ আবদ্ধ আছে তাহার বিশাল বকের উপর দিয়া নির্মলসলিলা নির্ঝরিণী দ্রুতগমনকালে বর্ষণে তাহাকে ক্স করিয়া থাকে ও প্রতিদিন শত শত কণাকে কারামুক্ত কবিয়া দেয়। পাষণে ছিদ্র পাইলেই তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করে ও সমগ্র পাষণকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিয়া রাখে। মধ্যে মধ্যে শ্রোতস্থিনী কঠিন স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়, তখন আর আমাদিগেব কারামুক্তি হয় না। বহু দিবস, বহু রজনী নির্মল জলবাণী স্বচ্ছ তুষার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। ইহাতে

আমাদিগের একটা মহত্বপূর্ণ সাধিত হইত। পাষণের মধ্যে ছিদ্রপথে যে যে স্থানে জল প্রবেশ কবিত তাহাও এই সময়ে তুষাবে পরিণত হইত, জলকণাগুলি তুষারকণায় পরিণত হইবাব সময়ে আকারে বর্ধিত হইত ও সেই সময়ে কঠিন পাষণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ইহাতে আমাদিগের বড়ই আনন্দ হইত, যে নির্ভুব পাষণ আমাদিগকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া রাখিত, বাহাতে আবদ্ধ হইয়া আমরা চির অন্ধকার মধ্যে অসহায় অবস্থায় পতিত ছিলাম, তাহাও ক্ষুদ্র জলকণাব শক্তিতে শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এইরূপে আমবা ক্রমশঃ আলোকের নিকটে আসিতাম, কাবণ যখন তুষার গলিয়া যাইত, সূর্য্যোত্তাপে হিমরাশি জলশ্রোতে পরিণত হইত, তখন অর্ধগলিত চূর্ণীকৃত তুষারখণ্ডের সহিত বিদীর্ণ পাষণখণ্ডগুলি মহাশব্দে নিয়াভিমুখে গমন করিত, জলশ্রোত ক্রমশঃ আমাদিগের নিকট সবিয়া আসিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদিগেরও মুক্তির দিন অগ্রসর হইতেছিল।

একদিন ক্ষুদ্র বৃহৎ শত সহস্র পাষণখণ্ডের পতনে আমার মস্তকেব নিকট পর্য্যন্ত একটা ক্ষীণ ছিদ্র হইল; তাহার পর ধীরে ধীরে ছিদ্রপথে জলকণার পর জলকণা প্রবেশ করিতে লাগিল; একটা জলকণা আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল, তাহার কোমল শীতল স্পর্শ আমাকে মুগ্ধ করিয়া বাধিল; আমি আজীবন কঠিন পাষণের মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম, জলকণাব ভ্রায় কোমল পদার্থ কখনও দেখি নাই বা স্পর্শ করি নাই, সুতরাং আমি অতি সহজেই মুগ্ধ হইলাম।

জলকণা কত কথা কহিত। সে বলিত, তারকামণ্ডিত নীল আকাশে শুভ্র মেঘপুঞ্জের মধ্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার জন্মের দিন শুভ্র মেঘপুঞ্জ নীলাকাশে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, ইন্দ্রধনু শুভ্র স্তূপে নানা বর্ণে রঞ্জিত কবিয়াছিল, ইন্দের বজ্রের আলোক নীল লোহিত আভায় জগৎ উজ্জ্বল করিয়াছিল, জন্ম হইবামাত্র সে সহস্র সহস্র বারিকণার সহিত স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মর্ত্যে আসিয়া সমস্ত জলকণা একত্র হইয়া পর্কতশিখর হইতে বেগে নিয়াভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। পথে বেগসম্বরণ করিতে না পারিয়া সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়াছে। জলকণা অনেক দিন আমার মস্তকের পার্শ্বে ছিল, সে কত কথা কহিত। আমাদের উপরে পর্কত-শুদ্ধ লক্ষ লক্ষ বৎসরের তুষার সঞ্চিত আছে, তুষারের ভার অধিক হইলে কিয়দংশ পর্কতস্বক হইতে খলিত হইয়া নিম্নাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে। পর্কতের পার্শ্বে একটা তুষারের নদ আছে, সে স্থানে তরুলতা বা জীবজন্তু কিছুই নাই। বহু নিম্নে আসিয়া তুষারময় নদ নির্ঝরিত হইতে পরিণত হইয়াছে, যে স্থানে তুষার গলিতেছে সে স্থানে শত শত তরুলতা জন্মগ্রহণ করিয়া স্থানটিকে উজানে পরিণত করিয়াছে। পর্কতের পার্শ্বে একটা গভীর কূত আছে, স্থানটি অতি রমণীয়, ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত বৃক্ষ ক্ষতস্থান পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদিন সহস্র সহস্র বৃক্ষে ও লতার নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া ক্ষুদ্র বনটিকে সুসজ্জিত করিয়া রাখে। পর্কতস্বক হইতে রক্তধারা নির্গত হইয়া অবিরাম পর্কতের সাহস্রদেশে যে প্রাণাণধণ্ডে আমবা আবদ্ধ আছি তাহাব উপব নিপতিত হইতেছে, শত শত জলকণা পথচ্যুত হইয়া কাননটিকে স্ফিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। জলরাশি পতনের শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হয়, ভয়ে রক্তনীতে কোন জীবজন্তু নির্ঝরিত নিকট আসে না। সময়ে সময়ে নির্ঝরিত তুষারে পরিণত হয়, জলরাশি তুষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গগনস্পর্শী ক্ষটিকস্তম্ভের স্তায় দণ্ডায়মান থাকে, তরুলতা পত্রশূন্য হইয়া যায় ও রমণীয় কানন মরুভূমিতে পরিণত হয়। জলকণা আরও বলিত যে আমি অধিক দিন এখানে থাকিব না, আমাকে লইয়া যাইতে মেঘরাজ্যের শত শত জলকণা প্রতি দিন আসিতেছে, তাহারা যে দিন তুষারে পরিণত হইবে সে দিন আমিও তুষারে পরিণত হইব, তাহাব পর একত্র হইয়া চলিয়া যাইব। আমরা ভাবিতাম সে দিন আসিলে আমরাও বন্ধনমুক্ত হইব।

দিন আসিল, জলকণা ক্ষীত হইতে লাগিল, ক্রমে স্বচ্ছ কোমল জলকণা ধূসরবর্ণ কঠিন তুষারে পরিণত হইল। সেই সময়ে প্রাণাণের শত ছিদ্রে শত শত জলকণা তুষারে পরিণত হইয়া আকারে বর্ধিত হইল, সহসা ভীষণ শব্দের সহিত প্রাণাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। হঠাৎ কোথা হইতে উজ্জল আলোক আসিয়া আমাদেরকে অন্ধ করিয়া দিল, অল্পস্থানে বৃষ্টিলাগে আমরা মুক্ত হইতে চলিয়াছি। তখনও জলরাশি তুষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চল বহিয়াছে, উজ্জল আলোক গুহ্র তুষারে প্রতিফলিত হইয়া হেম-আভার দিল্লিত প্রজ্জলিত করিয়া তুলিয়াছে, চতুর্দিকে মহা শান্তি বিরাজিত।

একদিন দূর হইতে ধৌতবর্ণের একটা ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া আসিল, তাহা দেখিয়া আমার প্রতিবেশীরা কহিল যে এইবার বসন্ত আসিতেছে, জলরাশি মুক্ত

হইয়া পুনরায় চলিতে আবস্তু করিবে, কানন পুনরায় পত্রপুষ্পে শোভিত হইবে। তাহার সহিত আমরাও চলিতে আরম্ভ করিব, আমাদেরই কারাগৃহেব কন্দুধাব মুক্ত হইয়াছে, পূর্বতান স্থান পবিত্যাগ করিয়া নূতন দেখিতে হইবে, প্রতিদিন অবস্থাব পরিবর্তন হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী-বান্ধালী

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহাকুমার অন্তর্গত জাঠাগ্রামের জমিদার, পণ্ডিত বাখালাল শিবোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহোদয় বাবু গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে হইতে এলাহাবাদ-প্রবাসে ছিলেন। তিনি তথায় সেক্রেটারিগ্রেট কর্তৃক কবিতেন। শিবোমণি মহাশয়ের পুত্র বাবু কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেই স্থানে বালাকালেই প্রয়াগ-প্রবাসে আসিয়াছিলেন। এখানে এবং তাত্র তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। লক্ষ্মোএর গবর্ণমেন্ট-এডজুকেট প্রেসিডেন্ট প্রবাসী-বান্ধালী পবলোকপত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু এম এ, মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কুমারচন্দ্র বাবু শীঘ্রই কলেজ ত্যাগ করিয়া একটা এণ্ট্রান্স স্কুলের হেডমাষ্টার হন এবং অল্পদিন পরেই অব্যোধ্যায় অন্তর্গত প্রতাপগড়ের রাজা চিংপাল সিং (এক, দি, এন্স) মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করবর কালে কুমারচন্দ্র বাবু গৃহে আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং অল্পকালের মধ্যে হাইকোর্ট প্রীডারশিপ পত্রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতাপগড় জেলা আদালতে ওকালতী ব্যবসায় আবস্তু করেন। ইহাব কিছুকাল পরে তিনি পার্শ্ববর্তী জেলা খেবীতে গিয়া বাস করেন। খেবীর আদালত আপিস প্রভৃতি সমস্ত ইহার প্রধান শহর লখীমপুরে অবস্থিত। “আউথ-রোহিলখণ্ড” রেলপথে এখানে আসিতে হয়। জেলাটা ক্ষুদ্র, শিক্ষা সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে এখন এখনও বহু গশ্যতে পড়িয়া আছে; কুমারচন্দ্র বাবুর আগমন কালে তে নিতান্তই অল্পমত ছিল। ১৮১৬ বৎসর এখানে চিনির কাবধানা, কাগজ, মাছ, চাটাই প্রভৃতি প্রস্তুত করণোপযোগী ঘাসের কারবার, ও কৃষি, গবাদি পশুপালন ও বুদ্ধি এবং বন-বিভাগীয় কর্ম্মের স্বত্বপত হওয়ার ইহার উন্নতিলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলেও তখন ইহা নিবিড়বনজঙ্গলপরিপূর্ণ ও হিংস্রজন্তুসমাকুল ছিল। যদিও সেই সময় জঙ্গল হইতে শালকাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং এখনও তাহার বিস্তৃত ব্যবসায় রহিয়াছে, তথাপি সেখানে প্রবাসী বান্ধালীর আতর্ষ্যের বস্তু বিশেষ কিছুই ছিল না। এই কারণে সময়ে সময়ে

এখানকার উৎকৃষ্ট আবাদী জমি নাম মাত্র খাজনার পাওয়া যায় দেখিয়া বহু পূর্বে হইতে কোন কোন বাঙ্গালী এখানে ভূসম্পত্তি করিয়া স্থায়ী বাস স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াও কেহ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। একমাত্র কুমারচন্দ্র বাবুই এখানে প্রথম স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। স্থানীয় আদালতে তাঁহার প্রসার বৃদ্ধি ও প্রখ্যাতি, জনসাধারণের মধ্যে সম্মান প্রতিপত্তি এবং স্থানীয় ভূতালুকের তালুকদার-দিগের সহিত সৌহার্দ্যই তাঁহার পক্ষে প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল এবং তাহাই তাঁহার খেরী-প্রবাসের মূল। তিনি যখন লখীমপুরে আগমন করেন, তখন এখানে বাবু প্রসাদী নারায়ণ নামে জনৈক ডেপুটি পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিখ্যাত ডাকপেরাদাদিগের দ্বারা গোপনে বিপন্ন বাজপুরুষদিগের নিকট বিদ্রোহ-গণের গতিবিধির সংবাদ প্রেরণ করিতেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ “রঞ্জীৎনগর” জমিদারী দান করেন। কুমারচন্দ্র বাবু তাঁহার নিকট হইতে এই জমিদারী ক্রয় করিয়া স্থানীয় জমিদারগণের অন্যতম হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ২৫ বৎসর জুজনের সহিত ওকালতী করিয়া ১৮৯৯ অব্দে কুমারচন্দ্র বাবু পরলোক গমন করেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তখন রঞ্জীৎনগরের জমিদারী বিক্রয় করিয়া সপরিবারে প্রবাসবাস উঠাইয়া স্বীয় ভ্রাতাদিগের নিকট পূর্ববঙ্গের আদি বাসস্থানে চলিয়া যান। প্রবাসী কুমারচন্দ্র বাবুর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ তাঁহার জীবন অট্টালিকা মাত্র এক্ষণে লখীমপুরে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা পাঁচ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম তথায় জনৈক স্থানীয় উকীল ভাড়া ছিলেন। আর কোন বাঙ্গালী এখানে স্থায়ী অধিবাসী হন নাই বটে, কিন্তু রেল ও গবর্ণমেন্টের বিবিধ বিভাগে কর্ম লইয়া বহু বাঙ্গালী মধ্যে মধ্যে খেরী লখীমপুরে প্রবাসবাস করিয়া যান। তন্মধ্যে চিকিৎসা বিভাগেই তাঁহাদের আবির্ভাব কিছু ঘন ঘন। কুমারচন্দ্র বাবু এখানে ওকালতী করিতে আসিয়া একজন বাঙ্গালী ডাক্তারকে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার বেণীমাধব দাস বহুকাল সিভিল মেডিকেল অফিসের কর্ম করিয়া ডাক্তার বিনোদবিহারী ঘোষকে কার্যভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। বিনোদ বাবুর পর ডাক্তার বনমালী পাল সিভিল মেডিকেল অফিসের হইয়া আসিয়া সাত বৎসর খেরী-প্রবাসে অবস্থিতি করেন এবং ১৮৯৯ অব্দে কুমারচন্দ্র বাবুর মৃত্যুর সময় বনমালী বাবু স্থানান্তরে গমন করিলে এসিষ্ট্যান্ট সার্জন হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগমন করেন। পাঁচ-বৎসর পূর্বে আমরা যখন খেরী গিয়াছিলাম, তখনও লখীমপুর হাঁসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তারকেই দেখিয়াছিলাম।

এবং সেই সময় দেখিয়াছিলাম খেরীজেলার অন্তর্গত “ঝিণ্ডিপুরা” তালুকের ম্যানেজার জনৈক বাঙ্গালী। তাঁহাকে কার্যোপলক্ষে অধিকাংশ সময় সদবে অর্থাৎ লখীমপুরে থাকিতে হয়। তাঁহার সহিত আলাপ প্রসঙ্গেই কুমারচন্দ্র বাবুর জমিদারী লাভ ও প্রবাসবাসের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি কুমারচন্দ্র বাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি খেরীপ্রবাসী হইয়া আছেন। খেরী জেলার অধীন “ভূর” নামে একটা তালুক আছে। তাহার বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। পূর্বে উহা “মাঝগাঁই” ও “জগদেবপুর” নামে দুই অংশে বিভক্ত ছিল। চৌহান রাজপুত্রবংশীয় রাজমিলাপ, সিং ও তাঁহার ভ্রাতা রাজদিদৌপাং সিং তাঁহার অধিকারী ছিলেন। মিলাপ সিং এক কস্তা রাখিয়া পরলোক গমন করিলে নিঃসন্তান দিল্লীপাংই ভূর ষ্টেটের একাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার তিনজন জ্ঞাতভ্রাতা দেবীবল্লভ, রঘুবর ও মঙ্গল সিং সমান ভিন অংশে উহা ভোগ করিতে থাকেন। রাজদেবীবল্লভ এক কস্তা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে মাজ-গাঁইএর তালুকদার মৃত মিলাপ সিংহের কস্তা পিতার উত্তরাধিকার স্বত্বের দাবী করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গৃহ-বিবাদস্থলে দেবীবল্লভের অন্ত দুই ভ্রাতা রঘুবর সিং ও মঙ্গলসিং এই মকদ্দমার ইংরাজী কাগজপত্র পরিরক্ষণের জন্ত বিপিন বাবুকে নিযুক্ত করেন। ইহার তিন বৎসর পরে দেবীবল্লভের বিধবা পত্নী রাণী চন্দ্রপাল কুমার মকদ্দমার অধিক অগ্রসর না হইয়া স্বামীর পরিত্যক্ত এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির পরিবর্তে স্বীয় ভরণপোষণের উপযোগী বার্ষিক ৩২ হাজার টাকা আয়ের কয়েকখানি মাত্র গ্রাম লইয়াই অপোগে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ঐ অংশই “ঝিণ্ডিপুরা” তালুকের ছোট অংশ। ভূরষ্টেটের বর্তমান নাম “ঝিণ্ডিপুরা”। এই ছোট তালুক তিন জন জিলাদার বা তহশীলদারের অধীনে তিনটি চাকলা বা জিলায় বিভক্ত। কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্যপদ্ধতিতে ইহার কার্য পরিচালিত হয়। পূর্বে অন্তান্ত সামন্ত রাজ্যের জায় ভূরষ্টেটের প্রধান কর্মচারী “দেওয়ান” নামে অভিহিত হইতেন। তালুক খণ্ডীকৃত হইয়া উক্ত পদে এক্ষণে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। রাণী চন্দ্রপালকুমার সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিপিন বাবুকে স্বীয় ষ্টেটে “ম্যানেজার” মনোনীত করিয়া খেরীর ডেপুটি কমিশনের সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। কমিশনের বাহাদুরের নিয়োগে ১৯০৬ অব্দ হইতে বিপিনবাবু যোগ্যতার সহিত “ঝিণ্ডিপুরা” ছোট ষ্টেটের ম্যানেজারী করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নামসাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১২শ ভাগ

১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩১৯

৩য় সংখ্যা

জীবন-স্মৃতি

কারোয়ার ।

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা সদর ষ্ট্রিটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম ।

কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্ণাটের প্রধান নগর । তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ । মেঘদাদা তখন সেখানে জন্ম ছিলেন ।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই । অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাবুয়াশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—সে বেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা । প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় বাড়িগাছের অরণ্য ; এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধের উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে । মনে আছে একদিন স্তরূপকের গোথুলিতে একটু ছোট নৌকার করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম । এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিচূর্ণ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম । নিস্তরূ বন

পাহাড় এবং এই নির্জন সঙ্কীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের আত্মমন্ত্র পড়িয়া দিল । আমরা তীরে নামিয়া একজন চাবার কুটীরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম । প্রাচীরের ঢালু ছায়াটির উপর দিয়া যেখানে চাঁদের আলো আড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে তাহাদের দাওয়াটির সামনে আসন পাতিয়া আহার করিয়া বইলাম । কিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল ।

সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইল । সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম । তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরূ, ঝাউবনের নিয়ন্ত্রণমণ্ডিত চাকল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিঃশব্দ, দিক্চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন । এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মাছুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম । বাড়িতে যখন পৌছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল । সেই রাতেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিচ্ছিন্ন । সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদেব কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত

গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিন্তু আশা করি
জীবনস্মৃতির মধ্যে তাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে
তাহার পক্ষে অর্নধিকারপ্রবেশ হইবে না।

যাই যাই ডুবে যাই; আরো আরো ডুবে যাই
বিহ্বল অবশ অচেতন।

কোন্ খানে কোন্ দূরে, নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।

হে ধরণী, পদতলে দিয়োনা, দিয়োনা বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও!

অনন্ত দিবসনিশি এমনি ডুবিতে থাকি
তোমরা স্নদূরে চলে যাও।

তোমরা চাহিয়া থাক, জ্যোৎস্নাঅমৃতপানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি;

অপার দিগন্ত ওগো থাক এ মাথার পরে
ছই দিকে ছই পাখা তুলি।

গান নাই, কথা নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম নাই আগরণ,—

কোথা কিছু নাহি আগে, সর্কাজে জ্যোৎস্না লাগে,
সর্কাজ পুলকে অচেতন।

অসীমে সুনীলে শূন্ডে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
ভারে যেন দেখা নাহি যায়;

নিশীথের মাঝে শুধু মহান একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায়।

গাও বিশ্ব গাও তুমি স্নদূর অদৃষ্ট হতে
গাও তব নাবিকেব গান,

শতলক্ষ বাত্মী লয়ে কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।

অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে—

বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশারে যাই
অনন্তের স্নদূর স্নদূরে।

একথা এখানে বলা আবশ্যক কোনো সত্ত্ব আবেগে মন যখন
কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভাল হইতে
হইবে এমন কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা।
ভাবের সঙ্গে ভাবকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে

না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে
তাহা অস্বকূল হয় না। স্ববর্ণের তুলিতেই কবিত্বের রং
কোটে ভাল। প্রত্যক্ষের একটা জ্বরদন্তি আছে—কিছু
জরিমাণে তাহাব শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা
আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয় সকলপ্রকার
কাকুলতাতেও কাকুলতার চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা
চাই—মাত্ত্বের অন্তঃকরণে মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, কর্ত্ত্ব
তাহারি হাতের না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই
যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্ত্ত্ব করিতে যায় তবে তাহা
প্রতিবিম্ব হয় প্রতিমূর্ত্তি হয় না।

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এই কারোয়ারে “প্রকৃতির প্রতিশোধ” নামক
নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী
সমস্ত মেহবন্ধন মারাবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জরী
হইয়া একান্ত বিগতভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে
চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে
একটি বালিকা তাহাকে মেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের
ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন
ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—কুজকে
লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই
মুক্তি। প্রেমের আলো যখন পাই তখনি যেখানে চোখ
মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতিব সৌন্দর্য্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের
মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ
পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা
আপনাকে তুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার
জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের
প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইচ্ছাকালে অসীম আপনাকে
প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাধির মধ্যে
আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য
ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে স্নদের
মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ কবে সেখানে সেই প্রত্যক্ষ-
বোধের কাছে কোনো তর্ক থাকিবে কি করিয়া? এই
হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-

সিংহাসনের অধিরাঙ্গ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক যতসব গ্রামেব নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতাব মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমেব মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের দেহভূতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুটিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমার অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দিষ্টভাষায় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধও সেই ইতিহাসটিই একটু অল্প রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার ত মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিনাত্রি পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমেব সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।”

তখনো “আলোচনা” নাম দিয়া যে ছোট গল্প প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অন্তঃস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা কবা হইয়াছে। তত্ত্ব হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কিনা, এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর স্থান কি, তাহা জানি না—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিনাত্রি আইডিয়া অলঙ্কারভাবে নানা বেশে

আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কাব্যোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড় একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া তর দিয়া দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদেগো নন্দরাণী—

আমাদের শ্রামকে ছেড়ে দাও—

আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব

আমাদের শ্রামকে দিয়ে বাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে বাইতেছে,—সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না,—সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে,—সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়;—সেইখানেই মাঠে ঘাটে বনে পর্বতে অসীমেব সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দূরে নয় ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য—পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট—ভেননা, সর্বত্রই যাহাব আনন্দ, তাহাকে কোনো বড় জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার অল্প আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১৯৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয় তখন আমার বয়স ২২ বৎসর।

ছবি ও গান।

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সাকুলাররোডের একটি বাগান-বাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বসতি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ,

বিশ্রাম, খেলা ও আনাপোনা দেখিতে আমার ভারি ভাল লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মত হইত।

নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি বেন স্বস্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া বিরিয়া লইয়া দেখিতাম। একএকটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি কবিতা নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভাল লাগিত। সে আর কিছু নয়, একএকটি পরিষ্কৃষ্ট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিষকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পৃথিবীর উপর রেখা ও রং দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও স্রষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা কবিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলি রং ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাস্তু উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে; আমিও সেইদিন নবমোবনের নানান রঙের বাস্তু নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলি রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশ বছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলোকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়ত ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্বেই লিখিয়াছি প্রভাতসঙ্গীতে একটা পর্ক শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর একরকম কবিতা স্রু হইল। একটা জিনিষের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসব হইতে থাকে তত সেসমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিষ আছে। সেগুলি যদি গাছেব পাতা হইত তবে নিশ্চয় ঝরিয়া যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা ত অত সহজে বাবে

না, তাহার দিন-ফুবাইলেও সে টি কিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্ত জিনিষকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই “ছবি ও গান”-এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের স্র যেন শাদা কথাকেও গভীর কবিতা তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন স্রবে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসঙ্গীতের স্বাক্ষর সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিন্তাধারা একটা স্র জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিবে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। একএকদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণেব একটা স্র মিলিতেছে। ছোট শিশু যেমন ধূলা বালি ঝিকু-শামুক বাহা খুসি তাহাই লইয়া খেলিতে পারে কেননা তাহার মনের ভিতরেই খেলা জাগিতেছে; সে আপনার অন্তরের খেলার আনন্দ দ্বারা জগতের আনন্দ-খেলাকে সত্যভাবেই আবিষ্কার করিতে পারে, এই জন্ত সর্বত্রই তাহার আয়োজন; তেমনি অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা স্রেরে ভরিয়া উঠে তখন আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজীব লক্ষ তার নিত্য স্রেরে যেখানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই—তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দুঃখ বাইতে হয় না।

বালক।

ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল-এব মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মত ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহিব কবিবার জন্য মেজবোঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, স্রবীন্দ্র বসেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখার কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাদেরও রচনার ভার গ্রহণ করিতে

বলেন। ছুই, এক সংখ্যা “বালক” বাহির হইবার পর একবার ছুই একদিনেব জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতার ফিরিবার সময় রাত্রে গাড়িতে ভিড় ছিল, ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না,— ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম বন্ধ হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল; স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত কৰুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতার তাহার বাপ অহরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অভ্যুদয় আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া “রাজর্ষি” গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কি আমার জীবনে কি আমার গৃহপক্ষে কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখন যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধাবের ধরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূর প্রবাসের অতিথির মত অনাহৃত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত।—কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোট ঘরটাতে কত অন্তত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সীমা নাই; তাহাবা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা—কোনো তাহাদের প্রয়োজন নাই কেবল ভাসিয়া বেড়াইত। উহারই মধ্যে ছুই একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন

ছিল না—তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বন্ধনকে বন্ধনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি বাহাদের পক্ষে কেতন নিশ্চয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বা-চুলওয়ালা ছেলে তাহার কার্নিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মত কার্নিক এক বিনাতার অভ্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটাই কার্নিক নহে তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু যে পাখী উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তগবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক—ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল সে বি-এ পড়িতেছে কিন্তু বাবার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম কিন্তু অত্যন্ত অধিকংশ বিতর্কই ভ্রায় ডাক্তারিবিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না সুতরাং কি উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্ব্বভয়ে আপনায় জী আমার মাতা ছিলেন তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আপনি বোধহয় এ সমস্ত বিশ্বাস করেন না। আমি বলিলাম, আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার বোগ যদি সারে ত সারুক। জীর পাদোদক বলিয়া এতী জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অগ্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বহুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসঙ্কোচে সেই ধূমচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমেই অত্যন্ত স্থল করেকটি ঘটনার স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল তাহার অন্য যে ব্যাধি থাক্ মস্তিষ্কের হরলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্ব্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম এ সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন

চিঠি পাইলাম আমার গতজন্মের একটি কল্পাস্তান রোগশাস্ত্রের জন্ত আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুস্তটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মেব কল্পাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

এদিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো কোনো দিন, দিনও এমন করিয়া কাটিত। আসল কথা, মাহুঘের “আমি” বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না গুঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মত ভাসিয়া চলিয়া যায় আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের ইতিপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মেলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধকরি তিনি আশা করিয়াছিলেন কোনো এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মেলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব—সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কি একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবা বয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্মান বোদ্ধকবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহেব সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিতার বারমর্শের প্রেরণী সঙ্গিনী তরবারীর প্রতি তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসগীতি যে একদিন চন্দ্রনাথ বাবুর প্রিয় কবিতা ছিল ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কেবল যে এক সময়ে চন্দ্রনাথ বাবু যুবক ছিলেন তাহা নহে তখনকার সময়টাই কিছু অন্তরকম ছিল।

সেই সম্মেলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা

লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—বাহাকে অল্প পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরবাস্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃষ্ট তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতুহল সঞ্চরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্ত প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন বাহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খজানাসায়, তাঁহার চাপা চৌটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বঙ্কিমের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটাই সর্বাঙ্গের বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোট ঘটনা ঘটিল তাহাব হবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘবে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহাব বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম বাবু ঘরে হুকিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অন্নীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু উপলক্ষ্য ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন

সেখানে তাঁহার বাসার সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, বধাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা কবিরাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্ধাচীন সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন করিয়া বিনা পবিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।

তাঁহার পরে বয়সে আরো কিছু বড় হইয়াছি; সে সময়কার লেখকদের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি—কিন্তু সে আসনটা কিরূপ, ও কোন্‌খানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না;—ক্রমে ক্রমে যে একটু খ্যাতি পাইতেছিলাম তাহাব মধ্যে যথেষ্ট বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা অড়িত হইয়াছিল; তখনকাব দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতী ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমাসন, কেহ আর কিছু; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেটা শেলির পক্ষে যুগমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল; তখন আমি কলভাবার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি; তখন বিজ্ঞাও ছিলনা, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গল্প পত্র বাহা লিখিতাম তাঁহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি, স্তম্ভাং তাহাকে ভাল বলিতে গেলেও জোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তখন আমার বেশভূষা ব্যবহারেও সেই অর্ধশুটতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল; চুল ছিল বড় বড় এবং ভাবগতিকেও কবিত্বের একটা তুরীয় রকমের সৌধিনতা প্রকাশ পাইত; অত্যন্তই খাপছাড়া হইয়াছিলাম, বেশ সহজ মানুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার-আচরণের মধ্যে গিয়া পৌছিয়া সকলের সঙ্গে সুলস্কৃত হইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় “নবজীবন” মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন—আমিও তাহাতে দুটা একটা লেখা দিয়াছি।

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনেব পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচার-এ একটি গান ও কোনো বৈষ্ণব

পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ কবিয়াছি।

এই সময়ে কিধা ইহারই কিছু পূর্ব হইতে আমি বঙ্কিম বাবুব কাছে আবাব একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ মন্ডের ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুব কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন স্তনিবাব বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক কিন্তু সঙ্কোচে কথা সন্নিত না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীব বাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুসি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করার তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতোও আনন্দ হইত। বাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়াছেন যে সে লেখাগুলি কথা কহার অল্প আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসব জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে; তাহাব পবে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখাব মধ্যেও তেমনি অবোধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিত পাওয়া যায়।

এই সময়ে কলিকাতায় পশ্চিম তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যাদয় ঘটে। বঙ্কিম বাবুর মুখেই তাঁহাব কথা প্রথম শুনলাম। আমার মনে হইতেছে প্রথমটা বঙ্কিম বাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পবিচয়ের স্ত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কোলৌস্ত প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহাব প্রচার পত্রে তিনি যে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপবে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি তখন আমাব কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া

পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কোতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্র আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল চুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়েব উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহাব ইতিহাস রহিয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ঔরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere'র ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্বাভাস)

৩

মুসলমানধর্ম—মুসলমানধর্মের সাধারণ লক্ষণঃ—একেশ্বরবাদ, পিতৃ-শাসনতন্ত্র, সাম্রাজ্য।—মুসলমান সভ্যতা।—কালিক-শাসনের ইতিহাস।—মুসলমানধর্মের উপর সেমিটিক ও আর্যগণের প্রভাব।—মুসলমানধর্মের পরিপুষ্টি, যোগবাদ, হুসিসম্প্রদায়।—রীতিনীতি।—শাসনতন্ত্র।—আইন।—দর্শনঃ—সোটাফেলাইট, ফরাবী, অভিসেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র—সাহিত্য।—আরব-কবিতাঃ—প্রাচীন কবিগুরুবৃন্দ, আবু-নুবাস।—ফার্সি-কবিতাঃ—ফার্দীসী, সাহি, হাম্বিজ।—মুসলমান-দিগের শিল্পকলা।

মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের মধ্যে আর একটি উপাদান প্রবেশ লাভ করে—সেটি মুসলমানধর্ম। মুসলমানগণ কর্তৃক যে সভ্যতা ভাবতে আনীত হয়, তাহার বিশেষ লক্ষণগুলি পরিস্ফুটরূপে নেত্রসমক্ষে আনিতে পাবিলে আলোচনার পক্ষে সুবিধা হইবে।

আরব রীতিনীতি, ইহুদিধর্ম, ও খৃষ্টধর্মের প্রভাবের বশবর্তী হইয়া মহম্মদ বৈষ্ণব মুসলমানধর্মের আদর্শ

কল্পনা করিয়াছিলেন, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনার প্রবৃত্ত হইব।

একেশ্বরবাদ—কোরানের তৃতীয় বচনে এইরূপ

পরিব্যক্ত হইয়াছেঃ—

“ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই—তিনি জীবন্ত, স্বরত্ত্ব স্বপ্রকাশ—পৃথিবীতে, আকাশে যাহা কিছু অবস্থিতি করে—তিনি সমস্তই জানিতেছেন, কিছুই তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন নাই; তিনিই যেচ্ছাক্রমে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি ছাড়া আব দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই; তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।”

“বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সেই ঈশ্বর স্বকীয় আশ্রয়রূপে কাহাকে উৎপাদন করেন নাই”—

মহম্মদ জিব্ববাদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সৃষ্ট জগৎ হইতে তিনি পৃথকভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সৃষ্টির পূর্বেও অজ্ঞপ্রকৃতি যে বিস্তারিত ছিল, কোরানের কোন কোন বচন হইতে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে।

একেশ্বরবাদ হইতে উৎপন্ন দুইটি মতবাদ মুসলমান-সভ্যতার বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অদৃষ্টবাদ।—Mazdeisme ও খৃষ্টধর্মের স্রষ্টা কোরানও, পুণ্যবানের জন্ত স্বর্গ ও পাপীর জন্ত নরকে অস্তিত্ব স্বীকার করে। নবকের রাজা ঈব্লিস (গ্রীক্‌স্‌ diabolos হইতে উৎপন্ন)।

কোরানে এইরূপ উক্ত হইয়াছেঃ—

এইরূপ কথিত হয়ঃ—“আমরা যখন ভূগর্ভে শয়ন করিব, তখন নূতন জীবের স্রষ্টা আবার কি পুনর্জীবিত হইব?”

পুনরুত্থানের দিনে, প্রভুব সহিত সাক্ষাৎকাব উহার অস্বীকার কবে..

“যদি আমরা (অর্থাৎ ঈশ্বর) এইরূপই স্থির করিয়া থাকি, তাহা হইলে এতোক আত্মাই আমাদের হইতে নিজ নিজ গতি লাভ করিবে; কিন্তু আমার বাক্য হুস্পন্ন হওয়া আবশ্যকঃ—বসন্ত, কি দানব কি মানব—আমি উভয়ের ধারাই নরক পূর্ণ করিব” (XXXII)।

এই বচনটি হইতে মুসলমান ধর্ম্যাচার্যেরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঈশ্বর যখন ভবিষ্যৎদর্শী তখন তিনি মুসলমান ধর্মজ্ঞানের জন্ত, মুক্তির জন্ত, কতকগুলি বিশেষ অধিকার এবং অপব ব্যক্তিদিগের জন্ত নরক পূর্ণ হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

এবং এই ধর্মমূলক অদৃষ্টবাদ হইতে জীবনের প্রত্যেক কার্যে এক প্রকার অন্ধ অদৃষ্টবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাই, “সহস্র-একরজনী”তে ধীবর আবহুলা এইরূপ বলিতেছেঃ—“আমার দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া,

আজ সমুদ্রে আমার জাল কেলিতে বাইব। আমার জালে আজ যে বাছ পড়িবে, তাহা হইতে আমার নব-জাত শিশুর ভাগ্য—তাহার ভাবো সুখেব পরিমাণ জানা যাইবে।”

“চাহার দরেকশ” নামক আখ্যায়িকায়, কোন এক বন্ধুর সম্মানার্থ প্রদত্ত ভোজে, এক বণিকযুবক সুরাপানে বিহ্বল হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার পর সে জাগিয়া দেখিল, গৃহটি জনশূন্য, দাসবৃন্দ ও অসুখাবসামগ্ৰী সমস্তই অন্তহিত, কেবল ছুটী কাটামুণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে,—একটি তাহাব বন্ধুর, এবং অপবাতি তাহার প্রেমসীর। পরে একজন ধোজাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিল,—“একি কাণ্ড?”—ধোজা:—“আর কি, বাহা ষটিবার তাহা ষটিয়াছে, তার জন্ত চিন্তা কিসের?”—তখন বণিক-যুবক চুপ করিয়া রহিল,—ভাবিল, ধোজা ঠিক কথাই বলিয়াছে।

কালক্রমে এই অদৃষ্টবায় নিশ্চেষ্টতাবাদে (quietism) পর্যাবসিত হইল। যেসকল কারণে মুসলমান-সভ্যতার অবনতি হয় তন্মধ্যে ইহাও একটি।

তাছাড়া, একেশ্বরবাদ হইতে মূর্ত্তি পূজার প্রতি একটা বিধ্ব বিদেহ উপস্থিত হয়; এই বিদেহ এত দূর পর্যন্ত গিয়াছিল, যে কোন সৃষ্ট জীবের প্রতিমা বা চিত্র রচনা করাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মরুভূমিয সন্তান এই আরব-দিগের মূর্ত্তি-গঠন-কলায় কোন কালেই রুচি ছিল না:—মহম্মদ আসিবার পূর্বে উহারা সাকারবাদী ছিল; উহারা “জিন”দিগেব আরাধনা করিত; বিচিত্র আকারধারী, নামহীন দৈত্যদিগেব আরাধনা করিত, এবং যেসকল দেবতা প্রস্তরাদির মধ্যে অবস্থিতি করেন, সেইসকল দেবতার আরাধনা করিত। কাবার কুক্ষিলা ঐরূপ একটা প্রস্তর।

ইহুদীধর্ম ও খৃষ্টধর্মের দ্বায় যেসকল ধর্ম-ঈশ্বর-প্রত্যাশিষ্ট গ্রহ আছে, সেইসকল ধর্ম ছাড়া মহম্মদ আর কোন ধর্মকেই প্রস্তর দিতেন না। হিন্দু-দেবতার মূর্ত্তিদর্শনমাত্রই মুসলমানদিগের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। মুসলমানের চক্ষে, ঐসকল মূর্ত্তি শুধু নিরর্থক প্রতিকৃত্তি নহে—উহা জঘন্য নারকী রচনা; ব্রাহ্মণদিগকে

উহারা দানবতুল্য মনে করিত। কিন্তু ধর্মমাত্রেরই একটা স্থল বহিবাচরণ থাকা আবশ্যক। তাই মহম্মদ, ধর্মমুগ্ধতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।—যথা, রমজানের উপবাস, শুক্রবারে মসজিদে গমন, দিনের মধ্যে চারিবার ও রাজি কালে একবার নমাজ পাঠ। একটা উচ্চ স্থানে আছোহা করিয়া মুসল্লি হইয়া কোরানের এই প্রথমংশটি আবৃত্তি করে:—

জগতের অধিপতি, সেই ঈশ্বরের জয় হউক, বরাদর ঈশ্বরের জয় হউক, সেই বিচার-দিনের মহাপ্রভুর জয় হউক। আমরা সাক্ষ্যে তোমার আল্লার প্রার্থনা করিতেছি। আমাদেরকে সরল পথে লইয়া যাও; বাহাদের প্রতি ভুলি এসর, বাহারা তোমার কোপদৃষ্টির আশঙ্কা করে না, বাহারা বিপথে চলে না, তাহাদের পথে আমাদের লইয়া যাও—যদি।

মুসলমানমাত্রকেই এই কথাগুলি আবৃত্তি করিতে হয়। সত্তরজি-আসনের উপর দাঁড়াইয়া উহারা মক্কার মিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে; পরে ইটুগাড়িয়া মাটির উপর ললাট স্থাপন করে; তাহার পর শরীরের পূর্বাঙ্গ উত্তোলন করিয়া, ভুলিতে ভুলিতে নমাজ পড়ে; পরে আবার দণ্ডায়মান হয়।

মুসলমানদিগের ঘান ও উপবাসাদি দেখিয়া হিন্দুর বিস্মিত হয় নাই, কেননা ঐ প্রকাব অমুগ্ধান হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। উহাদের ভূমিষ্ঠ-প্রণতি, উহাদের নমাজ-পাঠ হিন্দুদের চক্ষে হস্তজনক বা ঐক্সকালিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইত। যেসকল আখ্যায়িকায় কোন হিন্দু রাজকুমারী কোন রূপবান মুসলমানের প্রেমে মুগ্ধ,—তাহাতে দেখা যায়, ঐ রাজকুমারী স্বকীয় নায়ককে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিতে দেখিয়া হস্ত সঞ্চরণ করিতে পারিতেছে না; পরে ভয় পাইয়া পশ্চাতে হটরা বাইতেছে।—সে ভাবে, বুঝি তাহার নায়ক কোন এক প্রকার যাদু-মন্ত্র পাঠ করিতেছে। মুসলমানদিগের অভ্যস্ত আচরণও হিন্দুদিগের নিকট অদ্ভুত ঠেকিত:—যথা কুকুরের প্রতি ঘৃণা, শূকরমাংস আহাবে নিষেধ, স্বচ্ছন্দ-অমুগ্ধান, গোর-দেওরা-প্রথা। কেবল মুসলমানদিগের একটি প্রথা হিন্দুদের উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দুরা নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগত উপাসনা ছাড়া আর কোন উপাসনাপদ্ধতি জানিত না। পক্ষান্তরে মুসলমানধর্ম

সমবেত-উপাসনার পক্ষপাতী। পরে অনেকগুলি হিন্দু-সম্প্রদায়ও এই পদ্ধতির অনুসরণ করে।

মুসলমানধর্মের আর একটি লক্ষণ—পিতৃশাসনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা; এই পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা আরবদিগের স্বভাব-সিদ্ধ।

এই পদ্ধতি হইতে অনেকগুলি ফল প্রসূত হয়। পিতার কর্তৃত্ব।—পুত্র ও পৌত্র, পিতা ও পিতামহের আজ্ঞামুখ্য হইবেক। ক্রমে এই পরিবার বিস্তৃত হইয়া, বংশ ও শাখা-জাতিতে পরিণত হয়। এমন কি আজিকার দিনেও, আরব-শাখাজাতিগণ তাহাদের সর্দারকেই মানিয়া চলে, তাহাদের উপর স্থলতানের কর্তৃত্ব নাম মাত্র।

নারীজাতির নিকৃষ্ট অবস্থা। আরবেবা চারিটি ধর্মপত্নী ও যত ইচ্ছা উপপত্নী গ্রহণ করিতে পারে, এইরূপ কোরানের বিধি। পত্নী অন্তঃপুরে বাস করিবে, এবং অবশুষ্টিতা না হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবে না,—এইরূপ কোরানের আদেশ। কিন্তু আরব-দেশে এই বিধিনিষেধগুলি যথাযথরূপে পালিত হইত না; সমাজ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে পর, তখন এইসকল নিয়মের বেশী কড়াকড় হয়।

দিগ্বিজয়ের পর, পারস্যদেশীয় শা-দিগের জায়, কালিফ ও আরব-প্রধানদিগেবও অসংখ্য উপপত্নী ছিল। Ctesiphon ও Byzancia উহাদিগকে খোজা প্রদান করিত।

পিতৃশাসনতন্ত্রে নিয়মিত ব্যাপারগুলি সমাদৃত হইয়া থাকে :—

যথা,—সমবেত ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ, অবিভক্ত সম্পত্তি, বৃদ্ধগণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, আদব-কায়দার গাভীর্ষ্য, আরবদিগের যাহা অতীব প্রিয় সেই আতিথ্যসংকার এবং কোরানের আদিষ্ট দানধর্ম।

সম্ভবতঃ এইসকল উপদেশ, হিন্দুদিগের উপরে নানা-প্রকারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আরবদিগের পিতৃশাসনতন্ত্র, আর্থাসমাজের নিয়মপদ্ধতির সহিত সহজে মিশিয়া যাইবার ই কথা। জীলোকদিগের অববোধপ্রথা, যেরূপ মুসলমানদিগের মধ্যে, সেইরূপ হিন্দুদিগের মধ্যেও সমাদৃত; কিন্তু হিন্দুরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহাকেও

দান করে না। ব্রাহ্মণেবা অন্তর্বর্ণের লোককে স্বগৃহে গ্রহণ বা আশ্রয় দান করিতে পারে না।

মুসলমানধর্মের তৃতীয় লক্ষণ—সাম্য-ব্যবহার। সকল মুসলমানের সম্বন্ধেই, একই কর্তব্য, একই অধিকার। কি পদবী, কি জন্ম, কি সৌভাগ্যসম্পদ—উহার সহিত কোন বিশেষ অধিকার সংযোজিত নাই। অবশ্য, মহম্মদ মুসলমানকে দাস্তবৃত্তি অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন :—“অবিশ্বাসী প্রভু অপেক্ষা, বিশ্বাসী দাসও ভাল। কিন্তু ওমার মুসলমানদিগের একটা স্বতন্ত্র পদমর্যাদা দিয়াছিলেন। উহারা কেবলই সৈনিক হইবে, সকলেই সৈনিক হইবে। সকলেই কর হইতে মুক্ত হইবে, উহারা সকলেই অবসরবৃত্তি পাইবে, বেতুইন আরবদিগের মতে, কালিফ একজন সর্দার—একজন লোকনির্বাচিত সর্দারমাত্র। সকল সময়েই উহারা রাজপ্রাসাদে বলপূর্বক প্রবেশ করিত, এবং কালিফের নিকট মুক্তভাবে সমস্ত কথা জানাইত। কিন্তু পাবস্ত ও বৈজয়ন্তীৰ আদব-কায়দার দৃষ্টিতে, এইরূপ ব্যবহার দৃশ্যীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই এই আদব-কায়দাব প্রভাব বেতুইন ও অন্যান্য মুসলমানদিগের মধ্যেও সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইত। “সহস্র এক রজনী”তে এই সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একজন ধীবর হারুন-অল-রসিদের নিকট আনীত হইল; একটা পাজের মধ্যে কতকগুলি চিহ্নিত কাগজের টুকরা রাখিয়া তাহার মধ্যে হাত ঢুকাইতে তাহাকে বলা হইল। ঐসকল কাগজের টুকরায়, বেত্রাঘাত, মস্তকচ্ছেদন, ফাঁসি প্রভৃতি সর্বপ্রকার দণ্ড এবং সামান্ত ভিক্ষামুষ্টি হইতে রাজ-সিংহাসন পর্যন্ত সর্বপ্রকার দান সূচিত হইয়াছে। ধীবর এই খেলা খেলিতে রাজি হইল। কিন্তু ধীবর রাজসভায় এরূপ গ্রাম্যশব্দ প্রয়োগ করিয়া মন খুলিয়া আবেগভরে কথা বলিতে লাগিল যে তাহাতে হাকন বা তাঁহার সম্ভাসদ-গণ কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না।

মুসলমানধর্ম আভিজাত্যও স্বীকার করে না, ধর্মবাজক রা পুরোহিতের কোন বিশেষ শ্রেণীকেও স্বীকার করে না(১)।

(১). কিন্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে মুসলমানধর্ম একটি বাজক সম্ভার সংগঠন করিয়াছে। “উলমা”রা (মুসলমান ভট্টাচার্য) ধর্মশাস্ত্রবেত্তা

কালিকাই ইমান, অর্থাৎ ভক্তদিগের সর্দার, প্রত্যেক নগরে, তাহার স্থলাভিষিক্ত কর্মচারীকে মসজিদের জন্ত তিনিই নির্দেশ করেন। অত্রাঙ্গণ হিন্দুব পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা করা বা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু কোবান পাঠ করা ও তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করা মুসলমানের অধিকার আছে।

মুসলমানধর্মের উপদেশ অপেক্ষা, মুসলমানধর্মের মর্মভাবটি অধিকতর প্রবল। ইহুদী সিদ্ধপুরুষগণের জ্ঞান কোরান, মুসলমান কবি ও মুসলমান তত্ত্বজ্ঞানীরাও ধনশালী ব্যক্তিদ্বিগের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। Renan যে বলিয়াছেন, সেমিটিক জাতিই পৃথিবীতে গণতন্ত্রনীতি প্রথম প্রবর্তিত করে, একথা ঠিক। Nietzsche বলেন,— যে বিদ্রোহী জাতি স্বকীয় প্রভুদের প্রাচীন নীতিতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, শক্তিশালী পুরুষদিগের নীতিব পরিবর্তে, দাসেব নীতি স্থাপন করবে, তাহারাই গণতন্ত্রের প্রথম প্রবর্তক।

মুলতান জাজিদ (Jazyd) যিনি স্বকীয় ভ্রাতৃপুত্র ও দ্বিতীয় ওয়ালিদকে (Walyd II) (২) হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, তিনি এইরূপ বক্তৃতা করিয়া ছিলেন:—

“আমি ইমরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি। উচ্চাভিলাষের দ্বারা বা অর্থলিপ্সার দ্বারা চালিত হইয়া, বা রাজ্যশাসনকর্তৃদের লোভে ও ব্যবস্বাধাতা উদ্ভব। মুসলমানের সমস্ত অধিকারই ধর্মমূলক। ধর্মশাস্ত্র ও ব্যবস্বাধাতার যুগল পত্তন তুমি:—একটি, কোরান; আর একটি, ঐতিহ্য (“হুন্ন”)। হাদিস-নামক কোন এক বিশেষ সাহিত্যের মধ্যে এই ঐতিহ্য রক্ষিত হইয়াছে। সুবস্তার প্রেক্ষাপ মালিক-বের-এনাস ইহার সংস্থাপক; ৭১৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এইসকল সংকলন-গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা-উল্লেখযোগ্য বুচারি-কৃত এলু-জামি ও সাহি (৮৫ অব্দেব কাছাকাছি)। উল্লেখ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—কাজি বা বিচারকর্তা; মুক্তি বা ব্যবস্বাধাতা; এবং ইমান বা ধর্ম-বাজকদিগের মধ্যে বাহার সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাভাজন। বাহার নিকৃষ্ট পদবীর ইমান তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ইমান-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারাই মসজিদের নবজ-পাঠক, তাহারাই “ওয়াইজ” বা এচারক, তাহারাই “শোজা” বা উপদেষ্টা, তাহারাই মুয়েজ্জিন বা উপাসনার সময়-ঘোষণাকারী (শাস্ত্র: কালিকাই প্রকৃত ইমান এবং মসজিদের ইমান তাহারই প্রতিনিধি)। তুর্কের মুক্তিদিগের মধ্যে হইতে, মুসলমানধর্মের একজন প্রধান অধ্যক্ষ বাহিয়া লয়। তিনিই প্রধান মুক্তি বা সেখউল-ইসলাম। সকল মুসলমান সম্রাটদের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ ধর্মপ্রিয় আছে।”

(২) A. Von Kremer, Kulturgeschichte des Orients (I. P. 387)

উত্তেজিত হইয়া আমি বিদ্রোহকার্যে প্রযুক্ত হই নাই। আপনাকে বাড়াইয়া ভুলিবার প্রস্তাব আমি এ কথা বলিতেছি না। ইমর দব না থাকিলে, আমি একজন পাণ্ডা ভিন্ন আর কিছুই নহি। আমি মনুষ্যদিগকে অমুনব সহকারে বলিয়াছি, তাহার ইমরের নিকট ফিরিয়া আত্মক, তাহার প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের নিকট ফিবিয়া আত্মক, তাহার প্রবস্তার উপদেশের নিকট ফিরিয়া আত্মক। অত্যাচারী রাজা কঠিন, হৃদয়ের পরিচর দ্বিখাছিল; সর্ব প্রকার পাকপুস্তকের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল। তাব না-ছিল বিশ্বাস কোরানে—না-ছিল বিশ্বাস অস্ত্রিম-বিচার-দিন সম্বন্ধে.....তাই আমি সেই হ্রুৎ রজার বিরুদ্ধে অন্তরায় করিয়াছিলাম। আমার নিজের বলে, আমার নিজের পরাক্রমে আমি অত্যাচারীকে পবাত্ত করি নাই, ইমরের মহাপ্রতিই, ইমরের অসীম পরাক্রমেই অত্যাচারীর হস্ত হইতে দেশের লোককে উদ্ধার করিয়াছে। তোমরা সবাই শোন। আমি তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আমি কখনই পাথরের উপর পাথর ভুলিয়া, ইমরের উপর ইট ভুলিয়া কোন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিব না। আমার পরীক্ষিতক, আমার সম্মানদিককে সম্মুখ করিয়া উল্লিখ না। প্রতি বৎসর, তোমাদের স্থাপিত বৃত্তির অর্থদানে ও প্রত্ন মাফে কবচরূপ কসলেব অংশদানে তোমাদের অধিকার আছে। মুসলমান-দিগের মধ্যে বাহাতে হৃৎকল্লভতার বিস্তার হয় তাহাই করা আবশ্যক বাহার রাজধানী হইতে ঘুরে অবস্থিতি করে, তাহাদিগের স্বার্থ রাজধানীর অধিবাসীদিগের স্বার্থের সহিত সমানভাবে আমরা দেখিব আমি যদি আমার অঙ্গীকার পালন করি, তোমরাও তাহ হইতে স্বেচ্ছাপূর্বক আমার আজ্ঞামুখ্য হইবে, বিপদাপদে আমাকে সহায় করিবে, আমাকে রক্ষা করিবে। যদি আমার অঙ্গীকার পূরণে কোন ত্রুটি হয়, তাহা হইলে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার তোমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু একটা কথা,—তোমরা আমাকে পূর্বকই তাহা জানাইবে, এবং যদি আমি প্রতীকার করি। ইচ্ছ করি, তাহা হইলে আমার ত্রুটি মার্জনা করিবে। যদি তোমরা এমন কোন যোগ্য লোক পাও, যে আমার জ্ঞান অকুপ্তিচিন্তে তোমাদের হিতসাধনের জন্ত অঙ্গীকার করে, তোমরা অবাধে তাহাকেই তোমাদের রাজ্যরূপে নির্বাচন করিও—এবং সর্বপ্রথমে আমিই তাহাকে প্রভু বলিয়া সম্মান করিব—তাহার সেবান নিবৃত্ত হইব। তোমরা এ কথা মনে রাখিও, যে ভাল-রকম সর্দারি করিতে পারে না, তাহার হৃদয়ও কেহ মানে না। এক্ষণে আমরা জন্ত ও তোমাদের জন্ত ইমরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমায় কণ শেষ করি।” (৩)

অবশ্য, সমস্ত মুসলমান রাজ্যগুলিই বর্ণোচ্ছাত্তমূলক। যে জনসমাজ সম্যক্রূপে বিকাশলাভ করে নাই সেই সমাজে, সামান্য নীতি হইতে অত্যাচার উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং যেসকল বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী, যেসকল ধর্মসংঘ, যেসকল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সম্মিলনী ঐ অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ, অত্যাচারী রাজা অগ্রে তাহাদিগেরই উচ্ছেদসাধন করেন। কিন্তু মুসলমান রাজ্য বাহাই হউক, মুসলমান ধর্ম যেমন সার্বভৌমিক,

(৩) এই বক্তৃতাটি প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না;—তবে, ইহা যে খুব প্রাচীনকালের তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভেমনই সাম্যবাদী ও গণতন্ত্রমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল দেশের লোকই এই ধর্ম অবলম্বন করিতে পারে। এই ধর্ম, বর্ণভেদপ্রথার স্থানে সামন্ত-তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিরাছে। অতএব বর্ণভেদপ্রথাব উচ্ছেদসাধনে এই ধর্মই উপযোগী, এবং বৌদ্ধধর্ম যে কার্যে সকল হয় নাই, এই ধর্ম আবার সেই কার্য আরম্ভ করিলে অসম্ভব হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যদিগের পূর্বাভিমুখী পথযাত্রার নূতন একটি প্রমাণ

(১) পূর্ব দিকের আর এক নাম প্রাচী। প্র-উপসর্গের টান সম্মুখের দিকে ইহা খুবই স্পষ্ট। তার সাক্ষী—প্রমাণ কিনা সম্মুখের দিকে গমন; প্রসারণ কিনা সম্মুখদিকে লম্বিত করা। pro উপসর্গেরও ঐদিকে টান; তার সাক্ষী proceed progress ইত্যাদি। তা ছাড়া পূর্ব শব্দের দেশ-ঘটিত অর্থও সম্মুখের দিক; তার সাক্ষী—পূর্ব পশ্চাৎ এবং অগ্রপশ্চাৎ এ দুই কথা একই কথা। প্রাচীন যেমন কালঘটিত পূর্ব, প্রাচী তেমন দেশঘটিত পূর্ব।

(২) পশ্চিম দিক কিনা পশ্চাৎ দিক। পশ্চিম দিক পূর্ব দিকের বিপরীত দিক এই অর্থে তাহার আরেক নাম প্রাচীচী। প্রতিপক্ষ বলিতে বিপরীত পক্ষ বুঝায় ইহা সকলেরই জানা কথা।

(৩) উত্তর দিক অর্থাৎ উপব অঞ্চল (কিনা highland—পার্বত্য প্রদেশ)। উত্তর দিকের আর এক নাম উদীচী। উৎ উপসর্গের টান উপরদিকে ইহা বলা বাহুল্য। তার সাক্ষী—উত্তোলন কিনা উপরে তোলা, যেমন হস্তোত্তোলন; উদগম কিনা উপরদিকে নির্গমন—যেমন অকুরোদগম।

(৪) দক্ষিণ দিক কিনা দক্ষিণ হস্তের দিক। দক্ষিণ দিকের আর এক নাম অবাচী। অব উপসর্গের টান নিম্নাভিমুখে; তার সাক্ষী—অবতরণ শব্দের অর্থ নীচে

নাবা, অবামুখ-শব্দের অর্থ অধোমুখ। অবাচী কিনা নিম্নভূমি (lowland)।

এইরূপ আমরা পাইতেছি যে, “পূর্ব দিক” কথাটার অর্থ সম্মুখের দিক; প্রাচী-শব্দের অর্থও তাই। পশ্চিম-শব্দের অর্থ পশ্চাৎ; প্রাচীচী-শব্দের অর্থও তাই। “উত্তর-প্রদেশ” কথাটার অর্থ উপব-অঞ্চল অর্থাৎ পার্বত্য-প্রদেশ (highland); উদীচী শব্দের অর্থও তাই। “দক্ষিণ দিক” কথাটার অর্থ দক্ষিণ হস্তের দিক। অবাচী শব্দের অর্থ নিম্নভূমি (lowland)। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, এক দল আৰ্য্যের ভারত-যাত্রাকালে তাঁহাদের সম্মুখের পথ ক্রমাগতই পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া চলিতেছিল, আর, সেই গতিকে তাঁহাদের পশ্চাতের পথ পশ্চিমদিকে পড়িয়া বাইতেছিল; হিমালয়ের পার্বত্যপ্রদেশ তাঁহাদের উত্তরদিকে বণ্ডায়মান ছিল; এবং তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বের (অর্থাৎ ডাহিন পার্শ্বের) নিম্ন ভূমি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত ছিল। তবেই হইতেছে যে, ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যেরা পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে আর একটি কথা আমায় বক্তব্য এই যে, pro-উপসর্গ এবং ob-উপসর্গ দুয়েবই টান সম্মুখের দিকে। প্রভেদ কেবল এই যে, pro-উপসর্গের বিশেষ দৃষ্টি সম্মুখ-প্রবর্তিত ক্রিয়ার প্রতি (যেমন proceed, progress, propel), ob-উপসর্গের বিশেষ দৃষ্টি সম্মুখস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতি (যেমন object, obtain, observe)। লাতিন ভাষার ob-উপসর্গ এবং সংস্কৃত ভাষার অভি-উপসর্গ দোহে দোহার সহোদর ভ্রাতা। তার সাক্ষী—অভ্যাগত অতিথি কিনা সম্মুখাগত অতিথি; পূর্বাভিমুখে—কিনা পূর্বতর্কে সম্মুখ করিয়া তাহাব দিকে; object অর্থাৎ সম্মুখবর্তী বিষয়। Object শব্দের আর এক অর্থ—মনচক্ষুর সম্মুখবর্তী লক্ষ্য বিষয়; অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি শব্দের অর্থও তাই। এখন কথা হইতেছে এই যে, লাতিন ভাষার occident শব্দে পশ্চিম বুঝায়। সেঞ্চুরি ডিক্শনারিতে Occident শব্দের অর্থ ভাঙ্গিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ:—Occiden(t)s=(ob, before)+(cadere, fall...(ক)

* Century Dictionary edited by Professor W. D. Whitney of Yale University.

..... (গ)
Quarter of the setting sun..... (খ)

পবিত্র occident শব্দের অবয়ব দ্বয়ের স্বার্থ হইতে (ক-হইতে) : উহাৰ মোট অর্থটি (খ-অর্থটি) কিরূপে আসিল, অভিধান খানায় তাহাৰ মূলেই কোনো উল্লেখ নাই। ক-খ'র মধ্যবর্তী শৃঙ্খলানটিতে (গ-স্থানটিতে)

যদি এই ভাবেব একটি কথা বসাইয়া দেখিয়া যায়

“ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, এই যে ল্যাটিন আৰ্য্য-দিগের পঞ্চমীত্বকালে তাহাদের সমুদ্রের পথ পশ্চিম দিকে পড়িয়াছিল,* (খ দেখ)” তবে তাহা দিয়া খাপ খায়।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর

নিদি

বঠ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ উদ্ভাস্ত ভাবে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। অনাহার, অনিদ্রা, ভাবনা, সবগুলি মিলিয়া তাহাৰ মস্তক বিশৃঙ্খল ভাবে আলোড়িত করিতেছিল।

অমর হাবড়া হইতে গাড়ী করিয়া বাসার অভিমুখে চলিল। বড়বাজারেব হাড়োয়ারীদের দোকানে, দোকানে তখন উজ্জল শোভা চকু বলসাইয়া দিতেছিল। বড় বড় জমীদার ও ভাগ্যবস্ত্রের দ্বারে দ্বারে মজলকলস, আত্মপল্লবের মালা ও কমলী বৃক্ষ; কোথাও নহবৎ বা সানাইয়ে মধুর আগমনীৰ সূচনা গাহিতেছিল। অমরনাথের মনে পড়িতেছিল তাহাদের সেই বৃহৎ পূজামণ্ডপ, পূজাব সেই ধুমধাম, চারিদিকেব সেই আনন্দকল্লোল। প্রবাস হইতে আগত পুত্রের প্রতি পিতার সেই স্নেহ ব্যবহার, চারিদিকে কেবল সমস্ত্রম প্রাণসাপূর্ণ দৃষ্টি। শৈশবের খেলাধুলাও মনে পড়িতেছিল। পূজা আসিলে যাত্রার ধূমে আহাৰ-নিদ্রা ত্যাগ, সজীল লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রতিমাৰ সমুদ্রে বলিয়া তাহাৰ দোষগুণের বিচার করা, রোদ্রে রোদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইয়া পিতার স্নেহ তিরস্কার

* পতন শব্দের অর্থ শুধুই যে কেবল নীচে পড়া, তাহা নহে। তার সাক্ষী—Accident = Ad + cident অর্থাৎ বাহা be-“falls” (হঠাৎ) এসে পড়ে। (ত্রা x পং) আপৎশব্দের অর্থও তাই।

লাভ। আর আজ? বাড়ীতে সেই পূজা, সেই পিতা; কেবল বাড়ীতে নাই সেই অমরনাথ; সেই পূজাব মনোই তাহাৰ অপরাধের বিচার করিয়া তাহাৰ দোষের ভার মাথায় বহিয়া লইয়া তখন তাহাকে চলিয়া; আশ্রিতে পিতার আদেশ হইল। দুইদিন তাহাৰ দেৱীও সহ হইল না।

নিখাস ফেলিয়া অমরনাথ ভাবিতেছিল “কিসে এমন হয়? নিজের প্রাধান্ত সামান্য আহত হইলেই মানুষ তখন আঘাতকারীকে শতগুণ বলে আঘাত করিতে চয়। বাহাকে প্রাণাধিক বলিয়া ভাবি, কই তাহাৰ উপবেও তো সে আঘাতটা করিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না? অকপট অসীম স্নেহও যখন প্রতিশোধস্বার্থেব বিষে এমন জর্জরিত হইয়া যায় তখন জগতে প্রতিশোধেবই রাজত্ব? যখন মানবেব আত্মাভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে তখনই বুঝি সে ক্ষমা স্নেহের দৃষ্টান্ত দেখাইতে সক্ষম হয়।”

নিজের কথাও মধ্যে মধ্যে মনে পড়িতেছিল। পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন, এই মাত্র ভাবিতেই এক সময়ে তাহাৰ হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত, আর এখন পিতার বাহ্যিক ক্রোধাচ্ছাদনের ভিতরে তাহাৰ দারুণ বেদনা চাঞ্চল্য দেখিয়াও কই অমরনাথ এখনো তাহাৰ কর্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই পিতা; বাহাৰ অধীনে, বাহাৰ স্নেহের আদেশের উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর রাখিয়া বানক অমরনাথের সুখ দুঃখ কখনো নিজেদের অন্তিত্ব তাহাকে বুঝিতে দেয় নাই; আজ অমরনাথের সেই বৃদ্ধ পিতা, অন্তরে ভেমনি স্নেহশীল, তথাপি সেই পিতাকে অতিক্রম করিয়া অমরনাথ তাহাৰ এখনকার সুখদুঃখের বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইতে ত কিছুমাত্র পশ্চাদ্গত নহ্ন। হায়। যৌবনলালসাই কি জগতের সাধনার ধন? তাই কি আজন্মের সজ্জিত স্নেহেব ভাণ্ডার তুচ্ছবোধে শূন্য করিয়া ফেলিয়া দিয়া নবজীবন-সমুদ্রের কূলে, আশালোকিত উদার প্রান্তরে নবীন রক্তের সঞ্চয় করিতে উৎসুক? জীর্ণ পুরাতন খাতা ফেলিয়া দিয়া নূতন বৎসরে নূতন খাতায় নূতন ব্যাপারীদের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসাব খুলিবে? হবত পুরাণ-খাতা টানিয়া বাহির করিলে সে মূলধনগুলি কাহারো দস্ত “হাতকর্জব” মধ্যেই গিয়া পড়ে। তাই নূতন ব্যবসায়

খুলিতে হইলে সে পুরাতন খাতাখানা টানিয়া ফেলিয়া দেওয়ার বেশী প্রয়োজন ?

অমরনাথ বাসায় গিয়া পৌছিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াই দেখিল সম্মুখে বুদ্ধা কি।

“আঃ বাবু এসেছেন, বাঁচা গেল, এমন ভাবনা হয়েছিল—”

“কেন বল দেখি ? চারু কোথায় ? সে ভাল আছে তো ?”

“তাই ত বলছি বাবু, ভালই যদি থাক্বে তবে আর ভাবনা বলছি কেন ?”

“কেন কি হয়েছে ?”

“জর হয়েছে আর কি। এমন মেয়ে কিন্তু বাপু বাপের জন্যে দেখিনি। একি ছাড়া বাপু। মাথার জানুলাটা খোলা আছে তা হ’ল নেই; রাত্রে না হয় বন্ধ করতে ভয় করল সকালে বন্ধ ক’রে রাখ, কি আমার বল,—তা নয়, ছ রাত্তির হিম লাগিয়ে জর হয়েছে, মরি ভেবে। হরেকে দিয়ে নরেশ ডাক্তারকে ডেকে আনল, ওষুধ দেয়া, আর আমি কি করব—”

“বাক্ বাক্ জর ছেড়েছে তো ? কবে জর হ’ল ?”

“কাল হয়েছে। ডাক্তার বলে জর এখনো ছাড়েনি।”

অমরনাথ নিঃশব্দপ্রদবিক্ষেপে চারুর শরনরূক্ষে প্রবেশ করিল। আরক্ত মুখে চক্ষু মুদিয়া চাঁক শুইয়া আছে, বোধ হয় ঘুমাইতেছে। অমরনাথ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, দুই বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়িয়া গেল। এমন আরক্ত মুখে সে জরের ঘোরে অচেতন হইয়া সেই জীর্ণ গৃহের মলিন শয্যা পড়িয়া ছিল। এখন দেখিতে ও বয়সে তাহা অপেক্ষা বড় হইলেও সেই চারুই এই “পল্লবিনী লতেব” কিশোরী চাকলতা। কিন্তু এ গৃহ জীর্ণ নয়, এ শয্যা মলিন নয়। ত্রিতলস্থ উত্তম সজ্জিত গৃহ; উচ্চ পালঙ্কে কোমলশুল্কশয্যা, বসনভূষণে সজ্জিত চারু। কিন্তু সেই চারু কি ইহার অপেক্ষা অনাথা, ইহা অপেক্ষা অধিক পরদয়াপ্রত্যাশী, অধিক সহায়হীন ছিল ? যে অমঙ্গল-শব্দ-কাতর অটুটস্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয় তাহার পার্শ্বে বসিয়া রুগ্ন মুখখানির পানে চাহিয়া ছিল, সেই স্নেহ-কাতর দৃষ্টি কি তাহাকে বিশ্বপ্রেমের উপরে স্থান দান করে নাই ? তিনি

কি জানিতেন তাঁহার স্নেহের ধন একজন নিঃসম্পর্ক কঠোর-হৃদয় বিচারকের সম্মুখে অনাথা ভিখারিণীর ভায় দাঁড়াইবে ? সে ইচ্ছা করিলেই ইহাকে পদদলিত কবিতো পারিবে ?

“অমরনাথের চক্ষে জল আসিল। আবার মনে পড়িল, কোথায় সে ক্ষুদ্র বনফুল বনে ফুটিয়া বাঁচিত কি ঝরিয়া পড়িত হে জানে ? তাহাকে ছিঁড়িয়া একপ-লোকালয়ে আনিয়া বিধের সম্মুখে তাহাকে উপহসিত করাব কারণ অমর স্বয়ং ? যদি সে সেখানে না বাইত বা তাহাদের প্রতি কণিকের হৃদয়তা না দেখাইত তাহা হইলে তো তাঁহারা তাহার সম্বন্ধে এ আশা পোষণ কবিতেন না। তাহাদের সাধ্যমত স্থপাত্রে চারুকে তাহার মাতা নিশ্চয়ই সমর্পণ করিয়া বাইতেন। চারুর এ অবস্থাব কাবণ অমরনাথ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অমরনাথ জর আছে কি না জানিবার জন্য চারুর ললাট হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেই চারু চমকিত ভাবে চাহিল। অমরকে দেখিবামাত্র ত্রস্তে শয্যার পাশ কিরিয়া বলিল, “আপনি ! কখন এসেছেন ?”

“অমর গম্ভীর মুখে বলিল, “এখনি।”

“এখনি ! গাড়ীর শব্দ কই পাইনি তো ? আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।”

“হ্যাঁ। তোমার জর হয়েছে শুনলাম, কই ছাড়েনি তো জর ?”

“হ্যাঁ। আপুনি যে পূজোর পর আসবেন বলেছিলেন, এখনি এলেন—আর যাবেন না তো ?”

“যাব।”

“আবার যাবেন, তাহ’লে কবে আসবেন ?”

“আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে চারু ?”

“আপনাদের বাড়ী ? আমার নিয়ে যাবেন ?”

“তোমায় নিয়ে যেতে বাবা আমার পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

হর্ষের আতিশয্যে চারু শয্যা উঠিয়া বসিল।

“উঠ না উঠ না এখনো খুব জ্বর রয়েছে।”

“ডাক্তার বলেছে শীগগির সেবে যাবে। কবে যাব আমরা সেখানে ?”

“কাল গেলেই হবে। তোমার সেখানে যেতে আহ্লাদ হচ্ছে চারু ?”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

“আপনাদের বাড়ী যে।”

“আমাদের বাড়ী হ’লেই কি তোমার পক্ষে সেজায়গা সম্পূর্ণ নিরাপদ চাক? আমাদের বাড়ী ব’লেই তোমার সেটা আরও ভয়ের জায়গা।”

“ভয়ের জায়গা? কেন?”

“কেন? তুমি আমি সেখানে কত দৌরাঁ তা কি বুঝতে পার না?”

বিবর্ণ কম্পিত মুখে চাক ধীরে ধীরে বালিশের উপরে মাথা রাখিল। একটু খামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, “আমি তো বুঝতে পারছি না, তাঁরা কি আমার খুব বকবেন?”

“বকবেন না হয় তা। হয় তা বেশ আদর ক’রেই জায়গা দেবেন।”

“তবে ভয় কিসের? তবে আমি যাব।”

“বেও। আমার সমস্ত অপরাধ মাথায় ক’রে নিয়ে সেখানে অপরাধিনীর মত থাকতে পারবে তো? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করতে পারবে তো চাক?”

“আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। বড্ড ভয় করছে আপনাব কথা শুনে। আপনি সেখানে থাকবেন তো?”

“আমি?” মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ হাসি হাসিয়া অমর আবাব বলিতে লাগিল “চাক, তুমি কি কিছু বুঝতে পার না? জগতের কাছে এমন ক্রুপা ও অবহেলা পাওয়ার জন্তেই কি তুমি এমন হয়েছিলে? তুমি আমার কে যে তোমার কাছে আমি থাকব? আমি হয় তা সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকব কিন্তু তোমার সেখানে স্থান হ’বে না, তোমাকে অস্ত্রের কাছে তাড়িয়ে দেবার জন্তেই তো সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।” অমরনাথ সবেগে চাকর নিকটস্থ হইয়া ছুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল “যেতে পারবে তো চাক? আমি মরে যাচ্ছি - আমার বাঁচাও—তুমি যেতে পারবে তো? তাহ’লে বাবা আমার ক্ষমা করবেন, জগতের চক্ষে আমি নিরপরাধী হ’তে পারব। তুমি অন্তকে বিয়ে করতে পারবে তো? অস্ত্রের ধরে যেতে পারবে তো?”

আবেগটা দীর্ঘ প্রশমিত হইলে অমরনাথ দেখিল চাক

নিম্পন্দ আড়ষ্ট ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে; চাহিয়া আছে কিন্তু চক্ষু স্পন্দহীন, বকের স্পন্দন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। নাসাপথে হাত দিয়া দেখিল অতি মুহূ বহুবিলম্বী শ্বাস পড়িতেছে।

“চাক—চাক—অমন ক’রে রইলে কেন? ভয় পেয়েছ? চাক—চাক।”

চাক তাহার পানে চাহিল।

“বড় কি ভয় পেয়েছ?”

জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চাক ক্ষীণস্বরে বলিল, “হ্যাঁ।”

“ভয় কি।—জ্বরটা এখনো ছাড়েনি। একটু ঘুমোও দেখি।”

চাক পাশ ফিরিয়া গুইল। অমরনাথ জানালার নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। “কতক্ষণ পরে কি আসিয়া বলিল “বাবু খাওয়া হয়েছে তো?”

“খাওয়া?—কই হয় নি তো।”

কি বক্তার দিয়া বলিয়া উঠিল “ওমা তা এতক্ষণ এসেছ বাছা তা খাওয়ার নামটা নেই? তুমিই বা কেমন মেবে বাপু, পুরুষ মানুষ কি এসব আপনি বলে? খোঁজ খবর নিতে হয়। এস বাছা খাবে এস, আহা মুখটা শুকিয়ে গ্যাচে।”

“আহার” করিবার জন্ত অমরনাথ কক্ষ হইতে বহির্বে যাবার মাত্র চাক ভয়ানকস্বরে বলিয়া উঠিল “আমার একলা থাকতে বড্ড ভয় করছে; যিকে একটু ডেকে দিন।”

অমৃতপ্তভাবে অমরনাথ তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—“একলা কই চাক—এই তো আমি এসেছি—ভয়—কি। আমি বসে আছি—তুমি ঘুমোও।”

“না না আপনি থেতে যান।” বলিয়া চাক বালিশে মুখ লুকাইল।—অমরনাথ নীচবে বসিয়া রহিল।

রাত্রে চাকর জর ১০৫ ডিগ্রী উঠিল। যাত্রনার বালিকা চীৎকার করিতে লাগিল। অমরনাথ সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে তাহাব মস্তকের নিকটে বসিয়া মাথায় বরফ ও অ-ডি কলোন সিক্ত করিল। “কি সমস্ত রাত্রি ঝাড়াইয়া মাথায় বাতাস করিল। বালিকা মন্থো মন্থো আর্দ্রকণ্ঠে

কামিনী উঠিতেছিল “আমি যাব না—আমি যাব না—
তা’হলে আমি ম’বে যাব।”

প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, “এর বোধ
হয় রেমিটেন্ট ফিবারের ধাত। কাল এটা ভাল বোঝা
যায় নি; কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছিলাম। আজ দেখছি
কি আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে।”

অর কমিল না। উত্তরোত্তর কুলক্ষণই প্রকাশ পাইতে
লাগিল। অববনাথ বৈকালে পিতাকে পত্র লিখিল—
“শ্রীচরণেশ্বর, বিবাহ করা ভিন্ন আমি আর উপায়ান্তর দেখি
না। আপনাব আদেশ রাখিতে পারিলাম না আমি
এমনি অধম। ইতি।—হস্তভাগ্য অমর।”

তারপরে অচেতন চাকর মাথা ধরিয়া তুলিয়া বলিল
“চাক—চাক—আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাবনা—আর
কোথাও যেতে হবে না, তুমি আমার, তুমি আমার কাছেই
থাক।”

চাক তাহা কিছুই শুনিতে পাইল না, সে অরের ঘোরে
অজ্ঞান, কিন্তু অমরনাথ পিতাকে পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়া
নিশ্চিতভাবে তাহার শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া কয়দিন
পবে আজ একটু আরামে ঘুমাইয়া লইল। আজ তাহার
মন হইতে সমস্ত দ্বিধা সকল দ্বন্দ্ব কাটিয়া গেছে।

চতুর্দশ দিন পবে চাকর অর ত্যাগ হইল। বলকারক
ঔষধ পথ্যেব গুণে সে পরদিনই অমরনাথের সঙ্গে ক্রীড়ার
কয়েকটা কথা কহিল। ক্রমে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া হান
ওঠের ক্রীড়াতে অমরনাথকে আশান্বিত করিল।

তারপরে ঝি ও হরি চাকর রাজে পালা ক্রমে আগিবার
ভার লইলে অমর দুই দিন খুব ঘুমাইল ও তৃপ্তিপূর্বক
আহার করিল। চাকর বাহা শুক্রবা তাহা সত্য কথা
বলিতে গেলে তাহারাই করিয়াছিল। অমর কেবল
নিজের চিন্তার ভাব মাথায় লইয়া অনাহার অনিদ্রায়
তাহার মুখেব পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত মাত্র। বাহাকে
কখনো নিজের বন্ধ করিতে হয় নাই, সে অস্ত্রের বন্ধ
কিঙ্গপে শিখবে।

ক্রমে চাকর অর পথ্য পাইল। বৈকালে অমরনাথ
তাহার কক্ষে গিয়া দেখিল চাকর যথাস্থানে শুইয়া খোলা
খাবাকপথে নীলোদ্ভল আকাশের পানে চাহিয়া আছে;

মুখখানি বিবর্ণ, শুষ্ক; সায়াকৃ সূর্যের হেমাভ রশ্মি তাহার
কক্ষ কেশে স্নান লগাটে পতিত হইয়া বিবাহবাসের
লজ্জাপাণ্ডু নববধূর লগাটে সিন্দূরশোভার ছায় দীপ্ত
পাইতেছিল। রাত্তার অপর পার্শ্বস্থ নিম্ন বুক্কে পাখী-
গুলি তাহাদের যতদূর সাধ্য গোলমাল বাধাইয়াছে,
নিম্নে স্নানসংঘের কোলাহলের বিরাম নাই। চাকর
এক মনে সেই সহস্রকণ্ঠোচ্ছিত বিচিত্র রাগিনী শুনিতে
ছিল। কতদিন পীড়ার পরে যেন মানুষ অল্প জগত হইতে
কিরিয়া আসে, চারিদিকের উদ্বেলিত আনন্দ বা দুঃখের
তরঙ্গ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সে যেন
এখন সে সকলের অনেক উচুতে রহিয়াছে; সব শুনিতেছে
অথচ কিছুই ভাল বোধগম্য হয় না, কেবল অর্থহীন দৃষ্টিতে
চাহিয়া থাকে মাত্র।

অমরনাথ মুখমুখে দেখিয়া দেখিয়া বলিল—“এখন
কেমন আছ চাক? কোন অস্বথ করছে না তো?”

“না। ভাল আছি।” বলিয়া চাক তাহাব পানে
চাহিল।

অমরনাথ নিকটে বসিয়া বলিল—“ডাক্তার বললে
ভালো করে সারতে এখনো মাস খানেক লাগবে।”

চাক ক্ষণেক নীরবে রহিয়া বলিল—“এখন আমি
সেবেছি তো,—কিন্তু উঠলে মাথা ঘোরে।”

অমরনাথ সম্মুখে নেড়ে চাহিয়া বলিল—“যে দুর্বল হ’য়ে
পড়েছ। ভাল হ’বে তা কি আর আমার আশা ছিল?
কটা দিনবাত্রি যে কি ভাবে কেটেছে জানতেও পারিনি।”

চাক অনেকক্ষণ পরে ভীত চক্ষু চটি তাহার মুখে স্থির
করিয়া ক্রীণকণ্ঠে বলিল—“আমার তখন মনে হ’ত আপনি
যেন আমার একলা ফেলে রেখে বাড়ী চলে গিয়েছেন।
তখন আপনি এখানে ছিলেন? যাননি?”

“সেকি চাক? তোমার ব্যারামে ফেলে আমি চলে
যাব—তোমার এমন বিশ্বাস হয়?”

“তখন আমার তাই মনে হ’য়েছিল।”

অমরনাথ একটু সরিয়া আসিয়া তাহার ক্রীণ হাতখানি
নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া তরল কণ্ঠে বলিল—“এখনো কি
তোমার সে ভয় আছে মতা?”

“একটু একটু আছে।”

“কেন লতা ?”

চাক চকিত কণ্ঠে বলিল—“সেদিন যেমন রাগ করে-
ছিলেন আবার যদি তেমনি কবেন।”

“রাগ ? রাগ না লতা। তোমার ওপর কি রাগ হ’তে
পারে ? তবে নিজের ওপর হয়েছিল। কেন আমি
দুর্ভাগ্যবশত নিজের কাছে বেধে তোমার তরুণ মনে
যে ভুল ধারণা ছিল তাকে আরও দৃঢ় করে তুলেছি।
তখন বাড়ী নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে তোমার দিলে তুমি
কোন দিন আমার ভুলে যেতে, স্বধী হ’তে। তা না
নিজের দুর্ভাগ্য চারি দিকে অশান্তি বৃষ্টি করলাম,
তোমাকে কতখানি কষ্ট দিলাম—তোমার তো মেবেই
ফেলছিলাম।”

“আপনি বাড়ী যান, আমার যেতে বড় ভয় করবে,
আমি যাব না।”

“এখনো তাই ভাবছ লতা ? আর আমি বাড়ী যাব
না, তোমাকেও যেতে হবে না। যদি কখনো বাবা আমাকে
তোমাকে এক সঙ্গে মাপ করেন তবেই যাব, নইলে দুজনে
এমনি সকলের পরিত্যক্ত হ’য়ে অধু পরস্পরের হ’য়ে থাকব।
লতা বুঝতে পারলে তৌ ?”

“আমার আর কোথাও পাঠিয়ে দেবেন না ?”

“পাঠিয়ে দেবো ? চিরদিন আমার কাছে এমনি ক’রে
রাখব।” বলিয়া অমরনাথ চাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া
ধরিল।

কিছুক্ষণ পরে অমরনাথ দেখিল চাক তেমনি অবস্থায়
ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতে হাত দুখানি তেমনি বদ্ধ।
গভীর স্নেহে অমর তাহার মস্তকে চুষন করিয়া আস্তে আস্তে
বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

একমাসের মধ্যে চাক সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার
পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তের সঞ্চার হইয়া সে ছটীকে আবার পূর্বের
মত কোমল লোহিত শোভায় ভরিয়া তুলিল। তাহার করুণ
চক্ষুছটীতে আবাব পূর্বের মত স্নানীল হাসি ফুটিয়া উঠিল।
সহসা একদিন প্রভাতে উঠিয়া স শুনিলা তাহার বিবাহ।

বিবাহের পূর্ব সে বাসা ছাড়িয়া দিয়া অমরনাথ ভাল
একটা ক্ষুদ্র বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাদের মিলন-

মধুর দিব্যরাত্রিকে অব্যাহত করিয়া তুলিল। অপ্রাপ্ত
কর্মকোলাহল ও আনাগোনার মধ্যে এ নিভৃত নিশ্চিন্ত
প্রেম যেন আশ্রয় পায় না। চারিদিক হইতে ঐতিক্রান্ত
শব্দ আসিয়া সে নীরব মৌন ভাষাকে সময়ে সময়ে
প্রসঙ্গান্তরে চিন্তান্তবে লইয়া ফেলে। এ কর্মহীন মিলনকে
জড় বলিয়া উপহাস করিয়া কর্মরথ-তাহার বশ্মরনাধী
রথচক্রের নির্ধোবে স্থথালস প্রাণকে চমকিত করিয়া
দিয়া যায় ; কোথায় কি সামান্য অভাব আছে তাহা বড়
করিয়া চক্ষের উপর আনিয়া ফেলে। সময়ে সময়ে এক-
একটা ঘটনার জানাইয়া দেয় এমন মধুর মিলনও নিশ্চিন্ত
ভাবে উপভোগ করিবার যথেষ্ট বাধা আছে, সংসার
তাহার তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া সময়ে সময়ে এমন তীক্ষ্ণ
উপহাসের হাসি হাসিয়া উঠে যে কর্ণমূল ও গণ্ড আনন্দ
হইয়া উঠে। সংসারের মধ্যে সংসার বাদ দিয়াও তা
চলিবার উপায় নাই।

আব এখানে ? এখানে শব্দহীন নিভৃত নিলয়ের মধ্যে
এক অল্প ছাড়া কেহ অন্য কোন কথা বলে না। শিশিরের
শীর্ণদেহা গন্ধা নিতান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে মধুর রাগিনী গাহিয়া
উজ্জানের পশ্চাত দিয়া দিবস রজনী এক ভাবেই চলিয়াছে।
যায় কোথায় বলা যায় না কিন্তু গতিরও শেষ দেখিতে পায়না
যায় না। ঘনসন্নিবিষ্ট তরুবীথি, তাহাদেরও কোন চাক্ষু-
নাই। প্রভাতে যখন তরুণ দম্পতী উজ্জানে বেড়াইয়া বেড়ায়
তখন হুই পার্শ্বে শ্রাম দুর্ভাগ্যে শিশিরবিন্দু অনেকগুলি
একত্রে জমিয়া শীতের নবোদিত নিস্তেজ স্বর্য্যকিরণে চক্কর
অভিমানাক্রম মতই ঝল্ ঝল্ করিতে থাকে। পরিচার
আকাশে উষার লোহিতচ্ছটা তাহাব শুভ্র কপোলার
ভাবাবেগজনিত লোহিত রাগেব মতই ফুটিয়া উঠে।
নিহার্য্যচ্ছন্ন কুন্দকলিকাগুলি তাহারই মত সরসসঙ্কোচে
নতবুখে প্রাণপণে আপনার ক্ষুদ্র স্বদেশের সৌরভটুকু রুদ্ধ
করিয়া রাখে, স্বর্য্যের সোহাগতপ্ত উজ্জল কর অনেক
চেষ্টায় তবে তাহাদের মুখ খুলে। মধ্যাহ্নের শাস্ত্রিচ্ছ
রৌদ্রতপ্ত গৃহে নবদম্পতীর মিলনশুভ্রনই কেবল জাগিয়া
থাকে মাত্র। সন্ধ্যার রাতে তাহাদের আলোকিত বক্ষে
সে মিলন আনন্দে পবিপূর্ণ।

বৈকালে খোলা বারান্দায় একথানা শৌহাসনেব উপরে

চাক বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি দেখিতেছিল। অমরনাথ তখন নিকটে নাই, কক্ষের মধ্যে কি করিতেছিল। চাক জানিত এখনি অমর তাহাকে নিকটে না দেখিয়া বাহিবে আসিবে, তাই চাক যথাসাধ্য গাভীরা রক্ষা করিবার জন্য সমুখের টবের গোলাপ গাছে তাহার সজ্জিত কুঁড়িটির উপর মনোনিবেশ করিয়াছিল। পূর্বাঙ্কে অমরনাথের সহিত তাহার বড় ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল তথাপি অমরনাথ আসিল না। চাক দীর্ঘ মুখ ফিরাইয়া চুরি করিয়া পশ্চাত্ত্ব উন্মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল কাহাকেও দেখা গেল না। তখন ধীবে ধীরে দ্বারের নিকটস্থ হইয়া গৃহের সমস্তটা দেখিবার জন্য উকি দিল, ভয় হইতেছিল যদি অমরনাথ এখনি কোন গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

পশ্চাত হইতে কে একরাশ কুন্দ ফুল মাথার ও মুখের উপরে ফেলিয়া দিল। চাক চমকিত হইয়া ফিরিল। পশ্চাতে অমরনাথ। অত্যন্ত আনন্দে সমস্ত মুখটা হাসিয়া উঠিল, রাগপ্রকাশ করা আব্ব ঘটিল না।

“বনের মধ্যে উকি দিয়ে কি দেখা হইছিল?”

“যাঃও!”

“এখনো রাগ পড়েনি বুঝি?”

চাক মুখখানি ভারি করিয়া বলিল “না।”

“দেখ কতগুলো ফুল তুলেছি। এস ছুজনে ছুছড়া মালাগাঁথি, যার ভাল হ’বে তারই জিত, যাব ভাল হবেনা তার হাব; সে আর আমাব ওপবে রাগ করতে পাবে না।”

“আচ্ছা বেশ। আমায় কিন্তু ভাল ফুলগুলো দিতে হ’বে।”

“যাঃ তা দেবনা। দাঁড়াও হুচ হুতো আনি। ভালগুলো চুরি করো না যেন।”

“আমি বুঝি চোর?”

“নয়ত কি?” বলিয়া হাসিতে হাসিতে অমরনাথ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হুচ হুতা লইয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল—“আগে হ’তে মুখ ভার করলে চলবেনা, মালা গাঁথা চাই।”

“আমি বুঝি তাতেই ভয় পাচ্ছি? আমার মালা নিশ্চয় তোমাব চেয়ে ঢের ভাল হ’বে।”

“দেখা যাক।”

তখন দুইজনে মালা গ্রহণে নিযুক্ত হইল। উভয়েই প্রায় সমান শিল্পী, তবু অমরনাথ বয়স-গুণে এক রকমে মালাটা গাঁথিয়া তুলিতেছিল কিন্তু চাকরই পুরা মুস্তিল। অনভ্যস্ত অঙ্গুলীতে হুচ কেবলই কাঁপিতে থাকে, কখনো হাতে ফুটিয়া যায়, ফুল যেটা বিদ্ধ হইতেছে সেটা হুজের মধ্যে এড়াইয়া ফুলিতে থাকে, পছন্দ হয় না কাজেই খুলিয়া ফেলিতে হয়। দু ভিন বার খুলিতে খুলিতে পরাইতে পরাইতে ফুলগুলিও বোঁদীর ভাগ নান ও ছিন্ন হইয়া যায়। অল্প ঘণ্টা কাটিয়া গেল তথাপি চাকর হুজ্রে আটটিব বোঁদী ফুল পরানো হইল না। অমরনাথ মালায় মুখে গ্রহি দিয়া হান্তমুখে বলিল “এইবার কার জিত হ’ল? আর লাগবে আমার সঙ্গে?”

মালাটা হাতে করিয়া লইয়া অমরনাথ একবার হাসিমুখে তাহার পানে চাহিয়া কি ভাবিল, তাবপরে রূপ করিয়া চাকর মাথার উপরে ফেলিয়া দিল। মালা মাথা গলিয়া গলায় পড়িল। চাক অস্তিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া মালা খুলিয়া অমরের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিল “চাইনে।”

“হেরে আবার উষ্টে রাগ? চাইনে বই কি?” বলিয়া অমরনাথ তাহাকে বৃকে টানিয়া লইল। তারপরে বাম হস্তে তাহাকে বেঁটন করিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে অনাদৃত মালাটি কুড়াইয়া লইয়া তাহার কণ্ঠে পুনবায় পরাইয়া দিয়া লোহিত কপোল চুষন করিয়া বলিল “এই শান্তি।”

“যাও আমি এ মালা নেব না।”

“কেন?”

“আমায়টা তবে গেঁথে দাও।”

“কতক্ষণ ধরে যে কষ্টে একটা গাঁথলাম, আবার? তুমি এইটেই নাও, তোমার গাঁথা মনে ক’রে নাও।”

“তবে যাও আমি নেব না।”

“খুলে ফেল দিকিনি কত জোর আছে।”

উভয়ে টানাটানি করিতে করিতে মালা গাছটা জিঁড়িয়া গেল। অমরনাথ হাসিয়া বলিল—“যাঃ আপদ গেল।”

চাক অপ্রতিভ হইয়া সেই ছেঁড়া মালাটাই অমরনাথের গলায় জড়াইয়া দিল।

এমন সময় উভয়ে বর্ষায়সী পরিচারিকাকে নিকটস্থ হইতে দৈন্য সাংঘাত হইয়া বসিল। বৃদ্ধা আসিয়া অস্তিত্বাবিকার ভ্রান্ত পবন গন্তীর মুখে বলিল,—“না বল্লো তো নয় বাছা, বল্লো তুমি বেবস্ত্র হও তাই আমি এতদিন কিছু বলিনি, বলি মক্কগে চলছে যখন কোনো রকমে তা মাঝখেকে ছেলোটাকে কেন তাস্ত করি, এর পবে আপনিই কিছু উপায় কববেই। তা খেলা করা ছাড়া তোমাদের তো আব কিছু করতে দেখিনে। ও বাড়ী থাকতে বড়ী চেন আংটি বা দায়েরি হবিকে দিয়ে তা বেচিয়ে এতদিন ত খবচ চালায়। টাকা কমে বই তো আর বাড়েনা, এখন যা হয় একটা উপায় কব।”

বেদনার স্থানে আঘাত পাইলে যেমন লোকে বিবর্ণ মুখে শিহরিয়া উঠে অমবনাথ সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল, বিশেষ চাকর সম্মুখে একথা শুলা হওয়ার সে লজ্জা সে মর্মে মর্মে অনুভব করিল। একথা শুনিয়া চাকর মুখ কিরূপ হইয়াছে চাহিয়া দেখিতেও তাহাব সাহস হইল না, নত মুখে রহিল।

“হরির কাছে গুনু বাছা তুমি বড় লোকের ব্যাটা, তা বাপ কি খবচপত্র দেয় না? বাগারাগি কবেছ বুঝি? তা অমন কত ঘরে হয়, ছোটো খোসামুদী করলেই তো হয়, বাপেব রাগ বই তো আর নয়—”

“চূপ কব, চূপ কর ঝি। বাবাতে আমাতে সাধারণের মত রাগারাগি খোসামোদেব সম্বন্ধ নয়। ও কথা নয়, তবে অন্ত যদি কোন উপায় থাকে তো—”

“উপায় আর কি? ব্যাটা ছেলে একটা কিছু চাকরী বাকরী করলেও ত হয়।”

“চাকরী? আমি তো কিছুই জানিনা, মেডিকেল কলেজে আরও ছবছর পড়তে হত।”

“চেষ্টা কর বাছা চেষ্টা কর, ঘরে বসে থাকলে কি হয়?”

“তাহলে কল্কাতা যেতে হয়। চাকর কাছে কে থাকবে?”

“কেন আমরা রয়েছি। আর, চাকরী করলে কি দিবেবাতিরই মানুষ আপিসে থাকে?”

“আচ্ছা দেখি ভেবে চিন্তে। তুমি এখন যাও।”

ঝি চলিয়া গেল। অমরনাথ ক্ষণেক পবে চাকর পানে চাহিয়া দেখিল, সে নত মুখে দাঁড়াইয়া পা দিয়া মাটা খুঁটিতেছে। তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া অমর বলিল “কি ভাবছ চাকর?”

চাকর কিছুকণ নীরবে থাকিয়া বলিল—“তুমি একবার বাবার কাছে যাও।”

“বাবাব কাছে? তিনি যে আমার উপব বাগ করে আছেন।”

চাকর ক্ষণেক অপলকনেত্র স্বামী পানে চাহিয়া শোকে ক্রীণস্বরে বলিল,—“সত্যি তিনি বাগ কবেছেন?—কেন? তুমি তাঁব কাছে থেলেই হয়ত তাঁর সে রাগ কমে যাবে। তুমি যাও তাঁর কাছে।”

অমবনাথ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল—“যদি ন কমা কবেন? আর, আমিও কি তাঁব ওপর অভিমান করতে পারি না?” তারপরে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল “ঝি যা বললে, আমি একটা চাকরীর চেষ্টা দেখব, তাই ভেবে কি ওকথা বলছ?”

চাকর তাহার পানে জিজ্ঞাস্বনেত্র চাহিয়া বলিল—“ঝি কি বল্লো? বাবা তোমার ওপর হয়ত বাগ কবেছেন এই তো বললে সে। বাবা তোমার ওপর কেন রাগ কবেছেন? কি এত দোষ করেছে তুমি?” বলিতে বলিতে চাকর গলার স্বর বুজিয়া আসিল।

অমরনাথ চাকর তাহার অপরাধেব গুরুত্ব বুঝাইতে ইচ্ছুক হইল না বা পিতা যে তাংকে তাগ করিয়াছেন তাহাও তাহার জানাইতে ইচ্ছা হইল না। যে এত সরল তাহার মনে কেন আর গরল মাধানো। অমর সন্তুষ্ট স্বরে বলিল “আমি যদি দিনকতকেব জন্তে বিদেশে যাই, কল্কাতায় চাকরী করতে পারব না, তুমি থাবতে পারবে তো?”

চাকর সত্রাসে বলিল—“আমি একা থাকতে পারবনা, আমার নিয়ে চল।”

অমর একটু বিরক্তির স্বরে বলিল—“কবে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি হবে চাকর? যাক এখন যাচি না, তোমার ভয় নাই।”

চাকর ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

জমীদার হরনাথবাবু তাঁহার সাবেক চাল সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। তাঁহার জীবনে যে কোন অশান্তির কারণ আছে একথা বাহিরেব কোন লোক বুঝিতেও সন্দেহ করিতে পারিত না। যেমন পূর্বে রাজি শেষে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাহিকে তিন চারি ঘণ্টা কাটাইয়া বেলা প্রায় আটটার সময় জমীদারী সেবেস্তায় আসিয়া বসিতেন এখনো সেই নিয়মে কাজ চালান। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় যথাবীতি নান কবিতা অন্তরে বধু স্বরমার নিকটে আহার করিতে বসেন। সেখানে সন্মুখ হাঙ্গে বধু নিকটে অনেক আদর আবদার করিয়া তাহার রন্ধনের দোষ গুণ বিচার কবিতা আহার করিতে পূরা এক ঘণ্টাব বেশী সময় লাগে। তাবপর ঘণ্টাটাই বিশ্রাম ও একটু নিদ্রাস্তে বধু সহিত সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কথপোকথন কবিতা পুনর্বার বহির্কীর্তীতে চলিয়া যান। তখন অনেক বিজ্ঞানজ্ঞাব তর্কালঙ্কার নৈয়ায়িক বৈদ্যাস্তিক প্রভৃতি তাঁহার বৈঠকখানাব শোভাবর্দ্ধন করেন। তর্কে তর্কে বাজি হইয়া যায়, খানসামা আসিয়া পুনঃ পুনঃ অন্তরের অমুরোধ জানাইয়া যায় যে সন্ধ্যাহিকের সময় অতীত হইতেছে। শেষে মীমাংসা শেষে পণ্ডিতগণের একবাক্যে ধস্তা ধস্তা খনি ও আশীর্ষচনের মধ্যে, তাঁহারেব রজঃশূন্ত পদের খুলি গ্রহণ ও পণ্ডিতদের প্রণামী গ্রহণের মুহু মুহুর বুন বুন শব্দের মধ্যে হরনাথবাবু সভাভঙ্গ করেন। তখন পুনর্বার সন্ধ্যাহিকাস্তে বধু মুহু মুহুর সন্মুখ অমুরোধ তিরস্কারের মধ্যে মাঝে মাঝে নিজের বিলম্বের কারণ দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার জলযোগ শেষ হয় এবং অন্তরে শয়নগৃহে বিশ্রাম করিতে করিতে ধূমপানের মধ্যে দেওয়ানের সহিত জমীদারী ও সংসারের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কথপোকথন হইয়া থাকে। বধুর প্রতিও সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকিবার আদেশ দেওয়া আছে।

সেদিনও হরনাথবাবু সন্ধ্যা জলযোগের পরে শয্যায় শুইয়া তাত্রকূট সেবন করিতেছিলেন। সম্মুখে মোড়ার উপরে সম্মুখে বসিয়া কথপোকথন করিতেছেন প্রবীণ

দেওয়ান শ্রীমাচরণ বায়। তিনি বিষয়কর্মোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলেন, বৈকালে বাতী আসিয়াছেন। সেই কর্মান্তর্গত বিষয়েরই আলোচনা চলিতেছিল। কর্তার শয্যাপ্রান্তে একখানি পাখা হাতে লইয়া সুবমা উপবিষ্টা, শুধু শুধু বসিয়া থাকাকাটা মেয়েমানুষের পক্ষে অশোভন, অছিলাব মত হাতে একটা কার্য্য থাকার দরকার, নহিলে বাতাসেব তখন কোন প্রয়োজন ছিল না। হরনাথবাবু বলিলেন “যাক্ ওরা চির দিনটাই জালাতে ছাড়ছে না। আর আপিল টাপিল করবে না তো?” দেওয়ান গম্ভীর মুখে বলিলেন “এটায় আর ট্যা কোঁ কিছু করতে পাববে না বলেই তো বিশ্বাস কিন্তু বহু মহাশয়ের নতুন একটা ছুতো খুজতে কতক্ষণ? আর ওদের জমীদারীর সীমানা আমাদের সীমানার সঙ্গে এমনি জড়াছড়ি বাধান’ যে নির্বিবাদে চল্‌বাব জোটা নেই। আপনি আর আমি এই দুটো বুড়োর অবর্ত্তমানে অল্প নতুন লোকে হয়ত এসব ভাল করে বুঝেই উঠতে পারবে না। আমাদের কিন্তু উচিত আগে হতেই—” কর্তা বাধা দিয়া বলিলেন “তাইত আমার মাকে সব কথা শোনাতে হচ্ছে, কবি শ্রীমাচরণ, আমরা থাকতে থাকতে না বুঝতে মিলে শেষে মাকেই তো কষ্ট পেতে হবে। সব বেশ মন দিয়ে শোন ত’ মা? শুনে বুঝতে চেষ্টা কোরো।”

শ্রীমাচরণ বায় কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন হরনাথবাবুও সম্বোরে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেওয়ান হরনাথবাবুর পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন— “আমার ইচ্ছা করে আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা কই, যদি আপনি—”

“সেকি শ্রীমা? তুমি এরকম ভাবে তো আমার সঙ্গে কখনো কথা কও না, ছোটভাইয়ের অধিকার চিরদিন তোমাব কি অক্ষুণ্ণ নেই?”

“আছে। কিন্তু ভেবে দেখুন ঈশ্বর-দত্ত অধিকার যদি সামান্য মনোমালিন্জে নুগ্ন হয় তা হ’লে এ জগতে কোন অধিকারের গরু থাকে?”

হরনাথবাবু কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, শেষে বলিলেন— “অপ্রাসঙ্গিক কথা ছেড়ে দাও শ্রীমাচরণ, মিছামিছি মনটা ওলট পালট কলবাব দরকার কি? তারপরে কলকাতায় তোমার বেহাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলে? তারা সব ভাল আছে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। কলকাতায় অনেক লোকেরই সঙ্গে দেখা হ’ল।”

হরনাথবাবু আবার ধামিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—“অনেক কে কে?”

“এই রাধাচরণ—শশিকান্ত—আমাদের অমরের সঙ্গেও দেখা হ’ল।”

হরনাথবাবু প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলেন, তথাপি তাঁহার অব্যাহত কণ্ঠ হইতে মুক্তভাবে নির্গত হইল—
“কি দেখলে?”

দেওয়ান মুখ অবনত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—
“কি আর দেখে? যা আপনারা দেখাতে ইচ্ছা করেন সেই রকমই দেখলাম।”

“বুঝতে পাবলাম না শ্রামা, শরীর খুব খারাপ বুঝি?”

“শরীর যত না হোক অস্ত্রাস্ত্র অবস্থা তাই। চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখলাম।”

“চাকরী খুঁজে? আর পড়া হয় না বুঝি?”

“পড়বে কিসে? আর তো তাকে কিছু দেওয়া হয় না।”

হরনাথবাবু সজোরে গড়গড়া টানিতে আবিস্ত করিলেন। সহসা হাসিয়া হুবদাকে বলিলেন—“মা, পাখাটা রাখ, অত জোরে বাতাস দিওনা।”

সুন্নাত কুন্তিত ভাবে পাখা রাখিয়া দিয়া উঠিল।

“বোস, উঠছে কেন মা?”

আবার সে বসিয়া পড়িল।

হরনাথবাবুকে নীরব দেখিয়া দেওয়ান একটু কাশিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন—“এতে কিন্তু আপনার নিজেকে ধরু করা হচ্ছে। আপনার স্নেহহারা হ’য়ে তার যে অস্বস্তাপ না হয়েছে হয়ত অর্থাভাবে তাই হবে। তখন হয়ত আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আসবে। তার মূল কারণ কিন্তু সামান্য অর্থের প্রাধান্য।”

হরনাথবাবু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—“তা ঠিক। সে কিছু বলেছে?”

“বলবে আর কি? আমিই বললাম যে চল আমার সঙ্গে, তিনি যদিই সম্পূর্ণ ক্ষমা না করেন তবু আর্থিক ভাবে করতে পারেন হয়ত। তাতে সে বললে যে বাবা যদি

আমায় তেমন ক্ষমা করেন তা আমি চাইনা। তা যদি কবি তবে আমি তাঁর কুপ্ত। তিনি যদি কখন তেমনি ক’রে ‘অমর’ বলে ডাকেন তবেই তাঁর কোষে যাব নইলে সে কোলের পরিবারে তাঁর দয়া আমি চাই না।”

হরনাথবাবু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—“তেজটু খুব আছে।”

“সে আপনাবই ছেলে। সেটুকু থাকা তার দরকার।”

“যাক্। তবে যে বললে অর্থের জন্তে সে ক্ষমা চাইবে?”

“ভবিষ্যতের কথা বলছি। আরও দেখুন, আপনি ছেলে চাকরী চেষ্টায় অনাহার অনিদ্রায় সেই কলকাতায় গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায় এটা আপনার সম্মানে হানিকর। ঘরের বিবাদ পবকে জানাবার কি দরকার? সে আপনাকে উপেক্ষা করেছে এটা লজ্জারই বিষয়, বাইরে সেটা লোক জানাজানি নাক’রে নিজের সম্মান রক্ষার জন্তে তাকে উচিত মত সাহায্য ক’বে নিজের মান-অঙ্কুর বাখুন। তাব পরে তাকে আপনি মনে ক্ষমা না করতে পারেন কখনো তার মুখ দেখবেন না। যে অধিকার সে চেয়েছে তা তাকে কখনো দেবেন না। এই তো তার উপযুক্ত শাস্তি। টাকা বন্ধ ক’রে তাকে মনে বেশী বেদনা দিতে পারবেন যদি ভেবে থাকেন সেটা জুল করতেন। সে আপনার ছেলে—তার শাস্তি অল্প রকম।”

হরনাথবাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—“কথায় কথায় অনেক রাজি হ’য়ে গেল, আর দরকার নেই। যাও তুনি একটু বিশ্রাম কর গে পথশ্রমে ক্লান্ত আছ।.....বোমা, আর আজ কিছু খাবনা, তুমিও শোওগে মা। রাত্রে একবার ডেকে দিতে বল, আলো টালো গুলো সরাবে।”

হুবমা দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিল—“কিছু খাবেন না বাবা? একটু দুধ?”

“না,.....আচ্ছা, দাওগে রামাকে দিয়ে পাঠিয়ে। ডামাচরণ, তুমি এখনো খাওনি হয়ত?”

“আজ্ঞে না, সে জন্তে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি শোন।”

ডামাচরণ রায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হরনাথবাবু সুন্নাতকে তখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া

বলিলেন “যাও মা, খেয়ে দেয়ে শৌণ্ডগে।” স্বপ্নের ব আদেশমুতক কণ্ঠস্বরে বধু আর বাক্যব্যয় না কবিতা ধীর পদে ককাস্তরে চলিয়া গেল।

হরনাথবাবু চাকরকে আলো সম্পূর্ণ নির্বাণ করিতে আদেশ দিয়া শয়ন করিলেন। যথাকর্তব্যাস্তে চাকর চলিয়া গেল।

অন্ধকার কক্ষে শয্যার উপর পড়িয়া তিনি নিদ্রাদেবীর যথাসাধ্য উপাসনা করিলেও নিদ্রাদেবী নিতান্ত অকুপা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিনিদ্র মুদ্রিত চক্রেব উপর দিয়া সে কালের অনেক চিত্র ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিতেছিল। নিজের প্রথম যৌবন, সেই অমল পত্নীপ্রেম, সে ভালবাসার মধ্যেও পুজ্যভাবে মধ্যে মধ্যে বিবাদ, শেষে সেই স্নেহপ্রতিমার ক্রোড়ে সেই অমল শুভ স্নেহপুস্তলটির আবির্ভাব যেন চক্রেব উপর নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেদিনের সেই হর্ষোচ্ছ্বাসের স্মৃতি আজও তাঁহার সর্বশরীর তেমনি কণ্টকিত করিয়া তুলিল। কোমল শয্যায় আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া হরনাথ বাবু সেই স্পর্শস্পর্শ আজও যেন সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

মাগুয স্মৃতি লইয়া এমনি পাগল। হয়ত সে স্মৃতির বা হুঃখের মেলা কোন দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ধূল্যাকাধা ধুইয়া মুছিয়া সংযত ভাবে মাগুয তখন নিজের নির্দিষ্ট গম্ভীর মধ্যে বসিয়া সম্পূর্ণ নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নিজের দেনা পাওনা হিসাব নিকাশের কারবার চালাইতেছে, তথাপি সেই নূতন জীবনের মধ্যেই স্মৃতি তাহাকে কোন সময় হাসিবার স্থানে হয়ত চক্রে জল আনিয়া দেয়, কাদিবার সময় হয়ত তাহাকে হাসাইয়া দর্শকের কাছে অধিক হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে।

তার পরে মনে আসিতে লাগিল সেই গম্ভীর আনন্দের হিল্লোলে কালচক্রনের আবর্তন হইতে না হইতেই প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড অকস্মাৎ আসিয়া সবলে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। মুহূর্ত্তান তিনি বিগুণ আবেগে মাতৃহীন শিশুকে বন্ধের নিকটে টানিয়া ধরিলেন; এত দিন দুইজনে তাহার স্নেহ হুঃখের ভাগ লইতেছিলেন এখন হইতে তিনি তাহাব একা, সেও তাঁহার একা। সে দিনের

বেদনার স্মৃতিতে হবনাথবাবু আজও তেমনি শয্যায় লুপ্তিত হইতে লাগিলেন। শেষে অতি কষ্টে বহুক্ষণ পরে নিদ্রা আসিল। সে নিদ্রাটুকুও স্বপ্নময়, স্বপ্নও সেই শিশুর বাল্যস্মৃতিময়।

প্রভাতে শয্যাভ্যাগ কবিতা তিনি যথাকর্তব্য সম্পাদন করিলেন। মধ্যাহ্নে যথারীতি আহার করিলেন। সুরমা তাঁহার অসাধারণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া যথাকর্তব্য সম্পন্ন কবিতা গেল। সমস্ত দিন তিনি কাহার’ সহিত ভাল কবিতা কথা কহিলেন না। দেওয়ানও সমস্ত দিন তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইল না।

সন্ধ্যাকালে নিয়ম মত সন্ধ্যাহিক ও জলযোগাস্তে হরনাথ বাবু দেওয়ানকে ডাকাইলেন। আদেশ মত বধুও পাখা হস্তে শয্যাপ্রান্তে স্থান গ্রহণ করিল। দুই একটা কথাবার্তার পর হরনাথবাবু দেওয়ানের পানে না চাহিয়া একখানা খবরের কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিলেন—“আমি এখন ভেবে চিন্তে দেখলাম নিজেব সস্ত্রম রক্ষার জন্তে তাকে আমার মাসহারা দেওয়া উচিত।”

দেওয়ান কিয়ৎক্ষণ নীববে থাকিয়া বলিলেন—“বেশ। শুধু এইটুকু মাত্র যদি কর্তব্য বোধেন তবে তাই করুন। তার পরে সে আপনায় দান নিতে স্বীকার হয় না হয় সে পনের কথা।”

“পনের কথা নয়। আমার সস্ত্রমের জন্তে তাকে বাধ্য হয়ে নিতে হবে। বোমা, তোমার মত জানতে চাই, লজ্জা না ক’রে স্পষ্ট কথা বল। মাসহারা দেওয়া ঠিক কিনা?”

সুরমা ধীরে ধীরে তাহার নতমুখ স্বপ্নের দৃষ্টির সম্মুখে উল্লম্বিত করিল, তার পরে স্থিৰ কণ্ঠে বলিল—“না।”

“না? তাকে কিছু দেওয়া উচিত নয়? তুমি এমন বলবে আমি আশা করিনি।”

“না বাবা, ক্ষমা যদি করতে পারেন তাই করুন। মনে করলেই আপনায় পক্ষে তা সহজ।”

“ও—তাই বলছ? না, তত সহজ নয়। আমি আরও শাস্তি তাকে দিতে চাই?”

দেওয়ান বলিয়া উঠিলেন—“এটা আপনায় মত বাপের ঠিক হচ্ছে না।”

“আমার মত বাপেরই ঠিক হচ্ছে, এ আমারই পক্ষে সম্ভবে।” তার পবে বধূব পানে ফিরিয়া বলিলেন—“না, তুমি তাকে ক্ষমা করতে পাব? বল তুমি তাকে ক্ষমা কবেছ, এখনি আমিও তাকে ক্ষমা কবছি। কিন্তু মিথ্যা বলোনা, যথার্থ বা সত্য তাই তোমার বলতে বলছি।”

দৃঢ়পদবিক্ষেপে সুরমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তাহার বাস্পকঙ্ক কণ্ঠে ‘না’ শব্দ ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

পবদিন অমরের নামে দেওয়ান একশত টাকা কলিকাতায় প্রেবণ কবিলেন। দিন চারেক পবে তাহা ফেরত আসিল। অমব ইনসিওর লেফাফাব পশ্চাতে এই কয়টি কথা লিখিয়া দিয়াছে—“কাকা, আপনার মেহ চিরদিন স্মরণ থাকিবে, আপনি আমার জন্ত বাবার দ্বারা এই বন্দোবস্ত করাইয়াছেন বুঝিয়াছি। আপনাকে ধন্যবাদ, আমি এ মেহের অবোধ্য।” সম্মল চক্ষে দেওয়ান পত্রখানি কর্তব্য হস্তে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ হবনাথবাবু এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন। “আমি জমীদার হরনাথ মিত্র, আমার পুত্র তুমি, ইহা সকলেই জানে। কাজেই আমার সম্মল কতকটা তোমার উপব নির্ভব কবিতেছে। তুমি কোন ছোট চাকরী করিলে সে অপমান আমারও পৌছিতে। অতএব যতদিন না তুমি তোমাব অবস্থা সম্মল করিতে পারিতেছ ততদিন তোমার খবচ কারণ একশত টাকা মাসে মাসে যাইবে এবং তুমি তাহা লইতে বাধ্য। ইহা ভিন্ন তোমাব সঙ্গে আমার জন্ত কোন সঙ্ক নাহি। ইতি। শ্রীহরনাথ মিত্র।”

কয়েক দিন পরে হরনাথবাবু অমরনাথের একখানি পত্র পাইলেন। আবেগকম্পিত হস্তে খুলিয়া পড়িলেন। “আপনার সম্মানের জন্ত আমার মস্তকে যে শান্তিভাব প্রদান কবিলেন তাহা আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। আপনাব ত্যক্ত হইয়াও আপনার অর্থেই আমি এখনো পবিপুষ্ট হইতে থাকিব, ইতি। অমর।”

পত্রখানি বহুবার পাঠ করিয়া সম্বন্ধে তাহা ক্যান বাকসের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া হরনাথবাবু বহুকালের শুষ্ক প্রশান্ত চক্ষু হইতে বড় বড় দুই ফোটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

বাঙ্গালা শব্দকোষ

[সাঙ্কেতিক শব্দ—ও—ওড়িয়া, গ্রা—গ্রাম্য, বা—
বাঙ্গালা, সং—সংস্কৃত, স—প্রা—সংস্কৃত-প্রাকৃত,
হি—হিন্দী]

নিজের বিষয়ে নিজের কাজের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে একদিকে যেমন অহমিকা প্রকাশ পায়, অল্পদিকে পাঠকের নিকট তেমন ‘বিজ্ঞাপন’ মনে হয়। কিন্তু যে বিষয়ে লিখিতে বসিতেছি, ঘুরাইয়া লিখিলেও তাহাতে অহমিক প্রকাশের আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, বিষয়টা ঠিক নিজের নয়। বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গালীর; তাহাতে কেবল তোমার আমার সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ সাহিত্য-পরিষদ গত কয়েক বর্ষে পঞ্জিকায় আমার বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বলনের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাবিয়াছেন আমি রাঢ়ের গ্রাম্য-শব্দ সংগ্রহ কবিত্তেছি। এই সংগ্রহে কোতুল্লীব দুর্বহকালকর্তনের স্মৃতি হইবে, বাঙ্গালা ভাষার ইষ্ট সাধিত হইবে না। ইহারও একটা উত্তর আবশ্যক।

আমাব বাঙ্গালা ভাষা-চর্চার ইতিহাস কৌতুকাবহ। ইহাব আবস্ত খেলায়; এখন খেলা গিয়া এমন অবস্ত দাঁড়াইয়াছে যে শতবাব মনে হইয়াছে শেষ হইলে বাচি। আট দশ বৎসর পূর্বে কখনও ভাবি নাই, বাঙ্গালা ভাষাব শব্দ অক্ষর প্রভৃতি লইয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে, কিংল বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার যোগ্যতা হইবে। বর্ষাকালে একদিন অপরাহ্নে অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, নিত্য লেগা-পড়ার মন গেলনা। সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রাপ্ত শ্রীমতীলনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সম্বলিত ‘বাঙলা ক্রিয়াপদের তালিক’ চোখে পড়িল। দুই-এক পৃষ্ঠা উলটাইতে উলটাইতে মনে হইল আরও ক্রিয়াপদ আছে। তালিকাব শেষে অল্পব-ধপত্র ছিল যে নূতন ক্রিয়াপদ মনে হইলে তালিকায় লিখিতে হইবে, বাঙ্গালা শব্দ একত্র করিতে হইবে। যাঁহারা ভানেন তাঁহারা লিখিবেন, পরিষদের সম্পাদকের অনুরোধ শালন করিবেন; আমি খেলাচ্ছলে নূতন ক্রিয়াপদ লিখিতে বসিলাম। লিখিতে বসিলাম, কিন্তু কলম চলিল না। ক্রিয়াপদটা এই না অই? বানানে হি না এ, স না শ?

ইত্যাদি সন্দেহে পড়িয়া ভাবিলাম, যার কর্ম তারে সাজে—
কথাটা সত্য। ইতিমধ্যে ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম
প্রান্তের দুই বন্ধু বাঙ্গালাভাষা শিখিবার মানসে আমার
দুই তিন বার পত্র লিখিয়াছিলেন। তাইারা সেখানে
বসিয়া কি বই পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতে পারিবেন, তাহা
ভাবিয়া পাইলাম না। ‘পরে জানাইব’ লিখিয়া, কথাটা
চাপা দিলাম। বাঙ্গালা ভাষা শেখা সহজ কিনা, এ
প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ মনে উঠিতে লাগিল। একদিন মনে
হইল, দেখি কতগুলো বাঙ্গালা শব্দ জানি। বলা বাহুল্য
লিখিতে বসিয়া সে দিনও নিজের অযোগ্যতা বুঝিতে
কাল-বিলম্ব হইল না। পবে, বানানের ভাবনা ছাড়িয়া
যেমন-তেমন করিয়া শব্দ লিখিতে বসিলাম। এখানেও
বিপত্তি। শব্দগুলো এলা মেলা আসিতে লাগিল। এমন
ভাবে শব্দ একত্র করিয়া ফল নাই। শব্দগুলো ঠিক কি
বে-ঠিক তাহাও জানি না, অর্থও স্পষ্ট জানি না। পর
বৎসর বৈশাখ-মাসে অসহ গ্রীষ্মে তাড়নায় পুণীতে
প্রবাস করি। পুরীর বায়ুতে দেহ অবসন্ন নিশ্চেষ্ট হই।
মধ্যাহ্ন-আহারের পর সময় কাটানা ছুড়র হইয়া উঠিল।
একথান খাতা লইয়া আবাব বাঙ্গালাশব্দ-খেলা আরম্ভ
করিলাম। তখন বুঝিলাম হুতা দিয়া গাঁথিতে না পারিলে
শব্দের ক্রম থাকিবে না, কত শব্দ জানা আছে, তাহাও
জানিতে পারা যাইবে না। আমাদের জ্ঞানের বিভাগ করনা
করিলাম, অমব-কোষের বর্গেব জ্ঞান বর্গ ধরিলাম।
এখন হুত পাওয়া গিয়াছে, বানানের বিচার নাই, দুই
সপ্তাহে প্রায় সাত হাজার শব্দ একত্র হইল! গণিয়া
আশ্চর্য হইলাম; এত শব্দ মাথার ভিতর লুকাইয়া ছিল,
জানিতাম না। অনেক শব্দ অজ্ঞাপি ছাপায় উঠে নাই।
কোন ছেলেবেলা গ্রামে একবার শুনিয়াছি, দেখি সে
শব্দ আসিয়া উপস্থিত। চিরকাল প্রবাসী হইয়াও আমবা
মাতৃভাষার এত শব্দ—মূল শব্দ—মনে বাধি, না গণিলে
বিশ্বাস হইত না। এইখানে খেলা শেষ হয়, খাতা পড়িয়া
থাকে। পরে শব্দগুলো গুছাইয়া অর্থ দিয়া সাহিত্য-
পরিষদে পাঠাইবার কল্পনা হয়। তখন সেই বানান-সমস্তা
আবার প্রকট হইয়া উঠিল। প্রকৃতিবাদ, প্রকৃতি-বোধ
অভিধান ঘাঁটিলাম। আমার সঙ্কলিত শব্দের অত্যন্ত শব্দ

বাঙ্গালা অভিধানে আছে। প্রকৃতি-বাদে আশ পবিত্তে
‘আউক’ লেখা দেখিয়া ভাবিলাম কোষকাব কোন
দেশের শব্দ লিখিয়াছেন। ইহার পর বাঙ্গালা ছাপা
অভিধান ব্যাকরণ হইতে সাহায্যের আশা ছাড়িয়া দিয়া
শব্দশিক্ষা আরম্ভ করিলাম। দুইখান সংস্কৃতকোষ আশ্রয়
পড়িতে পড়িতে মনে হইতে লাগিল আমার সঙ্কলিত শব্দের
অনেকগুলো সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ফালোন সাহেবরূত
হিন্দুস্থানী অভিধান পড়িয়া বাঙ্গালাভাষার চলিত বাবনিক
(আবী ফার্সী) শব্দগুলো চিনিতে শিখিলাম। অল্পমান
কুমশঃ প্রবল হইতে লাগিল যে এতকাল যে শব্দ ‘দেশজ’
অর্থাৎ আর্বভাষাসম্মত না হইয়া প্রাচীন বঙ্গীয় অনার্বভাষা
হইতে প্রাপ্ত বলিয়া রটিয়াছিল, সে শব্দ ‘দেশজ’ নহে,
সংস্কৃতমূলক। প্রকৃতিবাদে লেখা আছে বাপ শব্দ তুর্কী-
ভাষা হইতে আসিয়াছে। কেবল প্রকৃতিবাদ নহে, যে
অভিধানে বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় আছে, তাহাতেই
—‘দেশজ’ ‘দেশজ’—এই এক মন্ত্রে প্রমাণাব কর
হইয়াছে। আমি শব্দের এই প্রকাব অবস্থা দেখিয়া
একেবারে বিপরীত প্রকৃতি ধরিলাম। ধরিলাম, বাঙ্গালা-
ভাষার ‘দেশজ’ শব্দ নাই। যেহেতু শব্দটির মূল বুঝিতে
পারিতেছি না, কোন সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ বোধ
হইতেছে না, অতএব ইহা ‘দেশজ’—এইবুপ যুক্তিব কুহকে
ভুলিলে চলিবে না।

ধরিলাম, শব্দটা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। যদি অপভ্রংশ,
তবে সে সংস্কৃত শব্দটা কি? বিজ্ঞানে বলে, জ্ঞাত হইতে
অজ্ঞাতে যাইতে হয়। যে যে বাঙ্গালাশব্দের সংস্কৃত
মূলে সন্দেহ নাই, সে সে শব্দ-পরিবর্তনের হুত অব্বেষণ
করিতে লাগিলাম। দেখিলাম এক এক শব্দের উচ্চারণে
প্রাচীনবৃপের চিহ্ন অজ্ঞাপি বর্তমান আছে। গোড়াব
দিকে না গেলে সংস্কৃতরূপ পাওয়া যায় না। এই হেতু
কয়েকখানি প্রাচীন পুস্তক মনোযোগ পূর্বক পড়িতে
লাগিলাম। এক অঙ্কলে পরে পবে রচিত পুস্তক পড়িলে
ভাষার পরিবর্তন-ক্রম বুঝিতে পালা যায়। এ কারণ
পুস্তকবচনার কালও মূলতঃ জানা আবশ্যক হয়। কৃত্তিবাস
ও কবিকঙ্কণ, বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণদাস
পড়িলাম। সব সমানভাবে পড়িতে পারি নাই। কৃত্তিবাস

ও কবিকঙ্কণ পড়িতেই তিনমাস লাগিয়াছিল। এই সময় সাহিত্য-পরিষদ হইতে মাসিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল প্রচাৰিত হয়। ইহাব ভূমিকায় লেখা ছিল এই ধর্মমঙ্গল প্রায় তিনশত বৎসরের পুরানা। ছই এক পৃষ্ঠা পড়িতে না পড়িতে ভূমিকাব ভুল বুঝিতে পাবিলাম। কিছু দিন পরে পরিষদ হইতে প্রকাশিত শূন্তপুৰাণ পাইলাম। বলা বাহুল্য তাহা প্রাচীন বলিয়া বিশেষ করিয়া পড়িতে হইয়াছে। এই সব পুরাতন পুস্তক হইতেও শব্দ সংগ্রহ করিতে করিতে কোষেব শব্দ বাড়িতে লাগিল।

শব্দের বর্তমান উচ্চারণ এবং স্থানবিশেষে রূপান্তর-প্রাপ্তি—ছই-ই শিক্ষা কৰা আবশ্যক। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় পক্ষে বিভিন্ন স্থানীয় রূপান্তর আলোচনায় ফল আছে। জুধেব বিষয়, এই পথ আমার নিকট বৃদ্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কয়েক স্থানের গ্রাম্য শব্দের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব তালিকার একটা দোষ এই যে সংগ্রাহক নিজের ইচ্ছামত বানান দিয়াছেন। একই শব্দ বিভিন্নবানান-হেতু বিভিন্ন বোধ হয়। শব্দের ধ্বনিটাই আসল। প্রচলিত বানানের সহিত মিলাইয়া লিখিলে পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হয় বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ জানিতে না পারিলে সংগ্রাহকের নিজের পরিকল্পিত পরিমাণ পাওয়া যায় না। আরও এক কথা, বর্ণানুক্রমিক শব্দতালিকা না করিয়া বর্ণানুক্রমিক কবিলে জ্ঞাতব্য শব্দ শীঘ্র পাওয়া যায়।

শব্দের মূল ধরিবার পক্ষে সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণশিক্ষা অত্যাৱশ্যক। যে সং-প্রাকৃতভাষা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, ঠিক তাহাব ব্যাকরণ নাই। তথাপি দেশের সং-প্রাকৃতভাষার মধ্যে কতক সাম্য ছিল বলিয়া যে-সে প্রাকৃত-ব্যাকরণ হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। আশ্চর্য এই যে, যাহাকে আমরা গ্রাম্য শব্দ গ্রাম্য উচ্চারণ বলি, তাহা প্রায়ই প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত। যাহাঁরা কাগ বগ শাগ কন্ম ধন্ম জন্ম প্রভৃতি শব্দ ‘গ্রাম্য’ ‘অশুদ্ধ’ ‘প্রাদেশিক’ প্রভৃতি ভাবিয়া ঘৃণা করেন, তাহাঁরা বাঙ্গালা-ভাষার সংস্কৃত অঙ্গমাত্র দেখিয়া অ-সংস্কৃত অঙ্গ বিস্মৃত হয়েন। শব্দের বানানে সংস্কৃত আকার দেখাইয়া অজ্ঞের চোখে ধুলিনিক্ষেপে কৃত্তি নাই। বাঙ্গালাভাষাব অস্থি-

মজ্জায় সং-প্রাকৃতভাষাব প্রভাব বিস্তারিত। সে প্রভাব অতিক্রম করিয়া সংস্কৃতের সমাদর কবিত্তে গেলে বাঙ্গাল নামে ভাষাই থাকিবে না। যাহাঁরা বানানে শব্দের ইতিহাস দেখিতে চাহেন, যাহাঁরা মনে করেন বানানে সংস্কৃতমূল দেখাইতে পাবিলে ভাষাশিক্ষায় পরম লাভ হয়, তাহাঁরা তুলসী-চন্দন দিয়া ভাষাই উপাস্ত্র জ্ঞান করেন। পরে এ বিষয় দেখা যাইবে।

শব্দের মূল পাইবার আর এক পথ, ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী সংস্কৃতমূলক ভাষার শব্দবিচার। এখন প্রথম প্রশ্নের আর এক আকার দাঁড়াইল। যদি বাঙ্গালা ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী—এই চারি ভাষার একটা শব্দের অনুরূপ আকার পাই, তবে সে শব্দ সংস্কৃতমূলক। কারণ দূরবর্তী স্থানেব বিভিন্নজাতির পক্ষে ‘বঙ্গদেশজ’ শব্দ-গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না। অবশ্য শব্দটা যাবনিক (ফার্সী কিংবা আরবী) হইলে ভারতের সব প্রদেশে স্বকীয় আকারে কিংবা রূপান্তরে থাকিতে পারে। উদ্দেশ্যের কি উদ্ভূতভাষার পৃথক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যাবনিক শব্দ ব্যতীত অল্প শব্দ মূলে এক না হইলে চারি ভাষার থাকিবে কেন? সে ল যে সংস্কৃত, তাহাতেও সন্দেহ কি? বাহা হউক, সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রচারিত ‘বাঙ্গালা ভাষা’র ২য় অধ্যায়ে—শব্দশিক্ষাধ্যায়ে পৃষ্ঠক এই ত্রিবিধ ক্রম দেখিতে পাইবেন।

একবার হুত্র ধরিতে পারিলে কাজ কতক সোজা হইয়া দাঁড়ায়। এখনও কিন্তু অনেক বাকি। গোটা শব্দের যেন মূল দেখিলাম, শব্দের ডালপালা দেখিবার উপায় কি? ব্যাকরণ। এই হেতু বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ লিখিতে হইয়াছে। ধু শব্দকোষ লেখা অসম্ভব, শুধু ব্যাকরণ লেখা অসম্ভব। ছই একত্র করিলে ভাষা বুঝিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, ব্যাকরণ-রচনাতেও তুলনাত্মকপদ্ধতি প্রচুর অবলম্বিত হইয়াছে।

শব্দ সংগৃহীত হইল, অনেক শব্দের মূলও নির্ণীত হইল। এখন গৃহাইয়া লিখিবার কথা। এখানে এক ক্ষুদ্র বিষয় বিদ্র জন্মাইতে লাগিল। শব্দগলা খঁতার লেখা ছিল; লিখিতে লিখিতে খাতায় স্থান হয় না। সে শব্দের পরে যে শব্দ বসার প্রয়োজন, সে শব্দের স্থান

হয় না, অ আ বর্ণানুক্রমে শব্দবিজ্ঞান ছড়ান হইল। আশ্চর্য এই, অল্প পুস্তকের স্তূতি লিখিতে যে উপায় ধরিয়াছি, তাহা মনে হইল না, শব্দের অঞ্জাল পরিষ্কার করিতে বসিলাম।

বাঁধা খাতা ফেলিয়া খোলা আ-বাঁধা খণ্ড খণ্ড কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। অনেক সময় অ-ব্যবসায়ীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে এইরূপ ঘোর পথে ঘুরিতে হয়, জানা উপায় নূতন আবিষ্কার করিতে হয়। যখন কুল পাইয়াছি, তখন স্মরণ হইল মেক্সমুলর সাহেব তাহাঁব এক বহিতে এইরূপ খণ্ড খণ্ড কাগজে শব্দ লিখিতে উপদেশ করিয়াছেন। এখনও আমার টেবিলের এক পাশে এক গাদা কাটা কাগজ আছে, যখন কোন শব্দ মনে আসে কিংবা কোনটার ব্যুৎপত্তি মনে আসে অমনই তাহা লেখা হইয়া আর এক পাশে পড়ে। অবসর হইলে লেখা কাগজগুলা পরে পরে গুছাইতে অধিক সময় লাগে না। এখানেও একটা ক্ষুদ্র কথা শিখিবার আছে। কাগজ অনেক হইলে যথাস্থানে বসাইতে সময় লাগে। শব্দের আশ্রয় দেখিয়া প্রথমে বর্ণে বর্ণে ভাগ, ভীর পর অক্ষরের স্বর দেখিয়া স্বরে স্বরে ভাগ করিবার পর যথা স্থানে আনা সহজ হয়। ঠেকিয়া শেখার জ্ঞান, মস্ত জ্ঞান। বাহাঁরা কোষ-সঙ্কলনাদি কর্মে কর্মী হইয়াছেন, আমার এই কাহিনী শুনিয়া হয়ত তাহাঁরা হাসিবেন। ইহার উপর যখন শুনিবেন যাবতীয় কর্ম নিজে করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, লিপিকার নিযুক্ত করিয়া শ্রম চলা হইয়াছে, তখন হয়ত গভীরভাবে এ কর্ম ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিবেন। লিপিকারের অপরাধ নাই; একদিনে একমাসে এক বৎসরে যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহা দুই দশটা মৌখিক উপদেশে কোথায় হইবে।

কোষের নিমিত্ত উল্লিখিত চতুর্বিধ ক্রমও পর্যাপ্ত হয় না। মূলের সহিত বাঙ্গালা শব্দের অর্থের সাম্য না হইলে মূলনির্ণয়ে সন্দেহ হয়। শব্দশিক্ষার সূত্রানুসারে মূল আসিল, কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের অর্থ দূবে থাকিল, এমনও ঘটিয়াছে। এ রকম স্থলে আর এক সূত্র পাইয়াছি। দেখা যায়, সে শব্দের অমুদ্রুপ শব্দ অল্প তিন ভাষাতে নাই, তখন বুঝিতে হয়, মূল সংস্কৃত শব্দের অর্থসম্প্রসারণে বাঙ্গালা শব্দের অর্থ আসিয়াছে।

এই পঞ্চবিধ ক্রমের দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে। যথা, (১) অল-তলা একটা শব্দ আছে। অর্থ, ঘরের হাঁটার তলা। সংস্কৃত মূল কি? অল-তলা উচ্চারণ হইতে বুঝিতেছি, অইল শব্দের সংক্ষেপে অল। স্বরবর্ণ বিপ্রকৃষ্ট হইতে পারে। অতএব শব্দটি অলি হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত অলি শব্দের অর্থ বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন। অতএব সংস্কৃত শব্দের দুই এক বর্ণ লুপ্ত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত কোষে দেখি, বলীক শব্দের অর্থ ঘরের চালের প্রান্ত (যথা, অমবে, বলীক নীচে পটলপ্রান্তে)। শব্দশিক্ষায় পাইয়াছি ব ক লুপ্ত হইতে পারে। অতএব সৎ বলীক হইতে বা° অলি অইল—ইহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে। ঘটনাক্রমে ওড়িয়া ও হিন্দীতেও অমুদ্রুপ শব্দ আছে। ও°-তে উলী, হ°-তে ওলতী শব্দের অর্থ বা° অলিতলা। অতএব আমার কোষে অলিতলা শব্দ মূল, অলিতলা সংক্ষিপ্ত কিংবা লট বিবেচিত হইয়াছে। (২) আমরা ইচড় জানি। শব্দটা যাবনিক কিংবা স্লেচ্ছ নহে। ইহার অমুদ্রুপ শব্দ অল্প তিন ভাষায় নাই। প্রথম এই, যদি শব্দটা সংস্কৃত হইতে আসিয়া থাকে, তবে সে সংস্কৃত শব্দটা কি হইতে পারে? ই-চ-ড়—শেষের ড মূলশব্দে টবর্গের বর্ণ হইতে পারে। ইচট, ইচড, ইচণ ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ নাই। ত স্থানে চ হইতে পারে। ইতট, ইতড ইত্যাদি শব্দও নাই। হয়ত দুই একটা বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত-কোষে দেখি ইংকট, উংকট শব্দ আছে, অর্থ বিষম। ইহা হইতে অর্থ ওকড়া গাঁছ। এখন মনে হইল ওকড়া ফলের গায়ে যেমন কাঁটা কাঁটা আছে, কাঁচা কাঁঠালের গায়েও তেমন আছে। এই হেতু ইংকট হইতে ইচড় নাম আসিয়া থাকিবে। শব্দশিক্ষায় দেখিতে পাই, ত স্থানে চ হইতে পারে, ক লুপ্ত হইতে পারে। অতএব সৎ ইংকট হইতে বা° ইচড় শব্দ আসিয়াছে। (৩) একটা শব্দ, (রাড়ের গ্রা° উচ্চারণে) এব্‌ডো-খেব্‌ডো আছে। ইহার সংস্কৃত মূল কি? দেখা যায়, অনেক শব্দের আশ্রয় আরাটীয় বিকারে এ হইয়া গিয়াছে। খাজুর-কে রাঢ়ে বলে খেজুর, বুড়া-কে বলে বুড়ো। অতএব শব্দটা আবুড়া-খাবুড়া হইতে পারে। শেষের ড সংস্কৃতশব্দে অবশ্য নাই। টবর্গ

কিংবা তবর্গের বর্ণ স্থলে ড আসিয়া থাকিবে। আবও জানি, বাঙ্গালা শব্দের আন্ত আ সংস্কৃতমূলে প্রায়ই অ থাকে, এবং অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ সংযুক্তবর্ণ থাকে। ও-তে আবুড়া-খাবুড়া আছে, হি-তে উবড়-খাবড়।

অতএব মূলে সংস্কৃত আছে। স- অবুর্দ হইতে আবুড়া এবং স- খর্পর হইতে খাপরা—খাবড়া হইতে পারে। অর্থে দেখিতেছি, আবুড়া-খাবুড়া—অবুর্দ ও খর্পরাদির তুল্য। শব্দটি আবুড়া-খাবুড়া লেখা যাইতে পারে, কারণ আকারান্ত শব্দের উপাস্ত স্বব লুপ্ত হইতে পারে। তথাপি বুড়া লিখিলে শব্দটি পূর্ণ হয়, এবং অক্লেপে রাঢ়ের উচ্চারণ পাওয়া যায়। (৪) আমবা সময়ে সময়ে বজ্জাটে পড়ি। বজ্জাটের স- মূল কি? বজ্জাটের বাটীর গ্রা- রূপ বজ্জট। ব স্থানে জ হইতে পারে এবং কখন কখনও বজ্জাট শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব শব্দটা বজ্জাট ধরা গেল। স-তে বজ্জা-বাত শব্দ আছে। ব লুপ্ত হইতে পাবে, এবং ত স্থানে ট আসা বিচিত্র নয়। অতএব স- মূল বজ্জাবাত—কিনা প্রচণ্ডপবন। বা-তে অর্থ-সম্প্রসারণে পবন অর্থ গিয়া আসিয়াছে দুর্ভাগ্য, গোলোযোগ, ফের ইত্যাদি। ব্যাকরণের সাহায্যের দৃষ্টান্ত লই। (৫) একটা শব্দ আছে যেটা নেনজাড় লেনজাড় নানজাড় শুনি। শেবাংশ জাড়, প্রথমংশের (নেন্ লেন্) একার কুটিল বা এক শুনিতে পাই। অতএব একার না হইয়া আকার শব্দ হইতে পারে। ল স্থানে ন আসিতে পাবে, বিশেষতঃ পরে ন আছে বলিয়া প্রথম ল সহজে ন হইতে পারে। হয়ত শব্দটা লানজাড়। লাজুল—লেজকে ও-তে বলে লানজ। অতএব লাজ শব্দে ব্যাকরণের আড় প্রত্যয় যুক্ত হইয়া লাজাড় শব্দ হইয়াছে। লাজাড়ে পড়া শব্দের অর্থ দীর্ঘস্থত্রে, যেন দীর্ঘ লেজের পাকে পড়া, যখন কাজের শেষ পাওয়া যায় না তখন বলা যায় লাজাড়ে পড়া। ইহার সহিত বুড়ীর লেজুড়, কাজের 'নেতাড়' তুলনা করা যাইতে পাবে। (৬) রাঢ়ে সকলেই আমানি জানে। কাজিকে আমানি বলে। আমানি শব্দ কবিকল্পে আছে। আমানি শব্দের মূল কি? দেখা যায়, টোমানি, ধোয়ানি, ক্যারানি প্রভৃতি অনেক শব্দে আনি আছে। এ সকল শব্দের অর্থে জল বা পানি আছে। এই হেতু ব্যাকরণে পানি (স- পানীয়)

হইতে আনি প্রত্যয় স্বীকার করিয়া কোষে অন্ন+পানি—আমলানি—আমানি ধরিয়াছি। (৭) সময়ে সময়ে বাঙ্গালা শব্দের শেষের ই ঙ্গ লইয়া বাগবিতণ্ডা হইতে দেখা যায়। কেহ ই কেহ ঙ্গ স্বচ্ছন্দে বসাইতেছেন যেন ই ঙ্গ একই, যেন বাঙ্গালাভাষা লা-ওয়ারীশ মাল। ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া আমি নিম্নলিখিত স্থলে ঙ্গ দিতেছি; (১) হুস্বার্থে ঙ্গ, যেমন বড়া-বড়ী, খালা-খালী; (২) করণার্থে ঙ্গ, যেমন, চালনী সেচনী; (৩) বিশিষ্ট, সম্বন্ধীয়, জাত, দক্ষ প্রভৃতি অর্থে ঙ্গ, যেমন দামী, দাগী, কটকী; (৪) ক্রীলিঙ্গে ঙ্গ, যেমন, বুড়ী, মাসী, বামনী। হুস্বার্থে সকল স্থলে ঙ্গ পূর্বাবধি চিহ্নিত নাই; একারণ কোন কোন স্থলে ই দিতে হইতেছে। যেমন গুঁড়া—গুঁড়ী, গুলা—গুলী বানান-না করিয়া গুঁড়ি, গুলি (সমূহ) লিখিতে হইতেছে। এইরূপ, ব্যঞ্জেন হু-ক না হইলে ই বসে, যেমন কলিকাতাই, জেঠাই। তুলনা কর, সহ, বউ।

কোষের যাবতীয় শব্দ দৃষ্টান্তের মতন কঠিন নহে। অনেক শব্দ সোজা; অনেক শব্দ এমন কঠিন যে মূল অহুমান করিতে পারিলেও প্রমাণাভাবে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যে শব্দের প্রাচীন রূপ, বিভিন্ন স্থানীয় বিকার, কিংবা অল্প তিন ভাষার অল্পরূপ পাই নাই, সে শব্দের মূল-নির্ণয়ে সন্দেহ বহিয়া গিয়াছে। অবশ্য বোঝে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তিবিচার সম্ভবপর নহে। কিন্তু একবার অবলম্বিত ক্রম হৃদয়ঙ্গম হইলে সহস্র সহস্র শব্দ সেই ক্রমের অন্তর্গত দেখা যাইবে।

বাঙ্গালা-শব্দকোষ—যাহা ছাপা হইতেছে—সে সম্বন্ধে সাধারণের একটা ভ্রান্তি হইয়াছে। এই ভ্রান্তির ততক কারণ, আমি। প্রথমে লক্ষ্য নিকটে ছিল; রাঢ়ের লিখিত কথাবার্তার শব্দ লক্ষ্য ছিল। এ কারণ কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এটা গ্রাম্য শব্দকোষ, রাঢ়ের 'প্রাদেশিক' শব্দকোষ।*

কিন্তু কোন্ শব্দ গ্রাম্য? কোন্ শব্দ নহে? গ্রাম্য শব্দের বিপরীত কি? গ্রামের বিপরীত নগর বলা যাইতে

* ভাষার ভাষা শব্দ থাকিতে কেন যে 'প্রাদেশিক' নামকরণ হইল, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত। বাঙ্গালা একটা প্রদেশের ভাষা, মরাঠী আর এক প্রদেশের ভাষা। এই অর্থ ভিন্ন প্রাদেশিক শব্দের জাব কি অর্থ হইতে পারে?

পারে। নাগরিক ভাষায় কি অতিদ্রষ্ট শব্দ নাই? বাহীরা সংস্কৃত বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহাঁবাও কি গ্রাম্য অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা প্রয়োগ করেন না? এ বিষয় 'বাঙ্গালাভাষা'র প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা গিয়াছে। যদি গ্রাম্যভাষার বিপরীত ভাষার নাম সাধুভাষা বলি, তাহা হইলেও এই দুই-এর প্রভেদ-নির্ণয় দ্রুত। তথাপি সুলভ: গ্রাম্য ও সাধু শব্দের একটা প্রভেদ ধরা যাইতে পারে। (১) একটা শব্দের দুই তিন রূপ থাকিলে যে রূপ মূলের যত দূরবর্তী তাহা তত গ্রাম্য। (২) মূলের দূরবর্তী হইলেও যে রূপ শিক্ষিত-সমাজে প্রচলিত, তাহাজ্ঞ সাহিত্যিকের সম্মত, তাহা সাধু। (৩) শব্দের একটা রূপ থাকিলে তাহা সাধু। দুই পাঁচটা উদাহরণ লওয়া যাউক। স° ভগিনী ভগ্নী হইতে বহিন, বর্ন, বোন, বুন শব্দ হইয়াছে। বহিন সাধু; বর্ন গ্রাম্য; বোন, বুন ভাষা। শাগ, কাগ, দিগ গ্রাম্য নহে; তবে, শাক কাক দিক অপেক্ষা গ্রাম্য। ষাশুড়ো শব্দ সাধু, শাউড়ী গ্রাম্য। চিঁড়া চিঁড়ে খোঁজ খুঁড়ে মতো ভালো ভাঙা ঝিঙী রান্ধা বের (বাহির) জাকা জ্যাক্ত প্রভৃতি ভাষা। যখন শব্দের বিকারে অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তখন বিকৃত শব্দও গ্রাহ্য। যেমন মাছেব লেজ। এখানে মৎস্তের লাজুল বলিলে বস্তুটা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ শাগ শব্দ। স° শাক ও বা° শাগ অর্থে এক নহে। কার্য কর্ম রাত্রি কীর্তি প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তনে কাজ কাম রাত্রি কীত্তি শব্দ হইয়াছে। গ্রাম্যজন (রাঢ়ে) শৃদ্ধ করিয়া বলে কাজ্জ কম্ম বাস্তি কীত্তি। যদিও সংস্কৃত-প্রাকৃতের অনুরূপ তথাপি শব্দগুলিকে গ্রাম্য বলা যায়। এইরূপ, তিন (তৃণ), ম্রিগ (মৃগ), না (স°-প্রা° নারা—স° নৌ), নই, লই (স°-প্রা° লজ্জ—স° নদী), ভমর (স°-প্রা° ভমরো—স° ভ্রমব), ইত্যাদি শব্দ গ্রাম্য বলা যায়। কিন্তু টগর (স° তগর, স°-প্রা° টগর), লাঠী (স° ষষ্টি, স°-প্রা° লট্টী), পইঠা (স° প্রতিষ্ঠা, স°-প্রা° পইট্টা), দাগ (স° দাহ, স° প্রা° দাঘ), মাছি (স° মক্ষিকা, স°-প্রা° মচ্ছিআ), প্রভৃতি শব্দ গ্রাম্য নহে। এইরূপ, 'এক' 'দুই' 'তিন' ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ সংস্কৃত হইতে বহু বিকৃত হইলেও গ্রাম্য

নহে। কবিদিগেব নিষ্ঠুর হিয়া, বৈষ্ণবদিগের উচ্ছব, শিল্পীদিগেব বাঁট (স° বৃন্ত, স°-প্রা° বেষ্ট), নাটাই (স° নতর্কী, স°-প্রা° নট্টজ) প্রভৃতি শব্দ গ্রাম্য বলিলে চলিবে কেন। অসংখ্য ক্রিয়াপদে সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশেব উদাহরণ বিস্তারিত। কোথায় স° ভবতি, কোথায় পালো হোতি, আর কোথায় বা° হয়! হোই লিখিব কি? স° যাতি স্থানে যাই লিখিলে মূলের নিকটবর্তী হয় বটে, কিন্তু যায় অর্থে শ্বাই পদ কে বুঝিবে? এই যে জায় উচ্চারণ, ইহাতেই সংস্কৃতের রা (যা) ধাতুেব বিকার ঘটিয়াছে।

বস্তুত: দুই দশটা শব্দ লইয়া এটা শৃদ্ধ ওটা অশৃদ্ধ বলা এক কথা, আর বুড়ি বুড়ি (স° ভূরি) শব্দের বানান-নির্দেশে কোনটা টিকিবে, তাহা না দেখিলে স্রম ব্যর্থ হয়। বর্ণন বাণান, পর্ণ পাণ, কর্ণ কাণ, কার্য কাষ ইত্যাদি সহজ শব্দ; কিন্তু যেখানে মূল শব্দ নিরূপণ করিতে ভাবাইয়া দেয়, তাবিয়া মাথা কুটিয়াও নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না, সেখানে সাগবে শৃদ্ধাশুদ্ধ ভাসিয়া যায়। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধ্বনিসংবাদী বানানই আশ্রয় করিতে হয়।

এই হেতু ভাষা একেবারে ত্যাগ করিয়া লিখিতে পারা যায় না। যত সাবধান হউন, ভাষা-ছাড়া কাদম্বরী হইলেও হইতে পারে, স্রীতার বনবাসও লেখা চলে না। নাটক গল্প উপকথা প্রভৃতির ভাষায় চলিত রূপাবর্তার ভাষা থাকিবেই; অন্ত লেখায় রস-সঞ্চাব কবিত্তে হইলে ভাষা আসিবেই আসিবে। যাহা চলিত বাঙ্গালা, তাহা বঙ্গের সর্বত্র চলিত নহে, এবং এ অঞ্চলে যাহা চলিত, তাহাব কিয়দংশ অন্ত অঞ্চলেব পক্ষে ভাষা। কানে শুনিলে ভাষাব পরিমাণ বাড়িয়া উঠে; লেখাতেও লেখককে চিনিতে পারা যায়। শব্দের রূপান্তর আছে; লেখক স্বভাবত: নিজেব জানা রূপেব পক্ষপাতী হন। স° লয়ণ, কোথাও লোন, কোথাও লুন, কোথাও বা নুন হইয়াছে। এক অঞ্চলে বেগুন খেজুর ঠিক, অন্ত অঞ্চলে বাগুন বা বাগুন খাজুর ঠিক। এখানে বক্ষা এই, এক শব্দের রূপান্তর শীঘ্র বুঝিতে পারা যায়। যেখানে এক বস্তুর নামান্তর ঘটিয়াছে, সেখানে শব্দ হইতে বস্তু জ্ঞান হয় না। খড় খেড় (স° খড়; স° খেট—খেড়) নাড়া (স°

নল, নড) বুঝিতে পারি; খডের এক নাম বিচালী তাহা হিন্দী হইতে শিখিতে হইয়াছে।

এক শব্দ, এবং শব্দের এক রূপ কিসে সর্বত্র চলিত হইতে পারে? বোধ হয়, বাঙ্গালা-শব্দকোষ ব্যতীত অন্ত উপায় নাই। প্রথমে শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শব্দ সুপ্রাপ্য করিতে হইবে; তিনি গ্রহণ করিলে অশিক্ষিতে শিখিবে। বাঙ্গালা-শব্দকোষ না থাকাতো চোঁচা হইলেও ভ্রমের শঙ্কায় বাঙ্গালা শব্দ ছাড়িয়া সংস্কৃত শব্দ বসাইতে হইতেছে। অত্ৰদিকে, যাইবা চলিত শব্দ বসাইতেছেন, তাইবা নানাবিধ আকার দিয়া একটাকে স্থায়ী কবিত্তে পাবিত্তেছেন না।

বাঙ্গালা-শব্দ বিচার করিলে দেখা যায়, প্রায় সাড়ে পনব আনা সংস্কৃতমূলক, আধ আনা অন্ত-দেশজ। সংস্কৃতমূলক শব্দ দ্বিবিধ; (১) সংস্কৃত-সম শব্দ, (২) সংস্কৃত-ভব শব্দ। 'সংস্কৃত', 'সম', 'শব্দ', 'ভব' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত বলা হয়। বাস্তবিক, এই শ্রেণীর সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃতরূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। 'শ্রেণী', 'সকল', 'অবিকল', 'রূপ', 'প্রচলিত'—শব্দগুলি দেখিত্তে সংস্কৃত শব্দিতে বাঙ্গালা। বাহা হউক, যখন দেখিত্তে সংস্কৃত কিংবা প্রায় সংস্কৃত, তখন এগুলি সংস্কৃত শব্দ বলা যাউক। যে শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, তাহা সংস্কৃত ভব। যেমন, যে, হইতে, তাহা। অন্তদেশজ শব্দও দুইভাগ কবিত্তে পাবা যায়। (১) যাবনিক, (২) গ্লেচ্ছ। সংক্ষেপে বলিবার পক্ষে যাবনিক ও গ্লেচ্ছ নাম সুবিধাজনক। আর্য ও ফার্সী শব্দ যাবনিক, এবং পতুঙ্গীজ ও ইংবেজী প্রভৃতি ইয়ুবোপীয় শব্দ গ্লেচ্ছ।

অতএব চারি শ্রেণী এই—

- ১। সংস্কৃত
- ২। সংস্কৃত-ভ্রষ্ট
- ৩। যাবনিক
- ৪। গ্লেচ্ছ।

কিন্তু বঙ্গের সকল স্থানের উচ্চারিত শব্দ এই চারি শ্রেণীতে ধরিত্তে না। পূর্বে দেখা গিয়াছে, যে শব্দ আকাষে সংস্কৃত, তাহা সংস্কৃত বলা রীতি। এরূপ শব্দ সংস্কৃতকোষে পাওয়া যায়। একারণ, চলিত থাক আর না থাক, ভাষার প্রভাবে শব্দের আকাষের পবিবর্তন হইতে পাবে

না। যাবনিক ও গ্লেচ্ছ শব্দও বঙ্গের সর্বত্র প্রায় এক। ইন্তেহার, এন্তেহার; লোকসান, নোকসান, লোসকান; মকদমা, মকদমা; রেল, রেইল; ইষ্টসেন, টেসন, ইষ্টসান প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণ আছে। সম্প্রতি এই প্রভেদ অগ্রাহ্য করা যাউক। বস্তুত: সংস্কৃত-ভ্রষ্ট শব্দের তুলনায় যাবনিক ও গ্লেচ্ছভ্রষ্ট শব্দ অল্প। চলন ধরিলে সংস্কৃত-ভ্রষ্ট শব্দ দ্বিবিধ, (১) শব্দের মূল এক, কিন্তু ভাষাভেদে ভ্রষ্ট-শব্দের ভেদ জন্মিয়াছে; (২) শব্দের মূল এক সংস্কৃত শব্দ নহে, এই হেতু স্থানভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। বেগুন, বাগুন, বাগুন, বায়গুন; কাঁচলা, তাতল; কাঁচ, কাচ; প্রভৃতি শব্দে ভাষাভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু আখ ও কুশইর, ছেলে ও পোলা, শালুক ও নাল, কাঁট ও বাড়ুন, বারুন প্রভৃতি শব্দের মূল সংস্কৃত কিন্তু বিভিন্ন। অতএব বঙ্গের সর্বত্র যে সকল শব্দ চলিত আছে সে সমুদায় নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিত্তে পারা যায়।

- | | | |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| (১) *সংস্কৃত | (ক) শুদ্ধ সংস্কৃত | /০ এক-মূল
১০ অনেক-মূল |
| | (খ) ভ্রষ্ট সংস্কৃত | |
| (২) যাবনিক | (গ) শুদ্ধ যাবনিক | |
| | (ঘ) ভ্রষ্ট যাবনিক | |
| (৩) গ্লেচ্ছ | (চ) শুদ্ধ গ্লেচ্ছ | |
| | (ছ) ভ্রষ্ট গ্লেচ্ছ | |

এখন দেখা যাইবে, বঙ্গের সর্বত্র শব্দসাম্যঘটনা কত দূর ব্যাপার। শব্দকোষের অভাবে ভ্রষ্ট শব্দের বাহুল্য হইয়াছে। আদর্শ না পাইলে সকল বিষয়েই এইরূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে। যখন আমরা বলি, এটা ঠিক নয়, তখন স্বীকার করিয়া লই যে অন্তত: একটা ঠিক আছে কিংবা ছিল। যেটাকে ঠিক জ্ঞান করি, সেটাই আদর্শ। নাস্তবিশ্ব এই আদর্শে বাঙ্গালা শব্দের সংরক্ষণের (standardisation) নিমিত্ত সাহিত্য-পরিষদের মহামন্ত্রী শ্রীরামেস্বরন্দর-ত্রিবেদী-মহাশয়ের উন্তেক্সনায় এই অ-ব্যবসায়ী লেখক বামনেব চাঁদ-ধরা কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। একাজ আমার নিজের মনে করি না; মনে করি সাহিত্য-পরিষদের কাজ, মনে করি বাঙ্গালীমাত্রেয়ই কাজ। এই হেতু বাঙ্গালা-শব্দকোষে

ভূমিকাব কিয়দংশ হইতে এই প্রবন্ধ সংক্ষেপে মুদ্রিত করাইতে পারিলাম।

কিন্তু বাঙ্গালাশব্দকোষ নাম দিয়া কোষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলেই কি কোষেব প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে? হইবে, যদি (১) শব্দে ভাষার দোষ না থাকে, (২) ব্যুৎপত্তির সহিত শব্দের নৈকট্য থাকে, (৩) অর্থ পরিস্ফুট থাকে, এবং (৪) প্রাচীন প্রয়োগ থাকে। প্রত্যেক শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ দেওয়া যাইতে পারে না, এবং বর্তমান রূপও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। তথাপি শব্দটা পাইলে লেখক দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন এবং ইচ্ছানুসারে গ্রহণও কবিত্তে পারিবেন। এখন শব্দটা লেখকের নিজের কানে ও স্বগ্রামবাসীর মুখে আছে। সুতরাং তাহা জানিবার সকলের সুবিধা নাই। কোষে থাকিলে সকলেই জানিতে পারিবেন।

এখানে আর এক কথা উঠিতেছে। আমি যে শব্দ জানি, অর্থাৎ লোকের মুখে শুনিয়াছি, সাহিত্যে পাইয়াছি, সে শব্দ বাঙ্গালা-শব্দকোষে উঠিয়াছে। যে শব্দ জানি না, অর্থাৎ যে শব্দের ব্যুৎপত্তি কিংবা অর্থ প্রয়োগ পাই নাই সে শব্দ উঠে নাই। জানা শব্দের কোষ হইতে পারে, অ-জানা শব্দের হইতে পারে না। একারণ বঙ্গের সকল স্থানের চলিত শব্দ এই কোষে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তা বলিয়া যে কোন শব্দের প্রতি কোষকারের অবজ্ঞা আছে, তাহা কেহ মনে করিবেন না। ব্যুৎপত্তি অর্থ প্রয়োগ সহ শব্দ পাইলেই তাহা এই কোষে স্থান পাইবে।

বস্তুতঃ উপরে যে আদর্শের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। উপস্থিতক্ষেত্রে সে প্রমাণ অপর কিছু নয়, সকলের কিংবা অভিজ্ঞ অঙ্গের সম্মতি। সকলের অনুমোদন অসম্ভব; যাঁহারা ভাষার বিচারে অধিকারী, যাঁহারা শাস্ত্রিক, তাঁহাদের সম্মতিই সম্মতি। কিন্তু প্রথমে শব্দ না পাইলে সম্মতি আশা করা যাইতে পারে না।

যখন এত লিখিলাম, তখন কথাটা সম্পূর্ণ করি। আবার বলি, ভাষা এড়াইতে পারেন, এমন কোষকার সম্ভবে না। বিশেষতঃ প্রথম চেষ্টায়, অস্ত্রের দৃষ্টির অভাবে, ভাষাদোষ কিছু থাকিবার সম্ভাবনা। মূল ত্রুটিই হইবে, ব্যাকরণের স্বত্রে গাঁথিলেও, সাহিত্যে প্রয়োগ থাকিলেও

প্রথম প্রথম কোন কোন শব্দে কোষকারের খেয়াল মনে হইতে পারে। এই আশঙ্কা ঘুচাইবার উপায় নাই। যে শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত, সে শব্দ এই কোষে প্রায় নাই। কারণ *সংস্কৃতকোষের অভাব নাই। আর সংস্কৃত-শব্দকোষ-রচনার যোগ্যতাই বা কোথায়? অতএব বাঙ্গালাভাষার শব্দ পাইতে হইলে একখানা সংস্কৃত-শব্দকোষ, যেমন ৬গিরিশচন্দ্র বিজয়রত্ন-প্রণীত শব্দসাব, কিংবা শ্রদ্ধাভিধান অভিধান—বাখিতে হইবে। সংস্কৃতকোষে শব্দটা না থাকিলে বাঙ্গালা শব্দকোষে থাকিবে; ইহাতেও না থাকিলে, শব্দটা সম্প্রতি অজ্ঞাত মনে কবিত্তে হইবে। কোষ কখনও সম্পূর্ণ হয় না, বাঙ্গালাশব্দকোষও সে নিয়মের অতীত নহে।

কখনও কখনও আবশ্যক শব্দ মনে আসে না, প্রচলিত কোষের রীতিতে লিখিত কোষে খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ থাকে না। এই অসুবিধা দূর করিতে ইচ্ছা আছে, বাঙ্গালা-শব্দকোষেব শেষে প্রধান কয়েকটা বর্গের শব্দ একত্র দেওয়া যাইবে। মনে করুন, ঢেঁকীর অঙ্গবিশেষের নাম জানিতে চাই। তখন 'ঢেঁকী' শব্দ দেখিলে সে নাম পাওয়া যাইবে। কিন্তু মনে করুন একটা মাছের নাম জানা আবশ্যক। তখন পরিশিষ্টে *মাছ-বর্গ দেখিলে হয়ত সে নাম পাওয়া যাইবে। পরে কোষের মধ্যে সে নাম দেখিলে ব্যুৎপত্তি অর্থ প্রভৃতি পাওয়া যাইবে। অধিকাংশ কোষে অর্থ থাকে, 'বৃক্ষবিশেষ', 'জন্তুবিশেষ'। কিন্তু এই রকম অর্থ হইতে বৃক্ষ ও জন্তু চিনিতে পারা যায় না। অথচ সাধারণের নিমিত্ত রচিত ক্ষুদ্রকোষে পবিচয়-লক্ষণও দেওয়া যাইতে পারে না। এই সঙ্কটে পড়িয়া মধ্যপথ অবলম্বন করা গিয়াছে। বৃক্ষের ও জন্তুর এমন দুই একটা বিশেষ প্রদর্শিত হইতেছে, যদ্বারা বঙ্গদেশবাসী তাহা সহজে চিনিতে পারিবেন। ঠিক চিনিতে না পারুন, এক জন্তুকে অপর জন্তু, এক বৃক্ষকে অপর বৃক্ষ মনে করিতে পারিবেন না।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বাঙ্গালা-শব্দকোষ এই নাম সার্থক হইয়াছে কি না। যাহাতে কোষখানি সর্বজন-গ্রাহ্য হইতে পারে সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি হইতেছে না। সিদ্ধিলাভ অবশ্য গ্রন্থকারের হাতে নাই।

কটক।

ত্রিযোগেশচন্দ্র-বায় বিদ্যানিধি।

ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান

১। বাজাসন ও নান্না।

ঢাকা জেলার চন্দ্রপ্রতাপ পরগণায় নান্না নামক একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলি উচ্চ “টিবি” বা মৃৎস্তূপ দৃষ্ট হয়। এক সময় এই “টিবি”-গুলি ৫০।৬০ ফুট উচ্চ ছিল। গত ২৫।৩ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত বর্ষার জল বৃদ্ধি পাওয়াতে সেগুলি অনেকটা বসিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও বর্ষা কালে নিকটবর্তী সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়া যায়, বর্ষা গ্রাম্য তরুরাজি তাহাদের নগ্ন দেহের অর্দ্ধভাগ পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া হাঁটুজলে দাঁড়ানো কৃষকের মত দেখায়, তখনও এই “টিবি”গুলি জলের অনেকটা উপরে মাথা জাগাইয়া থাকে।

এই টিবিগুলিকে দেশের লোকেরা “বাজাসনের ভিটা” কহে। এক সময়ে প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাপিয়া “বাজাসনের ভিটার” প্রসার ছিল। বাজাসন শব্দ “বজাসনের” অপভ্রংশ। বজাসন বৌদ্ধ যোগী ও তান্ত্রিকগণের সুপরিচিত আসন। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই আসন অবলম্বন করিয়া নির্ঝগ্ন লাভ করিয়াছিলেন। নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক মহাবান সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রাচার্যগণ এক সময় এই “আসন” তান্ত্রিক সাধনের বিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিতেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রাম এই বজ্রাচার্যগণের আর একটি প্রধান আড্ডা ছিল।

এই “বাজাসনের ভিটাকে” স্থানীয় হিন্দুগণ খুব ভক্তির চক্ষে দেখেন না। নিকটবর্তী কোনো গ্রামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন যাহাদিগকে প্রাচীন লোকেরা “বাজাসনের ঠাকুর” বলিয়া জানেন। বাজাসন-সংশ্লিষ্ট আর একটি বিশিষ্ট ভদ্র পরিবার সেখানে আছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বাজাসনের সহিত সংশ্রবে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন। “বাজাসনের ভিটা” ভূত ও নানাগণের প্রধান আড্ডা, ইহাই নিকটবর্তী পল্লীবাসিগণের ধারণা। হিন্দুরা উহার সহিত কোনোরূপ সংশ্রব স্বীকার করিতে কুণীত। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে,

তাঁহারা কেন যে এই সংশ্রব স্বীকার করেন না, তাঁহারা সহ্যের দিতে পারেন না। অথচ এ বিষয়ে তাঁহাদের বিরক্তি সুস্পষ্ট; যেন বাজাসন-সংশ্লিষ্ট হইলে তাঁহারা সমাজের চোখে নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িবেন ইহাই আশঙ্কা করেন। বৌদ্ধ-বিদ্বেষের শেষ শিখা এখনও হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জায় জলিতেছে! এক সময়ে যাহারা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ছিলেন কিন্তু এখন হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাও সে পূর্বস্মৃতি একেবারে লোপ করিতে ইচ্ছুক।

বাজাসনের পশ্চিম সীমায় $\frac{1}{2}$ মাইল দূরে, স্বয়ংপুর নামে একখানি সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। সেই গ্রামের অশীতিপর বুদ্ধ নবীন কল্যাতি ও হরিচরণ প্রামাণিক বলিয়া থাকে যে ঐ বাজাসনের ভিটার নিম্নভাগে ৬৭টি প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ ছিল, এখন সম্ভবতঃ তাহা মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহারা শৈশবে সেই স্তম্ভের উপর বসিয়া বিশ্রামলাভ করিয়াছে। এই প্রদেশ নিম্নতল এবং ইহার বহু ক্রোশের মধ্যেও কোন পর্বত নাই। দূর দূরান্তর হইতে এই প্রস্তর আনিয়া যাহারা স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী ছিলেন সন্দেহ নাই। “বাজাসনের ভিটা” খুঁড়িলে বহু-সংখ্যক ইষ্টক পাওয়া যায় কিন্তু নানা প্রকার প্রবাদ-গুনিয়া লোকে ঐ স্থান খুঁড়িতে ভয় পায়। এই প্রবাদ-গুলি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে মনে হয় বাজাসনের ভিটা এক সময়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের আশ্রম ছিল, এই জন্ত লৌকিক সংস্কার উহাকে ভূত ও প্রেতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রাচীন দলিলপত্রে প্রকাশ যে এই গ্রামগুলি এক সময়ে “বাজাসন তালুকের” অন্তর্গত ছিল। ইহাও এই বৌদ্ধাশ্রমের প্রাচীন সমৃদ্ধির অন্ততর প্রমাণ।

মুণ্ডিতমস্তক পুরুষকে এই অঞ্চলের লোকেরা এখনও “নাইয়া মুন্না” বা শুধুই “নাইয়া” এবং উত্তরূপ স্ত্রীলোককে “নারী মুন্নী” বা শুধুই “নারী” বলিয়া থাকে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে “নাগা মুণ্ডা” শব্দ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। আধুনিক চলিত ভাষায় ‘নাড়া মুড়া’। “নারা” ও “নারী” শব্দ ঐ অপভ্রংশ ‘নাগা মুণ্ডা’ শব্দের বিকৃতি। আমি অনুমান করি বাজাসনের পার্শ্ববর্তী নান্না গ্রাম



ব্রজলীলা ।

মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধভিক্ষুর বাসস্থান ছিল। অনেক প্রকার বৌদ্ধাচার এখনও নামাগ্রামে প্রচলিত আছে। তথাকার প্রাচীন কালীবাড়ীতে এখনও শূকর বলি পড়িয়া থাকে! বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ এক সময়ে যে সূরা দেবীকে সমগ্র প্রাণ চালিয়া পূজা করিতেন, এখনও তৎসম্বন্ধে প্রবাদ আছে। সেই দেশের লোকেরা সূয়াপুর বা নামার পরিচয় স্থলে বলিয়া থাকেন, :—“সূয়াপুর—নামা। মদেভাতে পান্না ॥” সূয়াপুর গ্রামে যে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া তান্ত্রিক চক্রে বসিতেন তাহার প্রবাদ এখনও আছে। সূয়াপুর সূয়াপুরের অপভ্রংশ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

বাজাসনের প্রাচীন সমৃদ্ধির আর একটি নিদর্শন এই যে ভিটার সান্নিধ্যে একদা অত্যন্ত বড় রকমের একটা মেলা বসিত। সেই স্থানে “জিয়স” পুকুর নামে একটা পুকুর আছে। এই পুকুরের জলের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি শোনা যায়। বঙ্গদেশের নানা স্থানেই “জিয়স” পুকুর নামধেয় দীর্ঘিকা বর্তমান। এই নামের পুকুর যেখানে যেখানে দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থানে ইহাদের সম্বন্ধে বিচিত্র প্রকারের অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে। এই জিয়স পুকুরগুলি যে এককালে বৌদ্ধভগতের কোন ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীয় ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার গোড়ের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে ঢাকা জেলার বাজাসন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।

ঢাকা জেলায় আমাদের বর্ণিত স্থানটি ব্যতীত বাজাসন নামধেয় আর কোনো স্থান নাই। আমরা বাজাসনের ভিটার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছি তাহাতে এই স্থানে যে সেই বৌদ্ধ বিহার ছিল তাহা অস্বীকার্য্য হয়।

সুপ্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বজ্রতান্ত্রিকগণের শীর্ষস্থানীয়; ইহার নাম বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। তিব্বতে এই বৌদ্ধাচার্য্যের স্মৃতি শত শত নরনারী কর্তৃক পূজিত। দীপঙ্কর বিক্রমপুরের রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে ইহার জন্ম, এবং ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার রচিত বিবিধ গ্রন্থ বৌদ্ধ শাস্ত্রের অঙ্গীয়। শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাছর সি আই, ই, মহাশয় তিব্বত হইতে দীপঙ্করের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে বজাসনের পূর্বস্থিত বিক্রমপুরে বৌদ্ধগুরু দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন; এবং তিনি দ্বাদশবর্ষকাল “বজাসন বিহারে” অধ্যয়ন করেন। এতদ্বারা এই প্রমাণ হয় যে বাজাসন বিহারে শিক্ষাপদ্ধতি এতদূর উৎকৃষ্ট ছিল যে দীপঙ্করের ঠায় ব্যক্তিও দ্বাদশ বর্ষ কাল সেখানে অধ্যয়নের সুবিধা পাইয়াছিলেন, এবং “বাজাসন বিহার” এতদূর প্রসিদ্ধ ছিল যে বিক্রমপুরকে ইহারই নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে হইত। বুদ্ধগয়ার যে স্থানে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন তাহাকেও সেকালে বজাসন বলিত, কিন্তু বিক্রমপুর হইতে তাহা এতদূরে অবস্থিত যে “বাজাসনের পূর্বস্থিত বিক্রমপুর” বলিয়া বিক্রমপুরের পরিচয়ে যে বাজাসনের উল্লেখ তাহা যে বুদ্ধ-



দশ-অবতারের চিত্র।

গয়ার সন্নিহিত বাজাসন তাহা মনে হয় না। যে

বাজাসন হইতে বিক্রমপুর মাত্র ১০১২ মাইল দূরে অবস্থিত, সেই বাজাসনের অস্তিত্ব না জানিয়াই রায় শরৎ চন্দ্র দাস বাহাদুর বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই ভ্রম স্বীকার করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In my Indian Pundits in the Land of Snow I remember to have alluded to a place called Vajrasana lying to the west of the Vikramapura, the birth-place of Dipankara Srijnana, the famous Atisa of Tibet. Had I then any knowledge of the existence of any locality called Vajasana close to Vikramapura, I would hardly have conjectured that Vajasana to have been Gya and not Bajasana. Bajasana is evidently a corruption of the name Vajrasana. In the mounds of Bajasana, it is said, there existed ruins of a Buddhist Bihar of old and there Atisa must have got his early education."

অর্থাৎ যদি বিক্রমপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমস্থিত বাজাসন নামক স্থানের অস্তিত্ব আমি জানিতাম, তবে কখনই আমার ইতিহাস পণ্ডিতস্ব ইন্দিয়াও অবশ্যে নামক পুস্তকে অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া বিক্রমপুরের পশ্চিমস্থিত বাজাসনের উল্লেখ না করিয়া বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিতাম না। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি এই বাজাসনের স্থাপত্য একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার অবস্থিত ছিল এবং তথায় দীপঙ্কর তাহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

সুতরাং নান্দা এবং সূর্যাপুরের সন্ধিস্থলে যে সমুচ্চ মৃৎস্তম্ভপসকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে এক সময়ে সূর্য্যবৎ বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত ছিল। এই বিহারের নাম ছিল "বাজাসন বিহার"। বহুসংখ্যক মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু ইহার নিকটবর্তী নান্দাগ্রামে বাস করিতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভিক্ষুরাজ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই বিহারে শিক্ষালাভ করেন। বিশাল-প্রস্তরস্তম্ভ-মালা-শোভিত যে হর্ম্যরাজি একদা এই বিহারের শোভা বর্দ্ধন করিত, এখনও মৃত্তিকানিয়ে তাহার নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধজগতের চক্ষে "বাজাসন বিহারের" বর্তমান ভগ্নাবশেষ ঐতিহাসিক সম্পদে সমৃদ্ধ।

বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরে যেসকল মুসলমান দপ্তরী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার ও তৎসন্নিহিত মাণিকগঞ্জ মহকুমার লোক। একথা সহজেই মনে উদিত হয় যে এই বহুসংখ্যক দপ্তরী যেস্থান হইতে বঙ্গদেশের সর্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে সেস্থান নিশ্চয় এক সময়ে বিজ্ঞাচর্চার একটা প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল।



দেবী-যুদ্ধ।

মুসলমানগণের সময়ে এই অঞ্চলে তেমন কোন বিজ্ঞান কেন্দ্রের কথা শোনা যায় না। কোন প্রসিদ্ধ “মথুতব মদরসা” বা আরবি ফারসী পড়ার পাঠশালা এই অঞ্চলে থাকিলে তাহা অনেকেরই জানা থাকিত; কারণ মুসলমান প্রভাব এদেশে বেশি দিনের কথা নহে। এদেশে যদিও মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তথাপি সম্ভ্রান্ত বা শিক্ষিত মুসলমান এখানে অতি বিরল। এত দগ্ধবী এখানে কোন্ বিজ্ঞানকেন্দ্র আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহের সুবিধা পাইয়াছিল? এইসকল দগ্ধরীর পূর্বপুরুষগণ ইরান তুরান হইতে আসে নাই, ইহারা মোগল পাঠান নহে, ইহা নিশ্চয়। এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিয়াও তাহাদের পুরুষাভ্যুত্থানিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। এমন কি যেসকল নিম্নশ্রেণীর-হিন্দু ‘লক্ষ্মীর পাঁচালী’ গাহিয়া জীবিকা অর্জন করিত, তাহারাও মুসলমান হইয়া সে ব্যবসায় ছাড়ে নাই। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে পুস্তকসংগ্রহ ও পুস্তকরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইত। সম্ভবতঃ “বাজাসন বিহারের” বিরাট পুস্তকসংগ্রহ রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক দগ্ধরীর প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই বাজাসনের নিকটবর্তী রউয়া, ইর্তা, সূয়াপুর, পিপুলিয়া, যাত্রাপুর, প্রভৃতি গ্রামে দগ্ধরীদের সংখ্যা এত বেশী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে বৌদ্ধ বিহার এককালে একরূপ সমৃদ্ধ ছিল, তাহার পৃষ্ঠপোষক কাঁহার ছিলেন? বাঁহাদের অর্থ ও অত্যাচার প্রকারের সহায়তায় বিরাট-প্রস্তরস্তম্ভ-সমন্বিত বিজ্ঞান-

শীলনের এই অসামান্য কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা কে? যুরোপে যেরূপ সাধারণের বায়ে একরূপ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে এদেশে তাহা হইত না। কোন রাজত্ব বা অর্থসম্পত্তিশালী ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শিল্প ও বিজ্ঞান বিকাশ পাইত; জনসাধারণ বিনা বায়ে সেই বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চার সুবিধা লাভ করিত।

২। সূয়াপুর।

বাজাসনের নিকটবর্তী সূয়াপুর গ্রামের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সূয়াপুর গ্রামে “বাজাসনের ঠাকুর” অভিধেয় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহারা এই নামে পরিচিত হইতে অনিচ্ছুক। কয়েক ঘর ‘দাশ’-সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক একদা এই গ্রামে “বাজাসনের দাশ” নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদেরও এই নামে এপর্যন্ত বিশেষ আপত্তি ছিল। সম্প্রতি বাজাসনের অতীত গৌরবের কথা শুনিয়া তদংশীয় বৈজ্ঞানিকগণের কেহ কেহ এই উপাধিতে আর আপত্তি করেন না।

আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত রাঘব-পঞ্জী নামক কুলগ্রন্থ আমার নিকট রক্ষিত আছে। সেই পঞ্জীতে দৃষ্ট হয় দিগম্বর, নীলাম্বর ও বিষ্ণুদাস ক্ষৌদ্রদার নামক দাশবংশীয় তিন ব্যক্তি খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সূয়াপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহারা “বাজাসনের দাশ”।

এই তিন ব্যক্তি সামান্য বা নগণ্য ছিলেন না। ইহারা

প্রসিদ্ধ পহুদাশের বংশধর, এবং পহুদাশ হইতে দশম স্থানীয়। পহুদাশ মহারাজ বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; চন্দ্রপ্রভা ইহার সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়;—

“সংগ্রামদক্ষে হতবৈরিপক্ষে গোড়েশ-সেবাজিত-পৌরুষঃ শ্রীঃ।

দাতা বিনাতঃ পরিপাল্য লোকান্ স বালিনছ্যাং বসতিং চকার ॥”

(মুক্তি চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩১৫)

এই বংশীয় ভূতপূর্ব পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কলিকাতা-নিবাসী জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে বল্লালসেন কর্তৃক পহুদাশকে প্রদত্ত সনন্দ সেদিনপর্যন্ত রক্ষিত ছিল। স্বরাপুরগ্রাম নিবাসী তমোনাশ দাশ এই পহুদাশ হইতে

হইতে নবম স্থানীয় চণ্ডীবর এইভাবে স্বজাতি-সমাজে অবিসম্বাদ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাঙ্গদেশে মোড়েশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। বিজ্ঞা বুদ্ধি এবং মর্যাদার বাহারা তৎকালে বৈজ্ঞ সমাজের অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীবর অন্ততম। চণ্ডীবরের প্রপিতামহী সেন-ভূমের রাজা চন্দ্রসেনের কন্যা ছিলেন। চণ্ডীবরের পিতা-মহের ছই সহোদরা বিক্রমপুরের বৈজ্ঞরাজবংশে বিবাহিত হন। বিক্রমপুরের ২য় বল্লালসেন (যিনি পোড়াবাজা নামে খ্যাত হন) এই ছই সহোদরার জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন।* দ্বিতীয় সহোদরা উক্ত রাজবংশের কাহ্ন



দেবী-যুদ্ধ।

২৫ পর্যায়ের। পহুদাশকে বল্লাল সেন মহাকুল প্রদান করেন। কিন্তু চণ্ডালিনী-দোষ-সম্পৃক্ত বল্লালের প্রদত্ত কুল বৈজ্ঞগণ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই।

“বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈজ্ঞ, বৈদিক ব্রাহ্মণ।

বল্লালের কুল না লইল তিন জন।”

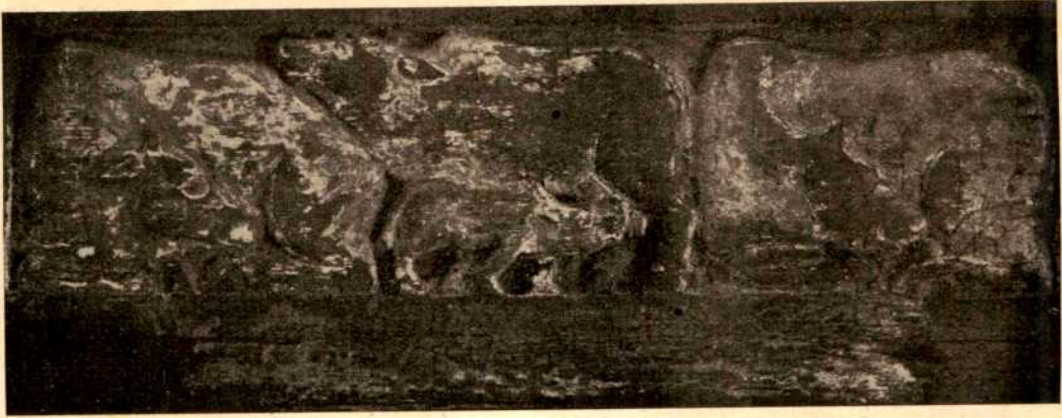
এই প্রবাদ অতি প্রাচীন। লক্ষণ সেনের সময়ে বৈজ্ঞগণ কুল গ্রহণ করেন কিন্তু সে সময়েও বল্লালী কুল এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীনতর-আভিজাত্য-দৃষ্ট বরেন্দ্র দেশবাসীরা এই নূতন কুলীন স্রষ্টার বিপক্ষে প্রবল প্রভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বল্লালী কুল ক্রমে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া দেশময় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কিন্তু বল্লালী কুলের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপত্তি লক্ষণসেনের প্রায় সাক্ষীতবৎসর পরে বঙ্গদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। পহুদাশ



দেবী-যুদ্ধ।

খাঁর সহিত পরিণীতা হন। ২য় বল্লালের এই মহিষীই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বামীর অগ্রগামিনী হন। সকলেই অবগত আছেন, নিদারুণ মর্ষপীড়ায় বল্লাল তাঁহার মহিষী ও অপরাপর পরিবারবর্গের সহিত জলন্ত চিত্রায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ১৩৫০ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্বে এই ছবটনা সংঘটিত হয়। চণ্ডীবরের আত্মীয়গণ এইরূপ উচ্চ সম্মান ও প্রতাপশালী ছিলেন। চণ্ডীবর

* চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩০২।



গোঠলীলা।

স্বয়ং শুধু প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন না, তিনি সমাজে সর্ব-বিষয়েই একজন শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পুত্রগণ রাঢ় দেশ পরিত্যাগ পূর্বক পূর্ববঙ্গের সীমান্তে স্থিত স্মরাপুরের গ্রামে কেন আসিয়া আবাস স্থাপন করেন? বৈষ্ণব কুলীনগণ স্থান ত্যাগ করিলেই অনেকটা মর্যাদাহীন হন। এজ্ঞা তাঁহারা সহজে কুলস্থান ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। কি প্রলোভনে পড়িয়া বিষ্ণুদাস ফোজদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বীয় সমাজের সহিত একরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া এক সুদূর পল্লীতে বাস স্থাপন করিলেন ইহাই অমুসন্ধান করিতে যাইয়া পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপার আমরা জানিতে পারিয়াছি। স্মরাপুর যে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধরাজার রাজধানী ছিল এবং তাহা মুসলমানগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই বিনষ্ট সাম্রাজ্যেই বিষ্ণুদাস ফোজদার প্রভৃতি ভ্রাতারা রাজপ্রতিনিধি হইয়া সমাগত হন তাহাও জানা যাইতেছে।

স্মরাপুর গ্রামে এখন যে স্থানে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যানাথ রায় প্রভৃতি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদারগণের বাড়ী সেই পাড়াটির প্রাচীন নাম ছিল “রাজার পাড়া”। সেই পাড়ারই একটি স্থানে—শ্রীযুক্ত শতদল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুলালয়ের ভিটার নীচে—ভূপ্রোথিত বৃহৎ অট্টালিকার চিহ্ন আছে। জনশ্রুতি এই যে ঐ গৃহে এক সময়ে কোন বাদশাহ বাস করিতেন। তাহার অদূরে শ্রীযুক্ত রেবতী চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ী যে স্থানটিতে অবস্থিত তাহাকে

পূর্বে “পীলখানা” বা “হাতীর পীলখানা” বলিত এবং আর একটু পূর্বে একটা টিপি ও তৎসংলগ্ন কতকটা উচ্চ স্থান আছে তাহার নাম “কোটবাড়ী”। হিন্দুরাজত্ব কালে দুর্গকে “কোট” বা “গড়” বলিত। সুতরাং এই কোটবাড়ীতে প্রাচীনকালে কোন দুর্গ অবস্থিত ছিল। গ্রামের উত্তর সীমান্তে একটি পাড়া আছে তাহার নাম “ইদগড়”। সমস্ত গ্রামটি বেষ্টিত করিয়া যে একটি পরিখা ছিল, এখনও বর্ষাকালে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন উপলব্ধ হয়। “রাজার পাড়ার” একটি পুকুরের মধ্যে সম্প্রতি একটা সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা এখনও জলের ভিতরে আছে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হয় নাই। উহার নিকটবর্তী কোন পুকুর হইতে বাসুদেবের একখানি প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অত্যাচারীর নিশ্চয়ম অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন। ঐ মূর্তি বহুদিন করুণা নান্নী কোন নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের গৃহে পূজা পাইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ঐ দেবতা রঘু সেনের আশ্রয়টিকায় কয়েক বৎসর অনাদৃত অবস্থায় একটি নারিকেল বৃক্ষের মূলদেশে পড়িয়াছিলেন, এখন উহা নিকটবর্তী রোয়াইল গ্রামে অভয় ঠাকুরের গাছতলায় আছেন। এই মূর্তি ভিন্ন আর দুইখানি প্রস্তরমূর্তি গ্রামসন্নিধ্যে পাওয়া গিয়াছে, একখানি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর একখানি স্মরাপুর সংলগ্ন বউয়া গ্রামে কোন মুসলমানের বাড়ী আশ্রয় করিয়া আছেন। এই দুই মূর্তির একখানি বৌদ্ধমূর্তি। মূর্তিগুলি যনাধিক সহস্র বৎসরের প্রাচীন। স্মরাপুরে শ্রীযুক্ত



গোবিন্দলা

দেবীচরণ দাস মহাশয়দের দেড় শত বৎসরের প্রাচীন ইষ্টকালয় ভাঙ্গিয়া গেলে, উক্ত গৃহের ভিত খুঁড়িতে খুঁড়িতে বহু নিয়ে একটি প্রাচীরের অগ্রভাগ আবিস্কৃত হইয়াছে। সূর্যাপুরনিবাসী ত্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাশ মহাশয় জানাইয়াছেন যে ঐ প্রাচীর সমস্তে মৃত্তিকা খুঁড়িলেই পরিদৃষ্ট হয়, উহা একটা সুবৃহৎ পাড়ার সমস্তটা জুড়িয়া আছে। এই দাশ বংশীয়রাই গ্রামের প্রাচীনতম জমিদার বিষ্ণুদাস কৌজদার প্রভৃতির বংশধর, এবং একসময়ে ইহারা সুবিস্তৃত ভূভাগ শাসন করিতেন। তাঁহাদের প্রাচীন দলিলপত্রে, ভগ্নগৃহ এবং মন্দিরাদিতে সেই প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় আছে। পহুদাশ হইতে দ্বাদশ স্থানীয় দিবাকর দাশের নামে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা গ্রামের পশ্চিমে বিদ্যমান ছিল, এখন তাহা ভরাট হইয়া গিয়াছে। ঐ দীর্ঘির অনেকগুলি ঘাট ছিল। তাহাদের নাম এখনও চলিত কথায় শোনা যায়,—“আয়ান ঘাট” “শয়ান ঘাট” ইত্যাদি।

উপর লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এই কয়েকটি তথ্য উদ্ধার করিতে পারি। সূর্যাপুর গ্রাম এক সময়ে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল; ঐ গ্রামেই তাঁহাদের দুর্গ বা কোটবাড়ী ছিল; রাজপ্রাসাদ যে পাড়ায় ছিল তাহার নাম “রাজার পাড়া” এবং তৎসম্বন্ধিত হস্তীশালার নাম এখনও চলিয়া আসিতেছে; তাঁহারা বিষ্ণু ও বুদ্ধ উভয়েরই পূজা করিতেন; তাঁহাদের প্রস্তুত-স্তুত-পরিশোভিত মন্দির এবং তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ মুসলমানেরা বিনষ্ট করেন; সেই ভগ্নমূর্তি ও ভগ্নস্তুত ভিন্নধর্ম্মীর লাহুনা অঙ্গে ধারণ করিয়া এখনও বিরাজ করিতেছে; হিন্দু-রাজার গড়ে মুসলমানেরা বিজয়োল্লাসে “ইদু” উৎসব সম্পাদন করেন, এই জন্তই সেই গড় যে স্থানে ছিল শেষে তাহা “ইদু গড়” নামে পরিচিত হয়; যে মুসলমান সম্রাট হিন্দুরাজধানী ধ্বংস করেন তিনি কিছুকালের জন্ত সেই রাজপ্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন, এই জন্তই গ্রামে “বাদশাহের বাড়ী” বলিয়া এখনও তাহা উক্ত হইয়া থাকে; হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজাদের অধিকারে “বাজাসন বিহার” বিজ্ঞা ও ধর্ম্মগৌরবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; মুসলমান বিজয়ের পরে এই লুপ্তপ্রায় বিহারের অধিকার



গোষ্ঠলীলা।

মুসলমান-রাজপ্রতিনিধি দাশবংশীয়দের হস্তে স্তম্ভ হয়; “বাজাসন বিহারের” নাম ও প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল দাশবংশীয়গণ এখনও “বাজাসনের দাশ” নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; “ফৌজদার” উপাধি ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদের সে অঞ্চলে বিস্তৃত অধিকার (যাহা প্রাচীন দলিলপত্র হইতে জানা যাইতেছে) পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হয় ইহারাই প্রাচীন বিনষ্ট সাম্রাজ্যে মুসলমান-রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ সূয়াপুর গ্রামে আগমন করেন। সূয়াপুরের হিন্দু বা বৌদ্ধ নৃপতি কোন বংশীয় ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে এই গ্রামে এবং নিকটবর্তী আর কয়েকটি গ্রামে অনেক সময়ে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। সেই-সকল মুদ্রা আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া এখনও হস্তগত করিতে পারি নাই। তাহা পারিলে সূয়াপুরের প্রাচীন রাজবংশের কোন না কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে আশা করি।

যেসকল মুসলমান ভাওয়ালে ও চন্দ্রপ্রতাপে হিন্দু রাজত্ব ধ্বংস করেন তাঁহাদের মধ্যে ভাওয়াল পরগণার চেরাগ্রাম নিবাসী পছন্ন শা গাজী ও তাহার বংশধরগণ বিশেষ বিখ্যাত। পছন্ন শা ও তৎপুত্র কারুম্মা গাজী সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সূয়াপুরের ধ্বংস সাধন করেন। সূয়াপুর যে নদীর উপরে অবস্থিত তাহা ধলেশ্বরীর একটি শাখা। টেলরের ঢাকার টপোগ্রাফি নামক পুস্তকে যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় ধলেশ্বরীর এই শাখার প্রাচীন নাম ছিল কানাই নদী। গাজীগণের প্রভাবের সময়ে উহা “গাজীখালি” নামে অভিহিত হয়।

৩। ধামরাই।

কানাই ও বংশাই এই দুই শাখানদী হিন্দু রাজত্বের বিলীন গৌরবগাথার স্মৃতি বহন করিতেছে। বংশাই নদীর তীরে সুপ্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম। এই গ্রাম অতি প্রাচীন। সাভার, সূয়াপুর, বাজাসন, ও নান্দা—ধামরাই গ্রাম হইতে বহুদূরে মিলে। “বাজাসন বিহারে” অতীশ অধ্যয়ন করিতেন। উহা দশম শতাব্দীর শেষার্ধের কথা। ঐ

বিহার সম্ভবতঃ আরও দুই চারি শত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্মারাপুরের বুদ্ধ বিগ্রহ ও প্রস্তরস্তম্ভ ১২।১৩ শত বৎসর পূর্বের বলিয়া মনে হয়। ভাওয়াল পরগণার সাভার ও কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থান অতি প্রাচীন। কাপাসিয়ার স্মৃতিস্তম্ভের কথা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনির গ্রন্থে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ধামরাই গ্রাম এই চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে কম প্রাচীন নহে। এই অঞ্চলটি সম্ভবতঃ ৫ হাজার কিংবা ততোধিক বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নীরবে বহন করিতেছে। ৬৭ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়, ধামরাই নাম শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন উহা সম্ভবতঃ ধর্ম-রাজিকা শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। মহারাজ অশোক তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যে ৮৪ হাজার ধর্মরাজিকা বা কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন,— ধামরাই সেই ৮৪ হাজারের একটি হইতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় এই অনুমানের ৬৭ বৎসর পরে সম্প্রতি ধামরাইবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-প্রসাদ বসু বি, এল, মহাশয় একস্থানি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন দলিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় ধামরাই

গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্মরাজী-ই ছিল। এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবুর মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

“বহুদিবস হইল, মহাদেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ধামরাই নামক প্রাচীন গ্রামের নাম শুনিয়া তৎকালে বলিয়াছিলেন যে ঐ স্থান ধর্মরাজিকা শব্দের অপভ্রংশ। মোর্য সম্রাট অশোক ৮৪,০০০ ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে অশোকাবদান হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছি।—‘অশোকে। নামা রাজা বভুবেতি। তেন চতুরশীতি ধর্মরাজিকা সহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাশনং প্রাপ্যতে তাবৎ তস্ত বশঃ স্বাতীং।’

উক্ত অশোকাবদান হইতে জানিতে পারি যে সম্রাট অশোক যেসকল ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন পুষ্যমিত্র সেই-সকল ধ্বংস করেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্মরাজিকা বিদ্যমান ছিল তাহা হইতেই এই স্থানের ধর্মরাজিকা নামকরণ হইয়া থাকিবে। ধামরাইবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ বসুর নিকট যে আড়াইশত বর্ষের প্রাচীন দলিল দেখিয়াছি তাহাতে এই স্থানের “ধর্মরাজী” নামই যখন পাইয়াছি তখন ইহা নিশ্চয় যে এই “ধর্মরাজী” চলিত ভাষায় হইয়াছে “ধামরাই”।

৪। সাভার।

ধামরাই ও স্মারাপুর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে ধলেশ্বরীর রক্তবর্ণ প্রাকারাকার প্রায় ক্রোশব্যাপক তীরদেশ আশ্রয় করিয়া সাভার গ্রাম অবস্থিত। এখানে ধলেশ্বরীর ভৈরবী মূর্তি পদ্মাকেও পরাস্ত করিয়াছে। ঝড় থাকুক বা না থাকুক এই নদীতে উত্তাল তরঙ্গের বিরাম নাই। কিন্তু সাভারের রক্তবর্ণ ও সূদৃঢ় তীর তরঙ্গের এই উৎকট আঘাত সহ করিয়া অটুট রহিয়াছে। এই সুরঞ্জিত উচ্চ তটভূমির উপর গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষের পঙ্ক্তি স্বর্ঘ্যাস্তের প্রভায় বড় সুন্দর দেখায়; সমস্ত দৃশ্যটি যেন চিত্রাঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। সাভারের মতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বোধ হয় বঙ্গদেশের আর কোথাও নাই। স্মরণ্য নদীতীরে অবস্থিত এই পল্লী স্বভাবতঃই যেন বাগিচার কেন্দ্রভূমি হইবার যোগ্য। প্রকৃতি যেন স্বয়ং রাজরাজীর সিন্দূর ইহার ললাটে পরাইয়া দিয়াছেন। দূর হইতে এই স্থান সিন্দূরমণ্ডিত বলিয়া ভুল হয়। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার কোটবাড়ীর অর্থাৎ দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এই হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অছনা ও

পত্নীকে পটিকানগরের রাজা বিখ্যাত গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র) বিবাহ করেন।* ইহার ষুষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

যে অতীত পত্নীর নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র ভাট যোগী ও চারণগণের গাথায় প্রচারিত হইত, সেদিনও বোম্বাই হইতে বাহাদের চিত্র

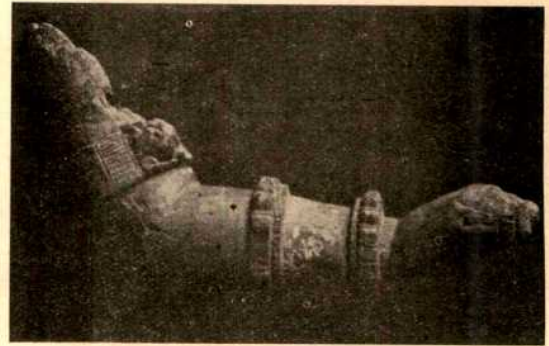
রবিবর্ণা অঙ্কন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর-পশ্চিমে লক্ষ্মণদাস প্রমুখ বহুসংখ্যক কবি বাহাদের গুণ-গাথা গাহিয়াছেন, এবং বাহাদের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গলাদেশ ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মহিষীদের প্রথম প্রেমমিলন এই সাভারেই হইয়াছিল। এই স্থানে রক্তবর্ণ ধুলিতে এক সময়ে অতীত ও পত্নী বাল্যক্রীড়া করিতেন। হরিশ্চন্দ্র রাজা রঙ্গপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাকে অনেকে হরিশপাল বলিয়া জানেন। হরিশ্চন্দ্রের সমাধি এখনও বিদ্যমান। অতীত ও পত্নীর স্থায় রূপবতী তখন ভারত-বর্ষে আর কেহই ছিলেন না। অশ্রুচর্য্যের বিষয় ইহাদের পুত্র হবচন্দ্র নির্বুদ্ধিতার জন্ত প্রবাদস্থানীয় হইয়া আছেন। সাভারে হরিশ্চন্দ্র পালের বাড়ী ছাড়াইয়া আরও উত্তরে শিশুপালের বাড়ী। ধামরাই হইতে ৬৭ মাইল দূরে যশোপালের রাজধানী মাধবপুর, এখন গাজীবাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। আরও উত্তরে কামদেব নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। পালবংশের ধ্বংসের পর এই স্থানে চণ্ডাল জাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক ভ্রাতৃত্ব কতক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মহাপ্রতাপশালিনী ভগিনীর নাম ছিল মোগ্গী। সাভারে এখনও “খাইডা ডোঙ্কা” নামক রাজার নাম শোনা যায়। কলিকাতা সিমলা, ১৬ নং সাগরধর লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, এই “খাইডা ডোঙ্কা” রাজার সম্বন্ধে ভাটের গান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি “কায়েং” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু জনশ্রুতি ও নাম পর্যালোচনায় ইনি যে তিব্বত দেশীয় ছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

* See Martin's Eastern India.



গোষ্ঠালীলা।

“খাইডা ডোঙ্কা” কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া বাইতে চাহিয়াছিলেন, ভাটপরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপের ইতিহাস বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতেও প্রাচীনতর। যেখানে সেন রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু তৎপূর্ববর্তী পালরাজগণের কীর্ত্তি অধিকাংশই ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার বহুসংখ্যক স্তূপের ভগ্নাবশেষ, পুষ্করিণী, দুর্গ ও গড়খাইয়ের চিহ্ন প্রাচীনতর রাজকুলের কীর্ত্তিগাথা মৌনভাবে প্রচার করিতেছে। পাল রাজগণ কোন জাতীয় ছিলেন বলা যায় না। তাঁহারা যে জাতীয় থাকুন না কেন পরে যে ইহারা রাজবংশী ও কোচগণের সঙ্গে স্থানে স্থানে মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালের বংশধর ভারত চন্দ্র রায় এখন নিকটবর্তী কোণা গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহারা মাহিষ্য বলিয়া পরিচয়



নায়িকার ভগ্নহস্ত।

দিতে প্রয়াসী। ভাওয়ালের কাপাসিয়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জগৎপ্রসিদ্ধ মন্ডলিনবস্ত্রের জন্মভূমি ছিল। যে রাজগণ এই বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন

তাহাদের রাজধানীর চিহ্ন ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপের সর্বত্র পড়িয়া আছে। “বায়ান বাজার ও তেপান গলি-” যুক্ত প্রাচীন “বাঙ্গলা” নামক নগর সম্ভবতঃ ইহাদের অগ্রতম রাজধানী ছিল। এখনও ঢাকার “বাঙ্গলা” বাজার” সেই লুপ্ত রাজধানীর নাম বহন করিতেছে। হে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত যুবক, একবার সচেষ্টিত হইয়া এই প্রদেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান কর। যেসকল সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে, তাহাদের গৌরবের শেষ শিলা তোমারও ললাট স্পর্শ করিতেছে, বুঝিতে পারিবে। ইতিহাসের মৌন ভারতী অনেক সাধ্য সাধনার তোমার সহিত কথা কহিবেন; তখন বুঝিবে তুমি যে স্থানকে নগর্য্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেছ তাহা এক সময়ে পরাক্রান্ত দ্বিধিজয়ী বীর, সমুদ্র-যাত্রী নাবিক ও শত শত জগদ্বিহারী বণিকের লীলাক্ষেত্র ছিল; সেখানে জগদগুরু ধর্ম্মপ্রচারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, এবং অপূর্ণ আত্মোৎসর্গের কথা প্রতি ধূলিরেণুতে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই প্রবন্ধ মধ্যে যে চিত্রগুলি দেওয়া হইল, তাহা সূর্য্যপূর্বের দশ বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের এক-খানি কাঠসিংহাসনে খোদিত ছিল। এই খোদিত চিত্র বিচিত্র বর্ণারূপে রঞ্জিত ছিল। তিন শত বৎসর কিংবা তদুর্দ্ধ কাল পূর্বে এই সিংহাসন নির্মিত হইয়া-ছিল। ইহাতে কয়েকটি অতি সুন্দর বড় বড় কাঠ-পুস্তলিকা সংলগ্ন ছিল। সিংহাসনের বাহা শোভা তাহা গত ৪১৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্তই ধ্বংস পাইয়াছে। ছইচারিখানি ভগ্ন কাঠ বাহা উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহাদের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। প্রথমখানি ব্রজলীলা। কদম্ব-বৃক্ষমূলে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও ছই পার্শ্বে সখী-গণ। সখীদের পরিচ্ছদ মুসলমানীদের অনুরূপ। তাহা-দের কাহারও হস্তে ভুঙ্গার, কাহারও হস্তে সনাল অর্দ্ধ-বিকশিত পদ্মপ্রস্থন, কাহারও হস্তে বাজানী, কাহারও হস্তে চামর, কাহারও হস্তে বা পুষ্পমালা। ছই পার্শ্বে আর ছই খানি কৃষ্ণলীলার চিত্র। মধ্যবর্তী কৃষ্ণমূর্তির নিম্নে চিত্রশিল্পী “রামপ্রসাদের” নাম খোদিত। প্রতি-লিপিতে এ নাম পড়া যায় না। দ্বিতীয় চিত্র একটা মন্দিরের দ্বার,—তাহাতে দশ অবতারের মূর্তি খোদিত।

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম চিত্র দেবীযুদ্ধের। ইহাদের মধ্যে একটীতে কোন এক অস্ত্রের হস্তে বন্দুক দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম চিত্র গোষ্ঠের, তাহাতে গাভীগণের মূর্তি অতি কৌশলের সহিত খোদিত। কিন্তু প্রতিলিপিতে তাহা একেবারেই শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। একাদশ চিত্র একটা নায়িকার ভগ্ন হস্তের। এই চিত্রশিল্পে মুসলমান প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই খোদিত কাঠফলক বিচিত্র সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত ছিল, এখনও উহাতে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। তিনি চারি শত বৎসর পূর্বে অঙ্কিত কয়েকখানি বঙ্গীয় চিত্র দর্শন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক সুপ্রসিদ্ধ ভিনসেন্টস্মিথ সাহেব আমাকে লিখিয়াছিলেন যে ঐ ছবিগুলি দেখার পূর্বে তাহার ধারণাই ছিল না যে অঙ্গরা গুহার চিত্ররাশির পরে ও আকবরের সময় পর্য্যন্ত হিন্দু চিত্রশিল্প বলিয়া কিছু ছিল।

মুসলমান বিজয়ের পরেও যে হিন্দু-চিত্রশিল্প ভারত-বর্ষে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাহার নিদর্শন ও দেশের অনেক প্রাচীন পল্লী খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অঙ্ক

(হাইনের কবিতা হইতে)।

বাহার সন্ধান ফির

সমগ্র ধরণী

নিশিদিন পাগলের বেশে,

মর্ম্মকোণে সন্ধ্যাপনে

অশ্রু সনে তা’রে

দেখেছি কি?—আলো করে কে সে?

সৌভাগ্য-মঙ্গল-শঙ্খ

ছ্যারে ছ্যারে

ফুকারিছে দিবস রজনী;

কামনা—সাধনা যা’র

সেই লভে তা’রে।

• তা’র প্রাণে বাজে সে’ রাগিণী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিষা।



কবিগুরু বাম্বাকি রামায়ণে বানরজাতিকে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-কৌশলে মানবের অনুরূপ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ত্রেতাযুগের সে বর্ণনা, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অভাবে, বর্তমান সময়ে সর্বজন-গ্রাহ্য না হইলেও, ডার্বিনের মতে সায় দিয়া একথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, নর ও বানরের শারীরিক গঠনপ্রণালী অনেকাংশে অভিন্ন। চিন্তা ও বুদ্ধিশক্তির আধার মস্তিষ্কেও ইহাদের অধিকার নিতান্ত কম নহে,—স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে তাই ইহারা মানবসমাজের ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করিয়া অনেক সময়ে অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করিতে পারে।

বানরসমাজে শিম্পাঞ্জী ও বনমানুষ সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। স্বভাবতঃ ইহারা মানবোচিত বহু হাবভাব ও আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত; উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, অল্পাংশ অনেক বিষয়েও ইহাদের লীলা অনেকাংশে নরলীলারই অনুরূপ হইয়া উঠিতে পারে। সংপ্রতি লণ্ডনের চিড়িয়াখানা হইতে এ বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের বানর-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ বা রক্ষক মিঃ ম্যান্সব্রিজ (Mansbridge) আপনার অধীনস্থ কয়েকটি প্রাণী দ্বারা ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। মিঃ ম্যান্সব্রিজ নিজে বানরজাতির একজন উপযুক্ত শিক্ষক। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত চিড়িয়াখানায় কাজ করিয়া তিনি এই শিক্ষকতা-কার্যে অপরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

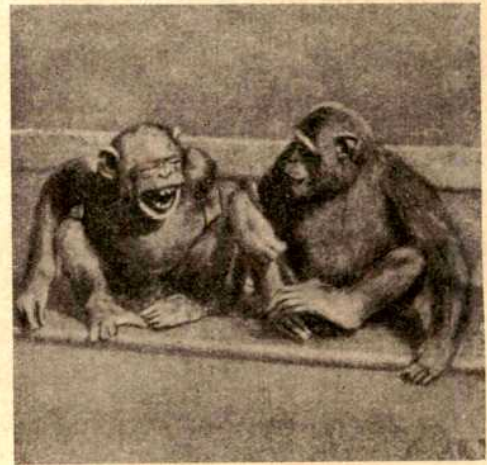
কয়েক বৎসর পূর্বে এই চিড়িয়াখানায় স্যালী (Sally) নামক একটা শিম্পাঞ্জী ছিল। অধ্যক্ষ ম্যান্সব্রিজ তাহাকে এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যাগুলি গণনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দর্শকবৃন্দ স্যালীকে ঐরূপ গণনা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, সে পদনিয়ম তুণ এক-

একগাছি করিয়া মুখে তুলিয়া রাখিত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হওয়া মাত্র সমস্তগুলি একত্র করিয়া প্রশংসার হস্তে অর্পণ করিত। স্যালীর পূর্বে বানরসমাজে আর কোন ব্যক্তির গণনা-চর্চায় ঐরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

সংপ্রতিও ঐ দক্ষ শিক্ষকের অধীনস্থ দুইটা শিম্পাঞ্জী ও তিনটা বনমানুষ অত্যশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলের সঙ্গে অসাধারণ শিক্ষালাভের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে।

শিম্পাঞ্জী দুইটির নাম জেরী (Jerry) ও ফেনী (Fanny)। জেরী পুংজাতীয় ও ফেনী স্ত্রীজাতীয়। আকৃতিতে ফেনীই একটু বড় বটে; কিন্তু বয়সে জেরী অপেক্ষা ছোট—উহাদের বয়স যথাক্রমে পাঁচ ও সাত বৎসর। উভয়েই তিন চারি বৎসর যাবত এই চিড়িয়াখানার অধিবাসী।

ফেনী ও জেরী ম্যান্সব্রিজের অত্যন্ত প্রিয়। বলিতে কি, ইনি উহাদিগকে নিজের সন্তানেরই স্তায় জ্ঞান করেন। অনেক সময়ে উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চিড়িয়াখানার খোলা রাস্তায়ও বেড়াইয়া বেড়ান। ঐ সময়ে দর্শকগণ এই প্রাণীদ্বয়ের মানবোচিত বহু লীলা দর্শনের সুযোগ পান। উহাদের এই লীলাখেলার কয়েকটি দৃষ্টান্ত অদ্য আমরা পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।



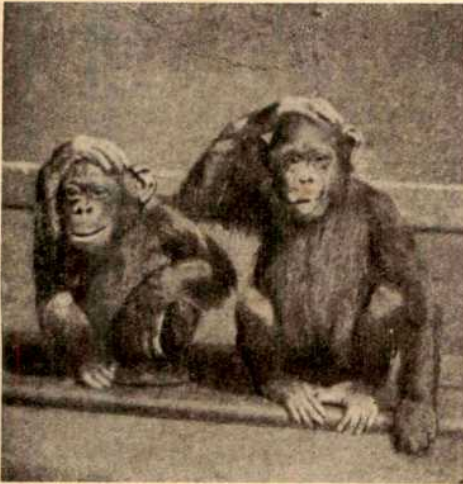
ফেনী দুধ খাইয়াছে বলিয়া জেরীর রাগ।

একদিন দর্শকগণ ম্যান্সব্রিজের সঙ্গে বানরবাসের সম্মুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জেরী ও ফেনীর

গৃহ হইতে ভয়ানক চীৎকারধ্বনি উখিত হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্ত সকলে উদ্গীর্ব হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, জেরীর হস্তে মার খাইয়া ফেনী প্রাণপণে চাঁচাইতেছে, কিন্তু জেরী তাহাতে অক্ষেপ না করিয়া দাঁতমুখ খিচাইয়া দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া যেন তাহাকে শাসাইয়া বলিতেছে—‘অঃ! আবার কারা হচ্ছে! ও সব আমি গ্রাহ্য করিনে—চুপ রও!’

ম্যান্সব্রিজ ধমক দিয়া উঠিলেন। নিমেষমধ্যে কান্নাকাটি সোরগোল সমস্তই থামিয়া গেল। ফেনী এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল, সে যেন বলিতে চায়—‘মাষ্টার মশায়! আমার কোন দোষ নেই—এসব জেরীর কাজ।’ জেরী নিজেও ভাবগতিক বুঝিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল।

ম্যান্সব্রিজ ডাকিয়া বলিলেন—‘ফেনী, তুমি বাইরে এস, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। জেরী বড় ছুষ্ট হয়েছে, তাকে আজ আর বেড়াতে নিয়ে যাব না।’ শিক্ষকের এই বাক্যের মধ্যে অজস্র তিরস্কারের বেদনা অনুভব করিয়া জেরী বস্ততঃই ভারী বিষন্ন হইয়া পড়িল। তাহার কাতর দৃষ্টিতে তীব্র অনুতাপের পরিচয় পাইয়া ম্যান্সব্রিজ তাহাকে ক্ষমা করিলেন।



জেরী ও ফেনী স্কেলাম করিতেছে।

বাদবিসম্বাদ সকল ভুলিয়া এবার জেরী ও ফেনী উৎফুল্লচিত্তে বাহিরে আসিল। অধ্যক্ষ বলিলেন—‘এখন

তোমরা একথানা বিস্কুট পাবে; মনে রেখো, একথানা বই ছথানা মিলবে না; কিন্তু ঐ একখানাই আমাদের সকলের খেতে হবে।’ একজন দর্শক একথানা বিস্কুট বাহির করিয়া ধরিলেন। অধ্যক্ষের ইঙ্গিতক্রমে ফেনী উঠিয়া দাতাকে সেলাম করিয়া উহা গ্রহণ করিল। কতকণ পরে ম্যান্সব্রিজ নিজে উহা ফেরত চাহিলে, ফেনী অস্থান বদনে তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। ম্যান্সব্রিজ বিস্কুটখানিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া একখণ্ড বৃহৎ ও একখণ্ড ক্ষুদ্রের সমবায়ে একএকভাগ ফেনী ও জেরীকে প্রদান করিলেন; অতঃপর উহাদের নিকট স্বীয় অংশ চাহিবামাত্র, ফেনী নিজের জন্ত ছোটখানি রাখিয়া বড় বিস্কুট খণ্ড তাঁহাকে দিল। জেরী কিন্তু ঠিক ইহার উল্টা করিল। জেরীর ভাবস্বভাব বস্ততঃই ‘ছুষ্ট, ছেলের’ মত!

ইহার পর ম্যান্সব্রিজ জেরীকে কাছে ডাকিয়া তাহার খাঁদা নাকের উপর একটা আঙুর রাখিয়া দিলেন এবং হাতের কোনরূপ সাহায্য ব্যতীত উহা তাহাকে খাইতে বলিলেন। জেরী আস্তে আস্তে ঝাড় নীচু করিয়া নীচের চৌটখানি বাড়াইয়া নাকের উপর হইতে আঙুরটিকে মুখে



জেরীর নাকের উপর আঙুর রাখা।

টানিয়া লইল। অতঃপর অধ্যক্ষ ফেনীর হাতে একটা আঙুর দিয়া জেরীকে তাহা খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন;—ফেনী অবিলম্বে রক্ষকের আদেশ পালন করিল। শেষোক্ত এই কাণ্ডটী নির্বাহ করিবার বেলা জেরী কিন্তু এত

বড় স্বার্থত্যাগের নিমিত্ত আন্তরিক ক্লেশের যথোচিত পরিচয় দিতে কস্মর করিল না।

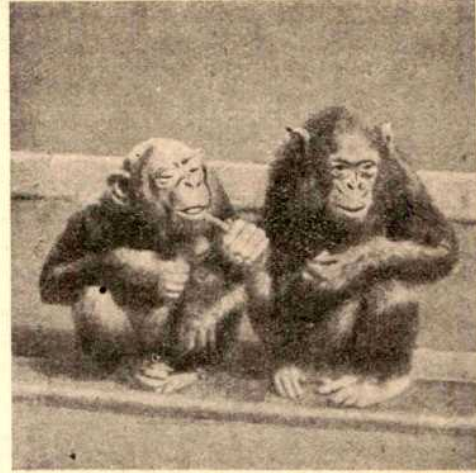
ম্যান্সব্রিজ ফেনীকে ডাকিয়া বলিলেন—‘ফেনি, চোক বুজে’ হাঁ কর, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি।’ তৎক্ষণাৎ ফেনী হাঁ করিয়া চোক বুজিবার ভাণ করিল; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অলক্ষ্যে ডান চোকটা দিয়া মিটির মিটির করিয়া তাকাইতেও লাগিল। অধ্যক্ষ তাহার ছুঁটু মি বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—‘সয়তান! এই বুঝি তোমার চোক বোজা?—



“চোক বুজে হাঁ কর, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি।”

ডান চোক দিয়ে ও কি হচ্ছে?—বোজ—বোজ—ও চোকটাও শীগগীর বোজ।’ এবার ফেনী সত্য সত্যই দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি বদ্ধ করিল। ম্যান্সব্রিজ ঐ অবস্থায় উহার নাকের ডগায় একটা আঙুর রাখিয়া দিলেন,—মুখের হাঁ সার্থক করিতে শিম্পাঞ্জীও গপ্ করিয়া তাহা গিলিয়া ফেলিল।

ভেলুকীওয়ালাদের স্থায় ম্যান্সব্রিজের পকেটগুলি সর্বদাই নানা দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ থাকে। তিনি তাঁহার একটা পকেট হইতে একখানা ছুরি ও একটা আপেল ফল বাহির করিয়া ফেনীকে তাহা কাটিতে দিলেন। ফেনী যথানিয়মে তাহা কাটিয়া রক্ষকের আদেশে একখণ্ড নিজে খাইল এবং অপর একখণ্ড ছুরির বাটে ছুঁড়িয়া জেরীকে খাওয়াইয়া দিল; ফলটির অবশিষ্টাংশ ম্যান্সব্রিজ নিজে গ্রহণ করিয়া ‘পকেটস্থ’ করিলেন। মুখের গ্রাসের এইরূপ

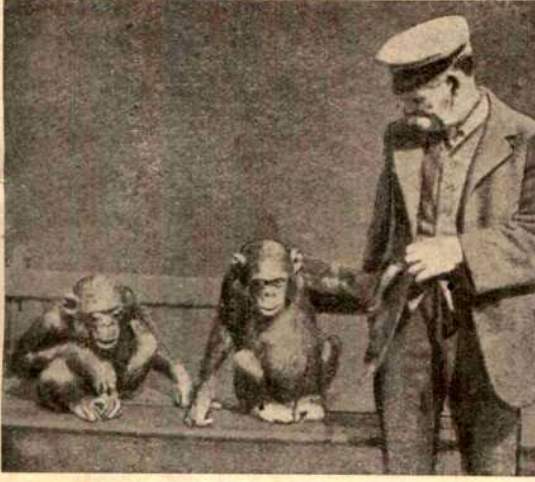


ফেনী নিজের আপেলের ভাগ জেরীকে খাওয়াইতেছে।

অসাময়িক অপব্যবহার দেখিয়া জেরীর কিছু ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে আপেলের অবশিষ্টাংশ পাইবার জন্ত হাউ মাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। অধ্যক্ষ বলিলেন—‘যাঃও! এখন আমাকে বিরক্ত করো না। আজ আর কিছু হচ্ছেনা, যা. পাওয়ার আবার কাল পাবে।’ কিন্তু সে কথা শুনে কে?—জেরী তিন বৎসরের থোকাটির মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ম্যান্সব্রিজ শেষে তাহাকে পকেট হইতে উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিলেন। আত্মরে থোকার কান্নাকাটি অমনি থামিয়া গেল—অভিপ্রেত জিনিস লাভের আশায় জেরী মহা উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া রক্ষকের পকেট অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল এবং এ-পকেট ও-পকেট করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে এক পকেটে আপেলটা পাইয়া অতি আনন্দে উদরসাৎ করিল।

বাহিরের থেলা এইভাবে শেষ করিয়া ঘরের ভিতরের ব্যাপার দেখাইবার জন্ত ম্যান্সব্রিজ অতঃপর জেরী ও ফেনীকে গৃহে রাখিয়া আসিলেন। উহাদের একজন অধ্যক্ষের কোলে চড়িয়া ও অপরজন তাঁহার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

ম্যান্সব্রিজ ফিরিয়া আসিয়া দর্শকগণকে উহাদের গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। এই গৃহ বানরবাসের মূল খাঁচার পশ্চাতে সংস্থিত এবং তিনখানি ক্ষুদ্র কামরায়



জেরী রক্ষকের পকেটে হাত ঢুকাইয়া আঙুর খুঁজিতেছে।

বিভক্ত। একটা বারান্দাপথ কামরাগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহার টালির আচ্ছাদন ও কাঁচের বেড়া এবং পার্শ্ববর্তী প্রবেশদ্বার মূল গৃহগুলিতে যথেষ্ট আলো ও বায়ু সঞ্চারের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। ম্যানস্ট্রিজ দর্শকগণকে লইয়া এই বারান্দাপথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের একটা কামরা দেখাইয়া বলিলেন—‘এইটা ওদের রান্নাঘর। এই ঘরের সমস্ত জিনিসই ওরা নিজেদের বলে মনে করে এবং এখানে এসে নিজেদের জিনিস নিজেরা পেলে কোন বিষয়েই ঝগড়াঝাটি থাকে না।’ ফেনীদের এই রান্নাঘরখানি নানাবিধ খাবার বাসনে সজ্জিত। উহার মধ্যে কয়েকপ্রকার ঔষধও রক্ষিত আছে। স্বাভাবিক বতাহারের অভাবে পেটের পীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় এই ঔষধ উহাদের জন্য ব্যবস্থিত। জেরী ও ফেনী প্রভাতে গাত্রোথান করিয়াই প্রত্যহ ইহার এক এক ডোজ পান করে। এই প্রকার ঔষধ সেবনে ইহাদের কোন প্রকার বিরক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

রান্নাঘরে দুইখানি কেদারা সাজাইয়া রাখিয়া ম্যানস্ট্রিজ অতঃপর ফেনীদের অন্দরাভিমুখে চলিলেন। পূর্বোন্নিখিত কামরা তিনটির সর্বশেষ গৃহখানিই উহাদের এই অন্দরমহল। মহলটির সম্মুখাংশ অর্ধকাচারূপ কপাট-সংযুক্ত। ম্যানস্ট্রিজ এই কপাটে ধাক্কা দিয়া প্রথমতঃ গৃহস্থকে সজাগ করিয়া লইলেন, তারপর ফেনীকে ডাকিয়া

দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। ফেনী ভিতরের হাতল ঘুরাইয়া কবাট খুলিল এবং মুখ বাড়াইয়া আগন্তকের উদ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে স্বীয় রক্ষককেই দ্বারসান্নিধ্যে দেখিতে পাইয়া মহা আনন্দে দরজার উপর লাফাইয়া উঠিয়া বিচিত্রগতিতে দোল খাইতে আরম্ভ করিল। ম্যানস্ট্রিজ তাহাদিগকে অবিলম্বে রান্নাঘরে আসিতে বলিলেন। বাধা ও স্তবোধ ছেলেটির মত জেরী এবার মহা চটপটে হইয়া উঠিল—ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ সে রক্ষকের হস্ত ধারণ করিল। ফেনীর কিস্ত তখনও দোল খাইবার সখ মিটে নাই—সে পূর্বের ছায় ভারী ক্ষুধিতে দরজার উপর ঢলিতে লাগিল। ম্যানস্ট্রিজ ডাকিয়া বলিলেন—‘বেশ! ভূমি তোমার দোল নিয়েই তবে থাক! আমরা কিন্তু চলুম; শেষে তোমায় একলা একলা যেতে হবে, তা বলে রাখছি।’ এই কথা শুনিয়া ফেনীর চমক ভাঙিল—তৎক্ষণাৎ সে নামিয়া পড়িয়া গজেন্দ্র-গমনে হেলিয়া ছলিয়া রক্ষকের অনুবর্তিনী হইল।

রান্নাঘরে পহুঁছিয়াই উভয়েই স্বীয় স্বীয় নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া পড়িল। ম্যানস্ট্রিজ পকেট হইতে এক থোকা কালো আঙুর বাহির করিলেন এবং তাহার একটা ছিঁড়িয়া ফেনীর নাকের উপর রাখিতে গেলেন। ফেনী ছুটু মি করিয়া আঙুরটা নোচে ফেলিয়া দিল। ম্যানস্ট্রিজ বলিলেন—‘একাধো ছুটু মিটা ওর চিরাভাস্ত। আর একটা আঙুরের লোভেই ছুটু এটাকে ফেলে দেয়।’ বাস্তবিক কার্যেও ঘটিল তাই। অধ্যক্ষ দ্বিতীয়বার যখন আর একটা আঙুর উহার নাকের ডগায় স্থাপন করিলেন, তখন সে অনায়াসে তাহা রাখিতে পারিল। এবারের কৃতকার্যতার পুরস্কারস্বরূপ অধ্যক্ষ তাহাকে আঙুরটা খাইতে দিলেন।

ফেনীর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ম্যানস্ট্রিজ, অকস্মাৎ স্মরণ করিবার ছলে, চ্যাচাইয়া উঠিলেন—‘আহা, ওর খোসাটা থেয়ে না, ওদিয়ে আমার দরকার আছে।’ কিন্তু তখন একটু আধটু শাসনও বাহা বাকী ছিল, তাহাও ফেনী তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া ঠোঁটের উপর একটা থুথুর বৃদ্ধ উঠাইয়া দেখাইল—এখন বলা বৃথা, আগেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ম্যানস্ট্রিজ তখন আর একটা আঙুর তাহাকে খাইতে

দিয়া তাহার খোসা রাখিতে বলিলেন। ফেনী চুষিয়া চুষিয়া রসটুকু খাইয়া এবার সত্য সত্যই খোসাখানি বাহির করিয়া রক্ষকের নিকট দিল এবং সমস্তটুকুই যে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রমাণার্থ আর একটা খুথুর বুধদ উঠাইয়া দেখাইল—মুখ একেবারে খালি।

ইহার পর জেরীর পালা। ফেনীকে খাইতে দেখিয়া একেই জেরীর লোভসম্বরণ ছুঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর খাওয়ার জিনিস লইয়া অধ্যক্ষ যদি ফেনীর মত উহার সহিত খেলা করিতেন, তাহা হইলে বেচারার আর ছুংখের সীমা থাকিত না। অধ্যক্ষ উহার স্বভাব বুঝিয়াই সে দিকে না গিয়া ফেনীর সহিত বন্টন করিয়া খাইবার জন্ত বাকী আঙুরগুলি উহার হাতে দিলেন। আন্তরিক ছুংখের সহিতই জেরী ফেনীকে এই খাণ্ডদ্রব্যের অংশীদার করিল।

এই সময়ে ম্যানসব্রিজ এক পেয়ালা দুধ আনিবার জন্ত পেছন ফিরিলেন, ফেনীও এই সুযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কেদারার তলে হাত বাড়াইয়া পূর্বনিষ্কিপ্ত আঙুরটা তুলিয়া লইল। তারপর টপ করিয়া তাহা গালে পুরিয়া যথাস্থানে পুনরায় “ভদ্রলোকটী” হইয়া বসিল।

ইতিমধ্যে ম্যানসব্রিজ ছুঙ্ক-পেয়ালা আনিয়া ফেনীর হস্তে দিলেন এবং জেরীকে উহা খাওয়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। ফেনী ডান হাতে পেয়ালা রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া চাম্চে ধরিয়া আস্তে আস্তে জেরীকে ছুঙ্কপান করাইতে লাগিল; কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেও সতৃষ্ণ ও অধীরভাবে বারংবার ছুঙ্কের প্রতি চাহিতে লাগিল। ভাবগতিক বুঝিয়া ম্যানসব্রিজ তাহাকে বাকী ছুঙ্কটুকু পান করিবার ছকুম দিলেন। তাঁহার মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতে ফেনী এক নিখাসে সমস্ত দুধ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

এই প্রকারে আহাৰাদি সমাধা হইলে ম্যানসব্রিজ শিম্পাঞ্জীদ্বয়কে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন। ফেনী কেদারা হইতে উঠিয়া আসিয়া অধ্যক্ষের হস্ত ধারণ করিল। জেরীর কিন্তু তখনও খাওয়ার আশা মিটে নাই; সে পেটুক ছেলের মত ঠায় খাবার আসনে বসিয়া রহিল। কিন্তু অধ্যক্ষ যখন তৎপ্রতি বিশেষ দৃকপাত না করিয়া ফেনীকে লইয়া হাঁটিয়া চলিলেন, তখন সেও নিতান্ত অনিচ্ছায় চলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ঘরে পৌছিয়াই

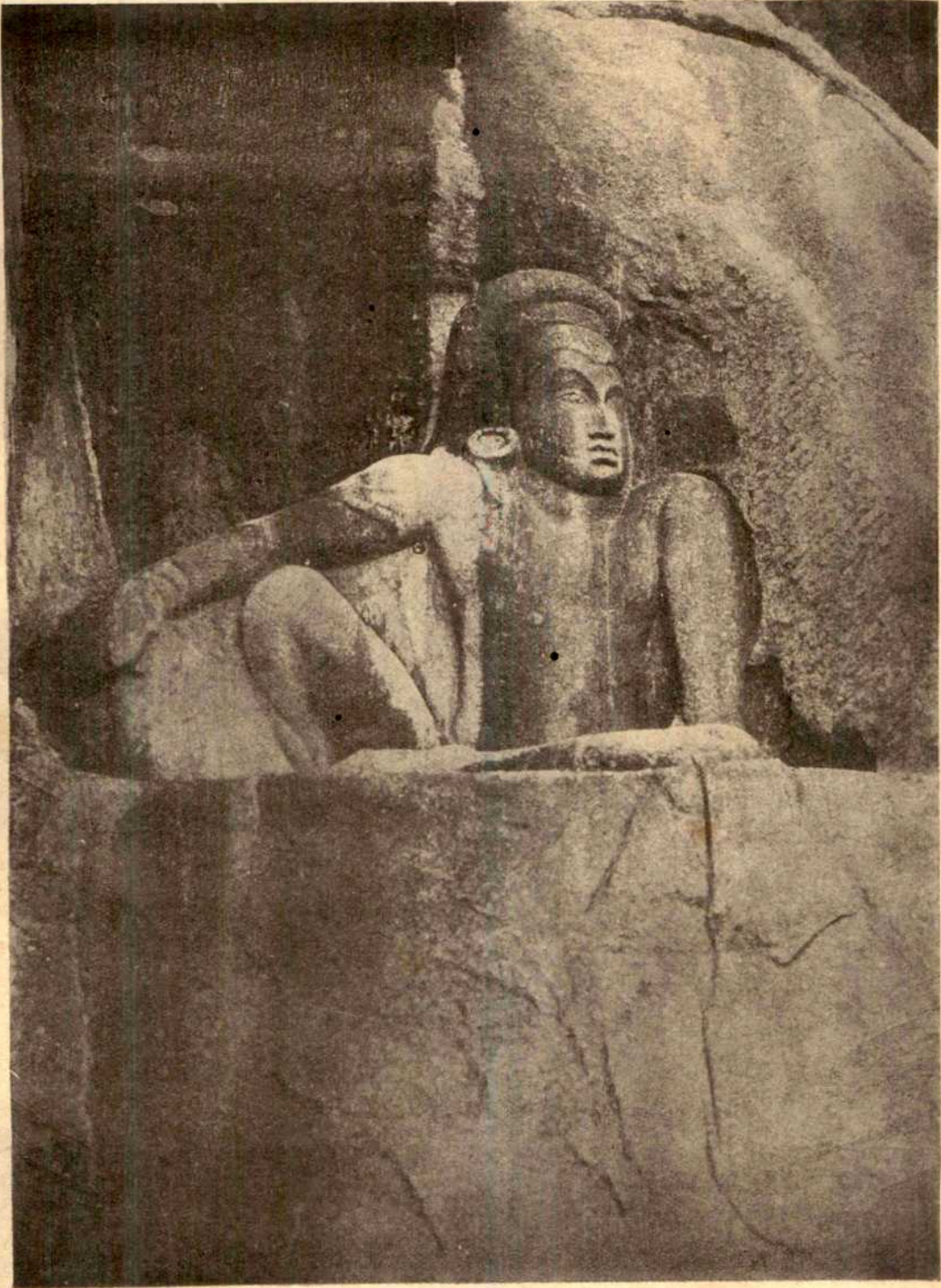


ফেনী জেরীকে দুধ খাওয়াইতেছে।

একগাছা দড়ির উপর উঠিয়া গোসাভরে গৌজ হইয়া রহিল। অধ্যক্ষ তাহাকে দোল খাওয়ার জন্ত কত সাধ্যসাধনা করিলেন, কিছুতেই তাহার রাগ পড়িল না।

শিম্পাঞ্জীদের গৃহ হইতে অতঃপর ম্যানসব্রিজ বন-মানুষের আড্ডায় চলিলেন। এই স্থান ফেনীদের গৃহেরই নিকটবর্তী, গৃহশোভায়ও ইহা শিম্পাঞ্জীদেরই মহল্লার অনুরূপ। দর্শকগণ এই স্থানে যাইয়াই সর্বপ্রথম দুইটা খেতবর্ণ দীর্ঘবাছ মর্কটের সাক্ষাৎ পাইলেন। মর্কটদ্বয় আফ্রিকার বনমানুষ সমাজের প্রাণী। উহাদের মধ্যে একটি একেবারে ছুঙ্কপোষ, অপরটা চারি বৎসর বয়স্ক। শেষোক্তটা প্রায় এক বৎসর যাবৎ এই চিড়িয়াখানায় আছে—উহার নাম জিমি (Jimmy)। জিমি বড়ই অশান্ত। তাই অনিষ্টের আশঙ্কায় ইহার নিকট থোকা-বনমানুষটিকে ঘেষিতে দেওয়া হয় না।

স্বভাবতঃ লম্ফে ঝম্পে হাঁটা চলায় বনমানুষগুলি অতি পটু। তার উপর কুস্তি শিখিয়া জিমি তো এক পাকা পালোয়ান হইয়া উঠিয়াছে! হরাইজেন্টাল বারে (Horizontal Bar) ঘুবপাক খাইতে ইহার সমান ওস্তাদ চিড়িয়াখানায় নাই। মানুষের মত থপ্ থপ্ করিয়া দুই পায়ে হাঁটিতেও ইহার অদ্বুত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা পরীক্ষার জন্ত ম্যানসব্রিজ ইহাকে আহ্বান করিলেন—অম্নি জিমি মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া দুই পায়ে দাঁড়াইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।



• কপিল মুনি । •
(সিংহলের একটি প্রস্তরমূর্তির প্রতিকৃপ।)

জিমির গৃহভাস্ত্রে কাঠনির্মিত একটা হরাইজেন্টাল বার আছে। গৃহের দেওয়াল হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত উহা প্রসারিত এবং ছাদের সন্নিকটস্থ। ইটাইটির পরীক্ষা সমাপনান্তে ম্যান্সব্রিজ্ জিমিকে এই বারটির উপর ঘুরপাক খাইতে আদেশ দিলেন। অমনি জিমি বার ধরিয়া কুমারের চাকের মত ঘুরিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই, এই ব্যায়ামের সময় ছাদ-সন্নিকটে যেখানে তাহার পা বাধিবার সম্ভাবনা আছে, নিয়মিত ভাবে তাগ বুঝিয়া সেখানে উহা সঙ্কুচিত করিয়াও রাখিতে লাগিল। হঠাৎ ম্যান্সব্রিজ্ বলিয়া উঠিলেন—‘থাম।’ অমনি কলের পুতুলের মত জিমিও নিষ্পন্দ হইয়া বারটির উপর উঠিয়া বসিল। তারপরে আবার অধ্যক্ষ উহার পুনরাভিনয় করিতে বলিলে, পূর্ব্বের ত্রায় যথানিয়মে ঘুরপাক খাইতে আরম্ভ করিল।

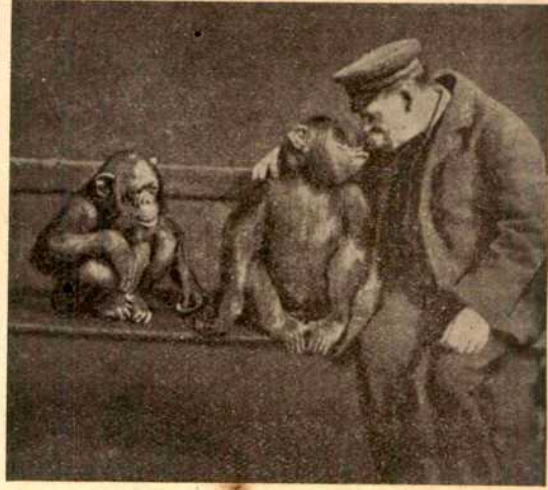
ইহার পর এখন ওরাং ওটাং জাতীয় বনমানুষের পালা। এই প্রাণীর বাসস্থান বানরাবাসের সম্মুখপ্রান্তে অবস্থিত। সেণ্ডি (Sandy) ও (Jacob) নামক দুইটা বনমানুষের ক্রিয়াকলাপই এ বিভাগের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। সেণ্ডি ১৯০৫ সাল হইতে এই চিড়িয়াখানার অধিবাসী; কিন্তু ইহার পূর্ব্বের আরো সাত বৎসর সিঙ্গাপুরে পালিত হইয়াছিল। জেকব ১৯০৮ সালে এখানে আসে। সেণ্ডির বয়স বছর বোল, জেকবের বয়স আট। উভয়ের বাসগৃহ স্বতন্ত্র।

শক্তিমত্তায় জেকব সেণ্ডি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেণ্ডির উদ্ভাবনীশক্তি স্বভাবতঃই প্রথর, কিন্তু ঐ শক্তির উৎকর্ষ সাধনে জেকবেরই তৎপরতা বেশি।

ফেনী ও জেবীর ত্রায় সেণ্ডি ও জেকবও ম্যান্সব্রিজের প্রিয়পাত্র। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বলবান ও হৃদ্যন্ত বলিয়া তিনি ইহাদিগকে কাছে ডাকিয়া খেলা করিতে সাহস পান না। খাওয়াদি প্রদানের সময়ও তিনি উহাদের গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ দ্বারপথেই যাতায়াত করেন।

সেণ্ডির কাণ্ড দেখাইবার জন্য ম্যান্সব্রিজ একথোলা খাণ্ড আনিলেন; এবং পশ্চাৎদ্বার দিয়া সেণ্ডির খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিলেন। সেণ্ডি হর্ষভরে অধ্যক্ষের দিকে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু

আহাধোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আগুপিছু হাঁটিতে লাগিল। ম্যান্সব্রিজ ছুইবার করিয়া সেণ্ডিকে থাবার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহার হর্ষোচ্চাস প্রশমিত না হওয়ায়, আন্তে আন্তে কানের উপর একটা ঘুসি মারিলেন। এবারে সেণ্ডির সত্যসত্যই চেতনা হইল। সে ভাবিল, অধ্যক্ষ বুঝি রাগ করিয়াছেন; তাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিল এবং ম্যান্সব্রিজকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গালে একটা চুমা খাইল। বনমানুষের এই চুষনের দৃশ্য বাস্তবিক বড়



ফেনী তাহার রক্ষকে চুষন করিতেছে।

আশ্চর্য্য। ইহারা পায়ের উপর খাড়া হইয়া ছুই হাত দিয়া গলা জড়াইয়া মানুষেরই মত চুমা খায়। শিম্পাঞ্জীর মধ্যে ফেনীও তাহার অধ্যক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া সময়ে সময়ে একপ চুমা খায় বটে; কিন্তু উহা তাহার শিক্ষার ফল। বনমানুষদের চুষনপ্রবৃত্তি স্বভাবজাত।

পূর্ব্বেরই বলিয়াছি, উদ্ভাবনী শক্তিতে সেণ্ডি শ্রেষ্ঠ হইলেও, উহার উৎকর্ষসাধনে জেকবের ক্ষমতা অধিকতর। ম্যান্সব্রিজ নিজেই ইহার সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন—একবার সেণ্ডি একগাছা খড় জলে ডুবাইয়া তাহা চুষিয়া জলপান করিবার পস্থা আবিষ্কার করে; জেকব তৎক্ষণাৎ ঐ প্রক্রিয়া নকল করিয়া একগাছা স্থলে চারিগাছা খড় লইয়া তৎসাহায্যে অধিক পরিমাণে জলপানের উপায় নির্দ্ধারণ করে। এবিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনার্থ তিনি তখন

দুই আঁটি খড় আনিয়া উহাদের গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং গৃহসম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বারের বাহিরে এক এক পাত্র জল রাখিয়া দিলেন। সেণ্ডি উহা পাইয়া তৎক্ষণাৎ একগাছি খড় দ্বারা জলপানের প্রণালী প্রদর্শন করিল; কিন্তু জেকব চারিগাছি খড় বাছিয়া লইয়া, খড় সমেত উভয় হস্ত জানালাপথে গলাইয়া দিয়া এক হাত দ্বারা খড় ভিজাইতে ও অপর হাত দ্বারা তাহা ধরিয়া জলপান করিতে আরম্ভ করিল। একাধো জেকব পূর্বাপর এইরূপ চারিগাছি খড়েরই সহায়তা লইতে অভ্যস্ত। বোধ হয়, অন্ধশাস্ত্রের চারি সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিবার পক্ষে ইহারও একটা স্বাভাবিক শক্তি জন্মিয়াছিল।

পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তটাই সেণ্ডি ও জেকবের উদ্ভাবনী শক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন নহে। অগ্ৰান্ত দুইটা বিভিন্ন ঘটনায়ও ইহাদের বুদ্ধি-কৌশলের আরো আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সেণ্ডি ও জেকবের বাসগৃহের সম্মুখাংশে দুইটা করিয়া ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, উহার চতুঃসীমা স্থল লৌহতारे আবদ্ধ। একদিন ভোরে ম্যান্সব্রিজ্ দেখিতে পাইলেন, জেকব একটা যন্ত্র লইয়া ঐ গবাক্ষমুখে কি এক কার্য্যে

বঁকাইয়া হাতলের মত এবং মাথার দিকটা বঁড়শীর স্থায় করিয়াছে এবং ঐ যন্ত্র সাহায্যে গবাক্ষসীমার স্থল তার খুলিয়া ফেলিতেছে! বনমানুষের নিশ্চিত যন্ত্রের কথা আর কোথায়ও, বোধ হয়, কেহ শুনে নাই—কোনদিন যে আর শুনিবেন, এমন আশাও করা যায় না।

জেকব সম্বন্ধে যেমন একটা ঘটনা উল্লিখিত হইল, সেণ্ডি সম্বন্ধেও একবার তদন্তরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বহুদিন ইহাতে সেণ্ডির গৃহে একটা মোটা শিকল পড়িয়া ছিল। একদিন সেণ্ডি উহার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া লইয়া একদিক খাঁচার ছাদ গলাইয়া পুনরায় ভিতরে টানিয়া আনিল এবং তদবস্থায় শিকলের দুই মুখ ধরিয়া করাতে মত করিয়া তারের উপর টানিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে শব্দ শুনিয়া, যথাসময়ে ম্যান্সব্রিজ্ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; অতথা, ঐ প্রকারে সেণ্ডি আর কতক্ষণ করাত টানিবার সুযোগ পাইলে, অধ্যক্ষকে সেদিন জেল-খানার পাহারার মত 'কয়েদী ভাগ্য হায়' বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইত!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।



জেকব তাহার খাঁচার জাল ছিঁড়িতেছে।

ব্যস্ত! তিনি উৎসুকভাবে ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তো তাঁহার চক্ষু স্থির! জেকব কোথা হইতে একটা মোটা তার সংগ্রহ করিয়া তাহার গোড়ার দিকটা

যাত্রী

ওগো পথিক, দিনের শেষে

যাত্রা তোমার সে কোন দেশে,

এ পথ গেছে কোন্‌ খানে?

কে জানে ভাই কে জানে!

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার

আলোক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা

আছে যে এক নিরুজ্জ্বল নিভৃত;—

চরাচরে হিয়ার কাছে

তারি গোপন দুয়ার আছে,

সেইখানে ভাই করব গমন নিশীথে।

ওগো পথিক দিনের শেষে

চলেছ যে এমন বেশে,

কে আছে বা সেইখানে ?

কে জানে ভাই কে জানে !

বুকের কাছে আমার সেতার

গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,

শুনেছি নাম জ্যোৎস্না রাতের স্বপনে ।

অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,

অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,

অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে ।

ওগো পথিক, দিনের শেষে

চলেছ যে এমন হেসে,

কিসের বিলাস সেইখানে ?

কে জানে ভাই কে জানে !

জগৎজোড়া সেই যে ঘরে

কেবল তুটি মানুষ ধরে,

আর সেখানে ঠাই নাহি কিছুরি !

সেখানেতে ঘন মেঘে

আর ত কেহই নাইক জেগে,

একটি নাচে আনন্দময় বিজুরী ।

ওগো পথিক, দিনের শেষে

চলেছ যে, কেইবা এসে

পথ দেখাবে সেইখানে ?

কে জানে ভাই কে জানে !

শুনেছি সেই একটি বাণী

পথ দেখাবার মন্ত্রথানি

লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো !

সে মন্ত্র এই প্রাণের পরে

অনাহত বীণার তারে

গভীর সুরে বাজে সকাল সাঁঝে গো !

• শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

২

আমাদিগের পলায়ন

সাহেববরের সঙ্গে অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে অধ্যারোহণ করিলাম। এবং কাষ্টম আফিসে গিয়া পাত্রি ফ্রেজার সাহেবের ও নিম্বেট সাহেবের সঙ্গে মিত্রিত হইলাম। কয়েক জন চীনা কেরাণীও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পোষ্টাফিসের কেরাণীদ্বয় সপরিবারে এবং কমিশনারের বড় কেরাণী মিঃ টাইয়ের ডবল পরিবার আমাদিগের পশ্চাদ্ধরণ করিলেন। আমরা সঙ্গে মাত্র একটা ওভারকোট



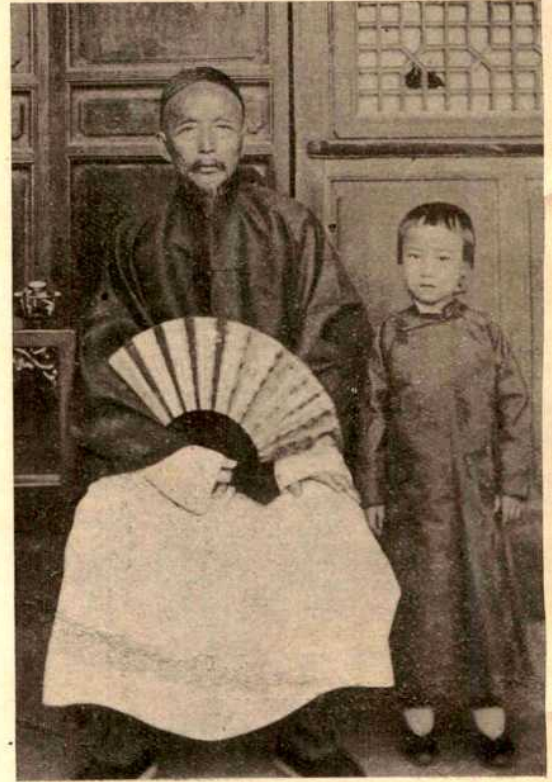
কমিশনারের বড় কেরাণী মিঃ টাই-লুং-সিন ও তাহার পুত্রকন্যা ।

(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ ।)

ও একটা করিয়া কম্বল লইয়াছিলাম। রাস্তায় আহারের জন্ত কুলির স্বন্ধে কিছু বিস্কুট, রুটি, চা, চিনি, তুধের টিন মাত্র সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। কারণ মালবহা খচ্চর দুস্তাপ্য হইয়াছিল। আমাদিগের মূল্যবান বথাসর্বস্ব এই প্রকারে টেনিয়ে ফেলিয়া যাইতে হইল। বিদ্রোহীর সর্দারগণ হইতে আমরা যত জন লোক যাইব তাহার এক পাশ-পোর্ট এবং কয়েকজন রাইফলধারী সেপাই আমাদিগের শরীররক্ষকরূপে পাইলাম। সকলে মিছিলের ধরণে

শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে পার্শ্বত্যাগ পথে ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। হাউয়েল সাহেব আমাদের নেতা কিন্তু তিনি নিজে রাস্তায় চলিতেও ভয় পাইতে লাগিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিতে আমি সামান্য একটু পিছে পড়িয়াছিলাম অমনি তিনি ঘোড়া হাঁকাইয়া আসিয়া কহিলেন, “ডাক্তার, পাছে থাকিবেন না সকলের একসঙ্গে থাকা কর্তব্য।” আবার কিছু দূর যাইতে যাইতে আমি একটা অগ্রবর্তী লোকের সঙ্গে কোন কথা বলিবার উদ্দেশ্যে কিছু অগ্রবর্তী হইয়াছিলাম, অমনি ফ্রেজার সাহেব কহিলেন যে “ডাক্তার, কমিশনার সাহেব আপনাকে অগ্রে যাইতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি সকলের জন্ত বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।” আমি তৎক্ষণাৎ পিছে হটিয়া সকলের সঙ্গে একত্র হইলাম। হাউয়েল সাহেব যেন প্রতি মুহূর্তেই বিদ্রোহিগণ কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও এ ধারণা হয় নাই। সাহেবের এই ভয় দেখিয়া মনে মনে হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আমরা টেক্সিয়ে পরিত্যাগ করিব এই সংবাদে এখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সপরিবারে টেক্সিয়ে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কারণ সকলেরই মনে একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহই এই স্থানে ধন প্রাণ নিরাপদ মনে করেন না। এইসকল সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত জেনেরাল চাংর সমস্ত পরিবারবর্গ ও লবণবিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কোং প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। এইপ্রকার প্রায় শতাধিক রমণী বালক বালিকা আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে চলিল। তাহার কারণ এই যে বিদ্রোহিগণ রাষ্ট্র করিয়া দিল যে ভ্রাম্যে ভারতীয় “বড়পাগড়ি-ওয়ালা” সেপাইগণ বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের অফিসারদিগকে হত্যা করিয়াছে। তথায় কাহারো ধন প্রাণ নিরাপদ নহে। অধিকন্তু ব্রহ্ম ও চীন সীমান্তের পার্শ্ব-তীয় অসভ্য কাচিনগণ পথিকদিগের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠ করিয়া লইতেছে। এই কারণ বশতঃ চীনারা ব্রহ্মায় যাইতে হইলে আমাদের সঙ্গে যাওয়া নিরাপদ মনে করিয়া এত লোক আমাদের পিছে চলিল। কিন্তু



অবসরপ্রাপ্ত জেনেরাল চাং ও তাঁহার পুত্র।

(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদের নিতান্তই অনিচ্ছা যে এদেশ ছাড়িয়া ব্রহ্মায় কোন লোক চলিয়া যায়। কারণ তাহা হইলে এস্থানের দুর্গম হইবে।

প্রায় বেলা দুই প্রহরের সময় টেক্সিয়ে হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে পথের ধারে এক উষ্ণ প্রস্রবণের নিকট আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর উপবেশন করিয়া বিশ্রামান্তে দুই একটা কলা ও দুই একখানি বিস্কুট দ্বারা মাধ্যাহ্নিক ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। এই স্থান হইতে হাউয়েল সাহেব নিশ্চিত মনে ও নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন।

টেক্সিয়ে হইতে ২৬ মাইল দূরে নাগিয়ান নামক প্রসিদ্ধ স্থানের এক দেবমন্দিরে গিয়া উঠিলাম। তথায় খড় বিছাইয়া উত্তম শয্যা রচনা করা হইল এবং মাত্র একটা করিয়া কঞ্চল দারুণ শীতে আচ্ছাদনের



চীনা মন্দিরের পুরোহিত । •

(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ ।)

কার্য্য করিল। অবস্থানুসারে আহারের ব্যবস্থা করা হইল।

পর দিন প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া চা ও রুটি খাইয়া নাণ্ডিয়ান পরিত্যাগ করিলাম। আজকার পথ বড় দুর্গম। গতকল্য যেসকল পাহাড় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। অল্পকার উচ্চ পর্বত ও দুর্গম গিরিপথসকল অতিক্রম করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পর্বতশীর্ষদেশে পথিকগণের বিশ্রামের একটা আড্ডা আছে। বেলা একটার সময় তথায় গিয়া অধ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। এই স্থানের তিন চার মাইলের মধ্যে কোন বসতি নাই। এখানে কতকগুলি গরিব জীলোক খাঙ্গের দোকান খুলিয়া দিবাভাগে অবস্থিতি করে। সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামে চলিয়া যায়। ইহারা ভাত, শূকরের মাংস, ডিম্ব, গৃহজাত সুরা প্রভৃতি দোকানে রাখে। আর কতকগুলি জীলোক ঘোড়ার ঝাঁস আনিয়া বিক্রয়ের জন্ত প্রস্তুত রাখে। এখানে উপস্থিত হইলে এই-

সকল জীলোক কলিকাতার চীনা বাজারের দোকানদারগণের মত যাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। আমরা কখনই ইহাদের কোন খাণ্ড ব্যবহার করি নাই। আমাদের খাণ্ড সঙ্গেই ছিল। তবে ইহাদের দোকানে বসিয়া সন্দের খাণ্ড খাইতে হইত। ইহারা আমাদের বিকৃত দোবারা চিনি প্রভৃতি দেখিয়া লোভ সঞ্চার করিতে না পারিয়া কেহ কেহ চাহিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমাদের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্যগুলি দিলে ইহারা মহাসুখী হইল।

এই স্থানে আমাদের ও ঘোড়াগুলির টিফিন খাওয়া হইলে পুনরায় অন্ধারোহণ করিলাম। এখান হইতে প্রায় তিন মাইল পথ পাহাড়ের নিম্নে নামিতে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই পতনের শঙ্কা হয়। এই পর্বত হইতে নিম্নাবতরণের পর টাইপিং নদীর বিখ্যাত প্রকাণ্ড গর্জ বা গিরি-সঙ্কটে উপস্থিত হইয়া পর্বতের পার্শ্ব কাটিয়া যে রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া কখনও বা নিম্নগামী কখনও বা উর্দ্ধগামী হইয়া চলিতে হইল। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। অতিবৃষ্টিতে স্থানে স্থানে পর্বতপার্শ্ব ধসিয়া পড়িয়া যাওয়ায় রাস্তা কোন কোন স্থানে অতি সংকীর্ণ হইয়াছে। তথায় অন্ধারোহণে চলা অতি সংকট। অশ্বপদ কিঞ্চিৎ স্থলিত হইলে দুই তিন শত বা ততোধিক গজ নিম্নে পতিত হইবার ভয়। ইহার মধ্যে আর এক বিপদ এই, যে, সন্মুখ হইতে ঐ পথে যদি শতাধিক অশ্বতর বোঝাই মাল সহ আসিয়া জমা হয় তাহা হইলে সেখানে না যায় পিছে হঠা না যায় সন্মুখে যাওয়া। চীনে এই জন্ত সন্মুখের আগন্তুকদিগকে সাবধান করিবার জন্ত অশ্বতরের দলের অগ্রে অগ্রে এক ঘণ্টা পিটাইতে পিটাইতে যায়। তাহার দ্বারা দূর হইতে জানা যায় যে সন্মুখে মাল সহ খচ্চর আসিতেছে। সেই জন্ত কোন ফাঁকা প্রশস্ত স্থানে ইহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। এই প্রকার কষ্টে এই গরিবস্ব' অতিক্রম করিয়া কান্ধাই নামক প্রসিদ্ধ উপত্যকায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হইলাম।

কান্ধাই উপত্যকায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে পথে তরবারিস্বন্ধে বহুশত শান জাতীয় লোককে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে

টেঙ্গিয়ার দিকে যাইতে দেখা গেল। তখনই বোধ হইল যে ইহারা বিদ্রোহীদের সৈন্যদলভুক্ত হইবার জন্ত গমন করিতেছে। তাহাদের সর্বপশ্চাতে জাপানী ধরণের সৈনিক ইউনিফর্ম-পরিহিত অনেকগুলি সৈন্য সহ এক ব্যক্তি সিডান চেয়ার বা বাঁশের দোলার মত যানে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারও থাকী ইউনিফর্ম এবং মাথায় সোলার বড় টুপি। আমি, নিসবেট ও ফ্রেজার সাহেব একসঙ্গে যাইতেছি, অপর দুইজন কক্ষিৎ পশ্চাতে। আমরা নিকটবর্তী হইলে যানাক্রমে ব্যক্তি হঠাৎ বাস্ত ভাবে মাথার টুপি তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন, আমিও তাদৃশ দ্রুত ভাবে তাঁহাকে প্রতিনমস্কার জানাইলাম এবং ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কোথায় যাইতেছেন। তিনি কিন্তু আমার ইংরেজী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া চেনা লোকের মত বোধ হইল কিন্তু স্বাভাবিক শক্তির দুর্বলতাবশতঃ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলাম না। এক মুহূর্তের মধ্যেই উভয়েই উভয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। সাহেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন “ইনি কে?” তাহাদের কথার উত্তরে আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না, কেবল কহিলাম যে “এই ব্যক্তিকে আমি চিনি বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু ঠিক বলিতে পারিলাম না ইনি কে।” সকলেই প্রথমে অস্বস্তি করিয়াছিলেন, যে, ইনি বুঝি কোন জাপানী সৈনিক কর্মচারী হইবেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গের একটা সেপাই কহিল যে “ইনি কান্টাইয়ের বর্তমান স্ত্রী; তাওফেই-সিন।” তখন আমার চৈতন্য হইল এবং মনে মনে পরিচয় হইল যে কেন ইহার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করি নাই। ইনি আমার অতি পরিচিত পুরাতন বন্ধু। ইনি জাপানে গিয়া কয়েক বৎসর থাকিয়া নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন। কয়েকটা সান বালিকাকে জাপানে লইয়া গিয়া নানা বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। এবং জাপান হইতে পুরুষ ও রমণী কারিগর আনাইয়া নিজের এলাকায় জাপানী ধরণের তাঁতের কার্য ও নানা শিল্পকার্য শিক্ষা দিতেছিলেন। ইহার বিষয় পূর্বে প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছিল। আমি তিন চারি বৎসর ইহাকে দেখি নাই। ইহার মুখে গোঁপ ছিল

না, মাথায় লম্বা বেণী ছিল এবং পরিধানে চীনা পোষাক। কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই, অধিকন্তু বড় সোলার টুপি পরায় চেহারার পরিবর্তন হইয়াছিল। ইহার পিতার ফটোগ্রাফ পূর্বে প্রবাসীতে* ছাপা হইয়াছিল। ইহার পিতা আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপনের জন্ত তাঁহার শেষ পক্ষের একটা ছোট কত্থা ধর্ম্মপিতারূপে আমাকে বরণ করেন। সেই হইতে ইহারা আমার কুটুম্ব। এ প্রথা চীনদেশের সর্বত্র প্রচলিত।

কান্টাইয়ে দুটি শহর। একটা পুরাতন অপরটা নূতন। পথিকদিগের থাকিবার স্থান পুরাতন শহরে। নূতন শহর পুরাতন হইতে তিন মাইল দূরে। তথায় স্ত্রীর রাজধানী। পুরাতন শহরে আমরা স্ত্রী কর্তৃক নির্মিত ডাকবাঙ্গালায় অবস্থিত করিলাম। এই স্থানের প্রত্যেক বাড়ীতে ও বাজারে সাধারণতন্ত্রের পতাকা (Republican flag) উড়িতে দেখা গেল। লোকের কথাবার্তায় চাল চলনে ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। বোধ হইল সকলেই যেন স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া বক্ষ প্রসারিত করিয়াছে। এখানে একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন ছিয়াও-সিং-কাই নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার কাষ্টম হাউসে পৌছিলাম। কাষ্টম হাউস জনশূন্য। তথাকার টাকাকড়ি সব বিদ্রোহীদের সর্দারের লোকে লইয়া গিয়াছে এবং কর্মচারীরা পলায়ন করিয়াছে। তথাকার একজন পরিচিত লোক হাওয়েল সাহেবকে সংবাদ দিল যে চীনব্রহ্মের সীমান্তের অসভ্য কাচিনগণ পথিকের সর্বস্ব লুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতে সাহেব শঙ্কিত হইলেন, কারণ সঙ্গে একটা বড় বাগ্গে বহু-টাকার রূপা ছিল। কুলিগণ তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই লোকটির সাহায্যে একজন গুপ্তচরকে ১০ দশ টাকা দিয়া ব্রহ্মদেশের সীমান্তের মিলিটারী পোষ্টের নেটিব অফিসারের নিকট এক পত্র পাঠান হইল যে তথা হইতে কতক সেপাই আসিয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দেয়।

পরদিন আমরা মানসীয়ান নামক চীন সীমান্তের শেষ

* প্রবাসীর পঞ্চম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা।



গলাকাটা সিপাহী ও তাহার শুশ্রূষাকারী সিপাহী।

(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে বাজারের মধ্যে এক ঘোষণাপত্র পাঠ করিলাম। তাহা ইংরাজিতে, চীনা ও শান ভাষায় লিখিত এবং কাপ্তাই স্তম্ভ তাও-ফেই-সিনের দস্তখতযুক্ত। তাহার মর্ম্ম এই যে “মাঝু রাজবংশ আমরা চাই না, প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রবর্তিত হইল, ব্যবসায় বাণিজ্য যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবে শান্তিতে চলিবে। বিদেশী লোকের প্রতি সম্মান দেখাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তিনি নিজে সমস্ত ইউনান প্রদেশের সৈন্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।” ঘোষণার ইংরেজি তরজমায় কিন্তু লেখা হইয়াছে যে তিনি গবর্ণর জেনারাল নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু চীনাতে লেখা হইয়াছে “তু-তু” বা প্রধান সেনাপতি। নিশ্চয় ইহা ইংরেজী তরজমাকারীর ভুল।

মানসীয়ানে আমরা এক রাত্রি বাস করিলাম।

তথাকার প্রধান ব্যক্তি (Mr. Maw) ম নামক এক পুরাতন কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন যে “আপনাদিগের সীমান্ত প্রদেশে কোন ভয় নাই। আমি সঙ্গে কাচিন প্রহরী দিব।” প্রাতঃকালে দেখি দশবার-জন কাচিন তরবারি স্বন্ধে এবং বল্লম হাতে করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব তাহাদিগকে বল্লাদ দিয়া ফেরত দিলেন। মাত্র একজন লোক পথ প্রদর্শকরূপে সঙ্গে রাখিলেন। তাহার দুই অর্থ মনে হইল। প্রথম বোধ হইল সাহেব বন্দী হইতে লেপাই আসিবে মনে করিয়া কাচিন প্রহরী লইলেন না, আর এক অর্থ এই হইতে পারে যে পাছে এইসকল চুর্তৃত কাচিন দস্যোগণই রক্ষক হইয়া শেষে বা ভক্ষকের কার্য করে।

এখান হইতে ১২ মাইল দূরে ব্রিটিশ বন্দীর সীমানা। সেই সীমানায় ফুলিমা নামক ক্ষুদ্র নদী পার হইলেই বন্দীর সীমানা। আমরা প্রায় বেলা বারটার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি ব্রিটিশ কন্সাল স্মিথ সাহেব আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এই স্থানে এক ভগ্ন গৃহের মঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তথা হইতে ৯ মাইল দূরে এক ডাকবাংলায় গিয়া অবস্থিতি করিলাম। কন্সাল ও তাঁহার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার প্রোভ রীতিমত স্বতন্ত্র ডিনার খাইলেন। আমরা কদলীফলের সাহায্যে অন্নমণ্ড সেবন করিয়া জঠরানল নির্বাপিত করিলাম। কিন্তু শীতের প্রকোপে বড় অস্থির হইলাম। এই স্থানের পাহাড়ের হাওয়া এত বদ ও অসহনীয় যে নূতন লোক এখানে আসিলে সহসাই পীড়িত হয়। এই হাওয়া ও টাপেইং নদীর জলপ্রপাতের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া বাইতে লাগিল। এবং শীতে শরীর কাঁপিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক টেলিগ্রাম কন্সালের নিকট পৌছিল। সে টেলিগ্রাম কন্সাল পড়িয়া হাওরেল সাহেবকে দিলেন। তিনি পড়িয়া আমাকে দিলেন। আমি টেলিগ্রাম পড়িয়া মনে মনে হাসিলাম এবং পাদ্রি ফ্রেজার সাহেবকে দিলাম। ভামোর ডিপুটি কমিশনার এ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। ইহা আমারই প্রেরিত সেই টেলিগ্রাম যাহা আমি টেঙ্গিয়ে হইতে ডাকে

ভামো পাঠাই। সেই বিদ্রোহের রাত্রির ঘটনা। ইহার।
কেহই জানেন না কে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে।

কেহ তক্তার মেঝের উপর শুইলেন, কেহ ইজীচেয়ারে
শুইয়া রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন আমরা ভামো
অভিমুখে রওনা হইলাম এবং কনসাল চীন অভিমুখে
যাত্রা করিলেন। তিনি যে কোথায় যাইবেন তাহা
কাহাকেও বলিলেন না। আমরা কলংথা নামক ডাক-
বান্ধালায় উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে তিন মাইল
দূরে পাহাড়ের উপর টংহং নামক স্থানে মিলিটারি
পুলিষের ফাঁড়ি। তথায় অনুসন্ধান কর: হইল যে
আমাদের প্রেরিত কোন চর তথায় পৌঁছিয়া কোন পত্র
দিয়াছিল কি না। প্রেরিত চর পত্র ঠিক দিয়াছিল,
এবং পোষ্টকমাণ্ডান্ট নেটিব অফিসার ভামোর ব্যাটালিয়ান
কমাণ্ডান্টের নিকট সেপাই পাঠাইতে অনুমতি চাহিয়া
পাঠায়। তথা হইতে কোন জবাব না আসায় আমাদের
সাহায্যের জন্য সৈন্য সীমান্তে যায় নাই।

কলংথা হইতে ২০ মাইল দূরে মোমক নামক স্থানের
ডাকবান্ধালায় পরদিন উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে
আমরা উদর পূরিয়া আহার করিতে পারিয়াছিলাম।
এখান হইতে ভামো ১০ মাইল দূরে। পরদিন ১১ই
নবেম্বর ষোড়ার গাড়িতে আমরা ভামো পৌঁছিলাম।
ভামোর পরিচিত লোকেরা সংবাদ শুনিয়া আমার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং টেলিগ্রামের বিপদের কথা
শুনিয়া অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

আমি টেলিগ্রামে হইতে ২৯শে অক্টোবর যে তারের
সংবাদ ডাকে ভামো পাঠাই তাহা আমার এজেন্ট সরকারি
টেলিগ্রাম অফিসে না লইয়া মিলিটারি পুলিষের পাঞ্জাবী
হেডক্লার্ক বাবু উগ্রসেনকে দেখান। উগ্রসেন বাবু
উহা ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডান্ট ক্যাপ্টেন অরমণ্ডকে দেখাইয়া
তাহার মত জিজ্ঞাসা করেন যে “ডাক্তার সরকার এই
টেলিগ্রাম কাগজে পাঠাইতে পারেন কি না।” তাহাতে
ক্যাপ্টেন অরমণ্ড নাকি বলিয়াছিলেন যে “He must,
it is his duty to do so.” অতঃপর এজেন্ট মহাশয়
টেলিগ্রামটি, টেলিগ্রাম অফিসে প্রদান করেন। টেলি-
গ্রাম মাষ্টার রোজারিও সাহেব আবার উহা ভামোর

ডেপুটি কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া তাহার মত
জিজ্ঞাসা করেন। ডেপুটি কমিশনার এই অতি প্রয়ো-
জনীয় সংবাদ তৎক্ষণাৎ বর্ম্মা গবর্ণমেন্টকে পাঠান এবং
ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের ইন্টেলিজেন্স অফিসার আবার
সেই সংবাদ তৎক্ষণাৎ শিমলা প্রেরণ করেন। অবশেষে
টেলিগ্রাম মাষ্টার এই সংবাদটি রেঙ্গুন গেজেটে পাঠান।
৬ই নবেম্বর ঐ সংবাদ রেঙ্গুন গেজেটে প্রকাশিত হইলে
পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে তারযোগে উহা প্রেরিত
হয়। বেঙ্গলি প্রভৃতি কাগজে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়
তাহা রেঙ্গুন গেজেটের নকল।

উগ্রসেন বাবু ভামোতে একজন নামজাদা ও প্রতি-
পত্তিশালী লোক এবং আমার একজন বন্ধু। তিনি কহিলেন
যে “আপনার সাহসের ও দৃঢ়তার প্রশংসা করি। ইংরেজরা
যখন ভয়েতে পলায়ন করিলেন আপনি তখন সাহসে
নির্ভর করিয়া ছিলেন এবং ধীর চিত্তে বহির্ভাগ্যে টেলিগ্রামের
দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র
হইলেন। প্রকৃত পক্ষে এই কার্য সাহেবদিগের কর্তব্য
ছিল।” তিনি আরো কহিলেন যে “বান্ধালীরা যে সর্বত্রই
সাহসের ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছেন, তাহা সকলেরই
অনুস্মরণীয়।” ইনি এক সময়ে বড় বান্ধালীবিশেষী
ছিলেন।

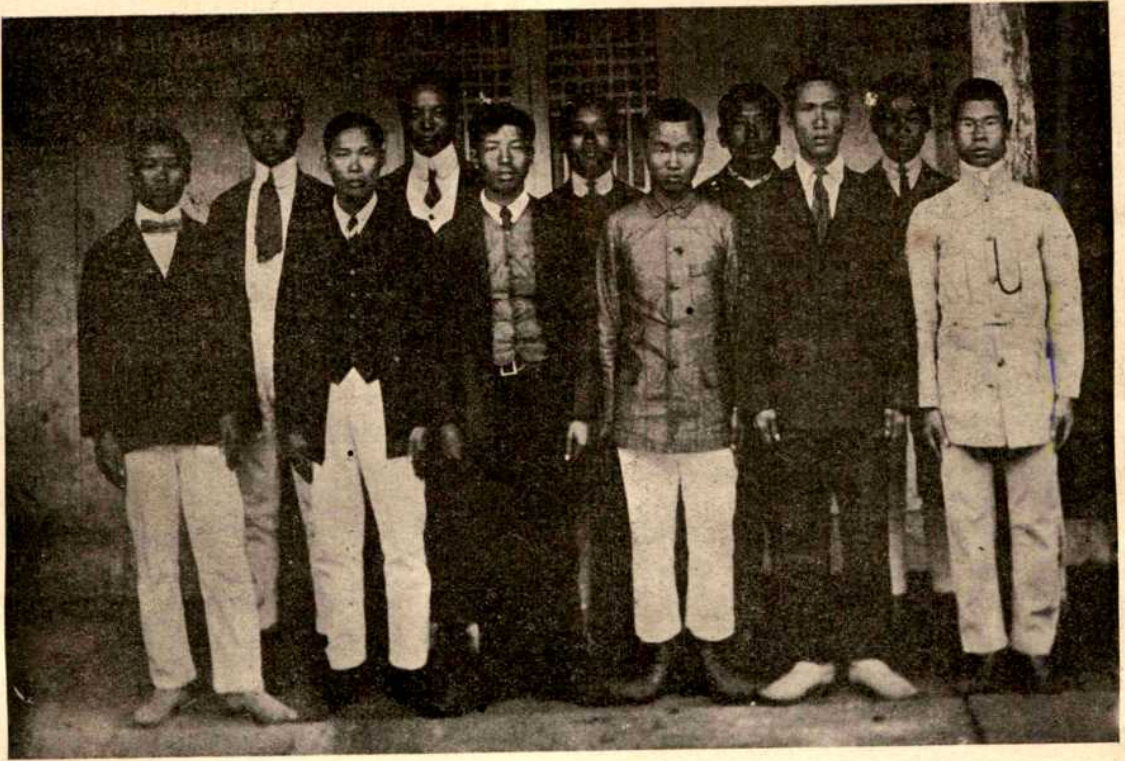
সেবার ১৯০৮ খৃঃ যখন দেশে যাই তখন ভামোতে
ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইনি বলিলেন যে ব্যাটালিয়ান-
কমাণ্ডান্ট বান্ধালীদিগের বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টের নিকট
রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, “বর্তমান
বান্ধালী বংশ আর ইউরোপীয় কর্মচারীদিগকে গ্রাহ্য
করে না। ক্রমে ইহার ইউরোপিয়ানদিগকে অগ্রাহ্য
করিতে আরম্ভ করিয়াছে।” কি উপলক্ষে এই প্রকার
রিপোর্ট হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানে যতদূর জানা গেল
তাহাতে জানা গেল যে এই জেলার মিলিটারি
পোষ্টের কয়েক জন বান্ধালী ডাক্তার ঐ রিপোর্টের
কারণ। তন্মধ্যে একজনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
এই জেলার কোন মিলিটারি পোষ্টে যে বান্ধালী ডাক্তার
ছিলেন তাহার চার্জ তথাকার ক্ষুদ্র ডাকঘরটি ছিল। সুতরাং
তিনি একাধারে পোষ্টমাষ্টার ও ডাক্তার ছিলেন। উক্ত

পোষ্টের কমান্ডান্ট (Commandant) ছিলেন একজন ইউরোপীয় লেপ্টেন্যান্ট। সাহেবের নাকি ২০০ টাকা মূল্যের এক ভি: পি: পার্শেল যায়। সাহেব আরদালি পাঠাইয়া পার্শেল লইয়া যান কিন্তু ভি: পি: মূল্য দেওয়ার সময় বলেন যে একমাস পরে বেতন পাইলে পার্শেলের টাকা দিবেন। বাবু তাহাতে কখনই রাজি হইতে পারেন না। কারণ, পোষ্টাল বিভাগের নিকট তিনি ঐ টাকার জন্ত দায়ী। সুতরাং তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। পরে চালাকি করিয়া কোন স্ত্রে পার্শেলটা পুনরায় আনাহইয়া আর ফেরত দিলেন না। সাহেবের আরদালি যাইয়া পার্শেল চাহিলে তিনি কহিলেন “টাকা আন ত পার্শেল দেই।” আরদালী গিয়া সাহেবকে রিপোর্ট করিল, সাহেব রাগে গড় গড় করিতে করিতে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া ডাক্তারকে পার্শেল দিতে কহিলেন। এবং বলিলেন যে “তুমি যদি পার্শেল না দেও তবে তোমাকে পিস্তল দ্বারা গুলি করিব।” বাবু কহিলেন যে “আপনি যে প্রকার অভদ্র ব্যবহার করিতেছেন তাহা ভদ্রলোকের অসহনীয়। আপনি যদি পুনরায় এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করেন তবে আমি আপনার বক্ষে এই ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিব।” এই বলিয়া দীর্ঘ একখানি ছোরা দেখাইলেন। সাহেব দেখিলেন যে এপ্রকার মাথা-ভাঙ্গা লোকের সঙ্গে বাকুবিত্তা করিলে হয় ত ক্রোধের বশে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এবিষয়ে আগাগোড়া তাঁহারই ক্রটি। সুতরাং কুবুদ্ধি অপমত হইয়া তাঁহার মস্তকে স্রবুজির আবির্ভাব হইল, যেমন ক্রোধে অস্থির ছিলেন সেইমত ক্রোধে প্রতাবর্জন করিলেন। এই বিষয়টা তখন ভামোর বন্ধুদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম। শোনা কথায় কোন ভ্রম থাকিলে তজ্জন্ত আমি দায়ী নহি।

ভামো পৌছিয়াই টেঞ্জিয়ের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া রেঙ্গুন গেজেটে পাঠাইলাম। তাহা ১৭ই ডিসেম্বরের গেজেটে প্রকাশিত হইলে সকলেই খুসি হইলেন। কেবল কাষ্টম কমিশনার হাওয়েল সাহেব বড় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখ ও লজ্জায় আমারও দুঃখ বোধ হইল, কেন না তাঁহার মনে দুঃখ হইবে এ ধারণা আমার আদর্শেই ছিল না। বাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান বিশ্বাস

মতে জানি তাহাই লিখিয়াছিলাম। কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া লেখা আমার অভ্যাস নহে। আমি তাঁহার নিকট এই জন্ত মাপ চাহিয়া বলিয়াছিলাম যে তিনি যদি বলেন, আমি আমার প্রবন্ধের মর্ম প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি কহিলেন, যে সংবাদ সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে তাহা প্রত্যাহারে ফল কি? তাঁহার নামটা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। রেঙ্গুন গেজেট আমাকে এই প্রবন্ধের দক্ষিণা স্বরূপ ৪০ টাকা দিলেও এই কারণে তাহাতে আমার মনে শাস্তি স্থাপিত হইল না।

এদিকে কনসাল দ্বীরে দ্বীরে গিয়া টেঞ্জিয়েতে উপস্থিত হইয়াছেন সংবাদ পাওয়া গেল। কাষ্টম কমিশনার ভামো পৌছিয়া প্রায় সাত আট শত টাকার টেলিগ্রাম পেকিনের কাষ্টম ইনস্পেক্টর জেনারালের নিকট পাঠান। তথা হইতে ভামোতেই অবস্থান করিবার জন্ত তাঁহার প্রতি আদেশ আসে। সুতরাং দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট ভাবে ভামো থাকিতে তিনি বাধ্য হইলেন। আমার উভয়সঙ্কট হইল। আমি একদিকে কনসাল অপর দিকে কাষ্টম কমিশনার উভয়ের আফিসেই চাকরি করি। কনসাল টেঞ্জিয়ে গিয়াছেন, আমারও পুনরায় টেঞ্জিয়ে যাইবার জন্ত আগ্রহ জন্মিল। তাহার কারণ দীর্ঘকাল ভামো থাকিতে হইলে আমাকে হয় ত হাঁসপাতালে গিয়া কার্য্য করিতে হইবে। তাহা হইলে আমার সারভিস ফরেন ডিপার্টমেন্টে হইতে পুনরায় ব্রহ্মদেশের মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে বদলি হইবে। এই প্রকার হইলে পুনরায় চীন সারভিসে বদলি হইতে ভারত-গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরের প্রয়োজন। আমার বান্ধালী বন্ধুরা যাহাতে আর চীনে না যাই সেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমার আগ্রহ যে চীনের ঘটনাসকল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিব এবং স্বদেশবাসীকে তাহা জ্ঞাত করিব। এপ্রকার স্বযোগ কোথায় মেলে? অবশ্য প্রাণের আশঙ্কা থাকিলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। কমিশনার সাহেবকে আমার অনুরোধের কথা বলাতে তিনি পরামর্শ দিলেন যে “কনসালকে টেলিগ্রাম দাও। তিনি যাইতে আদেশ করিলে টেঞ্জিয়ে যাইতে পার।” এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত মুসাবিদা করিয়া দিলেন।



ক্যান্টনি খেচ্ছাসৈনিক বা ভলান্টিয়ার।

(ডাঃ রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত, কটোগ্রাফ)

“Britain.

May I return.

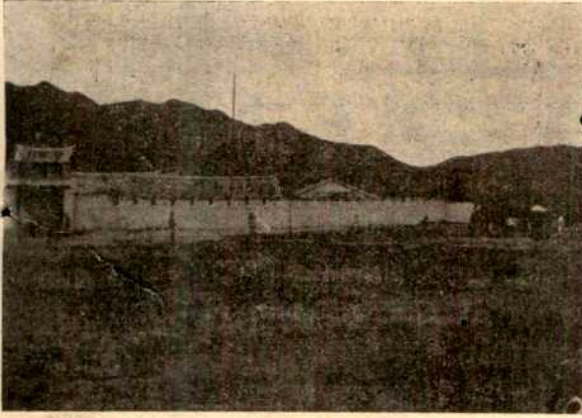
Sircor.”

কনসাল টেলিগ্রামের উত্তরে কহিলেন You may return. কিন্তু পাদ্রী ফ্রেজারকে ফিরিতে অনুমতি দিলেন না। গ্রোভ সাহেবকে ঘাইতে তার দিলেন।

উপসংহারে ভামোর চীনা মহাল্লার কথা কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্য মনে করি। আমরা ভামো পৌঁছিবাব পূর্বে ফলংথার ডাক-বাঙ্গালার উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলাম যে প্রায় ৪০ জন ভদ্র চীন যুবক অথারোহণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে টেক্সিয়ে অভিমুখে ঘাইতেছে। তাহাদের অধিকাংশই ক্যান্টনি। তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে জাপানি বলিয়া বোধ হইল। ইহারা সকলেই ভলান্টিয়ার। রেঙ্গুন চীনা ক্লাব খরচ দিয়া ইহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ইহাদের মুখে শুনিলাম যে সাংহাই হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে “মাগু সম্রাট পেকিনের রাজপাট ফেলিয়া পলায়ন

করিয়াছেন এবং সমস্ত দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদের হস্তগত হইয়াছে।” এই সংবাদ পাইয়া ভামো ও মাণ্ডালের চীনারা জাতীয় নিশান উড়াইয়া সহস্র সহস্র পুরাতন পতাকা গোড়াইয়া মহা উৎসব করিয়াছে। দীপমালার দ্বারা প্রত্যেক গৃহ আলোকিত করিয়াছিল। ভামোতে টিকি কাটার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। একদল লোক জ্বরদস্তি করিয়া লোকের টিকি কাটিয়া ফেলিতেছে। বাহাদের এখনও সন্দেহ আছে, সম্রাট পলায়ন করিয়াছেন কি না, তাহারা “রামভজি বা রহিমভজি” ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া কেহ একসপ্তাহের জন্ত, কেহ দশ দিনের জন্ত মাপ চাহিয়া উদ্ধার পাইয়াছে।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে টেক্সিয়ের মাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েল এবং টাওঠাইর সঙ্গে দেখা হইল। টাওঠাই এত ভীত হইয়াছিলেন যে তিনি ছদ্মবেশে ভামো ডেপুটি কমিশনারের শরণাপন্ন হন। ডেপুটি কমিশনার তাহাকে মিলিটারি পুলিশের কেল্লার ভিতর রাখিয়া সেপাইয়ের



চীনা কেল্লা—ইহার ভারপ্রাপ্ত কর্ণেল ছাউ বিদ্রোহের
রাত্রিতে নিহত হন।

গ্রহরী রাখিয়াছিলেন। এবং কোন চীনা তাঁহার নিকট
যাইতে না পারে তজ্জন্ম কড়া আদেশ জারি করিয়া-
ছিলেন। কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে পাছে
কোন বিদ্রোহী তাঁহাকে হত্যা করে। প্রায় সপ্তাহকাল
এই প্রকারে কাটিলে ভামোর প্রধান প্রধান চীনসদাগর-
গণ দায়ী হইয়া ডেপুটি কমিশনারের আদেশ লইয়া তবে
তাঁহাকে চীনাগের মন্দিরে আনয়ন করেন। তিনি ছুঃখে
এত বিমর্ষ যে কাহারো সঙ্গে প্রসন্নবদনে কথা বলেন
না। কারণ এই বিদ্রোহে তাঁহার যথাসর্বস্ব গিয়া তিনি
কাঙ্গাল হইয়াছেন। তাঁহার কোমরে চোট লাগায়
বেদনায় কাতর, তাই আমার নিকট ঔষধ চাহিলেন।
আমি আঘাতের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন যে
টেঙ্গিয়ে হইতে বিদ্রোহের রাত্রিতে পলায়নের কালে
জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার জন্ত তিন বার চেষ্টা
করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীর জল গভীর না থাকায় ডুবিতে
পারেন নাই। লাভের মধ্যে পাথরের আঘাতে কোমরে
বেদনা হইয়া কষ্ট পাইতেছেন।

মিঃ ওয়েলও যথাসর্বস্ব হারাইয়াছেন। তিনি
আক্ষেপ করিয়া কহিলেন “আমি মাধু নহি, আমি
খাস চীনা, চীনা হইয়া স্বজাতির যথাসর্বস্ব লুট করিল
এই আমার আক্ষেপ।” এইসকল কর্মচারীর নিবাস
ক্যান্টন ও সাংহাই প্রদেশে।

ভামোতে এত চীনা জীপুরুষ বালকবালিকা আসিয়া

জমা হইয়াছে যে তথায় ঘর ভাড়া পাওয়া কঠিন হইয়াছে।
চীনা মহাল্লায় প্রস্তুত খাওয়ার মূল্য দিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।
রেঙ্গুন ও মাণ্ডালে হইতে দলে দলে চীনা ভলান্টিয়ার
টেঙ্গিয়ে অভিমুখে চলিয়াছে। ভামো হইতে রাস্তায়
আবার নানা গোলযোগের গুজব রাষ্ট্র হইতেছে। তাহাতে
অনেকের মনে ভীতি সঞ্চার হইতেছে।

এইসকল ভয়ের কারণ সত্ত্বেও আমি ও গ্রোভ সাহেব
পুনরায় টেঙ্গিয়ে যাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম।
২২শে নবেম্বর যাত্রা করা হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামলাল সরকার।

শ্যামসুন্দর

তব অনন্ত-শয়ন, মাধব!

সাগরে কখনো নয়,

ধরণীর বৃকে জড়ায় ধরিয়া

রয়েছ ভুবনময়!

শ্রামল তোমার দেহের কাস্তি

তাই চারি দিকে রাজে,—

পল্লবদলে তৃণ শাঙ্গলে

ধাঞ্চলহরী মাঝে!

পাষণ শিখর তরল সাগর

শ্রাম শৈবাল বহে;

গোপন গুহার নিবিড় আঁধারে

দুর্গা নীরবে রহে!

সুকুমার শ্রাম কোমল মাধুরী

তবুও নিয়ত নব,

বাসব বরণ বহি অরুণ

মানিয়াছে পরাভব!

প্লাবন-লেহন অনল-দহন

বজ্র-বেদন আর,

শ্রামল তুণের মূহুর প্রভাবে

চাকা পড়ে বার বার!

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*

আজকাল বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে নব নব শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে। জাহ্নবীর নানা শাখায় প্রাবৃত শস্ত্রশ্রামলা বঙ্গভূমির স্থায় আমাদের সাহিত্য-মাতাও শত ধারায় অভিভিন্ত হইয়া উঠিতেছেন। সেইসমস্ত শ্রোতোধারার মধ্যে ইতিহাসচর্চার একটি ধারা ক্রমে বেগবতী হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। বাস্তবিক আজকাল আমাদের মধ্যে ইতিহাস আলোচনার কিছু ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কেবল তাহা নহে, এই আলোচনা যে কতক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাও বলা যাইতে পারে। বর্তমান যুগের ইতিহাসিকগণ কেবলমাত্র অনুবাদ অবলম্বন না করিয়া স্বাধীন গবেষণায় যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, ইহা যারপরনাই আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। যিনি এই স্বাধীন পথের প্রদর্শক তিনি যে বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। বর্তমান যুগের ইতিহাসিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা যতদূর অবগত হই, তাহাতে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্তকে এই পথের প্রদর্শক বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাস্তবিক রজনীকান্ত ভগীরথের স্থায় শঙ্খনিনাদ করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে এই ইতিহাসিকী গঙ্গার অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শঙ্খননি দুন্দুভিনিদাকেও পরাজিত করিয়াছিল, এবং তাহা আজিও আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার অনীত ইতিহাসিকী গঙ্গা বঙ্গসাহিত্যকে প্রাবৃত করিয়া যেরূপ উদ্যম পতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় বোধ হয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। বাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাসিক সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার সম্ভবতঃ সকলেই তাহা অবগত আছেন। অনেকে এক্ষণে সেই শ্রোতে তরগী বাহিয়া চলিয়াছেন। এবং নিজ নিজ তরগীবন্ধে পতাকা উড়াইয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের দৃষ্টি কিন্তু পতাকা অপেক্ষা শ্রোতের দিকেই ধাবিত হইতেছে। বাস্তবিক রজনীকান্ত যে শ্রোতের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি যদি স্বাধীন ইতিহাসচর্চার পথ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসিক সাহিত্য এত শীঘ্র সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। হুতরাং বাঙ্গালার ইতিহাসিক সাহিত্যে রজনীকান্তের স্থান কত উচ্রে অবস্থিত তাহা বোধ হয় সকলে অনুমান করিতে পারিতেছেন।

ভারতের ইতিহাস-সমুদ্রে মন্থন করিয়া রজনীকান্ত বঙ্গসাহিত্যকে যে-সমস্ত রত্ন ভূষিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা আপনাদের উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণ করিয়া সাহিত্যমন্দিরকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক, ভারতকাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থরত্নের আলোকে বঙ্গসাহিত্য যে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি সাহিত্য-মুকুটে যে কোহিনুর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অল্প তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার অক্ষয় কীর্তি সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যে বঙ্গসাহিত্য-মুকুটে কোহিনুররূপে বিবাজ করিতেছে, তাহা আমরা মূল্যকণ্ঠে বলিতে পারি। বাস্তবিক সিপাহীযুদ্ধের স্থায় একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস আজিও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয় নাই। ইহা যে বাঙ্গালার ইতিহাসিক সাহিত্যে অধিতীয় সে কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

* ৩৭রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। অভিনব সংস্করণ, বৃহদাকার দুইখণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা। প্রথম খণ্ডে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ সন্নিবেশিত। ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত।

আজকাল বঙ্গসাহিত্য নানাপ্রকার ঐতিহাসিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ হইলেও সিপাহীযুদ্ধের স্থায় একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ আজিও আমাদের নয়নপথে নিপতিত হয় নাই। সেইজন্য আমরা ইহাকে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্যের মুকুটমণি বলিয়া অভিহিত করিতেছি। আমরা আশা করি, অনেকেই এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন।

যে সময়ে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্য বিভাগলয়পাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকায় ও কয়েকখানি অনুবাদ গ্রন্থে ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে রজনীকান্ত স্বাধীন গবেষণার বলে সিপাহীযুদ্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্বে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমমণিকা বাঙ্গালার ইতিহাস ব্যতীত আর কোন স্বাধীন গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে অনেক স্বাধীন গবেষণার পরিচয় থাকিলেও তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিভাগলয়পাঠ্য হওয়ার সাধারণ পাঠক-বর্গের নিকট তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্যে ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং আমরাও তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। ষষ্ঠদশাব্দ রজনীকান্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ও যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজস্থানের অনুবাদ ব্যতীত আর কোন পাঠ্যগোষ্ঠী ইতিহাসগ্রন্থ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তন্মধ্যে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যে স্বাধীনভাবে লিখিত হইয়াছিল একথা আমরা বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে বাঙ্গালা ভাষাতেও স্বাধীন ভাবে ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। এবং এক্ষণে অনেকেই যে অল্পবিস্তর তাহার অনুকরণের চেষ্টা করিতেছেন তাহাও দেখিতে পাইতেছি।

সিপাহীযুদ্ধের বিবরণ সাধারণ ইতিহাসপাঠকমাত্রেরই অবগত আছেন। সেই দিগ্গদাকারী মহাশি বাঙ্গালার শ্রামল প্রান্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে যে পরিব্রাজ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও কাহারও অবিধিত নাই। কিন্তু কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইল, এবং কি ভাবেই বা তাহা উত্তর ভারতবর্ষকে দগ্ধ করিবার জন্ত প্রধাবিত হইয়াছিল, পরিশেষে তাহা কেমন করিয়া নিকপিত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকের অবগত হওয়ার হবিষা ঘটে নাই। রজনীকান্ত ইতিহাসানুরাগী বাঙ্গালীদিগকে তাহাই জানাইবার জন্ত সিপাহীযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি তাৎকালিক রাজনৈতিক ব্যাপার-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া তাঁহার অমর গ্রন্থে সিপাহীযুদ্ধের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হৃদয় চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিহাসানুরাগী পাঠকমাত্রেরই তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে তৎসমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। ডালহৌসীর বিশ্বগ্রাসিনী রাজ্যালাস ক্রুরূপে দেশমধ্যে অশান্তির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলে, কিরূপে প্রত্যাখ্যাত দেশীয় রাজস্ববর্গের প্রতিনিধিগণ সিপাহীদিগের সহিত যোগদানে প্রবৃত্ত হন, কিরূপে ধর্মনাশ ভয়ে সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহের সূচনা করে, কিরূপেই বা সেই বিদ্রোহানল বারাকপুর, বহরমপুর হইতে আরম্ভ হইয়া আরা, কানপুর, লক্ষৌ, মিরাট, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পরিব্রাজ্য হইয়া পড়ে, এবং কিরূপে নানানামেহ, কুমারসিংহ, তাত্যাতোপে, লক্ষ্মাবাই প্রভৃতি স্ব স্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সেই বিদ্রোহানলকে প্রজ্জ্বলিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবশেষে কিরূপেই বা নীল, হাংলক, আউটাম, উইলসন প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতি এই অগ্নি নির্বাণের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, রজনীকান্ত তাহা হৃস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ছত্রে ছত্রে তাহার লোমহর্ষণ কাহিনী



স্বর্ণীয় রজনীকান্ত গুপ্ত।

বিবৃত হইয়াছে, দেশীয় ও ইউরোপীয়ের অদ্ভুত সমরক্রীড়া এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় চিত্রিত হইয়াছে।

রজনীকান্তের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম-ভাগে তিনি ডালহৌসীর শাসনকালের সমালোচনা করিয়া ক্রমশঃ দেশমধ্যে অশান্তির অগ্নি প্রদীপিত হইতেছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সিপাহী সৈন্তের উৎপত্তির বিবরণও এদন্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে নুতন রাইফল বন্দুক ও বসায়ুক্ত চৌটার প্রচলনে ক্রমশঃ সিপাহীগণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় ও বারাকপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে ক্রমশঃ সিপাহীগণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব অঙ্কুরিত হয়, পরে লক্ষ্মী, মিরাত ও দিল্লীর সিপাহীগণ ক্রমশঃ উত্তেজিত হইতে আরম্ভ করে তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয়ভাগে কলিকাতার অধিবাসীগণের বিভীষিকা, দিল্লীর অভ্যুত্থানে ইংরেজ সৈন্তগণের বাজী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বারানসী, আজিমগড়, জোনপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের গোলবোমের বিবরণ, নানাসাহেব কর্তৃক কানপুরের

হতাকাণ্ড, হাবলকের বীরত্ব, কতপুত্র, কানপুর প্রভৃতির যুদ্ধ, বিখ্যাত নানাসাহেবের প্রাসাদ ধ্বংস, নীলের প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থভাগে গজাব, দিল্লী ও পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানের বিবরণ, বিহারের আরা প্রভৃতি স্থানের ব্যাপার, কুমারসিংহের সাহসিকতা, জগদীশ-পুরের ধ্বংস প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এবং পঞ্চমভাগ পাঠ করিলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গোয়ালিয়র, ইন্দোর, রাজপুতনা, আগরা, লক্ষ্মী, দিল্লী প্রভৃতির ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ, তাত্যাটোপে ও স্বাক্ষর লক্ষ্মীয়াইয়ের অদ্ভুত বীরত্ব হৃৎপঙ্কজের অবগত হওয়া যায়। আমাদের এই সর্বশেষ পরিচয় হইতে রজনীকান্ত ক্রমশঃ বিস্তৃত ভাবে সিপাহীযুদ্ধের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। এই পঞ্চমভাগে বিভক্ত বিরাট ইতিহাস-গ্রন্থে রজনীকান্ত যে ক্রমশঃ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ না করিলে জানা যায় না, যাহারা ইতিহাসানুরাগী পাঠক তাহার সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিলেই আমাদের উক্তির যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে সকলে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পরিচয় কঠক পরিমাণে জ্ঞাত হইতে পারেন। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ পাঠ না করিলে রজনীকান্তের প্রতিভা অবগত হওয়া যায় না। বাস্তবিক রজনীকান্ত তাহার এই বিরাট গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে আপনার অমানুষী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, তিনি ইহাতে তাহার স্বাধীন গবেষণার ফল ব্যক্ত করিয়াছেন। কে প্রভৃতি ইংরেজ

ঐতিহাসিকের গ্রন্থ প্রধানতঃ তাহার অবলম্বন হইলেও তিনি অনেক কাগজ পত্র ও দেশীয় প্রবাদ জনশ্রুতি প্রভৃতি আলোড়ন করিয়া স্বাধীন মস্তব্যের সহিত পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের মতের সমালোচনা করিয়া নিজ মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া তিনি যে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অকুতোভয়ে সেইসমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিশেষ গুণ এই যে, তিনি নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়ের বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং আমাদের মতে ঐতিহাসিক মাত্রেরই নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। সর্বাপেক্ষা তাহার ওজস্বিনী ভাষা তাহার বর্ণনাকে শ্রুতিস্বত্বকরী করিয়া রাখিয়াছে। যে ভাষায় ইতিহাস লিখিত হইলে তাহা হৃৎপঙ্কজের ছায় পাঠকের হৃদয়কন্দরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে, রজনীকান্ত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে সেই ভাষার বিশেষকরী লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সেই অপূর্ণ ভাষায় লিখিত ঘটনাবলী পাঠ করিতে করিতে শরীর

রোমাঙ্কিত হইয়া উঠে। ফলতঃ ঘটনাসমাবেশে, স্বাধীন সিদ্ধান্তে ও ভাবার পাঠার্থে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস যে বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারীর এই অপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

রজনীকান্ত তাহার সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস শেষ করার অব্যবহিত পরে এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীমান্ মোহিনীকান্ত পিতার এই অপূর্ণ কীর্তি সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শনের জন্য সিপাহীযুদ্ধের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কালীমবাজারের মুক্তহস্ত মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র এই সংস্করণের বায়বহনে সাহায্য করিয়া বাঙ্গালী মাত্রকেই উপকৃত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য যে কতরূপে মহারাজের সাহায্যে সমৃদ্ধ হইতেছে তাহার বোধ হয় নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। মোহিনীকান্ত পিতার এই অপূর্ণ কীর্তি রক্ষার জন্য যে সচেষ্ট হইয়াছেন তজ্জন্ত আমরা তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি তাহার স্বর্গীয় পিতার চিত্র সংযুক্ত করিয়া এই অভিনব সংস্করণটিকে সাধারণের নিকট অধিকতর আদৃত করিয়া তুলিয়াছেন। তন্নিম্ন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের জীবনী মহাশয়ের লিখিত রজনীকান্তের জীবনীও এ সংস্করণের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। মুদ্রণ-আদিতেও সংস্করণটি সুন্দর হইয়াছে। আমরা সাহিত্যানুরাগী পাঠক-মাত্রকেই এই অপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কৃতী পুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সভ্যজাতির একটি লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী যদি জাতীয়তার গৌরব রাখিতে চাহে, তাহা হইলে জাতীয় কৃতীপুরুষদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাহাদের অবশ্য কর্তব্য, সেইজন্য বাঙ্গালার অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক রজনীকান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাহার অমূল্যগ্রন্থ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করার জন্য আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই আহ্বান করিতেছি।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

নাঙ্গী পন্থীর গান

(পজাব)

অরূপ গুরু ।

ওগো ঝগড়া বড় সহজ নয়,
ও সে সম্মুখে যদি স্ত্রজন হয় ।
পুত্র, পিতা, পুরুষ, নারী,—
একাই সে যে সমুদয় ।
বাজীকরের এমনি বাজী
ফাঁস গলে দেয় ক'রে রাজী ।
লোভের মোহের কঠিন ডোরে
ফাঁস পড়েছে জগৎময় ।
পাখোয়াজে কি বাত বাজে
মানস-রূপা কণ্ঠা নাচে !
দুর্ন্যতি হয় মর্শ্বে উদয়,
তৃষ্ণা করে ত্রিলোক জয় ;
সম্মুখে যদি স্ত্রজন হয় ।

মায়া আর মমতা হ'জন
পিচকারী দে রাঙায় গো মন ।
তালিম মানুষ মিলেছে যার
তাকেই মজা মালুম হয় ;
সম্মুখে যদি স্ত্রজন হয় ।

আট পহরই ভজন চলে
গুলতানে মন যায় রে গলে ;
পলক ভরও হয় নাক' তুল,
পলকে হয় কল্ল ক্ষয় !
সম্মুখে যদি স্ত্রজন হয় ।

ভৈরোঁ সাধু মাতাল হ'য়ে
বসল চড়ে রূপের মৈ-এ !
মৈথানা শেষ পায়ে ঠেলে
গাইলে অরূপ গুরুর জয় ।
সম্মুখে যদি স্ত্রজন হয় ।

• আত্ম নিবেদন ।

আমি একান্ত তোমারি যে তাহা
হয়না গো যেন ভুল ;
ডালে ডালে আর পাতায় পাতায়
তুমি সে রঙীন ফুল ।
বান্ধা তোমার ফুল দেয় তারে,—
বুকে যে বিধায় শূল ;
জানে সে,—নিখিলে ফুলে ফুলে মিলে
কাঁটায় কাঁটারি হল ।
মক্কা মদিনা সকলি চ'ড়িছ
প্রেমিকের দেখা নাই,
শ্রামলী লুকাল ধবলী আসিল
এইবারে ছুটি চাই ।
ওরে দিল ! তুই থাকিস্ নে আর
ছনিয়াতে মশগুল ।
• সাঁইয়ের বান্ধা শা হুসেন খুঁজে
পেয়েছে তব্বমূল ।

কফিন আমার প্রমোদ-কক্ষ

কবর আমার গ্রাম,

কর্দম মম চন্দন রূপ

ধূলি শেষ মোর নাম ।

কোপীন কেহ ধবেছে লুপ্তি

কেহ মধুমলী খাসা,

একদিন তবু সখাই বে ভাই

ধূলিতে লইবে বাসা । •

কেন যোগী ! দেহ ভস্মে মাজিছ ?

ও দেহ তো হবে মাটি,

ধূলার গাঁঠির বাতাসে ফুলিয়া

হ'য়ে আছে পবিপাটি ।

কুমার তখনো ধূলাবে ছানিছে,

কুমারে ছানিছে ধূল ।

কুলনের দোল লেগেছে রে ভাই

উঁচু নৌচু সমতুল ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

মহাপুরুষের উক্তি

(মহম্মদ)

জীবো যাহার দয়া নাই ভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না ।

জীব মাত্রেই ভগবানের পরিবার-ভুক্ত ; যে ব্যক্তি জীব মাত্রেই মঙ্গল বিধানের অন্ত সর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করে সেই ভগবানের প্রিয়তম সেবক ; শ্রেষ্ঠ ভক্ত ।

যে জ্ঞানের বর্ধি প্রজ্জ্বলিত করে তাহাব মৃত্যু নাই ।

জ্ঞান-লিপ্সা মুসলমানের চক্ষে ভগবৎ-প্রেরণা ; জ্ঞান-শিক্ষা ভগবানের আদেশ ।

যে ব্যক্তি জ্ঞানের পথ অবলম্বন করে স্বয়ং ভগবান তাহাকে স্বর্গের পথ নির্দেশ করিয়া দান ।

পূর্ণিমার চন্দ্রে ও ক্ষুদ্র নক্ষত্রে যে প্রভেদ জ্ঞানী উপাসক এবং অজ্ঞ উপাসকে প্রভেদ তদপেক্ষাও অধিক ।

জ্ঞানীর লেখনী-মুখস্থিত মসীবিন্দু ধর্মার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহিদের রক্ত অপেক্ষাও পবিত্র জিনিস ।

জ্ঞান শিক্ষার্থে যাহাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে হয় সে স্বর্গপথের পথিক ।

কি জ্ঞানী কি পুরুষ প্রত্যেক মুসলমানের বিজ্ঞাচর্চা অবশ্য-কর্তব্যের অন্তর্গত ।

সর্বপ্রযত্নে বিজ্ঞালাভ কর । বিজ্ঞা জ্ঞান অজ্ঞানের পার্থক্য স্ফুটতর করিয়া তোলে ; স্বর্গের পথ সুগম করিয়া দায় । বিজ্ঞা নির্জনে সঙ্গী, মরুভূমিতে সহচর । বিজ্ঞা জ্বরের মূল, দুঃখের পরম ঔষধ । বিজ্ঞা বন্ধুসমাজে অলম্ব্য-হরূপ ; শত্রুর ব্যাধে বর্ষ ।

যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাব পক্ষে সং হওয়া সহজ, সৎগনিত হওয়াও সহজ । জ্ঞানী ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও ইহলোকে রাজার সম্ভ্রান্ত করিয়া থাকে এবং পরলোকে অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয় ।

উপাসনা বিশ্বাসী পক্ষে সাধুজ্ঞা-লাভ ।

নির্জনে ভগবানকে স্মরণ কব ; অনাহাবই তোমার শ্রেষ্ঠ আহার, উপাসনাই তোমার শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম ।

যে নমাজে হৃদয় নত্র না হয় সে নমাজ ভগবানের প্রাছ নয় ।

উপাসনা যাহাকে কুর্কর্ষ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারে সে মশাল হাতে করিয়া পথ হারায় । এরূপ উপাসনার কাহারও পুণ্য বৃদ্ধি হয় না, প্রতিদিন কেবল পরমাত্মা ও তাহার পতিত আত্মার মধ্যে ব্যবধানই বৃদ্ধি পায় ।

শ্রেষ্ঠ দানের উৎস হৃদয়ে, তাহা রসনায় উৎসারিত হন এবং ব্যথিতের হৃদয়-ক্ষতে অমৃত বর্ষণ করে ।

যে খাটরা খায় অথচ ভিখারীকে ফিরায় না তাহান দানই শ্রেষ্ঠ দান ।

রোষ প্রকাশ কবিবাব সুবিধা থাকিলেও যে তাহা দমন কবে ভগবান তাহাকে পুণ্ডিত কবিবেন ।

মাতৃষকে যে অনায়াসে আছাড় দিয়া কেলিতে পারে সে বলবান নয়, যে ক্রোধ দমন করিতে পারে সেই ক্ষমতাবান ।

ভগবানকে স্মরণ কবিয়া যে রোষেব আগুন নীরবে গলাধঃকরণ করিতে পারিয়াছে তাহার মত ভাগ্যবান আর কেহ নাই ; সে যে উৎকৃষ্ট সরবৎ পান করিয়াছে তাহা এ অগতে আর কেহই পান করে নাই ।

একজন বেঞ্জা কুয়ার ধার দিয়া বাইবার সময় একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে দেখিতে পায়। তৃষ্ণায় উহার জিহ্বা লোলায়মান। জীসোকটি নিকটে কোনো পাত্র না পাইয়া নিজের ওড়নায় নিজের একপাটি পায়জার বাঁধিয়া কুয়া হইতে জল তুলিয়া কুকুরটির তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই একটি মাত্র অহুষ্ঠানে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত কলঙ্ক নিঃশেষে ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে।

পরগীড়নের জন্ত যে অস্ত্রের সাহায্য প্রার্থনা করিতে সাহস করে তাহার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই; স্বজাতিকে অস্ত্রায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত জানিয়াও যে স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধ করে তাহার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নাই; অস্ত্রায়ের প্রতিষ্ঠা কবিত্তে গিয়া অধর্ম যুদ্ধে যে প্রাণ হারায় মহম্মদ তাহাকে স্বদলভুক্ত বলিয়া গণ্য করিবেন না।

তোমরা আমার অবস্থা গৌরব বুদ্ধি করিয়ো না; খ্রীষ্টানেরা যেমন মেবীর পুত্র বীভূতকে 'ভগবানের একমাত্র পুত্র'—এমন কি 'স্বয়ং-ভগবান' বলিয়া থাকে তৈমন বলিয়ো না। আমি ভগবানের ভৃত্য মাত্র, আমাকে তাঁহার ভৃত্য বলিয়ো, ভগবানের দূত বলিয়ো।

তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে যেমন বিশেষ অন্তর নাই, স্বর্গরাজ্যে তেমন চীরধারিণী চুঃখমলিনা অপোগণ্ড সন্তানের পালয়িত্রী বিধবার সঙ্গে আমার সন্তানের কোনো ইতর-বিশেষ থাকিবে না। সে কেমন বিধবা জান? যে একদিন পরমা স্তম্ভরী ছিল, শেষে, বিধবা হইয়া নিজের স্নেহ স্বাচ্ছন্দ্য সৌন্দর্য্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়া কেবল সন্তান পালনের পরিশ্রমে আপনাকে দেহ পাত করিয়াছে।

ঐশ্বর্য্যের বোঝা বাহার স্বন্ধে, হুসারোহ স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা তাহার পক্ষে হ্রস্ব।

ভিক্ষার দরজায় যে মাথা গলাইয়াছে দারিদ্র্যের দরজায় দাঁড়াইতে তাহার বিলম্ব নাই।

যে ব্যভিচারী ধর্ম তাহাকে পরিত্যাগ করেন; তাই বলিয়া জন্মের মত পরিত্যাগ করেন না। কুপথ ছাড়িয়া সুপথে চলিতে পারিলে, সংযত হইলে, ধর্ম আবার ফিরিয়া আসেন।

ইমানের তিনটি লক্ষণ; প্রথম, যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে স্বীকার করে তাহাকে কষ্ট না দেওয়া; দ্বিতীয়, একটা

মাত্র দুর্ব্বলতার জন্ত কাহাকেও অধার্মিক না বলা; তৃতীয়, কেবল একটা মাত্র দুর্কার্যের জন্ত কাহাকেও সমাজ-বহিষ্কৃত না করা।

যে ব্যভিচার করে, যে মস্তপান করে, যে পরস্বাপহারী, যে দস্যু এবং যে বিশ্বাসঘাতক সে কখনো মুমিন (বিশ্বাসী) নামের যোগ্য হইতে পাবে না। সাবধান, সাবধান।

যে ব্রহ্মপবায়ণ এবং পবলোকে বিশ্বাসী, সে, হয় ভাল কথার আলোচনা করুক; না হয় তো চূপ করিয়া থাক।

আত্মজয়েব জন্ত যে যুদ্ধোত্তম সেই জগতে শ্রেষ্ঠ জেহাদ।

সংবৎসরব্যাপী নামকীর্তন অপেক্ষা প্রহর-ব্যাপী ধ্যান ধারণাই শ্রেয়স্কর।

জীবের প্রতি যে সদয়, ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন। মানুষ ভালই হোক আং মন্দই হোক সদয় ব্যবহার করিতে কার্পণ্য করিয়ো না। অসত্যের প্রতি সদ্যবহারই মানুষকে মঙ্গলের পক্ষে চালাইবার একমাত্র উপায়। ইহার বাড়ী শিক্ষা নাই।

অনাথ শিশু যে বাড়ীতে আশ্রয় পায় সেই ভাল-মুসলমানের বাড়ী। আর যেখানে অনাথের অনাদর, সেই বাড়ী মুসলমানের বাড়ী হইলেও অবিশ্বাসী বিধর্মীর বাসেরও অযোগ্য।

শিষ্টাচার ভদ্রলোকের শ্রেষ্ঠতম পৈতৃক সম্পত্তি। যে পিতা পুত্রকে শিষ্টাচার শিখাইয়াছেন তিনি উহাকে শ্রেষ্ঠ বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন।

সিংহদ্বার দিয়া যে স্বর্গে প্রবেশ করিতে চায় সে আপনাকে পিতা মাতার তুষ্টিসাধন করুক।

পিতা কিম্বা মাতা যদি সন্তানের অহিত সাধনও করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের সেবাসুশ্রবা করা সন্তানের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

পিতার তুষ্টিতে ভগবান সন্তুষ্ট। পিতার অসন্তোষে ভগবানের মোষবল্লি ইন্ধনসংযুক্ত হইয়া ওঠে।*

মানুষ মরিলে তাহার দোষের উল্লেখ করিতে নাই।

আমি পরম জ্যোতির দর্শন পাইয়াছি, জ্যোতিতে আমার বসতি।

ঐসতোম্রনাথ দত্ত।

* হজরত মহম্মদের এইসকল হুস্পষ্ট উক্তিগণ্যেও পিতৃমোহী ও ব্রহ্মজ্ঞকে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা কি করিয়া পরম ধার্মিক বলেন?

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি “বস্তুতত্ত্বতাহীন?”

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বঙ্গদর্শনে গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যায় কবিবর রবীন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি, সমাজ সংস্কারের প্রয়াস ও ধর্মসাধনা হাওয়ায় দালানবাড়ী হইয়া ফুটিয়াছে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিই যে বস্তুতত্ত্বতাহীন ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই চিত্র যদি সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ রীত্যনুসারে লিখিত হইত, তবে তাহা বিচারবিতর্কের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। সাহিত্যের ভালমন্দ সাহিত্যের দিক দিয়াই আলোচ্য, সাহিত্যচরিত্রের জীবনের ভালমন্দের সহিত তাহার একান্ত সম্বন্ধ নাই। অবশ্য তাৎপর্য এ নয় যে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগই নাই, যোগ খুবই আছে—কারণ উভয়েই পরস্পরাপেক্ষী। সাহিত্য জীবনের ভিতর হইতে আপনার সৃষ্টির উপযোগী বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু জীবন আপনাকে সাধারণত যেমন ভাবে প্রকাশ করে, সাহিত্যের প্রকাশ তাহার অনুরূপ হয় না। সাহিত্যে জীবনচিত্রণে স্রুতে হউক চুঃখে হউক পবিণামে একটি বৃহৎ শাস্তির আদর্শ থাকা চাই। মানুষের মন নদীর মত—দীর্ঘপথ আঁকিয়া বাকিয়া আপনাকে বিচিত্রতার মধ্য দিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার আপত্তি নাই কিন্তু শেষকালটায় একটা স্থবিরতার কিম্বা চুঃখের সমুদ্রের মধ্যে তাহার একটা রঙ পরিণামের মধ্যে মেশা চাই—কিন্তু মানব-জীবনে সংসারের ক্ষেত্রে মানুষের মনের এই পবিপূর্ণ অভিব্যক্তিটি কি সকল সময় দেখা যায়? না। সেই জন্যই তো জীবন এবং সাহিত্য এক জিনিস নয়—জীবনের বাস্তবিকতা সাহিত্যে নাই এবং সাহিত্যের ভাবসম্পূর্ণতা জীবনে নাই—অথচ সেই জন্যই আবার পরস্পরকে পরস্পরের এতই প্রয়োজন। এই কারণে ম্যাথু আর্নল্ড কবিতাকে জীবনের সমালোচনা বলিয়াছিলেন—জীবনকে

সে এক বিশেষ ভাবদৃষ্টির দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেখা, যাহা জীবনের নিজস্ব জিনিস নয়।

বাস্তবজীবন এবং ভাবময় সাহিত্য এই উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকিলে কোন কবির জীবনের ভালমন্দ আলোচনা করিয়া তাঁহার কাব্যকে সেই কারণেই ভাল বা মন্দ স্থির করিবার প্রবৃত্তি হয় না। শেক্সপীয়ারের চরিত্র উত্তম বা মারাত্মক বা নিকৃষ্ট ছিল কি না, তাঁহার সম্বন্ধে যে চৌধুরের অপবাদ আছে তাহা সত্য কি না তাহা জীবনচরিত্র আলোচনা হিসাবে কোতুলনোদীপক হইতে পারে, কিন্তু শেক্সপীয়ারের নাট্যাবলীর মধ্যে তাঁহার যে মহান চিত্তশক্তি, মানুষের বিচিত্র সুখদুঃখ পাপপুণের মধ্যে তাঁহার যে অসামান্য অদ্ভুত প্রবেশের পরিচয় প্রদান করে—জীবনের এইসকল তুচ্ছঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় সে পরিচয়কে বাড়ায়ও না কমায়ও না। শেক্সপীয়ার ঘোড়ার সহস্র ছিলেন, কি কোন্ দিন কার বাগানে শেয়াল চুরি করিতে গিয়াছিলেন, তিনি ব্যভিচার দোষ ছুই ছিলেন কি না, ইহা তো সেই বৃহৎ বিপুল তাঁহার মানস-জীবনের পরিস্ফুটনে কোন সাহায্য কবে না। যেখানে তাঁহার নাটো, তিনি উদ্ভাস মানব-প্রবৃত্তির বড় তুলিয়াছেন, হেগেল যাহাকে আন্তর স্বপ্ন ‘geist’-এর স্বপ্ন বলিয়াছেন,—মানুষের আপনানি ভিতরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, এক স্বার্থের সঙ্গে অন্য স্বার্থের, উচ্চ প্রকৃতির সঙ্গে নিম্নপ্রকৃতির যে অবশ্রম্ভাবী অহেতুক বিরোধ রহিয়াছে—যেখানে শেক্সপীয়ার আশ্চর্য ঘটনার সমাবেশে সেই বিরোধের প্রবলতাকে দেখাইয়াছেন—সেখানে ত্রৈলোক্য তুচ্ছ ঘটনার সহিত তাহার সম্বন্ধ কোথায়? তবে কেমন করিয়া শেক্সপীয়ার মানবচরিত্রের এত অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন; শেক্সপীয়ারের জীবনচরিত্র হইতে যদি তাহা দেখাইতে পারা যাইত তবে তাহা যথার্থ জীবন হইত। কারণ তিনি যে কবি, তাঁহার জীবনই যে ভাব-জীবন—তাঁহার অন্ত জীবন যেখানে আছে, সেখানে অনেক আত্মবিরোধ, অনেক দুর্বলতা ও গ্লানি হয়ত লুক্কায়িত হইয়া আছে—না হয় তাহার সত্যই হইল, তথাপি সে সত্য তো কবিজীবনের সত্য নয়। এমন কোন কবির নাম করাই শক্ত—বোধ হয় দুইজন-

জন-ছাড়া—বীহাদের জীবন এবং কবিতা সম্পূর্ণরূপে এবং সর্বতোভাবে মেলে। কিন্তু সে জন্ত তো জগৎ তাঁহাদের কবিত্বের শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করে নাই। শেলি এপিসিকিডিয়ন্ লিখিয়াছেন, কিন্তু এমিলিয়া ভিত্ত্যানি কি সেই প্রেমের অলকাপুরী, সেই অপরূপ সৌন্দর্যালোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সত্যই? কখনই নয়। শেলি নিজেই কি বলেন নাই—

"In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought"

অর্থাৎ অনেক মানবরূপের মধ্যে আমি ব্যাকুল ভাবে আমারি চিত্তের মানসী প্রতিমার ছায়াকে অন্বেষণ করিয়াছি।

কিন্তু শেলির জীবনে বরাবর কি সেই আদর্শ প্রতিমার সঙ্গে মানব প্রতিমার অমিল হয় নাই? আর তখন শেলির অস্থিরচিত্ততা,—অনেক সময়ে নিশ্চয় নির্ভবতা কি সর্বোৎসাহে প্রশংসার্য? ওয়াশ্‌ট, হুট্টম্যান্ যৌবনে উচ্ছ-
খলতার বশবর্তী হইয়া চিরকাল অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও ছয়টি সন্তানের জনক হইয়াছিলেন। সেই জন্তই তিনি যখন মানবদেহকে আত্মার মন্দির বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া-
ছেন, জীলোকের শরীরকে "আত্মার প্রবেশদ্বার" বলিয়া-
ছেন, শরীরকে আত্মাকে এক করিয়া অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, তখন এপর্যন্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবন-
চরিত্রের অংশবিশেষের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সেইসকল ভাবুকতায় কি অবিখ্যাস স্থাপন করিয়াছে? জীবন যেমনি হউক, সাহিত্যের ভাবপ্রকাশ যদি পূর্ণ হয়, তবেই তাহা মানবের চিরন্তন কালের আদবের জিনিস হইয়া থাকিবে। সাহিত্য ও জীবন এক জিনিস নয়।

আর তা ছাড়া, বাহিরের ঘটনার দিক্ দিয়া কোন মানুষকেই বিচার করাটাই অজ্ঞান, কবিকে বিচার করা আরও অজ্ঞান,—কারণ তাঁহার জীবনটাই ভাবময় জীবন। অনেক সময় এই বাহিরের জীবনের সঙ্গে আর ভাবময় আন্তর জীবনের বিরোধই কবির কবিত্বকে আবার উৎ-
সাহিত করিয়া দেয়, কারণ স্বপ্ন ভিন্ন সৃষ্টিই সম্ভবে না।

এই জন্য শেলি এক জয়গায় লিখিয়াছেন :—

Most wretched men are cradled into poetry by wrong
They learn in suffering what they teach in song.

অর্থাৎ অনেক হতভাগ্য লোক অজ্ঞানের তান্ডনাতেই ছলনের দোলা আশ্রয় করে—তাঁহারা দুঃখের মধ্যে বাহা শিখে, সঙ্গীতে তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু কবির জীবনের রহস্য যেমনই হউক, ইহা সত্য যে তাঁহার জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্ত তাঁহার সাহিত্যেব অসম্পূর্ণতা ঘটবার কোন কারণ নাই। সেই জন্তই আমি বলিতেছিলাম যে বিপিন বাবু ঠিক সাহিত্যেব দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই, তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছেন এবং জীবনের এমন সকল ভাগ এমন সকল ঘটনাব দিক্ দিয়া বিচার করিতে গিয়াছেন, বাহ্যিক সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগই নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে বস্তুতন্ত্রতাহীন বলিতে চাহেন, অথচ তাঁহার প্রমাণ এই যে রবীন্দ্রনাথ ধনী সন্তান। তিনি জমিদার, অভাব বাংলা পল্লী-জীবনের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার ভিতর প্রবেশলাভের সাধ্য তাঁহার হয় নাই। তিনি অধ্যাত্ম সত্যের অন্বেষী, কিন্তু তিনি গুরুকরণ করেন নাই বলিয়া অধ্যাত্ম সত্য তাঁহার অনায়ত্ত থাকিয়া যাইতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ধনীর গৃহে লালিত-বর্জিত হইয়াছেন এবং তিনি আপন জমিদারীতে "আত্মবিস্তৃত" ভাবে তাঁহার প্রজাদের সঙ্গে মিশামিশি করিতে পারিয়াছেন কি না, এসকল ঘটনার সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যের বাস্তবচিহ্ন-অঙ্কনের কি যোগ আছে তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ যদি অসাধারণ চরিত্র বা মহাপুরুষের দাবী করিতেন, তবেই এসকল প্রশ্নের সার্থকতা ছিল। কারণ সেরূপ দাবীর ক্ষেত্রে, জীবনকেই বড় করিয়া দেখিতে হয়, তাহার লেশমাত্র অভাব-অসম্পূর্ণতা সেই দাবীকেই ধ্বংস করিয়া আনে। পূর্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের দাবী স্বতন্ত্র। শেক্সপীয়ারের গভীর নৈতিকদৃষ্টি, মিল্টনের আশ্চর্য্য কর্তব্যনিষ্ঠা, শেলির মানবপ্রেম ও মানবের দুঃখ দুর্দশা দূর করিবার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস—এসমস্তের জীবনহিসাবে মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু কাব্যহিসাবে কোন মূল্য নাই। কাব্যে যখন এইসকল গুণই কল্পনার সম্পদে ভূষিত হইয়া রসরূপ ধারণ করিয়া দেখা দেয়—কবির ভাবের সঙ্গে কবিতার প্রকাশের মধ্যমাখি যোগ হইয়া যায়, কোথাও বিচ্ছেদ আর থাকে না, তখনই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠতার উপর এই জন্ত কাব্যের শ্রেষ্ঠতার কিছু মাত্র

নির্ভব নাই। মিণ্টন কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া কবি নাও হইতে পারিতেন এবং কবি হইয়া কর্তব্যনিষ্ঠ নাও হইতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্বের কি ভ্রাসবুদ্ধি হইত তাহা তো দেখি ন। অবশ্য কবিতাব সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টন ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত যদি জীবনেবও মহত্ব কোটে, সে তো সোনার সোহাগা—কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে কবিত্বের বিচাবকালে জীবনের ঘটনার দিক্ হইতে বিচার কবা অত্যাশ। কবিত্বকে বসের আদর্শের দিক্ হইতে, তাহাব আপনার দিক্ হইতেই বিচাব কবিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ধনিসন্তান বলিয়াই যে কবি হইয়াছেন তাহা যেমন কোন মূঢ়ও বলিবে না, তেমনি কবি হইয়াছেন বলিয়া ধনের কোন বন্ধন তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিবে না এমন কি মানে আছে? লর্ড টেনিসনের আভিজাত্য ছিল না? তিনি আইল অব্ ওয়াইটেব “প্রাসাদকক্ষে বসিয়া কর্তব্যমর্দিত পিচ্ছল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়া” তাঁহাব Idylls, গ্রাম্যাগাথাগুলি লেখেন নাই? কিন্তু সেই কাবণেই কি কেহ তাঁহার চিত্রবাজিকে বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলিয়াছে? ব্রাউনিংকে তো কোনদিন উদরারের জন্ত চেষ্টা করিতে হয় নাই, তিনি তো দিব্য ফ্লোবেলসেব-ক্যাসাগিডির স্ববন্দ্য হর্ষো জীবন কাটায়াছিলেন, চিত্রকলাব লীলাক্ষেত্র ইতালীর প্রাকৃত সৌন্দর্যের মধ্যে দিনেব পর দিন যাপন করিয়াছিলেন, ক্যাসাগিডির দালান হইতে রাজপথে লোক চলাচল দেখিয়াছেন এবং Pippa Passes লিখিয়াছেন। তথাপি কোন বিজ্ঞ সমালোচক কি সেই জন্ত ব্রাউনিংয়ের চিত্রকে মারিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে? বরং অনেক স্থলদৃষ্টি সমালোচক তো সেই মহাকবিকে এ দোষও দিয়া থাকে যে বাস্তব জীবনের “ভালাটুকুই তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, মন্দটুকু পড়ে নাই”—তিনি সাধারণ হৃৎস্বারিত্রাসম জীবনের “মধুটুকুই আবাদন করিয়াছেন, তার তীক্ষ্ণ ছলটা গায়ে বিধে নাই”। তিনি বলিয়াছেন—“All's right with the world।” কিন্তু মন্দের অন্তরতব স্থানে ভাল’র মহিমাকে তিনি অমন নিঃসংশয়ে দেখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তো তিনি কবিসমাজে রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবশ্য বিপিন বাবু তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবেন তাহা জানি না।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার এ যেমন তাঁহাব এক অপবাধ, বাহার জন্ত তিনি বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিতে পারেন নাই শোনা গেল, তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে তিনি গুরুকবণ করেন নাই, ইহাও তাঁহার আর এক অপবাধ। তাঁহার “ঐকান্তিকী অন্তঃসুখীনতা” আছে বটে, কিন্তু তিনি অধ্যাত্মসত্যোপলব্ধিব জন্ত কেবল স্বামুভূতির উপবেই নির্ভর করিয়া থাকেন, শাস্ত্র এবং গুরুর বহিঃপ্রায়োগ্যর অপেক্ষা রাখেন না বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনাবেও বিপিন বাবু বস্তুতন্ত্রবিহীন বলিয়াছেন।

আমি এই দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এসকল কথা নিতান্তই অবাস্তব হইয়াছে। কেন হইয়াছে তাহা পবে বলিতেছি।

সত্য যে বাহির এবং ভিতর এই দুইকে লইয়া, স্তূত্যাং একদিকে যেমন স্বামুভূতি অবলম্বনে অধ্যাত্ম সত্যসকলকে আপনার ভিতর হইতে উপলব্ধি করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি শাস্ত্র ও ইতিহাসের প্রামাণ্য সংগ্রহ করিয়া নেই স্বামুভূতিকে তাহার উপব প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। শব্দব বাসামুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ এবং আধুনিক যুগের ধর্মসংস্কারক রামমোহন রায় এবং আংশিকভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন—স্বীকার করি। তবে গুরুগ্রহণ করাও যে শাস্ত্র-ইতিহাস আলোচনাব ভ্রায় তুল্য আবশ্যক, ইহা আমি মানিবার কোন কারণ খুজিয়া পাই না। কারণ ব্যক্তিগত অমুভূতিকেই যদি ভয় কর, তবে গুরুর অমুভূতিই বা সে ভয়কে দূর করিবার পক্ষে কি সাহায্য করে? গুরু কি অপ্রাস্ত? তিনিও তো একজন ব্যক্তিবিশেষ? না হয়, তিনি তোমা অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং তোমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিতে পারেন—তথাপি তাঁহাব হাতে আত্মসমর্পণ করিলেই কি একেবারে নিঃসংশয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?

শাস্ত্র বলিতে কোনো-একজন ব্যক্তির রচনা বুঝানো—তাহা অনেক ঋষির অনেক কালের সাধনালব্ধ ঈশ্বর-মু-প্রাপিত পবীকৃত প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম সত্যের সমষ্টি—তাহা এমন একটি অমুরস্ত ভাণ্ডার যেখান হইতে সকল

সাধককেই রসাকর্ষণ করিয়া আপনার পুষ্টি সংগ্রহ করিতে হইবে। এক এক দেশের এক এক সভ্যতার শাস্ত্র মানে সে দেশের race culture, যাহাকে না বুঝিয়া এবং না জানিয়া কোন ধর্মসংস্কারক শুদ্ধমাত্র ব্যক্তিগত ধেরালের উপর ও কল্পনার উপর কোন ধর্মমত স্থাপন কবিত্তে পারেন না, ইহা সত্য। কারণ ইতিহাসকে অস্বীকার করা, যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই জাতির সকল বিশিষ্টতাকে অস্বীকার করাও যা, আর যে-গাছে বসিয়াছি সেই গাছের মূলে কুঠারাঘাত করাও তাই। বিজ্ঞানেও কোন নূতন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার পূর্বে ঐ বিষয়ে কি কি সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, ও কি পন্থায় হইয়াছে তাহা সম্যক জানা চাই—বিধিব্যবস্থা প্রণয়নেও একান্ত নূতনত্বের স্থান নাই—ধর্মেরও নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে এসকল আলোচনা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ইহাদের সম্বন্ধে বেশ খাটে, কারণ ইহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্মকে গড়িয়াছেন, ইহারা ধর্মসংস্কারকের দলে পড়েন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তে তাহা নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন, ধর্মসংস্কারকও নহেন—তিনি আপনার কবিত্বের ভিতর হইতে যেটুকু অধ্যাত্ম প্রেরণা লাভ করেন তাহা কবির ভাষাতে কবির মতনই প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাকে কি খিয়লজির মত করিয়া কেহ পাঠ করে না আলোচনা করিয়া দেখিবার কল্পনা করে? তিনি যদি ব্রাহ্মধর্মপ্রবর্তক হইতেন বা নববিধান প্রচার করিতেন বা অল্প কোন ধর্মমত বা তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি করিতে বাইতেন, তবে যত ইচ্ছা তর্ক বিতর্ক করিয়া তাঁহার স্বাহুভূতিকে তাঁহার ঐকান্তিকী অন্তর্দৃষ্টতাকে, তাঁহার শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপর ভর না করিবার অপরাধকে (কিন্তু গুরুকরণ না করিবার অপরাধকে নয়) ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা বাইতে পারিত। অবশ্য ইহাও জানি যে স্বাহুভূতি যদি সত্য হয়, যদি তাহা উচ্ছৃঙ্খল আত্মপ্রতিষ্ঠার ছল মাত্র না হয়, তবে সে আপনিই আপনার শাস্ত্র হইয়া বসে, আপনিই আপনার প্রমাণ হয়—তাহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গভীরতাকে বাহিরের কোন মানদণ্ডই তখন নাগাল পাইয়া উঠে না। খৃষ্ট বুদ্ধ মোহম্মদ প্রভৃতি বড় বড় মহাপুরুষগণ

তার সাক্ষী। তাঁহারা যে তাঁহাদের রেন্-কালচারকে অর্থাৎ নিজ নিজ জাতির অধ্যাত্মজ্ঞানকে আত্মসাৎ করিয়া লন নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার জন্ত তাঁহাদিগকে ছাপার অক্ষরে লেখা বা মানুষের কাছে শোনা শাস্ত্র পাঠ করিতে হয় নাই। তাঁহারা যে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন—সে এই প্রত্যক্ষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাশাস্ত্র, যাহা অগ্নিপঙ্কজ আর বড় শাস্ত্র কোথাও নাই। ততখানি টাটকাটাটকি ভাবে সভ্যলোভ যাহাদের অদৃষ্টে ঘটে না, তাঁহাদিগকেই ব্যক্তিগত মতামতের উচ্ছৃঙ্খল অনিয়ন্ত্রতা হইতে বাঁচিবার জন্ত প্রাণপণে নানা শাস্ত্র নানা ইতিহাসের মধ্য দিয়া তিলে তিলে সত্যকে বাচাই করিয়া লইতে হয়—এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাই তত্ত্বজ্ঞানী, মহাপুরুষ নহেন।

যাহাই হউক ধর্মের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মতামতের আলোচনা হইতেই এতটা কথা আসিয়া পড়িল। আমি বলিলাম যে কোন একজন কবির কবিতা বা রচনা হইতে যে অধ্যাত্ম সত্যের আভাস পাওয়া যায় তাহাকে এইসকল তত্ত্বজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া, ইহাদিগকে যে ভাবে বিচার করিতে হয়—সেই ভাবেই বিচার করিতে যাওয়া একেবারেই নিবর্ধক। এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সাহিত্যকে সাহিত্যের দিক হইতে না দেখিয়া অন্তর্দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা করা বড় লেখক কতগুলি বার্থ কথার জাল সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, হাইটম্যান প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের মধ্যেও অধ্যাত্ম সত্যের অনেক আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, হিব্রুতে গ্রীকে বাইবেলের পাঠান্তরসকল ভুলনামূলক প্রণালীতে বাচাই করিয়া কোন্গুলি গ্রহণীয় কোন্গুলি বর্জনীয় তাঙ্গ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন কি না, কিম্বা কোন পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তির পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, কৈ এ পর্যন্ত তো সে দেশের কোন বড় সমালোচককে এ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

অথচ লেখক যে তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের বিভেদ অস্বীকার করেন এবং উভয়কে যে একই প্রণালীতে বিচার

করিতে হইবে এমন কথার বলেন তাহা তো বোধ হয় না।

কাব্যে আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন :—

“একত কবি তর্ক করেন না, বৃত্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা করেন না, কেবল আপনার অন্তঃকম্পে সত্য ও সৌন্দর্য দেখেন আর এইরূপে বাহ্য দেখেন, তাহাই ভাবের তুলিকার আঁকিবা লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিই কবির গ্রাণ। এইজন্ত ধর্মবিপ্লবের দ্রাব্য কবিও ত্রুটি। কিন্তু দার্শনিক নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিচারের জন্ত চারিদিক দেখা আবশ্যিক। শুদ্ধ অনুভূতির জন্ত এরূপ সম্যক দর্শন নিশ্চয়োজন। * * * বৈজ্ঞানিক যেকোন বস্তুতন্ত্রতা চাহেন, কবির সেবক বাস্তববস্তুতন্ত্রতার একান্তই প্রয়োজনাত্মক। বৈজ্ঞানিক বহির্গতীয় ও বিয়োগভিত্তিক। কবি অন্তর্গতীয় ও আত্মভিত্তিক। বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না পাইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের, আত্মানুভূতির প্রামাণ্যকেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্ত যথেষ্ট মনে করিয়া বাহিরের প্রামাণ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন।”

অর্থাৎ তাহা কিছুর পূর্বে লেখক লিখিতেছেন :—

“রবীন্দ্রনাথের অনেক দৃষ্টিই মার্কিক। উর্দানাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তত্ত্ব বাহির করিয়া অন্তত জাল বিস্তার করে রবীন্দ্রনাথও সেইকণ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও বসের তত্ত্ব-সকল বাহির করিয়া, আপনার অন্তত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন কতই বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, চরিত্রখানি বৃহদাকার উপজাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তবজীবনে কতই খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সম্ভব।”

আমি নিরপেক্ষ পাঠকবর্গকেই জিজ্ঞাসা করি এই পাশাপাশি উদ্ধৃত লেখাগুলি কি পরস্পরবিরুদ্ধ নয়? “কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন” এবং লেখক যুক্তিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তবে কেন সেই কারণেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ রচনাকে বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন? কবির সঙ্গে দার্শনিকের বৈজ্ঞানিকের কোথায় কতটুকু প্রভেদ তাহা নিজেই একরূপ স্থির কবিতা তারপব নিজেরই সিদ্ধান্তকে প্রয়োগের বেলায় লেখক কি বেমালাম অস্বীকার করিতেছেন না? বস্তুবিচ্ছিন্ন (abstract) ভাবে লেখক কবির স্বার্থ স্বরূপ ঠিক দেখিতে পান—কিন্তু বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ (concrete) কবির বেলাতেই তাঁহার স্বরূপ ভুল হইয়া যায়—ভাবে ও বাস্তবে এতটা গোলযোগ বস্তুতন্ত্রপোষক লেখকের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমি কোনমতেই মনে করিব না।

কিন্তু আমি হয়ত লেখকের ঠিক বক্তব্য কথাটি বুঝিতে পারি নাই। তিনি সাধারণ ভাবে কবির যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে হয়ত রবীন্দ্রনাথের স্বরূপের কোন বিভিন্নতা নাই। অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মানুভূতির দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে তাহাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপরসের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া এক আশ্চর্য্য কল্পলোক ও মায়ামুখী নির্মাণ করা,—ইহাই তো সাধারণত কবির স্বরূপ এবং খুব সম্ভব এ স্বরূপের বিচ্ছিন্নমানতা রবীন্দ্রনাথের আছে ইহা লেখক অস্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এ শ্রেণীর কাব্য মার্কিকই, কারণ—তাহা

“কানে মধু ঢালে, প্রাণে গিয়া সাড়া দেয়, বুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলে কিন্তু পাঠককে কতই কোন ছিব দিচ্ছো প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়।” “যেখানে কবি শুধু কবি নহেন, কিন্তু সাধকও, সাধনা বলে কবি যেখানে আত্মসাক্ষ্যকার লাভ করিয়া, সেই নিপুণ তত্ত্বের উপরেই আপনার কবিকল্পনাকে গড়িয়া তোলেন, সেখানে তাঁর প্রতিষ্ঠা এই মার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যায়, সেখানে কবি ধর্মিক লাভ করেন।”

সুতরাং মনে হইতেছে যে হয় তো না রবীন্দ্রনাথকে বিপ্লব বাবু শুধু কবিত্বের দিক দিয়া দেখিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার মধ্যে ধর্মিক আছে কিনা অর্থাৎ তিনি কল্পনার লীলাখেলা লইয়াই আছেন, না কোন সূক্ষ্ম সত্যকে কোন জীবনের তত্ত্বকে জীবনের ভিতর হইতে লাভ করিয়াছেন এবং সমস্ত কবিতার মর্মস্থলে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তিনি হয়ত অনুসন্ধান করিতেছেন।

আমি বলিয়া আসিলাম যে সাহিত্যকে যেমন জীবনের ভালমন্দের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখা অন্তায়, তেমনি তাহার ভিতরে কোন জীবনের তত্ত্ব পাওয়া যায় কিনা এবং না পাইলেই যে সাহিত্য মাটা হইয়া গেল এমন মনে করিবারও কোনই হেতু নাই। সাহিত্যে ভাব এক প্রকাশ এমন অব্যবহিত ভাবে এক হইয়া মিলিয়া থাকে যে দর্শনে যেমন আমরা ভাবকে স্বতন্ত্র করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি, সাহিত্যে তাহা পারিই না—তাঁর প্রকাশ ভিন্ন সেখানে ভাবের কোন সত্যই নাই। তত্ত্বকে স্বতন্ত্র কবিতা দেখিতে যাওয়াই সাহিত্যের পক্ষে প্রাণনাশক ব্যাপার। অবশ্য আমি এ কথা খুবই মানি যে বড় কনি মাত্রেরই জীবনের ভিতরকার একটি তত্ত্ব থাকে, ইংরাজীতে বাহাকে বলে Philosophy of life এবং সে তত্ত্বটি কি,

তাঁহা একবার ধরিতে পারিলে কবির সমস্ত কাব্য তাঁহার সমস্ত বিচিত্রতা লইয়া একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে ধরা দেয়। তাঁহার অভাবে কবির নানা বয়সের নানা ভাবের ও রসের বিচিত্র রচনার মধ্যে অনেক সময় ঐক্য পাওয়া যায় না। তথাপি ইহা মনে করা ভুল যে এই জীবনের তত্ত্বকে কবি কোথাও সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া যান। তাঁহা কেমন করিয়া তিনি বাইবেন,—তিনি তো তত্ত্বকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারেনই না, তাঁহা যে জীবনের জিনিস এবং জীবনের সঙ্গে একেবারে মেশানো। যেমন, জীবন জিনিসটাকেই কি আমরা শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি? সুতরাং কবির সকল সময়ের সকল কাব্যে একই তত্ত্বের নানা আভাস ইঙ্গিত নিশ্চয়ই আমরা পাইব এবং তাঁহার সমস্ত রচনাকে সেই তত্ত্বের দ্বারা ওতপ্রোত করিয়া আত্মদৃষ্টিগকে দেখিতে হইবে যেমন আমরা শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ভাগবিভাগকে এক অখণ্ড শরীর করিয়া দেখি।

ব্রাউনিং বল, পায়টে বল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বল, সকলেরি মধ্যে এই একটি জীবনের তত্ত্ব অন্তর্নিহিত ভাবে তাঁহাদের সকল বয়সের সকল রচনার তলে তলে জাগিয়া রহিয়াছে। এখানে সে আলোচনার স্থান নহে এবং প্রয়োজনাত্মক। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এইরূপ একটি জীবনের তত্ত্ব আছে, আর সেই জন্তই তাঁহার কবিতাকে কেবল কণিক আশ্রয়িত অল্পভূতির প্রকাশমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। যিনি তাঁহার সমস্ত কবিতা আগাগোড়া পাঠ করিয়াছেন, এবং তাঁহার জীবনের সকল বাহিরের আপাতঃ-বিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যেক অবস্থার ভাবের দিক্ হইতে একটি গভীরতর যোগ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই এ কথাই সাক্ষ্য দিবেন। আমি আমার “রবীন্দ্রনাথ” (গত বৎসরের প্রবাসী—আবাহা ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধে সেই জীবনের তত্ত্বটি

* এখানে পাছে কেহ ভুল বুঝেন এই জন্ত বলিয়া রাখি যে কবির আলোচনার আমরা জীবন বলিতে কি বুঝি তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জীবন মানে এখানে বাহিরের বাস্তব জীবন নয়, কিন্তু নিপুচ ভাবজীবন। সাহিত্যকে যে আমরা বাহিরের বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্ব মনে করি তাহা প্রবন্ধান্তে বলিয়াছি।

কবির সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া অনুসরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি—এখানে আবাহ সেই কাজে প্রবৃত্ত হইলে ততবড়ই একটি প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইবে। আমি বলিয়াছি তাঁহার কাব্যের ভিতরকার কথাটি হইতেছে সর্কানুভূতি বা বিশ্ববোধ—অর্থাৎ তিনি ধর্মের মধ্যে অখণ্ডকে, রূপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করিবার একটি আশ্চর্য স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধর্মতা অর্থাৎ বাহ্যকে আমরা বলি বাস্তব তাহাকে খুনি মানেন এবং তাঁহার সমস্ত স্বাদ ও সমস্ত অভিজ্ঞতা না লাভ করিয়া ক্ষান্ত হন না। কিন্তু তিনি সেই খানেই দাঁড়ি টানেন না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেখানে তাঁহার সত্যতা, তাঁহার অখণ্ডতা, সেইখানে গিয়া পৌছায়। সৌন্দর্য বল, প্রেম বল, স্বাদেশিকতা বল, তাঁহার অনুভূতি সর্বত্রই অতি প্রবল; কিন্তু সেই প্রবলতাই তাঁহার সত্য নয়। সত্য—যখন সেইসকল খণ্ড আবেগকে তিনি অখণ্ড বিশ্বানুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া লভ্য করিয়া দেখিতে পান তখনই। তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্যবিলাস ছবি ও গানে, কড়ি ও কোমলে, চিত্রাঙ্গদায় কি আবেগতীব্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ফুটিয়াছে, কিন্তু সেই দীপ্তজ্বালাময় প্রকাশের মধ্যেই যে তাঁহার সত্য তা নয়। সত্য—যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে সমস্ত বিধে ব্যাপ্ত করিয়া বড় করিয়া দেখিতেছেন, যখন বলিতেছেন—

“যে এদীপ আলো দেবে তাহে কেবল শাস
যারে ভালবাস তায়ে করিছ বিনাশ।”

যখন বলিতেছেন—

“সাতকের কাছে প্রথমেতে জাতি আসে
মনোহর মায়াকারা ধরি, তাব পরে
সত্য দেখা দেয়, ভুবনবিহীন রূপে
আলো করি জ্বলন্ত বাহির।”

তেমনি তাঁর প্রেমের কবিতায়, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেম কেবল ব্যক্তিগত ভোগের, গভীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—সমস্ত সৌন্দর্য সমস্ত কল্যাণে নুনা বিচিত্রভাবে আপনাকে সার্থক করিতেছে না,—ততক্ষণ পর্যন্ত কি তীব্র বেদনা। কারণ “আকাজ্জকর ধন নহে আত্মা মানবের।” কারণ “জাতি যে অপরাধী”—

“এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই ফুটেছে সঙ্গতবে
নির্দোষহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।”

একবার সেই আঁখিব জগৎ সেই বাসনার জগৎ বিলুপ্ত
হইলে, তাবপর যে নূতন জগৎ জাগিবে—

“সে নব জগতে কালশ্রোত নাই, পরিবর্তন নাই,
আমি এই দিন অনন্ত হ’বে চিরদিন রবে চাহি।”

“মানসী” পর্যন্ত এই যে তত্ত্বের আভাস, যে, সমস্ত ঋণ
অনুভূতিকে একটি অখণ্ড বিশ্বানুভূতির মধ্যে পবিপূর্ণরূপে
পর্যবসিত না কবা পর্যন্ত ইত্যাদের আপমাদেব কোন
পরিভূক্তি নাই, কোন সত্যতা নাই—সেই তত্ত্বই “সোনার-
তরী” “চিত্রা” ও “চৈতালী”তে পরিশুষ্ক আকার প্রাপ্ত
হইয়াছে। দেউল, আকাশের চাঁদ, পবন-পাখর, বৈষ্ণব
কবিতা, স্বর্গ হইতে বিদায়, এসকল কবিতা কল্পনার গড়া
মায়ালোক হইতে বাস্তববিশ্বলোকে প্রত্যাবর্তন করিবারই
কথা সত্যেরে ঘোষণা করিয়াছে। বিপিন বাবু কি এই-
সকল কবিতাকেও বস্তুতন্ত্রতাবীন ও মানসিক বলিতে চান?
বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইল এইসকল কবিতার চেয়ে
অধিক বস্তুতন্ত্র, কাব্য ঠাহার মোহান্তগুরু মানিতেন কিন্তু
এ কথা লেখক একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে বৈষ্ণব
কবির

“সে শীত-ঔৎসব মাঝে

শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে।”

কারণ—

“শুধু বৈষ্ণবের তরে বৈষ্ণবের গান।

* * *
সে সঙ্গীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নবনারীদের
প্রতি রক্তবীষ আর প্রতি দিবসের
‘ভক্ত প্রেমভা’।”

“রবীন্দ্রনাথের কবিতা কচিং বস্তুতন্ত্র হইয়াছে” এ
মত বিপিন বাবু কেমন করিয়া সমর্থন কবিতে পারেন
তাহা তো আমি ভাবিয়া পাই না। এ একেবারে বহিঃ-
প্রামাণ্যহীন শুদ্ধ স্বানুভূতির উক্তি। যেখানে ক্রমাগতই
কবি ভাবগত (subjective) অনুভূতিকে অবিসংসার করিয়া
বস্তুগত বিশ্বসত্যকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, মানবপ্রপঞ্চে,
মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে কল্যাণকর সর্বক দিয়া জাগাইয়া
তুলিতেছেন—যেখানে বারম্বার বাস্তবব্রহ্ম দেখকে ভৎসনা
করিয়া বলিতেছেন:—

“লক্ষ কোটি জীব ল’য়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।”

এই কথাই সজোরে বলিতেছেন:—

“চাহিনা হিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ভোর
লক্ষ কোটি প্রাণী মনে এক গতি মোর।

সেখানে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কি কবিয়া হয় যে “বীন্দ্র-
নাথের কবিতা কচিং বস্তুতন্ত্র হইয়াছে” এবং “বাংলা-
র পল্লীজীবন এবং বাঙালীর সাজা প্রাণটা চিবদিনই বীন্দ্র-
নাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে”?

বাংলার পল্লীজীবন কবিতায়, গল্পে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে
এত প্রচুর রকমে, এত অনায়াসে ফুটিতে আর কে
আঁকিয়াছেন আরি তো তাহা জানি না। কবিতাতে—
“চিত্রা”র পুরাতন ভূত্যা, হুইবিষা জমি, “চৈতালী”তে
মধ্যাহ্ন, দিদি, পরিচর, পুঁচু প্রভৃতি কবিতা—বাংলা-
পল্লীজীবনের ও পল্লীপ্রকৃতির সাজা প্রাণের চিত্র নব?
সমস্ত “কণিকা” কাব্যখানি সোনার ছন্দের স্বেচ্ছা বাধানো
বাংলার পল্লীচিত্রমালা বই আর কি বলিব? গল্পে—
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে রাইচরণ ভূত্যের চিত্র; পোষ্ট-
মাস্টার গল্পে রতনমণির চিত্র; ছুটি গল্পের সেই ফাকি
ছেলেটির চিত্র; দানপ্রতিদানে রাধামুকুন্দের বিশ্বাস-
ঘাতকতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা শশিভূষণের নীরব ক্রমার সেই কল্প
গল্পটি; অতিথি—যে গল্পটিতে তারাপদ’র চিত্রে বাংলার
গ্রাম্যপ্রকৃতিকেই মানবরূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র; শান্তি গল্পে
অতি নিম্ন পল্লীজীবনের চিত্র; দৃষ্টিদানে, সমাপ্তিতে বাঙালী
পল্লীজীবন চিত্র—কত নাম করিব! সমস্ত গল্পগুচ্ছটিকে
গল্পগুচ্ছ নাম না দিয়া বাংলার পল্লীচিত্রমালা নাম দিলেও
কোন ক্ষতি ছিল না। বাংলাব যথার্থ পল্লীচিত্র, পল্লী-
জীবনের যথার্থ মাহুকের অর্থ হৃদয়ের এমন করুণ-নিশুণ
অঙ্কনে আর কে এমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন
জিজ্ঞাসা করি? বাঙালীকে তাহার আপন দেশের এমন
ঘরের খবর এমন বুকের খবর আব কোন্ কবি বোন্
গল্পলেখক দিয়াছেন? এসকল গল্প যদি বাস্তবচিত্র না
হয়, তবে বাস্তবচিত্র কোথায় আছে তাহা বিপিন বাবু
অনুগ্রহ পূর্বক বাঙালী পাঠকসমাজকে দেখাইয়া দিলে
স্বীকার হইব।

তবে লেখক বলিবেন যে এসকল চিত্রে “দারিদ্র্যের

মধুটুকুই আমরা আশ্বাসন করিয়া থাকি, তার ভীষণ হলটা গায়ে বিঁধে না।” তা সত্য। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ব্রাউনিংয়ের ভাবুকতা সম্বন্ধে অনেক স্থলদৃষ্টি সমালোচক ঐ একই কথা বলিয়া থাকে যে তিনি পাণের চিত্রের ভালটুকুই দেখান, মন্দটুকু দেখান না এবং সে জন্য তিনি পাপকে অনেক জারিগার প্রদান দেন। অর্থাৎ ইহাদের অভিযোগ এই যে ব্রাউনিং কেন এমিলি জোলা নন বা হেনরিক্‌ ইব্‌সেন নন। তিনি কেন The Ghosts না লিখিয়া Pippa Passes লিখিয়াছেন। অবশ্য এহেন সমালোচনার জবাব আমি প্রবন্ধারম্ভেই দিয়াছি যে সাহিত্য আর সংসার উভয়ের প্রকাশ একই ভাবের হইতে পারে না—সংসারের বাস্তবিকতা সাহিত্যে নাই, সাহিত্যের ভাবসম্পূর্ণতা সংসারে নাই। Pippa Passes কিছু সংসারে ঘটে না। Ottimaর জ্ঞান বাস্তবচরিত্রী ও Sebaldএর জ্ঞান সেই পাণে তাহার সাহায্যকারী সংসারে ঘণ্টে আছে এবং অটিমার সাহায্যে সিবাল্ড তাহার স্বামীকে বৈরুপে হত্যা করিয়াছিল তাহাও ধবরের কাগজ ঘাঁটিলে প্রায়ই পড়া যাইতে পারে। কিন্তু যে বিশেষ একটি মানস অবস্থার ব্রাউনিং তাহাদিগকে ফেলিয়াছেন সে অবস্থা তো—সংসারে এসকল লোকের ভাগ্যে ঘটেনা। দারুণ অজ্ঞারের জন্য যখন ভিতরে ভিতরে তাহাবা পবম্পর হইতে পবম্পর ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং তাহা বহিরা অটিমা আপনার সৌন্দর্যের কুহকজাল সিবাল্ডের উপর বিস্তার করিবার ব্যর্থ চেষ্টা পাইতেছে ঠিক সেই সময় পিপার গান—

God's in His Heaven
All's right with the world!

বজ্রের মত তাহাদের কানে আসিয়া পড়িল এবং উভয়েই মোহের ঘুম হইতে উখিত হইয়া দেখিল যে কি মিথ্যার উপর তাহারা মিলিবার প্রয়াসী।—এমনটি ঘটনা তো সংসারে ঘটেনা। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে অসম্ভব ও মারিক বলিবার কোন হেতু নাই। “ঘটে বা তা সব সত্য নহে।” সুতরাং প্রত্যক্ষ সংসারে যে হলটুকুই পাওয়া যায়, সাহিত্যে সে হলটুকুই ঢাকা পড়ু এবং দেখান হয় যে হল আছে বটে কিন্তু মধুটাই আসল।

সাহিত্যে যদি সেই সম্পূর্ণতার আদর্শ না থাকিত, তবে সংসার তাহাকে এত আদর করিত না।

বাংলাদেশের যে চিত্রটুকু বিপিনবাবুর কয়েক ছত্রে পাওয়া গিয়াছে, রবিবাবু যদি তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেই চিত্রসহায়ে গল্পগুচ্ছ ও কবিতা বচনা করিতেন তবে বাংলাদেশকে এমন সত্য করিয়া চিনিতে ও ভালবাসিতে বাঙালীর ছেলে আজ পারিত কিনা সন্দেহ! বিপিনবাবু লিখিতেছেন—

“এমোরোসাস হইতে বল্লনার দুবীক্ষণ সহাবে, দুরহিত পর্ণ-কুটীরে অনাবিল প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ জাগিয়া উঠে, সেই পর্ণকুটীরের জীর্ণকঙ্কার কীটাপুলীনা ও শীর্ণদেহ, শীর্ণপ্রাণ কুটীর-বাসীদিগের কলহকোলাহল প্রত্যক্ষ কবিলে আর সে আনন্দটুকু থাকে না।”

বাঙালী পাঠক-মাত্রেই জানেন যে এ চিত্রও রবিবাবুর মধ্যে প্রচুর আছে কিন্তু কি ভাগ্য যে রবিবাবু কেবল এই চিত্রই আঁকিয়া আমাদের গায়ে ছল কুটাইয়া দেন নাই! “সমাপ্তি” গল্পে যখন ষ্টিমার কোম্পানীর কেরানী জিশানচন্দ্র তাহাব একমাত্র কঙ্কার বিবাহ উপলক্ষ্যে ছুটি প্রার্থনা করিয়া ছুটি পায় নাই এবং “টিনেব ঘরে একখানি ময়লা চোকা কাচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোট ডেস্কের উপর একখানি চামড়ার বাঁধা মন্তপাতা রাখিয়া” অনাবৃত দেহে টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিল, সে সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার কঙ্কা ও জামাতা সেই আফিসে আসিয়া উপস্থিত। সে কি চমৎকার আনন্দ-সম্মিলনের চিত্র! একদিকে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি নিরানন্দময় থাটুনিতে সেই বৃদ্ধ নিমুক্ত, অথচ অন্তরিকে সে স্নেহময় পিতা, তাহার হৃদয় বাৎসল্যের রসে ছলছল করিতেছে! যদি তাহার সেই একদিকটাই দেখান হইত, তবে হলই ফুটিত—কিন্তু অল্প দিকটা দেখিতে পাওয়া গেল বলিয়া সমস্ত দাবিদ্রোর উপরেও কি একটি মধুর-গভীর আলো পড়িল বাহাতে সেই বৃদ্ধটি এক নিমেষেই আমাদের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লইল! “কাবুলিগুয়ালা” গল্পটিতেও একটা করেদখাটা খুনী যে একজারিগার কতখানি মেহপ্রেমের অধিকারী সেটুকু কি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখান হইয়াছে—তাহাকে খুনী করিয়া রাখিলেই কি কাহিনীটি খুব বড়তর হইত?

কেবল দৃষ্টান্তের উপর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। বিপিন বাবুর সমস্ত আলোচনাটি যে কোন উচ্চ মনের সাহিত্য সম্বন্ধে খাটেনা, আমি তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কবিলাম।

বিপিনবাবু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিকেই শুধু বস্তুতন্ত্র-বিহীন বলিয়া ক্লোন্ত হন নাই,—অবশেষে লিখিয়াছেন—

“যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মাঝার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজসংস্কারের প্রভাব, ও ধর্মের শিক্ষাও বহু পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহাবই উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মাঝার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনিই মিলাইয়া গিয়াছে। * * * আর আজ তিনি যে এক বিশাল “বিশ্বমানব” কল্পনা করিয়া তাহারই উদ্যোগে প্রেমে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,—তাহারও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষণেও নব, আগসেও নব—কিন্তু তাঁর আলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটনঘটন-পটীকী মায়াশক্তিতে।”

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা মারিক ইহা খুবই স্বীকার কবি—কারণ, তিনিই সর্বপ্রথমে আত্মশক্তির মন্ত্র প্রচাৰ করিয়াছিলেন কিনা এবং তারপর তাহারই বাক্যের প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে দেশের কর্ণ বিভ্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এবং ইহাও সত্য যে তিনি কোন দিন অটনমি বা কলোনিয়ল সেলফগবর্নমেন্ট নামক অপূর্ণ বস্তুতন্ত্রতাকে ভাল করিয়া ধবিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশী সমাজ হইতে আজ পর্যন্ত বাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহা এই যে, সমাজের ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের মঙ্গল করিবার একটা বৃহৎ ক্ষেত্র রহিয়াছে, সেখানে অল্প বস্ত্র শিক্ষা ধর্ম সমস্ত যোগাইবার ভার আমাদেরই হইতে হইবে, দেশের মধ্যে বাহাতে ব্যূহবদ্ধ হইয়া কর্ম করিবার শক্তি এবং অল্পতান প্রতিষ্ঠানাদি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে, তন্ত্রস্ত আমাদের সকলকেই কোমর বাধিয়া লাগিতে হইবে। তিনি নিজের শিক্ষার জন্য সংসামান্য একটু আয়োজন করিয়াছেন এবং একাদশ বৎসব পর্যন্ত তাহার জন্ত নিজের শ্রম, অর্থ, ও অমূল্য সময় সমস্ত উৎসর্গ করিয়া, সকল বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া তাহাকে সফলতার দিকে তিলে তিলে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছেন এবং সামান্য একটা কাজকেও এ দেশে সফল করিয়া তোলা যে কি মুকটিনব্যাপার তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। স্ততরাং তাহার দেশচর্যাকে বস্তুতন্ত্রতা বিহীন ভিন্ন আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে ?

সত্য কথা বলিতে কি, বস্তুতন্ত্রসম্পন্ন প্রকৃত দেশচর্যা যে কি পদার্থ তাহা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে একদল লোকের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। আমার ভাষার উঁহাদেঃ পরিচয় না দিয়া বস্তুতন্ত্রবিহীন রবীন্দ্রের ভাষাতেই দিলামঃ—

“যাহাব সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অমুসরণের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমাগত অশান্ত হইয়া, যাহারা উচ্চ সংস্কৃতি বহুদিনের ধৈর্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেক দিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্যক্ষেত্র হইতে দূর্তাগ্রকমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অমুসরণে স্বার্থভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা হঠাৎ বিধম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না। ঠাণ্ডা দিনে নৌকার কাছেও বেঁসিলাম না, তুফানের দিনে তাড়তাতি হাল ধরিয়া আসামান্য মাঝি বলিয়া দেশ বিশেষ বাহবা লইবে এইকণ আশ্রয় ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদেরকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই সূচ্য করিতে হইবে। তত্বাভে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

* * * * *
“আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে স্খোভে কেবলি বাড়াইবা চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার দাবকতা আমর সম্মতি বহন অমুভব কবিলাম তখন কেবলি সেটাকে বাড়াইবা তুলিবার জন্ত আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ সে একটা নেশাব তাড়না সে কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ার ভাবের উত্তেজনাবই দরকার বেশি; সেটা রীতিমত পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—ততএব মিনরাত যাহারা কাজ কাজ কবিয়া বিরক্ত কবিতেনে, তাহারা ছোট নক্ষরের লোক—তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলি ভাবে বেশবে মাতাইব। * * * চেষ্টা নহে, কর্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।”

এইবার “বিশ্বমানব” সম্বন্ধে ছুটি একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ আজিকার মত সমাপ্ত করিব।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যজীবনের ভিতরকার তত্ত্বই আমরা দেখিলাম এই যে ববাবরই তিনি খণ্ড অমুভূতিকে বিশ্বাসভূতির দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন, আপনাব অবস্থাকে আপনি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার স্বাদেশিক অমুভূতির বেলাতেও সেই একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্বদেশকে তিনি স্বদেশেবই মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই, তাহাব মধ্যে বিশ্বমানবের প্রকাশকে দেখিয়াছেন। শুধু নিজের দেশকেই নহে, তিনি কোন দেশকেই বিশ্বমানব হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখেন না, তাহারই অঙ্গ বলিয়া জানেন। বিশ্বমানবকেই দান করিবার, তাহাবি চিরাট অভিপ্রায়কে বহন করিবার ও সফল করিবার জন্ত নানা-

দেশের নানা উদ্ভাবনীশক্তি লাগিয়া আছে। ভাবভবন
সম্বন্ধে তাঁহাব বড় চুপ এই যে “এখানে আমাদের জ্ঞান
কর্ম আমাদের সর্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড় বড়
রাজপথ এক একটা ছোট মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া থম্বিত
হইয়া গিয়াছে। আমাদের জন্ম ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের
নিজের ঘর, নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।
তাহা বিশ্বমানবের অভিযুগে আপনাকে উদ্ঘাটিত করিয়া
দিবার অবসর পায় নাই।” কিন্তু এই অবস্থাতেই ভারতবর্ষ
ঠেকিয়া থাকিবে ইহাও তিনি কোন দিনই বিশ্বাস করেন
না। তাঁহার জীব বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে যে এত বিভিন্ন
জাতি এত আচার আচরণ ভাষা ধর্ম প্রভৃতির বৈষম্য লইয়া
উপস্থিত হইয়াছে ইহা একটি লক্ষণ—কিসের?—না,
বিশ্বমানবের প্রকাণ্ড একটি সমস্তার মীমাংসা যে এখানেই
হইবে, ইহা তাহারই লক্ষণ। এই ভারতবর্ষে সকল পার্থক্য
বিলুপ্ত বা নির্কাসিত হইবেনা কিন্তু মিলিবে।

এইখানেই আমার প্রবন্ধ শেষ করি। আমি
অনেকক্ষণ আমার পাঠকদিগের সময় ও ধৈর্যের উপরে
অত্যাচার করিলাম—তাঁহাদিগের নিকট সে ক্ষমার্জন্য
চাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কার্য সম্বন্ধে আমাদের
পরিকার ধারণা থাকা আবশ্যক বিবেচনাতেই এই প্রতিবাদ
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং প্রবন্ধের কলেবরও এত দীর্ঘ
করিতে বাধ্য হইয়াছি। যিনি আমাদের দেশের গৌরবস্থল
এবং হাঁহাব নিকট দেশ এখনও অনেক আশা করিতে
পারে, তাঁহাকে ভুল বুঝিলে আমরা আপনাদিগকেই নানা
বিষয়ে বঞ্চিত করিব, ইহাই আমার আশঙ্কা।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী।

জৈন কবিতা

চৈতন্য-বন্দনা।

সর্বশুদ্ধবর্ষী মেঘ, সনাতন মঙ্গল-বল্লরী,
অর্থী জনে কল্লতরু, সংসার-সাগর-জলে তরী,
পাপ-অঙ্ককার নাশি যেই ভাস্কর করেন প্রভাত
শ্রেয়ের নিদান তিনি, শাস্তিদাতা জিন শাস্তিনাথ।

ধূপারতি।

আগুন দহিছে ধূপের শবীর
সৌরভ তায় উঠে,
আরতি পূজায় লাগিয়া ধূপের
করম-বন্ধ টুটে।
ধূপের মতন নিজ দেহ মন
করিতে যে জন পারে,
প্রভু-আগে সেই পায় বহুমান
অস্তে অমরাগারে।

নমস্কার।

যত কিছু আছে তীর্থ পাবন
মর্ত্যে, পাতালে, স্বর্গদেশে,
যত আছে জিন-বিষ জগতে
আমি সবে নমি নির্কিশেষে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান।

পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” নামক গ্রন্থের
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ২০ বৎসর পূর্বে এই পুস্তক প্রথম
প্রকাশিত হইয়াছিল। এসিদ্ধ দার্শনিক সীতানাথ বাবুর গ্রন্থের এই
অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থের
পাঠকসংখ্যা প্রচুর নহে।

প্রথম সংস্করণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পাঠ করিয়া আমার মনে যেসকল
সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ
করিয়াও সেইসকল সন্দেহই রহিয়া গিয়াছে, তাই এই প্রবন্ধটি
লিখিতেছি।

আমার সন্দেহভঞ্নের জন্য আমি সীতানাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ
ভাবে আলাপ করিতে পারিতাম কিন্তু তাহাতে আমার মতন আরও
যেসকল লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহাদের সন্দেহভঞ্নের উপায়
থাকিত না, সেসকল লোকের সংখ্যাও অপ্রচুর নহে, এই জন্যই প্রকাত-
ভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সীতানাথ বাবু যদি প্রকাত-
ভাবে সন্দেহভঞ্জন করেন তবে অনেকের সংশয় দূর হইবে। আমি
আশা করি সীতানাথ বাবুর দ্বারা একজন সাধনশীল দার্শনিক পণ্ডিত
আমার এই আলোচনায় বিরক্ত হইবেন না।

একটি তত্ত্বের উপর তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের ভিত্তি
স্থাপন করিয়াছেন, যদি সেই তত্ত্বটি মিথ্যা হয় তবে তাঁহার ব্রহ্মনিরূপণ,
ব্রহ্মজ্ঞান ও তাঁহার প্রবর্তিত সাধন-প্রণালী সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।
সে তত্ত্বটি এই, “বিষয়জ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না এবং

আত্মজ্ঞান ভিন্ন বিষয়জ্ঞান থাকিতে পারে না।” “বিষয়জ্ঞান অবলম্বন না করিয়া আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না” এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তত্ত্বত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন “যদি কোন পাঠক বলেন আমি কোনও বিশেষ সময়ে কেবল আপনাকে জানিবাছি, অল্প কোনও বিষয়ে জানি নাই” তবে আমরা বলি এ কথার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ অবশ্য স্মৃতি। পাঠকের স্মরণ হইতেছে যে সেই সময় তিনি কেবল আপনাকেই জানিতেন আর কোন বিষয়কে জানেন নাই, তবেই হইল যে তাঁহার তখনকার সমস্ত জ্ঞানটুকু এই ছিল, “আমি কেবল আপনাকে জানিতেছি—আব কিছু জানিতেছি না। * * * এই জ্ঞান যে নিরবচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান নহে, ইহার মধ্যে যে একটা স্পষ্ট বিষয়-জ্ঞান রহিয়াছে, তাহাও সহজেই দেখা যাইতেছে।” সে বিষয়টি—আত্মার অতিরিক্ত অল্প বস্তু অর্থাৎ বোধ।”*

আমার বক্তব্য এই যে লেখক ধ্যানীর নিকট হইতে আপন ইচ্ছামত উত্তর বাহির করিয়াছেন। ধ্যানী এই উত্তর করিতে পারেন যে, যদি তাঁহার ধ্যানকালে বিষয়জ্ঞান ছিল, তবে তাহা ত তাঁহার মনেই থাকিত, যখন আত্মজ্ঞানের কথা মনে আছে এবং অল্প জ্ঞানের কথা মনে নাই তখন কিরূপে বলা যায় যে তাঁহার বিষয়জ্ঞান ছিল? বস্তুত তখন তাঁহার বিষয়জ্ঞান বা বিষয়ের অভাবজ্ঞানও ছিল না, থাকিলে এখন তাঁহার উহা মনে থাকিত। নির্বিকল্প সমাধিকালে আত্মার কিরূপ অবস্থা হয় তাহা অন্তর্কে বুঝান যায় না, তাই বলিয়া অল্প লোকের একথা বলিবার কি অধিকার আছে যে সমাধিস্তম্ভে বাহ্য ধ্যানীর মনে নাই তাহাও নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে ছিল?

“পঞ্চদশীতে” একটা অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে বলা,—যদি কোনো ব্যক্তি নিজা হইতে জ্ঞানিয়া বলে যে সে অতিশয় স্বখে নিজা গিয়াছিল, তখন বৃত্তিতে হইবে যে সে ব্যক্তি নিজাকালে স্বখ অনুভব করিয়াছিল, নতুবা এখন তাহার সে স্বখের স্মৃতি কোথা হইতে আসিল? এ দৃষ্টান্তটি নিশ্চয়, কেননা যদি কোনো ব্যক্তি নিজাকালে স্বখভূষণ সন্তোষ করে তবে সেই স্বখভূষণ তাহাকে সন্তোষকালের স্মৃতির সাহায্যে প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু যদি কিছু সন্তোষ না করিয়া থাকে সে বিষয়ের প্রমাণের জন্য গত-স্মৃতির সাহায্য অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না, বর্তমান কালের স্মৃতিই স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে সে কিছু সন্তোষ করে নাই, সন্তোষ করিলে ত তাহার মনেই থাকিত। যদি কোন পাঠক বলেন যে তিনি বেহঁস হইয়া ঘুমািয়া ছিলেন, নিজাকালে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, তাহাতে সীতানাথ বাবু যদি বলেন যে তুমি স্মৃতি হইতে একথা বলিতেছ, তবে বলিতে হইবে যে তাহার অজ্ঞান অবস্থারও জ্ঞান ছিল। ইহা একান্তই অবিরোধী। মনে করুন একজন চিকিৎসক তাঁহার রোগীকে ক্রোরোকরম করিয়া তাহার একখানি পা কাটিয়া কেলিয়াছেন, জ্ঞান লাভ করিয়া সে ব্যক্তি যদি বলে যে তাহার পা কাটার সময় সে অজ্ঞান হইয়াছিল, তবে কি বলিতে হইবে যে সে যখন অজ্ঞান হইয়াছিল তখন তাহার এই জ্ঞান ছিল যে সে অজ্ঞান হইয়া আছে, নতুবা এখন সে কোথা হইতে এ জ্ঞান পাইল যে সে অজ্ঞান হইয়া ছিল? বস্তুত কিছু একটা সন্তোষ করিলেই তাহা পূর্বস্মৃতির সাহায্যে টানিয়া আনিতে হয়; বাহ্য আদৌ সন্তোষ করা হয় নাই, অনুভব করা হয় নাই, বাহ্য অস্তিত্ব নাই পূর্বস্মৃতি তাহা কোথায় পাইবে?

ধ্যানী ব্যক্তি কেবল আত্মজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিষয়-জ্ঞান কি বিষয়ের অভাব-জ্ঞানও তখন তাঁহার থাকে না। সীতানাথ বাবুর লেখা পড়িয়া মনে হয় তাঁহার মনের মধ্যে জ্ঞান এইরূপ একটা ভাব আছে যে ধ্যানী ব্যক্তি যখন আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন হন তখন “আর কিছু দেখি না

আর কিছু দেখি না” এইরূপ একটা জ্ঞানও তাঁহার মধ্যে থাকে অর্থাৎ তাঁহার মনটা তখন বড়ির পাণ্ডুলেখের মতন একবার আত্মজ্ঞানের দিকে ও একবার অভাবাত্মক বিষয়-জ্ঞানের দিকে ছলিতে থাকে। অনেক উচ্চ সাধকেরও যে এরূপ অবস্থা ঘটয়া থাকে তাহা আমি অন্বীকার করি না কিন্তু এরূপ বাঁহার চিন্তেব গতি তাঁহার কখনই বিগত হয় না। বাঁহার চিন্তা আত্মজ্ঞানেই মগ্ন অগ্ন্যব্রহ্মাণ্ড আছে কিনা আছে এ চিন্তা তাঁহার মনে আসেনা। এ বিষয়ে সমাধিস্থ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যই বিশিষ্ট প্রমাণ, যুক্তি তর্ক এখানে ব্যর্থ। সীতানাথ বাবু যে যুক্তি দিয়াছেন তদ্বারা ইহা মোটেই প্রমাণিত হয় নাই যে, আত্মজ্ঞান বিষয়-জ্ঞান ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এতদ্বারা বাহ্য বলা হইল তাহার সন্ধিপ্তসার এই যে,—

সীতানাথ বাবু বলিতেছেন যে তুমি যে বলিতেছ শুধু আত্মজ্ঞানে ডুবিয়া ছিলে, তোমার অন্য কোনো বিষয়-জ্ঞান হিংনা, একথা সত্য নহে, কেননা তুমি তোমার স্মৃতি হইতে যখন একথা বলিতেছ, তখন তোমার অন্ততঃ অন্য বিষয়ের অভাবাত্মক জ্ঞান ছিল, নতুবা তুমি কি করিয়া জানিলে যে তোমার তখন বিষয়-জ্ঞান ছিল না? আশাব উত্তর এই যে, আমার যে বিষয়-জ্ঞান ছিল তাহা আমি পূর্বস্মৃতি হইতে টানিয়া আনিয়া বলিতেছি না, আমার বর্তমান স্মৃতিই বলিয়া দিতেছে যে তখন আত্মজ্ঞান ভিন্ন আমার অন্য কোনো জ্ঞান ছিল না, থাকিলে ত মনেই থাকিত।

আর এক কথা, মনের এরূপ বর্ণন নয় যে সে একই সময়ে দুইটা বস্তুতে বা দুইটা বিষয়ে অবস্থান করিতে পারে। মন এতই দ্রুতগামী যে, সে যখন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করে আমরা তাহার আশা বাওড়া ধরিতে পারি না, মনে করি বৃষ্টি মন একই সময়ে একাধিক বিষয়ে বিচরণ করিতেছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। এতটা বহুভূত একটা অগ্নিময় গোলক বাধিয়া ঘুরাইলে যেমন একটা অগ্নিময় বৃত্ত হয় এবং ঐ বৃত্তের সর্বত্রই সর্বত্র অগ্নিগোলক আছে বলিয়া মনে হয় সেইরূপ দ্রুতগামী মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করিলেও অতি দ্রুত গমনাগমন হেতু আত্মজ্ঞানে ও বিষয়-জ্ঞানে তাহার নিবৃত্ত অবস্থানরূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু নিরন্তর চিন্তের এরূপ চাঞ্চল্য থাকে না, তখন সে আত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে তদাকারাকারিত হয়, কি ভাব পক্ষে কি অভাব পক্ষে অল্প কোনো জ্ঞানই তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। দুইটা বিষয়ে একত্র অবস্থান করা মনের বর্ণবিবর্তন কার্য; তা, সে ভাব পক্ষেই হউক আর অভাব পক্ষেই হউক। যতদূর চাঞ্চল্য থাকে ততদূর মন এমনই দ্রুতগামী আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানে গমনাগমন করে যে মনে হয় আত্মজ্ঞানের সঙ্গেই বিষয়জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু মন যখন নিরন্তর হয় তখন সে ভাবা-ভাবা প্রজ্ঞাপতির মতন এক ফুলেই পড়িয়া থাকে, পুষ্পান্তর যাইতে পারে না। মনের সংকল্প বিকল থাকিতে অর্থাৎ মন সর্বপ্রো-ভাবে আত্মজ্ঞানকে আত্মসমর্পণ না করিলে সমাধি হয় না। নির্বিকল্প সমাধির অবস্থার মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না? সনিকল্প পর্যাঙ্ক কিঞ্চিং কিঞ্চিং থাকে, সে অবস্থার ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানীচূড়ামনি শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে “সমাধির ভিতর দিয়া গিরি চিত্রব্রহ্মের প্রকাশ হয় না”। এই যে কথাগুলি বলিলাম ইহা যোগীদিগের সাক্ষ্য, আমার মনগড়া কথা নহে, পরন্তু যুক্তিও ইহার প্রতিপত্তি নহে।

তত্ত্বত্ব মহাশয়ের দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে আত্মজ্ঞান ছাড়িয়া বিষয়জ্ঞান থাকিতে পাবে না, আসল কথাটা এই যে “জ্ঞান”-নিরূপক হইন “বিষয়” থাকিতে পারে না। এই তত্ত্বের উপর তিনি ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার কথার সারমর্ম এই যে জড়বস্তু জ্ঞান-নিরূপক নহে উহা জ্ঞানসাপেক্ষ, হতবাক এই অনন্ত স্রষ্টতে জীবের জ্ঞানের

অগোচর যেখানে বাহা আছে অথবা যেখানে বধন বাহা থাকে তাহা এক অখণ্ড সর্বব্যাপী জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত থাকে, এই জ্ঞানই ব্রহ্ম, ইনি নিরাকার সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ।

প্রথম কথা এই যে জীবপুঞ্জ কোনো স্থান আছে কিনা? যদি না থাকে তবে ত হৃষ্টকে প্রকাশিত রাখিবাব জন্য এক অখণ্ড সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় কথা এই যে নিমণাতাবও তিক্ত নাই, শর্কবাবও মিষ্ট নাই, এইসকল বস্তুর সঙ্গে আমাদের রসনার সংযোগ হইলে স্বাবুজাবিভিত্ত দিয়া আমাদের মস্তিষ্কে যে একপ্রকার বোধের উদয় হয় তাহাকেই আমরা তিক্ত ও মিষ্ট বলিয়া থাকি। যেখানে রসনা নাই সেখানে তিক্তও নাই মিষ্টও নাই। এইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ সমস্তই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন হয়, একথা সীতানাথ বাবুও বলিয়াছেন। এখন কথা এই যে, রক্ত-দাসপেশী-নির্মিত ইন্দ্রিয়-বস্তুর সাহায্য ভিন্ন যে কোনো বিষয় ভোগ করা যায় একপ অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। নিরাকার জ্ঞান কিরূপে থাকিতে পারে তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না। মস্তিষ্ক ও ন্যূ-শৃঙ্খলা (nervous system) রহিত হইয়া জ্ঞান যে থাকিতে পারে ইহা যুক্তির বিরুদ্ধ কথা। হতবাক যদি কোনো অখণ্ড সর্বব্যাপী জ্ঞানকে এই অগতের সাক্ষী-চৈতন্যরূপে থাকিতে হব তবে তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ থাকা চাই, কেননা এইসকল ইন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আমরা জানি। সীতানাথ বাবু যদি আগুবাধ্য বিধান করিতেন তবে তাঁহার নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলিতে অধিকার থাকিত। ষবিরা ধ্যানযোগে নিরাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; সে সময় দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল নাই। প্রথমবুদ্ধি মহাত্মা রামামোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচাৰ কবিয়াছেন। মহর্ষি মেঘেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে যে “ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থ সংকলন কবিয়াছেন, উহা তিনি “হকুম” পাইয়া অর্থ্যাৎ প্রত্যাদিষ্ট হইবা কবিয়াছেন, সে “হকুম” বিচারোৎপন্ন জ্ঞান বা সহজ জ্ঞান নহে। উহা সাক্ষ্য ভাবে “হকুম”। সীতানাথ বাবু এইসকল মহাজনগণের পছন্দ অতিক্রম কবিয়া “অতর্কপ্রতিষ্ঠা” ব্রহ্মকে তর্কমুখে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি বাহা কবিতো চাহিয়াছেন তাহাতে কৃতকাণ্ড হন নাই।

সীতানাথ বাবু আগুবাধ্য ও সহজজ্ঞানকে উপেক্ষা কবিয়াছেন, শুধু উপেক্ষা করেন নাই, অবজ্ঞা কবিয়াছেন। কাহারও নিকট কিছু গুলিয়া মানিয়া লওয়া এবং সহজজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করাকে তিনি “অন্ধবিশ্বাস” বলিয়াছেন এবং অন্ধবিশ্বাসী-দিগকে তাঁহার সহিত চলিতে নিষেধ কবিয়াছেন। তিনি “অন্ধ-বিশ্বাস” ও “জ্ঞানগত” বিশ্বাসের যেকোন সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা বড়ই অস্পষ্ট, পাঠ করিয়া বুঝা যায়না যে উক্ত উভয় প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে তিনি কিরূপ পার্থক্য কবিয়াছেন। এখানে সে প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। সত্যতঃ প্রবন্ধে উহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে সীতানাথ বাবু বিনাযুক্তিতে কিছুই গ্রহণ করিতে বাজি নহেন হতবাক তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে স্থল বেহের আশ্রয় ভিন্নও জ্ঞান থাকিতে পারে, এবং আরও প্রমাণ করিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়-সাহায্য ভিন্নও সেই জ্ঞান, শব্দ স্পর্শ রস গন্ধ অনুভব করিতে পারে, অন্তর্ভাব সৃষ্টি রহিল না। কেননা পঞ্চতত্ত্ব পরিত্যাগ কবিয়া সৃষ্টির অস্তিত্ব কিরূপে থাকে তাহা মানববুদ্ধির অগম্য, আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত হইবা পঞ্চক কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে তাহাও মানবধারণার অতীত।

হতবাক কাহাবও জ্ঞানে-শব্দ স্পর্শ-রস-গন্ধবৃত্ত এই সৃষ্টিকে প্রকাশিত রাখিতে হইলে তাঁহার পাঁচটা ইন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক। সীতানাথ বাবু যুক্তিমুখে এই অনন্তচরিত্রের সাক্ষী-চৈতন্যরূপে এক নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা বিফল হইয়াছে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থের মধ্যে আমাদের আপত্তির কথা অনেক রহিয়াছে। আত্মা, মন, স্মৃতি প্রভৃতি শব্দ গ্রন্থকার যে ভাবে ব্যবহার কবিয়াছেন এবং আমাদের স্মৃতি কালে আমাদের জ্ঞান ও স্মৃতি প্রভৃতি ইত্যদে গচ্ছিত থাকে, আমরা জাগ্রত হইলে তিনি উহা আমাদের দিগকে ফিরাইয়া দেন ইত্যাদি যেসকল কথা বলিয়াছেন সেসকল কেবল যে আপত্তিজনক তাহা নহে অত্যন্ত দোষজনক বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে। কিন্তু সেসকল কথা এখন রাখি। দ্বিতীয় বাহ্যার উপর তিনি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন সেই মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জনর আশা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

উপসংহারে আমাব বক্তব্য এই যে নিরাকার ব্রহ্মসত্তা অথবা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সীতানাথ বাবু উহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ কবিয়াছেন সেই যুক্তিরূপ অস্ত্রে তাঁহার মতগুলিও যে খণ্ডিত হইতে পারে ইহা প্রদর্শন কবা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীমদনোব্রহ্মণ্ড গুহ ঠাকুরতা।

‘প্রবাসী’-সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধটা আমার নিকট উত্তরের জন্য পাঠাইয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু নানা কাবণে আমি ইহার উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। একটা কারণ এই যে প্রবন্ধটা পড়িয়া বোধ হইল লেখক ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ ভাল করিয়া পড়েন নাই। তাব একটা প্রমাণ এই যে তিনি আমাব ব্যাখ্যা-দ্বিতী মূলতঃ প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমটিকে দ্বিতীয় আর দ্বিতীয়টিকে প্রথম বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। আমার ধারণা এই যে তিনি পুস্তকখানি কবেকবার ভাল করিয়া পড়িলে পুস্তকের ‘মধ্যেই তাঁহার আপত্তিগুলির উত্তর পাইবেন। যেমন, জ্ঞানের ইন্দ্রিয় সাপেক্ষতা সম্বন্ধে তিনি বাহা বলিয়াছেন, তার উত্তর প্রথমাব্যায়ের ‘জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়’ নামক পবিচ্ছেদে আছে। দ্বিতীয় মূলতঃ সম্বন্ধে যেসকল আপত্তি তুলিয়াছেন, সেসকলের উত্তর দ্বিতীয় অব্যায়ের ‘জ্ঞানের দৈত্যবৈচিত্র্য’ নামক দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে আছে, ইত্যাদি। পুস্তকখানি ভাল করিয়া পড়িয়াও যদি সম্বোধ না যায়, তবে সে সম্বোধ সাময়িক পত্রের আলোচনার ঘুর হইবে না।

‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’-লেখক।

“ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা”

বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচিত “ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্তপূর্ণ ইতিহাসের নানা রঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উন্মোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি বাহা এতদিন সহজ চোখে করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না। এইবার তাহার সে চোখ বাহ্যামুগ্ধ সাঙ্ক্য লাভ করিবে তাহার অবশোধন দেখা দিয়াছে; তবে যে, চতুর্দিকে কর্কশ কা কা ধ্বনি হইতেছে—রজনী প্রভাতের সমসমকালে তাহা হইবারই কথা। এতদিনের ধ্বংসাত্তির পরে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসে এই যে একটা সম্ভবমতো পাকা বকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর শুভ সম্ভানদিগের কত না আনন্দের বিষয়। গোড়াপত্তন হইয়াছে যেসকল

স্বন্দর, তাহার উপবে ত্রমূলক ভিত্তি রাখিয়া তুলিতে হইলে আরো নানাপ্রকার ইষ্টক অন্তর এবং মালমসলাব জোপাড় করা আবশ্যক তা ছাড়া পুণ্ডিত ইতিহাস-ভারতীয় নূতন দেবালয়ের নির্মাণ কার্যে বাহা-বাহা কারীকরদিগের সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রবন্ধটির সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আপাততঃ বাহা আমার মনে উদ্ভিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :—

মহাদেবের আদিম গীতস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে কি উত্তর অঞ্চলে ?

রবীন্দ্রনাথের লেখার আভাসে আমার এইরূপ মনে হয় যে, তাহার মতে মহাদেবের আদিম গীতস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি বাহা আঁচিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, যেহেতু বাণবিকই বান্দনাদি ক্রব্জাতিদিগের মধ্যে বিষ্ণুর স্নিকমূর্ত্তি উপাস্ত দেবতার আদর্শ পর্যায়ে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত; চূর্ণাঙ্ক রাক্ষস জাতিদিগের মনোরাগ্যেব সিংহাসন শিবের ক্রমমূর্ত্তিবই উপযুক্ত অধিষ্ঠান-মক। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমার দেখিতে পাই যে, একদিকে যেমন রক্ষঃ, আর একদিকে তেমনি বক্ষ। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ-অঞ্চল যেমন রক্ষদিগের দলবলের প্রধান সঙ্গমস্থান (Head quarter) ছিল—উত্তর অঞ্চল তেমনি বক্ষদিগের দলবলের প্রধান সঙ্গমস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যদিগের চক্ষে দক্ষিণের ড্রাবিডাদি জাতিরা যেমন রাক্ষস বানরাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, উত্তরের মোগলাদি জাতিরা তেমনি বক্ষদিগের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল—ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বিকটাকাববিষয়ে দক্ষিণের রক্ষ এবং উত্তরের বক্ষের মধ্যে যেমন মিল আছে, কিন্তুতকিমাকাব-বিষয়ে তেমনি দক্ষিণের বানর এবং উত্তরের কিল্লের সঙ্গে মিল আছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, বক্ষদিগের রাজধানীতে কুবের-পুতে—মহাদেবের অধিষ্ঠানের কথা কাব্যপুর্বাঙ্গাদি শাস্ত্রে ভূবোভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া কৈলাস-শিখর মহাদেবের প্রধান গীতস্থান।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পার্শ্ব একটি বিষয়ের আমার চক্ষু ফুটিয়াছে; সে বিষয়টি এই যে, জনক বাজা যে বেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি ভারতে কৃষিকার্য্য প্রবর্তনের প্রধান নেতা ছিলেন; আর, তাহার গুরু ছিলেন বিশ্বামিত্র। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, হিমালয় প্রদেশের কিরাত জাতিরা ব্যাধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত—তাহারা কৃষিকার্য্যে ধাবই ধারিত না। কিরাত জাতি মোগল এবং তাতারদিগের সহোদর জাতি ইহা বলা বাহুল্য। এটাও দেখিতেছি যে, হিমালয়ের উপত্যকার মহাদেব অর্জুনকে কিরাত বেশে দেখা দিয়াছিলেন। মহাদেব কিরাতদিগের দলে মিশিয়া কিরাত হইয়াছিলেন। মহাদেব পশুহস্তাও বটেন, পশুপতিও বটেন। মহাদেব যে অংশে কিরাতদিগের ইষ্ট দেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুহস্তা; আর, যে অংশে তিনি বাসু মোগলদিগের ইষ্ট দেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুপতি। পুরা-কালের মোগল এবং তাতার জাতিবা জীবিকালাভের একমাত্র উপায় জানিত—পশুপালন, তা বই, কৃষিকার্য্যের ক অক্ষবও তাহারা জানিত না—ইহা সকলেরই জানা কথা। তবেই হইতেছে যে, মোগল এবং তাতার জাতিরা—সংক্ষেপে বক্ষবা—একপ্রকার পশুপতির দল ছিল; স্তবরাং পশুপতি-মহাদেব বিশিষ্টরূপে তাহাদেরই দেবতা হওয়া উচিত; আর, পুরাণাদিকে যদি শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হয়, তবে ছিলেনও তিনি তাই। বক্ষরাজ কুবেরের রূপ ছিল অনাধ্যোচিত; আর, তিনি ধনপতি নামে বিখ্যাত। প্রাচীনভারতে ধন-শব্দে বিশিষ্ট-রূপে গো মেঘাদি পশুধনই বুঝিত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পশুজীবী মোগল-তাতার প্রভৃতি জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আর্ধ্য-

দিগের ইতিহাসে বক্ষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি পশুহস্তা কিরাত জাতি—কি পশুপালক মোগল জাতি—উভয়েই কৃষিকার্য্য বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ ছিল। এখন স্নিকমূর্ত্তি এই যে, ধনুর্ভঙ্গের বাণ-র-টিকে কোন্ প্রকার বিষ-শব্দ বলিব? কিরাতদিগের পশুহস্তী ধনুর্ভঙ্গ বলিব? না রাক্ষসদিগের বিষমাত ভঙ্গ বলিব? আমার মোধ হয়—প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর দক্ষিণের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক যোগ-সেতু বর্তমান ছিল; কেননা লক্ষ্যপুরী প্রথমে কুবেরের ছিল, পরে তাহা রাবণ বলপূর্বক হস্তগত করিয়াছিল। রাবণ এবং কুবের যে একই পিতার পুত্রদ্বয় ইহা কাহারো অবিস্মিত নাই।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ-। কথাটি এই :—

নেপাল প্রদেশে বুদ্ধমন্দির এবং শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিত করে। শুধুবাণ্ড শৈবধর্ম্মাবলম্বী। খুব সম্ভব যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভিক কালে বৌদ্ধ সাধকেরা হিমালয় প্রদেশে নির্জনে বোচ সাধন এবং তপস্বী করিতেন। উমা যেমন উপনিষদের স্থানির্মল ব্রহ্মবিদ্যা, পার্শ্বতী তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রের বিভীষিকাময়ী মশমহাবিভা। ভক্তের দেবতা যেমন বিষ্ণু, যোগীতপস্বীদিগের দেবতা তেমনি মহাদেব। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রারম্ভিক কালে বৌদ্ধ সাধকেরা বিশিষ্টরূপে যোগী তপস্বী ছিলেন। মহাদেব সেইসকল পরিত্যক্ত বৌদ্ধ যোগী তপস্বীদিগের আদর্শ-প্রতিমা—এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কথেক বৎসর পূর্বে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং আর্ধ্যধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত নামক পুস্তিকায় এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমি বাহা সবিস্তরে লিখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :—

পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা আশ্চর্য্য নূতন প্রণালীতে বৌদ্ধ বিদ্যার প্রতিবিধান চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহারা বৌদ্ধ যোগী তপস্বী-দিগের আর্ধ্য যোগী তপস্বীদিগের দলে টানিয়া লইলেন, আর, মহা-দেবকে সেইসকল অবৈদিক যোগীতপস্বীদিগের ইষ্টদেবতাব পদবীতে আসন গ্রহণ করাইলেন। পাছে লোকে মনে করে—যোগীধর মহাদেব বুদ্ধবই আর এক অবতার—এই আশঙ্কা পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা তাহার গলায় পৈতা দিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের মোট কথাটির সহিত আমার মতের একটুও অনৈক্য নাই। যে দুই একটি কথা আমি উপরে ইঙ্গিত করিয়া তাহার সহিত ভারতের ইতিহাস-ধারার কথাগুলি সমন্বয় মতে একঘটিত অঙ্গপূরণ করা হইলে ভাল হয়—ইহাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। আমার বিশ্বাস এই যে, এই সমন্বয় কার্য্যটি রবীন্দ্রনাথ মনে করিলেই ঈশ্বর প্রসাদে সর্বাঙ্গসম্পন্ন রূপে সুনিপুণ করিতে পারেন।

ঐবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরভূত।

জ্যৈষ্ঠমাসের 'প্রবাসী'তে ঐযুক্ত জলজর দেব মহাশয় 'পরভূত' শীর্ষক প্রবন্ধে বিলাতী 'কুর্কু' পানীয় স্বভাবের সহিত আমাদের চির-পরিচিত প্রতিবেশী কোকিল পানীয় স্বভাব মিলাইতে বাইরা বিবস ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কোকিল বারমাস আমাদের দেশে থাকে না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। উহারা কোথা হইতে আসে আর কোথায়ইবা চলিয়া যায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। * * * বসন্তকালে কোকিল আমাদের দেশে আসে তাই কোকিলের অস্ত্র নাম বসন্ত-ভূত।

* * * আমাদের কোকিল * * * মার্চমাসে এ দেশে আসিরা, জুলাইমাসে এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।"

জলদ্বার বাবুর এই সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এবং তাহা স্বীকার করিবার প্রকৃষ্ট কোন যুক্তিও তাঁহার প্রবন্ধে নাই। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট অসুমান কখনও দাঁড়াইতে পারে না। কোকিল যে আমাদের দেশের চিরস্থায়ী পাখিই স্বপ্নের অধিবাসী, সে বিষয় আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আমাদের গ্রাম অঞ্চলে বারমাসই কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় অনেকেরই জ্ঞানেন, নানা জাতীয় পক্ষীর প্রভাতী কোলাহলের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কোকিলের অস্পষ্ট কলববও প্রতিগোচর হইয়া থাকে।

আমার আটচল্লিশ বর্ষ ব্যাপী জীবনের অধিকাংশ সময় পার্বত্য প্রদেশে অতিবাহিত হইয়াছে; বর্তমান সময়েও পার্বত্য অঞ্চলেই বাস করিতেছি। গিরিকিরীটিনী-ত্রিপুরার উন্নত পর্বতশ্রেণী প্রকৃতির বসত্যস্থ। সেখানে এমন অনেক নতুন পাখী দেখিয়াছি, যাহা আমাদের অঞ্চলে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই পার্বত্য প্রদেশেও বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বসন্তকাল ভিন্ন অল্প সময়ের কুহরবে কাননভূমি মুগ্ধবিত করেনা—ইহা কোকিলের স্বভাব। পোঁতা, বায়ুদ্র প্রভৃতি নিশাচর পক্ষিগণ যেমন আঁধারের মুখ না দেখিলে পত্রের অন্তরাল হইতে বাহির হয় না, ময়ূবগণ যেমন মেঘ না দেখিলে সাধারণতঃ পুচ্ছ বিস্তার করে না, ভেকগণ যেমন বর্ষার বারিসম্পাত না হইলে উচ্চবব কবে না, তদ্রূপ কোকিলের কণ্ঠও ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ব্যতীত উন্মুক্ত হয় না—ইহাই কোকিলের স্বভাব। বারমাস কুহরনি শুনিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই কোকিলকে আমাদের দেশের প্রবাসী-পক্ষী বলিয়া মানিবা লইতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই।

বসন্তকালে আমাদের দেশে আসে বলিয়াই কোকিলের নাম 'বসন্তদূত' হইয়াছে এই কথাটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইবারও বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠস্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং তাহার কলকণ্ঠনিঃসৃত কুহরতান আমাদের নিকট বসন্তের আগমনবার্তা ঘোষণা করে, এই কারণে কবিগণ কোকিলকে বসন্তের দূত পদের সন্ম প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই উপাধি প্রদানের কোনও গুঢ় কারণ আছে বলিয়া সাব্যস্ত করিবার প্রমাণ নাই।

জলদ্বার বাবু আপন মত সমর্থনের নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"উৎকল দেশে ও মধ্য প্রদেশে কোকিলকে কোইলি বলিয়া থাকে। আমের আঁঠির ভিতরকার শাঁসকেও কোইলি বলে। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, আমের মধ্যে কোইলি না হইলে, কোকিলের কুহর স্বপ্রতিগোচর হয় না; বসন্ত তাহাই সত্য। মার্চমাসের মধ্যে বা শেবভাগে আমের কোইলি হইয়া থাকে, প্রায় সেই সময়েই কোকিল এ দেশে দেখা যায়।"

সংগৃহীত প্রমাণ দ্বারাও জলদ্বার বাবুর মত সমর্থিত হইতেছে না। "আমের মধ্যে কোইলি না হইলে কোকিলের কুহর স্বপ্রতিগোচর হয় না" এই প্রবাদবাক্য "হারা, 'কোইলি' হইবার পূর্বে কোকিল এ দেশে আসে না, এ কথাও কোনও আভাস পাওয়া যাইতেছে না। বরং কোইলি না হওয়া পর্যন্ত কোকিলের কণ্ঠ মুগ্ধবিত হয় না ইহাই বুঝা যাইতেছে। কোকিল বসন্ত আগমনের পূর্বে ডাকে না বলিয়াই দেশ ছাড়া হইয়া যায়, একথা ঠিক নহে। জলদ্বার বাবু যদি দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহার টিকানা পাইলে, বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে জীবিত না পাইলেও অন্ততঃ মৃত একটা কোকিল তাঁহাকে দেখেয়া যাইতে পারে। বাড়ি কোকিল জীবিত অবস্থায় ধৃত করা কষ্টসাধ্য।

আমাদের দেশের বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুগুলি কোকিলের পক্ষে অসহনীয় বা অতৃপ্তিকর, এরূপ সাব্যস্ত হইলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত অথবা মানসিক বৃত্তিচেষ্টেব ক্ষুণ্ণিবিধান জন্য তাহাদের দেশান্তরে বাওয়া আবশ্যক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে। কিন্তু পিঙ্গরবন্ধ কোকিলগণ বারমাসই এদেশে থাকে। সাধারণতঃ কোন ঋতুবিশেষে তাহাদিগকে অসুস্থ বা ক্ষুণ্ণিহীন হইতে দেখা যায় না। সকল পাখীর ন্যায় ইহারাও স্বচ্ছন্দে আঁহাবাদি করে এবং বসন্তের সমাপ্তিতে স্বভাব-সিদ্ধ কুহরতানে বিমানপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে। অথচ শীত্ন মনিতোও দেখা যায় না। এইসকল আবহাওয়া পাখীকে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, আমাদের দেশের কোন ঋতুই কোকিলের পক্ষে অসহনীয় বা অতৃপ্তিকর নহে। হুতরাং 'কুহু' পাখীর দ্বারা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের স্থান পরিবর্তন করিবার বিশেষ কোনও কারণ আছে বলিয়া বুঝা যায় না।

আমি প্রাণীতত্ত্ববিদ নহি, হুতরাং অন্ততঃ বিষয়ে আমার জ্ঞান অতি অল্প। কিন্তু স্বাভাবিক কোতূহলপ্রযুক্ত কোন কোন বিষয়ে সম্ভান লইয়া এবং সর্বদা নানা জাতীয় পালিত ও বন্য পক্ষী দর্শন করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহার দ্বারা বুঝিতেছি, জলদ্বার বাবু কাকের বাসাও কোকিলের ডিম পাড়িবার কারণ অসুসন্ধান করিতে বাইরা যেসকল কথা, অবতারণা করিয়াছেন, তাহা না করিলেও চলিত। অবশ্যের বা বর্ণের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কোকিল কাকের বাসার ডিম পাড়ে, কিংবা কাক সেই কারণেই নিঃসন্দেহ চিত্তে ডিমে তা দেব ও হানা পালন করে, এমন নহে; ইহা তাহাদের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। কোকিল কখনও কাকের বাসা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পাখীর বাসাও ডিম পাড়ে না, ইহা কোকিলের স্বভাব। কাকও আপন হানার স্ত্রীকে দেখে বলিয়াই কোকিলের হানাকে পোষণ করে ইহা নহে; হানান্তুলি বিভিন্নবর্ণের বা বিভিন্ন আকারের হইলেও কাক তাহাদিগকে পালন করিত দ্বিধা করিতে না, পাখীর স্বভাব আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায়। জলদ্বার বাবুও পাখীর একপ ব্যবহারের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং একজাতীয় পাখীর ডিম ও হানা অন্ত জাতীয় পাখীর দ্বারা রক্ষিত হওয়ার কয়েকটা দৃষ্টান্তও প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশের আব এক জাতীয় পবিত্র পাখীর বিষয় আলোচনা কবিলে এবিষয়েও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

'বৌকথাংক' পাখী কোকিলের ন্যায় অন্য জাতীয় পাখীর দ্বারা আপন ডিম ফুটাইয়া ও হানা পালন করাইয়া লয়। কোকিল যেমন এই কার্যের দ্বারা কাকের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, বৌকথাংকও পাখী তদ্রূপ কিঙ্গার উপর এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করে; ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বৌকথাংকও পাখীর হানার সহিত কিঙ্গার হানার আকৃতি বা বর্ণগত কোনও সাদৃশ্য নাই। কিঙ্গার হানা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, বৌকথাংকও পাখীর হানা মূর বর্ণের উপর কালছিট বিশিষ্ট। আকারেও কিঙ্গার হানা অপেক্ষা কিছু বড়। এত পার্থক্য সত্ত্বেও কিঙ্গা বৌকথাংকও পাখীর হানা পোষণ করিতে দ্বিধা করে না। অথচ কিঙ্গার বাসা ভিন্ন অন্য জাতীয় পাখীর বাসাও বৌকথাংকও পাখীর হানা কখনও দেখা যায় নাই। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, এক এক জাতীয় পরভূত পাখী অন্য কোনও নির্দিষ্ট জাতীয় পাখীর দ্বারা আপন আপন ডিম ফুটাইয়া ও শাবক পালন করাইয়া লয়। এবং শেফেক্ত জাতীয় পাখীরাও সমস্তে সেইসকল ডিম ও হানা পোষণ করে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। এই কার্যে তাহাদের চিন্তা বা বিবেচনা শক্তির পরিচায়ক কিছু নাই। ভিন্ন জাতীয় পাখীর বাসা

তাহার অগোচরে ডিম পাড়িয়া বাগড়া চতুরতার কার্য্য বটে, কিন্তু ইহাও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ৬৭ বলিয়াই মনে হয়।

বৌদ্ধধর্মকণ্ড পার্থী গ্রীষ্মাবসানে অন্য দেশে চলিয়া যায় বলিয়া প্রবাদ আছে, কোকিলের মতক্বে এদেশে তরুণ কোমল প্রবাদ নাই। উক্ত প্রবাদবাক্য সমুলক কে অমূলক, ভালবকম অনুসন্ধান না করিয়া তথ্যের কোন কথা তালা বাইতে পারে না। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে,—উপযুক্ত বহু সন্দেহ কোকিলের ন্যায় অবদ্বন্দ্ব বৌদ্ধধর্মকণ্ড পার্থী দীর্ঘজীবী হয় না। ইহার অবশ্যই একটা কারণ আছে।

এতৎসম্বন্ধে আনও দুই একটা কথা বলিবার ছিল; প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং—আর অগ্রসর হওয়া গেল না। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে আমানব দেশে আরও কোন কোন জাতীয় পরভূত পার্থীর সম্ভাবন পাওয়া যাইবে।

আশ্রয়তলা!

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

অবসান

এবার ভাসিয়ে দিতে হ'বে আমার

এই তরী!

তীরে এসে যায় যে বেলা

মরি গো মরি।

ফুল ফোটােনো সাবা করে

বসন্ত যে গেল সরে!

নিম্নে মরা ফুলের বোঝা

এখন কি করি—

মরি গো মরি!

জল উঠছে ছলছলিয়ে

চেউ উঠেছে ছলে,

মর্ম্মরিয়া যারে পাতা

বিজ্ঞান তবমূলে।

শূন্য মনে কোথায় তাকাস্

সকল বাতাস সকল আকাশ

ঐ পান্নর ঐ বাঁশ্বব স্বরে

উঠে শিহরি—

মরি গো মরি!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন ন্যায়*

উপক্রমণিকা।

এই প্রবন্ধে দুইটা নূতন কথা থাকিবে। বাহাতে এই দুইটা বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত ঐ দুইটা বিষয় কি তাহা অগ্রেই বলিতেছি।

(১) ন্যায়সূত্র প্রথমে অধ্যাস্ববিজ্ঞা বা মোক্ষশাস্ত্র বলিয়া প্রণীত হয় নাই। উহা সামান্ত তর্কের গ্রন্থমাত্র ছিল। পরবর্ত্তী গ্রন্থকাবেরা উহাকে মোক্ষশাস্ত্রে পবিশত করিয়া ন।

(২) বর্ত্তমান-ন্যায়-সূত্রকার ন্যায়ের মূলতত্ত্ব জানিতেন না। ব্যাপ্তি তাহার অবিদিত ছিল।

অন্ত যেসকল আপাতনূতন কথা এই প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং প্রবন্ধকারের লিখিত আসিয়াতিক-সমিতির পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে গওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন ও নব্য ন্যায়।

ন্যায়বিজ্ঞা দুইভাগে বিভক্ত। (১) প্রাচীন ন্যায় এবং (২) নব্য ন্যায়। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ন্যায়ই প্রধানতঃ সমালোচিত হইবে।

সূত্র ও সূত্রকার।

অধুনা ন্যায়ের যেসকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ন্যায়সূত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ন্যায়সূত্র মহর্ষি অক্ষপাদ বা গোতম-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে পাঁচটা অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আন্থিক আছে। পণ্ডিতসমাজে ঋষি-প্রণীত বলিয়া ইহার যথেষ্ট নাম আছে। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল ইহা টোলে নিয়ম-পূর্ব্বক অধীত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের, এবং সংস্কৃত দ্বিতীয় ও উপাধি পরীক্ষাব খাতিরে, ইহার একটু অধ্যাপনা হইয়া থাকে মাত্র। ফলে শতকরা নব্বই জন নৈয়মিক ন্যায়সূত্র চক্ষুগোচরও করেন নাই। ধর্ম্মবিষয়ে বেক্রপ বেদের প্রামাণ্য, ন্যায়বিষয়ে ত্রিক্ সেইরূপ অক্ষপাদ-সূত্রের প্রামাণ্য।

* প্রবন্ধকারের "ভারতীয় ধর্ম্ম" গ্রন্থের এক অংশ।

সূত্রকারের সময়।

শ্রায়সূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চীন, জাপান এবং মঙ্গোলিয়া দেশে অষ্টাপি তত্ত্ব দেশের ভাষায় অক্ষপাদীয় শ্রায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। চীন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অক্ষপাদ বুদ্ধেরও পূর্বে বিজ্ঞান ছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে (২.৫১৫) এবং সাম্ব্যাসূত্রে (৫।২৭) ন্যায়দর্শনোক্ত পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যের উল্লেখ আছে।

সূত্রের আলোচ্য বিষয়।

বর্তমান ন্যায়সূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। (১) প্রমাণ (২) প্রমের (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প (১২) বিতণ্ডা (১৩) হেত্বাভাস (১৪) ছল (১৫) জ্ঞাপ্তি (১৬) নিগ্রহস্থান। এই তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পাওয়া যায় যে, ন্যায়সূত্র প্রধানতঃ তর্কবিচারই গ্রন্থ (dialectics), ইহা দর্শন (philosophy) নহে।

উপরোক্ত তালিকাটী ন্যায়শাস্ত্রের ১ম সূত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ সূত্রটী এই—

‘প্রমাণ প্রমের সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্তাবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ছল জ্ঞাপ্তি নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাং নিশ্চেষয়সাধিগমঃ। ১।১।১।

ইহার অর্থ এই যে প্রমাণাদি ষোলটা পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিশ্চেষয় লাভ হয়। গ্রন্থকার স্বকীয় গ্রন্থের সূচীপত্র দিয়া বলিলেন যে এইসকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলে মানব “নিশ্চিত মঙ্গল” লাভ কবে। আজকালকার গ্রন্থেও তর্কশাস্ত্রের উপযোগিতা কি, তাহা দেখান হইয়া থাকে (কাববেস্ত রীড কৃত লজিক দেখুন)।

নিশ্চেষয়স কি?

সূত্রে ‘নিশ্চেষয়স’ লাভের কথা আছে। এ নিশ্চেষয়স কি? অনেকে মনে করেন যে, নিশ্চেষয়স অর্থে মুক্তি বা অপবর্গ। কিন্তু ঐমত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পাণিনির ব্যাকরণে ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে অচতুরাদি সূত্রে নিশ্চেষয়স শব্দটী ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বলেন “নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিশ্চেষয়সম্”। অবশ্য, নিশ্চিত শ্রেয় বলিতে অপবর্গ বুঝাইতে পারে, কিন্তু অপবর্গই যে নিশ্চিত

শ্রেয়, অন্য কোনও শ্রেয় যে নিশ্চিত শ্রেয় নহে, ইহা বলা চলে না। মহাভারতে নিশ্চেষয়স শব্দ বহুবচ সাংসারিক মঙ্গল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

নৈশ্চেষয়শো তু তো জ্ঞেবো দেশকালো ইতি স্থিতিঃ। ১।১৪.১৮৫।
জ্ঞায়মিশ্চেষয়ঃ নাম কথং কুর্ধ্যাৎ সত্যং মতম্। ১।২.৪।১৪।
ময়া নিবেদিতং সর্বং পথাং নিশ্চেষয়সং পরম্। ২।৭৩।

“নিশ্চেষয়সং তু কল্যাণ মোক্ষয়োঃ শব্দরে পূমান্।”
এইরূপ অভিধানও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অন্ত-এব নিশ্চেষয়স শব্দের অর্থ সাধারণ কল্যাণ বলা অযৌক্তিক নহে।

বার্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন—

সর্বত্র বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানমতি নিশ্চেষয়সাধিগমতঃ। ত্রয়াং তাবৎ কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিশ্চেষয়সাধিগমঃ ইতি। তত্ত্বজ্ঞানং তাবৎ অগ্নি-হোত্রাদি সাধনানাং স্বাগতাদি পরিজ্ঞানম্ অমুপহতাদি পরিজ্ঞানং চ। নিশ্চেষয়সাধিগমোহপি স্বর্গপ্রাপ্তিঃ তথাহি অত্র স্বর্গঃ ফলঃ ক্রমতে ইতি। বার্তীয়াং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিশ্চেষয়সাধিগম ইতি। ভূম্যাদি পরিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ভূমিঃ কণ্টকাত্তমুপহতেত্যেতত্ত্বজ্ঞানং কুবাধ্যাধিগমতঃ নিশ্চেষয়স-মিতি তৎকলাৎ। দণ্ডনীত্যাং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিশ্চেষয়সাধিগম ইতি। সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাসক্তি বিনিয়োগ-তত্ত্বজ্ঞানং নিশ্চেষয়সং পৃথিবীজয়ঃ ইতি। ইহস্বধ্যাধিবিজ্ঞানান্নজ্ঞানান্-তত্ত্বজ্ঞানং নিশ্চেষয়সাধিগমোহপগর্গপ্রাপ্তিরিতি।

অর্থাৎ “সকল বিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান আছে এবং নিশ্চেষয়স লাভও আছে। বেদে অগ্নিহোত্রাদি করিতে হইলে যেসকল জিনিষের প্রয়োজন, তাহা বা মুঠ অর্জিত কি না, অমুপহত কি না প্রভৃতির জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান এবং স্বর্গপ্রাপ্তি “নিশ্চেষয়সাধিগম।” ‘বার্তী’র ভূমি প্রভৃতির জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান আর কুবিলাস্ত নিশ্চেষয়সাধিগম। দণ্ডনীতিতে সাম দান ভেদ ও দণ্ডের যথাকাল যথাসক্তি যথাদেশ প্রয়োগ তত্ত্বজ্ঞান, আর পৃথিবীজয় নিশ্চেষয়স। এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান আত্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান এবং অপবর্গ নিশ্চেষয়স।”

উদ্ধৃত উদ্যোতকরের লেখা অনুসারে যে বিজ্ঞা দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহাই সেই বিজ্ঞান নিশ্চেষয়স। স্বর্গ, কৃষি, পৃথিবীজয় ইহারা যথাক্রমে ত্রয়ী, বার্তী, এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্রের নিশ্চেষয়স। শ্রায়শাস্ত্রের নিশ্চেষয়স কি? ন্যায়শাস্ত্র পড়িলে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? প্রমাণ প্রমের সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত অবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ছল জ্ঞাপ্তি নিগ্রহস্থানের তত্ত্ব জানিলে কি লাভ হয়? ভাষ্যকার বলেন—

“সেয়মাবীক্ষিকী.....

প্রবীণঃ সর্ববিজ্ঞানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।

অশ্রয়ঃ সর্বধার্ম্মাণাং যথোদ্যোগে প্রকীর্ণিতা।

শ্রায়শাস্ত্র সর্ববিজ্ঞান প্রদীপস্বরূপ, ইহা সর্বকর্মের উপায়, এবং সর্ব-ধর্মের আশ্রয়।

অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বুদ্ধি মার্জিত হয় এবং যুক্তির সাধু অসাধু নির্ণয়ের শক্তি জন্মে এবং এই জ্ঞানই অজ্ঞান বিজ্ঞান অনারাসে প্রবেশ করা যায়, সকল কৰ্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে গোলযোগ ঘটে না। এই সকলগুলিই জ্ঞানশাস্ত্রের নিঃশ্রেয়স। জ্ঞানশাস্ত্রকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান পরিণত করিয়া মোক্ষকে উহার নিঃশ্রেয়স বলা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ভ্রম বলিতে হইবে। বাৎসায়ন হইতে আগন্তু করিয়া সকল চীৎকারই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অক্ষপাদের জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞান নহে। উহা সর্ববিজ্ঞান প্রদীপ—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Science of Sciences, উহা তর্কবিজ্ঞান,—দর্শন নহে।

অক্ষপাদের বোড়শপদার্থ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রমাণাদি বোদী পদার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, উহারা জ্ঞানস্থলে আলোচিত বিষয়ের নির্ণয় মাত্র। এই বোড়শ পদার্থকে বৈশেষিকদের দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ের সহিত বা আরিষ্টটলের Substance attribute প্রভৃতির সহিত তুলনা করা বড়ই অযৌক্তিক। অবশ্য বৈশেষিকদের ষট্‌পদার্থও যদি এইরূপ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের তালিকামাত্র হয়, তবে কোনও আপত্তিই নাই, কিন্তু উহারা সাধারণতঃ বিশ্বস্থ পদার্থের বিভাগ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন ভৌতিক পদার্থ কঠিন তরল ও বায়বীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, তেমনি বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থ দ্রব্যগুণাদি ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত। এই হিসাবে অক্ষপাদকে বোড়শ পদার্থ-বাদী বলা নিতান্ত অযৌক্তিক।

নিম্নে এই বোদী বিষয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রমাণ।

যাহা দ্বারা পদার্থজ্ঞান বা প্রমা জন্মে তাহাকে প্রমাণ বলে। আমরা চক্ষু দ্বারা বস্তুর যথার্থ আকার, আয়তন, বর্ণ প্রভৃতি জানিয়া থাকি; অতএব চক্ষু একটা প্রমাণ। চক্ষের গতি আমরা চক্ষে দেখি না, কিন্তু এক সময়ে চক্ষু আকাশের একস্থানে এবং ঐ সময়ের ছবি প্রহর পবে চক্ষকে আকাশের আর কস্থানে দেখি।

ইহা দ্বারা অনুমান করি যে চক্ষু গতিমান। অতএব অনুমান একটা প্রমাণ।

প্রমাণ কয়টা? বর্তমান জ্ঞানস্থলে চারিটা প্রমাণের উল্লেখ আছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ।

প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থেব সন্নিবর্তন হইলে, অশব্দ, অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সকল রকমের জ্ঞান হইবার সময়ই স্মৃতি মনের সহিত যুক্ত হয়, এবং সকল প্রত্যক্ষেই মন ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়। এই আত্মমনঃসংযোগ এবং মনইন্দ্রিয়-সংযোগ প্রত্যেক প্রত্যক্ষে থাকিলেও প্রত্যক্ষের লক্ষণে উহার উল্লেখ নিশ্চয়োজন, কেননা ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থেব সংযোগ হইয়া জ্ঞান হইলে তাহাতে ঐ দুইটা থাকিলেই থাকিবে।

অশব্দ।

প্রত্যেক বস্তুরই একটা নাম আছে। ঐ নাম দ্বারা ঐ বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। উহাকে শব্দজ্ঞান বলা যাইতে পারে। লবণ মুখে দিয়া তাহার স্বাদের যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষ, আর 'লবণ' এই শব্দ শুনিয়া তাহার স্বাদের যে জ্ঞান হয় তাহা শব্দ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান শব্দ নহে।

অব্যভিচারী।

মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনস্থলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তন আছে, অপিচ উহা শব্দজ্ঞান নহে। তথাপি ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমা নহে, কেননা অব্যভিচারী না হইলে ইন্দ্রিয়ার্ধ-সন্নিবর্তন জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না। যে জ্ঞান এখন একরূপ, অপবক্কে আর একরূপ, তাহাকে ব্যভিচারী জ্ঞান বলে।

নিশ্চয়াত্মক।

দুইটা পরস্পরব্যভিচারী জ্ঞানের মধ্যে একটা জ্ঞান ভ্রম হইবেই। একটা জিনিস দেখিয়া যখন আমাদের মনে এইরূপ ভাব হয় যে উহা স্তম্ভ না মাছ—তখন ঐ জ্ঞান সংশয় বলিয়া পরিচিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হইয়া থাকে। এইরূপ স্তম্ভকার প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ করিলেনঃ—

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবর্তনপর অশব্দ অব্যভিচারী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষ। ১।১।৪

অনুমান।

অনুমান কি ? সূত্রকার অনুমানের লক্ষণ করেন নাই।
তিনি বলিলেন :—

“তারপর প্রত্যক্ষজ্ঞ পূর্ববৎ শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট এই তিন রকম অনুমান।”

প্রত্যক্ষজ্ঞ।

অনুমান প্রত্যক্ষজ্ঞ, অর্থাৎ অনুমান প্রত্যক্ষ হইতে জন্মিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মূল কবিতা অনুমান হইয়া থাকে। আকাশে মেঘ উঠিতে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে ‘বৃষ্টি হইবে’ এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন যে প্রত্যেক অনুমানেই লিঙ্গ-দর্শন এবং লিঙ্গ-লিঙ্গীব সম্বন্ধদর্শন আবশ্যিক, এবং ইহা বা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান

পূর্ববৎ।

অনুমান তিন রকম,—পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ববৎ অনুমানে কারণ দেখিয়া কার্যের অনুমান করা হয়। কারণ কার্যের পূর্বে থাকে বলিয়া এখানে পূর্বলক্ষে কারণ বৃত্তিতে হইবে। পূর্ববৎ কিনা কারণবৎ, অর্থাৎ যে অনুমানে কারণটি উপস্থিত আছে মেঘ হইতে দেখিলে, মেঘরূপ কারণের দ্বারা বৃষ্টিরূপ কার্যের অনুমান পূর্ববৎ অনুমান।

শেষবৎ

শেষবৎ অনুমানে কার্য দ্বারা কারণের অনুমান হইয়া থাকে। শেষ কি না কার্য। শেষবৎ অনুমানে শেষ অর্থাৎ কার্যটি হাতে আছে, উহা দ্বারা অনুপস্থিত কারণের অনুমান করা হইয়া থাকে। নদীর জল বাড়িয়া গিয়াছে, বোলা হইয়াছে, বাস্তা খাট সিক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি কার্য দেখিয়া উহাদের কারণীভূত বৃষ্টির অনুমান শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট।

যখনই আমরা একটি জিনিস এখন একস্থানে এবং তারপর আরেকস্থানে দেখি তখনই বুঝি যে উহা পূর্বস্থান হইতে শেষস্থানে গিয়াছে। গতি ভিন্ন জিনিসের স্থানপরিবর্তন দেখি না। চন্দ্র এখন একস্থানে, দুই

ঘণ্টা পরে আরেকস্থানে, দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব চন্দ্রেবও গতি আছে। এইরূপ অনুমানের নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। ইহাকে কেন সামান্যতোদৃষ্ট বলে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

নানান্ ব্যাখ্যা।

উপরে পূর্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্টেব ব্যাখ্যা দেওয়া হইল, তাহা স্তায়ভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। • স্তায়ভাষ্যে এতদ্ভিন্ন অন্ত্যেকরকম ব্যাখ্যাও আছে। সামান্যকারিকার ভাষ্যে গোড়পাদ ইহাব আর-একরকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তিন ব্যাখ্যার কোনটা সূত্রকারের অভিপ্রেত ছিল, তাহা জানা যায় না। বস্তুতঃ এমনও হইতে পারে যে, এই তিনটাই সূত্রকারের অনভিপ্রেত বা ভুল ব্যাখ্যা।

নব্য স্তায়ের ব্যাখ্যা।

ইহা ছাড়া, নব্য স্তায়ের আচার্যগণ ইহার আরও একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ববৎ কেবলদ্বয়ী, শেষবৎ কেবলব্যতিবেকী, এবং সামান্যতোদৃষ্ট অধর-ব্যতিবেকী অনুমানের নামান্তর মাত্র।

ব্যাপ্তি, সাধ্য, লিঙ্গ বা হেতু,

পক্ষ, সপক্ষ, বিপক্ষ।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। একজন লোক রাস্তাবরে, মাঠে, গৃহপ্রাঙ্গণে বা বনে, যেখানেই ধূম দেখিয়াছে, সেখানেই আগুনও দেখিয়াছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাহার মনে একটা সংস্কার হইয়াছে যে, ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহাদের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য্য আছে। এই সাহচর্য্য-নিয়মের নাম ব্যাপ্তি। ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি স্থিৎ হইয়া গেলে পরে, যদি সে কোনও স্থানে ধূম দেখে, তবে তথায় তাহার বহ্নির অনুমান হয়।

মনে কর যেন সে একটি পক্ষতে ধূম দেখিল। এখন “পক্ষত ধূমবান্” এই জ্ঞানটি এবং “ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য-নিয়ম বা ব্যাপ্তি আছে” এই জ্ঞানটি, এই দুইটী জ্ঞান হইতে “পক্ষত বহ্নিমান্” এই জ্ঞানটি হইল। এখানে পক্ষতকে পক্ষ, বহ্নিকে সাধ্য এবং ধূমকে হেতু বা লিঙ্গ

বলে। যেখানে সাধ্য আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়, তাহাই পক্ষ। পর্তুতে ধূম দেখিতেছি, কিন্তু বহি আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়, অতএব পর্তুত পক্ষ। যেখানে সাধ্য আছে বলিয়া নিশ্চয়ই জানা আছে, তাহা সপক্ষ, যেমন মহানস, মাঠ, বন ইত্যাদি। যেখানে সাধ্য নাই বলিয়া নিশ্চিত জানা আছে তাহা বিপক্ষ, যেমন জলহ্রদ; জলহ্রদে বহি নাই ইহা নিশ্চিত।

যে অনুমানে কেবলমাত্র সপক্ষ আছে বিপক্ষ নাই তাহাকে কেবলমাত্র, যে অনুমানে কেবলমাত্র বিপক্ষ আছে সপক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী, এবং যেখানে সপক্ষ বিপক্ষ উভয় আছে তাহাকে অদ্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যথা জৈশ্বর জৈয়—যেহেতু তদ্বোধক শব্দ আছে। এখানে জৈয় সাধ্য। জৈয়বহীন কোন পদার্থ নাই, অতএব ইহা কেবলমাত্র অনুমান। পৃথিবী অস্ত্রান্ত ভূত হইতে ভিন্ন, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধ আছে। ইহা কেবলব্যতিরেকী অনুমান। এখানে সপক্ষ নাই, কেন না অস্ত্রান্ত ভূত হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। পর্তুত বহিমান যেহেতু উহা ধূমবান, এটা অদ্বয়ব্যতিরেকী অনুমান, কারণ এখানে সপক্ষ (মহানস, গোষ্ঠ, চন্দ্র) ও বিপক্ষ (জলহ্রদ) উভয়ই আছে।

সমালোচনা।

কিন্তু পূর্ববৎ শব্দে কেবলমাত্র, শেষবৎ শব্দে কেবলব্যতিরেকী এবং সামান্ততঃ শব্দে অদ্বয়ব্যতিরেকী বুঝায় তাহা চিত্তা করিবার বিষয়। বস্তুত সূত্রকার যে কেবলমাত্র ও কেবলব্যতিরেকী অনুমানের কথা জানিতেন, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। ভাষ্যাদি প্রাচীনতর গ্রন্থে উহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ “ব্যাপ্তি”বাদ জানা না থাকিলে, কেবলমাত্র, কেবলব্যতিরেকী ও অদ্বয়ব্যতিরেকী এইরূপ বিভাগ নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি কি? যেখানে যেখানে ধূম আছে সেইখানে সেইখানে বহি আছে, এইরূপ সাহচর্য-নিয়মকে ব্যাপ্তি বলে। সহচর শব্দ ক্য সাহচর্য। যাহারা একত্র থাকে তাহাদিগকে সহচর বা সমানাধিকরণ বলে। বহি ও ধূম

একত্র থাকে, অতএব উহারা সহচর বা সমানাধিকরণ। সহচর বা সমানাধিকরণ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সাহচর্য বা সমানাধিকরণ্য। অতএব বহি ও ধূমের মধ্যে সাহচর্য বা সমানাধিকরণ্য রহিয়াছে। কিন্তু সাহচর্য বা সমানাধিকরণ্য মাত্রই ব্যাপ্তি নহে। কোনরূপ সাহচর্যকে ব্যাপ্তি বলে তাহা বুঝাইবার জন্য সাহচর্যের একটু বিশেষণ দেওয়া হইল। যেখানে যেখানে ধূম অর্থাৎ হেতু সেখানে সেখানে বহি অর্থাৎ সাধ্য। এইরূপ সাহচর্যই ব্যাপ্তি এবং এইরূপ সাহচর্য হইতেই অনুমান হইয়া থাকে। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি স্থির হইয়া গেলে পরে কুত্রাপি হেতু দেখিলে সেখানে সাধ্যের অনুমান হয়।

পৃথিবী অস্ত্রান্ত ভূত হইতে ভিন্ন, কেননা পৃথিবীতে গন্ধ আছে। এখানে পৃথিবী পক্ষ, অস্ত্রান্ত-ভূত-হইতে-ভিন্ন সাধ্য এবং গন্ধ হেতু। এখানে পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি খাটে না। কেননা যেখানে যেখানে হেতু অর্থাৎ গন্ধ, সেখানে সেখানে সাধ্য অর্থাৎ অস্ত্রান্ত-ভূত-হইতে-ভিন্ন সাধ্য আছে, এইরূপ বলা চলে না। একমাত্র পৃথিবীতেই গন্ধ আছে। পৃথিবী অস্ত্রান্ত ভূত হইতে ভিন্ন কিনা ইহা বিচারের বিষয়। কাজেই এখানে পূর্ববর্ণিত ব্যাপ্তি রহিল না। এই দোষ নিবারণের জন্য আরেকরকমের ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। যেখানে যেখানে সাধ্যাত্তাব আছে, সেখানে সেখানে হেতুতাব আছে; এইরূপ ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এই ব্যাপ্তি এখানেও রহিয়াছে। অতএব এখানে অনুমান হইতে পারিল। আবার, জৈশ্বর জৈয়, যেহেতু তদ্বোধক শব্দ আছে; এখানে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি খাটে না—এখানে মাত্র প্রথমোক্ত অর্থাৎ অদ্বয়ব্যাপ্তি আছে। পর্তুত বহিমান যেহেতু উহা ধূমবান; এখানে অদ্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয়-বিধ ব্যাপ্তিই খাটে। যেখানে যেখানে ধূম (মহানস, চন্দ্র, গোষ্ঠ) সেখানে সেখানে বহি (অদ্বয় ব্যাপ্তি) এক যেখানে যেখানে বহিমান অতাব (জলহ্রদাদি) সেখানে সেখানে ধূমের অভাব (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি)। অদ্বয় ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এইরূপ দুইপ্রকারের ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই কেবলমাত্র, কেবলব্যতিরেকী ও অদ্বয়ব্যতিরেকী এই তিন রকম অনুমান হইল।

অক্ষপাদ ব্যাপ্তি জানিতেন না।

বর্তমান জ্ঞানসূত্রে ব্যাপ্তির কোনও উল্লেখ নাই।

বস্তুত জ্ঞানসূত্রকার যে ব্যাপ্তি কি তাহা জানিতেন না, এই পক্ষেও চুই একটা যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

(১) জ্ঞানসূত্রে বা জ্ঞানসূত্রভাষ্যে ব্যাপ্তি বা তদর্থক কোনও শব্দ উপলব্ধ হয় না।

(২) জ্ঞানসূত্রকার বলিলেন কার্য দেখিয়া কারণ অনুমিত হয় (শেষবৎ), কারণ দেখিয়া কার্য অনুমিত হয় (পূর্ববৎ) এবং এতদ্বিধা সামান্ততাদুষ্ট নামে আর এক রকমের অনুমানও আছে। যদি ব্যাপ্তি কি তাহা জানা থাকিত তবে তিনি বলিতেন যে ব্যাপ্য দেখিয়া ব্যাপকের অনুমান হয়।

এইরূপে বৈশেষিক সূত্রকার বলিলেন ;—

“ইহা ইহার কার্য, কারণ, সম্বোধী, বিরোধী, সম্বারী ইহাই লৈঙ্গিক জ্ঞান” (৯২১১) অর্থাৎ কার্য, কারণ, সম্বোধী, বিরোধী, সম্বারী দেখিয়া যথাক্রমে কারণ, কার্য, সম্বোধী এবং সম্বারী সম্বন্ধের অনুমান হয়।

এখানেও ব্যাপ্য দোষের ব্যাপকের অনুমান হয় একথা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে উল্লিখিত হইল না। বস্তুত জ্ঞান ও বৈশেষিক সূত্রকারেরা যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন সে সময়ে “ব্যাপ্তিবাদ” আবিষ্কৃতই হয় নাই। কেবলমাত্র সাংখ্যসূত্রে (৫২৯) ব্যাপ্তির লক্ষণ ও পরীক্ষা আছে এবং ঐ প্রসঙ্গে পঞ্চশিখের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া ধরিলেও, যে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সাংখ্যসূত্রকার পঞ্চশিখকে ব্যাপ্তিবাদজ্ঞ বলিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। পঞ্চশিখ অতি প্রাচীন সাংখ্য্যচার্য। মহাভারতে তাঁহার উল্লেখ আছে। অতএব বর্তমান জ্ঞানসূত্র বা উহার প্রাচীনতম অংশগুলিকে পঞ্চশিখ হইতেও প্রাচীন বলা যায়।

(৩) জ্ঞানসূত্রের পঞ্চম অধ্যায় ও তাহার ভাষ্য মনোযোগ পূর্বক অধ্যয়ন করিলে স্বতঃই এইরূপ সন্দেহ হয় যে, সূত্রকার ব্যাপ্তি কি তাহা জানিতেন না। জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থান সম্বন্ধে সূত্রীর্ষ আলোচনা ব্যাপ্তিবাদজ্ঞের পক্ষে নিরর্থক। ব্যাপ্তিবাদজ্ঞ নব্যনৈয়ায়িকগণ স্বকীয় গ্রন্থে জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থানের আলোচনা আদৌ করেন নাই।

(৪) ভাষ্যকার ন্যায়ের উদাহরণ দিতেছেন—(১১১৩৫) যাহার উৎপত্তি নাই তাহা নিত্য। শব্দের উৎপত্তি আছে, অতএব শব্দ অনিত্য।—এই উদাহরণটা ভ্রমাত্মক। ব্যাপ্তিবাদ ভাল কবিতা জানা থাকিলে, এরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব নহে।

এইসকল কারণে মনে হয়, যে, অক্ষপাদ বা বাৎসায়ন কেহই ব্যাপ্তিবাদ পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এবং ব্যাপ্তিবাদ জানা না থাকিলে অনুমানকে কেবলমাত্রী, কেবলব্যতিরেকী এবং অদ্বয়ব্যতিরেকীরূপে ভাগকরা যায় না। তাই নব্যন্যায়ের ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিয়াছি।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যাখ্যাত হইল। উপমান ও শব্দ কি তাহা বলিতেছি।

উপমান।

“গবয় গোসদৃশ” এই কথাটা শুনিয়া, পরে গবয় দেখিলে, মনে হয় যে এই পরিসদৃশমান জন্তুটির নাম গবয়। এইরূপে শব্দের সহিত তাহার অভিধেয় বস্তুর সম্বন্ধনির্ণয় উপমানের ফল।

সমালোচনা।

এই ব্যাখ্যা ভাষ্যবার্ত্তিক ও নব্যন্যায়-সম্মত। কিন্তু আধুনিকদের নিকট কতকগুলি শব্দের অর্থনির্ণয়ের জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করা বড় আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজিতে বাহাকে এনালজি (Analogy) বলে, উপমান কি তাহাই? এসম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে একটীমাত্র পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মীমাংসকেরা উপমানেব আরএকবাক্য ব্যাখ্যা করেন, উহা মীমাংসাদর্শন আলোচনার সময় প্রদর্শিত হইবে।

শব্দ।

সূত্র প্রমাণবলে যাহারা অর্থের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আপ্ত (আপ্—লাভ করা+ক্ত) বলে। আপ্তেরা যে উপদেশ দেন তাহাই শাস্ত্রপ্রমাণ। অর্থাৎ যে বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ সেই বিষয়ে তিনি আপ্ত। অবশ্য মন্ত্রে রাখিতে হইবে যে আপ্তেরা মিথ্যাবাদী নহেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান প্রদান কবিতার জন্যই বাক্য প্রয়োগ

করিয়া থাকেন। যাহা নিকন্তে ঋষির যে লক্ষণ করিয়াছেন, (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মানো ঋষয়ো বভূবুঃ) ভাষ্যকার সেই লক্ষণকেই আশ্রয় লক্ষণ বলিয়া লিখিয়াছেন।

আশ্রয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ঋষিগণ ও (২) লৌকিকগণ। উভয়ই সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মানো হইলে আশ্রয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণের উপদিষ্ট পদার্থ প্রত্যক্ষযোগ্য না হইলেও উহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবিতো হইবে। এইরূপে জ্ঞানস্বত্বকার স্বর্গাদিপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়া লইলেন। বার্তিককাব হইতে আবিস্কৃত করিয়া অনেকে শব্দের অন্তরূপঃ অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা নব্যজ্ঞানের প্রস্তাবে প্রতিপাদিত হইবে।

জ্ঞানস্বত্রে আলোচিত ষোলটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি প্রমাণ, দ্বিতীয়টি প্রমের। প্রমাণ কি তাহা দেখান হইয়াছে, এখন প্রমের আলোচিত হইবে।

প্রমের।

আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ প্রত্যভাব, ফল, হুঃখ, অপবর্গ—ইহার প্রমের। (১।১৯)

জগতে যে কেবলমাত্র এই দ্বাদশটি প্রমের বা জ্ঞাতব্য-বিষয় আছে তাহা নহে। তবে এই দ্বাদশটির তত্ত্ব জানিলে অপবর্গ হয় এবং ইহাদের মিথ্যাজ্ঞানেব ফল সংসার, এইজন্ত ইহা বা বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

হুঃখ।

প্রমেরের পবিসংখ্যানে “হুঃখেব” উল্লেখ আছে কিন্তু সুখের নাম নাই। বড়দর্শনসমুচ্চর নামক গ্রন্থে নৈয়ায়িক-দর্শনের বর্ণনার মধ্যে নিম্নলিখিত পংক্তিটি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রমের চান্দ্রদেহাধ্বজীক্সিয় স্বখানি চ। (২৪)।

অর্থাৎ আত্মা, দেহ, অর্থ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ প্রভৃতি প্রমের। এখানে হুঃখের বদলে সুখের নাম আছে। চৌখাখা সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত বড়দর্শনসমুচ্চর হইতে উপরোক্ত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় আদিমাতিক সমিতির পক্ষ হইতে বলোনা নগরের ডাক্তার ফুয়ালি (Luigi Suali Ph. D. of Balogna) বড়দর্শনসংগ্রহেব যে সংস্করণ করিয়াছেন তাহাতে একটু সামান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

প্রমের চান্দ্রদেহাধ্বজীক্সিয় স্বখানি চ। (২৪)।

এখানেও “সুখ” আছে, হুঃখ নাই। অতএব ‘সুখ’ নে একসময়ে প্রমেরস্বত্রে ছিল তাহার সম্ভে নাই। ইহা দেখিয়া স্বধী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ নৈয়ায়িকেরা অতি প্রাচীনকালে (ভাষ্যকারেরও পূর্বে) সর্বাভাববাদী বা পেসিমিষ্ট (pessimist) ছিলেন না। এই অনুমান অতি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহাব সপক্ষে একটা ন্তি মাধবাচার্য্যের ‘সম্ভোপ শঙ্কবক্তয়ে’ পাওয়া যায়।

তত্রাপি নৈবাধিক আন্তগর্ভঃ কণাদ পক্ষাচ্চবাঞ্চপক্ষে।
মুক্তির্লিশেষ বদ সর্ববিচ্চেৎ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ভান্ন সর্ববিচ্চেৎ
অত্যন্তনাশে শুণসজ্জতে ধী হিতি নভোবৎ ঞ্ণভক্ষপক্ষে।
মুক্তির্লিশেষে চরণাঞ্চপক্ষে সানন্দ সংচিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ ॥

(১৩৬৮৬৯)

শঙ্করাচার্য্যের দ্বিখিত্তয়ের সময়ে নৈয়ায়িক তাঁহাকে বলিলেন “যদি তুমি সর্ববিৎ হও, তবে কণাদ ও অক্ষপাদেব দর্শনে মুক্তিব কি ভেদ আছে তাহা বল, আর যদি তাহা না বলিতে পার, তাহা হইলে তুমি যে সর্ববিৎ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা পবিত্যাগ কর।” (১৩৬৮)। আধুনিক নৈয়ায়িকেরা কণাদ ও অক্ষপাদেব দর্শনকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

বস্তুত নব্যজ্ঞানের দর্শন বৈশেষিক দর্শন, তবে ভাষা তাহার নিজস্ব। এইজন্ত আমরা নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক মুক্তিতে কোন তফাৎ দেখি না। শঙ্করাচার্য্যের (অথবা মাধবাচার্য্যের) সময়েও সাধারণ দার্শনিকেরা, আমাদেরই মতন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মুক্তিকে এক বলিয়া বুক্তিতেন। কিন্তু তৎকালে জুদুর কাশ্মীরের পণ্ডিতদিগের নিকট হার ও বৈশেষিকের মুক্তিতে পার্থক্য অবদিত ছিল না। তাই তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে ঠকাইবার জন্ত উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য উত্তর দিলেন “আত্মার সহিত শুণেব সম্বন্ধেব অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশেব মত [সুখ-হুঃখবহিত] আত্মার যে অবস্থা হয় কণাদেব মতে তাহাই মুক্তি।”

অক্ষপাদেব মতে মুক্তিতে “আনন্দসংচিৎ” থাকে। এই প্রমাণানুসারে অক্ষপাদ-দর্শনে মোক্ষে আনন্দের সত্তা স্বীকাব কবিলে, প্রমেরস্বত্রেও সুখের উল্লেখ সম্ভবপব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পক্ষিপন্থানী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন

নৈসর্গিকই “সুখ”কে প্রেমেরহুত্রে স্থান দেন নাই। বস্তুতঃ
হৃৎখের পরীক্ষার জন্য একটা হৃৎও আছে, হৃৎখের জন্য
হৃৎ নাই। তবে যড়দর্শনসমুচ্চরে, তাহার টীকাহুত্রে, এবং
সংক্ষেপ শব্দরজয়ে এইরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্য
রহিল কেন ? এসকল অতি গুরুতর কথা। বঙ্গীয় পণ্ডিত-
সমাজের দৃষ্টি এইসকল বিষয়ে আকৃষ্ট করিবার জন্যই এত
কথা লিখিলাম।

অর্থ।

এখন প্রেমেরগুলির পরিচয় দিতেছি। আত্মা, শরীর
ও ইন্দ্রিয় কি তাহা সকলের মোটামুটি জ্ঞানা আছে। অর্থ-
শব্দে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ বুঝায়।
ইহারা যথাক্রমে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই
পঞ্চভূতের গুণ, এবং নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রবণ ও কর্ণ দ্বারা
ইহাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বুদ্ধি।

বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান শব্দ একার্থ বাচক। সাধুগণ
বুদ্ধি বলিয়া একটা (অন্তঃ—) করণ স্বীকার করেন।
তাহাদের মতে বুদ্ধি দ্রব্যগদার্থ। নৈসর্গিকের মতে বুদ্ধি
দ্রব্য নহে, উহা গুণ।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ।

বিরহাতঙ্ক

(লিখিয়া দেবী)

মৃণাল ভাঙিয়া করিতে ভোজন

জ্যোৎস্না ভাবিয়া শিহরি উঠে।

ভূষিত সে, তবু, তারকা ভাবিয়া

না হৌয় সলিল পত্রপুটে।

নিশি না আসিতে দেখে সে আধার

কমলে নিরখি' ভ্রমর-বীধি।

দিবসে করিল হৃৎ-শরীরী

চক্রবাকের বিরহ-ভীতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হেমকণা

(২)

সূর্যোত্তাপে কঠিন তুষাবরাশি যখন গলিতে আরম্ভ
হইল তখন আমাদিগেব তুষারকণায় পরিণত জলকণাও
গলিয়া শ্রোতে মিশ্রিত হইল। পর্তুতলীর্ণ হইতে
নিম্নাভিমুখে ধাবমান জলশ্রোতের বেগে আকাশস্পর্শী
শুল তুষাবস্তু চূর্ণীকৃত হইল। রাশি রাশি চূর্ণ তুষারের
সহিত শত শত বজ্রপাতের ত্রায় আকাশভেদী শব্দের মধ্যে
আমরা নিম্নাভিমুখে পতিত হইলাম। পতনের সময়ে
পর্তুতের সাঁহুদেগে চূর্ণ তুষারের লক্ষ লক্ষ কণা উল্লঙ্ঘনে
শত শত তুষারউৎসের সৃষ্টি হইয়াছিল। সূর্যালোক
উৎসবাশির উপর পাতত হইয়া শত শত ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি
করিয়াছিল। পতনকালে আমি যে পাষণথণ্ডে আবদ্ধ
ছিলাম তাহা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শিলাথণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত
হইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, খেত তুষারউৎসসমূহের মধ্যে
কণেকের জন্য একটা ধূসর বর্ণের উৎস দৃষ্ট হইয়াছিল,
কণেকের জন্য আমি মেঘমধ্যস্থ তারকার ত্রায় উজ্জল
হইয়া উঠিয়াছিলাম, কারণ শৈলনিগড়মুক্ত হইয়া আমি
উৎসের বালুকারাশির মধ্যে সূর্যালোকে পতিত হইয়া-
ছিলাম এবং হেমাত আলোক আমার মস্তক হেমগাত্রে
প্রতিফলিত হইয়াছিল। মুক্ত হইয়া শ্রোতস্বিনীবক্ষে
অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলাম; তদন্তীত আমার গতান্তরও
বোধ হয় ছিলনা। কিয়দূরে সমগ্র তুষাররাশি ক্ষীতল
জলে পরিণত হইয়াছিল, স্বচ্ছ সলিলরাশি অতি
দ্রুতবেগে রাশি রাশি পাষণ খেত করিয়া নিম্নাভিমুখে
ধাবিত হইয়াছিল। প্রবল শ্রোতের তাড়নে বালুকা-
কণাটা পর্যন্ত নদীগর্ভে স্থান পাইতেছিলনা। নদীর
উভয় কুলেই গভীর বন, দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজি মস্তক
উন্নত করিয়া আকাশ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতে-
ছিল, দূরে নীলাভ গিরিরাজি বতদূর দৃষ্টি ধাবিত
হয় ততদূর পর্যন্ত সমান্তরালে বিস্তৃত ছিল, জলমগ্ন
পাষণথণ্ডের আঘাতে নদীবক্ষে শত শত ক্ষুদ্র তরঙ্গের
উৎপত্তি হইতেছিল ও উজ্জল সূর্যরশ্মিগুলি তাহার উপর
ক্রীড়া করিতেছিল। এইরূপে নদীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে

নিরাভিযুখে বাইতেছিলাম, ক্রমে সূর্য্যরশ্মিগুলি ক্রীণ-
শক্তি হইয়া আসিতেছিল, ধূবে ধূসবর্ণ কুণ্ডলিকা পর্কত-
মালাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল, বনমধ্যে অন্ধকার গাঢ়
হইয়া উঠিল। জলকণাব কাছে শুনিয়াছিলাম এইরূপে
দ্বিবস অতীত হইয়া রাত্রি আসিয়া থাকে, অল্পমানে
বুঝিলাম অন্ধকার আসিতেছে, শীত্ৰই দৃশ্যমান জগতকে
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। নিমেষের মধ্যে নদীবক্ষস্থিত
সুবর্ণরঞ্জিত তবঙ্গগুলি নীল হইয়া গেল; উভয়কূলবর্তী
বনরাজি গাঢ় কালিমায় আবৃত হইয়া গেল, আলোক ক্রীণ
হইতে ক্রীণতর হইতে হইতে পরিশেষে হঠাৎ নির্বাপিত
হইয়া গেল। তখনও নদীর জলরাশি সমভাবে ছুটিতেছিল;
আমি ভাবিয়াছিলাম পথ তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া জলরাশি
তুন্তিত হইয়া আলোকের প্রতীকার অপেক্ষা করিবে,
কিন্তু তাহার পরিবর্তে মুহু মধুর ধ্বনি করিতে করিতে
সমভাবে জলস্রোত নিরাভিযুখে চলিল। তখন শীতল
নৈশবায়ু দ্রুতবেগে উত্তবাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল ও
বায়ুচালিত বনানী ঈষৎ শঙ্কারমান হইতেছিল। সমভাবে
নদীবক্ষে চলিতেছিলাম, ক্রমে স্রোত মন্দীভূত হইতেছিল,
জলের শীতলতার হ্রাস হইতেছিল। বহুদূরে পর্কতশীর্ষে
ক্রীণ আলোক দৃষ্ট হইল, ধূসরবর্ণ মেঘ ও কুণ্ডলিকার মধ্যে
ক্রীণ শুভ্রবর্ণ আলোকের রেখামাত্র দৃষ্ট হইল, ধূসরবর্ণ
আবরণ মুক্ত হইয়া গিরিশৃঙ্গগুলি নীলাভ হইয়া উঠিল।
উপত্যকার অপবপ্রান্তে নীলাকাশে রমণীর কেশদামে
জড়িত মণিমালাব স্রায় তারকাপুঞ্জ শোভা পাইতেছিল,
বনমধ্যে তরুশীর্ষে ধূসরবর্ণ কুণ্ডলিকা ক্রমে তুষারশুভ্র বলিয়া
বোধ হইতে লাগিল, বিহঙ্গমকুল উল্লাসে নানাবিধ ধ্বনি
করিতে আরম্ভ করিল, শুভ্র স্বচ্ছ আলোক রজনীর
অন্ধকার খোঁত করিয়া ফেলিতে লাগিল, নদীর জল
পুনরায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, দেখিতে পাইলাম নদীবক্ষ
সুদূর বৃহৎ উপলখণ্ডে আচ্ছন্ন ও স্থানে স্থানে শুভ্র
ধূসর বালুকাক্ষেত্রে আবৃত। দূরস্থিত গিরিশীর্ষ হঠাৎ
উজ্জলবর্ণ হইয়া উঠিল, দ্রুতবেগে একটি সূর্য্যরশ্মি আসিয়া
তরুশীর্ষসমূহ কাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল, রজনীর
শিশিররাশি সহস্র সহস্র শুভ্র সুস্ফার স্রায় স্রাবলপত্র-
রাশিতে সঞ্চিত ছিল, সূর্য্যালোক আসিয়া তাহাদিগকে

সহস্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল। একটার পর দুইটা
করিয়া এইরূপে সহস্র সহস্র কোটি কোটি সূর্য্যরশ্মি আসিয়া
শুভ্র স্রাবল ও ধূসরবর্ণ জগতকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া
দিল, স্রোতস্থিনীর স্বচ্ছ সলিল হঠাৎ গলিত সুবর্ণর
ধারায় পরিণত হইল। নদীর বেগ মন্দীভূত হইয়াছে,
ধীরে ধীরে জলরাশি বালুকাস্তরের উপর বহিয়া চলিয়াছে,
উভয় কূলে বহুদূর পর্য্যন্ত ধূসর বালুকাস্তর ব্যতীত
আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, উপকূলবর্তী বনরাজি বহুদূরে
পড়িয়াছে, গিরিরাজি আরও দূর-জগতের প্রান্তে ক্ষুদ্র নীল
রেখার স্রায় প্রতীয়মান হইতেছে। শত শত হেমকণা
নদীগর্ভে উপলখণ্ডের পার্শ্বে বা বালুকামধ্যে আশ্রয়লাভ
করিতেছিল, আমিও ভাবিতেছিলাম বহুদূর পর্য্যটন করিয়া
বহু ক্লান্ত হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম আবশ্যক। আমার
মনোভাব বৃদ্ধিতে পারিয়াই যেন স্রোতস্থিনী আমাকে বুঝে
নিষ্কেপ করিল, বায়ুর তাড়নে কয়েকটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ একত্রিত
হইয়া আমাকে শীর্ষে লইয়া বালুকাস্তরের উপর লক্ষ প্রদান
করিল, আমি বালুকাক্ষেত্রে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম, জলরাশি
পলায়ন করিল, আর্ত্ত বালুকাসৈক্য আমার বাসভূমি
হইল।

বালুকাসৈক্যে কতদিন অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা
বলিতে পারি না, দিনের পব দিন আসিত, শুভ্র বালুকা-
ক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়া সময় অতিবাহিত করিতাম। বালুকা-
ক্ষেত্রে আমার স্রায় শত শত হেমকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত
ছিল, সূর্য্যকিরণ আসিয়া যখন বালুকাক্ষেত্রে আলোকিত
করিত তখন হেমকণাগুলি প্রজ্বলিত অগ্নিশূলিকার স্রায়
প্রতীয়মান হইত, বালুকাক্ষেত্রেখানি কোন বরবর্ণিনীর
সুবর্ণখচিত শুভ্র কাব্য বস্ত্রের স্রায় নদীবোলায় স্তম্ভিত
ছিল। কখনও কখনও হৃষ্ট বালকেব স্রায় বায়ু আসিয়া
বালুকাকণাগুলির কর্ণে কি একত মন্ত্র প্রদান করিত, তাহার
বলে সমগ্র বালুকাক্ষেত্রে উন্নত হইয়া উঠিত ও তাণ্ডব নৃত্যে
ক্ষুদ্র উপত্যকার শান্তিভঙ্গ করিত, বায়ু ঈষৎ হাস্ত করিয়া
দরিয়া বাইত, তখন হতাশভাবে বালুকাকণাগুলি ভূপৃষ্ঠে
পতিত হইত। কোন কোন দিন মৃগবৃথ রজনীযোগে
জলপান করিতে আসিত, সন্ধ্যার শীতলতার প্রকল্প হইয়া
শুভ্র বালুকাক্ষেত্রে মৃগশিঙগণ উল্লাসে নৃত্য করিত, তখন

বাঁদুকাকাগুলি তাহাদিগের পদক্ষুদ্র হইয়া বড়ই লাঞ্চিত হইত। কোন কোন গভীর নিশীথে সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকগণ ধীরে ধীরে আসিয়া জলপান করিয়া বাইত, পরদিন মুগমুখ তাহাদিগের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া দূরে পলায়ন করিত।

একদিন প্রভাতে গৌরবর্ণ ধর্মীকৃতি মুগচর্ম্মাচ্ছাদিত মনুষ্যবয়স বনমধ্য হইতে বালুকাক্ষেত্রে আসিল, তখন উজ্জল সূর্যালোক হেমকণাগুলিকে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া মহানন্দে একজন অপরকে কহিল “পাইয়াছি,” দ্বিতীয় মনুষ্যও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মস্তকচালনা করিল। উভয়ে আসিয়া নদীজলসিক্ত বালুকাক্ষেত্রে পৃষ্ঠস্থিত মুগচর্ম্ম উন্মোচন করিল ও বেতস নির্ম্মিত পাত্রে বালুকারাশি গ্রহণ করিয়া নদীজলে যৌত করিতে লাগিল ও কিপ্রহস্তে কন্টকাকার ধাতুনির্ম্মিত শলাকা দ্বয় গ্রহণ করিয়া বালুকা-মধ্যস্থিত হেমকণাগুলি চর্ম্মনির্ম্মিত আধারে সঞ্চয় করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা দিবস অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যা আগত হইলে বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বৃক্ষতলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল ও শিশিরসিক্ত শপশয্যায় রজনী যাপন করিল। পবদিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত হেমকণা আহরণ করিয়া নিজ নিজ চর্ম্মপেটিকা পূর্ণ করিল, তাহাব মধ্যে আমিও বদ্ধ হইলাম। আমার সহিত একই পাষণ-থণ্ডে আবদ্ধ বহু হেমকণা মনুষ্যদ্বয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে চর্ম্মাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহারা নদীর জীতলজলে অবগাহন করিল, বেতস পাত্রদ্বয় যৌত করিল ও নিজ নিজ চর্ম্ম পরিধান করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে বহুদূর গমন করিয়া সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্ব্বতের সাহস্রদেশে উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে তাহারা দেখিতে পাইল একটি হরিণী তাহার শাবকদ্বয় লইয়া নদীতীরে আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি শাবক মনুষ্যদ্বয়কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শবে নিহত হইল, হরিণী অপর শাবক লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল। তখন মনুষ্যদ্বয় একটি বৃক্ষ হইতে দীর্ঘ শাখা ছেদন করিয়া নিহত হরিণিশিশুকে তাহাতে আবদ্ধ করিল ও উভয়ে তাহাকে বহন করিয়া পর্ব্বতের পারদেশে উপস্থিত হইল ও একটা বৃহৎশুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শুষ্ক হারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া নিহত হরিণিশিশুর কিয়দংশ রন্ধন

করিয়া ভক্ষণ করিল ও অগ্নির পার্শ্বে শয়ন করিয়া রজনী যাপন করিল। প্রভাতে আমাদিগকে লইয়া মনুষ্যদ্বয় পর্ব্বতে আরোহণ করিল ও সমস্ত দিবস পথ চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পর্ব্বতের অধিত্যকায় তাহাদিগের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। পর্ব্বতের অধিত্যকায় বৃহৎবৃক্ষসমূহের ছায়ায় পাষণখণ্ড ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটার দেখিতে পাইলাম। গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যদ্বয় হরিণিশিশু বিখণ্ড করিয়া লইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল ও যে মনুষ্য আমাকে অধিকার করিয়াছিল সে তাহার বাসস্থানে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে তাহার জী ও দুই তিনটি বালক বালিকা উপবেশন করিয়া ছিল, তাহারা গৃহস্বামীকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। বালক-বালিকারা পিতার পৃষ্ঠস্থিত ধনুর্ধ্বাণ, চর্ম্ম ও নিহত মুগশিশুর অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিয়া বথাস্থানে রক্ষা করিল, গৃহস্বামী কটীদেশ হইতে হেমকণাপূর্ণ চর্ম্মপাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার জীর হস্তে প্রদান করিল। তাহাদিগের কথোপকথনে বুঝিলাম গৃহস্বামী পূর্বে বৎসব মুগ অবধে গমনকালে নদীতীরে বালুকাক্ষেত্রে বহু সূবর্ণকণা দেখিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পরে অমুসন্ধান করিয়া স্থান নির্ণয় করিতে পারে নাই। মুগয়া ও সূবর্ণসঞ্চয় তাহাদিগের গ্রামস্থ সকলের একমাত্র উপজীবিকা। পূর্বে বৎসরে গৃহস্বামী আবশ্যকমত সূবর্ণকণা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহারা আবশ্যকমত তুল, লবণ ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র জন্ম করিতে পারে নাই। শীতকালে মুগয়ালব্ধ মাংসে জীবনধারণ করিয়াছে, মুগচর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছে ও বহুকাল লবণ আশ্বাদন করে নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ স্থির করিল পরদিন গৃহস্বামী সংগৃহীত সূবর্ণ লইয়া দূরে উপত্যকায় আবশ্যকীয় জব্যাদি জন্ম করিতে বাইবে। জী আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিল, সকলেই একাসনে একপাত্র হইতে আহাৰ্য্য করিল ও গৃহমধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্নানপ্ৰসঙ্গ হইল। পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে গৃহস্বামী পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিতে লাগিল ও তৃতীয় গ্রহবে পর্ব্বতপাদ-মূলস্থিত এক বৃহত্তর গ্রামে উপস্থিত হইল। সেই গ্রাম

হইতেও বহু ধর্মাকৃতি মনুষ্য পণ্য বিনিময়ের অল্প উপত্যাকাস্থিত বিপণিসমূহে গমন করিতেছিল, কেহ স্ববর্ণকণা, কেহ গজদন্ত, কেহ মৃগচর্ম, কেহ বা গন্ধদার পৃষ্ঠে লইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছিল। আমার অধিকারী তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাকালে পূর্বতের পাদমূলস্থিত অরণ্যপ্রান্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সকলে রজনী বাপন করিল ও প্রভাতে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে অরণ্যের অপব প্রান্তে নদীতীরে একখানি ক্ষুদ্রগ্রামে উপস্থিত হইল। বক্রগতি নদীতীরে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহের ছায়ায় বৃক্ষশাখা ও শুষ্ক তৃণেব সাহায্যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীৰ নির্মিত হইয়াছে। তকতলে পরিত্রুত ভূখণ্ডে চারি পাঁচখানি বিপণি বসিয়াছে। কোন বিপণিতে তণ্ডুল, লবণ, তৈল, সূত ও শর্করা, কোন বিপণিতে নানাবর্ণে বস্ত্রিত রাশি রাশি কার্পাসনির্মিত বস্ত্র এবং একটি বিপণিতে উজ্জল লৌহ-নির্মিত নানাপ্রকার অস্ত্র বিক্রীত হইতেছিল। আমার অধিকারী নীল ও রক্তবর্ণ কার্পাসনির্মিত বস্ত্রখণ্ডের পবিত্রবস্ত্রে বিক্রেতাকে একমুষ্টি স্বর্ণ প্রদান করিলে বিক্রেতা স্ববর্ণমুষ্টি গ্রহণ করিয়া পিত্তলনির্মিত তুলামণ্ডে পবিমাণ নির্ণয় করিয়া আমাদিগকে তাহার কটদেশস্থ ক্ষুদ্র চর্মপেটিকায় নিক্ষেপ করিল ও আমার ভূতপূর্ব অধিকারীকে তাহার অভীক্ষিত বস্ত্রখণ্ডগুলি প্রদান করিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখিলাম দলে দলে পূর্বতবাসিগণ বিপণিসমূহে আসিয়া বহুআয়াসসহ স্ববর্ণকণা, গজদন্ত, মৃগচর্ম ও চন্দন প্রভৃতি গন্ধকাষ্ঠেব বিনিময়ে তাহাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গেল এবং সন্ধ্যার পূর্বে বিপণিসমূহের দ্রব্যাদি নিঃশেষিত হইল। বিক্রেতাগণ বিনিময়ে সংগৃহীত দ্রব্যাদি নিজ নিজ গণকুটীরে রক্ষা করিয়া রজনীতে বিশ্রাম-লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রেতাগণও বৃক্ষতলে তাহাদিগের পার্শ্বভ্য রীতি অনুসারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার পার্শ্বে নিদ্রিত হইল। প্রভাতে বণিকগণ অশ্ব ও উষ্ট্র ও বলীবর্দসমূহের পৃষ্ঠে বিনিময়লব্ধ দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল ও পার্শ্বতীরগণ ক্রীত দ্রব্যাদি পৃষ্ঠে বহন করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। যিনি আমাকে বস্ত্রবিনিময়ে লাভ করিয়া-

ছিলেন, তিনি স্বীয় বাসস্থান হইতে তিনটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্বীয় পণ্য লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার সমুদ্রয় পণ্য বিক্রীত হওয়ার উষ্ট্রত্রয় শূন্যপৃষ্ঠে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। একদিন বিশ্রামলাভ করিয়া ও বনমধ্যে বথেক্ষা আহারলাভ করিয়া উষ্ট্রত্রয় সুদীর্ঘ পাদক্ষেপে ভাববাহী অপরাপর পশুগণকে পশ্চাতে রাখিয়া অপবাহে আমার নূতন অধিকারীর বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহার বাসস্থান গ্রামে নহে, নগরে। দূর হইতে রক্তবর্ণ প্রাচীরবেষ্টিত শুভ্রহর্ম্যাদি-শোভিত নগর বস্ত্রবস্ত্র-পরিত্রিতা স্ত্রন্দরী কামিনীর স্তায় অপরাহ্নেব ক্ষীণ সূর্যালোকে শোভা পাইতেছিল। নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম পাষাণ-আচ্ছাদিত পথ নগরের সম্মুখে পাষাণনির্মিত সেতুর উপর দিয়া রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্মিত অন্ধকার গহ্বরবিশেষে প্রবেশ করিয়াছে। নগরপ্রাচীরের বহির্দেশে বেটন করিয়া একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে, পবে শুনিয়াছি তাহার নাম পরিখা। এই পবিখার উপরে পাষাণনির্মিত সেতু ও তাহার পরপারে রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্মিত অত্যুচ্চ অন্ধকার গহ্বরবিশেষ, তাহার নাম নগরতোরণ। তোরণের বহির্দেশে উজ্জললোহে আচ্ছাদিত বহু অস্ত্রধারী মনুষ্য দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন নূতন অধিকারীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইতে বুঝিলাম যে, নগরতোরণে প্রবিষ্ট হইতে হইলে পরিচয় দিয়া অমুমতি গ্রহণ করিতে হয়। উষ্ট্রত্রয় তোরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, দেখিলাম তোরণ মধ্যে ভীষণ অন্ধকার ও তোরণের উভয়পার্শ্বে লৌহনির্মিত স্তূপ দ্বার। বহির্দেশে আসিয়া দেখিলাম পথ উভয়পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্য দিয়া দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা সম্মুখেও কয়েকজন অস্ত্রধারী রক্ষী দণ্ডায়মান ছিল, তাহারাও পূর্ববিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রবেশ করিবর অমুমতি প্রদান করিল। দ্বিতীয় তোরণ অতিক্রম করিয়া উষ্ট্রত্রয় নগরে প্রবেশ করিল। নগর মধ্যে পাষাণাচ্ছাদিত সরল রাজপথ দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহার উভয়পার্শ্বে গগনস্পর্শী অট্টালিকাসমূহ। প্রতিগৃহের নিম্নতলে আলোক-মালায় সজ্জিত বিপণিসমূহ। দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় মনুষ্যসমূহ স্তম্ভে যাতায়াত করিতেছে, গো, অশ্ব ও

উদ্ভবাহিত রথ ও শকটসমূহ ক্ষতবেগে চালিত হইতেছে। এই রাজপথেব কিয়দংশ অতিবাহিত কবিতা উদ্ভবাহিত একটি সজ্জীর্ণ অন্ধকারময় পথেব মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ও কিয়ৎক্ষণ পরে একটি নাতিক্ষুদ্র ষ্ঠেতবর্ণ গৃহের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। জনৈক পরিচালক আসিয়া উদ্ভবাহিত বন্ধাধাবণ করিল, আমাদিগের নূতন স্বামী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রথম গৃহ হইতে গৃহান্তবে গমন করিয়া একটি ক্ষুদ্র লৌহনির্মিত পেটিকা উন্মুক্ত কবিতা কটিবদ্ধ চন্দ্রপেটিকার সহিত আমাদিগকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পুনরায় গভীর অন্ধকার মধ্যে পতিত হইলাম, অশুভবে বুঝিলাম সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু চন্দ্রপেটিকা আবদ্ধ আছে।

শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নফোদ্ধার

(জ্ঞানসৌর্য কল্পে লিখিত 'ল্য-জাঁক' প্যাব্দি নামক
হুল করাসী গল্প অনুসরণে)

১

শ্রীষ্টমাসের আগের দিন সকালবেলা দুইটি অসাধারণ ঘটনা একই সঙ্গে ঘটিয়াছিল—সূর্যদেব আর ম্যাস্‌সির জাঁ-বাখিস্ত গোদক্ষর সকালবেলাই উঠিয়াছিলেন।

নিঃসন্দেহ, তারা শীতের মাঝখানে, পনরদিনের কোয়াসা আর মেঘলা আকাশ বাঁটাইয়া যখন সৌভাগ্যক্রমে উন্মুক্ত বাতাস বহিয়া দিনটিকে শুকনা ও স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছিল তখন সূর্যদেবকে অকস্মাৎ তাঁহার তপ্ত রক্তরাগে পুরাতন বন্ধুর মতো প্রাভাতিক প্যারী-শহরকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া সকলেই খুসি হইয়া উঠিয়াছিল। সূর্যদেব হাজাব হোক বড় কেউ-কেউ তা নহেন—তিনি দেবতা বলিয়া বহুকাল হইতেই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এ দিকে ম্যাস্‌সির জাঁ-বাখিস্ত গোদক্ষর, তিনিও বড় কেউ-কেউ লোক ছিলেন না—তিনি ধনবান মহাজন, সবকাবী সুদী কারবাবের বড় সাহেব, অনেক কোম্পানির ডিরেক্টর, কত সভা সমিতির মেম্বর, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বরং সূর্যদেবের চেয়েও একগুণ সেরা—সূর্যদেবকে তাঁহার উদয়কালের নির্দিষ্ট

সময়ে আকাশে দেখা আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কিন্তু সেই সময় ম্যাস্‌সির গোদক্ষরের জাগরণ নিতান্তই আশ্চর্য ব্যাপার। আমবা বিশ্বস্তত্বের অবগত আছি যে সেই দিন সকালবেলা পোনে আটটার কাছাকাছি শ্রীযুক্ত সূর্যদেব আর শ্রীযুক্ত গোদক্ষর এক সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু এই লক্ষ্যী ববপুত্রটিব জাগরণ সূর্যদেবের জাগরণ হইতে ভিন্ন ধরণেব হইয়াছিল। সেই চিবস্তন-কালের স্মৃতিপুর্বাতন ভব লোকপ্রিয় সূর্য উদয়মাজ্জেই বাহুরেব মতো চাবিদিকে মায়াব খেলা জুড়িয়া দিল। সমস্ত বাত্রি ধরিয়া বুঝে চিনির মতো চূর্ণ তুষার পল্লবহীন বৃক্ষগুলিকে ঢাকিয়া চিনির খেলনার মতো সাজাইয়া রাখিয়াছিল; বাহুরেব সূর্য উদয় হইবামাত্র সেগুলিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপী প্রবালের তোড়া করিয়া তুলিল। এই ইন্দ্রজাল রচনা করিতে গিয়া সূর্য তাহার তৃপ্তিপ্রদ তপ্ত কিরণ প্রাভাতিক পথিকদের গায়ে অপক্ষপাতে ঢালিয়া ঢালিয়া দিতেছিল। তাহার হাসি জামাজোড়া-জাঁটা আপিসবাড়ী বড় সাহেবের প্রতি, কম্পিতকলেবর কেরাণীর প্রতি, ছিন্নচীর দিনমজুরেব প্রতি, ট্রামগাড়ীর ক্রান্ত কণ্ঠাক্টারের প্রতি, কিংবা নিজে শীতে কাঁপিয়া পবকে গরম কবিতে অভিলাষী গরম গরম চোনেবাদামওয়ারার প্রতি সমভাবেই বর্ষিত হইতেছিল। তাহার হাসিতে বিশ্বজগৎ খুসি হইয়া উঠিয়াছিল। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত গোদক্ষরের যে জাগরণ সে শুধু অসন্তোষ আর ফসাদে ভরা। রাতে তিনি ঋষিসটীবেব প্রাসাদে ভোজের নিমন্ত্রণে স্তব্ধ হইতে পায়ের পর্যন্ত চাখিয়া আসিয়াছেন, সেসব এখন সাতচল্লিশ বছরের পুরাতন পাকস্থলীতে হলহুল বাধাইয়া তুলিয়াছে; অম্বলে আর বুকজ্বালায় তাঁহার মেজাজটাও জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গোদক্ষর যে ধরণে ডাকঘণ্টার দড়ি টানিলেন, তাহা শুনিয়াই তাঁহার খাস খানসামা শার্ল তাঁহার দাড়ি কামাইবার গরম জল তাড়াতাড়ি লইয়া বাইতে বাইতে রান্নাবরের ঝিকে চোক ঠারিয়া বলিয়া গেল—“হাঁ হাঁ!... বাদরটা আজ সকালবেলাই মারমার করতে করতে উঠেছে...ওলো গ্যারিড্রি, হাঁ করে আর ভাবছি কি, আজকে কপালে অনেক হুঃখ অনেক ভোগান্তি আছে।...”

শার্শা ঘরের চৌক-ঠেব নিকট পৌছিয়া ভালো মানুষটিব মতো পথম নম্রতায় নৃষ্টি নত করিল, এবং সসজ্জমে মুনিবেব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া জানালাব পর্দাগুলি একে একে খুলিয়া দিল, আশ্রয় জালিল এবং মুনিবেব প্রসাধনেব সকল আয়োজন এমন শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলাব সঙ্গে করিতে লাগিল যেন মুনিবেব পূজারী ঠাকুরপূজার জো কবিত্তেছে।

গোদক্ষর কোটের বোতাম লাগাইতে লাগাইতে কড়া মেজাজে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কটা বেজেছে বে?”

শার্শা উত্তর কবিল—“আজ্ঞে আজ বড় শীত। ছ’টার সময় ত কনকনে ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু এখন হুজুর আকাশ সাফ হয়ে বেদু’ব উঠেছে, আজকেব দিনটা সুভাষাভালি কেটে যাবে বোধ হয়।”

গোদক্ষর ক্ষুব্ধ শানাইতে শানাইতে জানালাব কাছে উঠিয়া গিয়া পর্দা সরাইয়া দেখিলেন, পঞ্চদশর আলোর স্নান কবিত্তা উঠিয়াছে, ববফের উপর মিঠে রৌদ্র তকণীব অধরে স্নিত হাস্তেব মতো দেখাইতেছে। ও হবি, সভাই ত।

মাছব ফতই কেন দেমাকী আর চালদ্রুস্ত হোক না, চাকববাকবের সামনে কোনো বকম ভাবেব আতিশয্য প্রকাশ কবা যতই কেন বে-আদবী লাগুক না, ডিসেম্বব মাসের শেষাংশেই সূর্য্যমুখ দেখিয়া মনেব আনন্দ চাপিয়া রাখিবাব শক্তি খুব অল্প লোকেরই থাকে। গোদক্ষর তাই অনুগ্রহ কবিত্তা আজ একটু হাসিলেন। বন্ধুজলে বাসুস্পর্শে কুঞ্জেব মতো সেই হাসিটুকু আর কাহাবো মুখে দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হইতেন। যাহোক তবু তিনি হাসিাছিলেন; এবং একমিনিটের জন্তও তিনি তাঁহার আপিস আদালত কার-কারবার সব ভুলিয়া বালকেব স্ত্রয় অবাক প্রসন্ন মুখে দেখিতে লাগিলেন সকল পথচারী লোক ও গাড়ীঝোড়া সোনাণি কোয়ারার ভিতব দিয়া কেমন আনন্দে আনাগোনা করিতেছে।

কিন্তু আপন-রা নিশ্চিন্ত থাকুন, এ ভাব তাঁহার এক মিনিটেব বেশি টিকিতে পারে নাই। সূর্যের মতো শুভ্র কিরণেব দস্তবিকাশ করিয়া হাঁসা শোভা পায় তাহাদের যাহাবা নিহস্মা তাজিল,—শোভা পায় স্ত্রীলোকের, পিত্তর,

ছোটলোকের, আর কবিত্ত। শ্রীযুক্ত গোদক্ষরের কি হাসিবার অবসব আছে, বিশেষ ত আজকার দিন তাঁহাব কাজের ভিড বিস্তর আর শুক। সাড়ে আটটা হইতে দশটা পর্যন্ত তাঁহাকে সমাগত বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ জরুরি কাববাবী পরামর্শ করিতে হইবে—হাঁসাবা আসিবেন তাঁহারাও বড় কেউকেটা লোক নন, তাঁহারাও হাসেন না, তাঁহাদেরও একমাত্র চিন্তা শুধু টাকা আর টাকা। আহাবেব পরই তাঁহাকে আবাব গাড়ী কবিত্তা অনেক মহাশয় ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অনেক বখা পকা কবিত্তা আসিতে হইবে,—তাঁহারাও তাঁহারই মতন মহাজন, কাহাবো সুহিত সরস্বতীব সস্তাব নাই, সকলের সেই একই ধান্দা লক্ষী ঠাকুরগেব প্রসন্নতা। সেবান হইতে একমিনিটও লোকসান কবিত্তা যো নাই, শ্রীযুক্ত গোদক্ষরকে আপিসে গিয়া সবুজ-বনাত-ঝোড়া বড় বড় মোয়াত-ভবা টেবিলে গিয়া বিবাজ করিতে হইবে, সেখানে আবাব আরএকদল নূতন মহাজনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে সেই একই শুক বিষয়ে—টাকা বোজগর, অর্থসঞ্চয়, লক্ষীলাভ। তাহার পর খুব সম্ভব তাঁহাকে তিন চাবটা কমিশনে বাহিব হইয়া এমন সব লোকের সংসর্গে থাকিতে হইবে যাহাবা অর্থ-উপার্জনের কতি তুচ্ছ সুযোগটিও ছাড়ে না অথচ ক্রান্তের পর্ব্বগৌরবের আলোচনার অমুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাখানেক সময় অপব্যয় করিবার উদারতাও বাহাদেব আছে। নিত্য ক্ষৌরী হইলেও গোদক্ষর বরাবর এমন হুচারগাছা দাড়ির খোঁচ ছাড়িয়া দেন যে দেখিলে মনে হয় যেন রাঁধা শিকাবাবের উসর স্তনমরিচেব বুকনি ছড়ানো; তাহাতে তাঁহাকে চাষাড়ে মদ বা বড় জাতের বানরের মতন দেখায়। ক্ষৌরী হইয়া জোয়ান-বয়সীর ক্ষিপ্ৰগতিতে একটা প্রভাত-পরিচ্ছন্ন গায়ে টানিয়া তিনি আপনার আপিস-কামরার নামিয়া গেলেন। সেখানে যাহাবা সারবন্দি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের সকলেবই এক ধান্দা, নিজের পুঞ্জটিকে পুঞ্জিত পুঞ্জ কবিত্তা তোলা। ইহারা টাকা রোজগারের কত বকমেব ফন্দি আঁটিয়া গোদক্ষরের পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন,—কেহ চাহেন জনমানবশূন্য মরুভূমির উপর বিয়া একটা নূতন বেলপথ খুলিতে, কেহ চাহেন প্যারী হবেব

কাছাকাছি দেখাতে কোথাও একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুলিতে, কেহ বা চাহেন দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশে একটা খনি খনন করিতে। গোদফ্রয় গম্ভীর হইয়া সব স্তনিলেন; কিন্তু তিনি এক মুহূর্তও ইহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না। যে ভবিষ্যৎ বেলালাইনে বিশেষরূপে প্যাসেঞ্জার বা মাল বহনের সম্ভাবনা আছে কি না, কারখানার চিনি না স্রুতি টুপি তৈরি হইবে, এবং খনি হইতে খাঁটি সোনা অথবা রদি তামা উঠিবে। না, এসব বিষয়ে উচ্চবাচ্য নয়! কারবাবীদের সঙ্গে ত্রীযুক্ত গোদফ্রয়ের যে কথাবার্তা হইল তাহা শুধু তাঁহার দক্ষিণার দরদস্তুর—তিনি যে এইসব কঠিন প্রব্লেম মীমাংসার জন্য আটদিন ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলি ফিকির আবিষ্কার করিবেন তাহার জন্য তিনি এখন পাইবেন কি। এইসব অর্থলভের নূতন পথের কল্পনা হয়ত নজ্জার কাগজে কাগজ-চাপার তলে বা ফাইলের কোঁড়ে চব্বস গতি লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহার ফিরের টাকা ত মারা বাইতে পাবেন না।

ঠিক বেলা দশটা পর্যন্ত অঙ্কশাঙ্কের আলোচনা চলিল; দশটা বাজিয়া মাত্র সূদী কারবারের ম্যানেজার সাহেব সকলকে নির্দ্বন্দ্ব ভাবে বিদায় করিয়া দিয়া আপিসের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর খাবার-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত কাজই তাঁহার ঘড়িধরা, এক মিনিটের নড়চড় হইবার জো কি।

খাবার-ঘরখানি খুব জমকালো। টেবিলে দেয়ালে যত সব রূপার বাসন সাজানো ছিল তাহা দিয়া একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা সহজেই হইতে পারে। অনেকখানি সোডা গিলিয়াও গোদফ্রয়ের গলাজ্বালা কমে নাই, তাই তিনি অজীর্ণ রোগীর যোগ্য খাবার জোগাড় করিতে বলিয়াছিলেন। এই বাহ্যিক আড়ম্বরের মধ্যে বসিয়া দুই শত টাকার মাহিনাও বাবুর্চির পরিবেষণে তিনি আহা করিলেন বিরস বিষম মুখে ছুটি ডিম সিদ্ধ আর একখানি কাটলেট। তারপর সেই লক্ষ্মীমন্ত লোকটি চাখিলেন ছতিন পরসী দামের একটু পনির।

এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া হঠাৎ প্রবেশ কবিল সুন্দর ও কৃষ্ণ নীল-মকমলের-পোষাকপরা পালক-ওলা

টুপি। তলে হাসিমুখে ডিরেক্টর সাহেবের চার বৎসরের শিশুপুত্র বাউল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জাম্বানী আয়া।

ইহা প্রতিদিন পৌনে এগারটার সময়কার নিয়মিত ঘটনা। তখন সাহেবের জুড়ি-জোতা ব্রহ্মা গাড়ী গাড়ী-বারান্দায় অপেক্ষা করে, আর অসহিষ্ণু জুড়ি বোড়-পথের উপর খুব চুকিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে থাকে। মহামহিম লক্ষ্মীমন্ত মহাজন দশটা বাজিয়া পরতাল্লিশ মিনিট হইতে ঠিক এগারটা পর্যন্ত পুত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া থাকেন, এর এক মিনিট বেশিও নয়, কর্মও নয়। বাৎসল্যের পরিতৃষ্টির স্রুতি তিনি চক্ৰবর্তী ঘণ্টার মধ্যে পনেরটি মিনিট নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহার কারণ ইহা নহে যে তিনি পুত্রকে ভালো বাসেন না; তাঁহার মতন লোকে যতদূর পারে তিনি পুত্রকে ততদূরই ভালো বাসিতেন। কিন্তু ভালো বাসিলে কি হয়, কারবার!...

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি বেশ বৃদ্ধ এবং কতকটা জরাগ্রস্ত, তখন কেবলমাত্র কাশানের খাতিরে তিনি নিজেকে নিতান্তই প্রেমিক বলিয়া জাহির করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদেরই দলের লোক মার্ক ইস হ্যাকস্টেনের কন্যার সহিত প্রেমে পাড়িলেন। কন্যাও পিতা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও, বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ব বলিয়া আপনায় বিরক্তি তিনি বেমানাম চাপিয়া গেলেন; তিনি এই লক্ষ্মীর বাহনটির স্বত্ত্ব হইয়া উঠাকে কৃতার্থ করিবেন এবং তাহার বিনিময়ে তাহাকে দিয়া নিজের ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবেন; তিনি যে বড়ো জামাই করিতে রাজি হইবেন তাহার একটা প্রতিদান পাওয়া চাই ত। বিবাহের করেক বৎসর পরেই গোদফ্রয় বিপদগ্রস্ত হইলেন এবং তাঁহার শিশুপুত্র রাউলকে তিনি সসজ্জমে সসম্মানে লালন করিতে লাগিলেন, কারণ সে যে বাঁচিলে একদিন লক্ষ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী হইবে। তাহাকে খাতির না করিবে কে? সোনাব মোলনার রাজপুত্রের হালে থোকা রাউল দিনে দিনে মাহু হইতে লাগিল। কেবল তাহার বাবা কান্ধের ভিড়ে, কর্তব্যের চাপে, লোকের জ্বালায় ছেলেব চিন্তায় পনের মিনিটের বেশি ব্যয় করিতে পারিতেন না;

তারপর বাকি তেইশ ঘণ্টা পরিতাল্লিশ মিনিট ছেলে থাকিত যি চাকরবেব জিয়ার।

—সুপ্রভাত রাউল।

—ছুপ্ত ভাত বাবা।

শ্রীযুক্ত গোদব্রয় তাক্কাতাড়ি হাতের তোয়ালে কেলিয়া
—পুত্রকে কোলে তুলিয়া বাম উরুর উপর বসাইলেন এবং
আপনার প্রকাণ্ড খাবার মধ্যে শিশুর কচি হুদে হাতখানি
ধরিয়া তাহাকে বারম্বার চুষন করিতে লাগিলেন।
আশ্চর্যের বিষয়, সত্যসত্যই তখন সেই স্ত্রী কাংবাবেব
মহাজন তুলিয়া গিয়াছিলেন যে শতকরা তিন টাকা স্ত্রদের
কোম্পানির কাগজের দর সেদিন পঁচিশ পরস্যা চড়িয়াছে,
কিংবা এখনি তাহাকে শম্পহরিং টেবিলেব উপর কোলা
ব্যাণ্ডেব মতো দোয়াতের কালি ছড়াইয়া কোম্পানি
কাগজের স্ত্রদের হিসাব কষিতে হইবে।

—বাবা, কালকে ত বড় দিন? ... কালকে বড়দিন
বুড়ো আমাকে কি খেলনা এনে দেবে বাবা?

বুড়া বাবা বুড়া বড়দিনের বদলে একটু ভাবিয়া বল-
লেন—হঁ, দেবে বৈ কি ... খেলনা ... আচ্ছা ... তুমি
লক্ষী ছেলে হয়ে থাকলেই পাবে।

বুড়া আপনার হাঙার-মহলা স্থতির একটা কোঠায়
টুকিয়া রাখিলেন খোকার জন্য বাজার হইতে খেলনা
কিনিতে হইবে। তাবপর জার্মানী থাইয়ের দিকে ঘুরিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মাদামোয়াজেল্ ব্যার্তী, রাউলেব
ওপর তুমি খুসি আছ ত?

জার্মানী ঈহং হাসিয়া আপনার খুসি জানাইয়া খোকাব
বাগের কোতুল একেবারে শান্ত করিয়া দিল।

মহাজন বলিলেন—আজকে বড় খাসা দিনটি, না?
কিন্তু বড় শীত। যদি তুমি রাউলকে নিয়ে কোম্পানির
বাগানে বেড়াতে যাও, তা হলে আজ বেশ হয়, না ব্যার্তী?
কিন্তু খবরদার, খুব ঢেকেঢ়েকে নিয়ে যেয়ো, বুধলে?

আয়া শুধু একবার খাড় নাড়িয়া সুনিবকে নিশ্চিত
করিয়া সকল উপদেশ পালন করিবার অঙ্গীকার করিলে
শ্রীযুক্ত গোদব্রয় শেষবার পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া
টেবিল হইতে উঠিলেন—অমনি তাকের উপর বড়ীতে
এগারটা বাজিতে স্ত্র কবিল—এবং তিনি ঘর হইতে

বারান্দার বাহির হইতেই খানসামা শার্ল তাঁহার গারে
ওভারকোট চাপাইয়া দিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া
গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাবপর সেই নিম্নকোব
চাকর মাতাল-পাড়ার গলিতে মদের দোকানে প্রস্থান
করিল—সেখানে আজ দোকানের সামনের ব্যালকনে
বাড়ীর চাকর বাকরদের আজ্ঞা জমিবার কথা আছে।

২

বাচিয়া স্ত্র খাকুক জরদা রঙের জুড়ি বোড়,
তাঁহাদের প্রসাদে স্ত্রী কারবারের কর্তাব সকল কর্তব্য
নির্নিয়মে যথাসময়েই সম্পন্ন হইয়া গেল, কোথাও একটুও
বিলম্ব ঘটিল না। মহাজনটোলা ঘুরিয়া তিনি দেশান্তর
নির্বাচনে ভোট দিয়া ফ্রান্স তথা যুরোপকে আশ্রয় করিয়া
ঘরে ফিরিলেন।

পথে তাঁহাব মনে পড়িল যে তিনি রাউলকে বলিয়া
আসিয়াছেন যে বড়দিন বুড়ো তাহাকে খেলনা উপহার
দেবে; তখন তিনি খেলনার দোকানে গাড়ী লইয়া শইতে
কোম্পানিকে আদেশ করিলেন। খেলনার দোকানে গিয়া
তিনি দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া ছেলেব জন্ত সওয়া
করিলেন একটা কাঠের খোড়া চাকার উপর চড়ানো;
এক বাস সীসার সৈন্ত, সবগুলির চুল কালো আর
নাকগুলি উন্টানো, যেন সব সমজ ভাই কিংবা কুম
বেঞ্জিনেণ্টের সৈন্ত; এমনি আরো বিশ রকমের খেলনা,
চকচকে আর চমৎকার। খেলনাগুলি গাড়ীতে তুলিয়া
তিনি গাড়ীর গদিতে স্থাপন করিয়া গতির তালে তালে
নাচিতে নাচিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন,
পুত্রের ভাবী আনন্দের ছবি আঁকিয়া তাঁহার পিতৃহৃদয়
বাস্তবের স্ত্রে গর্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

খোকা বড় হইবে, রাজার হালে তাহার শিক্ষা সহনং
হইবে, এবং একদিন সে বিশ, পঁচিশ, চাই কি, ত্রিশ লক্ষ
টাকার মালিক হইয়া গ্যাট হইয়া পায়ের উপর প দিয়া
বস্ত্রা বসিয়া স্ত্রে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবে। রাষ্ট্রতন্ত্রের
মৌলিতে এখন টাকার সংখ্যাত্তেই খাতির, টাকার
পরিমাণেই মানেব মাপ, বংশের বড়াই একেবারে মাটি!
রাউলেব বাপ, সামান্য একজন পাড়ারগেয়ে, সামান্য একজন
মোক্তাবের বেটা; রাউলেব বাপ ছাত্রদের মেসে পার্কিয়া

এককালে সাড়ে পাঁচ আনা বোজ হিসাবে খোরাকী দিয়া মানুষ; তাহার তখন না ছিল একটা ভালো পোষাক, না ছিল কিছু মান সজ্জা। সেই লোক যদি অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া থাকিতে পারে, প্রজাতন্ত্রের দৌলতে যদি দে রাজশক্তির ভাগ পাইতে পারে, অবশেষে যদি বিবাহে বড় ধরনার মেয়ে পর্য্যন্ত জোগাড় করিতে পাবে, তবে তাহার ছেলে রাউল, সে না পারিবে কি? শিশুকাল হইতেই যে রাজার হালে মানুষ, মাতৃবংশের দিক দিয়া বাহার শরীরে আভিজাত্যের গর্ভিত শোণিত প্রবাহিত, বাহার বুদ্ধি বিজ্ঞা দ্রুতাপ্য পুষ্পের মতো চমৎকার হইবে, যে দৌলনার শুইয়াই বিদেশী ভাষার তালিম হইতেছে, এক বৎসব পরেই যে পনি ঘোড়ার সোয়ার হইবে, একদিন যে নিজের নামে মাতৃবংশের পদবী যোগ করিয়া হইবে শ্রীল শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় হ্যাকস্টেন, গোদফ্রয় বংশের নামে এমন উপাধি যোগ, আহা সে কী উপাধি, একেবারে রাজকীয়, অতি প্রাচীন, একেবারে ক্রুজেন্ডের গন্ধযুক্ত উপাধি যে যোগ করিবে, সেই রাউল না পারিবে কি? কী উজ্জ্বল তাহার ভবিষ্যৎ! কী আশাপ্রদ তাহার জীবনযাত্রা! ... সাধারণতঃ ভালো বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ত বলা যায় না, আবার হয়ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে; তখন আমার রাউল, না না, রাউল কেন, আমাব গোদফ্রয় হ্যাকস্টেন হয়ত রাজকন্যা বিবাহ করিবে, আর কে বলিতে পারে যে তখন আমাব রাউল একেবারে রাজার সিংহাসন ঘেঁসিয়া না বসিবে, রাজপারিষদের উর্দ্ধি সোনালি রূপালি জবির কাজ-করা কিংখাবের পোষাক তাহার গায়ে ঝলমল না করিবে; নিশ্চয় তাহার ক্ষেটিং গাড়ী হাতল হঠবে সোনাব, পা-দান রূপার, আর থাকিবে সহস্র কোচমানের পাগড়ীতে তকমা, বুকে চাপরাস, গাড়ীর গায়ে জমকালো মধ্যাদাচিহ্ন।

হায় মুচ টাকার ধক! আজ নিজের শিশুর আনন্দের জন্য যে শিশুর জন্ম-উৎসব-উপলক্ষে এত টাকার খেলনা কিনিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যাঠিতেছে, সেই শিশু একদিন দীনহীন জনকজননীর ক্রোড়ে আত্মাবশের আবর্জনার মধ্যে জন্মলাভ করিয়া জগৎকে আজ জয় করিয়াছে, সে কথা ত একবারও মনে পড়িল না! শুধু অর্থের চিন্তা, সম্পদের স্বপ্ন!

চিন্তায় বাধা দিয়া গাড়ী বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় সিঁড়ির সামনে আসিয়া থামিল। গোদফ্রয় সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে দেখিতে পাইলেন দালানে তাঁচাব সমস্ত চাকর দাসী ভীতিপাংশুলমুখে তাঁহাবই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং এক কোণে জার্মানী আয়াটা জড়োসড হইয়া পড়িয়া আছে। জার্মানী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া ছই হাতে তাচার মুখ ঢাকিল, আঙুলের ফাঁক দিয়া তাহার অশ্রুধাবা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় গোদফ্রয়ের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

—কি রে?...ব্যাপার কি?...জ্যা?...

খাস খানসামা শার্ল চোখে বেদনা ও মুগ্ধভাবে ভয় ভবিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল—আজ্ঞে রাউল!...

—খোকা?

—আজ্ঞে হারিয়ে গেছে! .. এই নচ্চাব জার্মানী মাগীই ত যত নষ্টেব মূল! .. হারিয়ে গেছে বিকেল চারটের সময় থেকে ...

সৈন্ডের বুকে গুলি লাগিলে সে যেমন কাঁপিতে কাঁপিতে হটিয়া যায়, ব্যথিত পিতাও তেমনি ছই পা হাট্টা তন্ত্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং জার্মানী তাঁহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া কেবলি আর্তস্ববে বলিতে লাগিল—মাপ করুন! আমায় মাপ করুন! ..

সকল চাকরেরা একসঙ্গে গোলমাল করিয়া বলিতে লাগিল—এই মাগী কোম্পানির বাগানে যায়নি ছজুর! ও কি কোনো দিন রাউলকে আর কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়? বোজ রোজ ঐ গুণ্ডাপাড়ায় যায়, সেখানে একটা লোকের সঙ্গে ওর ভাব আছে! .. কি সর্বনাশ! কচি ছেলে নিয়ে গুণ্ডাপাড়ায় যাওয়া! সেখানে ছেলে হারাবে না ত হারাবে কোথায়? ও মাগীর কি ছেলেব দিকে নজর থাকে, একেবারে গল্পে যেতে যান গিয়ে। এখন ছেলে কোথায় চলেই গেল না গুণ্ডারাই চুরি করলে তা কে জানে? .. আমরা চের তল্লাস কবেছি ছজুব, কোথাও ত কিছুই কিনারা পাওয়া গেল না ...

খোকা! হারাইয়া গিয়াছে! গোদফ্রয়ের কানে শুধু এই ছটি কথা প্রলয়ের মূর্ছাব বিধাণ বাজাইতেছিল। তিনি

লাকাইয়া জাশানীর বাড়ির উপর গিয়া পড়িলেন, কিল উচাইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, তাব পব দুই হাতে তাহার দুই বাহ ধরিয়া জোরে ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁতু কড়মড় করিয়া জুড়গজ্ঞানে বলিতে লাগিলেন—বল মাগী ! বল, কোথায় খোঁকাকে হারালি ? বল হাবামজাদী, নইলে তোকে মেরে শুঁড়ো করে ফেলব। ... কোথায় ? ... কোথায় ? ... তাহাব খোঁকা কোথায় ? ...

কিন্তু সেই ঝি বেচারী শুধু কাঁপিতে কাঁপিতে কমাই চাহিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না।

খোঁকা ! তাঁহাব খোঁকা ! সে হারাইয়া যাইবে, চুরি যাইবে ! ইহা অসম্ভব। যা যা সকলে মিলিয়া ধোঁজ। খোঁকাই যদি না থাকিল ত টাকা কাহার জন্ত ? মুঠা মুঠা টাকা ছড়াইয়া গলিতে গলিতে বাড়ীতে বাড়ীতে জনে জনের পিছু পুলিশ লাগাইয়া দিতে হইবে। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা নয়।

—শার্ল, বেখ তোরা এই মাগীকে পাহারা দিবি।

আমি পুলিশে খবর দিতে চললাম...

গোদফ্রয়ের বুক দেন ভাঙিয়া পড়িবার মতন ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, ভয়ে ভাবনার সর্কাজে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন, ঘোড়া জুড় পাগলের মতো পুলিশের থানাব দিকে ছুটিয়া চলিল, অষ্টটের কি পরিহাস ! গাড়ীর গদি ভরিয়া চকচকে সব খেলনা পড়িয়া আছে ; পথের ধারের সাববন্দি গ্যাসের আলো, দোতানে দোকানে আলোর রোসনাই, ছুটন্ত জানালা দিয়া বার বার সেইসব চকচকে খেলনার উপর পড়িয়া হাজার চোখে বেন আগুন হানিতেছিল। আজ এক দেবশিশুর জন্মদিন, আজ বিশেষ করিয়া শিশুদেরই আনন্দ-উৎসব, কিন্তু তাঁহার শিশু আজ তাঁহার ঘরে নাই, একথা চারিদিকের পুলক-আয়োজন কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে দিতেছিল না।

এই উৎসব-প্রমত্ত শহরের পথে পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে, ছুৎ-ছুৎ-ছুৎ পিতা আপন মনে বার বার বলিতেছিলেন—“আনাব রাউল। আমার খোঁকা। বাবা আমার। তুই কোথায় গেলি ... কোথায় আছিস ?” আর অধৈর্য্যে উত্তেজিত হইয়া গাড়ীর গদির উপর আঙুলগুলি

চাপিয়া চাপিয়া মটকাইতেছিলেন। আজ এখন তাঁহার কাছে পদমর্যাদা, খেতাব সম্মান, কোম্পানির তাগত, টাকার সিন্দুক, হুদ, আসল, সমস্তই মিথ্যা বোধ হইতেছিল। একমাত্র চিন্তা আগুনের শিখার মতো তাঁহার উত্তাল মস্তিষ্কের মধ্যে জাগিতেছিল—আমার খোঁকা, কোথায় আমার খোঁকা !

ঐ ঐ পুলিশের থানা। জোরসে জোরসে গাড়ী হাঁকো ... রোকো রোকো, গাড়ী রোকো। ... যাঃ, থানায় যে কেহই নাই, উৎসব-আনন্দে সকলে ঘে-যাব দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ... কোই হায়, কোই হায় ? ... এই কনেটেবল, এই এই, শোন ... আমি জাঁ-বাগ্গন্ত গোদফ্রয়, সরকারী স্ত্রী কারবারের কর্তা, ... আমার ছেলে, খোঁকা, শহরের রাস্তায় হারাইয়া গেছে ... চাব বছরের আমার খোঁকা, ... দারোগা সাহেব কাঁহা, দারোগা সাহেব কাঁহা। ... গোদফ্রয় তাড়াতাড়ি কনেটেবলের হাতে একটা মোহর শুঁজিয়া দিলেন।

সেই কনেটেবলটি বৃদ্ধ, প্রকাণ্ড-পাকা-গোঁফ-ওয়াল ভয়লোক ; সে গিনিব সুপারিশে যত না হোক বিশদ পিতার কাতরতা দেখিয়া তাহাকে দারোগা-সাহেবের খাস কামরায় লইয়া গেল। সে ঘরে দারোগা সাহেব এক চোখে চশমা দিয়া পেঁচার মতো গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন।

গোদফ্রয় আবেগকম্পিত চরণে ঘরে প্রবেশ করিয়া একথানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে নিজের ছুৎকাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন।

দারোগা সাহেবও ছেলের বাপ ; এই কক দৃশ্যে তাঁহার মন গলিয়া গেল। কিন্তু তিনি পুলিশের বড় নায়েব, কোমলতা প্রকাশ করা তাঁহাব শোভা পায় না, এইজন্ত কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া পূর্ববৎ গম্ভীর হইয়াই বসিয়া রহিলেন।

—আচ্ছা, মশায়, আপনি বলছেন চারটের সময় ছেলে হারিয়েছে, না ?

—হাঁ, দারোগা সাহেব।

—হুঁ, তাবপরই অন্ধকার হয়ে গেছে ... বয়সও ত তেমন বেশি নয় যে পথ চিনে, বাড়ী ফিরবে ; লোকেও

জিজ্ঞেস করতে পারবে না, কেউ জিজ্ঞেস করলেও জবাব দিতে পারবে না ... এখনো ভালো করে' হয়ত কথাই কোটে নি, বাপ পিতমর নামও ত সে জানে না, কেমন কিনা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দারোগা সাহেব, হ্যাঁ ! ...

—হঁ, হারিয়েছে মেছোবাজারের দিকে ? ... হঁ, পাড়াটা বদ বটে, ... শুভা চোর বাটপাড়ের আড্ডা ঐ মহল্লায়। ... তা আপনি ভাববেন না, ওপাড়ায় খুব ছ'সিয়ার দারোগা আছে ... আমি তাকে এক্ষুণি টেলিফোন করে বলছি ...

হতভাগ্য পুত্রহারা পিতা পাঁচ মিনিট একলা বসিয়া। কী সে ভয়ানক ছঃসহ স্মরণীয় সময় ! প্রাগলভ্যের তখন কী ব্যাকুল আর্ন্তনাদ !

দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি হালি মুখে কিরিয়া আসিয়া বলিলেন—ছেলে পাওয়া গেছে।

ও ! আশ্বস্ত পিতার উদ্দাম আনন্দের কী ব্যগ্র প্রকাশ ! তিনি দারোগার হাত ধরিয়া আবেগভরে ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

—আপনার ছেলে পাওয়া রকমেব কুর্সা ফুটফুটে, কেমন কি না ? একটু রোগাটে-রকম চেহারা, না ? ... নীল মকমলের পোষাক পরা ?—টুপিও ওপর সাদা পালক দেওয়া, কেমন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দারোগা-সাহেব, ঐ আমার ছেলে, আমার খোকা ! ... সেই সেই আমার রাউল।

—বেশ বেশ ! তা সে ছেলে ঐ পাড়ার একজন গরীব লোকেব বাড়ীতে আছে। সে খানায় এসে এজ্জহার দিয়ে গেছে। ... হঁ, এই তার ঠিকানা—পিয়েরোঁ, পাথুবে গলি, রাজার বাগান। গাড়ীতে গেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি আপনার ছেলে দেখতে পাবেন। তবে আপনি কি সে কদর্য জায়গায়, সেই নোংরা গলির কুঁড়ে ঘরে যেতে পারবেন ? সে লোকটা তরিতরকারীর ফেরিওলা। কিন্তু হলে কি হয়, লোক ভালো, নয় ?

আ ! সে লোক নিশ্চয় খুব ভালো ! গোদকর উচ্ছ্বসিত আবেগে দারোগা সাহেবকে ধন্তবাদ জানাইয়া চার-চারটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন ; সে সময় সেই তরকারীর ফেরিওলা সেখানে থাকিলে সরকারী

সুদী কারবাবের বড়সাহেব তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতেন। সত্যসত্যই, শ্রীযুক্ত গোদকর, সরকারী সুদী কারবাবের বড় কর্তা, সেই চাবাটার দেখা পাইলে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন ! তবে কি এই লক্ষ্মীর দাস দান্তিক ধনী অস্তরে টাকার মমতা ছাড়া অন্য ভাবও আছে ? এই মুহূর্তে তিনি অমুস্তব কবিতাছিলেন যে তিনি পুত্রকে কি পরিমাণ ভালো বাসেন। কোচমান কোচমান, জোরসে হাঁকো, চাবুক লাগাও। এখন আর তাঁহার অর্থসঞ্চয়ের চিন্তা ছিল না, পুত্রকে বাহুপুত্রের ধবণে মাছুষ করিয়া তুলিবার কল্পনাও আসিতেছিল না ; তিনি ভাবিতেছিলেন বেতনভোগী চাকরদাসীবি মিথ্যা মমতার কথা। ভবিষ্যতে তিনি স্বদের হিসাবে জবাব দিয়া নিজেই ছেলের খবরদারি করিবেন ; তাহার বুড়ী পিসির খোঁজ খবর এতদিন তিনি কিছুই লইতে পারিতেন না, এখন তাহাকে আনিয়া বাড়ীতে রাখিবেন—তা হোক সে পাড়ারগেয়ে। পিসির পাড়ারগেয়ে কথার টান আর সেকলে ধরণে তাহাকে সৌখীন মহলে লজ্জা পাইতে হইবে, তা হোক, বুড়ী মাছুষ কোথায় একলাটি পড়িয়া আছে, কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে দেখাও ত কর্তব্য। আর সে এবাড়ীতে আনিয়া থাকিলে আদর বহু করিয়াই তাহার নাতিটিকে প্রাণের টানে মাছুষ করিয়া তুলিবে। চাবুক লাগাও কোচমান, চাবুক লাগাও। এই মহাজনের সময়ের টানাটানি বোঝাই, আর দেনাদার খাতকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাঁহাকে বোঝাই তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকাইতে হয়। কিন্তু আজ টাকা রোজগারের শান্দা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও আজ হরার অবধি ছিল না—আজ জীবনে প্রথম তাহার সহিত তাহার পুত্রের প্রকৃত বাৎসল্যের পরিচয় ঘটিবে। চাবুক লাগাও কোচমান ! জোরসে হাঁকো !

এই কনকনে শীতের রাত্রে সেই গাড়ী সমস্ত প্যারী শহরের বৃকের উপর দিয়া অতিবেগে দীর্ঘপথ পান করিতে করিতে উদ্বেগের মতো ছুটিয়া চলিতেছিল, এবং সরকারী আপিস আদালত, সওদাগরী কুঠি কারখানা, হোটেল সরাই পিছে ফেলিয়া অন্ধকার সন্ধ্যার গলির গোলকধাঁধায় গিয়া পড়িল। একটা নোংরা পাড়ার নোংরা গলিতে গাড়ী

থামিল। শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় গাড়ীর লঠনের আলোতে পথ দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন; দেখিলেন সেখানে এক চত্বর ধোলাবাড়ী, ভাঙাচোরা খুপসী ছাঙ্গর। এই ত সেই নম্বর বে-বাড়ীতে সেই তরকারী-কিরি-ওলা থাকে। আবেগকম্পিত হস্তে তিনি দরজার কড়া নাড়িলেন। বাড়ীর দরজা খুলিয়া একজন লোক বাহির হইয়া আসিল, সে প্রকাণ্ড লম্বাচোঁড়া জোয়ান, তে-এঁটে তালের মতো তাহার মাথা, আর সোঁকো মুখের মাঝে একজোঁড়া প্রকাণ্ড কটা গোঁফ। সে তুলো, তাহার ডুরে কাপড়ের পশরী জামার দী-হাতটা এক পাশে ঝলঝল করিয়া ঝুলিতেছিল। সে সেই চকচকে গাড়ী আর সুন্দর-ওভারকোট-পরা গাড়ীর অধিকারীকে দেখিয়া সানন্দ সঙ্গমে বলিল—“আসুন, মশায়, আসুন। আপনি কি ছেলের বাবা? ... কিছু ভয় নেই ... খোকার কিছু হয়নি ... সে বেশ আছে।”

সে দরজার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুককে-বাড়ীতে প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিল এবং নিজের মুখের উপর একটি আঙুল রাখিয়া বলিল—“আন্তে মশায় আন্তে! খোকা ঘুমুচ্ছে।”

৩

কুঁড়ে ঘর। মতাই কুঁড়ে। ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিনের কুপি জলিতেছিল—তাহাতে আলো হইতেছিল অল্প, গন্ধ উঠিতেছিল বিষম, এবং ধোয়া হইতেছিল প্রচুর। সেই ধূসর আলোর গোদফ্রয় দেখিলেন ঘরের আসবাব একটা পাত্র-ভাঙা দেওয়াল, খানকতক হাতাভাঙা চেয়ার, একখানা ময়লা গোল টেবিল আর তার উপর রাজের সামান্য অহোরের উচ্ছিষ্ট বাসন পড়িয়া আছে; দেয়ালের পায়ে ছাখানা সজ্জা ছাপা ছবি টাঙানো।

কিন্তু সেই তুলো ফেরিওলা তাঁহাকে অধিক কিছু দেখিবার অবসর না দিয়া কুপিটা উঠাইয়া লইয়া ঘরের এক পাশে গেল। সেখানটা একটু আলো হইয়া ওঠাতে দেখা গেল একটি বিছানার উপর দুটি ছেলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত বহিয়াছে। উহারই মধ্যে বড় ছেলেটি ছোটটিকে আদর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গোদফ্রয় চিনিলেন সেই ছোট ছেলেটি তাঁহারই খোকা রাউল।

ফেরিওলা তাহার চাবাড়ে কথা বখালাখা মোলায়েম করিয়া বলিল—“ছুই ছোঁড়াই ঘুমে ঘেন মরে রয়েছে। আমি ত জানতাম না যে এই ছোট রাজাকে কে কখন খুঁজতে আসবে, তাই আমি ওদের আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়েছি আর ওরা চোখ বুজতেই পুলিশে গিয়ে খবর দিয়ে এনেছি। ... অন্য দিনে জিদোর আলাদা ছোট বিছানায় শোয়; আজকে ওদের আমার বিছানায় শুইয়ে আমি জেগে রয়েছি—আমাকে ত ভোরে উঠে গঞ্জের হাটে বেতেই হবে ...”

এত কথা গোদফ্রয়ের কানে গেল কিনা সন্দেহ। তিনি সেই ঘুমন্ত ছেলে দুটিকে দেখিতেছিলেন। উহার একটা ভাঙা খাটিরায় ময়লা বিছানায় তাঁহার ঘোড়াব গাড়ের কঙ্কলব চেয়েও অধম একখানা মোটা কঞ্চল মুড়িদিরা পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু এই দৃশ্য কি সুন্দর, কি চমৎকার! রাউল তাহার নুতন চকচকে মকমলের পেশাক পরিয়া ছোঁড়া-কাপড়-পরা তাহার সঙ্গীর কোলের কাছে কেমেন স্বচ্ছন্দ নির্ভরের সহিত শুইয়া আছে। রাউলের রক্তহীন কঁাকাশে ছোট মুখখানির পাশে এই ছোটলোকের ছেলেটির স্বাস্থ্যসুন্দর কালো কুৎসিত মুখখানিও দর্শনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল।

গোদফ্রয় দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ফেরিওলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি? তোমার ছেলে? ...

—না, মশায়। আমি বিয়ে করি নি, বিয়ে হবারও আব সম্ভাবনা নেই। ছ বৎসর হবে আমার একজন পড়ন্তী মজুরনি, সে মারা গেল; আহা মাগী বড় গরিব ছিল, খেটে খেটে প্রাণ বাঁচ করত তবু তার আর তার ছেলের পেট ভর খাবার এক বেলাও জুটত না। এমনি করে পাঁচ বৎসব চলল, কিন্তু তার পর তার প্রাণে আর সুইল ন, সে মারা গেল। মাওড়া ছেলেটিকে ভগবান আমার হাতেই ঝেলে দিলেন,—মায়েদের নিজের বাছারাই খেতে পান না তা পরের ছেলেকে কি খাওয়াবে, তাই মায়েরাও এই মাওড়া ছেলেটির তার নিতে পারলে না, তখন ভগবান এই হতভাগার ওপরই ভার দিলেন। এভার আমব লাষ্ট্রির ভাগের মতন হয়েছে,—এ আমার অবলম্বন, আমার সহর, আমার বল ভরসা। এমনি কবেই ভগবান তাঁর

দেওয়া যোঝা সোজা করে তোলেন। রোজ ইঙ্কল থেকে এসে সে তুলদাঁড়ি আর ওজন-বাটখারা মাথায় নিয়ে ঠেলা-গাড়িতে তরিতরকারি সাজিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়—আমি এই ছলো হাত নিয়ে যা পারি না, জিদোর তা সহজেই করে দেয়। সাত বছরের ছেলে, কিন্তু এরি মধ্যে ও এমনি চালাক! ওই ত খোকাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

—কি রকম? এই বালক? ...

—ওর বড় বুদ্ধি মশায়! ও ইঙ্কল থেকে আসবাব সময় দেখলে যে খোকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যালকা-মুখো হয়ে হাপুস-নয়নে কাঁদছে। ও খোকাকার সঙ্গে ভাব করে চুপ করিয়ে ভুলিয়ে আমার কাছে নিয়ে এল—আমি সেখান থেকে নিকটেই আমার তরিতরকারি ফেরি করে ফিরছিলাম। দেখতে দেখতে আমাদের ঘিরে লোক জমে গেল, আর সবাই কত কি জিজ্ঞাসা করে' করে' খোকাকে ডরিয়ে তুলতে লাগল। খোকাকার কথা আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না, ভালো করে' একে কথা বলতেই শেখেনি, যা ছ একটা বলে তারও কতক ইংরিজি কতক জার্মান। তখন কেউ কেউ বলে খোকাকে খানায় দিয়ে আসতে। কিন্তু জিদোর রাজি হল না, সে বলে পুলিশ দেখে খোকা ভয় পাবে। আরো, আপনাদের খোকা জিদোরকে ছেড়ে কোথাও যেতেও চাচ্ছিল না। তখন আমি গাড়ীর বেলাত বাড়ী এনে ধুয়ে, খোকাকে জিদোরের কাছে রেখে খানায় খবর দিতে গেলাম। রাত্রে ওরা একসঙ্গে কত-কালের চেনা বন্ধুর মতো আনন্দে খাবার খেয়ে ঘুমুচ্ছে; .. খোকাকে কে কখন খুঁজতে আসবে বলে আমি জেগে আছি।

আশ্চর্য্য। ত্রীযুক্ত গোবিন্দপুরের মনে যাহা হইতেছিল তাহা তাঁহার অন্তরাআই জানে। বাড়ীতে আসিতে আসিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহার খোকাকার রক্ষাকর্ত্তাকে বকশিস দিয়া বেশ করিয়া খুসি করিয়া দিবেন—খাতকদের রক্তশোষা হুদের আমদানি হইতে এক মুঠো সোনার মোহর। কিন্তু আজ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যে ববনিকা সরিয়া গেল তাহার অন্তরালে দরিত্রের একী জীবন লুক্কায়িত ছিল।—দারিদ্র্যের মধ্যে

সত্যতা, দুঃখের মধ্যে আনন্দ, অভাবের মধ্যে আতিথ্য। সেই মজুবনি মাতার সন্তান পালনের কল্প প্রাণপণ চেষ্টা, এই ছলো লোকটির স্বাবলম্বন ও অনাথের প্রতি বাৎসল্য, আর এই ছোটলোকের ছোট ছেলের এতখানি দয়া আর বুদ্ধি সেই ধনকুবেরকে অচিন্তিতপূর্ব ভাবনায় ভাবাইয়া তুলিল। এই যে বালক তাঁহার খোকাকে ছোট ভাইটির মতন বুকে করিয়া নিশ্চিন্ত আবাসে ঘুম পাড়াইয়াছে, অচেনাকে চিরপরিচিত বন্ধু মতো নিজের খাবারের ভাগ দিয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছে, পুলিশের নিষ্মম হেফাজতে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় নাই, এত বকশিসের লোভে মোটেই নয়। তবে শুধু মনিব্যাগের বন্ধ খুলিলেই তাঁহার কর্তব্য শেষ হইবার নহে—তিনি জিদোর আর তাহার পালকপিতা ছলো ফেরিগুলার ভবিষ্যৎ একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন, তাঁহার কৃতজ্ঞ সামর্থ্য চিবদিন তাহাদিগের অমুসরণ করিলে তবেই তিনি সন্তোষ লাভ করিবেন। সরকারী হুদা কারবাবের বড় সাহেবের মজলিসে যেসব ভাবুকতাহীন মহাজনদের দহরম-মহরম, তাহারা তাহাদের আদর্শ এই বড় সাহেবের মনের এখন-কার অবস্থা জানিতে পারিলে নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। বাস্তবিক হুদী কারবাবের বড় কর্ত্তা আজ তাঁহার জীবনের এক নুতন অধ্যায়ের পরিচয় দিলেন, তিনি সদাশয় আন্তরিকতা মুক্ত করিয়া ধরিতে উদ্ভূত! সত্যই তিনি এই দরিদ্র ছোটলোককে বকশিস দিতে গিয়া টাকার থলির বন্ধ না খুলিয়া একেবারে হৃদয়ের বন্ধ খুলিয়া দিতে প্রস্তুত। এই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইল এই ফেরিগুলা ছাড়া জগতে আরো অনেক দরিদ্র পজু আছে, জিদোর ভিন্ন অনেক অনাথ শিশু আছে, অনেক মাতা সন্তান পালন করিবার সংগ্রামে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেছে। আরো আশ্চর্য্য যে তাঁহার মনে হইল অর্থ যদি অভাবই মোচন না করিল তবে ত সে অর্থ নয়, ব্যর্থ,—সে বাতু, খনির মধ্যে থাকিলেও বা সিদ্ধকে পড়িয়া পচাও তা। এইসব চিন্তা তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল।

ঘুমন্ত ছাটি শিশুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুত্রহারা পিতা এইরূপ চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে যখন চমক ভাঙিয়া ফেরিগুলার মুখের দিকে তাকাইলেন তখন

তাহার বিনয়-স্বাধীন ভাব আর আনন্দে উজ্জল চক্ষু দেখিয়া তিনি হৃদয় হইয়া গেলেন।

গোদকর বলিলেন—ভাই, আজ থেকে তোমরা আমার বন্ধু। তুমি আর তোমার পোষাপুত্র আমার উপকার দিয়ে কিনে নিয়ো ... আমিও দেখাব যে আমি অকৃতজ্ঞ নই ... বন্ধু, আজ থেকেই ... বন্ধু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার অবস্থা সচ্ছল নয়, ... আমি তোমার আমার কৃতজ্ঞতার প্রথম মন্থনা দেখাতে চাই।

ফেরিওলা তাহার একখানি হাত দিয়া বড় সাহেবের নোটের-ভাড়া-ভরা হাত ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল—না, না, মশায় না, হুব হুব ন। আমবা পাবার প্রত্যাশা করে কিছু করি নি; আপনি কিছু মনে করবেন না, আমরা কিছু নিতে পারব না। আমরা সোনাদানার মুখ দেখিনি বটে, কিন্তু এমন দিন আমার চিরকাল ছিল না। আমি সৈন্ত ছিলাম, আমার এখনো মেডাল আছে; তারপর আমি কারিগর মিস্ত্রী ছিলাম; হাতের ওপর দিয়ে একদিন গাড়ী চলে গিয়ে আমার অকর্ণপা মুলো করে দিয়ে গেছে, কিন্তু তবু এখনো আমি নিজের রোজগারই খাচ্ছি, কার এক পরসার মার ধারিনে।

—তবু

সেই মুলো ফেরিওলা গোদকরের কথার আরম্ভেই সরল হাতে তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—তবু যদি আপনি আমার দয়া করবেনই, তবে এই পরিবর্তন স্বরণ রাখবেন তা হলোই যথেষ্ট হবে।

অর্থপিশাচ কুচক্রীর কাছে আজ এসব কী বিষয়কর ব্যাপার! হুদী কারবারের বড় সাহেব আজ একটা মুলো ফেরিওলার কাছে একেবারে অবাক হতভম্ব এতটুকু!

গোদকর আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু জিদোর, জিদোরের সঙ্গে আমার কিছু করতে দাও।

ফেরিওলা আনন্দে উত্তর করিল—ওর জন্তে? আঁহা ও অনাথ! আমি অনেক সময় ভাবি যে আমি ছাড়া জগতে ওর কেউ নেই, তখনই আবার ভাবি, ভাবনা কি, আমাকে হিনী জুটিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আবার কাউকে জুটিয়ে দেবেন ... ইকুলের মাঠারেরা ত শুকে বড়ই তারিক করেন, ভালো বাসেন।

সে হঠাৎ ধামিয়া গেল। তারপর বলিল—আপনি অনেককাল এসে দাঁড়িয়ে আছেন—খোকাকে গাড়ীতে নিয়ে চলুন . . . ও অধোরে ঘুমুচ্ছে এখন কোলে নিয়ে জাগবে না, ... দাঁড়ান, আগে ওর পায়ে জুতো জোতা পরিয়ে দি, ঠাণ্ডা লাগবে

ফেরিওলার দৃষ্টির অত্মসমরণ করিয়া গোদকর দেখিলেন যে অধিকৃণ্ডের ধারে জুজোড়া ছোট ছেলের জুতা রহিয়াছে—চকচকে নতুন জোড়া রাউলের, আর নাল-বাধানো ছেঁড়া নাগরা জোড়া জিদোরের, আর কি জুতার মধ্যে দু-পরমানো এক একটা পুতুল ও এক এক মাদক মেরঠাই আছে।

ফেরিওলা লজ্জিত হইয়া বলিল—ওদিকে দৃষ্টি দেবেন না মশায়; ওসব জিদোরের কাণ্ড। শোবার আগে নিজের জুতায় আর আপনার খোকার জুতায় ঐসব বড়-দিনের সপ্তগাত রেখে তবে সে ঘুমুতে গেছে ... আমি থানার খবর দিয়ে ফেরবার পথে ঐসব ছাইপাঁশ ভিনে এমের্ছলাম ছেলে ভুলোতে ...

বড় সাহেব ভাবমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার জীবকেরা তখন দেখিলে তাঁহাকে চিনিতে পারিত কিনা সন্দেহ। গোদকরের চক্ষুতে আজ জল।

হঠাৎ তিনি সেই খোলার ঘরের গলি হইতে বহিঃ-হইয়া গেলেন এবং মিনিট খানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাহার হুই হাত তখন নানা খেলনার ভরা—একটি তিনি নিজের খোকার জন্তে কিনিয়াছিলেন, এককণ গাড়ীতেই অমনে গড়াগড়ি যাইতেছিল। তিনি সেইসব নোনালি-বার্নিশ-করা চকচকে খেলনা সেই ছোট ছেলোড় জুতার মধ্যে ভাগ করিয়া রাখিয়া দিলেন। ফেরিওলা অবাক হইয়া তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

গোদকর ফেরিওলার হাতখানি নিজের আবগর্য হাতের মধ্যে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া ভাবগদগদ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—বন্ধু, আমার বন্ধু, এইসব খেলনা বড়দিন-বুড়ে খোকাদের জন্তে নিয়ে এসেছে। আমার ইচ্ছে যে রাউল জিদোরের সঙ্গে জেগে তার বন্ধুর সঙ্গে এবার খেলনা পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেবে। ... রাউল আজ তোমার বাড়ীতেই থাক। ... আজ থেকে বন্ধু, তোমরা আমার

আপনার, তোমাদের ভার সে আমার। আজ তোমরা আমার শুধু আমার হারাণো ছেলে ফিরে দিলে না, আমার হারাণো মনুষ্যত্বও ফিরে দিলে। আমি এই ছুটি ঘুমন্ত শিশুর শপথ করে বলছি একথা আমি জন্মে ভুলব না।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না ?

শ্রীবটক চট্টোপাধ্যায়। মূল্য এক আনা। কলিকাতা, ১৭ নং ভুবনমোহন সরকারের লেন হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল-ক্রাউন বোলপেজী ২০ পৃষ্ঠা।

লেখকের মত যে ব্রাহ্মগণ হিন্দু নহেন, ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্ম। এই পুস্তিকাটি বিশেষ কোন একটি যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। এই অস্ত্র ইহার সমালোচনা করা হুসাধ্য নহে। লেখক নানা স্থানে যেসকল স্বদ্ব্যয়োচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার আলোচনা নিম্নরোজন। তিনি যে দুই একটি অপ্রকৃত কথা লিখিয়াছেন, তাহারই সংশোধন আবশ্যক। তিনি বলেন, অনেক ব্রাহ্ম আপনাদিগকে হিন্দু বলার “প্রধানতঃ এই কারণেই সেলসে ব্রাহ্মের সংখ্যা এত কমিয়া বাইতেছে।” প্রকৃত কথা এই যে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে; কোন সেলসেই কনিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন, “উদার ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে দিন দিন হিন্দুমানীর দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করাতেই মোসলমান সমাজ প্রভৃতির ভগবন্ত সন্তানবিধারী সাংঘাতিকপ্রাপ্ত প্রাণ-খুলিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারিতেছেন না।” কিন্তু আমরা বলি যখন “ব্রাহ্মেরা হিন্দু” একথা উঠে নাই, তখন কি মোসলমান, খটান, প্রভৃতি দলে দলে ব্রাহ্ম হইরাছিলেন? লেখকের কথার কোন প্রমাণ নাই। তিনি বলেন “আর্যসমাজে হিন্দুমানীর বড়াই নাই।” অথচ “আর্যসমাজের” শীর্ষস্থানীয় লালালালচাঁদ প্রভৃতিই পঞ্জাবে “হিন্দুস্তান” স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। তন্নিমিত্ত হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বেদকে আর্যসমাজ অস্বীকার করেন। সত্যের বাহ্যি বিপরীত লেখক তাহাই বলিয়াছেন। লেখককে কোন মুসলমান নাকি বলিয়াছেন, যে, ব্রাহ্মেরা “বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের সিংহাসনে আর্য ঋষিদিগকে বসাইয়াছেন।” লেখক বা এই মুসলমান ভ্রমলোক এই কথাটির কথামাত্র প্রমাণ দিতে পারেন কি?

লেখক আত্মমত সমর্থনার্থ অনেক এসিদ্ধ ব্রাহ্মের নানা বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু লেখক ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি ঐহাদিগকে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য সালিস মানিতেছেন তন্মধ্যে সহস্র দেবেল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সীতানাথ তর্কভূষণ, প্রভৃতি অনেকে ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুই মনে করেন।

“আমার পরম প্রত্যাশা বহু একজন নিষ্ঠাবান্ পরম ভক্ত ব্রাহ্ম ডাক্তার কালি আবদাল গফ্ফার।” ইহা লেখকের কথা। ডাক্তার কালি আবদাল গফ্ফার মহাশয়ের কস্তা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন, তখন মুসলমানকস্তা বলিয়া ডাক্তার মহাশয় কস্তার নিমিত্ত বিশেষ বৃত্তির অস্ত্র দরখাস্ত করেন, এবং কস্তা উহা প্রাপ্ত হন। হুতরাং কেহা বাইতেছে যে ডাক্তার মহাশয় ব্রাহ্ম হইয়াও মুসলমানের দাবী

হাডেন নাই। কিন্তু লেখক মহাশয়ের মতে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্ম হইলে তাহার পক্ষে হিন্দুদের দ্বারা মাদানও মহাপাপ।

আমাদের নিজের ধারণা এই যে ব্রাহ্ম ধর্মের মূল সত্য বাহ্যি তাহা হিন্দুধর্মও আছে; এবং ব্রাহ্মধর্ম স্বাধীনতার ধর্ম। হুতরাং কোন ব্রাহ্ম যদি আপনাকে হিন্দু বলিতে চান, ত, তাহাতে কোন বাধা নাই। হিন্দুধর্ম প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রেই আবদ্ধ নয়। মুসলমান রাজত্বকালে যেসকল হিন্দু ধর্মসংস্কারক অস্বগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতাবলম্বী উপাসকসম্প্রদায়গুলিও হিন্দু বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একেশ্বরবাদী, এবং জাতিভেদ বা মূর্তিপূজার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। অনেক মুসলমানও এইসকল হিন্দু উপাসকসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। এইসকল সম্প্রদায় যদি হিন্দু হন ত, ব্রাহ্মেরা কেন হইবেন না? হিন্দুধর্ম অস্বগ্রহণ ধর্মের মত ক্রম-বিকাশশীল এবং ক্রমপরিবর্তনশীল। ইহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ব্রাহ্মধর্ম। ভবিষ্যতে ইহার আরও পরিবর্তন হওয়া সম্ভবপর। হুতরাং হিন্দুধর্ম চিরকালের অস্ত্র কতকগুলি শাস্ত্র বা সাধুবাণ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য নহে। ইহাও স্বীকার্য্য নহে যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ যে ব্রাহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মের নিরাকার উপাসনা, প্রভৃতি, তাহা হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না, কেবল মূর্তিপূজা, স্পৃহাস্পৃহ বিচার, খাদ্যাখাদ্যবিচার, জাতিভেদ, ইত্যাদি অংশই ঐ হিন্দুধর্মে একচেটিয়া অবিকার স্থাপন করিয়া আছে। ফলতঃ, পাশ্চাত্য যুগিটেরিয়ানগণ যেমন ক্রিস্তবাদী খটানদিগের নানা ভ্রান্তমত ত্যাগ করিয়াও আপনাদিগকে খটানই বলেন, তেমনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মগণও আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে পারেন। তবে কেহ জোর করিয়া ঐ নাম তাহাদিগকে দিতে চান না, দিতে পারেনও না।

লেখক হিন্দু নামটিকে যুগ্মার সন্ধে দেখেন। খটান নামটি প্রথমে অবজ্ঞাহুচক ছিল, এখনও অনেকে অবজ্ঞার সহিত উহা ব্যবহার করেন। “মোছলমান” কথাটিও অনেকে অবজ্ঞার সহিত ব্যবহার করেন। তাই বলিয়া মোসলমান বা খটানগণ নিজনিজ নাম কেম পরিত্যাগ করিবেন?

আমরা প্রহুপরিচয়ের সাক্ষীসীমা অতিক্রম করিয়া বাইতেছি। হুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হই।

ব্রাহ্মবিভাগীয়—

ঐজ্ঞানিতকুমার চক্রবর্তী। মূল্য ১/০। আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫, অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা। ৫৯ পৃষ্ঠা।

এই বহিখানিতে বোলপুর শান্তিনিকেতনই ব্রাহ্মবিভাগীয়ের বাহ ইতিহাস ব্যতীত, ইহাও কেন্দ্রগত মূলভাব, প্রভৃতিও বিবৃত হইয়াছে। কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলে পুস্তকখানির কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

“কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন, তখন মহর্ষি তাঁহাকে এই কার্য্যে বুঝই উৎসাহ দিলেন। আমি কবির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার মনে হঠাৎ একপ সঙ্কল্পের উদয় হইল কেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছি। তাঁহার কাব্যজীবনের ভিতর দিয়াই তাঁহার একটা পরিবর্তন ঘটতেছিল,—পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে পুটনিবন্ধ কেবলমাত্র ভাবময় জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিভূক্তি দিতেছিল না; আপনাদের বেষ্টন ছাড়িয়া একটা বড় ত্যাগের জীবনের অস্ত্র তাঁহার বেদনা প্রাপ্তিতেছিল। কাব্যের পথ দিয়াই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে, ধর্মনীতিতে প্রবেশ করিলেন; সর্ব্বত্রই দেখিলেন আপনাকে ক্রমাগত ধর্ম করিয়া পূর্ণরূপে

ত্যাগের আদর্শই কেবলি প্রকাশ পাইয়াছে।” “তাহার মনে হইল যে ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুর্দশমের আদর্শের মত জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হইতেই পারে না। এ আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়রূপ করিয়া তোলা যায়। বাল্যে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্য-পালনের দ্বারা জীবনের মূর বীধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম-ভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা, সমস্ত জিনিসকে সেই বড় দিক্ হইতে আনন্দের দিক্ হইতে দেখিতে শিক্ষা করা—যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বাদ্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারবন্ধনকে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান, তাহার পর মৃত্যুর সময় একাকী পরলোকে প্রয়াণ—শিক্ষাকে, সংসারকে, বিষয়ভোগকে এমন মুক্তির সোপান করিয়া তোলার মত আদর্শ আর কোথায়? হুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে বানপ্রস্থ জীবন বাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রোঢ় বয়সে কবিকে পাইয়া বসিল। আদর্শ কেবল কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে তিনি উৎসুক হইলেন।”

পুরাকালে যেসকল ঋষি ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বিদ্যার্থীদের অশেষ কল্যাণের উপায় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহারা উভয় ছিলেন না। তাহারা সংসারিক ঐশ্বর্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এবং পারমার্থিক ঐশ্বর্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্তকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। হুতরাং অধুনা সেই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আশ্রমসংগঠন সকলকে সংসারিক ঐশ্বর্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে পূর্বতন ঋষিদের ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। লেখক যে ইহা বিস্মৃত হন নাই, তাহার পরোক্ষ প্রমাণ পুস্তকের নানা স্থানে আছে।

“ইয়োরোপে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের কোন বিরোধ নাই; সমাজের মধ্যে নানা ভাবে যেসকল চেষ্টা ও চিন্তা জাগিতেছে, বিদ্যালয়ে তাহাই স্থান পাইয়া বিদ্যালয় শিক্ষার্থীগণকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তৈরি করিতেছে। ইহা দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে আমাদেরও ভিতর হইতে একটা বিদ্যালয় ঠিক তেমনি করিয়া জাগে। সে আধুনিক বিদ্যালয়ের ছায় বাহিরের পুথি পড়াইবার ও পরীক্ষা পাশ করাইবার একটা যন্ত্রমন্ত্র না হোক,—সে আমাদের দেশের ভাবে রসে চিন্তায় কল্পনায় উদ্বোধিত করিয়া অমুকরণ বৃত্তি হইতে আমাদিগকে নিবৃত্তি দিয়া আমাদের সমাজকে একটি বিশেষ শক্তি দিক! বাস্তবিক, এই ইচ্ছাই আমাদের এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার ভিতরকার ইচ্ছা ছিল।”

পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমুদয় ব্যাপারের শিক্ষানবিশী বিদ্যালয়েই করান চলে। আমাদের দেশে প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার বাস্তবিক কিছুই নাই। হুতরাং বিদ্যালয়কে ভবিষ্য জীবনের শিক্ষানবিশীর ক্ষেত্র সকল দিক্ দিয়া করা যায় না। কেবল সমালোচনা ও প্রতিবাদের দিক্ দিয়াও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে সম্প্রসঙ্গ রাখিবার যো নাই; এবং তাহা মানব প্রকৃতির স্বস্থতারও হানি করে। তথাপি বিদ্যালয়কে সংসারের কোন বিভাগ হইতে নিঃসম্পর্ক রাখা যে বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা দ্বিগুণ প্রতিকারের চেষ্টা করা বিধেয়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যেসকল ছাত্র থাকেন, তাহাদের ও তাহাদের অভিভাবকদের এই পুস্তকখানি পড়া উচিত। শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিরও ইহা পঠনীয়।

পুস্তকখানিতে কিছু ছাপার ভুল আছে।

নেপালে বঙ্গনারী—

শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। উৎকৃষ্ট ময়ূর কাগজে ছাপা। আর্ট পেপারে ছাপা ১৪ বানি উৎকৃষ্ট ছবি সম্বলিত।

মানুষ যদি দেশে ও কালে আপনার সংকীর্ণ গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শিক্ষিত বলা যায় না। এই কুপমভুক্ততা দূর করিবার জন্ত ভূগোল ও নানা দেশের ইতিহাস পাঠ একান্ত আবশ্যক। তাহার পর স্বদেশে ও বিদেশে ভ্রমণ না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের দেশে এবিধ শিক্ষার আয়োজন বড় কম। অন্য দেশের কথা দূরে থাক, আমরা ভারতবর্ষকেই ভাল করিয়া জানি না। ভারতের সকল প্রদেশের ভূগোল ইতিহাস আমাদের অনেকের অজ্ঞাত। আমরা কাগজে পড়ি, “বাকুড়া ভ্রমণ,” বা “কাটোয়া ভ্রমণ,” বা তদ্বিধ কিছু। খুব বেশী যাহারা বেড়ান, তাহার করেন উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণ। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটাদি দেশ বা রাজপুতানা বেশী লোকে দেখেন না। নেপালের মত দুর্গম দেশে যাওয়া দূরে থাক, তাহার বিষয়ে ভাল করিয়া কিছু জানিবার উপায়ও পর্যাপ্ত বাঙ্গালী সাহিত্যে ছিল না। শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্বয়ং নেপালে গিয়া বাস করিয়া, নিজ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের ফলস্বরূপ বাঙ্গালীদিগকে এই সুন্দর বহিখানি উপহার দিয়াছেন। তাহার ভাষার প্রাণ আছে, এবং বর্ণনাশক্তি আছে।

নেপালবাসী, কাটমণ্ডু, নেপালের অধিবাসিগণ, প্রধানতীর্থ-পুণ্ডপতি-নাথ, নেপালে বৌদ্ধধর্ম, নেপালের বৌদ্ধমন্দির, নেপালের পূজাপার্বণ ও জাতীয় উৎসব, নেপালের প্রাকৃতিক বিবরণ, নেপালের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান, নেপালের পুরাতত্ত্ব, গুপ্তা বিজয়, নেপালের বর্তমান গুপ্তাধিপতিগণ, এবং নেপালের আদর্শ সতী স্বগীরা বড় মহারাণী,—লেখিকার তাহার পুস্তকে এই কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। হুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইহা পড়িলে নেপাল সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয়। আমাদের অনুরোধ এই যে দ্বিতীয় সংস্করণে লেখিকা নিজ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফল আরও অধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিবেন। তাহা হইলে এই পুস্তক বর্তমান সংস্করণে যেরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তদপেক্ষা আরও মনোরম হইবে।

পুস্তকখানিতে জানিবার ও ভাবিবার বিষয় এত আছে, যে দু একটির উল্লেখ করিলে তৃপ্তি হয় না। “এখন কাটমণ্ডুতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে! সহর এখন উজ্জ্বল!” কিন্তু নেপালের মানুষগুলির মন জ্ঞানালোকে কখন উজ্জ্বল হইবে? কাটমণ্ডু সহরের “এই সীমার মধ্যে কোন নীচজাতীয় ব্যক্তির বাস করিবার অধিকার নাই।” যে দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর আত্মসম্মান বোধ করিবার ও বজায় রাখিবার উপায় নাই, সে দেশ কখন বড় হইতে বা থাকিতে পারে না। “ইন্দ্রচক কলিকাতার বড়বাজার বলিয়া ভ্রম হয়। কিলাতী পণ্যত্রয়ো ইহা হুমোভিত।” হুতরাং নেপাল স্বাধীন হইয়াও পরাধীন। বিদেশী বশিক্ ইহা শোষণ করিতেছে। কাটমণ্ডুতে বীর হাঁসপাতাল, দরবার স্কুল, বীর লাইব্রেরী, ড্রেন ও জলের কল আছে। কিন্তু নেপালে দেশব্যাপী কোন শিক্ষার আয়োজন নাই। নেপালবাসীদের “বাহ্যাকৃতি চালচলন কোনরূপ বীরত্ব বা গৌরব্যাক্রম নহে।” বাহ্যিক বাঙ্গালীর চেহারা ও চালচলন দেখিয়া বাঙ্গালীর সম্বন্ধে নিরাশ এই কথাটি তাহাদের চিন্তনীয়। নেপালে “কুমারী, সধবা, কি বিধবা কাহারও মস্তকে আবরণ নাই।” অতএব, প্রমাণ হইতেছে যে অবশুষ্ঠনের মধ্যে জড়সড় না হইলেও হিন্দুনারী হিন্দুনারী থাকিতে পারেন। “স্ববর্ণিতে লালহুতা বীধা ভিন্ন সধবাদের আর দুইটি লক্ষণ আছে। হাতে কাচের চুড়ি, গলায় পুতির মালা। এই দুইটাই কিন্তু বিলাতি জিনিষ। সধবাদিগের প্রধান লক্ষণ এই দুইটি বিলাতি



নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী—

মহারাজ নার চন্দ্র শামসের জন্ম রাণা বাহাদুর।

[“নেপালে বন্দনারী” হইতে গৃহীত]

জিনিষ কিরাপে হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।” “উচ্চ পরিবারের রমণীগণ সর্বদা জুতা মোজা পরিধান করিয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দু আচারের কোন ব্যতিক্রম হয় না। পূজা কিম্বা আহারের সময় জুতা মোচন করিলেই চলে।” “ভারতবর্ষের স্ত্রীর নিরস্ত্র ব্যক্তির বাহ্য এখানে নাই। গৃহে গাভী কিম্বা মহিষ, ক্ষেত্রে মোটা চাউল, মক্কা, গম, শাক তরকারী অধিকাংশের গৃহেই থাকে।” “নেপালের প্রজাবর্গ দরিদ্র বটে, কিন্তু ইহারা অর্থহীন দরিদ্র; নিরস্ত্র, অনাহারক্লিষ্ট, করভারে প্রপীড়িত, জীর্ণদেহ, মনুষ্যকন্ডাল নহে। ইহারা দূঢ়, বলিষ্ঠ, কপট ও প্রসন্নমুর্তি।” “নেপালের দাসত্বপ্রথা ইউরোপীয়দিগের দাসত্বপ্রথার ন্যায় নহে। এখানে দাসদাসীগণের কোন কষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সম্মাননির্বিশেষে প্রতিপালিত হয়।” “গোহত্যা ব্রাহ্মণহত্যা করিলে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পাণের প্রাক্ষিতের ব্যবস্থা হয়।” লেখিকা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন :— “নেপালের রাজ্যে পদার্পণ করিয়া, একদিন এই বলিয়া আনন্দ করিয়া-

ছিলাম, যে আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন ব্যুর আসিয়া আমার দেহকে আলিঙ্গন করিল। এমন দিন আমার জীবনে আসিবে ভাবি নাই ত। ছই বৎসর নেপালে বাস করিয়া, দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হইল, এ যে আমার স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন। স্বাধীনতায় এ জাতি কি লাভ করিয়াছে হায়! আমি তাহা দেখিতে পাইলাম না।” বাস্তবিক ‘স্বাধীন’ থাকিয়া নেপাল সুবিচার, হুশাসন, সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞানধর্মে উন্নতি, সর্বজনভোগ্য স্বচ্ছল অবস্থা লাভ করে নাই; প্রজাবর্গ মানুষ হইতে পারে নাই। লাভ মাত্র এইটুকু হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ন্যায় নিরস্ত্র জীর্ণদেহ লোকের বাহ্য এখানে নাই। একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পরাধীনতা ছই প্রকারের: (১) বিদেশীর অধীনতা, এবং (২) আদিতে বিদেশবাসী কিন্তু বর্তমানে স্বদেশবাসী বিজয়ী শ্রেণীর অধীনতা। দ্বিতীয় প্রকারের অধীনতায় স্বাধীন হইবার আশা ও সম্ভাবনা অধিক থাকে। দৃষ্টান্ত তুরস্ক ও চীন। নেপালেরও এই সৌভাগ্য ঘটিতে পারে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার থাকিলে তাহাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে। আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। পাঠকপাঠিকাগণ নিজে সমগ্র বহিধানি পড়িয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করুন। ছবিগুলির জন্ত লেখিকা স্বয়ং ফোটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন। ছবিগুলি হইয়াছেও ভাল। ছবির ছাপাও বেশ হইয়াছে। কিন্তু লেখার ছাপা নিভুল হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য অর্থবোধে ক্রেশ হয় না।

গোড়বিবরণ—

[বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি-সঙ্ঘতি।]

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—প্রথম খণ্ড। গোড়রাজমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ

চন্দ্র প্রণীত। রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-

সমিতি হইতে শ্রীহরেন্দ্রের বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৯। মূল্য ছই টাকা।

দীর্ঘপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া একটি অক্ষয় কীর্তিস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গের ধনী জমিদারবর্গ, সকলে না হউক, অধিকাংশ, কুমার শরৎকুমার রায়ের মত সুশিক্ষিত ও বিদ্যাবিদ্যাসী হইলে দেশের কি সৌভাগ্য হইত, কি উন্নতি হইত!

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্যের গুরুত্ব কিরূপ, ইহা কিরূপ সফলপ্রদ হইবে, তাহা এই “গোড়রাজমালা” হইতেই বুঝা যায়। ইহার লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র অতি বোধ্য ব্যক্তি। তিনি যে এই পুস্তক প্রণয়নে কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রমাণ সংগ্রহের জন্ত কিরূপ নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রমাণ প্রয়োগে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝা যায়। তিনি যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা ঠিক

হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষজ্ঞদিগের বিচার্য। আমরা পল্লবগ্রাহী, সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশে অধিকারী নহি। তবে একথা আমরাও বুঝিতে পারিতেছি এবং অসম্বোধে বলিতেছি যে এখন হইতে যদি কেহ বঙ্গের ইতিহাস জানিতে বা লিখিতে চান, তাহা হইলে তিনি তাহার অধীতবা গ্রন্থতালিকা হইতে এই পুস্তক বাদ দিতে পারিবেন না।

এই গ্রন্থে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিজ্ঞাবিৎ অনেক পণ্ডিতের মত আলোচিত হইয়াছে। এইজন্য ইহার সিদ্ধান্ত ও প্রমাণগুলি ইংরাজীতেও প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে তৎসমুদয় উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারিবে। স্বদেশপ্রেমের পক্ষপাতিত্ব অনেক সময়ে অলক্ষিতে আমাদেরকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে লইয়া যায় বলিয়াও আমাদের সিদ্ধান্তসকল ইংরাজীতে লিখিত হইয়া বিদেশীদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া ভাল।

আজকাল বাহালা ইতিহাসের আলোচনা করেন, তাহার। যখন ছাত্র ছিলেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তখন ইতিহাসচর্চায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি এখনও সমান উৎসাহে সেই কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ইহা অভ্যস্ত হৃদয়ের বিষয়। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি তাঁহাকে গোড়বিরণ গ্রন্থাবলীর সম্পাদক নির্বাচন করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থাবলীর রাজমালা প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে যথাক্রমে শিল্পকলা, বিবরণমালা, লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ত্ব, শ্রীমুর্তিতত্ত্ব ও উপাসকসম্প্রদায় প্রকাশিত হইবে। অক্ষয় বাবু আলোচ্যগ্রন্থের যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহা সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত, ও সারবান্। ফেনাইয়া লিখিলে তাহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু অক্ষয় বাবু তাহা করেন নাই। উপক্রমণিকার ঠাস বুঝ পাঁচ হাতের পরিচয় দিতেছে। উহা হইতে আমরা কোন কোন অংশে উদ্ধৃত করিতেছি। উহাতে সমগ্র গ্রন্থের সমুদয় সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

“বিগত একশত বৎসরের অনুসন্ধান-লব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার কার্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—মুসলমান-শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বকালবর্তী বরেন্দ্রমণ্ডলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসীর ইতিহাসের মূলসূত্রের সন্ধান লাভের আশা করা যাইতে পারে। বরেন্দ্র-ভূমি প্রাচীন ভূমি বলিয়া,—বরেন্দ্রভূমি দেবমাতৃক বলিয়া,—(মহানন্দার পূর্ব তীর হইতে করতোয়ার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত) নানাস্থানে এখনও অনেক রাজহুগের, অনেক রাজভবনের, অনেক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিষয়বিজড়িত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।”

“এইসকল কারণে,—বাস্তবালী ইতিহাসের উপাদান-সম্বলনের আশায়,—বরেন্দ্রমণ্ডলে ধারাবাহিক রূপে তথ্যানুসন্ধানের আরোজন করিবার অভিপ্রায়ে,—রীবাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্-এ, (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) একটি ‘বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি’ গঠিত করিয়া, তথ্যানুসন্ধান ব্যাপ্ত হইয়াছেন। তাহার অকাতর অর্থব্যয়, অক্লান্ত অধ্যবসায়, এবং প্রশংসনীয় ইতিহাসাহুয়োগ, অগ্র-কালের মধ্যেই, অনুসন্ধান-সমিতিকে সকলের নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। অনুসন্ধান-ক্ষেত্র এবং অনুসন্ধানের অবসর অল্প হইলেও, অনুসন্ধানের কল নিত্যই অল্প হয় নাই।” “বাস্তবালী ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য অনেক স্থান আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, অনেক চিত্র সংকলিত হইয়াছে, এবং অনেক পুরীকার্ত্তির নিদর্শনও সংগৃহীত হইয়াছে। এইসকল নিদর্শন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য,—(১) পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, (২) ভাস্কর্যের

নিদর্শন, (৩) পুরাতন জ্ঞানধর্মসভ্যতার নিদর্শন [অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ]।”

ইতিহাস-রচনায় “কিরূপ বিচারপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। স্মার্যনিষ্ঠ বিচারপদ্ধতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদেরদের জ্ঞদয়ঙ্গম হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। কবি কল্পণ ‘রাজতরঙ্গিনী’র উপোদ্যোতে লিখিয়া গিয়াছেন,—

স্মার্যঃ স এব গুণবান্ স্মার্যেষ-বহিষ্কৃত।

তৃতার্থকথনে বস্তু স্মের্যমোঘ সরস্বতী ॥

“আমাদের সাহিত্যে এই উপদেশবাক্য এখনও সম্যক স্মরণীয় লাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ, আমাদেরকে পূর্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অধিকুল বা প্রতিকুল করিয়া রাখিয়াছে। পালবংশের এবং সেনবংশের নরপালগণের শাসনসময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা যেন তুচ্ছ কথা,—তাঁহাদের জাতি কি ছিল, তাহাই এখনও আমাদের নিকট প্রধান আলোচ্য হইয়া রহিয়াছে।”

“পক্ষান্তরে ‘গৌড়রাজমালা’র দেখিতে পাওয়া যাইবে,—পাল-নরপালগণের অভ্যুদয় লাভের অব্যবহিত পূর্বে, সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল; সমগ্র দেশের উপর কাহারও কোনরূপ আধিপত্য বিস্তারমান ছিল না; বাহুবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সকলের কবলে দুর্বলবল নিপীড়িত হইতেছিল; দেশ একেবারে ‘অরাজক’ হইয়া পড়িয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ অবস্থার নাম ‘মাংস্ত্র জ্ঞায়’। তাহাকে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে, প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। তিনিই পাল-নরপালবংশের প্রথম ভূপাল,—ইতিহাসে “প্রথম গোপালদেব” নামে উল্লিখিত।

“এদেশের প্রজাপুঞ্জ, অরাজকতা দূর করিবার জন্ত, একবার একজনকে রাজা নির্বাচিত করিয়া, প্রজাশক্তির বিধিগত অমোঘবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,—ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ সময়ে, প্রজাশক্তির এরূপ উন্মেষ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার আলোচনার সময়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য।”

মহাবলপরাক্রান্ত পাল সম্রাটগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, বরেন্দ্রমণ্ডলে সংস্থাপিত গরুড়ভূজের দ্বিতীয় মোকে তাহার অন্ততম প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও ছবি ভাল। ছাপা নিতুলনা হওয়া দুঃখের বিষয়। এইরূপ একখানি বহিতে অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পুস্তকের শেষে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া উচিত ছিল।

সম্পাদক।

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়—

গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃতাদ্যাপক শ্রীরামলাল বোদান্তর্জী বিদ্যারত্ন, এম্-এ, কর্তৃক সম্পাদিত। ডি, এন, ভট্টাচার্য (ভট্টাচার্য এণ্ড সন্, ৬এনং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১১+৮৪+২৮+১৬; মূল্য ১০।

হুইথানা হস্তলিপি এবং ছয়খানা মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে বোদান্তর্জী মহাশয় কুল্লুক ভট্টের টীকা সহ মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পাদন করিয়াছেন। পাদটীকায় পাঠান্তর এবং পরিত্যক্ত অংশ দেখান হইয়াছে। কুল্লুক ভট্টের টীকাতে যে যে অংশ অপরাপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় তাহার মূল নির্দেশ করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। যে সমুদয় স্থলের মূল নির্দেশ করা সম্ভব হয় নাই, গ্রন্থের শেষে তাহার এক তালিকা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকা ইংরাজীতে লেখা এবং ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সম্পাদক-মহাশয়-প্রদত্ত টীকাও (২৮ পৃঃ,) মূল্যবান। বি-এ, পরীক্ষার্থী এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। একটা অনুবাদের দিলে গ্রন্থের মূল্য আরও বৃদ্ধি হইত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

শিক্ষা-সমালোচনা—

কলিকাতা, বেঙ্গল হাশিখাল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রী বিনয়কুমার সরকার, এম-এ প্রণীত। পৃঃ ২+১২+১২৪; মূল্য ১/-

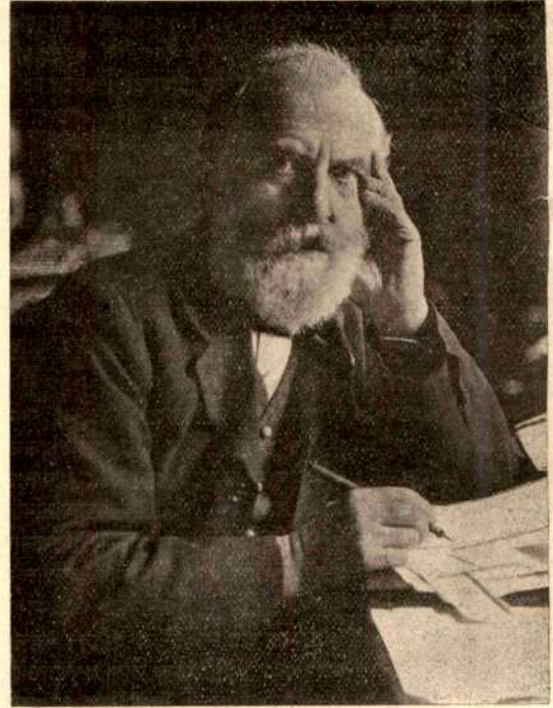
এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে—

(১) মনুষ্যদ্বারা লাভের সোপান, (২) চিন্তায় মৌলিকতা, (৩) চরিত্র-গঠনের উপাদান—মানবসেবা, (৪) আরোহ পদ্ধতির অধ্যাপনা প্রণালী, (৫) জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে? (৬) ভাষাশিক্ষা প্রণালী, (৭) শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক, (৮) আদর্শ-শিক্ষা-পদ্ধতি, (৯) বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা।

প্রত্যেক অধ্যায়ই হুলিখিত। শিক্ষকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন; সাধারণ পাঠকের পক্ষেও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

শ্রী বরদাচরণ মিত্র এম-এ, সি-এস, এই গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তরলতার পরিচয় না দিলেই ভূমিকার মূল্য বৃদ্ধি হইত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।



মহাত্মা উইলিয়ম স্টেড।

ইনি সমস্ত জগতের হিতৈষী বন্ধু ও নির্ভীক স্থায়নিষ্ঠ বীর ছিলেন; টাইটানিক জাহাজ ডুবির সময় ইনি দেখুইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

“টাইটানিক” জাহাজ ডুবির সময় মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও অনেক ইংরাজ ও মার্কিন পুরুষ নারী অবিচলিত চিত্তে নিজ নিজ কর্তব্য করিয়াছেন। অনেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে চেষ্টা না করিয়া অপরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই যে নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গ, ইহা কোন কোন জাতিতে যতটা দেখা যায়, অত্বে কোন কোন জাতিতে তত দেখা যায় না; তাহার কারণ কি? একজন ফরাসী নাট্যকার “ফিগারো” নামক ফরাসী কাগজে লিখিয়াছেন যে ফরাসী জাতি নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সকল অবস্থায় নারীকে রক্ষা করিবার যে ভাবে (chivalry) ইউরোপকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাহা এই নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গের একটি কারণ। অপর কারণ, ফলাফল স্বত্বতঃ বিচার না করিয়া কর্তব্যশীলনে যে দৃঢ়তা আধুনিক যুগে জন্মিয়াছে (modern stoicism)।

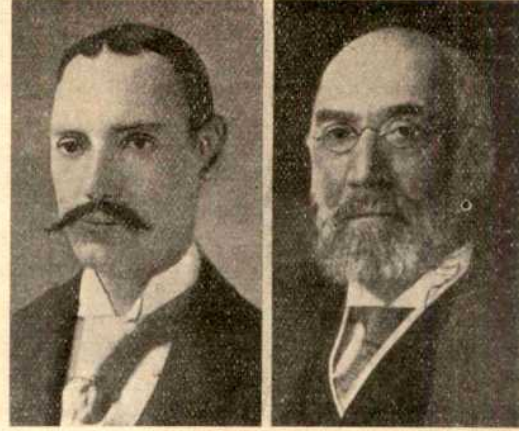
এগুলি অবশ্য কারণ বটে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা কতকগুলি ব্যবসায়, কার্যে ও নৈসর্গিক অধিকার ভোগে অভ্যস্ত থাকায় সমুদয় কারণ ঠিক ধরিতে পারেন না। স্বদেশ রক্ষা বা বিদেশ আক্রমণ জন্ত ঐসকল দেশে স্থলসৈন্য ও জলসৈন্য আছে। সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরই ঐসব দেশে স্থলসৈনিক বা জলসৈনিক হইবার অধিকার বা সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্ত এমন কোন গ্রাম নাই, যাহা হইতে কেহ না কেহ সৈনিক না হইয়াছে। এইজন্ত মুহূর্তমধ্যে মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হওয়া, প্রাণটি হাতে লইয়া যুদ্ধ করা, সে দেশের লোকদের কাছে অসাধারণ ব্যাপার নয়। ঐসব দেশে অস্ত্র-আইন না থাকায়, যাহার ইচ্ছা অস্ত্র রাখিতে পারে, স্বদেশে বিদেশে ভীষণ হিংস্র জন্ত শিকার করিতে অভ্যস্ত হইতে পারে। তাহাতে তাহাদের পৌরুষ বৃদ্ধি হয়, মৃত্যুভয় কম হয়। ঐসব দেশের লোকেরা নানাবিধ পুরুষোচিত বিপদসম্ভাবনাসম্মুল ব্যায়াম



কাপ্তেন স্মিথ।

টাইটানিক জাহাজের অধ্যক্ষ। ইনি খ্যাত জাহাজের সহিত বীরের ন্যায় সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছেন।

ও ক্রীড়া করে। আজকাল কত লোক যে এরোপ্লেন নামক আকাশযানের সাহায্যে আকাশে উঠিতেছে এবং তন্মধ্যে যে কত লোকে অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়িয়া মারা পড়িতেছে, তাহা মনে করিয়া রাখা যায় না। অথচ এরোপ্লেন আরোহণ হইতে কেহ নিবৃত্ত হওয়ার চিন্তা মনে স্থান দিতেছে না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বাণিজ্যের জন্ত, যুদ্ধের জন্ত, নানাদেশ ভ্রমণের জন্ত, স্বাস্থ্যলাভ বা আনন্দের জন্ত, তিমি, কচ্ছপ, মংগু প্রভৃতি ধরিবার জন্ত, প্রবলদি মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্ত, টেলিগ্রাফের তার সমুদ্রতলে বসাইবার জন্ত, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্ত, স্মেরক কুমেরক বা তল্লিকটবর্তী দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করিবার জন্ত, জাহাজে করিয়া মহাসাগরবক্ষে যাতায়াতে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জনে অভ্যস্ত। ইহা বড় বিপৎসম্বল। কিন্তু এইরূপ বিপৎসম্ভাবনায় অভ্যস্ত হওয়ায় লোকেরা সাহসী ও মৃত্যুভয়ে অবিচলিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও আফ্রিকার অনেক



জন জেকব এষ্টর ও ইসিদোর ব্রুস।

ইহারা ধনকুবের, আত্মরক্ষা অপেক্ষা পরের প্রাণ রক্ষায় ধর্ম, গৌরব ও আনন্দ বোধ করিয়া ষেচ্ছায় সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছেন।

অজ্ঞাত প্রদেশ, মরুভূমি ও অরণ্যানী অতিক্রম ও আবিষ্কার করিয়া মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিতে শিখিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কত বিবাক্ত বাষ্প, কত বিপজ্জনক বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার বা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন, ও তৎসমুদয়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। তাহাতেও মৃত্যু-সম্ভাবনা আছে। তাঁহারা প্লেগ আদি ভীষণ মহামারীর বীজ অনুসন্ধান করিতে গিয়াও মৃত্যুর সম্মুখীন হন। উচ্চ পর্বত আরোহণ, উচ্চ পর্বতমালায় সর্বোচ্চ শৃঙ্গে সর্বপ্রথমে পদক্ষেপ ইত্যাদি চেষ্টার দ্বারাও পাশ্চাত্য অনেক পর্যটক নিজ নিজ কষ্টসহিষ্ণুতা ও পৌরুষের পরিচয় দেন। ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির ধাতু-নিঃস্রাবী গহ্বরমুখেও ইহারা অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না।

“টাইটানিক” জাহাজ ডুবির সময় আর একটি দৃশ্য এই দেখা গিয়াছিল যে যিনি ক্রোড়পতি, বা উচ্চপদস্থ বা সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধ, এরূপ লোকও অতি দরিদ্র, নগণ্য লোকের জন্ত প্রাণ দিলেন। তাহার কারণ এই যে পাশ্চাত্য জগতের এক এক দেশে লোকেরা প্রায় এক জাতের লোক। সত্য বটে তথায়ও ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও নিরক্ষর, অভিজাত ও সাধারণ লোকদের মধ্যে সর্বদাই সামাজিক নিম্নত্বাদিতে একত্র আহার আমোদ বা বৈবাহিক আদান প্রদান হয় না। কিন্তু এইসকল শ্রেণীর মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের মত বংশগত পার্থক্য নাই। কেহ স্পৃহা জাতির লোক, কেহ অস্পৃহা জাতির লোক, একের স্পৃষ্ট জল বা খাদ্য অণুর অব্যবহার্য্য, একের পক্ষ অন্ন অপরের অখাদ্য, এরূপ কোন বিভাগ প্রকল

দেশে নাই। সুতরাং যে-কোন খেতকার মনুষ্য, হীন বা দরিদ্র বংশে জন্মিয়াও যথেষ্ট ধন বা বিত্ত উপার্জন করিতে পারিলে, সাহিত্য শিল্প আদিতে যথেষ্ট প্রতিভা দেখাইতে পারিলে, যুদ্ধে শৌর্য দেখাইতে পারিলে, তাহার সামাজিক পদবী ও প্রতিষ্ঠা উচ্চতম শ্রেণীর লোকদের সমান হইবার একটা সম্ভাবনা আছে। এইজন্য ঐসকল দেশে, খেতকারদিগের মধ্যে দয়া ও সহানুভূতি বংশ বা রক্তের অলঙ্ঘ্য সীমায় গিয়াও বাধা পায় না। বংশ, ধনশালিতা ও বৃত্তির প্রভেদ সত্ত্বেও তথায় মনুষ্যত্বের সাধারণ ভূমিতে সকলেই দাঁড়াইতে পারে।

ভারত গবর্ণমেন্ট এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, উহার অঙ্গীভূত হইবে কেবল ঢাকা সহরের কলেজ ও স্কুলগুলি, উহা সাক্ষাৎ ভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবে, এবং ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়েই বাস করিতে হইবে, তাহার নিজ বাড়ী বা বাসা হইতে আসিয়া স্ব স্ব শ্রেণীতে পড়িয়া যাইতে পারিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া দিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকে একটি কমিশন বসাইয়া স্থির করিতে বলিয়াছেন, যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ হইবে, কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, ছাত্রবেতনাদি কিরূপ হইবে, উহার অধ্যক্ষসভা কিরূপ হইবে, ইত্যাদি। ঢাকাতে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেই লোকের আপত্তি ছিল, গবর্ণমেন্ট তাহা গুনিলেন না। ঢাকায় একজন শিক্ষা-কর্মচারী বঙ্গের ডিরেক্টরের আদেশ বা তাহার সহিত পরামর্শের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া মৃত পূর্ববঙ্গ-গবর্ণমেন্টের রাজনীতিজ্ঞ শিক্ষানীতি অনুসারে কাজ করিতেছেন। পূর্ববঙ্গ-গবর্ণমেন্টের দেহ লয় পাইয়াছে, কিন্তু উহার প্রেতাঙ্গ এখনও কতকগুলি রাজকর্মচারীর ঘাড়ে চাপিয়া তাহাদিগকে পূর্ব-নির্দিষ্ট পথে চালাইতেছে। সুতরাং শিক্ষা ও শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল বিষয়ে গবর্ণমেন্টের নীতি সম্বন্ধে বাঙ্গালীদিগকে এখনও সন্দেহান থাকিতে হইতেছে।

গবর্ণমেন্ট যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনঃপূত হয় নাই। সভাপতি ও কোন কোন সভ্য সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। কিন্তু এখন, কাহার কাহার বিরুদ্ধে আপত্তি, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া কোন লাভ নাই। সার্ব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপদ গ্রহণ করিলে হয়ত কিছু সফল ফলিতে পারিত। সার্ব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিশনের অঙ্গীভূত হইলে ভাল হইত। বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মত পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আর কাহারও নাই। তন্নিম্ন, তর্কযুদ্ধে তিনি নিজমত বজায় রাখিতে স্ননিপুণ। সুতরাং তিনি

কেবল কমিশনের পরামর্শদাতা হওয়ায় আমরা সন্তুষ্ট হই নাই।

গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন বটে, যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের খরচ যেন এরূপ হয়, বাহাতে গরীব ছাত্রেরাও তথায় শিক্ষালাভ করিতে পারে। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে, যে সহরে কোন শিক্ষালয় অবস্থিত থাকে, তথাকার বাসিন্দারা গরীব হইলেও কোন প্রকারে মাসিক বেতনটা দিয়া ছেলেদের শিক্ষাবিধান করেন। ছেলেদের জন্ত স্বতন্ত্র বাড়ীভাড়া দিতে হয় না; রন্ধনের সময় অল্প চাল ডাল বেশী লইলেই ছেলেদের খাওয়াটা চলিয়া যায়। কিন্তু শিক্ষালয়ের ছাত্রাবাসে তাহাদিগকে খুব কম বাড়ীভাড়া ও খুব কম খাইখরচ দিতে হইলেও, ইহার জন্ত স্বতন্ত্র নগদ টাকা দিতে হইবে বলিয়া, ইহা অনেক গরীব পরিবারের সাধ্যাতীত হইবে। এইজন্য আমাদের মনে হয় যে, সকল ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে, এরূপ নিয়ম না করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। যেমন, কোন ছাত্র যদি তাহার পিতা, মাতা, খুড়া, জেঠা, মামা, দাদা, প্রভৃতির গৃহে বাস করে, তাহা হইলে তাহাকে ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে না, এইরূপ নিয়ম করা উচিত। আর আমাদের এই প্রস্তাবটা নূতন রকমেরও নয়। বিলাতের প্রাচীন ও নূতন সাশ্রম (residential) বিশ্ববিদ্যালয়সকলে, কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বাস করে না, অল্প বাসায় থাকে, এরূপ ছাত্রদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

রাজপুরুষদের শাসনাধীন ছাত্রাবাস সম্বন্ধে আমরা দুটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি, যদিও কোন ফললাভের আশা আমরা করি না।

ভারতবাসীদের ধর্ম ও সমাজনিয়ম সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ততা যে সকল সময়ে দেখান, তাহা নয়, কিন্তু ছাত্রাবাস সম্বন্ধে ইহা দেখাইতে বাওয়ায়, হিন্দু সমাজে যেসকল ভেদনিয়ম অনেক পরিমাণে রহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে খুব কঠিন ভাবে প্রচলিত করিয়া বসেন। যেমন ছাত্রদের নিজেদের ভাড়া-করা বাসায় ব্রাহ্মণ, বৈজ্ঞ, কায়স্থাদি জাতির এক কামরায়, ও অনেক স্থলে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করা, এবং ব্রাহ্ম ছাত্রদের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করা, চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছাত্রাবাসে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের স্বতন্ত্র স্থানে আহারের ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টায় আবার পুরাতন মনোমালিন্য এবং তুচ্ছ অবজ্ঞা ঘেঁষের পুনরাবির্ভাব হইতেছে। ইহাকে আশ্রয় একটি কুফল মনে করি।

ছাত্রগণ পিতামাতা বা অল্প স্বাভাবিক অভিভাবকের গৃহে এবং নিজেদের ভাড়া-করা বাসায় সংবাদপত্র ও

মাসিকপত্র পাঠ সম্বন্ধে এবং অরাজনৈতিক বক্তৃতাাদি শ্রবণ সম্বন্ধে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে, রাজপুরুষদের অধীনস্থ ছাত্রাবাসসকলে তাহা পায় না; বিশেষতঃ যে-সকল স্থানে পূর্ববঙ্গের মত শিক্ষানীতি চলিত আছে। ইহাতে ছাত্রদের চরিত্রগঠন, প্রকৃতির বিকাশ এবং জ্ঞানবুদ্ধির বিশেষ অন্তরায় ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে; পরীক্ষা কিরূপ ভাবে গৃহীত হইবে; ইত্যাদি সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কিছু নির্ধারণ করিয়া দেন নাই। কিন্তু কমিশনটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সভাপতি ও সম্পাদক সরকারী তরফের প্রস্তাব যে ভাবে পেশ করিবেন, তাহাই অধিকাংশ সভ্য কর্তৃক গৃহীত হইবে, বোধ হয়। তথাপি কোন কোন বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলি।

পরীক্ষায় কেহ কোন বিষয়ে উত্তীর্ণ না হইলে, পরবর্তী পরীক্ষায় তাহাকে কেবল সেই বিষয়েই পরীক্ষা করা উচিত। এইরূপ নিয়ম করিয়া, পাশের নম্বর শতকরা ২৫ হইতে ৩৩ না রাখিয়া, শতকরা ৪৫ রাখিলেও ক্ষতি নাই। পাশ্চাত্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসরের মধ্যে একাধিক বার পরীক্ষা লওয়া হয়। আমাদের এখানে এক পরীক্ষায় কেহ অকৃতকার্য হইলে এক বৎসর পরে তবে আবার তাহার পরীক্ষা দিবার সুযোগ হয়। অথচ হয়ত সে কয়েকমাসের পরিশ্রমের পরেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। তজ্জন্ত আমাদের দেশেও বৎসরের মধ্যে একাধিক বার পরীক্ষা গৃহীত হওয়া উচিত। তদ্বিন্ন পরীক্ষায় কেহ উত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা, তাহা স্থির করিবার সময়, পরীক্ষার্থী সম্বৎসর নিজশ্রেণীতে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক আদি পরীক্ষায় কিরূপ কৃতকার্যতা দেখাইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। নতুবা, অনেক নিয়মিত পরিশ্রমী মনোযোগী ছাত্র, পরীক্ষার সময় পীড়িত হইয়া পড়িলে তাহাদের সম্বৎসরের পরিশ্রম নিষ্ফল হয়। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রদের এইরূপ সারাবৎসরের সাপ্তাহিক আদি পরীক্ষার ফল গণনার মধ্যে সম্ভবপর নহে এইজন্ত যে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের উৎকর্ষ-নির্ণায়ক মাপকাঠি এক নয়। কিন্তু যখন ঢাকায় শিক্ষাপ্রধান (teaching) বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে তখন আর এ বাধা থাকিবে না। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবমত ব্যবস্থা করা সুসাধ্য ও সমীচীন হইবে।

শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ প্রস্তাব সাধারণের সমক্ষে রহিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পশিক্ষালয় করা হউক। ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। ইহা ভালই। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধে সমগ্র বঙ্গদেশের জন্ত একটি শিল্পশিক্ষালয়ের প্রস্তাব

রহিয়াছে। ঢাকায় শিল্পশিক্ষালয় করিতে হইলে, হয় ঐ বঙ্গীয় শিল্পশিক্ষালয়টিকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কিম্বা সেখানে দ্বিতীয় একটি শিল্পশিক্ষালয় খুলিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন প্রস্তাবই গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বর্তমানে ঢাকা সহরে যে যে স্কুল ও কলেজে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইগুলিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, গবর্ণমেন্ট ইহা স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে কমিশনের কোন মতামত খাটিবে না। এইসব সাধারণ শিক্ষালয়গুলিকে শিল্প-শিক্ষালয়ে পরিণত করা নিশ্চয়ই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। তাহা করিলে, ঢাকা সহরে সাধারণ শিক্ষার জন্ত স্তম্ভ কলেজও রাখিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই হৃদিকে খরচ করিবেন না। যদি করেন ত ভালই।

আমাদের বিবেচনায় বিলাতের কোন কোন (যেমন লীড্‌স্) আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঢাকায় পূর্ববঙ্গের বর্তমান বা ভবিষ্যতে সম্ভবপর কৃষি আদি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ধান ও পাটের চাষ পূর্ববঙ্গের লোকদের একটি প্রধান জীবনোপায়। চা প্রাকৃতিক হিসাবে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন জেলার এবং আসামের একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অতএব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাতু পাট ও চার চাষ শিখান উচিত। তদ্রূপ এণ্ডি রেশম উৎপাদন ও তাহা হইতে বস্ত্রবয়ন, কমলালেবুর চাষ, আসামের খনি হইতে কেরোসিন তৈল সংগ্রহ ও তাহা হইতে বাতি বস্ত্রত করা, ইত্যাদিও শিখান উচিত। ঢাকার চিকিৎসা-বিদ্যালয়টিকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করা উচিত, এবং উচ্চ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষারও বন্দোবস্ত করা উচিত। জীবনবিজ্ঞা (Biology), রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্ত উৎকৃষ্ট যন্ত্রসংগ্রহ ও পরীক্ষাগার থাকা উচিত। মনস্তত্ত্ব আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সকলে যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিখান হয়, তদ্রূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস একটি প্রধান অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত। এইজন্ত মানববিজ্ঞান (anthropology) শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য; ভারতবর্ষে প্রাপ্ত প্রাচীন ও নবীন প্রস্তর (palæolithic and neolithic) যুগের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও কঙ্কালাদি এবং বর্তমানে ভারতবাসী নানা অসভ্য জাতির অস্ত্রশস্ত্র পরিচ্ছদাদি বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থষ্ট ম্যাজিয়মে সংগৃহীত ও রক্ষিত হওয়া কর্তব্য; নানা প্রদেশে আবিস্কৃত প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রশাসনাদির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া তাহা পাঠ ও তাহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্যোদ্ধার শিখান উচিত; ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের

নেতৃত্বে বার্ষিক তীর্থযাত্রার বন্দোবস্ত করা উচিত। পুরাতন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সাধারণ সাহিত্য হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। এইসমস্ত পুস্তক প্রধানতঃ সংস্কৃত, পালি, ফার্সী, তিব্বতীয় ও চীন ভাষায় লিখিত। এইসকল ভাষা শিখাইবার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। তত্ত্বিন্ন জার্মান ও ফরাসি ভাষায় ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইসকল ভাষা শিক্ষার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

মনে হইতে পারে, যে, আমরা বড় লম্বা-চোড়া বরাতে করিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যখন বলিতেছেন যে বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার সমুচিত বন্দোবস্ত করিবার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন পাশ্চাত্য ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটা কিছু না করিলে সে কথার কোন অর্থই হয় না। কেবল বা প্রধানতঃ ছাত্র-দিগকে কড়া পাহারার মধ্যে রাখিবার জন্য একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিলে তাহার দ্বারা বাঙ্গালীর খুব উচ্চশিক্ষা হইতেছে, ইহা কেহই মনে করিবেনা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির মত, উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে ব্যায়ামগৃহ থাকা উচিত। তাহাতে জাপানী কুস্তি (জিউজিৎসু), সেগোর ব্যায়ামপ্রণালী, লাঠিখেলা, ঘুসোঘুসি, প্রভৃতি শিখান উচিত। নৌচালনও শিখান কর্তব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে, যে, ছাত্রদের শিক্ষালয়-সংস্পৃষ্ট ছাত্রাবাসে থাকিয়া শিক্ষা করা ভাল, না নিজ পিতামাতার নিকট থাকিয়া শিক্ষা করা ভাল। আমাদের বিবেচনায় পিতা মাতার নিকট থাকিয়া শিক্ষা করাই ভাল। কারণ তাহাতে ছাত্রগণ পারিবারিক কার্যে অভ্যস্ত হয়, পরিবারের সুখদুঃখের মধ্যে বদ্ধিত হইয়া পরিবারে রোগীর পরিচর্যা দি করিয়া, পারিবারিক জীবনের সদগুণ লাভ করে, ও ভবিষ্যতে গার্হস্থ্য জীবন যাপনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। অনেকে বলিবেন, যে, অনেক পরিবার সুশিক্ষার আলয় নহে। ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে, যে ছাত্র-বাসসকলের অধ্যক্ষ ও পর্যবেক্ষকগণ অনেক স্থলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে স্নেহশীল, বিবেচক, কর্তব্যপরায়ণ এবং মহচ্চরিত্র নহেন? প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষালাভের নিয়ম ছিল বটে। কিন্তু সেই গুরুগণ সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতেন, ছাত্রগণ তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া একদিকে যেমন সংযম শ্রমশীলতা সহিষ্ণুতাদিতে অভ্যস্ত হইত, অপরদিকে তেমনি পারিবারিক জীবনের স্নেহ ও মাধুর্য উপভোগ করিয়া সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিত। বর্তমান ছাত্রাবাসগুলি গুরুগৃহ নহে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম নহে,

এবং ঐগুলির দারোগা ও গ্রহরী মহাশয়েরাও প্রাচীন-কালের ব্রহ্মচর্যপরায়ণ জ্ঞানধর্ম্মাধেবী গুরু নহেন। সুতরাং প্রাচীনকালের আশ্রম চতুষ্টয়ের কথা এই প্রসঙ্গে না তোলাই ভাল।

স্বথের বিষয় দেশের নানাস্থানে জনসাধারণের শিক্ষার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থান হইতে এই অভিযোগ শুনা যায় যে যথেষ্ট ছাত্র পাওয়া যায় না, পাইলেও কোন কোন ছাত্র কিছুদিন আসিয়া তাহার পর আর আসে না। সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রী, প্রভৃতির কাজ চিরাগত প্রথা অনুসারে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশের নূতন প্রণালী শিখাইবার মত বহিঃবাংলা ভাষায় লিখাইয়া সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া যন্ত্র ও হাতিয়ারের সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারিলে হয়ত আরও বেশী ছাত্র পাওয়া যাইতে পারে। ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রী, সেকরা প্রভৃতির কাজে বোধাঙ্কণ (drawing) বেশ কাজে লাগে। রেখাঙ্কণ শিখাইবার বন্দোবস্ত করিলে কেমন হয়? সোজা চাষের বহিঃছাত্র-দিগকে দিলে কেমন হয়?

সুইডেন নরওয়ে প্রভৃতি দেশে স্লইড (sloyd) নামক এক প্রকার শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহারে চোখের পর্যবেক্ষণশক্তি, দেখিয়াই দৈর্ঘ্যাদি নিরূপণ ও বস্তুর আকৃতি নির্ধারণ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে হাতের দক্ষতাও জন্মে। ইহা মহীশূরে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তৎসম্বন্ধে তদ্দেশবাসী শ্রীযুক্ত ভাভা একটি রিপোর্ট লিখিয়াছেন। জনসাধারণের শিক্ষাবিধানপ্রণালী ব্যক্তিগণের তাহা পাঠ করা উচিত।

এই বৎসর বাঁকিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। প্রথমে শুনা গিয়াছিল যে উহার আয়োজনকারী সমিতিতে কোন বেহারবাসী বাঙ্গালী যোগ দেন নাই। তৎপরে দেখিলাম ভ্রজন যোগ দিয়াছেন। এইরূপই হওয়া উচিত। বাঙ্গালী যেখানেই থাকুন, তথাকার লোকদের সঙ্গে এক-যোগে দেশহিতকর কাজ করা উচিত। যত বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে থাকিয়া অর্থোপার্জন করেন, তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী অবাঙ্গালী বাঙ্গলা দেশে আসিয়া অর্থোপার্জন করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের রোজগারের সমষ্টি, বঙ্গবাসী অবাঙ্গালীদের রোজগারের সমষ্টি অপেক্ষা অনেক কম। খাস্ বেহারে যত বাঙ্গালী আছেন, খাস্ বঙ্গে তাহার চেয়ে অনেকগুণ বেশী বেহারী আছেন। কেহ কাহারও প্রদেশে লুটিয়া খাইতেছেন, এইরূপ মনে

করিয়া দীর্ঘা বা সঙ্কেচ অন্তভব কৰা কৰ্তব্য নহে। যাহার শক্তি আছে, সে যেখানে পারে, করিয়া থাইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

কুমারী যামিনী সেন, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-উপন্যাস-লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা এবং ‘আলো ও ছায়া’-রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী বায়ের ভগিনী। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া পূর্বে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ



ডাক্তার শ্রীমতী যামিনী সেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে তিনি স্বটল্যাণ্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রয়্যাল ক্যাকটি অব্ ফিজিশিয়ান্স্ এণ্ড সার্জন্সের ফেলো হইয়াছেন। ইতিপূর্বে কোনও নারী এই সম্মান লাভ করেন নাই। কুমারী সেন অনেক বৎসর নেপাল রাজ-

দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। তথায় তিনি প্রকৃতির গাভীর্ষা ও নির্মলতা, স্বল্পভাষিতা, বিলাসবিমুখতা, দৃঢ়-চিত্ততা ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্ম, প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অধিকন্তু সূচিকিৎসক বলিয়াও তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী মহারাজ সার চন্দ্রশামসের জঙ্কে যে কথা কেহ বলিতে সাহস করিত না, তিনি তাহা বলিতেন। নেপাল হইতে তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া আসেন; বিপৎসঙ্কুল অস্ত্রচিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন যে তাঁহাকে চিরজীবন রোগীর মত সাবধান থাকিতে হইবে, কঠিন পরিশ্রমের যোগ্যতা তাঁহার আর হইবে না। এই অবস্থাতেও তিনি বিদেশে গিয়া গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বজাতীয় নারীদের মধ্যে প্রথমে এই উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের নিয়মাবলী সংশোধিত হইতেছে। যাহারা ম্যুনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য নহেন বা কখনও ছিলেন না, একরূপ লোকেও তাহাদের প্রতিনিধি হইবার অধিকার পাইলে ভাল হয়। তন্নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের মত যাহাতে তাঁহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার ব্যক্ত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। অর্দ্ধশিক্ষিত বা “জোছকুম”-বাদী লোক অধিকাংশস্থলে সভ্যপদ পাইলে ব্যবস্থাপক সভাগুলি নিতান্তই অকেজো হইয়া থাকে।

চিত্র-পরিচয়

মশাল-আলোকে।

প্রতীচ্য শিল্পকলায় প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রের যেমন প্রাধান্য আছে, প্রাচ্যকলায় তেমন নাই; তাহার মধ্যে আবার চীন ও জাপানের চিত্রকলায় যতটুকু আছে ভারতীয় চিত্রকলায় আবার তাহাও নাই। ভারতীয় চিত্রশিল্পে প্রাকৃতিকদৃশ্য মূর্তিচিত্রের পারিপার্শ্বিক মাত্র। এই পারিপার্শ্বিক দৃশ্য-চিত্রও বোধ হয় খাঁটি ভারতীয় নহে, চীন প্রভাবের পরিগৃহীত। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিকল্পনা যতটুকু দেখা যায় সেইটুকু প্রকৃতই কলাসম্মত—ইহা সুন্দরকে সুন্দরতর করে, প্রকৃতির কবিত্বটুকু ছানিয়া প্রকাশ করে, মানব-অন্তরে বাহ্য সভ্য শিব সুন্দর তাহারই উদ্বোধনের সহায়তা করে। ইহা হইতে আমরা যে আভাস পাই তাহাতে অন্ধকারের অন্ধকারত্ব ও আলোকের আলোকত্ব সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠে। এমার্সন প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রণের ইহাই প্রকৃত

উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ হাভেল তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কৃত্রিম আলোক সম্পাতে যে উজ্জ্বলমধুর মিষ্ট ভাবটি ফুটে তাহাই প্রকাশ করিতে ভারতীয় শিল্পীরা খুব ভালো বাসিতেন বলিয়া মনে হয়।

মুখপত্ররূপে মুদ্রিত চিত্রখানি কোনো প্রাচীন শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত; কলিকাতা আর্ট গ্যালারীতে সংরক্ষিত; এবং বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়ের অনুমতি-অনুসারে মুদ্রিত। এই চিত্রখানির বিষয়—এক রাজপুত রাজদম্পতি অশ্বারোহণে যাত্রিকালে মশালের আলোকে গিরিপথ অতিক্রম করিতেছেন; সঙ্গে লোকলঙ্কার, মশালটি পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার যাত্রীদেরকে ঘিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু মশালের আলোকে সমুখে যেমন তাহা সরিয়া সরিয়া যাইতেছে পশ্চাতে আবার তেমনি ঘন হইয়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে। রমণী অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইতেছেন গন্তব্যস্থান আর অধিকদূরে নাই, অন্ধকার আর প্রগাঢ় থাকিবে না, গিরিঅন্তরালে চন্দ্রকলা উকি মারিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আলোকে গিরিনদী ইম্পাতের ছুরির মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

এই চিত্র আলোকছায়া সম্পাতে অর্ধশুট সুবমায় বর্ণিত বিষয়টিকে মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দিতেছে।

কপিল মুনি।

কপিল মুনি পাতালে তপস্তামগ্ন ছিলেন। তপস্তাবির ক্রমাতে সগররাজার অশ্বমেধত্বরজ-অধেষণকারী বাটহাজার পুত্র তাঁহার ক্রোধে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই ব্যাপারের অব্যবহিত অবস্থা এই মূর্তিটিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

কপিলমুনি ধ্যানভঙ্গে সগরসন্তান ভস্ম করিয়া ‘মহারাজলীলা’ আসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার দক্ষিণহস্তে অশ্ববরা বিধৃত, কিন্তু মুখ সেদিক হইতে পরাবর্তিত—তাঁহার সহিত অশ্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা একদিকে সংযুক্ত অথচ তিনি তাহাতে নিরিপত্ত বিরক্ত, ইহাই সূচিত হইয়াছে। মুনির মুখভাব প্রশান্ত অথচ গর্ভিত, সরল এবং বাহুবস্ত্রনিরপেক্ষ। মূর্তিটি শিল্পীর চরম কুশলতার নিদর্শন।

এই মূর্তিটি সিংহলের অমুরাধপুরে ঈশ্বরমুনিয় বিহারে প্রাচীরগাত্রে কুঁদিয়া বাহির করা। ইহা শীগিরিয়-প্রতিষ্ঠাতা পিতৃহস্তা প্রথম কাশ্মীরের প্রায়শ্চিত্ত-কর্মের একতম বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। তাহা হইলে ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ।

এই মূর্তির চিত্রটি ও গতবারের মুখপত্র ‘সরোবর-তীরে হংস’ চিত্রটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের A History of Fine Art in India and Ceylon নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

কফিপাথর

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ)।

ছুটি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কোলাহল ত বারণ হল

এবার কথা কানে কানে।

এখন হবে প্রাণের আলাপ

কেবল মাত্র গানে গানে।

* রাজার পথে লোক ছুটেছে,

বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,

আমার ছুটি অবেলাতেই

দিনছপরের মধ্যখানে।

কাজের মাঝে ডাক পড়েছে

কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল

উঠুক তবে মঞ্জুরিয়া।

মধ্যদিনের মৌমাছিরা

বেডাক মুছ গুঞ্জরিয়া।

মন্দ ভালোর দন্দে পেটে

গেছে ত দিন অনেক কেটে,

অলস বেলায় খেলার সাথী

এবার আমার হৃদয় টানে।

বিশ্ব কাজের ডাক পড়েছে

কেন যে তা কেই বা জানে।

রোগীর নববর্ষ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড় জিনিষকে ঠিক বড় করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকি তখন সকল জিনিষকে নিজের পরিমাণেই খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। এইজন্য বর্ধমানের ছোট ছোট নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারি এমন অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ নহে। শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবারণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতের কাজ আমি না হইলে সম্পন্নই হইবে না, এই চিন্তায় নিজেকে একটু অবসর দেওয়া অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্তব্যাপরতা যত মহৎ জিনিষই হোক সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড় হইয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়। রোগ যখন মানুষকে কাজ হইতে ছুটি লইতে বাধ্য করে তখন এই সত্যটি স্পষ্ট হয়—তখন বিশ্ববীণা হৃদয় হইয়া বাজে, সমস্ত রূপরসগন্ধ মানুষের কাছে স্বীকার করে যে তোমারি মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাকনে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি। যত্নের পরিপূর্ণতা যে কি অগভীর তাহা তখনই আবাদন করা যায়। তখনই দেখা যায় যত্নের পটে আঁকা জীবনের ছবি; যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তর পূর্ণতা, তাহাটির উপরে হৃদয়ী চকলতার নুপুর-লিঙ্গ, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উজ্জ্বল বর্ণাশ্রয়। রোগশয্যায় শুইয়া তাহিত আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রশর্কর গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;

আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাস জন্মমৃত্যু উত্থানপতন ঘাতপ্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া ক্রিান্তেছে—কিন্তু সেও ত এই বাহিরের প্রাদর্শ্যে। আমি দেখিতেছি ঐ যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের উপর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাষি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল—ভিতর বাড়িতে এক কি দেখা যায়! সেখানে আলোর ত চোখ টিকিয়া পড়ে না, সেখানে দৈন্দ্রসামন্তে ঘর জুড়িয়া ত দাঁড়াইয়া নাই। সেখানে মাণ নাই মাণিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে ত মুক্তার ঝলর ঝলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধূলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজসান্তরণ ত কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবক-যুবতীর মালা বদল কুরিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিতেছে কিন্তু রাজোচ্চানের মালী আসিয়া ত কিছু-মাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। যুদ্ধ সেখানে কর্ণশালার বহু-কালিমা-চিল্লি অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পটবস্ত্র পরিতেছে। কোথাও ত কোন নিষেধ দেখি না। ইহাই আশ্চর্য যে এত ঐশ্বর্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন। ইহাই আশ্চর্য, পা তুলিতে ভর হয় না, হাত তুলিতে হাত কাপে না। ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোক-লোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু হৃৎকণ্ঠ খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোট নয়, অসঙ্গত নয়—সে জন্ত কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছেন না। সবাই বলিতেছে তোমার ঐটুকু খেলা, ঐটুকু হাসিকান্নার জন্তই এত আয়োজন—ইহার যতটুকু তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারি;—যতদূর পর্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে তোমারি মনের সম্পত্তি। তাই এত বড় জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব নুটিলা না—ইহার অন্তবিধানভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরো ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য। সেইখানেই ধরা পড়ে, কোটার মধ্যে কোটা, তাহার মাঝখানে যে রঙটি সেই ত প্রেম। কোটার বোঝা বহিতে পারি না কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমন যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বৃক্ষের কাছে অনায়াসে বুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড় নিভূতে ঐ একটি প্রেম আছে—চারিদিকে সূর্য্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার শুকতার মধ্যে ঐ প্রেম, চারিদিকে সপ্তশতাকোটি সত্তাগড়া চলিতেছে, তাহারি মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ঐ প্রেম। ঐ প্রেমের মূল্য ছোটও যে সে বড়, ঐ প্রেমের টানে বড়ও যে সে ছোট। ঐ প্রেমই ত ছোটর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়র সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ প্রেমের নিকতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত হ্রস্ব আমারই ভাবতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড। সেখানে নির্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উষ্মগন্ধ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিশ্শব্দচরণে দূত আসিল। এও কি বিশ্বাস করিতে পারি। হাঁ সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেইত অসম্ভবকে সম্ভব করিল। সেই এতবড় জগতের মাঝখানেও এত ছোটকে এত বড় করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না সে যে আপনারই আনন্দে ছোটকে গৌরব দান করিতে পারে।

এই জন্তই ত ছোটকে তাহার এতই দরকার। নহিলে সে আপন-নার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কি করিয়া? ছোটর কাছে সে আপনার ৯মী বৃহৎকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়,

ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সে জ্ঞ এমন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাবচিত আকাশের নীচে এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্রবেলায় ছোটর কাছে বড় আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোট ইহাও ছোট নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক তিল পরিমাণ দেশকে ও পল পরিমাণ কালকে অসীমদে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব;—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় হৃৎকণ্ঠে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে হৃদয়, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ ইহা বলিবার জন্ত আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ, সেই সংসার ত আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিনমজুরী লইতে হইবে? সেইখানেই কি চরম দেনাপাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিলভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জাহাঙ্গীরা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই, কেবল আনন্দ আছে। কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়—সেখানে একবার বাইতে হইবে, একেশ্বরের ঘরের বেশ পরিয়া, হাসি মুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেহলি আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই—অমৃত হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন—হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ ইহা সেইখানে চল—আজ নববর্ষের পাখী সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অবাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্ত প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিল না বলিয়া সেই কথাটি আজ শুক ইহা। শুনিবার সময় পাইলাম—আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণপত্রটিকে গ্রহণ করিয়া মাথার করিয়া গ্রহণ করি।

ভারতী (জ্যেষ্ঠ)।

বজ্রলেপ—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী—

বজ্রলেপ বা বজ্রের ছায়া কঠিন সিমেন্ট বা আঁতুর প্রাচীন আরতে ব্যবহৃত হইত। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইহার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। বোদ্ধ যুগেও এই পদার্থ সৌধনির্মাণে ব্যবহৃত হইত। বজ্রলেপ তিন প্রকার—ভেবজ, প্রাণিজ, ও ধাতুজ। (১) ভেবজ বজ্রলেপের উপাদান—গাষের আঠা, শিমুলফুল, শালই বীজ, ধ্বন বৃক্ষের ছাল, বচ, তর্পিন তেল, বোল, গুগ্গলু, দেবদারুণের আঠা, শালনিখাস বা ধুনা, মসিনা বা তিসি, বেল আঠা প্রভৃতি। প্রকার ভেদে—লাক্ষা, দেবদারুণের আঠা, গুগ্গলু, বুল, কয়েংবেল ও বেলের মধ্যভাগ, নাগকল, নিম্ব, গাব, মদনফল বা নটফল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা, বোল, আমলকী প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। (২) প্রাণিজ বজ্রলেপ বা বজ্রতল শিরীষ আঠার ছায়া পদার্থ। তাহার উপাদান—গো, মহিষ ও ছাগলের শূক, গর্দভের রোম, মহিষ ও গরুর চর্দ, নিম্ব, কয়েংবেল, বোল হইতে প্রস্তুত তৈলসংযুক্ত কন্দ। (৩) ধাতুজ বজ্রলেপ বা বজ্রসজাত একপ্রকার দ্রব ধাতু। উপাদান—৮ ভাগ সীসক, ২ ভাগ কাঁসা, ১ ভাগ পিতল।

রাং ঝাল, তামার ঝাল, পিতল ঝাল, রূপার ঝাল, সোনার ঝাল প্রভৃতির স্রাব ইহাও একরূপ ঝাল। কোনারকর মন্দিরাদিতে এই ধাতুলেপে পাথর গাঁথার নিদর্শন দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান হয়, চুন-স্রবিক বালি দিয়া ইমারত গাঁথার প্রথা পরবর্তী কালে প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরে পাটান ভারতে ঘুটিং চূনের আস্তর প্রচলিত হয়। অশোকস্তম্ভের বাহ্যিক চাকচিক্য এই বজ্রলেপের জন্যই সহস্রাবৃত্তবর্ষস্থায়ী হইয়াছে।

আমার বাল্যকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ছেলেবেলায় আমরা বাবামশায়ের কাছে বড় ঘেস্‌সতাম না, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ইংরেজি পরীক্ষা আর ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার বেলায়। তখন ১১ মাসের উৎসব খুব ধুমধামে সম্পন্ন হত, পলতার বাগানে ছোট্ট বড় বড় মিলে আনন্দভোজ হত—তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন জগদমোহন গাঙ্গুলী। তিনি খুব সৌখীন আমদে অথচ কণ্ঠষ্ঠ ছিলেন। তিনি এমন বলশালী ছিলেন যে একবার পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে আমাদের একটা গাড়ী বলপূর্বক টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তিনি একলা সেই গাড়ী ধরে রেখেছিলেন, এ আমার স্মৃতিতে দেখা। আমাদের পলতার বোটঘাটায় বিদ্যুৎ ছিলেন নবীনবাবু, তিনি বাবু শব্দের এক ছড়া বেঁধেছিলেন এক হাবুবাবুকে লক্ষ্য করে—

বাববো বহবঃ সন্তি বাবুয়ানা-পরায়ণাঃ।

হাবুবাবু সমোবাবু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥

তার একটা গান ছিল—

বাটাঁছেলের মুখে কড়ি সর্বলোকে কয়

সাতসের কার্যে বাটাঁছেলের পরিচয়।

কলধম নাবিক ছিল, সাহসে আমেরিকা গেল,

দেশের বাতী জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।

বাটাঁছেলে হবে যদি, সাহস কর আজ অবধি,

বিধবাবিবাহে কর আনন্দ উদয়।

বাবামশায় পারিবারিক উপাসনার পর উপদেশচ্ছলে আমাদের দোষ শুধরে দিতে চেষ্টা করতেন। আমি বিলাত থেকে ফিরে এসে ইংরিজি চালচলনের বাড়াবাড়ি করেছিলাম, তাঁর উপদেশ আমার সাবধান করেছিল। বাবামশায় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে conservative ছিলেন না, বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটি পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন। আমি চিন্তাম বোর radical, তথাপি তিনি আমার স্বাধীন মতে বাধা দিতেন না। আমি ছেলেবেলা থেকেই শ্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে ধমকে বলতেন “তুই মেয়েদের নিয়ে মেয়েদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি না কি?” অবরোধপ্রথা আমার বড়ই অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্সী করতুম। বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্দা উচ্ছেদের স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠল। আমার কন্ঠস্থান বোম্বাই যেতে হবে; আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। জাহাজে ওঠবার সময় বাড়ী থেকে কিন্তু কিছুতেই গাড়ী করে যাওয়া ঘটল না, আমার স্ত্রী পাফী করে অস্থায়ীপন্থ হয়ে জাহাজে উঠলেন। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ঘরের বৌকে প্রকাণ্ড স্থানে দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ হয়ে এল।

ব্যবসায়ী (চৈত্র ও বৈশাখ)।

কাগজ—

• কাগজ সর্বদেশে সুপরিচিত, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার নাম অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষে পূর্বকালে কলাপাতে, তালপাতে, তেরেট (তাল জাতীয়) পাতে, তুর্জপত্রে লেখার কার্য চলিত। ধাতু ও প্রস্তরফলকও প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে চামড়ায় কাগজের কাজ হইত। প্রাচীন বোনজাতি পুস্তককে ডেপ্টরি বা চর্ম বলিত। গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ড ও অডেসিস পর্পচর্মে লিখিত হইয়াছিল। ভারতবাসী যুগ করিতেন বলিয়া ভারতে চর্ম প্রচলিত হয় নাই। কথিত আছে পণ্ডিতপ্রবর সফ্রেটাসকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তিনি পুস্তক লিখেন না কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, আমি জীবন্ত প্রাণীর জ্ঞান মৃতের চর্মে পরিবর্তিত করিতে চাহি না।

কাগজ প্রথমে কোন জাতি প্রস্তুত করে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খ্রীষ্টীয় ৯৫ অব্দে চীনেরাই প্রথম কাগজ প্রস্তুত করে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভোজরাজার লিখনপ্রণালীতেই প্রমাণ— ১১ শতাব্দীতে কাগজের ব্যবহার ছিল। ভোজরাজা ১১০৬ সাল হইতে ১১৪২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার সহিত মামুদ গজনির সংবর্ধণ হয়। পাণ্ডুববিজয়ী গ্রীকসম্রাট আলেকজেন্দারের সেনাপতি “লিয়ারকস” লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এক প্রকার তুলা-চাপড়ান জিনিসের উপর বাণিজ্যাদির হিসাব লেখা হইয়া থাকে। এই তুলা-চাপড়ান সম্ভবতঃ তুলট কাগজ। এই তুলট কাগজ মালদহ জেলায় বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইত। দেশ বিদেশে এই কাগজ রপ্তানী হইত। বাঙ্গলায় কাগজ প্রস্তুত একপ্রকার উষ্ণিয়া গিয়াছে। শতবর্ষ পূর্বে ইহা বেশ চলিয়াছিল। হাবড়া জেলার আমতা ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে ময়না গ্রামে এখনও ইহার প্রচলন আছে। জঙ্গিপুত্র সবভিবিংশনে থানা সমসেরগঞ্জ জেলা মর্শিদাবাদ, কৃষ্ণপুর ও সীতারামপুরে এখনও এই কার্য বর্তমান আছে। মুসলমান জাতির মধ্যে কাগজী (কাগজ প্রস্তুত-কারক) সম্প্রদায়ের হাতে এই কার্য শ্রান্ত আছে। মুসলমান তাঁতীরা যেমন “জোলা”, মংসুজীবীরা যেমন “নিকারী” ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছিল, সেই প্রকার তাহাদের এই কাগজী আখ্যাও হইয়াছিল। এখনও কাগজী মুসলমান ঢাকা অঞ্চলে কাগজ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, কলিকাতায় ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যে ঐ প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক প্রকার পাটের কাগজ, ঢাকা মুন্সীগঞ্জের “মেঘু কাগজীর” প্রস্তুত এক-প্রকার কাগজ, শাহাবাদ সদরাম হইতে ৪ প্রকার দেশী কাগজ এবং ভূটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ প্রদর্শিত হয়। ভূটীয়া কাগজে প্রায় পোকা ধরে না। এই কাগজ বেশ মৃদু ও মৃৎ। ভূটানীরা তুন্দ্রশজাত “ডিগা” নামক একপ্রকার গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। ইহার গাছের ছালজন্যিক বেশ লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া কাঠের ছাইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রস্তরের উপর রাখিয়া মুদ্রা দিয়া পিটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে, তৎপরে জাপানী কাগজের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত করে। জাপানে তুত গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়।



বিশ্বামিত্র ।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত চিত্র ইহাতে শিল্পীর অনুমতিক্রমে ।

Three Colour Blocks by U. Ray and Sons.

Kuntaline Press, Calcutta.

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নাম্যামাহ্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩১৯

৪র্থ সংখ্যা

জীবন-স্মৃতি

জাহাজের খোল।

কাগজে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামবা তৈরি করিয়া একটা পূরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশলাই কাঠি জ্বালাইবার জন্ত তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশলাই কাঠি অনেক স্বর্ণণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্তও তাঁহার উৎসাহ ছিল, কিন্তু সেই তাঁতের কল একটমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্ত তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভর্তি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, গুপে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে এইসকল চেষ্টার ক্ষতি বাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ বাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশেব খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে

এইরূপ বেহিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দ্বিগ্ন বারম্বার নিষ্ফল অব্যবসায়ের বস্তা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বস্তা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন ধাঁহার ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহার অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

একদিকে বিলাতী কোম্পানী আর একদিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই বিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিবোধিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং “আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ ক্লিষ্ট হইয়া গেল,—বরিশাল খুলনার ষ্টীমার লাইনে সজ্জয়া আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনাভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহাবা নিনা-মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালেব ডলটিয়ারেব দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই

বাড়িল বই কমিল না। অক্ষশাস্ত্রেব মধ্যে স্বদেশ-
হিতৈষিতাব উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না;
কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গাণত আপনাব
নামতা ভুলিতে পারিল না—সুতরাং তিন-ত্রিক্বে-নয়
ঠিক তালে তালে ফড়িঙেব মত লাফ দিতে দিতে স্বপ্নের
পথে অগ্রসব হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে,
লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু
তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে
চেনেন না এইটুকুমাত্র শিথিতে তাঁহাদের বিস্তর ধরচ এবং
ভতোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো
তাঁহাদের দ্বারা ইচ্ছাবিনোদ ঘটে না। যাত্রীরা যখন
বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার
কর্মচারীরা যে তপস্বীর মত উপবাস করিতেছিল এমন
কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জ্ঞানও
জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু
সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে
তাঁহার এই সর্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই
জয়পরাজয়ের সংবাদ আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত
ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল তাঁহার স্বদেশী
নামক জাহাজ হাবড়ার ত্রিঙ্গে ঠেকিয়া ভুবিয়াছে। এইরূপে
যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ
অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি
রাখিলেন না, তখন তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুশোক।

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা
ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ
করি নাই। মাঝে যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প।
অনেকদিন হইতে তিনি বোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে
তাঁহার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই
নাই। এতদিন পর্য্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই
স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময়
একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে

লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি
অন্তঃপুরের তেতলায় বসে থাকিতেন। যে রাত্রিতে
তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত
রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া
আসিয়া চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল, “ওরে তোদের
কি সর্বনাশ হলো!” তখনি বোঁঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি
তাহাকে ভৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া
লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে
শুষ্কতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত
প্রদীপে অস্পষ্ট আলোকে রূপকালের জন্ত জাগিয়া উঠিয়া
হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কি হইয়াছে ভাল করিয়া
বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মার
মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ
করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া
দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রান্তরে খাটের উপরে
শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর, সে দেহে তাহার কোনো
প্রমাণ ছিল না;—সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে
রূপ দেখিলাম তাহা স্বপ্নস্থিতির মতই প্রশান্ত ও মনোহর।
জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল
না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর
দরজাব বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ দ্রষ্টানে চলিলাম তখনি শোকের সমস্ত বড় ঘেন
একেবারে এক দম্কায়ে আসিয়া মনের ভিতবটাতে এই
একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা
দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের
ধরকল্পনার মধ্যে আপনাব আসনটিতে আসিয়া বসিবেন
না। বেলা হইল, দ্রষ্টান হইতে ফিরিয়া আসিলাম;
গলির মোড়ে আসিয়া তেতলায় পিতার ঘরের দিকে
চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের
বারান্দায় শুক হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধু ছিলেন তিনিই মাতৃহীন
বালকদের ভায় লইলেন। তিনিই আমাদের কাছে খাওয়াইয়া
পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো
অভাব ঘটয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্ত দিনরাত্রি
চেষ্টা করিলেন। যে ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে বিচ্ছেদের

প্রতিকার নাই তাহাকে জুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না; স্থায়ী রেখার আঁকিয়া রাখে না, এই জন্ত জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাতে চিরস্থান না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড় হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিশুষ্ক মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাধিয়া ক্যাপার মত বেড়াইতাম—তখন সেই কোমল চিকুণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর ব্লাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ আঙুলগুলি মনে পড়িত;—আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে স্পর্শ সেই স্নানর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমার ভুলিই, আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড় বড় মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ফুটিয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নার একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা বাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মূহুর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল তখন মনটার মধ্যে সে কি বাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্রস্বৰ্ণ প্রভৃতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মত বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মত বাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা বাহাকে

তাহাদের সকলের চেয়েই বেশী সত্য করিয়াই অহুস্তব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে হৃদয়ের মত মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাইয়া মনে হইতে লাগিল এ কি অদ্ভুত আশ্চর্যজন! বাহা আছে এবং বাহা রহিল না, এই উত্তরের মধ্যে কোনোভাবে মিল করিব কেমন করিয়া!

জীবনের এই রন্ধুরটির ভিতর দিয়া যে একটা অভল-স্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া কিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি বাহা গেল তাহার পরিবর্তে কি আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। বাহা নাই তাহাই মিথ্যা—বাহা মিথ্যা তাহা নাই। এই জন্তই বাহা দেখিতেছি না, তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, বাহা পাই-তেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই ধামিতে চায় না। চারি গাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই তন্দ্রাকারকে কোনমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্ত পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে—তেমনি, মৃত্যু, যখন মনের চারিদিকে হাৎ একটা “নাই”—অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলি “আছে”—আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায়না তখন তাহার বত দুঃখ আর কি আছে!

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভাব লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদী নাই এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উদ্ভাস বোধ করিতে লাগিলাম। বাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে

ছাড়িতেই হইল এইটাকে কতires দিক দিয়া দোখরা বেমন বেমনা পাইলাম তেমনি সেইকণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণ-পূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত কবিতা চারিদিকে কেবলি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবেনা— একেবারে জীবনের দৌরাণ্ড কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা আশ্চর্য্য নূতন সত্যের মত আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিনের জন্ত জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ণন করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্ত যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্ত আমার একটা স্বষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্যপদার্থের মত মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সেসমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কি মনে করিবে কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। মুক্তির উপর গারে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পারে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থােকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও ভেতালার বাতিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার নাকাতের বিলম্ব হইত না।

এসমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালায় প্রত্যেক ছোট ছোট শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আশ্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে কি আর সরকারী রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে? নিশ্চয়ই তাহা হইলে হারিসন রোডের চারতলা পাঁচতলা বাড়িগুলো বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙ্গাইয়া চলি, এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টলিনি মহামেশটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ঐটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, যাঁ করিয়া তাহাকে লম্বন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল—পারেন নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোন্না একটা চুড়ার উপবকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের ভোরপহারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্ত আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মত ছুঁহাত বুলাইয়া কিরিতাম। আবার সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ।

এক এক বৎসরে বিশেষ এক একটা গ্রহ রাজার পদ ও মজীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই।

তেমনি দেখিতেছি জীবনের এক এক পর্যায়ে এক একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসেব বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া বাইতেছে, সাবি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড় ঝুড়িতে তরীতরকারী বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জল কাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আরি বিনা কাবশে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে ইন্ধুলে গিয়াছি; দরমার ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে;—অপরাক্ষে বনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে;—দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকাব শব্দ; আকাশটাকে যেন বিছাতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোন্ পাগলী ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়, অন্ধকারে ভাল করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না—পণ্ডিত মশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড় বাদলটার উপরেই ছুটছুটি মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা ছলাইতে ছলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দোড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মনের ভিতরে স্রুতির চেয়েও নিবিড়তর একটা প্লক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে-সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে-ঝলঝল-করা সরস সবুজের উপর

সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে দক্ষিণেব বাতাস্কার গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া শুন শুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়।

“আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে

কি জানি পরাণ কি-বে চায়।”

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে—বাড়ির ঘন্টার ছপুব বাজিয়া গেল—একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবীতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না; সেও শরতের দিনে।

“হেলাফেলা সারাবেলা

এ কি খেলা আপন মনে।”

মনে পড়ে ছপুর বেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি সে বে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা বয়া। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল কিছুমাত্র আঁকা গেল না সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এদিকে সেই কর্মহীন শরৎ-মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের যাদুকর্য্য দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা সহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মত আগাগোড়া ভরিয়া তুলিভেছে। জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিতে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চারীদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ,—সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই-করা শরৎ—আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ প্লকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে বিরীনা দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা বাজ লইয়া মহা সমারোহে আমাকে সজ্জদান করিয়াছে। আর এই শরৎকালের মুখুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে

উৎসব, তাহা মান্নবের। মেঘমোড়ের নীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বপ্নস্থের আন্দোলন মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মান্নবের অনিমেষ দৃষ্টির আবশ্যটুকু একটা রং মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মান্নবের হৃদয়ের আকাজকাবেগ নিঃশ্বাসিত হইয়া বহিতেছে।

আমাব কবিতা এখন মান্নবের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে ত একেবারে অব্যবহৃত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকুমাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোষ, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেইসব বাধার ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্বরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় কেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব গাওয়া যায় না।

“কড়ি ও কোমল” মান্নবের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটার দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্ত দরবার।

“মরিতে চাহিনা আমি হৃদয়ের ভুবনে,”

মান্নবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।”

বিশ্বজীবনের কাছে হৃদ জীবনের এই আত্মনিবেদন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্ত যখন যাত্রা করি তখন আগের সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পবিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পাস করিয়া কেম্ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া বারিষ্টার হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত কেবল কয়টা দিনমাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সদ্ভদ্রতার দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে

চেনাশোনা ছিলনা সেই কাকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তখনো বারিষ্টারী ব্যবসায়ের ব্যাহার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহাব হয় নাই। মক্কেলের কুক্ষিত খলিগুলি পূর্ণ বিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধুসকলই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তখন দেখিতাম সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি-শেলফের মরক্কো চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিলনা। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিঃশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন কোন একটা দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

ফরাসী কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি শিখিতেছিলাম। “আমার সেইসকল লেখায় তিনি ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্ত একটি অপরিভূক্ত আকাজকা এই কবিতাগুলির মূল কথা।

আশু বলিলেন, তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব। তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। “মরিতে চাহিনা আমি হৃদয়ের ভুবনে”—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম, তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া

দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনালোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিলনা, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেরা নৌকা পাল তুলিয়া চেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে—
তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন যে জীবনযাত্রার বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

কড়ি ও কোমল।

জীবনের মাঝখানে কাঁশ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত কোনো বাধা ছিল বলিয়াই যে আমি গীড়াবোধ করিতেছিলাম সে কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের বাহারা সমাজের মাঝখানটাতে পড়িয়া আছে তাহারাই যে চারিদিক হইতে প্রাণের প্রবল বেগ অনুভব করে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। চারিদিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; বিন্দু পল্লবরাশির মধ্যে প্রফুল্ল থাকিয়া কোকিল পুরাতন পক্ষ্ম-স্বরে ডাকিতেছে—কিন্তু এ ত বাধাপ্রকুর, এখানে শ্রোত কোথায়, চেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে? মানুষের মুক্ত জীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া অস্বপ্ন করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগর-যাত্রা চলিয়াছে তাহারই জগোচ্ছাসেব শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশীসমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল? তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল স্বেচ্ছাধের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

যে মুহূর্ত নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতস্ত্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিঘিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িত হইতে বাহির হইয়া ঘাইবাব জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে সমস্ত আত্মশক্তির বাধা নৈতিক সভা ও ধর্মের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচর্যহীন ও সেবাবিহীন যে দেশাঙ্ক-

রাগের মুহূর্তমুহূর্ত তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড় একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত “ইহার চেয়ে হতম যদি ভারন বেছরী!”

“আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেড়ে—

হের ঐ ধনীর দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।”

এ ত আমার নিজেরই কথা। যে সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুক্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাদ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই?

মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্র ভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিমসীমান আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভূত্যের আঁকা খড়ির গম্বুজ মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটবে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের নিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ ন যদি বাধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, শ্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভাবাবেগকে কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলি জীবনের উপবে চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরৎের দিনে মেঘরোদের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগেব বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রদ নহে,

সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব-সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবাবে একটা পালা সাজ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যেসমস্ত ভালমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মত করিয়া হাঁকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সঙ্গিন। এইসমস্ত বাধা বিবোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবন-দেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায় তবে আর বাহ্য কিছুই দেখাইতে যাইর তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানই হইবে। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব ধার্মহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্থিতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীবীজনাথ ঠাকুর।

পূজার ঘণ্টা

[জুল সেমের লিখিত “লা ক্রশ” নামক মূল ফরাসী গল্প অনুসরণে]

ছোট গাঁ খানিতে একটি পুরাণে মন্দির আর একজন পুরাণে পূজারী ছিল। মন্দিরের পূজা-আরতির ঘণ্টাটি ছিল কাটা; তাহাতে শব্দ হইত ঠিক যেন বুড়ীর কাশির মতন। সেই শ্রুতিকটু শব্দ শুনিলে ক্ষেতের কাজে ব্যস্তের আর উৎসাহ থাকিত না; অকারণ দুঃখের ভাবে মন দিয়া বাইত।

পূজারীর বয়স হইলেও চেহারাটি ছিল বেশ আটো-সাঁটো গোলগাল ছষ্টপুষ্ট। শিশুর মতো সদানন্দ তাঁহার চেহারাটি; বুড়ো ধুরধুরো, তবু মুখখানিতে দেহ মনের স্বাস্থ্যের লালিমা মাখানো; গাঁয়ের মেয়েদের হাতের যত্নে পাকানো হুতার ছটিগুলির মতো কৌকড়া কৌকড়া শাদা ধবধবে চুলের শুচ্ছে তাঁহার মুখখানি ঘেরা।

তাঁহার অমায়িক ব্যবহার আর দয়াবত্নের জন্য যজ-মানেরা তাঁহাকে বড় ভালো বাসিত, ভক্তি করিত।

পূজারীর দীক্ষা লওয়ার বাৎসরিক দিন। পঞ্চাশ বৎসর আগে বৃদ্ধ তাঁহার ভরা যৌবনে এই ত্যাগের ব্রত স্বীকার করিয়া দীক্ষা লইয়াছিলেন। যজমানেরা স্থির করিল এই বিশেষ দিনে তাহাদের পূজারীকে বিশেষ কিছু উপহাব দিবে।

গোপনে বাড়ী বাড়ী চাঁদা ভুলিয়া একশ টাকা জোগাড় করিয়া তাহার পূজারীকে আনিয়া দিয়া কহিল—বাবা-ঠাকুর, শহরে গিয়ে আপনি নিজে দেখে পছন্দ করে একটা নতুন ঘণ্টা কিনে নিয়ে আসুন।

পূজারী বলিলেন—বাবা, তোমাদের কল্যাণে..... ভগবানেব আশীর্বাদে.....নতুন ঘণ্টা.....

বৃদ্ধ শুছাইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভাবে ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শুধু আপন মনে বলিতে লাগিলেন—দয়াল ঠাকুর, তোমার সেবা করতে দিয়ে আমাকে ধন্ত করেছ, ধন্ত করেছ।

পরদিন প্রভাতে পূজারী ঘণ্টা কিনিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। পথের দ্বারে বিচিত্র বৃক্ষলতাশুষ্ক ও পশুপক্ষীর প্রাণহিল্লোল রবিকিরণে ঝলমল করিতেছিল—চারদিকে শুধু প্রাণের, আনন্দের, বর্ণগন্ধ-গানের মেলা লাগিয়া গিয়াছে—পথের ধূলি পর্যন্ত প্রাণে স্পন্দিত।

আর তাহার মধ্যে সেই বৃদ্ধ পূজারীর কানে নতুন ঘণ্টার ভবিষ্যৎ মধুর সঙ্গীত থাকিয়া থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আনন্দে মুগ্ধমনে ভজন গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধ পথ হাঁটিতে-ছিলেন।

শহরে পৌছবার মাঝামাঝি পথে পূজারী দেখিলেন একটা ঘোড়া মবিনা পড়িয়া আছে, আর তাহার কাছে বসিয়া একজন বুড়া ও একজন বুড়ী হাপুস নয়নে ঘোড়ার শোকে কাঁদিতেছে।

তাহাবা বেদে। তাহাদের কাপড় ময়লা, আগাগোড়া তালি আর রিক্ত নক্সা-কাটা।

পাশের পগাব হইতে একটি তরুণী বেদিনী, পাতাল হইতে নাগকন্তাব মতো, হঠাৎ বাহির হইয়া পূজারীর নিকট আসিতে আসিতে বলিতে লাগিল—বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর, দান কব বাবা, কিছু দান কর, পুণ্য হবে, পুণ্য হবে।

তরুণীর কণ্ঠের স্বব বড় মধুর বড় মোলায়েম; বলার ভঙ্গিটি গানেব মতো তালে তালে। বেদিনীর গায়ের রং টাটকা-মাজা তামাব পুষ্পপাত্রের মতো। পোবাক পরিচ্ছদ বুড়াবুড়ীর চেয়ে কিছু ভালো নয় কিন্তু তবু তাহার ঐশ্বর্যের কমি ছিল না—চোখের তারা ছুটি তার কালো মথমলের টুকরা, গাছ ছুটি তাহার ননীর ডেলা, আর ঠোঁট দুখানি পাকা পচ; তার যৌবন-নিটোল বৃকের উপর নীল উকির পত্রলেখা, তামার তারে কালো চুলের রাশি পেশম তুলিয়া চুড়া করিয়া রাখা—পাপড়ির বেটনে পদ্মকোষের মতন আভ্যন্তর মুখখানি তাহাব মধ্যে টুলটুল করিতেছে।

পূজারী গতি স্থগিত করিয়া টাকার গেজে বাহির করিলেন। গেজে হাতড়াইয়া একটা ডবল পয়সা তুলিয়া ডকনিকে দিতে গেলেন। তাহাব মুখ দেখিয়া আর তাহাকে পয়সা দেওয়া হইল না। বুড়া তরুণীর পরিচয় লইতে লাগিলেন।

তরুণী বেদেনী বলিল—বাবাঠাকুর, আমরা বড় গরিব গো বড় গরিব। পেট ভরে খেতে পাই না, শীতে কাপড় পাই না। আমার এক ভাই ছিল, তাকে ধবে কয়েদ করেছে, সে না কি একটা মুবগী চুরি করেছিল। সেই আমাদের বোজগার করে খাওয়াত। সে নেই—আমাদের হুদিন খাবার জোটেনি।

পূজারী ডবল পয়সাটি গেজেতে রাখিয়া একটা টাকা তুলিলেন।

বেদেনী বলিয়াই বাইবেছিল—আমি বাজি করতে

জানি; আমার মা হাত গুণতে পাবে। কিন্তু চৌকিদার গাঁয়ে কিংবা শহরে কোথাও আমাদের খেলা দেখাতে বের না, আমাদের কষ্টেব এব শেষ হয়েছে। তারপব আবার 'আমাদের ঘোড়াটা মরে গেল—আমরা যে কি করে' কি করব?

পূজারী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, তা তোমরা কোথাও চাকরি বাকরি করনা কেন?

—লোকেরা যে আমাদের বিশ্বাস কবে না। আমাদের ঘরে ঠাই দিতে ভয় পায়; ঢেলা ছুড়ে তাড়া করে। অব আমরাও ত কোনো কাজ জানিনে; ভবঘুরে আমবা, জানি শুধু এ গাঁ ও গাঁ করে ঘুরে বেড়াতে। যদি আমাদের একটা ঘোড়া থাকত আর কাপড় চোপড় কেনবার কিছু টাকা থাকত, তা হলে আমরা বাচবার একটা পথ করাত পারতাম। এখন মরা ছাড়া আর উপায় নেই।

পূজারী টাকাটি গেজে রাখিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ভগবানকে ধন্তবাদ জানাও?

বেদেনী বলিল—কেন জানাব না? সে ভদ্রলোক যদি আমাদের সাহায্য কবে অবিশ্রি তাবে ধন্তবাদ জানাব।

পূজারী আমার বৃকের মধ্যে হাত ভবিয়া অতি সন্তো-পনে রক্ষিত তাহার বজ্রমানের দেওয়া একশ টাকার তোড়াটি হাতে তুলিয়া তাহার ভার আনাজ কবিত্তে লাগিলেন।

বেদেনী তাহার কোমল চোখের তরল দৃষ্টি পূজারীর মুখ হইতে একবারও নামার নাই, সেই নাগিনীর মতো বাহুকরা তাহার দৃষ্টি।

পূজারী প্রশ্ন করিলেন—তুমি ধর্মশীলা ত?

—ধর্ম?—বলিয়া বেদেনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

পূজারী বলিলেন—আচ্ছা বল—“ভগবান, তোমার আমি ভালো বাসি।”

তরুণী ছই চোখে জল ভরিয়া লইয়া বলিল—না না, বুড়ো বাবাঠাকুর, আমি তোমার ভালো বাসতে পারব না, আমি আর একজনকে যে ভালো বাসি।

পূজারী মের্জাইয়ের বন্ধ খুলিয়া বৃকের ভিতর হইতে টাকার তোড়াটি বাহির করিলেন।

বেদেনী চিলের মতো ছোঁ মারিয়া তোড়াটি হিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে বলিয়া গেল—বুড়ো ঠাকুর, তোমার ভালো বাসব গো, খুব ভালো বাসব। তুমি খাসা লোক।

বুড়াবুড়ী তখনো পগাবের আলের উপর বসিয়া ঘোড়ার শোকে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছিল।

°°°

পূজারী শহরের দিকেই চলিতে লাগিলেন। কোথায় কেন যাইতেছেন সে হুঁস তাঁহার ছিল না; তিনি তখন ভাবিতেছিলেন যে ভগবানের এ কী নিয়ম, তাঁহাবই সৃষ্ট কত প্রাণী কী বিবম হুঃখে কষ্টে নিমজ্জিত হইয়া আছে। পূজারী ভগবানের কাছে মনে মনে এই প্রার্থনা করিতে ছিলেন যে, এই যে ধর্মজ্ঞানহীনা বেদেনী, ইহার অন্তর হে ঈশ্বর, তোমার প্রকাশে উজ্জ্বল আলোকিত করিয়া তোলা। ‘যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক।’ আহা অমন স্তম্ভের মেয়েটি!

হঠাৎ পথের মাঝে তাঁহার হুঁস হইল যে তাঁহার শহরে বাওয়ার কষ্ট বেদেনী টাকার ভার হরণ করিয়াই লাঘব করিয়া দিয়া গিয়াছে—তাঁহার শহরে যাইবাব আব প্রয়োজন নাই।

খুলা পায়েই বুদ্ধ আবার গৃহের দিকে ফিরিলেন।

এখন তাঁহার ভাবনা হইল, একটা বেদেনী ভিক্ষা-রিণীকে কেমন করিয়া তিনি একেবারে অত টাকা দিয়া ফেলিলেন। সে টাকা ত তাঁহার নিজেরও নয়।

তিনি পা চালাইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে লাগিলেন; বেদেনীর দেখা পাইলে টাকা ফিরাইয়া লইবেন। সেই জায়গায় ফিরিয়া দেখিলেন শুধু সেই মরা ঘোড়াটা ঠ্যাং উচু করিয়া পড়িয়া আছে—বেদেরা একেবারে অন্তর্ধান।

এখন করা যায় কি। তিনি যে ভয়ানক পাপ করিয়াছেন তাহাতে ত আর কোনো সন্দেহ নাই। যজ্ঞমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, পঙ্জিত ধন অপহরণ, দেবতার ধন অপব্যয়।

এই ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভরে তাঁহার শরীর মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। ব্যাপারটা এখন টাকা ঋণ কেমন করিয়া? কি উপায়ে এই অন্ত্যায়ের প্রতি-

কারই বা করা যায়? একশ একশ টাকা কেমন কবিয়াই বা জোগাড় হইবে? লোকে যখন জিজ্ঞাসা কবিলে তখনই বা কি বলা যাইবে? আর নিজের আচরণই বা কেমন করিয়া লোকের কাছে প্রকাশ করা যাইবে?

মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। কালো মেঘের গায়ে ঝাপসা গাছগুলো দানবের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় কোঁটার বৃষ্টি নামিল। অগতের হুঃখচিন্তায় পূজারীও প্রাণ কাতর হইয়া উঠিল।

পূজারী গায়ে ফিরিয়া গেলেন, ভাগ্যে ভাগ্যে কেহ তাঁহাকে দেখিল না।

মন্দিরের বুড়ী ঝি জিজ্ঞাসা কবিল—কি বাবাঠাকুর, এর মধ্যে ফিরে এলে? শহরে গেলে না?

পূজারী মিথ্যা বলিলেন।—না, যাবার গাড়ী পেলাম না, আর এক দিন যাব এখন।……কিন্তু, একটা কথা, আমি যে ফিরে এসেছি একথা এখন কাউকে বোলো না, বুঝলে?

পরদিন প্রভাতে পূজারী মন্দিরে পূজা করিলেন না। নিজের ঘরটিতে বদ্ধ হইয়া রহিলেন।

পরদিন ভিন্ গাঁ হইতে যজ্ঞমান আসিল, মুর্খুর প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পূজারীকে যাইতে হইবে।

ঝি বলিল—বাবাঠাকুর শহরে গেছেন, এখনো ত তিনি ফেরেন নি।

—ঝি জানে না; এই যে আমি ফিরে এসেছি।—পূজারী দ্বার খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

°°°

ভিন্ গায়ে যাইবার পথে হুঃখজনক যজ্ঞমানের সঙ্গে পূজারীর দেখা হইতে লাগিল।

—বাবাঠাকুর যে! আজ্ঞে প্রাতঃপ্রণাম হই। শহরে যেতে আসতে কোনো ক্রেশ হয়নি ত?

পূজারী আবার মিথ্যা বলিলেন—ক্রেশ? না বাবা, পথে কোনো ক্রেশই হয়নি।

—আর সেই বণ্টাটা? সে কেমন হল?

পূজারী আবার মিথ্যা বলিলেন; তখন তাঁহার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না।

—বণ্টা? সে আর কি বলব বাবা, সে চমৎকাব।

আওয়াজ, সে আর কি বলব, যেন রূপোর বাণ্ড। একটি টুসকি মারলে অনেককণ তার আওয়াজ বাজে, শিগ্গিরি বধামতে চায় না, আর সে আওয়াজ তেমনি মিঠে।

—কবে আমবা দেখতে পাব ?

—শিগ্গিরিই দেখতে পাবে বাবা, শিগ্গিরিই দেখতে পাবে। কিন্তু ঘণ্টার গায়ে একশ আট ঠাকুরেব নাম খুদতে হবে, পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে, ভূতশুদ্ধি আসনশুদ্ধি করে তবে ত টাঙানো হবে, অমনি টাঙালেই ত আর হল না।

০০

পূজারী মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াই ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা ঝি, আমার এই আসন বাসন, চৌকি চৌকি যা কিছু আসবাব পস্তব আছে সব যদি বেচে ফেলি, তাহলে কি একশ টাকা হয় না ?

—হ্যাঁ: একশ টাকা। তোমার ত ভাবি ঐশ্বর্য্য, বেচলে একশ পয়সাও দাম হবে না।

—তবে ঝি, আজ থেকে আমি আর হবিষ্মিতে যি ছুখাব না ; পেটে সহ হয় না।

বুড়ী ঝি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—বাবাঠাকুর তুমি কি বলছ ? দিনান্তে এক মুঠো হবিষ্মি তাতে যি ছুখাবে না ? এও কি একটা কথা হল ? ... তোমার ব্যাপাব-খানা কি খুলে বল দেখি ? হয়েছে কি ? সেই যেদিন থেকে শহরে যেতে যেতে ফিরে এসেছ, সেদিন থেকে কি হয়েছে তোমার ?

ঝি প্রশ্ন দিয়া পূজারীকে এমন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে বুদ্ধ তাহার নিকট হইতে আব কিছুই গোপন রাখিতে পারিলেন না।

—আ! এ আব আশ্চর্য্য কি ? তোমার যে দয়াব শবীর, তাইতেই তোমার খেয়েছে। তা এর জন্তে ভেব না বাবাঠাকুর। ষতদিন না টাকার জোগাড় হয় লোককে চৌকিয়ে বাখবার বোকা বোকাবার ভার আমার রইল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শীঘ্রই গ্রামময় রটয়া গেল—ঘণ্টার গায় একশ আট ঠাকুরেব নাম খোদাই করিতে গিয়া ঘণ্টা ফাটিয়া গিয়াছে ; এজন্ত তাহা গলাইয়া আবার ঢালাই করিতে হইবে।

তারপর ঢালা খোদা হইলে প্রধান মোহান্তকে দিয়া শোণন করাইতে হইবে; নূতন ঘণ্টা প্রতিষ্ঠা সে ত আর অমন মুখেব কথা খসাইলেই হয় না।

ঝিয়েব রটনার পূজারী বাধা দিলেন না, কিন্তু অন্তবে তাঁহার বেদনা জমিতেছিল। একে ত নিজের মিথ্যা কথার বোকা তাঁহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল, তাহার উগর এইসব মিথ্যা রটনাব জন্ত তিনি নিজেকেই দায়ী বলিয়া বোধ করিতেছিলেন। যজমানের জন্ত ধন নষ্ট কব্যব সঙ্গে এই সব মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপের পর্ত্তের মতো তাঁহাকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। বুদ্ধ এতদিনে জবাব ভারে খুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন; স্বাস্থ্য ও আনন্দের লালিমা হাবাইয়া শূন্য গাল ছুটি বসিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি নিশ্চিন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

০০

পূজারীর দীক্ষাদিন নিরুৎসবেই কাটিয়া গেল; ঘণ্টা প্রতিষ্ঠাও কৈ হইল না। যজমানেরা সকলেই আশ্চর্য্য হইতেছিল। হরিধন কামার চুপি চুপি সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—আমি শহরের শড়কে পূজারী ঠাকুরকে এক বেদেনী ছুঁড়িব সঙ্গে রজরস কবতে স্বচক্ষে দেখেছি। আমি যা বলি তোমরা তা কান পেতে শোন, পূজারী ঠাকুর ঘণ্টার টাকাটা একেবারে নষ্ট করেছেন, এ একেবারে নিঘাস!

ক্রমে ক্রমে কামারের পোব দল পুরু হইয়া উঠিতে লাগিল। পথে পূজারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আর তাঁহাকে প্রশংসা কবে না, পূজারীকে গুনাইয়া গুনাইয়া তাহারা ফিস ফিস করিয়া তাঁহাবই আচরণ আলোচনা করে।

বুদ্ধ পূজারী অসাধ্য ভাবনার ভাঙিয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত অপরাধ গুরু হইয়া তাঁহার মন একেবারে পিষিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু বাধা করিয়াছেন তাহাব জন্তও বিশেষ পরিতাপ অনুভব করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না।

তিনি দরিদ্রকে শিক্ষা দিয়াছেন, এতে তাঁহার এত কি অপরাধ ? জেই দান হয় ত সমীচীন হয় নাই। সে টাবাও ছিল পরেব গচ্ছিত সম্পত্তি। তা তখন তাঁহার বিচার

করিবার কি অবসব ছিল ? আর এক কথাও ত ভাবিবার আছে—এই অপ্রত্যাশিত লাভ সেই ধর্মজ্ঞানহীন বেদেনীর অন্তরে হয়ত ভগবানের বোধ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে পারে ; ভগবান তাহার অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারেন।—ভাবিতে ভাবিতে পূজাবীর মনে পড়িয়া বাইত তকণী বেদেনীর সেই পাকা জামের মতো কালো ডাগর চোখের অশ্রুভরা মুখকরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

মন কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানে না, অন্তরাত্মার শিকার অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন পূজাবী বহুকণ ধরিয়া পূজা প্রার্থনা শেষ করিয়া যখন উঠিলেন তখন তাঁহার সঙ্গ দৃঢ় হইয়া গিয়াছে—বজ্রমানদের কাছে নিজের সমস্ত পাপ অকপটে প্রকাশ করিয়া ধরিতে হইবে—চুরি প্রবঞ্চনা আর নয়, বজ্রমানদেব ভক্তি কুড়ানো আর নয়।



পবদিন পূজারী মন্দিরে গিয়া পূজার আসনে বসিলেন, বুদ্ধ ভখন বিবর্ণ পাণ্ডুব আড়ষ্ট, খাঁড়ার সন্মুখে যেন বলি। তিনি দৃঢ় অকম্প কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—বৎস, তোমরা সকলে শোন...

এমন সময় তরল মধুর উচ্চস্বরে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ঘণ্টাধ্বনির মধুর সূচনার পূজার মন্দির একে-বারে ভরিয়া গেল।...সকল পূজার্থী সবিম্বরে উৎকর্ষ হইয়া বলিয়া উঠিল—নূতন ঘণ্টা! নূতন ঘণ্টা!

পূজারী ভক্তিগদগদ চিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—ভক্তবৎসল, তোমার এ কী অসম্ভব অতি-প্রাকৃত লীলা! হে ভগবান! তোমার দীন হীন দাসের কলঙ্ক-মোচনের জন্ত এ কী আশ্চর্য আয়োজন।

সকল বজ্রমানের পশ্চাতে এক পাশে দাঁড়াইয়া বুড়ী বি আনন্দ-দীপ্ত অপরূপ নেত্রে পূজারীর উপাসনা দেখিতেছিল। সে যে তাহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়া পূজারীর অতি দয়ার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

হিয়ার পয় পূজারীর আর আত্ম-অপরাধ প্রকাশ করা আবশ্যক হইল না।

চাক্র বন্দোপাধ্যায়।

নিকটের যাত্রা

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে।
বাহির হলেন প্রথম দিনের
প্রথম আলোর রথে।

গ্রহে তারায় বেকে বেকে
পথের চিহ্ন এলেন একে,
কত যে লোক লোকান্তরের
অরণ্যে পরতে।

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।

বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর।

পরের দ্বাবে ফিরে এসে
আসে পথিক আপন দেশে,
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

“এই যে তুমি” এই কথাটি
বলব আমি বলে’
কত দিকেই চোখ ফেরালেম,
কত পথেই চলে।

ভরিয়া জগৎ লক্ষ ধারায়
“আছ আছ”র স্রোত বহে যায়
“কই তুমি কই” এই কাননের
নয়নজলে গলে’।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(পূর্বসম্বন্ধি)

(De La Mazeliere বরাসী গ্রন্থ হইতে)



মুসলমানধর্মেরই সংশ্লিষ্ট এই সকল নীতিস্বত্রেব সঙ্গে, ভারত-আক্রমণকারীরা, মুসলমানধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি হইতে গৃহীত একটা জটিলধরণের সভ্যতা ভারতে আনয়ন করিল।

কেবল মধ্য-এসিয়ার বর্বরেরা ও আরবেরা ইতিপূর্বে প্রাচীন মহাদেশের সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। মহম্মদ, বিভক্ত আরব-শাখাদিগকে একত্র সম্মিলিত করেন। ওমার আবদদিগকে লইয়া দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন এবং এই দিগ্বিজয়ের দ্বারা আরব-প্রতিভা উদ্‌বোধিত হয়। যে সকল বিবাট উত্তম বিশ্বমানবের ক্রমোন্নতিকল্পে সহায়তা করিয়াছিল, মুসলমানদিগের আক্রমণ তাহার মধ্যে অন্ত-তম। যত সঙ্গুর্গই থাকুক না কেন, কোন জাতিই অস্ত্র-জাতির দৃষ্টান্ত ব্যতীত উন্নতির পথে অগ্রসব হইতে পারে না। যেকোন সাইবস, সেকন্দর-শা ও রোমকদিগেব বিজয়াজিযানের ফলে, পুরাকালের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে একটা যোগ স্থাপিত হয়, সেইরূপ মধ্যযুগেও আরব-দিগের অভিযানের ফলে বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে একটা যোগ নিবদ্ধ হইয়াছিল।

কালিফ-আধিপত্যের ইতিহাস চারিযুগে বিভক্ত। (১)

ধর্ম-যুগ।—মেদিনার চারিজন কুলপতি-প্রতিম কালিফ:—আবু বেকর, ওমাব, অথমান, আলি;—ইহঁরা নব-ধর্মের প্রধানাচার্য ও স্বকীয় সৈন্তমণ্ডলীর সেনাপতি। প্রজা কেহই নহে, সকলেই সহর্ম্মী। আরবমাত্রই সৈনিক। এই কালটি বৃহৎ দিগ্বিজয়ের কাল। তাহাব পর, মহম্মদের ভ্রাতৃপুত্র ও জামাতা আলি, এবং বিদ্রোহী

ওম্মেইয়াদ-শাখা-বংশ—এই উভয়ের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ। আলি গুপ্ত স্বাতকের হস্তে এবং তাহার সমস্ত বংশধরগণ একান্ত-ভাবে নিহত হয়।

আরব-রাষ্ট্রনীতির যুগ।—দামাসের ওম্মেইয়াদ-বংশের কালিফেরা—মহম্মদেব শত্রুপক্ষীয় কোন এক বংশের কুলপরম্পরাগত অধিপতি এবং মুসলমানধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ক্রমাগত দিগ্বিজয়ের দ্বারা রাজ্যবিস্তার হওয়া সত্ত্বেও, এবং Byzance ও গ্রীকভাবাপন্ন সিরীয়-দিগের প্রভাবসত্ত্বেও, কালিফদিগের এই রাজ্যশাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে আরব-শাসনপ্রণালীই ছিল।

আরব-বর্জিত রাষ্ট্র-নীতির যুগ। বাগদাদের আব্বাসিদ-বংশীয় কালিফেরা পারসীকদিগের দ্বারা বিশেষ-রূপে সেবিত হয়। একাধিপত্য ও কেন্দ্রগত শাসনভঙ্গ উহাদের রাজ্যশাসনের বিশেষ লক্ষণ। এই কালিফদিগের সময়ে বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের অহুশীলন চূড়ান্তসীমায় উপনীত হয়।

অবনতি।—সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। স্পেন-দেশ, কর্দুর ওম্মেইয়াদবংশীয়দিগের রাজত্ব কালে এবং ইজিপ্ট, কেরোর ক্ষতিমাবংশীয়দিগের রাজত্বকালে স্বাধীনতা লাভ করে। গজনির মহম্মদ, ইরান ও আফগানি-স্থানের অধিপতি হইলেন। সেলজুকিদি বংশের তুর্কেরা অ্যানাটলি দখল করিল। সকল শাসনকর্তাই নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীন হইয়া পড়িল। বাগদাদেও কালিফের কর্তৃত্ব আর রহিল না। পরিশেষে, মোগলদিগের অভিযানে কালিফের আধিপত্য অপসারিত হইল। এই ধ্বংসাবশেষের উপর দুইটি বৃহৎসাম্রাজ্য স্থাপিত হইল:—অটোমান-সাম্রাজ্য ও পারস্ত-সাম্রাজ্য। (২)



(১) হজিরা ৬২২। মহম্মদ (৫৭১—৬২৩)। মেকা অধিকার (৬৩০)। আবু বেকর (৬৩২—৩৪)। ওমার (৬৩৪—৪৪)। অথমান (৬৪৪—৪৬)। আলি (৬৫৬—৬১) দামাসের ওম্মেইয়াদ-কালিফ-গণ (৬৬১—৭৫০), কর্দুর কালিফগণ (৭৫৫—১০৩১)। বাগদাদের আব্বাসাইডিস-কালিফগণ (৭৫০—১৩৫৮)। সেলজুকিদিগেব সাম্রাজ্যকাল ১০০০ হইতে ১০২২ পর্যন্ত বিস্তৃত।—তাহাব পর এই সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। গজনেবাইডেরা (১০৬০—১১৮৬)।

(২) অটোমান-সাম্রাজ্য:—একদল তুর্কের সর্দার স্থলেমান ১২২৫ অব্দের অভিমুখে আর্মেনিয়া-প্রদেশে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহার পুত্র এর্টোগল (১২৩০—১২৮) ফিলিস্তিন-প্রদেশে সেলজুকদিগের নিকট হইতে একটা জাইদির প্রাপ্ত হয়। ওসমান (১২৮৮—১৩২৬) স্থলতান নাম গ্রহণ করিয়া, ঐ নাম স্বকীয় বংশকে প্রদান করে। তাহাব পর, এসিয়ামাইনর, থেস, সার্কিয়া ও বল্গেরিয়া দেশজয়। প্রথম বাতেসিদ (১৩৮২—১৪০৩) তামবলেন্ কর্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দি-অবস্থাতেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। অরাজকতা। প্রথম মহম্মদ (১৪১০—২১) অটোমান-তুর্ক-সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় মহম্মদ (১৪৫১—৮১) ১৪৫৩ অব্দে ইস্তান্বুল দখল করেন। মোগলদিগের পাবস্তবিজয়ের

মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। শেমিটিকবংশীয় আরবেরা এবং আর্য্যবংশীয় পারসীকেরা—উভয়েই এই সভ্যতার সংগঠনে সমান সাহায্য করে।

ইরাণেব মর্ম্মভাট প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পারসীকেরা জোরোস্তার-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই ধর্ম্মে দুইটি মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে:—একটি মঙ্গল, আলোক, অমজ্জ (অহরমজ্জ) ও অন্যটি অমঙ্গল, অন্ধকার, (আহরিমান)। জীব-সমূহের সোপান পরস্পরার দ্বারা মহুঘ, দেবতাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। একদিকে জ্যোতিব দেবগণ (অমশাস্পন্দ); আর একদিকে, অন্ধকারের দেবগণ (dev)। জগতের আরম্ভ হইতেই মঙ্গল অমঙ্গলের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। অমজ্জ কর্তৃক শুভজনক কোন জগতের সৃষ্টি হইবামাত্র তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ আহরিমান, অন্তত-জনক জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পরে অমজ্জদ পুণ্যবানদিগকে স্বর্গে লইয়া গিয়া পুরস্কার দেন এবং আহরিমান পাপীদিগকে নরকে লইয়া গিয়া যন্ত্রণা প্রদান করেন।

বর্তমান যুগেব সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বে (৩)জোরোস্তার এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। ব্যাবিলন-বাসীরা এই ধর্ম্মকে উৎপীড়ন করে। সাইরস ইহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবে। গ্রীকেরা ইহাকে অবজ্ঞা করিত। পার্সিয়েরা ইহার প্রতি উদাসীন ছিল। sassanides বংশের রাজত্বকালে ইহা আবার পারস্ত্ররাজ্যের ধাস ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহার পূর্বেই এই ধর্ম্ম দুই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তৎক্ষণাতীরা অমজ্জ ও আহরিমানের উপরে আর এক উচ্চতর দেবতা স্বীকার করিলেন। আর সমস্ত দেবতা তাঁহারই অধীন। সেই দেবতা—“জর্জর্জ-

পর, ১৫০২ অব্দে সিয়া-মতাবলম্বী ইস্‌মাবেল সফি কর্তৃক পারস্ত্রের রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্ত্র আক্‌গীনদিগের বশীভূত হয় (১৭২২—৩৬)। তুর্ক নাঙ্গির-শা (১৭৩৬—৪৭)। অভিনব রাজ্যবিভ্রাট। ১৭২৪ হইতে কাশ্‌শার-কুলের বর্তমান তুর্ক-রাজবংশ।

(৩) Zoroastre—শাস্ত্রীয়ভাষায় Zarathushtra, আধুনিক পারস্ত্র-ভাষায় Zerdusht। ধর্ম্মশাস্ত্র:—Zendavesta। প্রাচীন ভাষা Zend। মধ্যযুগের ভাষা-পঞ্চাবী।

অকরণ্য অর্থাৎ—মহাকাল। এবং সাধারণ লোকেরা অমজ্জদেব সৃষ্ট দেবতা একমাত্র নিরকেই (সূর্য্য, অগ্নি) পূজা-অর্চনা করিতে লাগিল।

মুসলমানদিগেব দিগ্‌বিজয়ে, জোরোস্তার-ধর্ম্মের জীবনলীলা শেষ হইল। অত্যাচার উৎপীড়নে পরাভূত হইয়া পারসীকেরা নবধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

অগ্নি উপাসকদিগেব কতকগুলি উপনিবেশ, কাস্পিয়ানের তটদেশে ও দক্ষিণ-পারস্ত্রে কোনপ্রকারে টিকিয়া বহিল এবং কতকগুলি অগ্নি-উপাসক শুল্জরাটে চলিয়া গেল। ইহারাই এখনকার পার্সি। কিন্তু বণেব দ্বারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও, পারসীকেবা আরবদিগের পূজা-পদ্ধতিহীন একেশ্বরবাদকে কখনই স্বীকার করে নাই। স্প্রিস্প্রদায়ের প্রচলিতমতাবলম্বী মুসলমানদিগের হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার সিয়া-নামক এক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায় গঠন করিল। একাধিপতি-শাসন-তন্ত্রেব প্রতি উহাদের আন্তরিক প্রবণতা থাকায়, উহার প্রার্থনা করিল যাহাতে মহম্মদেব বংশেই কালিক-আধিপত্য চিরস্থায়ী হয়। ইরাণ, আলি ও তাহার উত্তরাধিকারীদিগেব অধিকার সমর্থন কবিল। পবে যখন উহার অসিব আঘাতে বা বিষপ্রয়োগে নিহত হইল, তখন পোত্তলিকভাবে উহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল এবং কোন কোন স্থানে উহাবা দেবতার স্মার পুজিত হইতে লাগিল।(৪) আলিব দৃষ্টান্ত-অনুসারে, মুসলমান বীরপুরুষেরা ও পীরপায়গম্বরেরাও এইরূপভাবে পুজিত হইতে লাগিল। উহাদের সমাধির উপর স্মৃতিস্মির নির্মিত হইল। আত্মার মুক্তি ও দৈহিক আরোগ্যলাভের উদ্দেশে শতসহস্র যাত্রী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে কতকগুলি ধর্ম্মাশ্রমও স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে কতকগুলি উদ্দেশ্য—ধ্যান-ধারণা; আর কতক-গুলির উদ্দেশ্য—ধর্ম্মপ্রচার। মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে দর্শন নামক তাপস সম্প্রদায়ও ছিল। ইহার কঠোর তপশ্চর্যা

(৪) গুনিবাদ-বংশের পঞ্চাবলম্বী-লোকেরা বাহাদিগকে শুণ্ডহত্যা কবে, আলিয় সেই পুস্ত্রঘষ হাসন ও হোসেনেব উদ্দেশে একটা বিশেষ ধর্ম্মাশ্রম-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটা সমারোহ-যাত্রা করিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে ভক্তেরা অগ্নির দ্বারা আপনায় শরীরকে আঘাত করিতে থাকে। এই হাসেন হোসেন পাবস্ত্রদেশেব মুখ্য শোক-নাটোর প্রধান নায়ক।

কবিত; এমন কি উহা বা অসি ও ছুরিকার দ্বাৰা আপনাব শরীরকে ক্ষতবিক্ষত কবিত। কেহবা যোগানন্দে স্তিমিত-নেত্র হইয়া, চীৎকার করিতে করিতে বা নাচিতে নাচিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িত। এইরূপ ধর্মোন্মাদ হইতে কতকগুলি বদমায়েসের সম্প্রদায়ও উৎপন্ন হইয়াছিল; যথা “পর্বতবাসী বুদ্ধদিগের” সম্প্রদায়ভুক্ত “গুপ্তবাতকের” দল; ডুস্-নামক আর এক সম্প্রদায়, যাহা বা ইজিপ্টেব কালিফ হাকিমের উপাসক। এই কালিফ একজন যোগী, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ও উন্মাদগ্ৰস্ত। বিরুদ্ধসম্প্রদায়ের দেখাদেখি হুন্নিবাও কতকগুলি ধর্মোন্মাদ স্থাপন করিল এবং কতকগুলি গীবকে আবাহন করিয়া আনিল।

সিদ্ধাসম্প্রদায়ের বতগুলি মতবাদ আছে তন্মধ্যে সুফি-দিগের বৈরাগ্যবাদই সর্বাধিক কোতূহলজনক। সুফিরা সংসারের প্রতি উদাসীন, ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের জলন্ত অমুরাগ; এতটা অমুরাগ যে, বিধাতা-প্রেরিত হুঃখ ক্রেশেও তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে; যদি ঈশ্বর তাহা-দিগকে অনন্তকাল যজ্ঞণা দেন, তবু তাহারা কল্পনাতে তাহাই পরমানন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে:—এইরূপে প্রেমের খাতিরে প্রেমিক, স্বকীয় প্রণয়িনীপ্রদত্ত সমস্ত যজ্ঞণাই সন্তু করিয়া থাকে।(৫)

পারস্তাবাব লেখক সাদি এইরূপ সুফি-মতাবলম্বী ছিলেন।

“যাহারা ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত তাহাবাই ধম্ম। ... এমন হুঃ নাই যাহা চিন্তকে বিস্তার করে না; এমন গোলাপ নাই যাহার কটকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় না। এমন প্রেম নাই যাহা লাভ করিবার জন্য যজ্ঞণা পাইতে হয় না। কিন্তু এই সকল বাতুলেরা পরম সৌন্দর্যকেই ভাল বাসে; সেই দিব্য হৃৎকেই ভাল বাসে যে হৃৎ বিধকে হুঃখায় পরিণত করে ... তোমার মত যে জীব কাহা মাটি দিয়া নিষ্কিত তাহার উপর প্রেম স্থাপন কব। কিন্তু সে প্রেম যজ্ঞণাব নামান্তর। তাহার মুখের স্বন্দর তিলগুলি, তোমাব দিবসকে বিলুপ্ত করিবে, তাহার স্বপ্ন তোমার রাজ্যকে শাস্তিহীন করিয়া তুলিবে। কিন্তু সেই পরমহুঃখের চরণে

(৫) এইরূপভাবে কথার সহিত কার্ণাইলেব উক্তির তুলনা করা বাইতে পারে। কার্ণাইল বলিতে চাহেন যে, নরকস্থ হইবার যোগ্য হইলে, পাণ্ডী নরকস্থ হইতে সন্মত হয়:—“আমার যেন অনন্ত যজ্ঞণা হয়; কেন না, আমি এইরূপ দণ্ডভোগ করিবার উপযুক্ত। আমাব বিশ্বাস দুঃখভির কলে অনন্ত স্ত্রায়ের জন্ম হউক। আমি এইরূপ কাজ না করিলে, অনন্ত স্ত্রায়ের জন্ম হইত না। আত্মবিলোপই সকল ধর্মোন্মাদের আরম্ভ। যে অতিবড় পক্ষপাতি তাহারও পক্ষে ধর্মের এই উচ্চতম অবস্থা স্বপ্নম।” (Latter-day pamphlets, Jesuitism.)

নতব্রাহ্ম হইলে সমস্ত জগৎকে ভুলিয়া বাওয়া যায় ... অস্ত্রাব নহি একত্র বাস করা।—উহা অসম্ভব। তোমার অন্তরে একটিমাত্র প্রাণ—সেই প্রাণস্বরূপ স্বয়ং সেখানে অধিষ্ঠিত। তোমার নেত্র উন্মীলিত কর, তাহার প্রতিবিম্ব তোমাব জন্মবেব মধ্যেই অধিষ্ঠিত ... তিনি কি চান? তোমার প্রাণকে চান? এই ত তোমার গুণাব রহিয়াছে তিনি তোমার নিবাস পান কখন না। তিনি, কি চান? তোমার যজ্ঞণা চান? এই ত তোমার স্বয়ং রহিয়াছে। তিনি তাহার অসি দ্বার তোমার স্বয়ং ছিন্ন কখন না। মিথ্যা হইতে উৎপন্ন একট প্রেমলালসা এইরূপ যজ্ঞণা দিয়া থাকে ...”

এইরূপ হুঃখসম্বোধে, জলন্ত বাসনানলে দগ্ধ হইয়া এই যোগীরা দিব্যরাজির ভেদ উপলব্ধি করিতে পারে না। স্রষ্টার সৌন্দর্য্যেব সম্বন্ধে এমনি তাহাদের জলন্ত আগ্রহ যে, স্রষ্টা জগৎ তাহাদের নিকট বিলুপ্তপ্রায়। স্থূল “অস্থিমাংসের” প্রেম সুফির নিকট অপরিচিত। এইরূপ প্রেম বাতুলতার নামান্তর। সুফি, বিশুদ্ধ প্রেমসুত্রাপানে মত্ত-হয়; অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হয়। এই মত্ততার আব্বাদ পাইতে হইলে, ইহলোক পরলোক ভুলিয়া বাইতে হয়।(৬)

ঈশ্বরকে প্রিয়তমা সম্বোধন করিয়া সাদি এইরূপ একটি গজল লিখিয়াছেন:—

“আকাশের বজ্র। উচ্চচূড়ায় অবস্থিত একটি পার্শ্ববর্তী গৃহ আমার জানা আছে; যুদ্ধমন্ডল সমীরণও সেখানে প্রবেশ কবিত সাহস পা ন। ঐ গৃহে সিয়া আমার প্রিয়তমার সংবাদ আমাকে আনিয়া দিবে এই অধিত্যকার উপর আমার পুষ্টলী, আমার পরী, আমার হৃন্দরী বস করেন। বাও পক্ষি, এই প্রিয় বুদ্ধদিগের সংবাদ তাহার নিকট লইয়া যাও।”

এই হৃন্দরী বিনি সূর্য্য অপেক্ষাও জ্যোতির্গরী—

“তিনি যদি কৃপা করিবা আমাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন—তাঁহাবে উত্তর দিবে:—“সুলাস্বরূপ তাহাদের প্রাণ দিয়াও, তোমার নিকট হইতে একটি অনুগ্রহ তাহারা ক্রয় করিতে চাহে।”

আবও এই কথা বলিবে:—

“তাহারা মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া আছে, ত্বকায় তাহাদের কর্ণাগত প্রাণ। আর তুমি কি না শাস্তভাবে নিদ্রা বাইতেছ—তোমাব স্বপ্ন-গুলির মধ্যে একটি মূর্তি ছাড়া আর কোন মূর্তি নাই।”

“হে ইন্দুনিষ্ঠাননে, হে হৃন্দরী,—তুমি সর্বদাই বিস্ত্রমান, তাবাব সর্বদাই অবিস্ত্রমান,—এমন একদিনও বার না যেদিন তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়ের মধ্যে দিবা গমন না করে। হৃন্দরী তুমি যে সুবাইর আছ—তাঁহাই আমার হুঃখ যজ্ঞণার হেতু:—আমাদের এমন বোল্যত নাই যে আমরা তোমার দর্শনলাভ করি। তোমার অনল আবাদিগকে দগ্ধ করিবে।”

“আমরা তোমারই; তোমার শক্তির সীমা নাই; অস্ত্রাব কৃপ করিয়া আমাদিগকে ভালবাসো; নতুবা তোমার ভালবাসাকে আমাদেব স্বয়ং হইতে উৎপাদিত করিবা দেও।”

(৬) বুস্ত। (ভূতীয় পরিচ্ছেদ) Graff ও Ruckert-এর হৃন্দরী অনুবাদ এবং Barbier de Meynard-এর করাসী অনুবাদ।

হৃদয়, তোমার কি অলস জ্যোতি—কেন না, অবশেষের ভিতর হইতে তোমার জ্যোতির দ্বারা তুমি আমাদিগকে পরিদীপিত করিতেছ।

“সাদি তুমি কে? এই প্রেমের কথা তুমি বলিতেছ? আমি কে? আমি তাঁর কীর্তিদাস।” এই দাস সর্বান্তঃকরণে তাঁর একান্ত অঙ্গুষ্ঠ ও ভক্ত সেবক।”(৭)

M. Barbier de Meynard এর সুন্দর অনুবাদ হইতে সাদির ইশরের প্রেম সম্বন্ধে এই রচনাটি গৃহীত হইল :—

“একদিন বাদ্রে আমার মিত্রা হইতেছিল না,—আমি গুলিলাম প্রজাপতি মোমবাতিতে এই কথা বলিতেছে :—আমি ভালবাসি, অতএব পুড়িয়া নরাই আমার পক্ষে ভাষাধিক ; কিন্তু তুমি কি অস্ত তপ্ত অশ্রু মোচন করিতেছ? মোম-বাতি উত্তর করিল :—আমি হৃদভাঙ্গা প্রেমিক, আমার প্রিয় সহচর মধু হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; আব সেই অবধি ফেরহাদের দ্বারা আমি পরিতাপে দগ্ধ হইতেছি।” মোম-বাতি এই কথা বলিয়া স্বকীয় পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর কতকগুলি অশ্রুবিন্দু মোচন করিল; তাহুর পর আবও এই কথা বলিল :—প্রবন্ধক তোমার না-আছে আত্মবিসর্জন, না-আছে অধ্যবসায়। আমার শিখার প্রথম-সংস্পর্শেই তুমি গলায়ন কর; কিন্তু দেখ আমি, হির হইয়া থাকি এবং সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হই। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৭০)

যোগবাসদসম্বন্ধে মুসলমান ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের মিল হইতে পারে। সাদি তাহার প্রণয়িনী ঈশ্বরকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবি জয়দেব দেখাইয়াছেন,—প্রণয়িনীর দ্বারা ঈশ্বর তাঁহাব হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন।

বিশ্বব্রহ্মবাদে পৌছিয়া এই দুই ধর্মের সমন্বয় হইয়াছে। আরব ধর্ম্যাচার্যেরা বলিয়াছিল,—শূন্য হইতে, কিছু না হইতে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন; যোগবাদীরা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিলেন, ঈশ্বর আত্মস্বরূপ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এইরূপে উহারা সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক করিয়া ফেলিল। যোনি-ভ্রমণপথে ক্রমিক রূপে পর্যায়ক্রমে প্রকৃত, বুদ্ধ, পশু ও পরিশেষে এক্সেল হইয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া, পবে আরও এই কথা বলিয়াছেন :—

“আমি এক্সেলের উপরে আপনাকে উন্নীত করিব, সকলই অপসৃত হয়, কিন্তু ঈশ্বর কখনই অপসৃত হন না। এক্সেলকেও অতিক্রম করিয়া আমি এমন কিছু হইব যাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবে না। কিছুই নয়। কিছুই নয়। শ্রবণ কর, অহংকার বন্ধনাদে বলিতেছে; আমরা সকলেই ঈশ্বরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিব।”(৮)

(৭) অধ্যাপক Pizzari ইটালীর অনুবাদ অনুসারে Storia della poesia Persiana (I. p. 314).

(৮) (Sure, II, 154) Paul Harn এর অঙ্গীর্ণ অনুবাদ, "Geschichte der persischen Letteratur," P. 163.

ক্রমিক আঁব একটি কবিতা দেখ :—

“যখন কোন নাম ছিল না, রূপের চিহ্নমাত্রও ছিল না, তখনও আমি ছিলাম। কেবল মাত্র সেই সখা, সর্বাধিপ স্রষ্টা। আমা হইতে সকল রূপ সকল নাম নিঃসৃত হইয়াছে। যখন মেঘ, সৃষ্টিদাতাকে গর্ভেও ধারণ করেন নাই, তখনও আমি ইশ্বরের আরাধনা করিতাম। যখন দেবমন্দির ও মঠাদির না-ছিল বর্ণ না-ছিল রূপ, তখনও আমি মন্দির মঠাদিতে গমন করিতাম। যখন কাব্য শিশুও ছিল না বুদ্ধও ছিল না, তখনও আমি কাব্যকে সম্বোধন কবিয়া আবেগভরে প্রার্থনা করিয়াছি.....আমি সপ্ত স্বর্ণ ও সপ্ত ধ্বা অতিক্রম করিয়াছি...আমার হৃদয়ের মধ্যেই ইশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং ইহাও জানিতে পারি-আমি যে তিনি হৃদয়েই থাকেন, আর কোথাও থাকেন না।”(৯)

আর একস্থলে এইরূপ আছে :—

“আমিই সন্ধ্যা, আমিই প্রভাত...আমিই নৌকা, আব সেই নৌকা-চূর্ণকারী শৈলও আমি...আমিই শান্তি, আমিই সংগ্রাম...আমিই হরিণ আমিই সিংহ, আমিই ব্যাঘ্র, আমিই মেঘ, এবং যে মেঘ-পালক মেঘ-শালায় মেঘদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, সেই মেঘ-পালকও আমি। আমিই জীব-মুখল, সংসার-চক্র, সৃষ্টি-সোপান।”(১০)

এই প্রকার মতবাদের সংস্পর্শে হিন্দুদিগের যোগবাদ আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। হিন্দুরা সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে এবং মাতৃকা-পূজার বিভৎস ও ভীষণ ব্যাপারের মধ্যে আত্মহার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চানে রাষ্ট্রবিপ্লব

৩

আমার প্রত্যাবর্তন।

ইঞ্জিনিয়ার গ্রোভ সাহেব, হাওবেল সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে আমেরিকান মিশনারি রবার্ট সাহেবের গির্জার আঙ্গিনার ভিতরস্থ একটি বাগলায় বাস করিতেন। আমি তথায় গিয়া মিলিত হইলে তথা হইতে মোমক অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে ব্রহ্মসোমাস্তে মিলিটারি পুলিশের ক্যাপ্টেন অবমণ্ড ও সুবাদাব-মেজরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কাপ্তান কোতুক করিয়া কহিলেন যে “Take care, the rebels may kill you.” তাহাতে আমি কহিলাম যে

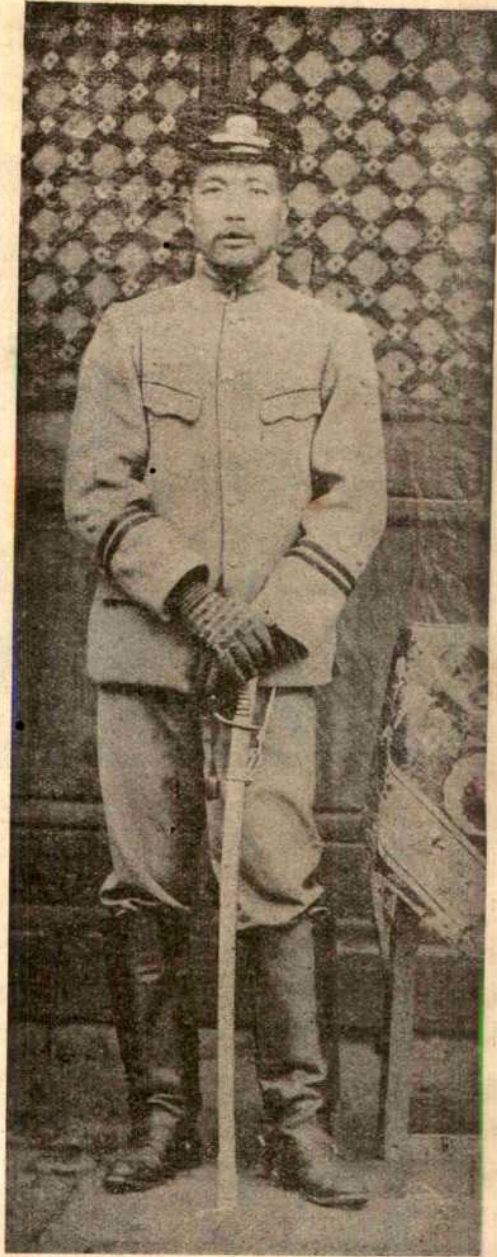
(৯) অধ্যাপক Pezzari ইটালীর অনুবাদ।

(১০) Divan এর Ruckert কৃত অনুবাদ।

I am quite prepared for that, sir. তথা হইতে যথাক্রমে পূর্বোন্নিখিত আড্ডায় আড্ডায় আমরা ব্রহ্ম দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া চতুর্থ দিবসে চীন সীমান্তের আড্ডা মানসীয়াানে উপস্থিত হইলাম। তথায় যত চীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল দেখিলাম সকলেরই ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে বিদেশী লোকের প্রতি ইহাদের নব্রতা ও ভদ্ৰতা দৃষ্ট হইত কিন্তু এক্ষণে সেই নব্রতার পরিবর্তে তাহাদের স্বভাব উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছে।

মানসীয়াানে উপস্থিত হইয়া পূর্বোন্নিখিত মিঃ ম-র বাড়ীতে রাত্রিকালে বাস করিব সংকল্প করিলাম। তাঁহার কাঠের ঘরের দ্বিতল গৃহে গিয়া আমরা শয্যা রচনা করিতেছি, এমন সময় একদল লোক আসিয়া প্রথমতঃ মিঃ মর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, পরে আমাদিগের কক্ষে গিয়া অভদ্রভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ আমাকে চিনিত। একজন জিজ্ঞাসা করিল যে “ডাক্তারের বাড়ী ভারতবর্ষ, সত্য কিনা?” আমি কহিলাম যে “হাঁ সত্য।” তাহাতে সে কহিল “আপনারা আমাদের পীত জাতির মধ্যে গণ্য। আপনাদের দেশ এখন ইংরেজের অধীন?” আমি কহিলাম “হাঁ, তাহাও সত্য।” তখন সেই ব্যক্তি কহিল “কেন আপনারা ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দেন না?” আমি তখন বড় লজ্জিত হইলাম এবং সেই লোকটাকে কহিলাম যে “তোমার এরূপ ভাবে কথাবার্তা বলা বড় অশ্রায়।” এই কথা বলিয়া ইচ্ছিতে বুঝাইলাম যে আমার সঙ্গী গ্রোভ সাহেব একজন ইংরেজ, ইহার সন্মুখে এই প্রকার কথাবার্তা বলা নিতান্ত অভদ্রের কার্য। গ্রোভসাহেব চীনা-কথা জানেন, অবশ্য তিনি তাহা সম্পূর্ণ বুঝিলেন। লোক-গুলি চলিয়া গেলে তাঁহাকে কহিলাম, “দেখুন, অল্প দিনের মধ্যে চীনাদিগের ব্যবহারে কেমন পরিবর্তন হইয়াছে।” তিনি কহিলেন, “কালের গতিতে এ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।” এখানকার নূতন সৈনিক কর্মচারিগণের কথার ভাবে তাহাদের ইংরেজবিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আসিবার পথে গুজব শুনিয়াছিলাম এবং এখানেও শুনিলাম যে টেঙ্গিরের লোক বড় ভীত হইয়াছে, তথায় লড়াই হইবার আশঙ্কা আছে। এই কারণে টেঙ্গিরে ও



লি-কেন-ইয়ে—ইউনান প্রদেশের সাধারণতন্ত্রী জেনারেল কমান্ডিং অফিসার। ইনি ছয় বৎসর জাপানে যুদ্ধ শিক্ষা করিয়া আসিয়া ইউনানফু শহরের সৈনিক বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্রোহের পর এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

তলিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা বালকবালিকা লইয়া বন্যায় পলাইতেছে। তাহার কারণ ইউনানফু শহর ইউনান



টাও-টাইয়ের পূত্রগণ ও কর্মচারীগণ।

প্রদেশের রাজধানী। তথাকার জেনেরাল লী, টেঙ্গিয়ের বিদ্রোহী সর্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কেননা তিনি সান জাতীয় কাঙ্গাই স্ভাতকে সমস্ত সৈন্তের সেনাপতি নির্বাচন করিয়াছেন। সান চীনার উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহা চীনারা সহ্য করিতে পারিবে না। টেঙ্গিয়ে ক্ষুদ্র স্থান। ক্ষুদ্র স্থান হইয়া সমস্ত ইউনান প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিতে গেলে ইউনানফুর ও টালিফুর সৈন্তের সঙ্গে টেঙ্গিয়ের লড়াই অনিবার্য হইবে, লোকের এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে।

আমরা যথাক্রমে টেঙ্গিয়ে পৌঁছিলাম। টেঙ্গিয়ে পৌঁছিয়া দেখি আমার বাড়ীর সদর দরজা বিদ্রোহিগণের সর্দারের আদেশে শীলমোহরযুক্ত হইয়াছে। তবে আমার ছই জন চাকর বাড়ীর একটা গুপ্ত দরজা দিয়া ভিতরে যাইত, আসিত। আমি দরজা খুলিয়া ভিতরে গেলাম। দেখিলাম আমার কোন দ্রব্য চুরি হয় নাই। আমাকে দেখিয়া আমার পাড়াপড়শিরা বড়ই আনন্দিত হইল,

তাহারা যেন আমাকে পাইয়া অনেক আশ্বস্ত হইল। কারণ বিপদের সময় তাহারা আমার বাড়ীতে আশ্রয় লইলে অনেকটা নিরাপদ মনে করে।

কাষ্টম আফিসের সাহেবদিগের বাড়ীও ঐ প্রকারে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ঘরের পার্শ্বের চীনা কেরানীদিগের বাড়ীর সমস্ত মাল বিদ্রোহিগণ অপহরণ করিয়াছে। বিদেশীদিগের সমস্ত সম্পত্তিও বিদ্রোহীরা লুট করিয়া লইত, কেবল ক্ষতিপূরণের ভয়ে একাধা করিতে সাহস পায় নাই। কারণ পূর্ব পূর্ব ঘটনায় বিদেশীদিগকে চীনগবর্ণমেন্টের বহু লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। যাহার হাজার টাকার মাল অপহৃত হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ পাঁচগুণ কি দশগুণ দিতে হয়। এই কারণে চীনারা এবার বড় সতর্ক হইয়াছে। বিদেশীর সম্পত্তির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছে। সাহেবগণেরও ধারণা ছিল যে সমস্ত ফেলিয়া গেলে চীনারা নিশ্চয়ই লুট করিবে এবং তাহারা যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ লইবেন। কিন্তু



টেক্সিসের প্রজাতন্ত্র গভর্নমেন্টের টাওটাই বা কমিশনার।

লি-কেন-ইয়ের অধীনস্থ কর্মচারী।

এবার এবিষয়ে তাঁহারা বড় নিরাশ হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে নিরাশ হই নাই তাহা নহে। বড় রকম একটা দাবি করিবার সুযোগ চলিয়া গেল।

আবার কাঙ্গাই সুভার কথা।

টেক্সিসে আসিয়া দেখি রাস্তা ঘাট হাট বাজার প্রায় লোকশূন্য। জীলোক ও বালক বালিকা প্রায় দেখা যায় না।

কেবল সৈন্তগণই বেশির ভাগে দৃষ্ট হয়। যাহারা পলায়ন করে নাই বা যাহাদের পলায়নের স্থান নাই, তাহারা দ্বিবারাত্রি অশান্তিতে কাটাইতেছে। এক এক দিন এক এক প্রকার গুজব। কোন কোন গুজবের মূলে কোন সত্যই নাই। আমরা আসিবার কয়েকদিন পূর্বে কাঙ্গাই সুভা ও সর্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের মধ্যে এত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে যে উভয়ের সৈন্তই পরস্পর লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সংবাদে দুই রাত্রি লোকে ভয়ে উবেগে কাটাইয়াছে যে কোন সময় কি হয়। কারণ অমুসন্ধানে জানিলাম যে টালিফু হইতে কাঙ্গাই সুভার নিকট এক টেলিগ্রাম আসিয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই যে “তোমার রাস্তা শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার কর।” টেলিগ্রাম আকিসে পৌছিলে তৎকালকার সিগনেলার তাহা গোপনে বিদ্রোহী-সরদারকে দেখায়। সরদার চাং তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মনে মনে ঠিক করিলেন যে সুভা তাও-কেই-সীন্ বুঝি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া সমস্ত কর্তৃত্ব নিজে লইতে মানস করিয়াছেন। তাই তিনিই সুভাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবেন এই আয়োজন হইল। সুভা শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন যে ব্যাপার-খানা কি? তিনি অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ অমুসন্ধান করিলেন এবং যখন কোন মীমাংসাকারক উক্ত টেলিগ্রাম তাঁহাকে দেখাইল তখন তিনি কহিলেন যে তিনি উহার কিছুই জানেন না। কোনো ব্যক্তি চাং-ওয়েন-কোয়ানের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাধাইয়া উভয়কেই নষ্ট করিবার জন্য এই কল্লনা করিয়াছে। বাস্তবিকও তাহাই। টালিফু হইতে চাং-এর কোন শত্রু এই প্রকার করিয়াছিল। অবশেষে দুই জনের বিবাদ মিটিল কিন্তু মনের মিল আর হইল না।

সুভা তাও-কেই-সীন্ আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। চীনাদের সঙ্গে এক মিল হইয়া তিনি দেশের মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু চীনারা সে প্রকৃতির লোক নহে। তাহারা সানদিগকে অমুন্নত জাতি মনে করিয়া ঘৃণা করে। এ বিষয়ে সানদিগের অবস্থা কতক আনাদিগের মত। স্বাধীন জাতি ও অধীন জাতিতে যে প্রভেদ তাহা এখানেও বর্তমান। • এই কারণ বশতঃ চীনা সৈন্ত সকলেই সান সুভার অধীনে চাকরী • করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছিল। সেই কারণেই তাও-কেই-সী-নকে সরদার চাং-এর অধীন হইয়া দ্বিতীয় কর্মচারীরূপে এখানে থাকিতে হইল। তাহাও নাম মাত্র, তাঁহার কোন ক্ষমতাই রহিল না। কিন্তু ধরিতে গেলে এই বিদ্রোহের আদিতে কাঙ্গাই স্ত্রী। তাঁহার আবাসেই যত মন্ত্রণা হয়। চাং-ওয়েন-কোয়ান্ কাঙ্গাই গিয়া মন্ত্রণা করিতেন। বিদ্রোহের দুই দিন পূর্বে চাং তথায় গিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া আসেন। বিদ্রোহের পর স্ত্রীকে সমস্ত সৈন্তের নেতৃত্ব দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া তবে এখানে আনিয়াছিলেন। এবং সেই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বোধ করি তিনি নিজ দস্তখতযুক্ত ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন যে তিনি সমস্ত ইউনান প্রদেশের কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হইয়াছেন। সরদার চাং কাঙ্গাই স্ত্রীর মত একজন নব্য ধরণে শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী বড় জমিদারের সাহায্য ও সহায়ত্ব পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এবং তাহাতে ফলও পাইয়াছিলেন। কেননা বিদ্রোহের পূর্বে চাং একজন নগণ্য লোক ছিলেন। আমার এখানে কখনো আসিলে সাধারণ লোকের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করিতাম, ইহার সঙ্গেও তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছি। কোন একটা বিষয়ের ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে চাং-এর কোনো ক্ষমতা ছিল না। কাঙ্গাই স্ত্রীর নামের গুরুত্বে অনেক ফল ফলিয়াছিল। এদিকে অগ্নাত সান স্ত্রীগণ কিন্তু বিদ্রোহিগণের সঙ্গে যোগদান করেন নাই। তাঁহারা এমতাবস্থায় কাঙ্গাই স্ত্রী আপন আপন এলাকা রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। এমতাবস্থায় কাঙ্গাই স্ত্রী আপন জাতীয় আত্মীয় স্ত্রীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চীনাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া তেজস্বিতা ও স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু চীনাদিগের কার্যে তাঁহার মনে আঘাত লাগিল, শেষে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

আমরা যেদিন টেঙ্গিয়ে পৌছি, সেইদিন পথে কাঙ্গাই স্ত্রীর পঞ্চম ভ্রাতা তাও-কেই-আড়, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রসহ অনেকগুলি রাইফলধারী সান সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া টেঙ্গিয়ে বাইতেছিলেন। তাঁহারা আমার পূর্বপরিচিত, তাঁহাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলাপ

হইল। ইহাদের সকলেরই বিদেশী ধরণে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা। ইহারা টেঙ্গিয়ে পৌছিলে দুইদিন পরে সুভা তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহার নামমাত্র কার্যের ভার দিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিলে শুনিলাম তিনি ছ-পে প্রদেশে ডাঃ সুন ইয়াট-সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাইতেছেন। তিনি ব্রহ্ম দেশ হইয়া সমুদ্রপথে সাংহাই দিয়া বাইবেন এমন কথা শুনিতে পাইলাম। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিল যে ইনি বুঝি অসন্তুষ্ট হইয়া অপমানের প্রতিহিংসা স্বরূপ বর্মী গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য বাইতেছেন। আমি তাঁহাকে “কুণ্ডচন্দ্র” মনে করিয়া ছিলাম। কিন্তু যখন শুনিলাম যে তিনি আনাম হইয়া (Anam) ইউনানফু শহরে উপস্থিত হইয়াছেন তখন আমার সে ভ্রম ঘুটিল। চীনদেশের শিক্ষারই এমন গুণ যে স্বদেশ ও স্বজাতি-দ্রোহিতা কি ইহারা তাহা জানে না।

আমার বোধ হইল তিনি তাঁহার মনোজ্বল (Grievances) কথা ইউনানফুর প্রজাতন্ত্রীয় গবর্ণর-জেনারেল ছাই-অ মহাশয়কে জানাইবার জন্য তথায় গিয়াছেন। কিন্তু তথায় গিয়া নাকি নজরবন্দী কয়েদী রূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখন তথা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নাংকিন শহরে সুন-ইয়াট-সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কোন সৈন্তের নেতৃত্ব লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

স্ত্রীর ভ্রাতাও অল্পদিন পরে এখান হইতে আপনার এলাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

টেঙ্গিয়ে আসার পর প্রায় একমাস বাবত ডাক ও টেলিগ্রাম বন্ধ ছিল; স্ত্রীর আমরা কোনো সংবাদই ঠিক সময়ে পাইতাম না; ইহাতে মহা অসুবিধায় থাকিতে হইয়াছিল।

লোকের অবস্থার পরিবর্তন।

বিদ্রোহের পর হইতেই বহু লোকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। যত অলস, ভবঘুরে, জুয়াবাজ, আফিংখোর লোক সৈন্তদলে ভর্তি হইয়াছে। তাহাদের বেতন ৬ টেল বা ১৩ টাকা করিয়া মাসিক হিসাবে



ঔজ্জাতীয় প্রধান সেনাপতি ।

ধারণ্য হইয়াছে। সুতরাং কুলি মজুর ও ভৃত্যাদি পাওয়া কঠিন হইয়াছে। সোয়ারি বাহক বেহারা ছত্রাপ্য। যে বেহারাটি ভানো যাইতে পূর্বে সাত আট টাকার পাওয়া যাইত, সেই লোক এখন ত্রিশ চল্লিশ টাকা চাহিয়া বসে। এখান হইতে একটি খচ্চর পাঁচ কি ছয় টাকার ভাড়া পাওয়া যাইত। তাহা বিদ্রোহের পরে কিছুদিন ধরিয়া বিশ পঁচিশ টাকার কমে পাওয়া যাইত না।

রাজকীয় ছোট বড় কর্মচারীদের মধ্যে কেহ হত হইয়াছে, কেহ প্রাণভয়ে পলাইয়াছে, কেহবা চাকরী পরিত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে

যেসকল গ্রাম্য ভদ্রলোককে পূর্বে কেহ গ্রাহ্য করিত না, তাহারা বিদ্রোহী সরদারের অমুগ্রহে এবং অধীনে নানা প্রকার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ সৈনিক কর্মচারী, কেহ কেহ কেরানী, কেহ কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। সরকারী আফিস আদালত লুটের অর্থে কেহ কেহ ধনী হইয়াছে। কেহ কেহ নিজের অর্থ অপসৃত হওয়ায় একেবারে গরীব হইয়া পড়িয়াছে। নূতন সৈন্তের ব্যয় বহনের জন্য সদাগর ও প্রজাবর্গের নিকট হইতে বহু অর্থ জোর করিয়া আদায় করা হইয়াছিল।

পরিচ্ছদের পরিবর্তন ।

সর্বপ্রায়ে মাথার বেণী কাটার বড় ধুম পড়িয়া গেল। সরদার চাং ঘোষণা করিলেন যে পনরদিনের মধ্যে যে মাথার বেণী না কাটিবে তাহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হইবে। শাস্তির পরও যে তাহা মাথায় রাখিবে তখন তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। সুতরাং ২৬০ বৎসর পূর্বে বিজয়ী মাণ্ডু সম্রাটের আদেশে বহু জুলুমে যে বেণী চীনার মাথায় সৃষ্ট হইয়াছিল, আজ বিদ্রোহী সরদারদিগের আদেশে সেই প্রকার জুলুমের সহিত লোকের মস্তক হইতে তাহা অপসৃত হইতে লাগিল। মাণ্ডু গবর্ণমেন্টের আমলে মাথায় বেণী না রাখিলে বিদ্রোহী মনে করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করা হইত। এক্ষণে নিরীহ অস্ত্র পল্লীবাসিগণ অতি অনিচ্ছার সহিত অতি যত্নে রক্ষিত বেণী কাটিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহারা কিঞ্চিৎ আপত্তি করিল অমনি তাহাদের পশ্চাৎদেশে পুলিশ ২০০ ছুইশতবার একখানি ক্ষুদ্র তক্তার দ্বারা আঘাত করিয়া চর্ম ও মাংস দলিত করিতে লাগিল। যেমন ব্রাহ্মণের উপবীত, বৈষ্ণবের টিকি, চীনাদের টিকিও সেই প্রকার পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; যদিও প্রকৃত পক্ষে ইহা পরাবীনতার চিহ্ন বলিয়াই প্রথমে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বিদ্রোহের পর এখানকার সৈন্ত ও সিভিল কর্মচারিগণ কিছুদিনের জন্য মাথায় নীলবর্ণের পাগড়ি ব্যবহার করিতে লগিল। পরে ক্রমে গোবাকের পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে লাগিল। একমাস মধ্যে সৈন্তগণের গোবাক

আবার নূতন আকার ধারণ করিল। মাথায় জাপানী ধরণের টুপি, গায়ে ছোট কোট, পায়ে পাজামা, পট্ট, এবং বুট। স্বল্পদেশে এবং আন্তানিতে পট্ট দ্বারা কোন শ্রেণীর সৈন্ত তাহা চিহ্নিত করা হইল। যেমন পণ্টনের নায়ক, হাবিলদার, জমাদার, স্ত্রীজামাদার সেইমত ইহাদের সিপাহীগণের উপরস্থ কর্মচারীর পদক্রম স্ফুট হইল। ইহা পূর্বেও ছিল কিন্তু এখন নূতন ধরণের হইল। নায়ক হাবিলদারদিগের বিদেশী পণ্টনে কিরিচ বা তরবারি নাই কিন্তু চীন সৈন্তের উপরস্থ যত কর্মচারী সকলেই কিরিচ বুলাইয়া সর্বদা চলে। ইহার উপর জাহাজের খালামী-দিগের বা নৌ সৈন্তের বড় বড় পিতলের ছই সারি বোতাম-বৃত্ত কালো ওভারকোট প্রত্যেকের অঙ্গে শোভিত হইল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কোটের আমদানি কোথা হইতে হইল। এ সমস্তই পুরাতন কোট। বৎসরান্তে পণ্টনের বা জাহাজের গোরা-দিগের পুরাতন কোট যত নিলাম হয় তাহাই বোধ করি খরিদ করিয়া চীনা সদাগরগণ নানা দেশ হইতে এদেশে চালান দিয়াছে।

এবার যত রকমের পোষাক পরা সৈন্ত দেখিলাম পূর্বে কখনো সেরূপ দেখি নাই। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সৈন্তের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পরিচ্ছদের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। হাওপিন—শানাই বা বিউগল বাজকর। পীত-বর্ণের পরিচ্ছদ ও টুপি। পিন মানে সেপাই বা সৈন্ত।

২। লু-পিন—মস্তকে কুম্ভবর্ণ উষ্ণীষ। ইহারা কোন কর্মচারীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনে বা সঙ্গে গিয়া অন্ত্র পৌছাইয়া দেয়।

৩। ছেঙ্ পিন—মাথায় জাপানি ধরণের সৈনিক টুপি। ইহারা লড়াই করে।

৪। মা-পিয়ান—অশ্বরোহী সৈনিক দূত। ইহারা মাথায় পাগুড়িও ব্যবহার করে, টুপিও পরিয়া থাকে।

৫। চিন পিন—কর্মচারীদিগের সঙ্গে আরদালিরূপে থাকে। ইহাদের পরিচ্ছদ লালবর্ণের।

৬। ওয়ে-টোয়ে-পিন—সৈন্তাধ্যক্ষের শরীররক্ষক—ভায়লেট রঙের ইউনিফর্ম।

৭। ফাও-টোফে-পিন—তোপখানার সৈন্ত—আন্তা-নিতে পীতবর্ণের পট্ট ও পীতবর্ণের উত্তরীয়।

৮। ফুং-ছেন-টোয়ে—শত্রু শিবিরে স্ফুট খনক (Sapper and miner)—আন্তানিতে খেতবর্ণের চিহ্ন।

৯। চি-নিং-চুয়েন—ভলান্টিয়ার সৈন্ত—আন্তানিতে লালবর্ণের চিহ্ন।

১০। চিন ছা-জু-পিন—পুলিশ সৈন্ত—ইহাদের মাথায় টুপিতে ধূসরবর্ণের চিহ্ন।

সৈন্তগণের পরিচ্ছদ প্রতি তিন মাসে পরিবর্তিত হয়। ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল মাসে পীতবর্ণের পরিচ্ছদ। মে, জুন ও জুলাই মাসে খেতবর্ণের। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর নীলবর্ণের। এবং নবেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে তুলাভরা নীলবর্ণের পোষাক।

বিদ্রোহের পূর্বে জেনারাল ও তন্নিম্নস্থ সৈনিক কর্মচারীগণ কোথাও যাইতে হইলে, বা কোন উচ্চ কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইলে পাকী আরোহণে যাইতেন এবং অগ্রপশ্চাতে নিশানধারী সৈন্ত চলিত। কিন্তু এক্ষণে সে সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন ছোট বড় সকলেই অশ্বরোহণ করিয়া যাতায়াত করে। পূর্বের সমস্ত পরিচ্ছদ এককালে বর্জিত হইয়াছে। ময়ূরপুচ্ছ ও জেড প্রস্তরের নলযুক্ত গ্রীষ্ম ও শীতকালীন টুপি প্রভৃতি আর এখন ব্যবহৃত হয় না।



রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বে চীন কর্মচারীর পাকী চড়িয়া শোভা যাত্রা।

এই তু গেল মোটামুটি সৈন্ত ও সৈনিক কর্মচারীদিগের কথা। এখন সিভিল কর্মচারী ও প্রজাসাধারণের পরিচ্ছদ

পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিব। সিভিল কর্মচারীদিগের আর পূর্বের জাঁকজমকবিশিষ্ট লম্বা চোঁগা, মূল্যবান স্বর্ণ-খচিত বড় কোট, স্বর্ণ ও হীরক গুটিকাযুক্ত মুকুট, মোতি ও নানা মূল্যবান প্রস্তরের মালা প্রভৃতি নাই। এসমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই প্রকার মূল্যবান পরিচ্ছদের ব্যবহার উঠিয়া যাওয়ায় সমগ্র চীন দেশে কোটি কোটি টাকার দ্রব্য অব্যবহার্য হইয়াছে। তবে মঙ্গলের কথা এই যে ভবিষ্যতে আর ইহার জন্ত জাতীয় অর্থ নষ্ট হইবে না। কি সৈনিক কি সিভিল কর্মচারী সকলেই গৃহে সাধারণ ধরণের লাল গুটিকাযুক্ত টুপি পরিতেন। কিন্তু ঐ টুপিও মাঝগুণ কর্তৃক প্রচলিত টুপি মনে করিয়া এখন সকলেই বিলাতী সাংস্কালীন টুপি (Evening Cap) পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত রাজকীয় কর্মচারীই বর্তমান জাপানি ধরণের সৈনিক টুপি, বড় বড় সোলার টুপি, কধলের টুপি (Felt cap) প্রভৃতি ধরিয়াছেন। এবং সেই দেখাদেখি প্রজা সাধারণ বিলাতি ধরণের নানা প্রকার টুপি ব্যবহার করিতেছে। এবার এই অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ টুপির আমদানি হইয়াছে। একদল লোকে বেশ লাভজনক ব্যবসা করিয়াছে। * কর্মচারীগণ মাথার টুপি হইতে পায়ের বুট পর্যন্ত সমস্ত পরিচ্ছদ বিদেশী ধরণের পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোড়ার সরঞ্জামও সমস্ত বিদেশী। দেশী জিন লাগাম আর ব্যবহার হয় না। ইংলিশ কোট, নেকটাই, কলার, দস্তানা প্রভৃতি অনেকের নিত্য ব্যবহার্য পরিচ্ছদ হইয়াছে। চীনাগের বর্ণ পরিষ্কার বলিয়া ইংরেজী পরিচ্ছদ পরিধান করিলে সহসা ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হয়। বিলাতি ধরণের টুপির প্রতি লোকের কেমন ঝোঁক পড়িয়াছে তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব। আমার বাটীর পার্শ্বে এক বাড়ীতে বিবাহ হয়। সেই বিবাহে আমার ভৃত্যগণের সাহায্যের নিমন্ত্রণ ছিল। দুই জন ভৃত্য কিছুতেই নিমন্ত্রণের মজলিসে যাইতে রাজি হইল না, কেননা তাহাদের বিলাতি ধরণের টুপি ছিল না। সাবেক টুপি পরিয়া মজলিসে যাইতে লজ্জা বোধ করিল। অবশেষে আমার দুইটা টুপি আর করিয়া তাহাই মাথায় দিয়া তবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল।

এই রাষ্ট্রবিপ্লব-ঘটিত পরিচ্ছদ-বিপ্লবে ইউরোপীয়

পাদ্রিগণের বড় মুশ্কিল হইয়াছে। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া যুগপৎ হুঃখ ও হাসির উদ্বেক হয়। হুঃখ হয় কেননা তাঁহারা চীনাগিকে ভুলাইবার জন্ত বহুবলে মাথায় সুদীর্ঘ বেণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই বহু যন্ত্রের ধন এখন কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন। হাস্তের কারণ এই যে তাঁহারা যতই কপটতা করিয়া নিজকে চীনার সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া আপন কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করুন না কেন ভবী ভুলিবার নয়।



চীনের বিদেশী কনসাল বা কমিশনারের পাকী।

চীনের উচ্চ কর্মচারীগণ এখন যখন অন্ধারোহণে কনসাল ও কমিশনারদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন ইহাদেরও এখন পাকী চড়িয়া চীনকর্মচারীদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে হইতেছে। তবে তাঁহাদের পাকী চড়িয়া যাওয়া চীনাগের ভুলান মাত্র, এ তাঁহাদের জাতীয় রীতি নহে।

পরিচ্ছদ-বিপ্লবের যে চারিখানি ছবি প্রদত্ত হইল এবং তাহার যে সামান্য বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা মাত্র সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইবে। অবশ্য ইহার মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম আছে। এ প্রবন্ধে সে সকলের বিবরণ দেওয়া নিম্নয়োজন।

ধর্মবিপ্লব।

ইহা অজীব বিশ্বয়কর ব্যাপার যে এত বড় একটা প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন রক্ষণশীল জাতির ধর্মের পরিবর্তন



রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বের চীন ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ
গ্রীষ্মকালীন টুপি ও বেগী।
ডাঃ রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত।

এত সত্তর এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। ইহাদের এই পরিবর্তনের বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের নিজের সামাজিক ও ধর্মের অবস্থার সঙ্গে যখন তুলনা করি তখন লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়। আজ আমরা দেড়শত বৎসরের অধিককাল ইংরেজের অধীন থাকিয়া, ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া যাহা করিতে সমর্থ হইলাম না, চীনারা তাহা অতি সত্তর সম্পন্ন করিল। এককাল পরে চীনারা আবিষ্কার করিয়াছে যে মন্দিরের যত দেবমূর্তি তাহার পেটে কেবল বাঁশ খড় ভিন্ন অণু কিছুই নাই। এই বাঁশ খড় ও মাটির নির্মিত দেহে কি করিয়া দেবত্ব থাকিতে পারে? সে প্রকার কল্পনা করা কেবল মূর্থতার পরিচায়ক। এই কারণে তাহারা অনেক মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।



রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বের চীন ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ
ও শীতকালীন শিরোভূষণ।
ডাঃ রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত।

কোন কোন দেবমন্দিরকে মূর্তিরূপে আবর্জনা চহিতে মূর্তি করিয়া তথায় তাঁতের আয়োজন করিয়া কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে বাহাতে জাতীয় উন্নতি হয়। কোন কোন স্থলের দেবমন্দিরে মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের আর লোকে পূজা করে না। সেদিন সম্রাজ্ঞার চিরপূজ্য দেবমূর্তি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কোন কোন মূর্তির পেটের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ড পাওয়া যাওয়ায় সেপাইগণ ধনলোভে অত্যাচার মূর্তিও আগ্রহের সহিত চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক একটা দেবমন্দির অতিশয় প্রকাণ্ড; কত লক্ষ লক্ষ টাকা সেই সকল মন্দির নির্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছে। মূর্তিসকল কত শিল্পকোশলে

নির্মিত। এখন পরিত্যক্ত হইতেছে। সেদিন এক প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরটা পর্বতের গাত্রে নির্মিত। ইহার নির্মাণ-কৌশলের সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্য মিলিত হইয়া এক অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সেই মন্দিরে এক হো-সাং বা পুরোহিত থাকেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে “মন্দিরের এখন এমন ছাড়া ছাড়া ভাব কেন?” তাহাতে তিনি কহিলেন যে “এখন আর এখানে কেহ পূজা করিতে আসে না।” এইরূপ প্রায় সকল মন্দিরের দশা হইয়াছে।

পূর্বে প্রবাসীর কোন কোন প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে “চীনার বসন্তোৎসব” বা তৃতীয় মাসিক উৎসবে “বম্বাজার ধগুরবাড়ী যাত্রা” উপলক্ষ্যে কত ধুমধামের সহিত পূজা ও মিছিল বাহির হইত, শরৎকালে রাজকর্মচারিগণ মন্দিরে গিয়া লক্ষ্মীদেবীর বা ফসলের দেবতাকে পূজা দিতেন, সে সকল আর এখন নাই। তাহা এখন অতীত ঘটনার মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে আমার স্বদেশবাসীদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে আমাদের ধর্মের নানা আবর্জনাগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া হিন্দু ধর্মকে একবার পবিত্র করা উচিত নয় কি? বাস্তবিকই সভ্য সমাজে এজন্ত লজ্জা পাইতে হয়। এই কারণেই আমরা “হিটলার” বা “আইডলেটার” আখ্যা পাইবার যোগ্য। আমরা যে ইরেজ উপনিবেশ সকল হইতে তাড়িত হই, ইহা তাহার বহু কারণের মধ্যে একটা কারণ বলিয়া বোধ হয়। চীন দেশে যে এত শীঘ্র ধর্ম ও সমাজের এত পরিবর্তন ঘটয়াছে সে অনেকটা তরবারির জোরে। কারণ দলপতিগণ যখন যাহা ঘোষণা করিবেন প্রজাসাধারণকে তাহা মানিতে হইবে। যে বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিয়া শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করা হইবে। আমাদের মানসিক ও নৈতিক বলের দ্বারা কার্য করিতে হইবে। সেই জন্ত বঙ্গীয় নব্য শিক্ষিত যুবকদিগকে অনুরোধ করি তাঁহার। যেন আপন আপন গৃহে সংসাহসের সহিত এই প্রকার সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। অথবা সভাসমিতি করিয়া আন্দোলন দ্বারা আবর্জনাগুলি দূর করেন। তাহা হইলে তাঁহাদের দেখাদেখি অপর সাধারণ

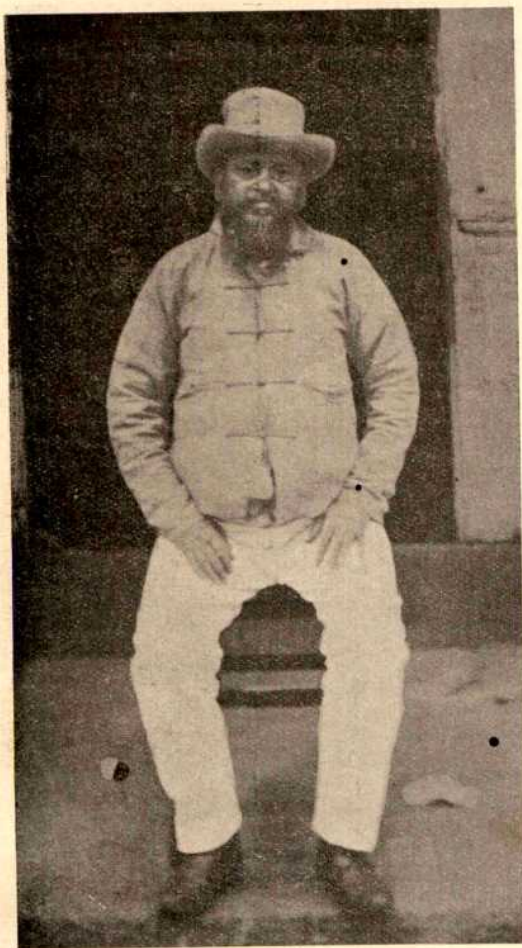


রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বেকার চীন মাণ্ডারিনের পরিচ্ছদ, শিরোভূষণ—
হাতে চীনা ছকা ও জলন্ত পলিতা।
ডাঃ রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত।

লোকে তাঁহাদের পথানুসরণ করিবে। আমি আজ এই কয়েকটা কথা এমন করিয়া লিখিতেছি তাহার কারণ দূরদেশে ৬০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর বসিয়া দূরে থাকিয়া দেশের অবস্থা যেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়, দেশে থাকিলে তাদৃশ বোধ হয় না।

সমাজবিপ্লব।

সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে খ্রীশ্চিয়ার প্রবল আকাজ্জা জন্মিয়াছে, এবং বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পুরুষের পরিচ্ছদের যে পরিবর্তন ঘটয়াছে তাহাও লিখিয়াছি। বালিকা-দিগের পদবন্ধন ধীরে ধীরে মুক্ত হইতেছে। পুরুষের মাথায় টিকির পরিবর্তে মুখে গোঁপের সৃষ্টি হইতে



রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে চীন জাতীয় পরিচ্ছদ ও বিদেশী শিরোভূষণ।

ডাঃ রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত।

আরম্ভ হইয়াছে। মাধু গবর্ণমেন্টের সময় চল্লিশ বৎসর বয়সের নিম্নে দাড়ি গোঁপ রাখার নিয়ম ছিল না। কিন্তু এইক্ষণে বিংশ বৎসরের যুবকগণ গোঁপ রাখিয়া দিতেছে। মুখে গোঁপ মাথায় টেড়ি, বিদেশী-পরিচ্ছদপরিহিত কোন চীন যুবককে হঠাৎ চীনা বলিয়া ঠিক করিবার সাধ্য এখন আর কাহারও নাই।

গত জানুয়ারী মাসে সুন-ইয়াট-সেনের টেলিগ্রাম দ্বারা আদেশ জারি হইবামাত্রই চীন দেশের সর্বত্রই জানুয়ারী মাস হইতে বৎসর গণনার চলন হইয়াছে। চীন দেশের নববর্ষ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রায় মধ্যভাগে আরম্ভ হয়। কিন্তু হঠাৎ জানুয়ারীর প্রথমভাগে চীন রাষ্ট্রবিপ্লবকারি-গণের নববর্ষের উৎসবের আয়োজন হইল। পরস্পরের



লিউ-ই-পিয়াও—হেয়ো-সেনইওং নামক বিখ্যাত আড়তের মালিক।

মধ্যে প্রীতিসন্তোষণ প্রভৃতি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহা ব্যাপার জানিলাম;—চীনে খ্রীষ্টীয় নববর্ষ হইল অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী হইতে চীন নববর্ষ গণনা করা হইবে। কিন্তু খন খ্রীষ্টাব্দ ১৯১২, অর্থাৎ চীন সন ৪৬০৯ বৎসর বলিয়া ঘোষণা করা হইল। • সুতরাং ভবিষ্যতে ৪৬০৯ বৎসর হইতে সনের হিসাব চলিবে। নূতন গবর্ণমেন্টের পুলিশ,

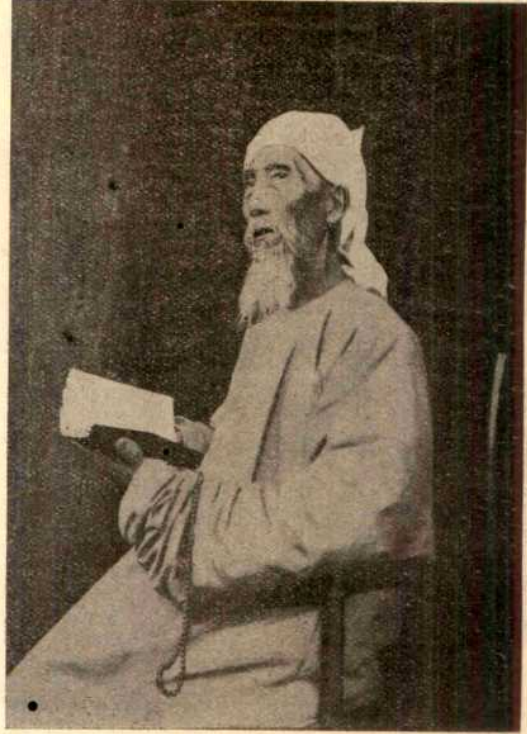
সৈন্য ও কর্মচারীগণ জাহ্নয়ারী মাসেই নববর্ষের উৎসব সাজ করিয়াছে, কিন্তু প্রজাসাধারণ তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আবার জাতীয় নববর্ষ পালন করায় একবর্ষে দুইটা নববর্ষের উৎসব হইল। তবে পূর্বে পূর্বে বৎসর সর্বসাধারণের নববর্ষে যে প্রকার আমোদ আনন্দ ও তামাশা হইত এবার তাহার প্রায় কিছুই দেখা যায় নাই। এবার নববর্ষে বা বিবাহাদি উপলক্ষ্যে পটকা পোড়ানর শব্দও শুনা যায় নাই। পূর্বে দিবারাত্রি পটকার আওয়াজে কর্ণ বধির হইত। এবার ঘোষণা দ্বারা পটকা পোড়ান রহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা হাজার হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল। আমার বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে ৬০০ টাকার পটকা পোড়ান হইয়াছিল। সেইসকল পটকার শব্দ বোমের আওয়াজের মত। যত বারুদ এই বৃথা আমোদে ব্যয়িত হইত তাহা এক্ষণে স্বদেশ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইবে।

বিবাহে পূর্বে ঢোল বা কাড়া বাজিত, এখন তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। এখন অনেকে আমাদিগকে সেলাম করিতে হইলে মাথার টুপি তুলিয়া সেলাম করে এবং সম্রাট লোকের আগমনে করমর্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদ্রোহের পূর্বে ছই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অবনত ভাবে অভিবাদন করিবার নিয়ম ছিল।

এখন চীনাদের সাহেবী ধরণে আহার করিবার লালসা হইয়াছে। গত জাহ্নয়ারী মাসে একজন কর্মচারী সরদার চাং প্রভৃতিকে ভোজ দিলেন। সেইজন্য আমার নিকটে কাঁটা চামচ ও প্লেট প্রভৃতি সরঞ্জাম চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শাসন-প্রণালী।

যদিও নামে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে কিন্তু কার্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা ত স্বেচ্ছাচার বলিয়াই বোধ হয়। তবে ইহাকে সৈনিক-শাসন বা মার্শাল ল বলা যাইতে পারে। কিন্তু মার্শাল ল দ্বারা শাস্তি বিধান করিতে হইলে কোর্ট মার্শাল দ্বারা অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তার পর তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে অর্থাৎ টেক্সিয়ে অঞ্চলে সে প্রকার কোন



চীনের মুসলমান।

কোর্ট নাই। বিদ্রোহী সরদারের মুখের কথাই আইন বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই শাসনপ্রণালীর কয়েকটা নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি প্রকারের শাসনপ্রণালী এখানে চলিতেছে।

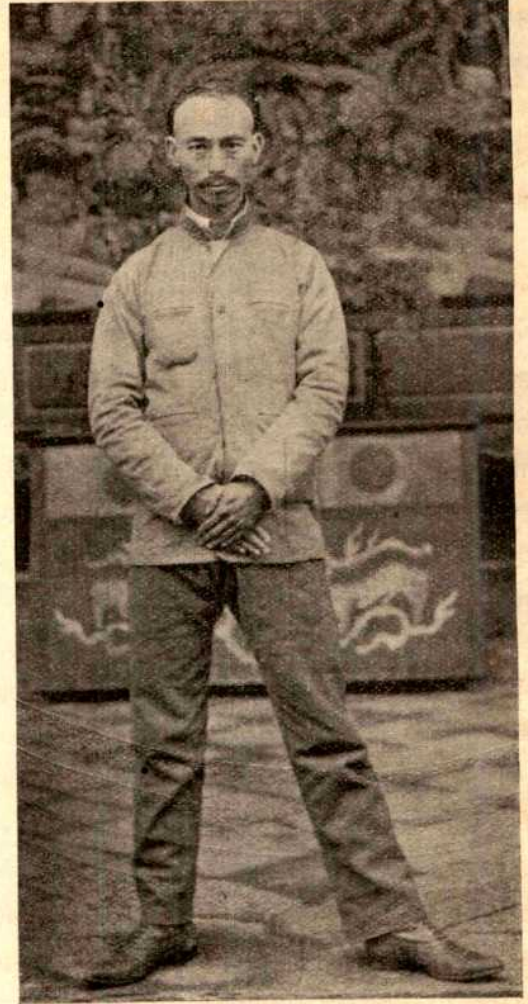
১। লিউ-ই-পিয়াওর কথা—এখানকার হোয়াং-সেন-ইওং নামক বিখ্যাত আড়তের মালিক এই ব্যক্তি। ইনি খুব ধনী সওদাগর, চীন ও ব্রহ্ম দেশের বহুস্থানে ইহার কারবার আছে। বিদ্রোহের পর এই ব্যক্তি পলাইয়া ভামো গিয়াছিলেন। ইহাকে সরদার চাং ফাঁকি দিয়া টেক্সিয়ে আনান। আমরা যখন আসি সেই সঙ্গে ইনিও আসেন। এখানে আসিবামাত্র ইহাকে বন্দী করিয়া লইয়া শিরশ্ছেদের ভয় দেখান হয়। অবশেষে প্রায় ৭৫,০০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া তবে ছাড়িয়া দিয়া এক প্রকার নজর-বন্দী ভাবে ইহাকে রাখা হইয়াছে। অপরাধ, কেন তিনি পলাইয়া ভামো গেলেন। এইটা হইল প্রকাশ্য অপরাধ। গোপন অপরাধ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা লগ্না। সরদার

চাংএর পিতার ঔষধের দোকান ও বাড়ী ছিল। সেই বাড়ী দেনার জন্ত লিউ-ই-পিয়াওর নিকট প্রথমে বন্ধক থাকে পরে দেনার দায়ে উহা বিক্রয় হইয়া যায়। এই বাড়ীতেই ইহার আড়ত। সেই জন্ত চাংএর ক্রোধ।

পরে জেনারাল লি-কেন-ইয়ে আসিলে ইহার বিরুদ্ধে আর এক প্রকাশ্য অপরাধ আবিষ্কৃত হয়, তাহা চোরাই মাল রাখা। গোপনীয় অপরাধ চীনাদের মুখেই শুনিতে পাই। ইনি ঐ জরিমানার টাকার কতক রেহাই পাইবার জন্ত গোপনে নাকি কনসালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই অপরাধে ইহার শিরশ্ছেদ করিবার আয়োজন হইয়াছিল। ইনি তাহার সন্ধান পাইয়া রাত্তিকালে পলাইয়া পাহাড় জঙ্গল দিয়া ভামো গিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছেন কিন্তু ইহার ভাইকে অদ্যাবধি বন্দিদশায় রাখিয়াছে। ইহার কারাবাস বন্ধ, বাড়ীর পরিবারবর্গ দেশছাড়া হইয়াছে, পুলিশে সব শিল মোহর দিয়া বন্ধ রাখিয়াছে। জরিমানার অর্দ্ধেক টাকা ইনি পূর্বেই দিয়াছিলেন।

২। লোং-লিং-টিং বা লোং-লিংএর মাজিষ্ট্রেট। লোং-লিং এখান হইতে তিন দিনের পথ। তথা হইতে নাকি ইনি এক টেলিগ্রাম লিখিয়া ইউনানফুর জেনেরালের নিকট পাঠান। তাহাতে নাকি সরদার চাংএর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে ঐ টেলিগ্রাম সরদারের হাতে পড়ে। তিনি লোং-লিংএর মাজিষ্ট্রেটকে ফাঁকি দিয়া আনাইয়া তাঁহাকে কয়েদ করেন এবং তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবেন এমন আয়োজন হয়। পরে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ জেনারাল চাং জামিন হইয়া ইহাকে মুক্ত করেন। কিন্তু আবার কোন কথায় উত্তেজিত হইয়া ইহাকে এক মন্দিরের আগ্নার ভিতর বহু সম্রাস্ত লোকের সম্মুখে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হয়। এই ঘটনায় বহু লোকের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল।

৩। টু-ইন-লিয়াল—এই ব্যক্তি মুসলমান। বিদ্রোহের পর টেঙ্গিয়ের সৈন্ত যখন ইউনটাং-ছ-ফু শহর আক্রমণ করে, তখন তথাকার সৈন্তের সেনাপতি মিঃ ল'র বিরুদ্ধাচরণ করায় এই ব্যক্তি শঠতা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করে। সরদার চাং এই কার্যে খুসি হইয়া টু-ইন-লিয়ালকে ঐ স্থানের ৫০০ সৈন্তের অধিপতি নিযুক্ত করেন। ইহার পর টু-ইন-



কর্ণেল ছেন-চিন-খোয়ে।

লিয়ালকে শোয়েলিন্-ফু নামক স্থানের হুঙ্কে প্রেরণ করা হয়। টু নাকি পথে লোকের উপর বড় অত্যাচার করিয়াছিল এবং লোকের অর্থ ও সম্পত্তি হরণ করিয়াছিল এই বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। সরদার চাং মা-তে-ইন নামক অপর এক মুসলমানকে লিখিয়া ফাঁকি দিয়া টুকে আনিবার জন্ত বড়যন্ত্র করেন। টু কিছুতেই টেঙ্গিয়ে যাইতে স্বীকৃত হয় না। অবশেষে মা-তে-ইন ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া রাজি করে। টুকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্ত মা-চাং-পিয়াও নামক আর এক মুসলমানকে টেঙ্গিয়ে হইতে

পাঠান হয়। টেক্সিয়ে হইতে এক দিনের পথে কাং-লাং-চাই নামক স্থানে ইহাদের সাক্ষাৎ হয়। সরদার চাং মা-চাং-পিয়াওকে গুপ্ত আদেশ দিয়াছিলেন যে টুকে হত্যা করিয়া তাহার মাথা টেক্সিয়ে লইয়া আসিবে। কাং-লাং-চাই নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর শিষ্টাচারের পর, মা-চাং-পিয়াও হঠাৎ পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া টুকে গুলি করে। গুলি টুয়ের পশ্চাৎ-দেশ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, এবং টু ধরাশায়ী হইবামাত্র মা-চাং-পিয়াও শিকার মিলিয়াছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া মুণ্ড লইবার জন্ত তরবারি আনিতে যায়। যেই মা তরবারি লইয়া টুয়ের গলায় কোপ মারিতে উত্তম অমনি টু শায়িত অবস্থাতেই আপন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া এক গুলিতে মা-চাং-পিয়াওকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে। পিস্তলের গুলি ইহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। অবশ্য এই কাণ্ডের পরে অগ্ন্যগ্ন লোকে টুর শিরশ্ছেদ করে। অবশেষে টুর মাথা ও মা-চাং-পিয়াওর লাশ টেক্সিয়ে প্রেরিত হয়। মা-চাং-পিয়াওর লাশ মুসলমানদিগের মসজিদে আনীত হইয়াছিল; আমরা গিয়া দেখিয়াছিলাম।

এইরূপে প্রায় প্রত্যহ দুই একটা লোকের মাথা কাটা বাইতে লাগিল। তাহার তখন চাংকে নৃশংস ও বিশ্বাস-ঘাতক মনে করিয়া নানা নিন্দা করিতে লাগিল। তখন ইউনান-ফু হইতে জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে এখানে পৌছিবার কথা শুনা গেল। সকলে মনে করিলাম যে জেনেরাল লি আসিলে অনেকটা আসান হইবে। লোকে স্তুতিচার পাইবে।

১লা ফেব্রুয়ারী জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে অতি আড়ম্বরের সহিত বহু সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া এখানে পৌছিলেন। তাঁহার পৌছিবার দুই দিন পূর্বে টালিফুর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, কর্ণেল ছেন-চির-থোয়ে পলাইয়া বন্দী যান। কারণ লি-কেন-ইয়ে ইহার শিরশ্ছেদ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির বিষয় পরে উল্লেখ করা যাইবে।

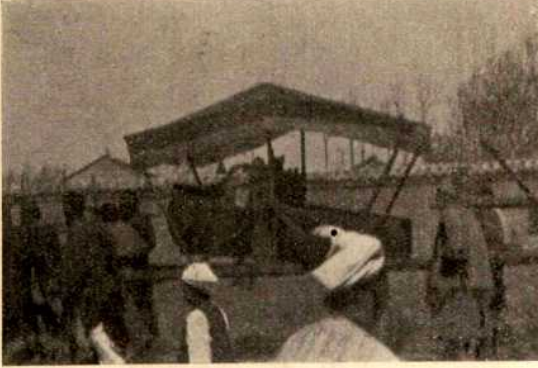
লি-কেন-ইয়ে আসিবার কয়েকদিন পরেই তাঁহার



তৌ-ছোয়েন-ইয়ে - ছোয়ে-ইয়েন-চী নামক প্রসিদ্ধ
ব্যাঙ্কের একজন মালিক।

হুকুম চণ্ড খাওয়ার অপরাধে দুইজন লোকের উপরকার ওষ্ঠ কাটিয়া দেওয়া হয়, দুই একজন লোকের শিরশ্ছেদ হয়, এবং তের জন লোকের জুয়া খেলার জন্ত কান কাটিয়া দেওয়া হয়।

৪। তৌ-ছোয়েন-ইয়ে—এই ব্যক্তি এখানকার ছোয়ে-ইয়েন-চী নামক প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের একজন মালিক। কাষ্টম আফিস ও কনসালের টাকাকড়ির কার্য এই ব্যাঙ্কে হয়। কাষ্টম আফিসের সাহেবেরা কার্য বন্ধ করিয়া এখন ভামো বান তখন আয়ের হানি হইল মনে করিয়া সরদার চাং-ওয়েন কোয়ান ইহাকে কাষ্টম গুল্ক আদায়ের ভার দিয়া কমিশনারের কার্যে নিযুক্ত করেন। ইনি কিছুদিন মহাগর্ভে হাট কোট ও বুট পরিয়া কমিশনার সাক্ষিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে কাষ্টম আফিসের সাহেবগণ আসিয়া পুনরায় কার্য আরম্ভ করিলেন। তখন



শবাধার বহন।

মিঃ তৌয়ের কার্য্য গেল। ইহার কয়েকদিন পরেই শুনিতে পাইলাম যে লি-কেন-ইয়ের আদেশে ইহাকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ আমার একটা ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে তৌ-ছোয়েন-ইয়েকে ইয়ামিন হইতে বাজারের মধ্যে লইয়া শিরশ্ছেদ করিবার আয়োজন হইয়াছিল এবং তাঁহার কফিন বা শবাধার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। ইতি-মধ্যে সরদার চাং দৌড়িয়া গিয়া জামিন হওয়ায় প্রাণদণ্ড হইল না। ইহার পর এই ব্যক্তিকে এক কাঠের খাঁচার মধ্যে বসাইয়া গলা আবদ্ধ করিয়া বাজারের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইয়াছে। রোজ বৃষ্টি সমস্তই ইহার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে। স্বচক্ষে লোকটার এই দুরবস্থা দেখিলাম। ইনি লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামলাল সরকার।

কবির দুঃখ

(হাইন হইতে)

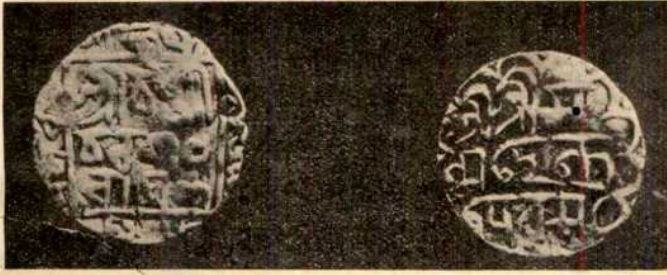
আমি যদি পার্ভাম হ'তে মন্ত একটা শিল্পীরে,
এল্লিধারা আঁকতাম সব ছবি,
যে সাজিয়ে তাই রাখত সবাই রাজপ্রাসাদে, মন্দিরে,—
যুচে যেত দৈত্য দুঃখ সবি'।

বেহালা আর বাঁশী নিয়ে পার্ভাম যদি তুলতে তান,
তুলতাম আমি এল্লিতর সুর,
যে রাজারাজড়া মিলে সবে বাড়িয়ে দিত আমার মান,—
দৈত্যদশা হ'ত আমার দূর।
কিন্তু হায় কবিতা, স্রুথের মুখ দেখতে আমার হবে নাগো,
তোমায় যখন সার করেছি আজ,—
এল্লি হায় বিশ্বমাঝে তুষ্টিহীনা তুমি মাগো,
এল্লি তোমার আপুথোরাকৌ কাজ!
সবাই যখন থাকে মদ—থাকে বেশ গ্রাসভরা,*
তখন—(লাজের কথা বলব আমি কারে?)—
আমায় খুসী থাকতে হবে একেবারেই মদছাড়া,
নেহাইৎ যদি খেতে হয়ত—ধারে!
শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

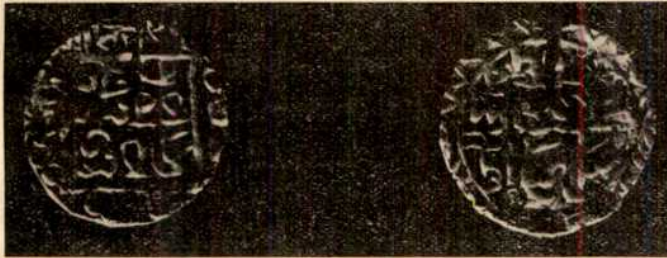
দনুজমর্দন দেব

গত কয়েক বৎসরাবধি আমি যশোর-খুলনার ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের কার্য্যে ব্রতী আছি। তজ্জন্ত প্রাচীন কীর্ত্তির অনুসন্ধানার্থ আমাকে মাঝে মাঝে সুন্দরবনেও যাইতে হইয়াছে। গত বৎসর পৌষমাসে বড়দিনের বন্ধে আমি স্বনামধন্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের উত্তোগ ও সাহায্যে একবার সুন্দরবনে যাত্রা করি। ডাক্তার রায়ের জ্যেষ্ঠভাতা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় রূপা করিয়া আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমরা ১১ জনে ছোট বড় ২ খানি নৌকায় পর্য্যাপ্ত আহাৰ্য্য ও অস্ত্রাশ্রয় সরঞ্জাম লইয়া যাত্রা করি এবং চাঁদখালি দর্শন করিয়া কালকীর খাল ও চেউটা নদী দিয়া খোলপেটুয়া নদীতে পড়িয়া গত ১৯১১ অব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বিছটগ্রামে পৌঁছি। এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড ডক বা পোতাশ্রয় ও অস্ত্রাশ্রয় কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। তথা সংগ্রহের জন্ত আমি ঐ দিন প্রাতে নিকটবর্ত্তী বাহুদেবপুর গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় একটি মুসলমান কবর খনন করিবার সময়ে একটি প্রাচীন মূর্ত্তা প্রাপ্ত হয়। মূর্ত্তাটি সে উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়কে দেয়।

* আহা, কি দুঃখ গো!



শ্রীমহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত পাণ্ডুনগরের মুদ্রা।



দমুজমর্দনদেব নামাঙ্কিত পাণ্ডুনগরের মুদ্রা।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু দয়া করিয়া উহা আমাকে দিয়াছিলেন। তখন উহার লেখা পড়িতে পারা যায় নাই। পরে দৌলতপুরে আসিয়া মুদ্রাটি পরিষ্কার করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করা হয়।

মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে :—“শ্রীদমুজমর্দন দেব।” এবং অপর পৃষ্ঠায় আছে—“শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ—শকাব্দ ১৩৩৯—চন্দ্রদ্বীপ”। ইহার মধ্যে “শকাব্দ”র “শ”টির কতকংশ ও চন্দ্রদ্বীপের “প”টি মাত্র কাটা গিয়াছে। অল্প অক্ষরগুলি বেশ পড়িতে পারা যায়। শীঘ্রই ইহার ফটো প্রকাশিত করিব। এই মুদ্রাটির প্রকৃত অবস্থা ও অকৃত্রিমতা বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বিশিষ্ট কন্সার্বাটর, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, মহাশয় স্বীয় অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইবেন। আমি উহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ২১টি কথা বলিব।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে বা তদনুরূপ অল্প কোন স্থানে একরূপ মুদ্রা সংগৃহীত হয় নাই। মালদহনিবাসী প্রব্রতন্ত্ববিৎ স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে “পাণ্ডুনগরের মুদ্রা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ

পাঠ করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে যে দুইটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শন করেন তাহার একটি সম্বন্ধে তিনি বলেন “২৩৯ শকাব্দ বা ৩১৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুনগরের রাজা দমুজমর্দন দেব রাজত্ব করিতেন।”* আমি সে মুদ্রাটি দেখি নাই, সম্ভবতঃ উহার কোন ফটো এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমার বিশ্বাস উক্ত মুদ্রায় পাণ্ডুনগরের কোন উল্লেখ নাই; ৬রাশেখাব্দ শকাব্দের নির্দেশে “২৩৯” এইরূপ পাঠোদ্ধার করিবার সময় একটি ৩ কেও ২এর মত পড়িতে পারেন এবং উক্ত ২ এর বামভাগে একটি ১ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। সুতরাং সে মুদ্রারও তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দা ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। অল্প কুত্রাপি দমুজমর্দন দেবের মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

মালদহের মুদ্রায় বাহাই থাকুক, আমার মুদ্রায় ১৩৩৯ শকাব্দা, দমুজমর্দন দেব এবং চন্দ্রদ্বীপ এই তিনটি বিষয়ই সুস্পষ্ট ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখা যায়। মুদ্রাটি অকৃত্রিম তাহা শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু সপ্রমাণ করিবেন এবং মুদ্রার প্রমাণ যে অকাট্য তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই স্বীকার করিবেন। দমুজমর্দনের “দেব” উপাধি কায়স্থবাচক; এখনও তাঁহার কায়স্থ বংশধরগণ বরিশালের সন্নিকটে দীনভাবে দিন যাপন করিতেছেন। “চণ্ডীচরণপরায়ণ”—বিশেষণে দমুজমর্দন যে হিন্দু এবং শাক্ত নৃপতি ছিলেন, তাহার প্রমাণ দিতেছে। সুতরাং বর্তমান মুদ্রা হইতে সহজেই নির্দেশ করিতে পারি যে দমুজমর্দন দেব নামক একজন প্রবল প্রতাপাধিত শাক্ত কায়স্থ নৃপতি ১৩৩৯ শকে বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা যে মুদ্রা ছাপিতেন না, তাহা সত্য নহে। দমুজমর্দনের নিজেরই মুদ্রা পাওয়া গেল।†

এক্ষণে এই দমুজমর্দন কে? তিনি কোথা হইতে

* শ্রীহরিন্দাস পালিত প্রণীত “মালদহের রাধেশচন্দ্র”—২৯ পৃঃ।

† বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১৫৯ পৃঃ।

আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিলেন? এ সম্বন্ধে অনেকগুলি মত আছে। আমরা এক একটি করিয়া সংক্ষেপে সবগুলি বিচার করিব।

(১) “বল্লালসেনের কায়স্থজাতীয়া উপপত্নীজাত পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দম্বজদমন রায় তাহার বংশধর।”* (অবশ্য এস্থলে দম্বজমর্দন ও দম্বজদমন অভিন্ন ব্যক্তি ধরিয়া লওয়া হইতেছে)। এই মতের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। যদিও এই মতের পরিপোষক গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে শপথ করিয়া বলিতেছেন যে তাহার পুস্তকে “সম্পূর্ণ অমূলক কোন বৃত্তান্ত নাই”, তবুও আমরা ইহার প্রমাণের সন্ধান পাইলাম না। বিশেষতঃ ইহাতে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। প্রমাণ অভাবে আমরা এমত পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন সমগ্র বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজ। লক্ষ্মণসেনের কয়েকটি পুত্র ছিলেন—মাধবসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন। খিলিজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন পুরুষোত্তম প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন। মাধবসেন হিমালয় অঞ্চলে পলায়ন করেন; কুমায়ুনে কেশবসেনের তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে।† বিশ্বরূপ পূর্বে হইতে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। কেশবসেন বঙ্গবিজয়ের কিছুদিন পরে পলায়ন করিয়া বিশ্বরূপের নিকট যান। বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর কেশবসেন অল্পকাল রাজত্ব করেন।‡ পরে বিশ্বরূপের পুত্র দম্বজমাধব রাজা হন। কেহ আবার অনুমান করেন, লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র ছিল তাহার নাম সদাসেন। দম্বজমাধব তাহার পুত্র যখন স্পষ্ট জানা যায় না তখন তিনি সদাসেনেরই পুত্র।** আবার কেহ বলেন লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেনই রাঢ়ীয় কুলজীগ্রন্থে

দনোজা মাধব নামে উক্ত হইয়াছেন।* পরে দেখা যাইবে একথা সত্য হইতে পারে না। বাহা ইউক, দম্বজমাধব যাহারই পুত্র হন, তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা নানা নামে পরিচিত হইয়াছেন। দম্বজ, দনোজা, ধিমুজ রায় (Stewart), নোজা (Raja Nodja, Tieffen-thaler), নোজা (আবুল ফজল), দম্বজ রায় (Jiad-din Barni and Elliot), দনোজামাধব বা দম্বজমর্দন দেব রায়, ও দম্বজদমন—এসকলই অনেকের মধ্যে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। অর্থাৎ বিক্রমপুরের দম্বজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দম্বজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি।† দম্বজমাধব বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার রাজত্বকালে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বুলবন পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মম্বিনুদ্দীন তোগরলের দমন জন্ত স্বয়ং বঙ্গদেশে আসেন। এসময়ে দম্বজমাধব সৈন্ত দিয়া নৌপথে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।‡ দম্বজরায়ের সহিত বুলবনের সন্ধি হয়। কিন্তু তৎপরে অল্পদিন মধ্যে পূর্ববঙ্গের অনেকস্থান মুসলমান অধিকার ভুক্ত হইলে, দম্বজমাধব চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন পূর্বক নূতন সিংহাসন পাতিয়া বসেন। তিনি তাহার গুরুদেব চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর নির্দেশানুসারে যে নবোথিত দ্বীপে রাজ্যস্থাপন করেন, উহার নাম তিনি গুরুদেবের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ রাখিয়াছিলেন।** চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়গণ সকলেই এই দম্বজমাধব বা দম্বজমর্দনের বংশধর। এই রাজবংশীয় কেহ কেহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাহারা গোষ্ঠীপতি কায়স্থ। স্মরণ্য

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২১ পৃঃ।

† “The Emperor occupied Sonargaon having been joined in advance by Dhinwaj Rai, Zamindar of the city, with all his troops. This is probably the same person as Dhinaj Madhub who is believed to have been a grandson of Ballal Sen”—Dr. Wise, I. R. A. S. 1874, No. 1, p. 83.

“It is not improbable that the founder of this family (Chandradwip family) is the same person as the Rai of Sonargaon by name Dhanuj Rai”—Dr. Wise, J. R. A. S., 1874, No. 3, p. 206.

See also N. N. Vasu, J. R. A. S. 1895, No. 1, p. 35.

‡ সীতেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বঙ্গীয়-সমাজ, ৭৯ পৃঃ।

† Stewart's History of Bengal (Bangabasi Edition, p. 82), Elliot Vol III. p. 116.

** শ্রীব্রজমুন্দের মিত্র কৃত “চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ”।

* শ্রীচুগাঁচল সাহায্য প্রণীত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১১৯ পৃঃ এবং গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

† Journal of the Asiatic Society, of Bengal Vol. Lxv, part I, p. 28 এবং বিক্রমপুরের ইতিহাস, p. 43.

‡ আখ্যাবর্ত্ত, চন্দ্রদ্বীপ প্রবন্ধ, কান্দিন, ১৩১৮—৮১৯ পৃঃ।

* N. N. Vasu—J. B. A. S, Vol, LXV, part I, p. 32.

এতদ্বারা বল্লালসেন যে কায়স্থ তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ প্রমাণ-বলে শ্রীবৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সুবিধাত “বিশ্বকোষে” বল্লালের কায়স্থত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন কিনা তাহা প্রতিপন্ন করা বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তিনি কায়স্থ ছিলেন না, একথাও আমি এখানে বলিতেছি না। তবে আমরা এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বিক্রমপুরের দমুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দমুজমর্দন এক ব্যক্তি নহেন।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে দমুজমাধব কাহার পুত্র তাহাই স্থির হইতেছে না। কেহ বলেন তিনি লক্ষণসেনের পুত্র মাধবসেন; কিন্তু ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয়ের সময়ে যিনি পরিণত বয়স্ক, তিনি তাহার ৮২ বৎসর পরে বুলবনের সময়ে জীবিত থাকিতে পারেন না। আবুলফজল লক্ষণের পুত্র সদাসেনের নাম করিয়াছেন,* দমুজ যে সদাসেনের পুত্র তাহা অসম্ভব মাত্র। আবার হরিমিশ্রের কারিকার প্রমাণ হইতে দমুজের পিতামহ বলিতে লক্ষণসেনকে না বুঝাইয়া বল্লালকে বুঝান বিচিত্র নহে†। বিশ্বরূপের পরে তিনি পূর্ব বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি বিশ্বরূপের পুত্র তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। সেন বংশেই যখন দমুজমাধবের পুত্রত্ব এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ, তখন তাঁহার উপর আবার অগ্র একবংশের পিতৃত্ব আরোপ করা সমীচীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ নগেন্দ্রবাবু ঘটককারিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দমুজমর্দনের বংশীয় জয়দেবকে “চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো দেববংশ সমুদ্ভবঃ” বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে “পুনশ্চ” দিয়া ফরিদপুরের এক বৃদ্ধ ঘটকের লিখিত বংশাবলী হইতে দেখাইতেছেন যে উক্ত পংক্তি “চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো সেনবংশ সমুদ্ভবঃ”—এইরূপ হইবে।‡ সেনকে দেব করিবার চেষ্টার মত “দেব” ও যে দৈবাৎ “সেন” হইয়া পড়িতে পারে, তাহা বিচিত্র নহে। মোটকথা শেষোক্ত পংক্তিতে “সেন” শব্দ যে প্রকৃষ্ট হইতেই পারে না, ইহা বলিতে পারি না।

* Tarret, Ain-i-Akbari, Vol. II, p. 146.

† J. R. A. S., 1896, No. 1, p. 32; বারভূঞা, আনন্দনাথ রায়, ১১৮ পৃঃ

‡ J. R. A. S., 1896, No. 1, p. 33-37.

তৃতীয়তঃ নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বলিতেছেন যে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বুলবনের আক্রমণের পর ২০ বৎসরের মধ্যে দমুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতেও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশের রাজ্য শেষ হয়। তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইক যে দমুজমাধবও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর ক্রমে ৪ জন চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। পঞ্চম রাজার নাম পরমানন্দ রায়। ৪ জনের রাজত্বকাল মোট ১৫০ বৎসর ধরা যাইতে পারে।* পূর্বে বলা হইয়াছে যে দমুজমাধব ১২৫০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন, সুতরাং তিনি ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। যদি তাঁহার রাজত্ব আরও ১৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে পরমানন্দের রাজত্ব ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু আইন-আকবরিতে পাইতেছি যে আকবরের রাজত্বের ২৯শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাকলায় (চন্দ্রদ্বীপে) যে জলপ্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় স্তম্ভ বয়স্ক যুবরাজ†। তাহা হইলে এই ১২০ বৎসর কালের কি গতিবিধান করা যায়, বুঝিতে পারিতেছি না।

চতুর্থতঃ, পরমশ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীবৃদ্ধ নিখিলনাথ রায় মহাশয় দেখাইতেছেন যে লক্ষণসেনের পলায়নের পর তাঁহার বংশীয়গণ ১২০ বৎসর বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। পরে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গে সেন রাজত্ব ছিল। তাহা হইলে ৬৮ বৎসর রাজত্বের পর অতিবৃদ্ধ দমুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন বলিতে হয়। ইহা সম্ভবপর কিনা বিবেচ্য। ইহা গ্রাহ্য হইলেও পরমানন্দ রায়ের রাজ্যারম্ভ ও জলপ্লাবনের মধ্যবর্তী ১০২ বৎসরের সময়কাল করা যায় না।

পঞ্চমতঃ, কেহ কেহ বলিতেছেন দমুজমাধব সেনবংশীয় শেষ স্বাধীন নৃপতি। তাঁহার পর সেনবংশীয়েরা কেহ বিক্রম-

* আর্ধ্যাবর্ত, ১৩১৮ খ্রিঃ, ৮১৪ পৃঃ

† Gladwin's Ain-i-Akbari published by I. P. Society, p. 304.

Beveridge, Bakargunj, p. 27.

‡ প্রতাপাদিত্য (নিখিলনাথ রায়) উপক্রমণিকা ৬৭ পৃঃ

Article on Bengal (Imperial Gazetteer, Revised Edition.)

পুরে রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাবা আদম নামক একজন ক্ষমতাশালী দরবেশ রামপালের নিকটবর্তী আবহুল্যাপুরে আসিয়া গোহত্যা প্রভৃতি দ্বারা যখন হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন, তখন সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন ক্রোধাক্ত হইয়া বাবা আদমকে হত্যা করেন। রামপালে বাবা আদমের মসজিদ আছে। উক্ত সেনরাজ দলুজরায়ের বংশধর পোড়ারাজা বা দ্বিতীয় বল্লালসেন। গোপাল ভট্ট নামক তাঁহার একজন শিক্ষক বল্লাল-চরিত নামক পুস্তকে এই দ্বিতীয় বল্লালের চরিতকথা লিখিয়াছেন। এই পুস্তক ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।* যে দলুজরায়ের বংশধরগণ সপ্রত্যাপে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি তাহার প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে কিরূপে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিলেন ও চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার বংশীয় রাজগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন, ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

বৃষ্টতঃ, সমস্ত সন্দেহের নিরসন পক্ষে আমার নববিষ্কৃত মুদ্রাই অকাটা প্রমাণ। এ মুদ্রায় দলুজমর্দনের তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দা বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ স্পষ্ট রহিয়াছে। যে দলুজমাধব ৩০ বৎসর রাজত্বের পর ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আর ১৩৭ বৎসর পরে বাঁচিয়া থাকিয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

সুতরাং নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হইল যে বিক্রমপুরের দলুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দলুজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। বিক্রমপুরের সেনবংশীয়দিগের সহিত চন্দ্রদ্বীপের বঙ্গজ কায়স্থকুলোদ্ভব দেববংশীয় দলুজমর্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। “নামের সাদৃশ্য ব্যতীত দনৌজমাধব ও দলুজমর্দনের একব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই।”† সুতরাং যাহারা এই দুইজনকে একই ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সেনবংশীয়দিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন

করতঃ বঙ্গীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ হইবে এবং মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। মানুষের জীবনে মতের পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী। মত থাকিলেই তাঁহার পরিবর্তন হয়। সুতরাং আশা করি, সহৃদয় ঐতিহাসিক মহাত্মাগণ আমার নববিষ্কৃত মুদ্রাটির প্রকৃত তথ্য নির্ণয় পূর্বক উহার প্রমাণ বলে স্বীয় স্বীয় পূর্ব মতের প্রত্যাহার করিবেন।

(৩) চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও যে কয়েকটি প্রবাদ আছে, তন্মধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। একদা চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক একজন যোগশক্তি-সম্পন্ন সন্ন্যাসী গুরু তাঁহার প্রিয় ভৃত্য দলুজমর্দন দেবকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হন এবং রাত্রিকালে বর্তমান বরিশালের সন্নিকটে অতি প্রশস্ত সুরঙ্গা নদীর মধ্যে নৌকা বাধিয়া থাকেন। নিশীথে তাঁহার স্বপ্নাদেশ হয় যে সেইস্থানে জলমধ্যে কয়েকটি দেববিগ্রহ আছে, উহা যেন তিনি তুলিয়া লন। পরদিন প্রাতে গুরুর আদেশে দলুজমর্দন ঐস্থান হইতে দুইটি দেবমূর্তি উত্তোলন করেন, এখনও চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশীয়েরা উহার সেবা করিতেছেন। গুরুদেব দলুজমর্দনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ-পূর্বক বলিলেন যে ঐস্থানে শীঘ্রই এক দ্বীপের উদ্ভব হইবে এবং দলুজমর্দন তথায় রাজা হইবেন। অচিরে মহাবৌদ্ধের আশীর্বাদবাণীর সত্যতা প্রমাণিত হইল। ভাগ্যপুষ্ট তত্ত্ব শিষ্য গুরুদেবের নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম রাখিলেন—চন্দ্রদ্বীপ। এই দলুজমর্দনই সুবিখ্যাত চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের স্থাপয়িতা। তিনি প্রবল প্রত্যাপে বহু বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনিই বাকলা সমাজকে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় করেন। তিনি বঙ্গের একাংশে এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র।

* শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৫২ পৃঃ ও ৭৫ পৃঃ, J. R. A.S. Vol. XIII, part I, page 285.

† গোড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ।

দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব

পূর্ব প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যে নব আবিষ্কৃত মুদ্রাটির কথা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। মালদহে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বর্গগত স্বনামধন্য রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় দুইটি রজত নিশ্চিত মুদ্রা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি দনুজমর্দনদেবের ও অপরটি মহেন্দ্রদেবের। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাটির আলোচনা করিতে হইলে রাধেশ বাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাদ্বয়ের আলোচনাও করা উচিত। স্বর্গীয় রাধেশ বাবু মৃত্যুর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখার পত্রিকায় মুদ্রাদ্বয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এবং উহা-দিগের আলোক চিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গত ১৩১৭ সালের ২৬শে পৌষ তারিখে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়দিগের সহিত আমি এই মুদ্রাদ্বয় পরীক্ষা করিয়াছিলাম। রাধেশ বাবু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে রাধেশ বাবু মুদ্রাদ্বয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় উপহার প্রদান করিবার জন্ত কলিকাতায় আনিয়াছেন। ইহার দুই তিন দিন পরেই রাধেশ বাবুর মৃত্যু হয় এবং তাহার পর হইতেই মুদ্রাদ্বয়ের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার, এম, এ, মহাশয় ও মালদহের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ, বি, এল, মহাশয়ের নিকট সন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে উক্ত মুদ্রাদ্বয় রাধেশ বাবু কর্তৃক কোন স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। গতান্তর না থাকায় রাধেশ বাবু কর্তৃক প্রকাশিত আলোক চিত্র অবলম্বনে মুদ্রাদ্বয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে। এই মুদ্রা দুইটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখার তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে ১৩১৭ সালের ১৯শে ভাদ্র

রবিবারে প্রদর্শিত হইয়াছিল। রাধেশ বাবু লিখিয়াছেন এই দুইটি মুদ্রা পাণ্ডুর আদীনা মসজিদের উত্তর-পূর্বাংশে নৃত্যাসিক দুই ক্রোশ মধ্যে সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে হলচালকের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং সাঁওতাল কৃষক তাহা গাজোল হাটে বিক্রয় জন্ত লইয়া গেলে, পুরাতন মালদহের একজন দোকানদার তাহা খরিদ করে। দোকানদারের নিকট মালদহের “গোড়দুত” নামক সাপ্তাহিক পত্রের কার্যাব্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেন।* রজত মুদ্রা দুইটি গোলাকৃতি, দনুজমর্দনদেবের মুদ্রার ওজন ১৬৭ গ্রেণ ও পরিধি ৩৬ ইঞ্চি এবং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার ওজন ১৭০ গ্রেণ ও পরিধি ৩৬ ইঞ্চি।

(১) দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা :—

আকার প্রায় গোল, ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি ৩৬ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠ :—

বৃত্ত মধ্যে বঙ্গাক্ষরে (১) শ্রীশ্রীদ

(২) নুজমর্দ

(৩) ন দেব

বৃত্তের বহির্ভাগে যে স্থান আছে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখায় পরিপূর্ণ। বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা নাসিরউদ্দিন মহমুদ শাহের একটি রৌপ্য মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে বৃত্তমধ্যে এইরূপ খোদিত লিপি ও তদ্বহির্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখাঙ্কণ আছে।† এই, পৃষ্ঠের খোদিত লিপি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই, কেবল স্থানাভাবে প্রথম পংক্তির “দ” বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ :—

চতুষ্ক মধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী

(২) চরণ প

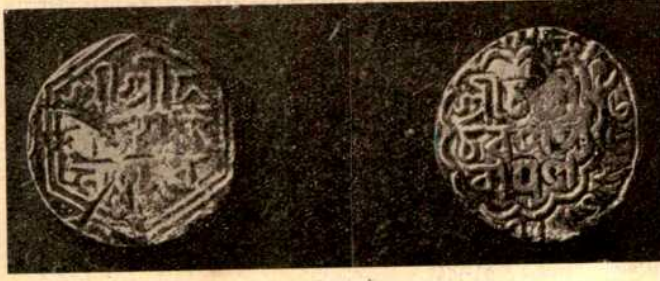
(৩) রায়ণ

চতুষ্কের উর্দ্ধে “পাণ্ডু”

চতুষ্কের বামে “নগর,”

* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৭০-৭৪,

† Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, Part II, p. 164-66, No. 131, Pl. IV.



শ্রীদম্ভজমর্দনদেবের নামাঙ্কিত চন্দ্রবীপের মুদ্রা-শকাব্দা—১৩৩৯।

নিম্নে “শকাব্দা”

ও দক্ষিণে “৩৩৯” আছে।

এইগুলি বুস্তের বহির্ভাগস্থিত অংশে লিখিত আছে।

(২) মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা :—

গোলাকৃতি, ওজন ১৭০ গ্রেণ, পরিধি ৩৬ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠ :—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তাকার বৃত্তাকারে যুক্ত (Scalloped circle)

তন্মধ্যে (১) শ্রীশ্রী ম

(২) মহেন্দ্র

(৩) দেবস্ব

বাক্সালার স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের অনেকের মুদ্রাতেই এইরূপ বৃত্তাকারে যুক্ত বৃত্তাকার দেখিতে পাওয়া যায়; যথা সৈফুদ্দিন হামজা শাহ, সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ, জলালুদ্দিন মহম্মদ শাহ, সামসুদ্দিন মুজাফর শাহ ইত্যাদি।†

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ :—

চতুর্দশমধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী

(২) চরণ প

(৩) রায়ণ

চতুর্দশে “পাণ্ডু”

চতুর্দশের দক্ষিণে “নগর,”

উর্ধ্বে “শকাব্দা”

ও বামে “৩৩৬”।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র যে নূতন মুদ্রাটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা খুলনা জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে জনৈক

মুসলমান কর্তৃক একটি কবর খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক মিত্র মহাশয়কে দিয়াছিলেন। মুদ্রাটি গোলাকার ও সর্ববিষয়ে স্বর্ণীয় রাধেশ বাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রার অনুরূপ।

(৩) দম্ভজমর্দনদেবের মুদ্রা :—

গোলাকৃতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি ৩৬ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠ :—

সমভুজ সমান্তরাল ষট্‌কোণদ্বয় মধ্যে :—(১) শ্রীশ্রী

(২) দম্ভজমর্দ

(৩) ন দেব।

বাক্সালার স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের মুদ্রায় সমভুজ ষট্‌কোণ মধ্যে খোদিত লিপি পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে, ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের একটি মুদ্রায় এইরূপ একটি ষট্‌কোণ আছে*।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ :—

বৃত্তমধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্তখণ্ডসমূহ যোজিত করিয়া বৃত্ত।

তন্মধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী

(২) চরণ প

(৩) রায়ণ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বুস্তের মধ্যে “শকাব্দা ১৩৩৯ চন্দ্র ব (১) প।”

স্বর্ণীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় দম্ভজমর্দনদেবের মুদ্রার তারিখ ২৩৯ ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখ ৩৩৬ শকাব্দা পাঠ করিয়াছেন ও তদনুসারে দম্ভজমর্দনের তারিখ ৩১৭ ও মহেন্দ্রদেবের তারিখ ৪১৪ খৃষ্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রাধেশ বাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত দুইটি মুদ্রাতেই তারিখ কাটিয়া গিয়াছে, ইংরাজী মুদ্রাতন্ত্রে, ইহার নাম Marginal deletion. Deleted margin অর্থাৎ মুদ্রার পার্শ্বে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাটিয়া গেলে সেরূপ মুদ্রার পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু সেই জাতীয় বা সেই রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে উভয়কে মিলাইয়া অস্পষ্ট অক্ষরগুলির পাঠোদ্ধার করিতে হয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাটিতে

† Ibid, No. 160. No. 88. No. 161. No. 92. No. 96. No. 171. No. 163.

* Ibid. Pt. II. P. 155. No. 51.

যে অংশে তারিখ আছে তাহা কাটিয়া যায় নাই, সুতরাং তারিখ সম্পূর্ণ আছে, এইরূপ স্থলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রাধেশ বাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাটির তারিখও ১৩৪৯ শকাব্দ। মহেন্দ্রদেবের আর কোন মুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ইহার তারিখ নির্ধারণ করা সহজ নহে, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে রাধেশ বাবুর মতানুসরণ করিয়া যদি ইহার তারিখ খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে নির্দেশ করা যায় তাহা হইলে সুবীসমাজে হস্তাস্পদ হইতে হইবে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে বাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে বলিলেই শোভা পাইত। বাঁকুড়া জেলার শুভনিয়া পাহাড়ের সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার খোদিত লিপিতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যদি বঙ্গাক্ষর দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে ভরসা করি শীঘ্রই তিনি মত পরিবর্তন করিবেন। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে অক্ষর ছিল বটে এবং হয় ত তৎকালে তাহা বঙ্গাক্ষর নামে পরিচিত ছিল কিন্তু খ্রীষ্টীয় ২০শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাহা বঙ্গাক্ষর নামে পরিচিত তাহার সহিত শুভনিয়া পাহাড়ের খোদিত লিপি সমূহের কোনই সাদৃশ্য নাই। অনুমান হয় মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার সম্পূর্ণ তারিখ ১৩৩৬ শকাব্দ, তন্মধ্যে সহস্রক সংখ্যাটি কাটিয়া যাওয়ায় বিধম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে দেখিতে পাইবেন যে মহেন্দ্রদেব খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর লোক, ৫ম শতাব্দীর নহে। দমুজমর্দনদেবের মুদ্রাঘরের তারিখ শকাব্দ ১৩৩৯+৭৮=১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখ শকাব্দ ১৩৩৬+৭৮=১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মুদ্রাজয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহেন্দ্রদেব নামক জনৈক হিন্দু শাক্ত রাজা মুসলমান রাজধানী গোড়ের অতি সন্নিকটে রাজত্ব করিতেন। ইনি মুসলমান রাজার অধীনতা স্বীকার করিতেন না, কারণ তাহা হইলে কখনই নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ করিতে পারিতেন না। মুসলমান রাজসমাজে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ ও শুক্রবারে সাধারণ প্রার্থনাগৃহে নিজ নামে সঙ্কল্প করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা স্বাধীন

রাজার চিহ্ন। মুসলমান ইতিহাসে ইহা “খুতবা ও সিকা জারি” নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখের তিন বৎসর পরে দমুজমর্দনদেব নামধের অপর একজন হিন্দু রাজা গোড়ের নিকটবর্তী পাণ্ডুনগরে ও সমুদ্রউপকূলবর্তী চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমান হিন্দু বা ইংরাজ ঐতিহাসিক কেহই বঙ্গের এই স্বাধীন হিন্দু রাজঘরের নাম গ্রহণ করেন নাই, দমুজমর্দনদেব চাঁদরায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য রায় ও নীতারাম রায় প্রমুখ ভূস্বামিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন মাত্র। যে সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে মহেন্দ্রদেব ও দমুজমর্দনদেবের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সে সময়ে উত্তরাপথে প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের বিশাল সাম্রাজ্য গৃহবিবাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে পরিণত হইতেছিল। মহম্মদ তোগলক সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লিনগর শাসন করিতেন মাত্র ও আলাউদ্দিন খিলজি এবং মহম্মদ তোগলকের আসনে বসিয়া মোঙ্গল-সম্রাট তৈমুরের ভয়ে কম্পিত হইতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অন্তর্বেদীতে শাক্ত-বংশীয়গণ ও গোড়বঙ্গে ইলিয়াসশাহী রাজগণ স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। গুজরাটে, মালবে ও দাক্ষিণাত্যে স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গে ইলিয়াসশাহের বংশের অধিকার শেষ হইয়া আসিতেছে। ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রদিন ইলিয়াস শাহ গোড়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন ও বহুকষ্টে সম্রাট ফিরোজ তোগলকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। উনিবিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বিজিত হইয়া উত্তরবঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ একত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করেন। সিকন্দর শাহের পুত্র আজম শাহ সাত বৎসর ও পৌত্র হামজা শাহ দশবৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস-সালাতীনকার বলেন যে হামজা শাহের দত্তক পুত্র সমুদ্রদিন ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তর বঙ্গের ভাটুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ বা কংস (পারসিক অক্ষরে ইহার নাম কান্স লিখিত হইয়া থাকে) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৪০৯

খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিদ্রোহী হইয়া মুসলমান রাজাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর পাঁচ বৎসরকাল রাজধানী ফিরোজাবাদ অর্থাৎ পাণ্ডুয়া নগরে সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ সাহের নামে মুদ্রাঙ্কণ হইত। কেহ কেহ বলেন যে পদচ্যুত রাজার পুত্র বায়াজিদ শাহকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার নামে গণেশ বা কংসনারায়ণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। অপরূপ ঐতিহাসিকেরা বলেন যে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ মুসলমানধর্ম দীক্ষিত হইয়া সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়াজিদ শাহের পরে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের পুত্র যত্ন মুসলমানধর্ম দীক্ষিত হইয়া জালালুদ্দিন মহম্মদশাহ নাম গ্রহণ করেন ও ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। যত্ন রাজত্ব পূর্বে মুয়জ্জমাবাদ (ময়মনসিংহ) ও চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) ও দক্ষিণে সাতগাঁও অর্থাৎ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের নিম্নলিখিত চাঁকশালগুলিতে মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রা কলিকাতার বাজ্বরে আছে :—

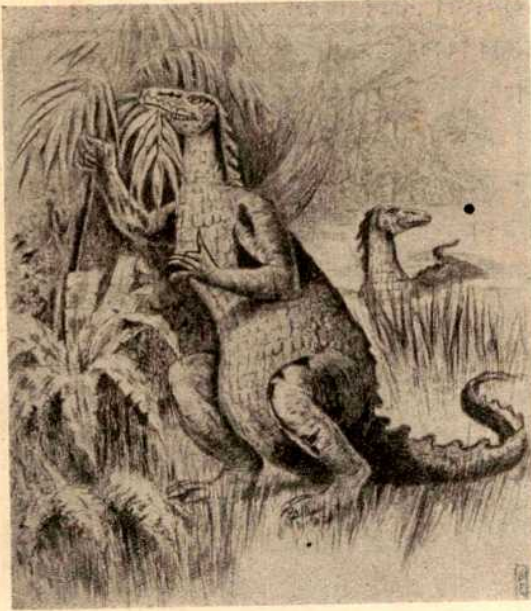
- (১) ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর)।
- (২) সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম)।
- (৩) মুয়জ্জমাবাদ (ময়মনসিংহ)।
- (৪) ফতেহাবাদ (ফরিদপুর)।
- (৫) চাটগাঁও (চট্টগ্রাম)।

যে বৎসরে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের মৃত্যু হয় সেই বৎসরেই মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাটি প্রস্তুত হইয়াছিল। কথিত আছে গোড়ের বিখ্যাত পীর মুর কুতুব আলম জৌনপুরের মুসলমান রাজাকে (সম্ভবতঃ ইব্রাহিম শাহ) বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন। কথিত আছে যে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ সপুত্র মুসলমানধর্ম দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ায় মুর কুতুব আলমের আদেশে ইব্রাহিম শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অনুমান হয় রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের মৃত্যুর পর যত্ন স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্রদেব বিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডুনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন। ইতিহাসে কথিত আছে যত্ন পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পুনরায় গোড়ে লইয়া গিয়াছিলেন।

ইহাও হইতে পারে যে মহেন্দ্রদেবের ভয়ে যত্নকে ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মহেন্দ্রদেব সম্ভবতঃ দমুজমর্দনদেবের পিতা। দমুজমর্দনদেব সম্ভবতঃ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই যত্ন কর্তৃক তাড়িত হইয়াছিলেন ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অরণ্য মধ্যে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগরে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে দমুজমর্দনদেবের যে মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। দমুজমর্দনদেবের রাজত্ব বরেন্দ্রভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না, তাহার প্রধান কারণ এই যে ১৩৩৯ শকাব্দে = ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে = ৮২১ হিজরীতে ফতেহাবাদ ও সাতগাঁও জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের হস্তগত ছিল, কারণ উক্ত বৎসরে পূর্বোক্ত স্থানদ্বয়ে মুদ্রাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দমুজমর্দনদেব বোধ হয় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসরেই চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া হস্তচ্যুত হইলেও সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ ও জালালুদ্দিন মহম্মদশাহের অনেক মুদ্রা, খোদিত-লিপিতে ফিরোজাবাদে মুদ্রিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিজরী ৮১৬ হইতে ৮১৯ পর্যন্ত (১৪১৩—১৬ খৃষ্টাব্দ) মুদ্রিত মুসলমান মুদ্রা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যত্ন সহিত মহেন্দ্রের বা দমুজমর্দনদেবের, বিবাদের কথা অত্যাধি ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই। বঙ্গের এই স্বাধীন মরপতিদ্বয় অত্যাধি অজ্ঞাত ছিলেন, স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইহাদিগের নাম আবিষ্কার করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

উপসংহারে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। চন্দ্রদ্বীপের দমুজমর্দনদেবের তারিখযুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া সেনরাজবংশের কায়স্থত্ব নিরসন করিয়াছে। সেনরাজবংশীয় দমুজমাধব দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের সমসাময়িক, সুতরাং তিনি ১২৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চৌন সময়ে জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সহিত ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপ হিন্দুরাজ্য স্থাপনকারী দমুজমর্দনদেবের সহিত অভিন্নত্ব ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত সেনরাজবংশের কোনও

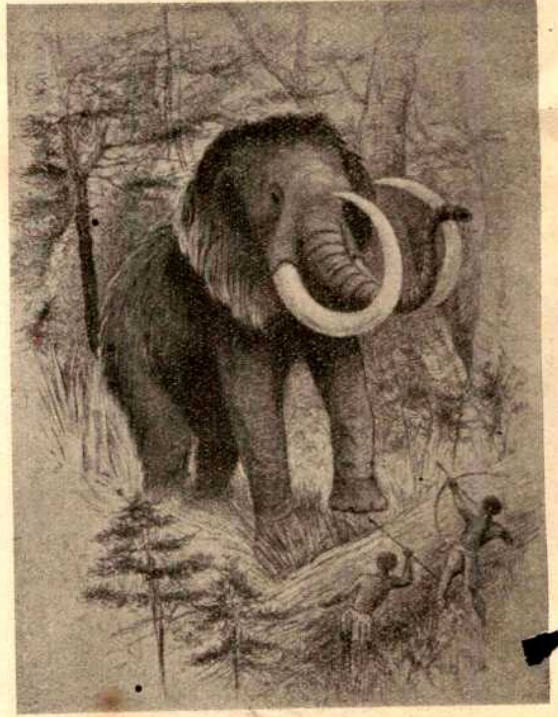
লইয়া গিয়াছিল। তাহারা জলে ডুবিয়া ক্রমে মাটিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তারপরে কত যুগ ধরিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে শক্ত হইয়া হইয়া পাথর হইয়াছে, আজ আমরা সেই অবস্থায় তাহাদের পাইয়াছি। অনেক স্থলেই খালি কঙ্কালটা এইরূপ পাথর আকারে পাওয়া যায়—কারণ শরীরের অপর অংশগুলি শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট ছোট পোকা এবং মাছের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশগুলির ছাপ পাহাড়ের গায়ে বর্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। এই সমস্ত কথা যে কাহারো মনগড়া নয় তাহা একবার যত্নবরে গেলেই বুঝা যায়।



আটলান্টোসারাস—উত্তর আমেরিকার অধুনাবিলুপ্ত বৃহদায়তন সরীসৃপ। ইহার ৮০ ফুটেরও অধিক লম্বা হইত এবং সম্ভবতঃ পিছনের পায়ে ভর রাখিয়া চলিত।

পৃথিবীতে মনুষ্য জন্মের বহুশত বৎসর পরেও ম্যামথ নামে একপ্রকার জন্তু ছিল, তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু উত্তর সাইবেরিয়ার বরফের নদীতে তাহাদের সম্পূর্ণ শরীরটা পাওয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকায় একটি বৃহদাকার জন্তুর চর্মের কতকটা অংশ এইরূপভাবে রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, লণ্ডন শহরের নিম্নস্থ মাটিতে এখনো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীরের দেহাবশেষ

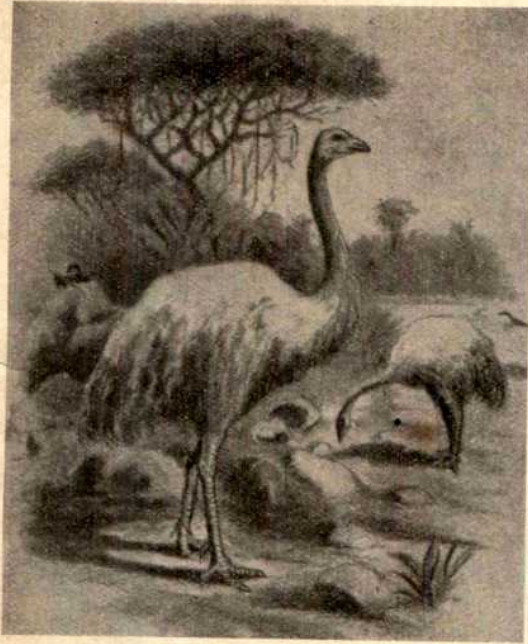
পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সে সব কুমীর এখন আর টেম্‌স নদীতে দেখা যায় না।



ম্যামথ—দেখিতে অনেকটা হাতীর মতো কিন্তু ইহার হাতীর চেয়ে অনেক বড় হইত এবং ইহাদের দেহ লম্বা লম্বা লোমে আবৃত থাকিত। সাইবেরিয়ার বরফের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ দেহ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

মানুষের আদিম পুরাণাদিতে অনেক রকম ভীষণ প্রাণীদের বৃত্তান্ত পড়া যায়। আজকাল অনেকেই তাহা গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দেন। অবশ্য উহার অধিকাংশই যে পল্লবিত সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু কতকটা সত্যও আছে। প্রাচীন পুরাণাদিতে বর্ণিত জন্তুদের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল এমন অনেক প্রকাণ্ডকায় অদ্ভুতাকৃতি জন্তু এক সময়ে পৃথিবীতে বাস করিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাদের মধ্যে কোনো কোন জন্তু মনুষ্যজন্মের পরেও কিছুদিন জীবিত ছিল এবং তাহাদের হইতেই পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, এই অনুমানটি অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ তাহারা মনুষ্যজন্মের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্ত লোপ পাইয়াছে।

মনে কর আমরা কোনো নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছি, এমন সময়ে যদি ৬০ ফুট লম্বা এবং সেই আন্দাজে চওড়া একটা টিকটিকি-জাতীয় জন্তু আসিয়া উপস্থিত হয় ত আমাদের মনে কি হয়! জন্তুটির ওজন ২০ টনের কম হইবে না (১ টন=২৭ মণ)। এইরূপ জন্তু সত্যসত্যি এক সময়ে উত্তর আমেরিকায় বাস করিত, ইহার নাম রাখা হইয়াছে ব্রণ্টোসরাস। ইহার পিছনের পা দুখানি হাতীর পায়ের ছায় প্রকাণ্ড ছিল কিন্তু সম্মুখের পা ছোট

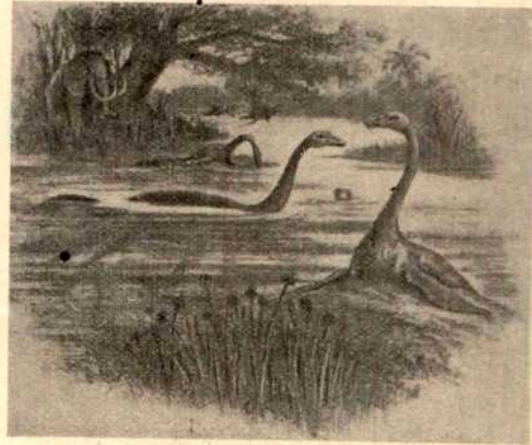


মোয়া পাখী—নিউজিল্যান্ডের অধুনাবিলুপ্ত প্রাচীন অধিবাসী, উটপাখীর সদৃশ, কিন্তু প্রায় ১৪ ফুট উচু হইত, এখনো ইহাদের ডিম প্রায়ই যেখানে সেখানে পাওয়া যায়।

ছিল, এই জন্তুর দৈর্ঘ্যের একচতুর্থাংশই ছিল ঘাড়টা, এই সরু, লম্বা ঘাড়টার ডগায় একটা ছোট সাপের মতন মাথা বসান ছিল। চেহারাটা কেমন মানানসই হইল! ইহার এক একটি পায়ের ছাপ ছিল এক বর্গগজ লম্বা। ব্রণ্টোসরাস বিল এবং জলাজমিতে বাস করিত। কারণ নানা-প্রকার জলীয় উদ্ভিদই ছিল ইহার খাদ্য, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র আকার এবং মেরুদণ্ডের স্থূলতা হইতেই বুঝা যায় যে এই জন্তুর বুদ্ধি তত স্থূল ছিল না এবং গতিবিধিও তেমন দ্রুত ছিল না, ইহার দেহে শিং বা খড়্গ প্রভৃতি কোনো

প্রকার আত্মরক্ষণোপযোগী অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই; কাজেই মনে হয় এই জন্তু অত্যন্ত ভীক এবং শাস্তপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিল।

অ্যাটল্যান্টোসরাস নামে আর একপ্রকার জন্তু ব্রণ্টোসরাসের চেয়েও প্রকাণ্ড। ইহার সুবিস্তৃত দেহটি আশি ফুট লম্বা, ইহা যখন পশুাদিকের পায়ে ভর করিয়া চলিত তখন ইহার মাথাটি মাটি হইতে অন্তত ত্রিশ ফুট উচ্চে অবস্থান করিত। ইহার উরুতের হাড়খানাই ছয় ফুট ছই ইঞ্চি অর্থাৎ একটি মানুষের চেয়েও লম্বা। কলোরাডোতে ইহাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং এই জাতীয় আরো



প্রিসিয়োসরাস—অতিকায় জলচর জীব, ইহাদের বিশাল দেহের তুলনায় মাথা অতি ক্ষুদ্র ছিল, গলা খুব লম্বা হইত।

অনেক জন্তুর দেহ উক্ত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের কাহারো কাহারো দৈর্ঘ্য চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ ফুট।

এই শ্রেণীর অন্তর্গত সেটিয়োসরাস নামক এক প্রকার জন্তু ইংলণ্ডে বাস করিত। ঐ দেশের ছয়টি প্রদেশে উহার দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মুণ্ড কোথাও পাওয়া যায় নাই। মাথা বাদ দিয়া খালি খড়্গ এবং লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট। সম্ভবত সমস্ত দেহটা অন্তত চল্লিশ ফুট লম্বা হইবে। ইহার উরুতের একখানা হাড়ের দৈর্ঘ্য চার ফুট তিন ইঞ্চি এবং ওয়েমাউথ নামক একস্থানে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা একখানা হাতের হাড় পাওয়া গিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনে ইহার চেয়েও ভয়ঙ্কর একটি অধিবাসী

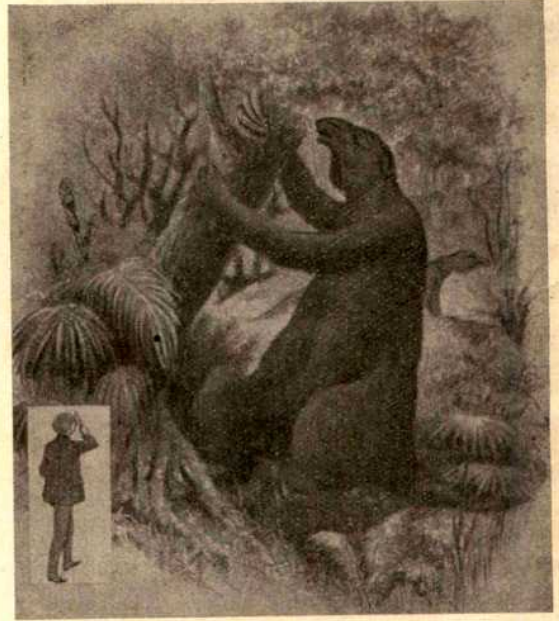
ছিলেন, তাঁহার নাম মেগালোসরাস। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিশ ফুট এবং চালচলনও খুব দ্রুত ছিল। ইহার দাঁত দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে ইনি মাংস খাইতেন। ইহার পায়েও ভয়ঙ্কর নখর ছিল। ইনিও পিছনের পায়ে ভর করিয়া চলিতেন এবং চলিবার সময়ে ইহাকে কতকটা ক্যান্ডারুর মত দেখাইত।

রেভারেণ্ড হাচিনসন্ নামক একজন বিখ্যাত লেখক বলেন “মেগালোসরাসেরা কি করিয়া শীকার করিত তাহা কল্পনা করা কিছু শক্ত নয়, মনে কর যেন একটা মেগালোসরাস একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকাভুক প্রাণীর উপরে আড়ি পাতিয়াছে, পিছনের দিকটাকে একেবারে শরীরের নীচে গুটাইয়া লইয়াছে, দেখিতে দেখিতে সেই লম্বা পাজুখানায় ঠেলা দিয়া এক প্রকাণ্ড লাফ মারিল এবং বেচারী শিকারটিকে নখর-ওয়ালা সামনের হাত দুখানায় ধরিয়া ফেলিল, তারপরে সেই খাঁড়ার মত দাঁত বাহির করিয়া জন্তুটার অস্থিমাংস মুহূর্তেই সাবাড় করিয়া ফেলিল।”

ষ্টেগোসরাস নামক আর এক প্রকার জন্তু দেখিতে মেগালোসরাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিন্তু ইহার অত্যন্ত নিরীহ। ইহার দৈর্ঘ্য পঁচিশ ফুট। এটিও টিকটিকি-জাতীয় জন্তু। ইহার গায়ে কতকগুলি গোল গোল হাড়ের আঁশ ছিল, তাহার এক একটির ব্যাস দুই তিন ফুট। তা ছাড়া আঙুলে দুই ফুটের অধিক লম্বা ধারাল নখর ছিল। ইহার পিছনের অংশটা সাধারণ একজন মানুষের চেয়ে লম্বা কিন্তু সামনের পা দুখানা তাহার তুলনায় অনেক ছোট। কাজেই ষ্টেগোসরাস যখন চলিত তখন তাহার মাথা এবং লেজটা প্রায় মাটিতে গিয়া পৌঁছিত আর মাঝখানটা পনের ফুট উচুতে থাকিত কাজেই দেখিতে কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রের আকার হইত। ইহার দাঁত ছোট এবং নরম ছিল—তাহাতেই বোঝা যায় নরম গাছ পাতা খাইয়াই ইহার জীবন ধারণ করিত।

ষ্টেগোসরাস সম্বন্ধে একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে ইহার মেরুদণ্ডটা লেজের কাছে পৌঁছিয়া একটু বড় আকার ধারণ করিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন দ্বিতীয় আর একটা মস্তিষ্ক—এই স্থান হইতেই পিছনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং লেজের কাজ চলিত।

এই শ্রেণীর অদ্ভুত জন্তুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর দেখিতে ট্রিসেরাটপ্‌স। ইহার দৈর্ঘ্য পঁচিশ হইতে ত্রিশ ফুট, মুণ্ডটাই সাত আট ফুট এবং সেই প্রকাণ্ড মাথার উপরে তিনটা শিং। দুইটা শিং বাঁড়ের শিংএর মত কপাল হইতে উঠিত। অপর শিংটা অনেক ছোট, সেটা গণ্ডারের খড়্গের মত নাকের উপর অবস্থিত। মাথার খুলির তুলনায় এই জন্তুর মস্তিষ্ক এত ছোট যে ইহার বিশেষ কিছু বুদ্ধি ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার খুলির পিছন দিকটা উচু হইয়া উঠিয়া একটা গোল মুকুটের আকার ধারণ করিয়াছে—তার চারিদিকটা শক্ত আঁশ



মেগাথেরিয়াম—দক্ষিণ আমেরিকার ১৮ ফুট লম্বা ভাষণকার জন্তু; ইহাদের হাড় হাতীর হাড়ের চেয়েও মোটা। কোণের মনুষ্যাকৃতিটি এই অতিকায় জন্তুর সহিত তুলনা বুঝাইবার জন্য অঙ্কিত হইয়াছে। দিয়া বেশ করিয়া ঢাকা। ইহার গায়েও অনেক হাড়ের আঁশ ছিল। কাজেই ইহার দেহটি সুরক্ষিত থাকায় ইনি যে একজন ভয়ঙ্কর রকমের যোদ্ধা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ইনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন।

সেকালে এক প্রকৃতির উদ্ভয়নকারী সরীসৃপজাতীয় জন্তু ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ডানার বিস্তৃতিই ২৫ ফুট ছিল আবার কোন কোনটা বা চড়াইয়ের

মত দেখিতে। ইহাদের ডানাগুলি ঠিক অত্যাশ্চর্য পক্ষীর ডানার মত নয়—কতকটা বাতুড়ের মত। ইহাদের সামনের পায়ে চারিটি করিয়া আঙুল থাকিত; ইহার মধ্যে তিনটি সাধারণ রকমের লম্বা এবং নখরবিশিষ্ট আর চতুর্থটা খুব বেশী লম্বা। এই লম্বা আঙুলটা ডানার প্রান্তভাগকে ঝুলিয়া পড়িতে দিত না। বাহিরের আকৃতিতে এই জন্তুগুলির সঙ্গে পাখী ও বাতুড়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু ইহাদের হাড়ের গঠন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহারা সর্বাঙ্গপ্ৰজাতীয় জন্তু।

এই জাতীয় জন্তুর নাম দেওয়া হইয়াছে টেরোড্যাক্টিল (Pterodactyl)। ইহারা সংখ্যায় প্রচুর ছিল। ইহাদের মধ্যে যেগুলি ছোট তাহারা পোকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত, আর বড় বড় গুলি তাহাদের শক্ত দাঁত দিয়া ছোট খাট জানোয়ার শীকার করিত, আবার একদল সমুদ্রেও থাকিত; তাহাদের খাণ্ড ছিল মাছ। ইহার পরবর্তীকালে স্তন্যপায়ী জীবদের যুগে যেসমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায় তাহারা অধিকাংশই অতিশয় প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুত। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর নাম টিনোসেরাস, লেজ বাদে ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং ওজন তিন টন (১ টন=২৭ মণ)। ইহার দেহটা হাতীর কিন্তু মুণ্ডটা গণ্ডারের মত। ইহার মাথায় জিরাফের শিংএর মত ছটা বড় বড় শিং ছিল, ইহার উপরের চোয়ালে গজদন্তের মতো দুইটা চ্যাপ্টা দাঁত ছিল। এই দাঁতগুলি যে কি কাজে আসিত তাহা বুঝা যায় না। কারণ ইহারা ঘে ঘাস এবং শাকসবজী খাইয়া জীবন ধারণ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আজকালকার গো মহিষ প্রভৃতির মত ইহারা দল বাঁধিয়া থাকিত।

ব্রণ্টপ্স নামে আর এক প্রকার অসংখ্য জন্তু উত্তর আমেরিকার কোনো হ্রদের চতুর্দিকে বাস করিত। লেজ বাদে ইহাদের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং উচ্চতা ৮ ফুট। মোটা-মুটি চেহারায় দুই শিং-ওয়ালা গণ্ডারের সঙ্গে ইহাদের খুব সাদৃশ্য আছে। কেবল তফাৎ এই যে ইহাদের শিং পাশাপাশি—গণ্ডারের মত একটা আর একটার সম্মুখে নয়। ইহাদের মুণ্ড দৈর্ঘ্যে এক গজ এবং দুই শিংএর ডগার ব্যবধান বিশ ইঞ্চি, টাপিরের ঠায় ইহাদের লম্বা এবং নরম নাক ছিল বলিয়া বোধ হয়।

মধ্য আফ্রিকার সেমালিকি অরণ্যে ওকাপি নামক একপ্রকার জন্তু আবিস্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন সেকালের একশ্রেণীর জন্তুর সঙ্গে ইহাদের জাতি-সম্পর্ক আছে, হয়ত ইহারাই তাহাদের বর্তমান বংশধর। উত্তর ভারতবর্ষে সিবাথেরিয়াম নামক ইহাদের এক শাখার দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। ইহাদের চেহারা অনেকটা



সেটোসেরাস—সেকালের ইংলণ্ডের অধিবাসী টিকটিকি জাতীয় জীব, আকার অন্ততঃ ৪০ ফুট লম্বা হইত।

কালসারের মত; কিন্তু আকৃতি গণ্ডারের চেয়ে অনেক বড় এবং মুণ্ডটা সত্যসত্যই ভয়ানক প্রকাণ্ড। ইহাদের চারিটা করিয়া শিং থাকিত, ঠিক চোখের উপরেই দুইটা ছোট ছোট এবং তার পিছনে দুইটা বড় বড় এবং চ্যাপ্টা। রোমন্থনকারী অশ্রু সমস্ত জন্তুর চেয়ে ইহাদের চোয়াল বড় ছিল, মহিষের চোয়ালেরও প্রায় দ্বিগুণ হইবে এবং উপরের ঠোঁটটা লম্বা হইয়া একটা ছোট খাট শুঁড়ের আকার ধারণ করিত। নানা কারণে ইহাদিগকে জিরাফ এবং কালসার এই দুই শাখার জন্তুর মধ্যবর্তী বলিয়া বোধ হয়।

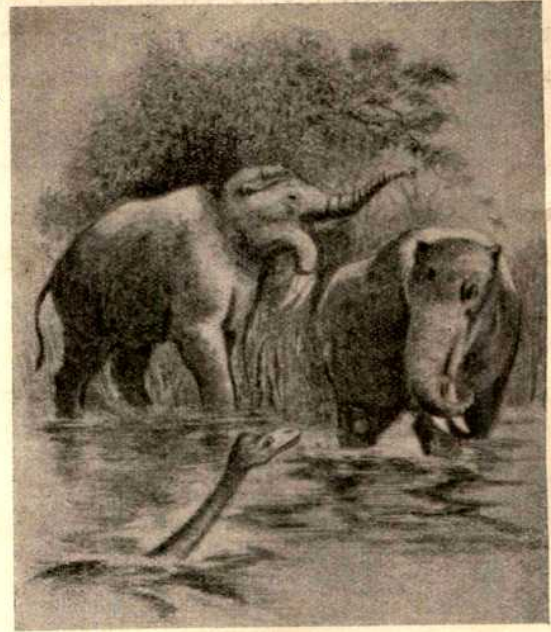
আমরা যেকালের কথা বলিতেছি সেইকালে দক্ষিণ আমেরিকায় মেগাথেরিয়াম নামে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল, ঐ জন্তুর একটা ছবি দেওয়া হইল। হবির পাশে যে মানুষের ছবিটা আছে উহা জন্তুর ছবির সঙ্গে একই স্কেলে আঁকা। ইহাতে পাঠক এই প্রকাণ্ড জন্তুর আকৃতি কল্পনা করিয়া লইতে পারিবেন। ইহারা ১৮ ফুট লম্বা হইত এবং ইহাদের অধিকাংশ হাড়ই হাতীর হাড়ের

চেয়েও মোটা ছিল—উরুতের হাড়টা হাতীর হাড়ের তিনগুণ। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসাধারণ বল এবং পায়ে ভয়ঙ্কর নখর ছিল। পিপীলিকাভূকের ছায় ইহারা পায়ের আঙুল গুটাইয়া চলিত।

ইহারা যে রকম করিয়া খাও যোগাড় করিত তাহা অতি আশ্চর্য। ডার্কইন্ বলেন “ইহাদের দাঁতের সরল গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহারা নিরামিষাশী ছিল এবং সম্ভবত গাছের পাতা ও ছোট ছোট ডালপালা খাইত।” বিশাল দেহ এবং বড় বড় শক্ত বঁকা নখের জন্ত ইহাদের পক্ষে চলাফেরা অত্যন্ত অসুবিধাকর ছিল, এইজন্য কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ইহারা শ্লথদিগের ছায় পিঠ নীচের দিকে করিয়া গাছে উঠিয়া ডালপাতা খাইত। যদিও সেকালের গাছপালা এখনকার চেয়ে অনেক বড় এবং শক্ত ছিল তবু হাতীর মত প্রকাণ্ড জন্তু যে তাহারা ধারণ করিতে পারিত তাহা মনে হয় না। অধ্যাপক আউয়েন্ বলেন যে “ইহারা গাছের ডাল নোয়াইয়া এবং ছোট ছোট গাছের শিকড়স্বত্ব তুলিয়া ফেলিয়া তাহার পাতা খাইত। ইহাদের নিম্নাঙ্গের ভয়ঙ্কর প্রসার এবং ওজন এই কাজের পক্ষে অসুবিধাকর না হইয়া বিশেষ উপযোগীই হইত। প্রকাণ্ড লেজ এবং ছুই পায়ের গোড়ালীর উপর শক্ত হইয়া বসিয়া ইহারা বড়-বড়-নখর-বিশিষ্ট ছুই হাত অনায়াসে এবং পূরাদমে চালনা করিতে পারিত।”

যে প্রদেশে মেগাথেরিয়ামদের বাসস্থান ছিল সেইখানেই আট নয় ফুট লম্বা একপ্রকার প্রকাণ্ড আর্ম্যাডিলো (Armadillo) বাস করিত। ইহার গায়ে কচ্ছপের খোলার মতো একটা কঠিন আবরণ থাকিত; কাজেই আজকালকার আর্ম্যাডিলোর মত ইহারা কুণ্ডলী পাকাইতে পারিত না। ইহাদের বর্তমান বংশধরগণ অল্প কয়েক ইঞ্চি মাত্র লম্বা।

এখন সেকালের বিশালকায় পাখীদের সম্বন্ধে কিছু বলিব। নিউজিল্যান্ড এবং ম্যাডাগাস্কার প্রদেশেই ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। ইহাদের মধ্যে মোয়া নামক এক প্রকার পক্ষীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই এক জাতির মধ্যে পনের রকম বিভিন্ন শ্রেণী দেখা যাইত। কোনো কোনো পাখী ১৪ ফুট পর্যন্ত উচু হইত এবং দেখিতে অনেকটা



ডাইনোথেরিয়াম—দেখিতে হাতীর মতো, দাঁত সিঁদুঘোটকের ছায় নীচের দিকে বঁকান।

উটপাখীর মতো ছিল। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের জনশ্রুতি অনুসারে বোধ হয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। এখনো ইহাদের হাড় এবং ভাঙা ডিমের খোলা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাডাগাস্কারে ইপিওনিস নামে আর এক প্রকার প্রকাণ্ড পাখী ছিল। ইহাদের ডিমের ব্যাস প্রায় পনের ইঞ্চি ছিল। এক একটা ডিম একশ আটচল্লিশটা মুরগীর ডিম অথবা তিনটা উটপাখীর ডিমের সমান হইত। ইহাদের গোটা হাড় কোথাও পাওয়া যায় নাই। কেবল ভাঙা ভাঙা খণ্ড পাওয়া গেছে কাজেই ইহাদের আয়তন কত বড় ছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ডিমের চেহারা দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা মোয়ার চেয়ে ছোট ছিল না।

ইংলণ্ডে যে একসময়ে দুইপ্রকার প্রকাণ্ড ডানাবিহীন পাখী ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। লণ্ডনের ভূগর্ভে ডার্মানিস্ নামক একপ্রকার পক্ষীর দেহাবশেষ এবং ক্রয়-ডনের নিকটে গ্যাষ্ট্রনিস্ নামক আর একপ্রকার পাখীর অস্থি পাওয়া গেছে।

এই প্রবন্ধে যেসমস্ত ভীষণকায় জন্তুর বিবরণ দেওয়া

গেল তাহারা যে বছরদিন হইল লোপ পাইয়াছে ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। মামুদের পক্ষে তাহারা বড় সজ্জন প্রতিবেশী হইত না। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিহাশী ছিল এবং তাহাদের চাল-চলনও গম্ভাই-লঙ্করি ধরণের ছিল। কিন্তু তবু তাহাদের বিশাল বপু এবং প্রভূত বল আদিম যুগের মামুদের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইত সন্দেহ নাই।

এই বিষয়ে ধাহাবা আরো বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের “সেকালের কথা” এবং Hutchinson প্রণীত Extinct Monstres নামক গ্রন্থ পড়িতে পারেন।

শ্রীযুক্তনাথ সুধোপাধ্যায়।

লক্ষ্মণসেনের সময়

“বঙ্গবর্শনে” ও “প্রতিভা”র লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রকাশিত হইবার পরে দুই এক স্থানে লক্ষ্মণসেনের সময়সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তদন্তের কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। প্রতিবাদ-কাবিগণ যেসমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনটিই নূতন নহে। পুরাতন প্রমাণের নূতন ব্যবহারে দুই একটি কথা সাজাইয়া বলা আবশ্যক হইয়াছে। “প্রতিভা”র শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যে প্রতিবার প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উল্লেখ-যোগ্য কথা বিশেষ কিছুই নাই, এবং তৎসমুদয়ের উত্তর শ্রীযুক্ত “প্রতিভা”র প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি বরেন্দ্র অমৃতসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ্র তৎকর্তৃক প্রণীত “গৌড়রাজমালা”র ৬২—৬৮ পৃষ্ঠার লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার ফলে রমাশ্রমাদ বাবু লক্ষ্মণসেনের সময় সম্বন্ধে পূর্ব মতই বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পূর্বের বিজয়সেনের অন্তিমকাল নির্দেশ করা যায় না। বিজয়সেন সম্বন্ধে রমাশ্রমাদ বাবু অনেক কথাই বলিয়াছেন ও আবহমানকাল ঐতিহাসিকগণ বীরবর লক্ষ্মণসেনের মন্তকে যে দুর্ভাগ্যকারিণী বর্ণন করিয়া আসিয়াছেন, রমাশ্রমাদ বাবু তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের কথা বলিতে গেলে সূত্র সেনরাজবংশের সম্বন্ধে যে সকল কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার আলোচনা করা আবশ্যক।

সেনরাজগণ কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয়বংশোৎপন্ন, তাঁহারা সম্ভবতঃ সম্রাট প্রথম মহাপালের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য হইতে গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই মতের প্রবর্ত্তনিতা ও আমি তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছি মাত্র। সম্প্রতি বিজয়নগর রচিত “বিক্রমার্জ চরিত” নামক গ্রন্থের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া রমাশ্রমাদ বাবু বলিয়াছেন যে, কল্যাণীক চালুক্যবংশীয় চালুক্য-বিক্রম সম্বৎসর-প্রতিষ্ঠাতা বট বিক্রমাদিত্য তাঁহার পিতা ভুবনৈকেশ্বর দ্বিতীয় সোমেশ্বরদেবের আদেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় ও কামরূপ

বিজয় করিয়াছিলেন। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া রমাশ্রমাদ বাবু হির করিয়াছেন যে সেনরাজবংশ চালুক্য যুবরাজের দ্বিগুণ বজ্রার সহিত গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন, কারণ বিজয়নগরে দেবপাড়া প্রাঙ্গণে উল্লিখিত হইয়াছে যে সামন্তসেন একাটসেনা লইয়া অরিকুলাকর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুর্ভুক্তগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে গজাভীরবর্তী পুণ্ড্রাশ্রমনিচরে বিচরণ করিয়াছিলেন; এবং বজ্রালসেনের ভাস্কর্য্যশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় “চন্দ্রবংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সহচর-পালন-খ্যাতিগর্বে রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ শ্লোক)। এই রাজপুত্রগণের বংশে শত্রুসেনাসংগেরে প্রলম্বতপন সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।” রমাশ্রমাদ বাবু হির করিয়াছেন যে পুর্বেকান্ত ঘটনায় পরস্পরের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন “প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্তসেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে, বাঙ্গালার আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায় তাঁহার পূর্বপুরুষেরা রাঢ়নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি-প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্য-কালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব।” এই বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে বাইখা রমাশ্রমাদ বাবু বলিয়াছেন যে, “কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া রাঢ়দেশ গৌড়রষ্ট্র হইতে বিজয় করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাটরাজ্যে যে রাজপুত্র বা ক্ষত্রিয়সেনানায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাঁহারই বংশধর।” সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল ও তাঁহার পুত্রজয়ের সময়ে পালসাম্রাজ্যের যে দুর্ব্বলতা ঘটনাছিল তাহাতে সকলই সম্ভব। কিন্তু দিগ্বিজয়ের পরে কল্যাণের চালুক্যরাজ্যের যে গৌড়, মগধ বা বঙ্গের কোন প্রদেশ আশ্রয় বাঞ্ছিত পারিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কল্যাণ হইতে রাঢ় বহুদূর, তখনও আর্ধ্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য রাজশূন্ত হয় নাই। রমাশ্রমাদ বাবু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কল্যাণ হইতে গৌড়বঙ্গ দিগ্বিজয় বাত্মা করা সম্ভব, কিন্তু গৌড়বঙ্গের কোন প্রদেশ অধিবার করিয়া আশ্রয়ধীন রাখা তখন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তখন প্রাচীন পালসাম্রাজ্যের অন্তিমদশা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ত্রিপুরাতে ও রত্নপুরে চৌরীসংগ্রাম, জেলাভুক্তিতে চন্দ্রাজয়েরগণ, মালবে পরমারগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। চালুক্যবংশের কোনও ভাস্কর্য্যশাসন বা খোদিতলিপিতে রমাশ্রমাদ বাবু পুর্বেকান্ত আর্ধ্যাবর্ত্ত রাজগণের বিজয়-কাহিনী পাইয়াছেন কি? প্রাঙ্গণিকাব বিজয়দেবের বাক্য হয় ত সত্য, কিন্তু চালুক্যরাজ বট বিক্রমাদিত্য যে রাঢ় অধিকার করিয়া তাহার শাসনভার কর্ণাটদেশীয় সেনাপতির হস্তে ক্ষত করিয়াছিলেন এবং তিনি যে বাহিকার অঙ্গুরাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন একথা ইতিহাসের কেহো টিকিবে চিনা সন্দেহ। কর্ণাট বলিলে কল্যাণভাষা প্রচলিত দেশকে বুঝায়; কল্যাণ এই কর্ণাটদেশে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি স্বীকার করা যায় না যে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে কর্ণাটদেশীয় কোন রাজা আর্ধ্যাবর্ত্তের পূর্বপ্রান্তে আসিয়া হারী অধিকার স্থাপন করিত সমর্থ হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চাঙ্গমুসরণ করিয়া আমি সেনরাজগণকে রাজেন্দ্রচোলের বিজয়বাত্মার অনুগামী বলিয়াছি, কিন্তু আমি কোন স্থানে বলি নাই যে এই সেনোপাধিকারী কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশ কোনকালে চোলমণ্ডলের অধিবাসী ছিল। রমাশ্রমাদ বাবু নিশ্চয়ই

অবগত আছেন যে বর্ষ বিক্রমাদিত্যের পিতামহ জগদেকমল দ্বিতীয় জয়-সিংহ-দাক্ষিণ্য রাজকন্যার্তী রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মেলপাডিগ্রামে চোলেশ্বরমন্দিরে তামিল ভাষায় লিখিত প্রত্নলিপিতে প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেবের নবম রাজ্যাক্ষের যে খোদিতলিপি আছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে জয়সিংহদেব চোলবাজ কর্তৃক মুশদি বা মুদ্রি ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছিলেন।† চালুক্যরাজ এই পবাক্ষর স্বীকার করেন নাই। বালগাথে গ্রামে আবিস্কৃত কারাভা ভাষায় লিখিত এই জগদেকমল দ্বিতীয় জয়সিংহদেবের রাজ্যকালীন একখানি খোদিতলিপি হইতে জানা গিয়াছে যে চালুক্যরাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাঁহাকে সিংহেব সহিত এবং রাজেন্দ্রচোলদেবকে গজের সহিত তুলনা করিতেন।‡ মুশদি বুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যবাজ পরাজিত হইয়া চোল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বোধ হয় বহু কর্ণাটদেশীয় সৈনিক তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোলদেব যখন উত্তরাপথ আক্রমণের উদ্দেশ্যে এচাং করিয়াছিলেন তখন হয় ত কোনও ভাগ্যাবধৌ দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিক ধনধান্যপূর্ণা গোড়ভূমির খ্যাতি শ্রবণ করিয়া চোলবিত্তর বৈজয়ন্তীর রক্ষার্থে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। চোলমণ্ডল হইতে রাজেন্দ্রচোলের বিজয়বাহিনী উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমায় গঙ্গাতীর পর্যন্ত দেশ বিজয় করিয়া সম্ভবতঃ গঙ্গোত্তরণকালে প্রথম মহীপালদেব কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল প্রত্যা-বর্তন করিলে সেই ভাগ্যাবধৌ সৈনিকপুত্র সম্ভবতঃ বাঢ়দেশে বাস করিয়াছিল, তাহারই বংশে সামন্তসেনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবগাড়াপ্রশস্তি ও বজ্রালসেনের তাম্রশাসন উভয়ের উক্তি সত্য, সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষ্মীলুঠনকারী দুর্ভাগ্যগণকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে রাঢ়মণ্ডলে শত্রুসৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া তিনি বিদেশীয়-গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ়-মণ্ডলবাসীগণ বধাসাধ্য বিদেশীয় কষ্টকোন্মলনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেশে প্রকৃত রাজশক্তির অভাব হওয়ায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সামন্তসেন রাঢ়বাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াও জনকভূমি বিম্বৃত হইতে পারেন নাই, বাদ্গালদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াও তিনি বাদ্গালী হইতে পারেন নাই, সেই জন্যই অরিকুলাচীর কর্ণাটলক্ষ্মীর কথা তাঁহার পৌত্রের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে। বজ্রালসেনের তাম্রশাসনে সামন্তসেনের পিতৃগণ সম্বন্ধে বাহা কথিত হইয়াছে তাহাও সত্য, বর্দ্ধমানভুক্তির রাঢ়মণ্ডল সেনরাজবংশের প্রথম অধিকার, তৎপরে বিজয়সেনের পূর্বে কেহই সে অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাঢ়ীয় সেনরাজগণ পালবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, সেই জন্যই রামপালের বরেন্দ্রাভিবানে সাহায্যকারী সামন্তরাজগণের মধ্যে কোন সেনরাজের নামের উল্লেখ নাই। রাম-পালদেব যখন কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজা করিয়াছিলেন তখন বোধ হয় হেমন্তসেন রাজ্যচ্যুত হইয়া সামান্ত ব্যক্তির দ্বার দ্বিগপাত করিতেছিলেন।

সেনবংশের প্রথম প্রকৃত রাজা বিজয়সেন। বিজয়সেনের যে স্বরীর্ষ প্রশস্তি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবগাড়াগ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে বিজয়সেন গোড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ করিয়া-ছিলেন, এই গোড়েন্দ্র সম্ভবতঃ মদনপালদেব, ইহাব কারণ বধাঙ্গনে প্রকৃত হইবে। বিজয়সেনের কালনির্দেশকালে রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন “লক্ষ্মণাঙ্গের মূল বাহাই হটক, আমরা কুমারদেবীর সারনাথ-

লিপিতে, “রামপাল চবিত্তে”, বৈষ্ণবদেবের এবং মদনপালের তাম্রশাসনে, বরেন্দ্রদেশের যে ইতিহাস প্রাপ্ত হই, তাহাব উপব নির্ভর করিতে গেলে, দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পূর্বে বিজয়সেন কর্তৃক বরেন্দ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব বোধ হয়।” কুমারদেবীর দাবনাথলিপিতে, “রামপাল-চরিত্তে” বা বৈষ্ণবদেব ও মদনপালের তাম্রশাসনে এমন কোন কথাই নাই যাহাব উপব নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বিজয়সেনকে ষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিষ্কপ করা যায়। সারনাথে আবিস্কৃত প্রথম মহীপালদেবের খোদিতলিপি-হইতে জানা যায় যে মহীপালদেব ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে পর্যন্ত বিজয়মান ছিলেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা হইলে পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাসের নিম্নলিখিত পর্যায় লিখিত হইতে পারে :—

খ্রীষ্টাব্দ ১০২৫—প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু।

“ ১০৪০—নবপালদেবের মৃত্যু। (গয়ার কৃষ্ণধারিকামন্দির ও নরসিংহমন্দিরের খোদিতলিপি ১৫শ বাজ্যাকে উৎকীর্ণ)।

* “ ১০৫৩—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যু। (আমগাছিব তাম্র-শাসন ১৩শ বাজ্যাকে উৎকীর্ণ)।

* “ ১০৫৫—২য় মহীপালদেবের মৃত্যু।

“ ঐ —২য় শুবপালদেবের মৃত্যু।

“ ১০৯৭—রামপালদেবের মৃত্যু। (চণ্ডীমোরেব শিলালিপি ৪২শ বাজ্যাকে উৎকীর্ণ)।

“ ১১০০—কুমারপালদেবের মৃত্যু।

“ ঐ —৩য় গোপালদেবের মৃত্যু।

* “ ১১০৫—বিজয়সেনদেব বর্জুক দক্ষিণ বরেন্দ্র জয়।

* “ ১১০৯—উত্তর বরেন্দ্র মদনপালদেব কর্তৃক তাম্রশাসন প্রদান।

* “ ১১১৪—মদনপালদেবের মৃত্যু। (জয়নগরের খোদিতলিপি ১৪শ বাজ্যাক)

“ ১১১৯—বজ্রালসেনের মৃত্যু।

* “ ১১২৫—লক্ষ্মণসেন কর্তৃক বরেন্দ্র বিজয় ও পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন।

তাবকাচিহ্নিত তারিখগুলি ব্যতীত অপরগুলি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। “রামচবিত্ত” হইতে জানা গিয়াছে যে গাংড়বালবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধু ছিলেন :—

সিহৌস্তবিক্রান্তেন্দ্রার্জুনধামা ভুব প্রদীপেন।

কমলাবিকাশভেজজিভিষজাচন্দ্রেণ বজ্রনোপেতম (তাম্) ১২০

চণ্ডীচরণসরো [জ] প্রসাদমস্পয় বিগ্রহশ্রীকং।*

ন গুণ মদন সাংদেশশীশমগাদ জগবিজয়লক্ষ্মীঃ ১। ২১)

কালকুজাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রমসম্বৎসরে = ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ছই তিন বৎসর পূর্বে কালীব নিকট চন্দ্রাবতীগ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছে। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রদেব বাগাণীতে জিলোচন যন্ত্র প্রদান করিয়া বামনস্বামী শর্মাকে যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহাব তাম্রশাসন তৎপুত্র মদনপাল কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপুত্র গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গা-তীরবর্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, স্ততরাং সে সময়ে তাঁহার পিতা মদনপালদেব নিশ্চয়ই সিংহাসনারোহণ

† South Indian Inscriptions, Vol. III. No. 18, P. 27.

‡ Indian Antiquary, Vol. V, P. 15; Mysore In-
scriptions, No. 72, P. 148.

* Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol.
III, P. 52.

করিয়াছেন ও তাঁহার পিতামহ চন্দ্রদেব স্বর্গগমন করিয়াছেন। অতএব সৌভাগ্যবশত মদনপালদেব ১১২০ হইতে ১১২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। ভরসা করি রমাশ্রমাদ বাবু বিজয়সেনকে স্বাধীন ও স্বাধীন বৃত্তিরপক্ষে নিক্ষেপ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতে পাইবেন না।

বিজয়সেনদেব সম্বন্ধে রমাশ্রমাদ বাবু বাহা প্রকাশ করিয়াছেন তদবধি বিশেষ কিছু বলিবার নাই, পৌড়বঙ্গে বিদেশীয় শত্রুর অবস্থান-হেতু স্যেসোমুখ প্রাচীন পালসাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। রাঢ়ের লক্ষ্যে বিজয়সেন যে ত্রুটি হইয়াছিলেন মিথিলায় নাগদেবও সে কার্য সাধন করিতেছিলেন। অবশেষে ভূকণ্ড সৈনিকের আগমনে ত্রুটি উল্লম্বিত হইয়াছিল। নাগদেবের জ্ঞান বিজয়সেনের দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীরাজবংশের পূর্বের বিজয়সেনদেবের একখানি তাম্রশাসন পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনের স্বাধিকারী উহা মহাভোগপাধ্যায় ভাস্কর্য্যের সত্যশচর্য্য বিদ্যাক্ষরপত্র পাঠ্যকারের লক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পব বহুদিন উহার সন্ধান পাই নাই। সম্রাট সত্যবাহু প্রভৃতিবিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারী রায় বাহাদুর বি. বেক্ষ্য কলিকাতার বার্ড কোম্পানীর কার্যালয়ের জনৈক ইরাজ কর্মচারীর নিকট হইতে তাম্রশাসনখানি পাঠ্যকারের লক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট উহা দশ পনের মিনিটের লক্ষ্য দেখিয়াছিলাম, বিজয়সেনের পত্নী মহাবাহী বিলাসদেবী তুলাপুত্র ব্রত করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণাধর্য্য বিজয়সেন তাঁহার ৩১ বা ৩২ রাজ্যকে পুণ্ড বর্ধন-ভূক্তির বিক্রমপুত্র মণ্ডলের একখানি গ্রাম শান্তিয়া গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে এই তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। স্তত্র্য্য বন্ধে তখন বর্ধমান রাজ্যের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল। হরিবর্ষদেবের কাল সম্বন্ধে অতাবধি যেসমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাব বিশেষ বিশ্লেষণ আবশ্যক। সম্রাট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হরিবর্ষদেবের ১২ রাজ্যকে লিখিত একখানি অষ্টমহাবিক্রা প্রজাপারমিতা সংগৃহীত হইয়াছে। অনন্ত বাহদেব মণিরের ভবদেব ভট্টের প্রাপ্তি, হরিবর্ষদেবের তাম্রশাসন ও এই নূতন গ্রন্থের অক্ষরাবলী বিশ্লেষণ করিয়া হরিবর্ষদেবের কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার লক্ষ্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক। হরিবর্ষদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পক্ষে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি সম্ভবতঃ রামপালদেবের পূর্ববর্তী এইসময় বলা যাইতে পারে।

“বিজয়সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বঙ্গালসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সমগ্র সৌভাগ্যে করায়ত্ত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।” এই উক্তি কোন প্রমাণ আছে কিনা জানি না, যদি থাকে তাহা রমাশ্রমাদ বাবুর নিকট সম্বন্ধেও আছে। “বঙ্গালসেন, স্বীয় অতীত সাধনের লক্ষ্য, পালসাম্রাজ্য উন্মূলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।” এই উক্তি মূল সত্য আছে কিনা তাহাও প্রমাণেরই বলিতে পারেন, যদি থাকে তাহা তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থে বা কোন পুরাতন গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমার ধারণা যে পূর্বসম্বন্ধের বশবর্তী হইয়া রমাশ্রমাদ বাবু বঙ্গালসেনের এই অনুলক প্রশংসাবাদ স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। “বর্ধমানকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া, বঙ্গালসেন বঙ্গ বা রাঢ়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন,” ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। বিজয়সেন যে বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার নবাবিকৃত তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। বর্ধমানের হরিবর্ষদেব ইহার বহুপূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহার তাম্রশাসন ও ভবদেব ভট্টের খোদিতলিপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হরিবর্ষদেবের কাল-নির্দেশের উপায় ইতস্ততঃ বিকল্প ছিল, সম্বন্ধে সংগৃহীত হইতে পারিত এবং সম্ভবতঃ রমাশ্রমাদ বাবুর পুস্তকখানিকে অধিকতর মূল্যবান করিয়া

তুলিত। বঙ্গালসেন সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য কথা এই যে বর্তমানভূক্তির উত্তর রাঢ়মণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এবং তিনি অনুন একাদশ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিজয়সেন ৩১ বা ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার কিয়দশকাল রাঢ়ে সামান্য ভূস্বামী হইয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যের বহুদল শিবির হইলে বিজয়সেন বঙ্গদেশে পালক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সম্বন্ধে হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বঙ্গালসেনের রাজত্বকাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। বঙ্গালসেন সত্যই কোলীজপ্রথার প্রতিষ্ঠাতা কিনা অসম্ভব সত্য প্রমাণ অতাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কোলীজপ্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। যদি কোনদিন প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বঙ্গালসেনের সময়ে কোলীজপ্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইলে মুক্তি হইবে যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মমুখারী ও প্রাচীন পালসাম্রাজ্যবংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয়সেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কারয়জ্ঞাতন্ত্র মধ্যে অভিজাত্য স্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বঙ্গালসেনের সময়ে আধিপত্য ও পক্ষ ব্রাহ্মণধর্ম্ম সম্বন্ধে উপাধ্যান স্থাপিত করিয়া নূতন অভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কিনা সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপাহীনদেশে অভিজাত্যের নাজাত বৃদ্ধি বৃদ্ধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোঝে ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে। সম্রাট বর্ধমান জেলায় কাটোয়া নব-ভিবিজনের অন্তর্গত সীতাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত বঙ্গালসেনের নূতন তাম্রশাসনে বঙ্গালসেন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই প্রাপ্ত বায় না, বাহা পাওনা বায় তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

লক্ষ্মণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধে দুইটি কথা আছে। প্রথমতঃ ভাস্কর্য্যের গণনা এবং আবুল ফজলের গ্রন্থ অনুসারে স্থির হইয়াছে যে লক্ষ্মণ-সম্বৎ গণনা ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ-সম্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত হইয়াছে :—

(১) লক্ষ্মণসম্বতের একটি উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহর্ষি বাবু নগেন্দ্রনাথ বহু বলিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেন যে সময়ে লক্ষ্মণগ্রহণ করেন সে সময়ে বঙ্গালসেন মিথিলায় মুজ্জাব্রা গিয়াছিলেন। হঠাৎ জনরব হয় যে বঙ্গাল যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, সেই সময়ে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে ছুটি হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ বঙ্গালসেন নবজাত পুত্রের নামে তাহার লক্ষ্মণ হইতে এই সম্বৎ গণনার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(২) বাবু মনোমোহন চন্দ্রবর্তী বলিয়াছেন যে সামন্ত সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নূতন অর্থ গণনার স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং পরে ইহা লক্ষ্মণসেনের নামে প্রচলিত হইয়াছিল।

(৩) রমাশ্রমাদ বাবুর মত “পাল এবং সেন রাজ্যগণের সময় সৌভাগ্যমণ্ডল শকাব্দ বা বিক্রম-সম্বৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল; নৃপতিগণের বিজয় রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন বংশের রাজ্য নষ্টের পর, কিছুদিন ‘বিনষ্ট রাজ্যের’ বা ‘অতীত রাজ্যের’ সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অর্থের অভাব পূরণের লক্ষ্যে, ‘লক্ষ্মণাব্দ’ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে।”

প্রথম দুই মত সম্বন্ধে বাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। রমাশ্রমাদ বাবুর মতানুসারে লক্ষ্মণসেন ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে

লক্ষণসেনের বাজ্ঞকালেই বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপির উৎকর্ষ হইয়াছিল। লক্ষণসেনের মৃত্যুর দিন হইতে লক্ষণাঙ্গ গণনা করিবার কথা রমাএসাদ বাবুর ভ্রাতৃ বাজ্ঞের নিকট হইতে প্রত্যাশা করি নাই। শুনিয়াছি ঐচ্চবিজ্ঞানহার্ণব বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। ঐযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ও তাঁহার প্রতিবাদে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। রমাএসাদ বাবু বলেন “সুতরাং ‘ঐমল্লক্য’ সেনমুদ্রাভীত রাজ্যে সং ১১১১ খ্রীষ্টাব্দরূপে গ্রহণ না করিয়া, [আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণসেনের মৃত্যু ধরিয়া,] ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই সিদ্ধান্তের এক আপত্তি আছে। লক্ষণসেনের ‘অভীত’ রাজ্য হইতে কোন সখৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই। উক্তবে বলা যাইতে পারে—গোবিন্দপাল দেবের ‘গতরাজ্য’ বা ‘বিনষ্টরাজ্য’ হইতেও কোন সখৎ প্রচলিত নাই। পঞ্চাঙ্কের গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সখৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই।” * সক্ষেপে এই বুঝা যাইতেছে যে রমাএসাদ বাবু বলিতে চাহেন যে বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপি ছইটির কাল লক্ষণসখৎ অনুসারে গণিত নহে, লক্ষণসেনের মৃত্যু বা সিংহাসনচ্যুতির তারিখ হইতে গণিত। সুতরাং লক্ষণসখৎতের যেসকল তারিখ অত্যাধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় সত্য। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুকাল হইতে বৎসর গণনা করিতে কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? ভারতবর্ষে এরূপ ঘটনা কোন কালে দেখা যায় নাই। শুধু লক্ষণ-সখৎ নহে শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ ব্যবহার কালেও “অভীত” শব্দের প্রয়োগ দেখা গিয়াছে। বিক্রম-সখৎ সখৎ বর্ষার ডাক্তার কিলহর্ণ একটি উদাহরণ দেখাইয়াছেন।† বিলাতে কেছিজ বিখ্যাতশালয়ের পুস্তকাগারে ১৫০৩ বিক্রমাব্দে লিখিত “কালরূপ তন্ত্র” নামক একখানি গ্রন্থ আছে তাহার পুণ্ডিকার লিখিত আছে “পরম-ভট্টারকেত্যাচারি রাজাবলী পূর্ববৎ ঐমল্লক্যাদিত্যদেবপাদানামভীত রাজ্যে সং ১৫০৩ ইত্যাদি।”‡ ইহার পব ডাক্তার কিলহর্ণ উত্তরাপথের খোদিতলিপিসমূহের তালিকা সম্বলনকালে “অভীত” শব্দযুক্ত বিক্রম সখৎসরানুসারে গণিত বহু খোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছেন।§ আবার কতকগুলি খোদিতলিপিতে দেখা যায় যে বিক্রম-সখৎসর গণনাকালে নিম্নলিখিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে :—

“ঐমল্লক্যাদিত্যোপাদিত সখৎসবর্ণতেষু ঘাটশাহ ত্রিষষ্টোত্তরেণ।” ||

“শকনুপতি-রাজ্যান্তিবক-সবৎসরেবতিকাশ্বেষু গঞ্চু শভেযু।” ১০৬

* সৌড়-রাজমালা, পৃঃ ৬৪।

† Indian Antiquary, Vol. XIX, P. 2, Note, 3.

‡ Bendall's Catalogue of Buddhist. Sanskrit Manuscripts in the Cambridge University Library, p. 70.

§ Epigraphia Indica, Vol. V. Appendix.

|| Indian Antiquary Vol. VI, P. 194; Kielhorn's list No. 191. = Epigraphia Indica, Vol. V. App. p. 28. রমাএসাদ বাবুর মতানুসরণ করিতে গেলে বলিতে হইবে যে বিক্রম-সখৎসরের কতকগুলি তারিখ বিক্রমাদিত্যের অভিব্যেককাল হইতে এবং কতকগুলি তারিখ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুকাল হইতে গণিত হইয়া আসিয়াছে। সেইরূপ শকাব্দ গণনাকালে দেখা যায় যে উত্তর প্রকার বাক্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাদামিগুহার চালুক্যবংশীয় রণবিক্রান্ত মঙ্গলেশ্বরের খোদিতলিপিতে দেখা যায় যে শকাব্দ কোন শক নুপতির অভিব্যেককাল হইতে গণিত হইয়াছে :—

* Indian Antiquary, Vol. III, P. 505, Vol VI. p. 363, Vol. X, P. 58.

কিন্তু ঐ চালুক্যবংশীয় সত্যেশ্বর দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোলেব খোদিত-লিপিতে দেখা যায় :—

সম্পাদিতবৃত্তেষু গতেষ্বেষু গঞ্চু।

গঞ্চমৎ কলোকালে বট্টু গঞ্চশতাংহত।

সমাসসমাপ্তিতাং শকানামপি ভূভুজাম।” +

সুতরাং “অভীত” বা “গত” শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ব্যবহৃত অব্দ রাজ্যাক্ষ নহে, কিন্তু কোন অব্দ বিশেষ হইতে গণিত হইয়াছে এবং কোন রাজার রাজ্যচ্যুতি বা মৃত্যুকাল হইতে গণিত হইতে পারে না। ডাক্তার কিলহর্ণের গণনায় বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত লক্ষণসখৎসরের গণনা যে তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বোধগম্যর খোদিতলিপির ব্যবহৃত অব্দও সেই তারিখ হইতে গণিত হইয়াছিল।‡ আকবরের মন্ত্রী লক্ষণসখৎ গণনারত্তের যে কাল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপির ব্যবহৃত অব্দ সেই কাল হইতে গণিত হইয়াছে। “অভীত” শব্দ ব্যবহার করিয়া লেখক জানাইয়াছেন যে মহারাজাধিরাজ লক্ষণ-সেনদেব তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষণসেনের পুত্রদ্বয় তাঁহা-মিগেব ভাঙ্গশাসনে ল গণসখৎ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু ইহা হইতে বলা যাইতে পারে না যে লক্ষণসেনের ব্যবহার তৎকালে ছিল না। রমাএসাদ বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে লক্ষণসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ সম্ভবতঃ সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্রোষ্ঠ প্রাতা হয় ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লক্ষণাঙ্গ এতলনে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাব প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নিজ নিজ রাজ্যাক্ষ ব্যবহার করিতেন। সে বাহাই হউক, সেন বংশের নূতন খোদিতলিপি বা ভাঙ্গশাসন আবিষ্কৃত না হইলে এ কথার সীমাসী হইতে পারে না।

লক্ষণসেন সখৎ দ্বিতীয় কথা এই যে এখন এমন একটা সময় আসিয়া গড়িয়াছে বাহাতে সংস্কৃত সাহিত্য এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। খোদিতলিপি ও প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে লক্ষণসেন ১১১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলগ্রন্থসমূহ হইতে এবং “দানসাগর” ও “অভুতসাগর” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ১০৮১ শকে বজ্রালসেন অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন ও ১০৯১ শকে তিনি “দানসাগর” রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ১১১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কিছুতেই লক্ষণসেনের মৃত্যু হইতে পারে না। একপক্ষে লক্ষণসেনের সমসাময়িক খোদিতলিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি ও অপর পক্ষে খ্রীষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত কতকগুলি কুলশাস্ত্র, বর্ধশাস্ত্র ও জ্যোতিষের গ্রন্থ। কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অত্যাধি ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য হয় নাই, কিন্তু “দানসাগর” বা “অভুতসাগর”র বচনগুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য। রমাএসাদ বাবু “দানসাগর”র শ্লোকগুলির অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্ত দেখাইয়াছেন যে অনেকগুলি পুঁথিতে শ্লোকগুলি আছে। কিন্তু যদি এইরূপ শত শত গ্রন্থেও এই শ্লোকগুলি সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত থাকিত তাহা হইলেও তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। “দানসাগর” সখৎও এই কথা বলা যাইতে পারে। বোম্বাইয়ের, কাশ্মীরের বা বঙ্গদেশের সমস্ত “দানসাগর” ও “অভুত-সাগর” গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বজ্রালসেন এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া তাহার পরে আধুনিক

+ Epigraphia India, Vol. VI, P. 4.

‡ Indian Antiquary, Vol. XIX, P. 7.

নাগরী বা বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থাবলি লিখিত হইয়াছে। বঙ্গালসেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশতাব্দী অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই গ্রন্থ কতবার লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বঙ্গালসেন এতদেশে আভিজাত্য-ভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভিজাত্যের অমুরোধে এখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যসমাজে কৃত্রিম বংশপত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদেশীয় ধনিগণ কতশত কুলশাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোন তারিখ সভ্য প্রমাণ করাইবার জন্য কোন ব্রাহ্মণ হয় ত “অদ্ভুতসাগর” ও “দানসাগরে” মানবাচক শ্লোক কয়টি রচনা করিয়া যোগ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থসমূহের অমূল্যিগুণ নানা দেশে নীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত অমূল্যিগুণ প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলি নাই, তখন সেগুলিকে প্রকৃষ্ট ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। “দানসাগর” ও “অদ্ভুতসাগর” ব্যতীত “সদ্বিক্তিকর্ণামৃত” এইরূপ মানবাচক কয়েকটি শ্লোক আছে, কিন্তু সেগুলিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি কেহ কোনদিন সত্যাকরনশীল-বিরচিত “রামপাল-চরিতের” জ্ঞান অথবা ময়ীপালদেব, নরপালদেব, বিগ্রহপালদেব, রামপালদেব বা হরিবর্ষদেবের রাজ্যকালে লিখিত “অষ্টসাহস্রিকা” প্রজ্ঞাপারমিতার জ্ঞান প্রাচীন গ্রন্থে পূর্বোল্লিখিত শ্লোকগুলি আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন উহা ইতিহাসক্ষেত্রে সাধারণ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। কোন হান অঙ্ককার থাকিলে আলোকের আবশ্যক হয়, কিন্তু বহু: আলোকিত ক্ষেত্রে আলোক আনিলে তাহা দ্বন্দ্ব হইয়া যায়। সেইরূপ অক্ষরতত্ত্ব বা মুদ্রাতত্ত্ব প্রমাণের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্যের প্রমাণ উপস্থিত করিলে তাহা গ্রন্থ হইবার আশা থাকেনা। বাল্যমুতিজ্ঞানিত বঙ্গালসেন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিলে তাহা সহজে গ্রন্থ করিবার ইচ্ছা হয় না। চিরপ্রত্ননামা “দানসাগর” ও “অদ্ভুতসাগর” গ্রন্থদ্বয়ে কোন অংশ প্রকৃষ্ট বলিতে সন্দেহ বড় বাধা লাগে। বংশগত আভিজাত্যভিমান আসিয়া আশাশ্রিতকে আচ্ছন্ন করে। যদি কোন স্বদেশীয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কোন অংশকে পরমজ্ঞানীকালের রচিত বলিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে কুলাঙ্কর বলিয়া মনে হয়। জীবনের লক্ষ্য সার সত্যের অনুসন্ধান নেত্রপথ হইতে অপ্রস্তুত হয়, সুতরাং জাত্যভিমানজড়িত ঘটনার বিশ্লেষণ বিশেষীর হস্তেই অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়।

রমাশ্রম বাবু কি লক্ষ্য করেন নাই যে সেনরাজগণের তাম্রশাসনসমূহে কোলিঙ্গপ্রধার নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই? বঙ্গালসেন, লক্ষণসেন, কেশব-সেন, ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনসমূহে তাম্রশাসনগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের উল্লেখকালে বঙ্গালসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের কোন কথাই নাই। বঙ্গালসেন যদি গৌড়বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কোন নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার কথা তাম্রপট্রে উৎকর্ষ হইত। হয়ত বঙ্গালসেনের ১১শ রাজ্যাকের পরে এই নূতন অভিজাতসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে লক্ষণসেনের তাম্রশাসন-চতুষ্টয়ে এবং কেশবসেন এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? ভরসা কবি ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এই কঠিন সমস্যা পুরণের চেষ্টা করিবেন।

“গৌড়রাজমালা” ৬৪ পৃষ্ঠায় রমাশ্রম বাবু কিঞ্চিৎ অক্ষরতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। ১২৩২ সম্বৎসরে গোবিন্দপালদেবের গয়ার শিলালিপি সহিত এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত বৃদ্ধগয়ার খোদিতলিপিষদের অক্ষরসমূহের তুলনা করিয়াছেন। বস্তুত: এই খোদিতলিপিষদের অক্ষরতত্ত্ব বিশ্লেষণ কিঞ্চিৎ কঠিন। ভারতের-ইতিহাসে সর্বসময়েই দেখা গিয়াছে যে সভ্য জগতের প্রাচ্যে

সভ্যজগতাপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি সাধারণত: ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আসামের বঙ্গভূমির তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত বৃদ্ধগয়ার খোদিতলিপিষদের অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না, কিম্বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। সাধ-রণত: গৌড়বঙ্গে যে আকারের অক্ষর খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই আকারের অক্ষর কামরূপে ১২শ শতাব্দীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বাহা বঙ্গে ১২শ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহা চট্টগ্রামে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। পুনরপি তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত শিলালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না। একই ব্যক্তির তাম্রশাসনের ও শিলালিপির অক্ষর ভিন্ন একাকারের, গৌড়বাল রাজবংশের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনা কবিলে রমাশ্রম বাবু এই কথা ক্ষমদ্রব্য করিতে পারিবেন। “বঙ্গদর্শনে” “লক্ষণসেন ও মুসলমান বিজয়” নামক গ্রন্থের প্রথমেই গয়ার যে চারিটি খোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছি তাহা অশোকচক্রদেবের সময়ের, কিন্তু তদন্থে দুই একাকারের হস্তলিপি আছে। লক্ষণ-সম্বতের ৫১ অব্দের খোদিতলিপি ও বৃদ্ধগয়া-স্মি-প্রস্তরের শিলালিপি অতি অবস্থের সহিত খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর “মহাজলীঘতে” উৎকর্ষ, অক্ষরতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইলে সূর্য্যমন্দিরের ১৮১৩ বৃ-পরিমিতলিপিষদের শিলালিপি ও বৃদ্ধগয়ার লক্ষণ-সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের শিলালিপির অক্ষর ব্যবহার করা উচিত। ১২শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদ মগধে মাগধী লিপির হুচনা দেখা গিয়াছিল, সুতরাং উহাও তক্ষরের সহিত পূর্বোক্ত শিলালিপিষদের অক্ষরের তুলনা হওয়া উচিত কিনা তাহা বিচার্য্য। অশোকচক্রদেবের সমকালীন গয়া ও বৃদ্ধগয়ার শিলালিপি-চতুষ্টয় সম্বত: কোন গৌড়বাসী কর্তৃক উৎকর্ষ রমাশ্রম বাবু দেবপাড়া-প্রস্তর অক্ষরাবলীর সহিত পূর্বোক্ত শিলালিপি-চতুষ্টয়ের অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই তাহা বৃদ্ধিতে পারিবেন। বৃদ্ধগয়ার লক্ষণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের ও গয়ার সূর্য্যমন্দিরের ১৮১৩ বৃ-পরিমিতলিপিষদের শিলালিপিষদের অক্ষরের সহিত চাকাব নবাবিযুক্ত চণ্ডীমূর্তির পাথরীস্থিত লক্ষণসেনের তৃতীয় রাজ্যাকের খোদিতলিপির অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই বৃদ্ধিতে পারিবেন যে “গ” ও “ন” একই একাকারের। এতদ্ব্যতীত “ল,” “ব,” “শ,” “স,” “ক” প্রভৃতি ১২শ শতাব্দীর প্রমাণাকর সমূহ (Test letters) তুলনা করিলেই বৃদ্ধগয়ার খোদিতলিপিগুলি যে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ পাদের তৎসম্বৎ কাহারও কোন সম্ভেহ থাকিবে না।

শ্রীরাধালাল দাস লম্বোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—কাশীধাম

ভারতের অতি প্রাচীন পুণ্যতীর্থ কাশীধামে বহুযথাক সংসার-বিরাগী, মুক্তিপ্রার্থী, নিষ্কিঞ্চন সাধক, জ্ঞানসিপ সু শত শত বিচারী এবং দেহান্তে পরাগতি লাভের আশায় সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া বাস করেন। এইরূপ নানা কারণে ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে নানা জাতীয় লোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। মানবজীবনে শারীরিক ব্যাধি ও বিপদাপদ যে চির-

দিনের সহচর সে কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে। এইরূপ বিপদের সময় অসহায় প্রবাসীরা যে কি শোচনীয় অবস্থা হয় সে বিষয়ে বাহাদুর চাক্ষুষ অভিজ্ঞান আছে কেবল তাঁহাদের পক্ষেই প্রকৃত ধারণালাভ সম্ভব হইয়া থাকে। সাধু সন্ন্যাসী, তরুণবয়স্ক বিদ্বান্ধী এবং প্রবাসাগত ভীষণাঙ্গী নবনারীদের সাহায্যের জন্য ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা যে কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই সে কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ধর্মপরায়ণ সঙ্গতি-সম্পন্ন হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই পুণ্যকর্মজ্ঞানে এখানে সত্রশালাব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। এই সমুদয় সত্রশালার সংখ্যা যদিও তত অধিক নহে তথাপি উহা হইতে বহুসংখ্যক নিষ্কিনন সাধু, দরিদ্র বিদ্বান্ধী এবং অসহায় ব্রাহ্মণবংশীয় নবনারী যে নিরমিতরূপে প্রতিদিন সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছেন সে বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণের জাতি এবং শারীরিক অসুস্থতা অথবা বার্দ্ধক্য বশতঃ বাহারা সত্রালয়ে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহারা তথাকার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কয় অবস্থায় অসহায় নরনারীর আশ্রয় ও সেবার জন্য এখানে তিন চারিটা হাঁসপাতাল ও একটি অনাথালয়* বহুদিবস হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী হুঃস্থ লোকসংখ্যার তুলনায় উপরি উক্ত সত্রালয়, অনাথালয় ও হাঁসপাতালগুলির কার্য করিবার শক্তি অতি সামান্য। সেজন্য পথে, ঘাটে, ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে প্রায়ই অনাথ, ক্রম ও ক্ষুধার্ত নরনারীকে অতি শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এখানে অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন বাহারা সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া হুঃস্থের জীবনের নানাবিধ যত্ননা নীরবে সহ করিয়া থাকেন। ইহারা আমাদের সঙ্গতি-হীন মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রমহিলা। নানারূপ হুঃস্থ ও ক্লেশ সহ করিলেও ইহারা কাহারও ঘরস্থ হইতে প্রকৃত নহেন। অর্থাভাবে ইহারা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যেসকল গৃহে ইহারা বাস করেন তথায় স্বয়ংক্রিয় একেবারেই প্রবেশ করিতে পারে না এবং

সেজন্য গৃহগুলি এত অধিক অন্ধকারময় যে দিবাভাগেও তন্মধ্যে আলোক সাহায্যে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহগুলি আবার অতিশয় স্যাংসেতে ও দুর্গন্ধময় বলিয়া মনুষ্যবাসের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অস্বপযোগী। বিদ্বান্ধী বালকেরাও সাধারণতঃ কপর্দকশূন্য। ইহারা সুস্থাবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোনরূপে দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লোকেরা যখন রোগে উৎখানশক্তি-রহিত হইয়া পড়েন তখন ইহাদের সমুদয় সাহায্যলাভের পথ এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কারণ সত্রালয় ও হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিলেই সাহায্য লাভের সম্ভাবনা নচেৎ নহে। সেজন্য সে সময় ইহাদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে সে বিষয় বোধ হয় লিখিবার আবশ্যক কবে না। এরূপ অবস্থায় অনেকে আবার ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও অন্যান্য নানা কাবনে পূর্বোক্ত অনাথালয় ও হাঁসপাতালে যাইতে চাহেন না। উপরি উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পুণ্যভীর্ণ কালীধামে আমাদের অসহায় হুঃস্থ দেশবাসীর সেবার জন্য একটা বিশালক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

স্বনামধন্য, পুণ্যপ্রোক, জন্মভূমির মুখোচ্ছলকারী; বঙ্গের চিরগৌরব, সন্ন্যাসীবর স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বী ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ-প্রভাবে বার বৎসর পূর্বে বহু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানবের অন্তবে জীবসেবারূপ স্মহান্ ত্রুত জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উপদেশ-প্রভাবে কতিপয় তরুণবয়স্ক বঙ্গবাসী যুবক এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা জীবনাভিনয়ের প্রথমাকাঙ্খেই সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ নিজ জীবন জীবসেবারূপ স্মহান্ ত্রুতে সমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। কালীধামে অবস্থান কালে পথে বাহির হইলেই তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে গঙ্গাতীরে ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে অসহায় অবস্থায় ক্রম ও দরিদ্র বহু লোক পড়িয়া রহিয়াছে। এরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া কালীধামেই তাঁহারা তাঁহাদের মহান্ উদ্দেশ্য প্রথমে কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম করেন। সে সময় ১৯০০ সালের ১৩ই জুন তারিখে ইহাদের মধ্যে একজন প্রত্যয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে দেওনাথপুরায় পথের পাশে অশীতি বর্ষীয়া

* এটা ভিক্টোরিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে অপেক্ষাকৃত হুঃস্থ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া হয়।

একজন বাঙ্গালী জীলোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে তাঁহার কথা কহিবাব শক্তি ছিল না। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবাব পৰ অতি ক্রীণ কষ্ট তিনি বলিলেন “হুটী ভাত খাব—চার দিন কিছু খাই নাই।” যুবকটীর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না বলিয়া তিনি নিজ কোনরূপ অর্থসাহায্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তিনি বাজারে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া চারি অন্ন পয়সা সংগ্রহ করিলেন এবং তদ্বারা কিছু দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া বৃদ্ধকে আহ্বান করাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি একজন বন্ধুর বাটী হইতে অন্ন আনিয়া বৃদ্ধকে ভোজন করাইলেন। সন্ধ্যার সময় পুনরায় আসিয়া তিনি তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটা বাটীর চৌতারায় বৃদ্ধার সে রাত্রি সাপনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেদিন রাত্রি বৃষ্টি হওয়ায় পৰদিবস প্রাতঃকালে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে জীলোকটি শীতে ধর-ধর করিয়া কাঁপিতেছেন। একখানি অতিশয় জীর্ণ ও মলিন পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন বৃদ্ধার গায়ে অপর কিছুই ছিল না। উঁহাকে তাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় দেখিয়া তিনি নিজ উত্তরীয়খানি এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং অতি কষ্টে কোন স্থান হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া সে দিবসের মত তাঁহাব জীবন রক্ষা করিলেন। তারপর গঙ্গাতীরস্থ কোন স্থানে তাঁহাকে রাখিয়া যুবকেরা নিজহস্তে তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করেন এবং ঘরে ঘাবে ভিক্ষা সংগ্রহ পূর্ব্বক দৈনিক আহ্বানের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। প্রথম তিন মাস ইঁহারা দুঃস্থ অনাথাদিগের এই ভাবেই সেবাদি করিয়াছিলেন এবং রুগ্ন অসহায় লোকদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা সাহায্য করিয়া আসিতেন। প্রায়-
জন বিবেচিত হইলে কোন কোন রোগীকে ইঁহারা নিজেদের ব্যয়ে ভেলুপুর কিল চৌকাবাটী হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই ইঁহাদের কার্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন একরূপ ভাবে পথে ঘাটে এবং প্রত্যেকের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া কার্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেবে একটা পৃথক সেবাশ্রম

প্রতিষ্ঠিত করা অনিবার্য্য বিবেচিত হওয়ায় ১৯০০ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়া একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করা হয় এবং তথায় প্রথম সেবাশ্রমের কার্য নিয়মিত রূপে আরম্ভ হয়। এই স্থানে সেবাশ্রমটা এক বৎসর ছিল। যুবকদিগকে এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে কার্য ক্রিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে জনসাধারণের হৃদয়ে ইঁহাদের প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কতিপয় হৃদয়বান স্থানীয় ভদ্রমহোদয়ের সাহায্যে একটা কার্যনির্বাহক সভা সংগঠিত হয় এবং সেই সভার উপর আশ্রমের কার্য নির্বাহের ভার গুণ্ড হয়। পরে উক্ত স্থানে নানারূপ অনুবিধার অল্প এবং ক্রমশঃ কার্যেরও বৃদ্ধি হওয়ায় অন্ততঃ ছয় সাত মাস থাকিয়া মাসিক দশটাকা ভাড়ায় রামাপুরা নামক স্থানে অপেক্ষাকৃত একটা বৃহৎ বাড়ীতে আশ্রমটা স্থানান্তরিত করা হইল। ১৯০৩ সালের প্রারম্ভে, বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায়, আশ্রমটিকে “রামকৃষ্ণ মিশনের” অধীনে ও তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হয়। শেষোক্ত স্থানে আশ্রমের কার্য আট বৎসর কাল পবিচালিত হইয়াছিল।

প্রথমে আট জন যুবক আশ্রমোৎসর্গ বিধানের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত জীবসেবারূপ মহদুত পালনে প্রবৃত্ত হ'ন। কিছুকাল কার্য করিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে যেরূপ কার্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা স্বেচ্ছা-রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে দু'চার জনের তজ্জ্ঞ সম্পূর্ণভাবে আত্মবিনিয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। একথা বুঝিবামাত্র তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ব্রহ্মচারী এই কার্যের অল্প নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইঁহারা এক অভিনব ভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জী, গুরু, জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে অসহায়, রুগ্ন, মুমূর্ষু, জরাগ্রস্ত ও অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সহিত সেবা করিতে লাগিলেন। অনাথ, গীড়িত ও মুমূর্ষু লোক পথে দেখিলেই আশ্রমে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। যখনই জানিতে পারিতেন যে কোন স্থানে কোন দরিদ্র জী অথবা পুরুষ রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেজন্য তাঁহাদের শিশুসন্তানের

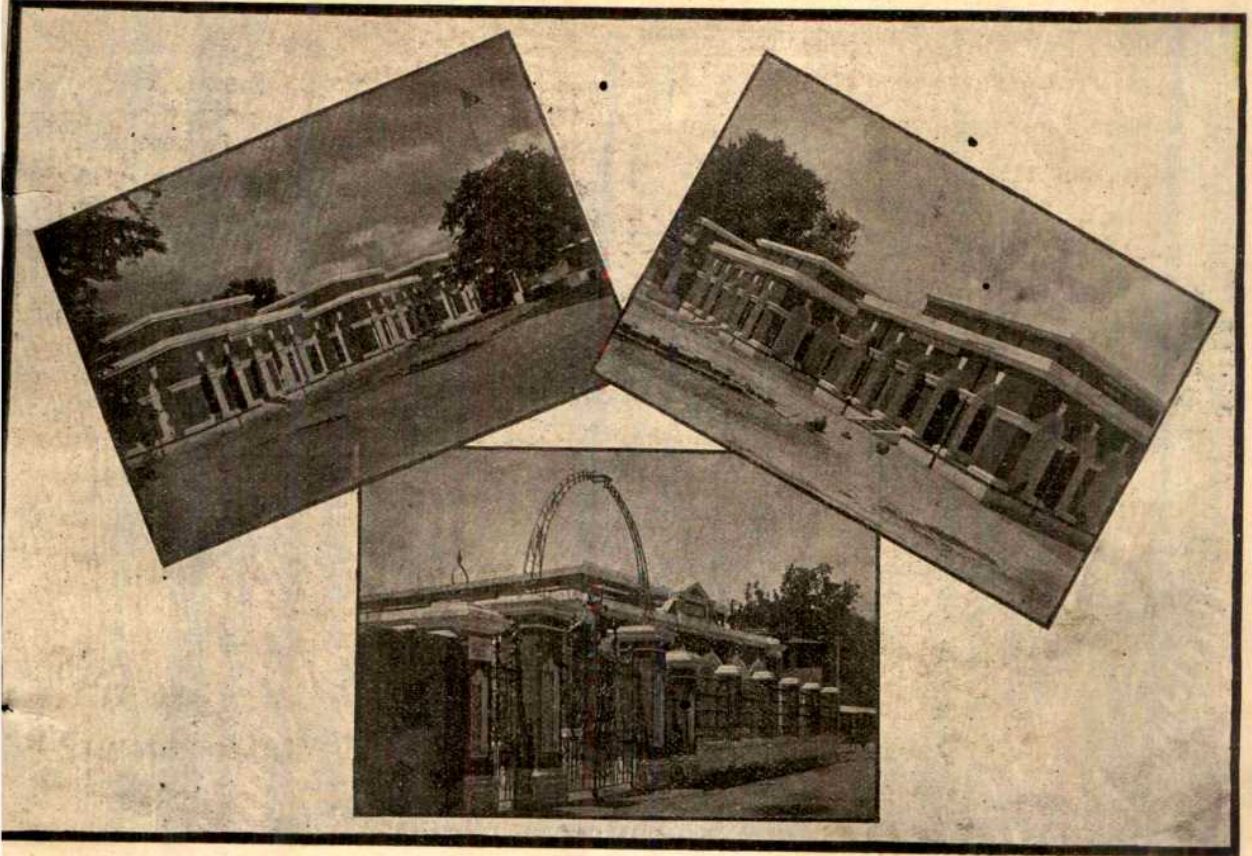
অনাহারে কষ্ট পাইতেছে তখনই তাঁহারা তথায় বাইরা বধাসাধ্য বোগীর জন্ত ঔষধ পথ্যাদি ও সন্তানদের জন্ত আহারাদিব বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেন। চলৎশক্তিহীন অথবা জরাগ্রস্ত নরনারীর গৃহে বাইরা আহারীয় প্রদান করিয়া আসা ইহাদের দৈনিক কর্মের মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল। যেসমুদয় গীড়িত বিজ্ঞার্থী ও নরনারী সরকারী অথবা জন্ত ইঁসপাতালে বাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন তাঁহাদের বাসস্থানে ডাক্তার অথবা কবিরাজ লইয়া গিয়া সাধ্যমত বোগের চিকিৎসা করিতেন। এবং অবস্থা-বিপর্যয়-হেতু যেসমুদয় মধ্যম শ্রেণীর নরনারী পরদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু প্রেরণ বিবেচনা করিয়া আত্মদান অথবা অনশনের ক্রেশ নীরবে সহ্য করিতেন তাঁহাদের সন্ধান করিয়া প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদিগকে প্রাণধারণগোপযোগী আহারীয় অথবা অর্থ প্রদান করিয়া আসিতেন। অজ্ঞাত যেসমুদয় গীড়িত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন রোগনির্ণয়পূর্বক তাঁহাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণও ইহাদের কার্যের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

ঈদৃশ দরিদ্রসেবারূপ সদমুষ্ঠানের কার্য স্ফটিকরূপে নির্বাহের জন্ত প্রথম হইতেই একটি উপযোগী আশ্রমের অভাব অনুভূত হইতেছিল এবং সেবাশ্রমের বাৎসরিক কার্যবিবরণীতে এবিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া জনসাধারণের নিকট একটি আবেদনপত্র প্রতি বৎসরই প্রকাশিত হইতেছিল। ধীরে ধীরে আশ্রমের কার্যের প্রসার এবং ইহাদের স্বার্থগক্ষণ জন্ত প্রকৃত নিষ্কাশ ও পরহিতকর কার্যাবলী দর্শন এবং লোকমুখে তদ্বিষয় প্রবণ করিয়া জনসাধারণ যে মুগ্ধ হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? এবং আরও কিছুকাল পরে কাহারও জানিতে আর বাকি রহিল না যে কতিপয় বঙ্গীয় যুবক কালীধামে এক অভূত পরসেবারূপ অমুষ্ঠানের স্বত্বপাত করিয়াছেন। ধীরে ধীরে অনেকেরই হৃদয়ে ইহাদের কার্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদয় হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে এবিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কালীবাসী কতিপয় পরদ্বারকাতর হৃদয়বান ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়েরা যুবকবৃন্দকে আনন্দচিত্তে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ

ও অতুরাগ অকুণ্ঠ রাখিয়াছিলেন। আশ্রমের কার্যবৃদ্ধির সহিত দেশের নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার সাহায্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আশ্রমের বাটী নির্মাণের জন্ত যে আবেদনপত্র প্রকাশিত হইতেছিল তাহার প্রয়োজনীয়তা, কলিকাতা এনটালি-নিবাসী দানপরায়ণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় এবং মহা উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত তারিণীচন্দ্র পাল মহাশয়, প্রথম অনুভব করিয়া মুক্তহস্তে দান করিয়া আশ্রমনির্মাণেব জন্ত অর্থগণের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত মহোদয় ৪,০০০ চারি সহস্র মুদ্রা দান করেন এবং শেষোক্ত মহোদয় নিজ জীবনব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা সঞ্চিত ২০০০ ছই সহস্র মুদ্রা দান করিয়া অপূর্ব মহত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ইহাদের সমুদয় দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বহু সম্মতি-সম্পন্ন সাধুহৃদয়ের তদনুকরণেচ্ছা জাগরিত হইয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে অনেকেই এই শুভকর্ম সাধনের জন্ত অর্থসাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে প্রায় ৬০০০ ছয় সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কালীধামের অন্তর্গত লাকসা নামক স্থানে প্রায় তিন বিঘা জমী ক্রয় করিয়া ১৯০৮ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে “রামকৃষ্ণ-মিশনের” অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহোদয় কর্তৃক আশ্রমের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। পর বৎসর আশ্রমনির্মাণকার্য সমাধা হইলে ১৯০০ সালের জুলাই মাসে তথায় প্রকৃতপ্রস্তাবে নিয়মিতরূপে কার্য আরম্ভ হয়। আশ্রমে এক্ষণে সর্বস্বত্ব ছচল্লিশ জন রোগীর আশ্রয়, সেবা ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে। জীলোক এবং পুরুষদিগকে পৃথক পৃথক ওয়ার্ডে (ward) রাখিয়া সেবা করা হয়। সম্ভ্রতি আশ্রমে কি প্রণালীতে কার্য হইতেছে সাধারণের অবগতির জন্ত সে বিষয় অতি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল:—

১। আশ্রমে রাখিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন রোগীর সেবা করা হয়। বাহার বৈরূপ প্রয়োজন তাহার জন্ত সেইরূপ ঔষধ ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত হয়। আরোগ্য লাভের পর রোগীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আশ্রমে বাহাদের মৃত্যু হয় আশ্রমের ব্যয়ে তাহাদের বখোচিত সংকার করা হয়।

২। আশ্রম হইতে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ জন



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—কাশীধাম।

রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে পথ্যাদিও প্রদান করা হয়।

৩। যেসকল রোগী আশ্রমে আসিতে অসমর্থ প্রতিদিন একপ প্রায় দশ পনর জন রোগীর নিজ নিজ বাসস্থানে চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া চিকিৎসা করা হয়। প্রয়োজন বিবেচিত হইলে পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয়।

৪। প্রতিদিন প্রায় একশত দরিদ্রকে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে চাউল ও অন্ত্র আহারীয় অথবা অর্থ প্রদান করা হয়।

৫। প্রতিদিন প্রায় চার ঘণ্টা কাল ভিক্ষা সংগ্রহ কার্যে অতিবাহিত হয় এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য পূর্বোক্তরূপে বিতরণ করা হয়।

৬। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে রেলভাড়া,

বাড়ীভাড়া প্রভৃতির অন্ত্র অর্থসাহায্যও প্রদান করা হইয়া থাকে।

গত দশ বৎসর আশ্রমে এইভাবেই কার্য চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য কার্য পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হই যে এই দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমের পর সেবকবৃন্দের অন্তরে অণুমাত্রও অবসাদের উদয় হয় নাই, বরং ইহাদের উত্তম ও আগ্রহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবসেবার অন্ত্র ইহারা আরও অধিক পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু অতিশয় ছুঃখের বিষয় যে ইহারা সে মহান উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। কারণ স্থানাভাবে ইহারা অনেক রোগীকে ক্ষুধমনে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন এবং অর্থভাবে বহু উপযুক্ত পাত্রও সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কিন্তু

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস “সদিচ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীভগবান্” নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের এই নিকাম অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। ইহাদের বর্তমান অভিলাষ ও অভাব সাধারণের অবগতির জ্ঞাত নিম্নে লিখিত হইল :—

১। স্থানাভাব বশতঃ আশ্রমে নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর সেবার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। যে সময় এখানে কোন কোন ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় সে সময় বহুলোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থানাভাবে সেবকেরা সে সময়ও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। এই উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র (ward) ওয়ার্ড নির্মাণ বিশেষ প্রয়োজন—বায় ১২০০০।

২। অসহায় সঙ্গতিহীন, অর্থহীন একশত কাশীবাসী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বাসস্থানের জ্ঞাত অপর একটি পৃথক আতুরাশ্রম—বায় ২৫০০০।

৩। আশ্রমে থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসাদি করিবেন এক্ষণে একজন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের •বাস-স্থান—বায় ৫০০০।

৪। সেবকবৃন্দের বাসস্থান—বায় ৮০০০।

অতএব এখনও সর্বমুদ্র ৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দ্বারা যে একটি মহাহিতকর কর্ম অমুষ্ঠিত হইতেছে এবং দেশের প্রকৃত ও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতবৈধ হইবে না। ইহা দ্বারা যে দেশের একটি চিরামৃত্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যিনিই আশ্রম ও আশ্রমের কার্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন অথবা লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহারই হৃদয়ে নিকাম পরার্থত্বী সেবকবৃন্দের উপর শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছে। ইহার উন্নতি বিধান দ্বারা সেবকবৃন্দের উৎসাহ ও আগ্রহ ক্রমশঃ বদ্ধিত করা কি আমাদের কর্তব্য নহে? দেশ মধ্যে ইহাকে একটি আদর্শ সেবাশ্রমে পরিণত করিয়া তুলিতে পারিলে দেশবাসীর কি উহা মহাগৌরবের বিষয় হইবে না? উক্ত আশ্রমের উন্নতি বিধানের জ্ঞাত জনসাধারণের নিকট এই আবেদনপত্র প্রকাশিত হইল এবং আমরা

আশাকরি নিয়মিতরূপে সাধ্যমত ইহার সাহায্য করিতে কেহই পরাধুত্ব হইবেন না।

• সেবাশ্রমের সাহায্যের জ্ঞাত যিনি বাহা কিছু দিবেন অমুগ্রহ করিয়া—সহকারী সম্পাদক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, লাক্ষা, বেনারসসিটি, অথবা অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ, জিলা হাওড়া,—এই ঠিকানায় পাঠাইলে উহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীহরিদাস দত্ত।

ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ

ইংলণ্ডে যখন গ্রাশতাল আর্ট গ্যালারি প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল এ যেন একটি ভাবের স্বর্গলোক, এখানে যেন বাস্তব পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যসীমারেখা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথায় ব্যবসা-বাণিজ্যের নানামুখী ব্যস্ততাময় কর্ম-স্রোত, কোথায় রাষ্ট্রীয় কলেবরের অগণিত শিরোধর্মণীর নিয়ত বহমান জীবনের আবেগচাঞ্চল্য—লণ্ডনসহরের চারিদিকের জনসমুদ্রের কর্মসমুদ্রের ফেনতরঙ্গের কল্লোলের সঙ্গে সেই শান্তসমাহিত চিত্রশালাটির যেন কোথাও যোগ নাই। তাহার কারণ গ্রাশতাল গ্যালারিতে ইতালীয় চিত্রমালার সংখ্যাই অধিক এবং সেই চিত্রগুলি ভগবান্ খৃষ্টের লোকাভীত দৈবীলীলার বিচিত্র পুরাণকাহিনীর নানা পরিকল্পনা। তাহার অদৃশ্য জগতের রহস্ত-পরিপূর, সূত্রাং দৃশ্যজগতের সঙ্গে তাহাদের বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি।

সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিল্পের আদিগুরু গিয়োটোর চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সায়োনায়, ফ্লোরেন্সে, ভেনিসে ও অন্যান্য ইতালীয় সহরে চিত্রকলার যেসকল নব নব দল সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের চিত্রগুলি গ্রাশতাল গ্যালারিতে ক্রমানুসারে সজ্জিত হইয়াছে। চিত্রের বিষয় প্রায় এক—ঐ খৃষ্টীয় পুরাণ। এক খৃষ্টের জন্মবার্তা ঘোষণা সম্বন্ধেই (Annunciation) কত অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কত গির্জার প্রাচীরে প্রাচীরে—

তাহাদের প্রতিলিপি আনিয়া আজ সকল ইউরোপীয় চিত্রশালা রক্ষা করিতেছে।

এখন অবশ্য কালের পরিবর্তন ঘটয়াছে। যে মধ্যযুগে এই অধিকাংশ চিত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই যুগকে ইউরোপ এখন অন্ধযুগ বলিয়া চলে। তখন স্বর্গ, দেবদূত, সাধুসন্ন্যাসী তাহার কল্পনাকে কবিয়াছিল, এখন সেসকল অলীক ও কাল্পনিক কথা—অতীতের কোন লোককেই ইউরোপ স্বীকার করিতে চায় না। তখন বিশ্বাস মানুষের চিত্তসিংহাসনে একলা অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছিল, এখন বিজ্ঞান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

তথাপি এসমস্ত চিত্রই শ্রাশঙ্কাল—বিশেষভাবে ব্রিটিশ বা ইতালীয় বা অন্য কোন জাতীয় নহে। ফ্রান্সেলিকো, বেলিনি, লিওনার্ডোডাভিন্সি প্রভৃতিকে অমূল্যত যুগের মানুষ বলিলেও তাহাদের কল্পনাসম্পদ হইতে ইউরোপ বঞ্চিত হইতে চায় না। এমন কি তাহাদের পববর্তী ডচ চিত্রকরগণ যেমন কবেনস্, ভ্যানডাইক্, কিছা ব্রিটিশ চিত্রকরগণ যেমন টার্নার কি হগার্থ,—তাহাদিগকেও মধ্যযুগীয় কিছা অল্পকাল পরবর্তী ফ্লোরেন্সের ওস্তাদ শিল্পীদের সঙ্গে কোন অংশেই কেহ তুলনীয় মনে করে না। মধ্যযুগের ভক্তিমগ্নের প্রতি আধুনিক ইউরোপ যতই অবজ্ঞাশীল হোক—সেই ভক্তিশাবিত্র্যহীন আর্ট যে একটি বড় উৎকর্ষ লাভ কবিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন আধুনিকতম আধুনিকেরও মনে লেশমাত্র সংশয় নাই। ইউরোপে যদি আবাব কোন সময়ে ধর্মের নবযুগ আসে, তখন সেই মধ্যযুগের সাধনাব এবং সেই ভক্তিলীলায়িত শিল্পের তলব পড়িবেই—কারণ তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম-সত্যের একটি নিত্যরূপ আছে।

আমার কাছে এইটাই চমৎকার লাগে যে কি শ্রাশঙ্কাল গ্যালারিতে কি পাবলিকের লুভ্রএ ইউরোপীয় মানুষ আপনায় যুগযুগের শিল্পসাধনাব শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানকার চিত্রগুলি এখন হয় ত কেবলমাত্র কলাকুশলগুণী বা কলাশিক্ষার্থী কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া থাকে—তাহার সুখে সমস্ত ইউরোপের জীবনের বড় সামগ্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ফ্রান্সে এক সময় বড় বড় ইতালীয় চিত্রকর চিত্র-

কলার আদর্শস্থানীয় ছিলেন, সেখানে এখন নথ জীমূর্তির চিত্র সর্বত্রই আদৃত হইতেছে। কিন্তু আধুনিক-কালের এই প্রহসন কি একদিন মরীচিকার মত দিগন্তবালে বিলীন হইয়া যাইবে না? যে আর্ট গ্যালারিতে আজ শিক্ষার্থীগণ প্রাচীন শিল্পীর রচনা নকল করিবার জন্য রং ও তুলি হাতে বসিয়াছে, একদিন তাহারা নিশ্চয় বুঝিবে যে কেবল আকারের সৌষ্ঠব, রং ফলানো, পরিপ্রেক্ষণ—এই সমস্ত জিনিসই শিল্পের প্রাণ নহে, তাহার যথার্থপ্রাণ একটি অধ্যাত্ম আদর্শ বাহা চিরন্তন কাল ধরিয়া মানুষের আত্মাকে আনন্দময় জ্যোতির্ময় করিয়া রাখিতে সমর্থ।

আমাদের দেশে প্রাচীন শিল্প অল্পে অল্পে উদ্ধার হইতেছে, নূতন শিল্পও তাহার প্রেরণায় জাগিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু হায়, আমাদের শিল্পকে আমরা কোথায় তেমনি করিয়া পরে পরে স্তরে স্তরে সাজাইলাম? বিদেশী ঐতিহাসিক আমাদের কানে মন্ত্র দিতেছে যে ভারতবর্ষে পূর্বকালে আর্ট ছিল না—বৌদ্ধযুগে অশোকের কালে কনিষ্ক প্রভৃতি রাজাদের সময়ে যেটুকু আর্ট দেখ, সে কেবল গ্রীকদের অনুকরণে হইয়াছিল—তাহার পূর্বে বা পরে শিল্পের নামগন্ধ নাই।

ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন আর্ট নাই বলাও বা আর ভারতবর্ষকে বর্জ্যদেশের সমপর্যায়ভুক্ত করাও একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে তত্ত্ববিজ্ঞা ছিল অথচ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ছিল না, সে চিন্তা করিয়াছে কিন্তু বোধ করিতে পারে নাই—তাহার মানে এই যে তাহার মস্তিষ্কের সহিত তাহার মায়ুতন্ত্র কোন সংযোগ ছিল না—সে এমন একটি সভ্যতার কল ফলাইয়াছে যাহার আঁটি মাত্র আছে, নীস কোথাও নাই। এমন অদ্ভুত কথা যে বিংশশতাব্দীর সভ্যতা-গর্ভাঙ্ক কোন পণ্ডিত লোক কল্পনা কবিতো পারে, ইহাই আমার কাছে সর্কাপেক্ষা বিশ্বাসকর বলিয়া বোধ হয়। তথাপি ভারতশিল্প সম্বন্ধে সেই পণ্ডিত প্রব্রততত্ত্ববিদগণ কি বলেন তাহা দেখা যাক।

নেপালের সীমান্তপ্রদেশে পিপ্রবতে যে প্রাচীনতম একটি জুপী আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে শাক্যগণ বুদ্ধের ভস্মরক্ষা করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, তাহার

তারিখ ইহারা ৪৫০ B. C. স্থির করেন। তখন গ্রীকরা আসে নাই। তবে ভারতবর্ষীয়গণ এ স্তূপরচনা কোথা হইতে শিখিল? উত্তর “Perhaps from Babylonia।” এই perhaps-টি নিছক ঐতিহাসিক।

ইহার পর আড়াই শত বৎসর পর্যন্ত আর কোন শিল্প নাই—তার মানে পাওয়া যায় নাই। তারপর একেবারে অশোকের কাল—তাহার স্তম্ভ স্তূপ গুহাচিত্র প্রভৃতি। মধ্য ভারতবর্ষে বহুত ও ভূপাশে সাক্ষী স্তূপ আছে—বুদ্ধগয়াতেও আছে। অশোকের প্রস্তর বেলিংএর চিত্রমালাও নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। স্তূপরচনা কোথা হইতে শিক্ষা হইয়াছে তাহাতো জানিলাম, এখন অশোক বেলিংএর চিত্রমালায় যেসকল যক্ষ রক্ষ নাগ প্রভৃতির ভাস্কর্য্য দেখা যায়, সে শিক্ষা কোথা হইতে হইল? গ্রীকদের নিকট হইতে। অশোকস্তম্ভও গ্রীক ও পার্সিপলিটান অর্থাৎ পারস্তদেশীয় স্তম্ভেরই রূপান্তর মাত্র। সম্রাট অশোক নানাদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেবণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার সময়কাল শিল্পের এই অমুকরণ সহজ হইয়াছিল।

তারপর শক ও কুশানদিগের সময়ে অর্থাৎ কণিক ছবি প্রভৃতি রাজাদিগের রাজত্বকালে, যখন রোমে এবং সর্বত্রই গ্রীক শিল্প অপ্রতিহত প্রভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখন গান্ধারদেশে এক শিল্পযুগ আসে। পেশবার ও পঞ্জাবের নানা স্থানে এই শিল্পের অজস্র উপকরণ বাহির হইয়াছে—কলিকাতা, লাহোর, ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রভৃতি মিউজিয়মে তাহা দেখা যায়। সেগুলি ‘হুবহু’ গ্রীক—কারণ বুদ্ধের মূর্তি দেখিলে হঠাৎ অ্যাপোলো বলিয়া ভ্রম হয়। দেবতাদের মূর্তিগুলিও গ্রীকদেরই মত। বুদ্ধ হে তখন দেবতারূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যেমন গান্ধারে তেমনি দক্ষিণে অমরাবতীতে এই একই ধরণের শিল্প দেখা যায়। দক্ষিণে তখন অন্ধ্র রাজাদের রাজত্ব।

কিন্তু এই সময়ে অজন্তাগুহার চিত্রাবলীরও জন্ম হইয়াছিল, সে তো গ্রীক অমুকরণে হয় নাই। তবেই তো মুস্থিল। তবে সে আবার কাহার অমুকরণ তাহা গবেষণার দ্বারা বাহির করা তো বিষম গোলযোগের ব্যাপার।

গ্রীকীথ্‌স্ ফারগুসন্‌ হেন মান্নথেরাও যে এই চিত্রাবলীর প্রভূত স্থখ্যাতি করিয়াছেন। এমনকি গ্রীকীথ্‌স্‌ ফ্লোরেন্স ভেনিসের চিত্র হইতেও অজন্তাগুহার চিত্রকে উচ্চ আসন দিয়াছেন—

“The Florentine could have put better drawing and the Venetian better colour, but neither could have thrown greater expression into it.” সুতরাং অজন্তাগুহার চিত্রাবলী যখন গ্রীক অমুকরণ বলিবার উপায় নাই, তখন ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিতেছেন—

“Their foreign origin is apparent, but nobody knows where the artists came from or what their models were.” অর্থাৎ তাহাদের বৈদেশিক উৎপত্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান, তবে কোন্‌ বৈদেশিক শিল্পীরা আসিয়াছিল, তাহাদের শিল্পের আদর্শ কি ছিল তাহা কেহই জানে না। ইহারও নাম যদি ইতিহাস হয়—তবে আমাদের পুরাণতত্ত্ব-প্রভৃতিকে ইতিহাস বলিতে দোষ কি! ভিন্সেন্ট স্মিথের একপং বলিবার যুক্তি—সাহিত্যে তখন বাণভট্টের কাদম্বরীর ‘tawdry and insincere rhetoric’ দেখা যাইতেছে, চারিদিকে কোথাও কোন চিন্তার বা চেষ্টার পরিচয় নাই। সুতরাং হয় ত প্ল্যকেশিন্‌ প্রভৃতি চালুক্য রাজাদের কালে বিদেশ হইতে কোন চিত্রকরের দল আসিয়া অজন্তা গুহাকে চিত্রশোভিত করিয়া থাকিবে। ধন্য সেই অধ্যাতনামা অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী ঐতিহাসিকের মস্তিষ্কসম্মত চিত্রকরের দল।

যাক্‌, তারপর? তারপর ভারতবর্ষে আর আর্ট নাই। কারণ ভিন্সেন্ট স্মিথ্‌ একটি আশ্চর্য্য লাইন কলমের এক ঝাঁড়ে লিখিয়া ফেলিয়াছেন—সে পংক্তিটি এই—

“After A. D. 300, Indian sculpture hardly deserves to be reckoned as Art.”

তারপর যোগল সম্রাটদের আমলে জ্ঞানাসেন শিল্প জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুজাতির কোন কৃতিত্ব নাই। ভারতবর্ষের আর্টের ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা নাই, তাহার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়া দেখিবারও কোন

সম্ভাব নাই। এই তো পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মোটা-মুটি সিদ্ধান্ত। আমি তাঁহাদের সকল কথা যথাযথ ভাবেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের দেশের কোন বিষয়ের ইতিহাস আলোচনা করিবার শক্তি আমবা রাখি না। পাশ্চাত্য গুরুগণ যাহা বলেন তাহা আমরা বেদবাক্যের মত শিরোধার্য করিয়া লই।

শ্রীযুক্ত ই. বি. হাভেল বহুকাল ভাবতবর্ষে ছিলেন। কলিকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, স্ততরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জানিবার এবং ভারতবর্ষীয় সনাক্ত, অধ্যাত্তত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন— তাহার নাম “The Ideals of Indian Art”। সেই পুস্তকে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্ত একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্ট যে কত বড় একটি শক্তি, তাহার ক্রমবিকাশের দ্বারা যে আজও পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত আর্টকে চিনিতে হইলে একটা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, কেবল উপর উপর দেখিয়া এটা অমূকের অনুকরণ বা এ অংশটা অমুক দেশ হইতে আসিয়াছে এরূপ স্থির কবা মূঢ়তা—হ্যাভেলের পুস্তক পড়িয়া সে কথা বেশ বুঝিয়াছি। ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে অধ্যাত্তসাধনার সঙ্গে তাহার শিল্পসাহিত্যের যে একটি ভিতরের যোগ আছে—ভাবতবর্ষের অধ্যাত্ত সাধনার বিশেষত্ব কোথায় তাহা না জানিলে যে তাহাব শিল্পসাহিত্যের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না—সে কথাও এই পুস্তক সপ্রমাণ করিয়াছে। আর্টের প্রাণ যদি সেই গভীর অধ্যাত্তত্ব হয়, তবে জানিতে হইবে যে সে কোন দিন মরিবার নয়, ফুরাইবারও নয়—তাহার কাজ নিঃসন্দেহ যুগে যুগে ভিতবে ভিতবে হইয়া আসিয়াছে এবং আজি পর্য্যন্ত হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ কেমন করিয়া তাহার সংবাদ পাইবেন?

গ্রহের ভূমিকায় হাভেল গুরু করিয়াছেন যে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়মে ভাবতবর্ষীয় আর্ট বিভাগে সরকারী বিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে ভাবতবর্ষীয় পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি বীভৎস—ভাবতবর্ষ আর্ট কাহাকে বলে তাহা জানেই না। হাভেল বলেন, ইহার কারণ, ধাহারা লেখেন তাঁহারা পাশ্চাত্য সংস্কারে আপাদমস্তক এমনি নিমজ্জিত যে একবার মনেও করেন না যে হিন্দু-শিল্পীকে এমন সকল বিগ্রহ (symbol) দ্বারা ভাবপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, যাহা হিন্দু জনসাধারণের নিকটেই সুগোচর। যেমন ধর অধ্যাত্তচেতনাকে এদেশে তৃতীয় চক্ষু বলা হইয়াছে। স্ততরাং তৃতীয় চক্ষু দেখিয়া এবং তাহার অর্থ না জানিয়া কেহ যদি তাহাকে বীভৎস কি কদর্য বলে তবে সে কি নিজের মূঢ়তার পরিচয় দেয় না? এরূপ ভুল বুঝিবার আরও কারণ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্ট অরসংখ্যক কলাবিলাসী ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ কিন্তু হিন্দুশিল্প কোনদিন সেরূপ ছিল না। হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর অধ্যাত্তসাধনার গভীরতম উপলক্ষগুলিকে সকল হিন্দুর নিকটে সুগোচর করিয়া তোলাই হিন্দুশিল্পের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সেইজন্য যেসকল ইঙ্গিত, রূপ বা চিত্রের সহিত হিন্দুগণ পরিচিত ছিলেন, শিল্পীকে ভাবপ্রকাশের বেলায় তাহাদের সাহায্য লইতে হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে শিল্পশ্রুতির সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠববিধানের নিত্যনিয়মগুলি রক্ষিত হইয়াছে কি লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা সততভাবে বিচার্য, কিন্তু কি ভাব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে এবং কোন্ বিশেষ রূপ অবলম্বনের দ্বারা সেই চেষ্টা আপনাকে সফল করিয়াছে, গোড়ায় তাহা না জানিয়া সরাসরি বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কি কাহারও পক্ষে উচিত?

হাভেল যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্বন্ধ নির্ণয় দুঃসহ—জাতিধর্ম প্রভৃতির এত বিরোধ মাঝখানে আসিয়া জমিয়া পড়ে—ঠিক সেই প্রকার আর্টের মধ্যেও এত বৈচিত্র্য আছে—আদর্শের এবং তাহার বাহ্যপ্রকাশের—যে সেইসমস্ত বিরোধবিচ্ছিন্নতাকে একটা ঐক্যস্থলের মধ্যে গাঁথিয়া তোলা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের ভারত-বর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা স্থূল সংস্কার এইরূপ আছে যে, বৌদ্ধযুগ বৈদিক যুগের একটা বিরোধী যুগ, এবং পৌরাণিকযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে বৌদ্ধধর্ম এ দেশ হইতে চিরবিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিকযুগ বলিতে ইহার ষাণ্মাস্যাদিবহুল ক্রিয়াকাণ্ডই বোঝেন, উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে চোখে দেখিয়াও দেখিতে পাননা। বস্তুত উপনিষদীয় ব্রহ্মোপলব্ধির তত্ত্ব ও সাধনাই যে বৌদ্ধধর্মে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, উপনিষদীয় সর্বাঙ্কুশভূতি ও বৌদ্ধ বিশ্বমৈত্রীর সঙ্গে যে সাধনার দিক দিয়া কোন বিচ্ছেদ নাই, উপনিষদে যাহা ধ্যানলব্ধ ছিল বৌদ্ধধর্মে তাহাই চরিত্র ও সাধনার বিষয়ীভূত হইবার উপক্রম করিয়াছিল মাত্র—অভিব্যক্তির এই স্বস্বক্ৰমটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের স্থূল দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায়। যিশুর ধর্মকে ইহুদীয় প্রাচীন ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যেমন ভুল, কারণ যিশু পূর্ব পূর্ব সাধকগণের বাণীকে আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে মূর্তিরূপে কবিরাজিলাইলেন মাত্র—ঠিক তেমনি উপনিষদ হইতে বুদ্ধ-মৌল্যের ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা সেই একই রকমের ভুল, কারণ এক্ষেত্রেও একজন মহাপুরুষ সমস্ত কালের বাণীকে আপনার জীবনের দ্বারা সার্থক করিয়াছিলেন মাত্র। কবির বাণী যে বস্তুতই তপস্বীর তপস্তার অপেক্ষা রাখে—নহিলে সে বাণীর গভীরতা কে পরিমাণ করিবে?

পৌরাণিক ধর্ম বৌদ্ধধর্মকে এদেশ হইতে তাড়াইয়াছে, ইহাও আর একটা ভ্রান্ত সংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অবসান কালে যে সময়ে দ্রাবিড়, শক, হুন প্রভৃতি বহু অনার্য জাতি আধিজাতির সহিত সম্মিশ্রণে ধর্মে, সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল, সেই সময় একটা প্রবল স্বাভ্যন্তর্য ভাব বৈদেশিক প্লাবনকে ঠেকাইবার জন্য উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন অনার্য দেবদেবী, অনার্য আচার-ব্যবহার সমস্তকেই শোধিত-সংস্কৃত-রূপান্তরিত করিয়া লইবার যে প্রয়াস তাহা কোন হিসাবেই বৌদ্ধ-ধর্ম-বিরুদ্ধ নহে। বৌদ্ধ নির্মাণতত্ত্বই হিন্দুর বিস্তৃত অদ্বৈততত্ত্ব হইয়াছিল, বৌদ্ধ ত্রিষট্টি হিন্দু ত্রিমূর্তি হইয়াছিল, বৌদ্ধ অবতারবাদই হিন্দুর নারায়ণপূজার পরিণত হইয়াছিল, বৌদ্ধ তত্ত্বসাধনা হিন্দুর উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে কত

চুকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কথাই বরং বলা উচিত যে নব্য হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া তাহার বিচিত্র বিশৃঙ্খলাকে ও বৈদেশিকতাকে স্বাভ্যন্তর্য শৃঙ্খল-বন্ধনে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই ধর্ম-বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে অন্তান্ত দেশের একই ইতিহাসের এত স্তরভেদ প্রভেদ যে যদি কোন বিদেশীর কাছে ভারত-বর্ষের ইতিহাসের পর্যায়গুলি অত্যন্ত অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

জাপানী লেখক ওকাকুরা সান্ তাহার “Ideals of the East” নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে আর্টের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে কোন মতবিশেষ নাই। কারণ এসকল দেশেই আর্ট একটি বড় অধ্যাত্মবোধ হইতে উৎসারিত হইয়াছে এবং সেই অধ্যাত্মবোধের মূল উৎসও এই ভারতবর্ষেই।

ইউরোপে মধ্যযুগে আর্টের সঙ্গে ধর্মবোধের এই যোগ ছিল—ধর্মসংস্কারের যুগে পিউরিট্যান-প্রভাবে সে যোগ ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু সে যে কত বড় বিচ্ছেদ তাহা কেহ ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখে নাই। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত আর্টকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসজ্ঞ সমাজের মধ্যে বাঁধা রাখিয়া ক্ষীণপ্রাণ ও বিলাসী করিয়া তোলা হইয়াছে—সমস্ত জাতীয় প্রাণধারার সঙ্গে তাহার যোগ নাই—সে নীতিছাড়া ধর্মছাড়া—সৌন্দর্য্যকে সে এমন একটি আকর্ষণ-কুহুম করিয়া রাখিয়াছে যাহার মূল যুগযুগান্তরের মাটির মধ্যে দৃঢ়রূপে নিহিত নহে।

হাভেল বলেন ভারতবর্ষে এই বিচ্ছেদ আজ পর্যন্তও ঘটে নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্টের উৎপত্তি অম্লসন্ধান করিতে হইলে যে পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধ এদেশে প্রথম জাগ্রত হইয়াছিল—তাহার সংবাদ সর্বপ্রথমে লইতে হইবে। সে কবে? যে দিন “প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে।” সেই বৈদিক কালে।

কিন্তু বৈদিক কালে তো কোন আর্ট নাই—আমরা তো শুনিয়া আসিয়াছি যে গ্রীক আগমনের পর হইতেই গাঙ্কার শিল্পাদিতে আর্টের উদ্ভব। মাত্রগর্ভে দশমাস যখন শিশু বাস করে, তখন তা সে ভূমিষ্ঠ হয় না, স্তন্যপান তখন তাহার অস্তিত্বই নাই একথা কি বলা যায়? ঠিক তেমনি

গ্রীকোরোমান ভাস্কর্যগণ আসিবার অনেক পূর্বে ভারতবর্ষীয় আর্টের তত্ত্বের সূচনা হইয়া গিয়াছে। যখন মিত্র বরুণ অগ্নি মকং প্রভৃতি দেবতাগণ মানুষের প্রত্যক্ষ সঙ্গী— অগ্নি যজ্ঞে পোরোহিত্য করেন, উষা ধনধান্য বর্ষণ করেন, পুষ্প তাপের দ্বারা জগতকে পোষণ করেন, মরুৎগণ অগ্নি আরোহণ পূর্বক ইন্দ্রের মেঘগুলিকে দশদিকে বিক্ষিপ্ত করেন, পর্জন্তদেব স্বয়ং বিদ্যুতের স্বর্ণকশা দ্বারা তাহাদিগকে অভিক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত ধরণীর তাপ জুড়াইয়া দেন, শস্তকে উদ্ভিন্ন করেন—সুধু তাই নয়—যখন সমস্ত শক্তি একই শক্তির রূপান্তর—যে তেজোময় অমৃতময় শক্তি আকাশে থাকিয়া সমস্ত জানিতেছেন এবং অন্তরলোকেও সমস্তই জানিতেছেন, সেই এক অনাত্মনস্ত মহান আত্মার দ্বারা সমস্ত নিখিল-চরাচর পরিব্যাপ্ত—এই মহাসত্য উপনিষদকার ঋষিদিগের নিখিল প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হইল—ঠিক সেই সময়েই সেই বহুশতাব্দীর এলোরা অজন্তার গুহা-চিত্রনিচয় এবং ভারতবর্ষের অজ্ঞাত নানা আশ্চর্য্য শিল্প-রচনার প্রথম সম্ভাবনা লাগিয়া উঠিল। সমস্ত বিশ্ব-ভুবনের যিনি আত্মা, তিনি জীবাত্মার সঙ্গে এক—একেবারে অচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ—এই তত্ত্বই ভারতীয় শিল্পকলার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। উপনিষদ এই তত্ত্বকেই সর্বাঙ্গভূতি বলিয়াছেন—সর্বাঙ্গভূতি মানে সকল পদার্থের মধ্যে পরমাঙ্গাকে অন্তর্ভব করা। যাহা বিশেষ নামধারণ করিয়া, বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিয়া, বিশেষ একটি রূপের মধ্যে নানা বিকাব বিকল লাভ করিতেছে, তাহা সেই নামরূপের সীমা যে অতিক্রম করিয়া অনন্ত অপরি-সীম হইয়া আছে—যেখানে তাহার প্রাণ, যেখানে আনন্দ, যেখানে তাহার বাস্তবিক সত্তা—কি আশ্চর্য্য দিব্যদৃষ্টিতে সেই কোন্ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এই ভারতবর্ষের ঋষিগণ তাহা দেখিয়াছিলেন এবং সেই জন্তই এমন হৃদ-মূলক সব কথা নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে বলিয়া গিয়াছেন—যাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া শস্ত—তদেজতি তন্মৈজতি তদদূরে তদন্তিকে—তিনি চলেন, অথচ চলেন না, তিনি দূরে আছেন অথচ নিকটেও আছেন। যেখানে সমস্ত চলা সেখানে তাহার অনন্ত শক্তি সমস্ত ধারণ করিয়া আছে, যেখানে

সমস্ত অবসান সেইখানে তাহার সৃষ্টির উদ্ভব নব নব কর্মচক্র রচনার আনন্দে পরিপূর্ণ। তিনি সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া দ্বাং সূদূরে রহিয়াছেন, অথচ তিনি এত নিকটে যে আকাশ ও কাল তাহার পক্ষে বাধারূপ হয়না। এই যে সীমাকে অনন্তে ব্যাপ্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখা, ভারতীয় আর্টে ইহারি পরিচয় আমরা ক্রমাগতই পাইব।

একথা স্বীকার কবিতাই হইবে যে যাহাবা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাহারা কেহই বৈদিক যুগের এই জীবাত্মা-পবনাত্মার যোগের তত্ত্বটিকে ভাল কবিয়া ধরেনও নাই এবং তাহার সঙ্গে যে ভারতের শিল্পকলার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তর্কাও তাহাদের ধারণার মধ্যেই আসে নাই।

না আসিবার কারণ আছে। যেখানে প্রথম ভার-তীয় শিল্পকীর্তি পাওয়া যায়, সে বৌদ্ধ স্তূপ। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধযুগের সঙ্গে বৈদিকযুগের সম্বন্ধ বিরোধী সম্বন্ধ বলিয়াই মনে হয়—সুতরাং বৌদ্ধ-স্তূপ তত্ত্ব গুহাচিত্রমালাব মধ্যে বৈদিক যুগের কোন প্রভাব কল্পনা করা কি করিয়া চলে?

আমি একটু পূর্বে বলিয়াছি যে বৌদ্ধ বিশ্বদৈত্বীয় সাধনা এবং উপনিষদের সর্বাঙ্গভূতির সাধনা একই জিনিষ। বুদ্ধদেব কেবল ধর্মের তত্ত্বদের দিক্টা চাপা দিয়া তাহার সাধনাদের উপরে অধিকতর জোর দিয়া ছিলেন—মুক্তি কি, আত্মা কি, তাহা গোড়ায় আলোচনা ও বিচার না করিয়া সেই পথে একটু একটু করিয়া চলার অভ্যাস অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। Creed of Buddha নামক একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ কথাব স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্বেই বলিয়াছি যে বৌদ্ধধর্মকে উপনিষদীয় ধর্মের একটি বিশেষ বিকাশ রূপে দেখিলে বৌদ্ধযুগের আর্টকে একেবারে আধ্যাত্মিকতা-শূন্য গ্রীকোরোমান শিল্পের নকল বলিয়া বিদায় দেওয়া যায় না।

কিন্তু সাক্ষী বরহত অমরাবতী প্রভৃতির স্তূপ ও ভাস্কর্য্য যে অনুকরণ নয় একধার প্রমাণ কোথায়? যাহা প্রত্যক্ষ দিবালোকের মত দেখা বাইতেছে, তাহাকে

গানের জোরে অস্বীকার করা তো চলে না। তাহার পূর্বে ভারতবর্ষে কোন্ আর্ট ছিল ?

হাভেল সে কথা অস্বীকার করেন না। তিনি এই যুগকে Transition অর্থাৎ পরিবর্তনের যুগের একটি যুগ বলিয়াছেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ নানা দেশ হইতে শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করিতেছিল—সেই সংগ্রহের কার্যের পরে যে যুগ আসিল তাহাই স্থষ্টির যুগ—তখনই যে তত্ত্বের কথা আলোচনা করিতেছিলাম তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। যেটা স্বাধিকারের একটি পক্ষ তাহাকে প্রারম্ভ মনে করাতেই ভুল হইয়াছে কারণ আর্ট মানে তো কতগুলি ছবি ভাস্কর্য্য রং ও মালমসলা নহে, তাহার প্রাণই হইতেছে। একটি তত্ত্ব, একটি আইডিয়া—যাহা নিয়ামক ও প্রবর্তক রূপে থাকিয়া তাহাকে নানা রচনাতে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। স্মরণ্য প্রারম্ভ খুঁজিতে হইলে সেই আইডিয়াতে যাইতে হইবে—আরকিয়লজিতে নহে।

ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতির জ্ঞান হাভেল বরহত ও সাক্ষী স্তূপকেও সম্পূর্ণরূপে গ্রীক নকল বা পারস্ত নকল বলিতেও প্রস্তুত নহেন। ভারতবর্ষীয় অনার্য্য দ্রাবিড়গণ যে শিল্পনিপুণ ছিল তাহা সকলেরই জানা কথা। সম্রাট অশোক যখন স্তূপাদি নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তখন তিনি যে অনার্য্য শিল্পীদিগের সাহায্য পান নাই, এ কথা বলা চলে না। পারস্ত দেশের স্তম্ভের জ্ঞান অনেক বৈদেশিক অঙ্কুরগণিতের বিজ্ঞানমতা সত্ত্বেও সেই সময়ের স্তূপ ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে এদেশীয় স্বকীয় স্থষ্টিরও অনেক লক্ষণ রহিয়াছে। অশোকের পূর্বে ভারতবর্ষে কাঠের স্থাপত্য প্রচলিত ছিল, সেগুলি চিহ্নমাत्रে বিলুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু যদি কোন দিন গঙ্গাগর্ভ হইতে বা রাজপুতানার মরুভূমি হইতে মিসর ও জর্জিয়ার জ্ঞান প্রাচীন কালের সকল কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে, তখন অশোকের পূর্বে ভারতবর্ষে যে শিল্পচেষ্টা বিরূপ ছিল তাহা জানিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না এবং সংশয়েরও কোন স্থান থাকিবে না।

অশোক রেলিংয়ের চিত্রমালায় কোন বড় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। সত্যম্ বুদ্ধমূর্ত্তি তখনও দেবমূর্ত্তি

রূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করে নাই। যেসকল যক্ষ রক্ষ লোকপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা বা নৈসর্গিক (naturalistic) ভাবেই বেশি পূর্ণ—এই নৈসর্গিকতার একটি নবীন ভাব সেই চিত্রমালার মধ্যে স্ফুট বটে।

হাভেল বলেন যে, এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব যেখানে গিয়া পড়ে নাই, সেইখানেই এই নৈসর্গিকতার ভাব আর্টে দেখা যায়।

তিনি বলেন চীন আর্টেরও ইহাই বিশেষত্ব। মহাবান বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে যাইবার পূর্বে চীনদেবতারার ঠিক অশোকের স্তূপের এইসকল প্রাকৃত দেবতাদের মতই আকারপ্রকারবিশিষ্ট ছিলেন।

যাহাই হোক এই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আর যখন নালান্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল সেই সময় পর্য্যন্ত এই নানাস্থানের নানা সংগ্রহকার্য্য চলিয়াছিল। এই সংগ্রহের যুগের পরেই স্থষ্টির যুগ—আদিম দ্রাবিড়শিল্প, পার্সিপলিটান্ অর্থাৎ পারস্তের শিল্প,—গ্রীকোরোমান্-গাঙ্কাবশিল্প—এসমস্তই একত্র করিয়া সমস্তকে একটি বড় অধ্যাত্মবোধের দ্বারা, শুদ্ধ অরণির মধ্যে অগ্নি সম্প্রদানের জ্ঞান, পূর্ণ করিয়া এক অভিনব ভারতবর্ষীয় শিল্পরচনার কাল পরে উপস্থিত হইল।

যখন মহাবান বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ ভগবান বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন, তখনই সংগ্রহেব যুগ শেষ হইয়া আসিল। তখন যেমন ইউরোপে মধ্যযুগে কত কত শিল্পী খুঁটের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের ঘটনাকে কত কত চিত্রে স্থাপত্যে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, তেমনি এই সময়ে, কত মন্দিরে, কত বিহারচৈত্রে, কত গিরিগুহার—যেখানে যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির কোন আশ্চর্য্য রূপ খুলিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের পূজা আসিয়া সেই রূপের উপরে একটি ভক্তির রহস্ত মাখাইয়া দিয়াছে—সেই-সেইখানে ভগবান অমিত্যভ ভারতবর্ষীয় শিল্পীচিত্তের সমস্ত ভক্তি ও কল্পনাকে লুষ্ঠন করিয়া লইলেন। তাহার প্রবুদ্ধ সকল-বন্ধযুক্ত দেবমূর্ত্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সিংহলে, জাভায়, চীনে সর্বত্র সেই মূর্ত্তি লোকহৃদয়ে আপনার অমর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিল।

ভিন্সেন্ট স্মিথ গাঙ্কারশিল্পকে ভারতবর্ষীয় শিল্পের জনক বলিয়াছেন। সেই শিল্পে বুদ্ধের তপোমূর্তিকে একটা জীর্ণ জীর্ণ কঙ্কাল করিয়া গড়িয়াছে। কিন্তু এই যুগে যথার্থ ভারতশিল্পী তাঁহাকে প্রাচীন মহাকাব্যোক্ত নরসিংহ কবিয়া গড়িল—তাঁহার ললাট দীপ্ত, লোচনময় স্নিগ্ধ, বর্ণ গৌরোজ্জ্বল, শরীর বীৰ্য্যশালী, তিনি পদ্মাসনে আসীন। তিনি যে ভিতরে যথার্থই সকল বাসনাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ কবিয়াছেন, এ তাহারি মূর্তি! মানুষের ভক্তি এই নরোত্তমের মধ্যে যে দিব্য সৌন্দর্য্যকে দেখিয়াছে, কোন বাহু সৌন্দর্য্য তাহাব সঙ্গে তুলনীয় হয়। গ্রীকশিল্পকে ভারতশিল্পের জনক বলা বাস্তবিকই কি হান্তাপদ!

সিংহলে ও জাভায় বুদ্ধের যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কোন দেশের কোন স্থাপত্যে তাহার তুলনা মিলে না। বুদ্ধ পদ্মাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার উকীষের উপরে একটি ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধমূর্তি। মহাবান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে পূর্বে এক আদি বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বহু হইবার বাসনা হইল—সেই বাসনাব নাম প্রজ্ঞা—আদি বুদ্ধে এবং প্রজ্ঞায় মিলিয়া কয়েকটি ধ্যানীবুদ্ধ সৃষ্টি কবিলেন—সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় মধ্যে তাঁহার নিগূঢ় ভাবে বিরাজমান। এই অবলোকিতেশ্বরের উকীষস্থাপিত ধ্যানীবুদ্ধের নাম অমিতাভ। যাক্ তার পর, পিপ্পল পত্রের ছায় একটি জ্যোতির্মণ্ডল বুদ্ধের মস্তক আবৃত করিয়া আছে, তাঁহার বামকরতলে ধর্ম্মচক্র মুদ্রাচিহ্ন—তাঁহার দক্ষিণকরতলে উদার উম্মুক্ত—তাহাতে বরমুদ্রা চিহ্ন বিদ্যমান। তিনি ধ্যাননিমগ্ন, সমস্ত শরীরেব উর্জ্জ্বল শক্তি, দক্ষিণ পদতল মেলিয়া দিয়াছেন তাহা একটি শতদলের উপরে স্থাপিত—সেই শতদল নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন। আধ্যাত্মিক শক্তির এমন আশ্চর্য্য প্রবল প্রকাশ—চীন জাপানের কোন বুদ্ধমূর্তিতে দেখা যায় নাই।

ধ্যানীবুদ্ধের এই কল্পনা কি আপনি কোন মূর্তিকাবের মাধ্যমে আসিয়াছিল? না—নিশ্চয়ই এই ধ্যানপরায়ণতা, এই বোগনিমগ্নতা বৈদ্যতন্ত্রের মত সমস্ত দেশেব আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল—সুতীভেস্ত তিমির রহস্তাব-গুপ্তন ক্ষণে ক্ষণে বিহ্বলীর্ণ হইয়া উন্মোচিত হইবার উপক্রম

করিতেছিল। ইউরোপীয় শিল্পী যেমন নানাপ্রকার বাহ্যিক কসরৎ কবিয়া শিল্পের হাত পাকায়, আমাদের দেশে তেমনি এই ধ্যানশীলতাকে অভ্যাস করিতে হইত—ইহারি জন্ত এদেশের শিল্পী আপনার শিল্পবিষয়ে তন্ময় হইয়া একান্ত হইয়া বাইতে পারিতেন এবং সেরূপ একান্তভাবে ভিন্ন একরূপ সত্যশিল্প কখনই সৃষ্টিত না।

এইসকল ধ্যানমূর্তি কাহাবা অতি যত্নে কুঁদিয় তুলিয়াছে? আজ তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত—কার তাহারা নামের লোভে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। সেইজন্য দেখা যায় যে ভারতশিল্পে চিত্রকলার চেয়ে ভাস্কর্য্যই বেশি। যাহা সকলের চেয়ে দৃঢ় ও পবিত্রমসাধা এবং সকলের চেয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী সেই কার্য্যেই ভারতশিল্পী আপনার মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। যেখানে সমস্ত দেশের পূজা আসিয়া মিলিত হইয়াছে—সেইখানে দেবমন্দিরের এক পার্শ্বে সেও আপনার শিল্পপূজাকে বহন করিয়া আনিয়াছে—তাহার শ্রেষ্ঠ কল্পনার পূজা, নির্মল সৌন্দর্য্যভবের পূজা, পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বস্তির পূজা—পরমধ্যানের অমুখ্যানের পূজা! ইগাই তো মানবের শ্রেষ্ঠ আর্ট—যেখানে মানুষ ধ্যানে যে গভীরতম উপলব্ধির চিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে অতি যত্নে পাথরের মধ্য হইতে ফুটাইয়া তুলিয়া অনন্তকালের মধ্যে অমর করিয়া রাখির গিয়াছে।

যাহাই হোক বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণামে এই যে আদর্শ মানুষ বা যাহা একই কথা মানবরূপী দেবতার পূজা জাগিল তাহা কেবলমাত্র বৌদ্ধদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিল না জৈনদের মধ্যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সেই একই ভাবে প্রভাব এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। তাহার কারণ মতামতের দিক্ দিয়া জৈনধর্ম্মে, আর্ধ্যধর্ম্মে, বৌদ্ধধর্ম্মে যতই অতৈক্য থাকুক—ইহারা সকলেই একটি জায়গায় মেলে যে বাসনাবন্ধন হইতে মুক্তি মানুষ যে বহু তপস্যার দ্বার অর্জন করিয়া থাকে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠরূপ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বৈদিকধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পৌরাণিকধর্ম্মের যেসকল আত্যন্তিক বিরোধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা সত্য নহে। বস্তুত, ইহারা একটি অন্তর্নিহিত

পরিণাম—পৌরাণিক ধর্ম যে বৌদ্ধধর্মেরই পরিণাম তাহা একটু প্রমাণ করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে।

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ উপস্থিত হইলে যখন বুদ্ধ আর মানুষ বহিলেন না, দেবতা হইলেন, তখন তিনি এক অমর অমর আদি বুদ্ধের প্রজ্ঞাপ্রসূত মানসরূপী ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। এই ধ্যানী বুদ্ধগণ পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ভাবমাত্র; কালে কালে ইহারাই মানবের মধ্যে মানবরূপ ধরিয়া পৃথিবীতে মঙ্গল সাধন করিয়া যান। মহাবান বৌদ্ধধর্মে এই অবতারবাদের প্রথম উৎপত্তি, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এই অবতারবাদের তত্ত্বটিকেই আরও ব্যাপকতর পতীরতর করিয়া লইয়াছে। যে তত্ত্ব কেবল একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাকে সমস্ত বিশ্বব্যাপী একটি বিশ্বাটতত্ত্বে পৌরাণিক ভক্তধর্ম মুক্তিদান করিল। সেই বিশ্বতত্ত্বটি কি? সেটি আমাদের দেশের চিরপরিচিত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব। বিশ্বকে পুরুষ এবং স্ত্রী এই দ্বৈতশক্তির লীলাক্ষেত্র করিয়া দেখা।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ ত্রিগুণের অধীন হইয়া কার্য করে, পুরুষ অথবা আত্মা ত্রিগুণাতীত, অর্থাৎ ত্রৈলোক্য এবং সাক্ষী মাত্র। এই ত্রিগুণতত্ত্ব পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানেশ্বর নাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই:—ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ। তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এইরূপ:—সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ ছুটি, প্রকাশ এবং আনন্দ। প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা হইতেছে জড়তা বা অবসাদ ও অশান্তি বা প্রবৃত্তিচাক্ষুণ্য। জড়তার প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, প্রবৃত্তিচাক্ষুণ্যজনিত অশান্তিতে আনন্দ বাধাগ্রস্ত হয়। জড়তার বাধাব নাম তমোগুণ, প্রবৃত্তিচাক্ষুণ্যের বাধার নাম রজোগুণ। রজোগুণ তমোগুণের বিপরীত—তমঃ মানে অসাড়তা—তাহার বাধাজনিত যে চাক্ষুণ্য ও হুঃখ তাহাই রজোগুণ। সুতরাং এই তিনগুণের ক্রম এইরূপ—নীচে তমোগুণ তার উপরে রজোগুণ—ও সর্বোপরি সত্ত্বগুণ। ব্যুৎপত্তি মাত্রেরই আমবা এই ত্রিগুণের পরস্পরের সম্বন্ধ দেখিতে পাই—প্রত্যেক বস্তুই সেখানে জড়তা ছাড়াইয়া উত্তম এবং উত্তম ছাড়াইয়া আনন্দে ও

প্রকাশে বা যাহা একই কথা তাহার বাস্তবিক সম্ভার অধিকৃষ্ট হইতে চাহিতেছে। কিন্তু সমস্ত সম্ভার একরূপ কোন বাধার সম্ভাবনা নাই বলিয়া সেইখানে সাত্বিক আনন্দ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ঐ প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বকেই শিব ও শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন রূপকে ধ্যান করিবার একটা উত্তোগ পৌরাণিক কালে লক্ষ্য করা যায়। এলিয়ান্টা প্রভৃতি গুহাতে ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত মূর্তি খোদিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মে এই ত্রিমূর্তিই বুদ্ধ সত্ত্ব ও ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই তিনের আইডিয়াটা এক সময়ে আমাদের দেশকে খুব অধিকার করিয়াছিল—দুই দিকে দুই কোটি এবং মাঝখানে তাহার সামঞ্জস্য। ইহার সঙ্গে হিগেলের Thesis Antithesis Synthesis তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে—আমরা যাহাই ভাবি তাহা বস্তুমূলক—আলো ভাবি তো তাহাব উর্টা অন্ধকার আছে—ভাল ভাবি তো মন্দ আছে—এই বস্তু আবার মিলিত হয় একটি Absolute বা পবিত্র—নহিলে দ্বৈত পাকাপাকি ভাবে থাকিয়াই যায়। অবশ্য ত্রিমূর্তির আইডিয়াতে এই দ্বৈতাত্মক অদ্বৈততত্ত্বের কোন স্থান নাই—তবে সেখানেও ঐ একটি আইডিয়া ছিল যে একদিকে আরম্ভ অস্তদিকে পরিণাম মাঝখানে স্থিতি—একদিকে ব্রহ্মা অস্তদিকে মহেশ্বর মাঝখানে বিষ্ণু।

ঐতিহাসিক দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে ত্রিমূর্তির এই তিন দেবতার মধ্যে শিব স্পষ্টতই অনার্য দেবতা। তাঁহার ভূত প্রেত প্রভৃতি দলবল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মমজিক রূপে যে লিঙ্গপূজা এদেশে প্রচলিত আছে, প্রভৃতি নানা অনার্য চিহ্নই তাহার সাক্ষী। বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে যে গোপবেশী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা জড়িত হইয়া আছে, তাহাকেও অনার্য বলিয়া নির্দিষ্ট করা কঠিন নহে। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের অবসানকালে দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতা মিলিত হইয়া গিয়া যে একটি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কলাবিজ্ঞান দ্রাবিড়গণ নিপুণ ছিল, তত্ত্বজ্ঞানে আর্যগণের শ্রেষ্ঠ ছিল—কলার সঙ্গে তত্ত্বের মনোহর সম্মিলন ঘটিতেই অনার্য দেবতাপন

একটি বৃহৎ আইডিলার মহিমা পাইলেন—তাহারা একটি বৃহৎ বিশ্বতত্ত্বের বিগ্রহরূপ হইয়া উঠিলেন। সেই তত্ত্বই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, যাহার কথা বলিতেছিলাম।

যাহাই হোক এই ত্রিমূর্তির মধ্যে আবাব প্রত্যেকেরই পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই দিকই বিদ্যমান। ব্রহ্মা যেখানে পুরুষ সেখানে তিনি বিগ্ৰহসত্তা মাত্র, যেখানে প্রকৃতি সেখানে সৃষ্টিকর্তা। বিষ্ণু যেখানে পুরুষ সেখানে চিৎশক্তি, যেখানে প্রকৃতি সেখানে রক্ষাকর্তা পালনকর্তা। শিব যেখানে পুরুষ সেখানে বিগ্ৰহ মঙ্গল, যেখানে প্রকৃতি সেখানে প্রলয়কর্তা।

প্রকৃতিরাজ্যে- ত্রিগুণের পরস্পরের স্বাধীনতার জন্ত ভালমন্দ সুন্দরঅসুন্দর জন্মমৃত্যু সৃষ্টিধ্বংস প্রভৃতি যেসকল বিরোধ বৈপরীত্য দেখা যায়, সমস্তিসত্তার মধ্যে সেসকলের কোন স্থান নাই, কারণ সমস্তিসত্তা ত্রিগুণাতীত—এই ভাবটি সকল দেবতারই ভিতরকার ভাব। শিব প্রলয়কারী ভীষণ রুদ্র দেবতা—কিন্তু তিনিই মঙ্গল—সকল বাহ্য প্রাকৃতিক অমঙ্গলের অন্তরতর স্থানে যে মঙ্গল রহিয়াছে, সেই মঙ্গল তিনি। কালী করালী—সংহারপ্রলয়কারিণী মহাশক্তি—অথচ তিনিই বিশ্বমাতা—প্রাকৃতিক সমস্ত ভীষণতার অন্তরতর স্থানে একটি পূর্ণ প্রেম ও মঙ্গলের ভাব নিত্য বিরাজিত—তাহাই কালীর যথার্থ স্বরূপ।

হ্যাভেল বলেন ত্রিমূর্তির যেসকল স্থাপত্য পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টতই মনে হয় যে হিমালয়ের অনেক দূত্বের অভিব্যঞ্জনা এসকল তত্ত্বকে রূপ দান করিবার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এ তিনই স্বর্ঘ্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রূপ। ব্রহ্মা উদয়কালীন স্বর্ঘ্য—যখন ভুবনকমল মুকুলিত হইতেছে; বিষ্ণু মধ্যাহ্ন রবি—শেষ নাগের উপরে অনন্ত বিশ্বসমুদ্রের উপরে নিদ্রিত—শেষ নাগ অনন্তকালের চিহ্ন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে; এবং মহেশ্বর অন্তকালীন ভাঙ্গ এবং সেই জন্তই শশিমৌলি—কারণ স্বর্ঘ্য অন্তগমন করিলে অন্ধকার-অসুন্নগকে দলন করিবার নিমিত্ত তিনি চক্ষুকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এইসকল দেবমূর্তির যোগ কিছুমাত্র অসম্ভব নহে; কারণ ভারতবর্ষের সমস্ত ধ্যান ধারণা উপাসনা বিশ্বপ্রকৃতির

প্রভাবকে সর্বত্রই স্বীকার করিয়াছে। এমনকি আমরা মনে হয় গায়ত্রী মন্ত্রও আদিম সৌরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে—যে জন্ত ত্রিসন্ধ্যা তাহাকে ধ্যান করিবার নির্দেশ সকল আর্ঘ্য সন্তানের সম্মুখেই বর্তমান। স্মরণাতীত কাল হইতে প্রভাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত এদেশে ধ্যানের প্রশস্ত কাল বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে, সেই সময় প্রত্যহই অন্ধকারের গর্ভ হইতে বিশ্বপদ্ম উদ্ভািলিত হয়—প্রত্যহেই সেই নবীন সৃষ্টির মধ্যে সেইজন্ত শিল্পী ব্রহ্মার মূর্তি ধ্যান করিয়াছে। লিডেন মিউজিয়মে অবদীপ হইতে ব্রহ্মামূর্তি আনীত হইয়াছে। আমাদের দেশে জল হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস আছে, তাই ব্রহ্মার বাহনঃ হংস—মানসসরোবরবাসী। এই হেতু হিমালয়ের মধ্যে এই আটের প্রেরণা জাগিয়াছিল, হ্যাভেল এই অনুমান করিতেছেন।

তারপর বিষ্ণুমূর্তি—বর্ণ গভীর নীল—হিমালয়ের মধ্যস্থ আকাশের মত। ঋজুস্তম্ভের মতন মূর্তি, কারণ তিনি সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহার বাহন গরুড়—দিগন্ত-বিস্তৃত পক্ষ মেলিয়া দিয়া নিম্পন্দ নিশ্চল হইয়া আছে। হিমাচলের পক্ষবিস্তারকারী নীল পর্বতমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। বিষ্ণুর স্বদর্শনচক্র দশদিকে বিকীর্ণ স্বর্ঘ্যরশ্মির সঙ্গে তুলনীয়।

তারপর শিব—প্রলয়-দেবতা। হিমালয়ের প্রচণ্ড ঝটিকা, দাবানল, ভূমিকম্প, শৈলস্থলন প্রভৃতি এই রুদ্র দেবতাকে হয় ত সৃষ্টি করিয়া থাকিবে; অথচ এ সমস্ত দুর্যোগ বিপদপাতসমূহও হিমাচলের উত্তম অভ্রভেদী মহিমা যেমন অক্ষুন্ন অপরিণান, প্রভাতে স্বর্ঘ্যালোকে মেঘনিমুক্ত ধ্যাননিমগ্ন তাহার নীলকণ্ঠ যেমন আশ্চর্য—সারাক্ষে অন্ধকারজটাজুটগহন জটিলতার উপর চক্ষুকলানি নিঃশূল কিরণধারা যেমন মনোরম—এই প্রলয়ঙ্কর ভীষা দেবতার অন্তরতর স্থানে তেমনি একটি নিশ্চলগভীর ধ্যানমৌন মহিমা বিরাজ করিতেছে।

কালিদাসও মেঘদূতে কৈলাসবর্ণনার সেই কথা লিখিয়াছেন:—

শৃঙ্গোচ্ছারৈঃ কুমুদবিশমেধৈঃ বিতত্যহিতঃ যঃ
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব জ্বলকণ্ঠাট্টহাসঃ।

কৈলাসপর্বত কুমুদবিশদতা ও শৃঙ্গের উত্তুঙ্গতার দ্বারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রতিদিন ত্র্যম্বকের রানীভূত অট্টহাস্তের ছায় স্থিত হইয়া আছে। কালিদাসের এই শ্লোকটি হিমালয়ের সঙ্গে শিবের সারূপ্য ঘোষণা কবে। হিমালয়ের তুষারভটা হইতেই গঙ্গা প্রভৃতির ধারা বিনির্গত হইয়াছে, শিবের ভটা হইতে গঙ্গা নিঃস্কৃত হইবার পুরাণ-কথাও সর্বজনবিদিত।

হাভেল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতাকেই হিমালয়ের দেবতা বলিলেও বাস্তবিকই একা শিব ভিন্ন আব কাহারও মধ্যে হিমালয়ের ভাবসঙ্গতি বড় দেখা যায় না। ব্রহ্মার হংস বা বিষ্ণুর নীলবর্ণ তাঁহাদিগকে হিমালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিবার যথেষ্ট কারণ নহে। অবশ্য শিব যে স্পষ্টতই হিমালয়ের দেবতা সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

এই ত্রিমূর্তির সম্মিলিত চিত্র এলিমফাণ্টা গুহার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহা বিরল। তাহার কারণ এই যে ভারতবর্ষে বিষ্ণু ও শিব এই দুই দেবতা ব্রহ্মাকে সরাইয়া দিয়া পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের পূজক ভাগ করিয়া লইয়াছেন। বিষ্ণুব ভাগে পড়িয়াছে উত্তর ভারতবর্ষ যেখানে অধিকাংশ বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখা যায়, শিবের ভাগে পড়িয়াছে দাক্ষিণাত্য যেখানে শৈবসম্প্রদায়ের লোক বেশি।

অথচ বিষ্ণু ও শিব প্রত্যেকেই তাঁহাদের নিজের নিজের উপাসকের নিকটে ত্রিমূর্তি একাধারে। বিষ্ণু যুগে যুগে অভিব্যক্তির নানা পর্যায়ে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীকে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন। এলোরার ভাস্কর্য্যে বিষ্ণুর সেই দশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর গোপবেশী মূর্তিই কৃষ্ণমূর্তি।

এলিমফাণ্টাতে এলোরাতে শিবের তাণ্ডব নৃত্যের মূর্তি আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সেইরূপ মূর্তি চিত্রিত করাতে অনেকের নিকটে ব্যঙ্গভাজন হইয়াছেন। ভগবানের যে বিরাট আনন্দ হইতে সমস্ত জন্ম লইতেছে, স্থিতি করিতেছে, এবং বাহার আনন্দে সমস্ত বিলীন হইতেছে, তাঁহার সেই বিরাট আনন্দে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার হাতে

ডিমি ডিমি ডমরু বাজিতেছে—সেই ডমরুর ধ্বনি এই চবাচর জীবনের যে একটি অশ্রুত স্পন্দন, বাহা অনাদিকাল আকাশে ক্রন্দন করিতেছে, যে অশ্রু বৈদিক ঋষি আকাশকে ক্রন্দসী রোদসী বলিয়াছেন—এত বড় একটা মহাশূন্য মহাগম্ভীর ভাব কি অনায়াস অবলীলার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় শিল্পী কর্তৃক রচিত হইয়াছে।

ভারতশিল্পে এই ত্রিমূর্তির ভাস্কর্য্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের আদর্শকে দৈবভাবে পূর্ণ করিয়া কিরূপে ধ্যান করা হইয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। দেখা গেল যে বৌদ্ধধর্ম হইতেই এ ভাবটি এদেশীয় শিল্পী লাভ করিয়াছে। এখন শ্রেষ্ঠ নাবীর আদর্শকে কোন্ দৈবভাবে পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই শিল্প-সাধনার পূর্ণতা দেখা হয় না কি?

ত্রিমূর্তির প্রত্যেকটিরই এক একটি জীজুড়ি রহিয়াছে। ব্রহ্মার পাশাপাশি সরস্বতী, বিষ্ণুর পাশাপাশি লক্ষ্মী, মহেশ্বরের পাশাপাশি গৌরী। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ও সকল বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রহিয়াছেন—তেমনি যিনি পালনকর্তা তাঁহার জীৱপ লক্ষ্মী, সকল সমৃদ্ধি ও সম্পদ, এবং যিনি প্রলয়কর্তা তাঁহার জীৱপ মহাশক্তি, কালী ও দুর্গা।

বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধ দেবতারূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তখনও জীলোকের মূর্তি বৌদ্ধশিল্পে স্বাভাবিক ও সাধারণই রহিয়া গিয়াছে—তাহাতে কোন আইডিয়া দেওয়া হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম যখন ভিক্কুর সঙ্গে সঙ্গে ভিক্কুগীর নির্বাণপদকামিনী হইলেন, তখন তাঁহাদের সমাজবন্ধন ও লোকাচার খসিয়া গেল। তথাপি তাঁহারা খৃষ্টীয়ধর্মের কুমারী তাপসীগণের ছায় আচ্ছন্ন কোমার্য্য বক্ষা করিলেও তাঁহাদিগকে কোন শিল্পী আপনার ধ্যানের বিষয় করিয়া তুলিল না।

সুতরাং বৌদ্ধযুগে এই ভিক্কুগীর আদর্শ থাকা সত্ত্বেও তখন এবং তাহার পরে সকল কাব্যে ও শিল্পে জীলোকের সৌন্দর্য্য নিতান্ত স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবেই চিত্রিত হইয়া চলিল।

ভবীভামা শিখরীশনা পঙ্কবিষাধরোজী
মধ্যে কামা চকিতহরিশীপ্রেক্ষণা নিরনাভিঃ

শ্রেণীভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ

বা তত্ত্ব প্রাপ্তিবিষয়ে সহজবোধ্য হওয়া উচিত।

এই বর্ণনাই প্রাচীন সাহিত্যে শিল্পে জীমূর্তির চরম আদর্শ। কিন্তু এই যে বাহ্য সৌন্দর্যের প্রকাশ, এই যে ভোগের চিত্র, ভাবতবর্ষ কখনই এইখানে থামিয়া যাইতে পারে নাই—যে সৌন্দর্য তপস্তার দ্বারা পূত নির্মল অন্তরতর সৌন্দর্য্য নহে তাহা কখনই ভারতবর্ষীয় চিত্তকে চিরদিনের মত ভুলাইতে পারে না।

সেই জন্তই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে নারীর আদর্শের যে একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তাহা যেকোন সাহিত্যে দুর্লভ। কবি কালিদাস পার্বতীকে বাহ্য-সৌন্দর্যের সমস্ত আয়োজনের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন—অকাল-বদন্তকে ডাকিয়া আনিয়া যদি কোথাও কিছু অভাব থাকে তাহাও পূরণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যকে সহায় করিয়া কাম যখন অল্পভবদ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের জ্বলন্ত ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বরের ধ্যানভঙ্গ্য করিতে উত্তত হইল, তখন তাঁহার অধ্যাত্মনেত্রের অগ্নিশূলিকা কামকে এক নিমেষে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তখন গৌরী তাঁহাব রূপকে নিন্দা করিয়া তপস্তার নিরত হইলেন, অগ্নিতপা হইয়া অপর্ণা হইয়া আপনাব বাহ্যরূপকে দগ্ধ করিয়া যখন তাঁহার আত্মার নির্মলতর রূপ জাগিল, তখনই ছদ্মবেশী মহাদেব আসিয়া তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া তাঁহার কাছে ধরা দিলেন। এত বড় আশ্চর্য্য জীসৌন্দর্য্য কোন্ কবির হাতে কোন্ শিল্পীর হাতে এমন নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে?

পার্বতীর এই তপোমূর্তিই দাক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরে দেখা যায়।

আমি জানি কোনো কোনো পাঠকের মনে অনিবার্যরূপে এই প্রশ্ন উঠিবে যে আমাদের দেশে এই-সকল মূর্তিপূজা হইতে যে ধর্মের মধ্যে নানা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, সে সন্দেহ কি বলিতে চাও? আর্টের দিক দিয়া এইসকল মূর্তির সার্থকতার ব্যাখ্যা করিলে কি সেই বিকারকে মুখস পবাইয়া রাখা হইবে না?

ইহার উত্তর বর্তমান প্রবন্ধে কখনই সম্পূর্ণরূপে দেওয়া যায় না, কারণ ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখানে

কেবল এই কথাই বলি যে আমি খুব মনে করি, যে, আমাদের দেশে শিল্পের সাধনার সঙ্গে যেখানে আধ্যাত্মিক সাধনাকে যোগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইখানেই এমন একটি অন্তরকে আমরা স্থান দিয়াছি বাহা শিল্প এবং ধর্ম উভয়েরই প্রাণদাতা। আমাদের দেশের শিল্প অধ্যাত্ম-সাধনা হইতে প্রাণ পাইয়াছে ইহা হাতেল পুনঃপুনঃ প্রতীপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এবং বিশেষভাবে আর একজন শিল্পরসজ্ঞ কুমারস্বামী মহোদয় এই কথাও যেন বলিতে চান যে ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনাও খুব একটি উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়াছে—কিন্তু ব্রহ্মত তাহা নহে। কালীকে আত্মশক্তির রূপক ও শিবকে প্রলয়কারী মহাশক্তি ও মঙ্গলের আধার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেসকল লৌকিক কাহিনীর ও আচারের বীভৎসতা আছে, তাহার চিত্র কি করিয়া অন্তর্হিত করিবে? ব্রহ্মত যেখানে শিল্পী ধ্যানের দ্বারা একটি বড় বিশ্বতত্ত্বকে মূর্তিতে পরিকল্পনা করিয়াছে, সেখানে তাহা বিশ্বদৃশিল্প হিসাবে অসামান্য এবং চিরকাল মাহাত্ম্য তাহাকে বিশ্ববিমুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিবে এবং আদর করিবে—কারণ একটি পরমসত্য তাহার মধ্যে নিত্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যখনই মনে করা হইয়াছে যে শিল্পের বিষয় পূজার বিষয়, তখনই বাহা ভাব তাহা বিব্রত হইয়া দূষিত হইয়া আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহ কি হইতে পারে? শ্রেষ্ঠ শিল্প, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান—এসমস্তই ধর্মসাধনার পক্ষে সহায়—কারণ অধ্যাত্মবোধ তো একটি শূন্যতার বোধ নয়—সে সকল খণ্ড-বোধকে একটি অখণ্ড আনন্দবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয় মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন খণ্ড বোধ সেই পরিপূর্ণ আনন্দবোধের সমান হইতে পারে—কাহাকে দিয়াও কি তাহার অভাব পূরণ হয়? শেক্সপীয়ার পড়িয়া মানবচরিত্রের নানা চরিত্র জটিল রহস্য সন্ধান আমার দৃষ্টি খুলিয়া যায় বলিয়া মনুষ্যপ্রকৃতিকে উদার বিদ্রুত ভাবে আমি দেখিতে সক্ষম হই। এ বেশ কথা, আমার ধর্মবোধকে ইহা বাড়াইয়া দেয় বই কমায় না—কিন্তু যদি আমার এমন দুর্ভাগ্য ঘটে যে আমি শেক্সপীয়ারের গ্রন্থকে তেল সিঁদুর মাখাইয়া বিবিধ

উপচারে প্রত্যহ পূজা করিতে বসিয়া যাই, তবে তাহা কি শেক্সপীয়ারের দোষ হইবে ?

শিল্পকে শিল্প হিসাবেই দেখ, তাহাকে মূঢ়ের মত পূজার বিষয় করিয়া তুলিয়ে না। নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে মূর্খের সাহায্যে অনন্তরূপ ভগবানকে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়, এসকল ফাঁকিবাড়ির দ্বারা মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলা হয় মাত্র। আব এই উপায়ে ধর্মই যদি যায়, তবে শিল্প কোথা হইতে প্রাণ পাইবে ? সেই জন্তই বহুকাল পর্যন্ত সমস্ত শিল্পসাহিত্য এদেশে তেমন একটি বৃহৎ বিশ্বরূপ লাভ করে নাই বাহা নিখিলমানবের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া উর্টা ভ্রমেও যেন না পড়ি। একথা যেন না বলি, যে, এইসকল শিল্প আমাদের দেশের অনিষ্ট করিয়াছে, অতএব ইহারা বর্জনীয়। ইউরোপে মধ্যযুগের আর্টের মর্যাদা এখন কেহ দেয় না, কিন্তু আর্টগ্যালারিতে, কত সিল্ক্সার দেয়ালে দেয়ালে তাহার। চিরকাল ধরিয়া স্থান পাইয়া গিয়াছে—যদি কোন দিন আবার এখনকার আর্ট তাহার বিলাস ও সৌখীনতা পরিত্যাগ পূর্বক নূতন কালের সকল বিরুদ্ধ বিচিত্রশক্তির এক আশ্চর্য মিলনসেতু রূপে এক মহাধর্মকে চায়, তখন সকল যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টকে যে ডাক পড়িবেই। তেমনি ভারতবর্ষে যে মহাযুগে বৌদ্ধধর্ম কতগুলি শুদ্ধ নীতি ও আচার ছাড়াইয়া এক মহাভক্তিবর্ষে পরিণত হইল, যে যুগে কবি কালিদাস পৌরাণিক আদর্শকে তাঁহার অমর কাব্যসকলে উজ্জলতর করিয়া তুলিলেন, এলিক্যাপ্টা-ইলোবার ভাস্করগণ পাথরের মধ্য হইতে উত্তুঙ্গ-হিমাচলগিরিবিহারী দেবতাদিগের মূর্তি কর্তিত করিয়া বাহির করিল, সেই বিরাট যুগ কি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বৃহৎ বিকাশের দিনে কোন কাজেই লাগিবে না ? আমাদের দেশে পূর্ব পূর্ব কালে যেসকল আশ্চর্য কাব্য, আশ্চর্য শিল্প, গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাধনার নিগূঢ় রহস্য, স্রষ্ট হইয়াছে, চিত্তিত হইয়াছে, আবিস্কৃত হইয়াছে—তাহারা কি এদেশের ভবিষ্যৎ জীবনের আয়োজনের মধ্যে কোথাও স্থান পাইবে না—কেবল বাহিরের এইসকল কেনবুদ্ধ, বিদেশের অন্ধ অন্ধকার—ইহাদের মধ্যে কি আমাদের সমস্ত চেষ্টি ও চিন্তা নিশ্চিন্তভাবে

পর্যবসিত হইবে ? আমরা যদি মূঢ় হই, অন্ধ হই, তথাপি বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষের যে একটি গৌরবের চিত্র জাগিতেছে—তাহা নিশ্চয়ই সত্য—বাহিব হইতে সেই সত্য-দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিকে খুলিয়া দিক।

কোন বাণী ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় বাণী ? তাহা এই যে, সমস্ত বাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারি প্রাণে কম্পিত হইতেছে—তাঁহারি আনন্দের মধ্যে রহিয়াছে। সেই আনন্দকে যিনি জানেন তিনি আর কিছু হইতেই ভয় প্রাপ্ত হন না। তিনি সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

বিদেশীই আজ এই কথা বলিতেছে যে আর কোন দেশের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের জীবনের এমন একান্ত সহচর, সঙ্গী, বন্ধু করিয়া তোলা হয় নাই যেমন রামায়ণ-মহাভারতে কালিদাস ভবভূতির কাব্যে হইয়াছে। 'তপোবন' প্রবন্ধে 'শকুন্তলার' সমালোচনার কবি ববীন্দ্রনাথও সেই একই কথা বলিয়াছেন। সেই তপোবনের সর্বাঙ্গভূতি যদি বাস্তবিকই ভারতবর্ষের চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সত্য জিনিস না হইত, তবে এ দেশীয় সাহিত্যে তাহার এমন স্পষ্ট সূত্র নিদর্শন কি এমন করিয়া পাওয়া যাইত ?

সাক্ষীর অমরাবতীর চিত্রাবলীতে যে বোধিদ্রুমতলে ভগবান বুদ্ধ উপবেশন করিয়াছিলেন, তথায় বস্ত্রকারীরা পর্যন্ত অর্ঘ্য বহন করিয়া আসিতেছে, বনের পশুরা মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রকে বন্দনা করিতেছে—এ চিত্র কি কোন দেশের চিত্রশালাতে দেখা যায় ? এই যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া আছে মানুষ—সে যে বিচ্ছিন্ন নয় স্বতন্ত্র নয়—এই অঙ্গভূতিই কি ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় অঙ্গভূতি নয় ? ভারতবর্ষীয় শিল্পী তাই তাহার চিত্রের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক রাখেনা, সমস্ত চরাচরকে সে নিমজ্ঞ করিয়া টানিয়া আনে—আর ইউরোপীয় চিত্রকরকে আরসমস্ত খাটো করিয়া ছোট করিয়া মানুষের মাহাত্ম্যকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্যকে স্পষ্ট প্রবন্ধে দেখাইয়া দেওয়াই এ দেশীয় শিল্পীর প্রধান কাজ। কিন্তু ভারতবর্ষ শিল্পলক্ষীকে বলা যাইতে পারে—

গুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ঘিরে বনের প্রাণী

তবু হয়ত তোমার আপন ঘবে—

পাষণ হিয়া গলবেনা।

তাই সকলের চেয়ে গম্ভীর এই যে ইউরোপীয়গণের মধ্যে যে মুচ এই ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ লাভ না করিয়া গান্ধাবশিল্পকে স্ততিবাদ করে, কিম্বা মোগলদের শিল্পকীর্তিকে গৌরবজনক বলিয়া কীর্তন করে, পাষণ-হিয়া তাহাদের চশমা পরিয়া নিজের দেশকে দেখিবার ও বিচার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অথচ ফণ্ড'সন প্রভৃতির মনেও আসে নাই যে মোগলকীর্তি বারো আনা প্রশংসাই হিন্দু-শিল্পীর প্রাপ্য। আকবর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনসাধনের জন্য যে উদ্যোগী ছিলেন, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য যেমন থাকে—যে ব্যক্তি একবার তাহার কতেপুৰ শিক্রিতে গিয়াছে সেই বুঝিয়াছে হিন্দুতাব সেই সম্রাটের চিত্তকে কতদূর অধিকার করিয়াছিল। কতেপুৰ শিক্রির প্রায় সমস্তটাতাই হিন্দু শিল্পীর হাত, জাহাঙ্গীরের আগ্রার প্রাসাদেও তাই। আবুল ফজল লিখিয়াছেন “হিন্দুদের চিত্র আমাদের ধারণাকে অতিক্রম করিয়া যায়, সমস্ত জগতে তাহাব তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত।” তাজমহল—যাহা জগতের বিস্ময়—সেই ‘নন্দনের ফুজরাশি’কে কে সৌন্দর্য্যস্বপ্নলোক হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে? হিন্দু শিল্পী। মুসলমান তো কেবল ভাবতবর্ষেই আসে নাই—আরবে, পারস্তে, ঈজিপ্টে কোথায় মুসলমানের শিল্প ভারতবর্ষের মত এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে?

এইবার উপসংহারে একটা বড় প্রশ্ন আমাদের আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। যে আর্ট এক সময়ে ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রাখা কবিয়া এমন আশ্চর্য্য সার্থকতা লাভ কবিয়াছিল, সে কি এখন সেইদিক্ দিয়াই পুনর্বার জাগিতে পারিবে? ধর্ম্মের পরিবর্তন সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কি নূতন বাস্তা লইতে হইবেনা?

ভবিষ্যতের কথা আমি জানিনা—কোন পথ ধরিয়া আর্ট এদেশে আপনাকে সার্থক করিবে তাহাও বলিবার অধিকার আমার নাই।

তবে এটুকু নির্ভয়ে বলিতে পারি যে যতই আমাদের দেশ কি, তাহাব ইতিহাস কি, জাহার ধর্ম্ম কি, সমাজ-তত্ত্ব কি, তাহার সৌন্দর্য্যচনা কিরূপ তাহা আমরা সকল

দিক্ দিয়া আবিষ্কার করিব—ততই অন্তান্ত সকল সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাধনাও এদেশে প্রাণ পাইবে। আজ যেটুকু শিল্পসাধনার চেষ্টা বাংলাদেশে উঠিয়াছে তাহা সেই কারণেই উঠিয়াছে—কিন্তু এখনও তাহাকে বহুদিন ধরিয়া নিজেকে চিনিতে হইবে এবং তারপর কালের উপযোগী কবিয়া আপনার শিল্পকে সৃষ্টি করিতে হইবে। ভাবী মানবের শিল্প, কি এদেশে, কি ইউরোপে, একাটি বড় বিশ্বগ্রাসী, সর্ব্বতোমুখী আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে যুক্ত হইবার অপেক্ষায় আছে—সেই বোধের দ্বাৰা সমস্ত উজ্জল হইয়া উঠিবে—তখন প্রাচীনে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাব ভিতরের ভাবটিকে গ্রহণ করিয়া তাহার বাহিরের রূপটিব নকল কবিবার কোন প্রয়োজন হইবেনা—তখন যাহাই আঁকা যাইবে তাহার মধ্যে বিশ্বমানবের অথওকপের একাটি ছায়া পড়িবে—তখন বিশ্বজগতের কাছে আমাদের লজ্জা দূর হইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী।

দিদি

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একএকজন মানুষের স্বভাব বড় অদ্ভুত ধরণের হয়। ভুল বা জেদের বশে একটা কার্য্য একেবারে কবিয়া ফেলিয়া যখন সে তাহার অনুশোচনা বা মানি ভোগ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহাকে দেখিলে আর কাহাবও মনে এ বিশ্বাস স্থান পায় না যে এ ব্যক্তি আর কখনও উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে বা নিজের নির্দিষ্ট পথে চলিতে পারিবে। সে এমনি ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই লোকই যখন বিপরীত দিক্ হইতে—আবার একটা ধাক্কা ধায় তখন এমনি সবেগে একনিষ্ঠ হইয়া যথাকর্তব্য সম্পন্ন কবিয়া যায় যে দর্শকেরা অবাক হইয়া ভাবে এই কি সেই ব্যক্তি।

অমরনাথও সবেগে সতেজে দেড় বৎসর অতীত হইতে না হইতে তাহার মেডিকেল কলেজেব নির্দিষ্ট শিক্ষাসেতু অতিক্রম করিয়া কলিকাতা ও কলকাতা লোকদিগের আসন-পার্শ্বে বসায়মান হইল। বাকী এখন তাহার শিক্ষা-উত্তীর্ণ জীবনকে কৰ্ম্মে সংযোগ করা।

চাকি এখনো সেইরূপই আছে। তেমনি সরল, তেমনি অনভিজ্ঞ, তেমনি নির্ভরশীল। তাহাকে একহস্তে বক্ষের নিকটে ধরিয়া রাখিয়া অমরনাথ দ্বিতীয় হস্তে দৃঢ় একাগ্রতা সহকারে নিজেকে ও তাহাকে সংসার-নদীর কুলের নিকটে টানিয়া আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল।

ইতিমধ্যে অমরনাথ ও চাকির এক নূতন আত্মীয় জুটিয়াছিল; তাহার নাম তারিণীচরণ, সে চাকির পিসতুতো ভাই। সে এই সংসার-অনভিজ্ঞ দম্পতির মাঝখানে আসিয়া পড়াতে একদিকে চাকি তাহার তারিণী দাদার সাহায্য পাইয়া সংসারকর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিল, অপর দিকে অমরনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের লেখাপড়ায় মন দিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

সত্যের অহুবোধে ইহা বলিতে হইবে যে তারিণীচরণ অমরনাথকে বাস্তবিকই বহু সাহায্য করিয়াছিল। চাকি ও সমস্ত সংসারের ভার নিজে লইয়া সে অমরনাথকে শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিল। তারিণীচরণের জুনিয়রিত ব্যবহার অমরনাথ ও চাকি এতদিন কোনও অভাব জানিতে পারে নাই। এই নিঃস্বার্থ বন্ধুতার জন্ত অমরনাথ তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং তাহার অনেক খুঁটিনাটি দোষ সত্ত্বেও তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসে ও বিশ্বাস করে। আর চাকি তো তাহাকে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল, নহিলে অমরনাথের কলেজ ও পাঠের সময় সে যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিরূপে কাটাইত, তাহা চাকি ভাবিতেও পারে না।

মাঘ মাস গত হইয়া সবে কান্তন তাহার চঞ্চল অঞ্চলটিকে নবপ্রফুটিত আশ্রয়কুল ও বকুল-সৌরভে পূর্ণ করিয়া সেই নিভৃত কাননের মধ্যে পুষ্পিত অশোক ও পলাশ বৃক্ষছায়ায় আসিয়া আসন পাতিতেছিল। ব্রিহৎ বাতাস সজপ্রফুটিত বেলায় কোমল গন্ধটি বহিয়া তখনো সমস্ত কাননে বসন্তের আগমনসংবাদ জানাইয়া উঠিতে পারে নাই। গোলাপের আরক্ত কপোল তখনো জ্বলন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন, অর্ধপ্রফুটিত কপোলে অনিলের স্পর্শজনিত জ্বলন্ত সরসস্ফোটাভাস সবে মাত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। মোহাছির দলে গুঞ্জনধ্বনির বিরাম নাই; সুকুলিত

আশ্রয়শাখা তাহাদের ভরে জ্বলন্ত অবনত, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষচ্যুত মুকুলগুলি বুস্ বুস্ করিয়া বৃক্ষতলে খসিয়া পড়িতেছে। সেদিন একটু বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল। বহুকাল অনাবৃষ্টিব পরে জ্বলন্তবরিসিক্ত ধরণী হইতে একটা মধুর গন্ধ উঠিয়া গবাক্ষতল ভরিয়া দিতেছিল। পলাশগাছে শরীর লুকাইয়া বসন্তের চাটুকায় অনর্থক ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙিতেছিল। তথাপি তাহার সঙ্গিনী তাহাকে কিছুমাত্র সাড়া দিতেছে না। ‘কু-উ’। গবাক্ষপথ হইতে একটা কোমল তরুণ কণ্ঠ তাহাকে ভেঙাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি মধুর তরুণ মুখ গবাক্ষে দৃষ্ট হইল। কালো কোকিলটা তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া পূর্বমত ডাকিল ‘কু-উ’। আবার সেই কচি মুখখানির আরক্ত পেলব অধর দুখানি মধুর হাস্তে ফুরিত হইয়া শব্দ করিল ‘কু-উ’। কোকিলটার রাগ চড়িয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ স্বরও উচ্চ উঠিতে লাগিল। তাহার গলায় যতটা উচ্চ সপ্তক পৌছে ততটা উচ্চ স্বর তুলিয়াও হ্রস্ব মনুষ্যকে খাটিতে না পারিয়া বেচারী কোকিল শেষে থামিয়া গেল।

পশ্চাত হইতে অমর আসিয়া ছই হাতে চাকির গাল টিপিয়া ধরিয়া সহাস্ত মুখে বলিল “কোকিলটাকে খেপিয়ে তুলে যে? একে তো ওর প্রিয়া এখনো সাড়াই দিচ্ছেনা তার ওপর এই অত্যাচার?”

চাকি মুখ ছাড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল “তা সেই থেকে অমন চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে মব্ছে কেন? এখন তো থামতে হ’ল?”

“তা চোঁচালেই বা তোমার তাতে কি? ও তো তোমার কুঞ্জতলে একাকিনী বিরহমলিনা দেখে স্বর-স্বরূপ স্তম্ভীত্ব করে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্ছে না বা তুমি কিছুমাত্র বিরহিনীও নও যে ‘কান্ত বিনে ও পাখীর স্বরে তোমার জীবনটা ঠেকছে কাঁকা কাঁকা’? তবে এত রাগ কিসের?”

“কি অতগুলো বললে আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু ও পাখীতে ভারী পাখী। তোমার সেই গানটা আমি কতকষ্টে মুখস্থ করে মনে মনে বলতে যাচ্ছি,

লক্ষ্মীছাড়া পাখীটে একশবাবই কানের কাছে চৌচিয়ে মরছে।”

“সখী ভয় নেই ভয় নেই ও পাখীটে বার’ মেসে নয়, এই কটা মাস সহ্য কর, তারপরে বর্ষা এলেই ও চুপ করবে, বার’ মেসে হলেও বা ঝিকুরায়ের মতে বাঁচাটা একটু মুক্খিল হ’তো।”

“মুক্খিল সত্যি। কোকিলকে ভেঙালে চোক ওঠে। যাঃ কি কবলাম্।”

অমরনাথ তাহাকে টানিয়া লইয়া একখানা কোচের উপরে বসাইয়া নিজে তাহার নিকটে বসিয়া বলিল “কোন গানটা মুখস্থ কচ্ছিলে?”

“সেই যে তুমি গাও,—সেই ‘নিশি নিশি কত রচিব শয়ন’ সেইটে।”

“ওটা আমার বঙ্গে এখুনি শ্রোতার লাঠি নিয়ে আমার তাড়া ক’রে আসবে।”

“আচ্ছা ও গানটাব ওপরে ‘বিরহ’ লেখা কেন? বিরহ কাকে বলে?”

“সেটাও জাননা? হা হতোয়ি। সত্যি জাননা?”

চারু মুক্খিল এটা না জানা তাহাব পক্ষে অতি লজ্জার কথা। সঙ্কোচে ও লজ্জায় লাল হইয়া মুহূর্তে বলিল “জানিনা তো। বল’ না কাকে বলে?”

“বিরহ কাকে বলে? এই—এই ধর আমি না থাকলে তোমার মন-কেমন করে না?”

“করে না? কবে। তাই কি?”

“সেই মন-কেমন-করার নাম বিরহ।”

“তাই বুঝি?” বলিয়া চারু গভীর ভাবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে বলিল “তবে তো বিরহ বড় খারাপ।”

“খারাপ কিসে? ঐ বিরহ নিয়েই বলে আমাদের কাব্য ও সাহিত্যজগতের অর্ধেক পুষ্টি। আমাদের কেন সমস্ত সভ্য জগতেরও। ভালবাসা পরিস্ফুট বিরহেই। যাক্ বা তুমি বুঝবে তাই বলি—দেখনা রাধাকৃষ্ণের বিরহের গানগুলি যত মিষ্টি অশ্রুগুলি কি তাই? বিরহ অর্থাৎ ক্রয় যখন রাধাকে ছেড়ে মথুরা ছিলেন?”

চারু অনেক ভাবিল। শেষে সবেগে মাথা নাড়িয়া

বলিল “তা হোক গো, তা বলে বিরহ কক্খোনো ভাল না। আমি ও গানটা আর শিখবনা।”

অমরনাথ হারি মানিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—“তবে আর একটা গান গাই শোন।”

‘বল’ বলিয়া চারু প্রকল্প ‘ভাবে নিজে’ টানিয়া লইয়া বলিল “হাম্পোনিয়মটার কাছে গিয়ে ব’স, তাহ’লে আরও মিষ্টি লাগবে।”

‘আচ্ছা’ বলিয়া অমরনাথ হাম্পোনিয়মেব সম্মুখে চেম্ব টানিয়া লইয়া দুই হস্তে বাজাইতে আরম্ভ কবিল। শেষে গান ধরিল—

“মম বৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখী। সখি জাগো, জাগো।

মেলি রাগ-অলস আঁধি, সখি জাগো জাগো।”

গান চলিতে লাগিল। চারু নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল। সে কিছু না জানিলেও অমরনাথের প্রেমপূর্ণ স্বর ও স্নিগ্ধ অম্লবাগপূর্ণ চক্ৰ তাহাকে অনেক কথা বুঝাইয়া দিতেছিল। অমরনাথ সেই প্রথম-মিলনেব কিছুদিন মাত্র তাহাব সঙ্গে এমনি ভাবে হাঙ্গি খুসী গল্প আমোদ করিয়াছিল, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বিবাদেব ছ’য়া পড়িত; তাবপরে এত দিন তো তাহার কর্মব্যাপ্ত নয়নের উপর দিয়া পৃথিবী তাহার সমস্ত ঋতু ও সকল মোহজাল সঙ্কুচিত করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সহসা কোন’ রাত্রে শয্যাপার্শ্বে নিদ্রিতা চাল্লর কোমল মুখ তাহার কর্মরাস্ত্র চক্চুর উপরে একটা স্নল সন্নেহ স্নল মারার জাল ফেলিয়া দিত আবার প্রভাতের নবীন সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর কর্তব্যের আহবান সকল মোহ মুছিয়া ফেলিত। সে তখন বিশৃঙ্খল একাগ্রভ্রমর সহিত পুনরায় নিজ কর্তব্যে নিবিষ্ট হইত।

এখন কার্য শেষ হইয়াছে। মধুর বসন্তের সঙ্গে মুর প্রেম এখন নব অম্লরাগে তাহার ‘বৌবননিকুঞ্জ’ক সুশোভিত করিতেছে। তাহা এখন স্নেহের বংশীস্বর ও কল্লনাকোকিলের কুহু রবে মুখরিত। “বকুল স্ত্রী জাতি” ফুলেব সৌরভবাহী দক্ষিণপবন ফাঙ্কনগুণগীতে ও বাসন্তীচন্দ্রের চঞ্চল জ্যোৎস্নায় প্রাবিত। তাহা প্রেম-মিলনেব মতই আনন্দময় আবেশময় চাঞ্চল্যময়। তাই প্রেম, আকুল বাসনার সুখোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া

কম্পিতা ভীতা প্রিয়াকে জাগাইয়া তুলিতে চায়। নিজের বেদনা বাসনা আবেগ তাহাতে সঞ্চারিত করিয়া সুপ্তিমগ্না নবোঢ়া প্রণয়িনীকে বলে ‘সখি জাগো, জাগো, জাগো’।

গান একবার ছইয়াব তিনবার গাওয়া হইয়া গেল তথাপি অমরনাথ গাহিয়া চলিয়াছে

“জাগো নবীন গৌরবে,

মৃদু বকুল-সৌরভে,

মৃদু মলয়-বীজনে

জাগো নিভৃত নির্জনে !

জাগো আকুল ফুল-সাজে,

জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,

মম হৃদয়-শয়ন মাঝে,

স্তন মধুর মুরলী বাজে

মম অন্তবে থাকি থাকি—

সখি, জাগো, জাগো !”

এমন সময়ে দাসী আসিয়া একখানা পত্র কোচের উপরে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। চারু হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া অমরনাথকে দিতে গিয়াই বিস্মিতভাবে পত্রের পানে চাহিয়া রহিল। অমরনাথ তাহার সুখোচ্ছ্বাস হইতে সত্ত্ব আগ্রত হইয়া হার্মোনিয়মের একটা চাবী টিপিয়া ধরিয়া বেগো করিতে করিতে বলিল “কি ?”

চারু বিস্মিত ক্ষীণ-স্ববে বলিল “এ কার পত্র ?”

“প’ড়ে দেখনা ? আমাব কি তারিগীর হ’বে।”

“না, তা নয়। এতে আমাব নাম লেখা রয়েছে। আমায় কে পত্র লিখ্লে।”

হার্মোনিয়ম থামাইয়া অমরনাথ কোতুহলীভাবে হস্ত বিস্তার করিয়া বলিল “কই দেখি।”

চারু লেফাফাখানা স্বামী হস্তে দিল। অমরনাথ পড়িল। সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—
“কল্যাণীয়া শ্রীমতী চারুলতা দাসী। কল্যাণীয়ায় !”

“তাই তো, কে লিখ্লে ? আচ্ছা খুঁলেই পড়া যাকনা।”
অমরনাথ লেফাফা ছিড়িয়া পত্র বাহির করিতেই চারু ব্যগ্র-ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল “নামটা দেখনা আগে পড়ে, কে লিখ্লে, ঐ যে নাম লেখা রয়েছে—ওই যে—শ্রীমুরমা দাসী,—সুরমাদাসী কে ?”

অমরনাথ চমকিত হইয়া বলিল “কই ? কোথায় ?”

“শ্রীমুরমা দাসী। ওপরে কি লেখা—মাণিকগঞ্জ।”

অমরনাথকে বহুকণ নীরব দেখিয়া চাক উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল “চুপ ক’রে রইলে যে ? সুরমা দাসী—তিনি কে ? —তুমি কি চেন ?”

“তুমি কি চিন্তে পাচ্ছনা ?”

“না। কে তিনি ?”

“তিনি—তিনি—” বলিয়া অমরনাথ আর একবার পত্রের স্বাক্ষরটা দেখিয়া লইল। তাবপর পত্রখানা চাকব হস্তে দিয়া বলিল “পত্রখানা তুমিই পড়, পড়লে বোধ হয় বুঝতে পারবে।”

পত্র হস্তে লইয়া চারু শঙ্কিত মুখে বলিল “প’ড়ে যদি না বুঝতে পারি ?”

“তখন বলবো।”

“পড়তে ভাল পারবনা হয়ত, তুমি পড়ে বলনা ?”

“পারবে। লেখাতো বেশ পরিষ্কার। চেষ্টা ক’বে দেখ। তোমাবই পড়া উচিত।”

চারু নীরবে হস্তস্থিত পত্র পড়িতে লাগিল। অমরনাথ কিছুক্ষণ অন্তমনা ভাবে নত মুখে বসিয়া থাকিয়া চারুর পানে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, চারুব উদ্বিগ্ন মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কম্পিত হস্তে পত্রখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

অমরনাথ ব্যস্তভাবে নিকটে গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, “কি চাক কি ?”

“প’ড়ে দ্যাখ, আমি হয়ত ভাল পড়তে পারলাম না।”

অমরনাথ চমকিত ভাবে বলিল, “বাবা ভাল আছেন তো ?”

“ভাব খুব অসুখ হ’য়েছে প’ড়ে দেখ।”

অমরনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্রের প্রতি বর্ণের উপর চক্ষু বুলাইয়া গেল। সহসা পড়িতে যেন সাহস হইতেছে না। শেষে জীবৎ চেষ্টায় পড়িল—

মাণিকগঞ্জ।

কল্যাণীয়া !

তুমি হয়ত আমাকে চিনিবে না। কিন্তু পত্র পড়িয়া তোমার স্বামীকে সব কথা বলিলে তোমাবা আমাকে চিনিতে

পারিবে এবং উদ্বেগও বৃদ্ধিতে পারিবে। পিতাঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত। প্রায় এক বৎসর তাঁহার ব্যারাম আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অবস্থা সংশয়াপন্ন। তিনি নিজে না লিখিতে পারায় অগত্যা আমি তোমাকে লিখিতেছি, তুমি তোমার স্বামীকে বলিবে পিতা অতিশয় পীড়িত। তিনি তোমাদের দেখিতে চান। তুমি ও তোমার স্বামী পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমরা বেশী উতলা হইবে না, তিনি অল্প দিন অপেক্ষা অল্প ভালই আছেন। তাঁহার দ্রুত কলিকাতা হইতে ভাল আঙুর ও বেনানা লইয়া আসিবে, এখানে ভাল পাওয়া যায় না। অধিক কি লিখিব। ইতি—

শ্রীস্বরমা দাসী।

অমরনাথ স্তম্ভিতভাবে নীরবে বসিয়া রহিল। চাকর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল “কি পড়লে?”

“বাবার অসুখ।”

চাকর নীরবে বহিল। মহাশয় তাহাদের মৌনভাব ভঙ্গ করিয়া অমরনাথ ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল “শীগগির ঠিক হ’য়ে নাও চাকর—বাড়ী যাব—বাবার অসুখ।”

“কি করব?”

“আ, কতকগুলো কাশড় চোপড় গুছিয়ে নাও। তারিণী—তারিণী।”

তারিণীচরণ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল “কি? এত ব্যস্ত কেন?”

“স্নাত্রেব ট্রেনে বাড়ী যাব। দরকারী জিনিষগুলো গুছিয়ে ঠিক ক’রে ফেল তো।”

তারিণী বিস্মিতভাবে বলিল “হটাৎ বাড়ী। কেন কি হয়েছে?”

“বাবার অসুখ।”

“কর্তার অসুখ! তা তিনি আপনাকে খেতে বলেছেন তো?”

অমরনাথ চটিয়া গেল। “কেন বলবেন না? তাঁর অসুখ।”

“তাত্তো বুঝলাম। চটবেন না—কথাটা মন দিয়ে শুধুন,—তিনি আপনাকে মাপ কর্নেন এমন কিছু লিখেছেন?”

“মাপ কর্নেন”—বলিতে বলিতে অমরনাথ সহসা ধামিয়া গেল। হঠাৎ তাহার বিগত জীবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। সুবমার পত্র দেখিয়া বিস্মিত ভাবের মধ্যে পিতার শুকতর পীড়ার সংবাদ এমন তন্ময় করিয়া দিয়াছিল যে অমরনাথ সব কথা ভুলিয়া গিয়া যেন পিতৃগতপ্রাণ বহুদিন প্রবাসী সন্তানের মত পিতাকে দেখিতে ব্যাকুল ও তাঁহা ব্যারামের সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তারিণীচরণের এক কথায় এখন সব ঘটনা যেন চক্ষের সম্মুখে জল্ জল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িল এখন পিতা ডাকিয়াছেন বা তাঁহার অসুখ হইয়াছে শুনিলেই তাহা ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইবে এ অধিকার আর নাই। এখন অনেকগুলি প্রশ্নের জবাবদিহি করিয়া তবে তাহাকে নিজের কর্তব্য নিজে স্থির করিতে হইবে। তারিণীর প্রশ্ন শত বৃষ্টিকের জ্ঞায় শত মুখ বিস্তৃত করিয়া তাহার ব্যাকুল প্রাণকে দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তিনি ক্ষমা করেছেন তো?” অমরনাথ ধীরে ধীরে ত্যক্ত কোষ্ঠে বসিয়া পড়িল।

তারিণী তাহার ভাব দেখিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—“পত্র কে লিখেছে? কর্তা কি?”

“না।”

“তবে কে লিখেছে?”

অমরনাথ দীর্ঘৎ রুষ্ঠভাবে বলিয়া উঠিল—“যেই লিখুক—বাবা ন’ন।”

তারিণীকে অপ্রতিভ ভাবে নীরব দেখিয়া চাকর বলিল—“আমার দিদি হ’ন—তিনি লিখেছেন।”

তারিণী পুনর্বার স্তব্ধ পাইল। “বেশ, যদি অমরনাথ আমার কথা যুক্তিসম্মত বোধ করেন তাহ’লে বলি—তিনি যান্ তো যান্ তুমি থাক।”

চাকর নীরব হইয়া রহিল। অমরনাথ বলিয়া উঠিল—“সেই ভাল কথা চাকর, তুমি তারিণীর কাছে থাক, আমি যাই—বাবা ডেকেছেন।”

তারিণী মৃদুকণ্ঠে বলিল—“আপনার জ্ঞা লিখেছেন—পিতা তো লেখেন নি?”

অমরনাথ উগ্রকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল “থাম তারিণী, বাবাই ডেকেছেন, তাঁর অসুখ,—নিজে কি ক’রে লিখবেন?”

“তিনি দেওয়ানকে দিয়ে বা অস্ত্র কাউকে দিয়েও তো লেখাতে পাতেন? এটা স্পষ্ট আপনাব জীব অহুমতি—এটুকু বুঝতে পারছেন না? আগাগোড়া এ সবই আপনার জীব খেলা।”

অমরনাথ দুইহাতে মস্তক ধরিয়। নীরবে বসিয়া রহিল। দুঃখ, লজ্জা, অপমান অতি উগ্রভাবে তাহার মস্তক আন্দোলিত করিয়া তুলিল। ভাবিয়া ভাবিয়া অগিতকণ্ঠে বলিল “তবে তো বাবা ডাকেন নি,—তবে যাব না।”

“তাই বলছি অমববাবু, বেশ বুঝে স্বপ্নে কাজ করুন। কোঁকের মাথার একটা কাজ করে বসে শেষে সমস্ত জীবনটা অহুতাপ করবেন না। মনে করুন, আপনি গেলেন, বাপের রুখাবস্থা দেখে চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর তিনি হয় ত আপনার সঙ্গে কথাই কইলেন না, মুখ ফিবিয়া নিলেন, আপনার জীব হয় ত—”

বাধা দিয়া অমরনাথ আতর্ভকণ্ঠে বলিল, “চুপ কর তারিণী, আব না। তিনি হয়ত আমাকে ফিরিয়েই দেবেন, হয় ত কথা কইবেন না, তবু তাঁর অস্থখ, আমি যাবই।”

“তবে আর কথা কি? কিন্তু চারু? চারুকেও কি নিয়ে যেতে চান? হয়ত আপনার জীব আপনাকে দ্বিগুণ অপমানিত করবার জন্যে এই ফন্দি করেছেন? আপনি যান কিন্তু চারুকেও কি তার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত মনে কবেন?”

“চারু, চাক, তুমি তাহ’লে তারিণীর কাছে থাক।”

“আমি যাব।” সজলনয়নে স্বামীর নিকটে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে চারু বলিল, “আমায় নিয়ে চল। আমারও দিদি যেতে লিখেছেন।”

“বাবা—বাবা যে লেখেননি চারু।”

“বাবা বলেছেন—তিনিই ডেকেছেন—দিদি তাই লিখেছেন।”

অমরনাথ কিংকর্ণ নীরবে রহিল। চারুর সরল বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে অনেকখানি বল দিল। স্বদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“এটা কি এত অসম্ভব তারিণী?”

“দেখুন বিবেচনা ক’রে যা ভাল হয় করুন আমার তো কেমন ভালো ঠেকছে না।”

চারু ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—“এর মধ্যে বিবেচনা করবার কি আছে? তারিণী দাদা, তোমরা কেন বুঝতে পারছনা?”

“যাক। যা” হবার হ’বে। তারিণী তুমিই বিপদে আমাব একমাত্র বন্ধু। যদি অসাবধানে কিছু ব’লে থাকি ক্ষমা ক’বো। তুমি বাসায় থাক। চারু আর আমি আজই বাড়ী যাব।”

তাবপর একটু থামিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ বলিল, “আমার মনে হ’চ্ছে—বাবাই আমার ডেকেছেন—তিনি নিশ্চয় আমার মাপ করেছেন।”

তারিণীচরণ ক্রুর হাসি হাসিয়া বাড় নাড়িতে নাড়িতে শুধু বলিল—“হ”।

নবম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাস্তাটা একটা ছরসহ ভার বহন করিয়া অমরনাথ চারুকে লইয়া বাটার অভিযুখে যাইতে লাগিল। পথে চারুর সঙ্গে সে বেশী কথাবার্তা কহে নাই; স্বামীকে নীরব দেখিয়া চারুও চুপ করিয়া ছিল, অজ্ঞাত একটা ভয়ে সেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। পথে অমরনাথ দুই-তিনবার পত্রখানা খুলিয়া খুলিয়া দেখিতেছিল, চারুর অস্ত্র যত চিন্তা হইতেছিল, নিজেব অস্ত্র তাহার তত চিন্তা হয় নাই। পত্রখানাব প্রতি বর্ণ সে মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল সমস্ত পত্রখানায় যেন একটা কি রকম ভাব, যেন আজ্ঞাধীন ব্যক্তি বা অপরাধীর উপবে বিচারকের কঠোর দৃষ্টি পত্রখানায় মাখানো। অমরনাথ ঈষৎ তীব্র চক্ষে পত্রখানার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল তাহাকে অবজ্ঞা বা অহুমতি করিতে স্মরণ্য কি অধিকার? সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ্য উপরে তাহার যেন একটা বিদ্রোহ ভাব মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মাস্তবের অপরাধ যেখানে গুরুতর সেখানে সে অপরাধের ভার অনেক সময় বিদ্রোহ রূপেই আগিয়া উঠে। যদি তারিণীর কথাই সত্য হয়, পিতা না বলিয়া থাকেন তো তাহার একরূপ পত্র লিখিবার কি প্রয়োজন? যেখানে তাহাবা যাইতেছে সেখানে এখন ইহাবই ক্ষমতা অপ্রতিহত,

তাহারই অল্পমতিস্থচক আহ্বানে তাহারই অধিকৃত স্থানে ভিখারী ক্ষমাপ্রার্থীর মত উভয়ে বাইতেছে ? যে অমর সেধানকার অধীশ্বর সেই অমর সেখানে আজ ত্যাক্ষ্য দূরীকৃত, অপবাদীর মত আত্মা পাইয়া তবে সেখানে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে—আর যে তাহাদের দৃষ্টি দিবে বলিয়া বিচারকের আসনে বসিয়া আছে সে সেধানকার কে ? আগন্তুক বৈ ত নয় ? অভিমানে ক্ষোভে অমরনাথের বক্ষ একএকবার জ্বলন্ত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল পিতা হরত হরত তাহার প্রভুত্বব্যঞ্জক দৃষ্টির সম্মুখে শুকাইয়া উঠিবে। নিখাস ফেলিয়া অমরনাথ ভাবিল ‘চাককে আনা ঠিক হয়নি’ নিমেষের মধ্যে আবার মনে আসিতেছিল পিতার পীড়া। অমরনাথ ব্যগ্রভাবে বার বার ঘড়ী দেখিয়া সময়ের পরিমাণ করিতে লাগিল।

ট্রেন ত্যাগ করিয়া যখন উভয়ে শকটোহল কবিল তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। দুধারে শ্রামল বৃক্ষশ্রেণীর ব্যবচ্ছেদপথে যখন অর্ধক্রোশ-দূরস্থিত গ্রামের গৃহ ও তরুশ্রেণী আবছায়া ভাবে দেখা বাইতে লাগিল তখন অমরনাথ আর অশ্রু সঞ্চরণ কবিতো পারিল না। সেই দুধারের শস্তের ক্ষেত্র, বোসেদের ও তাহাদের পাশাপাশি বৃহৎ বৃহৎ উজান যেন পরস্পরকে স্পর্ধা দেখাইয়া শির তুলিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। সেই বৃহৎ সাকো, দুধারে সেই উত্তর পক্ষের বিবাদি কলকল জলস্রোত, এখন কৌণভাবে বহিয়া বাইতেছে, সম্মুখের বৃহৎ বটগাছে রাখাল বালকেরা তেমনি করিয়া ঝুল খাইতেছে। অমরনাথের মনে পড়িতে লাগিল এইখানে বাল্যকালে প্রত্যহ বেড়াইতে আসিত, এই সেতুর উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িয়া কত সাতার দিত, এই বটগাছের ‘নামনা’গুলির শ্রেষ্ঠটোতে তাহারই একাধিপত্য ছিল। এই পথের উভয়পার্শ্বের খড়ো ঘরগুলির অধিবাসীরা তাহাব নিত্যান্ত পরিচিত। এখনো হরি, গুঁটে, জাপ্‌লারা হরত এই ঘরেই চিরদিনের স্বপ্ন দুঃখ লইয়া বাস করিতেছে, আর সে আজ দুই বৎসর এখান হইতে নির্বাসিত।

ক্রমে গ্রামের হুউচ সৌধ ও অনতিবৃহৎ গৃহগুলি

পরিষ্কৃতকপে তাহার চক্ষে ফুটয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যে শকট প্রবেশ করিলে কি একটা লজ্জায় অমরনাথ শকটের গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিয়া কৌতুহলী গ্রামবাসীরা চক্ষু হইতে আপনাকে লুকায়িত কবিল। চাকর পানে চাহিয়া দেখিল চাক নীরবে বসিয়া আছে। অমরনাথ ক্রমে অসহিষ্ণুভাবে দ্বার জ্বলন্ত ফাঁক করিয়া দেখিল এই দুবে বোসেদের উচ্চ অট্টালিকা ফেলিয়া আসিয়াছে, এই সম্মুখে নবীন পালের ডাক্তারখানা, এই বাড়ুঘোর চণ্ডীমণ্ডপ, পার্শ্বে গ্রাম্য স্কুল। ওধারে এই পোষ্টাফিস, পরে চাটুঘো ঠাকুরবদের পুরাতন ইষ্টকালয়, তারপরে সেই শুভ্র অট্টালিকা বৃহৎ মস্তক উন্নত কবিতা দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে এই সেই চিরপরিচিত বৃহৎ শ্বেতবর্ণ গেট। অমরনাথ সজোরে দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া মুখ বাহিব করিয়া দেখিল গেটের সম্মুখ হইতে একখানা গাড়ী তাহাদের অভিযুখে ছুটিয়া আসিতেছে। অমরনাথ গাড়োয়ানকে বেগে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলে পূর্বেই গাড়ীখানা নিকটস্থ হইবামাত্র শকটোপরি উপবিষ্ট রহিমবক্স কোচম্যান রশ্মি সংঘত করিয়া বসিয়া বসিয়াই ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেলাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিল “বাবু আপু আয়া হাবু।” অমরনাথের উত্তর দিবার পূর্বেই শকট তাহাকে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে বামচরণ থানসামা, হস্তে কতকগুলি ঔষধের শিশি লইয়া বাইতেছিল, অমরনাথকে শরীরের অর্ধেক বাহির করিয়া প্রায় ঝুলিতে ঝুলিতে বাইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া শকটের নিকটে গেল। “ছোট-বাবু কখন এলেন? বাবুর যে বড্ড অসুখ এতদিন—” অমরনাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। থানসামাকে পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ী গিয়া গেটের সম্মুখে পৌঁছিবামাত্র অমরনাথ লাফাইয়া নামিয়া পড়িয়া চিরপরিচিত লালকঙ্করময় পথ সবেগে অতিক্রম করিয়া বৈঠকখানার প্রকাণ্ড সিঁড়ির ধাপে পদস্পর্শ করিবামাত্র উপর হইতে রেহকোমলকণ্ঠে কে বলিল ‘অমব—অমর—আস্তে—অত ব্যস্ত হ’য়োনা’। চমকিত হইয়া অমব মুখ তুলিয়া দেখিল সম্মুখে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া বুদ্ধ দেওয়ান শ্রামাচরণ রায়—তাহার চারিদিকে কয়েকজন আমলা ও গ্রামস্থ কয়েকটি ভদ্রলোক উন্মুখ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অমরকে জ্বলন্ত থামিতে

দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া নামিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন “ষ্টেশনে গাড়ী তো রাখা হয়নি—কষ্ট হয়নি তো ? সময়টা ঠিক জান্তে পারিনি। কর্তাবাবুর বড়—” অমরনাথ বাধা দিয়া পূর্ববৎ বেগে সোপান অতিক্রম করিতে করিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল “আমি জানি ! চুপ করুন—চুপ করুন কাকা।” বলিতে বলিতে অমর সোপান অতিক্রম করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিল দেওয়ানজী হাঁকিয়া বলিলেন “অমর, বাবু অন্দরের সমুখের দোতালার ঘরে আছেন।” অমর চক্ষুর অন্তরাল হইলে কর্মনিষ্ঠ দেওয়ান সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন “গাড়োয়ানটাকে বিদেয় করে দাও। ওরে নদে, কি জিনিষ পত্র আছে নামিয়ে নিয়ে আর।” নদে খানসামা জিনিষ নামাইতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল “আজ্ঞে ! গাড়ীর মধ্যে কেউ আছেন।” চমকিত হইয়া দেওয়ান বলিলেন “তাইতো—আঃ—কি ছেলেমানুষী।” ত্রস্তে শকটের নিকটে গিয়া দেওয়ান বলিতে লাগিলেন “এই গাড়োয়ান, ভেতরে নিয়ে চল—গাড়ী ভেতরে নিয়ে চল। এগিয়ে চল, আরও খানিকটে চল, ওই ওদিকের ছরোরটার কাছে ভিড়ে দাঁড়াগে, ওবে নদে—এই হরে—বাড়ীর ভেতরে থবর দে—বামা—ক্ষান্ত কাউকে ডেকে নিয়ে আর।” পরিচারকেরা ব্যস্ত ভাবে অন্দরে দৌড়িল।

আরোহীকে নামাইয়া দিয়া গাড়ী যখন সমুখের বৈঠকখানার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল তখন দেওয়ানজী শান্ত হইয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া চাকরকে তাম্বুকের আদেশ দিলেন ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সাক্ষাতে কর্তার ব্যারামের ডাক্তার-কথিত লক্ষণগুলি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকার গাড়োয়ানের সহিত ভাড়া লইয়া বচসা জুড়িয়া দিল।

দ্বিতলের সোপান সবেগে অতিবাহিত করিয়া অমর হলের সমুখের বারান্দায় প্রবেশ করিয়া সহসা খানিয়া পড়িল। মুক্ত গব্যাকপথে হলের মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় দেখিল খানিকটা শয্যার অংশ ও তাহার উপরে শায়িত এবং গাত্রবস্ত্রে আবৃত মনুষ্যের অর্দ্ধাংশ দেখা যাইতেছে,—অমর বুঝিল পিতা। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত ভয়ে কণ্টকিত হইয়া স্তম্ভিতের ছায়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া

রহিল,—তাহার ভয় হইতেছিল পিতা যদি না বাঁচিয়া থাকেন। গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তি বোধ হয় অমরের আবেগ-ব্যগ্র পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। সহসা সে শব্দ নীরব হওয়াতে গভীর অথচ ক্লান্ত কণ্ঠে গৃহমধ্য হইতে প্রশ্ন হইল “কে ?” অমরের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। “বাবা—বাবারই গলা।”—ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অমর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে করিতে পুনরায় শুনিল গৃহমধ্য হইতে বামাকণ্ঠে কে বলিল “আপনি স্থির হোন,—আমি দেখি কে।”—অমরনাথ এবার সবেগে অগ্রসর হইল। মুক্ত দ্বারপথে সম্মুখেই পিতার রুদ্ধশয্যা দেখা যাইতেছে। উন্নত ললাট শুভ্রগভীর মুখশ্রী, উদার কোমল নেত্রদ্বয় ক্লান্তিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে—অমরনাথের রুদ্ধ বেদনার স্রোত বক্ষপঙ্ক্তির মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। টলিতে টলিতে সে একনিশ্বাসে পিতার পদতলে শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিয়া পড়িল। পুরু গালিচামণ্ডিত গৃহে পদশব্দ আর কিছুই হয় নাই, তথাপি কি একটা অজ্ঞাত আন্দোলনে গীড়িতের হৃদয় বোধহয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিয়াই পুনরায় মস্তকের নিকটে উপবিষ্ট রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “কে মা দেখত ? কে যেন আমার পায়ের তলায় বসল,—জামাচরণ কি ?”

অমরনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল পিতা তখনো চক্ষু মুদ্রিয়াই আছেন—তাহার মস্তকের নিকটে একটা রমণী—পরিচিতা সে,—ধীরে ধীরে রোগীর মস্তকে হাত বুলাইতেছে। তাহার অকুণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে অমরনাথ আবার দৃষ্টি নত করিল। ঈষৎ অপেক্ষা করিয়া হরনাথ বাবু ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন “মা।”

উপবিষ্টা রমণী তাহার মস্তকের উপরে একটু নত হইয়া নিঃস্বরে বলিল “বাবা ?”

“আমার কি ঘুম এসেছিল ?”

“কই না, আপুনি তো চেতনই আছেন বাবা।”

একটা বদ্ধ নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন “বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল, যেন বোধ হ’ল কে এসে আমার পায়ের তলায় বসেছে। জামাচরণ এসেছিল কি ? তার মত বোধ হ’ল না কিন্তু।”

“কার মত বোধ হ’ল?”

“কি জানি—তারই মত হবে—না না সে যে কলকাতায় আছে।”

পদ্মতলে উপবিষ্ট অমরের রুদ্ধ আবেগ বক্ষের মধ্যে ফুলিয়া ঠেলিয়া তাহাব কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতেছিল। আর আত্মসংবরণ কবিত্তে না পারিয়া সে পিতার পারের উপবে মস্তক রাখিয়া লুপ্তিত হইতে লাগিল। তাহার স্পর্শে হরনাথবাবু চমকিত হইয়া ব্যাকুল আত্মকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “মা মা আবার সেই রকম বোধ হ’চ্ছে—দেখনা কে?”

উপবিষ্ট রমণী পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “আপনিই দেখুন না বেন বাবা!—চেনে দেখুন।”

“আমার ভয় করছে—নদি মিথ্যা হয় তাই চাইতে পাবছি না,—সেই কি?”

অমরনাথ রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল “বাবা।”

বেন তাড়িতস্পর্শে আহত হইয়া হরনাথবাবু চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

“অমর।”

“বাবা, বাবা” বলিতে বহিতে অমরনাথ পিতার দুই পা সন্মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল।

সহসা তাহার মস্তকে কোমল করস্পর্শ হইল,—“তাপ-জ্বাখ, বাবা অমন ক’রে রয়েছেন কেন।” বলিতে বলিতে অমরনাথ হরনাথবাবুর মস্তক কোড়ে লইয়া বসিল। কাতর রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল ‘বাবা’ ‘বাবা’। অমরনাথ পিতার পা ছাড়িয়া দিয়া নীরবে শুধু চাহিয়া রহিল। কি করা কর্তব্য তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অমরনাথ তাহাব পানে দুই অশ্রুপূর্ণ চক্ষে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়া অরিতকণ্ঠে বলিল “এদিকে এসো, একটু বাতাস ক’রো, ভয় নেই—কেমন মোহ মতন হ’য়েছে—বড্ড দুর্বল হ’য়ে পড়েছেন।”

অমরনাথ উঠিয়া পিতাব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকে মুছ মুছ ব্যঞ্জন কবিত্তে করিতে নীরবে অমরনাথ অশ্রুপূর্ণ ব্যাকুল শুষ্কতা দেখিতে লাগিল। অলিত কণ্ঠে বলিল “কাকাকে একবার ডাকব কি?”

বোগীব অধরে ওঠে চামচে করিয়া জ্বলন্ত ছুই

দিতে দিতে অমরনাথ বলিল “না, এই যে সামলে উঠেছেন, আব ভয় নেই। বাবা,—বাবা।”

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হরনাথবাবু বলিলেন “মা।”

সহসা বক্ষের উপবে কি একটা বেদনার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া অন্তবে অন্তরে মোহের সঞ্চার হইয়াছিল। স্বথ কিম্বা দুঃখের কি একটা তীব্র আঘাতে দুর্বল অস্থিরকরণ কিয়ৎক্ষণের জন্য নিম্পন্দ হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে সে আন্দোলন সে নিম্পন্দতা অতিক্রম করিয়া হরনাথবাবু বলিলেন “মা।” তারপরে অতি ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থিত গুঞ্জের পানে চাহিয়া বলিলেন ‘অমর’। পিতার উদ্ভিগ্ন নেত্র-পাতের সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ দুই হাতে মুখ ঢাকিল, পিতার সে দৃষ্টি সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

পুনর্বার ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইল ‘অমর’।

অমর মুখ তুলিয়া দেখিল পিতা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। পিতার এই স্নেহশীল ভাব দেখিয়া অকল্পিত যন্ত্রণায় অমরের বক্ষ শতধা হইয়া ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল। দুই কম্পিত ব্যাকুল হস্ত পিতার হস্তখানি মুখের উপরে চাপিয়া ধরিয়া সে শয্যাপার্শ্বে মস্তক স্থাপন করিয়া লুপ্তিত হইতে লাগিল।

গুঞ্জকে স্পর্শ করিয়া হরনাথবাবুর বক্ষের যন্ত্রণা যেন শমিত হইয়া আসিল। গুঞ্জের মস্তকে হস্ত রাখিয়া তাঁহার রুদ্ধ বেদনা অশ্রু-আকারে নয়নে আসিয়া ছাপাইয়া উঠিয়া বরষার করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ধারার ধারায় উপাদান সিক্ত করিতে লাগিল। প্রবীণ হরনাথ বাবু বালকের স্তায় অশ্রুজল সঞ্চরণ করিতে পারিলেন না।

বহুক্ষণ অশ্রু নির্গমের পর তিনি কিছু স্থস্থ হইলেন। মস্তক ফিরাইয়া বধুর উদ্দেশে ডাকিলেন “মা।”

এই হৃদয়ভেদী আন্দোলনের সময় সে এক কোণে গিয়া মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া কি করিতেছিল কে জানে। অন্তর আহ্বান করিতেই নিকটে আসিয়া নত মুখে দাঁড়াইল।

“এইখানে ব’স। একটু বাতাস কর মা।”

অমরনাথ তাঁহার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া নীরবে ব্যঞ্জন করিতে লাগিল। হরনাথ বাবু কিছুক্ষণ তাহাব মন গভীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে

বলিলেন “মা, তোমার আমার একটা অমরোথ রাখতে হবে।”

সুমনা কষ্ট জঁবৎ কম্পিত হইল, সে বলিল “বলুন।”

“মা, তুমি হয়ত অমরকে এখনো ক্ষমা ক’রো নি; কখন করতে পাববে কিনা জানিনা, সে অমরোথ তাই আমি সহসা করতে পারলাম না, কেন না আমার চেয়ে তোমার কাছে তার অপরাধ ঢের বেশী। মা, আমার তোমার কাছে এই অমরোথ, যে ক’দিন আমি থাকি, আমার সম্মুখে তুমি যেন তাকে ক্ষমা করেছ এমনি ভাবে চল।”

সুমনা নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পবে নিশ্বাস ফেলিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন “কখনো পার ত’ তাকে ক্ষমা কবতে চেষ্টা ক’রো।”

সুমনা ধীরে ধীরে তাঁহার পদতলে গিয়া দাঁড়াইল। প্রায় কষ্ট কঠে ছই হস্তে তাঁহার পদযুগল ধরিয়া বলিল “আপনি আশীর্বাদ করুন।”

“তুমি তা পারবে মা। আমি আশীর্বাদ করলাম।”

অমরনাথ নীরবে নতমুখে বসিয়া ছিল। এ দৃশ্যে তখন আর তাহার নিজেকে অপমানিত জ্ঞান হইতেছিল না অথচ পথে আসিতে আসিতে সে এই ঘটনাব সম্ভাবনাতেই মনে মনে ক্লিষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এখন পিতার ক্রমাগত স্নেহশীল মুষ্টি ও স্নেহে ব্যবহারে সে কেবল তাঁহার অপরিণীত স্নেহেরই প্রমাণ দেখিতেছিল। অমর সুমনার ব্যবহার বা সুমনাকে নিজের লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া সে সম্বন্ধে উদাসীন ভাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কেবল তাহার পানে চাহিতে একটু কেমন সঙ্কোচ আসিতেছিল মাত্র। সুমনার সম্মুখে তাহার এ সঙ্কোচ-টুকুতেও সে নিজের কাছে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। কিসের এ লজ্জা? বাহার সহিত অন্তরে বাহিরে কোন’ দিন কোন’ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় নাই তাহার কাছে এ কুণ্ঠা এ লজ্জা কিসের? তাহাকে যদি একদিন এক মুহূর্তের জন্যও অমর জীবির অধিকার দিয়া আসিত তবে না হয় এ লজ্জাকে তাহার সঙ্গত বোধ হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন সুমনা অমরের চক্ষে সম্পূর্ণ পরজীবির মত একজন জীলোক মাত্র, তখন এ লজ্জাকে সে তো ক্ষমা করিতে পারে না।

নিরোধ অমর বুদ্ধিত না যে স্নায়ুধর্ম এবং সমাজের অধিকারের প্রভু মানবের উপরে কত প্রবল।—তাহার বিচাৰাসনতলে অমরের মস্তক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আপনি নত হইয়া পড়িবে। হরনাথ বাবু অমরের পানে চাহিয়া চাহিয়া ডাকিলেন “অমর, উঠে এখানে ব’স।” কলের পুস্তলিকার জায় অমরনাথ উঠিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষু দ্বারা যেন তাহার সর্বাঙ্গ স্নেহমার্জিত করিয়া পিতা বলিলেন “বড় রোগা হ’য়ে গিয়েছ।”

অমরের চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্নেহে তাহার মস্তক উপরে হস্ত রাখিয়া পিতা বলিলেন “কাঁদিসনে অমর; হাজার দোষ করলেও তোব ওপরে কি আমি রাগ করতে পারি?”

অমর একটা অন্ততাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিল না। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল ও পিতা ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমর ক্রমে শান্ত হইল।

সুমনা একটা মেজর গাশে খানিকটা ঔষধ ঢালিয়া নিকটে আনিতেই হরনাথ বাবু বলিলেন “আর ও ঔষধ খাবনা মা, যদি ভাল হই এতেই হব।”

“আপনি ত বোঝই এমনি আপত্তি করেন।”

“অপত্তি করি ব’লে কি তুমি তোমার ছোট ছেলেকে রেহাই দাও মা?”

সুমনা জঁবৎ হাসিয়া উপবোধের ভাবে বলিল “শেষে কথা কবেন বাবা। আগে ধৈর্য ফেলুন।” তার পরে অমরনাথের পানে চাহিয়া স্পষ্ট বাক্যে বলিল “বেদানা আনা হ’য়েছে তো?”

“ট্রাকের মধ্যে আছে” বলিতে বলিতে অমরনাথের মনে হইল চাক কিরূপ জোর করিয়া ট্রেনে তাহাকে বেদানা কিনাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল সে তাহাকে গাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে।

হরনাথ বাবু পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন “তুমি একা এসেছ?”

অমরনাথ মুছ কঠে বলিল “না।”

“ছোট বোমাকে কেনেছ? কই কোথায় তিনি।”

“গাড়ীর মধ্যে।”

হরনাথ বাবু ত্রুট ভাবে বলিলেন “এখনো তোমার তেমনি স্বভাব আছে। বোমাকে এতক্ষণ গাড়ীতে কেলে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হ’য়ে রয়েছ। মা”—বলিতে বলিতে স্বরমা উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সহসা অমরনাথের পানে দৃষ্টি করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ বহু-চেষ্টায়ও নিজের মুখের বিকৃত ভাব গোপন করিতে পারিতেছিল না। স্বরমা তাহা বুঝিয়া ঘরের নিকটে দণ্ডায়মানা একজন আত্মীয়কে ইঙ্গিতে বলিল “তুমি যাও।”

আত্মীয়া উত্তর করিল “ছোট বোকে আমরা গাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। দাণ্ডমানজী বলে পাঠিয়ে-ছিলেন।”

হরনাথ বাবু ব্যগ্র ভাবে বলিলেন “তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও, আমি তাঁকে দেখে আশীর্বাদ করব।”

“এই যে তাঁকে এই ঘরেই এনেছি।”

ধীরে ধীরে অবগুষ্ঠিতা চারু কম্পিত পদে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমরনাথ গভীর নত মুখে বসিয়া রহিল এবং স্বরমা রোগীর পথ্য নির্মাণে নিবিষ্ট ভাবে মনোযোগ দিল। হরনাথ বাবু বলিলেন “এস মা।”

চারু ধীরে ধীরে তাহার পদতলে গিয়া দাঁড়াইয়া শির নত করিয়া তাহার পদতলে প্রণাম করিল। হরনাথ বাবু নিম্ন স্বরে ডাকিলেন “এস মা আমার কাছে এসে ব’স; এই পাশে এস।”

তাঁহার নির্দেশ নত চারু তাহার কম্পিত চরণকে কোন মতে টানিয়া লইয়া গিয়া খণ্ডরের শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

“লজ্জা কি মা, আমি যে তোমাদের বাবা, বলো।”

অবগুষ্ঠনের অন্তরালে চারু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতো-ছিল। এত মেহবাক্য যেন সে কখনো পায় নাই। এইখানে আসিতে সে এতক্ষণ অজ্ঞাত ভয়ে সঙ্কোচে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল? সেই ভয়ের পাত্র কি এই মেহময় শান্তিময় পিতৃসম উদার মহাপুরুষ।

চারু নিকটে উপবেশন করিলে হরনাথ বাবু তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন “আমি তোমার অনেক কষ্ট দিয়েছি মা, তোমার নিজের যবে

তুমি এতদিন স্থান পাওনি। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি সুখী হ’বে।”

বহুক্ষণ সকলের নীরবে কাটিয়া গেল। স্বরমা পথ্য লইয়া বেদিকে অমরনাথ বসিয়াছিল সেইদিকে অগ্রসর হওয়ার অমরনাথ উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। স্বরমা ধীরে ধীরে বলিল “বাবা, খাবারটুকু খান।”

“দাও মা।”

স্বরমা পার্শ্বে বসিয়া নিপুণ হস্তে সমস্তে তাঁহাকে পথ্য সেবন করাইতে লাগিল। চারু ইহার পূর্বে দ্বারান্তরাল হইতে স্বরমাকে চিনিয়াছিল এবং আনন্দানন্দিত হৃদয়ে তাহার প্রতি কর্ম প্রশংসার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার উন্নত উদার মুখ, জলপূর্ণ আয়ত নয়ন, অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি, সর্বোপরি তাহার সর্বকর্মনিপুণ মেহপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া ভক্তিমিশ্রিত ভালবাসার চারুর মন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। হরনাথ বাবুও অমরে মিলনোখিত ক্রন্দনেব সময়, স্বরমা যখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ও তাহার জ্যোতিপূর্ণ কৃষ্ণতাবক আয়তচক্ষু হইতে অশ্রুশিশি ছাপাইয়া উঠিয়া উজ্জল গুণ্ডল বহিয়া মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল, ঘরের অন্তরাল হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া তখন চারুর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা পারে নাই, কেবল লুপ্ত নেত্রে এতক্ষণ স্বরমার প্রত্যেক কার্য প্রত্যেক ভঙ্গী পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল—জীবনে মা ভিন্ন অস্ত্র কাহাকেও যে জানে নাই—জগতের অস্ত্র কোন সখ্যকের সহিত যে মোটেই পরিচিতা নয় তাহার পক্ষে স্বরমার সহিত সখ্যকের জটিলতা মনে করিয়া চারু নিজেকে স্বরমা হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। বিশেষ চারুর মত সংসাবানভিজার পক্ষে ইহাই সম্ভব। চারু স্বরমাকে একজন আত্মীয়া জানিয়াই মনে মনে “দিদি” নামে অভিহিত করিতেছিল। সেই স্বরমাকে এখন অত্যন্ত নিকটে পাইয়া চারু বিশ্বস্ত হৃদয়ে তাহার পানে চাহিবামাত্র সহসা শিহরিয়া উঠিল। স্বরমার সে উদার মেহপূর্ণ মুখকান্তি যেন নিমেষে পরিবর্তিত হইয়া কি এক রকম হইয়া উঠিয়াছে। আরক্ত মুখে আয়ত চক্ষু যেন চক্ চক্ করিয়া অক্লান্ত বৃহৎ তাবা হইতে অস্বাভাবিক জ্যোতি

প্রকাশ করিতেছে। মুখে যেন একটা দাক্ষিণীয়া ভাব আসিয়া অধিকার করিয়াছে। ভীক্সভাবা চাক্র অজ্ঞাত ভয়ে মুহমান হইয়া পড়িল।

হরনাথ বাবু পথ্যসেবন শেষ হইলে সুরমা তাঁহার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। হরনাথবাবু নিম্নবরে বলিলেন “একটু দাঁড়াও না।—ছোট বোমা, আমার এখানে একবার এস তো মা।” চাক তাঁহার আজ্ঞামত অপর পার্শ্বে গিয়া তাঁহাব শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দাঁড়াইল। সুরমার পানে তাহাব আর চাহিতে সাহস হইল না। হরনাথবাবু ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিয়া চাক্র ক্ষুদ্র কল্পিত হস্তখানি এক হস্তে লইয়া অপর হস্তে সুরমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহার উপবে চাক্র হস্তখানি স্থাপন করিলেন। আর্দ্র চক্ষু সুরমার পানে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন “মা, আমি একে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। এ তোমার ছোট বোন। ছোট বোমা তোমার দিককে নমস্কার কর; ইনি দেবী।”

চাক্র ধীরে ধীরে কল্পিত বক্ষে আভূমি প্রণত হইয়া নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইতেই একখানি কোমল বাহু চাক্র একখানি হস্ত বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল। চাক শিহরিয়া চাহিয়া দেখিল অপূর্ণ করুণাপূর্ণ স্নেহময়ী দেবীমূর্তি বটে! চাক্র ভীত সরল ক্ষুদ্র মুখখানির উপরে তাহার সেই উজ্জ্বল চক্ষুয় এখন যেন অজস্র স্নেহ বর্ষণ করিতেছে। চাক বিগলিত ভাবে সুরমার বুকে ধীরে ধীরে যেন নিজের অজ্ঞাতেই মস্তক স্তম্ভ করিয়া মুহুসবে বলিল “দিদি!”—

* * * *

অমরনাথের অশ্রান্ত চেষ্টা ও সুরমার ক্রান্তিহীন বদ্ব সঙ্কেত হরনাথবাবু আর বেশীদিন তাঁহার নবগঠিত স্নেহের সংসারে আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন না। যে কয়দিন ছিলেন, সেই কয়দিনেই যেন ভিতরে ভিতরে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর ভাবী আশঙ্কায় ব্যাকুল যে ক’টি স্নেহকাতর প্রাণ আপনাদের দাবী মাগিয়া সব ত্যাগ কবিরী নির্মল প্রশান্ত চিত্তে পরস্পর পরস্পরের উপবে নির্ভর করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল তাঁহার গমনের বিলম্বে পাছে তাহার

স্বৈর্ধ্যহীন হইয়া তাঁহার সম্মুখেই নিজেদের গণ্ডির রেখা উন্নত করে, এই ভয়ে যে কয়দিন ছিলেন, তাহাই তাঁহার দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল। অমর সহজে সুরমার সঙ্গে কথা কহিত না, সে সম্মুখে বা নিকটে থাকিলে প্রথমে ঈষৎ তটস্থ হইয়া পড়িত, কিন্তু সুরমা যখন অসঙ্কোচে স্বপ্নের চিকিৎসা ও সেবা সঙ্কল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ের জিজ্ঞাসা ও আলোচনা কবিত তখন অমরনাথ যেন হাঁপ ছাড়িয়া সহজ সরলভাবে তাহার উত্তর দিত। হরনাথবাবু সে সময়ে মনে মনে সুরমাকে অজস্র আশীর্বাদ করিতেন। মুহূর্ত্তে বলিতেন “আমি এখন স্নেহে ষেতে পারব।” শেষদিনে অমর সকলের সম্মুখে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল “বাবা, আমার প্রতি আপনার কোন আজ্ঞা থাকে তো বলুন।”

হরনাথবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন “আজ্ঞা? না।”

“বলতে আপনি সঙ্কোচ করবেন না বাবা। কাকার কাছে শুনেছিলাম, আপনি আপনার জ্যেষ্ঠা বধূকে সমস্ত বিষয় দেবেন বলেছিলেন।”

সুরমার মুখে পানে দৃষ্টিপাত করিয়া হরনাথ বাবু স্নেহগগদ কণ্ঠে বলিলেন “যখন আমার মাকে বুঝিনি তখন বলেছিলাম। বড় বোমা যে আমার মা, তাঁকে কি আমি মনঃপীড়া দিয়ে লজ্জা দিতে পারি?”

অমরনাথ উভয় হস্তে পিতার পদতল স্পর্শ করিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “তাহলে আমার আপনি কমা করেছেন বাবা?”

“তোকে কমা? তোর ওপরে কি আমি রাগ কর্তে পেরেছিলাম অমু?”

কিরুৎকর্ণ পরে তিনি ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন “আর না অমু, এখন আমি এসব কথা আব বেশী ক’বনা। ভেবোনা যে আমি এখন মনে কোন ক্ষোভ নিয়ে গেলাম, আমি এখন বড় স্নেহী। তোমার স্থানে তোমায়ই প্রতিষ্ঠিত ক’রে রেখে গেলাম। তুমি বড়বোমার ওপরে যে অস্তায় করেছ আমি তোমায় সে অস্তায়ের প্রতিকলটুকু আমার বিচারমত ভোগ কবিয়েছি। কিন্তু তবু তুমি আমার সেই অমরই আছ এবং থাকলে। আমার মা বড় বোমার সঙ্কেত আমি তোমায় কিছু বলব না, আমি জানি

তার স্থান তিনি নিজে বন্ধা করবেন, কেউ তাঁকে এখনো চেনে না।*

বৈকালে পুত্র ও গুণবধূকে আশীর্বাদ করিয়া হরনাথ-বাবু শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিবনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অমরনাথ বালকেব ছায় অজস্র রোদন করিতে লাগিল, চাক কয়েক দিন মাত্র শব্দবের স্নেহস্বাদ পাইয়া পুনর্বার পিতৃমাতৃহীনা বালিকার ছায় এক কোণে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রামাচরণ বার উভয়কে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। একজন মাত্র ধৈর্যের প্রতিশ্রুতির মত নীরবে শ্রামাচরণ বারের উপদেশ অনুসারে ষথাকর্তব্য কর্মে সহায়তা করিতেছিল, অথচ অব্যক্ত যাতনা ও ক্রন্দনে তাহার হৃদয় বত সজ্জ্বলিত তেমন আর কাহারো নহে; তাহার সে সাধাবণের অজ্ঞাত চির-আত্মনির্ভরশীল হৃদয়ের যে কতখানি গেল তাহা সেই বলিতে পাবে। সে সুরমা।

(ক্রমশঃ)

ত্রিনিরুপমা দেবী।

কামাখ্যা-দর্শন

গত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আসামের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র কামাখ্যাধাম ও বিশিষ্টাশ্রম দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটয়াছিল। প্রকৃতি দেবীর প্রকৃত লীলাক্ষেত্র কামরূপ-ক্ষেত্র উচ্চ নীলগিরি* শৃঙ্গ হইতে কি সুন্দর দেখায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া কিছুক্ষণের অল্প সংসারের সমুদায় গোলমালের হাত এড়াইয়া এক অনির্বচনীয় শান্তিস্থল উপভোগ করিয়াছেন। কামাখ্যা পর্বতে সম্মিলনীর ব্যবস্থা করিয়া সভার কর্তৃপক্ষগণ প্রকৃতই সাহিত্যালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করিয়াছিলেন।

আমরা অতি প্রত্যুষে রেলগাড়ী হইতে দূরবর্তী আসাম প্রদেশীয় নানা-বুদ্ধলতা-সমাকীর্ণ মনোরম পর্বতশ্রেণীর এবং রেলরাস্তাব পার্শ্বস্থিত নলখাগড়া ও উলুখড়ের ক্ষেত্রের মধ্যে

মৃগশিঙ ও শৃগালের ইতস্ততঃ ছুটাছুটি দেখিতে দেখিতে সহযাত্রীগণ সহ আনন্দ-কোলাহল করিয়া চলিতেছিলাম।

সূর্যোদয়েব পর পুবাণ-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদ দর্শন করিয়া পরশুরামেব পিতৃ-আজ্ঞা পালনের স্মৃতি আমাদের মনে জাগরুক হইল। লোহিতের নীলাবুবাশি অতি স্বচ্ছ ও স্বাহ। আমবা শ্রীমার যোগে নদ পাব হইয়া পুনরায় রেল-গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। এই স্থানে বহুদূর-দেগাগত বন্ধুগণের সহিত আমরা একত্র হইলাম। সকলেই একভাবে একই উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। পূর্বাঞ্চে আমবা কামাখ্যা ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনটী কামাখ্যা পর্বতের পাদদেশে, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই পর্বতারোহণ করিবার দি ডিতে উঠিতে হয়। এই পার্বত্য পথটী নরকাসুর পুরাকালে নিশ্মাণ করাইয়া জনসাধারণের দেবীপীঠ দর্শন করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া আজও কীর্ষিতে জীবিত হইয়া আছেন। এই পথের প্রস্তর-সোপানগুলি পরে কোন সময়ে—সম্ভবতঃ কুচবিহারাধিপতি গুরুধ্বজ রথন কামাখ্যা-মন্দির পুনর্নির্মিত করিয়াছিলেন তখন—সংস্কৃত হইয়া থাকিবে। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া যেসকল সোপান দৃষ্টিগোচর হয়, ঐগুলি কোন একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ঐসকল প্রস্তরখণ্ড এবং আরও ঐ প্রকারের বহু খণ্ড যাহা এখন পর্বতের উপরিস্থিত গ্রাম্যপথগুলিতে এবং অনেক পাণ্ডাব বাড়ীর গৃহ-ভিত্তিতে স্থাপিত আছে—এককালে দেবীমন্দিরে সংযোজিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

পর্বতারোহণ করিবার আর একটা সুন্দর পথ ব্রহ্মপুত্র নদের ধার হইতে নির্মিত হইয়াছে; ইহা ময়মনসিংহ-নিবাসী স্বর্গীয় বাজা হরিশ্চন্দ্র নিজ ব্যয়ে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এই পথটী পর্বতের পূর্বপ্রান্তে, এবং অনেকটা সুগম। ব্রহ্মপুত্র দিয়া নৌকাযোগে এই পথে যাওয়া যায়।

নরকাসুর-নির্মিত সোপানশ্রেণীর পার্শ্ব পর্বতগাত্রে সিদ্ধিমাতা গণেশজীর মুখিকবাহন-মূর্তি খোদিত আছে, মুখিক-পৃষ্ঠে লম্বোদরের অবস্থান অশ্রুত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। পদ্মাসনের ব্যবস্থাই দেখা যায়। একটী রাক্ষস-

* কামাখ্যা পর্বতের নামান্তর নীলগিরি। (বোগিনীভয়)

মূর্তি এবং সালঙ্কার বরমুজায় সমাসীন একটা বুদ্ধমূর্তিও পর্বতগাত্রে খোদিত আছে। বৌদ্ধপ্রভাব নীলাচলেও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে ছাড়ে নাই। অনেকগুলি সাধুসন্ন্যাসীও পথিপার্শ্বস্থ পর্বতগুহায় আশ্রয় লইয়া পারলৌকিক মুক্তির চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। কেহ বা গঞ্জিকাসেবায় সিদ্ধিলাভ কবিতেন্ছেন।

পর্বতশৃঙ্গে উঠিয়া আমরা দেবীকে প্রণাম করিয়া সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সভার দৃশ্য দর্শনে পরম পুলকিত হইলাম। বর্তমান যুগে সভাস্থল বলিলেই চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি আসবাবে শোভিত প্রাঙ্গণ বা মণ্ডপ বুঝায়; কিন্তু এস্থলে তাহার কোনও একটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। বাঙ্গালীরা চিরন্তন প্রথা সেই সত্তরঞ্চশোভিত বিস্তৃত ফাশ, তত্বপরি সভাগণ সমাসীন, পরস্পর কোলে পীঠে পার্শ্বে—দেখিলেই ভ্রাতৃত্বাব জাগিয়া উঠে। এইসকল সম্মিলন করার প্রধান উদ্দেশ্য এইপ্রকাব মঙ্গলিসেব প্রচলন দ্বারা এক্ষেত্রে অনেকটা সাধিত হইয়াছিল। আমরা বাঙ্গালী, বাংলাপদ্ধতি ও চালচলন অনুসারে কোন্ কাক্স হইলে তাহাতে যেমন একটা আনন্দ বোধ হয়, অনুকরণীয় ব্যাপারে ঠিক তেমন হয় না। কেমন যেন একটা বাধ-বাধ বোধ হয়। আমাদের মনে হয় বাংলা রকমের সভাসমিতিতে কামাখ্যার জ্ঞান ফরাশের প্রথা প্রচলিত হইলে-মন্দ হয় না।

কামাখ্যা-পর্বতের ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গই সর্বোচ্চ এবং পরম রমণীয়। এখান হইতে গোঁহাটা নগরী, ব্রহ্মপুত্র, পর্বতপাদসংলগ্ন রেলপথ ও চতুর্দিকস্থ আসামীর নীল পর্বতশ্রেণী অতি সুদর্শন। ভুবনেশ্বরী মাতার মন্দিরের পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশের শিলাপৃষ্ঠে বসিয়া ঐসকল স্বভাবের শোভা দেখিলে সংসারের কথা মনে হয় না এবং ঐ স্থানটা ছাড়িয়া আসিতেও ইচ্ছা করে না। যোগিনীতন্ত্রে বর্ণিত কামরূপক্ষেত্র বাস্তবিকই প্রকৃতির লীলাভূমি। ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটাও ভূকম্পের পব অতি সুন্দররূপে সংস্কৃত হইয়াছে। বিগত ভীষণ ভূমিকম্পে প্রাচীন মন্দিরগুলির অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে।

কামাখ্যা-মন্দিরের পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ নিম্নস্থ একটা শৃঙ্গে যোগীবর অভয়ানন্দ তীর্থস্বামী মহাশয়ের অক্লান্ত শ্রমে

ও উদ্যোগে একটা ধর্মশালা নির্মিত হইতেছে। পরহিত-ব্রত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গবর্ণমেন্ট হইতে সাধারণ গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলের দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা করিয়া এই মহতী কীর্ত্তি স্থাপন কবিয়াছেন। বাড়িটার আর অতি সামান্য কার্য্যই অবশিষ্ট আছে। কামাখ্যার মাতৃসেবক পাণ্ডাগণ অতি উদ্যবস্রাব এবং অতিধিসংকারপ্রিয়। সাধারণত তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণ যেপ্রকাব অর্থগুরু এবং যাত্রী-পীড়ক, ইহাও তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পার্শ্বত্যাগপ্রণয় অতি সবল ও সাধুপ্রকৃতি। যাত্রীগণকে ইহার পরম যত্নে স্বগৃহে আহ্বার ও বাসস্থান দিয়া থাকেন। ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র প্রভৃতি শ্রেণীনির্কিংশেমে আদরবস্ত্রের কাহারও কোনও ভ্রুটি হয় না। যিনি বাহা দক্ষিণা দিতেছেন তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট। ইহাদের কোনওরূপ অভাব অভিযোগও শুনিতে পাওয়া গেল না।

কামাখ্যা-পর্বতে দুইদিন অবস্থান করিয়া আমরা গোঁহাটা নগরী পরিদর্শনান্তে বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিয়া-ছিলাম। কামাখ্যা-পর্বতমূল হইতে মহাতপা মহর্ষির আশ্রম প্রায় ১১ মাইল পথ। এই সুদীর্ঘ পথটা গোঁহাটা লোকালবোর্ড উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা অংশকটে এই পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টার সময়ে বশিষ্ঠাশ্রমে পৌছিলাম। স্থানটা অতি রমণীয়। চতুর্দিকে অতুল্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যে একটু উপত্যকা, মনে হয় প্রাচীর-বেষ্টিত একটা সুন্দর প্রাঙ্গণ। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে মহাতেজা মহর্ষির তপঃপ্রভাবে আনীত সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তা নামী বিশাল শিলাভেদী জলধারাভ্রম। কি সুন্দর দৃশ্য, কি মহান গাভীর্ঘ্য, কি চমৎকার ভাব। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যায়। ভীষণ প্রস্তরখণ্ডরাশির মধ্যে দিয়া জলধারাভ্রম প্রবাহিত হইয়া কিয়দূর পরে তিনটা একত্র মিলিত হইয়া পুনরায় দুইটা ধারায় বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। এই মিলনস্থানটা বশিষ্ঠ-কুণ্ড নামে খ্যাত। ঐ স্থানে বশিষ্ঠদেবের আসন-প্রস্তর-খানি অজ্ঞাপি সেই মহর্ষির কঠোর তপস্তার সাক্ষ্যদান করিতেছে। জলপ্রপাতের সুমধুর ধ্বনি প্রতিধ্বনি স্থানটাকে সর্বদা মুগ্ধরিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা প্রকৃতই সাধনার স্থান। এমন চিত্তমুগ্ধকর, প্রাকৃতিক

সৌন্দর্যপূর্ণ স্থান না হইলে তপস্বী হয় না। অলধারাগুলি অতি সুনির্মল ও সুগন্ধ।

এই স্থানটা হিন্দুর একটি পবিত্র তীর্থ। যাজ্ঞিক আসিয়া বশিষ্ঠকুণ্ডে স্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন। এবং এইসকল বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর রন্ধন ভোজনাদি করেন। কিন্তু শেবোক্ত কাণ্ড দ্বারা এমন রমণীয় পবিত্র স্থানটাকে বড়ই অপবিত্র করিয়া যান। ভোজনপাত্র, রন্ধনপাত্র এবং অঙ্গার ভস্ম ইত্যাদি এইসকল প্রস্তরের উপরেই রাখিয়া যান। অতি সামান্য ক্লেব্রস্বীকার করিয়া উহা পরিষ্কার করিলে স্থানটাও নোংরা হয় না এবং অল্প লোকের স্বাস্থ্যহানিরও আশঙ্কা থাকে না। হিন্দু হইয়া হিন্দুতীর্থে এপ্রকার অত্যাচার করা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

গৌহাটীর কর্তৃপক্ষ আগন্তুকদিগের বিশ্রামের জন্য এই স্থানে একটি ডাকবাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অবস্থান করিলে কোনও প্রকার টেক্স দিতে হয় না।

জলপ্রপাতটির পূর্বপার্শ্বে বশিষ্ঠদেবের মন্দির আছে, প্রাচীন মন্দিরটা ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর বর্তমান মন্দির প্রাচীন উপকরণ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। প্রাচীন মন্দিরটাও মধ্যে সংস্কৃত হইয়াছিল। একখানি শিলালিপি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। মন্দিরগাজে গণেশদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি পোদিত আছে। মন্দিরের মধ্যে মহাতপা মহর্ষি বশিষ্ঠদেব একখানি প্রায় ৩৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রস্থ অসমান প্রস্তরাকারে শায়িত আছেন। তিনটা কামরূপী ব্রাহ্মণ ইহার সেবক নিযুক্ত আছেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞিকদিগকে স্নান ও দর্শনাদির মন্ত্র পাঠ করাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া থাকেন। কথিত আছে এই বশিষ্ঠকুণ্ডে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করিলে ব্রাহ্মণগণের নিত্য-ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা-দৈবাৎ-অকরণ-জনিত প্রত্যাবায় হয় না। আমরা শ্রুত হইলাম যে, রাত্রিতে সময় সময় বজ্রহস্তী এবং শার্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ এখানে আসিয়া থাকে কিন্তু তপোবনের নিয়মামুসারে তাহার কখনও কোন হিংসা বা উৎপাত করে না। বশিষ্ঠমন্দিরের সম্মুখে একটা টিন-নির্মিত নাটমন্দির আছে, তাহাতে অনেক যাজ্ঞী ও সাধু

সম্মাসিগণ আশ্রয় লইয়া থাকেন। একখানি ক্ষুদ্র মূদী-দোকানও ঐ স্থানে আছে।

আমরা বথাবিধি স্নানাদি করিয়া এবং প্রচলিত নিয়ম-মুসারে রন্ধন, ভোজন সমাপনান্তে জলপ্রপাতের মধ্যস্থিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এ সময়টা যে কি সুখে কাটাইয়াছি তাহা এখন কল্পনায় আসে না। একজন অধ্যাপক বঙ্কু মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের তারা-উপাসনা-বিষয়ক গীতা এবং বক্তৃতা দ্বারা আমাদেরকে কিয়ৎকাল পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। উক্ত বঙ্কুবর যে এমন সুকণ্ঠ-গায়ক তাহা কখনও জানিতাম না। গানের কথায় অল্প সময়ে ক্রোধে তিনি “তেলে বেগুনে” হইতেন; কিন্তু আজ স্থানের গুণে তিনিও সুস্বরে ব্রহ্মময়ীর মহিমা গান করিয়াছিলেন।

আমরা বশিষ্ঠপ্রস্তরের অনির্কটনীর শান্তি-সুখ ও সুদৃশ্য পরিভাগ করিয়া পুনরায় গৌহাটী আসিলাম এবং বাস্পীয় শকট আরোহণে স্বদেশ যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যাসমাগমে ব্রহ্মপুত্রের গাঢ়নীলাভুরাশি ষ্টীমারে পার হইয়া পুনরায় শিলং মেলে আবোহণ করিলাম, এবং পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর স্বদেশের শোভাদর্শন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী।

জলস্থল

আমরা ডাঙার মাছুষ কিন্তু আমাদের চারিদিকে সমুদ্র। জল এবং স্থল এই দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে মাছুষ। কিন্তু মাছুষের প্রাণের মধ্যে এ কি সাহস—যে-জলের কুল দেখিতে পাইনা মাছুষ তাহাকেও বাধা বলিয়া মানিল না, তাহার মধ্যে ভাসিয়া পড়িল।

যে জল মাছুষের বন্ধু সেই জল ডাঙার মাঝখান দিয়াই বকে। সেই নদীগুলি ডাঙার ভগিনীদের মত। তাহা বা কতদূরের পাখরবাধা ঘাট হইতে কাঁখে করিয়া জল লইয়া আসে—তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নোন্নয়ন করিয়া দেয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কি বিষম বিরোধ। তাহার অগাধ

জলরাশি সাহাবার মরুভূমির মতই পিপাসায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্য, তবু সে মানুষকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সে বমরাজের নীল মহিষটার মত কেবলি শিং তুলিয়া মাথা কাঁকাইতেছে কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হঠাইতে পারিলনা।

পৃথিবীর এই দুইটা ভাগ—একটা আশ্রয় একটা অনাশ্রয়, একটা স্থির একটা চঞ্চল, একটা শান্ত একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে-সন্ধান সাহস করিয়া এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সেই ত পৃথিবীর পূর্ণসম্পদ লাভ করিয়াছে। বিয়ের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এই জন্ত আমাদের পূরণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন লক্ষ্মী এই পণ। এই জন্তই মানুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। পার হইতে পারিলে তবে তিনি ধবা দিবেন। যাহারা কুলে বসিয়া কলশকে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল মেলিল না, পাড়ি দিল না তাহারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইল।

আমাদের জাহাজ যখন নীল সমুদ্রের জুড় হৃদয়কে কেনিল করিয়া সগর্বে পশ্চিম দিগন্তের কুলহীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন এই কথাটাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ করিল সেই দিনই লক্ষ্মীকে বরণ করিয়াছে। আর যাহারা মাটি কামড়াইয়া পড়িল, তাহারা আর অগ্রসর হইল না, এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেল।

মাটি যে বাধিয়া রাখে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মত সন্তানকে কোনমতে দূরে বাইতে দেয় না। শাক-ভাত তরিতরকারী দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ায়, তাহার পরে ঘনছায়াতলে শ্রামল অঞ্চলের উপর ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বাহির হইতে চায় তবে তাহাকে অবেলা অবাভ্রা প্রভৃতি জুড়র ভর দেখাইয়া শাস্ত করিয়া রাখে।

কিন্তু মানুষের যে দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এত বড় যে কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলা ফেরা বাধা পায়। জোর করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে। মানুষের মধ্যে যাহারা দূরে বাইতে পাইয়াছে তাহারাই আপনাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। সমুদ্রই মানুষের সম্মুখবর্তী সেই অতিদূরের পথ—দুর্লভের দিকে দুঃসাধ্যের দিকে সেইত কেবলি হাত তুলিয়া তুলিয়া ডুক দিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া যাহাদের মন উতলা হইল, যাহারা বাহির হইয়া পড়িল তাহারাই পৃথিবীতে জিভিল। ঐ নীলাম্বুরাশির মধ্যে ক্রমের বাশি বাজিতেছে—কুল ছাড়িয়া বাহির হইবাব জন্ত ডাক।

পৃথিবীর একটা দিকে সমাপ্তিব চেহারা আব একটা দিকে অসমাপ্তিব। ডাঙা তৈরি হইয়া গিয়াছে—এখনো তাহার মধ্যে যেটুকু ভাঙাগড়া চলিতেছে তাহার গতি মুহূমন্দ, চোখে পড়েই না। সেটুকু ভাঙাগড়ারও প্রধান কারিগর জল। আর সমুদ্রের গর্ভে এখনো সৃষ্টির কাজ শেষ হয় নাই। সমুদ্রের মজুরী করে যেসকল নদনদী তাহারা দূব দ্বাস্তব হইতে বুড়ি বুড়ি কাধা বালি মাথায় করিয়া আনিতেছে। আর কত লক্ষ লক্ষ শায়ুক কিছুক প্রবালকোট এই রাজমিস্ত্রির সৃষ্টির উপকরণ অহোরাত্র জোগাইয়া দিতেছে। ডাঙার দিকে দাঁড়ি পড়িয়াছে, অন্তত সেমিকোলন; কিন্তু সমুদ্রের দিকে সমাপ্তির চিহ্ন নাই। দিগন্তব্যাপী অনিশ্চয়তার চিরচঞ্চল রহস্যাকারের মধ্যে কি যে ঘটতেছে তাহার ঠিকানা কে জানে! অশান্ত এবং অশ্রান্ত এই সমুদ্র—অনন্ত তাহার উদ্যম।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষ ভাবে বরণ করিয়াছে তাহারা সমুদ্রের এই কুলহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে—কোন একটা চরম পরিণাম মানব-জীবনের লক্ষ্য নহে, কেবল অবিশ্রাম ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কেবলি নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আনিতেছে। তাহারা কোন একটা কোণে বাসা বাধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। দূব তাহাদিগকে

ডাকে, 'হুল্লু' তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অসন্তোষের ঢেউ দিবাবাত্রি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটাইয়া তাহাদের চিত্তের মধ্যে কেবলি ভাঙাগড়ার প্রবৃত্ত আছে। রাত্রি আসিয়া যখন সমস্ত জগতের চোখে পলক টানিয়া দেয় তখনো তাহাদের কারখানা-ঘরের দীপচক্ষু নিমেষ ফেলিতে জানে না। ইহারা সমাপ্তিকে স্বীকার করিবে না, বিশ্রামের সঙ্গেই ইহাদের হাতাহাতি লড়াই।

আর ডাঙার যাহা বাসা বাঁধিয়াছে তাহা কেবলি বলে আর নহে, আর দরকাব নাই। তাহারা যে কেবল ক্ষুধার খাতটাকে সঙ্গীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহাও ক্ষুধাটাকে হুজু মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা বেটুকু পাইয়াছে তাহাকেই কোনোমতে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে কেবলি চারিদিকে সূনিশ্চিতের সনাতন বেড়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। তাহারা মাথার দিবা দিয়া বলিতেছে, 'আব যাই কর, কোন মতে সমুদ্র পাব হইতে চেষ্টা করিয়া না। কেননা সমুদ্রের হাওয়া যদি লাগে, অনিশ্চিতের স্বাদ যদি পাবে, তবে মানুষের মনের মধ্যে অসন্তোষের যে একটা নেশা আছে তাহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে! সেই অপরিচিত নূতনের রাগিণী লইয়া কালো সমুদ্রের বাঁশির ডাক কোনো একটা উতলা হাওয়ার যাহাতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে না পারে সেই জন্তে কৃত্রিম প্রাচীরগুলোকে যত সমুচ্চ করা সম্ভব সেই চেষ্টাই কেবল চলিতেছে।

কিন্তু এই সমুদ্র ও ডাঙার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া তাহার বিবোধ ঘুচাইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। এই ছুরে মিলিয়াই মানুষের পৃথিবী। এই ছুরের মধ্যে বিচ্ছেদকে জাগাইয়া রাখিলেই মানুষের যত কিছু বিপদ। তবে এত দিন এই বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে কেন? সে কেবল ইহা বা হরগৌরীর মত ভগবতার দ্বারা পরস্পরকে পাইবে বলিয়াই। ঐ যে একদিকে স্থাপু দিগধরবেশে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, আর একদিকে গৌরী নব নব বসন্তপুষ্পে আপনাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন। স্বর্গের দেবতারা ইহাদেরই শুভযোগের অপেক্ষা করিয়া আছেন, নহিলে কোনো মঙ্গলপরিণাম জন্মলাভ করিবে না।

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি। তাহাতে ক্ষতি হইত না কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া মায়্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি। সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশে মিথ্যা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম কিন্তু শক্তিকে হুঃখকে মানিলাম না। তাই আমরা রাগীকে অপমান করিতে রাজার স্তব করিয়াও রক্ষা পাইলাম না, সত্য আমাদের দিককে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য কবির্য্য ধরিয়া বলিয়া আছে তাহারা সমাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না এই তাহাদের পণ। এই জন্ত বাহিষের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহার্য্য করিতেছে অথচ সন্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও তাহার বলিতে আবস্ত করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোনো পদার্থই নাই, আছে কেবল গমন। কেবলি হইয়া উঠা, কিন্তু কি যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকান কোনোখানেই নাই। ইহা এমন একটা সমুদ্রের মত যাহার কুলও নাই তলও নাই আছে কেবল ঢেউ,—যাহ পিপাসাও মেটায় না, ফসলও ফলায় না, কেবলই দোল দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর হুঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়্যা—উহার দেখিল হুঃখকে আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়্যা। কিন্তু পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে ভ কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না—পূর্বপশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিথ্যা হয় পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দাঙ্কোব খণ্ডমানিত্বতানি জ্ঞানস্তে—অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু জন্মিতেছে একথা যেমন সত্য তেমনি "স তপোহতপ্যত" অর্থাৎ তপস্তা হইতে হুঃখ হইতেই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হইতেছে এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীত গানের পূর্ব আনন্দও যেমন সত্য, আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য।

এই আনন্দ এবং হুঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি, এই চির-
পুরাতন এবং চিরনূতন, এই ধনধান্যপূর্ণ ভূমি ও হুঃখাশ্রয়চকল
সমুদ্র উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে
স্বীকার করা।

এইজন্ত দেখিতেছি বাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল
বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্নত হইয়া উঠিয়া অপঘাত
মৃত্যুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ
কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া
ঠেকিতেছে। আর বাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া
কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায় তাহারা নির্বীৰ্য্য ও জীর্ণ
হইয়া এক শয্যার পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাক্তার পাড়ি এবং
সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিতে এবং
দুই পক্ষের মধ্যে পণ্যবিনিময় হইবে তখন উভয়ে বাচিয়া
যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনাব পণ্য দিয়া কেহ
আপনার দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারে না ;—বিনিময় না করিতে
পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর
দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মানুষ পরস্পর মিলে
বলিয়াই পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্য দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া
গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে জীপুংসের বিভাগ ঘটাতাই
যেমন দেখিতে দেখিতে বিভিন্ন জন্তুঃপ্লেথের আকর্ষণের ভিতর
দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্চর্য্যরূপে উৎকর্ষলাভ
করিয়াছে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও কেহবা স্থিতিকে
কেহবা গতিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করাতাই আজ আমরা
এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি মানুষের সত্যতাকে
বাহা বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আরব সমুদ্র,

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরাত

(অর্থর্ষবেদ)

কোন্ ভাগে তাঁর সত্য নিহিত ?

কোথা ঋত আর কোথায় ব্রত ?

কোন্ সে অঙ্গে শ্রদ্ধা বিরাজে ?

কোথা তপস্তা স্রসংযত ?

কোন্ ভাগে তাঁর অগ্নি দীপিছে ?

কোন্ খানে আর পবন বহে ?

বিরাতের সেই বিপুল শরীরে

দিনে কোথা চাঁদ গোপন রহে ?

কোন্ সে অঙ্গে তিষ্ঠে ভুলোক ?

কোন্ সে অঙ্গে ছালোক রাজে ?

কোথায় আকাশ রয়েছে প্রকাশ

বিরাতের মহাবপুর্ন মাঝে ?

সকল পথের কোথা অবসান ?

বায়ু কোথা ধার সমুৎসুক ?

কার অভিমুখে আহতি বহিয়া

বহি হইতে উর্দ্ধমুখ ?

কার কটাক্ষে বৎসর মাস

করে যাতায়াত ঋতু ও তিথি ?

কার ইঙ্গিতে মন্তকে তারা

বিহিত হব্য বহিছে নিতি ?

সুত্রা ও শ্রামা,—দিবা বিভাবনী

নিত্য কাহারে ভজনা করে ?

কাহার লাগিয়া নদে বহে শ্রোত ?

নির্বর ঋরে কাহার তরে ?

প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিয়া

রেখেছেন কোন্ স্তম্ভ 'পরে ?

কোন্ স্তম্ভের স্তম্ভ ক্ষমতা

বিশ্বের ভার হেলার ধরে ?

উর্দ্ধে কোথায় উঠেছে সে হুঁড়ে ?

নীচে কত দূর গিয়েছে নেমে ?

প্রজাপতি যেথা সৃজিছেন প্রজা

সেই ঠায়ে শুধু আছে কি থেমে ?

ভবিষ্য-বীজ কি আছে তাহাতে ?

অতীতের বাকী রয়েছে কিবা ?

এক হতে বহু গড়িবারে পঁছ

ব্যাপৃত আছে কি যামিনী দিবা ?

জিন লোক আর জিবিধ যে কোষ

সকলি রয়েছে তাঁহার মাঝে,

নিখিল-দ্রষ্টা ব্রহ্ম-বিজ্ঞা

তঁাহারি মধো মধুরে রাজে ।

তপস্তা তাহে আছে ব্রত ধরি'

ব্রহ্মা রয়েছে যজ্ঞ সাথে ;

ধরি হাতে হাতে আছে সদসৎ,

মিলে মিশে আছে দিবসে রাতে ।

তঁাহারি মধ্যে নিখিল দেবতা,

পৃথিবী, আকাশ, সূর্য, শশী ;

অগ্নি ও বায়ু, মৃত্যু ও আয়ু,

ঋক, সাম, যজু, তাপস বশী ।

দিক্চর তাঁর চেষ্টনা-তন্তু,

সপ্ত সাগর তাহার নাড়ী ;

মধুমতী কশা জিহ্বা তঁাহার,

নাই কিছু নাই তাঁহারে ছাড়ি' ।

সেই প্রজাপতি, পরমেশ্বর সে,

ব্রহ্মবিদেরা তাহারে জানে ;

তন্তু,—ধারক, স্বত্ব,—পূবক,

তারে অর্থকি ঘোষিছে পানে ।

যাতুধান—যারা য'হু জানে—তারা

বিরাটেরি দেহে বিরাট করে ;

অঙ্গিরা তাঁর নয়ন সমান,

অঙ্গি তাঁহার ললাট 'পরে ।

কেহ অশথের অসং শাখাটি

দেখিছে ভুবন প্রতিষ্ঠিত,

অথমে ভজিছে পরম বলিরা

শাখার মজিয়া হতেছে দ্রীত ।

বিরাটের কথা তাহারা জানেনা,

ধীর অতুলন রতন-কোষ

দেবতারা মিলি' বন্ধা করিছে,—

ব্রহ্মবিজ্ঞা হুমিদোষ ।

ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠ সব দেবতাব

সকল দেবত তাঁহারে পূজে,

তাঁরে যে জেনেছে, যজ্ঞসময়ে

যত বজমান হারেই খুঁজে ।

পুরাণ পুরুষ পুত্র তাঁহারি,—

উপজিল তাঁরি অঙ্গ হ'তে ;

আর হিরণ্য-গর্ভ উপজে

তাহারি সেচন হিরণ-স্রোতে ।

স্বক রয়েছে ইন্দ্রের মাঝে

ব্রহ্মেরি সেই তেজের কণা,

ইন্দ্র আছেন বিরাটের মাঝে

বিরাটের মাঝে সকল জনা ।

নানা দেবতার নামে, নামে, নামে,

হ'তেছে আহুত যজ্ঞে হঁবি,

অনাদি বিরাট অঙ্গ-সম্রাট

তবু লভিছেন একাই সবি ।

সূর্য তাঁহার অনিমেষ আঁখি

আর চন্দ্রমা পুনর্গব,

অগ্নি আশ্র, হাস্ত আলোক,

আকাশ উদর, আসন ভব ।

উন্মদ উনপকাশ বায়ু

হ'য়েছে তাঁহার পক্ষ প্রাণ,

তিনিই জ্যেষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ

তিনিই ব্রহ্ম লোক-নিধান ।

কৈবল্যের নিদান করিয়া

যে স্বজিল সোম অমৃতোপম,

ধরিল যে আবাপৃথিবীকে আর

অস্তরীক্ষে,—তাহারে নম ।

জল তারি ছলে চলে অহরহ,

বায়ু তারি মাঝে বিরতি মানে ;

তারি ধ্যানে মন সদা নিমগন

ধায় ঋক সাম তাহারি পানে ।

বিরাট পুরুষ বিরাজে ভুবনে

সলিল-পৃষ্ঠে তপে নিরত,

দেবতা-সমাজে ঘিরে তারে আছে

মূলেই ঘিরিয়া শাখার মত ।

দেবতা মানব বন্ধে তাঁহারে

সেবা করে কায়-বচন-চিতে,—

বলি-সস্তার জোগায় নিরত,—

উক্ণ রচে,—সে তাঁহারি দ্রীতে ।

• তিনি নির্মল, তিনি নিষ্কল,

তাঁর কটাক্ষে লুকায় তম,

পাপেব কলুষ তাঁরে না পবশে,
 দেব-অধিদেব তাঁহারে নম ।
 তাহাবি শরীরে করিছে বসতি
 তিন ভুবনের তিনটি জ্যোতি,
 নিখিল-ভরণ বিশ্ব-শরণ,
 তিনি হন প্রজাপতির পতি ।
 সকল প্রজাব সাথে প্রজাপতি
 তাঁরি সেবা করে হবষ-মতি ;
 সলিলে নিহিত স্বর্ণ-বেড়ন,—
 তাঁর রহস্ত নিগূঢ় অতি ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

টাইটানিকের হিসাবনিকাশ

টাইটানিক-জাহাজ ডুবি লইয়া জগতে একটা তোলপাড় হইয়া গেল, এত তোলপাড় যখন বঙ্গোপসাগরে এক-জাহাজ ভারতবাসী নরনারী তীর্থযাত্রী ডুবিয়াছিল তখন হয় নাই, সেদিন যখন ইতালীয় ফৌজ কত সহস্র অসহায় তুর্ক রমণীকে জালবন্ধ জন্তুর মত নির্দয়ভাবে হত্যা করিল তখনও নয় ; চীনে যেদিন কত সহস্র বৎসরের প্রাচীন পুস্তকাগারে আগুন লাগাইয়া ইউরোপীয় ফৌজ সভ্য-জগতের সম্মুখে আলোকজাগ্রা পুস্তকাগারের চিতাসজ্জাব পুনরভিনয় করিয়াছিল সেদিন সভ্য-জগতে বিশেষ একটা সাড়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না । পূর্বে এতগুলো বিধম ব্যাপার ঘটয়া গেল, কোন উচ্চবাচ্য হইল না, আর পশ্চিম সমুদ্রে একটি জলবুধ মিলাইতে না মিলাইতে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ঝনঝনা পড়িয়া গেছে, অথচ পূর্বে যে কাণ্ডগুলো ঘটয়া থাকে তাহা অপেক্ষা পশ্চিমের এই দুর্ঘটনাটা যে অধিক হৃদয়বিদারক তাহা নয় । অতএব দেখিতেছি কোন একটা ঘটনাকে হৃদয়বিদারক করিয়া তোলা না তোলা খবরের কাগজের কাজ । পূর্ব দেশগুলো যেন ফাঁকা জালা, পশ্চিমে শব্দ উঠিলে অমনি প্রতিধ্বনি দেয় । খবরের কাগজে টাইটানিক ঘূরা উঠিবার মুখেই আমি সহর ছাড়িয়া সমুদ্রতীরে সবিয়া পড়িয়াছিলাম । সেখানে খবরের কাগজের অন্নানাগোনা বড় একটা নাই

সুতরাং সমুদ্রেব ধারে বসিয়াও ঐ জাহাজডুবির কথা ভাবিবার কোন কাবণ ঘটে নাই । কলিকাতার কিরিবামাত্র দেখি কাগজে পত্রে ছত্রে ছত্রে টাইটানিক-কাহিনী ! এত বড় একটা ঘটনাকে দুই মাস ধরিয়া আমি যে মন হইতে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিলাম তাহারি শোধ ভুলিবার জন্য এই কাহিনীটা দ্বিগুণ বেগে আমার আক্রমণ করিয়াছে এবং ঐ জাহাজ ঢেউ বরফের পাহাড় ইত্যাদি নানা সামগ্রী লইয়া আমার মস্তিষ্কে একটা সমুদ্রমহন-কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছে ।

টাইটানিক-সাহিত্য আলোচনা কবিয়া অনেকে অনেক জ্ঞানলাভ ও অর্থলাভ কবিয়াছেন, আমিও যে কিছু লাভ করিলাম না তাহা নয়, তবে সেটা যে অর্থ নয় এটা ঠিক এবং সেটা যে বড় বেশি কিছু নয় তাহাও ঠিক ।

আমি দেখিলাম টাইটানিক সম্বন্ধে factগুলি একে একে পরে পরে সাজাইয়া হিসাব করিতে গিয়া ঠিকে ভুল ছাড়া আর বড় একটা কিছু পাইতেছি না, সুতরাং ব্যাপারটা আমার কাছে চিরকালই একটা প্রহেলিকার মত রহিয়া গেল দেখিতেছি ।

টাইটানিকের হিসাবনিকাশ আমি যে ভাবে করিতেছি তাহার আভাষটা এইরূপ :—

প্রথম খবর—জাহাজ ডুববার কালে মহিলা ও শিশু-গণকে প্রথমে প্রাণরক্ষার জন্য নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল ।

পরেব খবর—প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রীগণই কেবলমাত্র নিজেদের ও নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র রক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী কি মহিলা কি পুরুষ কেহ সে সুযোগ পান নাই ।

উত্তর—প্রথম খবরটা পড়িয়া খেত পুরুষের নির্ভীকতা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি একটা সম্মান ও করুণার সমুজ্জল ছবি মনে জাগিয়া উঠে কিন্তু পরেব খবরে মনটা ছোট হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে খেতাজের অদ্বুত আশ্রয়ভাগেব মহিমাটাও খাটো হইয়া পড়ে । মনে হয় ঐ জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে যদি একদল খেতাজ পুরুষ ও একদল ভারতমহিলা থাকিত তবে প্রথম প্রাণরক্ষার সুযোগ মহিলাবা পাইত কি পুরুষে পাইত ?

প্রত্যুত্তর—খুব সম্ভব আমেরিকান ক্রোবপতিরাই পাইল—কেননা শুনিতেছি নাকি এক ক্রোবপতি নিজের নৌকায় পাছে অধিক লোক উঠিয়া পড়ে সেইজন্য নাবিকদের রীতিমত ঘুষ দিয়া লোকটা নৌকাখানি একাই দখল করিয়া সরিষা পড়িয়াছিল।

ফলে দাঁড়াইতেছে—খেতাজ পুন্সদিগের জীজ্ঞাসিত প্রতি সম্মান ও আশ্রয়গণ্য বিশেষ কিছু নিদর্শন টাইটানিক ডুবি হইতে পাওয়া গেল না, এখানেও যেমন সেখানেও তেমন ‘চাচা আপন বাঁচা’। বাহারা পরসা কেলিয়াছে তাহা বা বাঁচিয়াছে।

দ্বিতীয় খবর :—জাহাজ যতক্ষণ জলের উপরে ছিল ততক্ষণ নৌবাস্তুরগণ ‘Nearer to my God’ এই ধর্মসঙ্গীত বাজাইতেছে শুনা গিয়াছিল।

পরের খবর :—মধ্য জাহাজের দিক হইতে একটা বিরাট কাতবধনি একবন্টা কাল ধরিয়া সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত শুনা গিয়াছিল।

উত্তর—পূর্বোক্ত যে ধর্মসঙ্গীত সেটা খেতাজ নাবিকগণের। জাহাজ ডুবিতেছে, নাবিকগণ ও কাষ্টক্লাস যাত্রিগণ মিলিয়া ধর্মসঙ্গীতে যোগদান করিতেছে, এটা খুবই Dramatic, কিন্তু ঐ যে জাহাজের খেলের ভিতর হইতে বিকট ক্রন্দন উঠিল সেটা তে’ Dramatic আদপে নয় ? ঐ বিকট চীৎকার যেটা টাইটানিক-সঙ্গীতশালার রসমজ্ঞ করিতেছে সেটা কাহাদের ?

প্রত্যুত্তর :—সেটা হচ্ছে সেই হতভাগ্য দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের এবং যেসকল কালা লঙ্কর ও চীনে মিজী বাহারা শেষ পর্যন্ত জাহাজের কল চালাইয়াছে জল সঁচিয়াছে তাহাদেরই।

ফলে :—টাইটানিক-জাহাজ-ডুবিতে বাহারা বাস্তবিক Nearer to God ছিল তাহাদের সাড়া তোমরা শুনিতে পাও নাই, তোমরা শুনিয়াছ কেবল খবরের কাগজের ঢাকের বাঁধি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই ইচ্ছা

কেবল মানুষই বলে, আশার অন্ত নাই; পৃথিবীর আর কোনো জীব এমন কথা বলে না। আর সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাও সেই সীমাকে মানিয়া চল। জন্তুদের আহার বিহার নিজেব প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা কান্স হইতে জান। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আগনি ধামিয়া যায়—তাহাব পবে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাহাইবার জন্ত তাহাদের দ্বিতীয় আব একটা ইচ্ছা নাই।

মানুষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য্য এই দেখা যায়—একটা ইচ্ছাব উপর সওয়ার হইয়া আর একটা ইচ্ছা চাপিয়া আঁছ। পেট ভরিয়া গেলে খাইবার ইচ্ছা যখন আপনি মিটিয়া যায় তখনো সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্ত মানুষের আর একটা ইচ্ছা ভাগিদ করিতে থাকে। সে কোনো মতে চাটুনি খাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আহাবের আসর ইচ্ছাকে প্রয়োজনের উর্দেও চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি কবে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই অপর প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর মানুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মাটিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কি আছে যে কেবলি বলিতেছে—আরো, আরো, আরো।

কিন্তু বাহাতে মানুষের ক্ষতি করিতে পারে সেই ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন ? নিজের এই দুরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মানুষ বিশ্বব্যাপারে একটা সমস্তানের কল্পনা করিয়াছে। রিহদি পুবাণের প্রথম নরনাথী যখন স্বর্গোতানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন ইহার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিবে। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল জ্ঞানের রাজ্য লোভ দিয়ো না। স্বর্গোতানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সন্তোষের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল কেবল মানুষই বলিল বাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরো পাওয়া চাই। এই

যে আরোর দিকে সে পা বাড়াইল এ বড় বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তিব কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই এইজন্য কোনদিকে কতদূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা পাওয়া শক্ত। এইজন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশঙ্কা চারিদিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্নিবারবেগে যে টানিয়া আনিয়া মানুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল সয়তান।

কিন্তু রাগই করি আর যাই করি জগতে সয়তানকে ত মানিতে পারি না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে মানুষের এই যে ইচ্ছার উপরে আরোর জন্ত আরো একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শক্তির আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার ষথার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। সুতরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই,—ততক্ষণ তাহাকে কেবলি আঘাত খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

কিন্তু এই আরোর ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেনমন করিয়া? আহা! করিলে পেট তাহার ভরিবেই—ভোগ করিলে এক জারগার তাহার নিবৃত্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে—আরোর ইচ্ছাকে সেখানে কোনো একটা সীমার আসিয়া হাব মানিতেই হইবে। শুধু হার মানা নয়, সে জারগার সে-দুঃখ পাইবে এবং দুঃখ ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং অন্তকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেখানে সীমা টানিয়াছেন তাহাকে লঙ্ঘন করিতে গেলেই শান্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরোর ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু তোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন, হয় গোপনে ছলনা; নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন দুর্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাণ্ডে সমাজ লণ্ডতও হইতে থাকে।

এমন করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু এই পাপ যদি না আসিত তবে মানুষ পথ দেখিতে পাইত

না। এই আরোর অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেখানে যদি পাপের আশ্রয় জলে তবে ঘোড়াটাকে কোনো মতে বাগ মানাইয়া কিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজন্য মানুষলোকে অজ্ঞান সকল শিক্ষার উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত বাহাতে ঐ আরোর ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়। কেননা, মানুষকে দীপ্তর ঐ একটা ভয়ঙ্কর বাহন দিয়াছেন, ও আমাদের কোথায় লইয়া গিয়া যে ফেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া কেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আরোর ইচ্ছাই মানুষের ষথার্থ বাহন।

প্রয়োজনসাধনের ইচ্ছা জন্তদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তদের দুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায় জন্তদের সুখদুঃখ আছে কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু মানুষের মধ্যে এই যে আরোর ইচ্ছা, ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, সুখের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা দুঃখেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তিরাজ্যের উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্ত বারবার বাহির হইয়া পড়িতেছে ইহা তাহার সুখের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্তমান প্রয়োজন সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই যে দুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা, বাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অজ্ঞতা, বাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে, মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন আগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে হারখার করিয়া দেয়, তখন সে সুখস্ববিধাপ্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে আমি সুখ চাহি না, আমি আরোকেই চাই; সুখ

আমার স্বখ নহে, আবেই আমার স্বখ। তখন সে বলে ভূমৈব স্বখঃ।

স্বখ বলিতে যাহা বুঝাব তাহা ভূমা নহে। ভূমা স্বখ নহে, আনন্দ। স্বখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, স্বখের বিপরীত দুঃখ কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন কবিতা হলাহল পান করিয়াছিলেন আনন্দ তেমনি কবিতা দুঃখকে অনার্য্যসেই গ্রহণ করে। এমন কি, দুঃখের দ্বাবাই আনন্দ আপনাকে সার্থক কবে, আপনার 'পূর্ণতাকে উপলব্ধি কবে। তাই দুঃখের তপস্বাই আনন্দের তপস্বা।

তাই দেখিতেছি অস্তান্ত জন্মদেব ভায় মানুষের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলি আমাদেরকে বলিতেছে “নায়ে স্বখমস্তি, ভূমাৎবে বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।”

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজবোধটুকু লইয়া জন্ত দুঃখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞানপ্রেমশক্তির কোনো সীমাতেই বদ্ধ হইতে চাহিল না; সে বলিল, অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।

তাই যদি হয় তবে এই আরোর ইচ্ছাকে এই আনন্দের ইচ্ছাকে এত করিয়া বশে আনিবাব জন্ত মানুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কি ছিল? এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবলশ্রোতে চোখ বুজিয়া অস্বাসমর্পণ করিলেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব সার্থক হইত।

ইচ্ছাকে বলগাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে ছুটা ইচ্ছার অধিকার নির্ণয় লইয়া মানুষকে বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে সেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। সেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছুপরিমাণে স্থিতিস্থাপক—এইজন্য কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহা টান সয়। দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলি বাড়াইতে গেলে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের সৌধচূড়া

ভাঙিয়া পড়ে। আমাদের আরো-ইচ্ছার মন্বদণ্ডকে ঐদিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মণ্ডিত হইয়া উঠে।

দেখা বাইতেছে, মানুষের অহং-এব দিকটাই সঙ্গীর্ণ। সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের স্বখ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপারিসীম করিবার চেষ্টা আত্মহত্যা চেষ্টা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সয় না। আহায়ে বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভৎস।

এই কারণে মানুষের এই আরোর ইচ্ছাটা যখন মত্ত হস্তী মত তাহার কণ্ঠস্বর অহং-এব ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি তাহাতে নিজের ও অন্তের দুঃখ আনিত তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু ইহার দুর্গতি তাহার চেয়ে আরো অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে—দুঃখের পরিমাণে তাহার পরিমাপ নহে। কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি কেবলমাত্র দুঃখের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না—এমন কি, দুঃখের দ্বারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উন্টা দিকটাও দেখ। মানুষের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যখন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ কবে তখন সেও বড় কুৎসিত। তখন সে কেবলি পুণ্যের হিসাব বাধিতে থাকে। যাহা পূর্ণ আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত তাহাকে ফলাফলের অঙ্কে গুণভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অহঙ্কৃত হইয়া উঠে; কেবলি বাহ্যিকতার জালে জড়াইয়া পড়ে; এবং স্বার্থপব শুচিতাকে কুপণের ধনের মত সঙ্গীর্ণ গণ্ডির মধ্যে গত্যস্ত সাবধানে জমা করিয়া তুলিতে থাকে। তখন সে ভূমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মত নিজের একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। ইহাও পাপের আর এক মুষ্টি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মানুষের মনে এই যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিষটা ত্তি তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদেরকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে

তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহং-এর অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে দুঃখ ঘটে তাহা নহে (এমন কি, স্থলবিশেষে দুঃখ না ঘটিতেও পারে) তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়র দিক আমাদের সত্যের দিক নষ্ট হইয়া যায় ;—অন্তর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না কিন্তু মানুষের পক্ষে তেমন বিনাশ আর কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন কি, কারো কারো চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ দুঃখবোধের চেয়ে অনেক বড় হইয়া আছে। এতই বড় যে বহুদুঃখের দ্বারা মানুষ এই পাপকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ নামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজেব যে একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে—অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ। অহং-এর দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য। মানুষ আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্তার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলি প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃতপারাবায়ের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরমগতিকে যাহা কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্ট।

লোহিতসমুদ্র,

বুধবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১। শ্রীবীজনাথ ঠাকুর।

আলোচনা

আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান।

এই প্রসঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত সীতানাথ তঞ্চঙ্গ্যা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ না হইয়া শ্রীযুক্ত মনোব্রজনাথ ঠাকুর মহাশয় জানাইবাছেন যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পুস্তকখানি নিজে

বুধবার ও পবকে বুধাইবার ক্ষুদ্র কারাবাব পড়িয়াছেন, এবং ২০ বৎসর পূর্বে যখন ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয় তখন হইতে আজ পর্যন্ত বহুবার পড়িয়াছেন, আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি ঐ পুস্তক হইতে সীতানাথ বাবুর নির্দিষ্ট উত্তর তিনি পান নাই। ইহা হইতে মনোব্রজনাথ বাবুর বিশ্বাস হইয়াছে যে সীতানাথ বাবু তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই বিচাৰ সীমাসংখ্য কোনো চেষ্টা করেন নাই, কারণ ব্রহ্ম-জ্ঞানসা গ্রন্থে আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত সন্দেহের নিরূপণ কবিবার চেষ্টা বা আভাস মনোব্রজনাথ বাবু কোথাও খুজিয়া পান নাই।

গীতাপাঠ*

(পূর্বোক্তরূপে)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—

“ত্রেণ্ডগ্যবিষয়া বেদা নিত্রেণ্ডগ্যো ভবাজ্জুন।”

“বেদে ত্রিমাখর্ষের বিধান-ব্যবস্থা যত কিছু আছে সবই ত্রেণ্ডগ্যবিষয়ক, তুমি অর্জুন নিত্রেণ্ডগ্য হও।” এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহার সঙ্গে আর চারিটি বচন যোজনা করিয়া উহার ভাবার্থ ফুটাইয়া দিতেছেন ;—বলিতেছেন—

(১) “নির্ঘন্দ্ব হও,” (২) “নিত্যসম্বদ্ধ হও” (৩) “বিষয়ঘটিত লাভালাভ মনে স্থান দিও না,” (৪) “আত্মবান্ হও।” সমগ্র শ্লোকটি এই :—

“ত্রেণ্ডগ্যবিষয়া বেদা নিত্রেণ্ডগ্যো ভবাজ্জুন।

নির্ঘন্দ্বো নিত্যসম্বদ্ধো নির্ঘোপক্ষেম আত্মবান্।”

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ নির্ঘন্দ্ব-শব্দের অর্থ ভাঙিয়া দিতেছেন এইরূপ :—

“সুখদুঃখ মান-অপমান রাগদেব গীতোক্ত প্রভৃতি দুই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সংগ্রহ হইতে বিনির্মুক্ত—এই অর্থে নির্ঘন্দ্ব।” কথাটা ঠিক। কিন্তু ঐ কথাটুকুর অশুভ আলোকে নিত্রেণ্ডগ্য এবং নির্ঘন্দ্বের মধ্যে বন্ধনের আঁট যে কিরূপ তাহাব সন্ধান পাওয়া কঠিন। তাহার সন্ধান পাইতে হইলে বর্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধে পূর্বের একটি প্রপাঠে সম্বন্ধসমোক্তের পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যাহা বলা হইয়াছে, সেই কথাটির প্রতি আবার একবার মনঃসমাদান করা আবশ্যিক। কথাটি সংক্ষেপে এই :—

সম্বন্ধের প্রধান যে-দুইটি অঙ্গ—প্রকাশ এবং আনন্দ, দোঁহাব সঙ্গে দোঁহারই চাই প্রতিদ্বন্দ্বী লাগিয়া আছে।

* বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পঠিত।

প্রকাশের প্রতিবন্দী কে? না অন্ধতা এবং জড়তা, এক কথায়—তমোগুণ। আনন্দের প্রতিবন্দী কে? না হুঃখ এবং অশান্তি, এক কথায়—রজোগুণ। সম্বৎসরের সঙ্গে রজস্তমোগুণের উভয়েরই একে-তো এইরূপ প্রতিবন্ধিতা, তাহাতে আবার রজস্তমোগুণের আপনা-আপনি মধ্যে প্রতিবন্ধিতা বড় যে কম তাহা নহে। তাব সাক্ষী—একদিকে রজোগুণের প্রকৃতি-সিদ্ধ হুঃখযন্ত্রণাব ছটফটানি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দাপাদাপি, আবেক দিকে তমোগুণের প্রকৃতিসিদ্ধ অপ্রকাশের অন্ধকার এবং জড়তার নাগপাশ, হৃয়ের মধ্যে যে কিরূপ সর্প-নকুলেব সম্বন্ধ তাহা কাহারো চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। অতএব এটা হির যে, বন্দ্যাদ্বন্দ্বি ত্রৈগুণ্যেব সঙ্গ্বেব সঙ্গী, আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, নিষ্পন্দ্যতা বিনৈশ্বেগ্যের সঙ্গের সঙ্গী।

এখানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, নিষ্পন্দ্যতা বিনৈশ্বেগ্য এবং নিশ্চৈশ্বেগ্য ভাব স্বতন্ত্র এবং নিশ্চৈশ্বেগ্য ভাব স্বতন্ত্র। শূন্য (০) এবং এক (১) এ হৃয়ের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, নিষ্পন্দ্য এবং নিশ্চৈশ্বেগ্যের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। নিষ্পন্দ্য হওয়া কাহাকে বলে? না একেবারেই গুণবর্জিত হওয়া। নিশ্চৈশ্বেগ্য হওয়া কাহাকে বলে? না তিন গুণের বন্দ্যাদ্বন্দ্বি প্রতিকূলে আত্মশক্তি খাটাইয়া বন্দ্য-বিনির্মুক্ত একটিমাত্র গুণের স্বর্ধ্যালোকে প্রভাতের পদ্মের জায় মাথা তুলিয়া এবং হৃদয় খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ানো। সে গুণ কি? না রজ-স্তমোগুণ-দ্বারা অবাধিত পরমপরিপুষ্ট ঐশ্বরিক সম্বৎসর। (১) রজোগুণ, (২) তমোগুণ, (৩) সম্বৎসর, (৪) মলিন সম্ব বা মিশ্র সম্ব, (৫) শুদ্ধ সম্ব, এই পাঁচের কাহার কিরূপ পরিচয়-লক্ষণ—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—

(১) রজোগুণের পরিচয়-লক্ষণ।

বিক্ষেপশক্তৌরজসঃ ক্রিয়ান্বিতা।

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুবাণী।

রাগাদয়োহস্তাঃ প্রভবন্তি নিত্যং

হুঃখাদয়ো বে মনসো বিকারাঃ ॥

কামঃ ক্রোধো লোভদীপ্তোহভ্যস্রাহ-

হকারেয্যা মৎসরাতাশ্চ ঘোবাঃ।

ধর্ম্মা এতে রাজসাঃ পুস্তবৃত্তিঃ

বন্দ্যাদেযা তদ্রজো বন্ধহেতুঃ ॥

ইহার অর্থ এই :—

রজোগুণের বিক্ষেপশক্তি ক্রিয়ান্বিতা।* তাহা হইতেই আদিহীনা প্রবৃত্তি-দ্বারা অজস্র প্রবাহিত হইতেছে। তাহ হইতেই রাগাদি এবং হুঃখাদি মনোবিকারসকল নিত্য নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ব, অস্রা (Jealousy), পরপ্রীকাতরতা প্রভৃতি ঘোর বৃত্তি যত কিছু আছে সমস্তই রজোগুণের ধর্ম্ম। যাহার উদ্বেজনার পুরুষের মনে এইসব প্রবৃত্তি প্রবল হইয় উঠে তাহাই রজোগুণ, আর তাহাই বন্ধনের হেতু।

(২) তমোগুণের পরিচয়-লক্ষণ।

অজ্ঞানমালস্ত জড়শ্চ নিদ্রা।

প্রমাদ মূঢ়শ্চ মুখাস্তমোগুণাঃ।

এতৈঃ প্রযুক্তো নহি বেত্তি কিঞ্চিৎ

নিদ্রালুবং স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি ॥

অজ্ঞান, আলস্ত, জড়শ্চ, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়শ্চ, এই-গুলি প্রধানতঃ তমোগুণের পরিচয় লক্ষণ। এইসকলের বশতাপন্ন হইয়া তামসিক লোকের জানে না কিছুই—কেবল হাট তুলিয়া ঝিমাইয়া এবং স্তম্ভের জায় হইয়া কালতিপাত করে।

(৩) সম্বৎসরের লক্ষণ।

সম্বং বিস্তুঙ্কংজগবৎতথাপি

তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।

যজ্ঞান্বিষঃ প্রতিবিশিতঃ সন্

প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাধিলং জড়ং ॥

ইহার অর্থ :—

সম্বৎসর জলের জায় বিস্তুঙ্ক; আব তাহাতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিশিত হইয়া নিখিল জড়বস্ত্র প্রকাশ করে। কিন্তু তথাপি তাহা অপর ছুটির সহিত জড়িত হইয়া সংসারগতির অমুপহী হয়।

ইহার টীকা।

আমাদের দেশের পুরাতন ভাষ্যজ্ঞানীদিগের এই যে একটি অন্তর্দৃষ্টিব দেখা কথা—কিনা আত্মচৈতন্য সম্বৎসরে

* কার্য্যপ্রবর্তনী শক্তিসমূহই ক্রিয়ান্বিতা। যন্ত্রবিজ্ঞানের (Mechanics-এর) পরিভাষায় তাই Force=acceleration—ক্রিয়া।

প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা গুনিয়া শিক্ষিতমস্ত্র নবা পণ্ডিতগণেব হান্তোদ্রেক হইতে পারে;—তা' হো'ক! কিন্তু তাঁহারা বাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের একজন প্রধান শিরোভূষণ বলিয়া মান্ত কবেন, তিনি কি বলিয়াছেন তাহা যদি মুহূর্তেক ধৈর্য্য ধরিয়া শোনে, তাহা হইলে তাঁহাদের হান্তবদন ভংগনাং গম্ভীরভাবে ধারণ করিবে তাহা বেম্ বৃষ্টিতে পারা যাইতেছে। অতএব শুধুন কাণ্ট কি বলিতেছেন :—

It may seem difficult to understand how I can say: I, as an intelligent and thinking subject (অর্থাৎ I, as চিন্ময়জ্ঞাতা পুরুষ বা চিন্দাত্মা), know myself as an object thought like other phenomena, not as I am (স্বরূপতঃ) but only as I appear to myself (প্রতিবিম্ববৎ) * * * But that this must really be so can be clearly shown by the fact that we cannot represent to ourselves time in any other way than under the image of a line which we draw.

ইহার অর্থ এই :—

আপাততঃ এটা একটা কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হইতে পারে যে, চিন্ময় জ্ঞাতাপুরুষের পক্ষে আপনার নিকটে আপনি ঘটপটাদি বা সুখদুঃখাদি প্রতিভাসম্ভার জ্ঞার জ্ঞের বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়া কি প্রকারে সম্ভবে? বাহা বাস্তবিক আমি না, তাহা আমি বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে তাহাব মধ্যে কাঠিন্জ কিছুই নাই; কেননা তাহা হইবারই কথা। এটা যেমন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, মনে মনেই হো'ক, আর হাতে কলমেই হো'ক—একটা বেধা টানিয়া সেই দৃশ্য রেখাটিকে অদৃশ্য কালাংশের স্থলাভিষিক্ত কবা ব্যতিরেকে অস্ত্র কোন উপায়ে কাল-নিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-স্বলভ নহে,* এটাও তেমনি আমবা সহজে বুঝিতে পারি যে, মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত চিদা-

ভাসকে চিদাত্মার স্থলাভিষিক্ত কবা ব্যতিরেকে অস্ত্র কোনো উপায়ে আত্মনিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-স্বলভ নহে।

কাণ্টের এই কথাটির টীকা।

মনে কর আমি বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষে মধ্যাহ্নকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার একটি আত্মীয়-লোকের বাটীতে গিয়াছিলাম। ভোজনান্তে ঘণ্টা-খানেক বিশ্রামের পর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমার বসিবার ঘরে আমার বাল্যকালের কাব্যাল্লুরাগী বন্ধু দেবদত্ত চৌকিহালান্ দিয়া বসিয়া যেমদূত পাঠ করিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “তুমি এখানে কতক্ষণ?” তিনি “বলিতেছি” বলিয়া টুক করিয়া ঘড়ির ডালা উদঘাটন করিয়া বলিলেন “আমি যখন তোমার এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন ঘণ্টাব কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটা গায়ে গায়ে লিপ্ত হইয়া বারোটাঘ ঠেকিয়াছে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল—ঘড়িটি আমার পরম নিষ্ঠাবান! কেমন দেখে তদগতচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে জোড়হস্তে মধ্যাহ্ন-দেবকে প্রণাম কবিতোছে! এখন এ-বাহা—দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে—ঘড়িটি শেবা কাজের লোক! এই দেখ মিনিটের কাঁটাও নিশান গাড়িয়াছে, আর ঘণ্টার কাঁটাও মানদণ্ড দিয়া যে দিকটা আমার ডাহিন্ দিক্ সেইদিকের ভূমি মাপিতেছে। অতএব এটা অকাটা বেদ-বাক্য যে, আমি ডাহা তিন তিন ঘণ্টা কাল তোমার অপেক্ষার বসিয়া আছি।” এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, ঘটিকা-চক্রের চতুর্থাংশ কি সত্যসত্যই তিন ঘণ্টা কাল? কখনই না। তবে কি? না তাহা অদৃশ্য তিন ঘণ্টা কালের দৃশ্য প্রতিক্রম, আর, প্রতিক্রমেরই নাম প্রতিবিম্ব। এখন বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, অদৃশ্য কালাংশে যেমন ঘটিকা-চক্রে দৃশ্যরেখাকপে প্রতিবিম্বিত হয়, চিন্ময় জ্ঞাতাপুরুষ তেমনি মস্তিষ্কের সঙ্ঘাংশে চিদাভাসরূপে প্রতিবিম্বিত হ'ন। টীকা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক্।

(৪) মিশ্রসংখ্যের পরিচয়-সংক্ষপ।

• মিশ্রস্ত্র সম্বন্ধে ভাবস্তি ধর্ম্মাঃ

স্বমানিতাত্মা নিয়মা যমাত্মাঃ।

* মনঃকল্পিত বেধা'কেও দৃশ্য রেখা বলা উচিত এই অস্ত্র—যেহেতু ক্রোধ করনা করিবার সময় আমবা যেমন অদৃশ্য ক্রোধ করনা করি, রেখা করনা করিবার সময় সেরূপ অদৃশ্য বেধা করনা করি না—দৃশ্য রেখাই করনা করি; কেননা “রেখা” বলিলেই বুঝায় যে, তাহা জ্ঞাত পুরুষের চক্ষুর সম্মুখে দৃশ্যমান।

শ্রদ্ধাচি ভক্তিস্ত মুমুক্ষুতা চ

দৈবী চ সম্পত্তি রসমিবুত্তিঃ ॥

ইহার অর্থ এই :—

মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম এইগুলি :—স্বমানিত (অর্থাৎ যে বাহ্য মানে তদনুসঙ্গ) দেবপুত্রাদি, যমনিয়মাদি বোণাদির অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুক্তিকামনা, দৈবী সম্পত্তি অর্থাৎ শমদমাদি সাধনসম্পত্তি, অসদাচরণ হইতে নিবৃত্তি (অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণ=সাধনাবস্থার লক্ষণ) ।

(১) শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষণ ।

বিভুদ্ধসত্ত্বস্ত গুণঃ প্রসাদঃ

স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ ।

তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা

যয়া সদানন্দরসঃ সমুচ্ছতি ॥

ইহার অর্থ এই :—

বিভুদ্ধসত্ত্বের পবিচয়-লক্ষণ এইগুলি :—আত্মানুভূতি, পরমাপ্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ, আব, সেই প্রগাঢ় পবমাত্মনিষ্ঠা বাহাতে করিয়া সদানন্দরসের সম্ভোগ হয় ।

(অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষণ=সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ) ।

এ স্থানটিতে শঙ্কবাচার্য্য পরমাত্মার সংস্পর্শগুণে শুদ্ধ-সত্ত্বের যেসকল লক্ষণ সিদ্ধপুরুষের অন্তরে বাহিরে হুটিয়া বাহির হয় তাহাই নির্দেশ করিলেন । স্থানান্তরে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে; শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ সর্বজগতের সারভূত সমষ্টিসত্ত্ব বা সমষ্টিসত্ত্ব বাহা রজ-ত্বমোগুণদ্বারা আবদ্ধিত ওহা পরমাত্মায়ই উপাধি, তা' বই তাহা জীবাশ্মার উপাধি নহে :—রজত্বমোগুণদ্বারা কলুষিত মলিনসত্ত্বই—মিশ্রসত্ত্বই—জীবাশ্মার উপাধি । শুদ্ধসত্ত্ব এবং মিশ্রসত্ত্ব সম্বন্ধে শঙ্কবাচার্য্যের প্রকৃত মন্তব্য কথাটি তলাইয়া বুঝিতে হইলে তাহার সহজ উপায় হ'চ্ছে—বর্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধের পূর্বের একটি প্রপাঠে সত্ত্বাচিতি সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধে গোটা দুই কথা আমি বাহা বলিয়াছি তাহার প্রতি, এই প্রসঙ্গে, আবার একবার মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা । ঐ স্থানটিতে প্রথমে আমি বলিয়াছি—

“সমষ্টিসত্ত্বা এবং ব্যষ্টিসত্ত্বা'র পদ্যপদের সহিত-মিলাইয়া দেখিলে প্রথমেই হুয়ের মধ্যকার একটি মধ্যান্তিক

প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, কোনো দুই ব্যক্তি যেহেতু এক নহে, এইজন্ত আমাদের তোমার সত্ত্বার অভাব আছে, তোমাতে আমার সত্ত্বার অভাব আছে; আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাম হয় দেবদত্ত, তবে দেবদত্তে তোমার এবং আমার উভয়েবই সত্ত্বার অভাব আছে তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্ত্ব-মাত্রেতেই সত্ত্বার সঙ্গে সত্ত্বার বাধা নূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে; সাধিক আনন্দ রাসিক হুঃখ এবং অশান্তি দ্বারা নূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে; সাধিক প্রকাশ তামসিক ক্রোধতা এবং অবসাদে নূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে ।” এ বাহা আমি বলিয়াছি ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্ত্বামাত্রই রজত্বমোগুণের সহিত ক্রড়িত, আর সেইজন্ত তাহা মিশ্রসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না—শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারে না । তাহার গরে বলিয়াছি—

“পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, যেমন তোমার বাহিরে আমি রহিয়াছি, আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ—সমষ্টিসত্ত্বার বাহিরে সেরূপ যখন দ্বিতীয় কোনো সত্ত্বা নাই, তখন কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টিসত্ত্বার সহিত লেশমাত্রও বাধার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না ।” শেষোক্ত কথাটির ভাবে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টিসত্ত্বই শুদ্ধসত্ত্ব ।

শুদ্ধসত্ত্ব যে পদার্থটা কি, এই তো তাহা দেখিলাম, আর, মিশ্রসত্ত্ব যে পদার্থটা কি তাহাও একটু পূর্বে দেখা হইয়াছে । এ বাহা দেখা হইল তাহা জিজ্ঞাস্ত বিষয়টির মূলে পৌছিবার পক্ষে যদিচ সহায় মন্দ না, কিন্তু তাহার মূলে পৌছিতে হইলে আরো গোটাকত কথা দেখিবার আছে;—এই নিগূঢ় বহস্ত-গুলি ক্রমে ক্রমে ভাঙিতেছি—প্রণিধান কর ।

প্রথম দ্রষ্টব্য ।

সত্ত্বাকে যদি চৈতন্যময় সদবস্ত হইতে বিবৃক্ত করিয়া দেখা যায়, তবে তাহা অস্তি নাস্তি হুয়ের বা'র—একপ্রকার জ্ঞানবিরোধী ভাব-পদার্থ হইয়া দাঁড়ায় । এইরূপ অস্তি এবং নাস্তি হুয়ের বা'র—জ্ঞান-বিরোধী ভাবপদার্থের নাম বেদান্তদর্শনের পাবিত্যাক্স—অবিজ্ঞা, কান্টের পবি-

ভাষায়—thing-in-itself। এ বিষয়ে কার্টের মন্তব্য কথ্য এই :—

ঘটনুষ্ঠে যখন আমার মনোমধ্যে ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সে যে ঘটজ্ঞান তাহা আমারই ঘটজ্ঞান; পক্ষান্তরে, ঘটবস্তু কিছু আর আমারই ঘটবস্তু নহে। আমার ঘটজ্ঞান যে আমারই ঘটজ্ঞান তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না থাকিলে আমার ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে না; আর, ঘটবস্তু যে আমারই ঘটবস্তু নহে তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না থাকিলেও ঘটবস্তু যাহা আছে তাহাই থাকে। যাহাই হোক না কেন—আমার ঘটজ্ঞানের সীমাবাহিরে ঘট নিজে যে কি, তাহা বলিতে পারা একান্ত পক্ষেই আমার সাধ্যাতীত। তবেই হইতেছে যে, যাহাকে আমি বলিতেছি ঘটবস্তু তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। তেমনি, আমি যাহাকে বলি পটবস্তু তাহার সহিত আমার পটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, ঘট-দ্রষ্টার যদি জ্ঞান না থাকে তবে ঘটজ্ঞানই বলো, পটজ্ঞানই বলো, আর, মঠজ্ঞানই বলো—কোনো জ্ঞানই তাহার মনোমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটদ্রষ্টাব জ্ঞান আছে বলিয়াই, তাহার একই অভিন্ন জ্ঞান ঘটনুষ্ঠে ঘটজ্ঞানে পরিণত হয়, পটনুষ্ঠে পটজ্ঞানে পরিণত হয়, মঠনুষ্ঠে মঠজ্ঞানে পরিণত হয়, ইত্যাদি। তবেই হইতেছে যে, ঘটপটাদিবিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান একই অভিন্ন জ্ঞানের শাখাপ্রশাখা। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বৃক্ষ এবং শাখা-সমূহের মধ্যে যেমন সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ, ত্রুটা পুরুষের একই অভিন্ন জ্ঞান এবং ঘটপটাদি-বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তেমনি সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ। অনন্ত-পূর্বে দেখিয়াছি যে, আমি যাহাকে বলি ঘটবস্তু তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; আমি যাহাকে বলি পটবস্তু তাহার সহিত আমার পটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; এক কথায়—আমি যাহাকে বলি ব্যষ্টিবস্তু তাহার সহিত আমার ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান বা ফ্যাকডাজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, আমি যাহাকে বলি সমষ্টিবস্তু, তাহার সহিত আমার সমষ্টিজ্ঞান বা মূলজ্ঞান

বা মোটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এখন, কার্টের শাস্ত্রে বলে শুধু এই যে, আমি যাহাকে বলি ব্যষ্টিবস্তু তাহার সহিত আমার ব্যষ্টিজ্ঞান নিববচ্ছিন্ন লাগিয়া আছে—যেমন ঘটবস্তুর সহিত ঘটজ্ঞান—পটবস্তুর সহিত পটজ্ঞান, ইত্যাদি; আর, আমার ব্যষ্টিজ্ঞানে অবভাসিত সেই যে ব্যষ্টিবস্তু, তাহা হইতে ঐ জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে কেবল thing-in-itself। বৈদান্তিকের শাস্ত্রে তাহা তো বলেই, তা ছাড়া অধিকন্তু আর একটি কথা বলে এই যে, জ্ঞানাবভাসিত ব্যষ্টিবস্তু হইতে জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে যেমন ব্যষ্টি thing-in-itself বা ব্যষ্টি-অবিজ্ঞা, জ্ঞানাবভাসিত সমষ্টিবস্তু হইতে জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে তেমনি সমষ্টি thing-in-itself বা সমষ্টি-অবিজ্ঞা।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

কার্টকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ ব্যষ্টিবস্তু, আর, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ অবিজ্ঞা বা thing-in-itself? তবে তাহার উত্তরে কার্ট একটা ঘট এবং একটা পট প্রসঙ্গকর্তার সম্মুখে রাখিয়া সে-দুটাব প্রতি একে একে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিবেন যে, এই যে ঘট, আর, এই যে পট, দুইই, জ্ঞানে অবভাসিত হইবামাত্র ব্যষ্টিবস্তু হইয়া ওঠে, আর জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হইবামাত্র অবিজ্ঞা বা thing-in-itself হইয়া পড়ে। পরন্তু, শব্দবাচ্যার্থ্যের শিষ্টকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ সমষ্টিবস্তু, আর কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ সমষ্টি-অবিজ্ঞা? তবে তাহার উত্তরে তিনি কি বলিবেন? তিনি যে কি বলিবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে;—সকল শাস্ত্রেই যাহা বলে তাহাই তিনি বলিবেন;—তিনি বলিবেন—“তুমি যাহা দেখিতে চাহিতেছ তাহা আমি তোমাকে অবশ্যই দেখাইব—কিন্তু এখন না; পৃথিবী যখন সৌররপ্তে প্রবেশ করিয়া জলময় হইয়া যাইবে; মহাসাগর যখন অগ্নিরপ্তে প্রবেশ করিয়া অগ্নিময় হইয়া যাইবে; অগ্নি যখন বায়ুরপ্তে প্রবেশ করিয়া বায়ুময় হইয়া যাইবে; বায়ু যখন আকাশে মিশিয়া আকাশের সহিত

একীভূত হইয়া যাইবে; আকাশ যখন আবে সন্ধ্যা-
সন্ধ্যার চৈতন্য-ঘাসা শুদ্ধস্বৰ্ণে মিশিয়া চৈতন্যময় হইয়া
যাইবে, তখন তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ কবিতা
তোমাকে আমি বলিব যে, বিশ্বব্যাপী মহাচৈতন্যে অব-
ভাসিত এই যে শুদ্ধস্বৰ্ণ ইহাই সমষ্টিবস্ত বা একমাত্র
অদ্বিতীয় সদ্ভূত, আর উহাকে চৈতন্য হইতে বিযুক্ত
ভাবে দেখিলে উহাই সমষ্টি অবিজ্ঞা; আবার, উহাকে
চৈতন্যের প্রতিবিম্বে অবভাসিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে
অভিভূত ভাবে দেখিলে উহাই মায়ী, অথবা যাহা একই
কথা—ঐশী শক্তি। দ্বিতীয় ভাবে দেখিলে শুদ্ধস্বৰ্ণও
যা, মায়ীও তা, ঐশী শক্তিও তা, একই। চৈতন্যের
আলোকে আলোকিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবা-
ষিত শুদ্ধস্বৰ্ণকে মায়ী বলা যায় এইজন্ত, যেহেতু তাহা
বহুধা বিচিত্র গরমাসচর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান।
মায়ী শব্দের গোড়া'র অর্থ—লোকে যাহাকে বলে জাদু-
বিজ্ঞা; আর, সেই গোড়া'র অর্থটিই তাহার দার্শনিক
অর্থ। কিন্তু যদি বলা যায় যে, “ঈশ্বর জাদুবিজ্ঞার প্রভাবে
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন” তবে প্রকা-
রান্তরে বলা হইবে, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত
কার্য্য আছে—সবই জাদুকার্য্য। বীজ হইতে বৃক্ষের
উৎপত্তি, ঈশ্বর-কম্পন হইতে আলোকের অভিব্যক্তি,
সচেতন ইচ্ছার বলে অচেতন দৈহিক ব্যাপার সকলের
প্রবর্তন, নিদ্রা হইতে জাগরণ, জাগরণ হইতে নিদ্রা—
সবই জাদুকার্য্য। এইকপ যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কার্য্যই
জাদুকার্য্য হয়, তবে জাদুকার্য্যের বিশেষত্ব কী-আর থাকে ?
জাদুকার্য্যের বিশেষত্বই যদি না থাকে, তবে জাদুকার্য্যকে
অজ্ঞাত কার্য্য হইতে বিশেষিত করিয়া তাহাকে একটা
স্বতন্ত্র শ্রেণীর কার্য্যরূপে দাঁড় করাইবার প্রয়োজন কি ?
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে নীতান্তই তাহার প্রয়োজন-
ভাব; আব, সেইজন্ত তাঁহারা “জাদু” “মায়ী” “Miracle”
এই ভাবের শব্দগুলির দলবল যেখানে যত আছে
সমস্তই বিজ্ঞানরাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন।
কিন্তু বিজ্ঞানীদিগের এইকপ কঠোর আইন-জারি-কার্য্যে
কবির মন প্রাণান্তেও সায় দিতে পাবে না। কথাটা আর
কিছু না—বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক চক্ষুমান, হৃদয় অন্ধ; কবির

হৃদয় চক্ষুমান, মস্তিষ্ক অন্ধ। এইজন্ত, বিজ্ঞানীরা যাহা
স্পষ্ট দেখিতে পান, কবি তাহা দেখিতে পান না; তেমনি
আবার, কবিরা যাহা স্পষ্ট দেখিতে পান, বিজ্ঞানীরা তাহা
দেখিতে পান না। বিজ্ঞানীরা যাহাই বলুন না কেন—
কবির চক্ষে অঘটনঘটনাপটীয়ারসী পবমাসচর্য্য ঐশীশক্তি
মহামায়ী বটে। ঐশীশক্তিকে কবি-চক্ষে বা হৃদয়-চক্ষে
দেখা ব্যতীত বিজ্ঞান-চক্ষে দেখা—মর্ত্যবাসী মনুষ্যের কথা
দূরে থাকুক—দিব্যধামবাসী দেবতাদিগেরও সাধ্যের
অতীত। বিজ্ঞানীদিগের পাণ্ডিত্য বাটাইবার স্থান
আছে—কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব সে স্থান নহে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু
নিবেদন মানিবার পাত্র নহেন, আব সেইজন্ত বিজ্ঞপ-শব্দধারী
কবিদিগের অগ্রগণ্য পোপ্ বলিয়াছেন “And fools rush
in where angels fear to tread” “দেবতারার যেখানে
পা বাড়াইতে ভয় করেন—দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য অর্কাটানের
সেখানে ছড়-মুড় কবিতা প্রবেশ করে।”

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

বেদান্তদর্শনের আব একটি কথা এই যে, শুদ্ধস্বৰ্ণ না
মায়ী বা সমষ্টি-অবিজ্ঞা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান।
তাহা তো হইবেই—যাহার গর্ভে পৃথিবী জলময়, জল
অগ্নিময়, অগ্নি বায়ুময়, বায়ু ঈশ্বরময়, এবং যিনি আপনি
ঈশ্বর-চৈতন্যে চৈতন্যময়ী সেই সর্ব্বধাবিণী বিশ্বজননী
জগতের মূল উপাদান নহেন তো আর কি ? শঙ্করাচার্য্য
তাই তাঁহার সর্ব্ববেদান্তসাবসংগ্ৰহে বলিয়াছেন—

“অনন্তশক্তি-সম্পন্নো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ ।
ঈক্ষামাত্রেন সৃজতি বিশ্বমেতচ্চরাচরং ॥
অদ্বিতীয়ঃ স্বমাত্রোহসৌ নিকপাদান ঈশ্বরঃ ।
স্বয়মেব কথং সর্ব্বং সৃজতীতি ন শক্যতাং ॥
নিমিত্তমপ্যুপাদানং স্বয়মেবাভবৎ প্রভুঃ ।
চরাচরাশ্রয়কং বিশ্বং সৃজত্যবতি লুপতি ॥
স্বপ্রাধাত্তেন জগতো নিমিত্তমপি কাৰণং ।
উপাদানং তথোপাধিপ্ৰাধাত্তেন ভবত্যয়ং ॥
যথা লুতা নিমিত্তং চ স্বপ্রাধানং তথা ভবেৎ ।
স্বশবীর প্রাধানত্বে চোপাদানং তথেষ্ববঃ ॥

ইহার অর্থ এই :—

অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং মায়ী-উপাধির সহবর্তী—এমন-
যিনি ঈশ্বর, তিনি সংকল্প-মাত্রে বিশ্বচরাচর সৃজন করেন
স্বয়ং ঈশ্বর যখন অদ্বিতীয় আপনি-মাত্র, এবং উপাদান-

রহিত, তখন তিনি জগৎ সৃষ্টি করিবেন কিরূপে এপ্রকার শঙ্কা করিও না। স্বয়ংই প্রভু নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ হইয়া জগৎ সৃজন পালন এবং সংহার করেন। যে অংশে তিনি স্বপ্রধান, সেই অংশে তিনি নিমিত্ত-কারণ, আর, যে অংশে তিনি উপাধি প্রধান সেই অংশে তিনি উপাদান-কারণ। যেমন মাকড়সা যে অংশে স্বপ্রধান সেই অংশে তন্তুজালের নিমিত্তকারণ অর্থাৎ কর্তাকারণ, আর যে অংশে শরীরপ্রধান সেই অংশে উপাদান-কারণ (অর্থাৎ স্রুতিকা যেমন ঘটে পরিণত হয় সেইরূপ পরিণামী কারণ), জৈব তেমনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ দুইই একাকী আপনি। শঙ্করাচার্য্য এই যে বলিয়াছেন—

“মাকড়সা যেমন স্বীয় শরীরগুণে তন্তুজালের উপাদান-কারণ, জৈব তেমনি স্বীয় উপাধিগুণে নিখিল জগতের উপাদান-কারণ।”

ইহাতেই উপাধি যে পদার্থটা কি তাহা প্রকারান্তরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপাধি—পদার্থটা আব্রু কিছু না—শরীর। যেমন রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, তপ্ত অঙ্গারের দীপ্তি অগ্নির স্থূল শরীর, তপ্ত অঙ্গারের অদৃশ্য উত্তাপ অগ্নির সূক্ষ্ম শরীর, আর তপ্ত অঙ্গারের দাহিকাশক্তি দীপ্তি এবং উত্তাপ উভয়েরই মূল কারণ— এই অর্থে তাহা অগ্নির কারণ-শরীর; তেমনি বলা যাইতে পারে যে, নিখিল বাহ্যজগৎ পবনাত্মক স্থূল শরীর, নিখিল অন্তঃজগৎ পরমাত্মার সূক্ষ্মশরীর, আর ঐশী শক্তি যাহার দ্বিতীয় নাম মায়ী এবং তৃতীয় নাম শুদ্ধস্ব, তাহা অন্তর্বাহ্য উভয় জগতের কারণ—এই অর্থে কারণশরীর। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেনও তাই। সেই সঙ্গে এটাও তিনি বলিয়াছেন যে, জীব-শরীরের যে অংশ অহিমজ্জারদরক্তত্বক প্রভৃতি পাক্তৌতিক উপাদানে পরিগঠিত তাহা জীবের স্থূল শরীর; যে অংশ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সূক্ষ্ম উপাদান, তাহা জীবের সূক্ষ্ম শরীর; আর জীব-চৈতন্ত্যের উপাধি-ভূত সেই যে অবিজ্ঞা বা মলিনসত্ত্ব * তাহা অল্পজ্ঞতা

* পঞ্চদশীতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, মায়ী=শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতি, এবং অবিজ্ঞা=মলিনসত্ত্ব প্রকৃতি; যথা—

“তমোরজঃ সত্ত্বগুণী প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা; •

সত্ত্বশুদ্ধবিশুদ্ধিত্যাং সত্ত্বা বিদ্যে চ তে মতে ॥”

এবং অহঙ্কারাদিবি কাবণ—এই অর্থে তাহা জীবের কারণ-শরীর।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

বেদান্তের মতে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই কারণ-শরীর স্রুষ্টি-রূপী। প্রভেদ কেবল এই যে, জীবাত্মার কারণ-শরীর সামান্ত-গোচের স্রুষ্টি; পর-মাত্মার কারণ-শরীর সেই মহাস্রুষ্টি বাহার আব এক নাম প্রলয়। একটু পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পর-মাত্মার সেই ঐ মায়ী-উপাধি বাহার আবেক নাম শুদ্ধ-স্ব তাহাই তাহার কারণ-শরীর, আর তাহাতে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সমস্ত বস্তু একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত। ইহা হইতে আসিতেছে যে পরমাত্মার কারণ-শরীর প্রলয়রূপী। আবার, জীবের কারণ-শরীর যেহেতু তাহার সমস্ত শরীরের সারভূত মূল উপাদান, কিনা বৈজ্ঞানিক ভাষায় বাহাকে বলে Protoplasm, এইজন্ত তাহাতেও জীবের স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত অবয়ব একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত হইবারই কথা; কাজেই তাহা স্রুষ্টিরূপী।* বেদান্তদর্শনে আরো বলা হইয়াছে এই যে, জীবাত্মার সেই যে স্রুষ্টিরূপী কারণশরীর, তাহা জীবাত্মার আনন্দময় কোষ; আর পরমাত্মার আনন্দময় কোষ হ'লে সেই মহাস্রুষ্টি বাহার আরেক নাম প্রলয়। গীতার কিন্তু লেখে

“অব্যক্তানীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্ত নিধনাত্তেব তত্র কা পরিবেদনা ॥”

“জানাই তো আছে যে, সৃষ্টির মধ্যই কেবল ব্যক্ত, পবস্ত তাহার আদিও যেমন—অস্তও তেমনি—দুইই অব্যক্ত, তাহার জন্ত খেদ কিসেব?” কলেও এইরূপ দেখা যায় যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ই বা কেমনধারা আর সৃষ্টিই

* জীবাত্মার সমস্ত শরীরের সারভূত Protoplasm বাহা তাহার মস্তিষ্কের স্রোত কোবে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহা চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্ব চৈতন্ত্যময়, আব সেই জন্ত আমরা মস্তিষ্কের শিখরপ্রদেশে আত্মাকে উপলব্ধি করি—যদিও তাহা আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র—চিদাভাসমাত্র। ঐ চিদাভাসিত বৈজ্ঞানিক সত্ত্বকে যদি চিদাত্মা হইতে বিযুক্তভাবে দেখা যায়, তবে তাহারই নাম অবিজ্ঞা বা thing-in-itself, কেননা তাহা অভিনাবি হইতে বঞ্চিত। সূত্র ব্রহ্মাণ্ডের মস্তিষ্কের অন্তর্নিগূঢ় মলিনসত্ত্ব বা ব্যষ্টিসত্ত্ব যেমন জীবচৈতন্ত্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী দর্পণ, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশেও অন্তর্নিগূঢ় শুদ্ধস্ব বা সমষ্টিসত্ত্ব তেমনি ব্রহ্মচৈতন্ত্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী দর্পণ।

বা কেননধারা তাহাব রহস্ত-বার্তা মুখে বলিয়াছেন এবং
 গ্রন্থে লিখিয়াছেন নানা দেশেব নানাশাস্ত্রকার কিন্তু চক্ষে
 দেখেন নাই কেহই। পক্ষান্তরে, আদি এবং অন্তের
 মাঝের জায়গাটিতে ভব দিয়া দাঁড়াইয়া আছি এই যে ক্ষুদ্র
 ব্রহ্মাণ্ড সবাই আমরা একএকটি, এ ব্রহ্মাণ্ডের আটপহরিসা
 প্রলয় এবং সৃষ্টি যে কিরূপ তাহা আমাদের কাহারো
 নিকটে অবিলম্বে নাই। তাব সাক্ষী—কল্পনাকুহকিনী
 যখন আমাদের ধ্যানচক্ষুে সম্মুখে বিবটি অন্ধকার-মূর্ত্তি
 ধারণ করিয়া প্রলয়ের অভিনয় কবে, তখন তাহার কোনো
 স্থানেই আমরা নাস্তি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না ;
 পক্ষান্তরে আমরা যখন রাত্রিকালের স্নানাদি হইতে
 প্রভাতে গাত্রোত্থান করি, তখন স্নানাদি যে কি আরামের
 বস্তু তাহা আমাদের জানিতে বাকি থাকে না। শ্রোতৃ-
 বর্গেব জানা উচিত যে, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঐশ্বর্য্যক্তি,
 অবিজ্ঞা প্রভৃতির সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া আমি যে কয়েকটি
 কথা বলিলাম, তাহাব একটিও আমার নিজের কথা না—
 সবই বেদান্তদর্শনের কথা। সত্য কি মিথ্যা—ঐশ্বর্য্যশক্তির-
 চার্য্য তাহার প্রণীত সর্ববেদান্তসারসংগ্ৰহে জীব জৈব
 এবং দোহার দুই উপাধি সম্বন্ধে বৈরাগ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত
 করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি প্রণিধান
 কর :—

“মায়োপাধিক চৈতন্য সাত্বাসং সম্বন্ধহিতঃ ।

সর্বজ্ঞতাদিশৃঙ্গকং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং ॥

অব্যাকৃতং তদব্যক্তং জৈব ইত্যপি গীয়তে ।

সর্বশক্তিগুণোপেতঃ সর্বজ্ঞানাবভাসকঃ ॥

স্বতন্ত্রঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকামঃ স জৈবঃ ।

তন্ত্ৰৈতত্ত্ব মহাবিকো মহাশক্তি মহৌষসঃ ॥

সর্বজ্ঞত্ববদাদিকারণত্বানীষিণঃ ।

কারণং বপুবিভ্যাহঃ সমষ্টিং সম্বন্ধহিতং ॥

আনন্দপ্রচুরত্বেন সাধকত্বেন কোষবৎ ।

সৈবানন্দময়ঃ কোষ ইতীশ শ্রুতি নিগদ্যতে ॥

সর্বোপরম হেতুত্বাৎ স্রষ্টৃশ্রুতানুসৃত্যেতৎ ।

প্রাকৃতো প্রলয়ো যত্র স্রাব্যতে স্রষ্টৃশ্রুতিমুখং ॥

অজ্ঞানং ব্যাধিভিপ্রায়াদনেকত্বেন ভিত্ততে ।

অজ্ঞানবৃত্তয়ো নানা তত্ত্বগুণ বিলক্ষণাঃ

বনস্তব্যাধিভিপ্রায়ঃ ভূত্বাহ ইত্যনেকতা ।

যথা তথৈবাজ্ঞানস্ত ব্যাধিতঃ স্রাদনেকতা ॥

* * *

ব্যাধির্মলিনসংস্রবো রজসা তমসা যতঃ ।

ততো নিকৃষ্টা ভবতি সোপাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥

চৈতন্যং ব্যাধিবচ্ছিন্নং প্রত্যগাত্ম্যেতি গীয়তে ।

সাত্বাসব্যাপ্তিপাতিতঃ সৎ তাদাত্ম্যেন তদগুণৈঃ ॥

অভিভূতঃ স এবাস্মা জীব ইত্যভিধীয়তে ।

কিঞ্চিদজ্ঞানীষবৎ সংসারিত্বাদি ধর্ম্মবান্ ॥

অস্ত ব্যাধিরহস্যাবকারণত্বেন কারণং ।

বপুস্তত্রাভিমানাত্মাত্মা প্রাক্ত ইত্যুচ্যতে বৃধৈঃ

প্রাক্তত্বমন্তৈকাজ্ঞানভাসকত্বেন সম্বন্ধতঃ ॥

* * *

স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যানন্দ প্রচুরত্বতঃ ।

কারণং বপূরানন্দময়ঃ কোষ ইতীর্থ্যতে ॥

অস্তাবস্থা স্রষ্টৃশ্রুতিঃ স্তাৎ যত্রানন্দঃ প্রকৃষ্টতে ।

এবোহহং স্রষ্টৃমত্বাৎ ন তু কিঞ্চিদবেদিসং ।

ইত্যনন্দঃ সমুৎকৃষ্টঃ প্রবুদ্ধে বুদ্ধতে ॥”

ইহার অর্থ এই :—

আপনার প্রতিবিষয়ের সহিত মায়-উপাধিতে অবিষ্টান
 করিতেছেন এমন যে সম্বন্ধ-পরিপুষ্ট চৈতন্য, তিনি
 সর্বজ্ঞতাদিশৃঙ্গকং, সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং, অব্যাকৃত
 এবং অব্যক্ত—এই অর্থে জৈব বলিয়া অভিহিত হ'ন।
 আর, তিনিই সর্বশক্তিমান্ সমষ্টি-অবিজ্ঞার (অর্থাৎ মায়ার)
 অবভাসক, স্বতন্ত্র, সত্যকাম, এবং সত্যসংকল্প—এই অর্থে
 জৈবঃ।* এই মহীমান্ মহাবিকুর মহাশক্তি সম্বন্ধে
 পরিপুষ্ট সমষ্টি-অবিজ্ঞা, আব, যেহেতু তাহা সর্বজ্ঞতা এবং

* মূলে আছে “সর্বজ্ঞানাবভাসক” অর্থাৎ সমস্ত অজ্ঞানের
 অবভাসক। অজ্ঞান শব্দের অর্থ কিছ অবিজ্ঞা, আর, সেইজন্য
 “সর্বজ্ঞানাবভাসক” এই শব্দটির আমি অনুবাদ করিলাম “সমষ্টি
 অবিজ্ঞার অবভাসক”। উক্ত শ্রোতাবলীর আর আব এদেশেও যে যে
 স্থানে লেখা আছে “অজ্ঞান,” সেই সেই স্থানে আমি তাহার অনুবাদ
 করিয়াছি “অবিজ্ঞা”। প্রচলিত ভাষায় অজ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানের
 অভাবমাত্র, পরন্তু বৈদান্তিক ভাষায়—অজ্ঞান-শব্দে বুঝায় অবিজ্ঞা।
 “অবিজ্ঞা” কিনা এক প্রকার অজ্ঞতা-প্রদর্শনী শক্তি—সত্যকে ঢাক
 দিয়া রাখিয়া অসত্যকে সত্যের মতো করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করাইবার
 শক্তি। এ যে, “শক্তি,” এ শক্তি আর কিছু না—Mill বাহাকে বলেন
 “Permanent possibility of Sensation.”

সর্কাসিপিভ্যোর কারণ, এই হেতু মনীষীরা তাহাকে বলিয়া থাকেন কারণ-শরীর।† তাহা আনন্দবহুল এবং কোষের জায় স্বরূপের আচ্ছাদক বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ, এবং তাহা সর্বজগতের লয়স্থান বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে সুযুপ্তিস্থান; আর বেদে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।‡ ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে অবিজ্ঞা অনেক এবং বিভিন্ন। অবিজ্ঞার ভালপালা অনেক এবং তাহার গুণবৈচিত্র্যও অশেষ-প্রকার। বন এক হইলেও ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে তাহা যেমন অনেক বৃক্ষ, অবিজ্ঞার অনেকতাও সেইরূপ। ব্যষ্টি অবিজ্ঞা রজস্তমোগুণ দ্বারা মলিনসত্ত্বা বলিয়া তাহা আত্মার নিকৃষ্ট উপাধি। এই ব্যষ্টি-অবিজ্ঞা দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীবচৈতন্ত্য তাহাকে বলা হইয়া থাকে প্রত্যগাত্মা। এই ব্যষ্টি-অবিজ্ঞারূপী উপাধিতে স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত বর্তমান, আর সেই উপাধির সহিত একীভূত হওয়া গতিকে তাহার গুণত্রয়ে অভিভূত—এমন যে অন্নজ্ঞ, পরন্তু এবং সংসারী চৈতন্য, তাহা জীব-নামে অভিহিত হয়। ব্যষ্টি-অবিজ্ঞা অহঙ্কারের কারণ বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে জীবের কারণ-শরীর। কারণ-শরীর-ভিমাত্রী জীবচৈতন্ত্যকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন প্রাজ্ঞ। তাহাকে তাঁহার প্রাজ্ঞ বলেন এইজন্ত—যেহেতু তাহা ব্যষ্টি-অবিজ্ঞার অবভাসক। জীববৎ কারণ-শরীর স্বরূপের

† ভাব এই যে পরমাণু এক, সমষ্টি অবিজ্ঞা সর্ব। একজ্ঞান, যে সর্বজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়—সর্বই (অর্থাৎ সমষ্টি অবিজ্ঞাই) তাহার কারণ।

‡ প্রলয়ের নাম শুনিলে কাহার না পা কাঁপে? অনতিপূর্ব কালের হুসভ্য লোকেরাও ধুমকেতু কখন আসেন, কখন বাঁচন তাহার ঠিক না পাইবা মনে কবিতেন যে, উনি প্রলয়ের গুপ্তচর তাহাতে আর ভুল নাই। অথচ ধুমকেতু এমনি সরল ভ্রমপ্রকৃতির জ্যোতিষ্ক যে, কিয়ৎবৎসরপূর্বে পৃথিবীপৃষ্ঠে তাহার পায়ের ধূলা পড়িয়াছিল, অথবা বাহা আরো ঠিক—ল্যাজের বাপোট পড়িয়াছিল, এমি স্বায়ত্বশাসিত শান্তিষ্ট স্বকোমলভাবে যে, পৃথিবী তাহা জানিতেও পারে নাই। অতএব ইহাই বৈশী সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, আমাদের এই ধাত্মমণি রজনী যেমন সন্ধ্যার মধ্য দিয়া সূর্যের আগমন করে, ব্রহ্মার মহারজনী তেমনি বৃগধৃগান্তরব্যাপী মহাসন্ধ্যার মধ্য দিয়া মহাবীরভাবে আগমন করবে। হয় তো সম্ভবগণের আত্মত্যাগবশতঃ রজস্তমোগুণ, আর সেই সঙ্গে মহাব্যোম বংশবৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে পরিশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে, তখন পৃথিবীর ত্রিসীমার মধ্যে জনমানব নাই; আর সেই অবসরে পৃথিবী ধীরে ধীরে আগমনের পিতালয়ে অর্থাৎ রসাতলে প্রত্যাবর্তন করিবে।

আচ্ছাদক এবং আনন্দ-বহুল বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুযুপ্তির অবস্থাই প্রকৃষ্ট আনন্দের অবস্থা। সুযুপ্তিকালের পবমানন্দ স্বরণ করিয়াই সুপ্রোখিত ব্যক্তি বলে—“গতরাজে পরমসুখে নিদ্রা গিয়া-ছিলাম—কোন্ দিক্ দিয়া রাজি প্রভাত হইল তাহা জানিতে পারি নাই।”

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তদর্শনের মতে প্রলয়রূপী ঐশ্বরিক কারণ-শরীর এবং সুযুপ্তিরূপী জৈব কারণ-শরীর ইহাই আনন্দময় কোষ। প্রলয়ের বৃহৎ ব্যাপারটাকে আপাততঃ না ঘাটাইয়া সুযুপ্তির সহিত আনন্দময় কোষের কিরূপ সম্বন্ধ—অগ্রে তাহারই তত্ত্ব-সন্ধান প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিদ্রা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) তামসিক, (২) রাজসিক, (৩) সাত্ত্বিক। একপ্রকার পাশব-প্রকৃতির নিদ্রা আছে বাহা ভূরিভোজন এবং মাদকদ্রব্য সেবনাদির ফলস্বরূপ—ইহাই তামসিক নিদ্রা; আর একপ্রকার নিদ্রা আছে বাহা স্বপ্নের উপক্রমে অশান্তি-ময়—ইহাই রাজসিক নিদ্রা; তৃতীয় আর একপ্রকার নিদ্রা আছে বাহা শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ফলস্বরূপ, আর সেই জন্ত স্বর্গসুখের পূর্বাভাস—ইহাই সাত্ত্বিক নিদ্রা, আর তাহারই নাম সুযুপ্তি। সুযুপ্তির মন্দাকিনীমানে সুপ্ত ব্যক্তির মন হইতে সমস্ত প্রমত্তম নিঃশেষে ধৌত হইয়া গিয়া যখন তাহাব স্থানে সুনিখলা শান্তি একাকী বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার অন্তঃকরণের গূঢ়তম প্রদেশে আনন্দময় কোষের দাব উদঘাটিত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্যদিয়া পরমাশ্রিত সুমঙ্গল শান্তি তাহার শরীর মনের উপরে স্বচ্ছন্দমতে কার্য্য করিতে পথ পায়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনো সুস্থশরীর পুণ্যাত্মা রাত্ৰিকালে সুযুপ্তিব স্বর্গে বাস করিয়া প্রাতঃকালে যখন মর্ত্যে আগমন করেন, তখন, বুদ্ধির প্রসন্নতা, মনের ক্ষুদ্রী, প্রাণের শান্তি, দেহের স্বচ্ছন্দতা সঙ্গে গুচ্ছাইয়া লইয়া প্রত্যাগমন করেন, তা বই, শূন্তহস্তে প্রত্যাগমন করেন না। ইহার ভিতরে একটি নিগূঢ় রহস্ত আছে, তাহা ভাদ্রিয়া বলিতেছি—প্রণিধান কর।

পূর্বে চের বলিয়াছি এবং এখানে ফের বলিতেছি যে, তোমারও যেমন, আমারও তেমনি, আর, তৃতীয় যে-কোন ব্যক্তি—যেমন দেবদত্ত—তাহাবও তেমনি, সত্তার সঙ্গে বর্জিয়া থাকিবার ইচ্ছা অবিচ্ছেদ্য লাগিয়া আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্জিয়া থাকিবার সেই যে ইচ্ছা—আসে তাহা কোথা হইতে? আসে যে তাহা কোথা হইতে তাহা দেখিতেই নাওরা যাইতেছে। সত্তার প্রকাশ হইলেই সত্তার রসামুভূতি হয়, সত্তার রসামুভূতি হইলেই সত্তার প্রতি প্রেম স্রমে, প্রেমের উপরে আনন্দের গোড়াপত্তন হয়, অব, সেই প্রেমানন্দের সঙ্গে এইরূপ একটি সদিচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া ঘোটে যে “সত্তা চিবজীবী হইয়া বর্জিয়া থাকুক।” এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সদিচ্ছার মূলে প্রেমানন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে—প্রেমানন্দের মূলে চিত্তপ্রকাশ চাপা দেওয়া রহিয়াছে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন প্রেমানন্দের অমুভূতি হইতে, সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি প্রেমানন্দের অমুভূতি। কিন্তু এইমাত্র দেখিলাম যে, সত্তার প্রকাশ না হইলে সত্তার প্রতি প্রীতিজনিত আনন্দ অমুভূত হইতে পারে না। অতএব, যাহাকে বলিতেছি সদিচ্ছা তাহা বর্জিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো বটেই, তা ছাড়া—তাহা চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্জিয়া থাকিবার ইচ্ছা। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্জিয়া থাকিবার এই যে ইচ্ছা—এ ইচ্ছা ইচ্ছামাত্র নহে—পরন্তু উহা আত্মশক্তিরই আর এক নাম। কেননা, সমষ্টিসত্তাব বাহিবে যখন দ্বিতীয় কোনো সত্তা নাই, তখন, সমষ্টিসত্তা যে আপনাব স্বাভাবিকী শক্তি ব্যতিরেকে অপর কোন শক্তির আশ্রয়ে ভর করিয়া নিত্যকাল বর্তমান, এতথা একেবারেই অগ্রাহ্য। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির অগ্নিব, কাব্যরচনা-শক্তি যেমন কবির কবিত্ব, তেমনি, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্জিয়া থাকিবার শক্তি চিদানন্দস্বরূপ সদবস্তু সত্ত্ব; আর, সদবস্তুর সে যে, সত্ত্ব, তাহা বস্তুমোক্ষণদ্বারা অবাধিত এবং পরম-পরিশুদ্ধ বলিয়া উপনিষদে উক্ত হইয়াছে “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া (সা)” পরম-আর জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া (অর্থাৎ ঐশীশক্তি) স্বাভাবিকী। এই সঙ্গে আব একট

কথা দ্রষ্টব্য এই যে, ব্যষ্টিসত্তা যখন সমষ্টিসত্তা হইতেই আসিয়াছে, তখন ব্যষ্টিসত্তাতে সমষ্টিসত্তার গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে। মনুষ্যের তো কথাই নাই—অধম শ্রেণীর জীবেরাও একপ্রকার বাধাবিলম্ব প্রতিকূলে আপনাব আপনার সত্তা বাঁচাইয়া রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট। এখন প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই :—

একটু পূর্বে দেখিয়াছি যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন আনন্দের অমুভূতি হইতে, সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি আনন্দের অমুভূতি; আর এইমাত্র দেখিলাম যে, সেই যে সদিচ্ছা অর্থাৎ সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্জিয়া থাকিবার ইচ্ছা, তাহা শক্তিময়ী প্রবলা ইচ্ছা, তা বই, তাহা ফাঁকা ইচ্ছা নহে। তবেই হইতেছে যে, সেই যে শক্তিময়ী ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তি, অথবা যাহা একই কথা—আত্মশক্তি, তাহার গোড়াতেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ; মাঝে শক্তির খাটুনি। গোড়ার যেখানে আত্মশক্তি সৃষ্টিগর্ভে বিশ্রাম করে, সেখানেও জীবাত্মার ভোগের জন্ত আনন্দের নৈবেদ্য সাজানো থাকে; আবার মাঝপথে যেখানে আত্মশক্তি উত্তমের সহিত কার্যে খাটে, সেখানেও আনন্দ ক্রবতারাব জ্বর চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, প্রকাশের বাধা কিনা জড়তা এবং আনন্দের বাধা কিনা অশান্তি, এই দুইপ্রকার বাধা অতিক্রম করাই জীবাত্মার আত্মশক্তির মুখ্য কার্য। একদিনের মতো বাধা অপসারিত হইলেই আত্মশক্তির একদিনের কার্য পরিসমাপ্ত হয়; আর তাহা যখন হয়, তখন, সেই অবসরে আত্মশক্তি সেদিনকার মতো বিশ্রাম করে। যে পরিমাণে আত্মশক্তি দিনগত বাধাবিলম্বের উপবে জয়-লাভ করে, সেই পরিমাণে চিত্তপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়। আবার, আত্মশক্তির বিশ্রাম-কালে সেই যথাপরিমাণে বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দকে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা স্রুষ্টির আরাম-নীড়ে প্রবেশ করে; আর সেই গতিকে স্রুষ্টির নিভৃত নিকেতনে চিত্তপ্রকাশ এবং আনন্দ উভয়েই একত্রে মিলিত হয়। তবে কিনা—চিত্তপ্রকাশ স্রুষ্টির সঙ্গে মিশিয়া ঘনীভূত বা একীভূত হইয়া যায়, আর, সেইজন্ত বেদান্তশাস্ত্রে স্রুষ্টিকে বলা হইয়া থাকে “প্রজ্ঞান-ঘন,”

আনন্দ জীবাত্মার ভোগের জন্য অনাবৃত হই, আর, সেইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে সুস্থিতিকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুস্থিতিকালে চিংপ্রকাশ যদি মূলেই বর্তমান না থাকিত—সুস্থির সঙ্গে মিশিয়া সুপ্তবৎভাবেও বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে সুস্থিতে আনন্দ অল্পভূত হইতে পারিত না; কেননা (একটু পূর্বে যেমন দেখিয়াছি) সমস্ত প্রকাশ ব্যতিরেকে আনন্দের অল্পভূতি সম্ভবে না; আব সুস্থিতে যদি আনন্দের অল্পভূতি না হইত, তাহা হইলে সুপ্তোপস্থিত ব্যক্তি কখনই এত বড় একটা মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ করিতে সাহসী হইত না—যে, “কাল রাত্রে আমি পরম স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।”

কুজ ব্রহ্মাণ্ডের সুস্থিতি এই যেমন আনন্দময় কোষ; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের মহাসুস্থিতি, যাহার আর নাম প্রলয়, তাহাও তেমনি আনন্দময় কোষ হইবারই কথা, কেননা, বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড এবং কুজব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমষ্টি ব্যষ্টি সম্বন্ধ। প্রভেদ কেবল এই যে, কুজব্রহ্মাণ্ডে, পূর্বরাজের আনন্দ হইতে পররাজের আনন্দে প্রয়াণ কবিবার সময় মাঝের পথে বাধাবিঘ্নের সহিত আত্মশক্তির সংগ্রাম এবং তজ্জনিত দুঃখক্লেশ অনিবার্য; পরন্তু, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে, ঐশী-শক্তির মূলেই বা কি—শেষেই বা কি—আর মাঝেই বা কি, সর্বত্রই আনন্দের বাধা-বোসনাই চির-বিরাজমান। একটুপূর্বে বলিয়াছি যে, জীবাত্মার আত্মশক্তি যে পরিমাণে দিনগত বাধাবিঘ্নের উপরে জয়লাভ করে, সেই পরিমাণে চিংপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়, আর আত্মশক্তির বিশ্রামকালে—সেই পরিমাণে বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দকে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা সুস্থির আরামনৈড়ে প্রবেশ করে। এখন কথা হইতেছে এই যে, “সম্মুখের বাধাবিঘ্ন অপক্রান্ত হইলেই ঈশ্বরপ্রসাদে আনন্দের অভ্যুদয় হইবে” এই বিশ্বাসে ভর করিয়া জীবাত্মার আত্মশক্তি যদিচ খাটুনি’র কষ্টকে কষ্টজ্ঞান করে না, তথাপি তাহাকে কষ্ট করিয়া গন্তব্যপথে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হয় তাহাতে আর ভুল নাই। একপ্রকার খাটুনি আছে—ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Labour of love—খ্রীতির খাটুনি। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণের রচনাকার্য্যে বান্দীকি মুনি যেরূপ খাটিয়াছিলেন, তাহা খ্রীতিব খাটুনি;

কিন্তু তথাপি তাঁহাব সেই সাধের রচনাকার্য্যটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপাটীকপে সুসম্পন্ন কবিতা তুলিতে তাঁহাকে বিলক্ষণই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল—নারদ মুনির নিকট হইতে রামের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ কবিত্তে হইয়াছিল—ক্রৌঞ্চী-পক্ষীটির জন্য তাঁহাকে যেরূপ মর্ষবেদনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার সরসভীর গর্ত্তবেদনা; দুঃসহ-শোকসম্মুখে তাঁহার মন যখন কিছুতেই শান্তি মানিতেছিল না—সেই মুখ্য সময়টিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন, আব তাঁহার দৈবশক্তিময়ী অভয়বাণীতে তাঁহার মনোমধ্যে কবিত্বরসের উৎস উন্মুক্ত হইয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, রামায়ণের রচনা-কার্য্যে খ্রীতির খাটুনি এবং কষ্টের খাটুনি দুইই একসঙ্গে জড়ানো ছিল। পরন্তু জগতের সৃষ্টিস্থিতিকার্য্যে ঐশীশক্তির খাটুনি আগাগোড়াই খ্রীতির খাটুনি—তাহা নিখুঁত আনন্দ-সঙ্গীত; কেননা, ঐশীশক্তি পবমাত্মাব স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া; তাহা একান্ত পক্ষেই বাধাবিহীন; তাহার কোথাও কোনো স্থানে কষ্টকল্পনার নামগন্ধও নাই। ঐশীশক্তিতে বিশ্রামের আনন্দ এবং উত্তমের ক্ষুধা নিখাসি এবং প্রখ্যাসের জ্ঞান একস্রুতে গ্রথিত এবং উভয়ে উভয়ের প্রতিপোষক। অতএব এটা স্থিবে যে, ঐশীশক্তি নিত্যানন্দময়ী। এই যে নিত্যানন্দময়ী ঐশীশক্তি ইহাই নিত্যসম্ব; কেননা, (অনতিপূর্বে যেমন বলিয়াছি) দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব, কাব্যরচনা-শক্তি যেমন কবির কবিত্ব, নিত্যানন্দময়ী ঐশীশক্তি তেমন সংস্করণের নিত্যসম্ব। এই নিত্যসম্বের অমৃত-ভাণ্ডার সর্বজগতের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর উন্মুক্ত রহিয়াছে। যাহাতে অমৃতের পুঞ্জকল্লাবা সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ষিতা থাকিতে পারে, আত্মার এই অন্তরতম সদিচ্ছাটিকে বলবতী এবং ফলবতী করিবার অভিপ্রায়ে মনুষ্যের আত্মশক্তি যদি সন্মুখস্থিত বাধাবিঘ্নের অপনয়ন-কার্য্যে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে, আত্মশক্তি একদিনের কার্য্য একদিনের মতো সুসম্পন্ন করিয়া রাত্রিকালে যখন সুস্থির আনন্দময় কোষে বিশ্রাম করে, তখন পরমাত্মার সেই অমৃত-ভাণ্ডার হইতে—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া হইতে—নিত্যসম্ব হইতে—

সুনির্মল আত্মপ্রসাদ শাস্তি তৃপ্তি এবং আরোগ্য অবতীর্ণ হইয়া সুস্থ ব্যক্তির নির্জীব শরীরে নবজীবনের সঞ্চার করে ; আর, পরমাত্মার প্রসাদলব্ধ সেই যে নবজীবন, যাঁহা সদাচারপবারণ পুণ্যাস্ত্রারা সুস্থতির হস্ত হইতে প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের নিকটে তাহা অত্যাধিক, কেননা, পরদিনের কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা তাহা বিধিমতে কাজে খাটাইয়া তাহা হইতে সোনা ফ্লাইয়া তোলেন ।

মনে কর, স্বাধী জনক সমস্তদিন তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগের মুখে তাহাদের নানা প্রকার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাব প্রতিবিধান-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন । সন্ধ্যার সময়ে তিনি এমি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, প্রজাদিগের জন্ত তিনি কি করিয়াছেন না করিয়াছেন তাহাব বিশেষ বিবরণ কিছুই তখন তাঁহার মনোমধ্যে স্মৃতি পাইতেছে না, কেবল মোটের উপরে তিনি যে প্রজাবর্গের হিতাহুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন—এই মোট জ্ঞানটি তাঁহার অন্তঃকরণে আত্মপ্রসাদের জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছে । এই যে মোট জ্ঞান এবং ভজ্ঞানিত আত্মপ্রসাদ, এই দুইটি পুণ্যফল লইয়া তিনি যখন সুস্থতির আবামনীড়ে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার একপ মনে হইতেছে না যে, “আমি এক্ষণে সর্বসংহাবক মৃত্যুব ভীষণ বলিশালায় প্রবেশ করিতেছি ।” ঠিক তাহার বিপরীত । তাঁহার মনে হইতেছে “আমি এক্ষণে সর্ব-সম্প্রাপহাবিণী জগজ্জননীৰ তরণচ্ছায়ায় নিলীন হইতেছি ।” এ যাহা তাঁহার মনে হইতেছে—বাস্তবিকই তা'ই । কেননা সুস্থতির আনন্দময় কোষ হইতে আনন্দামৃত পান করিয়া যাবৎ পর্যন্ত না তাঁহার শরীর সবল হয়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, মন তৃপ্ত হয় এবং বুদ্ধি এসন্ন হয়, তাবৎ পর্যন্ত সেই মেহময়ী জননী তাঁহাকে আপনার শাস্তিসদনের পবিত্র মধ্যে যত্নের সহিত আগ'লিয়া রাখেন । এখন কথা হইতেছে এই যে, সুস্থতিকালে সুস্থ ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের ঘোরপ প্রশান্ত সরল এবং নির্মল অবস্থা স্বভাবত ঘটিয়া দাঁড়ায়, তেমনি, জাগ্রৎকালে যদি কোনো সাধক সজ্ঞানভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনার মন হইতে বিষয়-বাসনা এবং অহঙ্কারাদি ধৌত করিয়া ফ্যালেন, তবে তাঁহাবও মনের সেইরূপ প্রশান্ত সরল এবং

নির্মল অবস্থা ঘটিয়া দাঁড়াইবারই কথা ; আর তাহা যখন ঘটিয়া দাঁড়ায় তখন পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয় হইতে—নিত্যস্ব হইতে—প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং আনন্দামৃত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাব সমস্ত অভাব ঘুচাইয়া ছায় । একপ মহাত্মারা আপনার জন্ত নির্ভাবনা এবং নিশ্চিন্ত ; ইহার “নির্বোগক্ষেম” । ইহাদের নিকটে আপনার মঙ্গল এবং অজ্ঞের মঙ্গল—দুই মঙ্গল নহে, পরন্তু সব মঙ্গলই এই মঙ্গল ; ইহাদের কার্যও তদমুরূপ । আর সেইরূপ কার্যে ইহাদের আত্মশক্তি নিখাস প্রকাশেব ত্রায়—যখন খাটিবার হয় তখন খাটে, যখন বিশ্রাম করিবার হয় তখন বিশ্রাম করে ; ইহাদের আত্মশক্তি বাধা-মুক্ত ; ইহারা “আত্মবান্” এইরূপ দেখা যাইতেছে যে “নিত্যস্বস্থ” হওয়া “নির্বোগক্ষেম” হওয়া এবং “আত্মবান্” হওয়া একই ব্যাপার ।

কেহ যদি মনে কবেন যে, সুস্থতি কেবল সুস্থ অবস্থাই নিম্নস্থ ধন, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল । তাঁহার জ্ঞান উচিত যে, জাগ্রতিতাবস্থাতে সবই আছে—বুদ্ধি, জাগরণও আছে, মনের স্বপ্নও আছে, প্রাণের সুস্থতিও আছে ; আর তিনের সামঞ্জস্য লোকমধ্যে দুর্লভ হইলেও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতীব প্রার্থনীয় । বড় বড় চিত্রকরদিগেব চিত্রবচনার একটি প্রধান গুণ, হচ্ছে—জাগ্রৎসুস্থি ; আর, সে-যে সুস্থি, অর্থাৎ চিত্রময়ী জাগ্রৎসুস্থি, তাহার ইংরাজি পারিভাষিক নান Repose ।* অব্যবসায়ী লোকদিগের অভিধানে বুক-কোলানো, চক্ষুরাঙানো, এবং বাহ আফালন করা'ন নামই বীরত্ব ;—ফলে বীরত্ব যে কাহাকে বলে তাহা নেলসন্ জানিতেন ; আর তাহা জানিতেন বলিয়া—ভীষণ জলধুচে প্রবৃত্ত হইবার প্রাবল্যমুহুর্তে সমস্ত মানোয়ারি সৈন্তবর্গকে সামনে ডাকিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন শুধু এই যে, England expects every man to do his duty, ইংলণ্ড চান—প্রতিজন আপনার কর্তব্য করে । ভাব এই যে, তোমরা যেমন সুনিশ্চিত মনে আর-আর কর্তব্য কা'র সমাধা কর, উপস্থিত কর্তব্য কার্যও সেইরূপ সুনিশ্চিত মনে

* Library Dictionaryতে এইরূপ লেখে :—

Repose, the fine arts, that harmony and moderation which affords rest for the eye.

সমাধা কর। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সঙ্গতিপন্ন গৃহী-
ব্যক্তির যেমন নিশ্চিন্তমনে বন্ধুবর্গের সহিত শ্রীতিভোক্তনে
উপবিষ্ট হ'ন—হাড়পাকা যোদ্ধারা অর্থাৎ Veteran
শ্রেণীর যোদ্ধারা সেইরূপ নিশ্চিন্ত মনে তোপের মুখে
অগ্রসর হ'ন। ইহারই নাম Repose। সিংহপ্রকৃতির
যোদ্ধাবীরদিগের বুদ্ধকার্যে এই যেমন এক প্রকাব জাগ্রত-
সুস্থিতির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব এবং জৈশা-
মহাপ্রভুর জায় ধর্মবীরদিগের অন্তঃকবণে এবং আচার
ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা তাহা আরো সুপরিষ্কৃতভাবে
বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে
ইহুদীদেশীয় ফারিসীদিগের অভিধানে নিশান ওড়ানো'র
নামই ছিল ধর্ম; কিন্তু জৈশা তাঁতার শিষ্যবর্গকে সম্মুখে
অড়ো করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা
যখন দান করিবে, তখন তোমাদের ডান হাত কি
করিতেছে—বাঁ হাত যেন তাহা জানিতে না পারে।
প্রকৃত কথা এই যে, কোনোপ্রকার মঙ্গলের উদ্দেশে
আত্মশক্তিকে বিধিমনে কার্যে খাটাইতে হইলে বুদ্ধিকে
জাগ্রত করা সাধকের পক্ষে যেমন আবশ্যক, অশাস্ত
এবং হৃদ্বাস্ত মন'কে সুস্থিতির শান্তিসলিলে অবগাহন
করানোও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইতে পারে
কেমন করিয়া? গীতাশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, মনুষ্যের
অস্তরাত্মার স্নানভূত প্রদেশে রজস্বমোক্ষণদ্বারা আবদ্ধিত
যে এক মহাসত্তা পরমাত্মাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে—যাহা
পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া—যাহাকে কোনো
প্রকার হুঃখক্লেশও স্পর্শ করিতে পারে না—অশাস্তিও
স্পর্শ করিতে পারে না—জড়তাও স্পর্শ করিতে পারে
না—সেই নিত্যসত্তা প্রতিষ্ঠিত হইলেই মনুষ্যের মন
অটল প্রশান্তি এবং স্থিরতা লাভ করে। ব্যাপারটি সামান্য
নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ! তাহার জয় প্রাপ্ত হইতে হইলে
কত না প্রভূত পরিমাণে আত্মশক্তির পুঞ্জি সঞ্চিত হইবে
আবশ্যক? অর্জুনের ধনুক যেমন বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীব ধনু,
অর্জুনের তুগীর যেমন অক্ষয় তুগীর, অর্জুনের রথধ্বজা
যেমন দ্বন্দ্ব ভীষণ মহাকপি; অর্জুনের আধ্যাত্মিক রণসজ্জা
তেমনি উহাদেবই সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবার মতো বিরূপ
ছাঁচের হওয়া চাই; অর্জুনের ঐশ্বর্যবীর্ঘ্য হিমালয় পর্বতের

জায় অটল হওয়া চাই; অর্জুনের জ্ঞাননেত্র নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ
সরোবরের জায় স্বর্গমর্ত্যাস্তবীক্ষের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব-
গ্রাহী দর্পণ হওয়া চাই; বিশেষতঃ অর্জুনকে, ব্রহ্মের
আনন্দের সহিত পরিচিত হওয়া চাই; কেননা, উপনিষদে
আছে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ন
বিভেতি কদাচন” “ব্রহ্মেব আনন্দের সহিত যিনি পরিচিত
হইয়াছেন তিনি কুত্রাপি ভয় প্রাপ্ত হ'ন না—কদাপি ভয়
প্রাপ্ত হ'ন না।” শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণতুল্যা প্রিয় অর্জুনকে
এইসকল আধ্যাত্মিক ব্রহ্মস্নেহে সুসজ্জিত করিবার অভি-
প্রায়ে তাঁহা এইরূপ উপদেশ দিতেছেন যে, যাহাবা
ত্রৈলোক্যের সেবক তাহারা বেদাদি শাস্ত্রই জানে সার—তুমি
অর্জুন নিঃসংশয় হও, নিঃসন্দেহ হও, নিত্যসম্বৎসর হও,
নির্ভোগক্ষেম হও, আশ্রয়ান্বিত হও।

আজিকের এই একটিমাত্র শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা অন্তান্ত
বারের গণ্ডাভিনেয় শ্লোকের অর্থ-ব্যাখ্যার স্থান জুড়িয়া
কলেবর বিস্তার করিয়াছে ভয়ানক! অতএব আজ
এইখানেই থাকা যুক্তিসিদ্ধ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুস্তক-পরিচয়

Leprosy and its Treatment. Third Edition. By
Pundit Kriparam Sarma. ২৩২ পৃঃ।

এখানি ইংরেজিতে লিখিত কুষ্ঠ ও তাহার চিকিৎসা বিষয়ক একখানি
পুস্তক। বিখ্যাত কুষ্ঠব্যথিচিকিৎসক পণ্ডিত কৃপারাম শর্মা ইহার
প্রণেতা। পণ্ডিত কৃপারামের নাম বঙ্গদেশে অনেকের নিকট সুপরি-
চিত। কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসায় ইনি নাকি অসাধারণ ক্ষমতাব পবিত্র
দ্বিগা, অনেক ধ্যাননামা চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের সম্পাদককে
চমৎকৃত করিয়াছেন এইরূপ শুনা যায়। পুস্তকখানি যখন আমাদের
হাতে পড়ে তখন আমাদের মনে এই আশা হইয়াছিল যে, এই পুস্তক
পড়িয়া কুষ্ঠ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে
পারিব কিন্তু কার্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই। এই পুস্তকে কুষ্ঠরোগ
ও তাহার চিকিৎসার কথা যত থাকুক আব না থাকুক লেখক যে
একজন অধিতীয় কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসক—এই বিপুল বিষে এ বিষয়ে
তাঁহার তুল্য সিদ্ধহস্ত আর কেহ নাই, বিবিধ প্রশংসাপত্র, সংবাদপত্রের
অভিমত এবং আরও নানা উপায় দ্বারা, সেই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার
বিলম্ব চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বলিতে কি এই ২৩২ পৃষ্ঠার
বইখানিতে কেবলমাত্র ৩২ পৃষ্ঠা কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসার কথায়
পূর্ণ, বাকি ২০০ পৃষ্ঠা লেখক ও তাঁহার গুণপন্যার পরিচয়, গভর্ণমেণ্টের
উপেক্ষা লভ্য হুঃখ, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের প্রশংসাপত্র, সংবাদপত্রের অভি-
মত এবং বিবিধ ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি আছে। এই পুস্তকখানি

পড়িবা আমাদের একান্ত নিরাশ হইতে হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের বাহা বক্তব্য আছে সংক্ষেপতঃ তাহা এই—বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে কুষ্ঠ হয়। কুষ্ঠ প্রধানতঃ বিবিধ মহাকুষ্ঠ ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। মহাকুষ্ঠ আবার ৭ প্রকার, ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ১১ প্রকার। দক্ষ, ব্রণ, বিক্ষোটিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র কুষ্ঠের অন্তর্গত। মোটামুটি বলিতে গেলে স্বাস্থ্যবিধি লক্ষন করিলে বায়ু পিত্ত কফ বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হয়। অধিক খাইলে, অল্প খাইলে, শাস্ত্রনিবদ্ধ জব্যাদি খাইলে, কুপিত হইতে পারে—এ সকল ছাড়া আরও সহস্র কারণে বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইতে পারে। পণ্ডিত মহাশয়ের মতে উপদংশ ও এসেহ রোগে ইহার বেকপ কুপিত হয়, এমন আর অন্য কোন কারণ নয় এই কাণে উক্ত দুই রোগকে ইনি কুষ্ঠরোগের প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। পক্ষান্তর চিকিৎসকেরা কিন্তু bacillus leprae নামক একরূপ উদ্ভিদাণুকে কুষ্ঠরোগের মূল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন—এই ব্যাসিলাসের ধর্ম অনেকটা টিউবার্কেল ব্যাসিলাসেরই ছায়, এই ব্যাসিলাস লইয়া ইয়ুবোপে অনেক পরীক্ষা চলিতেছে—বতটা আভাস পাওয়া যাইতেছে কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক সত্য আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব।

এই পুস্তকে কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসার বিশেষ কোন বর্ণনা নাই। পণ্ডিত মহাশয়, কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসার যেসকল ঔষধ ব্যবহার করেন তাহাদের তালিকা আছে মাত্র। এই তালিকার যেসকল ঔষধ আছে, সেসকল ছাড়া ইনি আরও অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন—সেগুলি ভয়ানক বিষ এই লজ্জ তাহাদের নামোল্লেখও করেন নাই। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জানিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকেও তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া শুনাইতে সাহস করেন নাই—কেননা তাহারা ভয়ানক বিষ—অধ্যক্ষ সাহেবের অনর্থ খচার বিচিত্র কি? ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। পুস্তকখানিতে একটা কাকরোজি দেখা যায়, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেকে আবার তাহার সমর্থনও করিয়া থাকেন—যে, গম্ভীরমেন্ট যেন ইচ্ছা করিয়া ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের গুণের আদর করিলেন না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে এই আশাস দিতে পারি, যদি বাস্তবিকই তাঁহার গুণ থাকে তাহা হইলে শুধু এদেশে কেন, দেশ বিদেশে তাঁহার গুণের একদিন স্বার্থ আদর হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সেই গুণের পরিচয় শুধু সংবাদ-পত্রের অভিমত এবং প্রশংসাপত্রের দ্বারা হইবে না। তিনি কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে যেসকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, কিছুমাত্র গোপন না রাখিয়া, স্বধী-সমাজে সেসকল উপস্থিত করুন তবেই তাঁহার গুণের স্বার্থ পরিচয় দেওয়া হইবে। বর্তমানকালে Serum ও Vaccine দ্বারা কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার অনুষ্ঠান হইতেছে—স্থলবিশেষে, ইহার দ্বারা কল ও পাওয়া যাইতেছে শুনিতেছি কিন্তু ইহার উপব নির্ভর করার এখনও সময় হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের চিকিৎসাপ্রণালী যদি অধিকতর ফলদায়ক হয় তাহা হইলে, তাহার পরীক্ষার সুযোগ সকলকেই দেওয়া উচিত। এই পুস্তকে যেসকল রোগীর চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের রোগের ইতিহাস, এবং তাহাদের চিকিৎসার বিবরণ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার প্রণালীমত চিকিৎসা করিবার আমাদের বিশেষ সুযোগের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই আমাদেরিগকে সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

বেলগেছিয়া হাঁসপাতালে দুইটি রোগীকে চিকিৎসা করার পর হইতেই এদেশে পণ্ডিত কৃপাবামের নাম প্রচারিত হইতে থাকে। সে সময়, সংবাদপত্রে এবং অনেক চিকিৎসকের মুখে তাঁহার বখেষ্ট গুণগান শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমরা কিন্তু তাহা অনুমোদন করিতে

পারি নাই। দুই একটি রোগীকে আরাম হইতে দেখিয়াই কোন মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি নাই। ডাক্তারি চিকিৎসায়ও একথা দুই একটি রোগী না সারে এমন নয়।

“Albuttএর System of Medicine নামক পুস্তকে কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-প্রসঙ্গে এই কথা লিখিত থাকিতে দেখা যায়।—“The treatment of leprosy is by no means satisfactory, but although an absolute cure rarely be anticipated, it is a mistake to suppose nothing can be done to prolong life or mitigate suffering or even occasionally to eradicate the disease.”

ইহা হইতে এমন বুঝা না যে কুষ্ঠরোগী *একবারেই আরাম হ' না। ২৪টি রোগী সম্পূর্ণ আরাম হইতে পারে। পণ্ডিত মহাশয়ের বোণীগুলিও যে সে শ্রেণীর অন্তর্গত নয় সে কথা জোর করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

এই পুস্তকখানির মূল উদ্দেশ্য যদি কুষ্ঠরোগ ও তাহার চিকিৎসা বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য প্রহকারের নৈ উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে; আর, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যদি আপনার ক্ষমতা সাধারণের নিকট জ্ঞাপন করা হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ হয় নাই। এই পুস্তক পড়িয়া অনেককেই পণ্ডিত মহাশয়কে একজন অধিতীর কুষ্ঠরোগ চিকিৎসক বলিয়া মনে করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। —ডাক্তার।

গৃহচিকিৎসা (পারিবারিক চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক)

দ্বিতীয় সংস্করণ—

সাব-এসিষ্ট্যান্ট সার্জন্স ঐসারদাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ২৯৮ পৃ., মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

এখানি এলোপ্যাথী চিকিৎসার বই। প্রহকার ভূমিকার লিখিয়াছেন—“গৃহস্থদিগের ব্যবহারের লজ্জ সর্বপ্রকার সুবিধা হইতে পারে এমন কোন ডাক্তারি পুস্তকের বিশেষ অভাব। এক্ষণ আমি চিকিৎসা বিষয়ক বিবিধপুস্তক অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি সংকলন করিলাম।” প্রহকারের উদ্দেশ্য ভাল; এখন তাহার এই সাধু উদ্দেশ্যটি যদি বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী গৃহস্থে যে একটা বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের পরিশ্রমের বতট পরিচয় পাইয়াছি—কৃতকার্যতা সম্বন্ধে সেকপ পরিচয় পাই নাই প্রহকার অনেকস্থলেই আপনার উদ্দেশ্যটি মনে রাখিতে পারেন নাই। ইহার ফলে পুস্তকখানি চিকিৎসাপুস্তক হইয়াছে বটে, কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসাপুস্তক হইতে পারে নাই। পুস্তকখানির অধিকাংশ স্থলই সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য হইয়াছে। পারিবারিক চিকিৎসাগ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকিতে দেখা যায় :—

(১) ইহার ভাষা বর্ণাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল হয়; সাধারণে বাহ বুদ্ধিতে পারে না এরূপ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কদাচিত্ত ব্যবহৃত হয়।

(২) যেসকল রোগ বুঝি সাধারণ, ইহাতে প্রধানতঃ সেইসকল রোগেরই বিবরণ প্রদত্ত হয়।

(৩) রোগের লক্ষণসমূহের কেবল মাত্র একটা তালিকা থাকে না—লক্ষণগুলিকে এরূপ ভাবে সাজাইয়া বর্ণনা করা যায় যে, পড়িবার পাঠকের মনে রোগটির যেন একটা ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়।

(৪) সাধারণ গৃহস্থের হস্তে বাহা সম্ভব, ইহাতে কেবলমাত্র সেইসকল চিকিৎসার বিবরণ প্রদত্ত হয়।

(৫৭) যে অবস্থায় রোগীকে নিজের হাতে না রাখিয়া, উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত, ইহাতে সেই অবস্থার বিশেষ উল্লেখ থাকে।

(৬৪) ঔষধের মাত্রা, মাপ, প্রস্তুতপ্রণালী, ঔষধোমিটারের ব্যবহার, বিবিধ পঞ্চপ্রস্তুতপ্রণালী প্রভৃতি গৃহস্থে অবশ্যজ্ঞাতব্য এইরূপ অনেক বিষয়ের বর্ণনা প্রস্তুত হয়।

বর্তমান পুস্তকখানিতে এসকল নিয়মের কোনটাই তেমনভাবে রক্ষিত হইতে দেখা যায় না। ইহার ভাষা কঠিন নহে বটে, কিন্তু প্রাঞ্জল বলা যায় না। লেখক অনেক স্থলেই আপনার বক্তব্যটি তেমন পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বসন্ত রোগের চিকিৎসা-প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন—“উপযুক্ত সূত্রা হইলে ব্যারাম আপনিই সারিয়া থাকে।” লেখকের উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ বলা যে, বসন্ত রোগের বিশেষ কোন ঔষধ নাই; এ রোগে বাহ্যিক আরোগ্যলাভ করে, আপনি হইতেই করে—তবে সূত্রার আবশ্যক; উপযুক্ত সূত্রা না হইলে, বাহ্যিকের বিচিত্রার সম্ভাবনা, তাহারিও বিচিতে পারে না। প্রস্থানিতে একপ অশুচিভাবের উদাহরণ নিতান্ত কম হইবে না। আবার অন্তঃসংসেবন, গৌমহর্গ্যাদান, ক্ষণোপন, দত্তনির্দীপক, উদারায়ান, প্রভৃতির ন্যায় বিস্তৃত দ্রব্য-শব্দ থাকায়, এবং অন্তঃস্থ বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায়, পুস্তকখানির অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বুঝা অসম্ভব হইয়াছে। বোগনির্বাসনও যে খুব ভাল ও সঙ্গত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। ইহাতে এমন অনেক রোগের কথা আছে, যেগুলি এদেশের রোগ নব, এবং এদেশে ইহাদের হইতেও দেখা যায় না। সারদাবাবু ত বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা-কার্যে ব্রতী আছেন; তাহার এই সুদীর্ঘ চিকিৎসাকাল মধ্যে, তিনি কয়টি Yellow fever (পীত জ্বর), Scarlet fever (আরক্ত জ্বর), typhus (টাইফাস) জ্বরের রোগী দেখিয়াছেন আমাদের বলিয়া দিবেন কি? যেসকল রোগের সহিত গৃহস্থের কোনই সম্বন্ধ নাই, অথবা অতি সামান্যই সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা, সেসকল রোগের বিবরণ দিয়া, ভালমাত্রই সম্বন্ধ থাকার মনে ধাঁধা। উৎপন্ন কবিবাব পারিবারিক-চিকিৎসাপুস্তক-প্রণেতার যে কোনরূপ বৈধ অবিকার আছে, ইহা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

পুস্তকখানিতে রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তারিত বিবরণ নাই। উদাহরণ এককটা ভালিকা আছে মাত্র। ইহাতে, রোগটির বহু প্রকার কারণ, লক্ষণ, ও চিকিৎসা থাকিতে পারে, তাহাদের কোনটিরই নাম বাদ পড়ে নাই, কিন্তু কার্যকালে, ইহার দ্বারা গৃহস্থ যে কতটা ফল পাইতে পারিবে সে বিষয়ে আমাদের খুবই সন্দেহ রহিয়াছে। Intussusception (অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ) নামক রোগটির কারণ দেওয়া হইয়াছে—“অন্ত্রের উত্তেজনা, সর্ববৎসরতির আধিক্য, লিম্ফিউডিম্বাল কোটের সকেচন” ইত্যাদি। সারদাবাবুকেই জিজ্ঞাসা করি, ইহা পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকের মনে কি কোন একটা ধারণা স্রষ্টব্য সম্ভাবনা আছে? আমরা Dr. Birch (ডাঃ বার্চ), Dr. Moore (ডাঃ মুর), Dr. Billroth (ডাঃ বিলরথ) প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকের গৃহ-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছি। এসকল পুস্তকে রোগটির সকল লক্ষণ এবং সকল প্রকার চিকিৎসারই যে উল্লেখ আছে তাহা নহে। যেসকল লক্ষণ সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বুঝা সম্ভব এবং যেসকল চিকিৎসা গৃহস্থের পক্ষে আপনার হাতে করা অসম্ভব নয়, এসকল পুস্তকে কেবল সেইসকল লক্ষণ এবং চিকিৎসার বিবরণ থাকিতে দেখা যায়। এ পুস্তকখানিতে সেরূপ অসুভাবের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। সারদাবাবু আশা করেন, তাহার গৃহস্থ পাঠক শিক্ষিত ডাক্তারের দ্বারা

রোগ পরীক্ষা করিবেন; “রক্তাস,” “সিবিলাস্ট শব্দ,” “ডেসিকুলার মর্গার,” “রালস,” “কুইনস্ বঙ্কাস,” “ক্রিশান সাউণ্ড” প্রভৃতি বৃত্তিতে পারিবেন; “শরীরের চিকিৎসা” এরূপেই কিবা মেদগদ্য হইতে বিটা-আক্সি-বিউটেরিক এসিড উৎপন্ন হয়, ঐ এসিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে ডাক্তারটিক কোমা হয়” প্রভৃতি তত্ত্ব জলের মত বৃত্তিতে পাবেন; কলেবা বোগ চিকিৎসার, নাইটেগ্লিসিবেনের “ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন” দিবেন; নিউমোনিয়া রোগে জ্বর কমাইবার জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র ঘি না করিয়া এন্টিপাইবিন নামক ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। ফলতঃ শিক্ষিত চিকিৎসক যেসকল কাজ করিতে ভয় পায়, সাধারণাবু বেশিতেই তাহা আনাড়ি পাঠকগণ দ্বারা অবাধে সেসব কাজ করাইয়া লইতে সাহসী। জটিলতর উপর জটিল এই যে সাধারণাবুর পাঠকদিগের কোন বোগেই এবং রোগেব কোন অবস্থাতেই ডাক্তার ডাকার আবশ্যক হয় না। কেবল যেসকল স্থলে অন্তঃপ্রবোগ করিবার আবশ্যক সেইরূপ স্থলেই ডাক্তারের সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয়। ইংরেজি ভাষার পারিবারিক চিকিৎসা সম্বন্ধে যেসকল পুস্তক আছে, তাহাদের লেখকেরা কঠিন বোগেব বেলায় ত কথাই নাই—অপেক্ষাকৃত সহজ বোগও বাঁকা হইয়া পাড়াইবার মত হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া গৃহীকে ডাক্তার ডাকিতে পরামর্শ দেন। সারদাবাবুও যদি ইহাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনার তাহার পুস্তকের গৌরবেব বৃদ্ধি বই ভ্রাস হইত না। সারদাবাবু তাহার পুস্তকের অনেক স্থলেই, পুন্টিস, চার্কোল পুন্টিস, কোমেটেশন, কবোমিড সারিশেট লোসন (ওরান ইন পাউড্রা) এবং সাণ্ড, বার্লি ওয়াটার, সুপ, ব্রু প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এসকল কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ গৃহস্থই যে এসকল বধ্যাবধি রূপে প্রস্তুত করিতে জানে না, ইহা আমরা বিলম্ব অবগত আছি, আর সারদাবাবুও যে তাহা জানেন না, ইহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। এসকল ত্রুটি ছাড়া পুস্তকখানিতে আরও বিবিধ প্রকার ত্রুটি ও ভ্রম আছে, সকল-গুলির উল্লেখ করা অসম্ভব, এ স্থলে ছই একটির উল্লেখ করিব মাত্র।

গৌমহর্গ্যাদান অর্থাৎ গোবীরের ঢাকা নামক প্রস্রাবট হ্রস্বিভিত হইয়াছে বটে, কিন্তু লেখকের অনবধানতা বশতঃ practical (কার্যোপযোগী) হইতে পারে নাই। এদেশে সাধারণতঃ ঢাকাদারেরা (vaccinators) ঢাকা দিয়া থাকে। ঢাকা দেওয়া খুব শক্ত কাজ নয়; বুদ্ধিমান গৃহস্থ ইহা অবাধে দিতে পারে। ঢাকা দিতে হইলে সর্বপ্রথমে বীজ সংগ্রহের আবশ্যক। সারদাবাবু যে-বালকের ঢাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার গুটি হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে বলেন, কিন্তু পল্লগ্রামে তেমন বালক কি সব সময় পাওয়া সম্ভব? সারদাবাবু কি জানেন না কাচের টিউবে করিয়া calf-lymph (গোবীজ) পাওয়া যায়, এবং আজকাল তাহার দ্বারাই প্রায় স্থলেই ঢাকা দেওয়া হইয়া থাকে? সে বাহাই হউক সারদাবাবুর পদের ত্রুটির আর মার্জনা নাই। তিনি বলিতেছেন—“বাহাকে ঢাকা দিবে তাহার বাহুমূলের চারি অঙ্গুলি নিয়ে।” স্থলে উপদ্রব মাত্র ছেদ করিয়া তন্মধ্যে বীজ বসাইবে। ইহার পূর্বে antiseptic precaution লওয়াব যে আবশ্যক তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না। এরূপ স্থলে erysipelas (বিসর্প), tetanus (ধনুস্তকার) প্রভৃতি প্রাণঘাতক রোগ দেখা দেওয়ার যে কত সম্ভাবনা—সে কথাটি সারদাবাবু ভ্রাতৃ বহুদর্শী চিকিৎসক কি করিয়া তুলিয়া গেলেন, আমরা তাহা হির করিয়া উঠিতে পরিলাম না। আমরা এই পুস্তকে জ্বর বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের আশা করিয়াছিলাম। জ্বর বহির্ স্বতন্ত্র রোগ নয়—অন্ত রোগেব লক্ষণ, তথাপি জ্বর কি? তাহার আনুসঙ্গিক লক্ষণই বা কি? অরকালে শারীরিক ফ্রিয়ার

ব্যতিক্রম কিরূপ হয়? তাগের পরিমাণানুসারে জ্বরের প্রণীতিভাষাই বা কিরূপ? জ্বরের যেটামুটি চিকিৎসাশ্রমণী কিরূপ? ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইলে গৃহীর প্রসঙ্গ বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল। জ্বরে অনেক সময় শরীরের তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হয়, এই তাপ যদি কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলেই রোগীর প্রাণ-বিনাশ হইতে দেখা যায়। এই তাপ হ্রাস করিবার যেসকল উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে রোগীকে শীতল জলে স্নান করান সর্বাপেক্ষা সহজ ও নিরাপদ উপায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সারদাবাবু তাঁহার পুস্তকের কোন স্থানেই এই উপায়টির উল্লেখও করেন নাই। এই পুস্তকের চিকিৎসা-বর্ণনা অনেক স্থলেই এত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া, পুস্তকে রোগচিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া বাইতে পারে না। জলময় ব্যক্তির চিকিৎসা এসঙ্গে এই পুস্তকে লিখিত আছে—“রোগীকে জল হইতে তুলিয়া তাহাব পা উর্দ্ধ এবং মাথা নিম্ন দিক করিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে, ক্ষুদ্রস্রবের জল বাহির হইয়া যাইবে।” ইহা পাঠ করিয়া কেহ যদি বেস্টীর পা ধরিয়া, ২১০ মিনিট কাল তাহাকে জ্বলাইয়া রাখে, তবে তাহাকে ঘোব দেওয়া যায় না; কোননা মাথাটা পা হইতে কতখানি নীচু করিতে হইবে, এবং এরূপ ভাবে কতক্ষণই বা রাখিতে হইবে, সারদাবাবু স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই। একজন ইরোজ লেখক (Lyon) এ বিষয়ে কত সতর্ক তাহা দেখুন—

Get rid of any water in the mouth &c. by placing the body for a few seconds face down with head a little lower than the feet.” এছকার ইহাতেও নিশ্চিত হইতে না পারিয়া, few seconds, head little lower, feet এই করটি শব্দ মোটা অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। এতটা সাবধান হওয়ার যে কারণ নাই, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। জলময় ব্যক্তি যে সব সময় দম বন্ধ হইয়া মারা যায় তাহা নহে। শতকরা ১২টি রোগীর মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য (Congestion of brain) শিক্কা সন্ন্যাসরোগ (apoplexy)। রোগীর পা ধরিয়া মাথাটা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ জ্বলাইয়া রাখিলে, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও সন্ন্যাস রোগ হওয়ার খুবই যে সম্ভাবনা ইহা কাহারও অবগিত নাই। এই কারণেই Lyon (ল্যন্) কিছুক্ষণ না লিখিয়া, few seconds (কয়েক সেকেন্ডকাল) লিখিয়াছেন, head little lower (মাথাটা পা হইতে সামান্য নীচু) লিখিয়াছেন এবং এই শব্দগুলি বাহাতে পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া না যায়, সেই কারণে মোটা অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। সারদাবাবু কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে উপায়টি কি তাহার বর্ণনা করেন নাই। শ্বাসপ্রশ্বাস স্থাপনের যে তিনটি উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে অল্পতঃ একটির বিশেষ রূপে বর্ণনা করা উচিত ছিল। আর একটি কথা এই যে, কতক্ষণ চেষ্টা করার পর রোগীর জীবন-আশা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহারও উল্লেখ করা উচিত ছিল। আমরা একঘণ্টার চেষ্টার রোগীর প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইতে দেখিয়াছি। রোগীকে যিরা বাহাতে লোকে জিভ না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করা উচিত ছিল।

এই তৎসল পুস্তক লিখিতে যেসকল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে করা—এখন ইহাতে যেসকল ভ্রম ঘটিয়াছে, তাহাদেরও ছুই একটির উল্লেখ করিব। সারদা বাবুর মতে সঁকল মশকই যেন ম্যালেরিয়ার বহন। আমরা কিন্তু এনোফেলীস্ (anopheles) নামক বিেষ একপ্রণীর মশককেই ম্যালেরিয়ার বাহন বলিয়া জানিতাম। সারদা বাবু বলিতেছেন—“যেসকল মশক ম্যালেরিয়ার বিষবহন করিয়া বেড়ায়, তাহারা ফেসকল ডিম পাড়ে, সেই ডিম ফুটিয়া যেসকল মশক হয়, তাহারা সকলেই

ম্যালেরিয়া বিষের আধার; উহাদের ধ্বশন কর্তৃক ম্যালেরিয়া বিষ মানবশরীরে সংক্রামিত হয়।” এই অভিনব তত্ত্বটি সারদাবাবুর নিজের না কোন পুস্তক হইতে সংগৃহীত? আমরা ত জানিতাম এনোফেলীস্-মশকেরা যতক্ষণ কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্তকে ধ্বশন করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহাদের মানবশরীরে ম্যালেরিয়া সঞ্চার করিয়া দিবার শক্তি জন্মাইতে পারেনা। সারদা বাবু দেখিতেছি cerebrospinal fever (মস্তিষ্কজ্বরের জ্বর) ও black fever (ব্ল্যাক্ ফিভার) এক মনে করেন। Sir Patrick Manson কিন্তু ব্ল্যাক্ ফিভার ও আসামের কালজ্বর এক বলেন। কালজ্বর যে সেরিত্রো-স্পাইডাল্ ফিভার নর, বোধ করি সারদা বাবু তাহা অস্বীকার করিবেন না।

এইসমস্ত ভ্রান্তি আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয় পুস্তকখানি কোন হিসাবেই গৃহস্থের পক্ষে সুবিধাকর হয় নাই। আমরা সারদা বাবুকে বার্ট সাহেবের কথাটি স্মরণ করাইয়া দিই—“Mere enumeration of sets of symptoms and treatments is unsatisfactory and impracticable.”

সারদাবাবু যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে তিনি বর্তমান পুস্তকখানিকে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া, চিকিৎসক-সহচর কি ভিষকবৃন্দ এইরূপ একটা নাম দিয়া প্রকাশ করুন, আর বার্ট, যুব প্রভৃতি এসিদ্ধ লেখকগণের পুস্তক অবলম্বনে, গৃহচিকিৎসা নাম দিয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে চেষ্টা করুন। আমরা তাঁহার ক্রমতার পরিচয় পাইয়াছি, চাই কি সকলকাম হইতে পারিবেন।

—ডাক্তার।

রাণী জয়মতী—

অবলাবান্ধব, শৈবাচরিত, প্রভাতকুমার প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত, কটন লাইব্রেরী, ঢাকা। ঢাকা, কাশী শ্রীশ্রী ওয়ার্কসে মুদ্রিত। ভবল জাউন বোড়শাংশিত ৪৬ পৃষ্ঠা। একখানি-চিত্র-সম্বলিত। মূল্য কাগজের বাঁধাই ১০ আনা, কাগজের বাঁধাই ১০ আনা।

আগামের নৃশংস রাজা চুলিক্কার অভ্যাচার হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভূজখন্ডিয়া রাজবংশের রাণী জয়মতী অপরূপ আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে প্রবাসীতেও এই কাহিনীটি সম্পর্ভাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল আখ্যানবস্তুর সাধুর্বা কাহ্নেই পাঠকগণের অনাধারিত নহে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে সে সাধুর্বার সারসংক্ষেপে গ্রন্থকারের নীরস ও একঘেয়ে বক্তৃতা-শ্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের আর প্রতিপৃষ্ঠাতেই সতীধর্ম-ব্যাখ্যানে গ্রন্থকারের কর্কশ বাগাড়ম্বর স্থান পাইয়াছে এবং তাহা আবর্জনার মত ঘিরিয়া ঘিরিয়া মূল আখ্যানটিকেও আবিল করিয়া তুলিয়াছে। বর্ণচ্ছেদ্র বিষয়ে গ্রন্থকার অজস্র কমাটিকের ব্যবহারে পাঠসৌকর্যের ব্যাঘাত এবং বিশেষণকে বিশেষ্যের লিঙ্গানুগত করিয়া স্থানে স্থানে ভাবার প্রতিকটু জন্মাইয়াছেন। রাণী জয়মতীর যে-চরিত্রাংশ লইয়া গ্রন্থের স্রষ্টা তাহা মোটেই পরিষ্কৃত হয় নাই। পাগলিনী-চরিত্রটির সমাবেশ বেখানী হইয়াছে—তাহার মুখের গান-গুলি পদ্মাকারে গজেন্দ্রও অধম। রাণী জয়মতীর স্বামী গদাপানি বীর না হইতে পারেন, কিন্তু যেজী তাঁহারই অস্ত্র নির্ঘাতনের কশাঘাত পূর্ত পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাকে স্বাকের হস্তে কেলিয়া রাখিয়া “চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কোথায় চলিয়া গেছেন”—এরূপ দুর্বলতার ক্ষিত্র মানবসমাজের অবোধ্য, হস্তরাজ জয়মতীর পবিত্র কাহিনীর সঙ্গে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত থাকি। দুঃখের। গ্রন্থের ছাপা মন্দ

নহে; বর্ডারগুলির অধিকাংশ বেমানান। গ্রন্থারম্ভেব চিত্রটি সাধারণ, তন্মধ্যে আবার জরমতীর মুক্তি “গালফুলো গোবিন্দেব না” পোছের।

শেরশাহ—

ঐতিহাসিকচল্ল বহু প্রণীত। ঢাকা, কটন লাইব্রেরী হইতে ঐশ্বরচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, কাশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ঐরাইমোহন সরকার দ্বারা মুদ্রিত। পাঁচখানি একরকের চিত্রবিশিষ্ট। ডবল ক্রাউন চতুর্ভুজাংশিত ৮১ পৃষ্ঠা। মূল্য সিন্ধ বাঁধাই ১০ আনা, কাগজে বাঁধাই ১০/০ আনা।

গ্রন্থারম্ভে “নিবেদনে” উল্লিখিত হইয়াছে—“বাহাবা ইতিহাসেব কথাব মধ্যে উপভাসের রস পাইতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য এই চিত্র অঙ্কিত হইল।” গ্রন্থকাবের একথা অপ্রকৃত নহে। প্রসিদ্ধ পাঠ্যবীর শেবশাহের দুঃখ বালাবহা হইতে বাহাদুরীলাভ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের প্রধান ঘটনাবলী এই পুস্তকে সবসমুদয় প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বহু মুদ্রাকর-প্রমাণ এবং বর্ণচ্ছেদাদি চিত্রের ক্রটি ঘটয়াছে; তৎসঙ্গেও পুস্তকখানি অশুপাঠ্য। তবে ইহার সমস্ত ঘটনা ইতিবৃত্তমূলক বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। শেবশাহ কর্তৃক কালিজয়দুর্গ অববোধসময়ে যে গোলন্দাজ তাঁহাকে বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্বক রোটাসগড় অধিকারসম্বন্ধে পূর্বকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া বাকদখানার আশুন লাগাইয়া দিয়াছিল গ্রন্থমধ্যে তাহার পরিচয় থাকি সঙ্গত। শেরশাহের মৃত্যুসময়ে শাহেন শাহ কর্তৃক যে গান গাহিতে পাইতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন তাহা উর্দু বা পার্শ্বভাষায় রচিত হইলে তৎসময়ের দৃষ্ট আরো একটু গভীর ও সুন্দর হইত। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে—সিফের বাঁধাইটুকুও মনোহর। ছবিগুলি বিশেষবর্জিত।

খাতির-নসারত।

গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ

(৩)

গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রধান প্রধান তারকাপুঞ্জের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলাম, এবং মাঘ মাসে নবগ্রহের স্থান পরিচয় প্রদান করিয়া দৃশ্যমান গ্রহ পাঁচটিকে আকাশ-গটে প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কালচক্রের আবর্তনে দেখিতে দেখিতে সেই স্বর্ণ সুযোগ চলিয়া গিয়াছে; প্রকৃতির অনন্ত বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে গগনগটেও বহুল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে।

(১) কয়েকটি গ্রহ ব্যতীত ঐ যে অসংখ্য তারকারাজি শোভা পাইতেছে উহা প্রত্যেকেই স্বপ্রকাশ—স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতিমান,—ঠিক আমাদের সূর্যের দ্বারা উহারাও একএকটি সূর্য। উহারা সৎলেই এক অদ্ভুত একতা-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। আজ উহাদের যেটি যাহার যেদিকে, যতদূর, দৃষ্ট হইতেছে

শতবর্ষ পরেও ঠিক সেইরূপই দৃশ্যমান থাকিবে। শুধু পৃথিবীর দৈনিক গতি বশতঃ বোধ হয় যেন উহাবাই দলবদ্ধ হইয়া প্রতিদিন পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার করিয়া আবর্তন করিতেছে; আবার পৃথিবী স্বীয় বার্ষিক গতিতে প্রতিদিন এক অংশ (degree) পরিমাণ পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া উহাবাই দৈনিক এক অংশ করিয়া পশ্চাৎ সরিতেছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। এইরূপে স্থির নক্ষত্রসমূহ (fixed stars) দৃশ্যতঃ একবর্ষে এক মহা-আবর্তন শেষ করিয়া স্ব স্ব স্থানে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

(২) পরন্তু গ্রহগুলি বিভিন্ন প্রকৃতিব। উহারা পর-মুখাপেক্ষী, পরাম্পরপৃষ্ট, পরাবীণ ব্যস্তির ন্যায়—একতার আদর জানে না; স্বজাতির সঙ্গে ত্যাগ করিয়া দুই চারিটা পারিপার্শ্বিক (satellites) সহ পরাম্পরগ্রহ লাভের জন্তই লালারিত হইয়াই যেন কখনও যুগ্ম, কখনও বা দ্রুত গতিতে, কখনও সরল, কখনও বা বক্র গতিতে অনন্ত আকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; একবার অল্পগ্রহ লাভ করিয়া বিশেষ দৃষ্টপৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হইতেছে, এবং পুনরায় নিঃপ্রাণ লাভিত হইয়া ক্ষীণকায়, ম্লান, ও বিষন্ন হইয়া পড়িতেছে। ৭ মাস পূর্বে সন্ধ্যার পর পূর্বাকাশে কৃত্তিকা-মোহিনী-পরিবারে যে মঙ্গলঠাকুরেব কথিতকাঞ্চনকান্তিতে মহাভেজা শনি মহাশয়কেও অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল, আজ তাঁহার অভিমুদ্রা উপস্থিত। ঐ দেখুন সাক্ষ্যগগনের পশ্চিম প্রান্তে সিংহরাশিতে ইনি কিরূপ ম্লানভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইহার সুন্দর নথর দেহ বিগুহ হইয়া গিয়াছে; বিশেষ লক্ষণ লোহিতকান্তি ব্যতীত দীনদশাগ্রস্ত মঙ্গল-ঠাকুরকে আর চিনিবার উপায় নাই। ঐ দেখুন ইহার পূর্বদিকের সিংহরাশিস্থ মধ্য নক্ষত্রের (Regulas) নিকটেই ইহাকে এখন নিশ্চয় হইতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঐ দেখুন পূর্বাকাশে আবার কিরূপ বিপরীত পরিবর্তন! সাত মাস পূর্বে উষাকালের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে বুধিকরাশিস্থ অগ্নিস্থলিঙ্গবৎ অমরাধার (Antares) সন্নিহিতে বৃহস্পতিকে দেখিয়াছিলেন। তখন ইহার প্রভা সাধারণ নক্ষত্রপ্রভা অপেক্ষা বড় বেশী ছিল না। আর, আজ সাক্ষ্যগগনের ঐ দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তেই চাহিয়া দেখুন, সেই বৃহস্পতির কি

শুভযোগ ঘটিয়াছে। সেই লোহিত-সুন্দর অমুরাধা স্বকীয় প্রভাতে সেই ভাবেই শোভা পাইতেছে বটে, কিন্তু সাময়িক অবস্থিতির অল্পবিধা বশতঃ বৃহস্পতি ঠাকুর আজ সূর্য্যদেব-প্রদত্ত শুভ জ্যোতিতে পূর্ণাবয়ব হইয়া হেমকান্তি অমুরাধার সৌন্দর্য্য-গর্ভে ধর্য্য করিয়া অতুল শোভায় আকাশপটের দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু “যেচে পাওয়া মান” ক’দিন চেষ্টা! দেখিতে দেখিতে (২১৩ মাস মধ্যে) দেবশুকও লঘু হইয়া পড়িবেন। ঠাকুরমাশয়ের এখনও বক্রগতি। ঐ দেখুন অমুরাধার নিকট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দূর পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। ২০শে শ্রাবণ এই বক্রতা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বদিকে অতি মন্থর-গতিতে সরিতে সবিতে তিন মাসে ৮° ডিগ্রি মাত্র অগ্রসর হইবেন। পক্ষান্তরে, ঐ যে পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যদেব ভীষণ-বেগে “সরিয়া” আসিতেছেন, ইনি এই তিন মাসে তিন রাশি (৯০°) অতিক্রম-পূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে তুলা রাশিতে উপস্থিত হইবেন। তখন বৃহস্পতির এই রক্তচন্দ্র সুন্দর ক্রমস্তি সৌভাগ্যে ক্রমশঃ মলিন হইয়া যাইবে, এবং আজ যে কারণে মঙ্গলও একরূপ অমঙ্গল, ৩ মাস পরে ঠিক সেই কারণেই বৃহস্পতির ও দুর্গতি কাটিবে। গ্রহগণের এইরূপ সাময়িক হ্রাস-বৃদ্ধি ও গতি-পরিবর্তন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, পরাধীন-জীবনে প্রতিপদে বিভ্রমণ ও লাজনা স্বর্গেও বৃদ্ধি স্বাভাবিক।

(৩) সূর্য্যকে আমবা যখন যে রাশিতে দেখিতে পাই পৃথিবী তখন বিপরীত দিকে তাহার সপ্তম রাশিতে অবস্থান করে। সুতরাং সূর্য্যের দিকে দৃষ্টমান গ্রহগুলি বস্তুতঃ পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে এবং তদ্বিপরীত দিকের গ্রহগুলি পৃথিবীর নিকটে আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইজন্যই সম্প্রতি মঙ্গলকে দূরগত বলিয়া ক্ষুদ্রতর এবং বৃহস্পতিকে সমীপাগত বলিয়া বৃহত্তর দেখাইতেছে। বহিঃস্থ গ্রহগণের (external planets) দৃষ্টমান হ্রাসবৃদ্ধি এই কারণেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

(৪) আভ্যন্তর গ্রহ (internal planet) বুধ ও শুক্রের হ্রাসবৃদ্ধি প্রধানতঃ চন্দ্রকলার জ্বায় বিভিন্ন রূপে সংঘটিত হয়। ইহাদের অর্দ্ধাংশ সূর্যালোকে সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইলেও অবস্থানবিশেষে বিভিন্ন সময়ে সেই অংশ অল্প বা

অধিক পরিমাণে আমাদের সম্মুখীন থাকে; তাহাতেই তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বুধ ও শুক্র যে-বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যের চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে, পৃথিবী-কক্ষ তাহাদের বহির্ভাগে অবস্থিত। বুধ ও শুক্র সূর্য্য কক্ষে বর্তাই পৃথিবীর নিকটবর্তী হইতে থাকে এইরূপে ততই তাহাদের আলোকিত অংশ ক্রমপক্ষে চন্দ্রকলার জ্বায় আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে তাহারা যখন আমাদের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়, অর্দ্ধাংশ পৃথিবী ও সূর্য্যের সংযোজক-রেখায় উপস্থিত হয় তখন আমাদের ঠিক সমক্ষে থাকিয়াও অমাবস্তার চন্দ্রের জ্বায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎপরে ইহারা ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে দূরগত হইয়া সূর্য্যের অপর দিকে সরিয়া যাইতে থাকে, এবং শুক্রপক্ষের শশধরের জ্বায় ইহাদের প্রকাশিত অংশ ক্রমশঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এইরূপে দিন দিন দীপ্তিময় অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও কিয়দ্দিন মধ্যেই অমিতপ্রভ সূর্য্যদেবের সম্মুখবর্তী হইয়া ইহাদের (পূর্ণচন্দ্রের জ্বায়) পূর্ণতাপ্রাপ্ত দেহমণ্ডলও একেবারে নিশ্চ্রত ও নির্দীপপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে। বুধ-শুক্রের এই “মোলকলার সর্ব্বনাশ” অমুরাধার করিলেও মনে হয়, পরাধীন, পরপ্রত্যাশীর অবিরত অবস্থাবিপর্দায় স্বর্গেও অপরিহার্য্য।

(৫) সম্প্রতি গ্রহ কয়েকটির অবস্থান (শ্রাবণের প্রথম ভাগে) এইরূপ—

(ক) বৃহস্পতি—বৃশ্চিকরাশিতে, ব্রহ্মাভ অমুরাধার উত্তরপশ্চিমে সন্ধ্যাকালে দক্ষিণপূর্ব্বাংশে দ্রষ্টব্য।

(খ) মঙ্গল—সিংহরাশিতে, মঘার সন্নিহিতে, সন্ধ্যাকালে, পশ্চিমাংশে দ্রষ্টব্য।

(গ) বুধ—সিংহরাশিতে, মঘার সন্নিহিতে, সন্ধ্যাকালে, পশ্চিমাংশে মঙ্গলের ৮° আটডিগ্রি পশ্চিমে দ্রষ্টব্য। ৮।১০ দিন মাত্র পরিষ্কার দেখা যাইবে। ১৬ই শ্রাবণ বক্রগতি অবলম্বন করিয়া কয়েকদিন মধ্যেই অদৃষ্ট হইবে।

(ঘ) শনি—বৃষরাশিতে, কৃত্তিকা ও বোহিণীর মধ্যস্থলে প্রত্যুষে পূর্ব্বাংশে দ্রষ্টব্য।

(ঙ) শুক্র—কর্কটরাশিতে, সূর্য্যের সম্মুখীন বলিয়া

অদৃশ্য। ভাঙ্গামাসের শেষাংশে কল্যাণাশিতে সন্ধ্যাতারারূপে পশ্চিমাকাশে দেখা যাইবে।

ত্রিগিরিশচন্দ্র দে।

“বাঙ্গালীর গ্রহণযোগ্য কি দেখিয়াছি”

নানাদেশের সাহিত্যে যেসব ভাল জিনিষ আছে, লোক-মুখে অলিখিত যেসকল গল্প প্রচলিত আছে, ইংরাজেরা সে সমুদয় অমূল্য করিয়া আপনাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছে। এইরূপ বাণিজ্যবীতি, শিল্পজ্ঞান প্রস্তুত করিবার প্রণালী, প্রভৃতিও তাহারা নানাদেশ হইতে শিখিয়াছে। ইংরাজদের দ্বারা পাশ্চাত্য অপরাপর জাতিরাও এই প্রকাণ্ডে অল্প জাতির জিনিষ আবশ্যকমত পবিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অমূল্যকরণ ও অমূল্যবণ প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসিতেছে।

আমরাও এইরূপে অল্প দেশের ও অল্পজাতির এবং ভারতবর্ষের অল্প প্রদেশবাসীদের অনেক জিনিষ লইয়াছি ও পাইয়াছি, আরও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা বিচার করিয়া লইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বাঙ্গালীরা ভ্রমণ করিয়াছে ও করিতেছে। আপাততঃ আমরা যদি ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে আমাদের গ্রহণযোগ্য কি আছে, তাহার আলোচনা করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইতে পাবে। এইজন্য আমরা পর্য্যবেক্ষণপটু প্রবাসীবাসীদিগকে এই কার্যে আমাদের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। যিনি যে প্রদেশে বাস করেন বা করিয়াছেন, তিনি তথাকার বিষয় লিখিবেন। সকলেই যে সকল বিষয়ে লিখিবেন, তাহা নয়; যিনি যাহা জানেন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই লিখিবেন। বঙ্গনারীর গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি আদি সম্বন্ধে প্রবাসিনী বঙ্গমহিলারা লিখিলে উপকৃত হইব।

কি কি বিষয়ে লেখা যাইতে পারে, মোটামুটি তাহার একটি তালিকা দিতেছি। এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। ইহা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে।

১। লেখক বা লেখিকা যে প্রদেশের বিষয় লিখিতেছেন, তথাকার সাহিত্যে ও লোককথায় বাদ্যলার অমূল্য করিবার মত কি কি জিনিষ আছে, এবং সম্ভবতঃ কাহার দ্বারা এই অমূল্য, ও সংগ্রহ-কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে? (ক) ঐ প্রদেশের ভাষার ক্রিয়াপদের গঠন, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, ইংরাজীতে which দিয়া বিশেষণ-বাক্য রচনার যে রীতি আছে তদ্রূপ কোন রীতি থাকিলে তাহা,—এইরূপ বিষয়ে অমূল্যকরণযোগ্য কিছু আছে কি না?

২। খাড়া।* ৩। রন্ধন।* (ক) একত্র বা একাকী আহার; (খ) খাইবার সময় উপবেশনের আসন, বসিবার রীতি, ইত্যাদি। ৪। (ক) পুরুষের পরিচ্ছদ, (খ) নারীর পরিচ্ছদ। ৫। স্নানের নিয়ম, স্থান ও রীতি। ৬। শৌচের স্থান, নিয়ম আদি। ৭। সামাজিক শিষ্টাচার, অভিমান-প্রণালী, ইত্যাদি। ৮। বিবাহের সম্বন্ধ স্থিতি করিবার সময় বা তৎপূর্বে বাহা করা হয়। (ক) কল্যাণ ও বয়স। (খ) বিবাহের বয়স। (গ) স্বস্তুরালয়ে বাইবাব বয়স। (ঘ) মাতৃস্বের বয়স। (ঙ) পূর্বরাগ। (চ) বরযাত্রীদের আচরণ এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহার। (ছ) দুই বৈবাহিক পরিবারের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও মনের ভাব। ৯। পর্দা। ১০। অবশুষ্ঠন। ১১। নারীর সম্মান বা অসম্মান। ১২। অন্তঃসম্বাবস্থায় নারীর যত্ন বা অযত্ন। ১৩। স্ত্রীকাপার ও তথায় নারীর প্রতি ব্যবহার। ১৪। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও সম্বন্ধ। ১৫। ব্যবসাবাণিজ্যের রীতি। ১৬। চাষের রীতি। (ক) জল তুলিবার ও সেচন করিবার রীতি। (খ) শুষ্ক ও চিনিব ব্যবসায়। ১৭। ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিল্পজ্ঞান প্রস্তুত করিবার রীতি। (ক) বস্ত্রবয়ন, ইত্যাদি। ১৮। মৃতের সৎকারে প্রতিবেশীর সাহায্য করা। ১৯। পঞ্চায়তদ্বারা নানাপ্রকার বিবাদভঙ্গন। ২০। সামাজিক শাসন। ২১। পূজাপার্কণ। (ক) সর্গসাধারণের উৎসব, যেমন রামলীলা। ২২। বারব্রত। ২৩। আতিথ্য। ২৪। অন্নসত্রাদি। ২৫। খেলা ও ব্যায়াম। ২৬। স্ত্রীনীতি

* কেবল উদ্ভবিকের রসমাতৃপুত্র স্ববিধা করিয়া দিবার জন্য কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। বলকারিতা, বাস্তবিকতা ও মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতে হইবে।



কাবুলিওয়ালা

- শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে।
চিত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয় একরূপ ভাবে গৃহ, বিশেষতঃ অন্তঃপুর, নির্মাণপ্রণালী। ২৭। বিস্তৃত পানীয় জল পাইবার উপায়। ২৮। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী। (ক) লিখিবার, সবজ্ঞান। ২৯। ধর্মশিক্ষা।

কোন বিষয় চিত্র দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে আমাদের কাছে ফোটোগ্রাফ বা অঙ্কিত ছবি পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে আমরা ফোটোগ্রাফ ও ছবিব খরচ দিব।

সম্পাদক।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

গত কান্ডন মাসের বদমর্শনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল “শিক্ষা, অশিক্ষা ও কৃষিক্ষা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা সাধারণের মধ্যে “শিক্ষা-বিস্তারের” চেষ্টা, বিশেষতঃ আইনের সাহায্যে লোককে জোর করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টার, বিরুদ্ধে লিখিত। বিপিনবাবু বলেন যে “এই চেষ্টার পক্ষে একটা অসত্য লুকাইয়া আছে।” “সে অসত্যটি এই যে বর্ণপরিচয় ও শিক্ষা, ইংরাজিতে যাকে লিটারেসি (literacy) ও এডুকেশন (education) বলে, এ দুই এক বস্তু। আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন ক, খ পড়িতে পারেন না, সত্যতঃ তাঁরা অশিক্ষিত। বিলাতেব শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী লোকে এ, বি, সি, পড়িতে পারেন, অতএব তাঁরা শিক্ষিত, এই একটা অসদ্যুক্তি এই সাধুচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অসদ্যুক্তি উপরে যে প্রবাস প্রতিষ্ঠিত, তাব প্রতিবাদ করা আবশ্যক।” “কথকেবা, কীর্তনোয়ারা, পুরাণাদি পাঠকেরা, সাক্ষাৎভাবে জন-সাধারণের মধ্যে যাইয়া, একই সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষা ও আমোদ প্রদান করিতেন। এই জন্ত আমাদের দেশে বর্ণজ্ঞান-অভাবেও কদাপি সংশ্লিষ্ট একান্ত অভাব হয় নাই।”

বিপিনবাবু শিক্ষা ও লিখনপঠনক্ষমতার যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অশ্রুতপূর্ব সত্য নহে। ইহা জানিয়াও আমরা সর্বসাধারণের মধ্যে লিখনপঠনক্ষমতা বিস্তারের সমর্থন করিয়া আসিতেছি। বিপিনবাবুর প্রবন্ধটি পড়িবার পরেও আমাদের মত সম্পূর্ণ অপরিণত রহিয়াছে। বিপিনবাবু যাহা বলিয়াছেন টিক্ সেইরূপ কথা সাব্ টি, ডব্লিউ হোল্ডার্নেস্, কে. সি. এস্, আই, (Sir T. W. Holderness, K.C.S.I.) প্রণীত “পীপল্ এণ্ড প্রব্লেম্ অব্ ইণ্ডিয়া” (Peoples and Problems of India) নামক পুস্তকে রহিয়াছে। যথা—

There is this to be said that the Indian peasant, though illiterate, is not without knowledge. He has been carefully trained from boyhood in the ritual and the religious observances of his forefathers. He hears the ancient epics read in their pithy vernacular form. He is full of lore about crops and soils and birds and beasts. In short, he is a disciplined intelligent person, moulded on a traditional system which, in spite of many defects, is not without its good points.

This is not an argument for withholding elementary education from him. But it explains why in rural India a knowledge of reading and writing may not be quite as indispensable as we with our Western ideas are disposed to assume.” Pp. 84-85.

পাঠক দেখিবেন এই ইংরেজ লেখক বিপিনবাবুর যুক্তি প্রবল করিয়াও বলিতেছেন যে “This is not an argument for withholding elementary education from him.” “ইহা ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার সপক্ষে প্রযুক্ত যুক্তি নহে।”

আমাদের দেশেব সাধারণ লোক নিরক্ষর হইয়াও বেরূপ শিক্ষা পায়, তাহা আমাদের দেশের একচেটির সম্পত্তি নহে। ঐ জাতীয় শিক্ষা মধ্যযুগে বিলাতেব সাধারণ লোকেবা mysteries এন্ড miracle-plays দেখিয়া শুনিয়া লাভ করিত, বর্তমান কালে হুইজার-লগেব ওয়ারপ্জামারগাউ গ্রামেব passion-play-ব মত নাটক দেখিয়া লোকেবা পায়, অতীতকালে ও বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য খৃষ্টানধর্মের লোকেরা সিন্ধায় উপদেশ শুনিবা পাইয়াছে ও পান, অতীতকালে ও বর্তমান সময়ে ম্যাজিক লঠন আদির সাহায্যে এন্ড চিত্রশালা ও ম্যুজিয়ম্ আদি দেখিবা পাইয়াছে ও পায়। তা ছাড়া, সকল দেশেই লোকে আত্মীয়বন্ধন ও প্রতিবেশীদের কাছে কত শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা কোন দেশেই উন্নত প্রণালীর কৃষি-শিল্পবাণিজ্যাদির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত, জাগতিক ব্যাপারের জ্ঞানলাভেব জন্ত, আত্মার বিকাশের জন্ত, সভ্যজাতিসকলের সহিত সমকক্ষতা করিবার জন্ত, যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আমাদের দেশেও যথেষ্ট নহে। কথকতা, কীর্তন, পুরাণাদি হইতে ভূগোল ইতিহাস, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষিচিহ্ন আদি কিছুই শিক্ষা করা যায় না। স্বাভাবিক কারণে, বিশেষতঃ আধুনিক সভ্যতাব বিপাকে পড়িবা, মানুষ কতপ্রকারে রুগ্ন হয় নিরক্ষর লোকে কথকতা আদি হইতে, এইসকল পীড়া হইতে আত্মরক্ষাব উপায় শিখিতে পারে না। সত্য বটে, কেবল অক্ষর-পরিচয় হইতেও উন্নতরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু অক্ষরপরিচয় জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দেয়। তাহাব পর যে বত অগ্রসর হইবে, সে তত জ্ঞান লাভ করিবে।

বিপিনবাবু অক্ষরপরিচয় ব্যতিরেকেও আমাদের দেশের লোকেরন যে প্রকার শিক্ষা আছে বলিয়াছেন, অক্ষর পরিচয় হইবামাত্র সে শিক্ষা ত লুপ্ত হইবে না। অক্ষর পরিচয়ও হউক, সে শিক্ষাও থাক্। তাহাতে আপত্তি বা কতি কি? তত্ত্ব, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আজকাল কথকতা, কীর্তন, পুরাণপাঠ, ক্রমশঃ কমিবা আসিতেছে অনেক স্থানে উহার অস্তিত্বও নাই। এই হ্রাসের ও লোপের প্রতি কারার্বও কি কেতাবী শিক্ষাব প্রয়োজন নাই?

কথকতা আদি হইতে হ্রাসের শিক্ষা এবং ভাবেব পরিপুষ্টি হইয়াছে ও হইতে পারে, যদিও তাহা কখনও যথেষ্ট পরিমাণে হয় নাই, এবং তাহার সঙ্গে অনেক কুসংস্কার মনোমধ্যে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু যেসকল লৌকিক বিষয়ের জ্ঞানের অভাবে আমাদের চাষা ও নানা শ্রেণীর কারিগরদের পাশ্চাত্য চাষা ও কারিগরদের সহিত প্রতিযোগিতা পরাস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেসকল জ্ঞান কথকতা আদি হইতে কখনই পাওয়া যাইতে পারে না। অথচ, কিছু কেতাবী শিক্ষা ব্যতীত এইরূপ লৌকিক জ্ঞান লাভ করাও যায় না।

এইধানে আমাদের একটি সংশয়ের কথা উল্লেখ করিব। আমাদের দেশের যেসকল শিক্ষিত লোক জনসাধারণকে লিখন পঠন শিক্ষা

দেওয়ার বিবোধী, তাঁহারা নিজের সম্ভানদ্বিগকে কেন লেখাপড়া শিখান? কথকতা আদি হইতে শিক্ষাই যদি যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ সম্ভানদ্বিগকে নিরক্ষর করিয়া রাখিয়া কেবল কথকতা, কীর্ত্তন, পুরাণাদি গুনান না কেন? তাঁহারা হয় ত বলিবেন, “লিখন-পঠন আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্ত ভাল ও আবশ্যিক; কিন্তু সাধারণ লোকদের সম্ভানদের জন্ত অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর।” এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, সাধারণ ও অ-সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় কেমন করিয়া কবি? দুই উপায়ে করা যাইতে পারে; (১) ধনের দ্বারা, (২) জ্ঞানের দ্বারা। ধনের দ্বারা বিচার করিলে বড় মুন্সিবে পড়িতে হয়; কারণ আমাদের দেশে ও সকল দেশেই কৃতকর্ম্ম জ্ঞানপিপাসুদের মধ্যে গরীবের ছেলেই বেশী। স্বত্বাং, দরিদ্রলোকেরা সাধারণ লোক এবং ধনীরা অ-সাধারণ লোক, ইহা বলিবার উপায় নাই। জ্ঞানের দ্বারা বিচার করিতে গেলেও বিপদ। কোন্ জ্ঞানের নীচে বেধা টানিবে? কুক্কাস পাল ও মহেন্দ্র-লাল সরকার লেখাপড়া শিখাব তাঁহাদের বা দেশের কি অনিষ্ট হইয়াছে? ব্রজেননাথ শীল লেখাপড়া শিখার তাঁহার বা দেশের কি অনিষ্ট হইয়াছে? এলাহাবাদে সবকারী হিসাববিভাগে একজন এম্. এ. পাশকরা ভদ্রলোক উচ্চবেতনের চাকরী করেন। তিনি মুচিছাত্রী। বঙ্গদেশে ডাকবিভাগে একজন উচ্চপদস্থ ধোপাজাতীয় ভদ্রলোক কাজ করিতেন। বঙ্গদেশে শিক্ষিত নমঃপুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, চিকিৎসক, সংবাদপত্র-সম্পাদক আছেন। ইহাতে এইসকল লোকের বা দেশের কি অপকার হইয়াছে? অতএব দেখা গেল যে কোন দিক্ দিয়াই এক একটা শ্রেণীর লোককে সাধারণ এবং অশ্রু কোন শ্রেণীর লোককে অ-সাধারণ বলিবার উপায় নাই। বিরুদ্ধবাদীদের শেষ মুক্তি এই হইতে পাবে, যে, লিখনপঠন দ্বারা কৃষক, দৈহিক ও শ্রমজীবী প্রভৃতির কার্যক্ষমতা কমিয়া যাইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও জাপানে সাধারণ লোকদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া দেখা গিয়াছে যে সেইসকল দেশের চাষা ও কারিকরদের শ্রমসামর্থ্য ও দক্ষতা কমে নাই, বরং তাহারা প্রাচ্য নিবাসর চাষা ও শ্রমিকদিগকে পরাস্ত করিতেছে।

তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের দেশের কোন কোন লিখনপঠনক্ষম শিক্ষিত ব্যক্তি জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইবার বিরোধী, অথচ তাঁহারা নিজ নিজ সম্ভানদ্বিগকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন। এই অসঙ্গতির কারণ নির্দেশ কেমন করিয়া করা যাইবে? এইসকল লোকদের মতামতের স্থা নির্ণয় করা বড় কঠিন।

বিপিনবাবু বলেন, “যদি অশ্রু দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা যায়, তবে আমাদের দেশের সাধারণ লোক যে অপর দেশের সমশ্রেণীর লোক অপেক্ষা কোনো বিষয়ে হীন বা অজ্ঞ, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না।.....তাঁরা যেমন তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কথা জানেন ও বোঝেন; আমাদের দেশের সাধারণ লোকেও তাঁদের নিজেদের কাজকর্ম্মের কথা তেমনই জানেন ও বোঝেন।.....কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য দ্বারাই শিক্ষার পার্থক্য বোঝার। আর এই বুদ্ধির মাগেই পরস্পরের শিক্ষার ওজন করিতে হইবে।.....আর এই মাগে যদি বিলাতের সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের সাধারণ লোকের তুলনা করা যায়, তবে যে বিলাতের দিকে দাঁড়িপাল্লাটা কণামাত্রও ঝুঁকিয়া পড়িবে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কণাপি এ কথা স্বীকার করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।” “যে কথা আমাদের তথাকথিত অশিক্ষিত লোকেরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝ করিয়া ধরিতে পারেন, ইংরেজ সমাজের জনসাধারণের কথা দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত কৃতবুদ্ধি লোকেও সেসকল কথাই সে পরিমাণে বুদ্ধি-নিবেশ করিতে পারেন কি না সম্ভেই।”

আমাদের মনে হইতেছে যে বিপিন বাবু আমাদের দেশের সাধারণ লোকদিগকে একটু বেশী মাত্রায় idealize করিয়া কেলিয়াছেন। নতুবা তিনি কখনই একথা বলিতেন না যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা অশ্রু কোনো দেশের ঐ শ্রেণীর লোকদের চেয়ে “কোনো বিষয়ে” হীন বা অজ্ঞ নহে। বাহা হউক তাঁর সমুদয় ভ্রম প্রদর্শন বা দুর্বল বুদ্ধি ধণ্ডন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সেইজন্য, কেবল আমাদের সাধারণ লোকদের “দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের” কথাই জিজ্ঞাসা করি। তাহা-দ্বিগকে যে প্রবন্ধক মহাজনেরা ঠাকুর ও চিরঞ্জী করিয়া রাখে, বেলগরে শ্রেনে দুই লোকেরা ঠাকুর; অত্যাচারী জমিদারের লোকেরা ঠাকুর ও উৎপীড়ন করে; হুগির আড়কাটিরা ঠাকুরী পণ্ডর মত, পণ্ডরবোর মত, দেশবিদেশে, দাসত্বচুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া, চালান দেয়; সামান্য প্রায় চৌকিদারের ভয়েও যে তাহারা তটস্থ; এইসকল বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে বিপিনবাবুর ধারণার সামঞ্জস্য বিধান কেমন করিয়া করিব জানি না। আমাদের বিশ্বাস এই যে তাহারা লেখাপড়া জানিলে নিশ্চয়ই এমন অনেক স্থলে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, যেরূপ স্থলে এখন তাহারা তাহা করিতে পারে না।

আমরা বিপিনবাবুর মত অনুসারে ধরিয়া লইলাম যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা কৃতবুদ্ধি ইংরেজের চেয়েও বুদ্ধিমান। তাহা হইলে ত তাহাদিগকে খুব বেশী করিয়াই লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া দরকার। কবিণ তাহা হইলে আমরা সহজেই বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস শিল্প আদিতে ইংরেজদিগকে পরাস্ত করিতে পারি। সে আশা বা ইচ্ছা না হয় নাই করিলাম। বিপিনবাবু ত একথা বলেন নাই যে লেখাপড়া শিখিলে বুদ্ধি কমিয়া যাব, স্বতরাং যখন সে ভয় নাই, তখন আমাদের দেশের সাধারণ লোককে লিখনপঠনক্ষম করার ক্ষতি কি? তাহাদের চিন্তার, কল্পনার ভগ্নকে বৃহত্তর করিয়া দেওয়ার ক্ষতি কি? জ্ঞানমন্দিরের এক একটা চাবি তাহাদিগকে দেওয়ার ক্ষতি কি? দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-ভয়, ভাবনা, আশা প্রেমের অতিরিক্ত উচ্চতর ও উদারতর, মহত্তর ভয় ভাবনা, আশা, প্রেম, তাহাদিগকে দিতে পারিলে ক্ষতি কি? দশ বিশ হাজার নিরক্ষর লোকের সম্ভানকে লিখনপঠনক্ষম করিতে করিতে হঠাৎ যদি একটি প্রতিভাবান্ হলে বা মেবে হুযোগ পাইয়া সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিল্পী, বা বদিক্ হইয়া উঠে, তাহাতে ক্ষতি কি?

“যদি বুদ্ধির ভীক্ষতা, চরিত্রের বৈধে ও সংযম, মনের বল, জ্ঞানের উদারতা ও চালচলনের শোভনতা, শিক্ষার প্রামাণ্য হয়, তবে এসকল বিষয়ে যে আমাদের পূর্বকাল “অশিক্ষিত” ভদ্রমহিলাগণ কোন অংশে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা হীন ছিলেন না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।”

বিপিনবাবুর প্রবন্ধটির অশ্রু অনেক স্থলে যেমন এখানেও তেমনি, সম্ভবতঃ ইচ্ছাপূর্বক নব, প্রাকৃত জনের বাহবা পাইবার (playing to the gallery) চেষ্টা রহিয়াছে। বাহারা নতুন কিছু করিতে চাহ, সকল দেশেই চিরকালই অতীতের বা বর্তমানের বড়াই তাহাদের পথে একটা মহা বিঘ্ন। আমরা কিন্তু বিপিনবাবুর অতীত-গোরখ-উদ্দীপনার কাঁদে পা দিতে চাই না। আমরা পূর্বকাল ভদ্রমহিলাদের গোরখের কিছুই লাব্য করিতে চাই না। আমরা বুদ্ধির ভীক্ষতা, চরিত্রের বৈধে ও সংযম, মনের বল, জ্ঞানের উদারতা ও চালচলনের শোভনতা, প্রবীণ ও নবীনা সকলের মধ্যেই দেখিতে চাই এবং দেখিয়াছি। “ছাপার হবক” এইসকল সদৃশ ও শক্তি নষ্ট করিবেই করিবে, এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। স্বতরাং পূর্বকাল নিরক্ষর পুরনারীদের কতকগুলি সদৃশ ছিল বলিয়া এখন বালিকা ও নারীদিগকে পুস্তকের সাহায্যে শ্রাটীন ও আধুনিক

জ্ঞান দিতে হইবে না, একপ মনে কবিবাব কোন কারণ দেখিতেছি না।

“বিলাতে যে সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে তার পশ্চাতে ইংরেজ সমাজের একটা স্বাভাবিক ও সহজ প্রয়োজন উপস্থিত ছিল। সে প্রয়োজন দুই দিক দিয়া উপস্থিত হয়। এক দিকে যখন কলকারখানার উদ্ভিষ্ট আরম্ভ হইল, তখন এইসকল কলকারখানায় যেসকল শ্রমজীবী কাজ করিতে গেল, তাদের বর্ণপরিচয় আবশ্যক হইয়া উঠিল। কলমবের বিধিনিষেধাদি মূখে বলিয়া, ক্ষণেক্ষণে এত লোককে তাহে ব্যবস্থা বোঝান অসম্ভব। তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া, মুদ্রিত ইত্যাহাব ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা একজ্ঞ কবা সহজ দেখিয়া, মহাজনেরা আপনাদের ব্যবসায়ের খাতিরে নিজ নিজ অধীনস্থ শ্রমজীবীদিগকে বর্ণজ্ঞান শিখাইতে আবশ্য করিলেন।—অল্প দিকে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সকলকেই একটু লেখাপড়া শিখানো আবশ্যক হইল।”

তাহাব ভাল লাগুক বা না লাগুক, বিপিনবাবু জ্ঞানেন যে আমাদের দেশে ক্রমশই কলকারখানা বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাতে হাজার হাজার মজুর কল কবিতোছে। বিলাতে যে কারণে মজুর শ্রেণীর লোককে লেখাপড়া শিখান দরকার হইয়াছে, এদেশে ঠিক সেই কারণেই কেন তাহাব প্রয়োজন হইবেনা? তাহাব পব বাল্লীর প্রয়োজনের কথা। আমাদের দেশেও গ্রামপঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন, মিউনিসিপালিটি লোকাল ও ডিস্ট্রিকটবোর্ড, প্রভৃতিব নানাবিধ ক্ষুদ্র অধিকার, নানাপ্রকার টাক্স, হবেক রকমেব বিধি নিষেধ আছে। (ব্যবস্থাপক সভাসভার সভানির্বাচনের কথা না হয় ছাড়িয়াই থালাস, কাণব তাহার সহিত সাধারণ লোকদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই।) এইজন্য সকলেবই কিছু লেখাপড়া জানা ভাল। তত্ত্বির আরও দুই একটি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেব কথা বিপিনবাবু অবগত নহেন। আমরা সংবাদ-পত্রাদিতে বাল্লীর ব্যাপারসকল সম্বন্ধে যেসব মতামত প্রকাশ করি, রাজপুস্তকেরা সেসব এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন যে সেসব জনকতক শিল্পিত বাবুব মত মাত্র; দেশের অধিকাংশ লোক নিবন্ধর, তাহারা ওসব মতের কোন ধার ধারে না। অতএব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের মতকে দেশেব মত করিতে হইলে এবং দেশের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে, দেশের নিবন্ধর লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম কবা আবশ্যক নহে কি? তারপর, ভাবতবর্ষকে কেন যে উপনিবেশগুলির মত বা কিছু কম পবিমার্গেও স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া হয় না, রাজপুস্তকেরা তাহার একটি কাণব এই দেখান যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নিবন্ধর দেশ। সাব এণ্ডু ফ্রেজার বন্ধের ছোটলাট-পিবি হইতে অবসর লইয়া গিয়া বিলাতের নাইটিঙ্ক সেকুরী পত্রিকা এক প্রবন্ধে ঠিক এই মুক্তি প্রবেগ করিয়াছিলেন। হুতবাং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও আমাদের দেশে সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তন কবা কি আবশ্যক নহে?

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখা গিয়াছে যে নিবন্ধর লোকেরা, বাবুরা বন্দেমাতব্য বলিয়া পাণ্ডুরা আদি দুর্মূল্য কবিতা দিয়াছে, এইকণ অমূল্য কথা এচাও বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু লেখাপড়া-জানা লোকেরা এগুণ কথা বলে নাই, বিশ্বাসও করে নাই। এবিধ ব্যাপার হইতে লেখাপড়া শিক্ষাব প্রয়োজনীয়তার কি কোন পরোক্ষ প্রমাণ বাওয়া যায় না?

বিপিনবাবু বলেন, যে, বুদ্ধিযুগে ও বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে লোকে “ভিতর হইতে প্রয়োজন” অনুভব কবিতা লেখাপড়া শিখিয়াছিল। বাহা হউক, এতক্ষণ পরে একটা অভয়বাপ্তি গুলিয়ার। এখন যদি কেহ বা কোন সম্ভাব্য ভারতের লোককে লেখাপড়া

শিখিবাব “ভিতর হইতে প্রয়োজন” অনুভব কবাইতে পারেন, তাহা হইলে বিপিনবাবুর আপত্তি থাকিবে না।

“বিলাতে..... এই সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের কলে, একদিনে যেমন দেশেব প্রায় সকল লোকই লিখিতে পড়িতে শিখিতেছে, সেইকণ অন্তরিকে, সমগ্র সমাজেব বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমশঃ স্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে।”

সার্বজনীন শিক্ষা জাগরণী, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশেও আছে। সেখানকাব লোকেব বিদ্যাবুদ্ধিও কি ক্রমশঃ স্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে? আমাদের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিবার একটি কাণব আছে। বিপিনবাবু বলিতেছেন যে এই স্রিয়মাণ হওয়াটা “এই সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের কলে” হইতেছে। যদি বাস্তবিক এইকণ একটি কার্যকাণব সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে “এই সার্বজনীন শিক্ষার ফলে” ফ্রান্স, জার্মেনী, প্রভৃতি দেশেও বিদ্যাবুদ্ধি নিশ্চয়ই স্রিয়মাণ হইতেছে। তাহা হইলে, বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পাদির ক্ষেত্রে যেসকল আবিষ্কার, যে উন্নতি হইতেছে, প্রতি সপ্তাহে যেসকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহিব হইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ নিবন্ধর ভাবতবর্ষ, আফগানিস্তান, নিগ্রোদের দেশ, প্রভৃতিব মস্ত্রিক হইতে প্রসূত হইতেছে। হইতে পারে যে বর্তমান সময়ে ডাকইন, হার্বার্ট-স্পেন্সারের মত জ্ঞানী জীবিত নাই, কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে বিদ্যাবুদ্ধি স্রিয়মাণ হইতেছে। যদি তাই হয়, তাহা হইলেও সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে সেই কুলটা চাপান উচিত নয়। অতিবিস্তার সাক্ষাৎবুদ্ধির চেষ্টা অর্থলালসা ও বিলাসভোগলালসাব কারণেব বিস্তৃত হওয়া উচিত নয়।

“ইংরাজী সাহিত্যের বর্তমানে যে অধোগতি দেখা বাইতেছে, এই সার্বজনীন লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা তাহার অন্ততম প্রধান কাণব। সাহিত্য পূর্ককালে সাহিত্যিকের আত্মবিকাশেই আপনাব চরম সার্থকতা অন্বেষণ করিত। যাঁরা গ্রন্থাদি রচনা প্রবৃত্ত হইতেন, দ্বারিয়া অনেক সময়েই তাহাদের নিত্যমহচর ছিল। সাহিত্য তখন সাধনাবপে গৃহীত হইত। অর্থোপার্জননের কামীতে পরিণত হয় নাই। ...গ্রন্থরচনা এখন একটা ব্যবসায়ের মত হইয়া উঠিয়াছে।.... এইজন্য ইংরাজী সাহিত্য ক্রমশই অতিশয় লঘু হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে সমাজের চিন্তাশক্তি হ্রাস ও রুচি বিকৃত হইয়া পড়িতেছে।” বিপিনবাবু এখানে এতবড় একটি বিষয়ের অবতারণা কবিয়াছেন যে তাহাব সমুদ্র কথা পরীক্ষা করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বাহা হউক, আমরা সংক্ষেপে দু একটি কথা বলিতেছি।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দশম সংস্করণের ৩০শ ভাগ্যমের গোড়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক অগাস্টিন বিরেল একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে :—“The booksellers of the 17th and 18th Centuries were every bit as anxious to make money for themselves and their families as any publisher today can be. and as for the authors, they did the best they could for themselves. Some of the worst of them made a great deal of money, and some of the best of them very little, and people complained then just as they do now of the degeneracy of the times and the vulgarity of the age. Indeed, before the age of printing, and when “the trade” was engaged in selling manuscripts, employing in Paris and Orleans alone ten thousand copyists, doleful cries resounded in University and Church circles as to the evil consequences of cheap learning and unlicensed reading.”

স্বত্বাং দেখা যাইতেছে যে কোন যুগেই সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবসাবুদ্ধিৰ অভাব ছিল না, কোন যুগেই সমৃদ্ধ বা অধিকাংশ ঐচ্ছিক সাহিত্যক্ষেত্রে "সাধক" ছিলেন না; অর্থলোলুপ লেখক আগেও ছিল এখনও আছে। প্রভেদ এই যে, পুস্তক মুদ্রণের উপাধি সহজতব এবং পাঠকসংখ্যা অধিকতর হওয়ার পূর্বাপেক্ষা এখন সাহিত্যিকেরা বেশী টাকা বোজগার কবিত্তে পারেন। বিরেল সাহেবের কথা হইতে ইহাও প্রমাণ হয় যে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের পূর্বেও সমসাময়িক সাহিত্যিক স্বল্পকটির কথা এবং সন্তাষ লেখাপড়া শিকার কুশলেব কথা তখনকার মার্জিতরূপে শিক্ষিত লোকেরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন। এইজন্যই এই প্রসঙ্গে বিবেল সাহেব বলিয়াছেন, "There is nothing new under the sun." বিরেল আরও বলেন—

"The activity of the press is not confined to the production and distribution of newspapers and periodicals. It also turns out, by the million, popular books at democratic prices. This cheapening of books is one of the great facts of the age. For a penny a piece may be bought no inconsiderable number of books, and among them are included some of the most famous in the world, whilst any one who is prepared to give sixpence a copy may include in his library almost everything that is really worth reading in the English tongue, whether grave or gay, in verse or prose."

যদি ইংরেজদের অধিকাংশেরই কচি বিকৃত, বিভাবুদ্ধি শ্রিমাণ, ও চিন্তাশক্তি কম হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এই লক্ষ লক্ষ "really worth reading" বহি কে কিনিতেছে? এবং কেহ না কিনিলে পুস্তকব্যবসারীরা ছাপাইতেছে কেন? বেশী লোক পড়ে বলিবা বহি সব সস্তা হইতেছে, এবং বহি সস্তা হওয়ার ফল, বিবেলের মতে—

"Cheap books disseminate the habit of reading, circulate the knowledge that there is pleasure to be got out of books, stimulate the desire of a wider range of study, contribute to the refinement of the race, and so affect the conditions under which books are produced and distributed."

অতএব, সার্বজনীন শিক্ষা, সস্তা বহি, জাতীয় প্রকৃতি মার্জিত হওয়া, এই তিনটির কিছু পরস্পর সম্পর্ক আছে দেখিতেছি। অবশ্য জনসাধারণ যে সকলের সেয়া বহিগুলিই পড়ে তাহা নয়। কিন্তু তাহারা যে পড়ে না, তাহার কারণ বিরেল বলেন, Scanty leisure, exacting labour, distressing tedium! "To expect this crowd to devote its scanty leisure, gained after hours of exacting labour or distressing tedium, to the perusal of masterpieces is unreasonable. To hard-working men and women, and, unfortunately we must add, to hard-working children, reading can never be more than a pastime competing with many other pastimes."

অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রমজীবীরা একটু বেশী অবসর পাইলে, তাহাদের শ্রম এখনকার মত হাড়ভাঙ্গা না হইলে, তাহাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়িবার সজ্জাবনা। তাহাযু দিন দিন চলবদ্ধ হইয়া তাহাদের

পরিশ্রমের সময় কমাইয়া ও বেতন বাড়াইয়া লইতেছে। ইতরাং এই সজ্জাবনা নিকটতর হইয়া আসিতেছে। এই সজ্জাবনার একটা পরোক্ষ প্রমাণ বিবেলের লেখা হইতে পাওয়া যায়। বিলাতেব মধ্যবিত্ত লোকদের অবসর শ্রমজীবীদের চেয়ে বেশী, শ্রম তাহাদের মত হাড়ভাঙ্গা নহে। ইতরাং তাহারা কেমন উন্নতি করিয়াছে, দেখুন :—

"It is sheer ignorance to suppose that the Act of 1870 [the Elementary Education Act,] and the splendid work of the best School Boards, although confined to what is called "Primary Education," have not had a great effect upon the intelligence of the middle classes... no inconsiderable portion of this class... have gone steadily on their way, reading good books, attending lectures, making notes, curing their defects, enlarging their horizons, and purifying their tastes, until, far short as they still may be of perfection, they can hardly be said to be far behind their critics, ... In proof of this improvement I can appeal to the private libraries of the land. In the 'forties and 'fifties of the last century the books in too many middle-class homes were a doleful crew,.... Now the blessed change! In countless households scattered up and down the country intelligent students are to be found of Chaucer, of Spenser, of Shakespeare. Modern editions of Bacon's Essays, the *Anatomy of Melancholy*, ... of Montaigne's *Essays*, of Jeremy Taylor's masterpieces, of Milton's prose, are as plentiful as blackberries in September. The Waverley Novels take the field almost every year in some fresh guise..... Charles Lamb is among the lares and penates of Great Britain; Hazlitt has come to life again..... England is now full of good editions of good books, and the demand for them increases."

অতএব, সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে (১) বিলাতেব সাহিত্যের অস্তিম কাল এখনও বনাইয়া আসিতে দেখি আছে। কেননা ভাল বহির চাহিদা বাড়িতেছে (the demand for them increases)। আশাযেব সম্ভাবনা দীর্ঘ হইবা গেল। এখন সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে (১) বিবেল সাহেবের অবশেষের শেষ কব পাক্তিতে যে আশার বাগ্মি আছে তাহাই উদ্ধৃত করি।

"An age of widespread diffusion of knowledge can hardly present a romantic aspect. A dungeon is more romantic than a school. Large masses of people, necessarily very imperfectly educated, but with a great conceit of themselves, all eager to know and discuss results, and to experience new sensations, are not likely at first to throw their influence on the side of the things that are "quiet, wise, and good." Dwellers in great cities and in populous and half-educated countries must learn to put up with a great deal of noise of all kinds. It is absurd to be too sensitive. Every thing runs its course. After contemplating the changed

conditions of modern literature, we may congratulate ourselves that wherever we look we see all the symptoms of life and activity in a people striving to get quit of the clogs of ignorance and to enter upon the glorious inheritance that belongs by right to every cultivated intelligence."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজের বিভা-
বুদ্ধির অবস্থা সম্বন্ধে বিপিনবাবু যে সূত্রে কথা বলিয়াছেন, বিরেল
সাধেব সে সূত্রে বলেন নাই। সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের পূর্বেও
সাহিত্য কখনও উন্নত, কখনও অবনত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই
বলিয়া অবনতির সম্বন্ধ ইহা মনে করা উচিত নয় যে অল্প সাহিত্যিক
প্রতিভা ও সাধনা দেখা দিবে না।

সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে বিপিনবাবু চৈত্রমাসের বঙ্গবর্ধনে "জবর-
দত্তির লেখাপড়া" নাম দিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা
নানা অবস্থার কথাই আলোচনার পূর্ণ। এই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই
যে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর কবিতা তাহার মঙ্গল করা যায় না;
কাহারও ভাল করিতে হইলে তাহার প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুণকরী
শক্তিকে ফুটাইয়া ফুলাই দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ ইহা সত্য। কিন্তু
কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে হইবে না, ইহা
যদি সত্য হয় তাহা হইলে আর প্রত্যেক পরিবারে যে কখন না কখন
পাঠে অনন্যোযোগী শিশু-ক ছোর করিয়া হাত ধরিয়া পড়িতে বসাইতে
হয়, প্রত্যেক ঘরে অপরাধী লোকদিগকে ছোর করিয়া কয়েদ করা
হয়, প্রত্যেক শহরে অনেক পৌরসভাকে শাস্তি বা জরিমানার ভয়
দেখাইয়া রাজ্যশাসিত অপরিসীম করা হইতে বিরক্ত রাখা হয়, তাহা কি
অজ্ঞান না অন্তর্ভুক্ত? বাস্তবিক বিপিনবাবুও এরূপ মনে করেন না।
কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "পিতামাতা একান্ত অক্ষম বা নিতান্ত
কর্তব্যবিমুখ হইলে, ফটৎ কোথাও সমাজ এ ভার [অর্থাৎ "সনাতন-
সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদাতার ব্যবহার" ভার] স্বহস্তে গ্রহণ
করিতেও পাবেন, সত্য। কিন্তু এই রূপে, বাহা কেবল একটা
সার্বজনীন বিধানের বিরুদ্ধ ব্যতিক্রম থাকে উচিত, তাহাকেই সনাতন
বিধানরূপে সমাজে প্রবর্তিত করিলে, সমাজের পক্ষেই আশঙ্ক্য করা
শেবে দায় হইয়া উঠে।" বিপিনবাবু যদি দ্বন্দ্ব করিয়া শ্রীযুক্ত সোমলের
প্রাথমিক শিক্ষা আইনের পাণ্ডুলিপি ধরাশুলি পড়েন, তাহা হইলে
দেখিতে পাইবেন যে তাহাতে কেবল "বিরল ব্যতিক্রম" মনেই
সামান্য রকমের "জবরদস্তি"র ব্যবস্থা আছে; উহাতে জবরদস্তিটাকেই
"সনাতন বিধান" করা হয় নাই। সুতরাং বিপিনবাবুর এই প্রবন্ধ
কান্নিক শব্দের সহিত হুঙ্কার। তিনি বিলাতে কোন কোন স্থলে
সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার চেষ্টার যে পরিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার
কথা লিখিয়াছেন, সে ক্ষমল অভিনিবেশ পরিবারগুলির অবস্থার
উন্নতির সহিত লয় পাইবে। এই উন্নতির চেষ্টা বিলাতে থুই হইতেছে।*

কষ্টিপাথর

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (জ্যৈষ্ঠ)।

আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—

প্রাচীনতম বেনময়ে যে সভ্যতা কথঞ্চিৎ অভিযুক্ত মাত্র, কতদিনে
এক কি প্রকারে ভারতবর্ষে উহার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এখনও
পর্যাপ্ত জ্ঞানিতে পারা যায় নাই। বাহারা কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদ
পণ্ডিত, কদাচ তাহাদের দ্বারা প্রাচীন যুগের সভ্যতার বয়স নির্দিষ্ট
হইতে পারে না। ভাষাতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধানের ফল সংগ্রহ করিয়া
যখন মানবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা (anthropologists) এ ক্ষেত্রে অন্বে-
ষণ হইয়াছেন, তখনই গুপ্ত কল ফলিয়াছে। মানবতত্ত্ববিদেরা যত্নপূর্ব্বক
ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই মিসরের ঐতিহাসিক সভ্যতা
১০,০০০ বৎসরের কম প্রাচীন নয় বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখনও পর্যাপ্ত ভারতবর্ষে ভাল করিয়া ভূ-স্তর
পরীক্ষা কার্য আরম্ভ হয় নাই। ১০,০০০ বৎসরের পূর্বে হইতে
প্রাচীন দিকে ৭০,০০০ বৎসর পর্যাপ্ত যে ভারতবর্ষে মানবলীলা অভিনীত
হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। ক্ষ
প্রাচীন যুগের নরকঙ্কাল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া Rhys, Beldc,
Keane প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইউরোপের
অধিবাসীরা কোন আৰ্য্যজাতির বংশধর নহেন। ইহাচীন প্রস্তাব-
যুগে ইউরোপে বাহারা বাস করিত, তাহারা নবপ্রস্তাবযুগে এশিয়া
হইতে আগত জাতিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া ঐতিহাসিক যুগের
পূর্বেই যেসকল নতুন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল, একালের ইউরোপীয়রা
সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই বংশধর। যেসকল জাতির মধ্যে আটভাগ
প্রচলিত হইয়াছিল তাহারা কখনও মূলতঃ আৰ্য্যজাতি ছিল না; আট
সভ্যতা তাহাদের 'ধার-করা' জিনিষ মাত্র। ভাষার একতা হইতে
জাতির একতা প্রমাণিত হয় না। মিস্রপুর সহরের অনতিদূরে ন-
প্রস্তাবযুগের মানুষের যে পূর্ণ কঙ্কালটি পাওয়া গিয়াছিল, হুথের
বিষয় যে এখনও পর্যাপ্ত তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হইল না। অন্বে-
সন্ধানের অভাবে এ কথা স্থির হইতে পারিল না যে, বাহারা ভারত
আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহারা এই ভারতবর্ষেরই প্রাচীন-
তম যুগের বংশধর, কি নহেন। ভারতবর্ষের আর্থেরা অল্প কোন দেশ
হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে কথা কাছে, তাহা ত মোক্ষমূল্য
প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদগণের একটা মন-গড়া মতবাদ হইতে উৎপন্ন।
ভাষাতত্ত্ববিদগণের এই জাতিতত্ত্বকথা এখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমাজে
উপহাসিত মাত্র। শ্রীযুক্ত মেকডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা হুথিবেচনায়
সঙ্গে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিলে একথা কল্পনা
বৃথিতে পারা যায় না যে, বেদমন্ত্রের ঋষি বা ঋষিগণ ভারতবর্ষের
বাহিরের অল্প কোন স্থানের বিষয় কিছুমাত্র জানিতেন। প্রাচীন
জাতির মধ্যে এই একটি জিনিষ স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায় যে,
অল্প কোন দেশ হইতে আসিলে বা তরুণ অল্প কোন বিশেষ ঐতিহাসিক
ঘটনা ঘটিলে সর্ব্বদাই সেসকল কথা জাতির ঐতিহ্যে রক্ষিত
হয়। ভারতের আর্থেরা অল্প দেশ হইতে আসিয়াছিলেন,
একথা বৈদিক মন্ত্রে দৃষ্টান্তেও ঐতিহ্য (tradition) রূপে রক্ষিত হয়
নাই। আমেরিকার হুথসিদ্ধ হপকিন্স মন্তব্যটি সমর্থন করিয়া
লিখিয়াছেন, যে, বেদমন্ত্রগুলির সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিচার করিতে
শেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ মন্ত্রই পঞ্জাব হইতে
বহুদূর পূর্ব্বপ্রদেশে রচিত হইয়াছিল।

* এই আলোচনাটি হানাতাবে গতমাসে ছাপা হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যদিগের প্রভাব যে ভারতের বাহিরে অন্তর্ভুক্ত বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, একথা এখন কয়েকটি নূতন তথ্য আবিষ্কারের পর প্রমাণিত হইয়াছে।

(১) বেবিলোনিয়ার ঐতিহাসিক যুগ যে খৃষ্ট পূর্বে ৫০০০ বৎসব অথবা তাহার কিকিৎ পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অনিশ্চিত; কেননা সেই সময়কার রাজাদিগের নাম পর্যন্ত জানিতে পাঁবা গিয়াছে। ঐ সভ্যতার অভ্যুদয়ের পূর্বে যে অন্ততঃ তিন চাবি শত বৎসর পর্যন্ত য়মেরিয়ান সভ্যতা ঐ দেশে বিকসিত হইয়াছিল, একথাও সুযুক্তি দ্বারা অনুমিত হইতেছে। প্রাচীনতম য়মেরিয়ান, জাতিতে আর্ধ্য না হইলেও, আর্ধ্যদিগের ভাষা লাভ করিয়াছিল। হিব্রু সাহেবের এই সিদ্ধান্ত ভুল হইতে পারে; কিন্তু একথা নিতুল যে, খৃষ্ট পূর্বে ১৮০০ অবসরে যে কসাইত (Kassite) জাতি বাবিলোনে 'হম্মুবাবি'র বংশধরদিগকে উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারা জাতিতে অনাৰ্য্য হইলেও আর্ধ্য সভ্যতা দ্বারা নব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইবানদেশীয়েরা তাহাদের ভাষায় আর্ধ্য ভাষাকে যে প্রকাব প্রাদেশিক বিকৃতিতে লইয়াছিল, এখানে সেই প্রাদেশিক বিকৃতি নাই। কসাইতেরা যে বাবিলোনের বহুদূর পূর্বপ্রদেশ হইতে আসিয়া দেশ জয় করিয়াছিল, এ কথা বাবিলোনের ইতিহাসে সম্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বাহারা পূর্বে বাস করিত, তাহারা যে ভারত হইতে বিস্তৃত আর্ধ্যসভ্যতা লাভ করে নাই, এ কথা বলিতে বাণবা হুঃসাহসের কর্তব্য। হুঃপ্রসিদ্ধ Sayce সাহেব লিখিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন আশিরীয় চিত্র-লিপিতে 'হুঃ'কে মিত্র নামে পাওয়া যায়। এই জাতিবৎ নাম মূলতঃ তাহাদের দেবতা 'অহুর' হইতে। 'অহুর' শব্দটি দেবতা অর্থে খাঁটি বৈদিক; ইবাণ্ডীয় ভাষা হইতে উহা উৎপত্তি হইলে 'অহুর' স্থলে 'অহুর' হইত।

এখন Hommel এবং Delitzsch আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রাচীন য়মেরিয়ান ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাবিলোনিয়ান জাতির ভাষায় ১০০ এমন শব্দ পাওয়া যায়, তাহাদের ধাতু আর্ধ্য শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(২) মিসর দেশের 'তেলু-এল-অমর্ণ' নামক স্থানে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ অবসরে এগিরা মাইনরের 'মিটানি' নামক স্থানে যে রাজা বা রাজকন্য করিতেন, তাহাদের নামকরণ বৈদিক ভাষায় হইত; এবং তাহারা বৈদিক দেবতা পূজা করিতেন। ইহাদের নামের বর্ণবিন্যাসে ইরাণীয় প্রাদেশিকতা নাই; কাজেই এই জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতের আর্ধ্যসভ্যতা লাভ করিয়াছিল। মিটানি রাজা অর্জুতম, অর্জু-বৎ প্রভৃতি মিসররাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং মিটানির রাজকন্যাবীরগণের প্রভাবেই মিসরের রাজপরিবারে হুঃ-পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (Rogers' History of Babylonia, Vol. I. p. ১০)।

'তেলু-এল-অমর্ণ'-এর আবিষ্কারের কিছুদিন পরে Cappadocia প্রদেশে Boghaz Kyo নামক স্থানে শ্রীযুক্ত Winckler যে লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেও ইহা সমর্থিত হয়।

আর্ধ্যভাষা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেবা যাহাই বলুন, কিন্তু এ বিষয়ে সকলেরই একমত যে, যেদমন্ত্রে দেবতাদি লইয়া যে ধর্ম পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতক্ষেত্রে সৃষ্ট বা উদ্ভূত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে একথা অস্বীকার কবিবার পথ নাই যে, বৈদিক উচ্চারণ সহ যেসকল শব্দ অন্তর্ভুক্ত নীত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। Hermann Jacobi

যথার্থই বলিয়াছেন যে, নিকষই ভাবতপ্রাপ্ত হইতে মেনোপটেমিয়া পর্যন্ত ভারতের আর্ধ্যসভ্যতা একদিন প্রবলতা লাভ করিয়াছিল।

ইউরোপের কয়েকটি জাতির উপরে আর্ধ্যভাষার কিকিৎ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। হুঃপ্রসিদ্ধ Keane সাহেব ইহাকে a mere veneer of Aryan culture বলিয়াছেন।

এতদূর যাহা দেখা গেল, তাহাতে অনুমান করা বাইতে পারে যে, যে সময়ে বেবিলোনিয়াতে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল, ভারতক্ষেত্রে সে সময়ে অথবা তাহার পূর্বে ঐতিহাসিক যুগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বাবিলোনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আব একটা কথা মনে হয়। প্রথমতঃ দুই-একশত বৎসব বাবিলোনিয়েরা স্বীয় দেশে পরিমিত ভাবে সভ্যতা বিস্তার কবিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ক্ষুধাব তাড়নায় উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত দূর দেশে বাজা বিওর করিতে চেষ্টা কবিতে হইয়াছিল। যেসকল স্থানে রাজ্য বিস্তার করা কষ্টকর এবং যেসকল স্থানে ভূমি তেমন উর্বর ছিল না, সেসকল প্রদেশে যখন বাবিলোনিয়েরা রক্তপাত করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল, তখন কেন যে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ কবে নাই, একথা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পাঁবা যায় না। পশ্চিম প্রান্ত হইতে যদি হুঃবিধা পাইয়া একটা আর্ধ্যদল ভারতবর্ষে প্রবেশ কবিতে পারিয়াছিল, তখন কি স্তব্ধচিত্ত একটা রাজ্যের ক্ষমতাপালী লোকেরা সেই পথে উত্তর-ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আসিতে পারিত না? মনে হয়, সিদ্ধুব পর্বপায়ে ঐ আদিম কালেও একটা ক্ষমতাপালী জাতি ছিল বলিয়াই বাবিলোনিয়েরা ভারতবর্ষে যিক অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ইরাণীদিগের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থের ভাষা পর্যালোচনা করিয়া গণিতেবা স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে যে ভাষা অপেক্ষাকৃত খুব আধুনিক, ইবাণ্ডী ধর্মগ্রন্থগুলি সেই ভাষায় রচিত। ইরাণের সে ভাষাও খাঁটি বৈদিক ভাষা নহে। উহা বৈদিকের একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। ঐ প্রাদেশিক ভাষায় অপেক্ষাকৃত নূতন যুগে বৈদিক ধর্ম পরিবর্তিত ভাবে বস্কিত হইবার পূর্বে যে খাঁটি ভারতবর্ষ হইতে, ইরাণ এবং ইবাদের পশ্চিমে, ভারতবর্ষের ধর্ম ও ভাষা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইলাম। ইরাণীদিগের গ্রন্থে আছে যে, তাহারা 'আবিলান বইজ' বা আর্ধ্যব্রজ হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছিল। সে স্থানচ্যুতি ভারতের আর্ধ্যদিগের তাড়নায় হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। যদি হইয়াও থাকে, তবে ঐ ঘটনা দ্বারা ইরাণীয় এবং ভারতবর্ষীয়দিগের মৌলিক একতা প্রতিপন্ন হয় না। এ যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের কথা, তখন হইতে পারে যে, সিদ্ধুপারে আর্ধ্যদিগের ক্ষমতা এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিবার পর ইরাণীয়ের স্থানচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও প্রমাণের অভাব।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (আষাঢ়)।

শেষ কথা—শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

যাবাব দিনে এই কথাটি

বলে যেন যাই—

যা দেখেছি যা পেরেছি

তুলনা তার নাই।

এই জ্যোতিঃসমুদ্রমাঝে

যে শতদলপুত্র বাজে

তাঁবি মধু পান করেছি

ধন্য আমি তাই—

যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন বাই।

বিষয়গুলোর খেলায়
কতই পেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে পেলেম
দুটি নয়ন মেলে।

পরশ বাঁবে বার না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা;
এইখানে শেষ করুন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন বাই।

বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা—শ্রীজ্যোত্স্ননাথ ঠাকুর—

সকল জীবই অজ্ঞানের নিবিড় অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। আবার, কতকগুলি অল্পপ্রাণেরা বিবর্তের একপ্রকার অশিক্ষিত জ্ঞান সকল জীবেরই আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে মতে ঐরূপ সংস্কারমূলক অশিক্ষিত জ্ঞান জ্ঞানভাস মাত্র, মনুষ্য জ্ঞানভাস হইতে প্রকৃত জ্ঞানে উত্থান করিবার জন্ত সর্বদাই সচেষ্ট। বেদান্তাদি শাস্ত্রের পাবিত্যবাহার জ্ঞানভাসের নাম অবিজ্ঞা। জ্ঞান-বীরেরা অবিজ্ঞার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া বিজ্ঞাব্যোমে ক্রমে ক্রমে অধিকার বিস্তার করেন।

বিজ্ঞারাজ্যের রাজাদের নাম হর, প্রজাদের নাম শিব। সময়ে সময়ে শিবপ্রধানেরা শুক্লের উজ্জ্বলিকারী হইয়া অধিকৃত রাজ্যের সংস্কারসাধন এবং বিস্তারসাধন করেন। এইরূপে শুক্লপরম্পরাক্রমে বিজ্ঞা মার্জিত এবং বর্ধিত হইয়া চমিতে থাকে। বিজ্ঞাই প্রকৃত জ্ঞান। বিজ্ঞা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত—অপর বিজ্ঞা এবং পরী বিজ্ঞা। অপর বিজ্ঞার আর এক নাম বিজ্ঞান। পরা বিজ্ঞার আর এক নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বিজ্ঞাই পৃথিবীস্থ সন্তানাদিগণের সন্তোষের ভিত্তিমূল।

পাশ্চাত্য সন্তোষের গোড়ার কথা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শুধুই যে কেবল বস্তুবিজ্ঞান তাহা নহে, বর্ণবিজ্ঞানও বিজ্ঞান, রস-বিজ্ঞানও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের গোড়ার কথা অবিজ্ঞার বা জ্ঞানভাসের বা অন্ধসংস্কারের পাশ্ছেদন। আমাদের দেশের পুরাতন আচার্যেরাও তাহাই বলেন। সমস্ত অবিজ্ঞার বন্ধন এক উত্তমের দ্বারা করিয়া পরাবিজ্ঞার উত্তীর্ণ হওয়ারই ঐকমত্য শঙ্করাচার্যের আশংক্য চেষ্টা ছিল। সাধারণ শ্রেণীর জনসমাজের পক্ষে অপর বিজ্ঞার দোশান বাড়িয়া পরাবিজ্ঞার দিকে ধীরে ধীরে আগ্রহ হওয়াই পরামর্শসিদ্ধ।

কথাটি খুব সোজা; তাহা এই যে,

(১) মনুষ্যের গোড়ার কথা বিজ্ঞা।

(২) বিজ্ঞার গোড়ার কথা অবিজ্ঞার পাশ্ছেদন।

কিন্তু আমাদের দেশের স্বভেদে এক্ষণে এমনি জড়তা আলস্য এবং নিরুদ্বেগ, আর সেই সঙ্গে ঘেঁষা ঘিঁষা এবং দাপপত্যের ভূত চাপিবারে যে, ঐ সোজা কথাটির প্রতি আমরা সোজা ভাবে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই অপারগ। আমরা মনে করি যে, অবিজ্ঞার পাশ্ছেদনই নামই উচ্ছৃঙ্খলতা, আব, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই চলুক—এইরূপ গতানুগতিকতাব নামই সর্বাচার। অবিজ্ঞার পাশ্ছেদন করিতে, আমাদের হাত এগোয় না—কিন্তু ব্যাপককে ডাকিয়া অবিজ্ঞার দড়াদড়ি দিয়া আমাদের হস্তপদ আরো দুর্বলপদ বন্ধন করাইয়া লইতে আমরা যেমন তৎপর এমন আর কেহই নহে। আমাদের দেশের এইরূপ হীনাবস্থার মধ্যেও যে সময়ে-সময়ে উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী মহাত্মারা

অন্ধকার আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান হ'ন, তাহা সর্বদেশের মঙ্গল-বিধাতা জগদ্বন্ধুর পরমেশ্বরের করুণার জ্বলন্তমান নিদর্শন।

যাত্রার পূর্বপত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিজ্ঞালয়। এখানে আমরা বড় ছোট একসঙ্গে থাকি, বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহূর্ত আমাদের ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীস্থ মানুষের সঙ্গেও আমাদের এমনি একটু বোগ থাকে। সর্বমানুষের ইতিহাসে যেসমস্ত বস্তু আসে বাস্তু-সৃষ্টির যে উদ্যমস্ত ঘটে, ঝড় বাদলের যে মাতামাতি চলে, সমস্তকই যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড় আকাশের মধ্যে বড় করিয়া দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের মনেব বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে দূরে আছি বলিযাই আমাদের এই হৃৎকোপ আছে। পৃথিবীর সমস্ত স্রবাহ এখানে কোন একটি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পায় না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবশেষে বিগুহকপে গ্রহণ করিতে পারি।

মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিজ্ঞালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত্ত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড় পৃথিবীস্থ নিমন্ত্রণের পত্র পাইযাছি। কিন্তু সেই নিমন্ত্রণ ত বিজ্ঞালয়ের দুইশো ছাত্র মিলিয়া বন্ধা করিতে হইতে পারিব না। তাই ছির করিয়াছিলাম তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব।

আমাকে অনেকই-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ঘুরোপে যত্ন করিতে যাউতেছ কেন? একথার কি জবাব দিব ভাবিয়া পাই না।

প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে বাইবে? এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে বাইবার ইচ্ছাটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ একখাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর, আমাদেরকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অস্বাভা, এত অবলা এত টাট্টি-টিক্টিকি এত অপ্রপাত যে বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যবের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নিরঙ্ক, নিবিড় যে, পরের মত পর আমাদের কাছে আর কিছুই নাই। এইজন্যই অল্প সময়ের জন্যও বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জবাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের জানা এমনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা অস্বাদ একখাটা আমাদের দেশে বিধাসংযোগ্য নহে।

অল্প বয়সে বন্ধন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্বেগ ছিল,—সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বা বারিষ্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভাল কৈফিয়ৎ—কিন্তু বাদ্য বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ৎ খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্বেগের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন আছে একখাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা অশ্রদ্ধা হইতেছেন যে উদ্বেগ ঘুরোপে সাধিত হইবে কি করিয়া? এই ভ্রমণ-বর্ষের ভীষণে ঘুরিয়া এখানকার সাধুসাধকদের সঙ্গে লাভ করাই, একমাত্র মুক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া বাইব ইহাই আমার পক্ষে যোচ।

দুইটা চক্ষু পাইবাছি, সেই দুটা চক্ষু বিরাটকে বত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তবু একথাও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে। কেবল হুখ নহে, এই ভ্রমণের সম্বন্ধের মধ্যে •

আয়োজনসাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে। পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সন্ধান করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বাহা অত্যন্ত তাহাকেই বড় সত্য বলিয়া মানা ও বাহা অনভ্যন্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

যুরোপে গিয়া সংস্কারমূলক দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই প্রত্যাশা লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে ?

যুরোপে যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে, তাহা সমুজ্জ্বল। এই জন্যই সেখানকার অন্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হস্ত আরো কঠিন।

যুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু একথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখিবা কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ মানুষ কখনই সত্যকে কল দিবা পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। যুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পবিচয় পাওয়া যায়। যুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পল্লিবর্জনের পথে চলিতেছে—আজ তাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চূপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেক বলিয়া থাকেন ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে। কিন্তু বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হব না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। যুবোপশেবণ একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।

টাইটানিক জাহাজ ডুবির প্রকাণ্ড অপয্যুত্য় অভিঘাতে যুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া বাওযাতে আমরা এক মুহূর্তে তাহার অন্তরতম মানবাত্মার একটি সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি। যেমনি দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আব লজ্জা হয় নাই। অমনি আত্মার পরিচরে আত্মার আনন্দ উদারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

আর আমরা আমাদের চারিদিকে যে আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই দৃষ্টান্তবাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, কেননা আমরা মুখে যে বাহাই বলি না কেন অন্তত মনে মনে আমাদের চবিত্ত্রের এই দ্বৈন্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই ? এটা কি ধর্মবাদেরই একটা লক্ষণ নহে ? আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জননন্দ বর্জন করিয়া গুচি হইবা থাকে এবং নাম জপ করে ? আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীৰ্য্য দান করে না ?

টাইটানিক জাহাজ ডুবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া যে-শক্তিকে দেখিয়াছি যুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানাদিকে নানা আকারে দেখি নাই ? দেশহিতের ও লোকহিতের জন্ত সর্বস্বত্যাগ ও ঐশ্বর্যবিসর্জনের দৃষ্টান্ত কি সেখানে প্রত্যহই হজিাব হাজার দেখা যায় না ? সেই

অজস্রশক্তি পূরীভূত ত্যাগের দ্বারা কি যুরোপীয় সভ্যতা প্রবলবীর্যের মত মাথা তুলিয়া উঠে নাই ?

কোন সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে না বাহাব ভিত্তি দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই দুঃখকে তাহাখুই বরণ করিতে পারে না বাহার। Materialist—বাহারা জড়বস্তুর দাস। বস্তুতেই বাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহার ত্যাগ করিবে কেন ? কল্যাণকে তাহার আপনার প্রাণের চেয়ে কেন বড় করিয়া স্বীকার করিবে ? শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পাবলৌকিক বিষয়সম্পত্তির মতই জানে—সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখ স্বীকার করিতে পারে—কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধি সামগ্রী নহে, বাহা তীর্থযাত্রার দুঃখ নহে, বাহা শুভনক্ষত্রযুগের দান নহে—বাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্রবোচনা—সেই দুঃখ সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তুউপাসক গ্রহণ করিতে পারে ?

যুরোপে বেশের জন্য মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য প্রেমের জন্য হৃদয়ের স্বাধীন আবেগের সেই দুঃখকে সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিতেছি। ইহাব মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নহে, ইহাব মধ্যে অনেকটা আছে বাহা বাহাদুরি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রায়ে চঞ্জের চারিদিকে একটা জ্যোতির চক্ৰ দেখা যায়। আমরা জানি তাহা চঞ্জ নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথ্যা। কিন্তু চঞ্জ মাঝখানে না থাকিলে সেই চঞ্জের ভাণ্টুই থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠপদার্থ তাহাকে বিরবি তাহাব আলোক ধার করিয়া লইয়া একটা ভাণের মণ্ডল সৃষ্টিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই নকলটা আসলের প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। শুণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখিবা আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বসিলে ঠিকিতে হইবে।

সত্যকে ভক্তি করিবার ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া মিনের পব দিন আপনাকে অকুণ্ঠভাবে নিঃশেষে দান করিবার শক্তি, যুরোপ তাহার জাতীয় সাধনা হইতেই পাইয়াছে।

আমাদের দেশেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক একাংশ পাইয়াছে। আমাদের বাহারা সাধক তাহার কেহবা জ্ঞানে কেহবা ভক্তিতে অগুণ্ডস্বরূপকে সমস্ত গুণপদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তার এবং সাধনায়, তাহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইবা আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের বাহারা সাধুপুণ্ড্র তাহার চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানবশ্রুতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্য যদি কোনো বিদেশী প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিশক্তি লইবা আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন; এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতরকার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইবা যাইতে পারিবেন।

আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মত একটা অভাব আছে এবং সেই অভাবই আমাদেরকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে।

একথা গুনিলেই আমাদের দেশাভিমাত্রীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতা নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির; যুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসংকয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। আজ পৃথিবীকে যুরোপ শাসন

করিতেছে রক্তব জোবে, ইহা অবিশ্বাসী নাথিকের কথা। তাহার শাসনের মূলশক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর—তাঁহা ছাড়া আব কিছুই হইতেই পারে না।

বৌদ্ধধর্ম বিঘ্নাসক্তিব ধর্ম নহে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, অথচ ভাবিতবর্ধে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপববর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য-শক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আব কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা নখন জড়বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণবিকাশের দিকে উত্তর লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার বস্তু। তাহা অন্তর বাহির কোনোদিকেই মানুষকে ধরু করিয়া আপনাকে আঁতাত করিতে চাহে না।

ইউরোপের এই ধর্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্য নিরন্তরই তাহা দুঃখসাধ্য চেষ্টার নিমুক্ত রহিয়াছে। ধৃষ্টের জীবনযুদ্ধ হইতে যে ধর্মবীর্য ইউরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনশক্তি আছে, সেটি দুঃখকে পরমখন বলিয়া গ্রহণ করা। স্বর্গের দয়া যে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনাব করিয়া লয় এই কথাটি আজ বহুশত বৎসর ধরিয়া নানা মত্রে অমুঠানে সজীভে ইউরোপ গুনিয়া আসিতেছে। গুনিতে গুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর সর্বস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চৈতন্যরও অমুঠালবর্তী অভিচৈতন্যের ধর্ম—সেইধানকাব পোপন নিম্নরূপতাব মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেইজন্য আজ ইউরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই যাহারা দুঃখে ধৃষ্টধর্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদেব জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনপ্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ভাগ্য করে, লিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মত বহন করে যে, তখনই বুঝা যায় তাহার নিজের অজ্ঞাতসাবেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং দুঃখের উপরে সজ্ঞানকেই সত্য বলিয়া মানে।

কোনো জাতির মধ্যে যাহারা তাপস তাহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্তা করেন এইজন্য সেই জাতির পন্থেরা আনা মুঢ়ও যদি সেই তাপসদের গারে বলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্তার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোট বড় সমস্ত দুঃখ মিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পবিত্রাণ্ডভাবে দেখিতে পাইনা, এ কথা বতই অগ্রিয় হটক ভবাণি ইহ আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবেব আবেগ, যে রসের লীলা তাহা আমাদের মধ্যে বঞ্চিত আছে, কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে যাহা বীর্যেব দ্বারাই সাধ্য তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা বাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই। দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই—দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই স্বার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্দে মহী-

মান করিয়া তুলে। তাই শাস্ত্রে বলে “নাথরান্না বলহীনেন লভ্যঃ” তর্থাৎ দুঃখস্বীকার করিবার বল যাহাব নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহাব একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিয়ে লাভ করিতে পারি নাই। আমরাব দেশের লোক কেহ কাহারও ভাগ্য হইল না। দেশ যাহাকে চায় সে সাদা দেয় না। তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা দুঃখের দ্বারা পবন্দরকে আপন করিতে পারি নাই আমরা দেশের মানুষকে মূল্য দিই নাই। যা আপন গর্বের সম্ভ্রান্তকও অহরহ সেবাদুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। চাবিদিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিবা গ্রহণ করিতে পারি নাই তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিবা দেশ, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি ঘর্ষণে প্রেমের দ্বাবাই ঘটে। ভক্তজ্ঞান বখন বলে, সর্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র—সেই ভক্তকথাব দ্বারা সর্বভূতকে আশ্রয় করা যায় না প্রেম নামক আত্মার চবমশক্তি—যাহাব ধর্ম অসীম, আপনাকে ত্যাগ করতেই বাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপব প্রেম নহিলে কিছুতেই পবকে আপন করা যায় না। এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পবমান্নাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন—মানবপ্রেমিব পবমান্নাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

ইউরোপের ধর্ম যুবোপকে সেই দুঃখপ্রাণীপ সেবাপব্যায় প্রেমের বীজ দিয়াছে। ইহাব জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্তার হোয়াগি নিবিত্তে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতি বজ্র করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দুঃসহ বজ্র-হত্যাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট নিষ্ঠার হইতেছে;—ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার মধ্যে তৈরি হইতেই পারে না—ইহা তপস্তার সৃষ্টি এবং সেই তপস্তাব অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবল।

সেইজন্য দেখিতে পাই বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ বখন প্রেমের সেই ভাগধর্মকে বরণ করিয়া গইয়াছিল তখন সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটয়াছিল যাহা ইউরোপে সম্ভ্রান্ত দেখিতেছি। ভারতবর্ষের সেই দুঃখরত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জল দীপ্তি ক্রিয়মত ও ভাববদ্য-বেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে? বাহিরে যদি কোথাও তাহার উদ্বোধন দেখিতে পায় তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না—আজ যাহা পনের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনাব সামগ্রী বলিয়া নেতন হইবে না?

শক্তির আশ্রয় যেখানে প্রচুর পরিমাণে আছে সেখানে ছাইতম্ভও প্রভূত হইয়া উঠে একথা মনে রাখিতে হইবে। অশান্তির ক্ষোভ এবং পাপের প্রচণ্ডতা ইউরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আমাদের দেশে নহে। কিন্তু তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই বরঞ্চ নিরন্তরই আগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। সকল অময়ের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অমৃতের উপর বরাত দিবা কেহ বলিয়া নাই—নিজের প্রাণকেও সর্বটাপন্ন করিয়া বীরের দল সংগ্রাম করিতেছে। গীতাচ একটি আশার বাণী আছে বঙ্গপরিমাণ ধর্মও মহৎ ভব হইতে ভ্রাণ করে। কোন সমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায়, ততক্ষণ সেখানকার ভূমি পরিমাণ দুর্গতিব অপেক্ষাও তাহাকে বড় বলিয়া জানিতে হইবে।

ইউরোপে দুর্বল জাতির প্রতি ন্যায়ধর্মের ব্যাভিচার দেখা যাইতেছেন।

এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদগু লুপ্ততার মধ্যে হইতেই বিকার ও ভৎসনা উচ্ছসিত হইতেছে।

আমরা সর্বদাই নিম্নে এই বলিষা সাম্রাজ্য দিয়া থাকি যে আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি—বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই এই জন্যই বহিঃবিষয়েই আমরা দুর্বল হইয়াছি। আমাদের অনেকেই মুখে আশ্বালন করিয়া বলিষা থাকেন দারিদ্র্যই আমাদের ভুষণ। ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি বাহাদুরের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভুষণ। যে ভুষণেব কোনো মূল্য নাই, তাহা ভুষণই নহে। এই জন্য ভাগ্যেব দারিদ্র্যই ভুষণ, আলমশীব দারিদ্র্য করণ্য। দরিদ্র বলিষাই বাহারা স্বেযোগ পাইলে অন্য দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিষাই ক্ষমতা পাইলে বাহা অন্য অক্ষমকে আঘাত কবে কখনই দারিদ্র্য তাহাদের ভুষণ নহে।

আমাদের এই যে দুঃখ দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রসারিত কবিত্তে পারি নাই, তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তিসাধনাব মধ্যে বন্ধ করিয়াছি, তাহা আমাদের সমস্ত মানুষকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাখরের জাঁতায় মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবুদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্মবোধের সর্গোৎপত্তি ও অচেতনতাই আমাদের গর্ভস্থিত জড়পিত্ত কবিষা দাসত্বের উপযোগী কবিষা তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি আইনের দ্বারা আমাদের দুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভায় আসন লাভ করিলে আমরা মানুষ হইয়া উঠিব—কিন্তু জাতীয় সঙ্গতি কলের সামগ্রী নহে এবং মানুষের আত্মা যতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পুরা মূল্য চুকাইয়া দিবার অস্ত্র প্রস্তুত হইতে না পারিবে ততক্ষণ নান্দঃ পন্থা বিদ্যতে অরনার।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি যুরোপে বাইতে হয় তবে তাহা নিম্নল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুণ আছে, সে গুণ সেধানকাব মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি। সর্বত্রই গুণকে অন্ধার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে হয়—চোখ মেলিলেই তাহাকে দেখা যায় না। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি বাহার নাই অতি সহজেই সে মনে করিয়া বসে শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো সুযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিষগুলি ধূল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাব পূরণ হয়। কিন্তু “যেনাহ নানুতা ত্রাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্” একখাটি যুরোপেরও অন্তরের কথা। এই অন্তরই যুরোপ বীরের জ্ঞাব সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে, বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই বর্ষ হইতেছে, ততই ভুল করিতেছে, ততই বিশৃঙ্খলতার উৎসাহের সহিত নুতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিন্তুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। সত্যের সম্মুখীন হইতে আমরা উদাসীন, আমরা যৎগড়া বাঁধাবাঁধনের মধ্যে আপাদমস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি,—সেইজন্য বিপদের দিন যখন আসন্ন হয়, সত্য পন্থা ব্যতীত যখন আমাদের আর গতি নাই, তখন আমরা কিছুতেই আপনাকে জ্ঞাত কবিত্তে পারি না; তখনো গোলা কাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের কল প্রত্যাশা করি, কৃত্রিম উৎসাহকে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারি না, আরক কর্মকে শেষ করিতে পারি না এবং ছুরিপরিমাণ তাত্ত্বিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারম্বার বর্ষ হইতে থাকি। সেইজন্য সত্যের দারিদ্র্যকে বীরের ন্যায় সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা; সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা; জীবনের সমস্ত জেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ হ্রস্বের

মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা; এবং বুদ্ধি স্বয়ং ও কর্ণে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন; মানুষের প্রতি প্রজ্ঞাবাহী ভগবানের দুঃসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রীর পক্ষে যুরোপযাত্রা কখনই নিম্নল হইতে পারে না; অবশ্য যদি তাহাব মনে প্রজ্ঞা থাকে এবং সর্গোৎপত্তি মানুষদের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাক্ষ্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস কবে।

আমি জানি যুরোপেব সঙ্গে এক জীবগাব আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদের গর্ভে অনেক বহিবে অনেক বহুগতীর বেদনা পাইতে হইতেছে। সে বেদনা আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যেরই দুঃখ এবং আমাদের সঙ্কিত পাণেরই প্রাণশক্তি হইলেও তাহা বেদনা; আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ্য বাহা তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা পবিত্র আমবা নানা আকারে পাইয়া থাকি; ইহাও আমবা প্রতিনিব দেখিয়াছি তাহা নিজেদের নীচতাকে উচ্চতর কপটতার দ্বারা গোপন কবিয়াছে ও পরজাতীয়েব মাহাত্ম্যকে অন্ধতা ও অহঙ্কারেব দ্বারা অস্বীকার কবিয়াছে; এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া যুরোপেব সত্যকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অন্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি; তাহাদের ধর্মকেও আমবা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সম্ভ্রাতাকে আমবা বস্তুজ্ঞানজড়িত স্থলপদার্থ বলিয়া নিম্না কবিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যেব আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে মলিনুষ্ঠিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়া অমুকবণের শূন্যতার মধ্যে পবের কারার ছায়া ও পবের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইয়া জগৎসন্সারে নিজেকে একেবারেই বর্ষ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অন্তত ভ্রম কবিয়া বসি সে অন্যকে স্বীকার কবিত্তে গিয়া নিজেকে স্বীকার করিয়া বসাই যথার্থ উদ্যোবেব পন্থা।

এইসমস্ত বিষমিষম আছে—সেই অন্তরই এই পথে সত্যসন্ধানের বাজা তীর্থযাত্রা। বস্তুত অত্যন্ত বিদ্যেব দ্বাবাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভেব আশা কবিত্তে পারি; কারণ বাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ কবি না;—অথচ কোনো মহৎ লাভের যথার্থ সকলতাই চেতনার পূর্বতর বিকাশ—অর্থাৎ আমরা বাহা কিছু সত্যভাবে লাভ করি তাহার দ্বারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি। তাহা যদি না করি, যদি বাহিবেব বস্তুকেই বাহিরে পাই তবে তাহা মাত্র, তাহা মিথ্যা।

বোম্বাই সহর—শ্রীবোন্দনাথ ঠাকুর।

বোম্বাই সহরটাব উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিবার মনে হইল বোম্বাই সহরেব একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলিকাতার যেন কোনো চেহাব নাই, সে যেন যেমন-তেমন কবিয়া জোড়াভাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।

অসল কথা সমুদ্র বোম্বাই সহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে স্বীকৃতি দিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত বাস্তবগলিভ ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমাব মনে হইতেছে সমুদ্রটা যেন একটা প্রকাণ্ড স্থপতিও, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিব উপলিবার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিবনি এই সহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল পন্থা। এই পন্থার দ্বারা হ্রদুয়েব বার্তাকে হ্রদুর রহস্তেব অভিযুখে বহির

লইয়া বাইবার খোলা পথ ছিল। সহরের এই একটা জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যায় জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বন্ধ নহে। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটাঁসটা পোখাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমর-বন্ধ এমন করিয়া বাঁধিয়াছে যে গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মুক্তি ধরিয়াছে; গাথাবোটা বোকাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর কোনো বড় কাজ ছিল তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাষ্ট্রদের কণ্টকারণে মকরবাহিনীর মকরের শুড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত-মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই সহরের ধারে সমুদ্রের মুক্তিট অক্লান্ত;—যেমন একদিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীরয় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর একদিকে সে মানুষের আশ্রিত হরণ করিতেছে—ঘোরতর কণ্ঠের সমুদ্রেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার জারি ভাল লাগিল যখন দেখিলাম শত শত নরনারী সাম্রাজ্য করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্নের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার সহরে এক ইডেন গার্ডেন আছে—কিন্তু সে কুপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আনন্দ নাই। সেই রাজপুত্রের তৈরি বাগান, সেখানে কত শাসন, কত নিবেদ। কিন্তু সমুদ্র তো কাহারো তৈরি নহে, ইহাকে ত বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এই জন্য সমুদ্রের ধারে বোকাই সহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও ত সেই অসঙ্কেত আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সব চেয়ে বাহা দেখিয়া জরয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্দ্রটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতার আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া রেখি এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না দেখার একটা দণ্ড আছে। নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সঙ্গী করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্নে স্ত্রীপুত্র ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মত ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অত্যন্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদেরকে অচেতন করিয়া রাখে কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ? বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখা সাফা হইবে না?

আমাদের গাড়ি মাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট বাগানটিকে বেতন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্শ্ব রমণী নহে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরা মারাঠিমেয়েরাও বসিয়া আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অন্তিমটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারিদিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় এ ভাবনা লেশমাত্র তাহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড় একটা সঙ্কোচের বোঝা

নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিষ হইয়া উঠে তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসঙ্কোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। মাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডনপার্ক ও গোল-দীঘিক মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কি লক্ষ্মীছাড়া কুপণতা।

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে বস্ত্র তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীলীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আমার ত তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে পাড়ে মেয়েদের সাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মাথার পাগড়ী এবং গায়ে একটা সেরজাই পরা। মেয়েদের ত কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটা আশ্রয় সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না—পরীক্ষণতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশুদ্ধতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য। এইটুকু আশ্রয় এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনাতঃ সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কতবড় একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিধের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে তাহা অভ্যাসের অসাড়তা বশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর একটা জিনিষ বোকাই সহরে অত্যন্ত বড় করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশীলোকের ধনশালিতা। কত পার্সি, মুসল-মান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড় বড় বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতার কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে, এইজন্য তাহা বড় দান। জমিদারীর সম্পদ বন্ধ জলের মত—তাহা কেবলি ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না, তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এই জন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চয় আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীকতা দেখি। মাড়োয়ারি, পার্সি, গুজরাটি, পাঞ্জাবিদের মধ্যে দান মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গোন্ধর মত—তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিষটাকে আমাদের দেশ সচেতন ভাবে অনুভব করিতেই পারিল না। এইজন্য আমাদের দেশের কুপণতাও কুশ্রী, বিলাস বীভৎস। এখানকার ধনীদিগের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মুক্তি উদার—ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

—মণিভদ্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

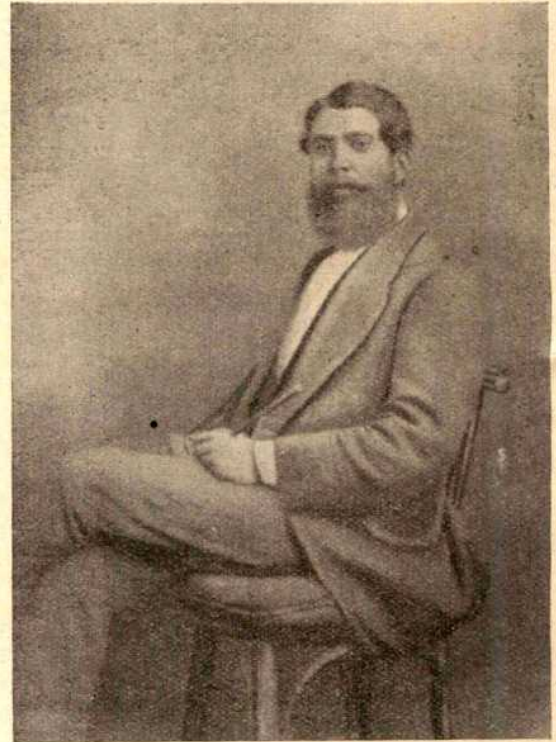
কোন জাতির অতীত গৌরব থাকিলে তাহাতে যেমন লাভের সম্ভাবনা আছে, ক্ষতির সম্ভাবনাও তেমনি আছে। লাভ এই হইতে পারে যে পূর্বকৃত্তির স্মরণ করিয়া নিজেদের ক্ষমতায় লোকের বিশ্বাস জন্মে, এবং এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে সমগ্র জাতি আবার উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা দুই দিক দিয়া :—লোকে কেবল পূর্ব গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া বর্তমানে অবসন্ন ও ত্রিয়মান হইয়া থাকিতে পারে; কিম্বা পূর্ব গৌরবের বড়াই করিতে করিতে অন্তঃসারশূন্য ও অপদার্থ হইতে পারে।

ভারতবর্ষের অতীত গৌরব আছে। আমরা তাহা হইতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে।

যদি কোন জাতির অতীত গৌরব না থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের উন্নতি হইতে পারে। নিগ্রোদের অতীত গৌরবের কোনই প্রমাণ নাই; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকে বিখ্যাত অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনিয়ার, কবি প্রভৃতি হইতেছেন। আমাদের যে-সুদূর-অতীতকালে গৌরব ছিল, তখন ইংরাজ, জার্মান ও ফরাসীদের পূর্ব-পুরুষেরা অরণ্যচারী বর্বর ছিল; আমাদের মত অতীত গৌরব এই তিন জাতির নাই; কিন্তু ইহারা ও ইহাদের বংশের মার্কিনেরা এখন জ্ঞানে ও রাষ্ট্রীয় শক্তিতে জগতের অগ্রণী। অপর দিকে, ইউরোপে গ্রীস ও ইটালীর লোকদের অতীত গৌরব আছে; কিন্তু তাহারা ইউরোপের অগ্রণী নহে।

সুতরাং অতীত গৌরব লইয়া বেশী নাড়াচাড়ার প্রয়োজন নাই। অতীতে ভাল যাহা ছিল, তাহা নিশ্চয়ই রাখা উচিত। কিন্তু অতীতে কিছু গৌরবের জিনিষ থাক বা না থাক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্তব্য। এই কর্তব্যপালন আমরা করিতেছি কিনা, প্রত্যহ ভাবিয়া দেখা উচিত।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়, ভূমি, অট্টালিকা ও নগর টাকায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। এই সম্পত্তি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে; তজ্জন্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইবে, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও শিক্ষক আদি নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহার এই একটি সর্ব আছে যে এই কলেজের অধ্যাপকেরা কেবল ভারতবাসী হইবেন। প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদিগকে



শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত।

(যৌবনকালের ছবি)

বিদেশে পাঠাইয়া বিজ্ঞানে পূর্ণশিক্ষিত করিয়া আনিবার ব্যয় এই কলেজ হইতে দেওয়া হইবে। এই কাজে বিশ্ববিদ্যালয় নিজ তহবিল হইতে আরও দুইলক্ষ টাকা দিবেন।

পালিত মহাশয় এই দান করিয়া দেশের মহা উপকার করিলেন। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ থাকা দূরের কথা, অনেক ছাত্র বি-এস-সি. ও এম-এস-সি.



শ্রীমুক্ত তারকনাথ পালিত ।]

(বর্তমান সময়ের ফটোগ্রাফ ।)

‘পয়স্তু’ পাড়িবার^১ সুযোগও এখন পায় না। পালিত মহাশয়ের বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপিত হইলে এই অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে দূর হইবে। কেবল ভারতবাসীরা এই কলেজের অধ্যাপক হইতে পারিবে, এই নিয়ম করায় কলেজের কাজ উৎসাহের সহিত চলিবে, এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্ব দেখাইবার একটি কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে।

পালিত মহাশয় যে একটি মহৎকাজ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলিতেছেন যে এই টাকা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সহিত সম্মিলিত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন টিউটকে দিবার কথা ছিল।

সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাভে জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের লোক-মান হইল। ইহা সত্য কথা। কিন্তু পালিত মহাশয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতি কেন বিরূপ হইলেন, তদ্বিষয়ে দুই পক্ষের কথা না জানায় কোন আলোচনা করিতে আমরা অসমর্থ। আমরা কেবল এই কথা বলিতে পারি যে এই টাকা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের হাতে দেওয়ার যথেষ্ট কারণ যদি পালিত মহাশয় দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। কিন্তু এখন তিনি যাহা করিলেন, তাহাও সংকাজ; তিনি, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদকে বঞ্চিত করিয়া, ৭১০ লক্ষ টাকা নিজের সম্ভান-সম্ভতিকে দিলেন না, আপনার সুখসম্ভোগের আয়োজনও করিলেন না। বিজ্ঞাদান যে শ্রেষ্ঠ দান, তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং তাঁহার নিন্দা ত আমরা করিবই না, বরং এই কথাই বলিব যে সকল ধনী তাঁহার দৃষ্টান্তের অঙ্ক-

সরণ করিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

তাঁহার দান বিশেষভাবে প্রশংসার্য এই কারণে, যে,— তিনি স্বেপার্জিত ধন দান করিয়াছেন, উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত ধন নহে; তাঁহার সম্পত্তির সামান্য অংশমাত্র দান করেন নাই, খুব বেশী অংশ, সম্ভবতঃ অধিকাংশই দান করিয়াছেন, এবং পরে অবশিষ্ট অংশও করিবার সম্ভাবনা আছে; তিনি নিঃসন্তান নহেন, যে, টাকাটা কে খাইবে, ভাবিয়া দান করিয়া ফেলিলেন; এবং তিনি বাচ্চিয়া থাকিতেই দান করিলেন। মৃত্যুর পর মানুষের পার্থিব সম্পদে কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং মৃত্যুর পরে যে

দান সিদ্ধ হয়, মৃত্যুর অগ্রে দান তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

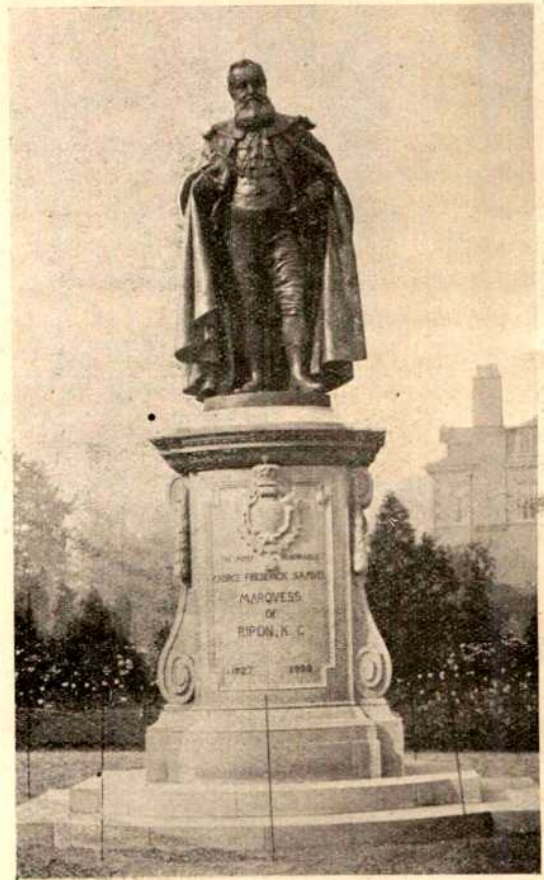
জমিদার ও বণিকদের মধ্যে পালিত মহাশয়ের অপেক্ষা ধনী অনেকে ত আছেনই, তাঁহার সমব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার উকীলদের মধ্যেও আছেন। সুতরাং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত আরও অনেক টাকা পাইবার আশা করা হুয়াশা নহে। আইনব্যবসায়ীরা পরিশ্রম করিয়া টাকা রোজগার করেন বটে; কিন্তু যাহাদের টাকায় তাঁহারা বড় মানুষ্য, সেই স্বদেশবাসীদের সেবার জন্ত তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই অর্থ ব্যয় করেন। ধনীদের মধ্যে পরার্থে অর্থব্যয় যিনি করেন, তিনি শ্রদ্ধেয়; যিনি তাহা না করেন, তিনি বিন্দুমাত্রও সম্মানের যোগ্য নহেন। একুপ লোকদের দেশের নেতৃত্ব করিবার কোনই অধিকার নাই।

জমিদারদের অর্থ অধিকাংশ স্থলেই স্বোপার্জিত নহে। স্বোপার্জিত ভিন্ন অর্থ, আইনতঃ অধিকার থাকিলেও, ধর্মতঃ অধিকার কাহারও নাই। অলসভাবে অপরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিলে অপরাধ হয়। যাহার মনুষ্যত্ব আছে, সে ইহা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে। এই জন্ত, দেশের, বিশেষতঃ কৃষকসম্প্রদায়ের, কল্যাণের নিমিত্ত প্রভূত অর্থব্যয় করা প্রত্যেক জমিদারের কর্তব্য। তাঁহাদিগের যেমন অন্নচিন্তা নাই, তেমনি অবসর-কাল সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প আদির চর্চা ও উন্নতিতে যাপন করা কর্তব্য। কিন্তু হুঃখের বিষয় যে এইরূপে অর্থব্যয় ও অবসর-কাল-ক্ষেপণ অতি অল্প জমিদারই করিয়া থাকেন। অলস জন্মধনীর ভুলিয়া যান যে ধর্মের চক্ষে, ত্রায়দর্শীর চক্ষে, অলস লোকেরা পরবিত্তাপহারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আর যেসকল ধনী বিলাসে ও পাপে মজিয়া আছে, তাহারা ত অতি রূপাপাত।

কোন কোন জমিদারের দ্বারা বঙ্গ দেশের উপকার হইয়াছে; কিন্তু জমিদার-সম্প্রদায়ের দ্বারা বঙ্গের ক্ষতি ভিন্ন বিশেষ কিছু লাভ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহাদের অস্তিত্ব যদি তাঁহারা সার্থক করিতে পারেন, তাহা হইলে পরম আনন্দের বিষয় হইবে।

ধাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের এই ক্ষতি করিয়াছে যে তাঁহাদের অধিকাংশকে মানুষ্য হইতে দেয় নাই।

ধার্মিক বড় লাট লর্ড রিপন ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্ত আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি উচিত। ভারতের অনেক যে-সে বড় লাট, মেঝ লাট ও ছোট লাটের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু লর্ড রিপনের মূর্তি এত দিন স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি উহা মান্দ্রাজে স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় বাকী ছিল; শীঘ্রই এই অভাব পূর্ণ হইবে। কিছুদিন পূর্বে বিলাতের রিপন



রিপন সহরে লর্ড রিপনের মূর্তি।

সহরে যে মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ একটি মূর্তি কলিকাতার জন্ত আগামী আগষ্ট মাসে আসিয়া পৌছবে। উহা ব্রোঞ্জ ধাতুতে নির্মিত অর্থাৎ যে ধাতুতে আজকাল পরমা নির্মিত হয়, সেই ধাতুতে ঢালাই। মূর্তিটি বিলাত হইতে আসিবে, কিন্তু উহার

প্রস্তরময় পাদপীঠ এখানে নির্মিত হইবে। সমুদয়ে আমাদের ১৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে সাড়ে সাত হাজার টাকা আছে। বাকী সংগ্রহ করিতে হইবে। সকলে কিছু কিছু দিলে অনায়াসেই এই টাকা উঠিয়া যাইবে। ১০নং হেষ্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে, “রিপনমূর্তির জন্ত” লিখিয়া, টাকা পাঠাইতে হইবে।

রিপন সহরে যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সার্ব উইলিয়ম ওয়েডারবন তাহার যে ফোটোগ্রাফ ভূপেন্দ্রবাবুকে পাঠাইয়াছেন, তাহাই এখানে মুদ্রিত হইল।

লর্ড রিপনের ভারত-শাসনকালে আমরা কলেজের ছাত্র ছিলাম। তাহার চেহারা যতটা মনে পড়ে তাহাতে তাহার এই মূর্তিটি ঠিক হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ইংলণ্ডের একএকটা জেলাকে কাউন্টি বা শায়ার বলে। এই কাউন্টিগুলার কোন-কোনটা খুব ছোট, এবং কোন-কোনটা খুব বড়। কিন্তু তথাপি, শাসনকার্যের সুবিধার অছিলায় বা অত্ৰকোন স্বার্থ কারণে, বড় কাউন্টি ভাঙ্গিয়া ছুটা কাউন্টি করা, কিম্বা বড় হইতে কতকটা অংশ লইয়া ছোট একটার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া, এরূপ কোন ঘটনা বা চেষ্টার কথা আমরা জানিনা। কারণ বিলাতের লোকের দেশটা তাহাদের “স্বদেশ,” তাহাদের একএকটা কাউন্টি “স্ব” কাউন্টি। এরূপ ভাঙ্গাচুরা করিতে তাহারা দিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এরূপ ঘটন ঘটে। প্রদেশ ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করা, জেলা ভাঙ্গিয়া ছুটা জেলা করা, ইহা ভারতের নানা প্রদেশে হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে যে মৈমনসিংহ জেলা খুব বড় বলিয়া, শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত তাহাকে ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করা উচিত।

কোম্পানীর আমলে ইংরেজশাসিত ভারত যত বড় ছিল, এখন উহা তার চেয়ে আয়তনে ও লোকসংখ্যায় অনেক বড় হইয়াছে। অথচ একজন বড় লাটে তখনও চলিত, এখনও চলিতেছে, কেবল অধস্তন কর্মচারী বাড়িয়াছে। তেমনি মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা যদি বাড়িয়া থাকে, ত অধস্তন কর্মচারী বাড়াইলোই চলে। অনর্থক ছুটা জেলা করিয়া দুজন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, দুজন জেলার জজ, এবং তাহাদের প্রত্যেকের আফিসের কর্মচারী, ইত্যাদিতে বহু অর্থ ব্যয় করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। জেলা পরিদর্শনের জন্তও এরূপ বিভাগ স্বরকার নাই। কারণ এখন, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে স্থলপথ ও জলপথে যাত্রায় পূর্ণাঙ্গা খুব সহজ, ও অল্পসময়সাপেক্ষ হইয়াছে।

মানুষের যেমন স্বদেশপ্রেম আছে, তেমনি স্বগ্রামপ্রেম, স্বনগরপ্রেম, ও স্বজেলাপ্রেম আছে। এই প্রীতি

দ্বারা অনেক সংকাজও হয়। ইহাতে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। বেসকল দাতা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সমস্ত জেলার উপকার করিবার জন্ত, কলেজে, পুস্তকালয়ে, টাউনহলে, জলের কারখানায়, বা অত্ৰ কোন জনহিতকর কার্যে টাকা দিয়া গিয়াছেন, জেলাভাগ করিলে বেসকল দানের সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকে না। ভবিষ্যতে এরূপ দান-প্রাপ্তির পক্ষে ব্যাঘাতও ঘটে।

তদ্বিন্ন, জনসমষ্টির সর্ববিধ শক্তি সমষ্টির ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ত্ব অনুসারে হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জেলাকে ছোট করিলে জেলার লোকদের শক্তিও কমাইয়া দেওয়া হয়।

এইসকল কারণে আমরা এইরূপ বিভাগ, বঙ্গ বা অত্ৰ যেখানেই ঘটুক, অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি।

পাঁচ বৎসরেরও অধিক হইল, মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামালপুরে এক হিন্দু মুসলমানের বিবাদ ও দাঙ্গা হয়। তাহার ফলে গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের জামালপুরস্থ কাছারীতে, লুণ্ঠিত অস্ত্রের জন্ত, থানাতল্লাসী হয়। কোনও অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। মৈমনসিংহের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ক্লার্ক সাহেবের হুকুমে এই থানাতল্লাসী হয়। তিনি তৎকালে কাছারীর সন্নিকটে ছিলেন কিন্তু ভিতরে যান নাই। থানাতল্লাসী তাহার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে হয় নাই, এবং সরকারী কর্মচারী দ্বারাও সব কাজ হয় নাই। মুসলমান জনতা দ্বারা বাস্ত ও কাগজপত্র ভগ্ন ও লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল। এই সব কারণে ব্রজেন্দ্রবাবু ক্লার্ক সাহেবের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। তাহাতে হাইকোর্টের জজ ফ্রেচার সাহেব তাঁহাকে খরচা সহ পাঁচ শত টাকার ক্ষতিপূরণের ডিক্রী দেন। ক্লার্ক ইহার বিরুদ্ধে আপীল করেন। আপীলেও ব্রজেন্দ্রবাবুর জিত হয়। তখন ক্লার্ক সাহেব প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করেন। প্রিভি কৌন্সিল তাঁহাকে জয়ী করিয়াছেন। এখন ব্রজেন্দ্রবাবু ক্ষতিপূরণ তা পাইবেনই না, অধিকন্তু ক্লার্কের সমুদয় খরচ তাঁহাকে দিতে হইবে। প্রিভি কৌন্সিল এই রায় দিয়াছেন যে থানাতল্লাসী করাইবার ক্ষমতা আইনানুসারে ক্লার্ক সাহেবের ছিল। আমরা আইনজ্ঞ নহি, সুতরাং এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতকগুলো বেসরকারী, গুপ্তার মত, বাজে লোক দিয়া জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করাইবার অধিকার কোন্ আইন অনুসারে কাহার আছে? বিচারপতি ফ্রেচার সাহেবের রায় হইতে এই ঘটনা সন্দেহে আমরা প্রকৃত তথ্য নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

“It became necessary for the search party to break open the outer door of the cutchery. Having thus effected an entrance, some of the Mahomedan mob,

which had collected and were accompanying the search party, were requisitioned to go and bring daos and assist in opening the boxes which contained the zemindary papers. That the search was conducted with unnecessary damage to the property of the plaintiff cannot, to my mind, be doubted for an instant. The papers out of various boxes in the cutcherry were strewn haphazard on the floor of the cutcherry. Mr. Horniman, of the 'Statesman' newspaper, who was accompanied by Mr. Newman, of the 'Englishman' newspaper, who had been specially delegated to proceed to Jamalpore and report on the state of the disturbances there, has graphically described the condition of affairs as he found them at the plaintiff's cutcherry on 1st May. I am satisfied on the evidence that the state of affairs at the plaintiff's cutcherry on May 1st was the same as it had been left on the conclusion of the search."

আমরা প্রিভি কৌন্সিলের রায় আত্মোপাস্ত পড়িয়া দেখিলাম। তাহার কোথাও ঘটনার এই দিকটির কোন আলোচনা বা উল্লেখ নাই। বাজে লোকের দ্বারা বাস্তব ও কাগজপত্র যে লুণ্ঠিত করা হয় নাই, একথা প্রিভি কৌন্সিল বলিতে পারেন নাই। সুতরাং আমাদের ধারণা ব্রজেন্দ্রবাবুর এই যে ক্ষতি হইয়াছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে তিনি তাহার কোন প্রতিকার পাইলেন না। খানাতল্লাসী করাইবার অধিকার ক্লার্ক সাহেবের থাকিলেও, এইরূপ ভাবে খানাতল্লাসী করাইবার অধিকার তাঁহার ছিল না। সুতরাং প্রিভি কৌন্সিল যে বলিয়াছেন যে ক্লার্ক সাহেব "seems to have acted properly with courage and good sense, and strictly in accordance with the powers committed to him", এই প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে।

প্রিভি কৌন্সিলের রায়টি পড়িলেই বুঝা যায় যে তত্রত্য জজেরা নিম্নস্থ আদালতের রায় ছুটিও ভাল করিয়া পড়েন নাই, তাঁহারা এতই ব্যস্ত ছিলেন! কারণ, তাঁহারা বলিতেছেন :—

"It was tried by Mr. Justice Fletcher. He found in favour of the plaintiff and gave a decree of Rs. 500, but without costs. Costs were not awarded to the successful plaintiff on account of the charge of personal misconduct, which his Lordship found to be unfounded and grossly improper."

প্রিভি কৌন্সিল বলিতেছেন যে জজ ফ্লেচার ব্রজেন্দ্রবাবুকে বিনা খরচায় ৫০০ টাকার ডিক্রী দিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা কিন্তু এই যে ব্রজেন্দ্রবাবু খরচা সহ ডিক্রী

পাইয়াছিলেন। ফ্লেচার সাহেবের রায় হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশই তাহার প্রমাণ :—

"Having given the matter the best consideration that I can, I think the justice of the case would be met if I order the defendant to pay the plaintiff Rs. 500 as damages.

"The defendant must also pay to the plaintiff his cost of this suit on scale No. 2."

সামান্য বিষয়ে যে-জজেরা এমন একটা স্থূল ভুল করিতে পারেন, তাঁহাদের বিচার যে অভ্যস্ত হইবেই হইবে, ইহা কেহই মনে করিবে না। ফ্লেচার সাহেব ক্লার্কের আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

But whilst this goes to establish the defendant's "bona fide," it does not release him from the obligation the law casts upon him as being in supreme control of the search party from seeing that the search was conducted in a proper and reasonable manner."

ইহার মধ্যে "grossly improper" এর মত একটা কড়া মন্তব্যের কোন ভিত্তি ত আমরা দেখিতে পাইলাম না। প্রিভি কৌন্সিল আরও বলিয়াছেন—"The actual search within the building was made by the police"। ইহা সত্য কিন্তু আংশিক সত্যমাত্র; কারণ খানাতল্লাসীতে যোগ দিবার যাহাদের কোন আইনসম্মত অধিকার ছিলনা, এরূপ মুসলমান জনতার লোকেরাও ইহাতে যোগ দিয়াছিল। আর বেশী কিছু আমরা বলিব না। ইংরাজী-জানা পাঠকেরা প্রিভি কৌন্সিলের রায়টি সমস্ত পড়িলেই সব কথা বুঝিতে পারিবেন। রায়টি লম্বা নয়। কিন্তু উহাতে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, যাহার ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কথা উঠিয়াছে, যে, ক্লার্ক সাহেবকে গবর্ণমেন্ট কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা দিবেন। ইহার মত অসম্মত প্রস্তাব আর হইতে পারে না। ক্ষতিপূরণটা কিসের? গবর্ণমেন্ট তাঁহার মোকদ্দমার সমস্ত খরচ দিয়াছেন। তাঁহার ক্ষতিটা কি হইয়াছে? মোকদ্দমায় নির্দোষী হইলেই যদি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তাহা হইলে গত ৫৭ বৎসরে কত লোক যে রাজনৈতিক মোকদ্দমায় ছয় মাস, এক বৎসর বা ততোধিক কাল হাজতে ও জেলে পচিয়া, শেষে সর্বস্বান্ত হইয়া নির্দোষী প্রমাণ হইল, তাহাদিগকে সর্বো-গ্রেই কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে, জার্মানীতে ও আমেরিকায় অনেক-গুলি ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্বের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি।

এস, ভী, রামমুর্তি এবং ভূপতিমোহন সেন কেব্বি জের
র্যাংলার হইয়াছেন। কেব্বি জে গণিত পরীক্ষায় (বি-
এর) প্রথম অংশে এইচ, বি, শিবদাসানি প্রথমশ্রেণীতে
উত্তীর্ণ হইয়াছেন; আইন পরীক্ষায় ব্রহ্মদেশীয় এম, টী,
মঙ্গ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ইতিহাসের পরী-
ক্ষায় এম, বী, বৈষ্ণ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন;
পদার্থবিজ্ঞানে এম, পী, দেশাই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ
হইয়াছেন।

পঞ্জাবের ইনার্সউল্লাহ খাঁ ১৯০৯ হইতে আরম্ভ করিয়া
উপযুক্তির কেব্বি জের বি-এ, পরীক্ষায় চারি বিষয়ে
সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যথা—১৯০৯, গণিত,
১ম শ্রেণী; ১৯১০, প্রাচ্যভাষা, ১ম শ্রেণী, ও পদার্থ-
বিজ্ঞান, তৃতীয় শ্রেণী; এবং ১৯১২, যন্ত্রবিজ্ঞান, ২য় শ্রেণী।
এরূপ কৃতিত্ব কোন ভারতীয় বা অল্পদেশীয় ছাত্র এ পর্যন্ত
দেখাইতে পারে নাই।

ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত শেষ পরীক্ষায় ১৯৭ জন ইংরেজ,
ওপনিবেশিক, চীন ও ভারতীয় পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন
ভারতীয় ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহার
নাম কে, এম, রেড্ডি। ইনি মাল্ভাজ প্রেসিডেন্সীর



রামনাথ খা মল্ ভাণ্ডারী।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনিও ছইটা পরীক্ষায়
৭৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বল্লভ ভাই
জাবের ভাই পাটেল পঞ্চম স্থান, এবং শতীন্দ্রনাথ ঘোষ
একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এসসী, পদার্থবিজ্ঞা ও
রসায়নে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পী, এইচ ডী, উপাধি
পাইয়াছেন। বার্লিনের মত শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই
উপাধি ভারতবাসীদের মধ্যে ইনিই প্রথম পাইলেন।

ইউ, এন্, রায়, আমেরিকার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের
খনির এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঈ-এম,
(Engineer of Mines) উপাধি পাইয়াছেন। তৎপরে
তিনি কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া-
ছেন।

এম, এম, বসু জাপানে কাপড় ও হতা রন্ধন এবং
ছিট ছাপা শিখিয়াছেন, এবং আমেরিকার ষ্টানফোর্ড
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের বি-এ, উপাধি ও কালিফোর্নিয়া
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের এম-এস, উপাধি পাইয়াছেন।



কে, হুব্বা রেড্ডি।

লোক। ইনি তিন বৎসরের জন্ত বার্ষিক ১৫০০৭ টাকার
বৃত্তি পাইয়াছেন। পঞ্জাবের লালারামনাথ মল ভাণ্ডারী

বৈশাখ মাসে ঝাঁকাদিগকে ভি, পি, ডাকে প্রবাসী
পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েক শত গ্রাহকের

টাকার সঙ্গে ডাকঘর তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা আমাদিগকে এরূপ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন, যে, আমরা প্রথমে তাঁহাদের টাকা জমা করিতে ও জ্যেষ্ঠ আষাঢ় সন্ধ্যা তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি নাই; কাগজ অপ্রাপ্তির অভিযোগ পাইতে পাইতে ক্রমশঃ তাঁহাদের টাকা জমা করিয়া কাগজ পাঠাইতেছি। এই কারণে এখনও অনেকের টাকা জমা হয় নাই।

তন্নিম্ন অনেকে যেখান হইতে টাকা দিয়া ভি, পি, লইয়াছেন, আমরা সেই ঠিকানা ডাকঘর হইতে পাওয়ায় সেখানেই পরবর্তী সংখ্যা পাঠাইয়াছি। অথচ কোন কোন গ্রাহক সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা সে খবর পাই নাই। এইরূপ কারণেও অনেকে যথাসময়ে কাগজ পান নাই।

প্রতি বৎসরই এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে। তজ্জন্ত কার্যাদিক্রম বশতঃ অনেকে চিঠির উত্তরও পান না। ইহা হ্রঃখের বিষয়।

চিত্র-পরিচয়

বিশ্বামিত্র ।

মুখপত্র রঙিন চিত্রখানির পরিকল্পনার বিষয় বিশ্বামিত্র; এক সময় পৃথিবীতে অত্যন্ত খাড়াভাব ও হুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; বিশ্বামিত্র ছয় দিন অনাহারের পর একদিন একটি পদ্মফুল প্রাপ্ত হন; সেই ফুলটি আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন মনে করিতেই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এই পদ্মফুলটি একাকী আহার করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত স্বার্থপর অধর্ম্য কার্য হইবে। বিশ্বামিত্রের ধর্ম্মই পদ্মরূপে

বিকশিত হইয়া বিশ্বামিত্রের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই চিত্রে বিশ্বামিত্রের চিন্তাপূর্ণ দ্বিবার ভাবটি বেশ ফুটিয়াছে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের আকার বোধ ভিক্ষুর গায় করনা করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তরুণ শিল্পীর শিল্পসাধনা সার্থক হইবে তাহার আভাস এই চিত্রে অস্পষ্ট অনুভব করা যায়।

কাবুলিওয়াল।

সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের “কাবুলিওয়াল” নামক চমৎকার গল্পটি অবলম্বনে এই চিত্রখানি অঙ্কিত। কাবুলিওয়ালার বিরাট মূর্তির মধ্যে শিশুসুলভ প্রকল্প সরল ভাবটিই চিত্রের কেন্দ্রগত ভাব। মেওয়া দিয়া, ‘হাঁথি’-ভরা ঝুলি আর ‘খণ্ডরা’কে মারিবার গল্প করিয়া ‘খোঁখি’ মিনির সহিত কাবুলিওয়াল ভাব করিতেছে—সেই অবস্থাটি চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে।

‘চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব’ প্রবন্ধে পরিচ্ছদ পরিবর্তনের যে চারটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রবন্ধলেখক ডাক্তার রামলাল সরকারেরই বিভিন্ন পরিচ্ছদে সজ্জিত প্রতিকল্প।

চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান সেনাপতির যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার নাম জেনেরাল লি ইয়েন হং।

চীনের বিদেশী কনসালের পাকীর ছবিতে ব্রিটিশ কনসাল মিঃ রোজের চিত্র গৃহীত হইয়াছে। ইনি গত বৎসর টেঙ্গিয়ে হইতে এসিয়া ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, এবং তথাকার এসিয়াটিক জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে চীন দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“বায়মাস্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩১৯

৫ম সংখ্যা

লণ্ডনে

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। শেষ দুই দিন প্রবল বেগে বাতাস উঠিল; তাহাতে সমুদ্রের আন্দোলনের সম-
তালে আমাদের আভ্যন্তরিক আলোড়ন চলিতে লাগিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম ইহাতে সমুদ্রের অপরাধ নাই, কাপ্তেনেরই দোষ। যেদিন পৌছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌছিয়াছি। বরুণদেব নিশ্চয়ই এই দুর্বলান্তঃকরণ যাত্রীটির জন্য ঠিকমত হিসাব করিয়া ঝড় বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষের হিসাব ঠিক রহিল না।

মাসেল্‌স্‌ হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া এক দিনের মত হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। স্নানাহারের পর একটা মোটর গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় পারিস সমস্ত যুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবেনা। চারিদিকে আমোদ-আহ্লাদের বিরাট আয়োজন। মানুষকে খুসি করিবার জন্য সুন্দরী পারিস নগরীর কতই শাজসজ্জা! এই কথাই কেবল মনে হয় মানুষকে খুসি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল

তখন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মানুষ রাজা। এই সমগ্র মানুষের বিলাস-ভবনট কি প্রকাণ্ড ব্যাপার! ইহার জন্য কত দাম যে অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহার জন্য প্রত্যহ কত জাহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করিয়া পৃথিবীর কত দুর্গম দেশ হইতে উপকরণ আসি-তেছে তাহার ঠিকানা কে রাখে!

এই মানুষ রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ; যে সহজে সন্তুষ্ট হইতে চায় না তাহাকে খুসি করিবার হুঃসাধ্য সাধন। বহুলোক ভোগ করিতে করিতে এবং বহুলোক ভোগ জোগাইতে জোগাইতে এই প্রমোদ-পারাবারের মধ্যে তলাইয়া মরিতেছে কিন্তু তবুও মোটর উপরে ইহার ভিতর হইতে মানুষের যে-একটি বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাইতেছে তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিনা।

রবিবারের দিন ক্যালে হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌছিলাম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি। মানুষের ভাষা যে আলোর মত। এই ভাষা যতদূর ছড়ায়

ততদূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংরেজের ভাষা যখন পাইয়াছি তখন ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম—সেই জুই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ডোভারে পা দিতেই আমার মনে হইল সেই ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল, যেখানে দাঁড়াইলাম সেখানে কেবল যে মাটির উপর দাঁড়াইলাম তাহা নহে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

অনেককাল পরে লণ্ডনে আসিলাম। তখনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি কিন্তু এখন মোটর গাড়ির একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে সহরের ব্যস্ততা আরো প্রবলভাবে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর রথ, মোটর বিখব্ব (অম্বিবাস), মোটর মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া চলিতেছে। আমি ভাবি লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কি ভয়ানক প্রকটু! যে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূর্তি তাহাই বা কি ভীষণ! দেশ-কালকে লইয়া কি প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে। পথ দিয়া পদাতিক যাহারা চলিতেছে প্রতিদিন তাহাদের সতর্কতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। মন অণু যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক না কেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাগিরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। হিসাবের ভুল হইলেই বিপদ। হিংস্র পশুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াসে হারণের সতর্কতাবৃত্তি যেমন প্রথর হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে ব্যস্ততার তাড়া খাইয়া খাইয়া এখানকার মানুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিতেছে। দ্রুত দেখা, দ্রুত শোনা ও দ্রুত চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলি বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে, শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সেই এখানে হঠিয়া যাইবে।

ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিতেছে। যে যত্ন ও প্রীতি পাইতেছি তাহা বিদেশীর হাত হইতে পাইতেছি বলিয়া আমার কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে;—

মানুষ যে মানুষের কত নিকটের তাহা দূরত্বের মধ্য দিয়াই নিবিড়তর করিয়া অনুভব করা যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আমি Nation পত্রের মধ্যাহ্ন-ভোজে আহূত হইয়াছিলাম। “Nation” এখানকার উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে যে সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার খুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অত্যায়ে যাহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, Nation তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জ্ঞা নিযুক্ত।

নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহাৰান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে বসিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইহারা সকলেই জানেন ইহাদেব প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-তরীর হালটাকে ডাহিনে বা বায়ে কিছু না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিন্তাকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে ধবরের কাগজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; আমরা লেখকের কাছে কোনো দায়িত্ব দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলস্ত ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এই জ্ঞা আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাব করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জুরীতে শস্ত-অংশ অতি সামান্য দেখা যায়—মনের খাণ্ড পূরাপুরি জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অত্যাচার বিষয়ে আলোচনাসভা আমি দেখিয়াছি, তাহাতে কথার চেয়ে কঠোর জোর কত বেশি! এখানে কিরূপ প্রশান্ত ভাবে এবং কিরূপ প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দ্বারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেকে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। ইহাদের কাজ গুরুতর অথচ কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই। ইহাদের রথ প্রকাণ্ড, তাহার গতিও দ্রুত, কিন্তু তাহার চাকা অনায়াসে ঘোরে এবং কিছুমাত্র শব্দ করেনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জম্মু

জম্মুপ্রদেশটি কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের সিংহদ্বার বলা যাইতে পারে। পাঞ্জাবের নিম্নসমতল ভূমি হইতে আরম্ভ

যেন একতলা হুতলা করিয়া ২৮০০ ফুট উর্দ্ধ উঠিয়াছে; জম্মুনগরের উচ্চতা ১২০০ হইতে ১৫০০ ফুট, শ্রীনগরের উচ্চতা ৪১০০ ফুট।

উত্তরপশ্চিম রেলওয়ের ওয়াজিরাবাদ স্টেশন হইতে কেবলমাত্র ৫২ মাইল লম্বা একটি ছোট রেলওয়ে জম্মুনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই লাইনের উপর শিন্নালকোট ব্রিটিশরাজ্যের শেষ নগর। শিন্নালকোট হইতে কুড়ি মাইল জম্মুপ্রদেশের সমতলভূমি অতিক্রম করিলে জম্মুনগর। জম্মুনগর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই স্থান হইতেই কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। জম্মুর পাহাড়ের দক্ষিণদিকে কেবলমাত্র সমতলভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আর উত্তরদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কলিকাতা হইতে জম্মুনগর প্রায় ১৪০০ মাইল দূরবর্তী। পাঞ্জাব মেলে আসিলে অম্বালায় গাড়ী বদলাইয়া উত্তর-পশ্চিম রেলের গাড়ীতে উঠিতে হয়; তাহার পর ওয়াজিরাবাদ স্টেশনে আবার নামিয়া জম্মুর গাড়ীতে



জম্মুনগরের উর্দ্ধ হইতে সাধারণ দৃশ্য। গম্বুজওয়ালা খেতকুটি রাজপ্রাসাদ; পার্শ্বে দপ্তরখানা (Foreign Office)।

করিয়া কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য ক্রমশঃ থাকে থাকে—ঠিক উঠিতে হয়। কলিকাতা হইতে জম্মু ঠিক ৪৬ ঘণ্টা পথ।



তবিনদীর পুল (জম্মুর দিক হইতে) । পুলের মুখের উপরকার ছুটি ঘরে (Octroi ও Customs tax) গুদ্র আদায় করিবার জন্ত সর্বদা লোক থাকে । [লেখক কর্তৃক গৃহীত কটোগ্রাফ]

জম্মুনগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম, বিশেষতঃ কলিকাতা মেল যখন বৈকালে ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছায় তখন কেবলমাত্র জম্মু পাহাড়টি দূর হইতে দেখা যায়, জম্মুনগরের সৌধাবলী বড় কিছু দেখা যায় না, পাহাড়টিতে ঢাকিয়া রাখে, কেবল অনেকগুলি খেত ও স্বর্ণবর্ণের মন্দিরের চূড়া দূর হইতে দেখা যায় ও তাহাদের উপর অস্ত-রবির কিরণ পড়িয়া বেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলে। তখন জম্মুনগরটি মন্দির নগর বলিয়া মনে হয়।

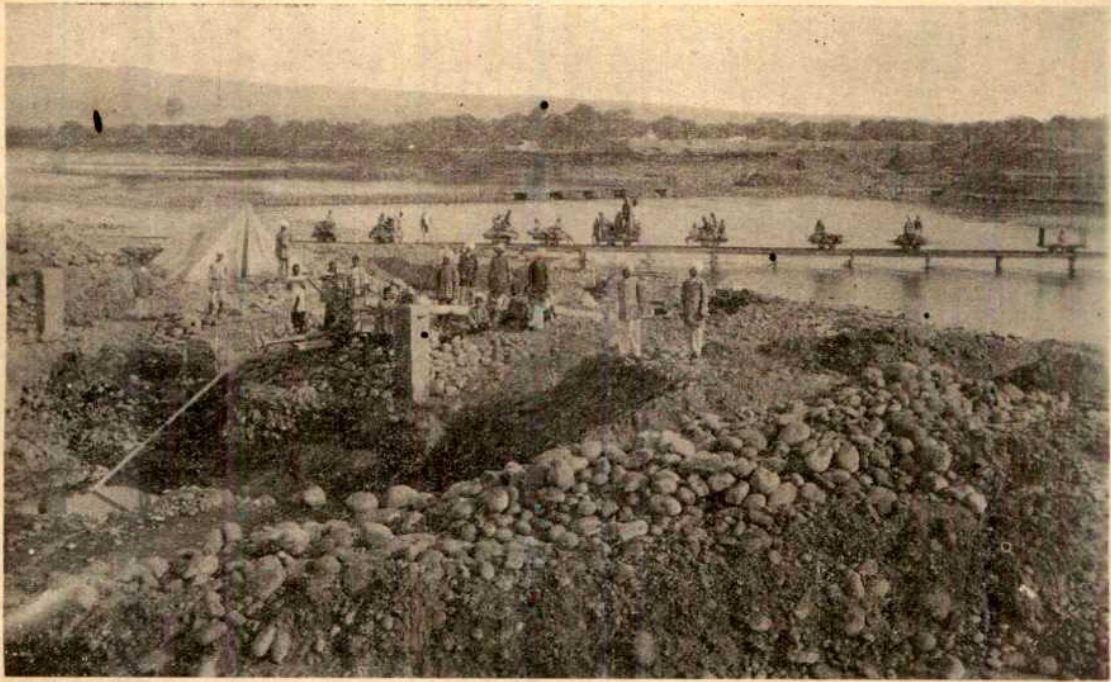
জম্মুনগরের আত্যন্তিক দৃশ্যও খুব সুন্দর। নগরের ভিতর দিয়া পথগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ উঠিয়াছে, আর পথের জুধারেই পাহাড়। জম্মুনগরের ভিতরও একতলা ছতলা করিয়া ছয় সাত তলা আছে। খানিকটা পাহাড় উঠিয়া বেশ সমতলভূমি তাহার উপর অনেক বাড়ী, তখন পাহাড়ের উপর আছি বলিয়া মনে হয় না, আবার একটা পাহাড় উঠিলে বেশ সমতলভূমি তাহার উপর অনেক বাড়ী, এইরূপ ছয় সাতটি পাহাড়ের উপর ঠিক যেন ছয় সাতটি তলায় বিভক্ত জম্মুনগর। এইরূপ

একএকটি পাহাড়কে এখানে একএকটি “ঢাকি” বা তলা বলে।

ষ্টেসন হইতে জম্মুনগরে যাইতে হইলে তবি নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এই স্থানে তবি পার হইবার নিমিত্ত একটি পুল আছে। তবি নদীটি খুব ছোট। জম্মু হইতে বহিয়া গিয়া মাইল খানেক দূরে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। নদীতে কোমরের বেশী জল নাই। নদীর জলপথটি খুব সঙ্কীর্ণ কিন্তু নদীর গর্ভটি অপেক্ষাকৃত চওড়া ও প্রস্তরময়, এইজন্ত নদীর পুলটি নদী অপেক্ষা অনেক বড়, কলিকাতার গঙ্গার পুলের মত লম্বা।

নদীর জুধারের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। পাহাড়ের মধ্য দিয়া নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কলকলস্বরে বহিয়া চলিয়াছে। জুধারের বড় বড় পাহাড় ক্রমশঃ বাঁকিয়া আসিয়া নদীর বুকের মাঝে লুটাইয়া পড়িয়াছে। নদীর মাঝে মাঝে ভগ্নপাহাড়ের কতকাংশ এখানে ওখানে জাগিয়া রহিয়াছে।

ষ্টেসনে ঘোড়ারশাড়ী পাওয়া যায়। এখানকার গাড়ী কলিকাতার টমটম গাড়ীর মতো ছচাকার, তবে তাহাতে



জম্মুনগরের নহরের (খালের) দৃশ্য। চন্দ্রভাগা নদী হইতে এই খালে জল আসে বলিয়া ইহারও জল জম্মুবাসীর কাছে পবিত্র।

ইহার জলে জম্মুর চাষ আবাদ হয়, জল পম্প করিয়া মাঠে দেওয়া হয়। [লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

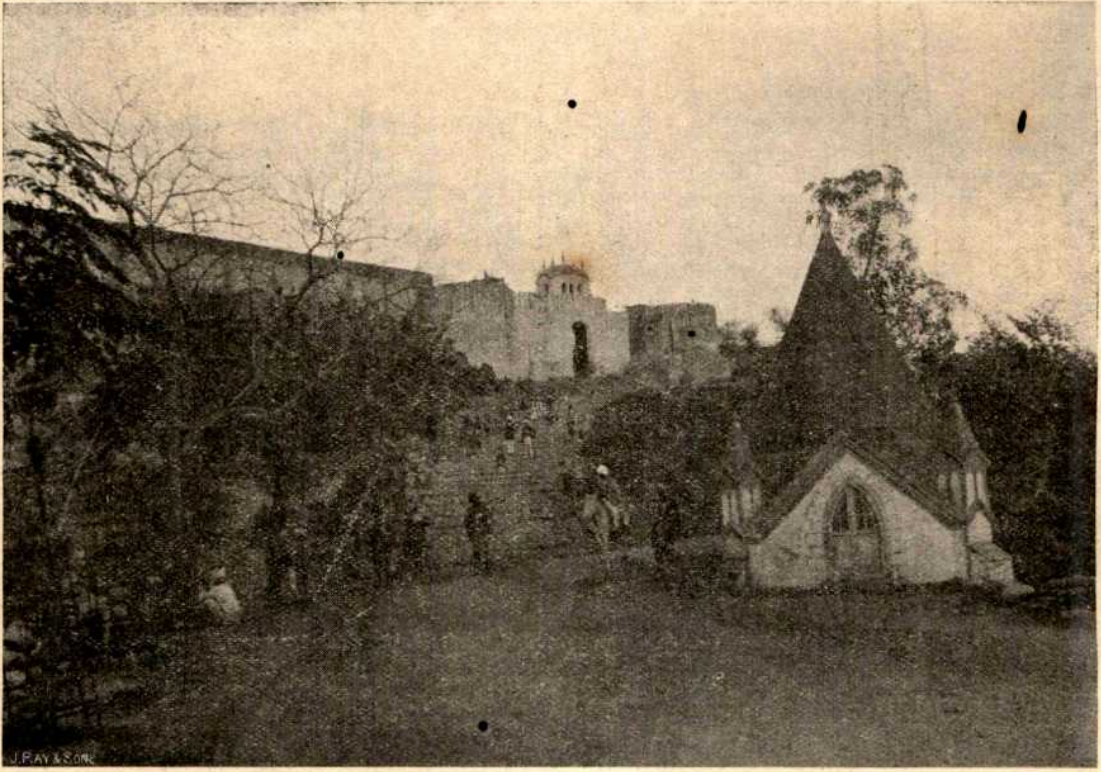
পাঁচজন বেশ আরামে বসিয়া ঘাইতে পারে। মাথার উপরের চালটি ক্যাম্বিশের, এজ্ঞা এ গাড়ীগুলি খুব হাল্কা ও দ্রুতগামী। এ গাড়ীগুলিকে টঙ্কা বলে।

তবির পুল পার হইয়া জম্মুনগরে প্রবেশ করিলে প্রত্যেককে একপয়সা করিয়া শুষ্ক দিতে হয়। ইহা কাশ্মীর ও জম্মু গভর্নমেন্টের প্রাপ্য। এই সময় কষ্টম হাউসের লোকে শুষ্ক লইবার কোনো জিনিষ আছে কিনা তাহা একবার দেখিয়া লয়।

জম্মুনগরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া একটি খাল চন্দ্রভাগা-নদী হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর তবিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই খালের জল বরফের জলের মত ঠাণ্ডা। বরফজলের চেয়ে ইহার উত্তাপ কেবলমাত্র ৪° কি ৫° ডিগ্রি বেশী এবং ইহার জল এইরূপ ঠাণ্ডা বারমাসই থাকে। দারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন ছায়াতেও উত্তাপ প্রায় ১১৭ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে সেই সময় এই “নহরের” (খালের) জলে নগরের সমস্ত নরনারী প্রাতঃস্নান করিয়া যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করে। গ্রীষ্মকালে এখানে ছপ্পরবেলা খুব ভয়ানক

গরম হয় বটে কিন্তু রাত্রি দশটার সময় হইতে সকাল আটটা নয়টা পর্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা থাকে, আমাদের দেশের বসন্তকালের মত বোধ হয়, তখন বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বহে। এই নহরের পার্শ্বে একটি বিজলঘর (power house) আছে, ইহার Dynamo খালের জলের স্রোতের বলেই চলে। এই স্থান হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তুত হইয়া তবির পুল ও অন্যান্য স্থান বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করে। এই বিজলঘরটি বাবু উষাপতি রায় নামক জনৈক বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে আছে। জম্মুতে কলের জল আছে, কলের জলের কারখানাও উষাপতি বাবুর অধীনে।

মহারাজের প্রাসাদ, মহারাজের দপ্তরখানা, আদালত, জেল ইত্যাদি অন্যান্য সমস্ত গভর্নমেন্টসংক্রান্ত বাড়ীগুলি তবিনদীর উপর পাশাপাশি একজায়গায় অবস্থিত। জম্মুনগরের উপকণ্ঠে মহারাজের আর একটি রামনগর প্রাসাদ বলিয়া প্রাসাদ আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত, সম্মুখ দিয়া তবিনদী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এই স্থানে ঘুরিয়া গিয়াছে।

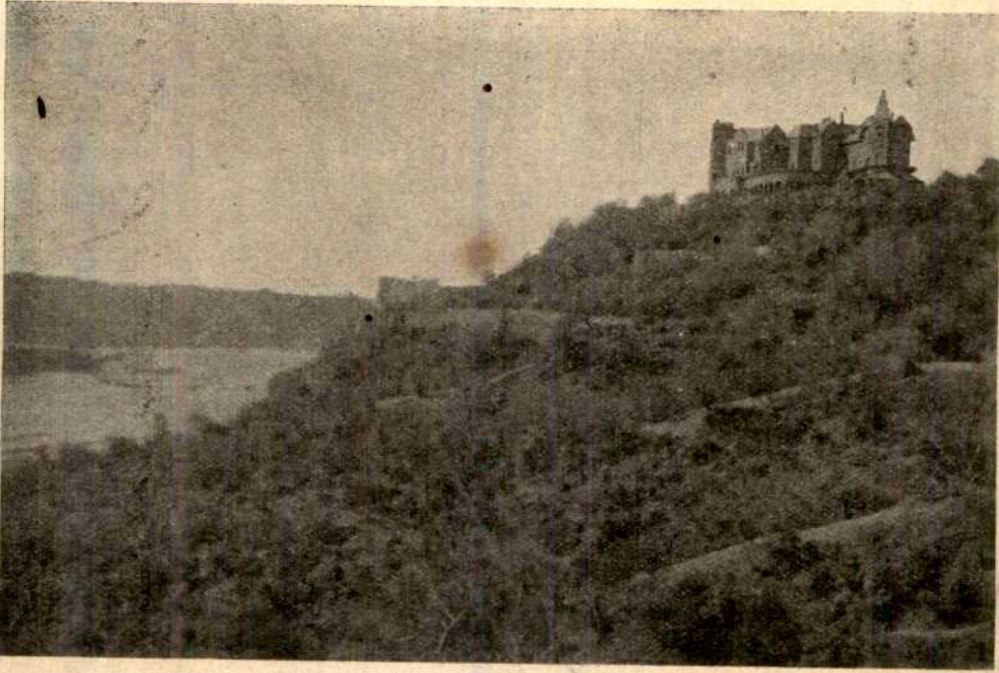


জম্মুনগরের বহিঃতোরণ—Gomti Gate—জম্মুর উত্তর দিকে। সিঁড়ির ডাহিন দিকে গির্জার মতো যে ঘর সেখানে পুলিশ থাকে, নূতন বিদেশী লোক দেখিলে নাম ধাম লিখিয়া লয়। [লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

জম্মুনগরের পশ্চিম দিকে আজবঘর বলিয়া সরকারী একটি বাড়ী আছে। ইহার ভিতরের গুটিকতক হলঘর বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত। কোন উৎসবের সময় রাজকীয় ভোজাদি হইলে এই স্থানে হয়। আজবঘরটি উচ্চ পাহাড়ের উপর অপেক্ষাকৃত সমতলস্থানে অবস্থিত; ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা সমস্তই সমতলভূমি খুব নিম্নে অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপর হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। নিম্নের গাছগুলি বড় বড় সবুজ রঙের ঢেউএর মত অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই দিকটা দেখিলে প্রবাসীতে প্রকাশিত “পদ্মিনী ও ভীমসিংহ” চিত্রটির কথা মনে পড়ে।

এই আজবঘরের গুটিকতক ঘর লইয়া এখন মহারাজার প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলেজ (Prince of Wales College) আছে। কলেজের নূতন বাড়ী নহরের তীরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, কলেজ শীঘ্র সেইখানে উঠিয়া বাইবে। এই কলেজে তিনটি বাঙ্গালী অধ্যাপক

আছেন বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. ও বাবু তারকনাথ সান্নাল, এম.এ, ইংরাজীর অধ্যাপক; এবং বাবু উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু এম.এ গণিতের অধ্যাপক। এখানকার ইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও বাঙ্গালী। কেবলমাত্র এই পাঁচজন বাঙ্গালী জম্মুনগরের স্থায়ী অধিবাসী। আরো কয়জন বাঙ্গালী জম্মু ও কাশ্মীর মহারাজার দপ্তরে চাকরী করেন। ডাক্তার আশুতোষ মিত্র মহারাজার শ্রেষ্ঠ সচিব। তাঁহার শীতকালে মহারাজার সহিত জম্মুনগরে আসেন, তাহার পর গ্রীষ্মকালে মহারাজার সহিত শ্রীনগরে চলিয়া যান। জম্মুনগরটি মহারাজার শীতনিবাস, এখানে মহারাজা পোষ মাস হইতে চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকেন তাহার পর শ্রীনগরে চলিয়া যান। এখানকার রাজসরকারে বিক্রমসম্বৎ প্রচলিত। এই আজবঘরে রণবীর লাইব্রেরী বলিয়া একটি পাঠাগার আছে। এই স্থানে স্তূপাকার প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সম্বন্ধে রক্ষিত আছে।



জম্মুর মহারাজার তবিতীরবতী রামনগর প্রাসাদ ও সরকারী দপ্তরখানা। • তবির পরপারে ঈষদ্রত ভূমির উপর দিয়া দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের বিজয়বাহিনী আসিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

ঐতিহাসিকগণ এইখানে আসিলে এইসকল পুঁথি হইতে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

জম্মুনগরটি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম হিন্দুনগর, বরাবর নিজের হিন্দু বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের উপর দিয়া এলেকজান্দারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কত বিদেশী আক্রমণের ঝড়বাত বহিয়া গিয়াছে, কত মুসলমান রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জম্মু বরাবর হিন্দু রাজার অধীনে আছে; দু'একবার শিখসেনা কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল মাত্র। ইহার প্রধান কারণ বোধহয় জম্মু প্রদেশটি পর্বতসঙ্কুল, সৈন্য গমনাগমনের পথ হইতে দূরে অবস্থিত ও শস্ত্রসম্পদে অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া বিজয়লোলুপ মুসলমান নরপতিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ডোকরা জাতীয় রাজপুত এইখানে বরাবর রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। এখনকার মহারাজাও এই শ্রেণীর রাজপুত। শিখমহারাজা রণজিতসিংহের সময়ে রণজিতদেও নামক একজন ডোকরা রাজপুত জম্মু প্রদেশের রাজা ছিলেন। রণজিতদেওএর ভ্রাতার পৌত্র গোলাপসিংহ সেই সময়ে শিখরাজ রণজিতসিংহের সমীপে লাহোরে

আসিয়া শিখসেনার মধ্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শিখ-সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। রণজিতসিংহের মৃত্যুর পর গোলাপসিংহ এই শিখসেনার এল রণজিতদেওএর বংশধরের নিকট হইতে জম্মু প্রদেশ জয় করিয়া জম্মু প্রদেশের রাজা হন। তাহার পর ১৮৪৬ সালে ইংরাজদের সহিত শিখদের যুদ্ধ বাধিলে গোলাপসিংহ কোনো দলে যোগদান না করিয়া মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দেন ও সেই সময় ইংরাজদের নিকট হইতে জম্মুর উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও কাশ্মীরের কতকাংশ ৭৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। তাহার পর ইংরাজ সেনাপতি সর্ হেনরী লরেন্সের (Sir Henry Lawrence) সাহায্যে কাশ্মীর রাজ্যের নিকট হইতে কাশ্মীরের সমস্ত দখল করেন এবং আধুনিক কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশ একে একে দখল করেন। গোলাপসিংহ ১৮৫৭ সালে মারা যান, তাহার পর তাঁহার পুত্র রণবীরসিংহ রাজা হন। আগ্রা-কালকার মহারাজা প্রতাপসিংহ রাজা রণবীর সিংহের পুত্র।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিস্তৃতি এখন (৮০০০০)



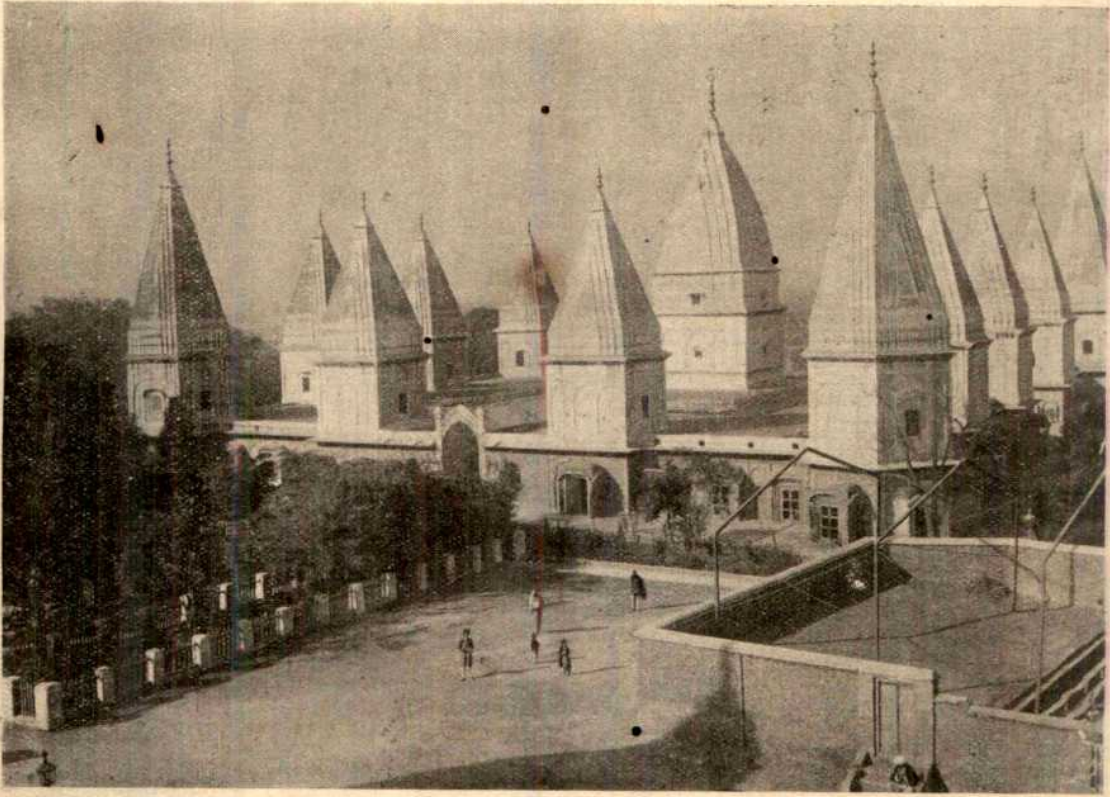
জম্মুর মহারাজার দপ্তরখানা (Secretariat Office) বৈশাখী উৎসবের দিনে।

আশীহাজার বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ।
বাৎসরিক আয় এ ০ কোটি আট লক্ষ টাকা।

ইতিপূর্বে প্রবাসীতে “কাশ্মীর ও কাশ্মীরী” নামক
প্রবন্ধে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক বিষয় কতক আলোচিত
হইয়াছে কিন্তু কাশ্মীরীদের রীতিনীতি বিশেষ কিছু
আলোচিত হয় নাই। ইহাদের রীতিনীতিতে বিশেষতঃ
বিবাহপ্রথাতে অনেক রকম নূতনত্ব দেখা যায়। এখানে
নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা
প্রায় ৭৫ জন মুসলমান, বাকী হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিখ; তবে
জম্মুশহরের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু, বাকী
মুসলমান। কেবল জম্মুশহরে কেন সমগ্র পাজাবেও
হিন্দু ও মুসলমানগণ আশ্রয় আপন জাতিগত পার্থক্য
বন্ধদেশ অপেক্ষা রীতিনীতির প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে বজায়
রাখিয়া চলে। শিখেরা তামাকু সেবন করে না কিন্তু
মদ্যপান করিতে ইহাদের মধ্যে বাধা নাই, মুসলমানেরা

তামাকু সেবন করে কিন্তু মদ্য পান করিলে ধর্মে
পতিত হয়। হিন্দুদের এছাড়া বিষয়ে বাধা নাই বটে তবে
এখানকার হিন্দুরা মুসলমানস্পৃষ্ট জল গ্রহণ তো করেই না,
মুসলমানের দোকানের জিনিসটি পর্যন্ত কিনে না।
মুসলমানেরাও পারগপক্ষে অন্নজলবিষয়ে হিন্দুদের সংস্পর্শে
আসিতে চাহে না। তবে এখানকার প্রশংসার বিষয়
এই যে হিন্দু ও মুসলমানগণ জাতিগত পার্থক্য বজায়
রাখিয়া চলিলেও তাহাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিরোধ
দেখা যায় না। এখানকার মুসলমান হিন্দুত্রাঙ্গণকে
অনেক সময় ভক্তি করিতেছে দেখা যায়, হিন্দুদের সহিত
বৈশাখী উৎসব ও বাসন্তী উৎসবে যোগদান করে।
এখানে একদিন আমাদের কিছু বেশী দুধের প্রয়োজন
হওয়ায় বাজারে দুধ কিনিতে যাইতে হয়। এক মুসলমান
গোয়ালার নিকট যাই। দুধ চাওয়ায় সে বলিল তাহার
কাছে আন্দাজ দুই সের দুধ আছে। আমরা তাহাই
লইতে ইচ্ছুক হওয়ায় সে ভিতর হইতে একসেব তিনপোয়া



জম্মুনগরে রঘুনাথজীর মন্দির।

ছধ আনিয়া বলিল—বাবুজী আর নাই। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাপু তুমি ত ইচ্ছা করিলে ভিতর হইতে একপোয়া জল মিশাইয়া আনিতে পারিতে; ইহাতে সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে আমরা হিন্দু হইয়াও তাহার নিকট হইতে ছধ লইতেছি ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট তাহার উপর ছধে জল মিশাইয়া আমাদেরকে “মুসলমানের পানি” খাওয়াইয়া সে আপনাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছুক নহে। একরূপ অন্ধবিশ্বাসমূলক সত্যতা বঙ্গদেশে বিরল।

এখানকার হিন্দুমাত্রেই শিখা রাখে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। মাথায় শিখা না দেখিলে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহারা তাহার হিন্দুত্বের বিষয়ে সন্দেহান হয়। রঘুনাথজিউর মন্দিরে প্রবেশ করিতে আমরা যে মুসলমান নছি তাহা বুঝাইতে বুড়ি বুড়ি হিন্দুত্বের প্রমাণ দাখিল করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ইহারা যখন শুনিল আমরা খাস কলিকাতাবাসী—কালী-

ঘাটের পার্শ্বে ও গঙ্গার উপকূলে থাকি—তখন আমাদেরকে বৈকুণ্ঠের মহা নিকটবর্ত্তী জানে অতি শ্রদ্ধার সহিত পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তবে চামড়ার সমস্ত জিনিষ, এমন কি চামড়ার ঘড়িরচেন ও মানিবাগটি পর্য্যন্ত, পকেট হইতে খুলিয়া বাহিরে রাখিয়া যাইতে হইয়াছিল।

রঘুনাথজিউর মন্দির জম্মুশহরের শ্রেষ্ঠ মন্দির। এখানে পর্ক উপলক্ষে বহু দূর হইতেও নরনারীর সমাগম হয়। মহারাজা ও মহারানীরা এখানে থাকিলে মাঝে মাঝে পূজা দেখিতে যান। মন্দিরান্তরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রমাণ প্রস্তরমূর্ত্তি আছে ও বাহিরে প্রায় একতলা সমান হস্তুমানের মূর্ত্তি আছে।

জম্মুশহরের পুরুষের সকলেই প্রায় ইংরাজী ধরণের কামিজ ওয়েষ্টকোট ও কোট গায়ে দেয়, মাথায় টুপি বা পাগড়ী দেয় ও ঢিলা ঝলঝলে বা পাটেপা ত্রীচের মত ইজের পন্থর। কখন কখন ধুতি পরে তবে খুব কম। বাংলাদেশে পাঞ্জাবী আন্তীন বলিয়া যে জামার চলন সেরূপ



জম্মুর ফেরিওয়াল—ডোকরা রাজপুত জাতীয়।

জামা এখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে পরিতে দেখা যায় না, গরীব ও ইতরলোকে পরে।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা খোঁপা বাঁধে না, চুল বিনাইয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখে। এখানকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই খুব স্নন্দরী, রং খুব উজ্জল ও দেহসৌষ্ঠব ভাল। স্ত্রীলোকেরা পায়ের কাছে খুব সরু ও কোমরের কাছে খুব ঢিলা সুকতান নামক একপ্রকার রঙ্গীন ইজের পরে, তাহার উপর হাত খুব সরু ও লম্বা বুলওয়াল একটি প্রকার কোর্তা বা জামা গায়ে দেয়, তাহার উপর মাথা ঢাকিয়া ওড়না পরে। বঙ্গদেশে নব্য যুবকদিগের মধ্যে আজকাল যেরূপ মাঝখানে বোতাম হাত সরু ও খুব লম্বা বুলওয়াল জামা চলন হইয়াছে ঐ প্রকার জামা এখানকার স্ত্রীলোকে পরে। একদিন একটি জম্মুশহরবাসী আমাদের নিকট হইতে কলিকাতা বিষয়ক গল্প খুব কৌতূহলের সহিত শুনিয়া শেষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল যে আমাদের সব ভাল লেবেন আমরা যে এখানকার নকলে এখানকার



জম্মুর মুসলমান রমণী—কাশ্মীরী ছাতের।

আওরাংকা মাকিক কোর্তা গায়ে দি এ আচ্ছা নেহি। বলা বাহুল্য আমাদের গায়েও তখন ঐরূপ জামা ছিল।

এখানে সকল স্ত্রীলোকেই জুতা পরে ও “পর্দা” থাকিলেও মধ্যবিত্ত সকল স্ত্রীলোক হাঁটিয়া পথে বাহির হয়।

এখানকার কাহাকেও শুধু মাথায় বা শুধু গায়ে কখন দেখা যায় না। ভিথারী কোপীন পরিয়া ভিক্ষা করিতেছে তাহার গায়েও লম্বা কোর্তা মাথায় পাগড়ী বা টুপি; কখন কখন পায়ের আবার জুতা থাকে। মুটে মাথায় মোট লইয়া চলিয়াছে তাহারও মাথায় পাগড়ী বাঁধা। হাঁসপাতালে রোগী শুইয়া আছে তাহারো মাথায় কাপড়ের হাল্কা টুপি। আমরা একদিন বাঙ্গালীবেশে থালি মাথায় রাজার দপ্তরখানায় আফিস দেখিতে গিয়াছিলাম। দ্বারের নিকট একজন সিপাহী ছিল আমাদের থালি মাথায় দেখিয়া প্রবেশের পথ আটকাইয়া তিনবার সেলাম চুকিয়া বলিল “আপ্কে ল্যাঙ্গাশির হায় মাক্ কিজিয়ে।” অগত্যা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। বাড়ী আসিয়া শুনিলাম যে এখানে নগ্নশির দেখান অমঙ্গলের চিহ্ন, রাজ্যের পক্ষে বড়ই অশুভলক্ষণ, এজন্য মাথায় কিছু ঢাকা না দিয়া কোনো সাধারণ স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ। এখানকার ফুটবল খেলার খেলওয়াড়রা পর্য্যন্ত মাথায় পাগড়ী বা টুপি বাঁধিয়া খেলে।



জন্মুর রাজপুত ব্রাহ্মণী—ডোঁকরা জাতীয়া—জন্মু ছাচের।

হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করিয়া ভস্মাবশেষ ঘরে লইয়া সম্বন্ধে রাখিয়া দেয়। রঘুনাথজিউর মন্দিরের পার্শ্বে কতকগুলি মন্দির আছে এগুলি রাজবংশীয় মৃতব্যক্তিদের ভস্মাবশেষের উপর নির্মিত স্মৃতি-মন্দির। লাহোরেও কেল্লার নিকট মহারাজ রণজিৎ সিংহের এইরূপ স্মৃতি-মন্দির আছে।

উৎসবের মধ্যে এখানে পূজার সময় দশহারা উৎসব খুব জাঁকালো রকম হয় বিশেষতঃ মহারাজা তখন জন্মুতে থাকেন বলিয়া। মহালয়ার দিন হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ উৎসব চলে। প্রত্যহই নগরে মেলা বসে ও কলিকাতার রামলীলার সংএর মত সং বাহির হয়। তাহার পর বিজয়ার দিন রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি রাক্ষসগণের খড়ু ও কাগজ-নির্মিত মূর্তি দাহ করে। সেদিন সমস্ত নগর আলোক-মালায় সজ্জিত হয় ও আতসবাজী পুড়ান হয়।



জন্মুর ফলওয়ালী—ডোঁকরা রাজপুত জাতীয়।

বৎসবের প্রথম দিনে বৈশাখী উৎসব হয়। সেদিন দলে দলে লোক মিছিল করিয়ঃ কলিকাতার মহরমমিছিলের মত লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে গান ও বাজনার সহিত শহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে রঘুনাথজিউর মন্দিরে আসিয়া থামে। হিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ করে। ফাল্গুন মাসের প্রথম পঞ্চমীতে বাসন্তী উৎসব হয়। সেদিনও বৈশাখী উৎসবের মত মিছিল বাহির হয়। তবে সেদিন ফুলের খুব বেশী ছড়াছড়ি।

এখানকার আদালতে উর্দু ভাষা ও বাংলা তারিখ ও বিক্রমসংখ্য ব্যবহৃত হয়। এখানকার দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধি ভারতীয় দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধির উর্দু অনুবাদ। তবে এখানকার হুএকটি নূতন আইন আছে, যথা, এখানে গোহত্যা করিলে এখন পাঁচ বৎসর কারাবাস হয়, পূর্বে প্রাণদণ্ড হইত। যেখানকার অধিবাসী শতকরা ৭৫ জন মুসলমান সেখানে এই আইন নির্বিরোদে চলিয়া আসিতেছে! নগরের পার্শ্ববর্তী নদীতে মৎস্য ধরিলে ছয়মাস জেল হয়! হত্যাপরাধ প্রমাণিত হইলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড

হয় না। এখানে কোন অস্ত্র-আইন নাই। যে ইচ্ছা বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে।

এখানকার মিউনিসিপালিটিসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় রাজ-সরকার কর্তৃক বিনা টেক্সে দৃষ্ট হয়। বাড়ী থাকার দরুণ বা জল ও আলোর জন্য শহরবাসীকে কোন কিছু টেক্স দিতে হয় না।

শহর পরিষ্কারের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত থাকিলেও এখানকার অধিবাসীরা বড়ই অপরিষ্কার। নগরের ভিতরের সুন্দর সুন্দর পার্কতাপথগুলি দুর্গন্ধ আবর্জনার পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। নগরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিতে গিয়া মাঝে মাঝে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। নগরের পথগুলি সরু ও ধূলিবহুল। অল্প জোরে হাওয়া চলিলে আর বাড়ীর বাহির হইবার জো নাই।

ইহাদের নৈতিক অবস্থা তত সুবিধাজনক নহে। তবে শোনা যায় কাশ্মীরীদের, বিশেষতঃ কাশ্মীরী হাজিগণের, অপেক্ষা বহু অংশে ভাল।

কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের সীমান্তে যে কয়েকটি প্রদেশ আছে তন্মধ্যে লাদক একটি। লাদক প্রদেশে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হিন্দুর নিবাসই বেশী, ইহাদের মধ্যে নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

লাদক প্রদেশটি পর্বতসঙ্কুল এজ্ঞা উর্বরা জমী অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত ও এই সংক্ষিপ্ত ভূমির পুনঃ পুনঃ বিভাগ নিবারণার্থ নারীর বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে; ইহাই ইহার কারণ বলিয়া এখানে নির্দিষ্ট হয়।

লাদকী যৌথসংসারভুক্ত ভ্রাতারা এক যৌথ স্ত্রী ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কেহ পৃথকভাবে বিবাহ করিয়া পৃথক পত্নী গ্রহণ করে তবে তাহাকে পত্নীর সহিত শৃঙ্গরালয়ে অবস্থান করিতে হয় এবং তাহা হইলে তাহার পৈত্রিক বা বংশের এজমালি সম্পত্তির উপর কোনও প্রকার স্বত্ত্ব বা দাবী দাওয়া থাকে না। বিবাহের পর হইতে তাহাকে মুখপা বা পত্নীর দাস বলে।

এখানকার এইরূপ বহুবিবাহের যে সন্তান সন্ততি হয় তাহারা জ্যেষ্ঠেরই সন্তানরূপে পরিগণিত হয় ও তাহারা তাহাদের অগ্রাগ্র পিতাকে ফর্সক বা সহকারী-পিতা বলে।



লাদকের তাতার।

মুখপার সন্তানেরা মাতৃনামে পরিচিত হয়, পিতৃবংশের নাম পর্যন্ত পায় না।

পিতার মৃত্যুর পর এজমালি সংসারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই বংশের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়, অগ্রাগ্র ভ্রাতারা কিছুই পায় না, তবে অগ্রাগ্র পিতা ও ভ্রাতার যাবজ্জীবন ও ভগিনীদিগের বিবাহকালাবধি ভরণপোষণের নিমিত্ত সম্পত্তি দায়সংযুক্ত থাকে।

পুত্রের অবর্তমানে জ্যেষ্ঠা কন্যা সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হয়। ইতিপূর্বে তাহার বিবাহ না হইয়া থাকিলে তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সে বিবাহ করিতে পারে।

এইরূপে লাদকের কোনো সম্পত্তি কখনো বিভক্ত হয় না বলিয়া বহুকাল পূর্ব হইতে লাদকী বাড়ীগুলি একই বংশের নামে আজ পর্যন্ত পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

কন্যা বিবাহযোগ্য হইলে কন্যাপক্ষীদের প্রথমে

একজন মুখপা সন্ধান কবে। তেমন সুবিধা গোছেব পাত্র
পাইলে বিবাহের কথাবার্ত্ত সব ঠিক হইয়া যায়, কত
বাগদত্তা হইয়া থাকে। একমাস হইতে এক বৎসবেব
মধ্যে কোন একটি দিন স্থির করিয়া বিবাহ হয়।

বিবাহের দিন নায়গা (ক্রীত-ব্যক্তি) বা বর আত্মীয়
বয়সাত্মীদের সহিত বোদ্ধ বেষে সম্বিত হইয়া বিবাহ করিতে
কতাব বাড়ী যায়। কতাব বাড়ীর দ্বারদেশে পৌছিলে
পর কতাপক্ষীরেবা লাঠি লইয়া তাক্স করে। এইরূপে একটা
মিথ্যা যুদ্ধেব অভিনয় হয় এবং বয়পক্ষীরেবা যতক্ষণ কতাব-
পক্ষীদের কতকগুলি বাধা প্রশ্নের যথামত উত্তর না দেয় ও
কিছু মুদ্রা না দেয় ততক্ষণ কতাপক্ষীরেবা পথ ছাড়ে না।
সেই মুদ্রা বর যৌতুকরূপে আবার ফেরত পায়।

পূর্বকালে যুদ্ধে কতাব হরণ করিয়া যে বিবাহ হইত
এই প্রথা হইতে তাহার বতকটা আভাস পাওয়া যায়।
উভয়পক্ষেরই আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে বোদ্ধ পুরোহিত বোদ্ধ
ধর্মপুস্তক হইতে শ্লোক পড়িয়া বিবাহ সম্পন্ন করে।
— তাহার পর দিনকতক বিয়া আত্মীয়স্বজনকে লইয়া
আমোদ আত্মলাদ ও উৎসব হয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণ।

নীলা

আমায় আমি করব বড়

এইত তোমার মায়া—

তোমাব আলো রাঙিয়ে দিয়ে

ফেলব বতীন ছায়া।

তুমি তোমার বাথবে দূরে,

ডাকবে যুঁজে কতই সুরে

আপ্নারি বিহু তোমার

আমায় নিল কায়া।

বিবহগান উঠল বেজে

শিখগগনময়

কত রঙের কয়া হাসি

কতই আশা ভয়।

কত যে চেউ ওঠে পড়ে,

কত স্বপন ভাঙে গড়ে,

আমাব মাঝে রচিলে যে

আপন-পবান্নয়।

এই যে তোমার আড়ালখানি

• দিলে তুমি ঢাকা—

দিগনিশির তুলি দিয়ে •

হাজার ছবি আঁকা,—

এরি মাঝে আপ্নাকে যে

বাধা বেধে বসলে সেজে,

সোজা কিছু রাখলে না, সব

মধুর বাক বাক।

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে

তোমার আমার মেলা।

দূবে কাছে জড়িয়ে গেছে

তোমাব আমার খেলা।

তোমার আমার গুঞ্জরণে

বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,

তোমার আমার যাওয়া-আসায়

কাটে সকল বেলা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

শাসনপ্রণালী।

তৌ-ছিং-ইয়েকে চারিদিন একপ্রকার খাঁচার মধ্যে
আবদ্ধ করিয়া রাখার পর তিন মাসের জেল এবং ১৫,০০০
টাকা ভরিমানা কবাব হকুম হইল।

বিশেষ অল্পসঙ্কানে আনিতে পারিলাম যে ইনি গত
বৎসব বন্দার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মিচোয়া জেলার সৈনিক
বিভাগের মাল বহনের জন্য থচর জোপাইবার ঠিক লইয়া
ছিলেন। মিচোয়া জেলা-প্রান্তে চীনসীমান্তে পিয়েনা-মা
নামক একটি ক্ষুদ্র স্থান আছে। ঐ স্থান এযাবৎ
না চীনার না ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে ছিল।

চীনারা ঐ স্থান আপন এলাকার অন্তর্গত মনে করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন কবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ স্থান বর্মার অন্তর্গত মনে করিয়া দখল করিয়া তথায় দুর্গ নির্মাণ করিতে প্রয়াসী হন। মিঃ তৌথের খচব এই ব্রিটিশ অভিযানে গত বৎসর ব্যবহৃত হইয়াছিল। চীনারা ইহার এই কার্য স্বদেশদ্রোহিতা মনে করিয়া ইহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই গিয়েনমার বিষয় এখনও নাকি নিষ্পত্তি হয় নাই। বর্মার গবর্ণমেন্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে লেখালেখি চলিতেছে। গত বৎসর চীনাৰা এই কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজদিগের কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া 'বয়কট' ঘোষণা করিয়াছিল।

লি-কেন-ইয়ে আসিবার পর ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইলে এই খচর জোগানব অপরাধে ইহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

টাই-হুং-শিন—মিঃ টাই কাষ্টম কমিশনারের বড় কেরাণী। ইনি পূর্বে তিব্বতে লাসাতে প্রায় ১৪ বৎসর চীন আশানের সেক্রেটারি ছিলেন। লর্ড ল্যান্ডাউনের সময় আশানের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্ত কলিকাতা গিয়াছিলেন। তাহার পর আজ ১০১২ বৎসর যাবত কাষ্টম অফিসে কাৰ্য্য করিতেছেন। ইনি কমিশনার হাওয়েল সাহেবের সঙ্গে বিদ্রোহের পর ভাষা গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে আসেন। এক মাসের মধ্যে কোথাও কিছুই না, হঠাৎ একদিন টাওঠাই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া ডাকিয়া লইয়া কয়েদ করেন। কমিশনার তাঁহার জন্ত জামিন হইতে চাহিলে সে জামিন অগ্রাহ্য হইল। ক্রমে মনোবদ্বন্দ্বি হইতে লাগিল। একদিন ডিম্পেনসারিতে কাৰ্য্য করিতেছি, হঠাৎ আমার সহিস কহিল যে টাই কেরাণীকে হত্যা করিবার জন্ত লইয়া গিয়াছে। আমি এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ঘোড়া প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার চড়িয়া দ্রুতবেগে বধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি লোকারণ্য। দুইটা লোকের মুণ্ড ছিন্ন হইয়া দেহ হইতে দূবে বক্ষিপ্ত আছে। দেখিলাম সে মুণ্ড টাই কেরাণীর নহে। তখন মনে আশ্বাস জন্মিল। টাইয়ের এক জ্যেষ্ঠ উর্দ্ধশাসে কাদিতে কাদিতে তথায় গিয়াছেন। অপর জ্যেষ্ঠ টাওয়ার

করিতে করিতে গিয়া কনসালের সাহায্য প্রার্থনা করায় কনসালের লোকও ঘোড়া ছুটাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক টাইকেও হত্যা করিবার প্রস্তাব ছিল, এবং রটনাও হইয়াছিল, তবে কি বিবেচনার তাঁহাকে বধ্যস্থলে লইয়া যায় নাই জানি না।

টাইয়েব যে অপরাধ তাহা কাল্পনিক। চাং-ওয়েন-কোরানেব দুই জন সেপাই এই বলিয়া এক দরখাস্ত করে যে “কর্ণেল ছাউকে বিদ্রোহের রাজিতে হত্যা করা হয়, তাঁহার ১৫,০০০ টাকা টাই কেরাণীর নিকট আমানত ছিল।” কর্ণেল ছাউ টাইয়েব ঘরের পার্শ্বের ঘবে বাস করিতেন। তাঁহাকে হত্যা করার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ টাইয়ের বাড়ীতে পলাইয়া আশ্রয়লাভ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও ভাই বর্তমান ছিলেন। কেহই সে টাকার কথা জানেন না। অক্টোবর মাসে ঘটনা, আর মার্চ মাসে এই টাকার কথা উঠিল, তাহাও তাঁহাব স্ত্রী বা ভাই দাবি করেন নাই। কোথাকার দুই জন সেপাই দরখাস্ত করে। মূল কথা টাই কেন টেকিয়ে ছাড়িয়া গেলেন সেই এক কারণ, অপর কাণে চাংএব প্রিয়পাত্র এক কেরাণীকে কমিশনার নানা কারণে বরখাস্ত করিয়াছিলেন, ইহাও প্রতিশোধ লইবার জন্ত কমিশনারের প্রিয়পাত্র টাইকে প্রাণে বধ করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। অনেক লেখালেখির পর টাইকে মুক্তি দিয়াছে কিন্তু মোকদ্দমা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই।

লি নামক একব্যক্তির জ্যেষ্ঠ ইউন-ছাংফু সহরে লি-কেন-ইয়েব নিকট এক দরখাস্ত করে যে লিন-হাই নামক এক ব্যক্তি তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়া তাহার জেড পাথরের বালা ও অন্যান্য দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে। লি-কেন-ইয়ে ইউন-ছাংফু হইতে টেলিগ্রামে টেকিয়ে “টাওঠাইকে হুকুম দেন যে “লিন-হাইর শিরশ্ছেদ কর।” টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র মন্ধ্যাব প্রাক্কালে তাহাকে ধৃত করা হয়, পরদিন তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। কেমন সুন্দর বিচার। আসামী রহিল টেকিয়ে, করিয়াদি ও বিচারক রহিল চারিদিনের পথ দূরে। টেলিগ্রামকে সমস্ত সম্পন্ন হইল।

এই প্রকার ঘটনা আর কত লিখিব। আমার ডায়ারী এইসকল নববলির ঘটনায় পূর্ণ। ইউন-ছাংফু সহরে

বদমাইস্ নামকটা সেপাইগণ লুটপাট করে। তজ্জন্ম প্রতিদিনই সেই স্থানের লুণ্ঠনকারী মনে করিয়া সন্দেহে কত নরবলি হইয়াছে। একদিন নিকটবর্তী একটি গ্রাম হইতে পাঁচ জন লোককে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনিয়া বাজারের মধ্যে তাহাদিগকে বলি দেওয়া হইল। ইউনছাংকুর লুণ্ঠনকারী বলিয়া তাহাদিগকে সন্দেহ করা হয়। ধরিয়া আনিলে লি-কেন-ইয়ের নিকট সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি তাহাদিগকে না দেখিয়া বা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই অমনি হুকুম দিলেন “সা-ঠা-মেন” অর্থাৎ তাহাদের মাথা কাটরা ফেল। অথচ মল্লসন্ধানে জানা গেল এই লোকগুলি উক্ত সহরে আদবেই যায় নাই। তাহার কুমারের শাজ কবিত, ঘরের টালি বা খোলা প্রস্তুত করিত। বিদ্রোহের পর হইতে সৈন্ত-দলভুক্ত হয়, এবং লির প্রসাদে কার্য হইতে অপহৃত হয়।

একজন জীলোক অপব এক পুরুষের সঙ্গে গিয়া কোন মন্দিরে লুকাইয়া ছিল। তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া উত্তরেরই শিরশ্ছেদ করা হইল। এক ৬০ বৎসরের বুকের নামে অভিযোগ হয় যে, সে কোন ব্যক্তির ৭০৮০ টাকা প্রভাষণ করিয়া লইয়াছে। অমনি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মাথা কাটরা ফেলা হইল। আমরা গিয়া দেখি তাহার কঁটা ও জী কাঁদিয়া গর্ভাংগড়ি বাইতেছে, শব্দধার আঁনা হইয়াছে। একজন লোক তাহার ছিন্ন মূণ্ডকে দেহের সঙ্গে সেলাই করিতেছে। এই প্রকার কত লোককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য বিনা বিচারে হত্যা করা হইয়াছে তাহা সমস্ত উল্লেখ করিতে গেলে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করা হইবে।

১৯০৩ খৃঃ আন্তর্জাতী মার্চ এখানে আসিয়াছি, কিন্তু ইতিপূর্বে এমন নরবলির বীভৎস কাণ্ড আর দেখি নাই। পূর্বে পবর্নমেন্টের আমলে কোন ব্যক্তির গুরুতব অপবাদ বিচারে সাব্যস্ত হইলে পরে গবর্ণর জেনারেলের আদেশ লইয়া তাহার প্রাণদণ্ড হইত। বৎসরে দু চারিটির বেশী প্রাণদণ্ড বড় হইত না। এবার এই বৎসক মাসে সমস্ত চীন দেশে কত লক্ষ লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই যে প্রায় প্রত্যহই দুই চারি পাঁচটির শিরশ্ছেদ করিয়া প্রকাশ স্থানে হাটের মধ্যে তাহাদের লাশ সমস্ত

দিন ধরিয়া পড়িয়া থাকে, কখন কখন ছিন্নমুণ্ডসকল নগর-প্রাচীরের দ্বারে ঝুলাইয়া রাখা হয়, ইহাতে লোকের মনে যে কি আতঙ্ক বা চুঃখ বোধ হয় তাহা বলা যায় না। কিন্তু এখানকার একটা লোককেও কাহারো ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিতে শুনি নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বরং লোকে বলিয়া উঠে “বেশ হইয়াছে এসকল লোককে কাটরা না ফেলিলে চোব ডাকাইত দমন হইবে না।” তবে একটা জীলোক হঠাৎ এই মূণ্ডমালা দেখিয়া পাগল হইয়াছে। কসাই যখন গর ভেড়া জবাই করে, তাহা দেখিয়াও আমাদের দেশের লোকের প্রাণে চুঃখ বোধ হয়, কিন্তু চীনাদের প্রাণে যে মনুষ্য বধে কিছুমাত্র চুঃখ বোধ হয় তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। মনুষ্যের জীবন কত মূল্যবান! তাহা কি চীনাদিগের নিকট এত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়? পূর্বে তোপখানাব একটা সৈনিক কর্মচারীর ফটা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে (ট্র্যাভ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)। তাহার কৃত্রিম দস্ত প্রস্তুত করিতেছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম উক্ত ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহার হৃদপিণ্ড কাটরা লইয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা নাকি কাটা-ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়, কেননা এ লোকটা নাকি বড় চরম ছিল। অপর দুইটা মাথা কাটার ফটে দিয়াছি তাহার একটীর জিহ্বা লইয়া গিয়াছে তাহাতেও ঔষধ প্রস্তুত হইবে।*

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন এদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি অল্পই ছিল। অনাধেবল নেপিয়ার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ তর্ক হইত। তিনি চীনাদিগের উপর বড় চটা ছিলেন। একদিন তিনি বলিলেন They (Chinese) have no souls। আমি কহিলাম Nc Sir, I am sure that they have। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন If they have as you say, that is for the hell, not for heaven। তাহার সেই কথার মর্ম আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি।

বাস্তবিকই চীনাদিগকে চেনা বড় কষ্টকর। সাংহাইয়ের

* এই ছবিগুলি অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া মুদ্রিত হইল না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

† ইনি লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাকডালার পুত্র।

একটা সাহেব এদেশে দশ বৎসর বাসের পর একদা বলিয়াছিলেন যে তিনি চীনদেশ ও চীনজাতি সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বিশ বৎসর এদেশে অবস্থিতির পর তিনি একদা কহিলেন যে এদেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁহার জানিবার আরো অনেক বাকি আছে। ৪০ বৎসর বাসের পর কহিলেন যে তিনি এযাবত কিছুই জানিতে পাবেন নাই। বাহা তিনি পূর্বে জানিয়াছিলেন সমস্তই ভুল। তবে সকল দেশে সকলেব মধ্যেই একটা ব্যতিক্রম আছে, এদেশে নাই তাহা বলা অজ্ঞার।

ব্যক্তিগত কথা।

(১) ছেন্-চির-খোয়ে - বিদ্রোহের পূর্বে এই ব্যক্তি নুতন সৈন্তের একজন নগণ্য ফাইজাং বা নায়ক ছিলেন।

চীন দেশে, কি সদাপর, কি সাধারণ প্রজাবর্গ, কি সরকারী সৈনিক বা সিভিল বিভাগের কংচারিগণ সকলের মধ্যেই গুপ্ত সমিতি আছে। সেই গুপ্ত সমিতি দ্বারা যত সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যেব পবামর্শ গোপনে হইয়া থাকে। গুপ্ত-সমিতি ইহাদের সমাজের অঙ্গবিশেষ।* বিদ্রোহের পূর্বে হইতেই এই-সকল সমিতির কার্য অতি ব্যস্ততাব সহিত চলিতেছিল। নুতন সৈন্তগণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব সমাক্রমে পবিপক হইলে, পুৰাতন সৈন্তদিগের মনে ইহারাই সেই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া কার্যসিদ্ধির সুযোগ অনুসন্ধান কবিতো থাকে। এইসকল গুপ্তমন্ত্রণার চাং ওয়েন-কোয়ান ও ছেন-চির-খোয়ে যোগ দেন।

ছেন্-চির-খোয়ের সর্বোপনিহ কণ্ঠচাবী কর্ণেল চাং হইতে এইসকল বিদ্রোহের ভাব ইহারাই গোপন রাখে। ২৭শে অক্টোবর রাত্রি নয়টাব ভোপ পড়িলে সেপাইগণ হঠাৎ বারাকের সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং কর্ণেল চাংকে বলে যে “আমরা সরকারি ইয়ামিন আক্রমণ করিব।” তাহাতে কর্ণেল চাং রাগান্বিত হইয়া বলেন যে “তোমরা অথবা গোলযোগ করিও না। আপন আপন স্থানে যাও।” ইনি বারাকের উপরেব সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান, নিজে সৈন্তগণ রাইফল লইয়া

দণ্ডায়মান। ইতিমধ্যে হঠাৎ বাইকলের ‘আওয়ার্ড’ হইল এবং কর্ণেল চাং খড়াশ-করিয়া পড়িয়া গেলেন। বাইকলের গুলি ইহার বক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছিল তবুও তাঁহার তন্দ্রে মৃত্যু না হওয়ার নুশংসেবা দ্বিস্তলের গুলি দ্বারা তাঁহাকে একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়া পরে সকলে নগরপ্রাচীরের দক্ষিণ দরজা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইয়ামিন আক্রমণ কবিল। যে ব্যক্তি কর্ণেল চাংর বক্ষে গুলির আঘাত করিয়াছিল সেই ব্যক্তি ছেন-চির-খোয়ে। বিদ্রোহের পর ইহার এই অমার্জক কার্যেব পুরস্কারস্বরূপ পদোন্নতি হইয়া সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন। এবং ইহার অধীনে সহস্র বিদ্রোহী সৈন্ত এখান হইতে বার দিনের পথ টালিহু সহর আক্রমণেব জন্ত প্রেরিত হইল। টালিহু সুদূর স্থান, তাহার পূর্বদিকে এক বিস্তীর্ণ হ্রদ, পশ্চিমদিকে দুয়ারোহ পর্বত। টেঞ্জিয়ে হইতে বাইতে হইলে দক্ষিণদিক দিয়া যাইতে হয়। টালিহু টেঞ্জিয়ে অপেক্ষা অতি বড় সহর, তথায় তোপখানা ও বহু শিক্ষিত সৈন্ত থাকে। তাহা আক্রমণ করিতে যাওয়া ধুরূহতামাত্র। টালিহু হইতে সৈন্ত গোপনে বাহিব হইয়া আসিয়া পর্বতের আড়ালে দশমাইল দূরে লুকাইতভাবে থাকিয়া ছেন্-চির-খোয়ের সৈন্তকে বেটন করিয়া ফেলে। তিন স্থানে যুদ্ধ হয়। তিন যুদ্ধেই তিনি পরাভূত হইয়া প্রায় অর্ধেক সৈন্ত নষ্ট করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার মাল, রসদ ও খরচ সমস্ত টালিহুর সৈন্তের হস্তে পতিত হয়। এই বীর পুরুষ যখন অবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া ফিবিয়া আসেন তখন ইহাদের অভ্যর্থনার খুব আয়োজন হয় এবং সহরে জাতীয় পতাকা উড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে লি-কেন-ইয়ে আসিবার দুইদিন পূর্বে ইনি এই স্থান পবিত্যাগ করিয়া বন্দী যান। তখনো সহরে খুব ধুম হয়। কিন্তু টালিহু আক্রমণের ধুঁতায় জন্ত লি-কেন-ইয়ে ইহাকে পাইলে শিরশ্ছেদ করিতেন।

(২) চাং-ওয়েন-কোয়ান—ইহার কথা পূর্বে কয়েক-বার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি এখানে একজন নগণ্য লোক ছিলেন। কিন্তু ইহার ভিতর মে একরূপ তেজস্বিতা, সাহস ও দৃঢ়তা আছে তাহা পূর্বে কেহ বুঝিতে পারে নাই। ইনিই বিদ্রোহের দুইমাস পূর্বে হইতে এইসকল

* মডার্ন সিভিল ১৯০৭ খৃঃ কেমব্রিজের মাসের কলামে এই চীন দেশের গুপ্ত-সমিতির বিশেষ বিবরণ প্রাপ্য।

সৈন্যদিগের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাব বেধ দৃঢ় করিয়া লন এবং নানা প্রকার কলনা করিতে থাকেন। শুনলাম যে ডাঃ সুন-ইয়েট-সেনের পত্রও ইহাঁদের গুপ্ত-সমিতির নিকট আসিয়া কর্তব্য নিৰ্দ্ধারণ করিয়া দেয়। কাঙ্গাই স্বভার সঙ্গে মন্ত্রণা হইয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্রোহের দিন ইনিই কতকগুলি সৈন্য গোপনে ছদ্মবেশে নগরপ্রাচীরের ভিতর প্রেরণ করেন। এইসকল লোক অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়া দশটার সময় নগরপ্রাচীরের দ্বার খুলিয়া দেয়। ইনিই লিকোটানটাই ও ছেন-টাই-ফোং নামক দুইজন লোককে গোপনে কর্ণেল ছাউকে হত্যা করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। কর্ণেল ছাউ সহরের বাহিরে নদীর অপর পারে ক্ষুদ্র একটা কেল্লার পুরাতন সৈন্তের সেনাপতি ছিলেন। ইনি তাঁহার কেল্লার নিকট টাই কেয়াগীর বাটীর প্রান্তে সপরিবারে বাস করিতেন। উক্ত দুইজন লোক গিয়া কর্ণেল ছাউকে ডাকে যে “হজুরের নিকট আমরা একটা সংবাদ দিতে আসিয়াছি।” কর্ণেল ছাউ শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া যেই বাহিরে গিয়াছেন, অমনি ঐ দুটি লোক ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলে তিনি চোঁচাইয়া দৌড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিবারমাত্র মুহূর্তমধ্যে তাঁহাকে থণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া লোক দুইটা পলায়ন করে। ইহার পরই তাঁহার অধীনস্থ সৈন্তগণ নূতন সৈন্তের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দেয়। কর্ণেল চাং ও কর্ণেল ছাউকে হত্যা করিয়া উভয় সৈন্ত মিলিত হইলে চাং-ওয়েন-কোয়ান ও ছেন-চির-খোয়ে সৈন্ত চালনা করিয়া সমস্ত ইয়ামিন আক্রমণ করিলেন। তাহার বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরে ইহার নাম হইয়াছে চাং তু-তু অর্থাৎ জেনারাল কমাণ্ডিং অফিসার চাং।

এই বিদ্রোহের যে পরিণাম কি হইবে কেহই তখন তাহা জানে না। হয়ত কার্যসিদ্ধি, না হয় ধনেপ্রাণে নিম্ন ল হওয়া। ধনে প্রাণে ধ্বংস হইবারই অধিক সম্ভাবনা তখন ছিল। প্রজাসাধারণও তখন প্রায় দুই নৌকায় পা দিয়া ছিল। ইউনান প্রদেশের তখন কেত্থাংও বিদ্রোহ হয় নাই। রাজধানী ইউনানফুও তখন নড়াচড়া করিতে

সাহস পায় নাই। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র টেক্সিয়ে যে এই প্রদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ প্রদর্শক হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এতবড় গুরুতর একটা কার্য করিতে যে সাহস পায় নিশ্চয়ই তাহাকে ধন্ত মনে করিতে হইবে। চাং তু-তুর তখন সংকট কত? এদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে সৈন্ত আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে যদি বিদেশীদিগকে রক্ষা না করা যায়, অপরদিকে মাঞ্চু রাজবংশের সৈন্ত আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। তাহা ভিন্ন নিজের অধীনের বিদ্রোহিগণ প্রজার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠ করিতে পারে এবং তাহাতে বাধা পাইলে তাঁহাকেও গুলি করিয়া কোন মুহূর্তেই তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে। সর্বোপরি সৈন্ত গঠন ও রাজ্যে শান্তি রক্ষার চিন্তায় তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোন কোন দিন রাজিকালে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই—নানা উদ্বেগে রাত্রি কাটাতে হইয়াছে। তবুও লোকটার মাথা বিগড়িয়া যায় নাই, বরং স্থিরচিত্তে দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছেন এবং এই গুণেই এখন মহাসম্মানজনক পদ লাভ করিয়াছেন। লি-কেন-ইয়ে আসিলে কিছুদিনের জন্ত সহরের কর্তৃত্ব ইহার হাতে ছিল না। ইনি এখান হইতে বদলি হইয়া টালিফুর জেনারাল হইয়া গিয়াছিলেন। ইনি টেক্সিয়েই লোক।

ফটো তুলিবার জন্ত ইনি আপন মাতা সহ একদিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ফটো তুলিয়া কনসাল সাহেবকে দেখাইলে তিনি কহিলেন “Is that the rotten man?” আমি কহিলাম “Yes, sir.” মনে মনে হাসি পাইল যে চাং ইউরোপীয় হইলে Hero বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন। যেহেতু তিনি আসিয়াবাসী তখন নিশ্চয়ই “রটন ম্যান” তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে।

(৩) লি-কেন-ইয়ে—ইনিও টেক্সিয়ের লোক। ইনি পূর্ব গবর্ণমেন্ট কর্তৃক জাপানে প্রেরিত হইয়া যুদ্ধকার্য শিক্ষা করিতেছিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর কাল জাপানে থাকিয়া যুদ্ধকার্য শিক্ষা করিয়া ইউনানফু সহরে গবর্ণমেন্টের সৈনিকবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। প্রায় দুই বৎসর যাবত এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।



চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের সর্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের মাতা। ইনি খুব বুদ্ধিমতী ও সাহসী। শুনা যায় যে তাঁহার পুত্রের রাজনৈতিক ভাব গঠনে ইনি সহায়তা করিয়াছিলেন।

(ডাক্তার রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

২৭শে অক্টোবর টেঙ্গিয়ে বিদ্রোহী হয়। ২৯শে এই সংবাদ ইউনানফু পৌছে। ৩০শে লি-কেন-ইয়ে তথাকার লেপ্টেন্যান্ট জেনেরাল ছাই অ নামক ব্যক্তির সঙ্গে যোগ দিয়া তথাকার জেনারেল চুং-চেন-লুংকে হত্যা করিয়া নগর আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু তথাকার ভাইসরয় বা গবর্ণর জেনারাল আত্মসমর্পণ করায় তাঁহার প্রাণবধ করিলেন না। তাঁহাকে বরং থরচ-পু-দিয়া সহরে হইতে নিঃশূল করিয়া পৌছাইয়া দিলেন।

বর্তমান সমস্ত ইউনান প্রদেশের মধ্যে ইউনানফু সহরে ছাই-অ বা ছাই-তু-তু (জেনেরাল ছাই) সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তা, তাঁহার নিম্নে লি-কেন-ইয়ে এবং তন্নিম্নে চাং-ওয়েন-কোয়ান। জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে ইউনানফু হইতে প্রায় দুই সহস্র পদাতিক সৈন্ত, তোপখানা ও কলের কামান ও দ্রুত আওয়াজকারী তোপ সহ যাত্রা করিয়া পথে এক একটা সহরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া নূতন নিয়মামুসারে তথাকার শাসনকার্যের সৃষ্টিলা করিয়া তথা হইতে অপর সহরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং এই প্রকারে ক্রমে প্রায় দুই-মাসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার সৈন্তের নূতন ধরণের পরিচ্ছদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং সৈন্তগুলি অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত। তিনি নিজে এক মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে শাসনকার্যের সৃষ্টিলা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় প্রতিদিনই নানা প্রকার ঘোষণাপত্র জারি হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের শিরশ্ছেদ হইতে লাগিল।

এখানে পৌছিবার কিছুদিন পরেই চাং তু-তু কর্তৃক গঠিত সৈন্তসকলকে ইনি ক্রমে জবাব দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় সহস্রাধিক সৈন্তের চাকরি গেল। এদিকে এই সহরে আড়াইশত ভলান্টিয়ার নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও বরখাস্ত করিলেন। চাং তু-তুর লোক বরখাস্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারেন মনে করিয়া তাঁহার ইয়ামিন হইতে সমস্ত রাইফল, বন্দুক, ও গোলা বারুদ প্রভৃতি সরাইয়া লইয়া নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন। ইহা দ্বারা আরো অসন্তোষ বৃদ্ধি হইল। ইনি দুইদিন প্রসিদ্ধ ক্রুপ কামানের (Krupp gun) ও কলের কামানের চাঁদমারি করিয়া প্রজাবর্গকে, স্কুলের ছাত্রদিগকে ও সমস্ত সৈন্তকে দেখাইয়া দিলেন। আমরাও দেখিতে গিয়াছিলাম। চাঁদমারি গড়পড়তা মন্দ হয় নাই। ক্রুপ কামানের গোলা প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু গোলা ফাটিয়া তাহার শেলগুলি দ্বারা চাঁদমারির লক্ষ্য অনেকটা ভেদ হইয়াছিল। কলের কামানের প্রত্যেক একহাজার গুলির মধ্যে গড়ে আড়াই শত গুলি চাঁদমারির লক্ষ্যভেদ করিয়াছিল। বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। টেঙ্গিয়েতে এদৃশ্য এই প্রথম। এই-

সকল কামান জার্মানির তৈয়ারি। তবে সাধারণ কামান এখন হুপে সহরে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলের কামান এখনও ইহারা প্রস্তুত করিতে পারে নাই।

জেনেরাল লি-কেন-ইয়ে এখনকার সহর রক্ষার বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। সহরের মোড়ে মোড়ে অস্ত্রধারী পুলিশের আড্ডা হইয়াছে। আপন আপন হাতার মধ্যে রাইফেলধারী পুলিশসৈন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পূর্বে কখনও এমন ছিল না। সকলে আশঙ্কা করিয়াছিল যে, লি-কেন-ইয়ের সৈন্য এস্থান পরিত্যাগ করিলে দুর্বৃত্ত-গণ সহর লুট করিবে। কিন্তু এই পুলিশের বন্দোবস্ত করার জন্য ঐ প্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। আজ একমাস হইল ইনি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইউনানাকু গমন করিয়াছেন।

ইউনানাকুর ছাই তু-তুর সঙ্গে ইউন-সী-খাই বা জুন-ইয়েট-সেনের দেশশাসন সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে পরামর্শ হইতেছে ও তদনুসারে কার্য চলিতেছে।

লি-কেন-ইয়ের সঙ্গে টাওটাই আসেন। তিনি আসিলে কাষ্টম কমিশনার পুনরায় এখানে আফিস খোলেন।

টেন্সিয়ে, চীন।

শ্রীরামলাল সরকার।



তারহীন টেলিফোনের আবিষ্কারী মিঃ কলিন্স, শিয়াটল A. V. P. প্রদর্শনীতে বসিয়া যন্ত্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি প্রদর্শনীতে বর্ণ পদক পাইয়াছেন।

প্রকার পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, সময়ে উহার কিছু ফল ফলিতে পারে। ব্যোমযানের ক্রমশঃ উন্নতি ও অত্যধিক প্রচলনে বর্তমান “সভ্য ও খৃষ্টান” জগতে কিরূপ ফল ফলিবে তা তুর্ক-ইটালী যুদ্ধে বেশ দেখা যাইতেছে। ইটালী ব্যোমযানের সামরিক ব্যবহারে তুর্কসৈন্যকে কিরূপ বিপর্যস্ত করিতেছে তাহা সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। “রামায়ণে,” “ইলিয়দে” যাহা শুধু বর্ণনায় মানব-কল্পনায় আবদ্ধ ছিল—বিজ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে আজ তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে।

তারহীন টেলিফোন উপরোক্ত দুই আবিষ্কার হইতেও আধুনিক। ক্ষণপ্রভা সৌদামিনী এখন তার-বাহন ব্যতিরেকে নগরের গৃহে গৃহে আঞ্জালুবর্তিনী বার্তাবাহিনী দূতীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

মার্কিনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এ, ফ্রেডেরিক কলিন্স (A. Frederick Collins) তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে তারহীন-টেলিফোন কন্মোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে উহার প্রত্যেক-টারই বিশেষ ক্ষেত্র, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্ভর-উপযোগী হইয়াছে। বস্তুতঃ উহার উন্নতি এত দ্রুত সাধিত হইতেছে যে আমার এই প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি বিভিন্ন প্রণালী যে সর্কাসুন্দর হইয়া উঠিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

তারহীন টেলিফোন

গত দশ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানজগতে অনেক নূতন তত্ত্ব ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার মধ্যে তারহীন টেলিগ্রাফ, তারহীন টেলিফোন এবং ব্যোমযান সর্বপ্রধান। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তারহীন টেলিগ্রাফের অন্ততম উদ্ভাবক, কিন্তু আমরা অগৌন জাতি বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ আবিষ্কার সম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে বসু মহাশয়ের নাম বড় বেশী উল্লিখিত দেখা যায় না। মার্কিনি প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ উহার সমস্ত কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

ব্যোমযান প্রভৃতি আকাশ-তরণীর উন্নতি ও পরীক্ষা-গবেষণা ভারতে আইন দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ভারতসন্ধান ছ চার জন উহার সংশ্রবে নানা



ভারতহিতৈষী প্রজাবন্ধু উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ান •
কলিলের কলে কথা বলিতেছেন।

মিঃ ফ্রেডেরিকের তারহীন-টেলিফোন-যন্ত্রের সহায়তায় যে-কোন আকারের বাড়ীর কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে, নগরের এক বাটী হইতে অল্প বাটীতে বার্তা প্রেরণ করা যাইতেছে। প্রাচীরের সংখ্যা, ব্যবধানের প্রশস্ততা উহার বাধা জন্মাইতে পারে না। পূর্বে টেলিফোন করিতে হইলে তার ও স্তম্ভশ্রেণীর রীতিমত যোগাযোগ রাখা আবশ্যক হইত, এক্ষণে আর উহাদের প্রয়োজন হয় না। দুই গৃহে দুইটা “গ্রাহক” ও “প্রেরক” সংযুক্তযন্ত্র (Receiver and Remitter Composite) থাকিলেই হইল। তারযুক্ত টেলিফোনের যন্ত্রের ভিতর দিয়া কথা-বার্তা বলিতে ও শুনিতে যে যে প্রক্রিয়া করা আবশ্যক তারহীনেরও প্রায় তাই আবশ্যক। তার না থাকায় কোন অসুবিধার কারণ হয় নাই।

সুবিধা ও অসুবিধা। তারহীন টেলিফোন কাজে আসিবে না এক্ষণে অবস্থা খুবই কম। পরন্তু তারযুক্ত টেলিফোন অপেক্ষাও ইহার সুবিধার দিক আছে। গিরি, নদী, বন জঙ্গল বা অগ্নিবিধ প্রাকৃতিক বাধা বিয়ে যেখানে

সর্বজন-জ্ঞাত সাধারণ তারযুক্ত টেলিফোন-সম্প্রদায় ও তার প্রভৃতি স্থাপন করা কষ্টসাধ্য অথবা অসম্ভব সেখানেও তারহীন টেলিফোন অশেষভাবে কার্যকর হইবে।

ফরী-জাহাজ নৌকা প্রভৃতি নদী হ্রদ বা সমুদ্রবক্ষ হইতেই তীরের আফিস হইতে আদেশ উপদেশ লইয়া যথাবশত পথে যাইতে পারিবে।

পরস্পর সম্মুখীন দুই জাহাজের “পাইলট” মাঝিকে আর উচ্চস্বরে চাৎকার করিয়া অথবা স্বর-প্রসারক “মেগাফোন” সাহায্যে পরস্পরের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিয়া রিপোর্টের ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। যুদ্ধস্বরেই কার্যোদ্ধার হইবে।

তারহীন টেলিফোনে জাহাজ নৌকা প্রভৃতির “সিগন্যাল” দিবারও এক উন্নত প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। গাড়কুয়াসাজের বা অন্ধকারাবৃত বড়বাতায় বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে অথবা নদীতে ইহার ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। উহার ফলে কত সংঘর্ষণ আপদ বিপদ হইতে তরণী রক্ষা পাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতপক্ষে উহা নাবিকগণের অশেষ উপকারে লাগিবে। টাইটানিক্ পোতের ধ্বংস ও উহার ভয়াবহ পরিণাম সভ্যজগতে কি ছলছল বাধাইয়াছে, তারহীনের উপকারিতা আজ সকলে বুঝিতেছে। আজকাল প্রচলিত প্রণালীতে যখন কোন বার্তা প্রেরণ করা হয়, তখন তাড়িৎপ্রবাহী তারকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে অল্পপ্রবাহিত (charged) করিতে হয়। ঐরূপ করিবার সময় তারে একপ্রকার তরঙ্গ-বিকম্পন উপস্থিত হয়। টেলিফোনের যে-কোন শব্দগ্রাহক (Receiver) কানের সঙ্গে ধরিলেই ঐ কম্পনের শা শা শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কথাগুলি বেশ স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাবে উচ্চারিত হইলেও তারের বৈদ্যুতিক তরঙ্গকম্পে উহা যতই দূরে নীত ও প্রতি-ধ্বনিত হয় ততই উহা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু তারহীন টেলিফোনে আমাদের স্বরতরঙ্গকে আকাশবঙ্করে একবার ঠিকভাবে মিশাইয়া দিতে পারিলেই উহা বিস্তৃত ও অবিকৃতভাবে বহুদূরেও পৌছিতে পারে। ইহার একটা কাঙ্ক্ষণ, যখন আকাশের (ইথারের) মধ্যস্থতায় কোন বার্তা পাঠান হয় তখন আর চিরতড়িৎপূর্ণ

আকাশকে কৃত্রিমভাবে “চপল” করিতে হয় না। সে নিজেই চিরচঞ্চল।

ইহা হইতে দেখা যায় তারহীন টেলিফোন “সতার” হইতেও স্বাভাবিক। বুটো অপেক্ষা সাতটা ত চিরকালই প্রকৃষ্ট পদ্ম—তা আবার বিজ্ঞানরাজ্যে। তারহীনের অমুঠানও স্বল্পব্যয়সাধ্য। উহার জন্ত তাত্র-তার, মূল্যবান শালের খুঁটি অথবা লৌহস্তম্ভ দরকার নাই; একটু ঝড়ঝটিকার মেরামতের জন্ত ব্যয় আবশ্যক নাই। অনন্ত নীল আকাশ উহার স্তম্ভ; চপলা বিদ্যুৎ নিজেই উহার দূতী, চাই শুধু তাহার আবির্ভাবের পীঠ-রূপী শব্দপ্রাক ও শব্দপ্রেরক যন্ত্র। আর একটা সুবিধা প্রথমে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সে হচ্ছে ফ্রেডেরিকের এই তারহীন-যন্ত্রের সহিত যে-কোন সাধারণ সতার টেলিফোন-যন্ত্রের সংযোগ-সম্ভাবনা। শুধু সাধারণ টেলিফোন-যন্ত্র কেন সাধারণ টেলিগ্রাফ (long distance line) অথবা তারহীন টেলিগ্রাফের আফিসের সহিতও ইহাকে সংযুক্ত করা চলে। এইরূপে আমরা শিয়াটলে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই “লেবরেটরীতে” বসিয়া প্রশান্ত-সাগরের যে-কোন জাহাজের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারি;—কর্ণওয়ালিস্ ট্রাটে প্রবাসী আফিস্ হইতে যে-কেহ জাপানযাত্রী জাহাজের সহিত পিনাংবন্দর পর্যন্ত কথাবার্তা বলিতে পারিবেন। তা-বদি প্রবাসী আফিসে তারহীন-টেলিগ্রাফ-যন্ত্র না থাকে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—থাকা চাই ফ্রেডেরিকের তারহীন টেলিফোন যন্ত্র। প্রবাসী আফিসকে তারযুক্ত টেলিগ্রাফে অথবা “তারহীনে” বেঙ্গুনকে ডাকিতে হইবে। রেঙ্গুন তারহীন দ্বারা আগামানকে ডাকিবে, আগামান অনায়াসে “জাপান” জাহাজকে সংযুক্ত করিতে পারিবে। তার ফলে, যে স্বর ইতঃপূর্বেই এতদূর অতিক্রম করিয়াছে—ইথারবাহনে অনন্ত শূন্যপথে তাহাই প্রশান্ত-সাগরের উপকূলে পৌছিবে।

তারহীন টেলিফোন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা যাহাতে ভালভাবে জন্মিতে পারে সেজন্ত উহার উদ্ভাবক মিঃ ফ্রেডেরিক্ কলিন্সের নিজের কথার সার-সংগ্রহ দিতেছি।

“তারহীন টেলিফোন আমার জীবদশায় (এখন তিনি ১০ বৎসর বয়স্ক) তারযুক্ত টেলিফোনকে গোঁধ হয় স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না। কিন্তু আমার গত দশ বৎসরের চিন্তা অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে আমি এই মীমাংসার উপনীত হইয়াছি, জগৎ এত দ্রুত উন্নতি ও পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হইতেছে যে, বিজ্ঞান যা-কিছু নূতনতর বার্তা-আদান-প্রদানের উপায় করিয়াছে ও করিতে সমর্থ হইবে উহার প্রত্যেকটাই এখানে শ্রুত আবশ্যক আছে। * * * যেখানে সতার টেলিফোন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব সেখানে ত তারহীনের আবশ্যক সর্বাপেক্ষা বেশী। উহা দ্বারা পূর্বোক্ত প্রণালীর কোন ক্ষতি না হইয়া বরং জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে।

“* * * দুর্গম গিরিশৃঙ্গ, ভীষণ বন, অগম্য উপত্যকা, ধরণীর গভীরভূমি অর্থে ধনি প্রভৃতি যখন প্রাকৃতিক দুর্গমতায় অথবা দৈব দুর্ঘটনায় বহির্জগৎ হইতে বিয়ুক্ত হইয়া যায়—সেই দুঃসময়ে এই তারহীন আকাশ-পথগামী বার্তাবাহক কোনবিশেষ সাহায্যে বার্তা আদান-প্রদানে সমর্থ হইবে। উহাতে শত শত মানবের অনন্ত উপকার সাধিত হইবে। উহাতেই তারহীনের উদ্ভাবনা, অন্ততঃ আমার নিকট, সার্থক হইবে। (Technical World Magazine, Oct. 11)।

আমি এ প্রবন্ধে বিজ্ঞানরাজ্যের যে অচিন্তিত আবিষ্কারের উপর-উপর আলোচনা করিলাম উহা অতি অদ্ভুত ও কোতূহলোদ্দীক। শক্তিতে ও ধারণায় উহা অতিবিস্ময়ী ও বিজ্ঞানরাজ্যের পরিচিত ভিন্ন আর সকলের নিকট আলাদ্বিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বোধ হইবে। কিন্তু উহা অনন্ত শক্তিশালিনী অসীম রহস্যময়ী প্রকৃতির একটু কণিকা মাত্র। বিজ্ঞান উহা আয়ত্ত করিয়া মানবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছে। নির্ধলবিধের এই শক্তি আয়ত্ত করার উপর—প্রাকৃতিক শক্তিজয়ের পরিমাপের উপর বর্তমান সভ্যজগতের কর্মক্ষমতা ও অধিকারসীমা নির্ভর করিতেছে। পতিত জাতির ঐ সাধনার আবশ্যক সর্বাপেক্ষা বেশী। মার্কিন জ্ঞানময় শিক্ষাক্ষেত্র ও সাধনার অনন্ত সুযোগ লইয়া কম্মীকে আহ্বান করিতেছে—নবীন ভারত কি সে আহ্বান শুনিবে না?

আমেরিকা।

শ্রীযোগেশ মিশ্র।

ভারতীয় বিমান-নাবিক

(মডার্ন রিভিউ হইতে)

আজিকার নব নব আবিষ্কারের যুগে, মানুষ যখন প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া লইতেছে, তখন ভারতবর্ষের অবস্থা স্মরণ করিলে বড়ই পরিতাপ হয়। মার্কিন তারহীন টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া বর্তমান ইতালির নাম চিরদিনের জন্ত খ্যাতিমণ্ডিত করিয়াছেন,

অগচ তাহার প্রথম উদ্ভাবনা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মণ্ডিৎকেও উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এবং কাপ্তেন্ আমাণ্ড-সেন্ দক্ষিণমেরু আবিষ্কার দ্বারা নরওয়েকে যশের উচ্চ-শিখরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। আকাশভ্রমণ ফ্রান্সের পতাকা উড়াইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হায়! ভারতের দিকে চাহিয়া আমরা কি দেখিতে পাই?—সেখানে দেখি কেবল অবসাদের বহু, গভীর নিস্তরতা, লজ্জাকর বিশ্রাম, একটা শোকাবহ শান্তি; যেন আমরা ধ্বংসের প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি! অবশ্য নানা কারণবশতঃ এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে আমাদের শৈথিল্য, আমাদের নিশ্চেষ্টতা, আমাদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা। অতীতকালে আমরা কি করিয়াছি তাহা ভাবিতে ভাবিতে, নির্বিকারচিত্তে আমাদের লুপ্তগৌরবের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা এমন স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি, যেখান হইতে এক পদ অগ্রে বা পশ্চাতে আমাদের অস্তিত্ব থাকি না-থাকি নিরূপণ করিবে।

জাতির জীবনে এমন একটা গুরুতর সময় আসে যখন উহা দ্বিগুণিত তেজে জাগিয়া উঠিয়া নির্মাণের কাজে লাগিয়া যায়; তখন উহা কোনো এক চরম উদ্দেশ্যের জন্ত, কোনো এক বিশেষ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ত, সম্মুখে এক আদর্শ স্থাপিত করিয়া স্বকীয় চেষ্টায় সকল ক্রটি পরিহার করিয়া আপনাকে উন্নীত করে, আপনাকে গড়িয়া তুলে। ইতিহাসে এরূপ সময় সংস্কারের যুগ বলিয়া বিশেষভাবে কথিত; উৎকট অবস্থায় ইহাকে বিপ্লব বলে। এরূপ সময়ে জাতির সমবেত শক্তি সাবধানতার সহিত হিতকর উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হওয়া আবশ্যিক, এবং যাহাদিগের হস্তে জাতির ভাগ্য নিহিত, তাহাদের প্রতি পদে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়া জাতিকে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাই উদ্বোধনের যুগ, যাহার প্রথম শুল্লিঙ্গ অধুনা চীন, পারস্য, তুরস্ক ও জাপানে সিক্কিম্ করিতেছে।

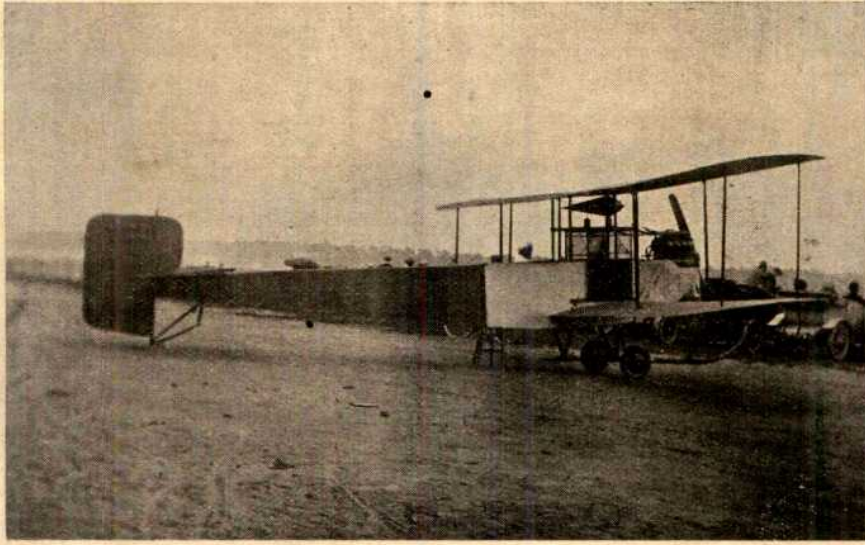
আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও লজ্জাকর নিরর্থক সামাজিক দ্বন্দ্রে প্রবৃত্ত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ কি কেবল শোকের দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে? ভারতবর্ষের কখনই এরূপ



শ্রীযুক্ত সেটি, প্রথম ভারতীয় বিমান-নাবিক।

অবস্থা হইতে পারে না। হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইবে; কেবল যদি সে একবার জাগিয়া উঠিয়া সময়ের সহিত চলিতে আরম্ভ করে। একটি ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয়েরাও সময়ের সহিত চলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে একজন বিমান-নাবিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বিমান নক্সা করিতে, তৈয়ারি করিতে এবং উহা চড়িয়া বোমপথে বিচরণ করিতে সক্ষম—তিনি একজন পাকা বিমান-নাবিক।

পাশ্চাত্যদেশের নূতনতম অল্পষ্ঠান হইতেছে উদ্ভয়ন-বিজ্ঞান; ইহারই উন্নতিবিধানের জন্ত বৈজ্ঞানিক জগতের সমবেত চেষ্টা ব্যয়িত হইতেছে; তাহার ফলে অল্পকালের মধ্যে লোকে সমুদ্রে বেশী বিচরণ করে আকাশেও তদ্রূপ সহজেই বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। অনতিবিলম্বে



ক্রক্‌ল্যাণ্ড উড্ডয়নক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সেটি ও তাঁহার “অ্যাব্রো” বাইপ্লেন বিমান।

আমাদের পুরাণ ও শাস্ত্রকথিত বিমান শূন্যমার্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে, ও পক্ষীরাজ ঈগলের সহিত ব্যোমচারী মানবের হৃদয়ের আর বিরাম থাকিবে না।

শ্রীযুক্ত স. ভ. সেটি, বি-এ, এ-ম, আই-ই-ই, মহীশূরের পূর্ববিভাগের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার। তাঁহার প্রধান, শ্রীযুক্ত এ. ভি. রো সাহেবের সহিত একত্রে তিনি একটি “অ্যাব্রো” ‘বাইপ্লেনের’ কল্লনা করেন। অঙ্কনকার্য সম্পূর্ণরূপে শ্রীযুক্ত সেটি করিয়াছিলেন। এই বাইপ্লেনে আরোহণ করিয়াই শ্রীযুক্ত সেটি আকাশে উঠিয়াছিলেন। ইহা আমাদের কম আনন্দের কথা নহে। এই আদর্শ-যন্ত্রটি বিখ্যাত অষ্ট্রেলীয় বিমান-নাবিক জে. ডিয়াগোন সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তিনি সেটি মহোদয়কে যন্ত্রনির্মাণের জ্ঞান প্রশংসা করিয়া অবিলম্বে উহা ক্রয় করেন। সর্বোৎকৃষ্ট বাইপ্লেনগুলির মধ্যে একটি একজন ভারতীয়ের অঙ্কিত, এবং উহার চালন-চক্রটি তাঁহার কল্পিত, ইহা ভারতীয় ধীশক্তির বিশেষ গৌরবের কথা। নিম্নলিখিত বর্ণনাপাঠে বাইপ্লেনটি কতবড়, তাহা পাঠকপাঠিকার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

প্রসার—৩ ফুট

‘কর্ড’—৪ ফুট ৬ ই:

ওজন আরোহী ব্যতিরেকে প্রায় আটশত পাউণ্ড বা

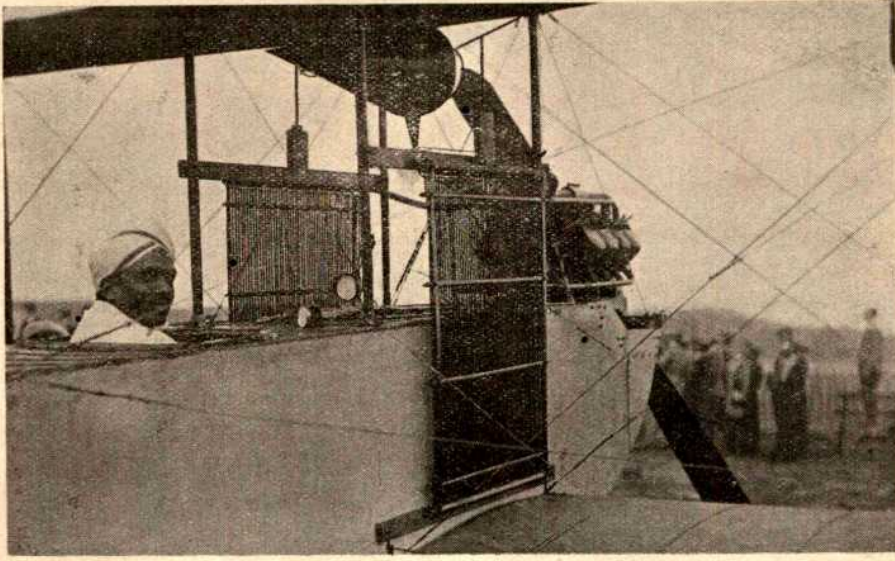
দশ মণ। ইহাতে ত্রিশ অশ্বের শক্তিবৃদ্ধ ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় ও বেগ ঘণ্টায় ৪৫—৫০ মাইল।

সেটি মহোদয় অধুনা একটি নূতন ধরণের বাইপ্লেনের কল্লনা করিতেছেন, কয়েকমাসের মধ্যেই উহার সম্পূর্ণ নক্সা প্রকাশিত হইবে।

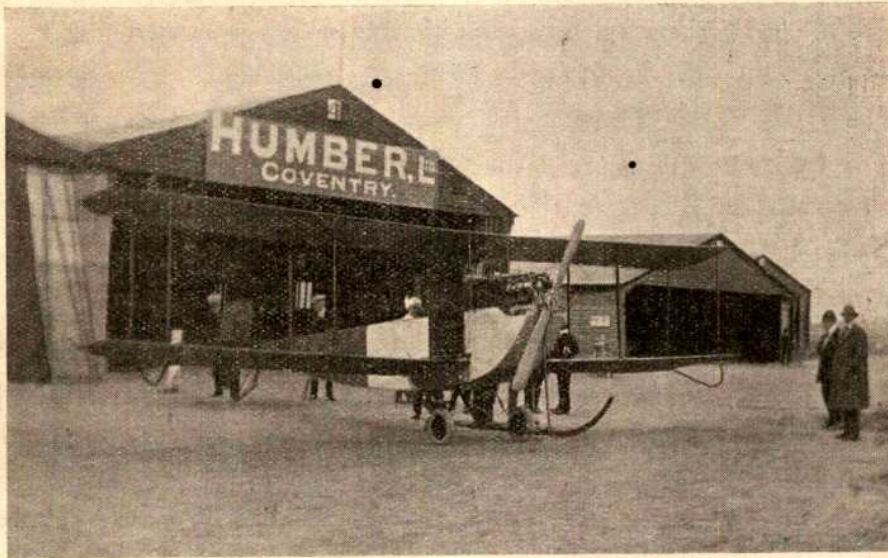
ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে সেটি মহোদয় একাগ্রচিত্তে তিন বৎসরের অধিককাল শিক্ষালাভ করিয়া সেখান হইতে সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

ক্রক্‌ল্যাণ্ডের উড়িবার ক্ষেত্র, যেখানে সেটি মহোদয় উড়িয়াছিলেন, লণ্ডন হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ক্ষেত্রটি আদর্শস্থানীয় ও বিশেষ কষ্টকর, এখানে উড্ডয়ন-প্রয়াসীকে তাহার সমস্ত দক্ষতা প্রয়োগ করিতে হয়। ক্ষেত্রটির পরিধি তিন মাইল;—একটি নদী, রেলের রাস্তা ও কারখানা-ঘর দ্বারা বেষ্টিত। নামিবার সময় বিমান-নাবিককে বিশেষ সতর্কতার সহিত এইসকল স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক পরিহার করিতে হয়। যাহারা একদেশ হইতে অত্রদেশে উড্ডয়নপ্রয়াসী তাঁহাদের পক্ষে এটি উপযুক্ত শিক্ষাশ্রম। সেটি মহোদয় বহুবার বিপদের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

এই ভূরতবর্ষের প্রথম, এবং প্রাচ্যদেশের অভ্যন্তরস্থান্যক বিমান-নাবিকের অগ্রতম বিমাননাবিক সেটি মহোদয়ের



শ্রীযুক্ত সেটি তাঁহার 'আ্যক্রো' বাইপ্লেনে উড্ডয়নের উপক্রম করিতেছেন।



শ্রীযুক্ত সেটি সাবধানে আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার বিমানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি কড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেখানকার পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মহীশূরে কৰ্মগ্রহণ করেন ও সেখানকার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হন। স্বভাবতই তিনি উড্ডয়ন-বিজ্ঞানের প্রতি আশঙ্ক ছিলেন, তাই ইংলণ্ডে গিয়া উহাই শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রভূত যত্ন ও শ্রমসহকারে

পাঠ ও অভ্যাসের দ্বারা তিনি উড্ডয়নবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করা হইলে এই অদম্য পুরুষ উত্তর করিলেন, “আমার ভবিষ্যৎ! বিমান-নাবিক! আর কিছু নয়। আমি আমার দেশবাসীদের মধ্যে উড্ডয়নের বার্তা প্রচার করিব; যাহা আমাদের পূৰ্বপুরুষেরা জানিতেন ও করিতেন।” তিনি একজন বলিষ্ঠ, সাহসী ও মেধাবী

যুবক। অর্থ-পাইলে আধুনিক ‘মনোমেন,’ ‘বাইমেন,’ এমন কি ‘হাইড্রোমেন’ পর্যন্ত নির্মাণ করিতে সমর্থ, এরূপ তিনি ভরসা করেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়বিশ্বাসী; তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও ভ্রম হইবার জো নাই।

শতাব্দীব্যাপী নিশ্চেষ্টতাহ পর যেনব্যভারত উদ্ভিত হইতেছেন, তাঁহা বা যদি এই যুবককে আদর্শরূপে স্থাপন করিয়া, তাঁহার সাহস ও বিপদসঙ্কুল বিজ্ঞানের প্রতি-বাহাতে কেবল সুখস্বচ্ছন্দ্য ও অর্থ-নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এমন নয়, প্রাণ পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে—অবিচলিত অমুরাগদর্শনে উৎসাহিত হন; তবে তাহা ভারতের পক্ষে উত্তকর হইবে। ইহার কেবলি উকীল-চারিটারের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া এইরূপ বিজ্ঞানপথের পথিক হওয়াই আমাদের যুবকদের কর্তব্য। তাঁহাদেরই উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসা নির্ভর করিতেছে; মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশের মুক্তি প্রধানত তাঁহাদেরই অধ্যবসায় ও উৎসাহের উপর নির্ভর করিতেছে; ভারতের সম্প্রসারণ, এক নবজাতির উদ্বোধন তাঁহাদের স্বদেশপ্রেমীতি সাহস ও কর্মকুশলতার দ্বারাই ঘটিতে পারে।

বিধির কি-বিড়ম্বনা, আধুনিক ভারত জগৎকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের কিছুই দিতে পারে না। কিন্তু যদি স্বদেশপ্রেমিক যুবকেরা একাগ্রচিত্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হন ও প্রশ্নসহকারে বৈজ্ঞানিক ভারতের উন্নতির জন্ত সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বৈজ্ঞানিক জগৎকে তাহার অংশ বোঝাইতে পারে। বিজ্ঞানাকাশে কয়েকটি নাক্রও ভারতীয় তারকা কিরণ দিতে থাকিলে সভ্য মানবের চক্ষে ভারতবর্ষ অনেক উন্নত হইয়া যাইবে; ও এই বিজ্ঞানোন্নতির গৌরবে আমাদের অজ্ঞান নানা ক্রটি ঢাকা পড়িবে।

কিছুদিন গত হইল বোম্বাই সহরে, দুইটি পারসী মহিলা ‘এইরোমেনে’ আকাশে উড়িয়াছিলেন। ‘এইরোমেনে’ কত লোক প্রাণ হারাইয়াছেন ও হারাইতেছেন, ইহা সবেও যে আমাদের দেশের দুইজন নারী এরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি।

সুশিক্ষিত বন্দোপাধ্যায়।

বর্ষাশেষে

বর্ষাশেষের ছত্রভঙ্গ

মেঘের অঙ্গ রাঙিয়ে ভোরে

হৃদয় ছিল পাহাড়গুলোর পিছনে,

দাঁড়িয়ে ছিল বনস্থলী

আলোকিত পুরীর দোরে

ঘন পাতার কাতার-বাধা বিজনে;

স্বর্ণ মেঘের পর্ণগুলির

স্বয়ংক্রিয় স্তরের মাঝে

উদ্ভাসিত গাঢ় নীলের সিন্ধুতা;

শ্রামল বনের কোমলতার

তরঙ্গিত ভাঁজে ভাঁজে

উৎসর্গিত হিরণ্ময়ী দীপ্ত-ভা।

দাঁড়িয়ে ছাটি ছেলে মেয়ে

নদীকূলের বালির চড়ায়

উজলু চোখে কিরণ প্রতিবিম্বিত;

কুচ-কুচে সেই কাল গায়ে

আলো এসে হেসে গড়ায়,

মুক্তকেশে বায়ু মুহূর্তে কম্পিত।

নৌকাখানির পরে আমি—

বালির-বাধের তীরে তীরে,

পড়েছিলাম প্রাণের পাখা ছড়িয়ে;

ভেসে গেলাম দূরে দূরে

বাকে বাকে ঘুরে ঘুরে

পাখার পালক আলোকেতে জড়িয়ে।

কোথায় গেল আলোর বরা

মোহের শীকর ছিটিয়ে দিয়ে,

ছুটিয়ে হাসি সয়ল চাক নয়নে ?

কোথায় গেল ভোরের বাতাস

ফুল লঘু গন্ধ নিয়ে

স্বপ্ন-তরুর নব কুসুম চয়নে ?

দাঁড়বে ঘরে, কাল জলের

উচ্ছ্বসিত অঙ্গ পরে

দীপ্তি তোলে স্নিগ্ধ-বাঁধা ধোঁয়াটি;

চম্কে ওঠে আলোব কণা

মনেব বিজন ছায়াস্তরে,

আধার বনে যেন হাজাব জোনাকি।

* * *

আবার কবে প্রভাত হবে,

সুস্থি-সিদ্ধুর স্তব্ধ নীবে

জাগরণের অরুণ-কিরণ বিধিয়া ?

এই ভটিনীব সেই কাননের

ওই আকাশের তীরে তীরে

ঝরবে আলো শ্রামলতা চুম্বিয়া ?

এই জীবনের সেই নয়নেব

ওই ভুবনের উপর দিয়ে

চেউয়ে চেউয়ে আসনে বয়ে মাধুবী ?

জমাট-বাঁধা দৃঢ় অটল

মৃত্যু-শিলা উজলিয়ে

জাগরণে জাগবে জাহুর চাতুরী ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মহাস্থানার।

ঋণ শোধ

(জাপানী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

অদৃষ্টের ফেরে কিউসুকিকে দাস্তবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে যে নিতান্ত গরীবের ছেলে ছিল তাহা নহে;—তাহার বাপ এমন সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন যে চাকরি না করিলেও তাহার দিন চলিত; কিন্তু সে যখন খুবই ছোটো তখন বাপের মৃত্যু হওয়াতে তাহার দাদার হাতে বিষয় আসিয়া পড়ে;—দাদা সেই বিষয় দুইদিনে ফুঁকিয়া দেয়—তাহার বদখেয়ালিতে বিষয়পত্র সমস্ত বিক্রয় হইয়া শেষে বসতবাড়ি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ে। তাহাতেও তাহার দাদার চোখ খোলে নাই। উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা তাহাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছিল যে শেষে চুরিচামারি করিয়া তাহাকে সখ মিটাইতে হইত। চুরি করিয়া তো সমাজে বাস করা পোষায় না,—কাজেই জেল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহা কেহই

জানিল না। গ্রামের সকলে তাহাতে নিশ্চিন্ত হইল; তাহার বলিতে লাগিল—আঃ আপদ গেছে। কিন্তু মায়ের প্রাণে যে কি হইতে লাগিল তাহা মাই জানান। তিনি দিন-রাত ধূলার লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এখন সমস্ত সংসারের ভার একা কিউসুকির উপরে। সে ছেলেমানুষ, যেন অকুল পাথারে পড়িল;—হু বেলা হু মূঠা খাওয়ার কথা দূরে থাকুক, মাথা শুঁজিবাব ঠাইটি পর্য্যন্ত নাই। কাজেই তাহাকে চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। অনেক কষ্টের পর দূর গ্রামে একটা চাকরি জুটিল। সে রা ও বোনটিকে দেশে রাখিয়া চাকরি-স্থানে চলিয়া গেল। বাইবার সময় তাহার মা তাহার হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন—“দেখিস বাবা। তোর দাদার কথা যেন ভুলে থাকিসনে—আহা বাছা আমার কোথায় আছে।” বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কিউসুকি মাকে সাধনা দিয়া বলিল—“কিছু ভেবোনা মা। আমি ঠিক দাদাকে তোমার কাছে এনে দেবো।”

কিউসুকি মায়ের কাছে এ কথা বলিয়া আসিল বটে, কিন্তু দাদার খোঁজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সে সমস্ত দিন কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে, কখন সে খোঁজ লয়—আর কোথায়ই বা খবর করে। থাকিয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে, দাদার জন্ত মায়ের শোকের কথা তাহার মনে পড়িত—তাহাতে তাহার প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু কি করিবে? উপায় নাই। সে ভাবিত যদি এমন দিন কখনো আসে যে পরের দাস্তবৃত্তি করিতে না হয়, তাহা হইলেই সে দাদার খোঁজ করিতে পারিবে—মায়ের হুঃখ মোচন করিতে পারিবে—নইলে ইহাজন্মে নয়।

কিউসুকির মনিব কিউসুকিকে অস্ত্রের সহিত ব্লেহ করিতেন। আহা! বড় ঘরের ছেলে হুঃখে পড়িয়া চাকরি করিতে আসিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত;—বাহাতে কিউসুকির ভালো হয় তাহার জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অবসর সময়ে কিউসুকি বেসকল কাজ করিত তাহার জন্ত তিনি আলাদা পারিশ্রমিক দিতেন—তাহা ছাড়া বাড়িতে জিন্দাকর্ষ উপলক্ষ্যে অস্ত্রাস্ত্র চাকরদের চেয়েও কিউসুকির পাওনাটা

বেশি হইত। এমন করিয়া মা বোনের খাওয়া-পরা চালাইয়াও কিউম্বুকির মাসে মাসে কিছু কিছু জমিতে লাগিল।

কিউম্বুকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এক হাজার টাকা হইলেই তাহার বন্ধকী বাড়ি ও কিছু জমীজমা উদ্ধার হয়। তাহা হইলে আর তাহাকে চাকরি করিতে হয় না;—নিজের জমীর কসলে তাহাদের দিন এক রকম বেশ কাটিয়া যাইবে। তখন সে নিশ্চিত হইয়া দাদারও সন্ধান করিতে পারিবে। জমীজমা, বাড়ি ও দাদা—এ সকলই যদি সে উদ্ধার করিতে পারে তাহা হইলেই তো তাহার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয়;—আর কি চাই!

এই হাজার টাকা কেমন করিয়া কতদিনে পূর্ণ হয় কিউম্বুকির দ্বিবারাত্র সেই ভাবনা। আর তো বেশি নয়, কাজেই তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভিলে ভিলে সঞ্চয় করিতে হইতেছিল। অল্প লোক হইলে ইহা অসম্ভব বলিয়া ছাড়িয়া দিত,—বলিত, এ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বারি লইয়া সমুদ্রে স্রষ্টি করা। কিন্তু কিউম্বুকি অসৌম্য ধৈর্যের সহিত এই অসাধ্য সাধনের জন্য পণ করিয়া বসিয়াছিল। এ নইলে যে তাহার চলিবে না।

অনেক অপেক্ষার পর শেষে সেই শুভদিন আসিল। এই মাসের মাহিনাটা পাইলেই তাহার হাজার টাকা পূর্ণ হয়। ক্রমে ক্রমে দেখিতে দেখিতে সে মাসও শেষ হইয়া গেল;—কিউম্বুকির আনন্দ আর ধবে না—আজ তাহার জীবনের সকল সাধনা সফল হইতে চলিয়াছে।

কিউম্বুকির সঞ্চয়ের টাকা থাকিত তাহার মনিবের কাছে। ঠিক হাজার টাকা যেদিন পূর্ণ হইল সেইদিন সে মনিবের নিকট বিদায় লইতে গেল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বড়ই খুশী হইলেন;—কিউম্বুকির যে দাসত্বের দিন শেষ হইয়াছে ইহাতে তাহার বোধ হইল যে তাহার নিজেরও একটা বোঝা যেন নামিয়া গেছে।

কিউম্বুকি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছে না;—এতদিন ধৈর্য ধরিয়া আর তাহার মন একভিল ধৈর্য মানিতেছে না। এখনই সে টাকা লইয়া নিজের গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। তাহার মনিব বলিলেন—“আচ্ছা বেশ

এখনই তুমি যাও, কিন্তু অত টাকা একসঙ্গে নিয়ে যেও না। পথ তো ভালো নয়—চোর ডাকাতির ভয় আছে। এখন কিছু সঙ্গে নাও—পরে এসে কিছু কিছু করে নিয়ে যেও।”

অপেক্ষা আর সে করিতে পারে না। এতকালই তে সে শুধু অপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছে—এখনো অপেক্ষা সে আর হয় না। কিউম্বুকি বলিল—“মাফ করবেন—কিছু ভয় নেই—আমি খুব সাবধানে টাকা নিয়ে যাব।” মনিব আর একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিউম্বুকি কখনো তাহার কথা অমান্য করে নাই—তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা তাহার ভালোর জন্যই—সে কথাও সে বুঝিতেছে, কিন্তু তবুও সে মনের অধীরতা প্রত্যক্ষ কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছে না।

কিউম্বুকির মনিব তাহাকে সমস্ত টাকাকড়ি বুঝাই দিতে লাগিলেন। টাকাসুলি হাতে করিয়া তুলিয়া লইবার সময় কিউম্বুকির বোধ হইতে লাগিল, সেগুলি যেন তাহার চিরপরিচিত বন্ধু। সবগুলিকেই তাহার মনে আছে—দেখিলামজাই সে তাহাদের চিনিতে পারিতেছে!—কোনটি কোনখানে একটু দাগ আছে, কোনটি একটু ঘসা, কোনটি একটু পাতলা, কোনটি চক্চকে, কোনটি ম্যাড়মেড়ে তাহ সবই তাহার জানা আছে! এমন কি কোন টাকটি সে প্রভুত্বের বিবাহের সময় বখসি পাইয়াছে তাহাও সে বলিয়া দিতে পারে। বহুদিন পরে বন্ধুর সহিত দেখা হইলে যেমন আনন্দ হয়, টাকাসুলিকে দেখিয়া কিউম্বুকির তেমনি আনন্দ হইতে লাগিল।

এই টাকাসুলি খুব সাবধানে বাধিয়া লইয়া কিউম্বুকি সেই রাতেই যাত্রা করিল—পর্বদিন প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা সহিল না। যাইবার সময় তাহার মনিব বলিলেন—“অল্প একখানা সঙ্গে নাও—কি জানি যদি কোনো বিপদ ঘটে।” বলিয়া একখানা ভালো তরোয়াল তিনি তাহার কোমরে বাধিয়া দিলেন।

কিউম্বুকি বাড়ি হইতে বাহির হইল। গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তাহার পরিচিত পথবাট বাড়িঘর প্রভৃতির নিকট হইতে তাহার মন একে একে বিদায় মাগিয়া লইতে লাগিল,—সে যেন সবাইকেই মনে মনে বলিতেছিল—“ভাই চন্দ্র! ভাই চন্দ্র!”

আজ তাহাব প্রাণ কানায় কানায় ভবিয়া উঠিয়াছে;—
কেবল একটা বেদনা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের মধ্যে
বিস্থিত ছিল—মাকে গিয়া সে কী বলিবে। মা তো টাকার
প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া নাই—সে বলিয়া আসিয়াছে দাদাকে
ফিরাইয়া আনিবে—মা যে সেট পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন।
সে ভাবিল, এতদিন মা অপেক্ষা করিয়াছেন, আরো ছোট
দিন করুন—আমি দেশে ফিরিয়া সন্মুল ব্যবস্থা করিব।

গ্রাম ছাড়িয়া একটা প্রকাণ্ড জঙ্গল। সেই জঙ্গলের
মধ্য দিয়া তাহার পথ—সেই পথে সে চলিতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে রাত্রি অনেক হইয়া আসিল—বনের
মধ্যে অন্ধকার ক্রমেই জমাট বাধিয়া উঠিতে লাগিল;—
কোথাও এতটুকু আলোব চিহ্ন নাই—গাছগুলার গা
হইতে পর্যন্ত যেন অন্ধকারে বরিয়া পড়িতেছে—কোলের
নাছব দেখা যায় না। কিউল্লিকির মন এতই উতলা
হইয়া উঠিয়াছে যে কোনো বাধাই তাহাকে নিরুৎসাহ
করিতে পারিতেছে না;—সে সেই অন্ধকার ঠেলিয়া চলিতে
লাগিল।

এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে কখন যে পথ
হারাইয়া ফেলিল তাহা সে জানিতেও পারিল না। শেষে যখন
বকের কাছে গাঁছের ডালপালা আসিয়া তাহার পথরোধ
করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চমক ভাঙিল। পথ পাইবার
জন্ত সে চতুর্দিক হাতড়াইতে লাগিল, কিন্তু পথ কিছুতেই
মিলিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমেই সে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে
ছিল। অন্ধকারের মধ্যে এদিক ওদিক করিতে গিয়া
ক্রমে তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল—কোন দিক
হইতে আসিতেছে, কোন দিকে যাইতে হইবে তাহাও
ঠিক বাধিতে পারিল না। একবার একটু রাত্তাব মতো
পায়, আবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়ে। এমন কবিতা
ঘুরিতেছে হঠাৎ একটা ধস্ ধস্ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া
উঠিল;—অন্ধকারের মধ্য হইতে মূর্তি গ্রহণ করিয়া
কে যেন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কাছে আসিতে
কিউল্লিকি দেখিল, এক বস্ত্র শিকারী।

তাহাকে দেখিয়া কিউল্লিকি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া
বাঁচিল—তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—“ওহে, আমার পথ
বলে দিতে পার ?”

শিকারী একবার তাহাব সর্বাঙ্গের উপর দিয়া তাহার
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তাহার পব বলিল—“যাবে
কোথা ?”

কিউল্লিকি নিজের গ্রামের নাম উল্লেখ করিল।

শিকারী তাহাকে খানিকদূর সঙ্গে লইয়া একটা পথেব
উপর আসিয়া তাহাকে বলিল—“এই সামনের রাস্তা ধরে
বরাবর উত্তর মুখে চলে যাও।”

কিউল্লিকি সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল—ক্রমেই
শ্রান্তিতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—পা
আর চলে না। এমন সময় দেখিল কিছুদূরে একখানি
কুটার। কুটারের মধ্য হইতে একটি কীণ আলোর বেধা
বাহিবেব ঘন অন্ধকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।
কিউল্লিকি ধীরে ধীরে সেই কুটার অভিমুখে চলিল।
কুটারের মধ্যে এক রমণী বসিয়া আপন মনে কাপড় সেলাই
করিতেছিল। এত রাত্রি, তবু ঘুমাইতে যাইবার দিকে
তাহার কোনো লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না। সে
নিবিষ্ট মনে কাজ করিতেছিল। কিউল্লিকি বলিল—“আমি
শ্রান্ত পথিক, আজ রাত্রেব মতো এখানে একটু স্থান
পাবো ?”

রমণী বিশ্বাসের সহিত কিউল্লিকির দিকে খানিকক্ষণ
চাহিয়া রহিল—তারপর অধিকতর বিশ্বাসের সহিত জিজ্ঞাসা
করিল—“এত রাত্রে এপথে তুমি কেমন করে এলে ?”

কিউল্লিকি বলিল—“আমি বনের মধ্যে পথ হাবিয়ে-
ছিলুম—এক শিকারী আমার এই পথ দেখিয়ে দিয়েছে।”
বলিয়া সে বসিয়া পড়িল—আব সে দাঁড়াইতে
পারিতেছিল না।

রমণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, কেমন ইত-
স্তত করিতে লাগিল, শেষে এদিক ওদিক চাষদিক
চাহিয়া অবরুদ্ধ স্ববে বলিয়া ফেলিল—“জান এ কোথায়
এসেছ ?”

কিউল্লিকি অবাক হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিল,
তাব পর বলিল—“না। এ কোথা।”

রমণী বলিল—“এ ডাকাভের বাড়ি। যে শিকারী
তোমার পথ বলে দিয়েছে, সে ডাকাভ—তারই এই
বাড়ি।”

কিউল্লুকি উদ্ভিগ হইয়া উঠিল—“এখন উপায়!”

রমণী বলিল—“উপায় তো কিছু দেখি না—নিশ্চয় সে তোমার পিছনে আসছে—এখনই এসে পড়বে।”

বলিতে বলিতে বাহিরে কাহার পদ-শব্দ শোনা গেল। রমণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কিউল্লুকিকে বলিল—“ওঠ, ওঠ—আব দেবী কোরো না!” বলিয়া তাহাকে সে ঠেলিতে ঠেলিতে কোথায় এক অন্ধকারের মধ্যে বসাইয়া দিল।

শিকারী কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—“শিকার কোথায়?”

রমণী কোনো উত্তর করিল না—বিশ্বয়ের ভান করিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। শিকারী আবার গর্জন করিয়া উঠিল—“শিকার কই?”

রমণী যেন কিছুই জানেনা এমনি ভাবে বলিল—“শিকার!”

—“হাঁ, হাঁ, শিকার।”

রমণী বিশ্বয়ের সহিত বলিল—“কই?”

শিকারী অধৈর্য হইয়া উঠিয়া বলিল—“আমি বরাবর—তাকে এই পথে আসতে দেখিছি;—পথেও নেই, ঘরেও নেই, সে কি তবে উবে গেল!”

রমণী শুধু বলিল—“কি জানি!”

শিকারী তখন রাগে উদ্ভাস্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—“হুঁশ্কেচি এ তোমাই কাজ! এ রোগ তোর সাবল না! বল কোথায় লুকিয়েচিস!” বলিয়া সে সজোরে এক পদাঘাত করিল। রমণী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—তবুও কোনো কথা বলিল না।

রমণীকে নিরন্তর দেখিয়া শিকারীর রাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল—ক্রমাগত প্রহাৰ করিতে করিতে তাহাকে যেন আধমরা করিয়া ফেলিল। রমণী তবুও কোনো কথা বলিল না—পড়িয়া পড়িয়া কেবল মার খাইতে লাগিল।

কিউল্লুকি অস্থির হইয়া উঠিল—আর নিজেকে গোপন রাখা চলেনা—তাহার রক্ত এই অবলা নারীকে কী লাঞ্জনাই না ভোগ করিতে হইতেছে। সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—“এই আমি।”

শিকারী তখন রমণীকে ছাড়িয়া বাঘের মতো কিউ-

ল্লুকির উপর গিয়া পড়িল। কিউল্লুকি তখনও এমন শান্ত যে ভালো করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না,—কাজেই সে কোনো রূপ বাধা দিতে পারিল না। দস্যু তাহার সমস্ত অর্থ অতি সহজে কাড়িয়া লইয়া ছিঃ বস্ত্র পরাইয়া তাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিল;—কিউল্লুকি কোনো বাধা দিল না বলিয়া তাহাকে শ্রোণে মারিবার আবশ্যক বোধ করিল না।

কিউল্লুকি নিঃসহায় নিঃস্বল অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার তরোয়ালখানি পর্যন্ত দস্যুতে কাড়িয়া লইয়াছে। বস্ত্র পশুর ভয় আছে—কিউল্লুকি কাতর কর্ণে দস্যুকে ডাকিয়া কহিল—“আমার সব নিয়েছ নাও কেবল তরোয়ালখানি ফিরিয়ে দাও, নইলে বাঘে তানুবে প্রাণটা নেবে।”

কি-জানি-কেন দস্যুর দয়া হইল। তরোয়ালখানি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া কিউল্লুকিকে দিতে গেল—অন্ধকারে সেটা একবার ঝকঝক করিয়া উঠিল। তখন দস্যু বলিয়া উঠিল—“এখানা একেবারে নতুন দেখছি যে! রোসো! এখানা থাক, আর একখানা দিচ্ছি।” বলিয়া সে ঘরের মধ্যে হইতে একখানা পুরাতন তরোয়াল আনিয়া কিউল্লুকির হাতে দিল।

পব দিন সকালে কিউল্লুকি ছিন্নবেশে, শুষ্ক মুখে প্রভুর হারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লজ্জার সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। টাকাকল সিয়াছে বলিয়া তাহার মনে দুঃখ হইতেছিল বটে, কিন্তু প্রভুর কথা না শুনিয়াই যে তাহাব এমন অবস্থা হইয়াছে সেইটাই তাহাব বৃকে বেশি করিয়া বাজিতেছিল—তাহার দুঃখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছিল।

কিউল্লুকির মনিব সকালে বাড়ির বাহির হইতে গিয়া যখন দেখিলেন ছিন্ন বস্ত্রে মলিন মুখে হেঁট মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া কিউল্লুকি, তখন তিনি বিশ্বয়ে অবাক হইয়া পেলেন। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন চোখের সাবনে কোন্ বাহুকরের বাহু দেখিতেছেন। যে কিউল্লুকি ভাল রাগে বিদায় লইয়া গেছে এ কি সেই! কিউল্লুকির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাব দুঃখ হইতে লাগিল। তিনি ডাড়াডাড়ি

তাহার হাত ধরিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গেলেন। তখন কিউম্বুক তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তিনি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—একটুও তিরস্কার করিলেন না। কিউম্বুক যেমন গতবাত্রে কাজ করিতে কবিত্তে চলিয়া গিয়াছিল, আজ সকালে আবার তাহাই শুরু করিল, —মধ্য হইতে রাত্রে ব্যাপারটা যেন স্বপ্ন দেখার মতো ঘটিয়া গেল।

দৃশ্য যে পুরানো তরোয়ালখানা দিয়াছিল তাহা কিউম্বুকির ঘরের দেয়ালে টাঙানো থাকিত। সেখানে দেখিলেই তাহার সে রাত্রে কথার মনে পড়িয়া যাইত। সমস্ত দিন কাজকর্মের পর সে যখন শয়ন করিতে আসিত তখন সেই টাকাগুলার শোক প্রতিরাতে নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিত—নিরুৎসাহে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িত। —আর কি সে বন্ধকী জমাজমা উদ্ধার করিতে পারিবে? —না, দাদাকে খুঁজিয়া আনিয়া মায়ের শোকাগ্র মুছাইতে পারিবে? তাহার আশা ভরসা সব গিয়াছে! টাকাগুলো যে জন্মের মতো গিয়াছে সে কথা সে ভুলিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিত কিন্তু প্রতিরাতে সেই তরোয়ালখানা তাহার মনে সেই দুর্ঘটনার সমস্ত স্মৃতি একে একে জাগাইয়া তুলিত—সমস্ত ব্যাপারটা যেন সে চোখের সামনে দেখিতে পাইত। যখন সেই দস্যু-গৃহের রমণীর কথা মনে পড়িত, তখন তাহার উপর একটা আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তাহার মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত; —তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কী লাঞ্ছনাই না সে সহ্য করিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিত—তাহার এ ঋণ বোধ হয় সে এ জীবনে শোধ করিতে পারিবে না।

শেষে এমন হইয়া উঠিল যে তরোয়ালখানা চোখের সামনে রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেখানাকে লইয়া সে কি করিবে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না;—পরে ঠিক করিল পুরানো জিনিসের দোকানে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবে। গ্রাম হইতে একটু দূরে একখানা পুরানো জিনিসের দোকান ছিল, একদিন সে তরোয়ালখানা সেইখানে লইয়া গেল। দোকানী বৃদ্ধ—চোখের জ্যোতি তাহার কমিয়া আসিয়াছে—সে তরোয়ালখানা তুলিয়া চোখের খুব কাছে লইয়া গিয়া তাহার উপর

ধীরে ধীরে চোখ বুলাইতে লাগিল—তরোয়ালখানার মাঝামাঝি আসিয়া সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—“এ যে বহুমূল্য জিনিস দেখচি!”

কিউম্বুক চুপ করিয়া রহিল। দোকানী আবার বলিল—“এতে বাদশার ছাপ আছে—এর দাম অনেক!”

কিউম্বুক জিজ্ঞাসা করিল—“কত?”

—“দেড় হাজার!”

দেড়হাজার! কিউম্বুক চমকিয়া উঠিল। তাহা হইলে তো তাহার সকল দুঃখের অবসান!

দেড়হাজার টাকা পাইয়া কিউম্বুকির মনে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। সে যে মনে মনে বলিত, দিন আসিলে সেই দস্যু-গৃহের রমণীর ঋণ সে শোধ করিবে—এখন তাহার মনে হইতে লাগিল—এই ত দিন আসিয়াছে! হাজার টাকা তাহার প্রয়োজন, অতিরিক্ত পাঁচশত টাকা দিয়া সে তো অনারসে ঋণ শোধ করিতে পারে। এই পাঁচশ টাকা পাইলে সে হয়ত দস্যুব নিকট হইতে চিরদিনের মতো মুক্তি পাইতে পারিবে—নিশ্চয়ই সে তাহার ক্রীতদাসী! এ কথা সে যতই ভাবিতে লাগিল ততই টাকা দান করিবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইতে লাগিল; —তাহার মনে হইতে লাগিল,—এ না করিলে তাহার পাপের সীমা থাকিবে না।

মনিবের নিকট এক হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সে বাহির হইল। সঙ্গে পাঁচশ টাকা। ইচ্ছা ঐ টাকাগুলো রমণীকে দিয়া সে বাড়ির দিকে যাইবে—পথে যে কথানা গ্রাম পড়ে সেগুলো একবার অনুসন্ধান করিয়া যাইবে। তাহার মনে হইতেছিল হয়ত ঐ গ্রাম কথানারই কোনোটার মধ্যে তাহার দাদা আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বাস করিতেছে—লজ্জায় নিজের গ্রামে ফিরিতে পারিতেছে না। কিউম্বুকির বোধ হইতেছিল, তাহার জীবনে এইবার দুর্দিনের মেঘ কাটিয়া গিয়া সৌভাগ্যবর্ষ উদিত হইতেছে। কেবল একটা সংশয় দাদাকে লইয়া—তাহাকে যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে মায়ের কাছে সে কি বলিয়া দাড়াইবে!

এবার সে এমন সময় বাড়ি হইতে বাহির হইল, যাহাতে

দিনের আলো থাকিতেই বনটা পার হইতে পারে। কিন্তু সে যখন দম্ভাগ্ৰহে পৌছিল তখন বনের মাথার উপর দিয়া সূর্য্য অস্ত হইতেছেন;—গাছের ফাঁক দিয়া চারিদিকে সোনালি আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—লাল আকাশের প্রান্ত হইতে পাখীরা কুলারে কিরিয়া আসিতেছে—সমস্ত বনটা দিগ্ধ আলো ও মুছ গুঞ্জে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কিউলুকি কুটারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে তাহাকেও ডাকিল না—রমণীকে সে গোপনে টাকা দিতে চাহে—দম্ভ্য জানিলে নিশ্চয় কাড়িয়া লইবে। কিউলুকি অপেক্ষা করিতে লাগিল। দিনের আলো ধীরে ধীরে মিলাইয়া বাইতেছিল—ছায়ার মতো একটা অন্ধকার কুটুবথানিকে গ্রাস করিতেছিল; পাখীর কলরব থামিয়া গিয়াছে—চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া স্থানটা যেন কেমনতর হইয়া উঠিল। কিউলুকি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। হঠাৎ দেখিল ঘরের মধ্যে একটি ক্ষীণ দীপশিখা জলিয়া উঠিয়াছে। আর অপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া সে অতি সতর্পণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, একটি জীর্ণ মলিন শস্যের দম্ভ্য স্থির হইয়া পড়িয়া আছে—শিরের প্রদীপ জলিয়া রমণী বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া রমণী চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; কিউলুকি তাড়াতাড়ি টাকার তোড়া তাহার হাতের কাছে ধরিয়া বলিল—“এই নাও! সে রাজ্যে আমার জন্তে তুমি যা করেচ সে ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।”

টাকা দেখিয়া রমণী বম্ব হইতে একটা বিবাদের ছায়া যেন সরিয়া গেল;—সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“আজ তুমি আমাদের প্রাণ দিলে! আমরা অনাহারে মারা যাচ্ছিলাম।”

টাকার কথা শুনিয়া দম্ভ্যও তাহার ক্ষীণদেহ তুলিয়া বসিল। কিউলুকি চলিয়া বাইতেছিল। দম্ভ্য তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। কিউলুকি ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।

দম্ভ্যর হৃদয় কৃতজ্ঞতা ভরিয়া উঠিয়াছে;—রূপদেহে অনাহারে সে পলে পলে মরিতেছিল—একটু আগে সে মৃত্যুর ছায়া সম্মুখে দেখিতেছিল—এ বিজ্ঞ বনের মধ্যে কোথাও এতটুকু আশার আলো ছিল না। তারপর

হঠাৎ এ কী! একদিন সে বাহার জীবন হইতে গিয়াছিল, আজ সেই তাহাকে জীবন দিতে আসিয়াছে। সে কিউলুকির হাত ছুথানা লইয়া নিজের হাতে মধ্যে চাপিয়া ধরিল—তাহার চোখের কোণে জল দধ দিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, কিউলুকিকে বুকের মধ্যে একবার চাপিয়া ধরিয়া হৃদয় সীতল করিয়া লয়! কিন্তু সে পারিল না—অবসর হইয়া চলিয়া পড়িল।

কিউলুকি অবাধ হইয়া দম্ভ্যর এই হৃদয়দোহুসা দেখিতেছিল—তাহারও সমস্ত হৃদয়টা আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল সে ধীরে ধীরে দম্ভ্যর শস্যের উপর বসিয়া পড়িল। দম্ভ্য আবার তাহার হাতখানা তুলিয়া লইল—অনেক কথ তাহার বুকের মধ্যে ভোলপাড় করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু একটা কথাও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সে ভাবিতেছিল, বাহাদের জন্ত সে বিপদকে বিপদ ভ্রান্ত করে নাই,—বাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্ত সে নিজের প্রাণকে মৃত্যুর সম্মুখে রাখিয়া যুঝিয়াছে—তাহার সেই সব অসুচরর তাহার এই অসুস্থতার দিনে, তাহার সর্ব্বস্থ লুপ্ত করিয়া। তাহাকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া চলিয়া গেল, আর বাহাকে সে প্রাণে মারিতে গিয়াছিল সেই আজ কি না তাহার জীবন দান করিতে আসিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়টা হায় হায় করিতে লাগিল—সে রুদ্ধ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“হতভাগ্য আমি।”

দম্ভ্য খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—যেন সে ভিতর হইতে একটু বল সংগ্রহ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল তারপর কিউলুকির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—“আমার মতো পাবও জগতে নেই—আমি নরাধম।” বলিয়া সে করুণ স্বরে আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। কিউলুকি শুক হইয়া শুনিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে রাজির অন্ধকার ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছিল; বাজির বাতাস, গাছের পাতার পাতার আছাড় খাইয়া হা হা করিয়া উঠিতেছিল; দম্ভ্য দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে অবরুদ্ধ স্বরে নিঃশব্দ কাহিনী বলিয়া বাইতেছিল! কিউলুকি একমনে শুনিতেছিল—তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। দম্ভ্য তাহার ছোট ভাই ও মায়ের কথা বলিতে গিয়া কঁদিয়া বন ফেলিল, তখন কিউলুকি হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

তারপর দস্যকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—“দাদা! দাদা!”

দস্য বিস্মিত হইয়া একবার কিউম্বিকির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর ছই বাছ আকুলভাবে তাহাব দিকে প্রসারিত কবিরী দিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।—ঘরেব ক্ষীণ দীপশিখা হঠাৎ যেন কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

ধর্মের জ্ঞান, আরব-সমাজও রূপান্তরিত হইল।

আরব-দেশের যাবতীয় বোহাইন ও নগরবাসী বণিকেরা, কিসে ধনশালী হইবে সেই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকিত। এই আরবেরা স্বকীয় বিভিন্ন শাখার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন করিত, শত্রুর উপর পুরুষাভুজের প্রতিশোধ লইত; তাহাদের সামরিক ও দস্যুলভ রীতিনীতি ছিল। সামান্যতির প্রতি তাহাদের এরূপ অমুরাগ যে, তাহারা পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত একই বংশে কোন সর্দার নির্বাচন করিত না। দুঃখদৈন্ত সত্ত্বেও, অর্থগুস্ততা সত্ত্বেও, উহাদের সাড়শর আভিধেয়তা ছিল এবং উহারা মুসলমান ভিক্ষাদান করিত।

আরও কিছুকাল পরে, সিবিরী-রাজ্যের অভ্যুদয়। বড় বড় দেশজয়, অতিক্রান্তভাবে দেশজয়, বর্ধরগণকর্তৃক অতিক্রান্তভাবে বিজয়ী সভ্যতাগ্রহণ, সহসা ধনশালী হইয়া উঠার দরিত্রদিগের ঐশ্বর্য-আড়ম্বর—এই সমস্তের ফলে নীতি কলুষিত হইল।

বোগদাদে, আরব-সভ্যতা চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল। সব জানিতে হইবে, সকল বিষয়েই চেষ্টা করিতে হইবে—এইরূপ একটা প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে অনুভূত হইয়াছিল। লাম্পটের বিলাসিতার মধ্যেও একটা শোভন লাগিতা ছিল। যেমন বড়বড় নগর ছিল সেইরূপ ক্ষুণ্ণোত্তর বড়বড় প্রাসাদও ছিল। সুন্দর গৃহসজ্জা, জমকালো কাপড়। তাহাদের ভোগস্বখের মধ্যেও একটা

মার্জিত কচি ছিল, শুভতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টাঙ্গুলভ একটা অবজ্ঞার ভাব এবং, বিলাসিতার সঙ্গে, এক প্রকার তাপসমূলভ কঠোরতা ছিল।

তাহাব পর অবনতি; বর্ধরদিগের আশির্ভাব; তুর্ক বা মোগলদিগের উপদ্রব ও হত্যাকাণ্ড। পরিশেষে, কালিক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যেসকল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সাধারণ উন্নতির প্রতি বিদ্রোহবশতঃ সেইসকল রাজ্যের অন্তর্গত উর্ধ্বর দেশসমূহ আজিকার দিনে মরুভূমিতে পরিণত।

আরবদিগের সমস্ত কার্যে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, এই ক্রমবিকাশের গতি অনুসরণ করা যাইতে পারে।

রাজ্যশাসন।

কুলপতিশাসনতন্ত্রের যুগে কালিক নির্বাচিত হইত। আর, সেই কালিকই “ইমান,” স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তখন সামরিক রাষ্ট্রনীতি প্রবল ছিল। ওমার, মুসলমান-মাজকেই সৈনিক করিয়াছিলেন। বাহাবা স্বধর্ম্মতাগ করিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইত, তাহাদিগকে আরবজাতির কোনএক শাখাভুক্ত হইতে হইত;—ইহা আরব-রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীভূত একটি নিয়ম। বাহাবা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী নহে তাহাদিগকে দ্বিগুণ রাজকর দিতে হইত;—“মাথা-গুণতি”-কর দিতে হইত, ভূমি-কর দিতে হইত। যেসকল মুসলমানের ভূসম্পত্তি নাই, বাহারা রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, তাহারা মাসে মাসে শতাদির আকারে কিছু কিছু সাহায্য পাইত, প্রত্যেক বৎসরে একটা নির্দিষ্ট অবসর-বৃত্তিও পাইত।(১)

ওমাইয়াদ রাজবংশের শাসনকালে, কালিকের আধিপত্য কুলক্রমাগত হইলেও উত্তরাধিকারিণের নিয়ম অনিশ্চিত ছিল। আরবদিগের নিয়মাত্মসাবে, বংশের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই সর্দার পদবী প্রাপ্ত হইত। উহাদের রাষ্ট্রনীতি সাধারণতঃ বিজয়মূলক হইলেও, বহু পুরাতন বিজিত প্রদেশসমূহে শান্তিকাল-মূলভ শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইত; আরবজাতীয় নহে,—এমন কি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীও

(১) এই ছই রাজকর বিধর্ম্মদিগকে দিতে হইতঃ—ভূমিকর (চরাগ) ও মাথা-গুণতি-কর (জিজিরা)। এই ছই কর মুসলমান দেশমাজেই বিশেষতঃ মুসলমান-অধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

নহে—একপ কৰ্মচারীসকলও নিয়োজিত হইত। সমগ্র সাম্রাজ্য দশ প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ধর্মসংক্রান্ত, সমর-সংক্রান্ত, রাজ্যশাসনসংক্রান্ত, বাজস্বসংক্রান্ত পদ—সমস্তই পৃথক পৃথক, এবং উহাদের পদমর্যাদাও এই ক্রমানুসারে একটি হইতে আর একটি উচ্চতর। কাজির হস্তে বিচারের ভার ছিল। প্রত্যেক প্রদেশই, শাসনসম্বন্ধে প্রায় স্বায়ত্ত, প্রত্যেকেরই আয়ব্যয়ের হিসাব স্বতন্ত্র; শাসনকর্তা, জিলাব সর্দারদিগকে মনোনীত করিতেন। পরে, রাজস্বের সম্পূর্ণ সংস্কার প্রবর্তিত হইল। মুসলমান ভূস্বামীদিগকেও—মোটের উপর সমস্ত রাজস্বের দশম অংশ পরিমাণ—রাজকর দিতে হইত। ইতিপূর্বে সমস্ত মুসলমান সৈনিক ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

পরিশেষে, আব্বাসীদ-বংশের শাসনকালে, Byzance প্রভাব তিরোহিত হইয়া তাহার স্থানে পারস্যের প্রভাব প্রবেশ করিল। কতকগুলি উজীর লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। আরও কিছুকাল পরে, একজন প্রধান-উজীরও নিয়োজিত হইল। প্রধান-উজীর, কালিফ হইতে, সর্বময় কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং এই পদ অনেক স্থলেই কৌলিক হইয়া পড়িল। সচিবদিগের বিভিন্ন অধিকারের মধ্যে—রাজ্যস্বামীমুদ্রাধিকার, কোবাধিকার, দণ্ডাধিকার (ইহার সহিত ডাক-যোগে পত্রাদি প্রেরণের অধিকারও একীভূত) খাসমহল-বিভাগের অধিকার, ও সমরাধিকার—এইগুলিই উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বাপনপদ্ধতি ক্রমশ পরিপুষ্ট লাভ করিল;—যথা, নৌ-গুরু, খনি-গুরু, পণ্ডাচারণ-গুরু, ভূমি-গুরু ইত্যাদি। মোটের উপর, ইহা এমন একটি শাসনতন্ত্র যাহাতে রোমের, বিজ্ঞানশ্রীর ও চেসিকোনের প্রতিষ্ঠান-গুলি একত্র সম্মিলিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

বিধি ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাপ্রণয়নে বোমকেরা যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল, আববেরাও সেইরূপ প্রতিভার পরিচয় দেয়। উহাদের আইন-কাহ্ননের প্রথম উৎস—কোরান; দ্বিতীয় উৎস—জনপ্রবাদ। প্রবক্তা মহম্মদের বাক্যাবলী,—মহম্মদের শিষ্যগণ কর্তৃক, আশ্রয়গণ কর্তৃক, পন্থীগণ কর্তৃক, এবং আরও পরে, ঐসকল আশ্রয়বন্ধুগণের পুত্র, প্রপৌত্র ও শিষ্যগণ কর্তৃক কথিত হইয়া মুখপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে।

ব্যবহাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায় কোরানে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, লোকপ্রবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্কাপেক্ষা প্রাচীন সম্প্রদায় মেদিনায় এবং সর্কাপেক্ষা চিন্তাকর্ষক সম্প্রদায় বাগদাদে অবস্থিত ছিল। বাগদাদে যে আইন-কাহ্নন প্রণীত হইয়া রোমীয় আইন-কাহ্ননের সমতুল্য। মহম্মদের বিচার-নিষ্পত্তিগুলি অমরূপ *ঘটনাস্থলে প্রযুক্ত হইয়া ব্যাপকত লাভ কবে। এবং উহারই বেমানান সংমিশ্রণে বিধর্মীদিগের জন্তও একটা ব্যবহাপদ্ধতি প্রণীত হয়।

আরব-আইনের দ্বারা, ব্যক্তিগণের আপেক্ষিক অবস্থা পুত্রের কর্তব্য, পত্নীর কর্তব্য, অভিভাবকের কর্তব্য, অপ্রাপ্ত বয়স্কের সম্পত্তিস্থাব্যধারকের কর্তব্য, দাসের কর্তব্য মক্কেলের কর্তব্য, দাসস্ব-মুক্ত দাসের কর্তব্য নির্দ্ধাৰিত হইয়াছে। এই আইন, দাসকে রক্ষা করে এবং দাস হইতে মুক্তিলাভের সুযোগ কবিয়া দেয়। মুসলমান-বিবাহ সিদ্ধ হইবার পক্ষে যেরূপ দুই জন স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান সাক্ষীর উপস্থিতি আবশ্যক, সেইরূপ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রীর সম্মতিও আবশ্যক। কোন দাসী, দাসস্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেও উপপত্নীরূপে থাকিবা যায়, কখনই ধর্মপত্নী হইতে পাবে না। বিধর্মী বমগীর সহিত বিবাহ করিবার অধিকার মুসলমানের আছে। চুক্তিপদ্ধতিও বেশ পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে :—যথা, দানবিক্রয়, সমবাহ, দান, গচ্ছিত, হুণ্ডিপত্র ইত্যাদি। উত্তরাধিকারিত্বের পদ্ধতিও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—দানপত্র-বিহীন উত্তরাধিকারী, বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত উত্তরাধিকারী, রক্ষিত স্বত্ব উত্তরাধিকারী, ইত্যাদি।

অতএব, মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনপ্রণালী ৬ বিধিব্যবস্থা হিন্দুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। মুসলমান অধিপতিগণ, স্বকীয় রাজ্যে, কালিক-সাম্রাজ্যের শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রবর্তিত করেন। ভাবতের মুসলমানগণ আরব-আইনেব দ্বারা অমুশাসিত হইত।(২) কিন্তু হিন্দু, বর্ণভেদ প্রথার ও স্বকীয় প্রাথমিক বিধিব্যবস্থার এতদন্ত ভক্ত হওয়ার, মুসলমান আইন প্রত্যাখ্যান করিল।

(২) এখনও ভারতের মুসলমানগণ আরব-আইনের দ্বারা অমুশাসিত হইয়া থাকে।

মুসলমানধর্ম, শিক্ষাকার্যের প্রবল সহায় ছিল। প্রত্যেক মুসলমান ভক্তের কোরান জানা আবশ্যিক। কোনও নগরে অধিষ্ঠিত হইবামাত্রই, আবব-সৈনিকেবা শত্রু রাখিয়া শাস্ত্রের বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিত। সর্বত্রই উহার ধর্মমূলক সম্প্রদায়, রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রদায়, বিশেষত সমাজঘটিত সম্প্রদায়সকল স্থাপন করিত। আরবদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই উহাদিগকে গণতন্ত্রের দিকে লইয়া যাইত। অনেকেই কোরানেব দোহাই দিয়া সর্দাব নির্বাচনের ও সম্পত্তি বিভাগের দাবি করিত।

মসজিদই একপ্রকার অবৈতনিক পাঠশালা; মসজিদেই বালকেরা লেখাপড়া শিখিত। উহাদের মধ্যে বাহারা বেশী বুদ্ধিমান তাহারা সর্কাজপুট উচ্চ শিক্ষালাভ করিত। কাইরো, মেকা, দামাস, কর্দ্দু, শেভিল্, টোলেড্—এই-সকল নগরে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ধর্মশাস্ত্র, ব্যবস্থাসাশ্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতেব শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্বত্রই পুস্তকাগার সংস্থাপিত হইত। (৩) কর্দ্দুর পুস্তকাগারে ৪ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। বাগদাদের পাঠাগারসকল সর্ক-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কোরানের লিখন-রীতিই সর্কাসম্পদব বিবেচিত হওয়ায়, লিখন হইতে সমরথন্দ পর্যন্ত সকল স্থানের সমস্ত শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত লোক, ঐ রীতি অনুসারেই লিখিত ও কথা কহিত। যাতায়াতের জন্য অসংখ্য নৌকা ছিল। রাস্তা ঘাট ভাল অবস্থায় রাখা হইত। ডাকের কাজও বেশ নিয়মিতরূপে চলিত। কোরানের অনুশাসন অনুসারে, মুসলমান মাত্রই জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবার মেকায় তীর্থযাত্রা করিতে বাধ্য। দ্রুতভাবে দিগ্বিজয় সাধিত হওয়ায়, হুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবাব জন্য সকলেরই একটা অভিকর্ষ জন্মিয়াছিল। কোন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ কবিবার জন্য, ছাত্রগণ কর্দ্দু হইতে বোখারায় গমন করিত। এইসমস্ত ভ্রমণ, ও বিভিন্নদেশীয় মুসলমানের বিভিন্ন প্রকৃতি, —সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতিকল্পে সাহায্য করিয়াছিল।

কোরান হইতেই আরব-দর্শনশাস্ত্র নিঃসৃত হয়।

(৩) আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারের ধ্বংসের কথা একটা কাহিনী মাত্র।

সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, মোতাজ্জেল-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ কোরানের কতকগুলি মতবাদ নির্দারিত করিয়া দিল। তাহারা ঈশ্বরের উপাধি ও গুণ অস্বীকার করিল; তাহারা বলিল, উহা একেশ্বরবাদের বিপরীত কথা। মানুষেব ইচ্ছা স্বাধীন, এই মতটিও তাহারা পোষণ করিল। অষ্টম শতাব্দীতে, উহা সমস্ত গ্রীকগ্রন্থেব, সিরিয়ার গ্রন্থেব, হিব্রুগ্রন্থেব, ভাবতীয় গ্রন্থেব, পাবস্ত-গ্রন্থেব অনুবাদ করিল এবং সমস্ত বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিল। জানেব এইরূপ একটা বিশ্বকোষসংগ্রহের চেষ্টা হইতেই কালিক-রাজ্যের অবনতির সময়ে, “চিন্তাশুদ্ধিসাধনাকারী ব্রাহ্ম-মণ্ডলী” নামক একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বসোরা নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ইহা সমস্ত সাম্রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সাধারণেব মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই এই ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য। উহারা যোগবাদী বলিয়াও আপনাদিগের পরিচয় দিত; সম্ভবত তাহার মূলে কোন রাষ্ট্রনৈতিক অভিসন্ধি ছিল।

গুস্তাইয়াদ-বংশের শাসন-কালে, আরবদিগের মধ্যে গ্রীকদর্শন প্রসার লাভ কবে। দিগ্বিজয়ের সময়ে, সেমিটিক-বংশোদ্ভব সিরীয়ানেবা প্রায় গ্রীকভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন হইতে, মোতাজ্জেল-সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিকগণ, ফাবাবিহ স্তায় স্বাধীন-চেতা আচার্য্যগণ, —অ্যারিস্টটলের মতবাদের সহিত কোরান-প্রতিপাদিত মতবাদসমূহের ঐক্যসম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম-ধর্মের অধিকার ও দর্শনের অধিকার—এই দুই অধিকারের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবেচনায়,—দর্শন একটা বিজ্ঞান, অথবা দর্শনই চবম বিজ্ঞান। তাহাদের মতে, সকল দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই একটা মিল থাকা উচিত। আরবীয় “টুলো” দর্শনের আচার্য্য—আভিসেন্।

আরবদিগের মনোবিজ্ঞানের স্থূল বেধাগুলি নিয়ে প্রদর্শন করা যাইতেছে :—

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, উপাধিবিহীন, অতিনির্মল ও বিশুদ্ধ সত্য। ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে, জীবের সোপানপরম্পরা। এই মতটি পারসীকগণ হইতে ও Gnostique সম্প্রদায় হইতে গৃহীত। কোন কোন দার্শনিকের মতে, ঈশ্বর—

প্রজ্ঞার স্রষ্টা, “বিশ্বজনীন আত্মার স্রষ্টা ও সর্বাদমি ভৌতিক পদার্থের স্রষ্টা। শেবেস্ত্রু ছই উপকরণ হইতে সমস্ত জীবজগৎ নিঃসৃত হইয়াছে। আভিসেন্ তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ পদ্যে,—ঈশ্বরের নিঃসৃত, এমন কতকগুলি “আইডিয়া”র অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন যাহা সমস্ত ভৌতিক জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। অতএব, তাঁহার দর্শনপদ্ধতি, “নিস্তাশিলিষ্ট” ও “নিস্তাশিলিষ্ট” এই দুই সম্প্রদায়ের দর্শনপদ্ধতির মধ্যে, একটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার করে। তাহার পর, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন কতকগুলি জীব, কিন্তু সেইসব আধ্যাত্মিক জীব এক প্রকার ভৌতিক পদার্থে আচ্ছাদিত। সর্বশেষে, সূক্ষ্ম (Ethereal) ব্যোম-জগৎ, যাহার নিজস্ব রূপ ও গতি গোলাকাব এবং সেই পাঞ্চভৌতিক জগৎ বাহার রূপ বিচিত্র ও গতি পবিবর্তনশীল। এই পাঞ্চ-ভৌতিক জগতের অন্তর্গত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা ও ধাতুসমূহের সোপান-গ্ররম্পবা। (৪)

আরবেলা পদার্থবিজ্ঞানেরও অমূল্য কবিরাছিল। উহারা পদার্থবিজ্ঞানকে—মনোবিজ্ঞান, স্তায়, ও তত্ত্ব-বিদ্যারই উপশাখা বলিয়া বিবেচনা করিত।

উহারা সমস্ত বিজ্ঞানেব অমূল্য কবিরাছিল। বিজ্ঞানের আলোচনার বাথায়ধ্য রক্ষা কবিবার দিকে উহাদের মনের গতি। ঐতিহাসিকেরা কালিকদিগের বুদ্ধবৃত্তান্ত ও শাসনবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছে; আবার কেহ কেহ সকল জাতিবই কালক্রমিক ইতিবৃত্তের অমূল্য কবিরাছে; আবার কেহ বা সাধারণ ইতিহাসেরও অমূল্য কবিরাছে। ওমারের আদেশ-মুসারে, সেনাপতিগণ বিভিত রাজ্যসমূহের পুখ্খাপুখ্খ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইত; যেসকল পর্যটক, যে-সকল বণিক, নানাদেশে ভ্রমণ করিত, তাহারা সেইসকল

দেশের মানচিত্রসম্বলিত ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিত। স্বকীয় ভাষার একান্ত অমূল্যগী আববেলা, ভাষার নিয়ম সূত্রবদ্ধ করিয়া ভাল ভাল ব্যাকরণ রচনা করিত এবং শব্দসমূহের তালিকা করিয়া অভিধান প্রস্তুত করিত।

পরীক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবক আরবেলা দৃষ্টিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞা, ধাতুবিদ্যা, ঐশীবিজ্ঞা—এই সমস্তের অমূল্য কবিরাছিল। দৃষ্টিবিজ্ঞানে উহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহা খুব ঠিক।

চিকিৎসাশাস্ত্রে আভিসেন্ সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গ্যালিয়েনের শিষ্য আরবেলা এই শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করে—যদিও, শব্দের নিষিদ্ধ হওঁয়া, মানবদেহ সম্বন্ধে উহাদের সম্যক জ্ঞান ছিল না। উহারা ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিল, এবং কি করিয়া চক্ষের ছানি কাটিতে হয় তাহা জানিত।

উহাদের রসায়ন শাস্ত্র, ধাতুপরিবর্তনবিজ্ঞানের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। আরবেলা, কঠিন, তরল ও বয়ব পদার্থের ভেদনির্ণয় করিয়াছিল, এবং কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থে অথবা তরল পদার্থকে কঠিন পদার্থে পরিণত করিতে পারিত; জলশোধন, ফটিকীকরণ, দ্রবণ, উষ্ণ-পাতন, বয়ব প্রস্তুতকরণ—এই সমস্ত প্রকরণ উহারা অংগত ছিল। কতকগুলি সূরা, কতকগুলি ক্ষার, তুজিয়া, ফটিকিরি, সোরা, সোডা, পঙ্ককাস—এই সমস্ত পদার্থও সহিত উহারা পরিচিত ছিল।

জ্যোতিষ। উহারা জ্যোতিষে টলেমি ও ভারতবাসীদিগের শিষ্য। ভারতবাসীদিগের অনেকগুলি “সিদ্ধি” (সিদ্ধান্ত) উহারা অমূল্য করে। উহাদের একটা পঞ্জিকা ছিল। উহারা সৌরপথের আনতি ঠিক গণনা করিতে পারিত, এবং উৎকৃষ্ট বীক্ষণ যন্ত্রাদিও নির্মাণ করিত।

গণিত। ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে উহারা সংখ্যাক, দশমিক গণনাপদ্ধতি, বীজগণিতেব মূলসূত্রাদি গ্রহণ করে। পরে, উহারা বীজগণিতের প্রভূত পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। দশম শতাব্দীতে, উহারা বর্ণাত্মক সমীকরণের লাববসাধন করে। উহারা যন্ত্রবিজ্ঞা ও জ্যামিতিরও প্রভূত উন্নতিসাধন করে। ইউক্লিডের মূলসূত্র হইতে যাত্রা ভারত

(৪) Garra d Vaux প্রণীত,—আভিসেন; Renan প্রণীত “Averroes et Averroisme.”

প্রধান আরব ঐতিহাসিকদিগের নাম নিয়ে দেওয়া হইতেছে :—
“ইবন্-খিশাম” (৮১২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়); এ “তাবারী” (৮৩৮-৯২২); খুইদরী-বলখী “অবুল-কাসস” (১০২৬-৮৬); হলুতান “এজুবুদ”; “আবুলকেরা” (১২৭৩-১৩০১) ইত্যাদি।

প্রধান আরব দার্শনিক :—“করাবি” (৯০০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়); “বন্ সিন” (আভিসেন) (১০০-১০০৭); “আবুল ফজালি” (১১১০ অব্দে মৃত্যু হয়); ইবন্-বস্ফ (আভেরোয়ে) (১১৭৬-৯৮)।

করিয়া উহা বা মাণ্ডলিক ত্রিকোণমিত্তির দ্বারা সমস্ত-
সমূহের সমাধান কবে।

আরব-চিন্তার প্রভাব, ভারতবাসীর পক্ষে যেরূপ
হিতকর হইয়াছিল, এমন আর কিছুই হয় নাই। নিরঙ্কুশ
কল্পনা, শ্রেণীবদ্ধন ও নিয়ম-বদ্ধনের স্পৃহা, স্বতঃসিদ্ধ
মূলতত্ত্বের প্রতি ঐকান্তিক অধ্যয়ন—এই সমস্ত ভারত-
বাসীর মনকে এরূপ বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল যে
উহারা স্বদেশের প্রকৃত গঠন জানিতে পারিয়াও, উহার
আকার পক্ষে মত এইরূপ করনা করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষেত্রে

ভো মহার্ঘব, নীল-মৈতরব
গর্জদ্-জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মস্ত সমান
তুলিতেছ কা'র বন্দনা-গান ?
নন্দনব উদ্বোধনের
হৃদুভি বাজে বঙ্গে।
নীলকণ্ঠের বিরাট পিনাক
টঙ্কত অহোরাত্র—
আজো কি ভোলনি মন-রোল,
স্ববাস্তবে মিলি' উন্মাদ দোল ?
ইন্দিবা আজি উদিবেন বুঝি
কক্ষে অমৃতপাত্র।
দাঁড়ারে তোমার বেলা-বালুকার,
হেরি বিহ্বল চিত্তে
যোজনাস্তরে গগন-সীমায়
ঢলিয়া পড়েছ মহানীলিমায়,
তরলোজ্জ্বল কেনিলোচ্ছল
পদ্মগ-ফণ-নৃত্যে।
না জানি কোথায় অতল পরশে
অরুণ-প্রবাল-হস্তে,
বাক্যী রূপসী বেগী-রচনাতে,
কঙ্কতিকাব সম্মুখ আঘাতে

ভাঙ্গে অর্কদ জল-বুদুদ,
বিলাস-মুকুর-নর্মে।

কোন্ উপকূলে লবঙ্গফুল-
পরিমলে বায়ু ফুল ?

দাকচিনি-বনে অপক্লপ পাখী
অরাল কলাপে জলধরু আঁকি'
মন্দমোহল তরুর তোরণে

চন্দ্রহারেব তুল্য।

হে চণ্ডিবার, মুক্ত-উদার,

হে পূর্ণ অক্ষরস্ত,

চেয়ে চেয়ে ওই বিপুল উরসে,
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে—

হেবি নেপথ্যে অন্তবিহীন

কল্পলোকের পঙ্খ।

খেলিছ এমনি লীলা-উদ্বেল,

অমলিন-মণি-দীপ্ত—

কত না ভাবুক তব পাশে আসি'

এমনি হরষে আলোড়ি' উছাসি'

সঁপেছেন তোমা' অনব অর্ঘ্য,

বিভোব অপরিভৃপ্ত।

এই সেই পুরী, এইখানে ডোবে

নবদীপের চন্দ্র—

তীর্থে তীর্থে যুগি' অবশেষে

উদাসীন প্রাণে এইখানে এসে

সমাহিত ওই নীল অনন্তে

ভূজিতে ভূমানন্দ।

জগ'জনে তিনি দিগ্ভাছেন কোল,

কেহ নাই অস্পৃহ,

হোক না সে দ্বিজ, হোক চণ্ডাল,

বিশ্বের প্রোতে ক্ষুদ্র বিশাল,

সবারে সাদরে আলিজে কাল—

বর্জনে প্রেম নিঃস্ব।

একদা জগদগুরু শঙ্কর

ভারতের বুধবৃন্দে

নিঃস্রব কবি' মনীষা-কিবণে

এইখানে আসি' তৃতীয়-নয়নে
নেহারিয়াছেন মহামানবেব

মিলনের অরবিন্দে ।

ধৃত্য এখানে মানব-আত্মা

পূজি' শাশ্বত সত্যে—

একাকার হেধা অখিল বর্ষ,

টুটি বিচারের কঠিন বর্ষ

সব ব্যবধান ডুব গেছে ওই

পাবন সলিলাবর্তে ।

কবীব, নানক, হবিদাস হেথা

অবিনাশ বাক্-ছন্দে

উছাধিলেন শুভ আছানে

চিবমুমুক্ মানবের প্রাণে,

লভি' সাধনায় মধুমান্ সেই

ঐব সচ্চিদানন্দে ।

এই শ্রীক্ষেত্রে লুটীও ভক্ত,

অভিমান হোক চূর্ণ,

হউক নিরাস ভেদ-জ্ঞান-ভ্রম,

জগন্নিধান পুঙ্খবাস্তব,

নীলমাধবেব চরণোপাস্তে

সব মনোরথ পূর্ণ ।

ভো মহার্ঘব, ভীম-ভৈবব

উত্তাল লীলাভঙ্গে,

গর্জি' মেঘের মস্ত সমান,

গাও গাও তাঁ'বি বন্দনা-গান,

নক্তানিব মাল্লিকের

গুহ্যরত্ননি-সঙ্গে ।

শ্রীককণাধিনিধান বন্দ্যোপাখ্যায় ।

দিদি

দশম পরিচ্ছেদ ।

হরনাথ বাবুর মৃত্যুর পর কয়েকদিন কাটিয়া গেল। অমর
ক্রমে সামান্য লাভ কবিত্তে লাগিল। চারুও জন্ত তাহাকে
আরও চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে হইল। চারু এখানে

অপরিস্ফুট স্থানের মধ্যে সম্পূর্ণ একা; স্বামীর কাছেও যে
স্বচ্ছন্দ্য বড় একটা ঘেসে না, এক কোণে একলাটি চুপ
করিয়া বসিয়া থাকে। হরনাথ বাবুর মৃত্যুর পরদিন
হইতে সুরমা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। অত্যা
অমরনাথই চারুর সঙ্গী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

শ্রীমাচরণ রায় একদিন সুরমাকে বলিলেন—“না,
তোমার হাতেই কর্তা ভ্রমরকে দিয়ে গিয়েছেন, সে এখনো
সংসারের কোনো কাজ শেখেনি, শিখতে চেষ্টাও কবে
না; বাথ কর্ণের দিকে একবারও ঘেসে না; তুমি
ইচ্ছা করলে হয়ত তাকে এসব দিকে দৃষ্টি নেত্রান্তে
পার।”

সুরমা কিছুক্ষণ নীরবে রহিয়া শেষে ক্ষীণ হাস্যেব
সহিত বলিল—“না কাকা, বাবা যদি থাকতেন ভো
অবশ্য আমি আপনার কথা রাখতাম, এখন তোনো
বিষয়ে আমার কথা না কওয়াই ভাল। নিজেই হুদিন
পরে বুঝে চলতে শিখবেন।”

“না রাগ ক'রো না। দেখতে পাই তুমি ছোট্টবোনা
বা অমরের তো একবারও তত্ব নাওনা এখন। এখন
ওরাও শোকাক্ত, ওদের নিজের বাড়ী হলেও ওরা এখানে
যেন নবাগত অতিথি। আমি আশা করেছিলাম না লক্ষী
তুমিই একলা সব বুক পেতে নেবে।”

“নিতে চেষ্টা করব কাকা, বাবাব আশীর্বাদ আছে;
কিন্তু এখন আমার কিছু বলবেন না।”

শ্রীমাচরণ রায় অপেক্ষ নীরবে থাকিয়া বলিলেন—
“সম্পূর্ণ মন দিয়ে যদি না পার মুখে আত্মীয় ভাব প্রকাশ
করে তাদের যাতে ভাল হয় সে চেষ্টা কবা ডোমার
কি উচিত নয়?”

“না কাকা, আমি তা মোটেই পারব না। মনে যদি
না পারি তো মুখেও আত্মীয়তা করতে পাবনা। মনে
এক ভাব রেখে মুখে আর এক রকম ব্যবহার সে আমি
পারব না। সেটা পারি না বলেই আপনাদের কাছে
কতদিন আমি নিঃশব্দের মত কত ব্যবহার করেছি।
মনও আমার সর্বদা এক রকম থাকে না কাক।
কখনো মনে হয় আমায় সব, আবার তখন মনে হয়
আমি এখানকার কেউ নই। বাবা থাকতে আমি দে-

রকমে চলেছি তাই মনে কবে হয়ত আপনি ওকথা বলছেন ; কিন্তু বাবার ধৈর্যের অধিকারে তখন আমার মনে এমন কিছু ক্ষোভ ছিল না—এ আপনাকে সত্য বলছি। বাবা যখন তাদের আমার হাতে হাতে দিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল...বাক্ এখন সে সব কথা—আমার মন বড় খাবাপ। বাবা চলে যাওয়ার পথ থেকে আর আমি ওদের কাছে এসে মোটেই পারি না। আমার মনে হয় আমার সব কর্তব্য নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রামাচরণ রায় চুপ করিলেন।

মহা সমারোহে ও বহু অর্থব্যয়ে স্বর্ণীয় হরনাথ মিত্রের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। শত্রুপক্ষীয় বহুদিগকেও স্বীকার করিতে হইল “হ্যাঁ, তাঁর উপযুক্ত কার্য হইয়াছে বটে।” অত্যধিক ব্যয় হওয়াতে অমরনাথের কিছু ঋণও হইয়া পড়িল। শ্রামাচরণ রায়েব এত ব্যয় করা ইচ্ছা ছিল না, কেননা কর্তা অত্যন্ত যুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া নগদ তেমন কিছু রাখিয়া যান নাই। কেবল অমরনাথের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে এরূপ কার্য হইল। প্রতিবাদ অনুচিত বুঝিয়া শ্রামাচরণ রায় ও সুরমা কেহই উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন দেওয়ান অমরনাথকে ডাকিয়া যথাকর্তব্য উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং সমস্ত বিষয়কর্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অমরনাথ বিস্মিতভাবে বলিল—“কাকা—এর মানে কি? আপনি থাকতে আমার তো এসব জানবার অত দরকার নেই।”

শ্রামাচরণ বলিলেন—“বাবা, দাদা এগিয়ে চলে গেলেন, আমারও তো প্রস্তুত হ'য়ে থাকা উচিত। আমি কাশী যাব স্থির করছি।”

অমরনাথ স্নানমুখে বলিল—“ও! বুঝলাম দ্বিতীয়বার আমার পিতৃহীন হ'তে হবে।”

শ্রামাচরণ রায় তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু অমরনাথ কোনো উত্তর না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। অগত্যা শ্রামাচরণ সুরমার নিকটে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সুরমা শিহবিয়া বলিল—“না কাকা, আপনি এখন কোনমতেই যেতে পারেন না।”

“না তুমি বুদ্ধিমতী হ'য়েও এই কথা বলছ।”

“না বলে কি বলব? এই সেদিন বাবা গেলেন এর মধ্যে আপনিও গেলে সত্যিই মিস্তির বংশ উচ্ছন্ন যাবে।”

“সে কি কথা মা? অমর বিষয়কর্ম বোঝে না বটে কিন্তু বড় ভাল ছেলে সে, তাকে তুমি চেন না মা। বাক্—আবাব বলছি তুমি অনেক জ্ঞান শোন, যদি দরকার পড়ে তুমি তাকে পরামর্শ টবামর্শ দিও। এরকম ক'রে পাণ কাটিয়ে থেক না মা।”

সুরমা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া মুখ নত করিয়া বলিল—“আপনি বারে বারে এই কথাই বলেন কাকা। আমি তো পাশ কাটাইনি। যিনি এখন কর্তা তিনি কি কোন কাজে আমার সাহায্য চান যে আমি—”

“সে ছেলে মানুষ, আর সেও তো কোনো কাজই নিজেব হাতে নেয়নি তুমি নিজ হ'তে কেন নিজের ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছ মা? কাল সরকারের কাছে স্তন্যদান তুমি তাব হিসাবপত্র কিছুই আব দেখ না, ভাঁড়ারী বলে মা আব কোন হুকুম দেয় না, সরকার আমার কথা শোনে না—এসব কি মা?”

সুরমা ক্ষণেক পরে যুক্তভাবে বলিল—“আমি ছদ্ম অবকাশ নিয়েছি কাকা।”

শ্রামাচরণ রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্নান মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—“এসব ভাল লক্ষণ নয়, তাই আমি আগেই যেতে চাচ্ছি।”

সুরমাও এবার গম্ভীর স্নানমুখে বলিল—“তা হবে না কাকা, আমরা আপনার সন্তান, আমরা যদি খানিক ভুল কবে হাসি কান্না, আপনি কি তাই ব'লে আমাদের বিপদের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। আমার কিছুদিন মাপ করুন। আপনি এতে কেন ক্রোধ হচ্ছেন, যার সংসার তিনি তো এসবের কিছু খোঁজ রাখেন না।”

বৃদ্ধ দেওয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতাশামিশ্র ক্ষোভের স্বরে বলিলেন—“খা ভাল বোঝ কর মা।”

“তা যাই হোক কাকা, আপনার এখন যাওয়া হবে না। অন্ততঃ বছর খানেক নয়। আমি যাই করি,—এতে অবশ্য তাঁর ক্ষতিও কিছু নেই—কিন্তু আপনি তা বলে

ভাগ তাঁকে করতে পারেন না। বাবা তাহ'লে স্বর্গ থেকে ক্ষুণ্ণ হবেন কাকা।”

দেওয়ানজী চিন্তিত ভাবে বলিলেন—“তুমি হাল ছেড়ে দিয়েছ, অমরও তো কিছু দেখবেনা, কাজকর্ম শেখাব বলে কাছারীতে ডেকেছিলাম, কিছু না শুনেই সে উঠে চলে গেল। তোমরা সবই সমান ছেলে মানুষ দেখছি। আচ্ছা না হয় নাই গেলাম, জানতে বুঝতে দোষ কি? আমি একা বুড়ো মানুষ কদিন একবড় ভার বহিতে পারিব?”

“আপনি যদি না পারেন কাকা, তবে আর কেউ পারবে না। .. এখন বেলা হ'ল স্নান করতে যান।”

কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অমরনাথ বিরক্ত ভাবে একদিন দেওয়ানকে ডাকাইয়া বলিল—“এখানকার চাকর বাকরের কোনো কাজে কিছু বন্দোবস্ত কি নেই কাকা? সবই দেখি অপরিষ্কার অনিয়ম। বিশেষতঃ বাড়ীর ভেতরে সবই গোলমাল। শোবার ঘরগুলো অতি অপরিষ্কার, বিছানাগুলো ততোধিক। বাড়ীতে আলো দেয় না, বাঁট পড়ে না। এসব কি কার তত্ত্বাবধানে থাকে না?”

দেওয়ান গম্ভীর মুখে বলিলেন—“ওসব বাড়ীর ভেতরের কাজ চাকরাণীরাই তো করে।”

“সেগুলোর এখন হ'য়েছে কি? আজ ভারী বিরক্ত ধরেছে। আমি তো ওসব কিছু লক্ষ্যই করি না, তবু আমারি আজ অসহ্য বোধ হয়েছে।”

সরকার চণ্ডী ঘোষ স্বেচ্ছা উপস্থিত ছিল, সে বলিল “চাকরাণীরা আপনাপনি মধ্য ঝগড়া ক'রে বামা ক্ষান্ত তো চলে গেছে, তারাই ওপরের ওসব কাজ করত। রান্নাবাড়ীর চাকরাণীগুলো তো আমাদের দফা সারলে। কৌদলেব চোটে কাল নারায়ণ ঠাকুর জবাব দিয়ে চলে গেছেন, বলে গেলেন যে মা আর ঝগড়ালোকে শাসন করেন না—আর এখানে থাকা নয়। কাল রাত্রে মরি শেষকালে বায়ুন খুঁজে, শেষে তেওয়ারীকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া গেল।”

“এসব এমন অবন্দোবস্ত কেন? কাকা—আপনি এসব দেখেন না কেন?”

“আমার কি ওসব দেখার অবকাশ থাকে অমর? বাড়ীর একজন কর্তা বা প্রধান চাই, বিশেষ করে একজন গিন্নি না হলে কি সংসার চলে? তোমরা তো কিছুই দেখবে না।”

“এসব কি আমার দেখার কথা কাকা? আমি সকল কাজ ছেড়ে ঝি চাকর চরিয়ে বেড়াব? বাব থাকতে এসব কে দেখত?”

দেওয়ান কিছু বলিলেন না। সরকার বলিল “আজ্ঞে মা ঠাকরুণই দেখতেন। তাঁর শাসনে ঝি চাকরাণীগুলো একটু জোরে কথা কবার বা কাজেব একটু ইদিক উদিক করবার জোটা ছিল? কাল হারানি মাগী কল্পে কি—”

বাধা দিয়া অমরনাথ বলিল—“বাবা যেন চলে গেছেন—যিনি দেখতেন তিনি তো আছেন—তিনি এখন এসব দ্যাখেন না কেন?”

জামাচরণ নীরবেই রহিলেন। চণ্ডী ঘোষ ভবিয়া চিন্তিয়া বলিল—“তিনি আর এসব কিছুই দেখেন না। কটাকা গোলমাল হ'ল বলে দাওয়ানজী মশার আমার বকলেন,—তা তিনি জাখেন না, মাঠাকরুণ দেখেন না, কাজেই গোল হল, এতে আর আমার দোষটা কি—”

অমরনাথ চণ্ডী ঘোষের কথার ঈষৎ হাসিয়া বলিল—“তা তোমার হাতে থরচ, দোষটা কাকারই হওয়া উচিত।.....কাকা, এর একটা বন্দোবস্ত করুন নইলে ত্রে এখানে প্রাণ নিয়ে তিষ্ঠনো দায় দেখছি।”

“আমি আর কি বন্দোবস্ত কবব বাবা, বড়মাই এসন দেখতেন।”

“তিনি এখন এসব জাখেন না কেন?”

“তুমি তাঁকে কোনো দিন ভার দাওনি ব'লে বোধ হয়।”

অমরনাথ ঈষৎ নীরব হইয়া অকুণ্ঠিত করিয়া বলিল—“এ যে অজ্ঞার কথা কাকা? এতদিন কি আমি ভাং দিয়েছিলাম?”

“তখন যিনি কর্তা ছিলেন তিনি দিয়েছিলেন। এখন তুমিই কর্তা।”

“কর্তা হওয়ার অনেক দোষ দেখতে পাই। এখন

আমার কি কর্ত্তে বলেন—আমার কি তাঁকে গিয়ে বলতে হবে নাকি ?”

“বলা উচিত। গৃহিণী না হ’লে এসব কাজ সুনিয়ে চলে না। এ বেরূপ বৃহৎ গৃহস্থালী তাতে সেই রকম নিপুণা গৃহিণীর প্রয়োজন। এসব কাজ পুরুষের নয়। ছোট বোমা এখনো ছেলে মানুষ আছেন বোধ হয়, নইলে—”

অমরনাথ ক্ষণক ভাবিয়া জীবৎনতমুখে বলিল “সে যেমনই হোক, প্রধান যিনি তাঁরই এসব দেখা উচিত। বাবা তাঁকেই তো এসংসারের প্রধান ক’রে রেখে গেছেন। তাঁর সে অধিকারে তো কেউ হস্তক্ষেপ করেনি, অনর্থক তিনি এরকম করছেন কেন ?”

“তোমার রাগ করা উচিত নয় অমব। তুমি যখন কর্ত্তা তখন তোমায় এটুকু সহ্য করে সাবধানে তাঁর ভ্রম ভেঙে দিতে হবে।”

“আমি তো কর্ত্তা হ’তে চাই না কাকা ; এসব আমার ভাল লাগে না।”

সহসা অমরনাথের মনে হইল যে পিতার মৃত্যুর পর হইতে সুরমা তাহার বা চাকর নিকটেও আর বসে দাঁড়ায় না। পিতার ব্যারামের সময় সুরমা চাকরকে যে প্রকারে নিকটে টানিয়া লইয়াছিল তাহাতে অমরনাথ চাকর নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। চাকর অস্বাভাবিক সরল হৃদয় সে জানিত, বুঝিত যে এই সঙ্গলাভ করিয়া চাকর কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হইবে না ; সুরমার সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধের উত্তাপ চাকর অনুভব করিতেই জানে না। সুরমা যে চাকরকে সঙ্গীর মত পার্শ্বে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে তাহাকে যেটুকু সাহায্য করিল তাহাতেই অমর একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিল, সুরমার সম্বন্ধে সে আর কিছু ভাবিব্যার অবকাশও পায় নাই, ভাবিতে ইচ্ছাও করে নাই। জীবনের মানিকর সংগ্রাম এখন মিটিয়া চুকিয়া গিয়াছে। পিতা তাহাকে আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ক্ষমা করিয়া স্বর্গে গিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। চারিদিকের কর্ত্তব্যের কঠিন বণ সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল শান্তি ও বিশ্রামের সময়। এই নিঃশব্দ নীরব আরামপূর্ণ জীবনের প্রথম স্তূপাত আরম্ভ হইতেই এ কি

বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এখন একজন সম্পূর্ণ নূতন লোক, বাহাকে অপব্যস্ত কখনো মনের রাজ্যের দ্বারেও কোনো দিন উপস্থিত করা হয় নাই, সেই কিনা কতকগুলো তুচ্ছ ঘটনা লইয়া সেখানে অত্যন্ত আগ্রত হইয়া উঠিয়া সময়ে সময়ে কি একটা তবল মানির রেখায় জীবনপ্রাস্ত ভরিয়া দিতেছে। সময়ে সময়ে মনে হইতেছে এটা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নাও হইতে পারে ; এ বিজ্রোহ করার অধিকার তাহার আছে। তখন অমরনাথ ভাবিল “যাই হোক, একটা মুহুর্ত্ত কথ্য বললে সকল ঝগড়া যদি মেটে তো এটা মিটিয়ে ফেলাই উচিত। সে এতদিন যেমন ছিল তেমনি তো আছে ; আমি তো তার অধিকারে কোনো রকমে হস্তক্ষেপ কবিনি, করতে ইচ্ছাও রাধি না এইটুকু বুঝিয়ে দিলে যদি গোল মেটে তো সেটা তাকে আমার বুঝিয়ে বলাই উচিত।”

অমরনাথ সুরমার উদ্দেশ্যে কক্ষের বাহির হইয়া ব্যারামায় পৌছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা দুর্বিবাব সঙ্কোচের হস্ত হইতে নিজেকে কিছুতেই সে মুক্ত করিতে পারি-
তেছিল না। বহু চেষ্টায় সেটাকে সরাইয়া ফেলিবা-
মাত্র মনে আসিল তি বলিয়া কথটা আবস্ত করা
যাইবে।

নিজেকে একটু কড়া রকম চোখ রাঙাইয়া অমরনাথ ভাবিল এত সঙ্কোচই বা কিসেব। আমি তো কোনো অস্ত্রায় কাজ করিতেছি না। তখন সাধ্যমত সহজ পদবিক্ষেপে অমরনাথ সুরমার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। সুরমা তখন নিবিষ্টমনে গবাক্ষের নিকটে বসিয়া পশমের কি একটা সেলাই করিতেছিল। পদশব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া চাহিল—
সম্মুখে অমরনাথ। সুরমার মনে হইল হঠাৎ চকিত হইয়া না
চাহিলে অনেকক্ষণ একপে বসিয়া থাকা চলিত—চোখো
চোখি হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তো চলে না, একটা
কথা ‘এসো’ ‘ব’সো’ না বলিলে বড় অসঙ্গত বোধ হয়।
অমরনাথ নিশ্চয়ই অগ্রে কথা কহিবে না,—সুরমাকেই
প্রথমে একটা কিছু বলিয়া বা করিয়া ফেলিতে হইবে,—
বিপদগ্রস্ত হইয়া সুরমা ত্রস্তহস্তে পশমগুলো কাটার বাক্সের
মধ্যে পুরিয়া উঠিবার উদ্ভোগ করিল।

সুরমা কে আশ্বাস দিয়া অমরনাথই প্রথমে কথা কহিল—
“একটা কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা কর্তে চাই।”

সুরমা মনে মনে বলিল “তা জানি।” তথাপি সে একটু বিস্মিত হইল অমরনাথ না জানি কি কথা বলিতে আসিয়াছে। সুরমা স্থির অকুণ্ঠিত দৃষ্টি অমরনাথের মুখের উপর স্থাপন করিয়া স্পষ্ট কর্তে বলিল—“কোনো কাজের কথাই বোধ হয়?”

অমরনাথের আর একদিনের কথপোকথন মনে পড়িল। এ কথাটারও ভঙ্গীতে অমরনাথের মন ঈষৎ গঁরম হইল। সুরমা যেন জানিয়া রাখিয়াছে যে অমরনাথ কেবল তাহাকে কাজের কথাই বলিতে আসে। এ কিরকম ব্যঙ্গ! কিন্তু বিরক্তিত্বকু মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া অমরনাথ বলিল—
“হ্যাঁ, কাজের কথাই বটে। কথাটার শেষ বোধ হয় শীগ্গির হবে না, একটু বস। যাক।” বলিয়া অমরনাথ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

সুরমা বুঝিল অমরনাথ নিজের সঙ্কোচ কাটাঁইবার নিমিত্তই এত উদ্বেগ বসিয়া ব্যবহারটা সহজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ঈষৎ হাসি তাহার বক্ষ ওঠে ফুটিয়া উঠিল। সেও সহজ হইবে বলিয়া ফেলিল—“তুমি যদি শীগ্গির শেষ কর তবে আমি দেৱী করব না।”

অমরনাথ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—“কাকা বললেন তুমি আর সংসারের কিছু দেখনা শোননা; সত্যি কি?”

সুরমাও ক্ষণেক নীরব থাকিল। তারপরে অমরের পানে চাহিয়া বলিল—“কে বলেছে একথা? কাকা নিজ হাতে বলেছেন তা তো বিশ্বাস হয় না?”

অমর ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল “কাকা বলেছেন ঠিক তা নয়—আমিই বলছি।”

“তুমি?”

“হ্যাঁ। এটা এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয় তো—

সুরমার কণ্ঠ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল—“আশ্চর্যের কথা একটু বটে বৈ কি। আমি কি করি বা কর্তব্য তুমি তার কি জান?”

“জানি। এতদিন আনবারও প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু যখন তোমার কাছেই আমাদের আশ্রয় নিতে হ’ল তখন

মিছামিছি একটা গুণ্ডগোলের প্রয়োজন কি? তুমি যেমন ছিলে তেমনি তো আছ। বাবা তোমার সকলের উপর প্রাধাত্যের পদ দিয়েছিলেন আমিও তোমার সেই রকমই জানি, আমি তোমার সে অধিকারের ওপরে হস্তক্ষেপের অধিকারও রাখিনা এবং তা করতে ইচ্ছাও করিনা। তুমি যেমন ছিলে তেমনি সংসারের প্রধান হ’য়ে থাক, আর যেমনি তুমি সংসারের অপর পাঁচজনের স্বার্থ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছ তেমনি তাদের সঙ্গে আমাদেরও স্বত্তিতে থাকতে দাও।”

“আমি কি তোমাদের স্বত্তিতে কোন বাধা দিয়েছি?”

“বাধা না দাও, তোমার এসব কর্তৃত্ব ত্যাগ করাই ভাল মানে কি?”

সুরমা মনে মনে গুমবাহিতে লাগিল। কি একটা কথা বলিবার ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল, তথাপি একটু সামলাইয়া বলিল—“সব কাজেবই কি অর্থ থাকে? আর থাকলেই বা তা কে কাকে ব’লে থাকে।”

“বেশ। তুমি না বল আমার তোমার একথা বন্ধিবে দিতে চেষ্টা করা উচিত তাই বললাম। কাকাও বললেন আমার তোমার বুঝিয়ে বদা কর্তব্য।”

“কি বুঝাবে?”

অমরনাথ একটু থামিয়া গেল। তারপরে বলিয়া বাড়িয়া বলিল—“তুমি বাবা বর্তমানে এ গৃহের মুহূর্ত্ত-পদ নিয়েছিলে এখন তা ত্যাগ করবে কিসের দ্বন্দ্ব? তুমি যেমন ছিলে তেমনি তো আছ।”

এবার সুরমার আপনাকে সামলান দায় হইল। তথাপি সে ধীর কর্তেই বলিল—“আমি যদি ভাবি তা নই?”

“কারণ ভিন্ন কার্য হয় না। তোমায় কি কেউ অসম্মান কবেছে?”

“না।”

অমরনাথ একটু নীরব থাকিয়া পরে প্রসন্ন মুখে সুরমার পানে চাহিয়া বলিল—“তবে? আমরা যখন কোনো অপরাধ করিনি নিজেই স্বীকার করছ তখন তুমি নিজের পদ আমার নেবে তো?”

“না।”

অমরনাথ নীষব হইয়া বহিল। উত্তর হৃদয় হইলেও তাহার সুস্পষ্টতায় সহসা নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া অমরের কর্ণমূল পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইয়া উঠিল। সে ক্রোধ সঞ্চারণ কবিত্তে চেষ্টাশত্রুও না করিয়া সগর্বে বলিয়া উঠিল—“বেশ। আমার এতে স্বার্থ বেশী এমন কিছুই নেই, কেবল যে যেমন ছিল তাকে আমি সেই রকম রাখতে চাই, স্বার্থ এইটুকু মাত্র। তোমায় আমার কোনো উপবোধ শোনাতে আসিনি। আমার কর্তব্য আমি কবে সেলাম।”

সুরমা ঈষৎ বিজ্ঞপের স্ববে বলিয়া কেলিল—“তা আমি জানি। তোমাব নিঃস্বার্থ কর্তব্যেব অগ্রগৃহে আমি স্থখী হলাম।”

অমরনাথ সক্রোধপদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া উত্তানে কতক্ষণ একাকী বেড়াইয়া বেড়াইল। অট্টালিকাব কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বলিল। তাহা দেখিয়া চৈতন্য পাইয়া সহসা তাহার মনে হইল চাক একলা আছে। তখন সে অস্তঃপুবাভিমুখে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ চলিয়া গেলে সুরমা কিছুক্ষণ নীষবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পবে কিছুই যেন হয় নাই এমন ভাবে সে কাঠীব বাক্সটা খুলিয়া পুনরায় পশম ও কার্পেটখানা লইয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া বসিল।

বিশেষ মনোযোগেব সহিত শেলাই কবিত্তে চেষ্টা করিলেও অনেক কথাই তাহাব মনে আসিতেছিল। আব একদিনের নির্জন কক্ষের কথোপকথনেব এক একটা কথা মনে পড়িল। সেদিনও উপসংহার হইয়াছিল কলহে, আজও তাই। স্বামী জীতে তাহাদের ব্যালাগটি বড় নূতন রকম ও সুন্দর হয়। সুরমার নিতান্ত কার্যাসক্ত ভাব প্রকাশের চেষ্টার উপবেও তাহার মৌন নীষব ওষ্ঠে একটা নিষ্ঠুর ব্যক্তিব কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, “স্বামী জী! ঠিক, তাই তো।”

স্বামীর সেদিনের তাচ্ছিল্য বাক্য একটা একটা করিয়া তাহার মনেব মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন সে যে

পূর্বে কিছু না জানিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বামীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং স্বামী তাহাকে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই আত্মাপমান বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মনে ওতপ্রোতভাবে জাগিয়া ছিল। আজ আজ তিনিই নিজে হঠাতে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিই বলিলেন—কোমল কর্তেই বলিয়াছেন—এটা আশ্চর্য্যেব কথা কিছু নয়—যে, সেই অপমানিতা সুরমাবই একটা আকস্মিক খেলাল তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। তিনি বৃত্তিতে বাধ্য হইয়াছেন যে সুরমা এত স্থগ্যা নয় যে, সে তাহাব ক্ষমতাটুকু প্রত্যাহার করিলে কাহাবো কোনো ক্ষতিবুদ্ধিব কাষণ হয় না। এ সংসাবে সেও অনেকখানি স্থান লইয়া আছে।

যে-স্থান সে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে ত্যাগ করিয়াছে সেই-স্থানই আজ তাহাকে নিজে সাধিয়া দিতে আসিতে হইয়াছিল। অমরকে যে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে ইহা মনে কবিয়া একটা নিজরানন্দে সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মনে করিল আরও যদি তাহার কাছে কোনো ক্ষমতা থাকে তাহা প্রয়োগ কবিয়া অমরকে অধিকতর উৎপীড়িত চঞ্চল পবাক্ষিত করিতে পাবিলে না জানি তাহাব কত আনন্দই হইবে।

শ্রান্তি ও বিবক্তি বোধ হওয়ার সেলাইটা রাখিয়া দিয়া সুরমা বাবান্দার আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েকদিন হইতে শুধু কার্পেটের ঘব গুলিয়া ও হুচে পশম পবাইয়া তাহাব অশ্রান্ত কর্মরত হৃদয় কেমন ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। চেষ্টা কবিয়াও তাহাব মধ্যে নিজেকে সে নিবিষ্ট রাখিতে পারিতেছিল না। অন্তমনে সে বাবান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখেই তাহার একলাব সম্পূর্ণ অধিকারের কতদিনের যত্নে নিয়ন্ত্রিত গৃহস্থালী। এ কয়দিন সে চক্ষু মেলিয়াও তাহার পানে চাহে নাই বা মুহূর্তের জন্তও তাহার বিষয়ে চিন্তা করে নাই। আজ অমরের আত্মানে তাহার অভাবে তাহাব গুছানো গৃহস্থালীব কতখানি ক্ষতি হইয়াছে দেখিবার জন্ত তাহার চক্ষুও কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

সুমনা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছুপে আনন্দে দেখিতে লাগিল, চাবিদিকে অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা। নতুন নিয়োজিত ভাণ্ডারী যথান্মিমে কতকগুলো দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া চাবী লইয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। রন্ধনশালার উঠানে মাহাল হইতে আনীত কতকগুলো মাছ—রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া অস্থ। দাসীব মধ্যে কেহ বা কাহাকেও তিরস্কার করিতেছে “মাছগুলো যে প’চে উঠল কুটবি কিনা?” দ্বিতীয়া ক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল “আমি এখন বলে মরছি নিজের জালায়, আমি মাছ কুটব? মাছ কুটেই বা কি হ’বে? নতুন বামনঠাকুর যে ব’রে রাঁদছে, মাগো, ভূতেও তা খেতে পারে না। কতকটা কাঁচা থাকে কতক যায় পুড়ে। আর তেল বাব কবে দেবেই বা কে? মাহাল থেকে যেনব প্রজা মাছ নিয়ে এসেছে তাদেরই বা চাল ডাল বর কবে দেয় কে? ভাঁড়াবীটা গেছে কোন চুলোয়?”

তৃতীয়া বি বলিল—“কে জানে, কোথায় কোন্ তামাসা হচ্ছে, তাই দেখতে রাতের মত সে গেছে।”

সহিস বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ঠাঁকিল—“কন্ রোজ্জে দানামে শ্রেক কমতি পড়ত হ্যায় আউর পান্সের দানা চাহি—হো ভাণ্ডারীজী।”

একজন বি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“আবে মলোবে! মিসে-ভাণ্ডারী এখনে কাঁহা? খুঁজে নে গে, হিঁয়া সে নেই। তোদের দানা চুরী করবাব বড় ধুম পড়ে গিয়েছে, না?”

“হাঁ হাঁ হামলোগ দানা চোরী করতে হেঁ, আউব তুম খালি পূজাপব রহতে হো। দেখো তো কেয়া মুন্সিল। হররোজ এইসা হোতা হুস।” সহিস বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

খানসামা বামচরণ আসিয়া সগজ্জনে মুখ চোক বুঝাইয়া বলিল—“কেবল মাগীগুলো দালালী করতে জানিল! বাবু বাইবে আজ কত বকলেন, দাওয়ানজী আবাব আমাকে বকলেন। মাগীয়া ওপরগুলো ঝাঁট পাট দিসনি কেন বলতো?”

চাকরাণীরা তখন সমলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“আ গেল যা। উনি এলেন সরফদাজি

কস্তে। আমরা নীচের কাজ করি এতেই আমরা অবসর পাইনে। বামা ক্কার তারাই তো ওপরের কাজ করত।”

“তাদের তো তোরাই ঝগড়া ক’রে তাড়িয়েছিস! নতুন ঝিটেকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিসনে কেন। ছাট বোমা আছেন, আমি যে ওপবে যেতে পারি না।”

“হ্যাগো হ্যা তুমি ভাবী কর্ম্ম। বামাকে আমি তাড়িয়েছি! সে করল ঝগড়া, বদনাম আমার। এই চন্ আমি, এত নাকনাড়া কিসের? যে বাড়ীতে বিচিব নেই, কত্তা গিলি নেই, সে বাড়ীতে আবাব লোকে থাকে?”

“যা মাগী বেরো। তোর মতন ঝি ঢেব পাওয়া যাবে। ভাঁড়াবীখুড়ো আচ্ছা মজা কল্লে। সরকারকে ডেকে এনে ভাল ভাঙতে হবে দেখছি। নইলে লোকগুলো কি ন খেয়ে থাকবে? বাপরে আমিও তো আর পারি না।”

সুমনা বাবান্না হইতে অপস্থত হইল। তাহার মনে হইল অমরনাথ একবার এইগুলো দাঁড়াইয়া দেখিলে তবে তাহার যথার্থ আনন্দ বোধ হইত। তাহার ক্ষেভেন জন্ত এক আয়োজন করা হইয়াছে সে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাল উপভোগ না করিলে সকলই ব্যর্থ; ব্যর্থ চেষ্টা নিজে অর্ধেই আসিয়া বিধে।

তখন রাত্রি হইয়াছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে বাবান্না দাঁড়াইয়া সুমনা ক্কারে কি ভাবিল, তার পরে ধীবে ধীবে অগ্রসর হইল। দেখিল সম্মুখেই অমরনাথের শয়নগৃহে ঘাবে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। অস্পষ্টালেকে সুমনা বুঝিল সে চারু,—চারু যেন তাহাকে দেখিয়া জ্বল অগ্রসব হইতেছে বোধ হইল। অমনি সুমনা ফিরিয়া যেন কোনো কার্যব্যপদেশে একটু স্ববিতপদে নিজের বরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার বোধ হইল চারু ফেন তাহাকে তিরস্কার করিতেই অগ্রসব হইতেছিল। সুমনা আর পশ্চাতে চাহিতে পারিল না।

সম্মুখেই দ্বিতলারোহণের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। কে একজন সোপানারোহণ করিতে করিতে অন্ধকারে হাঁট খাইয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বাঁলল ‘আঃ’। সুমনা বুঝিল সে অমরনাথ। ত্রস্তপদে সুমনা ক্কারান্তরে প্রবেশ করিল। তারপর শুনিতে পাইল অমর নিরুপায় ভাবে চিৎকার চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে রামচরণ রামচরণ বলিয়া

ডাকিতেছে। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পবে পরিচারক আসিয়া আলোক দেখাইলে অমরনাথ নিজ কলাভিমুখে চলিয়া গেল। তারপরে নূতন কিয় সঙ্গে বহুকলরব কবিতা রামচরণ তাহাকে যেখানে যেখানে যে যে আলোক দিতে হইবে তাহার উপদেশ দিতেছে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে নূতন ঝি আলোক লইয়া তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া আঘাত করাতে অগত্যা স্ববমাকে উত্তর দিতে হইল যে, আলোকে তাহার আজ কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

প্রভাতে যখন সুরমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন উজ্জল সূর্য্যকিরণ শাসিবদ্ধ গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তাহার নেত্রের উপরে প্রথব জ্বালা প্রদান করিতেছিল। পূর্বাভ্যাস মত সুরমা সচকিতে শয্যাব উপবে উঠিয়া বসিয়া বলিল—“ও এত বেলা হ’য়ে গিয়েছে।” তার পরে মনে পড়িল এখন বেলা হউক না হউক সগান কথা। সে নিজে হইতেই আপনাকে এই অলসতার মধ্যে টানিয়াছে, নিজেই নিজেকে এই শয্যায় এই গৃহে আবদ্ধ কবিয়াছে, ব্রহ্মিলে তাহাব হাবে এতক্ষণ কতবাব আঘাত পড়িত। স্ববমা নীরবে কিছুক্ষণ শয্যার উপবে বসিয়া বহিল। এই কন্মহীন কর্তব্যহীন প্রভাত তাহার কাছে একান্ত নিরানন্দ রূপে প্রতিভাত হইল।

কক্ষ হইতে নিষ্কাশ হইয়া সুরমা বাবান্দার গিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্র মনে একটা পামের গা খুঁটিতে লাগিল। সুরমা ভাবিতেছিল এমন নিষ্কর্য্য অলসতায় তো তাহার দিন কাটবে না, একটা কিছু তাহাকে করিতে হইবেই। অথচ কোথা হইতে তাহার পুনবারস্ত্র এবং সে কার্য্যটাই বা কি তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। নীচে চাহিয়া দেখিল চাকবাগীমহলে তখন সবেমাত্র বসিয়া বসিয়াই কেহ হাই ভুলিতেছেন, কেহ চোখ রগড়াইতেছেন, কেহ বা পা ছড়াইয়া বসিয়া গভরাজের মশার দোরাআঁ আনিদ্রার বর্ণনা করিতেছেন; শয্যাভ্যাগ সবে আরম্ভ হইয়াছে, বাসী কাজ সব অমন পড়িয়া রহিয়াছে। দারুণ বিবক্তিতরে সুরমা রেলিং হইতে মুখ বাহির করিয়া ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল “বিন্দি”। সঙ্গে সঙ্গে চাকবাগীমহলে একটা হলহল পড়িয়া গেল। যেহাটুর কর্তব্য কর্ষে লাগিয়া

গেল। বিন্দি সভয়ে উপব পানে চাহিয়া বলিল “আজ্ঞে ওপরে বাব কি মা?” “কি, হঠাৎ কি ভোদের? এত বেলা হুয়েছে—” পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া স্ববমা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল অমরনাথ। লজ্জায় স্ববমার দেহালের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, ছিছি অমরনাথ তো তাহার এ হুর্কলত দেখিতে পাইল।

অমরনাথ কোনো কথা না বলিয়া যেমন যাইতেছিল তেমনি ভাবে নীচে চলিয়া গেলেও তাহাব নিকট ধরা পড়ার লজ্জাব হাত এড়াইবার ক্ষমতা সবেগে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়া অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল কিরূপে অমবনাথের নিকট হইতে এ লজ্জাটা ক্ষালন করা যায়।

সমুখেই অমরনাথের শয়নকক্ষের মুক্ত দ্বার। পাশ্বে তখনো কে শুইয়া রহিয়াছে দেখা গেল। সুরমা থমকিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল চারু শুইয়া আছে। ধীরে নিঃশব্দে ফিরিবার উদ্যোগ কবিতোছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, চারু ক্লান্ত ভাবে পাশ ফিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বলিল “মা-আঃ”। সুরমা চলিয়া যাইতে চাহিতেছিল, পা ছুঁটা কিন্তু ধামিয়া গেল। মনটা ধীরে ধীরে বলিল, “অসুখ করেছে বোধ হয়। দেখা উচিত নয় কি? মেখে আব কি করব? তার স্বামী আছে, তার চেয়ে দেখাবাব লোক আর কে হতে পারে। আমি দেখে আর কি করতে পারব। তার চেয়ে বরং বাই কাজ দেখিগে। কিন্তু কাজই বা আর কি আছে? কই স্বামী তো বেরিয়ে গেল, কোনো উদ্বিগ্ন ভাব তো দেখলাম না, জানেনা না কি? নাঃ—দেখেই আসি।”

সুরমা নিঃশব্দপদক্ষেপে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ কবিয়া পাশ্বে নিকটে দাঁড়াইল। দেখিল স্নান বিষয় মুখে চারু চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণার কাতর চিহ্ন ক্ষুদ্র ললাটে ছুটিয়া উঠিতেছে, ভাসা ভাসা চক্ষের নীচে মলিন ছায়া। কক্ষ অযত্নরক্ষিত চুলগুলি চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুখখানি যেন অতিশীতের মত, দেখিলেই মানা হয়, আদব করিতে ইচ্ছা করে। স্ববমা নতনেত্রে তাহাব মুখের উপব চাহিয়া ভাবিতেছিল “আহা অসুখ কবেছে।”

আবার চারু ক্রহটী একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল
“মাগো—ওঃ।” সঙ্গে সঙ্গে ললাটে শীতল করস্পর্শ হইল।
স্নিগ্ধ স্পর্শে সচকিত ভাবে চারু চাহিল,—চাহিয়া দেখিল
নিকটে সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। মাথার বস্ত্রগার কাতর
হইয়া চারু এককণ তাহার মৃতা জননীকে মনে মনে ভাবিতে-
ছিল, চোখ মেলিয়াই প্রথমে মনে হইল না বুঝি।
তারপরে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যেন তাঁহারি মত
মেহ ও করণাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কে একজন তাহার উত্তপ্ত
ললাটে শীতল হস্ত ব্লাইতেছে। ‘দিদি’ বলিয়া চারু উঠিয়া
বসিয়া সবেগে সুরমার হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া আনিতে
চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সুরমা তাহার নিকটে উপবেশন
করিল। চারু তখন সুরমার আবণ্ড নিকটস্থ হইয়া তাহার
কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বলিল ‘দিদি’।

সুরমার ভিতরটা যেন কি রকম করিয়া উঠিল। একটি
আত্মসমর্পণকারী নিকপায় অসহায় শিশু যদি করুণনেত্রে
মুখের পানে চাহিয়া ধীবে ধীবে নিকটে অগ্রসর হয় তখন
তাহাকে সহ্যাবেগে যেমন সংজ্ঞাবে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে
একটা উন্নত ইচ্ছা হয়, চারুর এই শিশুর মত ব্যবহারে
সুরমার অন্তরটা তেমনি কহিয়া আন্দোলিত হইয়া উঠিল।
উচ্ছ্বাসটা কতকটা দমন করিয়া সুরমা চারুর মাথা আপ-
নার কোলে লইয়া তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিল।
তাহার পরে ধীরে ধীবে তাহার ললাটে হস্তমার্জনা করিতে
করিতে মুহূর্ত্তে বলিল “এত অর হয়েছে।” তাবপর
চারুর নির্মীলিত নেত্রের উপর ধীবে ধীবে অঙ্গুলিমার্জনা
করিতে করিতে সুরমা বলিল—“মাথা ধরেছে কি তোমার?”

চারু কাতর নেত্রে চাহিয়া বলিল—“বড্ড।”

সুরমা ধীরে ধীরে মাথা টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—
“একটু সোয়াস্তি হচ্ছে কি?”

“আ। তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা দিদি। বড্ড ভাল
লাগছে।”

কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া সুরমা চারুর স্নান মুখখানির
চিবুক স্পর্শ করিয়া স্নেহে কহে বলিল—“কবে পেকে অসুখ
হয়েছে চারু?”

“আজকে রাত্রে অর হয়েছে। কাল দুপুর থেকে বড্ড
মাথা ধরেছিল।

“মাথা ধরেছিল তা কাল আমার কাছে যাওনি কেন,
আমায় ডাকনি কেন?”

“সন্ধ্যা বেলায় তুমি যখন দালানে দাঁড়িয়ে ছিলে তখন
খাচ্ছিলাম। তুমি আমার দেখতে পাওনি দিদি, তুমি
চলে গেলে।”

অসুখতাপের আবেগে সুরমা বলিয়া ফেলিল—“দেখতে
পাবনা কেন, দেখেও চলে গিয়েছিলাম—আমি তখন যে
একেবারে—” বলিতে বলিতে সুরমা হঠাৎ ধামিয়া গেল।

“আমার অসুখ হয়েছে তখন তো জানতে না—নয়
তো কি আমার না দেখে তুমি চলে যেতে পারতে—নয়
দিদি?”

সুরমা মনে মনে ভাবিল—“তা আমার বড় বিশ্বাস দেই।
ভাগ্যে সে রাপের সময় চাক বেণী সাহস করে কাছে যায়নি,
গেলে হয়ত কি বলে বসতাম।”

চারু সুরমার হাতখানি তুলিয়া কপোলের উপর রাখিয়া
বলিল—“আঃ ভারী ঠাণ্ডা।”

“এখনো কি ভেমনি মাথা ধবে আছে চারু?”

“হ্যাঁ দিদি।”

“একটু অ-ডি-কলোন দিলে ভাল হ’ত” বলিতে বলিতে
সুরমা উঠিয়া পড়িল। টেবিলের উপরে, সেলেক্‌ব উল্লসে
নানা স্থানে অঙ্গুসন্ধান করিয়া শেষে গ্রাশকেসের দিকে
চাহিয়া বিরক্তপূর্ণ স্বরে বলিল—“গেল কোথায়? দেবাজে,
টেবিলে ৩৪টে শিশি ছিল যে।”

চারু ঈষৎ মাথা তুলিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিল—“মধ্যে মধ্যে
মাথা ধবে তাই খবচ হয়ে গেছে বোধ হয়।”

“কাব মধ্যে মধ্যে মাথা ধরে?”

চারু শয্যায় মুখ লুকাইয়া মুহূর্ত্তে বলিল—“ভার।”

“তা জ্বলে বুঝি আনিয়ে রাখতে নেই? আর কখনো
দরকার পড়বে না বুঝি? খুব গোছাল, মানুষ তো। শিশি-
গুলোও উড়ে গেল নাকি?”

“বাক্সেব পাশে টাশে পড়ে আছে বোধ হয়।”

“একটা অডিকলনেব দরকার হ’ল যে। বিন্দিক
ডেকে বলি।”

“না দিদি তুমি যেওনা তোমার ঠাণ্ডা হাতেই মাথা
সেরে যাবে। যেওনা।”

“পাগলী আর কি! উঠিস্ নে, আমি এই এলাম ব’লে।”

সুমনা চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে একটা অডিকলোনের শিশি ও থানিকটা নেকড়া হাতে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল চাকর প্রত্যাশিত নয়নে দ্বারের পানে চাহিয়া আছে। সুমনা তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুভাবে তাহার গাল দুটি টিপিয়া দিল। আত্মদে এক মুখ হাসিয়া চাকর বলিল—“আমার ভয় করছিল, হয়ত দিদি আসবে না।”

সে কথার উত্তর না দিয়া সুমনা বলিল—“কাঁচের গ্লাস বাটি কিছুই দেখছি না, যে রকম গুছোন ছিল সব উল্টে পাণ্টে গ’ছে। আলমাবীর চাবী কই?”

“চাবী! আমি তো জানিনে দিদি! হয়ত বিছানার তলায়—”

“বাস্তব হ’য়ে না আমিই খুঁজে নিচ্ছি।”

সুমনা শয্যার চাবিধার খুঁজিল চাবী মিলিল না। ইহাতে সে অত্যন্ত বিবস্ত্র হইয়া উঠিল। বিরক্তির অমরনাথের উপরেই সম্পূর্ণ ভাবে পড়িল। ভাবিল মানুষ এত অমনোযোগী কিরূপে হয়? সহসা নিজের কথাও যে না মনে পড়িল তাহা নয়। মনে হইল মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হইলে অতি কার্যকুশলীও এইরূপে নিষ্কর্মরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

মাথায় অডিকলোন দেওয়ার ব্যাপার শেষ হইলে চাকর মাথা বাগিশেব উপরে রাখিয়া, মুছ মুছ বাতাস করিতে করিতে সুমনা বলিল—“এখন একটু ঘুমতে চেষ্টা কর দেখি। ডাক্তার ডাক্তে বলেছি, একটা ওষুধ দিলেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে এখন।”

“আমি কিন্তু তেতো ওষুধ খাবনা দিদি। নরেশ ডাক্তারের বড় বিজ্ঞী ওষুধ।”

“নরেশ ডাক্তার কলকাতার বুঝি? এ কালীপদ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করে। ওষুধ জলের মত খেতে। ঘুমোও দেখি একটু।”

চাকর দিদির আজ্ঞামত ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—“না দিদি ঘুম আসছেনা। তার চেয়ে এস গল্প করি।”

“এখন বকা ঠিক নয়। ঘুমোও। আজ্ঞা তোমার যে জ্বর হয়েছে উনি কি জানেন না নাকি?”

“জানেন না বোধ হয়। বেশী বাত্রে জ্বরটা এসেছে কিনা।”

“সকালে যখন উঠে গেলেন তখনো জানেন নি?”

“আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম।”

“মাথা তো কাল দুপুর থেকে ধরেছে। তাও কি জানেন না?”

“তা জানেন বোধ হয়। ই্যা বিকেলে তিনি জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলাম।”

“তা আর কোনো খোঁজখবর নেই। কলকাতায় তোমাদের কি এমনি ক’বে দিন কাটত? সেখানে অল্প হ’লে কে কাকে দেখত?”

“তারিণী দাদা ছিলেন যে। বেশী অল্প হ’লে উনিও দেখতেন।”

“বেশী ব’কে কাজ নেই আর। একটু ঘুমোও।”

চাকর পুনরবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। সুমনা বুঝিল অমরনাথ আসিতেছে। সে ত্রস্তে শয্যা হইতে নামিয়া পার্শ্বস্থিত দ্বার খুলিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অমরনাথ দ্বারের সম্মুখে আসিয়াই ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল ‘চাকর,’ দেখিল চাকর পালঙ্কে ঘুমাইয়া আছে। এমন অসময়ে তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া অমরনাথ ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভপূর্ণে একবার তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল ডাক্তার আসিয়াছে। অমরনাথ তাড়াতাড়ি অঞ্চল স্তম্ভপূর্ণে বাহিরে গিয়া ডাক্তারকে সঙ্গ করিয়া লইয়া আসিল।

ডাক্তার চাকর হাত দেখিয়া মৃদুভাবে বলিল—“কবে জ্বরটা হ’য়েছে?”

অমরনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—“ঠিক জানি না, কালই হয়েছে হয়ত। ডেকে জিজ্ঞাসা করব কি?”

“না তাতে কাজ নেই। সাধারণ জ্বর, তবে একটু বেশী রকম বটে। চিকিৎসা বিষয় কিছুই নেই। আমি

এখন যাই, ওষুধটা বার কত খেলেই সেবে যাবে। কিন্তু যেন নিয়মিতরূপে খাওয়ান হয়।”

ডাক্তার চলিয়া গেল। তাহাব সশব্দ জুতাব মসুমসানিতে চারু ব, থুম ভাঙিয়া গেল। চোক খুলিয়াই চারু ডাকিল—“দিদি—”

— অমবনাথ সম্মুখে তাহাব ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল—“এত জ্বর কখন হ’ল?”

“তুমি? তুমি কখন এলে? দিদি কোথায় গেলেন? দিদি।”

অমবনাথ বিস্মতভাবে বলিল—“কাকে ডাকছ? য়ুমোও দেখি আবার। এমন জ্বর হয়েছে, কই সকালে তো আমার কিছু বলনি।”

“আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। কাল রাত্রে জ্বর হয়েছে। তোমায় কে বলে?”

“তোমায় অসময়ে ঘুমোতে দেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম গা খুব গরম। তারপরে ডাক্তারও এল। ডাক্তারকে ডাকাবার সময় আমারও জানাওনি কেন চাক?”

চারু বিস্মিতভাবে বলিল—“কই আমি তো ডাক্তারকে ডাকাইনি।”

“তুমি ডাকাওনি? তবে কে ডাকালে? বোধ হয় ঝিরা কেউ বুদ্ধি কবে ডাকিয়েছে। যাক্ সকালে আমাকে ডাকিয়ে জ্বরের কথা বলা তোমার উচিত ছিল চাক।”

চারু অপ্রতিভ ভাবে বলিল—“কাকে দিয়ে ডাকাব,— দিদি-দাদে বারে ঘুমুতে বলেন—”

বাধা দিয়া অমবনাথ বলিল—“দিদি কে? বাবে বারে কাকে ডাকছিলে?”

চারু বিস্মিতভাবে বলিল—“দিদি আবার কে, আমার দিদি, তিনি যে এখানে ছিলেন।”

অমবনাথ এতক্ষণে বুঝিল। একটু থামিয়া পরে বলিল—“কই না, কেউ তো ছিল না, তুমি তো একা ঘুমুচ্ছিলে।”

“তবে বোধ হয় তুমি আসবাব আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।”

“তুমি হয়ত স্বপন দেখেছ। মত্থা কি ধরেছে? অডিকলোন দিয়েছিলে বুঝি?”

“এখন কমে গেছে, আর নেই বলেও হয়। তুমি বলে দিদি ছিলেন না, স্বপন দেখেছি, এই ঝাৎ ভিত্তিই মাথায় এটা দিয়ে দিয়েছিলেন, কত বাতাস কল্লেন ভবে তো মাথাটা কমল। নইলে যে মাথা ধবেছিল—উঃ।”

কক্ষান্তরে সুরমা চারু ব উপব রাগিণী ফুলিয়া উঠি-ছিল। “আঃ মেয়েটা যেন কি! এমন বোকা তা দেখিনি। ছিছি বারণ কবে দিতেও ভুলে গেলাম।”

অমবনাথ বলিল—“তা হ’বে। এখন আর এফু য়ুমোও দেখি।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সুন্দর

• সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি

তারায় তাবায় খচিত,

স্বর্ণেরঙ্গে শোভন লোভন জানি

বর্ণে বর্ণে বচিত।

খজা তোমাব আৰো মনোহর লাগে,

বাঁকা বিছাতে জাঁকা সে।

গরুড়ের পাখা রক্তরবিব রাগে

যেন গো অন্ত-আকাশে।

জীবন-শেষের শেষজাগরণ সম

ঝলসিছে মহাবেদনা।

নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম

তীব্রভীষণ চেতনা।

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি

তারায় তারায় খচিত,

খজা তোমাব, হে দেব বজ্রপাণি,

চরম শোভায় রচিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমুদ্র-যাত্রা

[আশ্রয়ে তারিখে লিখিত “দ্য ভোম্বাইআজ দ্য শেতি গাব”

নামক মূল করাণী গল্প অনুসরণে]

আমার ঘরের জানলা হইতে যে খোলাব বাড়ীর চত্বর দেখা যাইত তাহারই একদিকে এক পরিবার বাস করিত। সেই পরিবারের ছোট ছেলেটিকে সবাই ‘ছোট গাব’ বলিয়া ডাকিত। তার বাপ ছিল এক কাটাকাপড়ের দোকানের দর্জি; তার মা ছিল চিরকণ্ঠ দুর্বল, সে বসিয়া বসিয়া শুধু স্বাস্থ্যের তত্ত্ব আর আশ্রম উপভোগ করিত। তাহাদের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে বড় তিনজনের কেউ বা বিদেশে চাকরি করে, কেউ বা বিবাহের পর পরেই ঘর কবিত্তেছে। বাপমার সঙ্গে থাকে শুধু একটি মেয়ে—বয়স তাহার আঠার বৎসর, সেও সেলাইয়েরই কাজ করে; আর থাকে ছোট গাব—সে কুঁজো।

তাহাব বাপ মা তাহাদের জীবনের বেশির ভাগ আলো-বাতাস-শুভ্র স্নাতা ধবে আর দোকানের গৌরবান্বিত মধ্যে কাটাইয়াছে, তাহাব ফলে ছোট গাব একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। তাহাব শিবদাঁড়া ধনুকের মতো ঝাঁকিয়া কাঁধ ছটাকে কানের কাছ পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পলকা পা ত্রিবক্র দেহের ভাবে নড়নড় করিত; তাহার কুঁজো পিঠ আর চিত্রনো বকের উপর একটা প্রকাণ্ড মাথা বসানো। কিন্তু তাহার মুখখানি ছোট, করুণমুখতার কমলায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উজ্জল। যদিও তাহার বয়স আট বৎসর, কিন্তু তাহার গ্রন্থি খর্ব দেহ দেখিয়া পাঁচ বৎসরের বেশি বলিয়া বোধ হইত না; কিন্তু তাহার ভাবনা গম্ভীর মুখ, প্রশস্ত কুক্ষিত ললাট আর কালো চোখের করুণ চিন্তাকাতর দৃষ্টি দেখিয়া তাহাকে প্রবীণ বলিয়া বোধ হইত।

তাহাব বাবা মা আর দিদি তাহার ঠাণ্ডা স্বভাব আর অসাধারণ বুদ্ধিবিবেচনার গল্প করিতে ভালো বাসিত—গাবের কথা বলিতে তাহাবা অজ্ঞান। ডাক্তারের মানা তাহাকে কোনো কাজ করিতে দিবে না; তবু তাহাকে খুঁসি করিতে, বৈচিত্র্যের আনন্দ দিতে তাহারা উহাকে স্থলে

দিয়াছিল। সেখানে সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়া শুনিত, আর, বাহা শুনিত তাহা ঠিক মনে করিয়া রাখিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা স্থলের ছুটির পব আমি দেখিলাম সে বাড়ীর দরজার গোড়াটিতে বসিয়া আছে। তাহার মা বাজারে কিছু কেনাবেচা কবিত্তে বাহিব হইয়া গেছে, তাহার দিদি এখনো দোকান হইতে বাড়ী ফিরে—নাহি, ঘরেই দরজার তাল বন্ধ। দেয়ালে ঠেগ দিয়া তাহাব করুণ নেত্রের উৎস্রুত দৃষ্টি পথের উপর মেলিয়া দিয়া চুপটি করিয়া সে বসিয়া আছে। আমি তাহার এই বিমর্ষ নিঃসঙ্গ ভাব দেখিয়া আদব করিয়া তাহাব সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, সে ভয়চকিত কালো চোখ দুটি তুলিয়া আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহাব দিদি রুদ্ধশ্বাসে হন হন করিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—“আহা বাছারে, মরে যাই! তোমার আমি দরজার গোড়ায় বোস করিয়ে বেধেছি—আ আমার পোড়া কপাল! তুমি কি আমার দেরি দেখে ব্যস্ত হচ্ছিলে ভাইটি?” গাব তাহার শাস্ত মধুর কণ্ঠে দীর্ঘ পবিত্র উত্তর দিল—“না দিদি, আমি কেবল ভাবছিলাম তুমি হয়ত আমাকে ভুলে গেছ, আর কখনো আমার কাছে ফিরে আসবে না ... আমি এমন রোগা, আমি এমন তোমাদের জালাই!” দিদি ভাইটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া চুমায় চুমায় সোহাগ করিয়া স্নেহের অম্লবোণ ছুঁথের মাঝে ডুবাইয়া মুহু গুঞ্জে বলিতে লাগিল—“হুটু ছেলে! হুটু ছেলে!” তারপর ভ্রাতৃ-স্নেহের আরতির জ্বলন্ত মতো তার চোখ দুটি জলে ভরিয়া লইয়া আমার দিকে ফিরিয়া সে বলিল—“একরত্তি ছেলে, কিন্তু কত এর বুদ্ধি! ডাগর মাহুকের মতো গুর বুদ্ধিবিবেচনা! আমাদের অদৃষ্টের দোষেই এর এমন অমুখ! ডাক্তার বলছে যে একে একবার সমুদ্রের ধারে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যেতে পারলে অমুখ সেয়ে যেতে পারে। কিন্তু সমুদ্রে তো নিকটে নয় সমুদ্রে হাওয়া বদলাতে যাওয়া মানে এক কাঁড়ি টাকা খরচ। তবু আমাদের যেতে হবে, প্রাণের চেয়ে তো আর টাকা বড় নয়। ... প্রাণপণ করে তাই তো চেষ্টা করছি যদি কিছু জমতে পারে!”

যেহেতু দিব্যরাত্রি খাটিতেছে—টাকা জমাইতে হইবে।

সে সেলাইয়ের কলেব গোড়ায় বসিয়া পাট আর বথেরা
আব সেলাই আর কোঁড় দিতে দিতে আপনাকে শুক শ্রমে
পিরিয়া একেবারে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল। সে এই,
কাটে, এই কোঁড়ে, এই কোঁড়ে, এই সেলাই করিয়া
তোলে—বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই। গভীর রাত্রে ঘুম
—ভাঙিয়া শুনি তাহার লোহর সেলাই-কলেব তীক্ষ্ণ হুটীর
ব্যস্ত কোঁড়ের ককণ আর্দ্রনাদ—পাড়াগাঁয়ের আলোর ধারে
অতল্ল ঝিল্লির একটানা স্রের মতো; তাহার ঘরের
জানলা-ঢাকা পর্দার উপর তাহার একাগ্র আনত কর্মরত
মুষ্টিখানির ক্লক ছায়া প্রদীপের আলোর স্পষ্ট আমি দেখিতে
পাই, আব তখন আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিয়া বাজিয়া উঠে
টমাস ছডেব সেই ভীষণ করুণ অমর গানের ধূম—

“খাটো শুধু খাটো আর খাটো,

ভোর না হতে পানী যখন ডাকে,

খাটো খাটো, যতক্ষণ না আসে,

তারার আলো ভাঙা চালের ফাঁকে ;

মুড়ি আর সেলাই আর কোঁড়,

কোঁড় আব সেলাই আর মুড়ি,

যতক্ষণ না বন্ধ উঠে কাঁপি,

বাহু অসাড়, মাথা উঠে ধুবি।”

পাড়ার সকল লোকেই গাবকে চিনিত, আহা করিত,
এবং তাহার দিকিকে কিছু না কিছু কাজ কবিতে দিত।
তাহারা গাবকে দেখিতে পাইলেই তাহাকে ধবিসা আদব
করিত, খাবার দিত, পুতুল দিত। সে মুখচোরা, লাছুক,
পাড়াপড়শীর আদরের ভয়ে পাশ কাটাইয়া সকলকে এড়াইয়া
চলিত; যদি কখনো কাহারো আদর বা দয়ার দান তাহাকে
স্বীকার করিতে হইত তাহা হইলে সে গম্ভীর হইয়া
অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া দিকিকে জিজ্ঞাসা করিত—
“আচ্ছা দিদি, ঐ তেতালা বাড়ীর গিন্নি আমাকে খেলনা
দিলে কেন, ও তো আমার চেয়ে না ?” তারপর ভাবিয়া
ভাবিয়া সে তাহার দিদির অস্তর ব্যথিত করিয়া বলিয়া
উঠিত—“ও ! আমি কুচ্ছিত কুজো কিনা।”

কাজ আসিয়া জুটতে লাগিল যথেষ্ট, আর পেটবার
গোপন কোণে গেকের পেটও ভুরিয়া উঠিতে লাগিল
চটপট। আশাচর্য আসিতে আর বিলম্ব নাই, তাহারাও

যাত্রার উত্তোগ করিতে লাগিল; একটা চামড়ার শোর্ট-
মাটো আর খোকার জুজ একটা পোষাক কিনিল।
এমিকে ছোট গাব খুসির চোটে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল,
সঙ্গীদের সঙ্গে সমুদ্রের প্রসঙ্গ ছাড়া তাহার আর অন্য
কথা ছিল না। কিন্তু একটা ছুঁটনার সব পণ্ড হইয়া
গেল।

পাঁচ নম্বরের ভাড়িতে বাড়ীর বৌ তাহার বিয়্য
পোষাক দর্জিমেয়েকে নুতন ধরণে সাজাইয়া গুছাইয়া
মেরামত করিতে দিয়াছিল। এই পোষাকটির দাম তের,
এইটিকেই একটু নুতন চঙে বদলাইয়া আপানী শীতের
উৎসবটা কাটাইয়া দিবে বোটি এই মতলব করিয়াছিল।
একদিন সন্ধ্যাবেলা দিদির কাছে বসিয়া বসিয়া গাব সেলাই
দেখিতেছিল এবং অন্তমনস্কভাবে একটা দোয়াত লইয়
খেলা করিতেছিল। হঠাৎ হাত হইতে দোয়াতটি উড়িয়া
গিয়া কালির ধারা পোষাকের সাটিনের উপর দিয়া তাহাদেব
হুর্ভাগ্যের মতো গড়াইয়া গেল। দিদি আর্দ্রনাদ করিয়া
তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। গাবের ভয়পাংগুল শুক মুখ
দেখিয়া দিদির মন বেদনায় ভরিয়া গেল, ভাইটিকে কি সে
বকিতে পারে ? সে তাড়াতাড়ি কানি দিয়া কাপড় হিঁহুত
কালি মুছিয়া লইল; তারপর মাপিয়া দেখিতে লাগিল
ছুঁটনার পরিমাণ কতখানি। আট গজ কাপড় একেবারে
কালিতে কলঙ্কিত হইয়া গেছে। উপায় ? সে কি বোটিকে
গিন্নি বলিবে গাব ছেলে মানুষ, দৈবাৎ তাহার পোষাক
নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে ? বোটি যদিও ধনী নয় তবুও তাহাব
মনে দয়া হইতে পারে। ছিঃ ! তাহার আত্মসম্মান-বোঝে
গর্ব তাহাদেব নিজের বিপদের কথা দেশেব কাছে ধরিয়া
হট্টগোল বাধাইতে লজ্জা বোধ কবিল। সে তখনি তাড়-
তাড়ি দিব্য দৃষ্টভাবে বড়বাজারের চকে চলিয়া গেল এবং
নুনান সহিত মিল করিয়া আট গজ কাপড় কিনিয়া
আনিল—পনব টাকা করিয়া গজের সাটিন। তাহার গেকের
পেট অনেকখানি শূজ করিয়া, সমুদ্রযাত্রা স্থগিত রাখিয়া,
একশো হুড়ি টাকা বাহিব হইয়া গেল। যাক ! এ বৎসর
সমুদ্রযাত্রার আর কোনই আশা ভরসা নাই। দিদি
ভাইটিকে বুকে চাপিয়া চুমু খাইয়া আবার কাজ করিতে
লাগিয়া গেল।

শীত আসিল। খোলার ঘরে খাটুনির বিরাম নাই। শরৎকাল হইতেই এবৎসর বিষম বাদল চলিতেছে, এবং তাহার প্রভাব গায়েব স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবেই অল্পভব করিতেছিল। তাহার পিঠের শিরদাঁড়া কনকন কবে, জ্বর হয়, মাথা ধরে। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া গভীর ভাবে মাথা নাড়িল এবং তাহাকে সমুদ্রের ধারে লইয়া যাইবার জন্ত পুনরায় ব্যবস্থা করিল। এবার যাইতেই হইবে; বা থাকে ববাত্তে যত টাকাই লাগুক বসন্তের বাতাসে সমুদ্রবেলায় গায়েব লইয়া বেড়াইতেই হইবে। সেলাইয়ের কল বিলম্বিত্বকারে দ্রুততর চলিতে লাগিল—রাতদিন দিনরাত! তাহার গায়েব সাহসনা ও সবুর করাইবার জন্ত একখানি রঙচঙে ছবির বই কিনিয়া দিয়াছে, তাতে শুধু সমুদ্র-দেশের ছবি—মাছগুলির অরণ্যে সম্ভ্রত বন্দর, তীক্ষ্ণচূড় খণ্ডশৈল কেনিল স্তম্ভ তরঙ্গে তবঙ্গে পরিম্বাত, শাদা পাখীর ঝাঁকের মতো পাল-তোলা জেলেডিঙি সমুদ্রময় ছড়ানো।

সমুদ্রের কথা ছাড়া গায়েব মুখে অল্প কথা নুই; সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখে সমুদ্র; সারাদিন আগিয়া বসিয়া উঠানের উপর ধূসর কোয়াসার জটলা দেখিয়া মনে করে সমুদ্রের তটবাসীকার স্মৃতি তরঙ্গ গড়াইয়া যাইতেছে, ফুলো পালের নৌকাগুলি তরঙ্গের সহিত আন্দোলিত হইতেছে। সে থাকে থাকে একটি শব্দ লইয়া কানের কাছে ধরিয়া স্থির নেড়ে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা সমুদ্রের চিরন্তন গঞ্জন শব্দের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া শোনে। স্রুদূরের সমুদ্রগঞ্জন শব্দের মধ্যে স্পন্দিত হইতে সে শুনিতে পায়।

শীত এবার স্নাতা আব বিষম কনকনে। আমি আর গায়েব তাহাদের দবজার বসিমা থাকিতে দেখিতে পাই না। ডাক্তার তাহাকে ঠাণ্ডায় বাহির হইতে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়াছে। কখনো কখনো জানলার পর্দা সরানো থাকিলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম—তাহার বসা চোখের বিষম দৃষ্টি শূন্যে সম্ভরণ কবিয়া ফিরিতেছে, আর আলোকিত শাসির গায়ে তাহার শীর্ণ আঙুল নৌকার অস্পষ্ট প্রতিক্রম অঙ্কনের চেষ্টা করিতেছে। হঠাৎ আমার ঘরের জানালার দৃষ্টি পড়িলে, আমি তাহাকে দেখিতেছি

দেখিয়া, সে বিবস্ত্রিত সহিত জানলার পর্দাটা টানিয়া দিত।

চৈত্রের মাঝামাঝি। আমি আর তাহাকে জানলার শাসির ধারেও দেখিতে পাই না। তাহার শিরদাঁড়া তাহাকে আর দাঁড়াইতে দিতেছিল না, তাহার দুর্বল পা তাহাকে আব বহন করিতে পারিতেছিল না, তাহার মস্তকের ভাবে শীর্ণ গ্রীবা ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহাবু ছোট বিছানাটিতে শুইয়া কাটায় আর দিনের মধ্যে শতক বাব ছবিব বইখানি পাতা উন্টাইয়া সহস্র-বার-দেখা সমুদ্রের ছবিগুলি সে দেখে। সে এখনো সমুদ্রযাত্রার আশা ছাড়ে নাই। থাকিয়া থাকিয়া সে তাহার দিদিকে জিজ্ঞাসা কবে—“দিদি, আমরা কবে যাব?” দিদি তাহাকে আদর কবিয়া বলে—“যাব ভাই যাব, শিগগিব যাব, তুমি আগে একটু ভালো হও।” ইহা শুনিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে গায়ে উত্তর করিত—“সেই জন্তেই তো আমি ভালো হতে ইচ্ছা করছি। কিন্তু চটপট কৈ সারছি দিদি? দিদি, তুমি যে কাদ আমি দেখতে পাবিনে, আমি তো শিগগিরই যাব।” তাবপর সে দিদিব সঙ্গে সমুদ্রের গঙ্গা জুড়িয়া দেয়—কোন্ কোন্ শহরের পাশ দিয়া কোন্ কোন্ দেশের ভিতর দিয়া সমুদ্রে পৌছিতে হইবে সব তাহাব মুখস্থ। শেষকালে সে বলে—“একবার কোনো বকমে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারলে হয়, তাবপর আর আমার কোনো অসুখ থাকবে না।” এবং উবার আভার মতো শব্দটি কানের কাছে তুলিয়া ধরিয়া সেই স্রুদূরের সমুদ্রের শব্দ একমনে শোনে—বাহাব দর্শন পাইলে তাহার আর কোনো গ্রানি কোনো অসুখ থাকিবে না।

বৈশাখ মাস। আমি আব সেলাই-কলের ঘরব্যব শব্দ শুনিতে পাই না। খোলার ঘরে সেলাই আর হয় না। কিন্তু প্রদীপের আলো একটি জানলা দিয়া সোনালি আভার আভাস দেয় যে পীড়িত শিশু বশ্যাপার্থে নিশীথ আগরণের বিরাম নাই।

একদিন প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম একটি ছোট কফিন তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইল, তাহার পশ্চাতে শোককাতর গায়েব আত্মীয় স্বজন।

এতদিনে ছোট্ট গাঁব সকল বোগমগ্ন হইতে মুক্ত হইয়া একাকী অনন্ত অজ্ঞাত মহাসমুদ্রের পথে যাত্রা করিয়া বাহিব হইল।

চাক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিকাশ

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই—
আমি ছিলাম অশ্রুমনে।
আমার নাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে বইল সজোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুল প্রায়,
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দনধুব গর্জ আসে হার
কোথায় দখিন সমীপে ॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিয়ার উদাসিনী
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশাসিনী।
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূবে ত নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে
আমাব হৃদয়-উপবনে ॥
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কষ্টিপাথর

ভারতী (প্রাবণ)।

আমার বালাকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার পিতামহ বাবাকানাথ ঠাকুরকে আমার কাপসা কাপসা মনে পড়ে। আমার বধন নিত্যন্ত শিশু তখন তিনি বিলাত বান; তাঁর মৃত্যুর খবর বখন এসে তখন আমরা বোটে গঙ্গার উপর ঝড় তুফানে মার কাছে ভড়সড। সে ১৭৭৮ শকে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। তখন তাঁর বয়স ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুসময়ে নিকটে ছিলেন। লণ্ডন সহরের প্রান্তবর্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি

হয়। পিতা বিশেষ মনোবোগ্ন দিয়ে বিবরকর্ণ দেখতে পারতেন না, এক্ষন্ত সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা করে পিতামহ পিতাকে লেখেন যে তুমি পাত্রিদেব সঙ্গে বাদপ্রতিবাদে আর সংবাদপত্রে লিখতে লুপ্ত থাক, বিষয়ে ভার থাকে আমলাদের হাতে এতে বিষয় নষ্ট হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পিতামহ Worthing নামক বন্দরে গিয়ে একমাস বাপন করেন। তখন তাঁর সঙ্গে ১৭ জন অনুচর, ১ জন সেক্রেটারি, একজন দোভাষী, ১ জন সঙ্গীত-গুণ্ডা ও ১ জন চিকিৎসক ছিল। তাঁর ভৃত্য হলি কারি-ভাত তৈরি করত। তাই এবং একটু কমলা লেবুও জেলি মাত্র তাঁর আহার ছিল। একটি মশল কাশ্মীরী শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য মহিলারা দলে দলে এসে দবজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সস্ত্রান্ত মহিলারা পর্যায় তাঁর তত্ত্ব নিতেন। তিনি অমায়িক সৌজন্মে সকলেরই ন্ত্র আকর্ষণ করেছিলেন। পীড়ার প্রকোপেও তাঁর বৈধ্যচ্যুতি হয় নি। স্বদেশী আচার ব্যবহারের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর ভৃত্য হলি আলবোনার তামাক সেজে দিত; মসলাব ডিবে সর্বদা সঙ্গে থাকত। গরম সেটে সহ্য হত না, জানলা খুলে শুভেন, প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করতেন, ববফল খেতেন। হলি তাঁর শরনকক্ষেব পাশেব ঘরেই থাকত, তিনি শরন করলে সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। কেহ তাঁকে কেমন আহ্নেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি মুত্থা আসন্ন স্নেনেও বলিতেন I am content, তাব পবে লণ্ডনে ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেজকালা ও ছোটিকাকাকে (সিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ) আশ্রয় বেণ মনে পড়ে। বাবামশায় বধন কোথাও বেড়াতে যেতেন তখন কখনো কখনো আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমরা মার কতছ বেশিক্ষণ ধুকৃতাম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকালাব ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয় ও বিশ্রামস্থান; মেজকালাই আমাদের বাড়স্থানীয়া ছিলেন। হাতেমতাই, লয়লামজলু, নবনারী, আনন্দ-উপভাস, ল্যাঙ্ক্ টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ প্রভৃতি বই আমরা তাঁর নিকট হতে নিয়ে পড়তাম। কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীবে মেয়েবা কেহ কেহ বেশ বাংলা জানতেন। ব্যামোর সময আমরা মার কাছেই থাকতাম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিনব্যাপী একরকম হর হস্ত; ডাক্তার দ্বারি শুণ্ড ব্যবস্থা করতেন প্রথম দিন রেডিও তেল, আব তার চেয়েও বিশ্বাস জলসাপ্ত; দ্বিতীয় দিন এলচ-দানার মতো কিছু লঘু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত। ডাক্তারকে দেখলেই আমাদের প্রাণ উড়ে যেত। তখনকার কালে ব্যামোর সময হাওয়া বদলের জন্তে বরাহনগর, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে লোকে যেত। এখন সেইসব স্থান্যকর স্থান ম্যালেরিয়ার আবাস হয়েহে।

ছোটিকাকা (নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) গৌরবর্ণ তেজীবান সুপ্রী পুরুষ ছিলেন কিন্তু বড় কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হত, আমরা তাঁকে ভয় কবে চলতুম। তিনি দারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেত গিয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতে; তাঁর কপলাবগোব দরুন তিনি সাহেববিবিসের প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবাস থেকে সহজে স্বদেশে ফিরতে চাইতেন না। অথচ তিনি ইংরেজ জাতের বণিকবৃত্তি ও চালচলন ঘৃণা করতেন। ছোটিকাকার কাছে রমাপ্রদাস বাব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং বজলল করিম ও বজলল রহিম আসা যাওয়া করতেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর কার ঠাকুর কোম্পানির সঙ্গে ভাড়াতে পড়ে কোম্পানির হাউস ফেল হওয়াতে তিনি স্বপ্নভায়ে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সিবীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যায়াম ছিলেন। নিজে স্বপ্ন কবে তাঁরা অপরের সাহায্য করতেন। ১৮৪৪ সালে তিনি কটকাল কালেক্টরেব সহকারী পদে

নিযুক্ত হন, ১৮৫৬ সালেই ইস্তক। যিরে দেশভ্রমণে বের হবে পড়েন। ১৮৫৪ সালে বশোহরের একটি তরীক্ষামা শিখরিদশনা বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স ১২ বৎসর। ভ্রমণে গিয়ে তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে বাড়ী করেন এবং অকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেজকাকা (পিরীজনাথ ঠাকুর) হরসিক অমায়িক সৌধীন পুরুষ ছিলেন, যেন বিলাসিতা মুর্তিমূর্খ। যেমন কলাবিদ্যার প্রতি তেমনি বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর আন্তরিক অমুরাগ ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর গতিবিধি ছিল, তিনি কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'বাবু-বিলাস' নাটক ও 'কামিনীকুমার' বলে একখানি গল্পোপাখ্যানের সকালে বেশ আদর ছিল। বিষয়বুদ্ধিও বেশ ছিল। তিনি সকল দিকেই চৌকস দক্ষ ছিলেন। তাঁর মৌসাহেব দিননাথ ঘোষাল কথক ঠাকুরের মতো রামায়ণ মহাভারতের গল্পের ঘটনা আমাদের মনোরঞ্জন করতেন। মুখে মুখে শুনেই ছেলেবেলায় রামায়ণ মহাভারত একরকম শেখা হয়ে গিয়েছিল।

অন্তরবাহির—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ভোরে ঘুম ভাঙিলে বেগবান পশ্চিমে বাতাসের শব্দ ও তবজের কলনার শুনিলে—শুনিলে মনে হইল কোন একটা অদৃশ্যবস্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। মৃদঙ্গকবতালেব বলবান শব্দের ঘটীর মধ্যে বেহালায় একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে যেমন বাজিতে থাকে তেমনি সেই বীর গভীর হ্রদের অবিবাম ধারা সমস্ত আকাশের সর্মহলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। এভাবে মহাসমুদ্র আমার মনের মধ্যে এই যে গান জাগাইল, বাহাতে হরগুণি ফুলের পাপড়ির মতো একটিল পর আরেকটি ধাতু বীরে শুয়ে শুয়ে উদ্ভাটিত হইতেছিল, তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। অথচ মনে হইতেছিল তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্বাসেরই অন্তরতর ধ্বনি। সমুদ্রের নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাহা উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ অন্তরে গান। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা বোগ আছে বটে কিন্তু সে বোগ অরূপতার বোগ নহে, সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের বোগ। দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুইয়ের মিল যে কোনখানে তাহা ধরিবার জো নাই, তাহা অনির্বচনীয় মিল। চোখে লাগে স্পন্দনের আঘাত আর মনে দেখে আলো, দেখে চৈক্যে বস্তু আর চিন্তে জাগে সৌন্দর্য, বাহিরে বটে ঘটনা আর অন্তরে চেষ্টা খেলাইয়া উঠে হৃদয়ঃখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়, আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অখণ্ড। এই যে আমি বলিতে যাঁহাকে বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মুহূর্তের চিন্তা ও অমুভূতি, অথচ এই সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে-একটি জিনিষ আপন সমগ্রতার প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি। এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতি-রূপ নহে, বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যস্ত।

বিষয়পের অন্তরতর এই অপকল্পকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণিদের ব্যাকুলতা। এই পৃথিবীর অন্তরতর অকল্পতাই আমাদের চিন্তের সামগ্রী। অভ্যাসের মোহে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না; অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্ভাটিত করিবার কাজেই কবিতা গুণিরা নিযুক্ত। এই জন্ত তাহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অমুসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন, তাহারা এক রূপকে আর এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন। এমন কি রী তাহারা দেখান যে, রূপ জিনিষটা প্রব সত্য নহে, তাহা স্বপ্নক মাত্র, তাহার অস্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহেই তাহার বস্তু

হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিভ্রম। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সায়াক্ষ অর্দ্ধবাত্রি ও বর্ধবাসন্তেব বাগিণী রচিত হইয়াছে। সে বাগিণীর সবগুলিই সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কিনা স্থানিনা, তথাপি আমাদের দেশের সঙ্গীতের এই বিশেষত্বটির মানে বিশেষরূপে খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে কালে গভুতে গভুতে নবনব বাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। যুরোপের বড় বড় সঙ্গীত-রচয়িতারাও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরেব—বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। যুরোপীয় গানের মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে গানের হ্রদে এবং গায়কের কণ্ঠে পড়ে পড়ে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোব, সঙ্গীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা বেনি বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস অর্থাৎ হ্রদবাহিনীর উদ্ভাবনপতনকে হ্রদের ও কণ্ঠধ্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু গান তো স্বভাবের নকল অর্থাৎ অভিনয় নহে। অভিনয়কে গানের সঙ্গে মিলিত করিলে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। আমরা সঙ্গীত তো বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না; প্রেমিক বা বিরহিণী ঠিকটি কেমন অনুভব করিতেছে তাহা তো জানিবার বিষয় নহে, সেই অনুভব অন্তরে অন্তরে যে সঙ্গীতটি বাজিতেছে তাহাই আমবা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্ন জাতীয়। কারণ বাহিরের দিকে বাহা আবরণ, অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য্য। অভিনয় জিনিষটাও যদিও মোটেব উপর অন্তঃস্থ কলাবিদ্যাব চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলায় কাণ্ড নহে; তাহাও স্বাভাবিকের পদা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। আর্ট জিনিষটাতে সংযমের প্রয়োজন, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। যুরোপের আর্ট বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। ব্যবসায়ী আর্টিষ্ট বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিষ্ট সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখা যায়, আব সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দোঁরাঙ্কাকে ধরু করিতেই হইবে—বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র।

সাহিত্যরথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—

দাঁচী শহরের মধ্যে মোরাবাদী নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর জ্যোতিবাবুর মনোরম বাংলা ও উপাসনা-মন্দির। তাহার বাড়ীর নাম শান্তিধাম এবং তাহা বাস্তবিকই শান্তিধাম। আমরা পাহাড়ের ঢাকার মতন সেই মন্দিরটির নীচে বসিয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। জ্যোতিবাবু বলিলেন—“আগের চেয়ে বাংলা সাহিত্য এখন অনেক উন্নত হয়েছে। উন্নয়ন কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান কবি। স্বতন্ত্রমোহন বাগচীর কবিতাও আমার ভাল লাগে। গল্পলেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে। গল্পলেখা অবজ্ঞার জিনিষ নহে—এটিও খুব গুণগণ্য আরম্ভক। গল্পের মট রচনা করিতে ও চারুজাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কলনশক্তি ও হৃদয়বৃত্তি

আবশ্যক। তারপর, মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প ঘোটেই হয় না; এ হিসাবে গল্প ও উপক্ৰাসের মূল্য অল্প নহে। আজকাল ছোটো নতুন কথা উঠেছে “কো” আর “মতো”। অনর্থক শব্দবিকৃতিতে লাভ কি? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—তাই এক স্থলে অর্থের অপস্টতা হতে পারে আমি স্বীকার করি। যেখানে অপস্টতার সম্ভাবনা আছে সেখানে শব্দটা বিকৃত না করে একটা হাইফেন চিহ্ন বসালেই সব গোল মিটে যায়। বাই হোক কোন বিশেষ চিহ্ন প্রয়োগে যদি ভাবার অপস্টতা দূর হয় তা করা কর্তব্য। আরবী কারশী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেননা তাতে এক বানানেব অনেকরূপ পাঠ হয়, কাজেই অর্থ না বুঝে পড়া যায় না, এ সমস্ত যে ভাবার অভাব তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের বঙ্গভাষার V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য V উচ্চারণেব স্থানে “ভ” না লিখে মারাতী নিয়মে “হ্” লেখা উচিত। যোগেশবাবুর বৃত্তাক্ষর-নির্বাসন-সম্মা সে কেবল শব্দের অপকবহার ও পদ্ধতির মাত্র। তাঁহার প্রণালী মাধ্যমে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। বিজয়বাবু চমৎকার ছন্দজ্ঞান। তিনি যে একজন এইকটি তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।”

একদিন তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া “বাস্তবিকপ্রতিভা” আগা-গোড়া বর্ণাবধ হাবভাবের সহিত শ্রুত করিয়া গাহিবা শুনাইলেন। “বাস্তবিকপ্রতিভা” রচিত হইলে তিনিই সকল গানে শ্রুত দিয়াছিলেন। সৌরভাঙ্কি শুভ্রকেশ তপস্বীর মত উজ্জল দীর্ঘ ক্ষীণ দেহবলি উত্তোলন করিয়া যখন তিনি গভীর ভাবাবেশে ও গভীর স্বরে “মা নিখা প্রতীতিম্ব দ্বমগমঃ” শ্লোকটি পাঠ আরম্ভ করিলেন তখন মনে হইল যেন সত্যসত্যই বাস্তবিকের মুখে সেই আদি কবিতা শুনিতেছি। জ্যোতির্বিজ্ঞানাবধ অধ্যবসায় ও ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ দেখিবার জিনিষ। এক মুহূর্ত্তও না ধামিয়া “বাস্তবিকপ্রতিভার” সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে তাঁহার হাস যেন ব্রহ্ম হইয়া আসিতেছিল, তবু তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে দেখা যায় নাই।

বর্তমান জ্ঞানশিক্ষা বিচার—জ্ঞানৈক আসামী—

এদেশের গার্হস্থ্য জীবনে জ্ঞানশিক্ষার কল ভালো কি মন্দ হইয়াছে ইহা লইয়া প্রায়ই বারপ্রতিবার হয়। সামাজিক সকল অদৃষ্টানের দ্বারা জ্ঞানশিক্ষার কল সম্পূর্ণ ভালোও হয় নাই, সম্পূর্ণ মন্দও হয় নাই। সমাজসংস্কার করিতে গেলেই পুরাতন মনের সহিত কতক ভালোও লোপ পায়, এবং নতুন ভালোর সহিত মন্দও আসিয়া পড়ে। আমাদের সামাজিক প্রথা হ্রস্বদৃষ্টি পরম্পরসাপেক্ষ ও ধর্মসংশ্লিষ্ট; পরিবর্তনের কারণ বাহির হইতে আসিয়াছে, দেশের অন্তর হইতে ক্রমশ স্বতঃই উদ্ভূত হয় নাই; স্বতরাং জ্ঞানশিক্ষার প্রবর্তনাব যদি কোনো ভুল হইয়া থাকে তজ্জন্য জ্ঞানশিক্ষার প্রবর্তকদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কলাকল দেখিয়া এখন ভুল ধরা বত সহজ, তাঁহাদের পক্ষে তখন তত সহজ ছিল না।

নব্যশিক্ষিতার বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ শোনা যায় তাহার সহিত সেকালের জ্ঞানোপদেশের স্বভাব ভুলনা করিয়া দেখিলে জ্ঞানশিক্ষার দোষও পরিষ্কার হওয়া সম্ভব।

(১) ধর্মভাবের হ্রাস। ধর্ম বলিতে আচার বিচার পুণ্য আর্থিক ব্রত উপবাস ধরিলে নবীনরা অপেক্ষাকৃত ধর্মহীন বটে। ইহার কারণ ব্রাহ্মধর্মের প্রচলন ও পুরুষাঙ্গের হিংস্রানীতে শৈথিল্য। কিন্তু মানসিক ধর্মভাবের বা হ্রাসভীর হ্রাস হয় নাই। (২) নবতার অভাব। ইহা শিক্ষার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। বাঁহারা অহঙ্কারবাসিগণ তাহাদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র চিন্তা। (ক) বাধ্যতার

অভাবও এই শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষার কলে কিঞ্চিৎ মানসিক স্বাধীনতা ও তাহার কলে ভিন্ন মতের সহিত অনবিশ্রুত সংঘর্ষ অবশ্যস্বাভাবিক। এতটা বয়সের গর অতিবাধ্যতার আধান প্রদান দুইই ক্ষতিজনক কারণ তাহাতে একপক্ষের অত্যাচারপ্রবৃত্তি প্রসার পায়, অপরপক্ষের হৃদয়বৃত্ত বিকাশের হানি হয়। অল্পদায়ক অপেক্ষা যেচ্ছাসেবার মাহাত্ম্য বেশি। দোষভীর উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া বাহাতে ঐ ও হ্রী নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত। (৩) গৃহকর্মে যক্ষমতা ও তাজিল্য। প্রথমটি আংশিকভাবে স্বীকার্য, কারণ ইন্সুল বলকের তাজিল্য গৃহের দ্বারা অনুমানে খোলাছলে গৃহকর্ম শিখিবার যথেষ্ট কম। কিন্তু অধিকাংশের অপটুতা ইন্সুলের শিক্ষাপ্রদানে নহে, গার্হস্থ্যশিক্ষার অভাবে। ইন্সুলেরও এ বিষয়ে সচেতন ব্যবস্থা করা আবশ্যক; পরীক্ষা দেওয়াই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কল্যাণের বাড়ীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বা পরীক্ষা দেওয়া হইতে নিবৃত্ত করিলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী শিখিবার কোনোই বাধা থাকে না। যে গৃহকর্ম নারীজীবনের সার বস্তু বাহার জন্ত সমাজে নারীর স্থান ও মান, তাহার তুচ্ছতর কর্তব্যকর্মকেও যে রমণী শ্রেণে জ্ঞান করে, সে কৃপাণাত্ম অতিদীন। বিবাহরূপ কনিষ্ঠ বটনার উপর যখন নারীজীবনের সমস্ত নির্ভর, তখন সকলপ্রকার গৃহকর্ম বালিকামাত্রকেই দেখানো উচিত। (৪) স্বাধ্যাহানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কঠিন সংগ্রাম ইহার একতম কারণ। জীপুর্কবের শরীর মন জীবনযাপনপ্রণালী সকলই জগদান স্বতন্ত্র হাঁচে গড়িয়াছেন, উভয়ের শিক্ষা স্বতরাং একই হাঁচে হওয়া ঠিক নয়। অবশ্য, সমাজশিক্ষার ভার যে-মাতাব হস্তে, তাহার পক্ষে কোনো শিক্ষাই অনাবশ্যক বলা যায় না, এবং তাঁহার সমস্ত সহায়ত্বের ক্ষেত্র বত প্রশস্ত হয় ততই ভালো। কিন্তু স্বাধ্য, লাভণ্য, কর্মক্ষমতা, এসমস্ত, সৌভাগ্য প্রভৃতি গৃহস্থজীবনোচিত কোনো গুণই বাহাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্বাধ্য মানে সামঞ্জস্য, এবং সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র। নিছক পণ্ডিতা অসহ। পুরুষালী মেয়ে বা মেয়েলী পুরুষ কেহই সমাজে আত্মত্ব হয় না। সেকালের রমণীগণের মধ্যে প্রায়শঃ যে শরীরমানের ক্ষুধি, উদ্ভ্রম, উৎসাহ, পরিভ্রমক্ষমতা, সরসতা ও প্রকৃষ্টতা দেখা যায়, তাহার ভুলনা আজকালকার অনেক মেয়েকে যেন নিতেই নইস ও নিরানন্দ বলিবাঁই মনে হয়। যদি প্রমাণ হয় যে আধুনিক প্রচার উচ্চশিক্ষার মেয়েদের স্বাধ্য ভগ্ন ও মন সক্ষী হইয়া পড়ে তাহা হইলে শত ভাবেও সে দোষ ঢাকিবার নহে। (৫) বিলাসিতা ও আয়োব-প্রিয়তা। ইহার বৃদ্ধি হয় নাই, প্রকারান্তর হইয়াছে মাত্র। সেকালের মেয়েরা গরনা ভালো বাসিতেন, একালের মেয়েরা কাপড় বা তপস্রাপস সৌখীন দ্রব্য ভালো বাসেন, বাহার আমদানী সেকালে এদেশে হয় নাই। কালভ্রমে নোন্দর্ঘের উপকরণে পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক। অবশ্য কখন অপেক্ষা ক্রম হ্রাস এবং অসময়ের বন্ধু; সে হিসাবে এ পরিবর্তন বন্দ বলিয়া স্বীকার্য। ইংরিজিয়ারানার প্রকারে আমাদের চালচলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিতব্যয়িতাই হৃগৃহস্থিগণের পক্ষে প্রশংসার্য। আমোদপ্রিয়তা সম্বন্ধেও উপরের কথা পাটে। বাহার বৈরাগ্য আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, তাহার কাজকর্ম আমোদপ্রিয়তার তদনুরূপ হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রদানে বিবাহবয়সের প্রসারণ, অন্তঃপুত্রের দ্বারা উৎপাদন প্রভৃতির জন্ত সম্ভ্রান্তি বাঙালীর মেয়ে কতকগুলি নতুন আমোদের অধিকারিণী হইয়াছেন। আমোদআহ্লাস যদি নির্দোষ হয় এবং কর্তব্যকর্মের ব্যাঘাত না ঘটায় এবং নিজেদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার অনুকূল হয় তাহা হইলে এই দ্রব্যের সমসার তাহার প্রচলন তো স্বাভাবিক বিষয়। সেকাল ও একালের হসমস্ত-নামিশ্রণ-সাধন আধুনিক মেয়েদের প্রথম কর্তব্য। ৬)

স্বার্থপরতা এবং বিদেশীয়তা। (ক) একেলে ইংরেজি শিক্ষিতা মেয়েরা অপেক্ষাকৃত স্বার্থপর তাহা মানিতে হইবে। বরং প্রাপ্তিতে বিবাহ ও পাঁকাতভাবের এভাবে একটু নিজস্ব গঠিত হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক। অনভিজ্ঞতার সারণ্য ও সম্পূর্ণ অধীনতা এবং শিক্ষিতার মার্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা একাধারে আশা করা যুগ। পূর্বের তুলনার কম হইলেও আজও মেয়েদের নিত্যকর্ম কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না—সে যে নারীর স্বার্থ। নূতন তত্ত্বের সামাজিক অরাজকতাব দিবে অবস্থার সহিত বনাইয়া লওয়া একমাত্র হুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর পক্ষেই সম্ভব, ভাঙনের মুখে নিজেকে স্থির রাখিতেও যুবুজির প্রয়োজন। (খ) সাহেবিধা বা বিবিয়ানা এদেশে গ্রীষ্মিকার অবিকল্প্য অঙ্গ নহে, তবে প্রায় জড়িত বটে, কারণ আমাদের ইস্কুলসলেজ মাত্রই ইংবেজি ভাব ও ভাবার পরিপোষক। মহাশীলী পাঠশালার এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম সূচিত হইয়াছে তাহার ফলাফল বিচারের সময় এখনো আসে নাই। ইংরেজি-অভিজ্ঞতা ও ইংরেজি-অনভিজ্ঞতার পার্থক্য অনিবার্য, কারণ ইংরেজি আমাদের নিকট নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দেয়। কিন্তু সেজন্ত উভয়ের সেলামেশাব তো কোনো বাধা সেধা যাব না; দুই দলের বেশভূষা উভয়ের সম্মতিক্রমে একই ধরণের করিয়া আনিলে মনের মিলের সাহায্য হইতে পারে। হিন্দুসমাজ যেমন উদারতা দেখাইতেছেন, গতিশীল সমাজেরও বিদেশী চানচলনের গতি মল্য করিয়া মিলনের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। বাঙালী বয়সের ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিতা হইলেও অধিক মাত্রার বিদেশীয় ভাষাপার বলিয়া গ্রীষ্মিকাব মধ্যমা রক্ষণে অক্ষম হইয়াছেন, এবং অল্পদিনেই সে শিক্ষার বিকল্পে স্বদেশীর মন ফিরাইয়াছেন।

কিন্তু কতিপয়গণের নিয়মামুসাবে প্রায় এতদ্যেক দোষেই অপব পৃষ্ঠায় একটি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। (১) বুদ্ধির উদারতা বা সাম্য-ভাব। (২) আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান। (৩) সময়ের মূল্য-বোধ ও যুগস্থলীতে যুগস্থলার চেষ্টা। (৪) বেশভূষা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অধিকতর পারিপাট্য। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। (৫) গৃহ এবং পরিবারের বাহিরেও মনকে এসারিত করিয়া সকলপ্রকার সমাজে মিশিতে পাবা, পৃথিবীর খোজধবর রাখা এবং সামাজিক উন্নতিচেষ্টায় যোগ দেওয়া। (৬) স্বাধীন প্রকৃত সহধর্মিণী হওয়ার উপযোগিতা। সন্তানের শিক্ষার সাহায্য করিবার ক্ষমতা।

একদিকে সম্পূর্ণরূপে সেকেলে প্রাচ্য ভাব, অপরদিকে সম্পূর্ণরূপে একেলে পাশ্চাত্য ভাব—এই দুইয়ের মধ্যগথ অবলম্বনই সর্বোপেক্ষা শ্রেয় বলিয়াই সর্বোপেক্ষা কঠিন। মেয়েদের স্বাভাবিক সংযম ও হিত-শীলতা সমাজের রক্ষাকবচ। সেকেলে গ্রীষ্মিকা এখন নানা কারণে দুর্বল। অথচ কোনোপ্রকার গ্রীষ্মিকা হওয়া উচিত, এবং একেলে গ্রীষ্মিকার দোষগুলি অনিবার্য নহে। যাহা দেশকালপাত্রোপযোগী আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবে সেই পথই অনুসরণ করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আমাদের বর্তমান ভাবুক ও কবিগণ আমাদের বর্তমান কালের নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলুন।

শারীর স্বাস্থ্যবিধান (আহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা):—শ্রীচুনীলাল বসু—

অধিক পরিভ্রম করিতে হইলে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। এবং তৈল ও শর্করা প্রাচীর খাদ্য, মাংসাদি খাদ্য অপেক্ষা মাংসপেশীর শক্তিবর্ধক। মাছ মাংস, ছানা, লবণ ও জল, পেশী ও অঙ্গি পর্বনের সহায়ক খাদ্য; তৈল, যুত, ভাত, রুটি, আলু, চিনি প্রভৃতি শ্রমশক্তি-বর্ধক। ২৫০০ বৎসরের পর শবীরের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, ততরাং বালক ও যুগের খাদ্যের প্রয়োজন অধিক এবং তাহাদের মাংসজাতীয় খাদ্য

(মাংস, মাছ, ডিম, ছানা, ডাল) অধিক উপযোগী খাদ্য। বালকের চকলম্বভাব বলিয়া শক্তি-উৎপাদক মিষ্টার খাইতে ভালো বাসে। সমবয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের খাদ্য শতকরা ১০ ভাগ কম প্রয়োজন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ভুক্তাবশেষ খাইয়াই সন্তুষ্ট; কিন্তু পুরুষের কর্তব্য সম্বন্ধে জননী যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দুর্বল হইয়া না যান সে দিকে দৃষ্টি রাখা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাদ্যে মাংসের পরিমাণ সংযত না হইলে যত্নেব পীড়া জন্মে। আয়ু-কর্ম শাস্ত্রে ঋতুভেদে আহার-ভেদেব ব্যবস্থা আছে। ইহাব উপকারিতা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এখনো পর্বাঙ্কিত হয় নাই। চরকের মতে হেমন্ত কালে ঘৃতদুগ্ধাদি, শুড়, তৈল ও নরম আহার এবং উষ্ণজল পান আবশ্যিক; শীতকালে অন্ন ও লবণরসবিধিষ্ট খাদ্য ও মাংস প্রশস্ত; বসন্তকালে শুকপাক জব্য, অন্ন, ত্রিধা বা মিষ্টজব্য বর্জিতব্য, মাংস ভক্ষণ প্রশস্ত; গ্রীষ্মকালে স্বাদু, শীতল, তবল স্নেহময় জব্যাদি ভক্ষ্য; জ্বাল পণ্ডমাংস, পক্ষীমাংস, ঘৃতদুগ্ধসংযুক্ত অন্ন অবসাদনিবারক, লবণ অন্ন করু ও উষ্ণ জব্য বর্জনীয়। বর্ষাকালে দেহ ও অঙ্গ দুর্বল হয়; এই সময়ে অন্ন লবণ ও স্নেহরসবিধিষ্ট জব্য আহাৰ্য্য; জল উষ্ণ কবিয়া শীতল কবিয়া পান প্রশস্ত। শরৎকালে পিত্তবমনকারী খাদ্য প্রশস্ত; ঘৃত, মৎস্ত, মাংস ও দধিভক্ষণ নিষিদ্ধ। চরকের মতে সর্ক-কালে এবং রাত্রিতে দধি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু মৌচনিকক দধিকে রোগোৎপাদক-বীজাণু-ধ্বংসকর বলিতে আজকাল দধি ব্যবহার প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রকাবেরা অধিকতর হস্ত তত্ত্ব উপনীত হইয়া ত্রিবিধি-বৈ-খাদ্যবিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। অভিজ্ঞোজ্ঞান রোগের কাণ। ১৪ বারে অল্পে অল্পে খাদ্য আহার করা উচিত। প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন স্বাস্থ্যের অমুকুল। দুগ্ধপানী শিশুদিগকে ২০ ঘট্টা অন্তর ও বালকদিগকে ৪ ঘট্টা অন্তর আহাব দেওয়া আবশ্যিক। বাত্রে স্বল্পাহার প্রশস্ত। বাজিভোজনের অব্যবহিত পরে নিদ্রা বাওবা অবিধেয়। আহাব কবিবার অব্যবহিত পূর্বে মুখ ও হাত ধুইয়া ভোজন করা উচিত; মুখের মধ্যে ও হাতে নানাবর্ণ বীজাণু থাকে, ধুইয়া ফেলিলে সেগুলি উদবে যাইতে পারে না; প্রাচীন-গণ্ড্ব করাব এথা বিজ্ঞানসম্মত। আহারের স্থানেও জলছড়া দিয়া হস্তমার্জনা করার রীতি খুব ভালো; কাণে ঘ্রাণ সহিতই রোগের বীজাণু থাকে। এই কারণে দোকানের ঘ্রিগ্রাসিত খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া স্বাস্থ্যের হানিকর। আহাবেব সময় বা অব্যবহিত পরে অধিক জল বা বরফজল পান করা উচিত নয়, ইহাব দ্বারা পাচকরস তরল হইয়া পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। নিমন্ত্রণ একটি অবশ্যপালনীয় সামাজিক প্রথা। কিন্তু আজকাল ভোজনের আড্ডারবাহ্য্য নিমন্ত্রণকর্তা ও নিমন্ত্রিত উভয়েরই ভয়ের কারণ হইয়াছে। অপব্যয় কবিয়া আড্ডার প্রদর্শন করিবার সময় আমাদের চিত্তবৃত্তিক-পীড়িত দেশের কথা মনে করা উচিত। নিজের স্বাস্থ্য ও রুচি অনুসারে পরিমিত আশ্বি বা নিরাসি খাদ্য আহার করা উচিত; মিশ্রখাদ্য তৃপ্তিপ্রাপ্ত ও স্বাস্থ্যপ্রদ একসের মাংসের মধ্যে যে পরিমাণ 'প্রতিধ' থাকে তিন পোখা দলে তাহা থাকে; ডাল মাংস অপেক্ষা সস্তা; ততরাং আমাদের পরিব দেশে মাংসের বদলে দাল চলিতে পারে; দাল মাংস অপেক্ষা দুগ্ধাচ্চ ইহা সত্য নহে। খাদ্য পরিপাক অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (প্রাবণ)।

আনন্দরূপ—শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি—তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। কিন্তু সৌন্দর্য

বেদিন অস্ত্রবাহ্যক প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেই দিন তাহার মধ্য হইতে অসীর একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; তখনই সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে—এ শুধু বর্ণ গন্ধ নহে, এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদস্রাব প্রবাহধারা। এই যে ধারণার অজিত অনির্বচনীয় মাধুৰ্য্য ইহাই আনন্দ। ইহাই দেশে দেশে কলে কালে অগণ্য প্রাণের প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে,—ইহা আর কিছুতেই হুলাইল না। ইহাইই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা নিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননী হৃদয় মেহে গলিল, কত প্রেমিকেব চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সীমার বন্ধ বন্ধে, রক্তে স্বেদ কবিতা এই অসীমের অমৃত-কোষ। কত নীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসাহিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য্য, পবনশ্চর্য্য। ইহাই আনন্দরূপময়ত্ব। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া পবিত্র সৃষ্টিতে জগতের দিকে দেখিলে আব বস্তু থাকে না, সমস্তই আনন্দ, সমস্তই মীমাংসা—ইহা সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহাই মধ্যেই আছে। তাঁহা প্রসাদের আনন্দের চৈতন্যের পেষ নাই, কেবলি আবে আবে আবে, তবু সেই অমৃতময় আনন্দময় এক।

যাত্রা—শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

একদিন মানুষ ছিল বুনা, ঘোড়াও ছিল বনের জন্ত। মানুষ ছুটিতে পারিত না। ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে যে একটি ছুটিবার আনন্দ তত তালে নৃত্য কবিত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে ভারি একটা স্নেহ হইত। তখন সে কাশ লাগিয়া কেশর ধরিয়া ঘোড়ার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার বিদ্বাংগামী চারটে পঃ জুড়িয়া লটল। মানুষ অনেক পড়িয়াছে অনেক বসিয়াছে তবু ঐশ্বর্য্যময়কে জিতিয়া লইয়া আপনার কাছে খাটাইতে ছাড়িল না। ডাক্তার চলিতে চলিতে মানুষ একজায়গার আসিয়া দেখিল সমুদ্রে তাহার সমুদ্র—অকুল নিবেদ লক্ষ লক্ষ ডেউ-তরুণী তুলিয়া ডাক্তার মানুষের শাসাইতেছে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ কবিত চাওয়া যাব সেই খানেই সে উচ্ছসিত হইয়া উঠে। কোনো বাধাছেই সে চরম বলিয়া মানিতে চাহ না। মানুষ ঘোড়ারই মতন সমুদ্রের পিঠের উপর চড়িয়া বসিল—কত ভুবিল কত মবিল তাহার সীমা নাই, তবু সে দুবকে জয় করিয়াই লইল। বাহা কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। বাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে, বাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। চলি বসিয়াই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। বাসা বাঁধিয়া বসিয়া থাকি বিশ্বের ধর্ম্মই নহে, অপূর্ণতাপূ হইতে এই নক্ষত্র পর্য্যন্ত সবাই বেহুসারনের মতো ছুটিয়া চলিয়াছে। সুত্বার ডাক আব কিছু নহে বাসা বদলেব ডাক। একই জায়গায় একই প্রকার মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে, তখন সে এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পাবে না। তখন এমন একটা চেতনার দবকার বাহা আমাদের চোখের কানের মনের বন্ধনকে কেবলি নতন নতন নতনের আবাত দিয়া আমাদের জীর্ণ পদাটিকে টুকবা টুকবা করিয়া চিবনুতনকে উদ্ঘাটিত কবিতা দিবে। কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি উন্মুক্ত এই জগৎ। কি শ্রাণ, কি আলোক, কি আনন্দ। পৃথিবীকে বেটন করিয়া মানুষের যে মনোলোক তাহার কি অক্ষুরানো ও অজুত বৈচিত্র্য। এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তর তর করিয়া নিশেবে দেখিবার সাধ্য

ও অবকাশ কাহারো নাই এবং যদিও এক হিসাবে কি সর্ব্বত্রই আছে, তবু আলস্ত ছাড়িয়া অভ্যাস কাটাইয়া চোখ মেলিয়া যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তি জড়তা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উজ্জ্বলিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে। ভ্রমণের ভিত্তিকার আসল উদ্দেশ্যটি এই—বাহা আছেই, বাহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই কেবলি প্রতিপদে আছে আছে আছে বলিতে বলিতে চলা; পুণাতনকে কেবলি নতন নতন নতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুইয়া ছুইয়া যাওয়া।

সমুদ্রপাড়ি—শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

জাহাজে চড়িতে প্রথমটা মনের মধ্যে কেমন একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হয়; জাহাজটাব সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অনুভব করাই তাহার কারণ। এ জাহাজ বাহারা গড়িয়াছে, চালাইতেছে, তাহারাই ইহার প্রভু; সমুদ্রের চিরুহীন পথ ইহাদেরই নাবিকদের বংশপরম্পরার সুত্বার দ্বারা ভ্রমণ; মরল হইয়া উঠিতেছে। আমি টাকা দিয়া এখানে স্থান পাইয়াছি, কিন্তু এখানে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যে আশ্রয় বিহীন পথন নিজে চলিতেছে তাহা কি শুধু টাকা দিয়া কিনিবার জিনিষ? ইহার পশ্চাতে শুবে শুয়ে কত চিন্তা কত সাহসের সঙ্কট হইয়া রহিয়াছে, সেখানে আমাদের কোনো অর্থ জমা হয় নাই। জাহাজের উপর ইংবেজ স্ত্রীশুকবের যে নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দতা তাহা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আছে। ইহার নিশ্চয় জানে বাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে, বাহা কবিত্যব তাহা করা হইবে, সেজন্য ইহাদের সমস্ত জাতি জামিন রহিয়াছে। যদি প্রাণক্ষণের সঙ্কট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাগুনে তাহা তাহা নহে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উদ্ভয় ও নিরলস সচরিত্রতা শেষমুহূর্তে পর্য্যন্ত সুত্বার সঙ্গে লড়াই কবিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই জীবপ্রাণ ইহারা বাহা দিবাছে তাহাই পছন্দিত—আর আমরা বাহা দিই নাই তাহাই লইতেছি—স্বত্বাৎ সমুদ্র পার হইতে হইতে দেনা বাধিয়া বাধিয়া বাইতেছি। এই ১৮ শতকের মনুষ্যের উপর ভর দিয়া চলা ইহা ডাক্তার বসিয়া বিলাতি ঝিনিব ব্যবহার করার চেয়েও বেশি দীনতার লক্ষণ। উহারা প্রাণ দিয়া চালায় আর আমরা টাকা দিয়া চলি, ইহার মাঝখানে ১৮ একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়িয়া বহিল তাহা আমরা কবে কোন্ কালে পার হইতে পারিব। এখনো আবস্তও করা হয় নাই, এখনো স্বকৃতরে কত প্রাণ সেওয়া বাকি আছে, এখনো কত বন্ধন ছিঁড়িত হইবে, কত সংস্কার দলিতে হইবে। গোটা কয়েক ধবের কাম্বোজ নৌকা বানাইয়া তাহারই খেলার পালের উপর বক্তৃতার কুঁ লাগাইলে আমাদের কিছুই হইবে না।

নীল সমুদ্রের মাঝখান দিয়া দুই ধারে চন্দ্রালোকে জলন্ত কেন্দ্রাশি কাটিয়া কাটিয়া জাহাজ চলিয়াছে, যেন জাহাজটাকে দুলের বৈজ্ঞানিকের মতো করিয়া তাহার দুই পাশে শাখা পাণ্ডি মুহূর্তে মুহূর্তে বিবশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। যেমন সমুদ্রে তেমনি সমুদ্রের উপনকার রাজি—মধ্যে ঝাঁড়াইয়া দুই অঙ্গহীনেন স্বন্দর মিলটি দেখিত থাকি, স্বন্ধের সঙ্গে চকলেব, নীরবেব সঙ্গে মুখেরেব দিগন্তব্যাপী অলাপ চুপ করিয়া শুনিয়া লই। মহাসাগর যে ছন্দে মুদ্রা বাজাইতেছেন আমার রক্তের নাচ তাহার সঙ্গে দিয়া ভাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকুর চারিদিকেই যে একটি অক্ষুর অনন্য রহিয়াছে তাহার দিকে বাজীদেব এক মুহূর্তও তাকাইবার অবকাশ নাই। জীবনের প্রতি ইহাদের আসক্তি এত বেশি যে জীবনের গভীর সঙ্গকে উপলব্ধি করিতে হইলে বতাই দুই ধরে যাওয়া আবশ্যক ইহারা এক

মুহূর্তের অন্তর ততটুকু দূরে বাইতে পারে না। এইজন্য ইহাদের ধর্মোপাসনা বেন একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যাপার। ইহারা ভারতবাসী জাতিবাহিনী হইলে কাজকর্ম আশ্রয় আশ্রয়দের অন্তর্য মাঝখানেই অসঙ্কেত অনন্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে পাবিত। সসীমের সঙ্গে অসীম, জীবের সঙ্গে শিব যে একেবারে মিলিয়া আছে, দুইয়ের সহযোগেই যে সত্য সর্বত্র পরিপূর্ণ, এই চিন্তাটা আমাদের মধ্যে স্ফোচনীয় সহজ হইয়া আছে। কিন্তু ইংরেজবাহিনীদেব জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার সহজ হনন শ্রী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা দেশমাত্র অস্বাধিকারকে মানিয়া লইতে চায় না। ইহারা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকমের দাবিকে সর্বোচ্চ সীমায় টানিয়া রাখিতে চায়, তাহার কলে অবশেষে অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করিবার সাহস বাহাদের নাই তাহারাই কোনো মতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া বিন কাটার, তাহারাই বলে অর্দ্ধ ত্যজিত পণ্ডিতঃ। তাহাতে সেই অর্দ্ধেরও অর্দ্ধ বায় পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যে ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন। কিন্তু সমস্ত সুবিধাই লইব এ দাবি করিলে একাধারও বহন করিতে হয়। বাতি বড় করিয়া জ্বালাইব অথচ সলিতা ক্ষয় করিব না এ তো কোনোমতেই হয় না। এইজন্য ভারতীয়দের প্রয়াস সমস্ত পণ্ডিত সমাজের ভিতর হইতে মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু এই ভার বহন করিবার শক্তি ইহাদের আছে। আর আমরা কেবলি দুঃখ এবং অস্বাধিকার বহন করি কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না। এইজন্যই আমাদের দেশের মজুরীর পরিমাণ অল্প হওয়া সত্ত্বেও দেশী জিনিষের মূল্য কমে না, কেননা মানুষ বতগুলি খাটে শক্তি ততটা খাটে না। কোনো অমুঠানের প্রতি যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশের কাহারো নাই, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের দিকে তাকায়। আমাদের দেশে একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া একএকটা কাজ জারিয়া উঠে, তাহার পরে সেই কাজকে বাহারা গ্রহণ করে তাহার তাহাকে বতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। দূতনিষ্ঠ প্রাণপণ লয়ালটি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবেই সমস্ত সম্মিলিত শুভামুঠান সম্ভবপন হবে। এই যে লয়ালটি ইহা বুদ্ধিগত নহে, ইহাও হৃদয়গত, জীবনগত, লাভ লোকসানের সমস্ত হিসাব সেই জীবনের টানের কাছে লধু—কোনো কর্মে যদি জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে তবে কোনো অমুঠানই নির্বিনয় হইতে পারে না।

রূপে তাহার দেখকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া কিরিতেছে। আজ যেমন করিয়াই হোক আমাদের দিকে ব্রহ্ম হইবে যে কলেবরহীন আত্মা কখনই সত্য নহে, কেননা কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা পণ্ডিত দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক—কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার হিতি, আনন্দ, অন্তঃ।

প্রতিভা (জ্যৈষ্ঠ)।

বাঙ্গালা ও ত্রাবিড়ী ভাষা—শ্রীযুক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—

ত্রাবিড়ী ভাষা অতি পুরাতন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে ইহাদের উল্লেখ আছে। রামায়ণোক্ত বানর ও রাক্ষস প্রভৃতি এই ত্রাবিড়ী ভাষা বলিয়াই অনেক অনুমান করেন। প্রাচীন ত্রাবিড়ী গ্রন্থে ত্রাবিড়দেশ তামিলক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথকে বোটাটুকু ত্রাবিড় দেশ বলা হইতে পারে। উত্তর ভারতের বৈরাগ্যরূপে ভারতবর্ষের

অপভ্রাংশলিকে দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পঞ্চগৌড়ী ও পঞ্চত্রাবিড়ী। কিন্তু তাহার মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটী ভাষাকে পঞ্চত্রাবিড়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গোলযোগ করিয়া গিয়াছেন। ত্রাবিড়ী ভাষার সহিত মারাঠী ও গুজরাটী ভাষার কোনো সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে তামিল, তেলুগু, মলয়ালম্, কন্নড় ও টুলু পঞ্চত্রাবিড়ী ভাষারূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। কেহ কেহ টুড়া, কোটা, গণ্ড ও কু লম্বত নবটা ত্রাবিড়ী ভাষা ধরেন। ত্রাবিড়ী ভাষা উত্তর ভারতের পণ্ডিতদিগের অবজ্ঞাভাজন ছিল। ইহাতে ট বর্ণের বাহুলা দর্শনে তাহারাই ইহাকে টাঙ্কা ভাঙা টাঙ্কা ডুঢাঙ্কা অসম্ভাষ্য বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। রুরোগীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এককালে আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, সিংহল, থাইল্যান্ড, হুন্স, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সংযুক্ত মহাদেশ ছিল। এবং ত্রাবিড়, ত্রামিল, ত্রাইল্ড (ত্রামিল) [ও নিশে] প্রভৃতি জাতি একই মূলবংশীয়ের অন্তর্গত। চিন্তাপতিকরণ, মণি বেকলাই, পুণ্যমুখ, মেন তামিল প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থের মতে রাবণ তামিল ভাষার সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মলজ বা ভেগেন্ড ভাষার প্রথম ব্যাকরণকর্তা মহর্ষি কণ্ বলেন—ভগবান অম্বুবিকু নিশুভ মৈত্রেয় বংশাধন করিয়া তাহাকে ব্রহ্মলজ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শব্দসম্পদে বিভবশালিনী হইলেও অনাথ্য শব্দ তাহাতে বহুই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দীর্ঘ, শর, মলয়, লক্ষা প্রভৃতি তামিল হইতে গৃহীত বলিয়া কাহারো কাহারো বিশ্বাস। ত্রাবিড় ভাষার সকল শাখার মধ্যে তামিল সমৃদ্ধতম। অগব চারিটি শাখাভাষা অপেক্ষা তামিলে সংস্কৃত-সম্ভব কম। তথাপি অনেক শব্দ সংস্কৃত ও বিশেষভাবে বাংলা ভাষার শব্দের তুল্য; মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে অনেক বিদেশী শব্দও বাংলার দ্বারা ত্রাবিড় ভাষাতেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। বাংলাসমূহ শব্দ তামিলে প্রবেশলাভ করার কাবণ অনেকে অনেকরূপ বলেন।

(১) কনকমঠে গিলে প্রভৃতি তামিল পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি বৃষ্টভ্রমের বংশতান্দী পূর্বে দক্ষিণভারতে উপনিবেশ করিয়াছিল। তামিল নাম তাম্রলিপ্তের পালি রূপান্তর তামিলট্টির অপভ্রংশ। (২) সিংহপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সিংহরাজের পুত্র বিজয়সিংহ খৃ-পু পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গের হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে বাইবার সময় কুলা নদীর তীরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; বিজয়বাটিকা (আধুনিক বেজোরাডা) তাহার স্থাপিত নগর। এই বাঙালী রাজপুত্রের ভাষা দক্ষিণভারতে বহুদিন প্রচলিত ছিল। (৩) অম্বু ভূতগণের বঙ্গবিজয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। উক্ত ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিজিতের মধ্যে ভাব ও ভাষার আদান প্রদান হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত বোড় ও বলালগণের প্রভাব বেদুড় বেদুন প্রভৃতি গ্রামের নামে আজও দেখা হইতেছে। [Refce. Bibliography:—The Origin of the Tamil Velalas; Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian Languages; Tamil Eighteen hundred years ago; Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature.]

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (শ্রাবণ)।

মহাভারত ও রামায়ণের কাল তুলনা—শ্রীচন্দ্রকিশোর তরকদার—

নিম্নলিখিত জ্যোতিষিক কারণে মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন মনে হয়—(১) মহাভারতের কালে যাত্রা, বিবাহ ও অভিব্যক্তিাদি কার্যে শুভাশুভ কালনির্ণয়ে মীর্হুর্ভ ও তিথি নক্স ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচিত হইতে দৃষ্ট হয় না এবং কলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে

অজিত বৈষ্ণবগণেরও মহাভারতে কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণের কালে বৈষ্ণবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা মুহূর্ত্ত ও তিথি নক্ষত্র ভিন্ন গ্রহ, বার, মাস, ও লগ্নাদি দ্বাৰাও রীতিমত শুভাশুভ বিচার করিতেন, তৎসাহায্যে লোকের আত্ম ভাগ্যাদি পরীক্ষা করিতেন। রামায়ণে ইহার ভূমি ভূমি বৃষ্টান্ত আছে। (২) মহাভারতীয় কালে মাস-সকলের নক্ষত্রের নাম পরিষ্কৃত হয় নাই। রামায়ণে মাসের নক্ষত্রের নামের অভাব নাই। (৩) মহাভারতীয় কালে রাশিসকলের নামকরণ হয় নাই। রামায়ণে কেবল রাশির নাম নহে, তাহাদের গণের বা

উপনামের পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। স্তত্বা তখন লগ্নসকলের পরিমাণ পরিজ্ঞাত ছিল। অধিকন্তু কে- রাশি কোন্ গ্রহের উচ্চ বা নীচ স্থান তাহাও পরিচিত ছিল। ইহাতে বোধ হয়, জ্যোতিষের কোন কোন সিদ্ধান্তগ্রহ রামায়ণের পূর্ববর্তী। (৪) মহাভারতে বারের নামোল্লেখ নাই। রামায়ণে বৃহস্পতিবাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৫) রামায়ণে মহাভারতীয় কালের পূর্বে ঋতুসকল ও অয়ন প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। চৈত্রমাসে ক্রীড়ামাচের রাজ্যাভিষেক কাল মনোনীত হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পরে তাঁহার চিত্রকূট গমনকালে শিশিরাত্মে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইয়াছিল এমন বর্ণনা আছে। অতএব চৈত্রমাসেই বসন্তারম্ভ হইত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষারম্ভ হইত—এবং বর্ষার আগমন সঙ্গেই উত্তরায়ণ চরম প্রাপ্ত হইত। জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যব অঙ্গাধারিক একমাসকাগ মধ্যে সীতাদেবণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। রামায়ণের কালে জ্যৈষ্ঠ মাসে শরৎ ঋতু প্রবৃত্ত হইত। শরৎকালে হেমন্ত প্রবৃত্ত হইয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত বর্তমান থাকার উল্লেখ আছে। দেখা যায় যে পৌষ মাসে রাজসিকল অতি দীর্ঘ হইত, স্তত্বা উত্তরায়ণ প্রবৃত্তির অধিক দীর্ঘ থাকিত না। বাস্তবিক, স্তত্ব তখন অত্যন্ত দক্ষিণাধীন হইত। ইহা পাঠে কেহ কেহ পৌষ মাসেই দক্ষিণাধীন শেষ হইত বলিতে পারেন। আমরা পৌষ মাস মাসে দীর্ঘ ও উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইত বলিয়াই সম্ভ্রান্তি তুল্য থাকিব। এইসকল মাস সৌর কি চন্দ্র, এবং মাসের করদিন গতে অয়ন আরম্ভ হইত তাহা বুঝা যায় না। সৌর হইলে, ১১ মাস উত্তরায়ণ আরম্ভে স্তত্ব উত্তরায়ণের দ্বিতীয় পাদারম্ভে অবস্থান করিত (ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা)। আর, উত্তরপশ্চিমাকলের প্রচলিত প্রবাদমত এইসকল মাস সৌর চন্দ্র হইলে, অজিতপক্ষে সৌরমাস ও প্রবর্গার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সৌরচন্দ্র উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইত। ইহা বর্তমান সময়ের নুনাবিক ২৮০০ বা ৩০০০ বৎসর পূর্বে। ইহা পূর্বে ভিন্ন পূর্বে নহে। স্তত্বা রামায়ণের অন্ততঃ সপ্তদশম বর্ষ পূর্বে মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল। তাহার মহাভারতের বনপর্বে সার্মার উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কেহ কেহ আমাদের নির্দেশে ভ্রান্ত হইবেন। মহাভারতে থাকিলেই যদি তাহা মহাভারতের কালীয় কিংবা তৎপূর্ববর্তী হয় তবে সভাপর্বে, ১১শ অধ্যায়ের ভাষা তর্কপাণ্ড, নাটক, বিবিধ কাব্য ও কারিকাক্ষয়কে, এবং বনপর্বে ১৮ম অধ্যায়ের আত্ম, শক, পুলিন্দ ও বন প্রভৃতি যোজ্য রাজবংশকে কেন তৎপূর্ববর্তী বা সমসাময়িক বলিব না? মহাভারতের আখ্যানভাগ পরবর্তী কালের লেখা।

মহাভারত রামায়ণের পূর্বের হইলেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ামাচের পূর্বের হইবেন ইহা স্তত্বসঙ্গত হয় না। রামায়ণের মূল মহাভারত অপেক্ষাও পুরাতন হইতে পারে। রামায়ণকর্তা যদ্যপি লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে তাঁহার গ্রন্থকে পুরাতনতমক বলিয়া সীকার করিয়াছেন।

বাল্মীকীয় নটরাজ শিব—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

অনেকের বিশ্বাস যে নটরাজ শিবের মূর্ত্তি দক্ষিণাত্যে বিরল,

আর্য্যাবর্তে মোটেই নাই। কিন্তু সে বিশ্বাস ঠিক নহে। বাংলা দেশেই বিক্রমপুরে দুটি নটরাজমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নটনাথের শিবমূর্ত্তি নাগ, অজ্ঞানগুহার চিত্রের দ্বারা অর্দ্ধনারী অর্দ্ধসর্পাকার। বোদ্ধস্বাধ শিবের নাম বিক্রপাক, নাগগণ বিক্রপাকের প্রজা। নাগপূজা ও শিব-পূজা ভারতের অপর প্রদেশের দ্বারা বঙ্গও বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।

আর্য্যাবর্ত (আর্য্যাবর্ত)।

পুৰাতন প্রসঙ্গ—(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহা

শয়ের পূর্বস্মৃতি) শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত—

ভালতলায় নীলমণি কুমারের বাড়ীতে একটি Positivist Club স্থাপিত হয়। এদেশে তখন অনেক Positivist ছিলেন—সিদ্ধিচন্দ্রনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণকমল কলেক্টরের অধ্যাপক লব, কটন, বেতারিঙ্গ, ফান্সি ও ২১ জন ছোকরা সিভিলিয়ান। ইংরেজেরা সে কালে আস্তিত্ব না; বাঙালী সমাজ ছিলেন—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), ছোট আদালতের জজ K. M. Chatterjee, হাইকোর্টের অনুবাদক কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার প্রভৃতি। পুরাপুরি কোমতের দ্বিতীয় না হইলেও ইংরাজি Humanity কার্যে জীবন উৎসর্গ করা সর্বপ্রথম কর্তব্য মনে করিতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পূর্ণ কোমতের সভ্যবলী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বৌক হইয়াছিল এদেশের উপযুক্ত করিবার জন্য কোমতের মত কিছু কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যিক। তিনি Humanity নাম দিয়াছিলেন “নারায়ণী”। কোমত মনে করিতেন, হুঙ্কারাধিপতিও কোমতের জীবনমূর্ত্তি visible representation of Humanity হইবে। যোগেন্দ্র যোগরাণার মাতৃমূর্ত্তি পছন্দ না করিয়া কস্তাপেড়ে শাড়ি ও সিঁদুর পরা, শিশুকে-স্বন্যাদানরতা মাতৃমূর্ত্তি রূপে তাঁহার নারায়ণী নাম দিয়া আঁকাইয়াছিলেন। যোগেন্দ্র কোমতকে কবি নাম দিতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অমরকোবের মতে কবিঃ সত্যবচনঃ, অর্থাৎ নৈঃশাপ বা বয় সমস্ত বাক্যই কলে তিনিই কবি; এজন্য কোমতকে কবি নাম দিতে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র স্তত্বঃ স্তব পর্য্যন্ত positivism ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উঠার এবং হিন্দুধর্মের সংস্কার খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রের স্তত্বার পর এদেশে positivismএর আর কেহ পাড়া রহিল না। আচার্য্য কৃষ্ণকমলের দ্বারা যত্ন হইলে মনের আবেগে আচার্য্য কোমতকে এক চিঠি লেখেন, তখন কোমত জীবিত ছিলেন না সে চিঠি বিভাগাগরের নিকট কিরিয়া আসে, বিভাগাগর মহাশয় তাঁহার romantic কাণ্ড দেখিয়া পাগলামি বলিয়া মেহের অত্যাচার করেন।

বিভাগাগর মহাশয় স্তত্বা ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন মানবান হইয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেন যে কেহ তাঁহার সে ঘোষ প্রভৃতি পারিত না। এই জন্যই বোধ হয় তিনি সংস্কৃত কলেজে কাম্বা কোনো ক্লাস পড়ান নাই। তিনি কোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ন-দিককে বাংলা পড়াইবার সময় বিভাগাগরের অনীল অংশ পড়াইত সন্ধ্যা বোধ করিতেন; সেই প্রভৃতি তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি চন্দ্রা ও প্রকাশ করেন; ইহা ‘বেতাল পঁচিশি’ নামক হিন্দি বহি হইত। কলকাতা সংগ্রহ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা পরম স্বল্পর একখানি গ্রন্থ। ইহা বাহির হইবার পূর্বে পুস্তকপরিদর্শন ও ‘প্রবোধ-চন্দ্রিকা’ নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ বোধহয় প্রথম প্রকাশিত হয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এক চিত্র ছিলেন, সেটি একটি character। বিভাগাগর তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত

পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতের লেখা মুক্তার মতো ছিল; কিন্তু তিনি সংযুক্ত লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না। তথাপি বা-তা সংযুক্ত শ্লোক অনর্গল রচনা করিতেন, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতেও কাটকুট করিতেন।

বিদ্যাসাগর বীটনকে অত্যন্ত অজ্ঞা করিতেন। বীটন মেসোবিলের জন্ত তিনি ছাত্রসেব ফলারশিপ থেকে ছুটাকা করিয়া কাটিয়া লইয়াছিলেন, ছাত্রেরা ব্যাপাবটা কি না বুঝিলেও বিদ্যাসাগর যখন বলিলেন তখন আর কোনো আপত্তি কবেন নাই। বীটন হৃদয়বস্ত্রতা করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর সব কলেজের ছাত্র-দ্বিপকে একত্র করিয়া কলিকাতা টাউন হলে পারিতোষিক দেওয়া হইত। একবার সভাপতি ছিলেন বাংলার ডেপুটি গবর্নর সার জন লিটলার। তিনি বেটে ছিলেন, ও তাঁর পেটটি ছিল মোটা। বীটন বস্ত্রতা করিতে উঠিয়া Sir John বলিয়া পুনরায় শুধু Sir বলিয়া আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মভুক্তি বর্জ্জলোদয় গবর্নরকে দেখিয়া বীটনের মনে Sir John Falstaff-এর স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সামলাইয়া গেলেন। বীটন কাণ্ডেন রিচার্ডসনকে কর্তৃত্বাধি করিতে বাধ্য করেন; একজন Law Member (Lord Macaulay) কাণ্ডেনকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর একজন Law Member তাঁহাকে কর্তৃত্বাধি করিতে বাধ্য করিলেন। বীটন কোনো বস্ত্রতার তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া hoary libertine বলিয়াছিলেন। এই চরিত্রহীনতা দোষেই বীটন তাঁহাকে শিক্ষাকাৰ্য্য হইতে অপসারিত করেন।

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার—শ্রীনিবাসচন্দ্র ভট্টাচার্য—

ম্যালেরিয়া প্রতিকারের উপায়—(ক) বাহাতে মশক কামড়াইতে না পারে তাহার চেষ্টা। অর্থাৎ মশারী টাঙাইয়া শয়ন, গারে সর্বদা জানা রাখা, গৃহস্থলী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জানালা দ্বন্দ্বায় মশক-নিবারক জাল দেওয়া, যবে ঘুনার ধোঁয়া দেওয়া প্রভৃতি। রক্তনের গন্ধ বা ভাস্কর্যের ধোঁয়াতে মশক দূর হয়। (খ) ম্যালেরিয়া হইলে সম্বর রোগবৃদ্ধির উপায় করা। ম্যালেরিয়ার স্থানে প্রত্যহ অল্প কুইনাইন খাওয়া উচিত। (গ) শরীরকে এরূপ ভাবে শিক্ষিত করা যাহাতে রোগ হইতে অব্যাহতি লাভের ক্ষমতা জন্মে। কারণ, শরীরের নাম মহাশয় বা সহ্যও তাই নয়। এসিদ্ধ মেচনিক প্রভৃতি প্রমাণ করিয়াছেন যে রক্তস্থ খেতকণিকাগুলি শরীরের রক্ষিসেন্সেব কার্য্য করে; শরীরের অনিষ্টকর কোনো পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিলে উহার সেই শত্রুকে বিনাশ করে, বা বিতাড়িত করে বা বন্দী করে। শরীরগঠনকারী বাবতীর কোষেই এই ক্ষমতা আছে। রক্তস্থ তরল পদার্থও (plasma) এইরূপ গুণবিশিষ্ট। শরীরের বিষমোষণাক এই ক্ষমতা বৃদ্ধি করা বাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে অনাহার বা নিরুদ্ভাহার করিলে শরীরেব রক্ত রস কমিয়া যায়, এবং তাহার ফলে রক্ত শরীরের বিভিন্ন কোষ হইতে রস সংগ্রহ করে, এবং তাহাতে বোগবিদ রক্তের মধ্যে গিয়া ধ্বংস হইয়া যায়।

প্রজাপতি (আষাঢ়)।

আর্দ্রক বা আদা—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস—

আদা তিন প্রকার—(১) আদা, (২) কৃষ্ণ আদা, (৩) আম আদা। আদার চাষ সহজ; দৌবাশ মাটিতে ভালো হয়; মুস্তিকা বাগাতে নরম থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। আদা পক্ষে গোবরের

পুতান সার উপকারী। বৈশাখ মাস রোপণের সময়। আদা গায়েব গের্ণো রোপণ করিলে গাছ হয়, তাহাবই মূল আদা। আদার মূল্যশের নাম গুহো। আদা তুলিয়া বীজ রক্ষাব জন্ত গের্ণোগুলি একত্রিবেস বোয়ে শুষ্ক করিয়া কোনো স্থানে শুষ্ক ঘাস বিছাইয়া দেড়ফুট উচ্চ গাদি দিয়া ঘাস চাপা দিতে হয়। এক বৎসর জেলা হইতে বৎসরে আদা হাজার টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হয়। জাপানীতে আদা দ্রুপ্ত্য; পোচুপালে আদা হইতে উৎকৃষ্ট স্নরা হয়। এক বিষ। জমিতে ৩০ মণ আদা জন্মে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য (আষাঢ়)।

মানকচুর আদান—শ্রীনেগেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার—

রীতিমত চাষ করিয়া সার মিলে এক একট কচু এক মণেরও অধিক হয়। ভাদ্র মাসের শেষ হইতে আশ্বিন মাসের শেষ অবধি রোপণের সময়। কচুর ক্ষেত বেশ পরিষ্কার উঁচু রোজখুজ হওয়া চাই। জমিতে তিন তিন হাত অন্তর ১ হাত দীর্ঘ প্রস্থ গভীর গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে কচু লাগাইবা ভিজা মাটি আলগা ভাবে চাপা দিতে হয়। গাছ পুঁতিবার পর হইতে চৈত্রমাস পর্যন্ত বৃদ্ধির সময়; চৈত্র শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ শেষ পর্যন্ত ক্ষেতের পাট করিবার সময়; কচু গাছের গোড়ার এক একট ছোট গর্ত সারপূর্ণ করিয়া জমি কোপাইয়া সমস্ত মাটি শুঁড় করিতে হয়; আশ্বিন ভাদ্র মাসে ঘাস নিড়াইয়া দিতে হয়; আশ্বিন মাসে আবার কোপাইয়া; মাটি শুঁড়াইয়া দিতে হয়, কিন্তু সাধারণ কচুর একটি শিকড়ও যেন না কাটে। মাঘ ফাল্গুন কচু তুলিবার সময়। কচুর শত্রু সন্মার ও শূকর। কচুর গোড়া খুব উঁচু করিয়া বাঁধিয়া মিলে উহার কতি করিতে পারে না; মধ্যে মধ্যে প্রত্যহ কয়েকদিন—ক্ষেতের স্থানে স্থানে আলো মিলে উহার আসে না। প্রতি বিষাতে অনূন ৪০০ কচু উৎপন্ন হয়; একজন লোক ২ বিঘা জমি চাষ করিতে পারে। ভাদ্র হইতে জ্যৈষ্ঠ ৪ মাস ও কচু উঠাইতে ১ মাস মোট ৫ মাস খাটিলে ৮০০ কচু লাভ করা যায়। কলিকাতার প্রত্যেক কচুর দাম গড়ে ১ টাকা বরিলে ৮০০ টাকা। ধরত বার ১০০ টাকা ৫ মাসে ১০০ টাকা। অবশিষ্ট ৭ মাস অল্প কাজ করিলে কচুর চাষেব বাঁধা হয় না। কচুতে ছাই সার ভালো নয়, গোবর সারই উপযুক্ত। প্রথম বৎসর যে জমিতে কচু হয় পর বৎসর সে জমিতে আব হয় না, অল্প কসল দিতে হয়। বোনো জমিতে এক বৎসর অন্তর কচু করিতে হয়। এ সম্বন্ধে কাহারো কিছু জানিতে হইলে 'ব্যবসা ও বাণিজ্য'-সম্পাদকের ঠিকানার লেখককে জিজ্ঞাসা করিলে লেখক জবাব দিতে সীকৃত আছেন।

অর্থোপার্জননের সহজ উপায়—শ্রীমহাম্মদ সফী মিয়া—

আসাম, পার্শ্বতা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্শ্বতা চট্টগ্রামে অর্থোপার্জনেব বিশাল ক্ষেত্র এখনো আছে। আসামেব চা-বাগানগুলি বালিক শতকরা ১৯ জন ইংরেজ, লাভ লক্ষ লক্ষ টাকা। আসামেব দেশের প্রমো ও সামগ্রীতে বিদেশী ধনী হইতেছে, আর আসাম তাহাদের নিকট ১০১২০ টাকার চাকরী করিতেছি। শিক্ষিত যুবকেরা যৌথভাবে ঐসকল পার্শ্বতা প্রদেশে নিয়মিত উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে পারেন—(১) বন্দোবস্তী জমির গাছ বিক্রয়; (২) সাইজমত কাঠ প্রস্তুত করা ইয়া চালান দেওয়া; (৩) কাঠের কাঁচিসার প্রস্তুত; (৪) পোড়া কাঠেব কয়লা বিক্রয়; (৫) সেগুন, সাল ও মেহগিনি বৃক্ষের বাগান করা; (৬) কলের বাগান করা, একজন সাহেব পাঁচাত্তি পেয়ারা

বিক্রয় করিয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জন করে; (৭) সবজি তরিতরকারি, রবিশস্ত, কপি, সালগম, কচু, লুকা, সরিষা ইত্যাদি উৎপাদন; (৮) কার্পাস উৎপাদন; (৯) ধান উৎপাদন; (১০) পান রোপণ; (১১) বাঁশ বিক্রয়; (১২) ছাতার বাঁটের উপযোগী সক বাঁশ চালান দেওয়া; (১৩) বাঁশের জব্যাদি প্রস্তুত করানো; (১৪) পশুপালন; (১৫) গরু ব্যবসা; (১৬) রবার বৃক্ষের চাষ; (১৭) মৎস্যের ব্যবসায়; (১৮) পক্ষী পালন; (১৯) ছন খেড়ের ব্যবসা; (২০) জাহাজের রসি তৈরি করিবার জন্ত আনাবস জাতীয় গাছের চাষ; (২১) আখের চাষ। যে-কেহ জমি বা পাঁচাড জমা লইয়া কারবার করিতে চান তিনি লেখকের নিকট বা সেলতান-সম্পাদক মোলবী মহম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেব, চট্টগ্রাম টিকানার চিঠি লিখিতে পারেন।

—মণিভদ্র।

অনুপ্রাসের অট্টহাস*

(শব্দগঠনে অনুপ্রাসের প্রভাব)

অয়ম্ অহম্ ভোঃ। আমি অনুপ্রাস। রসের আদিত্তে যেমন আদিত্ত, অলঙ্কারের আদিত্তেও তেমনি আমি। নায়ক-নায়িকার মধুরমিলনে আদিত্ত এবং ভাব ও ভাবাব মধুরমিলনে আমি, ঘটকের কাব করি। তাই কবি কালিদাস ভাব ও ভাবাব, শব্দ ও অর্থের মিলনমঙ্গলে পার্বতীপবনমুখের বন্দনা কবিতা স্বস্তিবাচনেই আমার মান রাখিয়াছেন। আমার ভক্ত দাশরথি রায় ও মতিলাল বায় কাব্যকর্তৃক শব্দকবি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি যে, অনুপ্রাসের স্বভাবসিদ্ধ লীলাখেলার ভাবার অলঙ্কার অনুপ্রাণিত? ইহা আগাগোড়া কবিকল্পিত কৃত্রিম কাণ্ড নহে। মুষ্টিমেয় মার্কারামার সাহিত্যসেবাই যে শুধু অনুপ্রাসে অনুরক্ত, তাহা নহে। বাগব্যাপারে অহরহঃ ভূভারতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা কোটিকণ্ঠে সমস্বরে সর্কীবস্থায় আমার বিজয়বার্তা বহন করে।

আমি বিশ্ববাপী, জগজ্জরী, শক্তিশালী, সর্বসর্কা। আমার বশঃ জগৎখোড়া, আমার হাসি ভুবন-ভুলান। বিশ্ববাসী আমাকে যথাযোগ্য মানমর্যাদা দেয়। যেখানে জনমানবের সমাগম আছে আমি সেখানেই আছি। সকল

* ২২এ জুলাই তারিখে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত। ভক্তিজ্ঞান শ্রবণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল, পি-এচ, ডি মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত কবিতাছিলেন।

স্থানে, সকল কালে, কোন-কিছু কবিত্তে, আমার আবশ্রুক হয়। তাই তো পারতপক্ষে আমি কবিত্তকালে ভাছছাড়া হই না।

জীবে শিবে, জীবে জড়ে, স্থলে স্থলে, জগৎরসে, দিগদেশে, জলে স্থলে, ভুলোকে ছালোকে, অনলে তনিলে সলিলে, আলোকে আঁধারে, আকাশে বাতাসে, নরিনঃ সাগরভূমিতে, পাবাধারে, সমুদ্রসৈকতে, সাগরস্রোতে, বারিধিবক্ষে, বাতববহিতে, তরঙ্গভঙ্গে, লহরীলীলান, সঙ্গারগা ধবায়, ধবাধামের স্রামশোভায়, ফলমূলে, উদ্ভিদে, ফুলফলে, পত্রপুষ্পে, পত্রপল্লবে, লতাপাতায়, তরুভতান, শাখাপ্রশাখায়, জলেজঙ্গলে, বনোবাগানে, পাহাড়পর্বতে, গিরিশৃঙ্খায়, গুহাগহববে, নদীনালায়, খালবিলে, বিল ও বিলে, চবাই উতবাইএ, জীবজন্তুতে, পশুপক্ষীতে, সবীহনে, কুমিকীটে, সাতসমুদ্রে, দশদিকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, বিশ্ববৈচিত্র্যে, সর্বত্র আমাকে প্রভূত-পরিমাণে পাইবন। রণে বনে, জীবনে মরণে, নিখাস-প্রশাসে, সংসারে দক্ষ্যমে, শ্মশানে মশানে, মান-অপমানে, শয়নে স্বপনে, অশনে বসনে, আসনে বাসনে, বিবাহে বিবাহে, সর্বত্র আমি স্রোতোভন। সামনে পিছনে, স্রু হইতে শেষে, আমাকে পাইবন। এ মহীমণ্ডলে, স্রু কু, উর্দ্ধ অধঃ, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, আপন পব, আসমান জমীন, অগোরগীর্ঘান্ বহুতো মহীয়ান, সকল ঘটেই আমি আছি। ধর্মকর্মই বল আর চুবিচামারিই বল, গুরুচুরিই বল আর বৈষ্ণববন্দনাই বল, আমাছাড়া কিছুই নাই। মহামায়ার ভোক্তবাজী হইলেও, আমার জোরেই এই জগৎযন্ত্রটা চলিতেছে।

দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন নাই, চক্ষুচক্ষুই আমাকে দেখিতে পাইবে। হাবভাবে, ভাবভঙ্গীতে, ভাবভঙ্গিতে ভাবে-ভাবে, ঠারেঠোরে, রকমসকমে, ধবধধরণে, অতাব-প্রকারে, চালচলনে, শিক্ষাদীক্ষায়, শিক্ষাসহবতে, আমি হাতেনাতে ধরা পড়ি। আমারই গুণে কর্ম করিলে কর্ম হয়, হিলোল উঠিলে জলে কল্লোল হয়। আমারই তড়নায় বড়বিপু চিত্তচাকল্য ঘটায়। কাম-ক্রোধ, মদ-মোহ-মাৎসর্য, আমার বশ। কেবল লোভ লোভ সামলইরাছে। হলাহল কালকূটও আমার সম্পর্কে স্রুচরণের চিনিব মত মিষ্ট। আমারই অমুরোধে এক রবি কবি, আর এক

রবি ছবি আঁকেন। আমাবই আবদারে পেঁচোর-পাওয়া
অবস্থায় এই লেখকের ললিতলবঙ্গ নাম-লাভ হইয়াছিল।

অগ্নিকণায় আমি, বারিদবৃন্দেও আমি। সসীমে
আমি, অনন্তেও আমি। অকিঞ্চিৎকরে আমি, সারাৎসার
পর্যাপ্তরেও আমি। জ্ঞাননেত্রে আমি, চন্দ্রচক্রেও আমি।
মহামহোপাধ্যায়ে আমি, মহামূর্খেও আমি। দেবভাবে
আমি, পশুপ্রকৃতিতেও আমি। সখ্যস্থাপনে আমি, শত্রুতা-
সাধনেও আমি; সৌহার্দ্যস্থত্রে আমি, বিদ্বেষবহ্নিতেও
আমি। স্বার্থসিদ্ধিতে আমি, পরার্থপ্রাণতায়ও আমি।
জ্ঞাননিষ্ঠাতে আমি, পক্ষপাতেও আমি। মনের মিলনে আমি,
মনোমালিন্তেও আমি। মিথ্যাকথায় আমি, সারসত্যেও
আমি। সংসঙ্গে সংসংসর্গে সাধুসঙ্গে আমি, আবার কুচক্রী
কুলোকের কাছেও আমি। বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি, স্থতিশক্তিতেও
আমি। বিষয়বুদ্ধিতে আমি, আবার বাঁহরে বুদ্ধি,
বিকৃতবুদ্ধি বা বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিতেও আমি।
বাহুবলে আমি, ব্রাহ্মণ্যবলেও আমি, আবার বিংশ শতাব্দীর
বিজ্ঞানবলেও আমি। বিরহীর হাছতাশ (হা হতোহুশি ?)
দীর্ঘশ্বাসে আমি, আবার বীরের ছফারটক্কারেও আমি।
ত্রেতার রামরাজ্যে রামরাজ্যে আমি, আবার মগের মুহুর্তে
কাতলাফেলার দেশেও আমি। নন্দনকাননে, মানস-
সরোবরে আমি, আবার নবককুণ্ডে, রৌরবে, প্রেতপুত্রী বা
পাতালপুরীতেও আমি। হাটে ঘাটে বাটে মাঠে গোঠে
আমি, নগরে সহরে গণ্ডগ্রামেও আমি। লোকালয়ে আমি,
পশুশালায়ও আমি। গহনকাননে বনবাসেই যাও আর
লোকালয়েই থাক, আমি সঙ্গের সাথী। বদ্ধবায়ুতে আমি,
বিশুদ্ধবায়ুতেও আমি। কুরুকুলে আমি, পঞ্চপাণ্ডবেও আমি।
সীতাসতীতেও আমি, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিতেও আমি। মায়-
নুগে আমি, স্বর্ণসীতায়ও আমি। বালবিধবায় আমি, পতি-
পুত্রবতীতেও আমি। মেয়েমানুষে আমি, পুরুষমানুষেও
আমি। বনের বানবে আমি, মনের মানুষেও আমি।

নরনাথ বা ক্রিতিপতিতে আমি, রাজবাণীতেও
আমি। রাজপুত্রায় আমি, প্রজাপ্রীতি প্রজাপালন প্রজা-
রঞ্জনেও আমি। সুশাসনে আমি, কুশাসনেও আমি।
কুশাসনে গুরুপুত্রোচিত, সিংহাসনে রাজারাজী, সুশাসনে
বরবধু, আমাব নিকট তুল্যমুখ্য। শক্তিশালী সৌভাগ্য-

শালীতে আমি, প্রিয়পাত্রের আমি। পূর্বপুরুষে আমি,
বংশবৃদ্ধি বংশবিস্তারের আমি। ঔরসসন্তানে আমি,
পোষ্যপুত্রের আমি। কৃষিক্ষেত্রে হলচালনে পশুপালনে
গকচরান ভেড়াচরানয় আমি, ব্যবসায়বাণিজ্যে বণিগ-
বৃত্তিতেও আমি। গুকগিরিতে আমি, আবার মাছিমার
কেরানীর কাণে কলমেও আমি।

স্বধসম্পদে, স্বধসৌভাগ্যে, স্বধস্বস্তিতে, স্বধস্বচ্ছন্দ্যে,
স্বধশান্তিতে, সম্মানসম্মানে, ধনে মানে, ধনজনবোবনে,
পদ-পসারে, পসার-প্রতিপত্তিতে, বিষয়-সম্পত্তিতে, বিষয়-
আশয়ে, বিষয়-বাসনায়, বিষয়বিষে, ব্যয় (ব্যসনে ?) ভূষণে,
ব্যয়বৃত্তিতে, ব্যয়বাহুল্যে, বিলাসলালসায়, কমলার কুপা-
কটাক্ষে আমি; আবার আপদ বিপদে, বিষয়বাহার,
বিষয়ব্যঘাতে, দৈবহর্ষিকিপাকে, দেবদৈবে, দৃঃখদৈন্তদারিদ্র্যে,
মহানুশ্লিষেও আমি। ধনীমানী, মন্তগণ্য জনগণের মধ্যে
আমাকে দেখিতে পাঠবে, আবার দীনহীন দীনহীন
দীনদরিদ্রের মধ্যেও আমাকে দেখিতে পাইবে। (রাজা
উজ্জীবের) রাজা কজীর, রাজা মহাবাজার, রাজা রাজড়ার,
আমীর ওমবাব কাছেও আমি, আবার মুটে মজুরের
কাছেও আমি। স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে আমি, স্বত্তরদত্ত
সম্পত্তিতে আমি, আবার পুরুষ-পরম্পরাগত পুত্রপৌত্রাদি-
ক্রমে উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত স্বাবব অস্বাবব সরিকানী
সম্পত্তিতেও আমি। রাণী ভবানীতে রাণী রাসমণিতে
রাজা রামকৃষ্ণে আমি, আবার ভজা জেলের ফুলী
জেলেনীতে শিবুসায়ও আমি। পরশপাথরে, মণিমাণিক্যে,
মণিমুক্তায়, মুক্তাব মালায়, আকবরী মোহরে, হীবার হাবে,
হীরাভরতে, ধনদৌলতে, সোণাব ধনিতে, লাক টাকায়,
চেক কাটার, পুঞ্জিপাটার, টাকাকড়িতে, মোটা মাহিয়ানায়,
উপরি পাওনায় আমি, আবার কাশাকড়িতে, শক্ত শরাবে,
ভিক্ষাভাণ্ডে, রিক্তহস্তে, খালি থলিতে, ধনহানে শনিতে,
সর্বস্বান্তে, সর্বশূন্য দরিদ্রতায়ও আমি। এক কথায়,
পাতাচাপা কপালেও আমি, পাথরচাপা কপালেও আমি।

স্বস্থশরীরে নির্নিমেষ-নয়নে চোখ চেয়ে জলজ্যাস্ত
বসিয়াই থাক, আব চিববোগী জরাজীর্ণ তন্ত্রাতুর কম্পমান
কলেবর হইয়া মরার মৃত শয্যাশায়ীই থাক, আর ঘূমের
ঘোবে, স্থপ্তিস্থে বা স্থপ্তিসাগবে ডুবিয়াই যাও, আমি

আশে পাশে আছি। অনমনা বা অনমনস্ক হইয়া একমনে একধ্যানে আকাশকুসুম-শশী প্রভৃতির ভাবনায় বিভোর হইও, আর কার্যকুশল করিতকর্মী বা অক্লান্তকর্মী ব্যক্তিকর্মী হইয়া অমমসাহনিকতার সহিত প্রাণপণে অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্যতা ব্রত-কৃতসঙ্কল্প হইও; শশব্যস্ত, ব্যস্ত-সমস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যস্তব্যস্ত হইও আর বাক্যবাণীশ বচন-বাণীশ বক্তৃতাবাণীশ হইও, কার্য্যকালে দ্বিধাবোধ ও গয়ংগচ্ছ না করিয়া স্বতঃপ্রসূত হইয়া দেশেব অস্ত ও দেশেব অস্ত অগ্রগ্রামী ও প্রাণান্তপরিচ্ছেদ বা প্রাণপাত করিয়া অগ্রগণ্য হইও, আর পবিত্রতাপী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও মনমোহ হইয়া সহজসাধ্য কর্তব্যকর্ত্তে পিছপাও বা পশ্চাৎপদ হইও; শত্রুর গর্জ্জিত করিয়া জয়সিদ্ধ হইও আর কষ্টেস্থিতে কায়ক্লেশে কষ্টকল্পনা বা সাধ্যসাধনা করিয়া কেঁদে ককিয়ে বড় বেগতিক বুঝিয়া 'চান্স আপনা বাঁচ' বলিতে বলিতে পিটটানই দাও, (পৈত্রিক প্রাণ লইয়া পালাবার পথ পাবেনা) আমার অধীনতা ছাড়াইতে পাবিবেনা। সংস্কৃত করিয়া নরনারীকে শুভসংবাদ সন্মোচনই দাও, আর সোজাছজি মেয়েমর্দকে খোসখববই দাও, বাক্যব্যয় কবিলেই আমার সাড়া পাইবে। ঐতিহ্য সর্বস বচনবিজ্ঞাসে কর্তৃকুহবে মধুসারাই ঢাল, আর চৌচ চুপড়ি কথায় ভ্যান ভ্যান করিয়া আবোল তাবোল বকিয় কাণ কালাপালাই কব, আমাকে ঠেলিতে পাবিবেনা। কেন না, কায়ের কথায়ও আমি, বাজে বকুনিতেও আমি।

আপনারা সাহিত্যভ্রম ভরপুর, সাহিত্য হইতে উদ্ধারণ উদ্ধৃত কবিয়া তেলা মাখায় তেল ঢালিব না। ধর্ম্মের কাহিনী বোধ হয় আপনারা—শুনিতে চাহিবেন না। অতএব সে প্রসঙ্গও না-ই তুলিলাম। ব্যাকরণ অভিধান, ছন্দঃ অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, বৈদ্যকশাস্ত্র প্রভৃতি কথার আলাদা আসরে বসিছি। অস্তান্ত বিদ্যায়ও আমার সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে কি না দেখুন।

(১) বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানবলে বলীয়ান। অতএব বিজ্ঞানের বিষয়ই বিবেচনা করুন। প্রকৃতিপরিচয়, বায়ু-বিজ্ঞানে বা বিমানবিদ্যায়, ব্যোমবিহাবে, বিমানবানে, জলবানে (জাহাজে), জম্মজানে, স্থিতিস্থাপকতার, কৈশিক আকর্ষণে, দিগদর্শনে, মনমন্দিরে, খেতসারে, জুয়ালাবে,

তাড়িতে, তারহীন তাড়িতবার্ত্তার, বিজ্ঞানে বরাতে মাথামাণায়, এমন কি টেলিগ্রাফের টবেটকায় পর্য্যন্ত শাশব রসে নীরস সরস হইয়াছে।

[তাহার পরে বিদেশী শব্দ আসরে আমদানী করিলে তো অল্পপ্রাস অল্পরস। যথা,—alkali, alcohol, phosphorus, phosphate, Tartaric, Tartarum, Carbide of Calcium, mesmerism, protoplasma, Rontzen rays; Atlantic গামী জাঁদরেল জাহাজ Titanic ও তাহার আরোহী সলিলসমাধিস্থ মহামন্ডল ট্রুস স্মিথ ষ্টেড এষ্টর; বিজ্ঞানবিৎ Pasteur ও Lord Lister, Hankine, Lagrange, Laplace, Galileo দ্বাই আমার বশ। বসায়ন-বিজ্ঞানে chemical compound কিন্তু mechanical mixture—এই স্বল্প প্রসঙ্গেও আমার কৃতিত্ব নহে কি?]

(২) গণিতবিজ্ঞান পাটীগণিত বীজগণিত, জ্যামিতি-ত্রিকোণমিতি, জরিপ পরিমিতি [ক্যালকুলাস কোয়ান্টিটিভ] প্রভৃতি শাস্ত্রে, ও যোগবিশেষ, সঙ্কলন ব্যবকলন, ত্রুণশূন্য, গুণনীয়ক গুণিতক, সম্পাদ উপপাদ, প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় আমাবই যোগাযোগে যুগলমিলন ঘটয়াছে। পৌনঃপুনিক, সমান্তর সর্বলরেখা, সমস্থত্র, স্বতঃসিদ্ধ—সবই অল্পপ্রাস-রস সুসিদ্ধ। শুভঙ্করের কড়াক্রান্তিকাক, দশবিধ গুণা, কাঠায় কুড়ো, কাঠাকালি, নৌকাকালি, জুদকষা, মাস-মাহিনা, সবই আমার প্রসাদে।

(৩) চিকিৎসা-শাস্ত্রেও আমাব হাতবশ আছে। কবি-বাজীতে হয় তো ইংরাজি-শিক্ষিতসমাজ গরমাজী। অতএব ডাক্তারীর [এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ইলেক্ট্রোপ্যাথি ভাইডোপ্যাথি হাইড্রোপ্যাথি ও মেডিক্যাল ম্যাগনেটিক্‌স্‌] কথাই বলি। ডাক্তারীতে, অন্তর্দর্শী বস্তুমন্ডল অনেক কাল পূর্বেই ইষ্টরসে কেষ্টরসের ব্যবস্থা করিয়া অল্পপ্রাসমহাস্বা যোষণা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ ম্যালেরিয়া ও মশকে, মহামারী ও মূষিকে, সঙ্কট নির্ণয় করিয়া অল্পপ্রাসপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে কশোলিতে [প্যাষ্টুর ইনস্টিটিউটে] পাঠানও অল্পপ্রাসের অল্পরোধে কিনা, কে জানে?

বুসবুসে জ্বর, জ্বরজ্বর, জ্বরজ্বালা, জ্বরজ্বালা,

অস্বাস্থ্য, বিকারেব বোব, গালগলা ফুলা, মাথাব্যথা, পিতিপড়া, কফকাসী, সর্দিকাশী, দাদ, দরদ, গলগণ্ড, স্বপ্নসঞ্চরণ, বেরিবেবি, প্রভৃতি রোগে আমার বীজাণু বিরাজিত। [পিল পাউডার, ক্যাসকাবা, কাষ্টিক] মলম, সালসা [সিনকোনা, কুইনাইন, কুইনাইন ক্যাপসুল, (ম্যালেরিয়াব মহৌষধ)] অজীর্ণ অশ্বলের অশ্ব বমানীজল [টাইকো-সোডা ট্যাবলেট]—পেটেন্টের কথা তুলিব না— [হোমিওপ্যাথিক ক্যামোমিলা] প্রভৃতি ঔষধেও আমার কাঁক পাইবেন। ব্যাবামে ব্যবহৃত বিলাতী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রেও আমি অধিষ্ঠিত [যথা পকেট-কেস, ক্লিনিক্যাল থার্মমিটার, ষ্টেথোস্কোপ]। [হেনিমান হোম, হেনিমান হল, হল অফ্ হেল্থ, গী-কক কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্, প্রভৃতি ঔষধালয়েও আমার দেখা পাইবেন। মেডিক্যাল কলেজে, মেটরিয়া মেডিক্যাল সিমিলি সার্জনে] মুমূর্ষু সেবাসুশ্রবায়, পথ্য ও পরিচর্যায়, আমার নজর আছে। আমারই অস্ত্র [এরাকট, পার্ল পাউডার, বার্লি বিস্কুট, মল্টেড মিড্] পাণিকলের পালো ও মাগুবমাছ মৌবজামাছ সুপথ্য। আমারই ব্যবস্থায় চিবরোগীর মরণ মঙ্গল।

(৪) আমি ইতিহাসেও প্রসিদ্ধ। [বেবিলনের রাগী সেমিবিয়ামিস্, নেবুকাডনেজাব, বার্নিয়ার, টাভার্নিয়ার, বোর্কোঁ,] সুদাস দিবোদাস, জনমেজয়, পুরুষবাঃ, যযাতি, শকুসিংহ, সংগ্রামসিংহ, সমরসিংহ বনবীর, হর্গাদাস, দক্ষমর্দিন দেব, দেবপালদেব, বজ্রাল, প্রতাপাদিত্য, মীরমদন, তান্ত্রিয়াতোপী, দাউদ, কৈকোবাদ, বাবর, সরফরাজ, গুরগণ, বুলবন, আবু বকর, আবুল ফজল, আমেদ সা আবদালি, রায় রায়ান, সাহান সা, নবাব নাজিম, নারেনবাজিম, আফগানিস্থানের আমীর, খেলাতের খাঁ, পারস্তের শাহ, সাসেবামে সর্বোবরে সমাহিত সের-সংহারক সেরসাহ, সকলেই আমার সাক্ষী। তন্তুতাউসে, কমলমীরে, চৈতককা চবুতারায় আমি। কুকক্ষেত্রে পাণিপথে, [ব্যানকবর্ণ কিলিক্র্যান্ডি ওভিনার্ভি হোহেনলিঙেনে] আমার যোগাড়ে যুদ্ধজয় হইয়াছে। আমারই কাবসাজিতে [স্পেনে স্যাংলেন] বন্দে বর্গী ও বখতিয়ারেব বঙ্গবিজয়।

(৫) খগোল-ভূগোলেও আমি গণ্ডগোল বাধাইতে

ছাড়ি নাই। আমারই অস্ত্র পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল বা কদম্বকুহ্মাকৃতি। স্থলভাগ জলভাগে, সাগর উপসাগর মহাসাগরে, নদনদীতে, উপনদী শাখানদী মহানদীতে, দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপ অন্তর্বীপে, দেশ মহাদেশে, অগ্নিগিরিতে, বাণিজ্য-বন্দরে, সর্বত্র আমি। [ইংরাজী ও অন্তান্ত বিদেশী শব্দ চালাইলে, ল্যাটিচিউড লঞ্জিচিউডে, প্রাচীন ব্যাবিলনে, ন ইনেভেতে, পিলপনিগসে, চার্কোনিজিতে, কিলিকিয়ার, আধুনিক কঙ্কর্ডে কনেষ্টিকটে সিনসিনাটিতে টবণ্টোর টিটিকাকায় মিসিসিপি ম্যাসাচুসেটসে ল্যাপল্যাণ্ডে বার্বারিতে টিম্বক্টুতে সিসিলিতে লণ্ডনে ডাঙীতে মাস-গোতে উলউইচে সিসিটারে চিচেষ্টারে, বেঅভবিস্কেতে, ফার্মঅভফোর্থে, ষ্টোকঅপনট্রেন্টে, Lopatka South of Kamaschatka, ক্যানকিন ক্যান্টনে, ককেসসে, স্তালপেটে, আলওরালে, ওয়াডিওয়াশে, হংকং, ট্রেট্‌স্ সেটলমেন্টসে, পুলাশিনাঙে, কেপ কলোনিতে, কেপ কমবিনে, বেঅভ বেঙ্গলে, আমাব অধিকাং।] দামোদর, ঘর্ষবা, কঙ্কণা, গুড়গুড়ে, শীতললক্ষা, বাগেদবীবিল, মধুমতী, প্রভৃতি নদনদী খালবিলেও আমার চলাচল।

নবাবী আমলেব বাঙ্গালাবিহাবে আমি, প্রাচীন কালের অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ, কাশীকাঙ্কীকোশলেও আমি। প্রাচীনকালে আমার আরও আদব ছিল। আমারই প্রভাবে পাটনাব প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র, পেশোয়ারেব প্রাচীন নাম পুষ্কপুত্র, মথুরাব প্রাচীন নাম শুবসেন ছিল। তিক্কিয়ার, জনস্থানে আমি, কর্ণস্ববর্ণেও আমি। বাঢ় বাগড়ী-ববেস্ত্র আমারই স্বত্রে বদ্ধ।

কটকে আমি, ক্যালিকটে আমি, কুন্তকোণমে আমি, ক্যানানোরে আমি, নাইনিতে আমি, দেরাছনে আমি, বাশবেরিলিতে আমি, বোম্বাইএ আমি, কালকায় আমি, সিমলাশ্লে আমি। লুণ্ডিকোটালে আমি, গিয়ানমীবে আমি, মৌলমিনে আমি, মার্কিন চুল্লকেও আমি। দূর ধাপধাড়ায় আমি, সুদূর পুলিপোলাওয়ে আমি। মহানগরী কলিকাতায় আমি, আবার এই অধম লেখকের বাসভূমি কাঁচকুলিতেও আমি। সেনানিবাস গোবাবাবিক দমদমায় আমি, আবার সাহিত্য-শিল্পলন-স্থান ময়মনসিংহ-চুঁচুড়ায়ও আমি। কোথায় দক্ষিণ বঙ্গ কোথায় আদাম। অথচ

বজ্রবজ্জ বাশবেড়িয়া বৈষ্ণবাটী পাইকপাড়া কাঁচড়াপাড়া
কুঠীঘাটার আমি, আবাব নবীনগর শিবসাগবেও আমি।

কলিকাতার ও তাহার আশে পাশে পাড়ার পাড়ায়
বাজারে বাজারে অলিতে গলিতে হাটে ঘাটে আমি চলা-
ফেরা করি। বোবাজার, বাগবাজার, রাজার বাজার,
বাবুর বাজার, টিকটিকি বাজার, বৈঠকখানা বাজার,
বাঙ্গাল বাজার, বড় বাজার, পগেরা পটী, চাঁদনীচক,
ঠনঠনিয়া, তালতলা, ভেঁতুলতলা, তিনকোণা তালো,
শুঁড়িপাড়া, কলুটোলা, পটুয়াটোলা, লেবুবাগান,
বকুলবাগান, বাহুড়বাগান, পদ্মপুকুর, তেলকল ঘাট,
মীরবহর ঘাট, মোলাআলি, টালাব নালা, মানিকতলা
মিউনিসিপ্যালিটি, আমহাষ্ট ট্রী, ক্রীকরো, ক্রস ট্রীট,
ইলিয়ট রোড, রেড রোড, রসা রোড, মদনমোহন
সেন লেন] সর্বত্র আমি। শেরালদহ হইতে
শ্রামবাজার, গড়পার হইতে হাবড়ার হাটে পর্যন্ত
আমার গতিবিধি আছে। [মহুমেন্টে উঠিলে আমাণেই
নজরে পড়িবে। ইডন গার্ডন বীডন গার্ডনে, হেষ্টিংস
হাউসে, শ্রিধ ট্যানিষ্ট্রীট কুককেলভি হেরিসন হেথাওয়ার
ও হোয়াইটএওয়ে লেডসর নবনির্মিত showshop বা
প্রদর্শনী-বিপণিতে আমি আছি।]

হুইটী স্থানকে একত্র যুড়িতে অনুপ্রাস-স্বত্বের প্রয়ো-
জন পড়ে। বধা, দূর সহর মক্কা মদিনা, জেদ্দা-জেদ্দো,
কাবুল-কান্দাহার, দিল্লী-লাহোর, দেওয়াগাজীখাঁ-দেরা-
ইসাইলখাঁ; ইরান-তুরান, তাতার-তিব্বত, সমরখন্দ-বোখারা,
ও খাস বাঙ্গলাদেশে, বাহুড়া-দীরভূম বর্জমান, বাথরগঞ্জ
বরিশাল, অধিকা-কালনা, খানাকুল-কুফনগর, কাপড়দ-
মাপড়দ, কাগাঁ-মোগাঁ, যোগাঁ-মোগাঁ, রূপদিয়া রাংদিয়া,
বড়িশা-বেহালা, বাগ্নে-বস্ত্রো, শিখি শিবপুর, সাঁচড়া-পাঁচড়া,
সোমড়া-সুখড়া, হাঁটিরা-জল্লয়পুর।

গ্রামের নামেও আমার ভবাভর আছে। আবাবিয়া,
আসানসোল, উজীরপুর, কড়কড়ে, করচনারিয়া,
কলসকাটা, কাঁওয়াকোলা, কাঁচিকাটা (র কুঠী), কাজীর
বাজার, কাড়াপাড়া, কালকেওট, কালিয়ারকর, কুচ-
কুচিয়া, কুচিয়াকোল, কোড়কদী, কৈকালী, খজান, গরল-
গাছা, গাফরগাঁও, গীতগ্রাম, গুণাইগাছা, গুপ্তিপাড়া,

গোদাগাড়ী, গোপালগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গোরগ্রাম, ঘোড়া-
ঘাট, ঘোড়ামাঝা, ঘোলাঘাট, চঞ্চল, ঝাঝা, ডমডিম,
ডোরগু, দিলদারনগর, নাজিরবাজার, নান্দুব, পাতিলপাড়া,
পার্বতীপুর, পালপাড়া, পীরপাহাড়, পীরপৈতি, পুনপুন,
পোলমপুর, প্রতাপপুর, কবিদাবাদ, ভেড়ামারা, মাঝাপাড়া,
মৌবপুর, মেহেরপুর, মৌলবীবাজার, বড়া, রাড়ীপাড়া,
রাজারামবাটা, রাণীমগর, রিমড়া, লালগোলা, লাহিড়িপাড়া,
বজ্রযোগিনী, বড়বড়ে, বদলবাঁধ, বনুবিষ্ণুপুর, বাগবাজী,
বারগোড়া, বারহারোয়া, বাবুবাজার, বাহাছাপুর, বাহির-
বন্দর, বীরপুর, বেলাবেড়া, বেড়বরাদী, ব্রাহ্মণবেড়িয়া,
শিয়ারশোল, শিবনিবাস, শিববাড়ী, সাববাড়ী, সরসুনা,
সুখসাগর, সুবজ্জ, সেরপুর, সৈসম, হাজরাহাটা, হাট-
হাজরাবি।

(৬) জাতিবর্ণ-উপাধিতে আমি বিরাজিত। ব্রাহ্মণ
বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণ, শূদ্র ভদ্র, কামাব কুমাব, খেপা
নাপিত, তেলি মালি, তেলি তামুলি, ছলি মালি, জেলে মাঙ্গা,
মাঝীমাল্লা, জেলে ও হেলে, ডোম ডোকলা, হাড়ি ডেম,
মুচি মুসলমান, মেথর মুদকরাস, রাজ মজুর, মুটে মজুব,
মজুব মিল্লী, প্রভৃতিতে সমাজের সকল স্তরে সর্বব্যাপ্ত্রাই
আমি যোড় মিলাইয়াছি। তাঁতী, কন্দকাব, কুন্তকার,
কাককব (কারিকর), সুবর্ণ-বর্ণিক (সুবর্ণবর্ণিক) বা সোণার
বেণে, কৃষি-কৈবর্ত, গড়োগোয়াল, ঝাড়বরদার, যকসেই
আমার তাঁবেদার। এমন কি পশুপালন হলচালন প্রভৃতি
বৃত্তির টোলফেলা বাবাবর জাতির মধ্যে পর্যন্ত (কুকি,
মিশমি) আমার বসবাস।

কান্তকুজ ব্রাহ্মণে আমি, সপ্তশতী ব্রাহ্মণেও আমি।
রাড়ীতে আমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে আমি, বৈদিক ব্রাহ্মণে
আমি, এমন কি বর্ণের ব্রাহ্মণেও আমি। লাহিড়ি
ভাহড়ি শৈব যেমন আমার আজ্ঞাধীন, বাঁড়ুজো মুখুজো
চাটুজোও তেমনি, তবে উজোর দকণ একটু তিক্ত।
মুখুটি কুটিল ও ঘোষাল রসালে আমার সমদৃষ্টি। বাঁড়ুলি,
পুতিতুণ্ড, বটব্যাংল, বেজবরুয়া, দ্বিবেদী, নন্দন, নন্দী,
নান, গড়গড়ি, গর্গ সরকার, দোবে-চোবে, দাস বহু, দাস
ঘোষ, দাস দত্ত, দাস দে, সেন নিয়োগী, সেন সরকার,
মিত্র মজুমদার, দকাদার, দস্তিদার, দিহদার, মজুমদার,

তবন্ধনার হালনার চাকলাদাব জোয়ারদাব প্রভৃতি দেবার উপাধিতে আমি বর্তমান।

গাঁইগোত্র, পর্যায়পটী, কুলশীল, গণপণ, আদানপ্রদান, পালটিপ্রকৃতি, কুলক্রিয়া বা কুলকর্ম, কুললক্ষণ, কুলীন-কল্পা, কুলীন বায়ন, কুলীন কায়েত, নৈ-কবা কুলীন, শুদ্ধ বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, কুলীন ও কাপ, কেশরকুনি, হড়গুড়, ঘটককারিকা, রাজঘোটক, সবই আমার ঘোটকতার। বোব বোস আমারই দাবীতে কুলের অধিকারী। দেবী-বর নিজেই আমার কাছে ধরা দিয়াছেন।

(৭) সংসার-সম্পর্কে কে কবে আমার অম্ববোধ অবহেলা করিতে পারিয়াছে? তাত, মাম, খুন্সর, ঋজ, স্বস্ত, ননান্দ, মাতামহ প্রভৃতি, ও বাবা, মামা, মামী, দাদা, দিদি, কাকা, কাকী, মামীমা, মামীমা, মেসোমশায়, বোনাই বাবু, বা চাচা, চাচী, নানা, নানী, ফুফু প্রভৃতি—সর্বত্রই আমার সমান অধিকার। মাতাপিতা, পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগিনী, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, পতিপত্নী, স্বামিজী, বরবধু, সন্তানসন্ততি, নাতিপুতি, কাছাবাছা, পোলা পান, শিশু, [বেবি]—এক কথায়, যাহাদিগকে লইয়া বরকরনার

নিবিড়বন্ধ, সকলেই আমার বশ। বাপবেটা, বৌ বেটা, মা মাসি, মাসি পিসি, মেসো পিসে, খুড়াখুড়ী, জ্যেষ্ঠাজ্যেষ্ঠী, ভাইপো ভায়ে বা ভাস্তেভায়ে, বহুরীকিউরী, এই সব ভালবাসার সম্পর্কে আমি যুগল মিলাইয়াছি। একানবর্ষি-পরিবার-প্রথায় আমার পূর্ণ প্রকোপ। খুন্সর ভাসুর মাসাশ পিসেশ ননাশ মামশেশ জ্যেষ্ঠেশ বড়শেশ এসব ধরিলে তো শেষ নাই। আজ্ঞা আই, জামাই বেহাই, তাহুই মাহুই, বোনাই আবুইও আমার আমলে আসেন। ভাসুর ভাদ্র (ভ্রাতৃ) বধুতে মিল আছে, কিন্তু ননদ-ভাজে মিল নাই। জাতগোষ্ঠী, জাতগোত্র, ভাইভায়েদের ভয়ে খুন্সরালয়ে আশ্রয় লইলেও আমার হাত হইতে নিস্তার নাই। সেখানেও খুন্সরখাণ্ডী শালাসব্বদী শালীশালাজ (সাক্ষাৎ শালা বা সোদর শালাও স্তনিয়াছি) ও ভায়রাভাই। জী বাপের বাড়ী থাকিলে স্বামীর সঙ্গে মিলিয়া আমার প্রভাবে মধুমরী হইয়া উঠেন। আমারই রূপায় ঘরনী-গৃহিনীর নামান্তর সংসার বা পরিবার। পোষাপুত্র, পালিতপুত্র, পালকপিতা, ধর্ম-মা আমার আশ্রিত। বরের ঘরের মাসি কনের

ঘরের পিসি আমি বড় ভালবাসি। যাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তাহাকেও হরির খুঁড়ো বা সরকারী মামা বলিয়া আমি কোল দিই।

কুমারীর কামনা ভাল ঘর বর। সধবার সাধ সোণাদানা গয়নাগাঁটি অলঙ্কার প্রতিকার বসনভূষণ বত হোক না হোক—শাঁখা সাড়ী ও সকলের সেরা, স্ত্রীর সীমস্ত-শোভা সিন্দূরবিন্দু। সন্তান-সন্তাবিতার শুভহুচনা সাধসেমস্তন (সীমস্তোন্নয়ন)। পতিপুত্রবতীর ছেলে কোলে দোলে বা শিশুসন্তান স্তনপান কবে। স্বামিসেবা, পতি-প্রেম, পত্নীপ্রীতি, সন্তানস্নেহ, এই সব লইয়া সোণার সংসার। গিন্নীধন্যগোছের শ্রামা জী বা স্ত্রীর জী সংসারান্ত্রমেব স্ত্রীতল বটচ্ছায়া। পবিত্রপ্রণয়প্রতিমা পতিপ্রাণা বঙ্গবধু অম্বপ্রাসে অম্বপ্রাণিতা। বিবাহব্যাপারে বরের বাপ কজাকর্ত্তার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। বিবাহবাসরে বরবধুর মধুবিলনে স্তব্ধস্বপ্ন। শুভবিবাহ শুভসাদী হইলে সোণায় সোহাগা হইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিকাদো মুৎসুহিতো

গত ২৮শে জুলাই মধ্যাহ্নে জাপানকে শোকসাংগরে নিমগ্ন কবিয়া নৃপতিশ্রেষ্ঠ, কর্মবোগী, মহাপুরুষ মিকাদো মুৎসুহিতো স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য নৃপতি বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে আর নাই ইহাই অনেকের বিশ্বাস, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের মধ্যে তিনি যে অন্ততম সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার কর্মময় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী “প্রবাসী”র ৮’ এক পৃষ্ঠায় লিখিত হইবার নহে, উহা নব্য জাপানের ইতিহাসে চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পীড়া যখন তাঁহার বুদ্ধি পাইল, তখন সহরে আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ হইয়া গেল; সকলে বাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া দিবারাত্র তাঁহার আরোগ্যের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহাপ্রাণ মিকাদো এ কথা জানিয়া বলিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা নয় যে রাজধানীতে সকল



জাপানের ভূতপূর্ব সম্রাট মিকাদো মুৎসুহিতো।

আমোদপ্রমোদ বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু কেহই সে কথা গুলিল না। নর্ত্তকী প্রমোদসভা পরিত্যাগ করিল, পালোয়ান কুস্তির আড্ডা ছাড়িয়া আসিল, অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল; পুরোহিতেরাও আর মন্দিরাভ্যন্তরে শান্তি পাইল না—তাহাদের সাক্ষাৎ দেবতা যে মৃত্যুসুখে উপনীত হইয়াছেন! তাহারা প্রাণদপ্রাণে সমবেত হইয়া অনাবৃত অবনতমস্তকে তাহাদের পিতৃতুল্য নৃপতির আরোগ্য কামনা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সম্রাজ্ঞী আহার নিভ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর শিয়বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সম্রাটের মৃত্যু হইল। সংবাদ আসিয়াছে একজন জাপানী তাঁহার মৃত্যুতে আত্মহত্যা করিয়াছে! এ নিদারুণ শোক সহ করিয়া সে বাঁচিতে চাহে নাই!

নৃপতির প্রতি প্রজার এই অদ্ভুত অমুরাগ দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন, কিন্তু তিনি যে জাপানীর চক্ষে

নরনারায়ণ! তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, শ্রদ্ধা করিত; তিনিও এই ভক্তিশ্রদ্ধার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। কেন, তাহা ক্রমশ বলিতেছি—

কিওতো সহরে ১৮৫২ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে যখন তিনি সিংহাসনারোহণ করিলেন, তখন তিনি বালকমাত্র। ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ও পরবৎসর তিনি প্রিন্স ইচিজো নামক প্রথম শ্রেণীর ওমরাহের কন্যা হারুকোর পাণিগ্রহণ করিলেন।

অভিষেকের সময় তিনি ঘোষণা করিলেন—“পূর্ব-পুরুষগণের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা স্বয়ং দেশ শাসন করিব; আমাদের সকল প্রজাকে শান্তি দান করিব; অগ্নাত দেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিব; আমাদের দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিব ও আমাদের জাতিকে • চিরস্থায়ী সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিব।” তাঁহার প্রতিজ্ঞা শুধু বাক্যের জাল নহে, তিনি তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছেন।

যখন তিনি জাপানের সিংহাসনে বসিলেন তখন গত দশ বৎসরের অন্তর্বিরোধে দেশ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত-কলেবর; জাপানের আকাশ ঘিরিয়া তখন ঘোর অন্ধকার; দেশ, বিচ্ছিন্ন বিভক্ত,—‘দাইম্যো’ বা ফিউডাল লর্ডেরা স্ব স্ব দল গঠন করিয়া পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত; গোঁয়ার-গোবিন্দ “সামুরাই” দল কটিদেশে ছই তরবারি ঝুলাইয়া জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বিস্তার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে, কথায় কথায় রক্তারক্তি করিতেছে। ‘যোশুন’ই দেশের সর্বসর্বা; মিকাদো তাঁহার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র, তিনি নামে মাত্র সম্রাট। বিদেশী শক্তিশালী জাতিরা জাপানের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতেছে; তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি নাই, আহ্বান করিয়া লইতেও সাহসে কুলায় না। পূর্ববর্তী ‘যোশুন’ কয়েকটি বন্দরে বিদেশীকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, তজ্জন্ত রক্ষণশীল ‘দাইম্যো’গণ ক্রোধে উদ্ভগ্নপ্রায় হইয়াছেন।

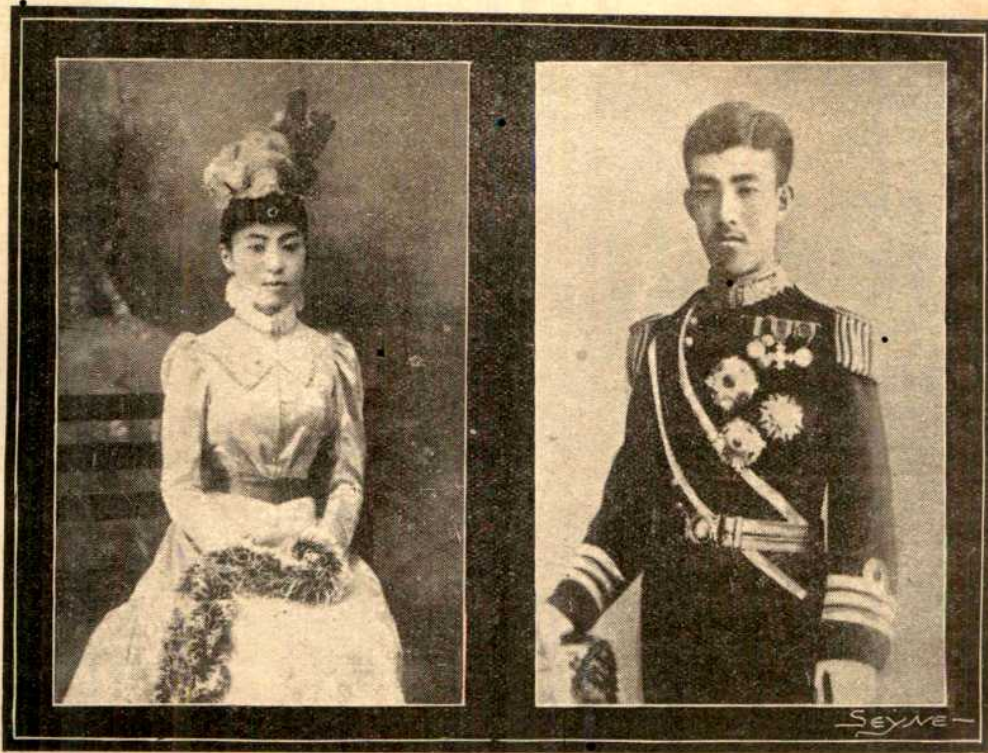
এমন সময় বালক-সম্রাট মুৎসুহিতোর আবির্ভাব হইল। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, ঝটিকা আসন্ন দেখিয়াও তিনি শঙ্কিত হইলেন না, দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া বসিলেন, ঝড়ের মুখে তরঙ্গী ভাসাইলেন, এবং ঝড়ঝঙ্কার মধ্য দিয়া নিপুণ হস্তে তরঙ্গী চালনা করিয়া উহা পরপারে পৌছাইয়া দিলেন।

‘দাইম্যো’গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তিনি ‘যোশুনের’ গর্ব খর্ব করিলেন। ‘দাইম্যো’গণের মধ্যে যে হিংসা বিষয়ের ব্যবধান ছিল তাহা কোন এক মন্ত্রবলে লুপ্ত করিয়া দিলেন। পরস্পর যাহারা শত্রু ছিল তাহাদিগকে তিনি মিত্র করিয়া দিলেন। দেশের বিচ্ছিন্ন বিভক্ত শক্তিকে একীভূত করিয়া জগতের মধ্যে এক মহাশক্তিশালী নব জাতি গড়িয়া তুলিলেন। দেশে রেল স্থাপনা করিলেন, বন্দর নির্মাণ করাইলেন, বিদেশীকে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনা করিলেন—দেশে কমলার আবির্ভাব হইল। তিনি বুঝিলেন দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে, তলাইয়া বুঝিলে শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মূল ভিত্তি, শিক্ষা ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভবপর নয়। অমনি রাজ্যজ্ঞা প্রচারিত হইল—“জীবনে কৃতকার্য হইতে হইলে জ্ঞানলাভ করা অত্যাশুকার। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জগৎ যে জ্ঞান আবশ্যক। তাহা হইতে সেই উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত যাহা রাজকক্ষচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিকিৎসক, কৃষক প্রভৃতি গড়িয়া তুলে—এক কথায় সকল প্রকার জ্ঞানলাভই শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেকে অনেক সময়, কৃষক শিল্পী ব্যবসায়ী এবং জ্ঞানলোকদিগের শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা বলিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও কবিতা ও নীতি-বাক্য রচনা করিয়া কত সময় অপব্যয় করিয়াছেন; সেই সময় নিজের বা দেশের লাভজনক কোনো বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল। এক্ষণে একটি শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, পাঠ্যতালিকাও নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের অভিপ্রায়, এখন হইতে এমন ভাবে শিক্ষাবিস্তার হউক যাহাতে কোনো গ্রামে নিরক্ষর পরিবার থাকিবে না এবং কোনো পরিবারে নিরক্ষর ব্যক্তি থাকিবে না।

এতাবৎকাল যাহারা জ্ঞানার্জনে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন—দীর্ঘকালের অপব্যবহার হইতে এই ভ্রান্তধারণার উৎপত্তি হইয়াছে; এখন হইতে সকলের স্বচেষ্টায় জ্ঞানার্জনে নিযুক্ত হওয়া উচিত।” ইহা সম্রাটের কেবল মুখের কথা নহে, ইহা তাঁহার প্রাণের কথা ছিল; তাই ইহা জাপানের সকল নরনারীর চিত্ত স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৮৯০ সালে এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, এবং ইহারই ফলে অল্প জাপানে নিরক্ষর লোক খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। মুটে মজুর, ‘রিক্সা’-ওয়ালা, চাকরাণী সকলেই প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের সকল সংবাদ জানিতে পারিতেছে।

তিনি দেশবাসীকে অবিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বিচারালয় স্থাপন করিলেন। স্বৈচ্ছাচারমূলক শাসন-প্রণালী রহিত করিয়া দেশে নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন করিলেন। জাপানীর স্বাভাবিক তেজ ও শক্তি সংহত করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শে নৌসেনা ও স্থলসেনাদল গঠন করিলেন। তাহা ১৮৯৪ সালে চীনকে, ও ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রুসকে রুষ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সকল সময়েই তাঁহারা বলিয়াছেন আমরা আমাদের বীরত্বের দ্বারা নহে, পরন্তু আমাদের সম্রাটের পুণ্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। জগদ্বিখ্যাত মুৎসুহিমার জলযুদ্ধের পর যখন সারা বিশ্বে অ্যাডমিরাল তোগোর জয়ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, তখন তিনি লিখিলেন—“যে অদ্ভুত সফলতা আমরা এই যুদ্ধে লাভ করিয়াছি তাহা কোনো মানবীয় শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের সম্রাটের পুণ্যবলেই সম্পাদিত হইয়াছে।”

ক্ষমাগুণেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। শেষ ‘যোশুন’ কেইকি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, একজন জাল রাজা খাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া সিংহাসনের দাবি করাইয়াছিলেন; এনোমোতো নামক একব্যক্তি ‘যোশুনের’



জাপানের বর্তমান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। (সম্রাজ্ঞী হইতে গৃহীত)।

পক্ষ গ্রহণ করিয়া য়েজোতে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা করিয়া-
ছিলেন; রেটোরসনের পর সাইগো সাংস্খ্যায় বিজ্ঞোহের
পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; ইহাদের সকলকেই
মুংসুহিতো ক্ষমা করেন। বিজিত শত্রুর প্রতি এমন ক্ষমা
প্রদর্শন জগতে বিরল।

তিনি যেমন পরিশ্রম করিতে পারিতেন তেমনি কষ্ট-
সহিষ্ণু ছিলেন। প্রতি বৎসর সৈন্তদলের 'ম্যাসুভারের'
সময় তিনি কয়েক দিবস ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্তপরিচালনা
করিতেন ও সাধারণ সৈনিকের আহাৰ্য্য ভক্ষণ করিতেন।

প্রতিদিন প্রাতে আট ঘটিকার সময় তিনি কার্যে
বসিতেন, কখনো কখনো কার্য শেষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর
উত্তীর্ণ হইত। গুরুতর রাজকার্য্যোপলক্ষে কোনো মন্ত্রী
রাজের যে-কোনো সময়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে
আসিয়া কখনো ফিরিয়া যান নাই।

যাঁহারা তাঁহার প্রাসাদ দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন
সেখানে আড়ম্বর বা বিলাসিতার লেশমাত্র নাই। বাহি-

রের চালচলনও তাঁহার এতই সাধারণ গোছের ছিল
যে তাহার সহিত আমাদের দেশের রাজ্যহীন 'রাজা'দের
চালচলনের তুলনা করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

তিনি বিপন্নের বন্ধু ও আর্ন্তের সহায় ছিলেন। দেশে
যখনই গৃহদাহে, ভূমিকম্প বা জলপ্লাবনে তাঁহার প্রজাবর্গ
বিপন্ন হইয়াছে তখনই তিনি তাহাদের দুঃখমোচনার্থ
মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন।

জন্তুর মধ্যে তাঁহার অশ্ব ও কুকুরের সখ ছিল। তিনি
একজন নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন।

রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি সাহিত্যচর্চা অবহেলা
করেন নাই। তিনি নিজে একজন শ্রুতি ছিলেন, অনেক
কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর নববর্ষের
সময় তিনি একটি করিয়া বিষয় নির্বাচন করিয়া দিতেন।
সেই বিষয়ে রাজপরিবারের স্ত্রীপুরুষ, রাজসভাসদ, আমীর-
ওমরাহ ও জনসাধারণ, যাঁহারা কবিতা রচনায় পারদর্শী,
সকলেই কবিতা রচনা করিতেন। এইরূপে তিনি জন-

সাধারণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগবর্দ্ধনে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

তিনি স্বদেশের পতিত জাতিকে উন্নীত করিয়াছেন, দেশ হইতে জাতিবিভাগ উঠাইয়া দিয়াছেন, দেশবাসীকে আভিজাত্য অপেক্ষা গুণের সমাদর করিতে শিখাইয়াছেন।

মুৎসুহিতো এক পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্রের নাম য়োবিহিতো, তিনিই সম্রাট হইলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স তেত্রিশ বৎসর। তিনি ১৮৭৯ সালের ৩১ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯০০ সালের ১০ই মে রাজ-কুমারী সাদাকোর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জাপানের নূতন সম্রাটের তিন পুত্র।

মনে পড়ে, কয়েক বৎসর পূর্বে এক শীতের প্রভাতে, মৃত সম্রাটের জন্মদিনে প্যারেড দেখিতে গিয়াছিলাম। শম্পাবিরল, বালুকাময়, তোকিওর বিস্তীর্ণ প্যারেডভূমি থাকিপরিহিত পদাতিক, রক্তপরিচ্ছদে সজ্জিত অশ্বারোহী, গোলন্দাজ সৈন্য ও কামানের গাড়ি, এবং জাপানী ও বিদেশী দর্শকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সবে মাত্র তরুণ সূর্য শীতপ্রভাতের কুয়াসাজাল ছিন্ন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নিশানধারী অশ্বারোহীর নিশানশীর্ষের বর্ষাফলকে নবীন রৌদ্র ঝিকমিক করিতেছে। অশ্বগুলো অধীর হইয়া কেবলি বালুকার উপর খর ঘর্ষণ করিতেছে। পদাতিকের দল দূরে দূরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের স্বন্ধে উন্নীত বন্দুকগুলি কেবল দেখা যাইতেছিল। প্যারেডভূমির মাঝখানে সম্রাট ও বৈদেশিক রাজদূতদের তাঁবু পড়িয়াছে। জাপানের আমীর-ওমরাহ, সম্রাটের মন্ত্রিগণ সম্রাটকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনাবৃত মস্তকে তাঁবুর সন্নিকটে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এমন সময় সম্রাট আসিলেন। তাঁহার শান্ত, সৌম্য, ধীর মুক্তি একবার দেখিলে আর ভুলিবার নয়।

তিনি জুড়ি গাড়িতে আসিলেন, সঙ্গে কয়েক জন মাত্র অশ্বারোহী শরীররক্ষক! মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শকদের মুখ আনন্দদীপ্ত হইয়া উঠিল, চতুর্দিক হইতে বানজাই ধ্বনি উথিত হইল। পদাতিকদল তুরীতে ‘কিমিগায়ো’ বাজাইতে আরম্ভ করিল; এক দলের শেষ হইতে না হইতে অল্প দল বাজাইতে আরম্ভ করে; প্রভাতের আকাশ অমুরণিত

করিয়া প্যারেডভূমির চতুর্দিকে তুরীর স্বর ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল—

“অমৃত যুগ ধরি, বিরাজো মহারাজ।

রাজ্য হ’ক তব অক্ষয়;

উপলবৃত দিন না হয় মহীধর;

প্রভূত শৈবালে শোভাময়।”*

হায়! তখন কি তাহারা জানিত তাহাদের মহারাজ এত শীঘ্র তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংখ্য-দর্শনের উপাখ্যানমালা

সে আজ বেশীদিনের কথা নহে যেদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শত শত ধর্ম্মপিপাসুদিগের বহু জটিল প্রশ্ন ছুই একটি গল্প দ্বারা সমাধান করিতেন। সাকার নিরাকারবাদ, মানব-আত্মায় সংস্কারের প্রভাব প্রভৃতি দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব-দিগের বিতণ্ডার বিষয়গুলি তাঁহার ছুই একটি উদাহরণে সরল হইয়া যাইত। খৃষ্ট ও উপদেশকালে গল্পের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। ইহাতে আপামর সকলেই মনোহর উপদেশাবলীর মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইত। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রেও যে গল্পচ্ছলে উপদেশদানের প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

বহুপ্রাচীন উপনিষদ গ্রন্থে আমরা এইরূপ উপাখ্যান দেখিতে পাই। তাহার পর দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্যদর্শনই এ বিষয়ে প্রধান সাক্ষী। ইহার চতুর্থ অধ্যায় কেবল উপাখ্যানমালার সংগ্রহ। আমরা তাহার উপাখ্যানগুলির পরিচয় দিতেছি।

একটি কথা পূর্বে বলিয়া রাখা আবশ্যক। সাংখ্য-দর্শনের মূলগ্রন্থ সপ্তকে মতভেদ আছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত সাংখ্যকারিকাকে অনেকে সাংখ্যদর্শন ধরিয়া থাকেন। কিন্তু সূত্রাকারে গ্রথিত কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন বিद्यমান। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভাষ্য, ও অনিরুদ্ধ ইহার বৃত্তি রচনা

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।

করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ছয় অধ্যায়ে সমাপ্ত। আমরা এই গ্রন্থ হইতেই উপাখ্যান সংগ্রহ করিলাম। উপাখ্যানগুলি সংক্ষেপে স্বত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধ উভয়েই পূর্ণ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উভয়ের উপাখ্যান সকল স্থলে সমান নয়। অনেক স্থলেই—তাই উপাখ্যানে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমরা সেই সেই উভয় স্থলে উপাখ্যানই বর্ণনা করিব।

সাংখ্যদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩২টি স্বত্র আছে। এক একটি স্বত্রে একটি উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা মূলস্বত্রগুলিও উদ্ধৃত করিলাম।

১। রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ।

এক বাজপুত্রের গণ্ডনকক্ষে জন্ম হইয়াছিল। তাহাতে তাহার পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এক ব্যাধ তাহাকে পুত্রবৎ লালনপালন করিয়া বর্দ্ধিত করে। বাজপুত্র ব্যাধের গৃহে থাকিয়া সংসর্গবশে ব্যাধের আচার গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে বাজার মৃত্যু হইল। তাহার অল্প সন্তান না থাকাতে মজ্জিগণ ব্যাধপালিত রাজপুত্রকে আনয়ন করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিল। সেই সময় মজ্জিগণের বাক্যে জ্ঞানলাভ করিয়া বাজপুত্র ব্যাধস্থলত আচার বর্জন করিয়া বাজ-আচার অবলম্বন করিলেন।

এইরূপ, মানবের মনে উপদেশ দ্বারা যদি বোধ জন্মাইয়া দেওয়া যায়, যে, সে ব্রহ্মের অংশ, তাহা হইলে তাহার ভ্রমবুদ্ধির নিরাস হয়।

২। পিশাচবদন্ত্যর্থোপদেশেহপি।

কোন গুরু শিষ্যকে নির্জনে উপদেশ দিতেছিলেন। গুরুজনের অন্তরালেস্থিত পিশাচ তাহা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে উপদেশ দিতেছিলেন তখন এক পিশাচ শ্রবণ করে। ইহার তাৎপর্য এই যে জ্ঞানী, শূদ্র প্রভৃতি যাহাবা পূর্বে উপদেশের অনধিকাৰী ছিল তাহাদেরও প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ শ্রবণে মুক্তি হওয়া সম্ভব।

৩। আবৃত্তিরসকুটুপক্ষেপাৎ।

ছানোগ্য উপনিষদে আকণি শ্বেতকেতুকে যেমন

বারংবার উপদেশ দিয়াছেন সেইরূপ একবার উপদেশে জ্ঞান না হইলে উপদেশের পুনরাবৃত্তি বিধেয়।

৪। পিতাপুত্রবদ্ব্যবোধদৃষ্টত্বাৎ।

এই স্বত্রটিব বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধ বিভিন্ন ব্যাপ্য করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন পুত্র দেখিতে পিতার মরণ হইল, নিজের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সে বৃত্তিতে পারে যে জগৎ জন্ম ও মৃত্যুবদ্ধী। এই জ্ঞান হইতে তাহাৎ বৈরাগ্য জন্মে।

অনিরুদ্ধ এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন—কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ গর্ভবতী পত্নীকে খণ্ডবালয়ে রাখিয়া অর্চনাসংগ্রহেব জন্ত বিদেশে গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ পুত্রকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। পরে ব্রাহ্মণের পত্নী উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইহাব তাৎপর্য এই—গুরুর উপদেশ না পাইলেও বহু উপদেশ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

৫। শ্বেদনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিরোগাভ্যাম্।

এ স্বত্রটির অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন—শ্বেদন আমিশখণ্ড-লোলুপ হইয়া আমিশ গ্রহণ করিতে অল্প কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সেইরূপ লোভ ত্যাগ করা উচিত। শ্বেদন যদি ইচ্ছাক্রমে আমিশ পবিত্যাগ করে তাহা হইতেই সুখী হয়। মানব সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিলেই সুখী, নহিলে দুঃখী হইবে।

অনিরুদ্ধ বলেন—কোন পুরুষ একটি শ্বেদনশাবক প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে অতি যত্নে তাহাকে পালন করিয়াছিল। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোকটি ভাবিল কেন ইহাকে অনর্থক কষ্ট দিই? বনে ছাড়িয়া দিলেই এ সুখী হইবে। এই ভাবিয়া সে শ্বেদনটিকে বনে ছাড়িয়া দিল। শ্বেদন স্বাধীন হওয়াতে সুখী হইল বটে কিন্তু পালকবিরহে দুঃখ অল্পকাল করিতে লাগিল। ইহাৎ তাৎপর্য এই—সুখ সর্বদাই দুঃখ-মিশ্রিত। সংসারে অবিরাম সুখ দুর্লভ। সেইজন্য সুখ ও দুঃখ উভয়েতেই নিম্পূহ হওয়া কর্তব্য।

৬। অহিনিষ্ময়িনীবৎ।

যেমন সুপ জীর্ণ স্বপ্ন পরিত্যাগ করে সেইরূপ মুক্তি প্রার্থী মানব প্রকৃতির মায়াজনিত বিষয় পরিত্যাগ

করিবেন। সাংখ্যমতে পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এট
জ্ঞানেই মুক্তি। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

কোন সর্প কোন বিববসম্মুখে স্বক্ পরিভ্যাগ করিয়া
ভাবিতে লাগিল “আহা! আমার এই স্বক্ স্থলি ও পঙ্কজ
হইয়াছে।” সেই স্বকের মায়ার সে সেস্থল ত্যাগ করিল
না। একজন সাপুড়ে সেই স্বক্ দেখিয়া এইখানে সর্প
আছে বুঝিতে পারিল ও সেই সর্পকে ধরিয়া ফেলিল।
তাৎপর্য—স্নেহ, মমতা প্রভৃতি বর্জনই মুমুকুদিগেব কর্তব্য।
[অনির্বন্ধ]

৭। ছিন্নহস্তবধা।

যেমন ছিন্নহস্ত একবার পরিভ্যাগ করিলে আর তাহা
কেহ গ্রহণ করে না, সেইরূপ প্রকৃতিব মোহ একবার
দুবীভূত হইলে আর তাহা আক্রমণ করিতে পারে না।
[বিজ্ঞানভিক্ষু]

কোন মুনি ভ্রাতাব আশ্রমে প্রবেশ কবিয়া ফল অপ-
হরণ কবিয়াছিলেন। ভ্রাতা বলিলেন “তুমি চোর।”
তিনি বলিলেন “কি প্রায়শ্চিত্ত করিব বল।” ভ্রাতা
বলিলেন “হস্তচ্ছেদ ভিন্ন অল্প প্রায়শ্চিত্ত নাই।” এই
শুনিয়া তিনি রাজার নিকট গিয়া নিজহস্ত ছেদন করাইয়-
ছিলেন। তাৎপর্য—অকার্য্য করা অসুচিত। ভ্রমে
করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। [অনির্বন্ধ]

৮। অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ।

রাজর্ষি ভরত মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়ে অনুশীলিত হইয়াও
সন্তোষপ্রসূত এক হরিণীকে মরিতে দেখিয়া নবজাত হরিণ-
শাবকটিকে পোষণ কবিয়াছিলেন। ক্রমে এই হরিণের
প্রতি তাঁহার এরূপ মমতা জন্মিল যে তাঁহার তপস্তা
প্রভৃতি সমস্তই লুপ্ত হইল। মরিবার সময় হবিণেব ধ্যান
করিয়া মরাতে তাঁহার অধোগতি হইল। তাৎপর্য্য এই যে,
মোক্ষার্থীর অনিষ্টচিন্তন করা উচিত নয়। তাহাতে
বিবেকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা জন্মে।

৯। বহুভির্যোগে বিরোধঃ রাগাদিভিঃ কুমারীশব্দবৎ।

কুমারীরা হস্তে শব্দবলয়সকল পরিধান করে।
তাহাদের গল্পের আঘাতে ঝনঝন শব্দ উৎপন্ন হয়।
সেইরূপ, বহু ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ

তাহাতে কলহ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ইহাতে যোগভ্রংশ
হয়। নির্জনতাই যোগের অমুকুল।

১০। দ্বাভ্যামপি তর্থেব।

দুইজন একত্রে থাকিলেও ঐ উদাহরণ। দুইটি বলয়েও
ঝনঝন হয়। দুইজন লোকেও কথাবার্তার যোগেব বিদ্র
উপস্থিত হইতে পারে।

১১। নৈরাশঃ স্ত্রী পিজলাবৎ।

পিজলা নামক বাবাজনা রজনীতে কোন পুরুষের
প্রতীক্ষায় রাত্রিজাগরণ কবিয়া ক্লিষ্ট হইয়াছিল। একদিন
অতিশয় কাতর হইয়া প্রতিজ্ঞা কবিল “এরূপ আর অপেক্ষা
করিব না।” সেইদিন হইতে আশা ত্যাগ করিয়া পিজলা
স্ত্রী হইল। তাৎপর্য্য আশা ত্যাগ করিলেই মানব
স্ত্রী হয়।

১২ অনারন্তেহপি পরগৃহে স্ত্রী সর্পবৎ।

নিজে কোন উত্তোগ না করিলেও সর্প যেমন পরকৃত
গৃহে বাস করে, সেইরূপ চেষ্টা না করিলেও স্ত্রী হওয়া
যায়। স্ততরাং চেষ্টা না করাই উচিত।

১৩। বহুশাস্ত্রগুরুপাসনেহপি সারাদানং ঘটপদবৎ।

ভ্রমর বহু পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া মধু সংগ্রহ করে।
মানবেবও সেইরূপ বহুশাস্ত্র পাঠ কবিয়া ও বহু গুরু
উপদেশ শ্রবণ করিয়া সারভাগমাত্র গ্রহণ করা কর্তব্য।

১৪। ইষুকারবল্লেকচিত্তস্ত সমাধিহানিঃ।

একজন শবনিষ্ঠাতা বসিয়া বসিয়া বাণ নির্দ্বাণ
করিতেছিল। সেই সময় এক রাজা তাহার সম্মুখস্থ পথ
দিয়া গমন করিতেছিলেন। শবনিষ্ঠাতা তাঁহার দিকে
চাহিয়াও দেখিল না। একমনে আপন কাজ করিতে
লাগিল। এইরূপ একাগ্রতা সহকারে ধ্যান করা কর্তব্য।

১৫। কৃতনিয়মলজ্জনাদানর্থক্যং লোকবৎ।

ঔষধ ও পথ্যাদির নিয়ম না মানিলে বোগ আবাগ
হওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে জ্ঞান-
নিষ্পত্তি হয় না। সকলেই যদি ইচ্ছামত ব্রতাদি শাস্ত্রনিয়ম
লঙ্ঘন করে তাহা হইলে কোন শৃঙ্খলা থাকা অসম্ভব।

১৬। তদ্বিস্মরণেহপি ভেকীবৎ।

নিয়ম বা তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইলেও চলে না। কোন

রাজা যুগ্ম করিতে গিয়া অরণ্যে একটি সুন্দরী কন্যা দেখিয়াছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” সে বলিল “আমি রাজকন্যা।” রাজা তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সে বলিল “আমি তাহাতে সম্মত আছি কিন্তু যখন আপনি আমাকে জল দেখাইবেন তখনই আমি চলিয়া বাইব।” রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছুকাল পরে একদিন জোড়ার পরিশ্রান্ত হইয়া কন্যাটি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল “জল কোথা?” রাজা প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া জল দেখাইয়া দিলেন। তখন সেই কন্যা জল স্পর্শ করিতে ভেঙী হইয়া গেল। কারণ সে ভেকরাজহুঁহিতা ছিল। রাজা জাল প্রভৃতি দ্বারা বহু অহুসঙ্কান করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

১৭। নোপদেশশ্রবণেহপি কৃতকৃত্যতা

পরামর্শাদুতে বিরোচনবৎ।

ইন্দ্র ও বিবোচন ব্রহ্মার নিকট তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন। ইন্দ্র শ্রবণ করিয়া আসিয়া সেই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। বিবোচন আলোচনা করিল না।

৮। দূর্যন্তস্তয়োৱিন্দ্রশ্চ।

তাঁহাতে ইন্দ্রের ফললাভ হইল। বিবোচনের কিছু হইল না। সেইহেতু শুধু শ্রবণ করিলেই ফল হয় না। তাহার আলোচনা আবশ্যক।

১৯। প্রণতিব্রহ্মচর্যোপসর্পণানি কৃতা

সিদ্ধির্বলকালাত্ তদ্বৎ।

সেবা, ব্রহ্মচর্য ও প্রণতির দ্বারা বহুকাল পরে ইন্দ্র বেক্রপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেইরূপই সিদ্ধিলাভের প্রশস্ত পন্থা।

২০। ন কালনিয়মো বামদেববৎ।

আরাধনার অস্ত্রই কাংসব্যাজ হয়, তত্ত্বজ্ঞানে তাহা হয় না। বামদেব পূর্জ্ঞম্মের সাধনবলে গর্ভাবস্থানকালেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

২১। অধ্যস্তরূপোপাসনাং পারম্পর্যেন

যজ্ঞোপাসকানামিব।

বাহার যোগযজ্ঞাদি করে তাহাবা কি তবে মুক্তি পায় না? কেবল জ্ঞানমার্গাবলম্বিগণ কি মুক্ত হয়? কর্মমার্গে কি ফল নাই? উত্তর—ফল আছে। তবে তাহারা ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতিব উপাসনাদ্বারা অনেক পবে জ্ঞানলাভ কবে। সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ হয় না।

২২। ইতরলাভেহপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিবোগতো
জন্মশ্রবণতঃ।

কিন্তু কর্মমার্গলব্ধ সুখ স্থায়ী নহে। যজ্ঞদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও তাহার ক্ষয় আছে। পুনর্বার সংসারে আগমন সম্ভব। সুতরাং জ্ঞানমার্গই শ্রেষ্ঠ।

২৩। বিরক্তশ্চ হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং

হংসক্ষীরবৎ।

বাহাব বৈবাগ্য জন্মিয়াছে সে, হংস বেক্রপ জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান কবে সেইরূপ, হেয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয় মোক্ষ অবলম্বন করে।

২৪। লক্কাতিশয়যোগাভা তদ্বৎ।

বাহার জ্ঞানবুদ্ধি হইয়াছে তাহার সংসর্গেও হংসের শূন্য ঐ প্রকার ত্যাগ ও গ্রহণ ঘটিতে পারে। অলব্ধ লক্কাভ্রেক্ষে লক্কাভ্রেক্ষই সংসাবে অনাসক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৫। ন কামচারিৎসং রাগোপহতে শুকবৎ।

রাগযুক্ত পুরুষেব সহিত মিলন কথা কর্তব্য নয় শুকপক্ষী সুন্দর বলিয়া পাছে কোন রূপলোলুপ বন্ধন করে এই ভয়ে বেক্রপ স্বচ্ছন্দবিহার করে না, সেইরূপ রাগযুক্ত পুরুষ হইতে মুক্তিলাভেচ্ছ সদা দূরে থাকিবে। [বিজ্ঞান-ভিক্ষু]

রাগযুক্তের মুক্তি নাই। ব্যাসেব রাগ থাকাপ্রযুক্ত মুক্তি হয় নাই। তৎপুত্র শুক রাগহীন হওয়ার্তে মুক্ত হইয়াছিলেন। [অনিরুদ্ধ]

২৬। গুণযোগাদ্ বদ্ধঃ শুকবৎ।

শুকপক্ষী বেক্রপ রজ্জ্বযোগে ধৃত হয় সেইরূপ আসক্তি-পাশে মানবও বদ্ধ হইয়া পড়ে।

২৭। ন ভোগাদ্ রাগশাস্তিমুনিবৎ।

ভোগেব দ্বাবা কখনও রাগের শাস্তি হয় না। সৌভাগ্য মুনি তাহাব প্রমাণ। ভোগ্যবাসনায় তপস্তায় জলাঞ্জলি

দিয়া বহুকাল ভোগ করিয়াও তৃপ্তি পান নাই। সুতরাং
ভোগ করিতে কবিতে বৈরাগ্য জন্মিবে এ কথা অবৈজ্ঞিক।

২৮। দোষদর্শনাছুভয়োঃ।

প্রকৃতি ও তাহার কার্যের পরিণাম প্রভৃতি দোষ
দেখিয়াই রাগশাস্তি হয়। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

আত্মা ও বিষয় এষ্ট উভয়ের দোষ দেখিয়াই বিষয়াদিগের
চিন্তে বৈরাগ্য জন্মে। [অনিৰুদ্ধ]*

২৯। ন মলিনচেতস্যপদেশ বীজ প্রবোক্তোহজ্ঞবৎ।

পক্ষী ইন্দুমতীৰ মৃত্যু হইলে অজবাজ্ঞা বহুবিধ বিলাপ
করিতেছিলেন। তাঁহাব শোকার্জচিত্তে বশিষ্ঠের উপদেশ
স্থান পাইল না। সেইরূপ মলিনচিত্তে উপদেশের বীজ
অজ্বলিত হয় না।

৩০। নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ।

যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেইরূপ মলিন
চিত্তে উপদেশের আভাসমাত্র থাকে না। এসকল ক্ষেত্রে
উপদেশ বৃথা।

৩১। ন তত্ত্বজ্ঞাপি তদ্রূপতা পঙ্কজাদিবৎ।

জ্ঞান হইলেই যে তাহা উপদেশের ঠিক- অনুরূপ হইবে
এমন কোন কথা নাই। পদ্ম পঙ্কে জন্মায় বটে কিন্তু তাহা
পঙ্কের অনুরূপ নয়। [বিজ্ঞানভিক্ষু]

সাংখ্যোক্ত ‘মহান্’কে আত্মা বলা যায় না। কেননা
মহান্ কারণ, আত্মা কার্য। কার্য ও কারণ এক নহে।
পঙ্কই পদ্ম নয়। [অনিৰুদ্ধ]

৩২। ন ভূতিযোগেহপি কৃতকৃত্যতোপাস্ত্র-

সিদ্ধিবদুপাস্ত্রসিদ্ধিবৎ।

অগ্নিমা প্রভৃতি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেই যে চবম হইল
তাহা নয়। কেননা তাহাবও পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে।
কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না। সুতরাং
তত্ত্বজ্ঞানলাভে সচেষ্ট হওয়াই সকলের কর্তব্য।

সাংখ্যদর্শনোক্ত উপাখ্যানমালা এইখানে শেষ হইল।
এইসকল উপাখ্যান পূর্বে ভাবতে বিশেষ প্রচলিত
ছিল। শ্লোকাধারে যে ইহাদের সংগ্রহ হয় তাহার
প্রমাণও বিদ্যমান আছে। যথা—

“পিঙ্গলা কুরঙ্গ সর্পঃ সারসাদেবকো বনে।

ইয়ুকারঃ কুমারী চ যভেতে শুকবো যম।”

পিঙ্গলানারী বারাজনা, কুরঙ্গ পক্ষী, সর্প, মৃগাঘেষণকাবী
ব্যাধ, শরনিষ্ঠাতা ও কুমারী এই ছয়জন আমাব গুরু।

বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যে এইসকল উপাখ্যানের সমর্থক
অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার কতক-
গুলি এই—

এহাবিষ্টো বিজ্ঞঃ কশ্চিচ্ছ্রোত্ৰহসিতি মন্ততে।

এহনাশাং পুনঃ স্বীয় ব্রাহ্মণ্যং মন্ততে যথা।

কোন ব্রাহ্মণ এহাবিষ্ট হইলে নিজেকে শূদ্র বলিয়া মনে
করে; পরে এহনাশে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বৃদ্ধিতে
পারে।

[সেইরূপ জীবও মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমি এই দেহ এই
জ্ঞান করে, পরে মায়া দূর হইলে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া
বৃদ্ধিতে পারে।]

বান্দে বহুনাং কলহো ভবেদ্বার্তী যদোরপি।

এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণম্।

বহুলোকের বাসে কলহ উপস্থিত হয়। দুইজন থাকি-
লেও কথাবার্তা চলিয়া থাকে। কুমারী-করস্থিত কঙ্কণই
ইহার নিদর্শন। সুতরাং একক থাকিবে।

আশা হি পরমং হুঃখং নৈরাশ্র্যং পরমং সুখম্।

যথা সন্ধিয়া কান্তাশাং সুখং সুধাপি পিঙ্গলা।

আশা বিষম হুঃখ। নৈরাশ্র্যই সুখ। কান্তেব আশা
পবিত্র্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে যুমাঁইয়াছিল।

গৃহারজো হি হুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন।

সর্পঃ পরীকৃত্য বেদ্য এবিষ্ট হুঃখমেধতে।

গৃহাবস্ত হুঃখের জন্ত, কখনও সুখের জন্ত নয়। সর্প
পরকৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া সুখে বাস করে।

অগ্ন্যন্ত মহন্ত্যন্ত শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।

সর্বতঃ সারমাধন্যং পুষ্পেভ্য ইব ঘটপদঃ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে, ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে
সার গ্রহণ করে সেইরূপ, সার গ্রহণ করিবে।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই
বুঝা যাইবে যে শ্লোকের উপাখ্যানগুলির সহিত সূত্রবর্ণিত
উপাখ্যানগুলির বিশেষ প্রভেদ নাই।

যেমন বেদবিধান গুরুব আজ্ঞাব ভায় কঠোর বলিয়া
কাব্যরসে জনগণকে বশীভূত করিতে হয়, সেইরূপ নীরস
ও দুর্গহ দার্শনিক তত্ত্বসকলকে সরস ও সরল করিবার

জন্ত উপাখ্যানমালার প্রয়োগ। ছবারোহ জ্ঞান-শৈলশৃঙ্গে আরোহণেব সুবিধার্থে সুগঠিত-সোপান-স্বরূপ এই গল্পরাজি মরুভূমি মধ্যে শম্পচ্ছাদিত সলিলসিক্ত ক্ষমচ্ছায়াভূষিত ক্ষেত্রেব স্থায় মনোমদ। এই উপাখ্যানপ্রবাহ উপনিষদ-শৈল-শিখরোদ্ভূত হইয়া অনন্ত কাল-ক্ষেত্রেব মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বৃদ্ধদেবের অল্পপম আখ্যানসমূহ ইহাব শাখা-সবিৎ। দেশ-র উপদেশ-লহরী উপনদী। কত কৃষিত গৃহীকে কত জ্ঞানবারি দান কবিয়া বহিয়া আসিতেছে—তোন সাগরে মিলাইবে কে জানে?

শ্রীশবচন্দ্র বোবাল।

হেমকণা

(৩)

লৌহপেটিকাব আবরণ যখন উন্মোচিত হইল তখন অন্ধকাব দূর হইয়াছে, শুভ্র দিবালোক আসিয়া গৃহটিকে উদ্ভাসিত কবিয়াছে। যিনি অবগ্যসঙ্কুল পার্কীয় উপত্যকা হইতে আমাদিগকে নগরে আনয়ন কবিয়াছিলেন তিনি পেটিকার আবরণ উন্মোচন কবিয়া আমাদিগকে উন্মোচন কবিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু চর্ম্মাধারে হেমকণা সংগৃহীত হইয়াছিল, আমাদিগেব অধিকারী সেগুলি ধাতুপাত্রে একত্র কবিয়া পুনরায় বৃহত্তর চর্ম্মাধারে আবদ্ধ কবিলেন। আমিও অবশ্য সেই সঙ্গে পুনরায় আবদ্ধ হইলাম। তাহাব পর বোধ হইল যেন কেহ আমাদিগকে বহন কবিয়া লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল, কিয়ৎক্ষণ শব্দশূন্য জনশূন্য পথ অতিক্রম কবিয়া কোলাহলবয় জনতাপূর্ণ বাজপথে উপস্থিত হইল। রাজপথেব কিয়দংশ অতিক্রম কবিয়া অপব একটি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হঠাৎ চর্ম্মপেটিকা উন্মুক্ত হইল ও আমরা প্রশস্ত ধাতুপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম। দেখিলাম নগরেব প্রধান বাজপথেব পার্শ্বস্থিত একটি বৃহৎ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। গৃহের মধ্যভাগে মলিন শয্যায় বৃহদাকার মলিন উপাধানে দেহভার জুস্ত কবিয়া কৃষ্ণকায় বিরলকেশ জটনৈক মনুষ্য অর্দ্ধশায়িত বা অর্দ্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাব পশ্চাতে শ্রোহনির্ম্মিত বৃহদাকার আধাবলম্ব স্থাপিত রহিয়াছে। গৃহেব উত্তর পার্শ্বে ও

সম্মুখে প্রাচীরের নিম্নার্দ্ধ রক্তবস্ত্রমণ্ডিত ও অপবার্দ্ধ স্বর্ণ ও বজ্রনির্ম্মিত অলঙ্কার ও তৈজসরাশিতে আবৃত রহিয়াছে। গৃহস্বামীব দক্ষিণপার্শ্বে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ জন শিল্পী নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে ও অপব পার্শ্বে ছয় কি সাত জন শিল্পী স্বর্ণবেণু হইতে স্বর্ণ মুদ্র প্রস্তুত করিতেছে। একজন শিল্পী স্বর্ণকণা লইয়া নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন করিতেছে এবং পরে অগ্নি সংযোগ কবির তাহা গলাইতেছে, দ্বিতীয় শিল্পী গলিত স্বর্ণ লইয়া কাষ্ঠাধারে নিক্ষেপ কবতঃ স্বর্ণদণ্ড নির্মাণ কবিতেছে, তৃতীয় শিল্পী লৌহদণ্ডেব আঘাতে সেগুলিকে প্রশস্ত কবিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি তীক্ষ্ণধাব অস্ত্রের সাহায্যে চতুর্দণ্ড স্বর্ণদণ্ডসমূহ প্রস্তুত কবিতেছে, পঞ্চম ব্যক্তি তুলাদণ্ডেব সাহায্যে চতুর্দণ্ড স্বর্ণদণ্ডগুলিকে ওজন কবিতেছে ও ষষ্ঠ ব্যক্তি একএকটি স্বর্ণদণ্ড লইয়া তদুপরি একটি লৌহদণ্ড দ্বাৰা আঘাত করিতেছে ও প্রত্যেক স্বর্ণদণ্ড লইয়া ধাতুপাত্রে নিক্ষেপ কবিতেছে। মধ্যে মধ্যে জনৈক দাস আসিয়া বিপণী-স্বামীব সম্মুখে হইতে হেমকণাপরিপূর্ণ ধাতুপাত্র লইয়া প্রথম শিল্পীর সম্মুখে স্থাপন করিতেছে ও ষষ্ঠ শিল্পীর নিকট হইতে নূতন স্বর্ণমুদ্রাপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া বিপণীস্বামীব নিকট লইয়া যাইতেছে। গৃহের চতুর্দিকে ক্রেতা ও বিক্রেতার্য্য বিপণীস্বামীব সহকারিগণের সম্মুখে বসিয়া নগরের কোলাহল বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদিগের অধিকারী চর্ম্মপেটিকা হইতে আমাদিগকে ধাতুপাত্রে নিক্ষেপ কবিলে বিবলকেশ দস্তাবেহীন বিপণীস্বামী ঈষৎ হাস্য করিল ও বিনা বাক্যব্যয়ে আশাবটিকে তুলাদণ্ডে স্থাপিত করিল। ওজন নির্ণয় হইলে মূল্য লইয়া বিপণীস্বামী ও আমাদিগেব অধিকারী ক্ষুদ্র বাক্যবৃদ্ধের অবতারণা করিল। অবশেষে বিপণীস্বামী আমাদিগেব অধিকারীকে কতকগুলি নূতন স্বর্ণমুদ্র প্রদান কবিলে তিনি গৃহ পরিত্যাগ কবিলেন। জীবনে আঃ কখনও তাঁহাব সাক্ষাৎ পাই নাই। কিয়ৎক্ষণ বিপণী-স্বামীব শয্যাব উপবে ধাতুপাত্রে পতিত ছিলাম, তাহাব পর কৃষ্ণবর্ণ একজন দাস আসিয়া পাত্র সহিত আমাদিগেব একজন শিল্পীব নিকট লইয়া গেল, সে ব্যক্তি অবিলম্বে আমাদিগকে নূতন আর্দ্র মৃৎপাত্রে নিক্ষেপ কবিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডমধ্যে স্থাপন কবিল। অগ্নিব উত্তাপে আর্দ্র মৃৎপাত্র

শুরু হইয়া গেল, কোমল পাত্র অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। অগ্নির উত্তাপ ক্রমশঃ আমাদিগকে স্পর্শ করিল, আমরা আনন্দে উদ্ভূত হইয়া উঠিলাম, আমাদিগের দেহে এক অননুভূতপূর্ব শক্তিব্যাবির্ভাব হইল। ক্রমে আমাদিগের কঠিন দেহও কোমল হইতে আরম্ভ হইল, পরিশেষে উত্তাপের আনন্দে একেবারে গলিয়া গেলাম। শিল্পী তখন লৌহনির্মিত অস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় শিল্পীর নিকট প্রদান করিল, আমরা শীতল তৈলাক্ত কাষ্ঠাধারে নিক্ষিপ্ত হইলাম। শীতল বায়ু স্পর্শে আমাদিগের দেহ কঠিন হইতে আরম্ভ হইল ও ধীরে ধীরে আমবা কাষ্ঠাধারের আকারের অনুরূপ দণ্ডে পরিণত হইলাম। তখন তৃতীয় শিল্পী একএকটি দণ্ড লইয়া লৌহদণ্ডের আঘাতে তাহাদিগকে প্রশস্ত করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহা চতুর্থ শিল্পীকে প্রদান করিল। তীক্ষ্ণধার ছেদনক ও লৌহমুদগর লইয়া শিল্পী তাহা হইতে চতুষ্কোণ স্ববর্ণখণ্ড কর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল ও অতি ক্ষয়কাল মধ্যে সেগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ স্ববর্ণখণ্ডে পরিণত করিয়া পঞ্চম শিল্পীকে প্রদান করিল। এক একটি চতুষ্কোণ স্ববর্ণখণ্ড তুল্যদণ্ডে ওজন করিয়া আবশ্যকমত কোন কোনটি হইতে শিল্পী কিয়দংশ কর্তন করিতেছিল। অবশেষে সমান ওজনের স্ববর্ণচতুষ্কগুলি ষষ্ঠ শিল্পীকে প্রদান করিতেছিল। ষষ্ঠ শিল্পী হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড প্রত্যেক স্ববর্ণচতুষ্কের উপর রাখিয়া লৌহমুদগর দ্বারা তাহাব উপরে আঘাত করিতেছিল। ইহাতে প্রত্যেক স্ববর্ণ চতুষ্কের উপরে একটি হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যাইতেছিল। শিল্পীর সম্মুখস্থিত ধাতুপাত্রটি স্ববর্ণ-মুদ্রায় পরিপূর্ণ হইলে একজন দাস আসিয়া পাত্রসমেত বিপণীস্বামীর সম্মুখে লইয়া গেল। এই সময়ে বিপণীর অধিকারী জনৈক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল “উগ্রসেন, আজ মধ্যাহ্নে রাজসভায় লক্ষ স্ববর্ণখণ্ড উপস্থিত করিতে হইবে, তাহার কতগুলি প্রস্তুত হইল ওজন করিয়া দেখ।” উগ্রসেন উত্তর কবিল “শিল্পিগণ চারিদিন পরিশ্রম করিতেছে, বোধ হয় লক্ষাধিক স্ববর্ণ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।” এই বলিয়া সে ব্যক্তি আসন্ন ত্যাগ করিল ও বিপণীর

অধিকারীর পশ্চাতে যে বৃহৎ লৌহনির্মিত আধারগুলি ছিল তাহার দুইটি লৌহশলাকা দ্বারা উন্মুক্ত করিল। প্রত্যেক আধারের দুইটি দ্বার দুই পার্শ্বে সবিন্য গেল। তখন দাসগণ তাহাব মধ্য হইতে দশটি কি দ্বাদশটি চর্মনির্মিত পেটিকা বহির্দেশে আনয়ন করিল। তদনুযায়িত নূতন স্ববর্ণমুদ্রা-গুলি গণিত হইলে বিপণীস্বামী আশ্চর্য হইল। দশটি বৃহৎ বজ্রাধারে লক্ষ স্ববর্ণমুদ্রা আবদ্ধ হইল ও অবশিষ্টগুলি পুনরায় লৌহাধারে প্রেরিত হইল। অনেকের সহিত আমিও বজ্রাধারে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কতক্ষণ বজ্রাধারগুলি বিপণীস্বামীর সম্মুখে পতিত ছিল তাহা স্মরণ নাই। বহুক্ষণ পরে কে যেন আমাদিগকে উত্তোলন করিল এবং অপর কোনও স্থানে লইয়া চলিল। রাজপথের জনশ্রোত ধীরে ধীরে অভিক্রম করিয়া বহুদূর গমন করিল। দ্বিতীয় গৃহমধ্যে প্রবেশকালে কে যেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল “কি লইয়া যাইতেছ?” তাহারা উত্তর করিল “স্ববর্ণবণিক মাধবসেন রাজসকাশে স্ববর্ণ প্রেরণ করিয়াছে, তাহাই লইয়া যাইতেছি।” তখন প্রশ্নকর্তাদিগের মধ্যে একজন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল ও একটি অন্ধকার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দ্বিতীয় একজন কর্মচারীর নিকট বাহক-গণকে বাধিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। রাজকর্মচারী বাহক-গণের মধ্যে একজনকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। —“তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?” “স্বর্ণকার মাধবসেনের বিপণী হইতে।” “কি আনিয়াছ?” “লক্ষ স্ববর্ণমুদ্রা।” “কি উদ্দেশ্যে?” “রাজাদেশাঙ্কসারে।” “কি আদেশ ছিল?” “অন্ত মধ্যাহ্নে রাজসভায় লক্ষ স্ববর্ণমুদ্রা উপস্থিত করিতে হইবে।” “মূল্য পাইয়াছ?” “আবশ্যকমত স্ববর্ণ ও রজতকণা ভাণ্ডাব হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, পারিশ্রমিক স্বরূপ দশমাংশ এখনও প্রেরিত হয় নাই।” “তোমার নাম?” “উগ্রসেন।” “পিতার নাম?” “কুঙ্গসেন।” “নিবাস?” “প্রধান রাজপথে মাধবসেন স্বর্ণকারের বিপণীতে।” ইহার পর বাহকগণ বজ্রাধারগুলি লইয়া অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। রাজকর্মচারী তাহাদিগকে গৃহতলে বজ্রাবাসগুলি রাখিতে আদেশ করিল। তাহারা বজ্রাধাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে সশব্দে গৃহের দ্বার বন্ধ হইল। শব্দ

তুনিয়া ঝুঝিলাম কবাট ধাতবপদার্থে নির্মিত। অন্ধকার গৃহমধ্যে কতক্ষণ ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। বহুক্ষণ পবে পুনরায় সশব্দে দ্বার উন্মুক্ত হইল, কয়েকজন মনুষ্য আসিয়া বজ্রাধাব সমেত আমাদিগকে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

যাহারা আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহারা ক্রমশঃ অন্ধকারময় গৃহগুলি পরিত্যাগ করিয়া আলোকময় বহুজনাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছিল। সময়ে সময়ে জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। তখন একব্যক্তি সুবর্ণবাহক-গণের পুরোবর্তী হইয়া উচ্চৈঃস্ববে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল “ব্রাতৃগণ, পথ ছাড়িয়া দাও, আমরা পুরুষাজের আদেশে তাঁহার ঈপ্সিত দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি।” তখনই শত শত কণ্ঠ পৌরবরাজ্যেব ধ্বনি করিয়া উঠিল, বাহকগণ আমাদিগকে লইয়া কিয়দূর অগ্রসর হইল। এইরূপে বারংবার পথরুদ্ধ হইয়া বাহকগণের গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। চতুর্দিকে অশ্বের হেঁয়াল ও ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, জনকোলাহলের মধ্যে অবিরাম ধাতব-পদার্থের ঝন্ঝনা আমাদিগের কর্ণে আসিতেছিল, আমরা না দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছিলাম মানবগণ কোনও অসামান্য কারণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সুবর্ণবাহকগণের সহিত যে রাজকর্মচারী আসিয়াছিলেন তিনি কিয়দূর গমন করিয়া তাহাদিগকে সুবর্ণবাশি ভূমিতে রাখিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঝুঝিলাম যে তিনি পাষাণাচ্ছাদিত পথে চলিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অপর একজন মানবের আদেশে বাহকগণ আমাদিগকে উত্তোলন করিল, পথের পাষাণে তাহাদিগেব চর্মপাছকা ধ্বনিত হইতেছিল। স্থানটি নীচব, নিম্নক, কিন্তু তথাপি বোধ হইতেছিল, বহু মানব সেই স্থানে একত্র হইয়াছে। হঠাৎ পূর্বোক্ত রাজকর্মচারী বলিয়া উঠিলেন “পৌরবরাজের জয় হউক, মাধবসেন শ্রেষ্ঠী লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া তাড়াতার প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা রাজ-সকাশে আনীত হইয়াছে।” তখন একসময়ে বিংশতিজন

বাহক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুতমণ্ডিত গৃহতলে পাতিত করিল, শুভ্র দিবালোক আমাদিগের বক্ষে প্রতিকলিত হইল। গৃহটিকে উজ্জলতর করিয়া তুলিল। লক্ষ সুবর্ণখণ্ডের মধুন নিকণ দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া তুলিল। দেখিলাম প্রমত্ত গৃহতলে বহু মানব দণ্ডায়মান বহিয়াছে। সুবর্ণপাষাণ-নির্মিত স্তম্ভশ্রেণীর উপরে উজ্জল রজতনির্মিত চক্রাতপ স্থাপিত; গৃহের একপ্রান্তে কয়েকখানি কাষ্ঠাসনে কয়েকজন মনুষ্য উপবিষ্ট রহিয়াছে; সুদীর্ঘ গৃহতলেব অবশিষ্টাংশ দণ্ডায়মান মনুষ্যশ্রেণীতে পরিপূর্ণ; গৃহের এক পার্শ্বে জনসম্মুখ অপসারিত করিয়া আমাদিগের নিমিত্ত স্থান সংগৃহীত হইয়াছিল। গৃহস্থিত মানবগণ সকলেই উজ্জল ধাতুনির্মিত আবরণ পরিধান করিয়া ছিল এবং সকলেই হস্তে ধাতুনির্মিত দণ্ডাকাব আয়ুধ ধৃত ছিল। সকলেই যেন কাহারও আগমন-অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া আছে, সকলেই যেন আশুবিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, কিন্তু কাহারও মুখে ত্রাস বা ভীতিব চিহ্ন নাই। গৃহপ্রান্তে যে কয়জন ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন তাহাদিগের মধ্যস্থিত একজন, আমাদিগকে-আনয়নকারী রাজকর্মচারীকে কহিলেন, “ভদ্র, তুমি শুভ সংবাদ আনয়ন করিয়াছ। এই দৃশ্যের যবনযুদ্ধে প্রথম ভরসা আসি এবং দ্বিতীয় ভরসা ইলগুরের শ্রেষ্ঠীগণের সুবর্ণবাশি, আমি দূরতাপ্রযুক্ত সুবর্ণখণ্ডগুলি দেখিতে পাইতেছি, তুমি একমুষ্টি আমার নিকটে লইয়া আইস।” কর্মচারী কিয়ৎক্ষণ অধেষণের পর সুবর্ণতুপ হইতে সর্বাঙ্গসুন্দর দশটি সুবর্ণমুদ্রা লইয়া রাজার নিকটে গমন করিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মুদ্রাগুলি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা সুবর্ণ-খণ্ডগুলি পরীক্ষা করিয়া দক্ষিণহস্তে আমাকে গ্রহণ করিলেন। পূর্বে একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি অতি সুন্দর। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে জগতের রমণীমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিও আমি সুন্দর কিনা। আমি জন্মাবধি সুন্দর। শৈশবে যখন পার্কৃত্য নির্ঝরিলীর পার্শ্বে পাষাণবক্ষে আবদ্ধ ছিলাম তখনও আমি সুন্দর, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্য তখন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির হায় দৃষ্টির অগোচর ছিল। যখন পাষাণবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জলবাশির সহিত শত শত যোজন পার্কৃত্য পথ অতিক্রম

কবিরাছিলাম তখনও আমি সুন্দর, তখনও আলোকের প্রথম রশ্মি আসিবে আমাদের সন্ধান কবিতা ও আমাদের দেখিয়া হাত্রে দিক উজ্জ্বল কবিরা তুলিত। বনপথেও আমি সুন্দর, মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে শুভ্র বালুকাবাশিৰ মধ্যে অগ্নিস্থলিঙ্গের স্তায় উজ্জ্বল আমার অবয়ব দেখিয়া মোহে লালসায় প্রথমদৃষ্ট মানবের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মাধবসেনের বিপণীতে যখন আমরা আকারে পরিবর্তিত হইয়া সুবর্ণমুদ্রায় পরিণত হইয়াছিলাম তখন যেন আমাদেরিগের কৈশোব অতীত হইয়া যৌবন আসিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রাব মধ্যে তখনও আমি অতি সুন্দর। সর্কাপেক্ষা আমার বর্ণ হরিত্রাভ, মাধবসেনের শিল্পিগণ আমাকে অতি যত্নের সহিত সমচতুষ্কোণ করিয়া কর্তন কবিয়াছিল, ইলপুর নগরের চিহ্ন হস্তীৰ মুক্তি আমার দেহে সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, পৌরববাজের রক্তাভহস্তে আমি যেন সদ্যঃপ্রস্তুত কমলেশ স্তায় হাস্য করিতেছিলাম।

পুত্ররাজ দক্ষিণহস্তে আমাকে গ্রহণ করিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন ও গৃহতলে দর্ভশয্যায় উপবিষ্ট এক কদাকার বৃদ্ধের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন, “আচার্য্য, নগরবাসী শ্রেষ্ঠিগণেব স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সুবর্ণবাশির প্রথম খণ্ড আপনায় চরণপ্রান্তে রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট যবনযুদ্ধে নিয়োজিত করিবার অহুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আশীর্বাদ করুন পৌববসেনা যেন জয়দৃষ্ট অরতিচম্ব কুববর্বেব মকপ্রান্তে রাখিয়া আসিতে পারে। যবনসেনা এক অদ্ভুত বালক-বীবেব চালনায় ঐরাণের প্রবল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া বাহ্লীক গান্ধার ও শকদ্বীপ রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া পবিত্র পঞ্চনদে পদার্পণ করিয়াছে। পৌরবসেনা যদি বণে পরাধুখ হয়, পুত্রবংশীয়গণ যদি আত্মবিস্তৃত হইয়া বণে পশ্চাৎপন্ন হন, তাহা হইলে অপ্রতিহতবেগে দুর্বারবৈরীবাহিনী উত্তরাপথ পদানত করিবে। শুনিয়াছি মগধে শূদ্ররাজ প্রবল পরাক্রান্ত, হয় ত যবনসেনা তাহাব বারণশ্রেণী দেখিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কবিবে, কিন্তু পুরু যত ও মদ্রবংশ কুকক্ষেত্রের মহাবুদ্ধের কাল হইতে উত্তরাপথেব প্রতীহাববক্ষী, যবনসেনা যদি রুদ্ধদ্বাব মুক্ত কবিত্তে পাবে, যদি পঞ্চাগলবিশিষ্ট পঞ্চনদ যবনের পদানত হয়, তাহা হইলে আধ্যাবর্ন্তে দেবতা ও ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব বক্ষা করা কঠিন হইবে। আশীর্বাদ

করুন যবনসেনা যেন অম্বরপুত্রকগণের সরস্বতীতীর পর্য্যন্ত বিতাড়িত কবিয়া দিতে সক্ষম হই।” রাজা পুনবায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব চরণতলে পতিত হইলেন। বৃদ্ধ আসন হইতে উত্থিত হইলেন, বৃদ্ধের জবাঞ্জীর্ণ কম্পমান হস্ত বাজাব মস্তকে স্থাপিত হইল। বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সকলে শুনিতে পাইল না, তিনি বলিতেছিলেন “রাজন, আমি আশীর্বাদ করিতেছি আপনি জয়যুক্ত হইয়া পৌরবপুবে প্রত্যাবর্তন করুন, পৌববসেনা যেন আততায়ী যবনকে সুবজ্জনদীবে পরপারে বিতাড়িত কবিত্তে সমর্থ হয়। অশীতিবর্ষ পূর্বে বাল্যকালে পবিত্র পঞ্চনদে ঐবাণদেশীয় যবনেব অতিভার দেখিয়াছিলাম, তখনও পবিত্র ক্ষেত্রে যবনেব অত্যাচাবে দেবতা ও ব্রাহ্মণের অশেষ দুর্দশা ঘটিয়াছিল। সোমবংশীয়গণের বাহুবলে ঐবাণীয় যবন উত্তরাপথ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। যে নূতন যবনসেনা আসিতেছে তাহাবা ঐরাণ দেশের পশ্চিমসীমান্তস্থিত যোন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। শক্তিশালী মুষ্টিমেয় যবনসেনা ঐরাণের পরাক্রান্ত প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে, আত্মরসম্রাট দরিয়াবুশ্ মহানদীবে পরপারে হীনাবস্থায় নিহত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু ঐবাণে ক্ষত্রবল বহুদিন ক্ষীণ হইয়াছে। শকদ্বীপ, বাহ্লীক, কপিশা, গান্ধার ও তক্ষশিলা যবনের নিকট শিব অবনত করিয়াছে সত্য, মুষ্টিমেয় যবনসেনা দুর্জয়ের বরুণপর্কত অকিাব করিয়াছে সত্য, দুস্তর সিংহনদের উত্তাল তবঙ্গরাশি যবনসেনার গতি-রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই তাহাও সত্য, যাদবমজ্জরাজগণ যবনরাজের পদানত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পৌরব সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সিদ্ধ বিত্ততা ও ইবাবতীর তটবক্ষায় খ্যাতিলাভ করিয়াছে; শত্রু যবনসেনা দুর্দান্ত, কিন্তু পৌরবসেনাও শান্তিপ্রিয় নহে, দুর্জয় হস্তে অসিধাবণ করে না। বৎস, সিদ্ধ অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু হিমালীতনয়া বিত্ততা বিশালবক্ষ বিস্তার করিয়া শত্রুবাহিনীকে বাধা প্রদান করিবে, পৌববগণ, বিত্ততার পবিত্র তটে মাতৃভূমির রক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। সপ্ততিবর্ষ পূর্বে এক যবনযুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য বিস্তৃত হইয়া অসিধারণ করিয়াছিলাম, জীবনের পরপারে আসিয়া দ্বিতীয় যবনযুদ্ধেও অসিধারণ করিব।” তাহার পর বৃদ্ধ কি বলিতেছিলেন তাহা আর কাহারও স্মৃতিগোচর

হইল না, লক্ষ লক্ষ বজ্রনির্দেব জ্বায় সমবেত জনসঙ্ঘের জয়ধ্বনি তাহা ডুবাইয়া দিল। জয়নির্ঘোষে পাষণনির্মিত সভাগার কম্পিত হইয়া উঠিল। বহির্দেশে সমবেত পৌরব-সেনা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি কবিতা উঠিল। নগরে যাহারা যবনবাজের চরিত্ররূপ তক্ষশিলানগর হইতে আসিয়াছিল, তাহারা বুদ্ধিল পৌরব সোমবংশের সম্মান রক্ষা করিবে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে পৌববসেনা বিতস্তার পূর্বতীবে যবনকে পাদক্ষেপ করিতে দিবে না। কোলাহল শান্ত হইবার পূর্বেই উপবিষ্ট পৌরবকুমারগণ একে একে বুদ্ধের চরণে প্রণত হইলেন। তখন রাজার আদেশে যুদ্ধযাত্রার ব্যয়নির্বাহ কবিবার জন্ত গৃহতলেব সুবর্ণরাশি সেনানীগণের মধ্যে বিতবিত হইল। সমবেত বোদ্ধ মণ্ডলীর সহিত বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষীণ কটিতটে দীর্ঘ অসি বন্ধন করিয়া সভাগার হইতে নির্গত হইল।

নগর হইতে সমস্ত দিন দলে দলে পৌববসেনা বিতস্তা অভিযুগে অগ্রসর হইল, আমাব অধিকারী ব্রাহ্মণও অধারোহণে রাজপ্রতীহার রক্ষীগণের সহিত সমস্তদিন চলিয়া সন্ধ্যাব প্রাক্কালে সম্ভ্রবৎ বিশাল বিতস্তাতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর পবপাবে স্নিগ্ধতীব হইতে আনীত যবননৌবাহিনী কীলকবদ্ধ বহিয়াছে দৃষ্ট হইল। সমগ্র যবনসেনা তখনও তক্ষশিলা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। পৌরবসেনা রজনী অতিবাহনের জন্ত স্কাবাব স্থাপন কবিল। চরণপ্রতিবুদ্ধে যবনসৈন্তের গতিবিধির সংবাদ আনয়ন করিতে লাগিল। যবনসেনা তখনও তক্ষশিলাব পথে, যবনগণ পরপাবে সমগ্র বাহিনীর জন্ত শিবির স্থাপন করিতেছে শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া পৌরবসেনা আহার ও বিশ্রামলাভের চেষ্টায় ব্যাপ্ত হইল। নিশীথে চবগণ আসিয়া পুরুবাজকে জানাইল যে যবনরাজ্যেব নেতৃত্বে সমগ্র যবনসেনা পরপারে উপস্থিত হইয়াছে। প্রভাতে নদীৰ উভর পারে উভর পক্ষীয় সেনা যুদ্ধসজ্জায় সম্বিভ হইয়া অপেক্ষা কবিত্তে লাগিল। সমস্তদিন অতীত হইয়া গেল, যবনসেনা নদীপার হইবার চেষ্টা কবিল না। পৌরবকুমারগণ সেনা লইয়া নিতন্তানদীর উত্তরে ও দক্ষিণে যে যে স্থানে নদী পার হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা রক্ষা করিতেছিলেন। বিতস্তাতীরে স্কাবাবে সপ্তাহ অতীত

হইয়া গেল, যবনরাজ নদী পার হইয়া পৌববসেনাব সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না।

তাহার পব যাহা হইয়াছিল তাহা ইতিহাসভূক্ত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতায় আর্ধ্যাবর্তের চিবকাল সর্বনাশ হইয়া আসিয়াছে, জগজ্জয়ী অসাধারণ যুদ্ধনীতিরূপ যবন-সম্রাট বর্ষাগমে ক্ষীতবক্ষ বিতস্তা নদীর প্রসার এবং পরপারে সমবেত পৌরবসেনার আকাব দেখিয়া সৈন্ত-চালনা কবিত্তে ভরসা কবেন নাই। পৌববগণেব জীর্ষাকাতব উত্তরাপথবাসী কোন কুলাক্রাবই বিতস্তা উত্তরণেব উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যবনসম্রাটকে সংবাদ দিয়াছিল। যবনবাজ কিরূপে নিশাযোগে পলায়ন কবিয়াছিলেন, কিরূপে নৈশ অন্ধকার ও বজ্রবাতের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া অধিকাংশ যবনসেনা বিতস্তা বক্ষস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপের আশ্রয়ে আশ্রয়গোপন কবিয়া নদী পার হইয়াছিল তাহা ইতিহাসভূক্ত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে পৌরবকুমার মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া যবনবাহিনীর গতিবোধের উত্তমে সসৈন্যে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন, যাবনিক ইতিহাসের পত্রে পত্রে তাহাব বিবরণ দেখিতে পাইবে। প্রভাতে যবনরাজ্যেব পলায়নসংবাদ পাইয়া পুরুবাজ ক্রতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিরূপে পবদিন পথশ্রান্ত ক্লান্ত আত্মীয়গণের নিধনে শোকাবুল পৌরবসেনা জয়োল্লাসে বনীয়ান যবনবাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাও ইতিহাসের কথা। বিতস্তাতীরে হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতি-সম্বলিত পৌরবসেনা ধ্বংস হইলেও পুরুবাজ যুদ্ধক্ষেত্র পবি-তাগ করেন নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন পৌববসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। পুরুবাজ অস্ত্রাঘাতে মুচ্ছিত হইলেও রাজহস্তী তাঁহার দেহ বক্ষা কবিয়াছিল অস্ত্রহীন অবস্থায় রক্তপাতে পিপাসার্ত হইয়া পুরুবাজ যবনহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রারম্ভেই আমার অধিকারী বুদ্ধ ব্রাহ্মণ যবনহস্তনিষ্কপ্ত শূলে বিদ্ধ হইয়া শিলাখণ্ডের পার্শ্বে পতিত ছিলেন। যুদ্ধান্তে যবনসেনা যখন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তখনও তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া জনৈক শক মুঘলাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া তাঁহার বজ্রাঞ্চল হইতে আমাকে গ্রহণ করিয়া কটদেশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তখন হইতে আমি যবনসেনার সহচরী হইয়াছিলাম।

শ্রীরাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত-ইতিহাসের জন্মকথা

১। ভূসংস্থান।

এখনও আমরা ইতিহাসের নামে অনেক স্থলে কেবল কয়েকজন রাজার জীবনচরিত পড়িয়া থাকি; রাজার ইতিহাসে জনসাধারণের কথা যতটুকু প্রতিকলিত থাকে, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে বাধ্য হই। রাজা ত জনসাধারণের একজন মাত্র; তিনি নায়ক হউন বা প্রতিভূ হউন, কেবলমাত্র তাঁহার কথায় লোকসাধারণকে চিনিতে পারি না। জনসাধারণের ইতিহাসই দেশের বার্থ ইতিহাস। অল্পদিকে আবার জনসাধারণের উন্নতি বা অবনতি বহু পরিমাণে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই ভক্ত আমাদের জনিত, জননাস্পদ বা জন্মভূমির আদিম ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। এই “দেশের মাটি” এবং “দেশের জল” কত দিন হইতে কি ভাবে আমাদের কাছে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে স্ফুটানি কথ্য বলিয়া লইব।

ভারতবর্ষের যে দক্ষিণ বিভাগ এখনও উপদ্বীপ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, ঐ ভূভাগের সৃষ্টি আমাদের দেশ-সৃষ্টির প্রথমে হইয়াছিল। অস্তিত্ব: আড়াই কোটি বৎসর পূর্বে দেশসংস্থানের আদিযুগে ঐ দক্ষিণ ভারত বা ভারত-উপদ্বীপের সৃষ্টি। ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সহিত পবিচয় না থাকিলে এই কথাগুলি বুঝা কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে। যাহারা নিজে ঐ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন না, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে পারি যে আমি অতিসাবধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-নির্গের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের কথাই লিখিয়াছি।

দেশসংস্থানের বয়সের কথায় কেহ যেন এই সমগ্র ধরিত্রী সৃষ্টির কথা না বুঝেন। খুব ন্যূনকল্পে এই ধরিত্রীর জন্ম প্রায় ছয় কোটি বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। যে “নীহারিকা-গোলক” হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি, তাহা যখন প্রথম পৃথিবীরূপে পরিণত হয়, তখন প্রথমে পৃথিবীর “কঠিন আবরণের” সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত পৃথিবীর নীহারিকা-গোলকে যখন তাপ অনেক কমিয়া গিয়া ১১৭০° (C)

হইয়াছিল, তখন কঠিন আবরণের সৃষ্টি হয়। তাহার পর যখন উত্তাপ কমিতে কমিতে ৩৭০° ডিগ্রিতে দাঁড়াইল, তখনই জল বা সমুদ্রের সৃষ্টিব আরম্ভ। পৃথিবীর ইতিহাসে জলের জন্মের পর স্থলের জন্ম নহে। উত্তাল তবজ-মালাসঙ্কুল ভীমদর্শন সিদ্ধকে স্বাভাবিক কল্পনার বিরুদ্ধে জোর করিয়া রমণী রূপে না হয় কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু উহাকে “আদি জননী” বলিতে পারি না। সৃষ্টির যে যুগে পৃথিবীর এই আদিম বিকাশ হইতেছিল, আমি সে যুগের কথা বলিতেছি না। যখন জলস্থলের বিভাগ এবং পরিবর্তনে দেশ-উপদেশ গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই আদি (Palaeozoic) যুগের কথা বলিতেছি। দক্ষিণ ভারতের জন্মযুগে রাজপুতানা সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল, এবং উহার কূল দিয়া একটি বহুবিস্তৃত এবং বহু উন্নত পর্বতমালা শোভা পাইত। একালের আরাবলী পর্বত সেই অতিবৃহৎ পর্বতের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সেই আদিম যুগ হইতে এ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল প্রায় একই ভাবে রহিয়া গিয়াছে,—বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু ঐ ভূভাগের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক একটি সুবিস্তৃত মহাদেশের অংশমাত্র ছিল, এবং সেই মহাদেশ আফ্রিকার দক্ষিণ সীমা হইতে মলয় দেশ পর্যন্ত ভারত-সাগর ব্যাপ্ত করিয়া বিস্তৃত ছিল। সে যুগে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত, আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তান ব্যাপ্ত করিয়া সমুদ্র-তরঙ্গ সঞ্চালিত হইত।

ঐ যুগে শব্দকাদি জাতীয় কতকগুলি জীব, অল্প দু-চারিটি শ্রেণীর মৎস্য, কতকগুলি উভচর এবং সরীসৃপ জন্মলাভ করিয়াছিল মাত্র। উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী দ্বীপের জন্ম হওয়া দূরে থাকুক, তখনও পর্যন্ত পৃথিবীর আকাশ বিহঙ্গ-গীতে মুখরিত হয় নাই। ধ্যানস্থ সৃষ্টি তখনও মৌনব্রত সাধন করিতেছিলেন।

তাহার পর দ্বিতীয় (Mesozoic) যুগের শেষভাগে যখন ভারতসাগরব্যাপী মহাদেশ হইতে পশ্চিম উপকূল কথঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত প্রায় একটি দ্বীপের মত হইয়া আসিতেছিল, তখনও পৃথিবীতে মনুষ্যের জন্ম হয় নাই। কিন্তু এই যুগে আসামের কিয়দংশ এবং পূর্ব হিমালয়ের সহিত দক্ষিণ ভূভাগের

সংযোগ সাধিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধুর পরপাৰেব প্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশ তখনও জলমগ্ন ছিল।

তাহার পূর যে তৃতীয় (Tertiary বা Cainozoic) যুগে মনুষ্যেব জন্ম, সে যুগেই সিন্ধু এবং গঙ্গাধৌত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে নাই। ঐ উর্বর ক্ষেত্র মানবেৰ লীলাভূমির উপযোগী হইতে তাহার পৰ বড় অধিক দিন লাগে নাই, হয়ত বা আর অতিরিক্ত দশ পনুব হাজার বৎসর লাগিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ প্রাচীন সময়ের যে ভূমি-সংস্থানের কথা বলিলাম, উহার সহিত ভারতবাসীদিগের ইতিহাসের কি সম্পর্ক আছে, তাহা দেখাইতেছি।

২। নরসংস্থান।

যে তৃতীয় যুগের মধ্যভাগে মানবেৰ জন্ম, সেই যুগ বা সেই সময় প্রায় পনব লক্ষ বৎসর হইল অতীত হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের শরীর এই পনের লক্ষ বৎসরেব ক্রমবিকাশের ফল। প্রত্যেক মানবেৰ শরীর বখন পনের লক্ষ বৎসরের আবর্তনে বর্তমান যুগের পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে, তখন চেহারা দেখিয়া মানুষকে যত অল্পবয়স্ক বলিয়া মনে হয়, সে তত অল্পবয়স্ক নহে। সেই সুদূর অতীত মানবেৰ আদি পুরুষ বা আদি “মহু” কোন্ পৃথাতীর্ষ বা ধর্মক্ষেত্রে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি।

ভূত্বরের নরকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া এবং মনুষ্যের জন্মযুগের জলস্থল-সন্নিবেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া নরতত্ত্বজ্ঞ-পণ্ডিতেরা একবাক্য স্বীকার করিতেছেন যে আফ্রিকা এবং এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব ভাগ ব্যতীত অন্ত কুত্রাপি মনুষ্যের আদি জন্মাস্থান নহে। জন্মভূমি হইতে পারে না। অতাবপক্ষেই প্রমাণে স্থিৰীকৃত হইয়াছে যে হিমালয়ের উত্তরভাগে কিবা হিমালয় হইতে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত রেখার উত্তরভাগে তৃতীয় যুগেব মধ্য সময়ে কুত্রাপি মনুষ্যের “অরিষ্টেশ্যা” স্থাপিত হইতে পারে নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে অতি তীক্ষ্ণ বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে মানবেৰ প্রথম জন্ম সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। তিনি দেখিয়াছিলেন যে অন্ত্রজ মানুষেব প্রথম জন্ম স্বীকার করা

চলে না; কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অতি অল্প পরিসর ভূভাগে মনুষ্যের অতিশেষব যুগেব পৰিবর্দ্ধন সম্ভবপর ছিল না। তিনি যদি তখন জানিতেন যে ভাবতবর্ষেব দক্ষিণ ভাগের সহিত সংযুক্ত একটি অতি বিস্তৃত মহাদেশ আফ্রিকার দক্ষিণ সীম হইতে মালেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালেশিয়া হইতে উহার বিস্তার অন্তর্দিকে আবাব অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ছিল তাহা হইলে আদি পুরুষের জন্মপূত ক্ষেত্রটির পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। উল্লিখিত মহাদেশটি যে মানবেব আদি জন্মভূমি, এ কথা স্বীকার কবিবার অল্পকূলে অনেক যুক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অবতারণা সুবিধাজনক নয় বলিয়া একটি সহজবোধ্য যুক্তি কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

বৈবস্বত মনুষ্য জন্মের বহু যুগ পূর্বে বখন আদি লোক-প্রতিষ্ঠাতা “কৈফিক মনুষ্য” হইতে মানববংশ বিস্তার-লাভ করিয়াছিল, তখন ফলভোজী মানবদিগেব এক এক জনেই জন্তু অনেক ভূভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাজেই মানুষেব দল বখন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তখন আহাৰের স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্ত মনুষ্যেরা দলে দলে আদি নিবাস ভাগ কবির দূবে দূবে চলিয়া গিয়াছিল। বাহা বা দূবে দূবে চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা নবরাজ্যে অধিকতর খাড়ালাভ করিয়া অধিকতর উন্নতিলাভ কবিতে পারিয়াছিল। বাহারা প্রাচীন গৃহ বা জন্মভূমিতে পড়িয়া ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই তেমন উন্নতি লাভ কবিতে পারে নাই। স্বভাবতঃ কেহই এর পরিত্যাগ করিয়া অত্রকে আশ্রয় করে না। এইজন্ত মানুষ চিরদিনই একটু রক্ষণশীল। একটু ঠেসাঠেসি করিয়াই অনেক লোক অবশ্য আদি ভূমিতে বাস করিতেছিল এইরূপ বাসেব ফলে যে আদিম গৃহবাসী দলেরা শাবীরিত এবং মানসিক উন্নতি তেমন লাভ করিতে পারে নাই, তাহা মনে করা বাইতে পাবে।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে একদিন ভারতসাগরে যে মহাদেশ বিস্তৃত ছিল, সেইখানেই মানুষেব আদি জন্ম, তাহা হইলে আমাদের জানা ঘটনাসহিত সকল কথা মিলাইয়া লইতে পারা যায় কি না, দেখিলে লওয়া যাক। আমরা যে মহাদেশের কথা উল্লেখ করিলাম,

তাহা এখন সাগরগর্ভে লুপ্ত; কেবল আফ্রিকার প্রান্ত হইতে মালেশিয়া পর্য্যন্ত সে মহাদেশের নিদর্শন স্বরূপে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া রহিয়াছে মাত্র। ঐ দ্বীপগুলির উপর যেসকল আদিম মনুষ্য বাস করিতেছে, তাহাও সকলেই প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদিগের সদৃশ। কেবল শারীরিক আকৃতিতে নয়, উহাদের অনেক প্রকৃতিতে পবম্পরের মধ্যে ভাষা বিষয়েও অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বীপগুলি দূরে দূরে, এবং তাহাদিগের মধ্যে অগাধ দ্বন্দ্ব সাগর বহুকাল হইতে রহিয়াছে। তবুও কেমন করিয়া এই আপাতদৃষ্টিতে নিঃসম্পর্কিত জাতিসমূহের মধ্যে আকৃতিগত এবং ভাষাগত সাদৃশ্যতা রহিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। এক সময়ে যদি উহাও একটি অসংযুক্ত ভূভাগে বাস করিতে পারিত, তাহা হইলেই এই সকল সাদৃশ্য শবীবে ও মনে বদ্ধমূল হইতে পারিত। বখন ভূপ্রলয়ে মহাদেশটি ভাঙিয়া যাইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক নিগ্রো বা নিগ্রোবৎ অধিবাসীরা ছুটিয়া পলাইয়া উত্তরভাগের অন্তান্ত দেশে চলিয়া গিয়াছিল এবং অনেকে প্রাচীন গৃহেই রহিয়া গিয়াছিল। এই কারণেই দুর্লভ্য সাগরের মধ্যে দূরে দূরে অসদৃশ জাতিগণের বাস সম্ভব হইয়াছে।

যাহাও পলাইয়া নিকটস্থ দেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহারাও যে ঐ নিগ্রোদিগের অনুরূপ ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ বিষয়েও একটি সহজ কথা কেবল বলিব। ভারতবর্ষের কোল জাতীয় লোকেরা অন্তান্ত জাতির সম্পর্কে আসিয়া অনেক পবিবর্তিত হইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও কোন কোন বিষয়ে উহারা নিগ্রোদিগের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করা যায়। ভাষা-তত্ত্ববিদেরা ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে কোলদিগের ভাষা অনেক মৌলিক বিষয়ে অতি নিঃসম্পর্কিত এবং অপরিচিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত এবং ভাবতসাগরের দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত মিলিয়া যায়। এইসকল মিল দেখিয়া নিশ্চয়ই পাঠকেরা একথা বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইবেন যে একটি বহুবিস্তীর্ণ মহাদেশ একদিন ভাবতসাগরে অবস্থিত

ছিল এবং সেখানে আদিম মনুষ্য প্রথমে বিকাশলাভ করিয়াছিল। যব দ্বীপে অতি প্রাচীন যুগের নরকঙ্কালের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রাথমিক মনুষ্যের কঙ্কাল বলিয়াও নির্ণীত হইয়াছে।

এই স্থলে কোন কোন পাঠক একটু তর্ক তুলিতে পারেন। তাহাও বলিতে পারেন যে, হাঁ বুঝলাম যে একটা বিস্তীর্ণ মহাদেশের উপর নিগ্রোজাতীয়দিগের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভূবিপ্লবে তাহাও এখন দূবে দূরে বিভিন্ন দ্বীপে বাস করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দল ভারতবর্ষ প্রভৃতি অন্ত দেশেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু কথা এই, যে, যাহাও এক সময়ে ভাবতসাগরস্থিত মহাদেশে জন্মলাভ করিয়াছিল, এবং এখনও তাহাদের শরীরে বিকাশের আদিম যুগের চিহ্নই বহন করিতেছে, অন্ত দেশের লোকদিগের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক হয় নাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ তাহারা বলিতে পারেন যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে (কেহ বা আফ্রিকার দক্ষিণে, কেহ বা ভারতে) স্বতন্ত্র ভাবে মানুষের সৃষ্টি যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরেও কেবল একটি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করা যাইতে পারে। মানুষ মাঝেই যে এক জাতি বা গোষ্ঠী (species) অর্থাৎ একই আদিম মনুষ্য শবীব হইতে যে সকল মনুষ্যের উৎপত্তি, তাহাও এই প্রমাণটি অতিশয় প্রবল যে, যে-কোন দেশের মানুষের সন্ধিত যে-কোন দেশের মানুষের বৈবাহিক সম্পর্ক হইলেই সন্তান উৎপন্ন হইবে এবং ঐ সন্তানগণ আপনাদের নিজের মধ্যে হউক অথবা অন্ত জাতীয় লোকের সহিত হউক, যদি বৈবাহিক সম্বন্ধ কবে, তবে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধিতে কিছুমাত্র বাধা উপস্থিত হইবে না। কোন জীব যদি এক বর্গের (genus) অন্তর্ভুক্ত হয়, অথচ জাতি বা species হিসাবে বিভিন্ন হয়, তবে প্রথমতঃ তাহাদের বৈবাহিক মিলনে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। একটি species বা জাতি যদি অন্ত species বা জাতির সহিত অত্যন্ত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের সংযোগে যে সন্তান জন্মিবে, সে সন্তান জীব উৎপাদক-শক্তিবিবহিত হয়। সমগ্র মনুষ্যজাতির মৌলিক একতা স্বীকৃত হইলে নিগ্রোজাতীয় লোকদিগের

সহিত আমাদের মৌলিক একতা স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইলে ঐ শোষণ জাতির বিকাশভূমিকে আমাদের আদি পিতৃ-লোক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

মহুয়া তাহার প্রথম উৎপত্তির যুগে অনার্য্যে স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিল; একথা ভূসংস্থানের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভাবত-বর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার সমগ্র দক্ষিণভারতে প্রবিচ্যাপ্ত হইতে পারিয়াছিল এবং উত্তর-পূর্ব দিকেও ছোটনাগপুর এবং রাজমহল পাহাড়ের পথ দিয়া আসামের কিয়দংশ ভূভাগে খাসিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ যখন নব যুতিকাপূর্ণ উর্বর ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন যে-ভাগ্যবানরা ঐ অংশ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারও ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া সহজে অন্তর্য চলিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ সমুদ্রের নামে নামাঙ্কিত সিন্ধুনদ তখন প্রায় সমুদ্রের মতই হস্তর ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের শৈলবান্ধি অমুস্তর্য্য প্রকার রচনা করিয়া ছিল।

এসকল কথা আলোচনার পর বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে যেসকল লোক মহুয়ার প্রথম পরিভ্রমণের যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদের কি হইল এবং তাহারা কোথায় গেল? একালের আধাসম্ভান। এবং ত্রিবিধ জাতীয়েরা সেই আদিমকালের লোকদিগের সহিত সম্পর্কিত কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে মহুয়ার আদিম পিতৃলোক এখন অধিক পরিমাণে সাগরগর্ভে নিমজ্জিত। পিতৃকুলের সাগরনিমজ্জিত অস্থির উপর ভারতের গঙ্গাপ্রবাহ এখনও তর্পণবারি ঢালিতেছে। আমরাও পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া ভারতের প্রাচীন জাতিতত্ত্বের অমুসন্ধান প্রবৃত্ত হইব।

৩। ভারতে মানব-প্রসার।

মানবের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে কতকটি কথা বলিয়াছি। তাহার ঐ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধানের কোন বিচার

না করিয়াই উহাকে একেবারে কল্পনাব খেলা বলিত চাহেন, তাহা যদি ঐ উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ করিতে চাহেন, কখন; কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। মহুয়ার উৎপত্তি বা জন্ম যেখানেই হউক না কেন, বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতবর্ষে মানুষের আবাসভূমি হইয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। সহজেই সে কথা প্রমাণ করিতেছি।

অন্ততঃ পক্ষে সাত লক্ষ বৎসর-পূর্বের (Pliocene) যুগে যে ভূস্তর রচিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক স্থান নরকঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ঠিক ঐ যুগের ভূস্তরে ভারতবর্ষে নরকঙ্কাল বক্ষিত আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু যে যুগে মহুয়া প্রায় সকল দেশেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল (Quaternary যুগ), সেই চতুর্থ বা নতুন যুগের ভূস্তরে ভারতবর্ষে নরকঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এ যুগ প্রায় ছয় লক্ষ বৎসর হইল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে, এই সময়ে দক্ষিণ ভারত বা ভারত-উপদ্বীপ এশিয়ার অন্ত অংশ হইতে সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল; এবং তখন দক্ষিণ ভারতের সহিত একদিকে মাদাগাস্কার এবং অন্তর্য্যিক মলয়দ্বীপ-পুঞ্জ সম্পূর্ণ যুক্ত ছিল। এই নতুন যুগের প্রস্তব-অস্ত্রধারী মহুয়া (Palaeolithic man) যখন ভারত-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল, তখনও ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের সহিত তাহাদের যত স্পর্শ ছিল, উত্তর ভারতের সকল স্থানের সহিত তেমন ছিল না। তখন যে হিমালয়ের উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমে ভারতবর্ষ হইতে গতি-বিধি অসম্ভব ছিল, তাহাও সর্ববাদিসম্মত।

যে ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন বেদগ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া থাকি, ভারতে ঐ যুগের উৎপত্তি চারি পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্বে নহে বলিয়া কেহ অমুমান করেন। মিসর দেশে এই ঐতিহাসিক যুগ প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও ঐ ঐতিহাসিক যুগ যদি দশহাজার বৎসর বলিয়া মানিয়া লওয়া যান, তবে প্রাচীনতার অতি পক্ষপাতী লোকদিগেরও কিছু বলিবার থাকিবে না।

তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ মানবের সভ্যতা লাভ করিবার বহুকাল পূর্বে, ভারতবর্ষে মনুষ্যের বাস ছিল। এখন বিচাব করিয়া দেখিতে হইবে যে, সুদূর অতীতে যেসকল বর্ষের মনুষ্য ভারতক্ষেত্রে বিচরণ করিত, এবং বাহার প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়া পর্বত-গুহায় বাস করিত, আমাদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে কি না ?

ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইবার পূর্বে অর্থাৎ দশ হাজার বৎসর পূর্বে আর একটি বাটহাজার-বৎসর-ব্যাপী মানবসভ্যতাব যুগ কল্পিত হয়। এই যুগের একভাগে মনুষ্য জাতি প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্রা দ্বিগুণ উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। অল্পকাল পরেই নবপ্রস্তরযুগের মনুষ্য (neolithic man) সুখসুবিধার নানা উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের এই যুগের লোক যে তৎপূর্ব যুগের লোকের বংশধর, তাহাতে সন্দেহ হইবে না। মানুষ এই যুগে বাগান করিয়া গাছ লাগাইয়া ফল খাইতে শিখিয়াছিল, কৃষিকার্য্য শিখিয়াছিল, কাপড় বুনিতে শুরিত, অনেক খনিজ ধাতু ব্যবহার করিতে পারিত এবং চাকার চুরাইয়া অনেক মাটির পাত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন উত্তর ভারতের নাগা এবং খাসিয়া পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদীমোত প্রদেশে পর্য্যন্ত অনেক পাওয়া যায়। খাঁটি বঙ্গদেশে উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং পঞ্জাবও এ পর্য্যন্ত কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। বিদ্যাপর্ব্বত হইতে দক্ষিণ ভারতের শেষ পর্য্যন্ত অনেকস্থানে এই যুগের মানব-কীর্্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সে কীর্্তি উত্তর ভারতের কীর্্তি হইতে অনেক ভিন্ন। উহার কয়েকটি পরিচয় দিতেছি।

প্রথমতঃ, প্রাচীন প্রস্তরযুগের ইতিহাসের কথা বলিতেছি। ঐ অতি প্রাচীন যুগের মনুষ্যের কীর্্তি-চিহ্ন উত্তর ভারতে তেমন অধিক পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে উহার বাহুল্য অতি অধিক। মাদ্রাজের শেষ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যা প্রদেশে পর্য্যন্ত ঐ সময়ের চিহ্ন অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত Le Mesurier (লে মেসিরিয়ে) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঐ চিহ্ন আবিষ্কার করেন।

তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত Bruce Foot (ব্রুস ফুট), Medlicott (মেডলিকট) প্রভৃতি নর্থদাকুল হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত ভূভাগ হইতে অনেক প্রস্তররচিত অস্ত্র, প্রাচীন গৃহ-সজ্জাব উপকরণ প্রভৃতি বাহির করিয়াছেন। মাদ্রাজ সহরেব অনতিদূরস্থ পল্লাবরম্ নামক স্থানে এবং চিদমলপট্ট, নেলোর ও দক্ষিণ আর্কটে পোড়ামাটি এবং পাথরের প্রস্তুত এক প্রকার শব-শয্যা পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা নবপ্রস্তরযুগের জিনিস। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, ঠিক ঐ প্রকারের শব-শয্যা এখনও পল্লাবরম্ প্রভৃতি স্থানে রমণীদিগের সমাধির জন্য অনেক দ্রবিড়-জাতীয়েরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই কি স্থিতি হয় না, যে, দক্ষিণ ভারতের একালের দ্রবিড়জাতীয়েরা অতি প্রাচীনকালের অধিবাসীদিগেরই বংশধর ? শ্রীযুক্ত Rea (রী) সাহেব ভিনেভেলি জেলার যেসকল প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, এখনও সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। যুক্তদেহ এক প্রকার সঙ্গলবিশিষ্ট যুগপাত্রের পুরিয়া সমাধিস্থ করা হইত। ঐ প্রকারের শব-শয্যা উত্তর ভারতে কুড়াপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

উত্তর ভারতে সুপ্রাচীন প্রস্তরযুগের কীর্্তি বড় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু নবপ্রস্তরযুগ এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগেব অনেক মানব-কীর্্তি আগামের পূর্বভাগ হইতে গাল প্রদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কথাটি পাঠকট্টিককে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। শবের অগ্নিদাহপ্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে উত্তর ভারতে যে-প্রকার সমাধির ব্যবস্থা ছিল, তাহার একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিঙ্গাপুর সহরের অনতিদূরে নবপ্রস্তরযুগের যে সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রস্তরসমাধিটি ১২ ফুট দীর্ঘ এবং উহার মধ্যস্থিত পূর্ণাবয়ব পুরুষের কঙ্কালটি এত দীর্ঘ যে উহা কোন ধর্ম্মাঙ্কিত জাতির মনুষ্যের কঙ্কাল হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এখন অন্তর্জলি করিবার সময়ে কোন পুরুষকে যে ভাবে উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করায়, সমাধির মধ্যে ঐ কঙ্কালটি সেইরূপ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া থাকিত ছিল। মৃত ব্যক্তির নিকটে

শশামে যেমন কলসী দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, কঙ্কালটির নিকট তেমনি মৃত্তিকা-নির্মিত কলসী পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মৃৎপাত্রটি হাতে-গড়া নহে,—কুমারের চাকর প্রস্তুত; এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঘষামাজা। ঐ কঙ্কালটির নিকটে একটি অতি ক্ষুদ্র সুন্দর মৃৎপাত্র একটি ০ ইঞ্চি দীর্ঘ সবুজবর্ণের কাচের পাত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐ অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায়। মিসর এবং বাবিলের ভিন্ন ভিন্ন কোথাও ঐ প্রাচীন সময়ে কাচের ব্যবহার ছিল না বলিয়াই লোকে বলিত; কিন্তু এখন আর তাহা বলিতে পারিবে না। এখনও ভূতরের কঙ্কালগুলি এমন ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই, যাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, যাহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং তাহার পূর্বে ধীরে ধীরে সভ্যতা লাভ করিতেছিলেন, ঐতিহাসিক যুগের আধারা তাঁহাদেরই বংশধর। উল্লিখিত প্রমাণ-গুলির সহিত অগাধ প্রমাণ মিলাইলে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে, তাহা পরে বিচার করিয়া দেখিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্র- নাথের সম্বন্ধনা

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ইংলণ্ডের সাহিত্যে যখন প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল, তখন সেই আলো-অরুণারের সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া কবির চক্ষে এক নূতন জগতের স্বপ্ন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যেমন শেলি। ব্রাউনিংয়ের ভাষায় বলিতে গেলে তাহার সমস্ত কাব্যলোকটি “lies quivering in light as something lieth half of life before God's foot”, ঈশ্বরের চরণসমীপে অর্দ্ধজীবনপ্রাপ্ত কোন বস্তু যেমন আলোকে কাঁপিতে থাকে, তেমনি করিয়া এক ভাবী জগৎসৃজনের নূতন আশার আবেগে এবং বেদনার কম্পিত হইয়াছিল। সেই একই মাহেশ্বরকণে আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থের গায় কোনো কবির কাছে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপরকার পর্দা উন্মোচিত হইয়া গেল

এবং তিনি চাহিয়া দেখিলেন “into the life of things” সেই প্রাণস্বৈর্যঃ সর্বভূতান্তরাঙ্গাকে, যিনি বৃক্ষইব স্তম্ভো দিবি তিষ্ঠতোকঃ—যিনি বৃক্ষের গায় আকাশে স্তম্ভ হইয়া আছেন। সেই অরুণোদয়ে আশা-আনন্দের কোনো পরিমাণ রহিল না; সমস্তই অত্যন্ত উদার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দিল।

তারপরে ভিক্টোরিয়ার যুগে টেনিসন্ ব্রাউনিংএর সময়ে আমরা একেবারে মধ্যাহ্নের জনতার ভিড়ের মধ্যে, প্রবৃত্তি-ফেনায়িত বিচিত্র জীবনের তরঙ্গান্দোলনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তখন স্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে তখন মুখোমুখি পরিচয়। বিজ্ঞান প্রত্যাহই বিশ্বপ্রকৃতির নূতন নূতন রহস্তের বার্তা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে। রাষ্ট্রে সমাজে কত পরিবর্তনের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে হাটের কলরবের মাঝখানে আমরা মানুষের বিচিত্ররূপ দেখিলাম—দূরদেশে, দূরকালে ব্যাপ্ত করিয়া তাহার সমস্ত মহত্ত্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, তাহার কল্পনার গুহাগতি, তাহার প্রেমের নিবিড় অতলতা প্রত্যক্ষ করিলাম।

তারপর, দিন অবসান হইল। বাস্তবেই বাস্তবের পরি-সমাপ্তি এক কথা আর সত্য রহিল না। যে মধ্যাহ্নের প্রখর দিবালোক আর কখনও গ্লান হইবে না মনে হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার উপর সন্ধ্যার ঘোর নিবিড় হইয়া আসিল। হঠাৎ বিজ্ঞান দেখিল যে অগুর রহস্তের দিক্ দিয়াও শেষ নাই আবার জীবজগতের সারভূত মস্তিষ্কের জীবকোষের রহস্তেরও কোথাও শেষ নাই। অসীম রহস্ত। জড় জীবে যে কল্পিত ব্যবধান ছিল তাহাও বুঝি ভাঙে ভাঙে। তত্ত্বজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিল, যে, তত্ত্ব মানে ভৌ-স্থিতির কথা,—কিছু আছে ইহা বলা—কিন্তু জীবন যে ক্রমাগতই চলিয়াছে—সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনো তত্ত্বই শেষ কথা হইতে পারে না। দ্বৈত, অদ্বৈত, ওসবই স্থিতির কথা। অনন্ত স্থিতি এবং অনন্ত গতি ইহারি একটি সামঞ্জস্যের জায়গা হইতেছে চেতনাময় জীবন। এমন করিয়া বাস্তবের সমস্ত রূপ, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার রহস্তের ঘোরে অত্যন্ত ঘোরালো হইয়া দেখা দিল।



কবি উইলিয়াম বাটলার য়ীটস্।

এখন তবে কিসের কথা কবিতা গাহিবে? এখন যে রহস্তের হাওয়া দিয়াছে। এখন স্রুত্বের কথা, গভীরের কথা, অনন্ত আকাশের নক্ষত্রসভার নিবিড় নিস্তব্ধতার কথা। অনেকের কথা নয়, একের কথা; বিচিত্রের কথা নয়, পূর্ণের কথা; সীমার কথা নয়, অসীমের কথা। ইউরোপীয় ভাবুকেরা সেই কথা বলিবার জ্ঞান আঁকুপাঁকু করিতেছেন;—কিন্তু হায়, ধূম ষতটা তৈরি হইতেছে, অগ্নিশিখা ততটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতেছে না; রহস্তের ঘোর ষতটা জমিয়া উঠিতেছে, নিশ্চয়তার প্রত্যয় ততটা জাগিতে পারিতেছে না। মেটরলিক প্রভৃতি আধুনিকদের লেখা পড়িলে এক মুহূর্তেই তাহা বুঝা যায়।

কবি য়ীটস্ (Yeats) ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের এই সন্ধ্যাকালের ঘোরের কবি। তাঁহার মধ্যে এই অনিশ্চয়তার ব্যাকুলতা আছে। অবশ্য তাঁহার সৌন্দর্যের অনুভাব খুব গভীর। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে তাঁর সব কবিতা “বহুদূরে পাখা মেলিয়া”—

They come where your sad, sad heart is,
And sing to you in the night,

Beyond where the waters are moving

Storm-darkened or starry bright.

যেখানে তোমার হৃৎকম্প বেদনাময় অন্তরটি আছে, সেইখানে আসিয়া রজনীতে তোমার কাছে গান গায়,—যেখানে জলধারা ঝড়ের অন্ধকারে বা তারকার দীপ্তির তলে তুলিয়া তুলিয়া উঠিতেছে—তাহারি পরপারে! তিনি আপনাকে ‘pilgrim soul’ অর্থাৎ পথিক আত্মা বলিয়াছেন—এবং সেই পথযাত্রার নানা রহস্তের গান গাহিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লব হইতে আজ পর্যন্ত, সেই প্রথম অরুণাভাস হইতে এই সন্ধ্যাকালের বিষাদমলিন ঘোর পর্যন্ত, যে আরম্ভ, মধ্য এবং পরিণামের এক আশ্চর্য্য লীলা দেখা গেল,—কবি রবীন্দ্রনাথ এক জীবনের মধ্যে সেইসকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া, সেই বিচ্ছিন্ন-কালের বিভিন্ন সকল লীলাকে এক অথও জীবনচক্রের মধ্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন দেখিতে পাই। এই পূর্ণ যুগচক্রের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ কবিজীবন-চক্রের কি বিচ্ছেদহীন মিলন! তাঁহার মধ্যে ‘Alastor’ এর ‘তারকার আশ্রয়ত্যা’ ছিল, ‘Shadow-vested-misery’র ছায়াবস্ত্রিত বিবাদের সন্ধ্যাসঙ্গীত ছিল, অনন্ত সৌন্দর্যের ‘প্রতিধ্বনি’র বেদনাময় সুর ছিল; আবার তাঁহারি মধ্যে ‘প্রভাতউৎসব’ জাগিয়াছিল, সমস্ত জগতের অন্তরের অন্তরে যে অফুরান রসের ও সৌন্দর্যের উৎস নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানকার অনির্বচনীয় আনন্দের সম্বাদ ছিল;—এসমস্তই যেন সেই ইংরাজী সাহিত্যের অকণোদয়ের গান। তারপর “সোনার তরী” “চিত্রা”র যুগে গল্পে ও কবিতায় সেই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যাহ্নের বাস্তবানুভূতি জাগিল। ‘Palace of Art’ বা ‘দেউল’ ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিবার কথা, ‘পরশপাথর’র সন্ধ্যাসীমার ও ‘আকাশের চাঁদে’র প্রার্থীর হতাশাসের কথা আমরা পাইলাম,—Idylls রচিত হইল গল্প গল্পে এবং ‘পুরাতন ভূত’ ও ‘পুরস্কার’ প্রভৃতি কাব্যে; বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি সিদ্ধান্তকে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এক করিয়া লইবার, বিশ্বের বিচিত্র প্রাণধারাকে নিভের চেতনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিবার,—সমস্ত প্রাণকে এক প্রাণ ও সমস্ত চৈতন্যকে এক অথও চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করিবার বার্তা শুনিলাম,—“বসুন্ধরার” ‘জীবন-দেবতা’ ও ‘মৃত্যু’র উপরে সকল কবিতায়

—“স্থলে ‘জলে আমি হাজাং বাঁধনে বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে”;—এবং “প্রেমের অভিষেক” ‘one word more’—এর কথাও—ব্রাউনিংয়ের সকল কবিতার সার কথাও—ফুটিয়া উঠিল। তারপর বৈকালের গলিষা-পড়া রৌদ্রের মাধুর্য্য ‘চৈতালী’র পাকা শস্যের উপর যখন নামিল—তখন হইতেই ভোগবিরতির সুর। ‘ক্ষণিকায়’ ‘কল্পনায়’ সেই সুরের পূর্ণবিকাশ। এ সুর ইউরোপীয় কবির নাই। এ ঘোর নয়, আবেশ নয়—কিন্তু পরম শান্তি, নিবিড়তম উপভোগ। ‘ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন ঝলমল প্রাণ’ যাপন করিবার কথা! তারপরে নৈবেদ্য-ধেয়া-গীতাজ্বলিতে একেবারে পরিপূর্ণতম গভীরতম রাগিণী—যে রাগিণী এখন ইউরোপীয় কবিসমাজকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।—সে সীমার মধ্যে অসীমের রাগিণী, অরূপকে অনির্ক-চনীয়কে রূপের মধ্যে গানের মধ্যে ধরিবার ব্যাকুলতার রাগিণী।—

সংবাদপত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজ এই বঙ্গীয় কবিকে গত ১২ই জুলাই এক সাক্ষ্য নিমন্ত্রণে কিরূপে সম্বর্ধনা ও সম্মান করিয়াছিলেন। সেই সাক্ষ্যসভায় ইংলণ্ডের প্রায় সকল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কবি ম্যট্‌স ছিলেন সভাপতি। এচ্‌, জি, ওয়েল্‌স্‌ উপস্থিত ছিলেন,—তিনি সোশ্যালিষ্ট এবং ওপেন্‌সিস্টিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক ‘A Modern Utopia’ সাহিত্যসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মিস্‌ মে, সিন্‌ক্লেয়ার ছিলেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী। নেভিন্সন্‌, হ্যাভেল, রদেনষ্টাইন তো সুপরিচিত নাম। রল্‌স্টন্‌ ছিলেন, তিনিও একজন বড় কবি। একটা বিরাট জনতাময় সভা না করিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটি যে এই বাছা বাছা লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কবিসম্বর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের স্ববুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং অল্পষ্ঠানটিকেও সর্বোৎসাহে করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। যে বৈঠক উপযুক্ত সমজ্ঞারের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেখানে যে উৎসবটি জন্মিয়া উঠে, হৃদয়ের ভাব-উৎস যেমন সহজে খুলিয়া যায়, এমন কেবল বাজে লোকের দলবুদ্ধির দ্বারা হয় না। স্বভাবত উত্তেজনাগ্রিয় ইংলণ্ডবাসী



চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রদেনষ্টাইন।

আপনা হইতে যে একরূপ চিন্তাবিশ্রাস্তকারী বারোয়ারি সৃষ্টি না করিয়া একটি রসিকজনসম্মিলনের মনোহর মধুচক্র রচিয়াছিলেন, সেজন্ত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

কবি ম্যট্‌সের সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি এদেশের অধিকাংশ কাগজেই প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সেদিন কবিকে যে জ্ঞতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই নিকট অতিবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাহারা ম্যট্‌সের কাব্যের সহিত পরিচিত, তাঁহার ‘Pilgrim Soul’এর পৃথক আত্মার ‘Sorrows of changing face’ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল মুখের সকল বেদনা যাহারা পাঠ করিয়াছেন—সর্বোপরি যাহারা আধুনিক সাহিত্যের রহস্যঘোরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া জানিয়াছেন কি ব্যাকুলতা এখন ইউরোপীয় চিন্তে প্রকাশের জন্য ছটফট করিতেছে—তাঁহারা ম্যট্‌সের জ্ঞতিবাদকে কখনই অতিশয়োক্তি বলিবেন না। তবে যাহারা ছনিয়ার কোন্‌না খবরই রাখেন না—এবং

আপনার ব্যঙ্গপ্রিয় প্রকৃতির চাপল্য ও লঘুতার দ্বারাই সকল গভীর জিনিষের অন্তরে প্রবেশ করিবার স্পর্ধা ও ছরাকাজ্জা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁহারা একরূপ প্রশংসাকে যে আতশযোজিত বলিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি। যাহা হউক রীটসের সমস্ত কথাগুলি এখানকার প্রায় কাগজে বাহির হয় নাই বলিয়া আমরা নিয়ে তাহার অনুবাদ দিলাম :

“একজন শিল্পীর জীবনে সেইদিন সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন, যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যাহার অন্তিত্ব তিনি পূর্বে অবগত ছিলেন না। আমার কাব্যজীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে যে অজ্ঞ আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিবার ভার পাইয়াছি। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার লিখিত প্রায় ১০০টি গীতিকবিতার গজানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিতেছি। আমার সমসাময়িক এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি জানি না, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। এই অবিকৃত গজানুবাদগুলি পাঠে আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, কি রচনারীতিতে, কি চিন্তায়, ইহারা অতুলনীয়। বহুশত বৎসর পূর্বে একদা ইউরোপে এই রচনারীতি পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ একজন বড় গীতরচয়িতা—তাঁহার কবিতাতে তিনি সুর বসাইয়া থাকেন এবং তারপর তিনি সেই কবিতা ও গান কাহাকেও শিক্ষা দেন। এবং এইরূপে মুখে মুখে সেই গান তাঁহার দেশবাসী কর্তৃক গীত হইয়া চলিতে থাকে—যেমন তিন চারি শতাব্দী পূর্বে ইউরোপে কবিতা গীত হইত। ইহার সকল কবিতার একটিমাত্র বিষয়—ঈশ্বরের প্রেম। আমি যখন ভাবিয়া দেখিলাম, যে, আমাদের পশ্চিম দেশে এমন কি গ্রন্থ আছে যাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে, তখন আমার মনে পড়িল টমাস্ এ, কেম্পিসের “খৃষ্টের অনুকরণের” কথা। ইহারা সদৃশ বটে—কিন্তু এই দুই ব্যক্তির রচনায় কি আকাশপাতাল প্রভেদ! পাপের চিন্তার দ্বারা টমাস্ এ, কেম্পিস্ ক্রুদ্ধ গুরুতররূপে অধিকৃত—কি ভীষণ

উপহার সাহায্যে তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যে শিশু লাটিম লইয়া খেলা করিতেছে, সে যেমন পাপের চিন্তা জানে না—ঠিক তেমনি এই কবিও পাপ সম্বন্ধে কিছু মাত্র চিন্তা ব্যয় করেন নাই। টমাস্ এ, কেম্পিসের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি প্রেমের কোনো স্থান নাই, তাঁহার কঠোর চিন্তের মধ্যে সেরূপ প্রেম প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রেমিক—তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্যের স্বন্দরেখাপাত হইয়াছে, যাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও গভীর প্রেমেরই পরিচায়ক।”

রীটস্ ইহার পর কবির অনুবাদিত তিনটি কবিতার গজানুবাদ পাঠ করেন। তাহার মধ্যে একটি কবিতা নৈবেদ্যের। ‘জীবনের সিংহদ্বারে পশিছু বেক্ষণে’ এবং ‘মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর’—মৃত্যুর উপরে এই দুইটি কবিতাকে ভাঙিয়া ইংরাজী অনুবাদে একটি করিয়া লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টি গীতাঞ্জলির একটি গান—“শ্রাবণঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে।” রীটসের পরে দু একজন কিছু বলিবার পরে কবি স্বয়ং সেই সভায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়, রহস্যপ্রিয়তা এবং দূরদর্শিতা সমস্তই একাধারে ফুটিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতাটিরও বঙ্গানুবাদ নিয়ে দিলাম :—

“আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই সে ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নাই। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন—আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে—তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই (ভাবিতে পারি) এবং অনুভব করিতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা গৃহিণীর ছায় বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবী করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁর রাজ্যে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকারপ্রবেশকে তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেন নাই। সেই জন্ত আমি কেবলমাত্র আপনাদিগকে এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে এদেশে আশা অনুবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাকে এত মুখ

করিয়াছে যে আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। আমি একটি শিক্ষালাভ করিয়াছি—এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষা লাভের জন্ত আমার আসা সার্থক—যে যদিও আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার সমস্তই পৃথক তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃদয় এক! নীলনদীর তীরে যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন হৃদয় গঙ্গার উপত্যকাকে শস্তশ্রামল করিয়া দেয়, তেমনি পূর্বাশের সূর্যালোকের অর্নিমেঘ দৃষ্টির নিরে যে আইডিয়া আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হয়ত সমুদ্রপার হইয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে—সেখানকার মনুষ্যজন্মের মধ্যে তাহার সম্ভাবণ লাভের জন্ত, সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্ত। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্তথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে।—না—সখে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহার একদিন মিলিবেই। ইহাদের ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক গুণিত্ত বিবাহবন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।”

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্থ্য বহন করিয়া যেসকল পত্র আসিয়াছে তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রী-কবির পত্রই শুনাইবার মত। একজন লিখিয়াছেন :—“যে দিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়েনা যে গতরাতে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোনো দিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কিনা।”

আর একজন লিখিয়াছেন “আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য আছে মাত্র তা নয়—কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যাত্মকের মত আসে, বাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে গীড়া দিতে থাকে—সেই তাহারি একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। একজন লোক আরেকজনের চোখ দিয়া দেখিতে পারে কিনা আমি জানি না বোধ হয় পারেনা; কিন্তু একজনের অন্তরের

হৃদয় প্রত্যয় নিশ্চয় আর একজনের বিশ্বাসকে জাগায়। St. John of the Crossএর “আত্মার অন্ধকার রাত্রি” নামক কবিতাটি ছাড়া আপনার কবিতার তুলনা খুঁজিয়া পাইনা—কিন্তু আপনি একটি পরিপূর্ণ অদৈত বোধে এবং একটি অধ্যাত্ম তত্ত্বদৃষ্টিতে St. John এবং অপর সকল খৃষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান “মিষ্টিসিজম” ইন্ড্রিগ্রাহ উপমায় পরিপূর্ণ; সে যথেষ্ট স্বপ্ন নয়—জগতের নানাবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেই জন্ত তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্মূল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোনো দিনই সন্তোষ দেয় নাই। কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, তাহা গতরাতে আপনার কাণ্ডাই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছ-স্বন্দর ইংরাজীতে এমন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন বাহা আমি ইংরাজীতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোনো দিন দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।”

হাউস অব কমন্সে ভারতবর্ষীয় বজেট আলোচনাকালে সহকারী সচিব মিঃ মণ্টেগু কবির বক্তৃতার যে উল্লেখ করিয়াছিলেন বা ইংলণ্ডের টাইমস্ পত্রে যে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা খুব উল্লেখযোগ্য মনে করি না। কারণ কবির যথার্থ সম্মান রসিকসমাজে—জনগণের হৃদয়মধ্যে—রাষ্ট্রদরবারে তাঁহার উল্লেখমাত্র তাহার তুলনায় অতি নগণ্য।

ইংলণ্ডের একজন প্রথিতনামা মনীষীর নিকট হইতে আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাঙ্গাদ বন্ধু যে পত্র পাইয়াছেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এখানে দেওয়া সম্ভব বোধ হইতেছে। তিনি লিখিতেছেন :—

“কবি আসিতেছেন শুনিয়া প্রথমটা যে আনন্দ হইয়াছিল, এখন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া তদপেক্ষা কত যে বেশি আনন্দ হইতেছে তাহা আর বলিবার নয়। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বাহা কল্পনা করিয়াছিলাম তাহার সমস্তই এই মধুরস্বভাব সাধুটির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি এবং যাগ কল্পনা করি নাই এমনও বহু সদৃশ্য-রাশি দেখিতেছি। ইহার চেয়ে মহত্তর আত্মা কে কবে দেখিয়াছে—ইহার অপেক্ষা গভীরতর সত্যপ্রেরণা আর কোথায় মিলিয়াছে? আমি যে ইহার কবিতাকে কত

উচ্ছে আসন দিই তাহা আপনাকে আমি বলিতে পারি না—যদি বলি, তবে আপনি মনে করিবেন যে আমি বাড়াইয়া বলিতেছি। ইহাঁর অন্তরতর গভীর অভিজ্ঞতা। হইতেই ইহাঁর সকল লেখার উৎপত্তি—তাহার মধ্যে নৈপুণ্য বা শক্তি ফলাইবার প্রয়াসমাত্র দেখি না—তাহার সমস্ত রচনাই এই বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সৌন্দর্যের নম্রমধুর আ-গপূর্ণ হৃদয়োথিত স্তব্ধ-অর্থ। তাহার কাছে সেই সৌন্দর্যই বিশ্বের ঐক্যের পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট প্রকাশ—অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য ভগবানের অনন্ত প্রেমের বাহ্যচিহ্ন বাহ্যবিগ্রহ মাত্র। সহস্র পদার্থে ইহাই তিনি দর্শন করেন এবং সহস্র রূপে জীবনের ও মৃত্যুর অক্লান্ত স্তবগানে ইহাই তিনি বাস্তব করেন। আপনাদের বাংলা ভাষায় যে ইহাঁর কবিতার সৌন্দর্য্য কিরূপ, তাহা আমি আবছায়া-মত কল্পনা করিতে পারি মাত্র—কিন্তু ইহাঁর কবিতার বাহ্যরূপটি না পাইলেও তাহার নিগূঢ়-গভীর অর্থ হৃদয়কে ব্যথিত ও আত্মাকে আলোড়িত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই গুণানুবাদেও আমি এমন জিনিস পাই যাহা আর কোনো সমসাময়িক কাব্যের মধ্যে পাই না। এত বড় আপনাদের কবি, আপনাদের কি গর্বের কথা!—বিশেষত যখন এত বড় কবির সঙ্গে এমন একটি চরিত্রের সম্মিলন ঘটিয়াছে। যদি এমন অনেক দূত আপনাদের দেশ হইতে এদেশে আসিতেন! এই কবিকে যে কেহ দেখিয়াছেন, তিনিই ভাল বাসিয়াছেন, এবং ইংরাজীজগতে ইহাঁর কবিতা অনুবাদিত হইবার জন্ত ইহাঁর প্রতি অনেকের গভীর ভক্তি হইয়াছে। সামনের শরতেই ইণ্ডিয়া সোসাইটি কবির অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন এবং রাটস্ স্বয়ং তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। আমার বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থ বাহির হইলে বহু লোকের নিকট তাহা সমাদর লাভ করিবে।”

এই অনুবাদগুলি কবির স্বকৃত। তিনি কবি রাটসকে ঐগুলি মার্জিত করিয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিলে কবি রাটস বলিয়াছিলেন যে, “এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া মার্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কি তাহা জানে না।”

কবির প্রতি কাহারো কাহারো ভক্তি এমন প্রব

হইয়াছে যে তাহার কবিকে গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া পদধূলি লইয়াছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন তাহাদের মধ্যে একজন। দিল্লী কলেজের অধ্যাপক বেভারেণ্ড সি, এফ, এণ্ড জে মডার্ন রিভিউ পত্রে লিখিয়াছেন—“যে-কবি তাহার কাব্যের দ্বারা তাহার স্বজাতিকে এতদূর উদ্ধুদ্ধ ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন তাহাকে আমি প্রশংসা করিতাম, কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ... তাহার সহিত বাংলা দেশের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া আমি বলিলাম ‘জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসকলের মধ্যে বাঙালীর যথার্থ স্থানটি নির্দিষ্ট হওয়ার সময় সূদূর নয়।’ এই কথায় কবির মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল, একটি সূদূরের আলোক তাহার দৃষ্টিতে জ্বলিয়া উঠিল। আমি বুকিলাম বঙ্গজননীর মূর্তি তাহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং ইংলণ্ডের সুধীসমাজের আতিথ্য ও সমাদরের মধ্যেও তাহার চিত্ত প্রবাস-বেদনা অনুভব করিতেছে। ... তাহার কবিতা-আবৃত্তি শুনিয়া ভাবাবেশে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, পুনঃ পুনঃ অক্ষিপ্লব সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল—এ আজ কি আনন্দ, যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া এতদিনে আমার দেশ ভারত-প্রতিভার পূজা করিতেছে। ... রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কবিতার অনুবাদে যেসকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, সেগুলি ললিত ও যথাযথ (marked by a stately grace and dignity), সুন্দর ও স্বচ্ছ (beautiful and lucid)। আবৃত্তি শুনিয়া একজন বলিয়াছিলেন ‘আসল বাংলায় যে ইহা অপেক্ষা আর কি ভালো আছে তাহা আমার ধারণারও অতীত।’”

ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক—এ বিষয়ে তাহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোনো দেশে নাই।

“ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান” পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে “ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আগমনে এদেশে যে সম্মান সম্মম প্রশংসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং রসিকসমাজে যে সাড়া পড়িয়াছে এমনটি এযুগের লোকের জীবদ্দশায় কখনো কোনো প্রাচ্য অজিধর জন্ত হইতে দেখা যায় নাই।”

গৌড়-রাজমালা

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সংকলিত ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক সম্পাদিত “গৌড়-বিবরণ” নামক গ্রন্থমালার প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের নাম “গৌড়রাজমালা”। ইহার প্রণেতা প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববেত্তা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ। বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধনামা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সপ্তদশ পুঁঠাবাপি একটি উপক্রমণিকায় গ্রন্থের সারাংশ সংকলন করিয়া ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ নীরস বিবরণ সরস করিবার ক্ষমতা কেবল শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয়েরই আছে, তবে এত সংক্ষেপে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া তাহা সরল ও হৃদয়গ্রাহী করিতে পারিবেন তাহা অনেকই ভরসা করিতে পারেন নাই। উপক্রমণিকাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। ভবিষ্যতে যদি কখনও “গৌড়রাজমালা” বঙ্গদেশে ক্রমোন্নত ইতিহাসচর্চার ফলে অনাবশ্যকীয় গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে তখনও মৈত্রেয় মহাশয়ের উপক্রমণিকা সুন্দর সরল হৃদয়গ্রাহী বচনা-স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যে সমাদৃত হইবে। গ্রন্থারম্ভে “গৌড়বিবরণের” সুযোগে সম্পাদক ৬ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম গ্রহণ করিয়া গ্রন্থখানিকে পবিত্র করিয়াছেন। অতীতে বঙ্কিমচন্দ্র লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বঙ্গদেশে ইতিহাসিক সারসভা অনুসন্ধানের জন্ত প্রস্তুত হয় নাই, সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। উপক্রমণিকায় গ্রন্থমালার সম্পাদক নূতন কথা কিছুই বলেন নাই হুতরাং ইহার বিবরণ অনাবশ্যক। দীর্ঘপত্রীয়ার বিগোংসাহী রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম.এ. মহাশয়ের বায়ে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে অল্পের প্রকারে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুরের নিকট গণী। ভরসা করি রাজকুমার দীর্ঘজীবী হইয়া তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অন্তর্গতগুলি সম্পন্ন করিয়া যাইবেন।

যে গ্রন্থখানির কথা বলিতেছি তাহা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ণ রত্ন। বঙ্গ ইতিহাসিক অনুসন্ধান আরম্ভ হইবার সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়কুমারের “সিরাজদৌলা” সাহিত্য, ইতিহাস নহে, ভবিষ্যৎযুগে বঙ্গবাসিগণ “সিরাজদৌলা” উৎকৃষ্ট গদ্য-নাট্যরূপে পাঠ করিবে। “বিক্রমপুরের ইতিহাস” ইতিহাস নহে, Gazetteer, ইহার ইতিহাসিক ভাগ মুদ্রিত না করিলে বিশেষ হানি হইত না। “বিক্রমপুরের ইতিহাসের” ইতিহাসিক পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন যে গ্রন্থকার যথেষ্ট অনুবাদ করিয়াছেন এবং বাহা তাহার মনে আসিয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা বা ইতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান তাহার মনে স্থানলাভ করে নাই। এই শ্রেণীর বস্তুগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তগুলিই Gazetteer, ইতিহাস নহে। রমা প্রসাদ বাবুর গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে তিনি মুষ্টিভঙ্কা করিয়া মহাবিজয়ের আয়োজন করিয়াছেন। তিনি যে অমূল্যরত্ন মাতৃভাষাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা কেবল বঙ্গভাষায় অপূর্ণ নহে, জগতের ইতিহাসক্ষেত্রে অপূর্ণ। “গৌড়রাজমালা” কোন ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইলে এতদিন নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইত। শ্রীযুক্ত চন্দ্র মহাশয় বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীলেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” জায় সম্বর ইহার অনুবন্ধ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। ইতিপূর্বে “বহুমতী”তে ও “সাহিত্যে” রমা প্রসাদ বাবুর গ্রন্থের কতক-

গুলি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সমালোচকগণ মুগ্ধকণ্ঠে “গৌড়রাজমালা”র প্রশংসা করিয়াছেন। “সাহিত্যে”র সমালোচক “গৌড়রাজমালা”কে বাঙ্গালার ঐতিহাসিকক্ষেত্রে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেন করিয়াছেন তাহার কারণগুলি দিতে বোধ হয় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। যে দুটি একটি কারণ উল্লিখিত আছে তাহা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় “গৌড়রাজমালা”র প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি “গৌড়রাজমালা” পাঠ করিয়া তিনটি মাত্র নূতন কথা জানিতে পারিয়াছেন :—

(১) গৌড়ের অতীত ইতিহাস আছে।

(২) গৌড়ীয়গণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে দেশশাসন করিয়াছিলেন; আর্যাবর্ত ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত তাহাদের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। সহস্র বৎসর পূর্বে গৌড়ে প্রজাশক্তির উন্মেষ ঘটয়াছিল, প্রজার নির্বাচনে রাজা মনোনীত হইয়াছিলেন।

(৩) বাঙ্গালী চিরপরাধীন ও চিরপরাজিতের জাতি নহে। বাঙ্গালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, শত্রু মর্দিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী শিল্পকলায় পারদর্শী হইয়া এশিয়া মহাদেশকে শিল্পের আদর্শ দিয়াছিল। ইত্যাদি।

কিন্তু এসকল কথা যে “গৌড়রাজমালা”র জন্মের বহুপূর্বে শ্রুত হইয়াছে সে কথা দেখিতেছি এখনও পাঁচকড়ি বাবুর প্রতিগোচর হয় নাই। গৌড়ের অতীত ইতিহাস আছে একথা কেবল কিলহর্ষ, ক্ষিট, শিখ, প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ বলেন নাই, সার রামকৃষ্ণ গোস্বাল ভাণ্ডারকর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী, প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বহুপূর্বে একথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। কয়েক বৎসর ধাবৎ “গৌড়বিবরণের” সম্পাদক নামা মসিকপত্রে নানাভাবে বঙ্গবাসিগণকে শুনাইয়া আসিতেছেন যে গৌড়ের ইতিহাস আছে, তবে তিনি যে পস্থা নির্দেশ করিয়াছেন সে পস্থা অনুসরণ করিলে কখনও গৌড়ের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইত কিনা সন্দেহ। “গৌড়ীয়গণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে দেশ শাসন করিয়াছিলেন” একথা যদি নূতন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে “গৌড়রাজমালা” অগ্নিতে নিক্ষেপ করা উচিত। গুনিয়াছি ৩ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ৮: পূর্বাব্দে লিখিত “বাঙ্গালার ইতিহাস”ও একথা আছে। আর্যাবর্ত ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত যে গৌড়ীয় প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল তাহা এই অষ্টাদশ বর্ষ কাল ধাবৎ ৬ উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি, শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বাঙ্গালা ও ইরাজী উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্বে যে গৌড়ে প্রজা-শক্তির উন্মেষ ঘটয়াছিল তাহা ৬ উমেশচন্দ্র বটব্যাল, পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সাহায্যে বহুপূর্বে আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং এই তিনটি কথার একটি কথাও নূতন নহে। রমা প্রসাদ বাবু ভারতের ইতিহাসের উপাদান হইতে গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। বিশাল সমুদ্র স্বরূপ উত্তরাপথ-দক্ষিণাপথের শোভিতলিপিমালার সার সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার “গৌড়রাজমালা” প্রণয়ন করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে যে-কোন ব্যক্তি এই উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে পারিত কিন্তু সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রমাণগুলি যোজনা করিয়া উত্তরপূর্ব-ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না। রমা প্রসাদ বাবু যেসমস্ত উপাদান লইয়া “গৌড়রাজমালা” রচনা করিয়াছেন তাহা অধিকাংশই বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসমস্ত খণ্ড প্রমাণ লইয়া মুসলমান বিজয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা সহজসাধ্য নহে। ভারতবর্ষের অপরাপর দেশ বা রাজবংশের ইতিহাসের সহিত

সামগ্রিক রাখিয়া রমাপ্রসাদবাবুকে এই ইতিহাসখানি রচনা করিতে হইয়াছে, ইহাই রমাপ্রসাদবাবুর বিশেষ কৃতিত্ব। এই কাণ্ডটি রমাপ্রসাদবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ফলে তাঁহার গ্রন্থখানি অপূর্ণ হইয়াছে। প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের মহা মহা রথীগণ বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টায় যাহা করিতে পারেন নাই, ভিলেট স্মিথ, ফিউ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ যাহাকে অসাধ্যসাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন, রমাপ্রসাদবাবু তাহা অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সাধন করিয়াছেন। রমাপ্রসাদবাবুর গ্রন্থে যে নূতন কথা নাই তাহা নহে, কাব্যোজবংশীর গোড়পতির কীর্তি ও গোড়-বংশের ইতিহাসে তাহার স্থান, তিনি নিরূপণ করিয়াছেন। চন্দ্রাজয়বংশীয় ধ্বংস কবে রাঢ় বিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণাটালুকা বিজয়াদিত্য কবে পশ্চিমবঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, একবার উত্তর বোম্ব হইল অনেকই মিতে পারিবেন না। “গোড়রাজমালা” গ্রন্থকারের সহিত আমার নিজ মতের অনেক অনেক আছে, তথাপি তাঁহার সংগ্রহ, প্রমাণসম্বল ও রচনাপ্রণালী সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

গ্রন্থরচনায় গ্রন্থকার জগদ্বিজয়ী সেকন্দরের ভারতভিযান কাল হইতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দ্বিধ্বজয পর্বাঙ্গ দেশীয় বা বিদেশীয় গ্রন্থে বঙ্গ বা বঙ্গবাসিগণের যত কিছু উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ও উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময়ের (খৃঃ পূঃ ৩৩৬—খৃঃ অঃ ৩৮০) বাংলাদেশের কোনও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সময়ে মগধের গুপ্তরাজগণ উত্তরাপথে শকাধিকার লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বাংলাদেশ সেই সময়কার কথা আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। খ্রীষ্টাব্দ ৮ম শতাব্দীর মিহিরৌলী গ্রামের লৌহস্তম্ভে যে চন্দ্ররাজার দ্বিধ্বজযকাহিনী উৎকীর্ণ আছে তাহাকে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই চন্দ্রের কথা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে বোম্ব হইল স্বীকার করিতে পারিতেন না। বঙ্গদেশে বাঁকড়া জেলার গুণ্ডনিয়া পর্বতে চন্দ্রের খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে কথাও “গোড়রাজমালা”র স্থানলাভ করে নাই। বঙ্গবিজয়ী চন্দ্র, ও গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। ইহার কারণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপি সমূহে পাওয়া যাইবে। মিহিরৌলীর স্তম্ভলিপি অক্ষরমালার সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষী, মথুরা, বা উদয়গিরির শিলালিপি সমূহের তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে উভয়ে বহু পার্থক্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির বিশেষত্ব আছে। আর্ঘ্যাবর্তের পশ্চিমাংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত ইহাদের কোনই সাদৃশ্য নাই, পরন্তু প্রথম কুমারগুপ্তের বিলসাদ স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে চন্দ্র নামক কোন রাজা পূর্বে বঙ্গদেশ, পশ্চিমে বাহ্লিক, ও দক্ষিণে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন :—

যন্তোষ্বর্ত্ততঃ প্রতাপমুরসা শত্রুন্ সমেত্যাগতান্ ।
বজ্রদাহবর্জিতেনোভিলিখিতা ধ্বংগেন কীর্তিত্বৈ ॥
তীর্হা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিদ্ধোজ্জিতাবাহ্লিকা
যন্তান্যাপাখিবাত্ততে জলনিধিকীর্ধ্যানিলৈর্দধিগণঃ ।

এই স্তম্ভ বিষ্ণুপদগিরির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দুইটি বিষ্ণুপদগিরি দেখিতে পাওয়া যায়, একটি গয়াধাম, ও দ্বিতীয়টি পুন্ডরীক। গুণ্ডনিয়া পর্বতের খোদিতলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে পুন্ডরীকপতি সিংহবর্মার (সিংহবর্মার নহে) পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কর্তৃক উহা খোদিত হইয়াছিল। স্বতরাং এই উভয় চন্দ্রবর্মাই এক

ব্যক্তি এবং এই বিষ্ণুপদগিরি পুন্ডরীক হওয়াই অধিক সম্ভব।* সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার বিরুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপি ও গুণ্ডনিয়া শিলালিপি উভয়ই বৈকব খোদিতলিপি; প্রথমটি ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ এবং দ্বিতীয়টি চন্দ্রবর্মার দাস কর্তৃক অনুষ্ঠিত। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপির চন্দ্রের ও গুণ্ডনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মার একই সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবুর সন্দেহ থাকিলে “গোড়রাজমালা”র স্বতন্ত্রভাবে গুণ্ডনিয়ার শিলালিপির উল্লেখ করা উচিত ছিল। অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে গুণ্ডনিয়ার শিলালিপি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারে না। অতএব ইহা বৃত্তিতে হইবে যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুন্ডরদেশের রাজা সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার গোড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং রাঢ়দেশের সম্ভবিত গুণ্ডনিয়া পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গোড় ও বঙ্গ যে গুপ্ত সম্রাটগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল একথা এক্ষণে সর্ববাদীসম্মত। রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন :—

“করিদপুর জেলায় স্মলগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং ঢাকা, করিদপুর এবং যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে গুপ্ত সম্রাটগিরের মুদ্রা চন্দ্রের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।”

রমাপ্রসাদ বাবু একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই কোন কোন জেলার কোন কোন গুপ্তসম্রাটের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ভিলেট স্মিথ অষ্টাদশ বর্ষ পূর্বে “গুপ্ত সম্রাটগণের স্ববর্ণমুদ্রা” নামক প্রবন্ধে বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাটগণের মুদ্রাসমূহের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটবর্তী ২৪ পরগনার অন্তর্গত কালীঘাটে, হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানন্দে, উত্তরবঙ্গের মালদহে ও রঙ্গপুরের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমার গুপ্ত ও স্মলগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত অষ্টাদশবর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশে গুপ্ত রাজবংশের যেসমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে রমাপ্রসাদ বাবু এসিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণী মধ্যে তাহার তালিকা পাইবেন। রাজসাহী জেলার ধানাইদহ গ্রামে প্রথম কুমারগুপ্তের একখানি তাম্রাঙ্গন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবু ইহার উল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট আছেন, কিন্তু তাম্রাঙ্গন হইতে গোড়দেশ সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি, তাম্রাঙ্গন এতদেশ সম্বন্ধীয় কিনা, তৎসম্বন্ধে “গোড়রাজমালা”র বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

পরভূত।

আবার মনের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত জলন্ধর সেন মহাশয়ের ‘পরভূত’ শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সত্যি আমরা অনেক সময় বৈদেশিক লেখকের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় প্রাণিতত্ত্বে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হই। ১৩১৪ সালের ‘প্রবাসী’তে ‘পিপীলিকা’ প্রবন্ধে এ বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। দেশ, কাল, আবহাওয়া ভেদে একই প্রাণীর প্রাণীর স্বভাবের তারতম্য লক্ষিত হয়। ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বের এটি মূল বিধান। মানবের আদি পুরুষ এক; কিন্তু বর্ত্তমানকালের সর্বপ্রাণ মানব জাতি এক নহে; বাসস্থানাদি ভেদে আমরা কত প্রকার বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছি।

এক ভারতবর্ষেই মানব জাতির মধ্যে আকার ও বস্তুগত পার্থক্য বিরূপ লক্ষিত হয়। বিভিন্নজনসমাকুল মহানগরী কলিকাতার পথে, পথিকের মধ্যে কে বাঙ্গালী, কে উড়িয়া, মাল্লাজী ইত্যাদি নির্দেশ করিতে দর্শকের অনুমান আসায় স্বীকার করিতে হয় না। একই মনুজবংশ যেমন দেশকাল ভেদে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সমগ্র জীবজগৎও তাহাই। পার্শ্ববর্তী গো জাতির মস্তকাদির গঠনে বস্তুর গৌরবসাদৃশ্য এখনো বর্তমান কিন্তু সমতলভূমির গো জাতিতে তাহার অভাব। এমত অবস্থায় বিলাতী 'কুকু' যে আমাদের কোকিল হইতে অনেকাংশে ভিন্ন প্রকারের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! 'কুকু' শব্দক পার্শ্বকালে কালীপ্রসন্ন বাবুর স্মার আমাদেবও বহু কথা মনে উদ্ভিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু আমাদের অনেক কথা তাহার প্রতিবাদ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিদেশী জিনিষ বদেদী নামে অভিহিত হওয়া কখনই বাঙ্গালীর নহে; কালীপ্রসন্ন বাবু উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। তবু তাহার বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রতিবাদ আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আলোচনার বিষয়টার সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারে আশায় বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

'গিরিকিরীটিনী ত্রিপুরার পর্বত প্রকৃতির রম্যকৃষ্ণ' মধ্যে 'বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়।' সত্য। কিন্তু ইহার দ্বারা বস্তুর গিরিহীন সমতল ক্ষেত্রে সকল সময় কোকিল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অনুমান করিয়া লইবার উপায় নাই। প্রকৃতই কোকিলকুল বস্তুর অনেক পক্ষী হইতেই বসন্ত অস্ত্রে বিদায় গ্রহণ করে। এটি প্রত্যক্ষ সত্য। ত্রিপুরা হইতে বারমাসই কোকিলের বসবাসের উপযুক্ত; সমগ্র বঙ্গভূমি তাই বলিয়া উহাদের পক্ষে সেইরূপ উপযুক্ত তাহা অনুমান করা চলে না। 'শিল্পব্রাহ্মণ কোকিলগণ বারমাসই এদেশে থাকে। সাধারণতঃ কোন ঋতুতে তাহাদিগকে অহুহু বা কৃষ্টিহীন হইতে দেখা যায় না।' এ প্রমাণও যথেষ্ট নহে। ময়না প্রভৃতি পাখী আমাদের দেশেই আছে অথচ তাহারা আমাদের দেশে গৃহপালিত অবস্থায়, বহু শরীরে বহু বৎসর কাটাওয়ায় দেয়। আমাদের গৃহে একটি চন্দনা-টিয়া আটশ বৎসর কাল জমাগত "রাধা কৃষ্ণ" নাম শুনাওয়া সম্ভবিত কলকাতা করিয়াছে। অথচ বস্তুর অবস্থায় টিয়ার নাম গন্ধও আমাদের এ প্রদেশে নাই।

স্বীকার করি,—"ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ব্যতীত" কোকিলকণ্ঠ 'উন্মুক্ত হয় না—ইহাই কোকিলের স্বভাব।' কিন্তু ইহাও উহার বসন্ত চির-বাসের প্রমাণ নহে। সে স্বভাবের মূল অস্ত্র। আদিরসের আবির্ভাবই উহার কারণ। আদিকালে আদিরসই প্রথমে জীবকে মুগ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাণীর প্রাণরীতিগত আকৃষ্ট, আদৃত করিবার প্রচেষ্টার কঠোর প্রথম পরিস্ফুটন—বৈজ্ঞানিক জগতে স্বধীগণ কর্তৃক সে তথ্য বহু প্রমাণ সহকারে স্থানীর্ণিত হইয়াছে। বসন্তে কোকিলের কলতানের অন্তরালে আজিও আদিরস লুক্কায়িত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

'অবসরবের বা বর্ষের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, কিংবা কাক সেই কারণেই নিঃসন্দেহচিত্তে ডিমে তা দেয় ও ছানা পালন করে, এমন নহে; ইহাও তাহাদের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক।' স্বাভাবিক সত্য। কিন্তু এক এক জাতীয় জীবের এক এক প্রকার বিশিষ্ট স্বভাবের কি কারণ নাই? ইতর জাতি কেন, মানব পণ্ডিত আপন সন্তানকে যে প্রাণের টানে, যেহেতু মমতায় লালন পালন করে, অস্ত্রের সন্তানকে তরুণ করে না,— ইহা জীবের স্বভাব বা মায়ী। কাক কোকিলের ছানাকে, কিংবা

'বৌ-কথা-কও'য়ের ছানাকে আপনার সন্তান বলিয়া ভ্রম না করিলে, পরসন্তানকে আত্মসন্তান-নির্কিশেষে পালন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের নিকট আশা করা যায় না। বস্তুতঃ সেরূপ ভ্রমের যথেষ্ট কারণ বর্তমান আছে। স্বধীগণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে গর্ভনা দ্বারা বস্তুর সমষ্টি নির্ণয় করিবার শক্তি নিম্নশ্রেণীর ইতর প্রাণীর নাই। তাহারা বস্তুর আকার, অবয়ব ও বর্ণ প্রভৃতির সাহায্যে উহার অস্তিত্ব নির্ণয় করে। কুকুর বা বিড়াল সন্তানের আকারাদি দ্বারা আপন সন্তান চিনিয়া লয়;—পক্ষীগণেরও উহাই স্মৃতিসহায়। কাক, এই জন্তাই কোকিলের শাবককে নিজ সন্তান বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহাকে সন্তাননির্কিশেষে লালন পালন করে। কাক ও কোকিলের ডিমে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িবার কালে, নিজের যতটি ডিম পাড়ে, কাকের ততটি ডিম ভাঙ্গিয়া কেলে; আকার ও বর্ণগত সাদৃশ্য থাকায় কাক কোকিলের ডিমের পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারে না। নিজ ডিম বোধে তা দিয়া ডিম ফুটায়। কাক ও কোকিলের ছানা প্রথম অবস্থায় দেখিতে একই প্রকারের। তাহা না হইলেও ক্ষতি হইত না; কারণ কাক ডিম ফুটিবামাত্র প্রত্যেকটি ছানার আকারগত পার্থক্যের দ্বারা নিজ সন্তানের পরিমাণ নির্ণয় করে; তাহার স্মৃতিতে কোকিলের ছানাও আত্মসন্তান-শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া যায়। পরিশেষে পালক উঠিলেও তাহার ভ্রম ভাঙ্গে না, নিজের সন্তানের প্রতিকৃতি এই রূপ ধারণ করিতেছে ইহাই তাহার বিশ্বাস জন্মে। ফিঙ্গা সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা ফিঙ্গার বাসায় 'বৌ-কথা-কও'য়ের সন্তান হইতে দেখি নাই। বোধ হয় বৌ-কথা-কও ও ফিঙ্গার ডিমে সাদৃশ্য আছে—সেটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা সাতভায়া বা ছাত্তর পাখীর বাসায় পাগীয়া বা 'চোক গেল' পাখীর ছানা হইতে দেখিয়াছি। দুই মাস পূর্বেও লক্ষ্য করিয়াছি, ছাত্তর পাখী পাগীয়ার ছানার আহার যোগাইতেছে। (আমাদের দেশের নামজানা গায়ক পাখীগণ কি অনেকেই পরভূত—সোখোনি?) ছাত্তর ও পাগীয়ার মধ্যে আকার ও বর্ণগত সাদৃশ্য আছে, উভয়ের ডিমও এক প্রকারের। হতরাং ছাত্তরের ভ্রমে পতিত হইবার যথেষ্ট উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভ্রমই কালীপ্রসন্নবাবু-কথিত উহাদের স্বভাবের মূল কারণ। তাহা না হইয়া এই স্বভাবকে কখনই সহজাত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই।

ঐজ্ঞানকীবল্লভ বিশ্বাস।

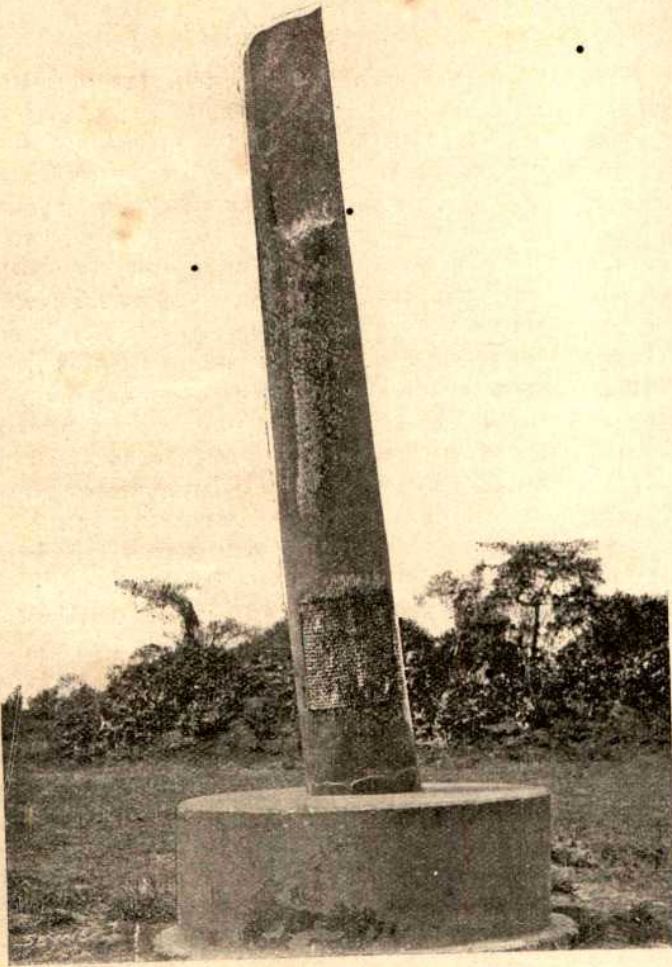
গরুড়স্তুস্ত-লিপি*

[বাদাল-প্রস্তরলিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানে কোম্পানী-বাহাদুরের একটি কুঠীবাড়ী বর্তমান ছিল। তাহার অধ্যক্ষ [শ্রর] চার্লস উইলকিন্স ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে বাদালের তিন মাইল দূরবর্তী একটি বনভূমির মধ্যে [প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ একটি ধ্বংসাবশিষ্ট আবাকার-কাহিনী। প্রস্তর-স্তম্ভের গাত্রে] এই প্রস্তর

* বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির (বহুত্ব) নূতন গ্রন্থ "গোড়লেখমালা" এই প্রবন্ধটি সমিতির অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হইল। প্রকাশী-সম্পাদক।



গরুড়স্তম্ভ।

প্রশস্তি উৎকীর্ণ থাকিবার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে, এই স্তম্ভলিপির কথা ক্রমে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। বাদালের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া, ইহা “বাদাল-প্রস্তরলিপি” নামে কথিত হইত। ইহা বাদাল অপেক্ষা মঙ্গলবারি-হাটের অধিক নিকটবর্তী বলিয়া, “মঙ্গলবারি-প্রস্তরলিপি” নামেও কথিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই প্রশস্তি একটি গরুড়-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া, ইহা “গরুড়স্তম্ভ-লিপি” নামেই কথিত হইবার যোগ্য।

এই স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, মালদহের কুঠার অধ্যক্ষ জর্জ উড্‌নী [১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে] এবং মালদহের

অন্তর্গত গুয়ামানতী কুঠার অধ্যক্ষ ক্রেটন [১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে] পরিদর্শন করিতে আসিয়া, স্তম্ভ-গাত্রে আপন আপন পাঠোদ্ধার-কাহিনী। নাম উৎকীর্ণ করিয়া গিয়া ছিলেন; তাহা অত্য়পি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উইল্কিন্স ভিন্ন, আর কাহারও, তৎকালে পাঠোদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উইল্কিন্স কিরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তিনি ইংরাজী ভাষায় যে মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই [১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে] এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় * প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মর্ম্মানুবাদ পাঠে জানিতে পারা যায়,— উইল্কিন্স সকল শ্লোকের বিস্তৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। [১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে] দিনাজপুরের কলেক্টর ওয়েষ্টমেকট পণ্ডিতবর হরচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত একটি পাঠ প্রেরণ করায়, [ত্রিযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষজরুত ইংরাজী অনুবাদ সহ] তাহা সোসাইটির পত্রিকায় † প্রকাশিত হইয়া, নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইতেছিল। কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়, সপ্তম এবং ত্রয়োদশ শ্লোক ভিন্ন, আর একটি শ্লোকও যথাযথভাবে

উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই; বরং অধিকাংশ স্থলেই, স্বকপোল-কল্পিত পাঠ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্নের অধ্যবসায়-বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। ‡

যাহারা এই প্রস্তর লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহার ব্যাখ্যাকাণ্ডেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতে অসদর্থ

* Asiatic Researches, Vol. I, pp. 133—144.

† J. A. S. B. 1874.

‡ Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 160—167.

হইয়া, অনেকেই প্রকৃত ব্যাখ্যার সন্ধানলাভ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক কিল্হর্ণের উক্ত ব্যাখ্যা-কাহিনী।

পাঠেও দুই এক স্থলে সংশয়ের অভাব ছিল না। অনুসন্ধান-সমিতি উপর্যুপরি এই স্তম্ভ-লিপির পাঠ সংকলনের চেষ্টা করিয়া, এবং স্তম্ভগাত্র উৎকীর্ণ লিপির সহিত প্রচলিত পাঠ মিল করিয়া দেখিয়া, একটি বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত করিয়া, বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকিলেও, এ পর্যন্ত ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

এই প্রস্তর-স্তম্ভট এক দিকে দ্বয়ং হেলিয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার বজ্রদৌর শীর্ষভাগ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্ত ইহার মূলদেশে সম্প্রতি একটি ইষ্টক-বেদিকা সংযুক্ত হইয়াছে। তাহার পরিধি ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি। বেদিকা-সংলগ্ন প্রস্তরস্তম্ভ-মূলের পরিধি ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। বেদিকার উপর হইতে ১ ফুট ৪ ইঞ্চি উর্দ্ধে প্রস্তর-লিপিটি সমাপ্ত লাভ করিয়াছে। তাহা সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ অষ্টাবিংশতি পংক্তি-বিশিষ্ট অষ্টাবিংশতি-শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য বলিয়া কথিত হইতে পারে। পংক্তিগুলি প্রায় ১ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ, অক্ষরের আয়তন অর্ধ ইঞ্চি হইবে। ১২২২৩২৫২৭ সংখ্যক শ্লোকের কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অত্যাশ্চর্য অক্ষরাবলী যেরূপ সুদৃশ্য, সেইরূপ সুখপাঠ্য। স্তম্ভটি এক অখণ্ড কৃষ্ণভাস ধূসর প্রস্তরে নির্মিত; তাহার সর্বোচ্চ যে “বজ্রলেপ” সংযুক্ত ছিল, স্থানে স্থানে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি স্তম্ভগাত্র বিলক্ষণ রক্ষণ। এই প্রস্তর-লিপিতে যেসকল ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদে দৃষ্টব্য।

১। শাণ্ডিল্যবংশে * [বিষ্ণুঃ ?], † তদীয় অম্বরে বীরদেব, তদগোত্রে পাকাল, এবং পাকাল হইতে [তৎপুত্র] গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

* এই বংশোদ্ভব গুরব মিশ্র [অষ্টাদশ শ্লোকে] “জমদগ্নি কুলোৎপন্ন” বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, এই বংশ রাণী-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের সুপরিচিত শাণ্ডিল্য-বংশ হইতে পৃথক বলিয়াই বোধ হয়।

† এই শ্লোকের প্রথম দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দে যে বীজি-পুরুষের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার বিসর্গ-চিহ্ন মাত্রই বর্তমান

২। সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে,—[শক্র] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্বাদিকেরই অধিপতি, দিগন্তবরা অধিপতি ছিলেন না; [কিন্তু বৃহস্পতির গায় মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটিমাত্র দিকেও [সত্যঃ] ‡ দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া ছিলেন; [আর] আমি সেই পূর্বাদিকের § অধিপতি ধর্ম্ম ॥ [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।

৩। নিসর্গ নির্মল স্নিগ্ধা চন্দ্রপত্রী কান্তিদেবীর ¶ গায়, অন্তর্বিবর্তিনী ইচ্ছার অনুরূপা, তাহার ইচ্ছানান্নী পত্নী ছিলেন।

আছে। অধ্যাপক কিল্হর্ণ তাহাকে “বিষ্ণু” বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু এরূপ অনুমানের কারণ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না।

‡ দ্বিতীয় চরণের শেষেও দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দ উৎকীর্ণ ছিল; তাহারও বিসর্গ-চিহ্ন মাত্রই অবশিষ্ট আছে। অধ্যাপক কিল্হর্ণ তৎসম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানের অবতারণা করেন নাই। অম্বয় অর্থ এবং ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই বিলুপ্ত শব্দটিকে [সত্যঃ] বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

§ অধ্যাপক-কিল্হর্ণ দ্বিত [ধর্ম্মঃ ক্রমলব্ধিয্য ” হলে] “ধর্ম্মঃ ক্রমলব্ধিয্য”-পাঠ লিপিকর-গ্রন্থাদির নিদর্শন বলিয়াই বোধ হয়। পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, “নবদ্বিয্য” শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল-নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

¶ এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্ম নামক রাজা ইতিহাস বিখ্যাত ধর্ম্মপাল। তাহার [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের [ষাটশতাব্দীর দ্বাদশ মার্গ দিনে] পাটলিপুত্রের জয়স্বক্কাবার হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার বিজয়-রাজ্যের ষড়-বিংশতিবর্ষে বুদ্ধগয়াধামে তাহার নামাঙ্কিত একটি প্রস্তর-লিপি [কেশব-প্রশস্তি] উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্বে আর কখনও পালবংশীয় নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্ম্মপালের পিতা গোপালদেবকে, “মাৎস্ত-স্নায়” দুরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, একথা ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৩য় শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। তারানাথের গ্রন্থেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া প্রবলের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হইয়া উঠিলে দেশের সেই অরাজক অবস্থার নাম সংস্কৃত সাহিত্যে মাৎস্ত-স্নায়।) গুরুডত্ত-লিপির এই শ্লোকের বর্ণনায়, ধর্ম্মপালের সময়েই [তাহার মস্তিষ্ক গর্গের মন্ত্রণা-বলে] মগধাদি অত্যাশ্চর্য প্রদেশে পালসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

¶ অধ্যাপক কিল্হর্ণ “কান্তি”-শব্দে চন্দ্রের “শোভাকেই” গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্ক বর্ণনা করিবার সময়ে, সেরূপ সাধারণ অর্থে “কান্তি”-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [প্রথম শ্লোকে] তাহার স্ত্রী

৪। বেদচতুষ্টয়রূপ-মুখপদ্ম-লক্ষণাক্রান্ত, স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পদগোরেবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, কমল-বোনি ব্রহ্মার ছায়, তাঁহাদের দ্বিজোত্তম * পুত্র, † নিজের “শ্রীদর্ভপাণি” এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সেই দর্ভপাণির নীতি কোশলে ‡ শ্রীদেবপাল [নামক] নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলা-সংহতিপূর্ণ রেবা [নন্দনা] নদীর জনক [উৎপত্তিস্থান বিজ্ঞাপকত্ব] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশ-ললাট-শোভি ইন্দু কিরণ-স্নেহায়মান গৌরীজনক [হিমালয়] পর্বত পর্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্তকালে অরুণরাগ-রঞ্জিত [উভয়] জল-রাশির আধার পূর্ব-সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৬। নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল §-

“স্রীনাথারি নীলিম্বা” বলিয়া বর্ণিত। এখানেও, শব্দান্তরের সাহায্যে, সেইরূপ উপমাই স্থচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরীধামের লোকনাথ-মন্দিরের প্রাঙ্গনে চন্দ্রমুর্তির দক্ষিণে, চন্দ্র-পত্নী কান্তি-দেবীর মূর্তি অত্যাঁপি দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রেও তাহার নির্দেশ আছে। যথা—

“চন্দ্রঃ স্রী নবপুঃ কাথ্যঃ স্রী নান্ববধবঃ প্রমুঃ।

বচন্ব্যাহু স্রীমহাভৈরাঃ সর্ভান্ববধবঃ মুখিতঃ ॥

ক্রমদ্বী চ স্রীমতী কার্য্যী নস্য ইবস্ব হস্তযোঃ।

কালী স্রীমস্রীমতী কার্য্যী নস্য দাস্ত্ব তু দল্লিম্বা ॥”

* অধ্যাপক কিল্হর্প এই শ্লোকের “দ্বিজেশ”-শব্দের চন্দ্র-বাচক অর্থ গ্রহণ করিয়া, [Epigraphia Indica Vol. II, p. 3] লিখিয়া গিয়াছেন “and the epithet *dvijesha*, applied to him, besides suggests, that he was like the Moon.” কিন্তু যে কবি [পূর্ব-শ্লোকেই] দর্ভপাণির মাতাকে চন্দ্র-পত্নীর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন, সেই কবি, তাহা বিশ্বৃত হইয়া, [পর-শ্লোকে] দর্ভপাণির জন্ত চন্দ্র-বাচক “দ্বিজেশ”-বিশেষণের চিন্তা করিতেই পারিতেন না। এখানে “দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ” বুঝাইবার জন্তই দ্বিজেশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

† [মনুঃ] কর্তৃপদের [আসীন] ক্রিয়া পদ উহা থাকায়, “দৃঢ়ান”-শব্দই ক্রিয়া-পদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতেছে। এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিস্কৃত] তাম্রশাসনে [৫-৬ শ্লোকে] দেবপালের জাতা জয়পাল নামক বিজয়ী বীরপুত্রবের বাহুবলই সাম্রাজ্য-বিস্তারের একমাত্র সহায় বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহার সহিত যে নীতি-কোশলেও সম্বন্ধ বর্তমান ছিল, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ ধরণি-বিজ্ঞাপক “কোণী”-শব্দ বৈদিক-সাহিত্যে [ঋগ্বেদ ১।৫৪।১] দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক-সাহিত্যে “কোণী” এবং “কোণী”-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অমর কোষের ২।১।২]

বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনাসমূহ বাহাকে নিরন্তর হর্কিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্ত] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

৭। সুররাজকর [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্রি-বরকে] অগ্রে চন্দ্রবিধাতৃকারী * [মহার্ষি] আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাক্রিত-পাদপাংস্র হইয়াও, স্বয়ং সচকিত † ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

৮। অত্রি হইতে ‡ যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ তাহার এবং শর্করা দেবীর পরমেশ্বর-বল্লভ § শ্রীমান্ সোমেশ্বর [নামক] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

“ধারা-ধরিত্রী ধরতী-জ্যোতী-জ্যা-কায়তী-জ্বিতিঃ” স্মরণীয়। এই শ্লোকের বর্ণনা-কোশলে রাজ-ভবনের নিকটেই মন্ত্রি-ভবন অবস্থিত থাকিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে গরুড়-স্তুপটি অত্যাঁপি তাহার পুরাতন প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দণ্ডায়মান আছে, তাহা যে মন্ত্রিভবনের একাংশমাত্র, তবিশেষে সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই; হতরং রাজধানীও তাহার অনতিদূরেই বর্তমান ছিল।

* “উড়ু-পু”-শব্দের অর্থ—চন্দ্র। এরূপ অর্থে “উড়ু-পু”-শব্দের প্রয়োগ কাব্যাদিতে বিরল হইলেও, নক্ষত্র-বাচক উড়ু-শব্দেই প্রয়োগ জ্যোতিঃশাস্ত্রে স্থপরিচিত। মহাভারতে [বনপর্ব] চন্দ্র-বাচক “উড়ু-পু”-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

“অদ্যহরদলং তস্য বসির্বলানিবাডুপম্ ॥”

† প্রবল পরাক্রান্ত পাল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে [স্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে] দেবপালদেবের “সচকিত ভাবে” উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে কর্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপাল দেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইবার কথা স্মরণ করিলে, লোক-নাথক মন্ত্রিগণকেই [King-maker] রাজ-নির্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। “সচকিত”-শব্দের প্রয়োগ [ইহিতে] সেই ঐতিহাসিক-তত্ত্ব স্থচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচ্চিৎ সম্মান-প্রদর্শন-বিজ্ঞাপনার্থ “সচকিত”-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বৌদ্ধ-নরপালগণের শাসন-সময়ে বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদমর্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিল্হর্প “অগ্রে”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—first offered to him a chair of state. মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধাণ্য ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

‡ সপ্তর্ষির একতম ঋষি অত্রির নয়ন হইতে ধ্যান-পরম্পরা-পরিণত-পরম-জ্যোতিরূপে চন্দ্র আবিস্কৃত হইবার যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, এই শ্লোকে এবং লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

§ “পরমেশ্বর-বল্লভ”-শব্দ দ্ব্যর্থঃ—[সোমেশ্বর পক্ষে] “রাজার প্রিয়”, [চন্দ্রপক্ষে] “মহাদেবের প্রিয়”।

৯। তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত [উচ্চ] স্থানে আরোহণ করিয়াও, [বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র-বিচার-সময়ে ধনঞ্জয়ের ত্রায়] ভ্রান্ত বা নির্দয় হইতেন না; তিনি অর্থিগণকে বিভবর্ষণ করিবার সময়ে, [তাহাদের মুখের] স্তুতি-গীতি শ্রবণের জন্য উদ্যত হইতেন না; তিনি ঐশ্বর্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে [সংবলিত] নৃত্যশীল * করিতেন; [বৃথা] মধুরবচন-প্রয়োগেই তাঁহাদিগের মনস্তষ্টির চেষ্টা করিতেন না। [সুতরাং] এইসকল জগদ্বিসদৃশ-স্বপ্নগোরবে তিনি সাধুজনের বিষয়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

১০। শিব যেমন শিবার, [এবং] হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম-প্রবেশ-কামনার আত্মানুরূপা রত্নাদেবীকে + যথাশাস্ত্র [পত্নীরূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। তাঁহাদিগের কেদারমিশ্র নামে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণিত কার্তিকেশ-তুলা † [এক] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার [হোমকুণ্ডোখিত] অবক্র-ভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমায়ি-শিখাকে চুষন করিয়া, দিক্চক্রবাল

* গতিবোধক বলুণ ধাতু হইতে “সংবলিত” হইয়াছে। অথের গতিবিশেষ “বলিত” নামে পরিচিত। ইহার ভাবার্থ, “নৃত্যশীল” বলিয়া গৃহীত হইল।

+ পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় “তরলাদেবী” পাঠ উদ্ধৃত করিয়া-ছিলেন। উইল্কিন্সের ইংরাজী অনুবাদে “রত্নাদেবী” পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পাঠ [রত্না] শুভগাত্রে স্পষ্টাক্ষরে উৎকীর্ণ আছে। এই নাম একালের পক্ষে স্মৃতিকর না হইলেও, সেকালে সুপরিচিত ছিল বলিয়াই, ইহার ব্যুৎপত্তি রঘুনাথ-চক্রবর্তী-কৃত অমর-টীকায় ব্যাখ্যাত আছে। “রত্না” শব্দের অর্থ, রমণীয়া—ইচ্ছাবিধিনি।

† এই শ্লোকে এক অর্থে কার্তিকেশকে, অন্য অর্থে কেদারমিশ্রকে, হুচিত করিবার জন্য অনেকগুলি স্বার্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশ্র-পক্ষে “শিখি-শিখা” হোমায়িশিখা; কার্তিকেশ-পক্ষে “ময়ূর-পিচ্ছ”। মিশ্র-পক্ষে “ক্ষারশক্তি” বহুবল; কার্তিকেশ-পক্ষে “শক্তি” নামক অস্ত্র। মিশ্র-পক্ষে “বিজ্ঞা” জ্ঞান; কার্তিকেশ-পক্ষে “মাতৃকাগণ”। মিশ্র-পক্ষে “যজ্ঞিয়া” যাগ যজ্ঞ; কার্তিকেশ-পক্ষে “অম্বর-নিপাত”। মিশ্র-পক্ষে “জাতরূপ” প্রশস্তরূপ; কার্তিকেশ-পক্ষে “কাঞ্চন”—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, স্লিষ্ট-প্রয়োগ-কৌশল বৃদ্ধিতে পারা বাইবে। কার্তিকেশের ধ্যানের সঙ্গেও ইহার কিছু সম্পর্ক আছে। যথা—

কার্তিকেশং নহ্যামাং ময়ূরীপরি-সংস্থিতং ।
তম-কাস্তন-বর্জ্যম্ হস্তি-হৃদম্ বর-মদং ।
হিম্মল্য মদ-হল্যাব লাল্যলঙ্কার-মুখিতাং ।
দমন-বদনং দিব সর্ব-সীলা-সমারতম্ ॥”

যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্মারিত শক্তি হৃদমণীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিজ্ঞা [যোগ্যপাত্র পাইয়া] তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্ব-কশ্মণ্ডণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন। §

১২। তিনি বাল্যকালে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই, চতুর্বিজ্ঞা-পয়োনিধি * পান করিয়া, তাহা আবার উল্লীর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া, অগস্ত্য-প্রভাবকে + উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন।

১৩। [এই মন্ত্রিবরের] বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গোড়েশ্বর [দেবপালদেব] † উৎকল-কুল উৎকলিত করিয়া,

§ এই শ্লোকের প্রথম-চরণোক্ত সমাসান্ত পদটি অধ্যাপক কিল্হর্ভ কর্তৃক ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি ইহাকে ব্যাকরণ-দ্রষ্ট বলিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—“As regards grammar I need draw attention only to the first compound in verse 11, which is formed incorrectly.” “শিখি-শিখা দিক্-চক্রবালকে চুষন করিতেছে” বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, ব্যাকরণ-দোষ সঙ্গটিত হইতে পারে; কিন্তু কবি বলিয়াছেন,—“দিক্চক্রবালই শিখি-শিখা চুষন করিতেছে।” হোমায়ি-শিখা [অজিহ্ব] অবক্র হইলে, “বোণ-ক্ষেম” হুচিত করে। অধ্যাপক কিল্হর্ভ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—“None of the ordinary meanings of *ajimha* appears very appropriate.” “অজিহ্ব”-শব্দের প্রয়োগ দ্রলভ হইলেও, অপরিচিত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। যথা—

“অজিহ্বাময়তাং যুগ্মা জীবন্ত ব্রাহ্মণ জীবিকাম্ ।”

* চতুর্থ শ্লোকের ত্রায় এই শ্লোকেও “বেদ”-অর্থে “বিজ্ঞা”-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিজ্ঞার সংখ্যা চতুর্দশ, মতান্তরে অষ্টাদশ। এখানে সে অর্থ হুচিত হয় নাই। সুতরাং কেদারমিশ্র বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বৃদ্ধিতে হইবে।

+ অগস্ত্য [সমুদ্রপান-কালে] বালক ছিলেন না। তিনি একটী-মাত্র সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে আর উল্লীর্ণ করিতে পারেন নাই; ইহাই [ইঙ্গিতে] উপহাসের কারণ বলিয়া ধনিত হইয়াছে। অগস্ত্য ঋষি বলিয়া, উপহাসের অবোধ্য; তাঁহাকে উপহাস করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তজ্জন্তই “বাল এব” বলিয়া, কবি বুঝাইয়া-ছেন,—কেদারমিশ্র বালক বলিয়াই, এরূপ করিয়াছিলেন;—তাহা ক্ষম্যর্হ।

† এই শ্লোকোক্ত “গোড়েশ্বরের” নাম উল্লিখিত হয় নাই। পূর্বাপর-সামঞ্জস্য-রক্ষার্থ, তাঁহাকে “দেবপালদেব” বলিয়াই বৃদ্ধিতে হইবে। “চির”-শব্দেও তাহাই হুচিত হইয়াছে। দেবপালদেবের [মুন্ডেরে আবিস্কৃত] তাত্রশাসনে ৩৩ সংখ্য লিখিত থাকায়, তাঁহার দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নারায়ণপালদেবের [ভাগল-পুরে আবিস্কৃত] তাত্রশাসনে [৬ শ্লোকে] দেবপালদেবের শাসন-সময়েই [তদীয় ভ্রাতা ব্রহ্মপাল কর্তৃক] উৎকল বিজিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হুণ-গর্ক খর্বাকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্প চূর্ণাকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বহুস্বরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৪। তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না;— মনে করিতেন, তাঁহার দ্বারা অপহৃত বিত্ত § হইয়াই, তাহার যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রু-মিত্রে নির্বিবেক ছিল। [কেবল] ভব-জলধি-জলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অত্র উদ্বেগ ছিল না। তিনি [সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয়-বাসনা ক্লান্তি করিয়া, পরম-ধাম-চিন্তায় আনন্দলাভ করিতেন।

১৫। সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি [কেদারমিশ্রের] যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শত্রু সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলাভরণা বহুস্বরার চির-কলাণকামী শ্রীশূরপাল * [নামক] নরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্ত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র [শাস্তি] বারি + গ্রহণ করিয়াছিলেন।

§ “ভয়মদন্তনিত্যান্” এই বিশেষণ-পদের ব্যাখ্যা * করিবার অল্প অধ্যাপক কিল্হর্ন চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল লিখিয়া গিয়াছেন,— “He allowed suppliants to take freely away his riches.” উইল্কিন্স কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্যের আভাস দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,— “He considered his own acquired wealth the property of the needy.” এই বিশেষণটি সমাজ তত্ত্বের নিপুণ রহস্য-উন্মোচিত করিয়া, সেকালের বাঙ্গালার ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

॥ অধ্যাপক কিল্হর্নের অনুবাদে ‘পরিমুদিত’-শব্দের [বৈজ্ঞানিক-সম্মত] চূর্ণাকৃত [crushed] অর্থ গৃহীত হইয়াছে; এবং তজ্জন্তই গ্লোকার্ণ বিকশিত হয় নাই। উপনিষৎ ও দর্শনাদিতে ব্যবহৃত “মুদিত-কথায়”-শব্দ সুপরিচিত। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়;— ‘আজার-স্বর্গী মলয়জিঃ মলয়স্বর্গী ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলক্ষ্মী সন্ময়স্বর্গী নিদ্রমৌল্য সন্ময়ঃ সন্ময়ঃ সন্ময়ঃ পাব’ ‘দর্শয়তি.’ ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়া গিয়াছেন,— “রাগ-বেদাদি দোষের নাম কথায়; জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসরূপ কার-জলে তাহা [মুদিত] ক্লান্ত হইয়া থাকে।” যথা,— “ক্লাম্যাদি বাগ-দ্বিঘাদি দোষঃ [নস্য বজ্রল-রূপলান্], জ্ঞান বৈরাগ্যাভ্যাসরূপ জাহ্নবী জালিনী স্রবিলী বিলাসিতঃ” ইত্যাদি।

* এই শ্লোকের “শূরপাল”কে, ডাক্তার হরগণি “শ্রমক বিগ্রহপাল” বলিয়া গ্রহণ করায়, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক কিল্হর্ন লিখিয়া গিয়াছেন,— “As to Suropala I readily adopt Dr. Hœrle’s suggestion that he is identical with the Vighrahapala of the Bhāgalpur copper-plate, the immediate predecessor of Nārāyanapala.”

+ অনেকে এই শ্লোকে [অন্তর রাজেন্দ্রলালের মতানুসরণ করিয়া,]

১৬। তাঁহার দেবগ্রাম-জাতা † বক্সা [দেবী] নারী পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া, এবং [দক্ষ-দুহিতা] সতী অনপত্যা § [অপূজ্যবতী] বলিয়া, তাঁহাদের সহিত [বক্সা দেবীর] তুলনা হইতে পারে না।

১৭। দেবকী গোপাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশোদা সেই লক্ষ্মীপতিকে [আপন পুত্ররূপে] স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বক্সা দেবীও, সেইরূপ, গোপাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশো-দাতারা ॥ তাঁহাকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮। তিনি জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্ন-কৃত চিত্তক * [অপর] দ্বিতীয় রামের [পরশুরামের] ছায়, রাম

শূরপালদেবের “অভিষেক-ক্রিয়ার” সন্ধান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু “ভূয়ঃ”-শব্দ তাহার প্রবল অন্তরায। বহুলোকে আত্মকল্যাণ-কামনায় যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, মন্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিয়া থাকে। “নানাসাগর-মেখলাভরণা বহুস্বরার চির-কলাণকামী” শূরপাল নামক নরপালও সেইরূপ করিতেন। “ভূয়ঃ” শব্দে, কেদারমিশ্রের অনেকবার যজ্ঞ করিবার, এবং শূরপালদেবেরও অনেকবার [যজ্ঞ-স্থলে] মন্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই শ্লোকে যদি কেউ ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে তাহা এই,—(১) শূরপালদেবের শাসন-সময়েও, বরেন্দ্র-মণ্ডলে বাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (২) বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজা যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, মন্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন; এং (৩) তাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কেদারমিশ্রকে বৃহস্পতির সহিত এবং শ্রীশূরপালদেবকে ইন্দ্রদেবের সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহারই আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

† মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম. এ. [রামচরিত কাব্যের ভূমিকায়] দেবগ্রামকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেন, তাহার কোন কারণের উল্লেখ করেন নাই।

§ এই শ্লোকের “অতুল্যা”-শব্দ রচনা কৌশল-বিজ্ঞাপক। দক্ষ-দুহিতা সতী সন্তান-লাভের পূর্বেই, দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণ বিসর্জন করায়, “অনপত্যা” ছিলেন। লক্ষ্মীও চঞ্চলা বলিয়াই সুপরিচিত। সুতরাং, ইহাদের সহিত তুলনা দিতে না পারিয়া, কবি “অতুল্যা”-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

॥ এই শ্লোকে দ্বিষ্ট প্রয়োগের অভাব নাই। দেবকীন্দন-পক্ষে অর্থ সুব্যক্ত। বক্সা-দেবীর পক্ষে “গো-পাল-প্রিয়-কারকের” অর্থ পৃথিবী-পালক “রাজার” প্রিয়কারক; “পুরুষোত্তমের” অর্থ “পুরুষশ্রেষ্ঠ” এবং “যশোদার” অর্থ “যশোদাতা”। এই অর্থে “যশোদা”-শব্দ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় [৪।৪।৬২] ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

“যশোদা ত্বা যশসি নিজীদা ত্বা নিজস্বীতি।”

* পরশুরাম-পক্ষে অর্থ—“সম্পন্ন ক্রিয়াদিগের নিধন-চিন্তাকারী”; মিশ্র-পক্ষে অর্থ—“সম্পন্ন-মন্ত্রচিন্তক” [জ্যোতিষিক গণনাকারী]।

[অভিরাম], শ্রীগুরুবমিশ্র + এই আখ্যায় [পরিচিত ছিলেন]।

১৯। [পাত্রাপাত্র-বিচার]-কুশল গুণবান বিজিগীষু শ্রীনারায়ণপাল [নরপতি] যখন তাঁহাকে মাননীয় † মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অশ্রু [প্রশস্তি] প্রশংসা-বাক্য কি [হইতে পারে?]।

২০। তাঁহার বাগবৈভবের কথা, আগমে § ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, মহতের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তির কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথা, এবং বেদার্থ-চিন্তা-পরায়ণ অসীম-তেজঃসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা, ধর্ম্মাবতার ॥ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

২১। সেই শ্রীভৃৎ [ধনাঢ্য] এবং বাগবীশ [সুপণ্ডিত] ব্যক্তিতে একত্র মিলিত হইয়া, পরম্পরের সখ্য-লাভের

+ অধ্যাপক কিল্হর্গ ইহার নাম “রামগুরুব মিশ্র” বলিয়া লিখিবার পর হইতে, অনেকেই “রামগুরুব” লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। “শ্রীগুরুব মিশ্রাখ্য” বলিয়া কবি প্রকৃত নামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; রাম-শব্দ তাহার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিকৃত] তাম্রশাসনে [৫২—৫৩ পঙ্ক্তিতে] ভট্টগুরুব “দূতক” বলিয়া উল্লিখিত। ধর্ম্মপালের এবং দেবপালের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপাল এবং যুবরাজ রাজ্যপাল “দূতক” বলিয়া উল্লিখিত। ভট্টগুরুব কর্ত্ত্ব সমাদরের পাত্র ছিলেন, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ অধ্যাপক কিল্হর্গ “traditional lore” বলিয়া “আগম”-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ অর্থে “আগম” শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল শাস্ত্রই “আগম”; তন্মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্রই “আগম” নামে প্রসিদ্ধ। সকল তন্ত্র “আগম” নহে; সপ্ত-লক্ষণ-সংযুক্ত কোন কোন তন্ত্রই “আগম” নামে কথিত। যথা—

“আগম” পদ্মবক্ত্তান্ত গনন্য গিরিজাসুখি।

মনস্ব বাসুদেবস্ব তন্মাদ আগম ভূত্ব্যনি।”

যথা

“আগমঃ শিববক্ত্তা ম্ভী গনন্য গিরিজাসুখি।

ময়সম্বা হৃদম্ভাজি তন্মাদাগম ভূত্ব্যনি।”

“আগম” বোদ্ধা বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইত। যেরূপতঃ তাহা উল্লিখিত আছে। যথা—

“ন বেদঃ প্রণবঃ স্মৃতিঃ মন্মদী বেদ-সমম্মিতঃ।

তন্মাদ বেদপদী মন্মদী বেদান্ত আগমঃ স্মৃতিঃ।”

বিচার-কার্যে ব্যবহৃত সাক্ষ্যপত্রাদি “আগম” নামে ব্যবহার-মাতৃ-কায় উল্লিখিত আছে; মনুসংহিতায় পারিভাষিক অর্থে “আগম” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা—

“নাথম্ভাঃসামঃ কথিম্ভানুস্মান্ প্রতি বর্ত্তনি।”

এই শ্লোকের “ধর্ম্মাবতার”-শব্দ রাজাকে হুচিত করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে আপন তাম্রশাসনে ভট্টগুরুবের প্রশংসা করিয়া ছিলেন, তাহা “ভাগলপুর-লিপিতে” দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানই, স্বাভাবিক শক্ততা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই যেন [একত্র] অবস্থিত করিতেছেন।

২২। শাস্ত্রামূলীন-লক্ষ-গভীর-গুণ-সংযুক্ত বাক্যে [তর্কে] তিনি বিদ্বৎ-সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ভ * চূর্ণ করিয়া দিতেন; এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও † অসীম-বিক্রম-প্রকাশে, অন্নক্ষণের মধ্যেই, শত্রুবর্গের “ভটীভিমান” [বোদ্ধা বলিয়া অভিমান] বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

২৩। যে বাক্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হইত না, তিনি সেরূপ [বৃথা] কর্ণ-সুখকর বাক্যের অবতারণা করিতেন না। যেরূপ দান পাইয়া [অতীষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া] যাচককে অশ্রু ধনীর নিকট গমন করিতে হয়, তিনি কখনও সেরূপ [কেলি-দানের] ‡ দান-ক্রীড়ার অভিনয় করিতেন না।

২৪। কলিযুগ-বায়ীকির § জন্ম-সূচক, অতি রোমাঞ্চোৎপাদক, ধর্ম্মতিহাস-গ্রন্থ-সমূহে, সেই পুণ্যাত্মা শ্রুতির বিবৃতি [ব্যাখ্যা] করিয়াছিলেন।

২৫। তাঁহার স্মরণ-তরঙ্গিণীর স্মার অ-সিক্ত-গামিনী

* এই শ্লোকের “পরবাদি-মদাবলম্বিতঃ” প্রয়োগটি উল্লেখযোগ্য। প্রতিবাদী বা বিরুদ্ধবাদীর নাম “পরবাদী।” “অবলেপন”-শব্দের অর্থ “লেপন” এবং “গর্ভ”। এখানে আত্ম-প্রাধান্ত-বিজ্ঞাপক গর্ভ বৃদ্ধা-ইবার জন্তই “মদাবলেপন” ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ অর্থে “অবলেপন”-শব্দের ব্যবহারের সুপরিচিত নির্দর্শন [মেঘদূতের]

“দিক্‌নাগানানি পথি পরিভবন্‌ স্কুলহস্তাবলম্বিনা।”

+ ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম-প্রকাশের এই আখ্যায়িকা কবি-কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। সেকালে বাঙ্গালা দেশেও যে ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া সুপরিচিত ছিল তাহা কুমারপাল-দেবের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বৈদ্যদেব কর্ত্ত্ব [বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনোক্ত] কামরূপ-জয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পাওয়া যায়।

‡ এই শ্লোকের চতুর্থ চরণের শেষ দুইটি অক্ষর বিনুগু হইয়া গিয়াছে। ভট্টগুরুব বাঁহার মন্তব্য করিতেন, সেই নারায়ণপালদেবও এইরূপ দানশীল ছিলেন বলিয়া তদীয় [ভাগলপুরে আবিকৃত] তাম্রশাসনে [১৪শ শ্লোকে], পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ এই শ্লোকে “সূচক”-অর্থে “পিশুন”-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অধ্যাপক কিল্হর্গ এই শ্লোকের প্রথম চরণের শেষে একটি (চ) অক্ষর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মূল লিপিতে তাহা না থাকায়, ছন্দোভঙ্গ ঘটতে পারে মনে করিয়া, অধ্যাপক কিল্হর্গ এরূপ করিয়া থাকিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ হলে চরণান্ত অক্ষরটি গুরুবর্ণ রূপে ধরিয়া লইবার রীতি প্রচলিত থাকায়, ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে না।

প্রসন্ন-গম্ভীরা বাণী [অগংকে] যেমন তৃপ্তিদান করিত,
সেইরূপ পবিত্র করিতে । ॥

[এই] প্রশস্তি হৃদধার বিকৃত্ত্ব কৰ্ত্তৃক উৎকীর্ণ
হইয়াছে । §

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

২৬। তাঁহার বংশে ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃহ গ্রহণ করিয়া,
আবার স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; [ইতি]
এইরূপ মনে করিয়া, [লোকে] তাঁহার পূৰ্ব্ব-পুরুষগণের
এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত ।*

২৭। তাঁহার [স্কুমার] • শরীর-শোভার ত্রায়
লোক-লোচনের জ্ঞানদায়ক, তাঁহার উচ্চাত্তঃকরণের
অতুলনীয় উচ্চতার ত্রায় উচ্চতা-যুক্ত, তাঁহার সূদৃঢ় প্রেম-
বন্ধনের ত্রায় দৃঢ়সংবন্ধ, কলিহৃদয়-প্রোথিত-শল্যবৎ সুস্পষ্ট
[প্রতিভাত] এই স্তম্ভে, তাঁহার দ্বারা হরির প্রিয়সখা
ফণিগণের [শত্রু] এই গরুড়মূর্ত্তি [তাক্ষ্য] আরোপিত
হইয়াছে । †

২৮। তাঁহার যশ অখিল দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া,
এই পৃথিবী হইতে পাতাল-মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া,
[আবার] এখানে হতাহি-গরুড়চ্ছলে উথিত হইয়াছে । ‡

॥ এই শ্লোকের বিলুপ্ত অক্ষরগুলির মধ্যে উইল্কিন্স “জিধা”-শব্দটি
পাঠ করিয়া, “flowing in a triple course,” বলিয়া ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । এক্ষণে কেবল “ধা”-অক্ষরটি কোনক্রমে দৃষ্টগোচর হয় ।
“স্বধূর্নী” [মন্দাকিনী] সমুদ্রে পতিত হয় নাই বলিয়া, “অসিন্ধু-
প্রসূতা” কিন্তু বাণী-পক্ষে তাহার অর্থ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না ।
তৎকালে সিদ্ধদেশ যবনাক্রান্ত থাকায়, তথায় পাল-সাম্রাজ্যের প্রধান
মন্ত্রীর আদেশবাণী প্রসূত হইত না,—এইরূপ অর্থ ইঙ্গিতে হুচিত
হইয়াছে কিনা তাহা চিন্তনীয় ।

* এই শ্লোকের “প্রপদিরে” ক্রিয়াপদের অন্তস্ত কৰ্ত্তৃপদ “লোকা”
ধরিয়া লইয়া, অধ্যাপক কিল্‌হর্ন মর্গাযুবাদ করিয়াছেন । ব্রহ্মার নব-
মানস-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার পৌরাণিক আখ্যায়িক। অবলম্বন
করিয়া, এই শ্লোক রচিত হইয়া থাকিতে পারে ।

† অক্ষর-বিলোপ এই শ্লোকের ভাব-প্রকাশের অন্তরায় হয় নাই ;
কিন্তু বিলুপ্ত অক্ষরগুলির দ্বারা কি কি শব্দ উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা
নিঃসংশয়ে অনুমান করিবার উপায় নাই ।

‡ বাহারা অন্যের যশঃ স্তুত করিতে পারে না, তাহারা সর্ববৎ খল
বলিয়া, সংস্কৃত-সাহিত্যে স্থপরিচিত । তাহাদের পরাভব হুচিত করি-
বার জন্ত, স্তম্ভের উপর “হতাহি-গরুড়-মূর্ত্তি” স্থাপিত হইয়া থাকিতে
পারে । যশেরাবর্ণ শুভ বলিয়া স্থপরিচিত ; তাহার সহিত গরুড়ের
বর্ণের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা চিন্তনীয় । তাত্ত্বিক পদ্ধতি-
ক্রমে গরুড়-পূজার যে ধ্যান উল্লিখিত আছে, তাহা এইরূপ ; যথা—

“বন্দ্যল-বল্লিয়ুদ্ভাব-কমলগতং পদ্মভূতায়বয়ং”
ক্লুদ্যাক্লুদ্যং দ্যবীন্দ্রৈবময়বকবং পদ্মনীলং সুবরাদ্ ।
দুশান্তিচ্ছদিতুচ্ছং সমবদ্বিল্লিবিষদীষণং দ্রাঘমূলং
দ্রাঘশ্রেষ্ঠাং বিবং দীনবল্লভময়ং পদ্মিবাং মজীহন্ত ॥”

বিবিধ-প্রসঙ্গ

জাপানের ভূতপূর্ব সম্রাট মুৎসুহিতোর রাজত্বকালে চল্লিশ
পঞ্চাশ বৎসরে জাপানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে,
ইউরোপে তাহা হইতে চারিশত বৎসর লাগিয়াছিল ।
আধুনিক বা প্রাচীন আর কোনো রাজার আমলে
এরূপ পরিবর্তন হয় নাই । অতএব তিনি যে সকল
দেশের রাজাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীস্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ
নাই । তাঁহার দেশের বহু মনোবী জাতীয় জীবনের ও
রাষ্ট্রীয় নানা বিভাগের উন্নতি করিয়াছেন এবং তিনি
সাক্ষী গোপালের মত দেখিয়াছেন, তাহা নয় ; তিনি
সর্ববিধ পরিবর্তনের ও উন্নতির মূলে ছিলেন, এবং
তিনি সকলের পরিচালক ছিলেন । বাহারা ভারতবর্ষের
রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ,
তাঁহারা জাপানের কথা ভাবিলে আশাবিত হইতে
পারেন । কিন্তু জাপানে ভারতবর্ষে প্রভেদটাও ভুল উচিত
নয় । জাপানে এত ভাষাবাহুল্য, জাতিবৈচিত্র্য এবং
ধর্মসম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ছিল না । জাপান সর্ববিধ উন্নতিতে
রাজার সাহায্য পাইয়াছে । বিদেশীর অধীনতার অবসাদ
জাপানকে অসাড় করে নাই । এইসকল কথা স্মরণ
করিয়া জাপানীদের উৎসাহের দ্বিগুণ উৎসাহে আমরা
জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিলে, তবে আমরা সফলকাম
হইতে পারিব ।

এ. ও. হিউম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন দূরদর্শী প্রকৃত
হিতৈষী ছিলেন । অনেক ইংরেজ মনে করেন যে তিনি
ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ রাজত্ব লুপ্ত করিবার জন্ত কংগ্রেস
স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক ভারতে ব্রিটিশ
শাসন দৃঢ় এবং স্থায়ী করিবার জন্তই চেষ্টা করিয়াছিলেন ।
ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদসাধনই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত,

§ ইহা হৃদধারের চ্যুত-সংস্কৃত-রচনার নিদর্শনমাত্র ।

তাহা হইলে তিনি সিপাহী যুদ্ধের সময় সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন না, বরং তাহাদের সাহায্য করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে চিরস্থায়ী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে করিতেন যে ইহাতেই তাঁহার স্বদেশ ও ভারতবর্ষ উভয়েরই প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

এইজন রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি তাঁহার সময়, শক্তি ও অর্থ কংগ্রেসের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শিক্ষিত ভারতবাসীদের অনেকে সচেতন হইয়াছেন ও ভারতবর্ষের কল্যাণ হইয়াছে। যাহারা মনে করেন যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলে ইহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে না, তাহারাও হিউম সাহেবের নিকট ঋণী। কারণ ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর চরম আদর্শ কি, এই চিন্তা ও এতদ্বিষয়ক আলোচনার অন্ততম কারণ কংগ্রেস, এবং কংগ্রেসের মূলে হিউম। তিনি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। সকলেরই তাঁহার মত কর্তব্যসাধনে সর্বদা সচেষ্ট হওয়া উচিত।

হিউম সাহেব একজন বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিৎ ছিলেন। ভারতবর্ষের শিকারের পাখী সম্বন্ধে তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট সচিত্র বহি আছে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ খ্রিস্টিয় ছিলেন।

সাত বৎসর পূর্বে ৭ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গ যথাসাধ্য বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞা করা হয়। তাহার ফল আশাহীন হয় নাই। কিন্তু কিছুই হয় নাই, তাহাও বলা যায় না। সাময়িক কিছু ফল হইয়াছিল, স্থায়ী ফলও কিছু হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ শিরবিষয়ে আমাদের শিক্ষার অভাব, যথেষ্ট মূলধনের অভাব, শাসন ও পুলিশ বিভাগের বিরোধিতা, এবং অনেক প্রবঞ্চক দোকানদারের স্বদেশী বলিয়া বিদেশী জিনিষ বিক্রয় করা। কিন্তু আমরা যতবারই অকৃতকার্য্য হই না কেন, স্বদেশী লক্ষ্য ছাড়া উচিত নয়। জাতীয় চরিত্র উন্নত করিবার চেষ্টা, শিরবিষয়ে শিক্ষালাভ, মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা এবং স্বদেশী জিনিষ সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা আমাদের বিশেষভাবে করা

কর্তব্য। আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে একমাস কাল ধরিয়া কলিকাতায় স্বদেশী মেলা খোলা থাকিবে। ইহাতে পূজার বাজারে স্বদেশী জিনিষ ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা হওয়া উচিত।

গবর্ণমেন্ট প্রথমে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন বলিতেছেন যে আপনসোলে বা বরাকরে একটি খনির (Mining) এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালয় হইবে, অত্র একটি শিল্পশিক্ষালয় হইবে, এবং শিবপুরে যে সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে তথায় স্থাপিতব্য এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দেওয়া হইবে। এইরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নানারূপ আপত্তি আছে। প্রথম আপত্তি এই, যে, এই তিন রকম শিক্ষালয়ের শিক্ষিতব্য কতকগুলি সাধারণ বিষয় আছে। তজ্জন্ত তিন জায়গায় স্বতন্ত্র শিক্ষক, যন্ত্রাগার, প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্রভাবে খরচ করা অনাবশ্যক। তিনটি শিক্ষালয় এক স্থানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর একটি আপত্তি এই যে জগতের সমুদয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনীয়ারিং একটি প্রধান শিক্ষার বিষয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অঙ্গটি ছেদন করিয়া ইহাকে অঙ্গহীন কেন করা হইবে? শিবপুর যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, ত, কলিকাতার উপকণ্ঠে স্বাস্থ্যকর স্থান ত অনেক আছে বা করা যাইতে পারে। কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে আসানসোলের নিকটেও ত যায়গা পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা ঢাকার এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু কলিকাতাকে অঙ্গহীন করিয়া একাঙ্গ করা উচিত নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগও থাক, ঢাকাতেও কলেজ হউক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। ঢাকা ও কলিকাতায় কোন ঝগড়া নাই। যাহারা এই প্রসঙ্গে ঢাকা ও কলিকাতায় ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা দেশের শত্রু। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া যাহারা বঙ্গের দুটা ভাগ কল্পনা করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমবঙ্গের সীমা কোথায় এবং পূর্ববঙ্গেরই বা আরজ কোথায়? গবর্ণমেন্ট একটা ভাগ করিয়া দিলেই ত সেটা স্বাভাবিক ভাগ হয় না।

যে ভূভাগের ভাষা এক, বাহার অধিবাসীদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে, তাহা এক দেশ, তাহার স্বার্থ এক। যাহারা পূর্ববঙ্গের উপকার করিতেছি বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট করিতেছেন, তাহাদের কথায় কেহ ভুলিবেন না। পূর্ববঙ্গে নানাবিধ শিক্ষালয় খুব বাড়ুক, তাহা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট করিয়া ঢাকার উপকার করিতে যাহারা চান, তাহাদের চেষ্টার সমর্থন আমরা কোন ক্রমেই করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত কাশীপতি ঘোষ আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



শ্রীযুক্ত কাশীপতি ঘোষ।

জলপ্রবাহের শক্তি হইতে তাড়িত শক্তি উৎপাদনের উপায় ও কলকারখানা সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কম্পোপলিটান ক্লাবের (সার্বদেশিক সভার) ছইবার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ



শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার।

বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি নানা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহার পর তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বর্তমান বৎসরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এন্সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গ্রীষ্মাবকাশ ও অত্যন্ত ছুটির সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া চারি বৎসরের কাজ ছই বৎসরে করিয়াছেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সকলে যোগ্য ছাত্রদের একরূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

সুরেন্দ্রনাথও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এন্সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনিও ছুটির সময় অতিরিক্ত



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু।

পরিশ্রম করিয়া ৪ বৎসরের কাজ দুই বৎসরে করিয়াছেন। তিনি ঔষধ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষে যাহারা বাস করেন, তাঁহাদের ধর্ম বাহাই হউক না কেন, তাঁহারা সকলেই স্বদেশহিতৈষী হইতে পারেন। হয়ত ক্রমশঃ সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান স্বদেশভক্ত হইবেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষকেই পূর্বপুরুষদের ও নিজেদের মাতৃভূমি, ভাষ্যতবর্ষকেই নিজেদের প্রাচীন জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতার ধনি, জানিয়া, ভারতবর্ষ ভিন্ন তাঁহাদের গতান্তর নাই

বুঝিয়া, এই দেশকে যে ভাবে দেখেন, মুসলমানেরা সে ভাবে দেখেন না। মুসলমানদের নামগুলি বিদেশী, অথ সম্প্রদায়ের নামগুলি দেশী। মুসলমানদের ধর্ম ও নাম পৃথিবীর নানা দেশে একই রূপ হওয়ায় তাঁহাদের সকলের মধ্যে একটি বন্ধনরজ্জু আছে। ইহা খুব সুবিধাজনক। কিন্তু নামটি সর্বত্র একই রূপ হওয়ায় মুসলমান কোন কোন দেশে সম্পূর্ণ দেশী হইতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই পূরা দেশী হইতে পারেন না; বিশেষতঃ সেই সব দেশে যেখানকার সমুদয় বা অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান নয়; - যেমন ভারতবর্ষ।

মুসলমানদের শাস্ত্রে এমন কোন অলঙ্ঘনীয় বিধি আছে কিনা জানি না যে তাঁহাদের নাম আরবী হওয়াই চাই। শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানেরা বলিতে পারিবেন। খৃষ্টানদের শাস্ত্রে একরূপ নিয়ম নাই যে খৃষ্টান যে দেশেরই হউন, তাঁহার নাম ইহুদীদেশের হওয়া চাই ই। কারণ আমরা দেখিতেছি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন রায়, খৃষ্টান ছিলেন। আমাদের মনে হয় কোন শাস্ত্রীয় বাধা না থাকিলে কোন এক দেশের সকল লোকের নাম সেই দেশের ভাষা হইতে গৃহীত হওয়া উচিত। তাহা হইলে সমস্ত জাতিটার মধ্যে বেশ একটি জমাট ভাব আসিতে পারে।

ইউরোপের নানা জাতির লোকদের ব্যক্তিগত নাম অনেক স্থলে ইহুদীদেশীয় হইলেও, তাহা ঠিক ইহুদী নয়, যেমন দায়ুদ ডেভিডে পরিণত হইয়াছে।

অতীত ভারতবর্ষকে আমরা বাদ দিতে পারি না। অতীত ভারতের ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান আদি সকল সম্প্রদায়েরই শিখিবার ও গৌরব করিবার জিনিষ আছে। কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাসে ঝগড়া বিদ্বেষের বিষয়ও আছে। দেশহিতের জ্ঞান সকল সম্প্রদায়ের লোক সম্মিলিত চেষ্টা করিয়া যদি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই একটি ভারতীয় জাতি গঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা হুঃখিত হইলাম। তিনি মৈনপুরীতে ওকালতী

করিতেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়া পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবাসীতে তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল।

রক্তের বন্ধন সহজে ছিন্ন করা যায় না। ইউরোপে হাঙ্গেরীর খৃষ্টান মেগিয়ারেরা বংশতঃ মধ্য-এশিয়ার হুন। ইউরোপীয় তুর্কদের মুসলমানেরাও মধ্য-এশিয়ার তুর্ক। হুন ও তুর্কের মধ্যে হয় ত জাতিত্ব ছিল, হয় ত ছিল



আলেকজান্ডার ফোমা কোরস।

না। কিন্তু উভয়েরই পূর্বপুরুষেরা মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ছিল বলিয়া বর্তমান তুর্ক-ইতালীয় যুদ্ধে হাঙ্গেরীর খৃষ্টান মেগিয়ারেরা ইউরোপীয় তুর্কদের মুসলমান অধিবাসীদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেছে, খৃষ্টান ইতালীয়দিগের সঙ্গে নহে।

ফোমা ডি কোরস হাঙ্গেরীতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহার এই ধারণা হয় যে মেগিয়ারদের আদি জন্মভূমি তিব্বতে লাসার নিকট। তাই তিনি সেই পিতৃভূমি দর্শনার্থ ৩৬ বৎসর বয়সে এক বন্ধুর প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১৫০ টাকা মাত্র ব্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া ইউরোপ হইতে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে মিশরদেশ দর্শন করিয়া তিনি দুইবৎসর পরে তিব্বতে পৌছেন। সমস্ত পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন। কেবল মধ্য মধ্য সাগর ও নদী পার হইবার জন্য জাহাজ ও নৌকার সাহায্য লন। তিব্বতে তিনি নয় বৎসর ছিলেন। তথায় বাসকালে তিব্বতীভাষা শিখেন ও বিস্তর তিব্বতী পুঁথি সংগ্রহ করেন। সেই সমস্তই তিনি কলিকাতায় আসিয়া এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন। তিনি চারি বৎসর ধরিয়া ব্রায়েন হজসনের সংগৃহীত তিব্বতী পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করেন। গবর্ণমেন্টের বায়ে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ফোমা ডি কোরসের তিব্বতী ব্যাকরণ ও অভিধান বাহির হয়। তাহার পর তিনি তিন বৎসর পূর্ববঙ্গ ও সিকিমে ভ্রমণ করেন, এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার নিজ জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পাঁচ বৎসর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে থাকিয়া নিজের উপস্থিত পুস্তকাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিতে থাকেন, এবং সোসাইটীর পত্রিকায় তিব্বতের ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে লাসা যাইবার পথে দার্জিলিংে তাঁহার মৃত্যু হয়। তথায় তাঁহার কবর আছে। এখন উহার মেরামত হইয়াছে। হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞান-পরিষদ সম্প্রতি বঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটীকে তাঁহার একটি সুন্দর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। আমরা উহার ছবি এখানে দিলাম।

ফোমা ডি কোরস জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান দানেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও তাঁহার জাতির পিতৃ-ভূমি তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার জীবন তপস্বীর মত সাদাসিধে ছিল। তিনি মত্ত, তামাক বা অস্ত্রবিধ কোন মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। চা আর ভাত, এই তাঁহার খাদ্য ছিল। তাঁহার কেবল এক প্রহর পোষাক ছিল। তাঁহার সমুদয় আয় প্রাচ্যবিজ্ঞান

নানা শাখার উন্নতি ও বিস্তারকল্পে ব্যস্ত হইত। তাঁহার প্রধান কীর্তি তিব্বতী-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় প্রবন্ধ-গুলিও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইবে। এমন জ্ঞানব্রত তপস্বীর জীবনচরিত্র আলোচনা করিলে উপকার হয়।

হুইজেন বাঙ্গালী মনোবী, রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার সহাধ্যায়ী ভূদেব সুধোপাধ্যায়, কনৌজে পিতৃভূমি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অবশ্য কোমা ডি কোরসেব পিতৃভূমি-দর্শন-ব্যতীত মত উহা হ্রঃসাধ্য ছিল না, এবং সেইজন্য তেমন চিত্রস্মরণীয়ও হয় নাই।

পুস্তক-পরিচয়

করক—

শ্রীহরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত গল্পপুস্তক। প্রকাশক শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী, ১২১১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। ১০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

বহুদিন পূর্বে হরীন্দ্র বাবু বাংলা-সাহিত্যকে “সজ্জা” উপহার দিয়াছিলেন, যথেষ্ট “চিত্ররেখা” প্রকাশিত হইয়াছে, এখন “করক” লইয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যের ঘারে হাজির হইয়াছেন। বয়সের সঙ্গে শক্তি হয় ত বাড়িয়াই চলিতে পারে; কিন্তু প্রকাশের অজস্র আচুর্ঘ্য যে দিন দিন কমিয়া আসে, তাঁহার পূর্বের দান গল্পের ‘গেটরা’ এবং বর্তমানের দান গল্পের ‘কোটা’ই তাহার সাক্ষ্য দিবে। এই কোটার আটটি কথিকা আছে, এগুলিকে রত্নকথিকা বলা বাইতেও পারে।

এই গল্প কয়টিতে হরীন্দ্রনাথের ঘোষ গুণ ভুল্যভাবেই বর্তমান। একটি বিন্দু সজল সরল করুণাই অধিকাংশ গল্পের আশ্রয়, এবং এইখানেই লেখকের বিশেষত্ব। লেখক কবিত্বময়, শিক্কা এবং সংস্কারের কৃত্রিমতা-বিমুক্ত আপন চিন্তাধারাকে তিনি বাধানিমুক্ত ভাবে শিশু-পুত্র এবং তরুণীমণ্ডলের অন্তরতনু হৃদয়তে বহাইয়া দিয়াছেন। লেখকের সহানুভূতির স্পর্শে গল্পগুলিতে মানব-নিরন্তর আশ্রয় এবং বুদ্ধজীবনের মধ্যে একটি মধুর একাবস্বন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃত সহানুভূতির নিকট বাহিরের কোনো বাধা টিকিতে পারে না; রম্যনাথ তাই এলাশ বকিতে বকিতে সন্ধ্যাসন্ধ্যার গাঁছটির কাছে আসিয়াই প্রাণত্যাগ করে, তাসিম আব্দুল্লাহর নিষ্ঠুর কবল হইতে মুক্ত শেষ দুঃখীটিকে বন্ধে চাপিয়া থাকে, ব্রজবংশবাসী তাই বহুদিন পরে আপন অসুস্থত কুহুরটিক সন্ধান পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মানবশিশুর বস্তুস্বাপার অনেকগুলি গল্পেরই কেন্দ্র। সেখানেও জরীয়ারপুল ও গরীবের ছেলে, কলিকাতাবাসী ও পাড়ারগেয়ে, মুসলমান কাসিম ও হিন্দু জীবন, কলেজের যুবক ও অপরিচিত ধনী বালক-পুত্রের মধ্যে বাহিরের বাধা স্তম্ভ করিয়া অন্তরের মিলনের ইতিহাস উজ্জলভাবে চিত্রিত হইয়া গিয়াছে; সেখানেও বালাসুন্দরী সরলা-সুহৃদারীর বয়সজীবনের ভেতরে ডুবাওয়া দ্বিতীয় সরলার ছেলে বতীবের আপনাকে ডুবাতে হয়।

হরীন্দ্র বাবুর “একতারাতে একটি বে তার” তিনি আপন মনে সেইটাই বাজান। ইহাতে করুণারসের আদিশ সরল বরণটি রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এই ভাবপ্রধান বিরলবর্ণ একরঙা ছবিটিতে বহুচিহ্ন মানবব্যাপারের চিত্র কিছুতেই প্রকটিত হইতে পারে না। কাহণ্যই হরীন্দ্র বাবুর গল্পের আশ্রয়—কিন্তু সেই আশ্রয়টি কত ক্ষীণ। সংস্কার-জ্ঞানের চকুপল্লবপ্রান্তে ইহা ক্ষণকালের জন্য বিরাজ করিতে পারে সত্য, কিন্তু জীবনের মূলদেশে রস-সঞ্চারের দাবী ইহার খুব বেশী নাই।

বৈতানিক—

শ্রীহরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কবিতা পুস্তক। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী ১২১১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য চার আনা।

ইহাতে ভগবদ্ভক্তি, নারী, গৃহচিহ্ন, “পার্শ্ব প্রেম” ইত্যাদি বিষয়ক বহুশিষ্ট কবিতা আছে। তাব মধ্যে অনেকগুলিই সনেট।

“আপন জনার চিন্তে নার

জীবন-স্তরা অভিমানের”

এই গানটি স্মরণ। ‘বিপদের’ স্বরূপ বর্ণনার কবি বলিয়াছেন,—

‘বিপদা বিপদা নখে, শোণিতে উজ্জলি

সারা অঙ্গে লিখে দিলি হরি-নামাবলী।’

ইহা যতি স্মরণ। কিন্তু ইহার মধ্যে হৃৎকবি শ্রীহরীন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভাব উ কি মারিতেছে।

‘গৃহলক্ষী’ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

‘আছ তুমি নিরবধি

সংসার-সরসীবৃকে শতদল সম

প্রজ্ঞাধিরা পক্ষ নীর।

*

*

*

বন্দী কভু নহ তুমি বন্দনীয়া নারি।—

এমের এ ঘরকাব নাহি কোন ঘারী,

তবু আছ চিরস্থির, ধীর, অচঞ্চল,

বন্ধে ভরি স্নেহ-ভক্ষ্য হৃদয়ার পরোহি।

*

*

মোরো অন্ধ, অন্ধ তাই

গৃহায়নে রাক্ষ-চাঁদ দেখিতে না পাই।’

ইহাও চমৎকার। ‘হৃদয়’ এবং ‘শেষ’ দিয়া পুস্তকের পরিসংস্টি হইয়াছে। মানবজন্মের সর্বশেষ প্রাণনাট্য কবি ধরিয়া দিয়াছেন,—

‘কবে বল কোথা কোন নেপথ্য আড়ালে,

কোন রক্তনীর প্রান্তে ধীপ চক্রবালে,

ফুরাইবে এ বিরহ? পারাবার-শেষে

চুপিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে।’

‘বিরহে’ কবিতাটিও মন্দ নহে। ‘স্বপ্নের পথে’ তাবা ও হৃদয়প্রান্তের স্বচ্ছন্দ এবাহ উপভোগ্য।

ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতাই কবিত্ব হিসাবে প্রথম শ্রেণীর নহে। সনেটগুলি প্রায়ই আড়ট। নতুন চিন্তা দেওয়া দুবে ধাব, পুরাতনকে নতুন করিয়া দেখাইবার মত ভাবাছন্দের ইন্দ্রজাল আছে কবিতাগুলিতে এমন দুই চারিটি পাণ্ডিত্যও খুঁজিয়া বেশী পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গ—

শ্রীহরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী, ১২১১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। ১২১ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক চতুর্দশটি সম্বর্ত আছে। সম্বর্তগুলি নিতান্তই সাধারণ বকরের। চিন্তার এবং চিন্তাপ্রকাশে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই। ভক্তির আন্তরিকতা থাকিতেও বা পারে, কিন্তু লেখকের আন্তরিকতাকে পাঠকের নিকট স্থাপিত করিয়া তুলিতে লেখকের পক্ষে যে শক্তির প্রবকার এই পুস্তকে তাহার বশেষ অভাব আছে বলিয়াই মনে হয়। মহাজনদেব অনুগ্রহে যে সব বড় বড় কথা দেশের হাওয়ার ভাসিমা বেড়াইতেছে তার মধ্যে কোনো কোনোটির সাক্ষাৎলাভ এই প্রবন্ধগুলিতে হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু লেখক সেই পদের কথাগুলিকে আপনায় করিয়া লইতে পারেন নাই। ধর্ম সমাজ ইত্যাদি গভীর বিষয়ে লেখনী চালাইতে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনার প্রবকার এই পুস্তকে তাহার বিশেষ কোনো পরিচয় নাই। এইসব বিষয়ে গভীর উপলব্ধির কোনো রকম অপেক্ষা না করিয়াই তরলভাবে আলোচনা করিতে বাওয়া সমীচীন নহে। সাহিত্যালোচনা সম্পর্কীয় সম্বর্ত দুটিতেও চিন্তা ও ভাবের গভীরতা বশেষ নাই।

আঙুর—

শ্রীপট্টলাল ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ; ৩৬৬২, পদ্মপুর রোড ভবানীপুর, কলিকাতা। ১২০ পৃষ্ঠা; মূল্য আট আনা, বাঁধাই দশ আনা।

ইহাতে এগারোটি গল্প আছে। সবগুলি গল্প তেমন ভাল না হউক মোটের উপর এ সংগ্রহটি পড়িয়া আমরা স্তব্ধ হইয়াছি। গল্পগুলিতে সাধারণতঃ আখ্যান বস্তুর অভিনবতা এবং সম্বন্ধবহানের (situation) বৈচিত্র্য আছে। লেখকের রচনার সলীল হান্তরসভঙ্গি মনোজ্ঞ; উত্তর-প্রভুতরগুলি অর্ধহীন কথা কাটাকাটিতে প্রকাশিত হান্তরসংঘর্ষের চুস্তেই মাত্র নহে; এগুলিতে সৌন্দর্য্য ও হান্তরসের বহুতা আছে। হান্তরসম্পৃক্ত হইলেও অবসানটি অধিকাংশ গল্পেরই কম্প। 'লেখকের রচনামুখি সংবত, অনাবশ্যক বাহুল্যে পল্লবিত নহে। চারিত্র-ব্যক্তিত্বও মাঝে মাঝে গল্পগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারীচরিত্রের বাস্তব দিকটা লেখক আদর্শের তুলিকায় মুছিয়া ফেলেন নাই। বাহাকে 'নীলদোলাভাই' বলিয়া হরমা আদর জানাইবা আসিবাছে সেই নীলরতনকে বহুদিনের রোগশয্যার শ্রীহীন দেখিয়া হরমা যখন ভাবিল—'রাগো এত কালো হয়ে গেছে—একে আমি বে করব না' তখন বালিকা-চরিত্রের এই বাস্তবতাই আমাদের চিত্তে হস্ত এবং মাধুর্যের সৃষ্টি করে। 'দেনাশোধের' অলঙ্কারপ্রিয়তারটিও এই হিসাবে স্পন্দন হইয়াছে। 'মনের দাগ' 'দেনাশোধ,' ও 'আদেশ পালন' এই তিনটি গল্পই আমাদের সব চেয়ে বেশী ভাল লাগিল।

পুস্তকটিতে অনেক ত্রুটিও আছে। "মনের দাগে" বলিতে গেলে আখ্যানবস্তুর দুইটি। প্রিয়র আখ্যানটি স্বধর্মবীর আখ্যানটিকে, কাজেই গল্পের মূল আখ্যানের প্রাধান্যকে, কিছু খণ্ডিত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম দেখিতে পাইলাম "নবীন ডেপুটি" "শুভ্রতর অভিযোগ" আছে বলিয়াই স্বধর্মবীর স্বামীকে শান্তি দিলেন। পরে দেখিতে পাই "সে নির্দোষী" শুদ্ধমাত্র প্রিয়র এই কথাটির উপরই নির্ভর করিয়া ও অল্প কোনোরূপ জিজ্ঞাসা কিংবা প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই ডেপুটি মহাশয়ের অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। মৃত বন্দীর নিঃসন্দেহে নির্দোষিতা প্রশ্নের উপরই ডেপুটির অনুতাপের তীব্রতা, কাজেই গল্পের সৌন্দর্য্য, নির্ভর করে, অথচ এই কথাটির উপর কিছুমাত্র জোর দেওয়া হয় নাই। নবীন প্রণয়র অনুতাপের বাজ হযত প্রিয়র একটি ছোট কথাই মধ্যেই নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠকসম্প্রদায় এই অনুতাপের একটি স্তরসলত সুদূর কারণ না পাইলে সন্তুষ্ট হইবে কেন। 'হারজিত'

নামক গল্পটির নামের সার্থকতা গল্পটির মধ্যে কোথাও তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সন্ন্যাসীর কথাব বিবরণে মাণিকলালের চিন্তার ভাষা এবং প্রণালী বাবৎসরের মাণিকের পক্ষে কতকটা অশোভন হইয়াছে। "এপ্রিয়ফুল" গল্পটি হান্তরসে উপভোগ্য হইলেও অস্বাভাবিকতার স্পর্শ এড়াইতে পারে নাই। "শেয়ালের ডাকে"ও এই দোষটি আছে। "কাজল" এবং "মাণিকলালে"র আখ্যানের বাধুনী কেমন চিলা হইয়া গিয়াছে, রসটি তেমন ভাবে কোথাও জমিয়া উঠে নাই।

দরিয়া—

শ্রীসৌরীন্দ্র ঘোষন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, প্রণীত নাটিকা। প্রকাশক, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; ১৫, হরিশ চাটুয্যের স্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা। ডঃ দ্রাঃ ১৬ অংশিত, ৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

গোষ্ঠান্ত্রিণের She stoops to conquer নামক বিখ্যাত কমিডি "অবলম্বনে" এই নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। 'অবলম্বন' কথাটির কাক দিয়া অনুবাদের ত্রুটির অভিযোগ অনেকটা কটিকা যায়। অবলম্বিত পুস্তকে সাধারণতঃ নূতন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ত দেখিতে পাওয়া যায়ই না, মূলের সৌন্দর্য্যটুকু রক্ষা করার অক্ষমতাকে শুধু 'অবলম্বন' কথাটির আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া হয় মাত্র। আলোচ্য পুস্তকটিও ঠিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হউক, তার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। নূতন সৃষ্টির দিক দিয়া এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বাওয়া ত মুঢ়তা, লেখকও নূতন সৃষ্টির দাবী করেন না। অবলম্বনের মৈপুণ্যের দিক দিয়াই ইহার বিচার করিতে হইবে; আনাদের মতে সেই হিসাবেও ইহাতে খুব বেশী গুণপনার পরিচয় নাই।

প্রথমতঃ লেখকের নূতনত্বের অবলম্বন সম্বন্ধে। মূলের অন্তর্ভুক্ত Maidটিকে তিনি মুখরা আমিনার ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অথচ বীদী আমিনাকে তিনি যে ভাবায় কথা বলাইয়াছেন তাহা বীদীর পক্ষে মোটেই শোভন হয় নাই। যে-কোনো বীদীর পক্ষেই যে এইরূপ ভাবায় কথা বলা অসম্ভব তাহা নহে, তবে অসাধারণত্বের বেলায় তার বিশেষ ছেঁড়ুটি দিয়া পাঠকের মনকে প্রস্তুত হইতে দেওয়া উচিত,—এখানে তাহা দেওয়া হয় নাই। গানগুলি দিয়াই অবশ্য নাটিকাটির শ্রেষ্ঠ নূতনত্বের দাবী। কবিত্বহিসাবে এগুলি সম্মত নয়, কিন্তু নাট্যাঙ্গীকৃত ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রীর মানসিক ভাবের সঙ্গে সাধারণতঃ ইহাদের বিশেষ কোনো যোগই নাই। রঙ্গমঞ্চের দর্শকগণকে আনন্দ বিতরণের সাধু ইচ্ছার এগুলিকে কৃত্রিমভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অনেক জায়গায়ই, বিশেষতঃ আলির বাসভূমিকে সরাইখানা মনে করিয়াও বীদীগণের সহিত সেলিমের নির্বিচারে মৃত্যুগীত সঙ্গাপ করায়, নাটকত্ব এবং স্বাভাবিকতার অপচার প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে। ভূমিকার্তে লেখক মহাশয় She stoops to conquerএর রোশালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু রোশাল বলিতে বাহা বুঝি গোষ্ঠান্ত্রিণের নাটিকার তাহাব কিছুই দেখিতে পাই নাই। বাস্তবিক এই নাটিকাটির গুণ রোশালে নয়, অন্ততঃ। তবে 'দরিয়াতে' লেখক রোশাল চুকাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সব জায়গায় শুভফল প্রসব করে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনেক স্থলে মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। সেলিমের বিনয়নম্রতা সম্বন্ধে মূলের কতকগুলি কথা লেখক বাদ দিয়াছেন, অথচ এই কথাগুলির উপর গ্রন্থের নাট্যকলা অনেকটা নির্ভর করে। বহু হেষ্টিংসের উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে মিস্ হার্ডকাস্লে'র (দরিয়া) সঙ্গে মার্গোর (সেলিম) প্রেমমালাপের প্রকারভেদের রস ও সৌন্দর্য্য লেখক রক্ষা করেন নাই। মিস্ হার্ডকাস্লে'র আপন

পৌষ্যক পরিবর্তন করিয়া অসাধারণ পৌষ্যক পরিণতনৈই মালোর তাহাকে দাসী বলিয়া ভ্রম করাব কারণ নিহিত, কিন্তু সেলিম সেখিত্তেই তাহার অভাবেই সম্রাটবংশীনা (কাট্টেই উল্লেখ না থাকিলেও, তদন্তকুপ বেশপরিহিতা) দরিদ্রকে বীণা বলিয়া মনে কবিয়া লইতে কোনো দ্বিধা বোধ কুরে না; এই পৌষ্যকপরিবর্তনটাই নাটিকাৰ বাহান্নািক কেন্দ্র, নাটিকাৰ সেই আপনাকে বীণা বলিয়া চালানোর উপায় স্বরূপ। লেখক এই উপাট্টিক রাবিবার কোনো দরকাৰ বোধ কবেন নাই। মিস হার্ডকাসল্কে দাসী ভাবিয়া তাংশর নিকট মালোর প্রথম প্রেমজ্ঞাপনার যথেষ্ট চাপলা আছে: কিন্তু সেই চাপলা মিস হার্ডকাসলের শিক্ষা এবং অলঙ্কিত কণ্ঠসোরবের প্রভাবে দীরে দীরে জ্বল্য পবিত্রত হইয়াছে, এই পরিবর্তনের সৌন্দর্য্যটুকু লেখক বিবর্তেই পাঠের নাই। এইরূপ অনেক ক্রটিতে মালোরচরিত্র সেলিমে আসিয়া অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কখনোশাশ্র Tony Lumpkin আসাকে মালোর পিতারও সেই দশ। কুর কুর ক্রটিও অনেক আছে। লেখক দৃশ্য ভাঙিয়াছেন, আপের কথা পাছে ভুড়িয়াছেন, দৃশ্য-কে-দৃশ্য উঠাইয়া দিয়াছেন:—তাঁহাতে সব স্থলে না হটক, কোনো কোনো স্থলে সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। রসলাপাই গোষ্ঠশ্লিষের নাটিকাটব সর্ব্বত্রের গুণ, সেই আলাপকে পবিত্রিত কবিয়া এবং নিবিতাবে ছাট্টিয়া দিয়া অনেক জাবগাযই তাহার রসকে তিনি খণ্ডিত করিয়াছেন।

এই রকম ক্রটি সত্ত্বেও এই নাটিকাৰ যে গুণ নাই তাহা নহে। মুলের রসটি রক্ষা করিতে তিনি অনেক স্থলে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কথোপকথনগুলিতে সাধারণতঃ বেশ একটি তরল চটুলতা ও অনাহত প্রবাহ আছে। কিন্তু এই ত্রেপ্পির অনুবাহ-অবলম্বনের গুণের জন্ত লেখক প্রশসোর ভাণী যতটা না হটন ঘোরের জন্য লেখক-নিম্নর ভাণী তার চেয়ে অনেকটা বেশী এই জন্তই আমরা দোষপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। দোষসত্ত্বেও এই নাটিকাখানি দ্বারা “বঙ্গরঙ্গমকে নাট্যের উপাধানে স্রব্ধ বৈচিত্র্য ও অনাবিল হাস্যরসের অবতারণার” উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ইহা অকস্টে বলা যায়ইতে পারে। আর ইংবাজি মূলনিরপেক্ষ ভাবে বাঁহারা এই নাটিকাখানি পাঠ করিবেন তাঁহারা নাটিকাৰ আখ্যান-বৈচিত্র্য; বচনার পারিপাট্য, পানের মাধুর্য্য, রসিকতার অনাবিল আনন্দ, ভাষার স্বচ্ছ অনাহত গতি যথেষ্টই উপভোগ করিতে পারিবেন।

জ্যোতি: পিপাস।

নিবেদিতা—

ঐশ্বরী সরলাবালা দাসী প্রণীত। ১২১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাঙ্গাব, উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ভূ: ক্রা: ১৬ অংশিত ৫৩+১/০ পৃষ্ঠা। শাইকা অক্ষরে এটিক কাগজে ছাপা; বামী সারদানন্দ-লিখিত ভূমিকা ও ভগিনী নিবেদিতাব চিত্র সম্বলিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

সে বেশি দিনের কথা নয়, মহাপুরুষ নিবেদানন্দ বামীর জ্ঞান চরিত্র ও স্বদেশপ্রীতির সাহায্যে আকৃষ্ট হইয়া বেবী নিবেদিতা আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন—নির্ভেব সমাজ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, আত্মস্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন অধিকতর ব্যাতিসম্মান লাভের প্রত্যাশার নব, ভাক্তের হঠাৎ স্বপ্নাঙ্গ করিবার জন্ত নয়,—তিনি আসিয়াছিলেন সমস্ত ত্যাগ বহিরা সম্রাসিনী তপস্বিনী উমার বেশে ভারতের শিবের আরাধনা কল্পিত আপনার ভক্তিপূত শরীর মন নিবেদন করিয়া দিয়া। তিনি ভারতবর্ষকে নিজের দেশ, ভারতবাসী নরনারীকে পরমাত্মীয় বলিয়া সর্ব্বাঙ্গতরুণে স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের জ্ঞানধর্মের শাখত মুক্তি তিনি জ্ঞানার সহিত সকল আবর্জনা অপসারণ

কবিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ভারতের অতীত শিষ্ণ-স্বাণত্যা তক্ষণ-বিদ্যা তাঁহাব সম্রাট স্পর্শে প্রাণে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতবাসী নরনারীকে জ্ঞানে প্রেমে কর্ণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের রাষ্ট্রে সমাজে গৃহে পরিবারে সর্ব্বত্র নষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কবিবার ব্রতে তিনি আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিকাতার এক প্রান্তে একটি গলির ভিতর একখানি সামান্ত বাড়ী লইয়া যে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়ের মেয়েরা কেবল মাতৃভাষা ভুলিয়া বিদেশী ভাষা ব্যবহার করিলে সেইজন্য তিনি দুঃ হইতেন; বালিকাদের হাতে গড়া পুতুল, আলপনা-দেওলা পিঁড়ি, মৃচাচিত্রিত বস্ত্র সেইজন্য তাঁহার আদরের গৃহসজ্জা ছিল; সেইজন্যই তিনি গৃহপ্রাচীরের বন্দিনী বালিকা ও বধূদিকে লইয়া ভ্রমণ করিতে আনন্দ পাইতেন; এবং সেইজন্যই তীর্থপর্যটন তাঁহার প্রিয় ছিল।

এই লোকস্বচরিত্রবতী প্রথববুদ্ধিশালিনী তপস্বিনীর ছাত্রীদের মধ্যে লেখিকা অন্যতমা। তিনি ভক্তি দিয়া, ক্ষম দিয়া, বুদ্ধি দিয়া নিবেদিতাকে যেমন ভাবে দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন এই পুস্তকে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন; এই পুস্তকখানির হৃদে হৃদে লেখিকা চরম নিপুণতাব সহিত নিবেদিতার চরিত্রের সকল দিক অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই পুস্তকখানি a joy for ever চির-আনন্দের ধনি হইয়াছে। লেখিকার ভাষা যেমন বিপুল তেমনি স্বচ্ছ ও অনাহত, যেমন মধুর তেমনি তাহার প্রবাহ—কোথাও এতটুকু বাধা নাই। অস্পষ্টতা জটিলতা নাই, আপনার আনন্দের বেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; আর সেই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে স্বাধীন বুদ্ধি ও বিচার, শ্রদ্ধা ও পূর্ণাবেক্ষণ। এমন জীবনচরিত্র বাংলাভাষার পূর্ব অঙ্গ আছে।

ইহার বিস্তারিত পরিচয় দিবার সোভ সযেরণ করা জঙ্কর হইলেও অনাবশ্যক; কারণ এই পুস্তিকার বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক বিক্রম কবিয়া বাহা লাভ হইবে তাহা নিবেদিতার বৃক্কের রক্তে লালিত বাগবান্নার বালিকাবিদ্যালয়ে সাহায্যে নিবেদিত হইয়াছে; হৃতরা এই পুস্তক এক এক খণ্ড সকল শিক্ষিত বাঙালীর ক্রয় করা উচিত।

ছড়া ও গল্প —

ঐললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

এই শিশুপাঠ্য পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষা অল্প বদল সংস্কার করা ছাড়া একখানি ছবি পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও একখানি ছবি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। ছবিসমূহি সযক্কে আমরা প্রথম বারে বাহা বলিয়াছিলাম তদতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই—প্রমুখ্য বা প্রকাশকেরও দোষ নাই, কারণ বাঙালীর চিত্রশিল্পে এই হাতেখড়ির যুগে এতদপেক্ষা কলাসঙ্গত চিত্র নগ্রহ করা স্বকঠিন ব্যাপার বটে। লেখা সযক্কেও বলিবার কিছু নাই—লেখক স্বয়ং অধ্যাপক এবং রসিক, রচনার বিষয় হিতোপদেশ ও নীতিমূলক, হৃতরা শিশুর উপযুক্ত নিশ্চয় হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়কে সাপ করা যায় না—তিনি জানেন যে কবিতা ও বনিতা জোর করিয়া বশ মানানো যায় না, যদি বা বশ মানে তবে রস বাঁধে না। গদ্য রচনাসমূহে ছন্দ ও মিল মান্তানাবুদ হইয়াছে, সে দোষ অবজ্ঞ চতুর লেখক ছড়া নাথ দ্বিধা চাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যা প্রাচীন ছড়া তা এমনি সব হাফা কথার রচিত যে লঘুতার হ্রস্বের ওজন রক্ষা হইয়া যায়। কিন্তু লেখক ব্যবহার করিবেন বড় বড় কথা আর যতদূর সাবিতা যাইবেন ছড়ার দোহাই দিয়া, এক কথনো হইতে পারে না। বেখান-সেখান হইতে তুলিয়া দেখানো যায়—বেমদ,

শশবাস্তে ভাদ্র মাহি প্রভুভক্ত বানর,
অথবা—

গর্জনেতে গিরিগুহা গম গম করতে থাকে।

ছেলেদের কান যদি ছেলেবেলা হইতেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে এমন বোঝা ভাবে তালিম হইয়া উঠে তবে তাহারা যে বড় হইলে কবিশ্রাবার্থী হইয়া ছন্দের শ্রদ্ধা করিবে না সে বিষয়ে জামিন কে? আজকাল দেখিতে পাই সমস্ত শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রে ও পুস্তকে এইরূপ ছন্দ অব্যাহি চলিতেছে। অক্ষর গণিরা পয়ার ত্রিপদী রচনার কাল যে ছিল ভালো; রবীন্দ্রবৃন্দে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু মাত্রাভঙ্গ করার পরিমাণও মাত্রা ছাড়াইবা উঠিয়াছে। বিজ্ঞ ও বিদ্বান অধ্যাপক সেই অনাচারী ধলের একজন ইহা কোন্দের বিষয়।

বাহাই হোক এই বইখানির কলাকূশলতাব খুঁটিনাটি দোষ সম্বন্ধে ইহা বাংলায় শিশুসাহিত্যের মধ্যে যে একখানি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশুজ্ঞা হাসিতে ভালো বাসে; কিন্তু আমাদের শিশুসাহিত্যে এককাল ভরানক বকম গুরুগভীর ছিল; প্রবন্ধকার আমাদের শিশুদিগকে অনাবিল হাস্তরস স্রোতসাইয়া দিয়াছেন, ইহার জন্তই এ গ্রন্থ সমাদরের যোগ্য।

বিশুদ্ধশর্মার গল্প—

বা পঞ্চতন্ত্র (উত্তর ভাগ)। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী, ৫৬১ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২২২ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা, পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা, মূল্য ৮/০ আনা।

পঞ্চতন্ত্রের উত্তরভাগের গল্পগুলি সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আজকাল বই লিখিতেছেন অনেক কিন্তু রসবৈচিত্র্যে মনোরম করিয়া বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতে খুব অল্প লোককেই দেখা যায়; এই পুস্তকের ভাষা খাঁটি বাংলা কোথাও গুচিবাইগ্রন্থের স্ত্যাব চলিত সহজ কথা ছাড়িয়া আড়ষ্ট সংকুত শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ ভাষা প্রাণ্য হয় নাই। গদ্য ভাষারও একটি ছন্দ আছে, সে ছন্দের কান খুব অল্প লেখকেরই থাকিতে দেখা যায়; দেখিয়া স্তম্ভী হইলাম এই অনুবাদের ভাষায় ছন্দ বজার আছে, রচনায় ওজন কোথাও বেশিকম হয় নাই। আর একটি বিশেষ গুণ, রচনা প্রচ্ছন্ন হাস্তরসে অমুহ্যত বলিয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

রচনারীতিতে দুই একটি ত্রুটি লক্ষিত হইল, তাহা প্রাদেশিক বাক্যরীতি (idiom) চালানো; আদর্শ বাংলায় এবকম ব্যবহার নাই। যথা—‘ধপাস দিয়া পড়িল’ ঠিক নয়, ধপাস করিয়া পড়িল লেখা উচিত; ‘উ কি দিয়া দেখিল’ লেখা অচলিত নয়, উ কি মাঝিয়া দেখিল অচলিত। এসব ত্রুটি সহজেই প্রতিকার্য।

গল্প চয়নে আরো একটু সাবধান হইলে ভালো হইত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন সব অনেক কথা আছে বাহা এখন অল্পবয়স্ক বালকদিগকে পড়িতে দেওয়া যায় না। এই সংগ্রহখানি সেই হিসাবে, মাত্র দুই একটি গল্পের জন্ত, নিতান্ত বালকের হাতে দিতে অনেক অভিভাবক হয় তো ইতস্তত করিবেন, যদিও সে গল্পগুলিও খুব সাবধানে লেখা হইয়াছে, তবুও তাহার অন্তর্ভুক্ত ভাবটি নিরাপদ নহে বলিয়াই একেবারে ভাগ করিলে ভালো বই মন্দ হইত না।

পুস্তকে কতকগুলি ছবি আছে। বাংলা বইয়ে সাধারণত যেমন হয়, তেমনি হইয়াছে, অর্থাৎ ভালো হয় নাই।

গিরিকাহিনী—

শ্রীপ্রবনাথ চন্দ্রবর্তী কর্তৃক প্রণীত ও শিল্প হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান ষ্টেডেন্ট্স লাইব্রেরী, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৬ পৃষ্ঠা।

পাইকা অক্ষরে এটিক কাগজে পবিত্রাব ছাপা; রেশমী কাগজে জমকালো বাঁধা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এখানি আসাম প্রদেশের গিরি নির্ঝর প্রপাত প্রভৃতিব নাম সম্পর্কীয় কিশদন্তীমূলক কাহিনীসংগ্রহ এবং সেই দেশী ভৌগোলিক ঐতিহাসিক সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিবরণ এবং আচার বিচার রীতি নীতি আচরণ প্রমোদ পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। গল্পগুলি কোতুহলোদ্দীপক। অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে বটে—কিন্তু সে সমস্তই ভাসা ভাসা, লেখকের পর্যবেক্ষণ-পটুতার পরিচয় কোথাও বিশেষ ভাবে পাওবা যায় না। রচনা সম্বন্ধেও বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু নাই।

গ্রন্থে অনেকগুলি ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি আছে। কিন্তু সেগুলি ছাপিবার উপযুক্ত কালি মনোনীত না করিতে পারায় প্রায় ছবিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রেখাঙ্কর বর্ণমালা—

শ্রীযুক্তেননাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক ব্রাহ্মমিশন প্রেস। প্রাপ্তিস্থান, আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়, ৫৫ অপর চিংপুর বোড, কলিকাতা।

বাংলা ক্রমশঃ অগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা সকলের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় অনেক মনোবী বস্তুতা উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু তাহা লিখিত না হওয়ায় ক্ষণিকের আনন্দ দান কবিতা মূগু হইয়া বাইতেছে; উত্তরপুরুষদিগের জন্ত আমরা অনেক অমূল্য বাক্য ইচ্ছা সম্বন্ধে রাখিয়া বাইতে পারিতেছি না। ইহাব প্রধান কারণ বাংলায় ক্রম-লিখন-প্রণালীর অভাব। ইবেব্রিতে পিটমানের উদ্ভাবিত শর্ট-হ্যাণ্ড লিখনপ্রণালী যে সমস্ত সমাধান করিয়াছে, বাংলার সেই সমস্ত সমাধান করিবার জ্ঞান, কবি মনোবী ও দার্শনিক পণ্ডিত পরম ভক্তিজ্ঞান শ্রীযুক্ত যিহেননাথ ঠাকুর মহাশয় রেখাঙ্কর বর্ণমালা উদ্ভাবন করিয়া তাহার লিখনসম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লিখিবাব উপদেশ সমস্ত পদ্যে লেখা, সে পদ্য শুধু ছত্রগুলি মিলে পাঁধা নয়, কবিত্ব অনুপ্রাণিত, হাস্তরসে রসালো, চিন্তা ও ভাবুকতার প্রগাঢ়। শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পুস্তক আনন্দপ্রদ হইবে একথা আনন্দি আমবাও জোর করিয়া বলিতে পারি এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষেও ইহা আনন্দপ্রদ হইবে এই হিসাবে যে একটা technical জিনিষ লেখার গুণে কেমন সরস ও সুন্দর হইতে পারে।

বইখানি আগাগোড়া রচয়িতাব হাতেব লেখার প্রতিলিপি, এই হিসাবে ইহার মূল্য আরো বেশি। ছাপা কাগজ অত্যুত্তম। মূল্যের উল্লেখ নাই।

গাঁহার ইংরেজি শর্টহ্যাণ্ড লেখাব চর্চা করিবা থাকেন তাহারা এই বাংলা বেথাক্ষর সহজেই আয়ত্ত করিবা অনেকেব উপকারে লাগাইতে পারিবেন আশা করা যায়।

অচল্যায়তন—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ বস্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১০৮ পৃষ্ঠা।

এই নটিকখানি সমগ্র গত বৎসব আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ইহাব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রতিবাদ, সমালোচনা ভ্রমভাব হইতে অভ্রমভাবে পর্যন্ত হইয়া গেছে। ভালো জিনিষ চিরকাল এমন দুল্লভ রাখিবা চলিতে পারে না; একঘণ্টেব তাহা বরণীয় হয়, এবং অপর দলের হয় অসহনীয়। এই গ্রন্থখানিতে আশ্চর্য রক্ষণ নট্য-

কৌশলে অৰ্ধহীন আচার ও কুম্ভকারের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিচার ও প্রেমের উদারতার প্রতিবাদ কবিত্বরসে ভিঞ্ঝাইয়া তোলা হইয়াছে। যেসকল রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী লোক ইহার বিকল্প সমালোচনা করিয়াছিলেন তাঁহারাও ইংরাজ চমৎকার কবিত্বের অপলাপ করিতে পারেন নাই। মতে না মিলিলেও এই হিসাবে এ পুস্তকখানি সকলেরই পরম উপভোগ্য হইয়াছে। মহাকবির এই অসাধারণ নাটকখানি যে পৌড়াবির বিরুদ্ধে বিচারমূলক প্রতিবাদ হইলেও অসাম্প্রদায়িক তাহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক মাঝেই স্বীকার করিবেন। এ গ্রন্থ প্রবাসীর পাঠকের স্বপরিচিত; হুতরাং পল্লবিত সমালোচনা নিত্মরোজন।

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত—

ঐউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রণীত। প্রকাশক সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৫০+১০। মূল্য ১।

প্রাচীন কাছাড় রাজ্যের ইতিহাসের সংক্ষেপে জিপু, কোচ, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস; কাছাড়ী জাতির দেশবিষয় ও উপনিবেশ স্থাপন; রাজ্যশাসনপ্রণালী ও রীতিনীতি; সাহিত্য ও শিল্প; মোট ১৬টি অধ্যায়ে বিস্তৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে পরিপূর্ণ ও স্বথপাঠ্য। এইরূপ প্রাদেশিক ইতিহাসসংগ্রহ দ্বারা বাংলা দেশের সর্বাবয়বসম্পন্ন ইতিহাস পড়িয়া তুলিতে যাহারা সাহায্য করেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের হিতৈষী এবং সেইজন্য বাঙালী মাত্রেই ধন্যবাদভাজন এবং সাহায্যের যোগ্যপাত্র।

সত্যকর্ণহার -

ঐকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিব্রচিত। প্রকাশক ঐঅমরনাথ মিত্র, ৫২ রোকনপুর, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৮৮+১০। পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে ছাপা; সচিত্র। মূল্য সাধারণ ১০ আনা; রেশমী কাপড়ে জমকালো বাঁধা বারো আনা।

গ্রন্থখানিতে সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সংস্কৃত পৌরাণিক, বেহলা গুল্লনা, চিন্তা প্রভৃতি বঙ্গ-পৌরাণিক, পদ্মিনী, কর্ণধেবী প্রভৃতি ভারত-ঐতিহাসিক এবং সারা বিবি রহিমা বিবি, হাজেবা বিবি মুসলমান শৌর্যগণ ও ঐতিহাসিক ১৭জন সত্য রমণীর কাহিনী সংক্ষেপে পক্ষে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের স্বতন্ত্র চিত্তাকর্ষক তাহা কতক সত্যচরিত্রমাহাত্ম্য ও কতক ছাপাখানার প্রসাধনে—গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এক কর্ণধকও নাই; সেতলে বকেরা পথার জিপদী ছন্দ, তাও কবি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—লেখার দোষে অমন ভালো জিনিষও অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। শুধু কি ছন্দের দোষ? না আছে ভাষার লালিত্য, ভাবের অভিনবতা, আর না আছে রচনা প্যারিপাট্য। ইহার আগাগোড়া অক্ষমতার আকর্ষণ নিদর্শন। সত্তা ছাপাখানার দোলেতে রাতারাতি হঠাৎলেখক হওয়া যায়, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত সে রচনা সাহিত্যভাণ্ডারে স্থান পাইবে কি না। যদি না পায় তবে পণ্ডিত করিয়া লাভ কি? যার কর্ণধ তাকে সাজে এ কথাটা না মানিয়া চলা হৃদয়িক পরিচায়ক নয়।

পুস্তকের ছবিগুলি অত্যন্ত কুৎসিত।

সচিত্র সপ্তকাণ্ড বাচস্পান—

ঐবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত, পঞ্জিরা, চট্টগ্রাম। ডঃ ক্রাঃ ৮ অংশিত ৩২২+৬+১০। পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে ছাপা কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ২। টাকা।

ভারতবর্ষের ইতিকথায় চব্বিছের বৈচিত্র্য ও মাহাত্ম্য রামায়ণ ও

মহাভারত যুগে যুগে লোকশিক্ষার কারণ হইয়া যেমন সমাদৃত, ইতিহাসে তেমন রাজধানের কাহিনী যুগে যুগে লোকশিক্ষার সহায় বলিয়া সমাদৃত। আমাদের ভারতবর্ষে স্বদেশ বলিয়া মমতা। কোনো কালে তেমন প্রবল ছিল না; ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থই এদেশের সর্বস্ব ছিল। সেই দেশে স্বদেশের ক্ষমতা, কাণ ধরিয়া প্রথম দেখা দিয়াছিল রাজপুত জাতির মনে; এবং তারপর বোধ হয় মহারাষ্ট্র জাতি। বাঙালী জাতি ও শিখ জাতির মনেও দেখা দিয়াছিল। প্রতীচ জাতির সংগ্রহে আসিয়া এখন আমরা জাতিধর্মনির্কীর্ণে ক্ষুদ্র স্বার্থ সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করিতে শিখিতেছি, দেশমাতা এখন আমাদের সকল সম্মানের নিকট কণ ধরিয়া দেখা দিয়া আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ ভক্তি দাবি করিতেছেন।

এই দেশপ্রেমের উদ্বোধনের শুভমুহুর্তের কালে প্রতীচ দেশের ইতিহাস যেমন একদিকে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিবে, আর একদিকে আমাদেরই ঘরের দেশভক্ত বীরদ্বিগের অসাধারণ আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদেরই অবসর ভ্রম হৃদয়ে বলসংকাব করিবে। ঘরের মূলধন না থাকিলে শুধু ধারকরা ধনে বড় হওয়া যায় না।

বাহারা আমাদের পিতৃধনেব সংবার দিয়া আমাদের বর্তমান ও ভাবী কল্যাণের চরিত্রগঠনে সাহায্য করেন তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

বিপিন বাবু সমগ্র রাজধানের বীর-কাহিনী প্রদেশ অনুসারে মিহা, অবর, মারবার, বিকানীর, বশলীর, বুলি, কোটা নামক সাতটি কান্ডে ভাগ করিয়া, প্রত্যেক প্রদেশে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও ঘটনা অবলম্বন করিয়া পক্ষে কৃতিবাসী রামায়ণের অনুকরণে পয়ার ও জিপদী ছন্দে রচনা করিয়াছেন।

রচনার ভাষা যথোচিত সবল ও সরস হই নাই; ছন্দের মধ্যেও বেশ অনাহত স্বচ্ছন্দ গতি নাই। তবে এত বড় গ্রন্থের আগাগোড়া সরস পক্ষে রচনা করা কঠিন ব্যাপার, তাহা কেবল প্রতিভাবান কবিই সাধ্য। লেখক স্বতন্ত্র হিতে পারিয়াছেন তাহাও একেবারে নিশ্চয় নহে। এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে প্রত্যেক শিশুর নিত্যসহচর হইলে তাহাদ্বিগকে দেশপ্রেমীতে ও শৌর্যবীর্যে মগ্নিত করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে যে সাহায্য করিবে তাহাতে আব সন্দেহ নাই।

পুস্তকস্থ চিত্রগুলি নেহাত মন্দ হয় নাই।

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—

ঐকুমুদিনী মিত্র প্রণীত। প্রকাশক ঐবিপিনবিহারী চক্রবর্তী, ১২১ রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২১৪ পৃষ্ঠা। বহুচিত্র-সম্বলিত, তন্মধ্যে দুইখানি বড় ও তাহার একখানি স্বর্ণমণ্ডিত; পরিষ্কার ছাপা কাগজ; পরিপাটি বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ঐতিহাসিকের চক্ষে অতি মূল্যবান পুস্তক। ইহাতে তিন শতাব্দী পূর্বকার ভারতের প্রজাবর্গের অবস্থা, বাদশাহদিগের চরিত্র, শাসননীতি ও শাসনপদ্ধতি অকপটে বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই ইহার এত মূল্য। এই গ্রন্থ আসলে ফার্সী ভাষায় লেখা; ইংরেজিতে অনুবাদ হইয়াছে বহুদিন; এখানি সেই অনুবাদের অনুবাদ। একেবারে আসলের বাংলা অনুবাদ পাইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম, কিন্তু নেই মাঝা চেষ্টা কাণা মামা থাকেও তোলা।

অনুবাদ কাগজি হুচর হইয়াছে; তবে ছ এক জালগার ইংরেজির গল্প বাংলা বচনবিন্যাসের ক্রমভঙ্গে হুটিয়া বাহিব হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানিতে এত রকম বিচিত্র ব্যাপারের সমাবেশ আছে যে ইহা সাধারণ পাঠকের নিকট উপন্যাসের ন্যায়ই স্বথপাঠ্য ও কৌতূহলজনক হইবে।

এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী হইবে তৎবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

চিত্রগুলি সমস্তই কটোগ্রাফের বা প্রাচীন মুদ্রিচিত্রের প্রতিলিপি, দুই একখানির ছাপা উপযুক্ত কালি নিশ্চাচনের অভাবে খাবাপ হইলেও আসল ছবিগুলি আশ ভালে।

বাস্তবভিত্তি-কুসুমাম্বলি—

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকৃষ্ণম প্রণীত। যশোর, কালিয়া আৰ্ণা নাট্য-সমাজ কর্তৃক অর্থনীত ও প্রকাশিত।* ডিসাই ১২ আং ২২+১০ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ কর্ণা। মূল্যেব উল্লেখ নাই।

এই পুস্তিকাৰ উৰ্ণবে দেখা আছে দৃষ্টকাব্য, ভিতৰেও পাত্ৰ পাত্ৰীৰ কথাপকথন আছে; কিন্তু কোনো কেন্দ্ৰগত ভাবেকে আশ্রয় কৰিবা কোনো একটি আখ্যাবিকা পড়িবা উঠে নাই। রচনাও কোনো মূল্যবান বা বিশেষ নাই। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আসিতেছেন; “বাঙাল জমিদার” রাজাকে ও শিক্ষিতা মহিলায় রাণীকে অভিনন্দন কৰিবেন এবং ব্রাহ্মণ ফলার মাৰিবেন ইহাৱই আৰোহনে সমস্ত ব্যাপার সমাপ্ত হইয়াছে।

এছক্কাৰ ভূমিকায় ইংবেজ-রাজত্বের ফলসেব মামুলি সাক্ষী বেল টেলিগ্রাফ খাড়া ক'ববা শেষে বলিতেছেন—“ফলতঃ আমরা মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় কবি; বমেশচন্দ্র, এস, পি, সিংহ ও কাস্তিচন্দ্রের ন্যায় বাঙ্গালীতাবিং এবং জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞানবিশারদ পাইবাছি ও পাইতেছি; তাহা একমাত্র ইংবেজ রাজত্বেরই ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

আমরা ইংবেজ রাজত্বের ফল অধীকার কৰি না, কিন্তু তাহাব প্রকৃতি ও পৰিমাণ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবাৰ জন্য গ্রন্থকাৰকে স্মরণ কৰাইবা দিতেছি যে, চীন জাপান ইংরেজের অধীন নয়; অথচ ঐ দুই দেশে বেল টেলিগ্রাফ হইয়াছে এবং কবি মনীষীও জন্মিাছেন। পূৰ্বে কালিদাস হইতে চণ্ডিদাস পর্যন্ত কবি, ভাস্কর্যচর্চা ও ভূতি বৈজ্ঞানিক এবং চৌডবরঙ্গ ও নানা ফলনবিশ প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিশারদেরা যখন এই ভাবতবর্ষেই জন্মিাছিলেন তখন ভারতবর্ষে ইংবেজের শাসন ছিল না।

ইংবেজশাসনের ফল অন্ততঃ অনুমান কৰিতে চাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা বাইতে পাবে, ইংবেজশাসনে আমরা জাতিধৰ্ম্মনির্কীৰ্ণেবে সম্মিলিত হইয়া দেশকে আপনাব বলিয়া চিনিতে শিখিরাছি, ইহা ইংবেজ শাসনের মহৎ লাভ।

চিত্রপরিচয়

বুন্দাবনে যমুনাৰ এক দহেৰ মধ্যে কালীষ নাগ সপৰিবাৰে বাস কৰিত। তাহাব সহস্র ফণাব বিধে সেই দহেব জল

পৰিপূৰ্ণ হইয়া থাকিত, গোক বাছুর রাখাল কেহ এই জল ভ্রমক্ৰমে স্পৰ্শ কৰিলেই তাহাব প্রাণসংশয় হইত। শ্রীকৃষ্ণ এই দুৰ্দ্ধয় নাগের বিষাক্ত সংস্পৰ্শ হইতে বুন্দাবনকে মুক্ত কৰিতে বহুপৰিকল্পনা হইয়া একদিন কালীকৃষ্ণে বাপাইয়া পড়িলেন এবং সহস্রশীৰ্ষ মহানাগকে ধৰিয়া তাহাব ফণাব উপব নৃত্য কৰিতে লাগিলেন। প্রথমে কালীৰ নাগ কৃষ্ণকে আক্রমণ কৰিবাৰ জন্য আফালন কৰিরাছিল, কিন্তু শীঘ্রই কৃষ্ণেব বিক্রমে পরাভূত হইয়া সে বৃথিগ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তখন সে সহস্র মুখে রক্ত বনন কৰিতে কৰিতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব কৰিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কৰিতে লাগিল; নাগ-নাৰীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভিক্ষা কৰিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কালীকে সপৰিবাৰে রমণক ঘোঁৰে নিৰ্দ্ধাসন কৰিয়া বুন্দাবনকে নিৰ্ভয় ও তাহাব অকল্যাণশক্তি গোপগোপী-দিগকে আশ্বস্ত কৰিয়া হ্রদ হইতে বিনিৰ্গত হইলেন। এই আখ্যায়িকা বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুৰাণে বিবৃত আছে।

চিত্রখানি পরিকল্পনাৰ সমৃদ্ধিতে, বর্ণবিজ্ঞানের প্রাচুৰ্য্য-পটুতায় এবং ভাবব্যঞ্জনাৰ সুলব। জলেব আবৰ্ত্তের আলোড়ন, তাহাব মধ্যে নাগনাবীদিগেব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তমজঙ্গম সংস্থান, শ্রীকৃষ্ণেব অবলীলাক্ৰমে বিরাট কালীৰ নাগ দমনের ভাব, এবং নাগনাবীদিগেব করুণ মিনতি বিশেষ দক্ষতাব সহিত অঙ্কিত। নাগনাবীদিগের মুখের কমনীয় সৌন্দৰ্য্য, স্বচ্ছ পরিচ্ছদের বিচিত্র বর্ণবিজ্ঞান, হ্রদ-তীরের দৃশ্য, যেন একটি ছন্দে গাঁথা কবিতার মতো স্তমজঙ্গম। জলের আবৰ্ত্ত অঙ্কন প্রথমূলক (conventional) হইলেও স্বল্প বেগাব আবৰ্ত্তে আলোড়নের ভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রখানিতে বিচিত্র উজ্জল বর্ণেব সমাবেশেও খুব স্তমহত সামঞ্জস্য বৰ্ণিত হইয়াছে।



রামচন্দ্র ও শবরী ।

Three colour blocks by U. Ray and Sons.

Kuntaline Press, Calcutta.

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩১৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সঙ্কল্প ছিল এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভাল কবিতা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইব—শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমেব উদ্ভাবিত হইতেছে। একদল বলিতেছে ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত, আর একদল বলিতেছে ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে হুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্ত পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না; একদল বলিতেছে চোখে কানে ভাবে আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, আর একদল বলিতেছে সচেতনভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ কবিতা সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত এ দ্বন্দ্ব কোনো দিনই মিটিবে না—কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য; সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয় হুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলনা, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; একদিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিষের প্রবেশদ্বার খোলা, আর একদিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিষের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত।

একথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা কবিতা চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ জীবনের গতি কোনো দিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না—অন্তর-বাহিরের নানা বাধার ও নানু ভাগিদে সে নদীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মত সীধা পড়িয়া থাকে না। অতএব তাহার মাঝখানের যেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবল স্থান পবিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চব্বস প্রান্তরেখা; একজাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে কখনো শান্তি আসে; কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্নত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিতূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন একদিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-একদিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহাব পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনাব ভিতর হইতেই একটা সহজ-শক্তিতে আপনাব ভারসাম্যস্তেব পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন একদিক হইতে থাকা যায় তখন সে যদ্যবতই অন্যদিকে ভর দিয়া আপনাকে সামুলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই

পড়িয়া থাকে। সুবোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনাপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদেব চিন্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংশ্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব চিন্তের গতি অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পার না এইজন্তই কোনো দিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সম্বন্ধে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্ত সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু যে-দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায়, বাঁধা প্রথা হইতে একচুল সরিয়া গেলে জ্ঞাত হারাইতে হয়, সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতাই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতেছেই এবং ঘটবেই—কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আব কিছই হইতে পারে না। এ কেমনতর? যেমন নদী সরিয়া যাইতেছে কিন্তু বাঁধাঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে; খেরা নৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। স্ততরাং ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদের দিতেছে না, আমাদের দিতেছে ছই চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড় বিঘাল সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল স্ততরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ্য

রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই;—একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে—বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই—এখনো সে মানুষকে বলিতেছে ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও। বাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, স্ততরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিবেব দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবাব কালে ব্রহ্মচর্য নাই, মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের গ্রহসন অভিনয়ের পর গলার সজ্জাধারণ আছে। তপস্তার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না কিন্তু পদগুলি দানেব বেলায় সে অসঙ্কোচে মুক্তপদ। এদিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা কবাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। বাঁচাটাকে তাহাব সমস্ত লোহার শিক ও শিকল সমেত মানিতেই হইবে অথচ পাখীটা মরিয়া গেছে। দানা পানি নিয়ত জোগাইতেছি অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কাল-বিবোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা মূল্য দিতেছি ও লইতেছি অথচ তাহাব পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না, এবং গুরু পুরাকালের বিন্মত ভাষার শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে—শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মত শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। একথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ কবি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া

গেলেই যথেষ্ট। এমন কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে, ব্যবহারত যথেষ্টাচার কর কিন্তু প্রকাশ্যত তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই। এমনতর মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার প্রজ্ঞা অস্ত পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরগুরুবীর সংখ্যা অল্প;—অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য, আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়—মানুষ একটা জিনিষকে ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে অনার্যাসে পারে অথচ সেই মুহূর্ত্তেই অন্মান বদনে বলিতে পারে, যে, সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না।—আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি এ সমাজে নিজের সত্যবিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাণ্ডল কত অসাধ্যরূপে অতিবিস্তৃত।

অতএব সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, স্তব্ধতা পুরাতনকালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধা-স্বরূপ হইয়া তাহাকে বন্ধ করিয়া তুলিতেছে সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলেব চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে, তাহা তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাহা আছে অথচ নাই; তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিভাগের ত এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিভাগ। সেও একটা প্রকাণ্ড হাচে-চালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে একহাচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনাতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায় ইহাই তাহার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃ-

প্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনাতন্ত্র আইন খাটাইবে ইহাই তাহার মংলব। স্তব্ধতা এই বৃহৎ বিস্তার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের ছড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে কিন্তু তাহা জীবনের খাত্ত নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিভাগের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিভাগের নূতন শিকল দুই-ই আমাদের মনকে যে-পরিমাণে বাঁধিতেছে সে-পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ককথা মনোরম হইয়াছে সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বার বার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষকালে এই অলম্ব্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন; তাঁহারা ইঙ্গিতের মত শিক্ষার গুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধাবিভর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আয়ত্ত-দিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। ডিরোজিয়ার, কাশ্মিরিচার্জসন, ডেজিড হেয়ার, ইহারা শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষার হাচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুহ এমন ভয়ঙ্কর পাকা ছিল না; তখন তাহার মধ্যে আলো-এবং হাওয়া প্রবেশের উপায় ছিল;—

তখন নিয়মেব কঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হোক আমাদের দেশে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রচীরমুক্ত করিতেই হইবে। বাস্তবিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্যপন্থায় আমবা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উত্তমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভঁর আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে বাহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটাই তাঁহাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার প্রত্যেকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্রমে ক্রমে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। “জাতীয়” নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হোক আর বিজাতীয়ের শাসনে হোক যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ক্রম আদর্শে বাধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না—সে তখন আপ্সি আদালতের বা কল-কাবখানাব প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখন সে মানুষ না হইয়া মাষ্টারমশায় হইতে চায়; তখন সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীবদেহের শোণিতপ্রবাহের মত চলাচল করিতে পারে।

কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষনেব যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকিতেই অল্প উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যা-বশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমবা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মহম্মদের পাকযন্ত্রের জারক রস; তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাশঙ্ক হইয়াছে। শিশুবয়সে নিজের শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নাই,—তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থার আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিন্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হোক সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদের গুরু করিতে পারিবেন না।

চ্যামফোর্ড,

শ্রীমদীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩১ শ্রাবণ, ১৩১৯।

চীনে ব্রাহ্মবিপ্লব

১। ইউনান প্রদেশের কথা।

অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে ইউনান প্রদেশের যে কয়েকটা শহরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বাদে অপর প্রায় ৭০টা নগর ও উপনগরে কোথায়ও তাদৃশ উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নাই। ইউনান হু, টালিফু, টেঙ্গিয়ে প্রভৃতি স্থান বিদ্রোহীদের হস্তগত হওয়ার সংবাদে অন্তান্ত শহরের রাজকর্মচারীগণ ভীত হইয়াছিলেন। বিদ্রোহীদের হস্তগত স্থানসকল হইতে টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র অভ্যন্তরীণ নগরের সৈন্তগণ রাজকর্মচারীদিগকে অপসারিত করিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়া জাতীয়

পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল। এইসকল স্থানে বীভৎস বিধ্বংসাত্মকতা দ্বারা নরহত্য প্রভৃতি বিশেষ হয় নাই।

ইউনান প্রদেশে এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে।

২। ছি-ছোয়ান প্রদেশের কথা।

খাস চীনসাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে এই প্রদেশ অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে তিব্বত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউনান প্রদেশ। এই প্রদেশ আয়তনে অত্যন্ত প্রদেশ অপেক্ষা খুব বড়, পরিমাণ ফল ২১৮ ৪৮০ বর্গ মাইল এবং ইহার জনসংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ৬৮,৭২৪,৮৯। এই প্রদেশের ভাঙ্গিলু এবং বাতাং প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান দিয়া চীনদেশ হইতে তিব্বতে যাইবার প্রশস্ত রাস্তা আছে। ইহারই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক কোণ আসামের সঙ্গে সংলগ্ন।

এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। যত ভুলি-বেহারা টেঙ্গিয়ে প্রভৃতি অঞ্চলে ও ভামোতে দেখা যায় সে সমস্তই ছি-ছোয়ান প্রদেশের লোক। ভূত্যা ও কুলিদের অধিকাংশও এই প্রদেশের লোক।

বিদ্রোহের কারণ।

ছি-ছোয়ান প্রদেশের ধনী সদাগরগণের সমবেত চেষ্টায় চীনা তুলিয়া এবং অংশ বিক্রয় করিয়া রেলরোড নিৰ্ম্মাণের আয়োজন হয়। এক রেলওয়ে সমিতি গঠন করিয়া কার্য আরম্ভ হয়। অবশ্য এই গুরুতর কার্য স্থানীয় রাজ-কৰ্মচারীগণের সাহায্য ও সহায়তক্রমে হইয়াছিল। কার্য অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলে চীন গবর্ণমেন্ট এই রেল লাইন নিৰ্ম্মাণের ভার নিজ হস্তে লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং ইহার ব্যয় বাবদ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হইতে নাকি পনের কোটি টাকা ধার করিবার জন্ত এগ্রিমেন্ট হয়। রেলওয়ে সমিতি ও প্রজাগণ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নানা স্থানে আন্দোলন দ্বারা অসন্তোষের বীজ বপন করিতে লাগিল।

লোকের মনে এমন একটা ভ্রাস জন্মিল যে এই রেল-ওয়ের জন্ত গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট টাকা ধার করিলে প্রকারান্তরে ঐ রেল লাইন বিদেশীর নিকট বিক্রয়

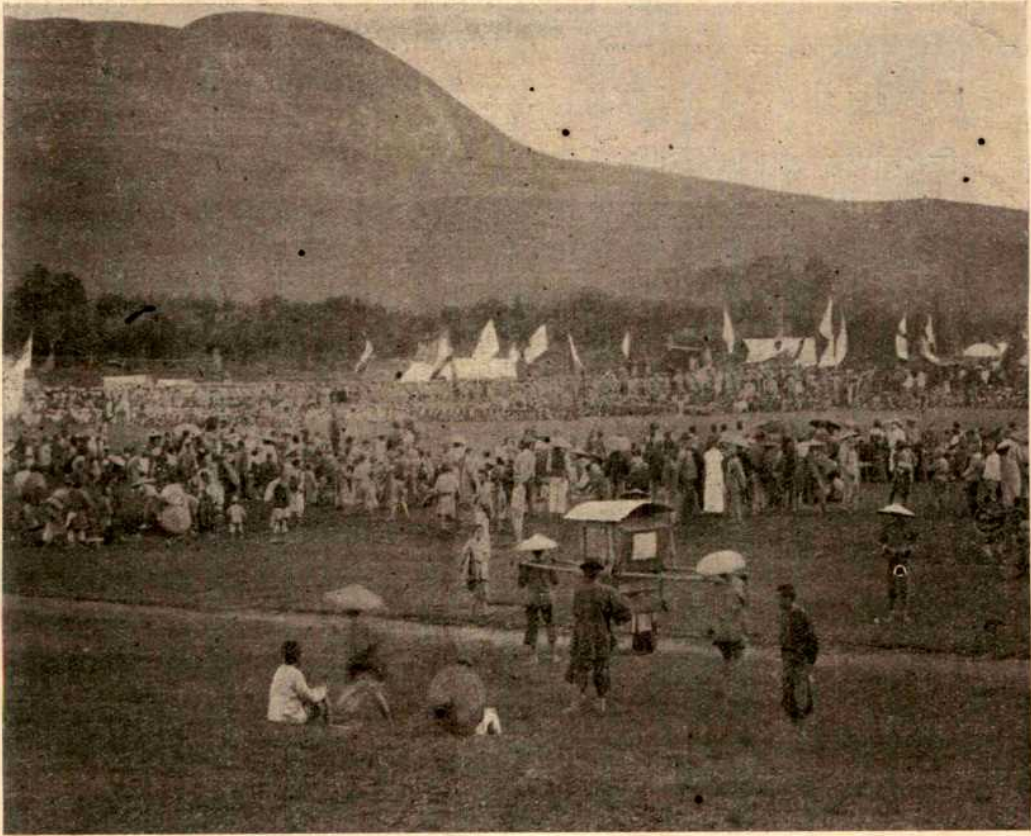
করার সমান হইবে। কেননা টাকা শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত বিদেশী লোকের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব এই লাইনের উপর থাকিবে এবং দেশ বিদেশীদিগের হস্তগত হইবে। টেঙ্গিয়ের বিদ্রোহের পূর্বে এখানকার সেপাইগণ ঠিক এই প্রকার কথা বলিত।

চীনাদিগের এই আশঙ্কা যে অলঙ্ক নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ কৃষ গবর্ণমেন্ট সাইবিরিয়া দিয়া যে প্রকাণ্ড রেলপথ প্রস্তুত করিয়াছেন তীক্ষ্ণ দ্বারা ক্যালেন বন্দর হইতে রেল চড়িয়া সাইবিরিয়া দিয়া একাদিক্রমে নাখুরিয়া দিয়া সিওল বা পেকিনে পৌছিয়া যায়। ইহা কৃষিয়ার এক বৃহৎ কীর্তি। ইংরেজদিগেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই যে তাঁহারাও এমন একটা রেলপথ নিৰ্ম্মাণ করেন যে সেই ক্যালেন বন্দর হইতে রেল চড়িয়া পারস্যীয়া, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান দিয়া হয়ত করাচী হইয়া, না হয় পেশোয়ার হইয়া আসাম পৌছিয়া তথা হইতে ছি-ছোয়ান রেল দিয়া একাদিক্রমে সাংহাই পৌছিতে পারেন। তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডবাসীদিগের বিলাত যাওয়া বা বিলাতের লোকের অষ্ট্রেলিয়া যাওয়াটা বেশ সুগম হইবে। সামুদ্রিক পীড়া বা ঝড় তুফানের আর ভয় থাকিবে না। পূর্বে কোনো ইংরাজী পত্রিকায় এই প্রকার কল্পনার কথা পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হয় যে সেই কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাওয়ায় পারন্তে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই কারণেই বা চীনের গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। সে যাহাই হউক আমরা “আদার ব্যাপারী” বইত নয়, আমাদেরই এত বড় জাহাজের কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

ঝড়ের সূচনা।

ঝড়ের পূর্বে যেমন নভোমণ্ডল নিস্তব্ধ ও গম্ভীরভাবে ধারণ করে, কেবল মাঝে মাঝে ঈশান বা নৈঋৎ কোনে বিজ্যচ্ছটা ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া লোকের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়া থাকে, ছি-ছোয়ানের রাজধানী চেং-টো সহরের ভাবও তাদৃশ হইয়াছিল।

গ্রাম গ্রামে সহরে সহরে নিয়ত গোপনে ও প্রকাশে সভাসমিতি হইতে আরম্ভ হইল, স্কুলে স্কুলে মহা আন্দোলনের



চীনদেশের বিজ্ঞানবালিকাদিগের প্যারেড ও উৎসব।

চেউ গিয়া আঘাত করিয়া ছাত্রগণকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

স্কুলের বালিকা ও বালকগণের শতকরা আশিজন ছাত্র ছাত্রী স্কুল ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে গিয়া সকল লোককে দেশের বিপদের কথা জ্ঞাপন করাইয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল। এবং গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সকল লোককে বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তুলিল।

ইয়াংসী নদীর ভাটিতে বহুদূরে জুধারে যত গ্রাম আছে সেইসকল গ্রামের লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্ত “রিভার টেলিগ্রাম” নাম দিয়া সংবাদ প্রেরণের এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করা হইল। বহু কাষ্ট-ফলকে বড় বড় অক্ষরে “চেং-চৌর রাজকর্ষচারীগণ হত হইয়াছে। পেকিন হইতে সৈন্ত আসিয়া গরীব ছি-ছোয়ানবাসীদিগকে নিপাত করিবে। তোমরা আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ কর।” লিখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

স্থানীয় মুদ্রাবল্লসকলের প্রভাব আরো বৃদ্ধি হইল। নানা সংবাদপত্রে পেকিন গবর্ণমেন্ট ও রাজকর্ষচারীদিগের নানা কুৎসা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। “চক্ষু উন্মেষক” “Eye Opener” “জ্ঞান উন্মেষক” “Wisdom Opener” “পাশ্চাত্য দর্শক” “Western Observer” প্রভৃতি পত্রিকায় নানা প্রকার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার একখানিতে ব্রহ্মদেশের পূর্বোত্তর কোণ মিচিনা জেলার নিকট পিয়েমেন-মা নামক স্থানে বিদেশী সৈন্তগণ গাছে চড়িয়া চীন সৈন্তদিগকে গুলি করিয়া মারিতেছে; আর একখানিতে সৈন-সুয়ান-হোয়াই নামক প্রধান রাজকর্ষচারীকে মুণ্ডপাত করিবার জন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহার গৃহে অগ্নি-সংযোগ করা হইয়াছে; তৃতীয় খানিতে বিদেশী কর্তৃক রমণীগণ অপহৃত হইতেছে, পুলিশ নিরক্ষর অবস্থায় তাহা দেখিতেছে, ইত্যাদি।

বিদেশী-বিদ্বেষ ।

চীনদেশী সর্বসাধারণের মনে বিদেশীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা থাকিলেও, বিদেশীকে আক্রমণ করিলে শেষে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ভয়, এবাব চীনারা অতি সাবধান হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ছি-ছোরান প্রদেশের কোনো স্থানে বিদ্রোহীগণ কাহাকেও আক্রমণ করে নাই বা কাহারও সম্পত্তির ক্ষতি হয় নাই। মাত্র একটা ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। রেভারেন্ড মানলী সাহেব যখন জি-চাও নামক স্থানের রাস্তা দিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তখন অন্নবয়স্ক বালকেরা তাঁহাকে অতি কুৎসিত ভাষায় সোধন করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে বয়স্কগণও আসিয়া বোগ দিল। জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। লোকেরা পাত্রীর গির্জাহ ভিতর প্রবেশ করিয়া ভালা-চুবা আরম্ভ করিল। ইতিপূর্বেই মানলী সাহেব দোড়িয়া ভিতরে গিয়াছিলেন। তিনি ভিতরে দরজা বন্ধ করিয়া পশ্চাৎ দিকের এক মেটে প্রাচীরে ছিদ্র কবিত্তা সেই পথে বাহির হইয়া কোনো প্রতিবন্ধীর বাড়ীর ভিতর দিয়া পলায়ন করেন। চীনাদিগের এই বিশ্বাস যে, রাজ্যে বিদেশীগণের অবস্থানই সকল অনিষ্টের মূল। তাহারা প্রথমে রেলওয়ের মালিক হইয়া ক্রমে রাজ্যটা ভাগাভাগি করিয়া লইবে।

ঝট্টিকারমুখ ।

পেকিনের মন্ত্রীসভার বিদেশী রাষ্ট্রনীতির মন্ত্রী প্রিন্স চিং* উপরই আন্দোলনের প্রধান কোপ পতিত হইল। যত সভাসমিতি তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল। কারণ লোকে বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনিই বিদেশীগণের নিকট এই রেলওয়ে লাইন বিক্রয় করিতে সংকল্প করিয়াছেন। প্রাথমিক সমিতির সভাপতি মিঃ পো এই রেলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের অগ্রণী। সুতরাং পেকিনের মন্ত্রীসভার কোণটা তাঁহার উপরই পতিত হইল। পো ও অন্যান্য প্রধান আন্দোলনকারীদের দ্বারা করিবার জন্ত প্রিন্স চিং, চেংচৌর গবর্নর জেনারালকে তারে আদেশ করেন।

* প্রিন্স চিং কটো পূর্বে "পেকিনরাজপুত্রী" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭ই সেপ্টেম্বর গবর্নর জেনারাল চাও-আড়-ফাং হট্টাৎ চেং-চৌ সহরের নগরপ্রাচীরের সকল দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। চেং-চৌতে তখন ১৮০ জন বিদেশী লোক ছিলেন। তাঁহাদিগকে নগরের মধ্যে ক্যানাডিয়ান মিশনের বাটার মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্ত আদেশ করিলেন। ব্রিটিশ কনসালজেনারেল মিঃ উইলকিন্সন প্রভৃতি ক্যানাডিয়ান মিশন হস্পিটালে বাস করিতে লাগিলেন।

গবর্নর জেনারাল বিপদের আশঙ্কার ভান করিয়া সকল সৈন্তকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সনত্ত সহরের সকল রাস্তা সৈন্তগণ ছাইয়া কেবল। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে রেলওয়ে সমিতির নেতা মিঃ লো এবং জাতীয় সমিতির সভাপতি মিঃ পো প্রভৃতি বৃত্ত করিয়া ইয়ামিনে বন্দী করা হইয়াছে। চীনাদিগের জাতীয় রীতি অনুসারে পেকিন হইতে টেলিগ্রাফিক আদেশ অনুযায়ী গবর্নর জেনারাল আন্দোলনকারীদের অগ্রণীদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠান যে পেকিন হইতে রেলওয়ে সম্বন্ধে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন। দলপতিগণ তাঁহার ইয়ামিনে উপস্থিত হইলে সামান্য তর্কবিতর্কের পর তাঁহাদিগকে কয়েদ করিবার আদেশ দিলেন। সৈন্ত পূর্বে হইতেই প্রস্তুত ছিল। তাহারা ইয়ামিন বেটন কবিত্তা দাঁড়াইল। কিন্তু প্রজাসাধারণ চীৎকার দ্বারা রাজপ্রতিনিধির কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশনায়কদিগকে মুক্তি দিতে জোর করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ লোকেরা সহরের ভিতরে ও ইয়ামিনের চতুর্দিকে জমা হইয়া আবো উচ্চ রবে চীৎকার আবৃত্ত কবিত্তা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশ্চাত্তব লোকেরা সম্মুখের লোকদিগকে চেলিয়া ক্রমে ভিতরের দিকে চাপা দিতে লাগিল। তখন গবর্নর জেনারাল চাও-আড়-ফাং সৈন্তদিগকে গুলি করিতে আদেশ দিলেন। বন বন বাইফলের আওয়াজ হইতে লাগিল, নিরস্ত্র প্রজামণ্ডলীর অনেকগুলি লোক মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। যাহাবা আহত হইয়াছিল তাহাবা চীৎকার করিতে লাগিল, অপর লোকেরা ভয়ে দোড়িয়া পলাইতে লাগিল।

তাহার পরই সৈন্তেরা রাস্তার রাস্তার খণ্টা পিটাইয়া জানাইল যে যাহারা দোকান বন্ধ করিয়াছে তাহাদের

মুরব্বীদিগকে ইয়ামিনে হাজির হইতে হইবে। সম্রাট কোরাংসীর সম্মানার্থে দোকানে দোকানে পীত বর্ণের চিহ্ন ছিল তাহা এবং সাহিত্যসমিতি ও অন্যান্য সভাসমিতির সকল আসবাব মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

চাও-আড়-ফাংর অবিমুখ্যকারিতার জন্য সকল লোককেই রাষ্ট্রবিপ্লবের দলভুক্ত হইতে বাধ্য করিল। আন্দোলন এখন আর রেলওয়েতে সীমাবদ্ধ রহিল না, উহা এখন রাষ্ট্র-বিপ্লবে পরিণত হইল।

বিপ্লবকারী দল ঘোষণা করিল যে বিদেশীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে কিন্তু মাঞ্চুবংশ ও তাহাদের কর্মচারীদিগকে তাড়াইতে হইবে। গবর্ণমেন্ট লোকের উপর যতই শক্ত শাসন চালাইতে আরম্ভ করিলেন, প্রজারা ততই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; প্রজাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য যতই লোকের শিরশ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, রক্তবীজের মত ততই শত শত লোক মৃত্যুক উত্তোলন করিয়া এই নৃশংস কার্যের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। প্রজাশক্তির অসীম তেজে মাঞ্চু রাজসিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল।*

ছি-ছোয়ান প্রদেশে ঘোর আশঙ্কা উপস্থিত হইল। গবর্ণমেন্টের দুর্বলতা দেখিতে পাইয়া ছুইলোক মক্ষ্মলের সহর ও গ্রাম লুণ্ঠ করিতে আরম্ভ করিল, অপবাদটা হইতে লাগিল রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের। বাস্তবিক তাহা মিথ্যা। রাষ্ট্রবিপ্লবকারীরা এ বিষয়ে বেশ মহত্বের পরিচয় দিয়াছে। দুর্বলের সশরত্যা করিয়াছে এবং ছুইকে যথা-যোগ্য শাস্তি প্রদান করিয়া জারবিচারের পরিচয় দিয়াছে।

চেংচৌ সহরের বাহিরে ছুধারে দশ মাইলের মধ্যে নানা স্থানে খণ্ডখন্ড আরম্ভ হইল। রাজকীয় সৈন্তগণ প্রায় সকল যুদ্ধেই পরাজিত হইতে আরম্ভ করিল, কোনো কোনো স্থানে সরকারি সৈন্তও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দিল। বিদ্রোহী-গণ অনেকস্থলে গাছের শুড়ির ভিতর খোল করিয়া তাহার মধ্যে বারুদ, ভাঙ্গা লোহার টুকরা ইত্যাদি পুরিয়া রাখিয়া তাহাতে বৈজ্ঞানিক তার সংলগ্ন করিয়া এমন প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছিল যে সহসা কেহ তাহা টের পাইতে পারে না।

* এখানে রবীন্দ্রবাবুর মূল্যবান কথাটি উল্লেখযোগ্য যে “বাহিরের বন্ধন যতই শক্ত হয় ভিতরের বন্ধন ততই শিথিল হইয়া পড়ে।”

লড়াইয়ের সময় রাজকীয় সৈন্তগণকে সেই বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। মক্ষ্মলের চতুর্দিক হইতে দলে দলে বিদ্রোহীগণ নগর আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

গবর্ণর জেনেরাল চাও-আড়-ফাং প্রজাশক্তির আঘাতে হতভম্ব হইয়া গেলেন, তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি আপন সৈন্তদিগের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না। সন্দেহে হিম্না হইয়া কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না তাই পূর্বেই গোলযোগের আভাস পাইয়া ডাভিলু ডাসিলু প্রভৃতি ভিবত সীমান্তের দূরস্থ স্থান হইতে সৈন্ত আসিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তথা হইতে তিন হাজার সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার মনে বলসংকল্প হইল।

১১ই তারিখ তিনি হঠাৎ আবার নগরের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সৈন্ত সমস্ত রাস্তা ছাইয়া ফেলিল। আন্দোলনকাবী অপর দলপতিদিগকে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে এবং ছাত্র-গণের সচিবদিগকে ধৃত করিতে আদেশ দিলেন। “চক্ষু-উন্মেষক” “জ্ঞান-উন্মেষক” প্রভৃতি সংবাদপত্রের আগিসের সকল দরজা বন্ধ করিয়া শিলমোহর যুক্ত করা হইল।

কারারুদ্ধ প্রধান ব্যক্তিগণের নাম।

রেলওয়ের বিকল্পে আন্দোলনকাবীদেব নেতা লো-লেন; তেনসিয়াও-কো—একজন প্রসিদ্ধ স্পষ্টবক্তা; বিশ্ববিজ্ঞান-লয়ের ছাত্রদিগের নেতা নিয়েন; জাপান-ফেরত ছাত্র-টিয়েন; রেলওয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট চাং-লান; প্রাদেশিক সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট পু-তিওনজুন ও ওয়াং; ব্যবসা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদিগের নেতা পেন; শিক্ষাবিভাগের অগ্রণী বাটবৎসরবরুং মং প্রভৃতি। অনেকে আশঙ্কা করিতেছিল যে এইসকল লোকের মাথা বুঝি কাটা গিয়াছে।

রাজপ্রতিনিধি ঘোষণাপত্রের উপর ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে লাগিলেন কিন্তু লোকে আর তাহার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিল না।

তাহার একখানির মর্ম এই যে, আন্দোলনকাবীগণ

সকল লোককে মিথ্যা কথা দ্বারা প্রভাবিত করিয়া বিদ্রোহী করার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে নির্দোষ লোকেরা ছাগল ভেড়াব যত হত হইতেছে।

আর একখানির মর্ম এই যে, লোকে যে রেলওয়ের বিকল্পে আন্দোলন করিতেছে তাহা অস্তায় নহে। গবর্ণ-মেন্ট তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করিবেন না। তবে চাবিটা বিষয়ে লোকেবা অস্তায় করিতেছে, বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ১ম, প্রজাবর্গকে সরকারের ট্যাক্স দিতে নিষেধ করিয়া নিজেবা তাহা আদায় করিবার চেষ্টা। ২য়, তাহারা সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া কাওরাজ শিক্ষা দিতেছে। ৩য়, আন্দোলনকাবীগণ বন্দুক ও কামান সংগ্রহ করিতেছে এবং প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৪র্থ, গবর্ণমেন্টের পক্ষাবলম্বী যাহাবা তাহারা বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইবে ও তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইবে, বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

বিদেশীগণের অবস্থা।

চেন্‌চৌর বাহিরেব সমস্ত সংবাদাদি বন্ধ। ডাক ও টেলিগ্রাফ বন্ধ, বিদেশীবা নিজেদের ঘবে কয়েদীর মত বাস করিতে লাগিলেন।

চেন্‌চৌর নিম্নে ইয়াংসী নদীর ধারে চুং-কিং নামক প্রাসাদ বাগিচা-বন্দর। চুং-কিং হইতে চেন্‌চৌ যাইতে ৪০ দিন লাগে। এইস্থানে বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান বাস করেন। চেন্‌চৌ হইতে প্রত্যাগত কুলির মারফত গোপনে পত্রাদি পাঠাইয়া সাহেবেরা বহির্জগতের লোককে সংবাদ দিতেন। এই পত্র পাঠানও সহজ ছিল না। বিদ্রোহীরা প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর তল্লাস করিয়া দেখিত। কোনো পত্র পাইলে বাধিয়াপু করিত। এই জন্য এক কুলিব হাতে ব্রিটিশ কনসালজেনেরাল মিঃ উইলকিন্সন চুংকিনে তাঁহার কোনো বন্ধুর নিকট চেন্‌চৌ সহরের হাল লিখিয়া জানাইয়া অশুভোখ করিলেন যে তাঁহার যত পত্র টেলিগ্রাম প্রভৃতি তথায় মজুদ আছে তাহা যেন বিক্ৰুট জাম প্রভৃতির বাক্সেব মধ্যে ভরিয়া কুলি দ্বারা পাঠান হয়। বিদ্রোহীগণ এই বাস্তব সন্দেহ করিয়া খুলিবে না। যত টেলিগ্রাম কুলিব হাতে পাঠাইবৈন তাহার নিকাশ রাখিবেন।

বিপদের আশঙ্কা জন্মে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজ-প্রতিনিধি ও অন্তান্ত উচ্চ কর্মচারীদিগের পরিবারবর্গ সেনানিবাসে আশ্রয় লইল। মক্ষ্মলের সহব ও গ্রামের লোকেরা পরিবারবর্গ সহ পর্বতে ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে আবস্ত করিল। খণ্ডখণ্ড ক্রমাঘরে চলিতেছিল।

বিদ্রোহীদিগের নিষ্ঠুরতা।

মিয়া-নিয়াং-চাং নামক স্থান (৩০ চেন্‌চৌ হইতে ৩০ মাইল দূরে) হইতে প্রায় ১৭১৮ জন সরকারী সৈন্ত আসিতেছিল। কোন ব্যক্তি বন্ধুতাব ভান করিয়া তাহাদিগকে কহিল যে সদব রাস্তা দিয়া যাইও না, তথায় বিদ্রোহী সৈন্ত আছে। সৈন্তগণ তাহার কথায় বিশ্বাস করার ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে এক ক্ষুদ্র পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। যখন এক কাঠের পোলের উপর পৌঁছিল তখন পোল ভাঙ্গিয়া পড়িল। পোলটা পূর্বাচ্ছেই ইহার কন্নাত দ্বারা কাটিয়া রাখিয়াছিল। সৈন্তগণ পড়িয়া যাবার বিদ্রোহীগণ গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সকলকে ধৃত করিয়া নিরস্ত্র করিল এবং পবে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ছিন্নশূণ্ডগুলি এক মন্দিবে ঝুলাইয়া রাখিল।

টুয়াং-ফাংর ঘোষণাপত্র।

পেকিনের মন্ত্রীসভার সমস্ত দৃষ্টি ছি-ছোয়ান প্রদেশের উপর পতিত হইল। মন্ত্রীসভা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার টুয়াং-ফাং নামক স্বপ্রসিদ্ধ উচ্চ কর্মচারীকে রেলওয়েব ডাইবেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ দমনেব ভার দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি ছি-ছোয়ান প্রদেশের নিকট উপস্থিত হইয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, তাহার মর্ম এই :—

“আমি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ছি-ছোয়ানবাসীদিগকে তাঁহার সদিক্ষা জ্ঞাপন কবিতো আসিয়াছি। আমার সঙ্গে যে সৈন্ত আসিয়াছে তাহা কেবল দস্যাদমনের জন্য।

“ছি-ছোয়ানের রেলওয়ে, গবর্ণমেন্ট নিজ হস্তে লইবাব কারণ এই যে, এই রেলওয়ে শুধু প্রজার অর্থে নিৰ্ম্মাণ করা কঠিন ব্যাপার এবং রাষ্ট্রনীতির হিসাবে এই রেলওয়ে লাইন অতি প্রয়োজনীয়। ইহা নিৰ্ম্মাণ করিতে

দশ হইতে বিশ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। এই লাইন প্রস্তুত করিবার ক্ষুদ্রতর ভার বহন করা গরীব ছি-ছোয়ানবাসীদিগের পক্ষে অতি কষ্টকর হইবে। ইহা নির্মাণ করিতে গেলে এদেশের লোক আবার গরীব হইয়া যাইবে। প্রজাব প্রতি দয়াপরবশ হইয়া গবর্ণমেন্ট এই লাইন নিজ হস্তে লইয়া ইহার নির্মাণে অর্থ ব্যয় করিবেন। এবং এতদিন লোকের নিকট হইতে যে বলপূর্বক টাকা ও অংশ সংগ্রহ করা হইতেছিল তাহা রহিত হইল। গবর্ণমেন্টের এই অল্পগ্রহ প্রকাশেব ক্ষুদ্র ছি-ছোয়ানবাসীদিগের কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাহাব পরিবর্তে কতকগুলি আন্দোলনকাৰী লোক রটনা করিতেছে যে, গবর্ণমেন্ট প্রজার অর্থ শোষণ করিতেছেন এবং বিদেশীর নিকট টাকা ধার করিয়া এই রেলওয়ের ভার বিদেশীর হাতে দিয়া প্রকারান্তরে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেছেন। তাহারা কি জানে না যে উক্তর চীনে এবং পেকিন-হাং-কাং রেলওয়ে বিদেশী নিকট টাকা ধার করিয়া নির্মিত হইয়াছে, এবং তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইতেছে, কিন্তু কই তাহা দ্বারা ত দেশের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ এই নুতন ধরণ অতি সুবিধাজনক সৰ্ত্তে স্থিতি হইয়াছে।

“লোকে এইসমস্ত বিষয় অল্পসন্ধান না করিয়া কেবল বুখা আন্দোলন করিয়া গোলযোগ করিতেছে। স্থল কলেজ প্রভৃতি বন্ধ করিয়াছে। বাজারের সকল দোকান বন্ধ করিয়া ঋণদাবীক্ৰয়ের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। লোকের এইসমস্ত ব্যবহার দ্বারা রাজদ্রোহের পবিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত বিদ্রোহীগণ চতুরতা দ্বারা প্রজাসাধারণের সর্কনাশ করিতে উক্তত চইয়াছে। ইহা দ্বারা তোমাদের সন্তানগণ দলে দলে নিহত হইবে। মনুষ্য ও বিদ্রোহীগণকে গবর্ণমেন্ট কখনও মাফ করিবেন না।

“রেলওয়ে সমিতি সম্বন্ধে যেসকল অনিষ্টকর গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, সে সমস্তই জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে। যদিও রেলওয়ে সরকারি সম্পত্তি হইল তবুও তাহা প্রজাসাধারণের বস্তু। অতএব আমার অনুরোধ এই যে এই বিষয় লইয়া যেন লোকে আর কোনো গোলমাল না করে। স্থল ও বাজার খোলা হউক। ব্যবসায় বাণিজ্য পূর্ববৎ চলিতে থাকুক। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হউক।

প্রজারা নিয়মমত কর প্রদান করুক। তাহা হইলে রেলওয়ে নির্মিত হইবে এবং গবর্ণমেন্টও সন্তুষ্ট হইবেন। তাহা হইলে প্রজাব সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।”

এই ঘোষণা দ্বারা কোন ফল ফলে নাট। এই সময় মন্ত্রীসভার কোনো কোনো সদস্য রাজাভিত্তিককে পরামর্শ প্রদান করিলেন যে ছি-ছোয়ান প্রদেশের লোকের উপর দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের ট্যাক্সেব হাব কমান হউক। ইহা দ্বারা প্রজাগণ রাজদ্রোহ বৃদ্ধিতে পাবিয়া রাজভক্ত হইবে। এই পরামর্শানুসারে পেকিন হইতে এক গুপ্ত আদেশ ভাইসরয় চাং-আড়-কাং নিকট প্রেরিত হয় যে তিনি, ছেন-ছোয়ান-সুয়ান ও টুয়াং-কাংব সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রজার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ট্যাক্স কমান যাইতে পারে কিনা সে বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

মন্ত্রীসভা হইতে সৈনিকবিভাগেব মন্ত্রীর উপর আর এক গুপ্ত আদেশ প্রেরণ করা হয় যে তিনি চারিজন সৈনিক কর্মচারীকে ছদ্মবেশে ছি-ছোয়ানে প্রেরণ করিয়া গোপনে লোকের প্রকৃত অবস্থা ও বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

মিঃ ছেন-ছোয়ান-সুয়ান উচাং সহরে উপস্থিত হইয়া ছি-ছোয়ান প্রদেশের বিদ্রোহের বিষয় উল্লেখ করিয়া পেকিনে এক দরখাস্ত প্রেবণ করেন। তাহাতে উল্লেখ করেন যে “ছি-ছোয়ানের বিদ্রোহ রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লব-জনিত নহে। তাহা কেবল রেলওয়ে সংক্রান্ত। এমনতাবস্থায় তথায় এক যুদ্ধাভিযান লইয়া গেলে ঐ প্রদেশের লোকের বিশেষ ক্ষতি হইবে। তাহা হইলে লোকের মনে আরও অশান্তি বৃদ্ধি হইবে।” মিঃ ছেন দরখাস্তে চারিটা বিষয়ের অবতারণা করেন। (১) “ছি-ছোয়ান রেলওয়ের বিদেশী মূলধন সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ করা হউক। (২) লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইচাং রেলওয়ে-ডাইরেক্টর লি-টী-সুনকে বরখাস্ত করা হউক। (৩) টুয়াং কাং-কে আদেশ করা হউক যে ৩০ লক্ষ টেল (প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা) বাহা ছি-ছোয়ান রেলওয়ে তহবিল হইতে ধার কৃবা হইয়াছিল তাহা অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হউক। (৪) ইউনান প্রদেশ হইতে যত সৈন্য ছি-ছোয়ান প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের বেতন অবিলম্বে প্রদান করা হউক।”

কিন্তু পেকিনের মন্ত্রীসভা মিঃ ছেনের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য না কবার তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ভয়মনোবোধ হইলেন।

তাইস্বয় চাও-আড়-ফাং পেকিনে যে টেলিগ্রাম পাঠান তাহার মর্ম্ম এই:—“বিদ্রোহ ক্রমে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে। ছেন-ছোয়ান-সুয়ান বিদ্রোহ দমনে ভয় পাঠিতেছেন। তাঁহার কার্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহ দমনের আবশ্যিক পরিমাণে ক্ষমতা দেওয়া হউক। যতই বিলম্ব হইবে ততই অনিষ্ট হইবে। টুয়াং-ফাং বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ। তাঁহাকে মাত্র রেলওয়েভ ভাব দেওয়া হউক।”

“আত্মরক্ষার উপদেশ” (Self preserving advices) নামক একখানি গ্রন্থ রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদের হাতে ছিল। উক্ত গ্রন্থ জাতীয় সমিতির মেম্বর পু-লু প্রভৃতি সাতজন লোক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ কবার গবর্ণর ছেনেরাল উক্ত মেম্বরগণকে কাবাকদ্ধ করেন। ছি-ছোয়ান গবর্ণমেন্টের পেকিনস্থ কর্ম্মচারীগণ এই কার্যের প্রতিবাদ কবিতা বলেন যে ঐ পুস্তক এইসকল ব্যক্তির দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই, স্তম্ভরাং নির্দোষীদেরকে মুক্তি দেওয়া হউক।

ছপে হইতে এবং ক্যান্টন হইতে বহু সৈন্য আসিয়া ছি-ছোয়ান প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং সেন্সী হইতেও বহু সৈন্য আসিবার হুকুম হইল।

হান বংশধরগণ।

চীনাগিকে চীন ভাষায় “হানিয়ান” বলে এবং মাঞ্চুদিগকে “মান্‌জেন্” বলে। যত চীনা সমস্তই হানবংশসম্ভূত। আমরা হিন্দুরা যেমন আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া গৌরব মনে কবি, তাদৃশ চীনারা হানবংশসম্ভূত বলিয়া গৌরব মনে করে। আর্য্যগণ যেমন অনার্য্যকে স্বণা কবে, চীনাগণ অনহানবংশসম্ভূতদিগকে অবজ্ঞাব চক্ষে দেখে। এই কারণেই ইহা বা হানজেন বা মাঞ্চুদিগকে স্বণা করে।

এই সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবকারীগণ এই সম্বন্ধে যে এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছে তাহার মর্ম্ম এই:—

“সমস্ত হান ভ্রাতৃগণের জানা উচিত যে বর্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লব যে উপস্থিত হইয়াছে তাহা লোকের মঙ্গলের জন্ত এবং অপবাদীদেরকে শাস্তি দিবার জন্ত। বর্তমান মাঞ্চু গবর্ণমেন্ট, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, উদ্বাদগ্ৰস্ত ও চৈতন্যশূন্য। ইহারা লোকের উপর গুরুতর ট্যাক্স বসাইয়াছে এবং লোকের অস্থিমজ্জা পেষণ করিতেছে। ইহারা হানবংশীয় লোককে ময়লাব সন্মুখ মনে কবিতা স্বণাব সহিত ব্যবহার করে এবং ইহা বা জানে না যে লোকের কি দুঃখ ও ক্লেশ। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে ইহা বা সাহায্য কবে না।

“প্রজার রক্ত শোষণ কবিতা ইহা বা রাজপ্রাসাদ ও নন্দন-কানন সকল নির্মাণ করে। পৃথিবীর সমস্তদেশের লোক এইসকল বিষয় অবগত আছে এবং ইহা শুনিয়া দুঃখে লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই কথা স্মরণ কবে যে যখন মাঞ্চুগণ চীন রাজ্যে প্রবেশ কবিতাছিল তাহা বা তখন নগরে নগরে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ নির্ভিক্ষেবে হত্যা করিয়াছিল। এই প্রকাব নৃশংস বর্বরতা বর্তমান ও প্রাচীন কালে কখনও শুনা যায় নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের উপর যেসমস্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার যদি প্রতিশোধ আমরা না লই তাহা হইলে আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। অতএব সমস্ত ভ্রাতৃগণের কর্তব্য বুঝা উচিত এবং তাহা বুঝিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদেরকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া বর্বর বিদেশী মাঞ্চুদিগকে নিপাত করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ইহা ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ পবিত্র কর্ম্ম এবং সেইজন্য অবিলম্বে দ্বিধাশূন্য হইয়া অনিষ্টকারীগণ দ্বারা নিপাত হয় তাহা কবা কর্তব্য।

“ভগবানের আদেশে আমাদের সম্মুখে এই কর্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে, এই সুযোগ যদি আমরা অবহেলা করি তবে কবে আর এমন সুযোগ উপস্থিত হইবে?”

“রাষ্ট্রবিপ্লবকারীগণ দীর্ঘজীবী হউন।”

(ক্রমঃ)

টেঙ্গিয়ে, চীন।

শ্রীমালাল সন্নকার।

কাছের সাথী

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।

শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হ'ত খবর আসে
উঠ'ত হিয়া চমকে।

শুধু বেদিন দখিন হাওয়ার
বিবহগান মনকে গাওয়ার—
পরান-উনমাধনী,—

পাতার পাতার কাঁপন ধরে,
দিগন্তের ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনী—

সেদিন আমার লাগে মনে
আছে যেন কাছে কোণে—
একটুখানি আড়ালে।

জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে।

একি গভীর, একি মধুর
একি হাসি পরান-বঁধুর,
একি নীবব চাহনি।

একি বিজ্ঞান গহন মায়ী
একি বিপুল জ্ঞানল হারা
নয়ন-অবগাহনী।

লক্ষ্যতারেব বিশ্ববীণা
এই নীরবে হয়ে লীনা
নিতেছে স্বর কুড়িয়ে,

সপ্তলোকের আলোকধারা
এই ছায়াতে হল হারা
গেল গো তাপ জুড়িয়ে।

সকল রাজার রতন-সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
বিনা সাজের কি বেশে।

আমাব চির জীবনে

লও তুমি এই লগগো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereএর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

০০

উৎকৃষ্ট সাহিত্য। আরবদিগের ধর্ম কবিতার ধর্ম। মহম্মদের পূর্বে, উত্তর প্রদেশের বেহইন্না স্বকীয় বিপদ-সম্মুখ যুদ্ধযাত্রাসম্বন্ধে, প্রেমের ব্যাপারসম্বন্ধে, শাখাজাতি-দিগের সংগ্রামসম্বন্ধে, এবং যে মরুভূমি দিবসে প্রথমে স্বর্ঘ্যোত্তাপে দগ্ধ হয় এবং যে মরুভূমিতে রাত্রিতে শৃগাল ও জিনেরা (দৈত্য) বিচরণ করে, সেই মরুভূমিসম্বন্ধে তাহার গান কবিত।

“শনকর” হইতে :—

আমার মায়ের ‘হাবাল,’ তোমরা এখন পশুদের লইয়া চবাইয়া বেড়াও। আমি তোমাদের ছাড়িয়া চলিলাম। বীরপুরুষের একমাত্র আশ্রয়স্থান—মরুভূমি...আমার সমাজ—চিতা, নেকড়ে ও তরসুর দল; আমার সঙ্গী—আমার বীর-সদয়, আমার ধনু, আমার শানিত, তলোয়ার...আর স্ত্রী—জলিয়া জলিয়া আপনিই নিবিয়া যায়; তখন আমি অস্ত্র বিবর ভাবি, স্ত্রীর কথা ভুলিয়া যাই। আর বালুরাশি? বরং আমি এই বালুরাশি লেহন করিব, তবু গর্কিত লোকদিগের নিকট নতশির হইব না...ঐশ্বর্যের প্রথর তাপ, জলন্ত স্বর্ঘ্য, হাসরোধী বাষ্পজাল; তপ্ত বালুকার উপর সর্পেরা আঁকিয়া থাকিয়া চলিতেছে। আর আমি, সাহসপূর্বক স্বর্ঘ্যের সম্মুখে আমার ললাট ও বক্ষ পাতিয়া রম্বিষাছি। আলখান্না নাই, চুপি নাই। কেবল একখণ্ড মোমড়া চীরবস্ত্র। (১)

সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যরত দক্ষিণ-আরবদেশে, যেখানে সর্বদেশের পোতসকল নিত্য যাতায়াত করে সেইসব বন্দরে, আরবেরা “সবা”র প্রাচীন রাজাদিগের মহিমা ও ঐশ্বর্যের কীর্তন করিত।

এইরূপ যথা :—

লুটের বোঝা লইয়া, আমাদের হ্রেয়ানিকারী বলবান অরবের নিকট আমরা কিবিধা আসিলাম। আমরা কতকগুলি অস্বাভাবিক বস্তুকে লইয়া আসিয়াছি। তাহাদের হুগোল কপোল, উজ্জল বর্ণ, স্বকুমার শরীর, ছিপছিপে গঠন, শুকনিতম্ব; ঠিক যেন ঝটিকা-গর্ভ জলজজাল হইতে পূর্ণচক্রে বিনির্মুক্ত। উহাদিগকে উল্লগুঠে উঠাইয়া

(১) “হমাসা,” Ruckert কৃত লর্দার অনুবাদ (১,১১১)

আনিবাছি। উহাদের শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেউব ও নুপুর উহাদের অঙ্গ হইতে অপস্থত হইয়াছে। আমাদের শত্রুগণ নিরস্ত ও যতকর। একটি গৃহও ভূমির উপর দণ্ডায়মান নাই, একটি সর্দারও জীবিত নাই। (২)

সভ্যতা জাতিয়া কবিতাকে রূপান্তরিত করিল। প্রাচীন কবি বাহা-মেখিত, শুধু তাহাই বর্ণনা করিত। নব্য কবি বা, ঘটনা ও স্থানের বর্ণনার সঙ্গে, জীবনক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী নীতি-উপদেশসকল যুক্তি দিতে লাগিল; হৃদয়ের অনুভবগাদি প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং আবও কিছুকাল পরে, সেইসকল হৃদয়েব ভাবাবেশ বিশ্লেষণ করিতে সচেষ্ট হইল। কবিতা ছিন্নপক্ষ হইল। পক্ষান্তরে কতকগুলি দার্শনিকের আবির্ভাব হইল। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ—“মাবী”। তাঁহার উক্তিগুলি বিবাদ-বজ্জিত। যথা :—

পিতা অপরাধী; তাঁহার অপরাধ? তাঁহার সন্তানদি। রাজারও জন্ম কম অপরাধের বিষয় নহে। তাহাদিগের হইতে আপনাকে যদি পৃথক করিতে বাও, তোমার অপরাধ আরও বর্ধিত হইবে। বুদ্ধিমান ও উদ্যবচরিত্র হইলে তোমার প্রতি তাহার আরও বিশেষ প্রকাশ করিবে। নির্দোষ অবস্থাতেই তাহাদের পিতা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে, জীবনের এমন এক রহস্তের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছে যে রহস্তের উদ্দেশ্য কখনকালে কোন জ্ঞানীই করিতে পারে নাই।

বড় বড় নীতিবেত্তাদিগের মধ্যে শেখ নীতিবেত্তা—“মাবী”। নীতিনীতির অবনতিব সঙ্গে সঙ্গে, উচ্চ ভাবের কবিতাবও অবনতি হইল।

কিন্তু আববেয়া লঘু কবিতাবও অল্পশীলন কবিতাছিল। তাহার যেরূপ মর্ম্মবাহী কঠোরপ্রকৃতি, যেরূপ কোপন-স্বভাব তাহাতে বিজ্ঞপাত্তক পঙ্করচনা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার আদিরসাত্মক গীতিকাব্য, স্ততি-বাচক পদ্ম ও জটিল আকাবের রসগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকও রচনা করিত। লঘু-কবিতার ওস্তাদ ছিলেন—আবু-মুহাস। তিনি হারুন-রসিদের একজন প্রিয়পাত্র।

কালিকের মৃত্যু উল্লেখ ও কালিকের পুত্রের জন্মোপলক্ষে যে পদ্ম রচিত হয় তাহার মর্ম্ম নিয়ে দেওয়া যাইতেছে :—

আমাদের নিকট হর্ব ও শোক আনিয়া দিয়া দিনগুলি আসে, দিনগুলি পলাইয়া যায়। আত কি?—আজ শোকের দিন। আজ কি?—আজ উৎসবের দিন। বুকের মধ্যে কান্না ঢাপিয়া আছে, চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। নির্জনে অশ্রুধারা, লোকসমাজে

আনন্দধ্বনি। কি আনন্দ। আমিন আমাদের প্রভু। কি শোক। আমাদের পুরাতন প্রভু মৃত। এক চন্দ্র বাগদাদ আলোকিত করিতেছে, আর এক চন্দ্র সমাধিস্থানের উপর নানিতেছে। (১)

প্রাচীন আরব-কবিতার মধ্যে দুইটি সংগ্রহ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে;—একটি হম্মাশ কর্তৃক রচিত (৭৭১ অব্দে হম্মাদের মৃত্যু)—“মুয়লাকাব”; অপরটি আবু-তেম্মাম-কর্তৃক রচিত (৮৪৬ অব্দে তেম্মামের মৃত্যু)—“হমাস”; আক-মহম্মদীয় যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি—“অন্তর” (৬০০ অব্দে মৃত্যু হব); যে আখ্যায়িকার তাঁহার দুসাহসিক কাণ্ডসকল বর্ণিত হইয়াছে, উহা সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীতে রচিত।

অম্মেরিয়াদিগের শাসন-কালে :—“হামদানী” (মৃত্যু ৯৪৫ অব্দে), ওয়াদা, কবজদক (৬৪১ অব্দে জন্ম)। আব্বাস বংশীয়দিগের শাসন-কালে :—মো'ত ইবন্ আব্বাস, আবু-মুহাস (৭৫০—৮১০), আবুল-আতাখিলা (৮২৬ অব্দে মৃত্যু), মোটানবিস (৯৬৫ অব্দে মৃত্যু), আবু ফিরাস (৯৮৮ অব্দে মৃত্যু), আবু আলা-মারি (১০৫৭ অব্দে মৃত্যু)।

প্রধান পারসীক কবি, যথা :—মহাকাব্যে,—“ফির্দসি” (৯০৫—১০২০); নীতিকাব্যে “হাকিম”, (১০৯ অব্দে মৃত্যু); “জারি” (১৪১৪—৯২); ওস্তাদের কবিতা—“অন্তর” (১১১৯—১২০২), “কমি” (১২০৭—১৩), “সারি” (১১৮৪—১২০২); পদ্মে রচিত গল্প :—“ফির্দসি” (বৃহৎ ও জুলেখা), “নিজামী” (১১৪০—১২০২); দবদারী কবিতা, এন্ওবেরি (১১৯০ অব্দে মৃত্যু)।

লঘু কাঁসি কবিতা সচরাচর গজলের আকারে রচিত। কতিপয় বিচরণ কবিতা লইয়া একটি গজল রচিত হয়। প্রতি দ্বিতীয় চরণে একই রকম মিল। “দিবান”—গজলের একটি সম্বলন-গ্রন্থ।



যে সময়ে আরব-কবিতার অবনতি হয়, সেই সময়ে পারস্যদেশে একটা জাতীয়তাব জাগ্রত হইয়া উঠে। উহা ফির্দসির “শা-নামায়” প্রবলভাবে প্রকট হইয়া উঠে। বাট হাক্তার শ্লোক-নিবদ্ধ এই মহাকাব্যে, পারস্যের পৌরাণিক ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইবান ও তুবান—এই দুই বাজ্যেব প্রতিষ্ঠাতা দুই প্রাতার বিরোধ লইয়া এই মহাকাব্যের আরম্ভ। কোন একটা অপবাধে, এই দুই রাজ্য পরস্পরের চিরশত্রু হইয়া উঠে। উহাদের সংগ্রামই এই মহাকাব্যেব মুখ্য বিষয়। সংগ্রামের দুইটি যুগ :—এক পৌরাণিক যুগ, আব এক—বীর-যুগ। ফির্দুসি কল্পনা করিয়াছেন, Arsacidesদিগের শাসনাধীন পারস্যের জায় ইরান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত। “কৈকাও”—পারস্যেব Le Charlemagne। তাঁহার Roland—“কন্তম্”। এই মহাবীর,—দম্মাদিগকে, অশ্বাবোহী যোদ্ধৃগণকে, মানবকে, দানবকে, অদ্বুতদর্শন যুগ ও

(১) Dr. Brockelmannএর জর্জান-অনুবাদ। M. de Kremer আবু-মুহাসের “দিবান” জর্জান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

পশুদিগকে স্বয়ংক্রিয় আহ্বান করিয়া সমস্ত ইরান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

কৈকাও-র মৃত্যুর পৰ, রুস্তম জীবিত থাকিয়া, Arche-menides-দিগের সাম্রাজ্যেব ভিত্তিস্থাপন ও জোরো-রাষ্ট্রেরেব ধর্মপ্রচার প্রত্যক্ষ করেন। প্রকৃত আবির্ভাবকালের ৫০০ বৎসর আবও পবে, কির্দুসি জোরোরাষ্ট্রকে জয়গ্রহণ কবাইয়াছেন। মহাকাব্যের নায়ক গুপ্তবাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। কাবুলের রাজা একটা যুগ্মার আয়োজন করিয়া রুস্তমকে নিমন্ত্রণ করায়, সেই যুগ্মায় যাত্রা কবিয়া রুস্তম, ভল্ল-কণ্টকিত একটা খাতের মধ্যে পতিত হন। নায়কের আপন ভ্রাতা শেবাদই এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। সে স্পর্ধাপূর্বক রুস্তমের নিকটে আসিল। কিন্তু রুস্তম বলিলেন :—“নিরস্ত্র হইয়া এই খাতেব মধ্যে থাকিলে, হিংস্র জন্তুবা আমাকে ভক্ষণ কবিবে। শেষ পর্য্যন্ত আমার ধন্যবান দিয়া আপনাকে রক্ষা কবিব।” শেবাদ তাঁহার এই ইচ্ছার বিবোধী হইল না। ইহা নিশ্চয়ই একটা ছল মাত্র। শেবাদ মনে করিয়াছিল, তাঁহার ভ্রাতা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু এ দিকে রোস্তম অতিকষ্টে একটু বলসংগ্রহ করিয়া শেবাদের প্রতি লক্ষ্যসন্ধান করিলেন। শেবাদ একটা বটবৃক্ষের কোটরের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। রুস্তমের তীর যুগপৎ বৃক্ষ ও শেবাদের বক্ষস্থল ভেদ করিল। তখন রুস্তম বলিয়া উঠিলেন, “হে জঁখর তুমিই ধন্ত, তুমি আমাকে প্রতিশোধ লইবার বল প্রদান করিলে।”

পারস্তদেশে, কাহিনী কথার দ্বিতীয় যুগ—সেকন্দরের যুগ। কির্দুসির মতে, দিগ্বিজয়ী সেকন্দর, এক পারসীক রাজার ঔরসজাত ও “কমের” রাণীর গর্ভজাত পুত্র। (“কম”—কিনা, Byzance, প্রাচ্য-রোমনগরী)। প্রাচীন গ্রীস, সেকন্দরের সাম্রাজ্য, রোম-সাম্রাজ্য, বৈজ্ঞান-সাম্রাজ্য—এ সমস্তই পারসীকদিগের নিকট, কম-নামের অন্তর্ভূত।

দ্বিতীয় যুগের ইতিহাস নিঃশেষিত হইলে কির্দুসি Seleucidesদিগের ইতিহাস ও Arsacidesদিগের (পার্শীর)

ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কবিলেন। তাঁহার বর্ণনা Sassanides হইতে আবাব আরম্ভ হইল। তাঁহার কাব্য যথাযথ ইতিবৃত্তে পরিণত হইল, কিন্তু তাহারও মধ্যে গল্পের অবতারণা আছে। যেমন,—দ্বিতীয় খসক ও রূপসী শিরোনবেব গল্প।

তুর্ক ও মোগোলদিগের দিগ্বিজয়ে, মুসলমান ধর্মের বিস্তাবে, প্রাচীন ধর্ম ও প্রাচীন ইতিহাস বিশ্বাস-সাগরে নিমগ্ন হইল। মহাকাব্যের পরে গীতিকাব্যের আবির্ভাব।

যিনি কখন প্রেমিক, কখন বোঙ্গী—সেই অশ্রান্ত পর্য্যটক “সাদি”, জলন্ত প্রেম ও স্বকীয় হৃদ্যাগের কথা সুকোমল পণ্ডে ব্যক্ত করিলেন।

এইরূপই “লয়লা-মজমুর” প্রণয়-কাহিনী। ইহা—আরবদেশের “রোমিও-জুলিয়েট”।

“আরবদেশেব রাজা অবগত হইলেন, লৈলার সহিত বিচ্ছেদ হওয়ার, মজমুর পশুর জায় মরুভূমিতে বাস করিতেছে। মজমুর লৈলাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা কবিল, কিন্তু ইহা তাহার বাতুলতা বলিয়া রাজা তাহাকে তিরস্কার কবিলেন। মজমুর বলিয়া উঠিল,—আপনি তাহাকে দেখেন নাই—রাজা লৈলাকে আনাইলেন। লৈলা সুত্রকার, কাঁপাজী, প্রায় কুবর্ষ : রাজ্যান্তঃপুরের অধমা দাসীও তাহা অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। রাজা মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু প্রেমিক বলিল :—মজমুর প্রণয় বৃষ্টিতে হইলে, মজমুর নেত্রাবাক দিবাি লৈলাকে দেখিতে হইবে। আপনার নিকটে আমি একটুও দূর প্রত্যাশা করি না। আমার-মত যে তুচ্ছ-ভোগী তাকেই আমার সঙ্গী করিতে ইচ্ছা করি। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের হৃৎকের কথা পরস্পরের নিকট বলিব। দুই খণ্ড শুক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে, আগুন আগনিই জ্বলিয়া উঠিবে। আমি যে পবিত্র কঠোর গুনিয়াছি, বনের কপোত যদি তাহা গুনিতে পায়—সেও আমার হৃৎকে বোণ দিবে। আমার প্রিয় বন্ধুগণ, ঐ প্রেমহীন ব্যক্তিকে তোমরা এই কথা বল :—যে হৃৎকে মজমুর জ্বল দিবার দ্বিগী হইতেছে, সে হৃৎকে যে কি তাহা আপনি জানেন না।”

যে হৃৎ, সে ব্যক্তি জনের বাধাকে উপহাস করে। আমার ক্ষতস্থান আমি ব্যক্তি জনকেই দেখাইতে চাই। যে ব্যক্তি ভ্রমের দংশনজালা কখন অশ্রুভব কবে নাই, তাহাকে ভ্রমরঞ্জনের কথা বলিয়া কি কল? আপনি কখন হৃৎকে পান নাই। আমার হৃৎকের বর্ণনা শুনিলে আপনি কেবল ক্রান্তি ও বিরক্তি অনুভব করিবেন। আমার হৃৎকের সহিত অন্তের হৃৎকের তুলনা। তাহাদের লবণ তাহাদের হাতে রহিয়াছে; কিন্তু আমার লবণ আমার ‘কাটা ঘরের’ উপর রহিয়াছে।”(১)

হাফিজ একজন স্মরণবাহী। “প্রান্তর ও উদ্যান বোঁবন-ব্রীতে বিভূষিত; গোলাপের অভিবাধনে বুলবুল জাদিয়া উঠিয়াছে। যে মদানিল মাঠময়দানে জয়গ্রহণ করিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসে, সে ষাউরের নিকট, গোলাপের নিকট আমার বনের

(১) গুলিস্তা (V. ১৭) Nesselmann-এর অর্থ-অনুবাদ হইতে গৃহীত।

বাসনা বহন করুক...লোকেরা সুরাপারীদিগকে উপহাস করে : পাছশালা তাহারিগকে উপহাস করুক; ভাল-ভাল শপথ, বিদায়।—প্রত্যেকের অস্ত্র দুই হাত পরিমাণ ধূলামাটি আবশ্যক; অস্ত্রি নিম্নার অস্ত্র ইহাই কি যথেষ্ট নহে? এইসকল উত্তর গগনভেদী প্রাসাদে কি প্রয়োজন? বাও, গগন-চূষী গৃহ হইতে পলায়ন কর। এইখানে কিনা শাস্তি ও প্রথের অবশেষ। ক্ষুদ্রশ্রুতি, লুক্ক সরাই-ওয়াল, মুক্তার ধারাই অতিথিদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। (২)

উঠ, সাকী। এস আমাদের পেয়ালা পূর্ণ করি। সকলেরই অস্ত্র সুরাপাত্র পূর্ণ করি। প্রেম? প্রেমকে আমি চিনিরাছি। প্রথম উহা স্বপ্ন, একটু পরেই দুঃখ।—যখন মন্মানিল প্রিয়তমার কুণ্ডল হইতে কস্তুরীসন্ধ্যা সোরভ হরণ করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়, তখন যন্ত্রণাপূর্ণ ক্ষত-হৃদয় হইতে কতই না শোণিতপাত হয়। যদি অতিথির ইচ্ছা হয়, তবে নিম্নাঙ্গ পড়িবার গালিচাকে সুরায় লাল করিয়া দেও।—আমি প্রেমের স্বপ্ন সন্ধান করিব। কিন্তু এত মুহূর্তেই যে বণিক-বারিদের বাহন-বটী নিঃসৃত মুহূর্ত-আস্থান ধনিত হইতেছে :—“এখনি প্রস্থান করিতে হইবে।”—বাহাদের স্বপ্নে বোঝা নাই, বাহারা নিশ্চিন্তভাবে নদীর তীরে অবস্থিতি করে, তাহারা কি রাজির বিভীষিকা, তরঙ্গময় ঝটিকা, ঝটিকার ভাষণ আবর্ত—এ সমস্ত জানে? আমি যে দুর্লভ স্বপ্নোপকরণ সেই দুর্লভ স্বপ্নই আমার সুরাতি নষ্ট করিয়াছে। সকলেই বাহা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, কি করিয়া তাহা লুকানো যায়? যদি শাস্তিতে জীবনযাপন করিতে চাও, যদি স্বপ্নী হইতে চাও, যদি তোমার প্রেমাম্পদকে লাভ করিতে চাও তাহার একমাত্র উপায়, হাকিম,—লোকের কথা অবজ্ঞা করা। (৩)

ঐ একই সময়ে দরবারী কবিতার আবির্ভাব। madrigal ও ইটালীয় সনেটের সহিত ইহার আকার-সম্বন্ধে তুলনা হইতে পারে। ইহা অল্পপ্রাস, মিত্রাকর ও শব্দবন্ধারের এক প্রকাব জটিল পদ্ধতি। প্রতি শব্দের একটি রূপক-অর্থ আছে। প্রত্যেক কবিতাটিতে একটু রসিকতা, একটু মজার কথা, একটু স্বস্ত্রভাবের কথা, বা হেঁয়ালি আছে। এবং হস্তলিপিতে একরূপ কারুকায়ের বাহুল্য যে তাহাতেও প্রকৃত অর্থ বুঝা কঠিন হইয়া উঠে। ইহার পূর্বেই কবিতা, যুবতীকে চন্দ্র বলিত, যুবককে ঝাউগাছ বলিত, চুলের সহিত Hyacinth-এর তুলনা করিত, কপোলের সহিত গোলাপের তুলনা কবিত, নেত্রের সহিত বাদামের তুলনা কবিত। কিন্তু এক্ষণে বিদগ্ধ কবিগণ ধর্মশাস্ত্র হইতে, বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে তুলনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকাল সম্বন্ধে “এন্ডোরি” রচিত এইরূপ একটি শ্লোক আছে :—“বলুবলের গানের বিরাম নাই, ঝাড়িরের হর্ষোচ্ছাসেব অন্ত নাই—চন্দ্র (amber) হইতেও মধুবতর একটা স্বগন্ধ ছুঁই হইতে

উষিত হইতেছে। মন্মানিল, ফুলের উপর রংএর তুলনা এবং বলাইরাছে কি, অমনি তটিনীর উপর উহার প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া তটিনীকে সহস্র বর্ষে উদ্ভাসিত কবিত্তেছে। জলবাশির গুপ্তকথা চুমে যে তুবার, তোমাকে বিদায়। এস ফুল, এস হরিৎশোভা—তোমাদের আমি অভিযান করি; কেননা, এখন ধরণীর পালা; ক্ষণী এগন নিজের গুপ্তকথা বলিতে চাহে। (১)

গীতি-শ্লোক যতই সুন্দর হউক না কেন, প্রাচ্য জাতির নিকট গল্পের মূল্য আরও অধিক। দীর্ঘ প্রৌঢ়শ্রমিনীতে অবসাদ-ক্লান্ত রাজা, বাজাস্তঃপূর্ববদ্ধ-মহিলারা, রজপাথের বাস্তবসমস্ত পথিকেরা, অথবা রাজদরবারেব লোকেরা—ইহাও সকলেই পর্যটনকারী কাহিনীকথকদিগের কথা শুনিতে ভালবাসে।

আরবেব গল্প-আখ্যানে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। উহাও ভারতবর্ষের নিকট হইতে, পারস্তের নিকট হইতে, এসিয়া-মাইনরের নিকট হইতে, ইজিপ্টের নিকট হইতে “সহস্র-এক-রজনীর” গল্পসকল ধার করিয়া আনিয়া নিঃশব্দ ওস্তাদেব জায় উহাই আবার নতুন করিয় রচনা করিয়াছে।

পারসীকরা আরবদিগের জায় ততটা সুরমিক নহে, কিন্তু আরবদিগের অপেক্ষা বেশী চিত্তাপবায়ক। পাবসীকরা স্বকীয় পৌরাণিক কাহিনীর আখ্যানে, প্রথম পঞ্চ ব্যবহার করে। “মুসফ-জুলিখা” নামক “জানি”-কবির রচিত এইরূপ একটি কাব্য। ইহাতে, সুপুরুষ মুসল্লি প্রতি জুলেখার প্রেম বর্ণিত হইয়াছে।

রাজি, মধুর রাজি; এইরূপে আমাদের জীবনের উষা। বোনের স্বপ্নের বিনগুলির জায় হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল। সকল পক্ষীই নিঃশব্দ, সকল মংগুই নিঃশব্দ, সকল কার্ঘ্যই, সকল ঘটনাই সুপ্ত।

পেলবোটা জুলেখা দ্বিজিতা; তাহার মধুর নেত্রের উপর একটি মধুর স্বপ্ন ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার উপাধানটি তাহার মস্তকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার মস্তকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কুন্তলকান্দি Hyacinth-এর জায় প্রতীয়মান হইতেছে। গোলাপের কেয়ারির মত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শয্যার উপর প্রসারিত। তাহার কুচিত কেশপাশ উপাধান হইতে নিপতিত হইয়া তাহার গোলাপী কপোলকে আচ্ছাদিত করিয়াছে।

সুযোদয় হইল। জুলেখা চক্ষু উন্মোচিত করিল। হঠাৎ সেই সময়ে এক সুবাপুরুষ দ্বারদেশে দেখা দিলেন। কি বলিয়া বর্ণনা করিব? এক পৃথিবীর সাধু? না, এক কোন দেবাত্মা, এক কোন জ্যোতির্দর-লোকবাসী স্বপ্নের পুরুষ? ইহারাই বেহস্তের কুকনেত্র ছরিদিগের চিত্তহরণ করিয়া থাকেন। এই সৌন্দর্যের, এই রূপলাবণ্যের, মোহিনী-শক্তি কে অতিক্রম করিতে পারে? জুলেখার হৃদয় বন্দী হইল, জুলেখা

(২) ঐ অনুবাদের সপ্তম গজল।

(৩) প্রথম গজল।

পর্যায় হইল। সেই কপেব প্রতিবিম্ব তাহার ক্ষমতা মুক্তি হইয়া গেল; উদ্ভাস-প্রবেশ একটি অক্ষর তাহার আশ্রয় উপর নিপতিত হইল। ঐ মুখখানি, জ্বলন্ত অস্তরে এমন এক আশ্রয় আলোইয়া দিল যে তাহাতে তাহার আশ্রয়সংঘ, তাহার ধর্ম সমস্তই ব্রহ্মা বস্তু হইয়া যায়।(১)

পদ্মময়ী কাহিনী গল্পময় গল্পে পরিণত হইল। প্রাচ্য-দেশের নগর-বর্ণনা :—সোজা রাস্তার দুইধায়ে কার্ঠের গরাদে-ওরালা বাড়ী; বাজার লোকাকীর্ণ; পুষ্কদের লম্বা আলখান্না, মাথায় পাগড়ী বা পত্তলোমাচ্ছাদিত টুপি; জীলোকদিগেব লম্বা কুণ্ডল পবিচ্ছদ, তাহাদের ওড়নার ভিতর দিয়া তাহাদের বড় বড় কালো চোখ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ছোট ছোট দোকান। দোকানদারেরা মিষ্টিমিষ্টি কথা বলিয়া (গভীর কণ্ঠ শব্দ মধ্যে মধ্যে কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতেছে) দাসী গালিচাসকল খুলিয়া দেখাইতেছে; তাহাদের অঙ্গুলীতে কিবোজা কিংবা পান্নাব আংটি। রাজি, জ্যোৎস্নাময়ী রাজি; বাগান-বাগিচা উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত; তালগাছ, বাউগাছ, জলের ফোরাবা; প্রস্তুতি গোলাপ, বাহা দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু ক্লান্ত হয় না, বাহার গন্ধ আশ্রয় করিয়া নাসিকা ক্লান্ত হয় না; আর সেই বুলবুল, যে, মধুর স্বরে, স্তম্ভের অগ্ৰে নিষ্ঠুর গোলাপেব নিকট তাহার প্রাণের কথা বলিতেছে, আবার বলিতেছে, বারংবার বলিতেছে। একটা রহস্যময় প্রাসাদের দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল; একজন হাবসী দাসীসহ সঙ্গে এক রাজকুমারী আবির্ভূত হইলেন; তিনি অবগুষ্ঠিতা, কাঁচলীতে বন্দনেশ আঁটা; বেগুনীরঙ্গের পাজামার উপর, স্বচ্ছ পরিচ্ছদ লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কেশপাশ হইতে মুক্তাহার ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অবগুষ্ঠন উদ্ভূত হইল : চন্দ্রবদন, গোলাপপ্রতিম গুণ্ঠাধর, স্তম্ভগঠন নাসিকা, আয়তনেত্র, মুক্তানন্ত প্রকাশিত হইল। চকিতদৃষ্টি এই মুষ্টিখানি, আবার দেখিবাব জন্ত উন্মত্ত হইয়া, রাজকুমারেরা অত্যাচারী রাজাদিগকে অগ্রাহ করিয়া, যাহকরদিগকে অগ্রাহ করিয়া, সমস্ত বিপদ অগ্রাহ করিয়া, পৃথিবীময় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে, হতাশ হইয়া সংসারকে বিসর্জন

দিয়া, চীববসন পরিধান পূর্বক বিজনপ্রদেশে গিয়া স্বকীয় হৃদিশার ধ্যান করিতে লাগিলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের “জীবন-দেবতা”

মানুষের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞা বিশেষ বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের অধিকারের অন্তর্গত ছিল; বংশানুক্রমে তাহারাই সে বিজ্ঞার চর্চা করিত এবং তাহাকে নিজেদের বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া কল্পনা করিত।

এখন নাকি গণতন্ত্রের যুগ, এখন সকলেই সব বিষয়ে অধিকার। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাকেও, প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে দেখাশাফাৎ মেলামেশা করিতে হইতেছে। ধ্যানের অভ্রভেদী শিখরে তাহার আর অনধিগম্য হইয়া নাই, তাহা এখন সমস্তলে নামিয়া ধারার সঙ্গে ধারাকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানেই এইরূপ সঙ্গ হইতেছে, সেখানেই মানুষ তাহাদের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য অভাবনীয় রূপ দেখিতেছে। সেখানেই তীর্থ, কাবণ, সেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ লুপ্ত হইয়া ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ প্রকাশমান হইতেছে।

হুইটম্যানের একটি কবিতা আছে, তাহার নাম “There was a child went forth everyday”—একটি শিশু প্রত্যহ বাহির হইত। কবি বলিতেছেন, সে বাহাই দেখিত, তাহাই হইত। প্রভাতেব সূর্যোদয়ের অকণচ্ছটা, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, বিহঙ্গের কাকলি, বৃক্ষলতা, সকল ঋতুর সকল আশ্চর্য্য দান, ফলশস্তের বিচিত্র সম্ভার; সহরের রাস্তাঘাটের লোকসংগা, গৃহের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন পৌরবর্গ—সকল দৃশ্য, সকল শব্দ, সকল ভাব, সকল অনুভব—তাহার অঙ্গীভূত অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রত্যহই এইসমস্ত গ্রহণ করিত, সে প্রত্যহই বাহির হইত।

কবি কথিত এই শিশুটিকে কে? কে বাহির হইয়াছে? আধুনিক মানুষ। যে সব চায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে বাহা কিছু

(১) “জামি”, বৃহৎ ও জুজ্জ্বল, অধ্যাপক Pezzi, Pæzia Persiana (II, 401).

আছে, মানুষের সমাজে বাহা কিছু হইতেছে, সে-সমস্তই 'আমার' এই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিতে সে চায়। শুধু আমার বলিয়া সে ক্ষান্ত নহে, সে-সমস্তই তাহার 'আমি'—তাহারই ব্যাপ্তি, তাহারই বহিঃপ্রকাশ—এত বড় কথাটা না বলিলে তাহার চলে না। 'আমার' বলিলে সেগুলি বাহিরের বিষয়সম্পত্তির মত মনে হয়, কিন্তু 'আমি' বলিলে আব তো কোনো কথা নাই। তখন তাহাকে বিস্তৃত করিবে কে, খণ্ডিত করিবে কে?

সমস্তকে যে নিজের চেতনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখা চাই—এ ভাব এ যুগের মানুষের মধ্যে ফুটিল কেমন কবিয়া? ফুটিল, যতই বিজ্ঞানের পরম্পরের মধ্যে বোগাযোগ প্রশস্ততর হইতে লাগিল—বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন, দর্শনের সঙ্গে শিল্পসাহিত্য যতই ক্রমশঃ সাহচর্য্যে ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে দীক্ষিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক বিজ্ঞান পন্থা, প্রকরণ-পদ্ধতি এবং আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদেব মোট কাজ একই। মানুষের মনের ক্ষেত্রে, চেতনার পরিধিকেই তাহারা বিস্তৃততর কবিয়া দিতেছে। সুতরাং তাহা বা যে বাণীই অন্বেষণ করুক এবং যে বাণীই সিদ্ধান্ত স্থির করুক, তাহা বা মানুষের মনকেই নানাদিক্ দিয়া নাড়া দিয়া পরম্পরের সহযোগিতা কবিত্তেছে, এবং সেইজন্য প্রত্যেক বিষয়েই সেই মনঃশক্তির বল ও প্রসারই বাড়িয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে আব সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র ভাবে অনেক সাক্ষ্য যে আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে পাওয়া যায়,—অর্থাৎ এ আইডিয়াটা যে আধুনিক কালেবই একটি বিশেষ জিনিস, তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমি এই প্রবন্ধ কাঁদিয়াছি। আমি জানি যে, কবিতার মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণ করার বিশেষ কোনো সার্বিকতা নাই। কারণ, কবিতা জো তত্ত্ব নয়, সে প্রকাশ। কবিতা তত্ত্বকে তো প্রমাণ করে না, সে তত্ত্বকে রূপদান করে। সব সময় যে তাও করে তা নয়—তত্ত্ব হোক বা না হোক, একটা কিছু যে-কোন-জিনিসকে সে আপনার করণার ও ভাবের ছাঁচে কেলিয়া একটি সুসমায় রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই খুসী হয়। সে তাবুকে চায় না, অভাবনীয়েকে চায়—নির্দিষ্ট তত্ত্বকে চায় না, অনির্দিষ্টতাকে চায়—এইজন্যই, সে বাহা প্রকাশ

করে, সৃষ্টি করে, তাহার মধ্য হইতে তাহার আসল ভাবটা কি, তাহা উদ্ধাব কবা এত কঠিন হয়। সুত্রেব মধ্যে যেমন মনের নানা ভাবেব আলোছায়াপাত দেখা যায়, কবিতার মধ্যে তেমনি ভাবেব নানা ইসাবা ইঙ্গিত মাত্র দেখা যায়, কিন্তু তাব বেশি নয়। সুতরাং দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে মিলাইতে গেলে অত্যন্ত অসঙ্গত এবাট কাণ্ড ঘটে।

এসব কথা মানিয়া লইলেও বলিতে হয় যে, কবিতাব মধ্যেও সত্য আছে, সে যে কেবলি মায়ার সৃষ্টি তা নয়। আমাদের মনের নানান্ মহালে যে সত্যের নূতন নূতন রূপ। কোনোটা বা মস্তিষ্কের মহাল, কোনোটা বা হৃদয়ের মহাল—কিন্তু এই বিচিত্রতায় সত্য কিছু বিভিন্ন হইয়া যান্ না। ইসারাব বলিলেও সত্য, কূটতর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া বলিলেও সত্য, প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা যন্ত্র দ্বারা লেখাইলেও সত্য। জগতের রূপ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, সুতরাং তাহা মিথ্যা—জগতের বাস্তবিক সত্তার মধ্যে রূপেব কোনো সন্দাব নাই—এ কথা যত বড় দার্শনিকই বলুন না কেন, ইহা সত্য নয়। কারণ, রূপ শুধু চোখে দেখিবার ও ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব কবিবার জিনিস হইলে, মানুষ কখনই বলিত না, জনম অবধি হ্ম রূপ নেহাবহু নয়ন না তিরপিভ ভেল। রূপেব মধ্যেই যে অরূপের বাসা, সে যে ভিতবেরই বাহির, সত্তারই প্রকাশ। কবিতা শুধুই প্রকাশ, অর কিছুই নয়, একথা তেমনই সত্য নহে—কারণ কবিতাও সত্যেরই প্রকাশ।

সুতরাং 'জীবনদেবতা'র আইডিয়ার সঙ্গে যদি দর্শন-বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে ইহাই বলিব, যে, এ আইডিয়াটি সত্য, এ নিছক কল্পনা নয়। কবি এই সত্যকে অনুভূতির দিক্ হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তিনি ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তত্ত্ব গড়েন নাই।

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ে অবতরণ করা যাক্।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শোনা। বহুপূর্ণ পূর্বে যখন তরুণ পৃথিবী সমুদ্রেরান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেমিনকার নবীন স্বরূপে ইন্দ্রনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মণ্ডিতে কোথা

থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বস্ব দিয়ে প্রথম স্বর্ধ্যালোক পান কবেছিলাম, অন্ধজীবনের গূঢ়পুলকে নীলাশ্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলাম। মৃত আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নবপল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষা মেঘের ঘন নীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পাবিত্রিত কবতলেব মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমবা ছুজনে একলা মুখোমুখী করে বসেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে।”

সকলেই জানেন যে কবি “জীবন-দেবতা” শীর্ষক কবিতাগুলিতে শুধু নয়, ‘বহুধবা’ ‘প্রবাসী’ প্রভৃতি আরও অনেক কবিতায় এই পত্রে বাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সেই ভাবের কথাই পাওয়া যায়। কবি বলেন যে, আমাদের এই বর্তমান জীবনের মধ্যে একটি চিরন্তন জীবন আছে। আমার যে জীবন কত যুগ পূর্বে হইতে কত বিচিত্র জীবপরিধায়েব ভিতর দিয়া আমার এই বর্তমানতার আসিয়া আজ পৌঁছিয়াছে, আমার সেই জীবনই আমার অন্তর্নিহিত চিরন্তন জীবন। কবি তাহার আশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলেন :—“যুগে যুগে আমি ছিলাম তুণে জলে” এবং “স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে”। এবং এই কপিক জীবনেব স্বল্পপরিসর চেতনার মধ্যে, সেই জন্তই তিনি বিখ্যেতনাকে এক এক সময় অনুভব করিয়া থাকেন।

ডাক্তরইনেব অভিব্যক্তিবাদে বলে, যে, এক আদিম জীবকোষ হইতে এই নানা বিচিত্র জীবদেহসকল উদ্ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে কথা অধুনা সকলেই দেখিতেছি মানেন। আদিম অ্যামিবা (Amoeba) এবং জটিল মানবদেহ একই উপাদানে গঠিত, একই জীবকোষ উভয়ের মধ্যেই বিস্তৃত। এই জীব কোষ বা প্রটপ্লাজমিক সেল, ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর বৃহৎ রচনা কবিতা জীবকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীতে উন্নীত কবিতাছে। মানুষেব শরীরে, বিশেষভাবে মানুষেব মস্তিষ্কে, ইহার জাল যেরূপ ঘন এবং ক্রিয়া যেরূপ ক্রম ও গতিশীল, এমন অন্য জীবদেহে বা জীবমস্তিষ্কে নহে। আর সেই জন্তই মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তরইন, ওয়ালেস্ প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতৃ-গণের এইসকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি

লক্ষিত হয় না। মানুষ যে বিচিত্র জীবজগতের মধ্য দিয়া সম্ভাবিত হইয়াছে, এ কথাটা সত্য বলিয়া মানা ভিন্ন গতান্তর নাই। সুতরাং ডাক্তরইনেব এই মত আশ্রয় করিয়া কেহ যদি বলেন যে আমি এক সময়ে গাছ ছিলাম, তবে শুনিতে যতই অদ্ভুত লাগুক, বাগ করা মুঢ়তা এবং উপহাস করা ততোধিক মুঢ়তা।

কিন্তু এ কথাটা যে অনেকের অদ্ভুত লাগে, তাহার কারণ ইহা নয় যে বুদ্ধজীবনের মধ্য দিয়া ক্রমে মানুষ-জীবনের অভিব্যক্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তটুকো কোনো মানুষ স্বীকার কবিতা হইয়াছেন। তাহার আসল কারণ এই যে, একজন মানুষ বলিতেছেন, আমি গাছ হয়ে উঠেছিলাম—‘আমি’ উঠেছিলাম এই বোধটা। আরো অধিক কারণ এই যে, সে-কথাটা সেই মানুষেব আবার “অল্প অল্প মনে পড়ে”।

“আমি গাছ হয়ে উঠেছিলাম” বলিলে বুঝায় যে ‘আমি’ব ধারাটা যেন গাছ পর্য্যন্ত প্রবাহিত, অর্থাৎ গাছের মধ্যেও এই আমি-বোধটা কোনো না কোনো আকারে ছিল। অথচ তাহা কেমন করিয়া হয়? আমি-বোধটা তো অচেতন বোধ নয়, সংস্কার মাত্র নয়, সে পূর্ণ সচেতন বোধ। প্রকৃতিরাজ্যে এ বোধেব স্থান নাই—কারণ সেখানে সমস্তই নিয়মে চলে, অন্ধসংস্কারেব বশবর্তী হইয়া চলে। স্বাভাব্যবোধের কোনো স্থানই সেখানে নাই।

তারপর “সেই পরিচয়ের কথা অল্প অল্প মনে পড়ে”—এ কথাবই বা অর্থ কি? আমাদের স্মৃতি কতদূর পর্য্যন্ত যায়? এই কয়েক বৎসরের জীবনে আমাদের মধ্যে বসত বস্তু, মত ভাব ও অচুতাব ও কল্পনা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বারো আনা অংশ ভুলিয়াছি, কেবল চারি আনা অংশেব সঙ্গে নিয়ত কারবার কবিতা আসিয়াছি বলিয়া বাল্যের সঙ্গে যৌবনকে, যৌবনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যকে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ কবিতা পারিতেছি। পৈতৃক নানা সংস্কার তো আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু তাহার সবগুলি কি আমাদের জ্ঞাত? যেসকল স্মৃতির উপর সেই সংস্কারের ভিত্তি—সেসকল স্মৃতির কোনো বার্তাই কি আমরা জানি? পিতা গেলে, তারপর পিতামহ—তখন তো আরও অজ্ঞাত। প্রপিতামহ—আরও অজ্ঞাত। ক্রমে উর্দ্ধে

আরও উর্দ্ধে গিয়া নিজে বংশের আদি পুরুষ পর্যন্ত পৌছিলাম। তারপর তাঁহাকে ছাড়াইয়া নিজেব জাতিব আদিপুরুষ পর্যন্ত গেলাম। ধব, প্রথম আদিপুরুষ যিনি ছিলেন, তাঁহাব কথাই কল্পনা করি। তাঁহাব সন্ধে স্থিতি তো দুইরকম কথা, তাঁহা হইতে আগত কোনো সংস্কারের সংবাদ কি আমি জানি? তাবপব, আরও যুগ যুগ পূর্বে প্রথম মানব, তারপর যুগ যুগ পূর্বে নানা জীবপরিণাম, তারপর আরও কত যুগ পূর্বে উদ্ভিদপরিণাম—তারপর, সেই কোন আদিম যুগে সেই প্রথম তরুটি—তাঁহার কথা “অন্ন অন্ন মনে পড়ে” এ কথাটা কি কেহ দিবালােকে বসিয়া কল্পনা কবিতো পরে, না লিখিতে পারে? এক পুরুষের স্থিতিই যখন থাকে না, তখন যুগযুগান্তর পূর্বের স্থিতি থাকে এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়? তবে কবিত্বের মস্তপান কবিত্বে এবং কল্পনার গঞ্জিকা সেবন করিলে সমস্তই সম্ভব হয়—সাধে শেক্সপীয়ার—

“The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.”—

বলিয়াছেন? সুতরাং কনি যদি বলেন যে, “আমি এক সময়ে গাছ হয়ে উঠেছিলাম” এবং সে কথা “আমার অন্ন অন্ন মনে পড়ে”—তবে শেক্সপীয়ারের ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহাব সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া কথাটাকে তলাইয়া ভাবিয়া দেখিবার কোনে আবশ্যকতাই থাকে না। ও আবার একটা কথা।

অথচ অভিব্যক্তিবাদের আদিগুরু, ডারুইন এবং তাঁহার পরবর্তী তাঁহাব চেলারা তাঁহার Post-Darwinians নামে খ্যাত—তাঁহারাই এই কথাটাকেও যে স্থানে স্থানে আমল না দিয়াছেন এমন নয়। আমি বলিয়াছি যে, কবির কল্পনা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমর্থন কবেন, এমন ব্যাপার এ যুগের পূর্বে আর ঘটে নাই। এ যুগে হইলে মহাকবি শেক্সপীয়ার এমন নিশ্চিন্ত মনে কবির সন্ধে তাঁহার মস্তব্যটি বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কারণ এ যুগের মহাকবি স্পষ্টই উন্টা কথা লেখেন; তিনি বলেন—

“A poet never dreams :

We prose folk do : we miss the proper duct

For thoughts on things unseen.”—ব্রাউনিং।

অতএব এযুগের মহাকবি এই আশাসবাক্যকেই শিরোধার্য

করিয়া লইয়া দেখা যাক কবিকথিত আদিম যুগে এই গাছ হইয়া উঠার ব্যাপার এবং সেই যুগযুগান্তরের স্থিতিকে বহন কবিবার ব্যাপারের মধ্যে ডারুইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-গণ কি সত্য নির্ধারণ করিতেছেন। ডারুইনের পুর ক্রমে অস্তান্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের লেখার মধ্য হইতে এই ভাবেব সমর্থনকাব্যী কথা সকল আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব, তাহা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি।

প্রত্যেক মানুষ যে একটিমাত্র ব্যক্তি নহ, কিন্তু অনেক ব্যক্তিত্বের সমষ্টি এবং এই প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বের যে স্বতন্ত্র বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্থিতি ও সংস্কার রহিয়াছে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব এমনতর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডারুইন এই কথাটিকে নানা স্থানেই মানিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। তিনি বলেন—

“An organic being, is a microcosm, a little universe, formed of a host of self-propagating organisms, inconceivably minute, and numerous as the stars in heaven.”—অর্থাৎ বিভিন্ন অবিশিষ্ট দেহী একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ, তাহা স্বপ্রাধান বহু দেহের সমষ্টিবাব গঠিত এবং সেই দেহগুলি এত ক্ষুদ্র যে তাহাবা ধারণার অতীত, এবং আকাশের তারার স্তায় অগণিত।

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

“শারীরতত্ত্ববিদগণ সকলেই একথা স্বীকার করেন যে আমাদের দেহের নানান অঙ্গ সকলের নিজস্ব স্বতন্ত্র আছে—প্রত্যেকটি জীব-কোষের কর্ম সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে; সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্তের উপর ভর করিয়াই বলা যাব যে প্রত্যেকটি জীবকোষ একটি স্বপ্রাধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি”—ইত্যাদি।

জীবকোষের স্বাধীন অস্তিত্বের মত বহু পূর্বে হইতেই বৈজ্ঞানিক সমাজে চলিয়া আসিতেছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেকটি স্নায়ুকেন্দ্রে (nervous centre) স্থিতি-স্বতন্ত্রভাবে বিবাজ কবে। যেমন, আঙুলে ঘা হইয়াছে, ঘা সারিয়া যাইবার পথে ক্ষতের চিহ্নিত স্থানটা শরীরের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি পায়। তার অর্থ এই যে, সেই চিহ্নিত অংশটুকুর মধ্যে ক্ষতের স্থিতি জাগরূক হইয়া থাকে। এতো একটা সহজ প্রমাণ, একপ নানা প্রমাণের দ্বারা শারীরতত্ত্ববিদগণ এই মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং এইসকল প্রমাণসহায় হইয়াই প্রত্যেকটি জীবকোষ যে একটি স্বপ্রাধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ডারুইন এ মতটিও প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আমাদের মধ্যে এই বহু ব্যক্তির সমাবেশের কারণ

অল্পসন্ধান করিতে গেলে, আরও অনেক কথার আলোচনার মধ্যে বাইতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে মনুষ্য যখন জন্ম লাভ করে, তখন হইতে তাহার সকল জীবনী ক্রিয়া এমন সহজভাবে সম্পাদিত হয় যে তাহাব কোনো চেষ্টা খাটাইবার বা বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজনই হয় না। শিশু অনায়াসে নিশ্বাস গ্রহণ করে, মাতৃসুস্থ হইতে দুগ্ধ চুষিয়া লয় এবং গলাধঃকরণ করে, পরিপাক করে, কানে শোনে, চোখে দেখে ইত্যাদি—কিন্তু এতগুলি কার্য সে যে আপনিই করিতে পারে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, এগুলি সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে আসিয়াছে। আর আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে যখনই কোনো কার্য একরূপ অভ্যাসগত হইয়া যায়, যে আর চেষ্টা বা চিন্তা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনমাত্র থাকে না, তখনই তাহা স্বার্থকরূপে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু সেরূপ সংস্কার দাঁড় করানো কি এক আধ দিনের কাজ? তাহাব জন্ত বহু বৎসর, হয়ত বহু যুগও লাগিতে পারে। অতএব, শিশুর জীবনী প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক কালের অভ্যাসের ফলস্বরূপে সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হইবামাত্রই জীবনচেষ্টার প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। এখন এই সংস্কারকে যদি পূর্বপুরুষের সংস্কার বল, তবে তাহা অসঙ্গত হয় না; যদিচ বৈজ্ঞানিক ভাবে বলিতে গেলে এই কথাই বলা উচিত, যে, তাহার বিশেষ বিশেষ জীবকোষ বহুকাল ধরিয়া এই এক ধবণের জীবনচেষ্টার অভ্যাস হইয়াছে, সুতরাং এই সকল অভ্যাসের স্বত্তি তাহাব মধ্যে সংস্কারের আকার ধারণ করিয়াছে।

সুতরাং ডাক্টর ইন্ যখন বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বিদ্যমান—প্রত্যেক জীবকোষই এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তি—তখন তাহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি জীবকোষ আপনাব বিশিষ্টতার একটি ধাবাকে তাহার আরম্ভকাল হইতে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করা ভুল হইবে, যে, সেই বহুপূর্বকাল কোনো জীবকোষ এবং এখনকার জীবকোষ একই বস্তু—তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ঘটে নাই। কত লক্ষ লক্ষ জন্মের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়া তাহাকে প্রবাহিত হইতে হইয়াছে, বাহিবে

কত অবস্থাব নিপর্ধ্যায়, কত পরিবর্তনপরম্পরা তাহাকে আঘাত করিয়াছে—সুতরাং যে জীবকোষ সেই আদিম কোন্ যুগে আপনাব জীবনলীলা শুরু করিয়াছিল, সে যে আজিও সেই একই ভাবে বর্তমান বহিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়?

তথাপি অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বহিয়াছে এবং সে যে তাহাব জীবনী ক্রিয়াব একটি অখণ্ড সংস্কারকেও বহন করিয়া চলিয়াছে,—যে জন্ত তাহার প্রাণরক্ষণী ক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও অনায়াস-সাধ্য হইতেছে, সে বিষয়ে আর ভুল নাই।

ইহার আর একটি প্রত্যক্ষ জাজ্জল্যমান প্রমাণ জ্ঞপ্তত্বে (Embryology) পাওয়া যায়। একটি উন্নত জীব অভিব্যক্তির যে-যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, গর্ভে অবস্থানকালে তাহার জ্ঞপ্ত, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই অবস্থাব রূপ পরে পরে ধারণ করে। গোড়ায় তাহাকে এমিবা বা মণ্ডজাতীর জীবের ভায় দেখিতে হয়, তারপর সর্পীসৃপের মত, তারপর পানীর মত,—এমনি করিয়া নানা আকারের ভিতর দিয়া সে নিজের বিশিষ্টদেহ লাভ করে। এই মতটিকে সে শাস্ত্রে বলে recapitulation theory অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির মত। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, কেন কোনো জীবের জ্ঞপ্ত এইসকল অবস্থার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিবে? তাহার সে-সব পূর্বপুরুষের সঙ্গে তাহার তো শ্রেণীগত পার্থক্য হইয়া গিয়াছে? ক্রামুরেল বাটলাব নামক বিখ্যাত ডাক্টর-শিষ্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন:—

“If the germ of any animal now living is but part of the personal identity of one of the original germs of all life whatsoever, and hence, if any now living organism must be considered as being itself millions of years old, and as imbued with an intense though unconscious memory of all that it has done sufficiently often to have made a permanent impression, if this be so, we can answer the above question perfectly well.” অর্থাৎ এখনকার কোনো জীবিত প্রাণীর বীজকে যদি সেই বিশ্বজীবন-ধারার কোন আদিম বীজের সঙ্গে আংশিক ভাবে এক বলিয়া ধরা যায়, এবং সেই হেতু, যদি এই বর্তমান জীবিত প্রাণিকে কোটি বৎসর বয়স্ক বলিয়া মনে করা যায়, এবং মনে করা যায় যে সে এই হুগীর্ধকাল এমন সকল কাজ করিয়াছে, যাহা তাহার মধ্যে চিরকালের মত মুদ্রিত হইয়া আছে—আর সেই নিগূঢ় অখ

নিশ্চয়ন স্মৃতিতে সে পরিপূর্ণ—তবেই ঐ উপরের প্রয়ের কোনো সম্ভব প্রদান করা বাইতে পারে।”

তারপরেই তিনি বলিতেছেন—

“I suppose, then, that the fish of fifty million years back and the man of to-day are one single living being in the same sense, or very nearly so, as the octogenarian is one single living being with the infant from which he has grown.” অর্থাৎ, “আমাব তাই মনে হয় যে পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্বের যে মৎস্য এবং অষ্টাধিকার যে মানুষ সে একই অথবা প্রাণী যেমন অষ্টাধিকারের বৃদ্ধ তাহার আপনার শৈশবকালের শিশু সঙ্গ একই ব্যক্তি।”

স্লামুয়েল বাটলার ডাকইনের ঐ জীবকোষের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্বের মতটিকে এই দিক দিয়া মানেন, যে, তাহার মধ্যে যেটা instinct অর্থাৎ সংস্কার সে তাহার বহুযুগের সঞ্চিত স্মৃতি বই আর কিছুই নহে। তিনি ‘instinct’কে বলেন ‘inherited memory’ এবং ‘unconscious memory’ অর্থাৎ পূর্বকৃত্যগত স্মৃতি এবং সূপ্ত স্মৃতি বই সংস্কার আর কিছুই নয়। ডাকইন দেখাইবাছেন যে, যখন জীবকোষগণ কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া এমন একটি সংস্কারের ধারা অনুসরণ করে, যাহার সঙ্গে অল্প শ্রেণীর প্রাণীর সংস্কারের ধারার একেবারে মিল হয় না, তখন সেই ভিন্ন শ্রেণীর (species এর) প্রাণী-দিককে জ্ঞান করিয়া মিলাইলে তাহাতে অত্যন্ত কুফল দৃষ্ট হয়। কাছাকাছির মধ্যে বর্ণসঙ্কর চলে, অত্যন্ত দূরবর্তীদের মধ্যে চলে না। স্লামুয়েল বাটলার বলেন যে তাহার কারণ দূরবর্তীদের মধ্যে স্মৃতির ধারা উল্টা ও বিপরীত, সেই জন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক মিলাইলে স্মৃতিভ্রংশ হইয়া যায় এবং সেইরূপ দূরসঙ্করজাত জীব তাহার আদিম অপরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাই হোক, এই unconscious memory অথবা সূপ্ত স্মৃতির মতকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াস করিয়াছেন বলিয়াই স্লামুয়েল বাটলারের নাম পশ্চিমদেশে বিখ্যাত।

ডাকইন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের এই মতটিব সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন-দেবতার’ ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

বৈজ্ঞানিক চক্ষে ডাকইন দেখিলেন, প্রত্যেক জীব-

কোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, সুতরাং একই মাতৃকোষ মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে—অথচ তাহারা পরস্পর বিকল্প হয় নাই, একই অথবা জীবনের মধ্যে বিদ্যুত হইয়া আছে। কবির অন্ত দৃষ্টি এবং কল্পনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন,—বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানাবিধ তাহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রাহিত হইয়াছে, সেই নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে; অথচ তাহারা পরস্পর বিকল্প হয় নাই—একই অথবা “জীবন-দেবতা” তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত বহিয়া লইয়াছেন।

“আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভাল বেছেছি,
জনতা বাহিয়া শুধু চিরদিন
তুমি আর আমি এসেছি।”

ডাকইন-শিষ্য স্লামুয়েল বাটলার দেখিলেন, প্রত্যেক জীবকোষের অথবা ধারা যে একই সংস্কারের পথ অনুসরণ করিয়া চলে, তাহা তাহার বহুযুগের অভ্যন্তরীণ জীবনী ফিরাই স্মৃতি বই আর কিছুই নয় এবং জীবজগৎ অভিব্যক্তির নানা অবস্থাব পুনরাবৃত্তির মধ্যেও সেই স্মৃতির সান্ন্য পাওয়া যায়; সুতরাং জীবকোষের ধারা একটি যুগযুগান্তরের অভ্যাসগত সূপ্ত স্মৃতিবই ধারা। কবি রবীন্দ্রনাথও অনুভব করিলেন, যে, সেই নানা সূপ্তস্মৃতি তাহার মধ্যে এক অপূর্ণ বিধেয়কায়ত্ত্বের স্বজন করিয়াছে। এ অস্বাভূতি কল্পনা নয়, এ সত্য যে:—

“বেধি চারিদিক পানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে।
তোমার আমার অসীম মিলন
যেনগো সকল ধানে।

হে চিরপুরাণো, চিবকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।

“প্রাচীনকালের পড়ি ইতিহাস
স্বপ্নের ছেবে কাহিনী
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিনী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেম আমারি স্মৃতি।

কোন ভাঙাবে সফর তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদ্রিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে সেলিয়া
পিতামহদের জীবনে আমরা
ছন্দনে এসেছি খেলিয়া।”

শুধু স্লাম্বেল বাটলার যে এই স্তম্ভ স্মৃতির মত প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, আধুনিক মনস্তত্ত্বে Subliminal consciousness অর্থাৎ মগ্নচেতন বলিয়া একটা কথা বলে। অর্থাৎ আমাদের চৈতন্তের সবটাই আমাদের কাছে প্রকাশ নয়, অনেকটাই অপ্রকাশ। অপ্রকাশ বলিয়াই যে তাহা অল্পপস্থিত এবং তাহাব কোনো কাজ নাই, এমন কথা বলা চলে না। এ কি রকম? না, উপমাচ্ছলে বলা যায় যে সমুদ্রের তলে যেসব দেশ তৈরি হইতেছে তাহার। যেমন অগোচর, এই মগ্নচেতনও তেমনি অগোচর। দূর হইতে কুহেলিজড়িত বিশাল এক নগরের ক্ষীণভাসে যেমন সবই অস্পষ্ট নয়, মধ্যে মধ্যে ছুটা একটা সমুচ্চ চূড়া, ছুটা একটা বড় বড় কীর্ষিচিহ্ন যেমন দেখা যায়—অথচ আর সবই ছায়াময়—মগ্নচেতনার বাণ্য কতকটা সেইরূপ।

যদি অভিব্যক্তিবাদ মানি, এবং যেক্রপ দেখিলাম, যদি জীবনের ও জীবনী ক্রিয়ার অভ্যন্তর স্মৃতির অথও ধারাকে মানি, এবং মানি যে আমাদের মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের সমাবেশ সেই অভিব্যক্তির স্ত্রে ঘটিতে পথ পাইয়াছে—তবে এ কথা না মানিয়া কোথায় যাইব যে আমাদের চেতনাও অনবচ্ছিন্ন? তার মানে আমাদের যেটুকু চেতনা স্বাধীনভাবে আপনার বুদ্ধি ও ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেছে, তাহার অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড চেতনা পূর্বস্মৃতির সংস্কারকে বহন করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং প্রচ্ছন্ন ভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছে। জন্ম মানেই একটা নূতন কবিতা আবিস্কৃত করা—স্মৃতবাং সেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মগ্নচেতনার যুগ্মগাঙ্গুরগম্ভীর অতলতার উপরে একটুখানি দ্বীপেব বেষ্টনের মধ্যে সচেতন হইয়া জাগিয়া উঠি এবং সেই অল্প একটু সচেতনতাকে সমগ্র চেতনা বলিয়া ভ্রম করি। একজন লেখক বলিয়াছেন :—
“Birth is the end of that time when we really knew our business, and the beginning

of the days wherein we know not what we would do”—জন্ম হইতেছে একটা কালের শেষ যখন আমরা আমাদের কার্য কি তাহা জানিতাম এবং অন্ত এক কালের আবিস্কৃত যখন আমরা জানি না আমরা কি করিব! স্মৃতবাং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন জীবনধারার কথা, অথবা যাহা একই কথা, জীবন-দেবতার কথাকে ভুলিয়া যদি বর্তমান জীবনকেই একান্ত কবিতা আমরা দেখি, তাহাতে আশ্চর্য কিছই নাই।

এই মগ্নচেতনার তত্ত্বকে মানিলে স্মৃতি সম্বন্ধেও আমাদের পূর্বের সংস্কারকে ভাঙিতে বাধ্য হইতে হয়। দেখা গিয়াছে যে বহু পুরাতন স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হয় না, যদিচ বহুকাল পর্যাঙ্ক তাহাব অস্তিত্বের কোনো চিহ্নমাত্র থাকে না। হয়ত একটা গন্ধ একজন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধকে বাল্যের এমন কোনো ঘটনা মনে করাইয়া দেয়, যাহা তাহার মনে পড়িবার কোনো কারণই ছিল না। প্রত্যেকের জীবনের কতগুলি বাঁধা অভ্যাস আছে, এবং সেই বাঁধা অভ্যাসের স্মৃতি তাহার মধ্যে দিবা জাগরুক থাকে। অথচ যখন এমন কোনো স্মৃতি মাহুষের মনে পড়ে যাহা ভাবেব অল্পবুদ্ধিতার নিয়মে তাহার পরিচিত অভ্যাসের কোথাও ধরা দেয় না, তখন তাহা কোনো একটি ইঙ্গিতে (suggestionএ) মগ্নচেতনাব বাণ্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছে ছাড়া আর কি কাবণ নির্দেশ করা যায়? স্মৃতবাং স্মৃতি যে কত দীর্ঘকাল পর্যাঙ্ক লুপ্তপ্রায় হইয়া আবার জাগ্রত হইতে পারে, তাহা হিসাব কবিতা নির্দ্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জড়বস্তুর মধ্যেও স্মৃতিব সাক্ষ্য লাভ কবিতাছেন। যে জাগরণ কোনো একটা ধাতু পদার্থ এক সময়ে আঘাত পাইয়াছে, বহু বৎসর পরে সেই জাগরণ সেই আঘাতের স্মৃতির পরিচয় সে প্রদান করিয়া থাকে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বুঝা যাইবে যে জাগ্রত চেতনার রাজ্যেই যে স্মৃতিব ষোলআনা আধিপত্য তাহা নহে, স্তম্ভ বা মগ্নচেতনালোকে তাহার আধিপত্য বড় সামান্য নহে। অর্থাৎ জাগ্রতই বলি বা স্তম্ভই বলি, সমস্ত চেতনাই এক অথও অনবচ্ছিন্ন চেতনা। যতদূর দেখা যাইতেছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান এই কথাটা প্রমাণ করিবার দিকেই চলিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জগতে ফেকনার (Fechner) সর্বপ্রথমে এই সত্যটি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশ্বজগতে সর্বত্র সর্ববিষয়ে সমধর্মতা বিরাজমান রহিয়াছে। ফেকনারের ইহাই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, যেমন চোখেব সঙ্গে দৃষ্টি, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শ সংযুক্ত রহিয়াছে, অথচ এই-সকল ইন্দ্রিয় বিভিন্ন, ইহাদের চেতনাও বিভিন্ন,—মদিও আশ্চর্য্য এই যে আমাদের মনে এই ভেদ মিলিয়া গিয়া সমগ্র শরীরেব এক চৈতন্ত অল্পভূত হয়—ঠিক তদ্রূপ আমার চৈতন্ত, তোমার চৈতন্ত, প্রত্যেক মানুষেব চৈতন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও অবচ্ছিন্ন হইলেও, এক অখণ্ড মানবচৈতন্তের মধ্যে মিলিয়া যায়। মানবচৈতন্ত যেমন ঐন্দ্রিয়-চৈতন্তেব পার্থক্য-সকলকে মিলাইয়া লয়, মানবচৈতন্ত তেমনি ব্যক্তিগত মানবচৈতন্তেব পার্থক্যসকলকে মিলাইয়া লয়। মানব-চৈতন্ত আবার সেই একই প্রাণালীতে পশু-পক্ষী-বৃক্ষলতাব জীবচৈতন্তে মিলিয়া যায়, জীবচৈতন্ত সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-মণ্ডলের বিশ্বচৈতন্তে পর্য্যবসিত হয়, এইরূপে “from synthesis to synthesis and height to height, till an absolutely universal consciousness is reached.”—সময়ের হইতে সময়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আকর্ষিত হয় যাবৎ পর্য্যন্ত না বিশ্বচৈতন্তেব অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করা যায়।

ফেকনার চৈতন্তের ক্ষেত্রকে এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীকে তিনি জড়পিণ্ড মনে কবিতেন না। তিনি পৃথিবীকে মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণবান্ চেতনাবান্ সত্তা বলিয়া বোধ কবিতেন। আমাদের শরীরের মধ্যে কত অসংখ্য জীবাণুর কি প্রচণ্ড আন্দোলন রহিয়াছে, অথচ আমাদের শরীর দেখিয়া তাহা কেন বোধগম্য হয় না? শরীর সেই অসংখ্য বৈচিত্র্যকে সবার করিয়া মিলিত কবিয়া লইতে পারিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর তো কোনো কাবণ নাই। সেইরূপ এই অগণ্য জীব-শরীরকে পৃথিবী আপনায় বৃহৎ শরীরেব অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে, তাই সমগ্র পৃথিবীর শরীরে জীবনচাক্ষুর্ষ্য কিঞ্চিত্রাণ্ডও পবিলকিত হয় না। আমাদের হস্তপদের দ্বারা অঙ্গসঞ্চালন আবশ্যক, পৃথিবীর সেরূপ আবশ্যকতা নাই—কারণ তাহার হস্তপদ সর্বত্রই; তাহার লক্ষ লক্ষ চক্ষু

এবং কর্ণ—সে আপনার অংশবিণেশেব অর্থাৎ মানুষেব অসম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব অল্পকণণ করিতে যাইবে কেন ?

ফেকনারেব এই চৈতন্তময় বিশ্বপুরুষের আইভিয়ার সঙ্গে গীতাব ‘বিশ্বরূপে’ব এবং উপনিষদীয় ‘সর্বভূতাস্তরাখ্যা’র ভাবেব সম্পূর্ণ মিল পাই। বিশ্ব যে সর্বত্র এক চেতনাবান্ পুরুষেব সত্তা দ্বারা ওতপ্রোত এবং আমরা সন্তোষেই যে তাহাব অন্তর্গত, ঐ কথার আভাস উপনিষদের নানা শ্লোকের মধ্যে আছে।

মুক্তকোপনিষদে আছে :—

অগ্নিস্থী চক্ষুধী চন্দ্রসূর্য্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বায়ুঃ স্পর্শঃ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ঃ বিশ্বমত্তপজ্ঞায়া

পৃথিবীহ্রেষ সর্বভূতাস্তরাখ্যা ॥

অর্থাৎ অগ্নি (ছালোক) ইহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য হৃদয়, দিক্ সকল কর্ণধর, প্রকাশিত বেদসমূহ বাণী, বায়ু শ্রোণ, হৃদয় বিশ্ব, পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী অর্থাৎ মাটি উৎপন্ন হইয়াছে—ইনি সূর্য্য প্রাণীর অন্তরাখ্যা।

এ কেবল কল্পনা মাত্র নহে, ইহাও বিশ্বকে সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্তবান্ প্রাণবান্ সত্তারূপে উপলব্ধি, যাহা ফেকনার কবিয়াছেন দেখা গেল।

‘জীবন-দেবতা’র ভাবেব সঙ্গে ফেকনারের যে তত্ত্বটি এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলাম, তাহার কি খুবই দাদৃশ্য নাই? জীবন-দেবতা মানে একটি “ever evolving personality” ক্রমশঃ উদ্ভিজ্জমান ব্যক্তিত্ব। কোন্ আদিম হৃৎ হইতে এই ‘আমি’ নামক ব্যক্তিত্বটির প্রথম সূচনা হইয়াছিল তাহা কে জানে! আমার বর্তমান দেহের জীবকোষসমূহের মধ্যে সেই বহু বহু বহু প্রাচীন যুগের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নানা জীবজীবনযাত্রার সংস্কার-সকল স্তম্ভস্বত্বরূপে আজিও বিস্তমান, তাহা দেখা গেল। সেইজন্য সমগ্র বিশ্বজগতেব সঙ্গে আমাব আপনার এমন একটি অন্তরতম যোগ যে আমি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কল্পনা নয়; ইহা আমাব দেহাভ্যন্তরের সমস্ত অব্যক্ত প্রাণের অনির্করচনায় রহস্তময় স্থিতি হইতে স্পন্দমান এক আশ্চর্য্য অনুভূতি।

কিন্তু সেই যুগযুগান্তর হইতে প্রবাহিত এই জীবন-ধারার অন্তর্নিহিত সত্তাই যদি জীবন-দেবতা হন, তবে তাঁহাকে আমার বর্তমান আ্মিদের এই খণ্ড চেতনাটুকুর

মধ্যে উপস্থিত কবিবার এবং উপলব্ধি কবিবার কোনো প্রয়োজন তো দেখা যায় না। আমি যেসকল অবস্থা মাড়াইয়া আসিয়াছি তাহা আবার মাড়াইবার আমার আবশ্যক কি? তরুলতাপশুপক্ষীর সঙ্গে ঐক্যাত্মভূতিব প্রয়োজন কি? তাহা আর কোনো কাবণে নয় কেবল এইজন্য যে, আমি যে মনে করিতেছি যে আমার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের সীমাব মধ্যে আমার যেটুকু জাগ্রৎ চেতনা খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাই আমার সব চেতনা,— তাহা প্রকৃতপক্ষেই তুল। আমার চেতনার ক্ষেত্র যে কোন্ স্রূর অতীত হইতে কোন্ স্রূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত, সে কথাটা বুঝিতেই পারিব না। আমার তাই এই কথাটি জানিতেই হইবে যে, সেই অখণ্ডবিশ্বচেতনলাভ-প্রয়াসী একটি সত্তা আমার মধ্যে চিরকাল ধরিয়া কেবলি আমার জীবনকে গড়িতেছেন, কেবলি তাহাকে বিশ্বের সঙ্গে নানা সম্বন্ধস্থলে বাধিয়া সকল ভেদসীমা দূর করিয়া দিতেছেন। আমাকে অভিব্যক্তির কত স্তরের মধ্য দিয়া তিনি লইয়া আসিয়াছেন, আমার মধ্যে সেইসমস্ত জীবন-যাত্রার অব্যক্ত সংস্কার মগ্নচেতনালোকে মজুত রহিয়াছে— এখনও, এই জীবনেও—যেখানে আমার চেতনার প্রসার ব্যাহত, সেইখানে তাহাকে দূর করিবার জন্য তিনি ভিতর হইতে কেবলি আমাকে বিশ্বের সর্বত্র ঠেলা দিয়া বাহির করিতেছেন। There was a child went forth every day. তিনিই তে জীবন-দেবতা; তিনি চলিয়াছেন “from synthesis to synthesis and height to height till an absolutely universal consciousness is reached” সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে, যাবৎ পর্যন্ত না বিশ্বচেতনের অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করা যায়।

“হে চিরপূরণো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিবা,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।”

কেবল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণে ও চৈতন্যে পূর্ণ করিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং আমাদের মানস-চৈতন্য যে ক্রমে ক্রমে চক্র হইতে পরিবর্তিত চক্রে আরোহণ করিয়া সেই বিশ্বচেতনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যাত্র

করিতেছে, ইহাও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। অর্থাৎ অভিব্যক্তির আবশ্য হইতে মানুষ পর্যন্ত,—অসংহত জ্যোতিঃপিণ্ড ‘নেবুলা’ হইতে আব স্রুসভ্য মানুষের উদ্ভব পর্যন্ত যে একটি ধারা চলিয়াছে,—মানুষ সেই ধারাটিকেই পুনরায় অনুসরণ করিয়া আপনাব সঙ্গে সমস্ত বিবর্ত বিধেব অখণ্ড যোগ অনুভব করিতে চাহিতেছে। বাহা সে হইয়া আসিয়াছে, তাহা সজ্ঞান ভাবে জানিবে এবং পূর্ণভাবে উল্লঙ্ঘি কবিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। এজন্য এক সময়ে যাহাকে সে জড় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তাহারই মধ্যে প্রাণের আশ্চর্যলীলা দেখিতেছে। বাহা বিশ্বত বিলুপ্ত ছিল, তাহা জাগ্রৎক্ষেত্রে আসিয়া রহিতে তাহাকে অভিজুত করিয়া দিতেছে। সমস্ত চেতনা যে এক অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন চেতনা এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ কবিবার দিকে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সমস্তই এখন প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে।

চেতনা সম্বন্ধে যেমন ফেকুনারের তত্ত্ব কি তাহা দেখা গেল, তেমনি আধুনিক কালের দার্শনিক আঁরি ব্যার্গস সে সম্বন্ধে কি বলেন তাহা এখন দেখা যাক।

ব্যার্গস বলেন চেতনা মানেই স্মৃতি। যে চেতনায় অতীতেব কোনো সাক্ষ্য নাই সে চেতনাই নয়,—সে তো প্রতি মুহূর্তেই জন্মিতেছে এবং মরিতেছে।

অথচ চেতনার মধ্যে ভবিষ্যতের একটি প্রতীক্ষাও আছে। কিন্তু অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এত গায়ে গায়ে লাগাও, যে, তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন ধর, আমি যখন বলি, ‘আমি ভাল আছি,’ তখন একটু পূর্বেই ভাল ছিলাম এবং পরমুহূর্তেও ভাল থাকিব, এই দুইটা আশ্বাস ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে এমন অব্যবহিত ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে তাহাদের বিযুক্ত করা একপ্রকার অসম্ভব। ব্যার্গস সেই জন্য বলিয়াছেন যে “consciousness is a hyphen between past and future”—চেতনা অতীত এবং ভবিষ্যতেব মধ্যে একটা হাইফেনের মত। তিনি বলেন, “জড়ের সঙ্গে চেতনার প্রভেদ এইখানে যে, চেতনার দ্বারা আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মুহূর্তের মধ্যে, জড়রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যাপার, বাহা পবে পরে ঘটয়াছে, তাহাকে ধারণার মধ্যে আবদ্ধ করিতে

সমর্থ হই। এই মুহূর্তে আমি চক্ষু দ্বারা যে আলোককে দেখিতেছি তাহার মধ্যে কৃত অদীর্ঘকালের ইতিহাস সংহত ভাবে নিহিত হইয়া আছে; কত অর্কদ অর্কদ জীবনের কম্পনমালা, যাঁহা আমি গণনা করিতে গেলে আমার লক্ষ লক্ষ বৎসব লাগিবে। অথচ আমি এক মুহূর্তে এত বড় কাণ্ডটা অমুভব করিতে পারিতেছি! দৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞাত চেতনা সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যায়।”

সুতরাং ব্যার্মিস্টের মতে চেতনা যাহাই অনেকখানি ব্যাপাবকে একটুখানির মধ্যে ধরা—জড়রাজ্যে যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসব ধরিয়া সম্পাদিত হইতেছে তাহাকে একমুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করা। তাহাকে ব্যার্মিস্ট নানাস্থানে কোথাও impulse অর্থাৎ প্রৈতি বলিয়াছেন, কোথাও intuition অর্থাৎ হৃদস্থিত সহজ ও অখণ্ড বুদ্ধি বলিয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহার মতে চেতনা, বিশ্ব-অভিব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিরই প্রেরণা। এই জন্ত ব্যার্মিস্ট Creative Evolution গ্রন্থ লিখিয়াছেন—অভিব্যক্তির মধ্যে যে একটি স্বল্পনীশক্তি চেতনারূপে লীলা করিতেছে, ইহাই তিনি প্রাণ কবিবার জন্ত উদ্ভোগী। জড় এই সৃষ্টির প্রেরণার উপকরণ মাত্র। কোথাও কোথাও চেতনা জড়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জড়স্বভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাঁহার নিয়ত চেষ্টাই এই যে সে উপকরণের উর্দ্ধে উঠিয়া আপনার অনির্বচনীয় অবদান-রূপকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে। এ যেন কবিতা—তাঁহা প্রাণই আসল, ভাষা তাঁহার উপকরণ; যেখানে তাঁহার প্রাণ পূর্ণ আগ্রহ, সেখানে ভাষার দেহ সেই প্রাণে প্রাণিত, যেখানে প্রাণ হুণ্ড, সেখানে ভাষাই সব হইয়া উঠিয়া গতিহীন নিশ্চলতা ও মৃত্যুর আকার ধারণ করে।

ব্যার্মিস্ট সম্পূর্ণ মতটি এখানে প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব, কাবণ তাঁহা এক কথার দুকথার সাগিয়া দ্বিবার মত নহে। তবে যতটুকু বলা গেল তাঁহাতে আমরা দেখিতেছি যে ব্যার্মিস্ট চেতনাকে যে সৃষ্টির প্রেরণা বলিয়াছেন, “জীবন-দেবতা”র আইডিয়াব সঙ্গে তাঁহার বেশ মিল আছে। সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে এই চেতনার দ্বারাই তো জীবনে জীবনে আমাদের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে; সে কত কি আনিয়াছে, কত সংস্কার জমাইয়াছে, কত

ফেলিয়াছে, কত গড়িয়াছে এবং আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই সৃষ্টির কাজ ক্ষান্ত নাই। সে সমগ্র চেতনাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না লাভ করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াই চলিবে। একদিকে তাঁহার অনাদি অতীত, অন্তর্দিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

এখন কি শ্রেণ, হয়েছে প্রাণেশ
বাকি ছিল মোর ?

ভেঙে দাঁও তবে আজিকার সন্ধ্যা
আন নবরূপ আন নবশোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাধিবে আমার
নবীন জীবন-ডোরে।”

আমি যে “জীবন দেবতা” লইয়া এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণপত্র সংগ্রহেব চেষ্টা করিলাম, তাঁহা দেখিয়া অনেক কাব্যবসন্ত ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। রসেব দিত দিয়া কবিতার এক প্রকার উপভোগ আছে এবং তাঁহাই যে তাঁহার স্রষ্ট উপভোগ সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, যে, কবিতা শুধু রস এবং সত্য নয়,—এমন করিয়া দেখা আমি ষপার্থ দেখা বলিয় মনে করি না। তাঁহার মাহাত্ম্যই তাঁহার প্রকাশে, সেইখানেই তাঁহার রস, এবং তত্বপদার্থ তাঁহার মধ্যে একেবারেই গৌণ—ইহা স্বীকার করিলেও তাঁহাকে সম্ভাবজীত প্রাণ-বর্জিত রূপ মাত্র মনে করিয়া আমি কোনো সাধনা লাভ করি না। আমার বিশ্বাস এই এবং “জীবনদেবতা”র আলোচনার এক্ষেত্রে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, বড় কবিমাত্রেরই জানিয়া এবং না জানিয়া তাঁহার শালোব সকল দিক্কার সকল প্রয়াসেব মধ্যে, সাধনার মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন। আমি যে-সকল চিন্তার দ্বারা অহুসরণ করিলাম, হইতে পার যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সঙ্গে যোগ বাধিয়াছিলেন বলিয়া এই “জীবনদেবতার” ভাব তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছে—কিন্তু তাঁহা না হইলেও আপনা-আপনি আপনার কবিত্বের অন্তর্দৃষ্টি হইতেই এই ভাব তাঁহাকে অধিকার করিতে বাধ্য—যখন এই ভাবেব বাপ্প সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে দেখিতে পাই। এই জন্তই বড় কবিকে seer বা দ্রষ্টা বলে—তিনি নদীর মত তাঁহার কালের নিম্নতরে

গভীরভাবে প্রবাহিত সকল ভাব-উৎস হইতে ধাতু সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যাহা বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়াইয়া থাকে তাহাকে তিনি সংহত করিয়া এক কবেন। আর এই জন্ত বড় কবির সমগ্র জীবনের ভিতর হইতে সমুদ্রুত কোনো আইড়িয়াকে নিত্যন্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র নির্বোধ ও প্রাকৃত জনের দ্বাবাই সম্ভব। অতঃপর “জীবন-দেবতা”র রহস্ত কিছু কিছু উন্বাচিত হইলে তাহা খুবই আনন্দের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী।

জন্ম, কর্ম এবং অবচার

লোকে বলে যে যাহার যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে; বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে ন। মহা-ভাবতে আছে “বিধাতা বিহিতং মার্গম্ ন কশ্চিদধিবর্ততে।” জীবনে যাহা ঘটে, তাহাই অ-জানা ভাগ্যের ফলে বা “অ-দৃষ্ট”-এর ফলে ঘটিল বলিলে কিছুই বুঝিতে পারা গেল না,—কিছুই বুঝাইতে পারা গেল না। যাহা “অ-দৃষ্ট,” অর্থাৎ যাহা দেখি নাই বা য’হা দেখা যায় না, অর্থাৎ যাহা জানি না, তাহাব ফলে কিছু ফলিল বলাও যা, কেন কিছু ঘটিল, তাহা জানি না, বলাও তা।

বিধাতা এবং বিধিলিপি সম্বন্ধে যাহারা আমার মত অজ্ঞ, তাঁহাদের বিচারের জন্ত আমাদের ভাগ্য এবং ভাগ্য-ফলের কথাই বিশ্লেষণ করিব। মানুষের ভাগ্যের কথা যে বড় হর্বোধ্য, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিবার জন্ত একটা অত্যাঙ্গি প্রচলিত আছে; প্রবাদ-বচনে উক্ত আছে যে পুরুষের ভাগ্যেব কথা মনুষ্য দূরে থাকুক, দেবতারাও জানেন না। হর্বোধ্য হইলেও ভাগ্য-চক্রের আবর্তন-রীতি একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

রাম সবল শরীর লইয়া দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মিল, আজন্ম কৃষিকার্যে ব্যাপ্ত রহিল, এবং কৃষক-পত্নীতে কৃষকদিগের সঙ্গে জীবনেবু অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিল। অশ্রুদিকে হরি দুর্বল শরীর লইয়া ধনী গৃহে

জন্মিল, এবং উপার্জনের ভাবনা-পবিশ্রু হইয়া স্নাত্তোগ-প্রিয় সঙ্গীদিগের সহবাসে বাড়িয়া উঠিল। রাম এবং হরির ভাগ্যে যাহাই থাকুক, যাহাই ঘটুক, তিনটি অবস্থা যে উভয়ের ভাগ্যকেই শাসন করিতেছে, তাহা দেখিতেছি। জন্মের সময় যে যেমন শরীর লইয়া জন্মিল, সেটা তাহাব জন্মফল; জন্মের পরে যে যেমন প্রাকৃতিক সুবিধায় যে কার্য করিল এবং তাহার ফলে যেমন ভাবে তাহার জীবন গড়িয়া উঠিল, সেটা তাহার কর্মফল; এবং যে পরিবাব বা সমাজের বাহ্যিক অবলম্বনে এবং প্রভাবে তাহার মতি গতি নিয়মিত হইল, সেটা তাহার অবচার-ফল।* ইউরোপীয় সমাজ-বিজ্ঞান এবং জীবন-বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ তিনটির নাম যথাক্রমে *famille*, *travail* এবং *lieu*। সহজ রকমে ইংরাজিতে ঐ তিনটিকে যথাক্রমে *heredity*, *function* এবং *environment* বলিয়া থাকে। উহার কোন্ট দ্বাবা মানুষের ভাগ্য কতখানি নিয়মিত হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিবাব প্রয়োজন।

সর্বকালে এবং সকল দেশেই জন্মফলের প্রভাব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বয়ঃ-যুগে এবং যে-সমাজে সূক্ষ্ম দর্শনের যত অভাব, সেই সেই স্থলেই জন্মফলের প্রভাব অতি মাত্রায় বেশি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্ভানেরা দেখিতে যে অনেকটা পিতা-মাতার মত হয়, তাহা বর্ষবেরাও লক্ষ্য করিয়া থাকে। পুত্র, পিতার অঙ্গ-ভঙ্গির অনুকরণ করিতে শিখে, পিতার কথা-কহিবার ধরণে কথা কহিতে শিখে, এবং মাতা আদর করিয়া প্রীত-মনে শিশুকে সেই অনুকৃতি-কার্যে অনেক সময়েই সহায় হইয়া সেই ধরণ-ধাবণগুলি বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। পুত্র এখানে জন্মফলে যাহা লাভ কবে নাই, যাহা যে কর্ম এবং অবচারের ফলে লাভ করিয়াছে, তাহাও সাধারণ লোকে জন্মফল বলিয়া বিশ্বাস করে। জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য হইতে দেখিতে পাইব যে, সম্ভানেবা

* যাহা মানুষের অবলম্ব, যাহা তাহাব কর্মক্ষেত্র; যাহা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এ দেশের প্রাচীন কালের ভাষায় তাহার নাম অবচার। *Lieu* বা *environment* অর্থে এই “অবচার” শব্দ প্রযুক্ত বলিবা মনে করিতেছি।

হবহ পিতা-মাতার দ্বিতীয় সংস্কার নহে। কিন্তু মোটা দৃষ্টিতে পুত্রকে একেবারে পিতার অনিকল দ্বিতীয় অবতার বলিয়া মনে হয়।

নিজেব আত্মাই পুত্ররূপে জন্মলাভ করে, এই হইল প্রাচীন শাস্ত্রের কথা। চেহাবার সাদৃশ্য দেখিয়াই যে এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, শাস্ত্র হইতেই তাহা দেখাই-তেছি। অতি প্রাচীন “আপস্তম্ব” ধর্ম্মসূত্রেব দ্বিতীয় প্রস্তাব নবম পটলেব চতুর্বিংশ খণ্ডের প্রথম দুই শ্লোকেই আছে যে—পিতা সন্তানের জন্মে নিজেই আবার জন্ম-গ্রহণ করেন, এবং সেই জন্মেই এই মরণশীল জগতে তিনি বংশ-পরম্পরাবধি অমৃতত্ব লাভ করেন। ঋষি আপস্তম্ব দ্বিতীয় শ্লোকে এই উক্তিব প্রমাণস্বরূপে লিখিয়া-ছেন যে—মানুষে সহজ চোখেই এক কথা প্রত্যক্ষ কবিতে পারে যে, শরীর স্বভাব হইলেও আকৃতি এবং প্রকৃতিতে পুত্র পিতার অনুরূপ। অতএব পিতাই পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংরাজিতে সাধারণ কথায় পুত্রকে a chip of the old block বলা হয়। টুকরা হইলেও টুকরাটুকুব নতুন এবং স্বাভাব্য খুঁস্বন্দ্বদর্শনেই উপলব্ধ হইতে পারে। সে কথা পরে দেখাইতেছি।

মানুষে যে সাধারণতঃ জন্মফলের প্রভাব কত অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া বিশ্বাস কবে, তাহা লোক-সাধারণেব মধ্যে প্রচলিত অনেক উপকথা এবং প্রবচন হইতে ধরিতে পারা যায়। ভাগ্যবিপর্যয়ে জন্মমারেই রাজার ছেলে বনের মধ্যে পবিত্যক্ত হইল; কিন্তু এসখানেও পশুপক্ষীবা তাহাব প্রজা এবং সেবক হইয়া দাঁড়াইল। বনেব পশু আসিয়া ছধ খাওয়াইয়া তাহাকে মানুষ করিল, পাখীবা ফল বোঁগাইল, সাপ আসিয়া ফণাবিস্তার করিয়া ঘূমেব সময়ে তাহার মুখেব উপবে রৌদ্রপাত নিবারণ করিল, এবং পরে বড় হইয়া বিনা শিক্ষায় কেবল জন্মের গুণে সে শিশু, বনচারী মনুষ্যদিগের নায়ক এবং প্রভু হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষেব এমন প্রাস্ত নাই, যেখানে কোন হঠাৎ-অবতার রাজবংশ সম্বন্ধে এই গল্প প্রচলিত দেখা যায় না। বিধাতার কলমে Cainএর কপালে নবহত্যার পাপ অঙ্কিত ছিল, কাজেই সে ভ্রাতৃবধ করিয়া নরকে গেল। জৈবের বার্তাবহ Ezekiel, ইস্রায়েল-বাসী-

দিগকে গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন যে, বাপ তেঁতুল খাইলে সন্তানের দাঁত টকিয়া যায়। (The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge.)

বংশ-সংক্রমণে মানুষে পূর্বপুরুষের কি বক্রমেব দোষ-গুণেব উত্তরাধিকারী হয়, এক কথা লইয়া জীবন-নিজ্ঞানে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। অনেক-শিক্ষিত লোকের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি যে, অনেকেরই এই অনু-সন্ধান এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান নাই, অগচ তাঁহারা গ্যালটন, ডারউইন প্রভৃতি নামেব দোহাই দিয়া অসম্ভব বক্রমেব জন্মফলের কথা বলিয়া থাকেন। অসবর্ণ বিবাহের কথায় অনেক অশিক্ষিত মূর্খের মুখে heredity নামক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালেব অসম্ভব বক্রমেব জন্মফলের প্রভাব বিবয়ক বিশ্বাস যেসকল মনে প্রভুত্ব করিতেছিল, সেখানে বিজ্ঞানেব heredity-বাদ একটা ধূয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু উহার মথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা জানিবার জন্য কোতুল উদ্দীপ্ত হয় নাই।

একটা সুপুষ্টি এবং সুপক বেগুনেব সকলগুলি বীজই সমান ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মানুষের মোটা চোখে অসম্ভব হইতে পারে। এক সঙ্গে অনেকগুলি বীজ বাড়িয়া উঠিবার সময় কতকগুলি যে সুবিকশিত হইবার সুবিধা পায়, এবং কতকগুলি যে অন্য বীজের চাপে এবং অন্য কারণে উপযুক্ত পুষ্টি লাভ করিতে পারে না, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। যখন বীজগুলি একই মাটিতে পুঁতিয়া সমান যত্নে লালনপালন করিবার সময় অনেক সুপুষ্টি বীজ আমাদের অজ্ঞাতসারে হয়বা একটু কোণঠেসা হইয়া পড়ে, না হয় আপাতদৃষ্টিতে একস্থানে পড়িয়াও ভিন্ন রকম মাটির গুণ প্রাপ্ত হয়, তখনকার পার্থক্য আমবা ত্রিকৃৎ ধবিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু যাহা হউক, বেগুনের চারার বেলায় মোটামুটি প্রাকৃতিক কারণের কথাই ভাবিয়া থাকি। বৃক্ষলতায় আত্মবাদের বাড়াবাড়ি নাই বলিয়া বেগুনের চারাগুলির পূর্বজন্মের স্মৃতি-স্মৃতির কথা উঠে নী; কিন্তু আমরা না কি আত্মাদরে তর-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির শারীরিক প্রকৃতি হইতে মানুষের

শারীরিক প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করি, তাই মানুষের জন্মপার্থক্যে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মূল বীজের যে অবস্থাব ফলে কোন শিশু বা সবল, কোন শিশু বা বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ কবে, বর্ষবের মনে সহসা সে প্রাকৃতিক অবস্থাব কথা উদিত হয় না। দুর্বল বা দোষগ্রস্ত বীজ যদি অঙ্কুরিত হইবাব সুবিধা পায়, তবে ত দুর্বল বা বিকলেন্দ্রিয় সন্তান জন্মিবেই। সকলেই বিকলেন্দ্রিয় হইতে পাবে না, সকলেই সুপুষ্ট হইতে পাবে না; ভিন্ন ভিন্ন সন্তানকে ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক অবস্থা লইয়া উৎপন্ন হইতেই হইবে, তবুও বর্ষবের মন মানে না; সে অজানা পূর্জন্মের দোহাই দিয়া পার্থক্য বুঝিতে চায়। মানুষের শবীরের প্রকৃতিই এমন যে তাহাতে অবস্থা-বিশেষেব দূষিত বীজ উৎপাদিত হইবেই হইবে। সেই দূষিত বীজ যদি অঙ্কুরিত হইতে পারিল, তবে ত একটা দোষগ্রস্ত শরীরেব জন্ম হইবেই। পূর্জন্মবাদীর কুসৃত্তিতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, অমুক রাম বা হরি সেই দূষিত শবীর লইয়া জন্মিল কেন? তাহাব স্থলে শ্রাম বা যজ্ঞ সে শরীর পাইল না কেন? একজনকে যখন সে শবীর পাইতেই হইবে, এবং তাহাব একটা স্বতন্ত্র নাম হইবেই হইবে, তখন আবাব সে ব্যক্তি যদি যজ্ঞ হইত, তবে সে হরি হইল না কেন, এ প্রশ্ন উঠিতে পারিত। এক জন্মের এক জনেব আত্মা অন্ত জন্মেব অন্ত শরীরে আদৌ প্রবেশ কবিতে পাবে কি না, সে তর্কেব বিচার করিতে গেলে ভূতবাদীর ইতিহাস লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যাহা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে সম্ভবপর বলিয়া অতি অল্প পরিমাণেও অনুভব করা যায়, তাহার ব্যাখ্যাব জন্ত একটা অজানা দাঁধা বা প্রাহেলিকাব সৃষ্টি করা কেন? প্রাহেলিকাটাও দুর্বোধ্য এবং ব্যাখ্যাটিও ততোধিক। অনেকেরই মনে রাখা উচিত যে সহজ দৃষ্টি ছাড়িলেই একটা শুষ্ক রকমের দার্শনিক হইয়া উঠা যায় না।

যেসকল ঘটনা বৃক্ষগতায় এবং পশু-পক্ষীতে সর্বদা প্রত্যক্ষ কবিতেছি, এবং প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হই না, সেইসকল ঘটনা যখন মানুষের বেলায় ঘটে, তখন আমরা তাহার অতি-প্রাকৃত ব্যাখ্যা দিবার জন্ত উদযোগী হই।

বৃক্ষ-গতায় মৃত্যু হয়, পশু-পক্ষীর মৃত্যু হয়, ইহা ত সর্বদাই দেখিতেছি; তবুও মানুষ মবে কেন বলিয়া কত অদ্ভুত ভাবেবই অবতারণা করিয়া থাকি। খৃষ্টানের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, আদম এবং আদম-পত্নী পাপ করিয়াছিলেন বলিয়া এ সংসারে গর্ভধারণের ক্লেশ জন্মিল, মৃত্যু আসিয়া এ সংসারে বিচরণ করিল। উদ্ভিদ বা অন্ত জন্তুবা পাপ করিতে পাবে বলিয়া খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন না; মানুষের জন্মের পূর্বে,—কাজে কাজেই পাপেব জন্মের পূর্বে—যে উহাদেব উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও শাস্ত্রেই স্বীকৃত আছে। তবে পশু-পক্ষী জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? উদ্ভিদ এবং পশু-পক্ষীদের মৃত্যু হয় কেন? এসকল কথা ভাবিবাব অবসর হয় নাই; তাই মানুষের বেলায় দেবতাব লীলা-খেলা পাপ হইয়া উঠিয়াছে, এবং মানুষের কর্মিত দুর্ভাগ্যের জন্ত অতি-প্রাকৃত ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রেও ঐ কথা। মানুষ যদি দেবতার বব পায়, কিবা যদি নিষ্পাপ হইয়া বাস কবিতে পারে, কিংবা নিষ্কাম সঙ্কল্প কবিয়া যোগ অভ্যাস কবিতে পারে, তাহা হইলে হয় সশবীরে অমর হইবে, না হয় ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটাইতে পারিবে, না হয় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবে। কথা এই যে, মানুষের সঙ্গে যে অন্ত জীব-জন্তুব মিল আছে, এ কথা যেন মানুষেরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না।

যে জৈবনিক (germ-plasm) হইতে আমাদের শবীর এবং জীবন, অল্প পরিমাণে তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া না লইলে আমাদের জন্ম এবং জন্মফলের কথা বুঝিতে পারিব না। যাহারা এ ভাবের জন্ত নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাব আশ্রয় লইয়া “গভীর গবেষণা” করিয়াছেন, তাহাদের হাতে শুষ্ক পথ্য দর্শনশাস্ত্র এবং Metaphysics সৃষ্ট হইয়াছে। একবার সেই অপার্থিব এবং অমূল্য শাস্ত্রের শিক্ষার কথা ভুলিয়া প্রাকৃতিক অবস্থাব দিতে দৃষ্টিপাত কবিলে মন হয় না।

যখন একটা অতি নিম্নস্তরের জীবশবীরের প্রতি লক্ষ্য কবি, তখন দেখিতে পাই যে একটু দেহপিণ্ড জীবরূপে বহি-রাছে। সে অঙ্গে, প্রত্যঙ্গ বা limbs নাই, চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়াদি নাই; হৃদয়, পাকস্থলী প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি নাই; হাড় নাই, শিবা নাই, স্নায়ু নাই; কেবল

আছে খানিকটা আঠাব মত পদার্থের একত্ৰসম্বন্ধ পিণ্ড। সে আঠাব কবে সৰ্কান্দে, সে সমস্ত কার্য্য কবে সৰ্কান্দে। সে-জীবশোষ্ঠিতে পুরুষ-স্ত্রীর ভেদ নাই; সে যেন স্বয়ম্ভু এবং অক্ষয়। যখন পুষ্টিলাভ কবে, তখন আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র জীব বা পিণ্ডে পরিণত হয়। ঐ বিভক্ত পিণ্ডদ্বয় আঠাব পুষ্টিলাভ করিয়া আত্মগর্ভাব-বিভাগে বহুতব জীব-পিণ্ডে পরিণত হয়। মনে কর, কোন মাছ বা পাখী উহাদিগকে উদবস্থ করিয়া হজম করিয়া ফেলিল না; তাহা হইলে উহাদেব শবীরেব কোন অংশকে অর্থাৎ কোন জীবকে মন্দিয়া যাইতে দেখিবে না। দেখিবে যে, ক্রমাগত জীব-পিণ্ড বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই জন্তই বলিতেছিলাম যে, উহাদিগকে দেখিলে স্বয়ম্ভু এবং অক্ষয় বলিয়া মনে হয়।

এই নিয়ম জীবে বা দেহপিণ্ডে যাহা অক্ষয় বলিয়া লক্ষ্য করি, উহাই সকল জীবেব শবীর এবং জীবনেব উপাদান। আমি একটি প্রবন্ধে জীবন-তত্ত্বেব সকল আবিষ্কাবের কথা বিবৃত কবিতো চেষ্টা করিতেছি না। উদ্দিষ্ট বিষয়টি স্মরণোদ্ধা করিবার প্রয়াসে জীবন-বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রত্যক্ষীকৃত সত্যের উল্লেখ করিব। যাহারা ফাঁকা আওরাজ্জে বৈজ্ঞানিকনির্ণেব নামেব দোহাই দিয়া থাকেন, তাহাদের জন্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্থূল কথাগুলির উল্লেখ করিব।

যেসকল উচ্চ শ্রেণীর জীবে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জন্মিয়াছে, ইজিরাদিব বিকাশ হইয়াছে, এবং দেহ-আয়তনে বিবিধ যন্ত্ৰেব উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানেও প্রায় যেন নিয়ন্ত্ৰেব জীবেব মত, শবীর-উপাদানেব জৈবনিক, দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে। যে জৈবনিক আমাদের শবীরের একমাত্র উপাদান, উহা যেন প্রথমতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। একটি ভাগ আমাদের দেহ-আয়তন এবং শারীর যন্ত্ৰাদির স্থষ্টি কবিয়া সেই স্থষ্টিতে পর্যাবস্তি হইতেছে, এবং অপব ভাগ যেন ঐ দেহের মধ্যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা কবিয়া অন্ত জীব উৎপাদন করিবার ক্ষমতা লইয়া বাস কবিতোছে। বলিয়া রাখি যে, এই অবস্থাটি স্ত্রীশবীরে এবং পুরুষশবীরে সম্পূর্ণ একই। কথাটি বলিবার প্রয়োজন এই যে, সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে,

জীবউৎপাদন বিষয়ে পুরুষশবীরের কার্য্যকারিতা অধিক। অজ্ঞ যুগেব শাস্ত্রে এবং উপাখ্যানে পড়িয়া থাকি যে, একমাত্র পুরুষের প্রভাবে কখনও যুৎপাদ্জে বা দ্রোণমন্ডা, কখনও বা সম্পর্কশূন্য মংস্ত্রাদি জাতির গর্ভে অনেক মনুষ্যশিশুর জন্ম হইয়াছিল।

যে শবীরগু (chromosoma) হইতে একটি মানব-শিশুর জন্ম, উহা সমান অংশে পিতৃশবীর এবং মাতৃশবীর হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। একটি মনুষ্য-শবীরে ২৪টি শরীরগু বা chromosomes-এর সমষ্টি। মানবশিশু জন্মবালে উহাব ১২টি পিতৃশবীর হইতে এবং ১২টি মাতৃশবীর হইতে লাভ করে। পিতামাতা আপন আপন পুষ্টিলাভেব সময়ে যে ভাবে ঐ শরীরগুগুলি বর্দ্ধন কবে, অথবা ঐ শবীরগুতে যেসকল দোষগুণ অঙ্কিত করে, তাহা শিশু-শরীরে অঙ্কিত হইবেই হইবে। পিতামাতার কোন শ্রেণীর দোষগুণ তাহাদের নিজের শরীরগুকে দোষগুণের অনুরূপে পরিবর্তন করিতে পারে, অর্থাৎ পিতামাতার কোন দোষগুণের ছাপ শিশুশরীরে অঙ্কিত হইবেই হইবে, সে বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পবে বিবৃত কবিতোছি। কিন্তু আমরা এইটুকু হইতেই বুঝিতে পারি যে, শিশুেব সমগ্র শরীর যখন পিতৃ-মাতৃদত্ত শরীরগুব সমষ্টিমাত্র, এবং পিতৃমাতৃ-শবীরেব অণুগুলি যখন তাহাদেরই নিজের বিশেষ অস্থায় পুষ্টির ফল, তখন শিশুশরীরে পিতামাতা ছাড়া অন্য কোন অসম্পর্কিত মৃত ব্যক্তির আত্মা আসিয়া প্রভুত্ব নিষ্ঠার করিতে পারে না।

আত্মা বলিলে একটা স্থূল কথা বুঝায়। মানুষেব সকল কৰ্ম্মই যখন তাহার শারীরক্রিয়ায় ফল, তখন আত্মা অর্থে ইহাই স্বীকার কবিতো হইবে যে, উহা প্রতি শরীরে নূতন সত্তারূপে শবীরগুব সম্মিলন এবং বিকাশের সময়ে বিকশিত বা উৎপন্ন হয়। অন্ত আত্মাকে যদি নব শরীর গ্রহণ কবিতো হইত, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাহাকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া, পিতা ও মাতা উভয়ের শরীরের শবীরগুতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইত। এরূপ করিতো হইলে আবার পিতৃমাতৃশবীরেব শবীরগুগুলি কোনপ্রকার পুষ্টি হইবার পূর্বে উহাকে শবীরগু সাজিয়া দাঁড়াইতে হয়। এ প্রথায় অগ্রসব হইলেও তাহার

আত্মটিকে ঐ পিতামাতার পিতামাতার শবীর আশ্রয় না করিলে নাতি হইয়া জন্মিবাব সম্ভাবনা নাই। এখন যদি যুক্তিপথে আর একটু অগ্রসব হওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মৃত পুরুষের আত্মাকে যদি নব জন্মলাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে কঁাকড়াব পদ্ধতিতে পিছাইয়া গিয়া আদিম জৈবনিক ন. সাজিলে আর চলে না। -

ঠিক জন্মসময়বাব মুহূর্ত্তে যখন ২৭টি শরীবাণু মিলিত হইয়া জীবকোষ বাধিয়া বাড়িতে বসে, সে সময় হইতে ভূমিষ্ঠ হইবাব সময় পর্যন্ত একই জৈবনিক-লীলা ঐ শরীরে অভিনীত হয়। সমগ্র অণুব সত্ত্ব যেমন একটি শরীর, তেমনি সমগ্র শরীরের একটা সূক্ষ্ম গুণফলরূপে এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মাব বিকাশ বা উৎপত্তি ধরিয়া লইলে বরং চলিতে পারে।

আত্মার বিষয়ে যাহাই হউক, শরীর সম্বন্ধে ঠিক বলিতে পারা যায় যে, শিশুর শরীর ঠিক পিতার শরীরও নহে, মাতার শরীরও নহে। পিতা এবং মাতা প্রত্যেকের শরীরই ২৭টি শরীবাণুব সমষ্টি; কিন্তু সম্ভাবনোৎপাদনের সময়ে কেবল বংশপ্রবর্তকরূপে ১২টি ১২টি কবিতা শরীবাণু আসিয়া মিলিত হইয়া নূতন শরীর গড়িয়া তুলে। তাহাব পর আবার আবার একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিতে হইবে। পিতা এবং মাতা তাহাদের আপন আপন পিতামাতার অংশে উৎপন্ন হইবাব পব সংসারের চাবি পাশেব অবস্থায় এবং শিক্ষায় যখন পরিবর্তিত হইতেছিলেন, তখন আপন আপন কর্ম্ম এবং অবচারের ফলে শারীরিক জৈবনিকের বংশপ্রবর্তক অংশটুকুকে পরিবর্তন করিতেছিলেন। উহাতে ফল এই হইল যে, সম্ভাবনাব অনেক অংশে যে পিতামাতার অনুরূপ হইবেন, তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। প্রতি বারের সম্ভাবন উৎপাদনের সময়ে, ঐ বংশপ্রবর্তক জৈবনিকে ভিন্নতা সাধিত হইতে থাকিবেই। কাজেই সম্ভাবন, পিতা ও মাতার (কেবলমাত্র পিতার নহে) আত্মা হইলেও একটি ভিন্ন স্বতন্ত্র জীব। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত J. A. Thomson লিখিয়াছেন—

“On the one hand, the child is like its parents, ‘a chip of the old block’, a literal *reproduction*; on the

other hand, the child is something original, a new pattern, a fresh start—leading the race.”

কর্ম্ম এবং অবচারের ফলে এই শিশু আবার আরও স্বাভাব্য লাভ করিয়া ভিন্ন মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র জন্মফলে একটি শিশু পিতামাতার দোষগুণের কতদূর পর্যন্ত উত্তরাধিকারী হয়, তাহা বলিতেছি।

পূর্বাতে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রমাগত এক দিক হইতে বাতাস বহে বলিয়া সমুদ্রতীরস্থ গাছগুলি একদিকে ঝুঁকিয়া বাড়িয়া উঠে, এবং চিবকাল বাঁকা হইয়াই থাকে। ঐ গাছগুলি বাঁকা, এবং বাঁকা হইয়া বাড়িয়াছে বলিয়া উহাদের বীজ হইতে যে নূতন গাছ জন্মিবে, তাহাও বাঁকা হইবে, ইহা সত্য নয়। পিতৃমাতৃশরীরের যে-কোন পরিবর্তনই যে সম্ভাবনশরীরে সংক্রমিত হইতে পারে, তাহা ঠিক নহে। যাহারা ক্রমবিকাশ-বাদের কোন কোন তত্ত্ব গাল-গল্পের মত শুনিয়াছেন, তাহারা মনে করেন যে, আমরা যদি কোন অঙ্গের চালনা বন্ধ করি, অথবা শরীরে যাহা প্রাকৃতিকভাবে জন্মিয়াছে, তাহাকে অব্যবহার্য করিয়া তুলি, তাহা হইলে বংশপরম্পরায় অব্যবহৃত অংশ একেবারে ধসিয়া পড়িবে বা লোপ পাইবে। যাহারা গল্পে শুনিয়াছেন যে ডারউইন বলিয়াছেন যে, বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি (হায় ডারউইন!), তাহারা এ পর্যন্তও বলিয়া থাকেন যে মানুষের ব্যবহারে লাগিল না বলিয়া ধীরে ধীরে লাঙ্গুলটি ধসিয়া পড়িয়াছে। হাতুড়েব হাতে, ক্ষয়-বৃদ্ধির তত্ত্বটার কি দৃগুতিই হইয়াছে। আমরা পুরুষাশ্র-ক্রমে হাতের নখ কাটিয়া আসিতেছি। এখনও কিন্তু তাহার ক্ষয় হইল না। তারকেশ্বরের অকুপা না হইলে ভট্টাচার্য্যবংশে চিবকাল দাড়িগোঁফ কামাইয়া আসিতেছে; তবুও ঐ অব্যবহৃত এবং অব্যবহার্য্য দাড়ি গোঁফ যথাসময়ে গজাইয়া উঠিতে ছাড়ে না। যদি কোন একটা বংশের লোকদিগকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জোর করিয়া খোঁড়া করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সুদূর বংশধরেরা আপনাপনি জন্মমাত্রে খোঁড়া হইয়া জন্মিবে না। চীন-দেশের জীলোকেরা বহুকাল হইতে যত্ন করিয়া পা ছোট করিয়া আসিতেছে; তবুও নবজাত সম্ভাবন সুবিকশিত পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

যেসকল রোগ আমাদের সমগ্র শারীরিক অবস্থা হইতে উৎপাদিত হয় না বাহা আমাদের হাড় গলাব না, অর্থাৎ যাহা মূল জৈবনিকের অবস্থাব ফলে যন্ত্র বা organic নহে, সে বোগ সন্তানে বর্তে না। এমন অনেক বোগ আছে, যেগুলি কোন আকস্মিক কাৰণে কিংবা বহিঃস্থ কোন ক্ষুদ্র অণুর (microbes) প্রভাবে উৎপন্ন হয়; সে বোগ কেবলমাত্র জন্মকালে সন্তানশরীরে সংক্রমিত হইতে পারে না। ধকন, কোন পিতা বা মাতার Phthisis নামক কাশবোগ জন্মিয়াছে; যদি জন্মমুহূর্তের পর সন্তানটিকে বাহ্যিকভাবে ঐ বোগ-সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করা যায়, তবে সন্তান পিতামাতার ঐ রোগের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু যাহা জন্মের পূর্বে পিতামাতার সংশ্রবে সংক্রমণ করে, তাহাকে জন্মকাল বলা যাইতে পারে না। উহা কর্মফলও নহে; কেবল অবচাৰ-ফল মাত্র।

জৈবনিকের যে অংশ বংশবর্ধকশক্তিরূপে স্বতন্ত্র বহিয়াছে, উহাতে যেসকল অবস্থার ফল অঙ্কিত হইতে পারে, তাহাই সন্তানে বর্তিতে পারে। Gout প্রভৃতি বাত রোগ জৈবনিকের গতির পরিবর্তনের সহিত গ্রথিত হইয়া যায় বলিয়া অন্তর্নিহিত হয়। কাজেই ঐ প্রকার বোগের উৎপত্তি সন্তানটুকুই শিশু-শরীরে জন্মলাভ করিতে পারে।

বংশপ্রবর্ধক জৈবনিকের এমন একটা মৌলিক প্রকৃতি আছে, যাহার ফলে সে একটা বিশেষ গতি বা লক্ষ্য লইয়া পুষ্টিলাভ কর্তৃক বা বাড়িয়া উঠে। শরীরের অবস্থা যদি সেই বৃদ্ধির অনুরূপ হয়, তবে কোন গোলই নাই। কিন্তু যদি শরীরে জীবৎ অনুরূপ অবস্থা লাভ করিয়া কোন বিশেষ দিকে উহার গতি বর্ধিত হয়, এবং সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গতি পক্ষে বাড়িয়া উঠিবার সুবিধা না পায়, তাহা হইলে নদীৰ প্রায়ে কুল ভাঙ্গিয়া যাইবার মত, শরীরে একটা বিকৃতি বা ব্যাধি দেখা দিতে পারে। ঐকম বিকৃতি বা ব্যাধিবৃদ্ধ পিতা যদি উন্নততর শরীর জন্ম দিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নারীকে তাঁহার শিশুর মাতা করেন, তাহা হইলে শিশুশরীরে পিতার ব্যাধি না জন্মিয়া একটা নূতন গুণের জন্ম হইবে। কারণ যে শক্তি পিতৃ-

শরীরে একটি গুণরূপে বিকশিত হইবার সম্ভব ছটকট কবিতা ব্যাধি উৎপন্ন কবিতাছিল, তাহা অনায়াসে সন্তান-শরীরে পুষ্টিলাভ কবিতাব পথ পাইল। এ বিষয়েব একটা মন্তব্য শ্রীযুক্ত J. Arthur Thomson প্রণীত "Heredity" গ্রন্থেব ২৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত কবিতেছি। এই মন্তব্যটি হইতে ইংবাজি-অভিজ্ঞ পাঠকেরা কথটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

"Leaving microbic and acquired diseases out of account, we may safely say that various processes of hypertrophy and atrophy, which are associated with disease in a well finished organism like man are, as it were, *recrudescences of important steps in past evolution*. The persistence of germinal activity in a patch of cells may give rise to a tumour, but is it not, as it were, an echo of the power that lower animals have of regenerating lost parts? So it may be that some of the cerebral variations which we call for convenience "nervous diseases" are *attempts at progress*."

সন্তানের শরীরে পিতৃমাতৃরোগের আনির্ভাব যে বোগের উত্তরাধিকারিত্ব সূচনা কবে না, এ বিষয়ের বিশেষ কথা এখানে লিখিতে গেলে পুষ্টি বাড়িয়া যাইবে। যেখানে মৌলিক জৈবনিকের প্রভাবে সন্তানের শরীরে বোগ উৎপন্ন করিবার একটি অনুরূপ অবস্থা বাত থাকে, অর্থাৎ predisposition মাত্র থাকে, সেখানেও ঠিক রোগের উত্তরাধিকার বলা চলে না। বোগ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সন্তান ঠিক জন্ম-ফলমাত্র পিতার কোন বোগেরই উত্তরাধিকারী হয় না। কেবল কোন কোন বোগে বোগ জন্মিবার অনুরূপ অবস্থা লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ কবে। এক বিবে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কবিলে এই অনুরূপ ভাব বা predisposition সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইতে পারে। অন্তর্নিকে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতামাতার একজনের শরীর হইতে রোগের অনুরূপ অবস্থা পাইয়াও অল্প জনের নিকট হইতে সন্তানটি রোগ প্রতিষেধের অবস্থা (immunity) লাভ কবে। পূর্বে সমুদ্রতীরস্থ বাঁকা গাছেব কথা তুলিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছি। সংক্ষেপতঃ কথটি এই যে মানুষের শরীরে যেসকল পরিবর্তন বাহ্যিক কারণে ঘটয়া থাকে,—যে পরিবর্তনের মূলে কেবল জন্মের পববর্তী

সময়ের কর্মফলের ও অবচারফলের প্রভাব, সেসকল পবিত্ববর্তন বা acquired characters সম্ভাবনশরীবে সংক্রমিত হয় না।

ধরুন, একটি দম্পতির শরীর খুব সুস্থ, দেহ-আয়তন সুপুষ্ট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সুবিকশিত; আচাব-ব্যবহার খুব সংযত, এবং নানা বিজ্ঞান মন অলঙ্কৃত। উদ্ভাসিত যে সম্ভাবন হইবে, সে প্রথমতঃ জন্মকালে পিতামাতার অল্পকপ শরীরটি পাইবে। ঐ শরীর যদি সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার শরীরের মত সুস্থ এবং সর্বকর্মক্ষম হয়, তাহা হইলেও বলিতে পারা যাইবে না যে, ঐ সম্ভাবন ঠিক পিতামাতার সুশিক্ষার লক্ষণ ও লাভ করিবে। অল্পবিধ বা কুবিকশিত দম্পতিব পুত্রের সহিত প্রথম দম্পতির পুত্রের তুলনা কবিয়া কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে করুন যে, শরীরখানির হিসাবে প্রথম দম্পতিব সম্ভাবন যেন একটা বড় “জালা” হইয়া জন্মগ্রহণ করিল; এবং দ্বিতীয় দম্পতিব সম্ভাবনটি একটি ছোট “ভাঁড়” হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। “জালা” হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে প্রথম সম্ভাবনটি সর্ব-শুণে পবিপূর্ণ হইবে, তাহা নয়। কর্ম এবং অবচাবের ফলে ঐ বৃহৎ জালায় কেবল কাদা ভরা যাইতে পারে এবং ছোট “ভাঁড়”টিতে অতি অল্প পরিমাণে ধরিলেও সুপেয় সবৎ পূর্ণ করা যাইতে পারে। একটি শরীরে অনেক সদৃশ বিকশিত হইবার অল্পকুল অবস্থা থাকিলে যে সদৃশ্যই বিকশিত হইবে, এ কথা বলা চলে না। খাদ্য, গৃহ, সমাজ, শিক্ষা এবং বাড়িগাব পথের অল্প রকমের সুবিধা অসুবিধা মানুষকে নিয়মিত করে।

কুটিল বাজনৈতিকের পুত্র অনায়াসে সরল সাধু ব্যক্তি হইয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে ঐ কুটিলতা নিন্দনীয় নহে বলিয়া সম্ভাবনকে জন্মমাত্র “একঘরে” হইতে হয় না, বৎ সম্ভাবনের সহিত সে দশজনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়া জন্ম এবং অবচাবফলের অল্পরূপে আপনাব নূতন ভাগ্য গড়িয়া তুলে। একজন দরিদ্র চোরের সহিত রাজ-নৈতিকের যত নৈতিক মিলনই থাকুক না কেন, যে চোরের গৃহে বদ্ধিত হয়, সাধারণতঃ তাহাব কপাল ভিন্ন রকমের হয়। চোরের বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া কেহ চোব হইবেই, এমন কথা বিধাতাপুরুষ কাহাবও কপালে জন্মের পূর্বে

লিখিয়া দেন না। তবে চোরের ছেলে সাধুসমাজে তেমন স্থান পায় না বলিয়া, রাজনৈতিকের পুত্রের মত ভাগ্য-পবিত্ববর্তনের সুবিধা পায় না।

আমাদের পাঠশালার পরিচালকেরা এবং সমাজ-সংস্কারকেরা এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। বহুকাল হইতে মানুষের মনে এই সংস্কার বহুমূল আছে যে, যে ব্যক্তি যেমন স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ কবে, তাহার সেই স্বভাব কিছুতেই ঘুচে না। জন্ম, কর্ম এবং অবচার পৃথক কবিয়া ধরিতে না পারায় সাধারণভাবে এই সংস্কার জন্মিয়াছে। সাধারণতঃ কুৎসিতকর্মকাবোদিগের সমাজই স্বতন্ত্র। সেই জন্ত আপাতদৃষ্টিতে আমরা বংশানুক্রমে মন্দ লোক দেখিবার সুবিধা পাই। বালকেরা পাঠশালার পড়িয়া থাকে যে—“স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে, যথা প্রকৃত্য মধুবং গবাং পয়ঃ।” শত সুশিক্ষাতেও যে স্বভাবের পবিত্ববর্তন না হইয়া উল্টা ফলটিই ফলে, এই কথা বুঝাইবার জন্ত কুনীতি-শিক্ষার গ্রন্থে আছে—“মণি না ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ?” না জানি কত হতভাগ্যের গৃহের পুত্র নবজীবনলাভের আশায় পাঠশালার আসিয়া ঐ কুৎসিত কথা পড়িয়া জন্মের মত দমিয়া গিয়াছে; এবং ভাগ্য-পবিত্ববর্তনে হতাশ হইয়া শেষে বুক ফুলাইয়া গর্হিত অহুষ্ঠানে মন দিয়াছে। কেবল মাত্র suggestionএ যে অনেক মাতালের ছেলে পরে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত সংগৃহীত আছে। একদিন বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্র, দর্পনাবায়ণের বেত্র হস্তে লইয়া এই শ্রেণীর হিতো-পদেশগুলিকে বিজালয় হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া দিবার জন্ত আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে আদেশ আজিও পালিত হইল না। পাঠানির্বাচন কমিটিতে আমাদের সুশিক্ষিতা মহিলারা যদি থাকিতেন, তবে দর্পনাবায়ণের বেত্রের পরিবর্তে মহিলা কুল-দস্তোলি “মুড়ো খেজুরা” দ্বারা এই নীতিব বিদ্যায়ের ব্যবস্থা হইতে পাবিত।

কর্ম ও অবচাব-ফল এবং জাতিভেদের ফল প্রভৃতির কথা বাবাস্তবে বলিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অনুপ্রাসের অট্টহাস

(শব্দগঠনে অনুপ্রাসের প্রভাব)

পূরীকৃত্তি।

(৮) জীবজগতে জড়জগতে সবাই আমাব ভরে জড়সড়। দানবমানব, ফক্ষক্ষঃ, ভূতপ্রেত, রাক্ষসগোক্ষস, নরবানব, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, জন্তুজানোয়াব, [ম্যামথ ম্যাটোডন মেগাথিরিয়ম] মেঘমহিষ, গোগবর, গোগর্দভ, হরহস্তী, উল্লুকভল্লুক, শকুনি গৃধিনী, শুকশাবী, পোকা-মাকড়, মশামাছি, গঁড়িগুগলি, আমিই এসব অদ্ভুত ঘোড় মিলাইরাছি। আমাবই দাপটে বাধেগরুতে, বাধে-বকবীতে, বাধেবলদে, এক ঘাটে এল খায়, কোন কথা কাকেবকে কাকেকোকিলে জানিতে পাথেনা। কলুব বলদ ও বামুনবাড়ী বড়াল উভয়েই আমার বশ। কোকিলের কাকলীতে বা পিককুহুতে, শিবীব কেকায়, পাগিয়ার পিউ পিউ ববে, স্তকের মকমকে, রাসভরাগিণীতে, কুকুরকীর্তনে, আমাব সাড়া পাও না কি? কুকুবকুগুগী আমারই পাক-চক্রে। আমারই স্রব্দে বিড়াল বাধেব মাসী।

পলুপোকাতে আমি, প্রজাপতিতেও আমি। পঙ্গ-পালে আমি, মধুমক্ষিকা বা মৌমাছিতে আমি, জোনাকী-পোকার আমি, আবার কাংকোটা বি ঘূবঘূবে পোকাতেও আমি। মন্তমাতঙ্গে বস্ত্রবরাহে বনবিড়ালে, গন্ধগোকুলায়, বনের বাধে, বনেব বানবে, [আই-আই উয়াজ উটাজে,] হনুমান, এঁড়ে গরুতে, বকনা বাছবে, ছাগলছানায়, লড়াইয়ে মেড়ায়, শশকে, কুকুবে, টাটুতে, ঝিঁঝি ছুঁচো চামটিকে টিকটিকি গিবগিটি সরীসৃপ কুমিকীটে, স্তো-সঞ্চার সাপে, কোথাও আমার অভাব নাই। পাখী-পাখালীর ভিতব কাকাতুরা, কুকুট, তোতা, ঘুঘু, বাবুই, কাক, কোকিল, টুনটুনি, বুলবুলি, কাঠঠোকরা, হাঁড়িচাচা, [পেঙ্গুইন পক্ষী,] সারস; জলজন্তুব মধ্যে কাঁকড়া, শুক, মিরগেলমাছ, মাগুবমাছ, মৌরমাছ আমার কাছছাড়া নহে। কাঁকড়াব দাড়ায় ও উর্ণনাভের লুতা-তন্তুতে আমি জড়াইয়া আছি। বাধের ঘরে বোগের বাসাও আমাকে পাইবে। জুজু, বোবো, চোখটাটা, মামসোও আমাব বশ। আড়গোড়ায় পশুশালায় আমি,

পিঞ্জবাপোলে আমি, হবিহবছত্রেব বা মেঘমর্দনেব ঘো-র ক্রমবিক্রমেও আমি।

(৯) জড়জগতে—পানাপুকুরই বল আর পানাপুকুরই বল আব মনোহব সরোবরই বল, কুলতলাই বল কুল-তলাই বল বকুলতলাই বল আর তেঁতুলতলাই বল, পল্লীপ্রান্তবেব বটবৃক্ষই বল আর কুবককুটিবেব কাটাচ বাঁশবন বেতবন বেণাবন ঝোপঝাড়, ঝোড়জঙ্গলই বল, সর্বত্র আমার অধিকার। স্থলকমলে, জলজ লতায়, হুল-কুহুমে, কেতকীকুহুমে, কদম্বকুহুমে, কনকচন্দ্রে, শিরীষপুষ্পে, বকুলফুলে, বকুলবীথিকায়, লন্দুলতায়, লজ্জাবতী লতায়, এলালতায়, মধুমালতীতে, জাতীঘূর্ণিত্তে, মল্লিকামালতীতে, কমলকুমুদকল্যানে, ফবীর-কুম্বকে আমার শোভা মনোলোভা। পাখ্যপাদপে আমিই খণ্ড ফাখি, পদ্মপত্রে আমিই টলমল করি। আবার কাশকুশে, লেউড়-বাঁশে, টোপাপানায়, পলাশপাতায়, আলো চালে, ছেলার ডালে, ডেকোর ডাঁটায়, বৈদ্যবাটীর তরীতবকাণীতে, শাকসজীতে, আমজামে, কলামুলায়, ছোলাকলায়, চালকলায়, কছকুমড়োষ, কচুবেঁচুতে, গোমআবুতে, পাকাকলায়, কাঁচকলায়, কুলবেলতালে, মুগমহুরে, মাংস-ফলে, কাঁকুড়ে, কাঁকবোলে, তেঁতুলে, চিচিঙ্গেতে, শশায়, সর্ষেয়, শস্ত্রে, আমার অজস্র আমদানি। মর্ম্মবস্ত্রে বা সন্ সন্ শব্দে আমার আওয়াজ সুস্পষ্ট। গজারি গাছ, সপ্তপর্ণ, দেবদারু, কণ্টিকাবি, ঋদ্ধি-বুদ্ধি-কন্দলয়, কলকবল্লভে আশশাওবা ঘলঘসে, শুভনিশাক সজ্ঞানাশাক, মহামন, সর্বত্র আমি বর্তমান। আমারই যোগাযোগে শালম্মিল-রদাল, তালতমাল, শালপলাশ, শাল্মলী, হরভকী বিভীতকী আমলকী, বনউপবনের শোভা সংবর্ধন করে। দুর্দামলে ধরণীর শ্রামশোভা আমারই গুণে। বকুর বববটীতে আমি, কিসমিসেও আমি। বাতাবী ও কমলালেবু আমারই বসে ভরপুর। পেঁপে ও আম আদা আনারই এসে মুখরোচক। হুননেবু lawless হইয়াও আমার শ্রুতা স্বীকার করে। পসতা তিক্ত-স্বভাববশতঃ পটোবপত্র নাম লইয়া একটু মধুব হইতে চাহে না। নিম্ননিসিলেও তিক্ত, কিন্তু অনুপ্রাসসে সিক্ত।

তিলকে তাল করিতে, তিল কুড়াইয়া বেল করিতে,

কুটকাটা বা কুমড়াকাটা কবিতে, কুমড়া কুরিতে, কুটনো কুটতে, চা'ল চিবাইতে, ধান ভানিতে, পাতা পাতিতে, পটোল তুলিতে, ভেরাঙা ভাজিতে, আমাব কৃতিত্ব কম নহে।

(১০) প্রকৃতিবৈচিত্র্যে আমারই বিচিত্র লীলা। খরতর রবিকরে মধ্যাহ্ন-মার্ভণ্ডে দাবদাহে আমি, আবাব বর্ষাব বারিধারায় বৃষ্টিবাদলে ভরাভাদরে পূবে বাতাসে মেঘ-মালার জগদজালে বারিদবৃন্দে বিজ্যাদবিকাশে চপলাচমকে আমি। নিদাঘ-নিশীথে আমি, নিশির শিশিরে আমি, মধুমাসে মলয়-মাকুতে আমি। চাঁদনী রজনীতে আমি, আবার পৌষের শীতবাতও আমি।

(১১) বর্ণবিজ্ঞাসে লাল আমার বাহারে লালে লাল। লালকাল, লালনৌল, কালা ও ধলা, হরিৎ-পীত-লোহিত, নীললোহিত, [ব্ল্যাক, ব্রোঞ্জ-হু, গ্রেগ্র্যানাইট,] সর্বত্র আমি জল জল করিতেছি।

(১২) দশদিকে দেখ, আমি আছি। পূর্বপশ্চিম, প্রাচী প্রতীচী, অবাচী উদীচী, উর্দ্ধ অধঃ, ঈশান কৈশে, পিছুপানে, সব দিকে আমি। দিগদর্শন আমিই উদ্ভাবন করিয়াছি।

(১৩) সংখ্যাবাচক ও পূর্ণবাচক শব্দে আমি রসসঞ্চাব করিয়াছি। দ্বিবি, দশএকাদশ, ষা-দশ, দ্বিতীয় তৃতীয়, সপ্তম অষ্টম নবম দশম, আব কত বুধিব? বিশত্রিশ, দশবিংশ, দশপঁচিশ, শতসহস্র, অযুতনিষুত, আমাব জোবে বোডবলী। ছদশে, ছদিনে, ছদশদিনে, আমার পরিচয় পাইবে।

(১৪) বার-তিথি-মাস-ঋতু ও অন্তান্ত কালবিভাগে আমি যথাকালে দেখা দিই। কলাকাঠা, পল বিপল অল্পপল, দিবাদণ্ড, বাববেলা কালবেলা কুলিকবেলা, মলমাস, কোটিকল্প, প্রভৃতি গণনা আমার জন্ত। নিশিদিদি, সাঁঝ সকাল, সকাল সন্ধ্যা, সকাল বিকাল, সব সময়েই আমি হাজির। দিনছপুবেও আমার দেখা পাইবে, সারারাতও আমার দেখা পাইবে। ভূতভবিষ্যৎ ভাবনায় আমি। কলিকালে আমার প্রভাব একট।

তিথির মধ্যে দ্বিতীয়া তৃতীয়া, পঞ্চমী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী, একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী চতুর্দশী পঞ্চদশী আমার বশীভূত। বটীরও আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা

আছে। প্রতিপদে আমিই প্রীতিপ্রদ। বোলকনায় আমি পরিপূর্ণ।

বারের মধ্যে আমি বার বাব তিন বার আছি—রবিবাব, বুধবাব, বৃহস্পতিবার। বৃধবৃহস্পতি, শুক্রশনি, বোড়ে বোড়ে আমার গুণ গায়। শনিব শেষ, বৈশ্য্যব্বারের বারবেলা, শনির দশা, শেষ শনিবাবে ছুটি, সবই আমার কারসাজি।

মাসের মধ্যে কার্তিকে, মার্গশীর্ষে, পৌষমাসে, নাবমাসে, মধুমাসে, ভরাভাদবে, আমার আদব আছে।

ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ শীত, হেমন্ত বসন্ত, আমাব কৃপায় সখ্যাত্রে বদ্ধ। পঞ্জিকাবিব্রাটেব ফলে পর্যায়-বিপর্যয় ঘটিয়াছে অথবা অয়নচলনহেতু কোন কোন ঋতু অগ্রগামী হইয়াছে, তাহা জ্যোতিষী মীমাংসা করুন।

(১৫) রাশি-নক্ষত্রেও আমাকে দেখিবে। মেঘবৃষ আমিই একত্র করিয়াছি; মিথুনমীন, মকবরীন পাশাপাশি না থাকিলেও আমার বশ। কর্কটে আমার কামড় আছে। সাতাশ তারাব অনেকগুলিই আমাব তেজে তাল পাকাইয়া জলিতেছে। কৃত্তিকা আমার কীর্ষি-পতাকা।

(১৬) মানবের দশদশায় আমি। শৈশবে, বাল্যাবস্থায়, বাল্যবয়সে, বালিকাবয়সে, বালকবেশে, ছোটছেলেবে, ছেলেবেলায়, ছেলেখেলায়, ধূলাখেলায়, খেলাধূলায়, সদানন্দ শিশুর সবল হাসিতে আমি; আবাব নবযুবার, নবযুবতীতে, নব-যৌবনে আমি; বয়োবৃদ্ধিতে, বৃদ্ধবয়সে, বুড়াহাড়ে বুড়া-হাবড়ায়, ঠেঙ্গাধরা বুড়ায়, বাহান্তরে বুড়ায়, বুড়ী খুড়খুড়ীতে বুড়াইবুড়ীতেও আমি। * শৈশবস্থাপনে, বাল্যবুদ্ধিতে, বাল্য-বিবাহে, পবিত্রপ্রণয়ে, বনিতাবিলাসে, সন্তানসন্তানবনায়, শিশুসন্তানের লালনপালনে স্তনপানে, মাতাপিতাব মায়ামমতা বা সন্তানস্নেহে, পতিপ্রেমে, পত্নীপ্রেমে, স্বামিসেবায়, আমার সত্তা অমুভব কর না কি? সমসাময়িক বাল্যবন্ধু-বিরোগবেদনায়, মা মরায়, যমজালায়, যমযন্ত্রণায়, শিয়রে শমনে, শমনভবন-গমনে, পঞ্চদ্ব্যপ্রাপ্তিতেও আমার ব্যাপ্তি আছে।

(১৭) মলমূত্রময় মানবশরীরের অবয়বে অষ্ট অঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্কশরীরে আমি বিরাজ করিতেছি। মুখচোখ, নাক-কাণ, গালগলা, পিঠপেট, চোঁট, টুট, ছরছরী,

ফুসফুস, কাঁকাল, বোঁড়াভুক, নাড়ীভুঁড়ী, বড়বড়ি ভাঙ্গা, ছধে দাঁত, মেদমজ্জা, মুখুঁব, স্নুস্না, শীর্ষ, সর্ষে আমি। মুখমণ্ডলে, বদনবিবরে, কর্ণকুহরে, চক্ষুচক্রে, নিয়নাভিতে, পদপ্রান্তে আমি। মাথাব মগজে, চোখের চাহনিতে, চোখের দেখায়, নাকেব নিশ্বাসে, মুখে মেছেতায়, পারে পাঁকুইএ, পেটে পিলের, মুখময় থুথুতে, নাসিকাকুঞ্জে, বদনব্যাদানে, হুদি নামায়, ছিরিছাঁদে আমি। ধবধবে, টকটকে বা টুকটুকে বং, বেলুন বেলুন বা গোলগাল গড়ন (নারীনিন্দায় পিতলের পিলমুজ্জ) আমাবই ঘোঁগাঘোঁগে। চিংকাং, কাণাকুঁজো, কোলকোঙ্গা, সবই আমাব প্রসাদো বামনবন্ধুবে আমি, দশাসই মাহুবেও আমি। আমাব প্রভাবে চোখে দেখে, কাণে শোনে, নাকে সোঁকে, মুখে খায়।

(১৮) এইবার বীররসেব অবতারণা করিব। যুদ্ধ-বিজ্ঞায়, সমবশাস্তিসন্ধিতে আমাব অধিকার। শুববীর ধনুর্জয়ের হুকাব-টঙ্কারে, কার্ষকে, শবাসনে, তরবারিতে, শেলশুলে, দোর্দণ্ডকোদণ্ডে, অস্ত্রশস্ত্রে, বর্ষচর্ষে, জিজ্জিবে, তর্জ্জনগর্জনে, তনুত্রাণ আর্জ্জ্জাণে, সন্মুখসমরে, শৌর্য বীর্ঘ্য ওদার্য্য গান্ধীর্ঘ্যে, কৌর্ষিকাহিনীতে আমি; আবার অশ্ব-সাদীতে, সৈন্তসামন্তে, হযহন্তীতে, লোকলঙ্করে, সিপাই-সাজীতে, পুলিশগণ্টনে, গোরাশুর্খায়, শরীরবরক্ষী সৈন্তে [বা বডি-গার্ডে, ক্যাডেট-কোবে], গুলিগোলায়, ঢালতরওয়ারে, বাকদবন্দ্যুকে, টোটায়, কুচকাওয়াজে, যুদ্ধজাহাজেও আমি। সামরিক সংবাদে, বালকবীবে, বীববোলিতে, প্রবল প্রতিপক্ষেও আমি। মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি যুদ্ধোয়ুধি হুটোপুটি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি লাঠালাঠি বুঁবোবুঁবি হাতাহাতি গুতোগুতি জুতোজুতি, অথবা বর্ষেরেব দস্তামস্তি নথানথি চুলোচুলি কীলোকীলি, আঁচড়কামড়, চড়চাপড়, উত্তমমধ্যম, পাদপ্রহার, চরণতাড়ন, তর্জ্জনীতাড়ন, কেশাকর্ষণ, ভ্রভঙ্গ, দাক্ষাহাক্ষা, লাঠিঠেঙ্গা, লাঠিসোঁটা, কোঁৎকা, ডাঙা, বাঁটকাটা, মুড়া খ্যাংরা, কিছুই আমাছাড়া নহে। বৃকে ব'সে দাড়ী উপড়াইতে, নাক কাণ কাটিতে, টিকি কাটিতে, মাথা মুড়াইয়া খোল ঢালিতে, দফারফা জেতুবায় নাস্তানাবুদ খুন-খাবাপী উৎপাত উৎখাত করিতে, আমার কৃতিত্ব কম নহে।

(১৯) আবার হাতাহাতি ছাড়িয়া মুখোমুখি কবিনেও আমাব অধিকাবে থাকিতে হইবে। হৃদযেব, হৃদযিলা, রেঘারেঘি, মনকসাকসি, মনোমালিখ, কাজিয়া কলহ, বিবাদ বিসংবাদ, বাদবিচার, বাদবিতণ্ডা, ঝগড়াঝাঁটি, বাগ্‌বিতণ্ডা, গোলমাল, গণ্ডগোল, দিগদাবী, থিটকেল, ধাক্কা, ঝঙ্কট, বিবম সমস্তা, সবই আমাব কারসাজিতে। গালাগালি, ঢলাঢলি, কড়কান, জলদি জবাব, রাগে গর গর করা, গা ঝ ঝ করা, সবই আমার কর্তৃক। -দোষ দেওয়া বা গোব দেখানায়, লাঞ্ছনা গল্পনায়, ব্যঙ্গবিজ্রপে, শ্লেষবিবে, বাহ্য-বাণে, বিজ্রপবাণে, বাঁকা বাঁকা বুলিতে, কষ্টিনয়িত্তে, মুখ-শেলে, শেলসম কুবাকো, মিছরির ছুরিতে, মজা মানায়, মজাব মাহুবে, হাসি তামাসায়, ঠাট্টায়, রগড়ে, কোতুক, ত্তোকবাক্যে আমি। গালিগালাজ মুখখিত্তি মুখখাবাপে কড়াকথায় কটুকথায় কটুবাক্যে কটুকাটব্যে আমি মুর্খিম ন। তা' সাধুভাষায় অকালকুস্মাণ্ড, অব্যবস্থিতচিত্ত, কুলকলঙ্ক, কুলপাংশুল, গজগজ্জীরগতি, জড়ভরত, দেশদ্রোহী, ঋণ-ধবজী, নষ্টহুট্ট, পায়গুত্তগুত্রিপণ্ড, মদমত্ত, বকধাঙ্গিক, স্বার্থসর্কস্ব, হৃদয়হীনই বল, আর ইতর ভাবায় উড়ম্যাড়া, একরোকা, ক্যাবলাকাস্ত, কাঠখোঁটা, খয়েরখাঁ, খামখেয়লি, খোদার খাসী, গড়োগোয়াল, গাছগক, গুণ্ডাচুণ্ডা, গোবরগণেশ, গোববগাদা, গোয়াবগোবিন্দ, ঘাটেপুড়া ঘাটবোড়া, ছুঁচো, জববজঙ্গী, ঠোটকাটা, ধামাধরা, নাক-কাণকাটা, নিধিনে, নিমকহারাম, নির্কংশেব বেটা, পাগপ-পাবা, পাজীর পাঝাড়া, ভেড়ের ভেড়ে, মদমাতলে, মড়িপোড়া মিনসে, বুড়োবানব, বে-আকুব, বে-আদব, বে-ইমান বে-তমিজ, বে-হদ বে-হাসা, বোঁধেটে, বাঁড়ের গোবর, হারামজাদা, হাড়হাবাতে—জীলোকের নোয় ইহরদীতী, কাঠকুড়ুনী, চুর্গাটুনটুনি, পাড়াবেড়ানী-ই সল।

(২০) আবার গালাগালি ছাড়িয়া গলাগলি কোলাকুলি কর, তথাপি আমাব অধিকারে সামন্তস্ত, ভাবাব, বনিবনাও করিয়া থাকিতে হইবে। আনন্দে গদগদ বা আনন্দে আটখানা হইবে, অথবা বাপুবাছা করিয়া কাহুতি-মিনতি করিবে, আমারই ইচ্ছায়। আটপিঠে, চটপটে, চালাক চতুর, জাঁহাবাজ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, গণ্যমান্ত ন্যায় ববেণা, গুণী জ্ঞানী, বিজ্ঞবিচক্ষণ, পবিত্র-চরিত্র, মাথাব

মাণিক, শাস্ত্রসংঘত, সংস্কার, স্থলী ও স্থবোধ, সত্যসন্ধ, গৌসাইগোবিন্দ, মাটীর মাহুখ, মুড়কাঁমুখী, বাংলা বাহাহর প্রভৃতি প্রাশংসার গুণগানে বা গুণ গাওয়ার আমার হাত আছে।

মানবজীবনের সকল বিভাগেই আমি বিহাব করিতেছি।

(২১) বিচারব্যাপারে ধর্ম্মাধিকরণে আমি, বিচার বিভাগেও আমি। আইনেব আমলে আসিলেই আমি দেখা দিব। আইন আদালত, আইনকানুন, আমলা কয়লা, মামলা মোকদ্দমা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ, [উইল কডিসিল], সহিমোহর, সহিস্পারিশ, বাহাল-ববতরক, [ডিক্রী ডিসমিস, জজ ও জুজী], হাকিম ও হকুম, জোরজার, জোবজুলুম, জোরজবরদস্তি, জুলুমজবরদস্তি, দাঙ্গাদাঙ্গামা, দাঙ্গাক্যাসাদ, দাঙ্গামাহজুৎ, খুনখারাপী, খুনজখম, ক্রোক, সাফাই সাক্ষী, জোবানবন্দী, বাববরদারী, [সেসন-সোপর্দ, জেলা জজ], নকলনবীশ, স্বত্বসাব্যস্থ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সালিশী সভা, মামলা মূলতবী, যোগদাযোগ, গরহাজিব, গাঁটকাটা, পকেটকাটা, [লাইবেল বা] মনিনাশ বা মানহানির মামলা, আদালতেব আমলা, ময়লা সামলা, [ব্যারিষ্টারের বাবু, ডিক্রীজাবীর মোহরার], দেনার দাফ, আমমোক্তারনামা, কবুলজবাব, বায়নানামা সবই আমার প্রসাধ্য।

(২২) জমীদারী সেরেস্ভায়ও আমি আছি। জমিদার জোতদার তালুকদার ইজারাদার পত্তনিদার দরপত্তনিদার ছেপত্তনিদার একযোগে আমার এলাকায় আছে। খিলজমি, লালজমি, মালজমি, জোৎজমা, বাজেজমা, জমিজমা, জমিজারগা, জমিজিবেৎ, তালুকমুলুক, খোদকস্তা পাইকস্তা, শিকস্তি পয়স্তি, বন্দোবস্ত, বিলিবন্দেজ, বাওবাব, আবওয়াব, উঠিতপতিত, ব্রহ্মোস্তর দেবোস্তব পীরোস্তর, স্থনিবুদি, বাকীবকেয়া, প্রজাপত্তন, রাজাপ্রজাসম্বন্ধ, প্রজা জমিদার, পত্তনিপাট্টা, নিকাশপ্রকাশ, তবতিববন্দী, খাজাকিখানা, গোমস্তাগিরি, সবকার, কারকুন, পাইক-পেরাদা, লোকলস্কর, ধরপাকড়, তাড়াছড়া, ফোতফেরার, উৎখাত, কিস্তিখেলাপ (লাট!), সব আমার রূপায়। দশশালা বন্দোবস্ত আমার গুণে [Encumbered Estates আমার দোষে]।

(২৩) মহাজনেব মালমশলা, লেনাদেনা, দেনাপাওনা, দাবীদাওয়া, বাকীবকেয়া, বিলাতবাকী, লাভলোকসান, কারকারবাব, পুঁজিপাটা, আমদানীবস্তানি, হাওলাত-বরাহ, দরদাম, দরদস্তুর, দাদন, গুণোগার, দেনদার, খরিদদার, দোকানদাব, চড়াদর, নবমদক, ত্রণোদর, খাতাপত্র, বিলবহি, হিসাবকিতাব, [বুককপিং], যোগান ও টান, বখরাবন্দোবস্ত, বোবকারী, রোকড়, গড়পড়তা, সর্ব-সাকল্যে, দালাল, নমুনা, ধার করা, মরশুম, তহবিল তছরূপ, [পেটেন্ট], সখেব বা খুসির সওদা, ভেজাল মিশাল, কল-কারখানা সবই আমার। মাড়োরাবী মহাজনে, কলের কুলিতে, ব্যবসায়বাণিজ্যে, বিক্রয়বাণিজ্যে, বাহিরীবাণিজ্যে, বাণিজ্যজাহাজে, জাহাজেব জেটিতে, বাণিজ্যবিস্তাবে, অর্ণব-বাণিজ্যে, ঋণদানে, আয়ব্যয়ে, উত্তমর্ণঅধমর্ণে, পবিশোধ-সমীকরণে, সঙ্কয়দমুখানে, আমি বিবাজ করি। স্বদেশীশিল্পে, শ্রমশিল্পে, হুচিশিল্পে, শিল্পিসভায়, শ্রমজীবী সমবায়, [ট্রেড গিল্ডে], কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে, প্রদর্শনীপ্রদর্শনে [বেঙ্গল ব্যাঙ্কে, বর্ম্মা ব্যাঙ্কে, চারটারড ব্যাঙ্কে] আমাব দেখা পাইবে। লক্ষ্মীকর্দসতি বাণিজ্যে—এই মূলমন্ত্রে আমি। আমারই কোশলে কলিকাতা সকলের সেরা বাণিজ্যবন্দর। আমারই চেষ্টায় উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বর বন্দব বসান হইবে।

(২৪) বাজনীতি রাষ্ট্রনীতিতে, [লাটের লেভিতে], জাতীয় জীবনে, মিলনমন্দিরে, মেটামজলিসে, বাবুঠেকে, [কনগ্রেস কনফারেন্সে], স্বায়ত্তশাসনে [নমিনেশানে] নির্বাচনে, পুননির্মাণে, সদস্তপদপ্রার্থনায়, ভোটভিক্ষায়, ভোটভাজনায়, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়তে, পঞ্চায়ত-প্রধায় আমি। বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গবিভাগবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থায় আমি, আবার বঙ্গবিভাগ-ব্যবস্থা বদলেও আমি। [প্রোকলামেশান পিলারে] দিল্লী দরবারে, [সেনসাসে, রিপোর্ট রেজলিউশানে, ব্রুক্কে, সিভিল সার্ভিসে] শাস্ত্র-শাসনে, রাজরোষে [পিউনিটিড পুলিশে, ডিটেক্টভে] বা পুলিশ পাহাযায়, পুলিশ পলটনে, কালকোর্তী কনষ্টেবলে, হুঁয়ান্তে সভাভঙ্গেও আমি। আমাব কলাপে সর্বসাধারণের সভায় লক্ষলোক সমবেত হয়। চাঁদাদাতার খাতায়ও আমাকে পাইবে।

(২৫) সমাজসংস্কারকের সম্মতিসঙ্কটে, সহবাস-সম্মতিতে, বিধবাবিবাহবিধিতে, বিবাহবিলাস ব্যবস্থায়, বিবাহবিচ্ছেদ ব্যবস্থায়, বস্ত্র বিলে, বিবাহ-বিভ্রাটে, বালাবিবাহ বহুবিবাহ-বারণে, যৌননির্কীচনে, পুরুষপুরুষ-কর্তৃক নারী-নিগ্রহ-নিবারণে, মহিলামিত্র সমাজে, সখী-সম্মিলনে, সারদাসদনে, জ্যৈষ্ঠিকায়, জ্যৈষ্ঠাবীনতায়, মেয়ে মজলিসে, মেয়ে মর্দানৌ ভোটভিত্তিকাবিণী জেনানা জোয়ানে আমি বলবান্। আবার বালবিধবার বেলায় ব্রহ্মচর্য্য বারব্রত নিরম্ব উপবাসবিধি ও অম্বকলে ষৈ-দৈ আমিই ব্যবস্থা করিয়াছি। নববিধানে ভ্রাতৃত্বাবে প্রতিমা-পুজায় (পুতুল পুজায়) পণপ্রথায় আমি সমদর্শী।

(২৬) বাবু বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভাসমিতিতে আমার যাতায়াত আছে। শুদ্ধিসভায়, হিতসাধিনী সভায়, অম্বশীলন-সমিতিতে, সাধনাসমিতিতে, সেবাসমিতিতে, ব্রতসমিতিতে, সাধারণসম্মিলনসমিতিতে, সাহিত্যসম্মিলনে, সারস্বতসম্মিলনে, [মেমোরিয়াল মীটিং বা] স্মৃতিসম্মিলনে, স্মৃতিসভায়, সহানুভূতিসভায়, শোকসভায়, সাঙ্ঘ্যসমিতিতে, স্তম্ভসভায়, সখা সম্মিলনে, সংস্কারসাধনার্থ স্মৃতিসঙ্ক-বিগী সভায়, সভ্যনাযায়ণ সমাজে, শ্রীশ্রীনিভ্যানন্দ প্রেম-প্রচাবিগী সভায়, সর্বত্র আমাকে পাইবে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায় আমি, সদগোপ-সভায়ও আমি। সভায়স্তু, সভাভঙ্গে, স্তম্ভ-বাচনে সংস্কৃত শ্লোকে, প্রবন্ধপাঠে, হাততালিতে, [হিঁপ হিঁপ হুরুরেতে], স্বকিকিৎ জলযোগে, [টা পাটিতে], স্মৃতিসৌধে, সমাধিসৌধে, সমাধিস্তূপে, সমাধিস্তম্ভে, শিলালিপিতে, শিলাকলকে, শাসনে, প্রশস্তি পরিচয়ে, পুঁথির পাটায়, মর্শ্বরম্বর্ষিব বা পাষণপ্রতিমার পাদপীঠে, সর্বাবস্থায় আমাকে দেখিতে পাইবে। আবাব প্রাচীন প্রথার কথকতায়, বারইয়াবী ব্যাপাবে, মঠমন্দিরপুঙ্খবিগী-প্রতিষ্ঠায়, অন্নদানে, আমার স্থান আছে। মুসলমানের মাদ্রাসা মকতাব মুশাফিবখান মসজিদে, মহম্মদ মহসীনের ইমামবাড়ীতেও আমার প্রবেশনিষেধ নাই।

(২৭) [টেলিফোঁ টেলিগ্রাফ, পোষ্টমাষ্টার, পোষ্ট-পিয়ন] হরকবা [রনার, বুক প্যাকেট, পার্শেল পোষ্ট] প্রভৃতি ডাকঘরের ব্যাপাবে আমার ডাক পড়ে। পত্রপাঠ-মাত্র উত্তর-প্রদানে, ডক্টরভাজন পবম-পুজনীর পরম-

পোষ্টাবর সম্মানভাজন মহামহিম মঙ্গলালয় বশংবদ অবশ্য-পোষ্য প্রণাম-পুংসর প্রভৃতি পাঠে আমি বিরাজ করি।

(২৮) আমোদপ্রমোদ, বাজনাবাঁজি, গায়ন বায়ন, নৃত্য-গীত, গীতবাঁজ, তৌর্য্যাত্তিক, সঙ্গীতশাস্ত্র, আমাব ভগোচর নহে। কায়দাকরতবে, গমকগিটকিবিতে, রাগরাগিণীতে, কড়ি ও কোমলে, সুরসংযোগে, সুরসুধায়, সুর ও সুরে, কলকঠে, কিরকঠে, আমাব আওরাজ সুপ্পঠ। কালী-কীর্তনে, কৃষ্ণকীর্তনে, সঙ্গীতসঙ্গীতনে, মানমাথুরে, সখী-সংবাদে, বামবসায়নে, মনসার ভাসানে, বীণাবাদনে, হৃন্দুভিনিবাদে, আমিই আসব মাত করি। তানানান ভাঁজিলেই, পিড়িং পিড়িং বা বুজতাবুজম বাজিলেই তেরাখিটাতা তবলায় টাট দিলেই, তাইবে নাইবে গাইলেই, দিক্তাধিনা নাচিলেই, আমি আসিয়া পড়ি। কালেয়াতেব কর্কশকঠে, দাড়ীদাতে আমি বিরাজিত। সঙ্গীত গুনয় বাহবা দাও, বাঃ বেশ বাঃ বল বা হাততালি লাগ-ও, সে সবও আমার লীলা।

ইমনকল্যাণ, শুজ্জররাগ, জয়জয়ন্তী, বিঁকিট, তেতালা, দশকুণী, দাদবা, মধ্যমান, মেঘমল্লার, বসন্তাহার, সর্বত্র আমার বাহাব। বেণুবীণা, সেতার এসরাজ, সপ্তস্বর, সুরবাহাব, মুরজমুরলী, মৃদঙ্গমন্দিরা, রবাব, হৃন্দুভি, ঘুংর, কনককিঙ্কিনীতে আমি, আবাব খোল-করতালে, নাগারাটিকারাকাড়ায়, তুরীভেরীতে, ঢোলক-তবলায়, ঢাকঢোলে, দামামাদগড়ে, জগবম্পে, চতবড়ের, টেটরায়, ব্যাণ্ডবাজনার, ব্যাংবাণীতে, ডুগডুগিতে, গাব-শুবাণ্ডবেও আমি। সঙ্গীতসমাজ, স্তম্ভসঙ্গীতসমাজ, সঙ্গীতসম্ভ, বঙ্গরঙ্গভূমি, [জাশনাল ও ষ্টাব থিয়েটার] নির্কীচিভ নৃত্যগীত, পটপরিবর্তন, [বেনিফিট নাইট ফুট সাইট] হুর্গাদাস দে, মিনার্ভায় মহেন্দ্র মিত্র, বৈকুণ্ঠবস্ত্র, বেকবরুয়, তানসেন, গীতবিং মাষ্টার মদন, সবাই অম্বপ্রাসবসে মগন। বাত্রার কালুরাভুলুয়া, বৃন্দাদুতী, মালিনীমাসী, আমারই যোগাযোগে ঘোটে।

(২৯) খেলাধুলা ক্রীড়াকৌতুকেও আমার লীলাখেলা। স্তম্ভ ছেলেবেলাব ছেলেখেলা ধুলাখেলা খেলাধুলা কেন, অষ্টকষ্ট, আগুডুমবাগুডুম, আতালিপাতালি, ইক্টিমিক্টি, কিংকিং, ঘুং ঘুং, ছিনিমিনি, দশপটিশ, ব ঘবন্দী,

সিঁদুটোকাটুকি, সব তা'তেই আমি। [ব্যাটবল বা ক্রিকেটে আমি], ঝালঝাপ্পায় হাড়ভুড়তে আমি, প্রাচীন কন্দুকক্রীড়ায় আমি। ঘুড়ী উড়ানয় আমি, আবার লাটু-লেট্টিতেও আমি। তাস পাশা শতরঞ্জে আমি, দাবাবড়ের আমি, তিনতাস ছবিছুট [পেরেমানবা পিংপং] মায় ইস্তক-কাবারে আমি। হাঁধায় আমি, কথাকাড়াকাড়িতে আমি; জলের খেলার তুলাব খেলায় আমি, ষোড়দৌড়ে পোলো-খেলায়ও আমি। শারীরিক শাস্ত্র-সঙ্কয়ে, জাগানী জিউ-জিৎসুতে আমি, মালামো কুস্তির কসরতে কুচকাওয়াজেও আমি। ভোজবাজী, বাঁশবাজী, মেড়ার লড়াই, বলবুলিব লড়াই, ভীমভবানী, [কার্লেকার্স সারকাস], আলিপুরের পশুশালা, মোহনমেলা, সর্বত্র আমাব দর্শন পাইবে।

(৩০) সভ্যসমাজের [এটিকেটে] তববতে, কায়দা-কাহুনে, আদবকায়দায়, আদবআপ্যায়িতে, আদরআহ্বানে, অনুরোধ উপবোধে লোকনকুতায়, লোকলজ্জায়, (আঙ্গুল আবডালে), দানধ্যানে, দয়াদাক্ষিণ্যে, দয়ামায়ায়, মায়ানম-তায়, স্বাগতসম্ভাষণে, করকম্পে, প্রাতঃপ্রণামে, গললগ্নীকৃত-বাসে, পাদম্পর্শপূরক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে, আমি আটঘাট বাধিয়া রাখিয়াছি। যানবাহনে, পোষাকপরিচ্ছদে, বসন-ভূষণে, বেশবিধানে, বেশবিভালে, বেশভূষায়, ছাঁটকাটে, সাজসজ্জামে, ঘরবাড়ীর সাজসজ্জায়, আহাববিহারে, আহাব-ব্যবহারে, বিলাসব্যাসনে, আমার অধিকার অপ্রতিহত।

(৩১) যানবাহনে—গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঘরের গাড়ী, ভাড়ার গাড়ী, ঘুড়ীগাড়ী, বেড়াভাড়ার গাড়ী, [টমটম, পুশপুশ, মোটরকার, ট্রেনট্রলি-ট্রাম, (শিয়ালদহ হইতে শ্রামবাজার) ট্রেন ষ্টীমার,] যাত্রীজাহাজ, [সাইকেল ষ্টে] ডার্কলিঙ্গের ডাঙী, [রেলবোড বা] রেলের রাস্তা, [লুপ লাইন, গ্র্যাণ্ড কর্ড, মাদ্রাজ মেল], সাবাসেতু, শোণসেতু [জাহাজের জেট ও জলিবোট, কাউ-কাচাব, কোষ্টক্যানাল লাইন] সর্বত্র আমি। পানিপাড়ে, [ষ্টেশন-মাষ্টার, টিকেট-কলেক্টর, টিকিট, নাইটভিউটি, টাইমটেবল,] গাড়ীর গড়গড় ষড়ষড় ঘ্যাচরঘ্যাচব হুসহুস, ক্যাচক্যাচ, সবই আমার যোগা-যোগে। [কেলনাব কোম্পানীর রিফ্রেশমেন্ট-রুমে আমি আরাম করি।]

(৩২) বিদেশে বিবোরে ভাড়ার বাড়ী বাসাবাড়ীতেই থাক আর বসতবাটা বাসভিটায়ই থাক, শরীর সাবার জন্ত স্বাস্থ্যনিবাসে বাস কব আর নিরুপায়ে মাতুলালয়েই আশ্রয় লও, আমাব মায় কাটাইতে পারিবে না। গৃহদাহ ঘটিলে, ভিটামাটি ঘুচাইলে, চাটিবাটি তুলিলে, বাড়ী বিক্রয় করিলে বা বাধা দিলে, চালচুলা না থাকিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। আবার বাগানবাড়ী বৃক্ষবাটিকা বিশ্রামবাটিকা প্রমোদ-উত্তান ক্রীড়াকাননে বহুবাক্ষবেব সঙ্গে অমোদপ্রমোদ আহাববিহার বনভোজন [পিকনিক কর বা ইডেনগার্ডেন বীডন্ গার্ডনে বা বীডন বাগানে] বিপ্লব বায়ুসেবন কর বা বিজনবাসে বনবাসে প্রবাসবাসে যাও, আমি সঙ্গের সাথী। আমার আবদারে ঘরবাড়ীর তরবেতর নামনির্দেশ। যথা, কমলকুটীব, কামিনীকুটীব, দেব-নিবাস, পুলিনপুরী, পাথারপুরী [আইভি ডিলা, অর্কিড ডেল, হলি লজ]।

ঘরদেশে, সদবদরজায়, দরদাগানে, চণ্ডীমণ্ডপে, ঠাকুরঘবে, গোসাঘরে, ঘণ্টাঘরে, খাসকামরায়, গুপ্তগৃহে, গর্ভগৃহে, গুহাগৃহে, পরঃপ্রণালীতে, জলের কলে, চৌ-বাচ্চায়, মাটিকোঠায়, শাশীখড়খড়িতে, ঘুলঘুলিতে, ঝিল-মিলিতে, ঘরদোবে, সদর অন্তরে, বিয়েবাড়ীতে, কোথাও আমার প্রবেশনিষেধ নাই। বহির্কীর্টি বা বাহিরবাড়ী গেলে সেখানেও আমি হজ্জা কবিব, তেতালার উঠিলে সেখানেও আমি চড়াঙ হইব, বড়বাড়ী গেলে সেখানেও আমি উঁকি মারিব। কারাগারে কারাকক্ষেও আমি কাছছাড়া নহি।

ঘরবাড়ীৰ মালমশলা সাজসজ্জাম তোড়যোড় যোগাড়-যন্ত্রে আমি কার্যকুশলতা দেখাই। আমিই রাজমজুর, মুটে মজুব মিস্ত্রী, কাবিকর খাটাই, মেরামত করাই, কর্ণিক ধার কারুকার্য গজগিরি কবাই, মর্শ্বরপ্রস্তর বসাই। ইটকাঠ, ইটটালী, বিলাতী মাটি, আড়াববগা, কড়িবরগা, বীমবরগা, কড়িকাঠ, কাঠকাটরা, শাল সেগুন সুঁদরী শিশু, খোলাধাপড়া, সুবকী, সিমেন্ট, খড় দড়ি, লাকলাইন, দড়াদড়ি, রশারশি, [মায় গ্রাউণ্ড গ্যাস]—সব যোগাড়-যোগাড় আমার ভান্ন।

ঘরবাড়ীর সাজসজ্জায় আমার হাত আছে। [বৈষ্ণ

চেয়ার] চৌকি, [কোচ] কেদার [ইজিচেয়ারবেও আমি
লাট হইয়া আছি], [পাংখা-পুলার], খসখস টাটা,
[মেকের ম্যাটিং], জাজিম, পাপস, গালিচাহলিচা, সুজুনী
শতরঞ্জ, [ডেক্স ড্রয়ার ডাণ্ডী হোয়াটনট] [পোর্টম্যান্টো
ষ্টলট্রাক ক্যাসবক্স] বিজলীবাড়ী, খাটের খুঁরা, গালবালিশ,
পাশবালিশ, বিছানা বালিশ, প্রদীপ পিলসুজ, পিতলের
পিলসুজ, শেজ সামাদান, লঠন, গোললঠন, কেরাসিনেব
কুপি, শিশি, কাঁচকড়া ও কড়িকোটার জিনিস, [কার্পেটে
কারচুপি কাষ], বাসনকোসন, ঘটাবাটী, বটিকাটারী
কুকুনী, ছুরীছোরা, বিড়োবারণ, মুড়াখাংরা, খড়কে কাঠী,
জিবছোলা, কাঠকলা, কোককলা, কাঠ খড়, কাঠখড়ি,
তুফকাঠ—সব আমি যেটাই।

(৩৩) সত্যভব নব ইন্দ্রবজ্রের [কফ কলাবে, হেট-
কোট প্যাটশার্টে কালকোটে] ছাতাছাড়িছাড়িগাড়ীতে,
জুতামোজায়, জামাজুতায়, চোখের চশমায়, স্বদেশভক্তের
সুখচরের স্বদেশী পেঞ্জীমোজা তোয়ালেবুলালে, সেকলে
সুস্ত্রদায়ের চোগাচাপকান আচকান ইজার চুড়িদারে,
জামাবোড়া দৌড়দার শালদোশালার, শাল আলোয়ানে
[অল উল] লালইমলিতে, ঘরগীর্জাহীগণের [শেমিজ জ্যাকেটে]
[সিদ্ধ শাটিনে, সিদ্ধের শাড়ী] দেশী শাড়ীতে, পরণে
পাছাপেড়ে শাড়ী পাকা পাড়ে, শাঁখাসিঁদুরে, মিশিমাঞ্জে,
ধনীমানীর মথমলে কিংখাবে, রেশমপশমে, দীনছঃখীর
কাপড়চাদরে, ধুতীকোতায়, কাছাকোঁচায়, তেলধুতীতে
সাতহাতী ধুতীতে, বা কাঁধকাটা কাপড়ে, কাঁধা কষলে,
ভেজঃগুজ সাধুসন্ন্যাসীর জটা কোটা লোটার, বাউলের
আলখাল্লার—কোথায় আমি নাই?

(৩৪) গয়নাগাঁটি সোণাদানা গারে এক গা গয়নায়,
অষ্ট অঙ্গে অভরণে (আভরণে), অলঙ্কার-প্রতিকারে
আমি অলঙ্কারের অলঙ্কার। যথা কেয়ুরকুণ্ডল, অঙ্গুলিতে
অঙ্গুরী, নাকে নথনোলকনঙ্গ (হুলকামিনীর কঁকে কলসী
নাকে নোলক পরণে পাছাপেড়ে সাড়ী পাকাপাড়), কাণে
ঝুমকো কাণবালা কর্ণকুণ্ডল, সীংখার সীংখিপিটি ঝাপটা,
মাথায় মুকুট, মাঝায় মেথলা বা কটিতটে কাঞ্চী কনক-
কঙ্কিনী, স্বর্ঘ্যহার চন্দ্রহার রেটগেট্ট, গলার গজহতি
মুক্তাহার, হেলেহার, হেঁসোহার, দড়াহার, মতির মালা,

হাতে তাব তাগাতাবিজ বাজুবন্ধ বালাবীক [ব্রেসলেট]
বাউটি বাউড়ি, যবদানা মরদানা, লবঙ্গদানা লবঙ্গকুল, মৌরী-
মাছলি, মুড়কিমাছলি, দমদম, বিনোদবাহার বোবনবাহার
আমিসোহাগিনী চুড়ী, ঢাকার শাঁখা, পায়ে পাণ্ডুলী চবণপদ্ম
পালংপাতা দমদমা বা গোলমল। গিনীসোণা, অভাবে
গিন্টির গয়না, [রোলড গোলড, কেমিক্যাল, মারাপুরী
মেটালে] পাশিশপাতা বা ফারফোব গহনা গড়ান।

(৩৫) নেশাব বশ বান্ধালী বাবুর আলবোলা গল্পাডায়,
চকমকি ঠোকায়, ছকাকলিকায়, অধুরীখাধিরায়, তামাক-
টিকায়, দোস্তাতামাকে, চাচুকটে, [চুরট-সিগারেটে, বিড়ি-
বার্ডসাইএ, কাকিকোকোতে, কোকেনে], মুক্তিগুপে
গাঁজাগুলিতে—(পেরার পাতায় প্রস্তুত।)—চরসঙুতে,
ছিটাটানায়, চুকটটানায়, নস্তটানায়, নস্তলোসায়,
নস্তনেওয়ার, সুরাসস্ত মদমাতালেব মদের মুখে, মাতলমোর,
পানপাজে, শুড়ীবাড়ীতে, খাঁটিটানায়, বোতলবাহিনীতে,
[ব্রাণ্ডীর বোতলে, ব্রাণ্ডীবিয়েরে, শেরিড্রামপেনে, পেল-
এলে] আমি অধিষ্ঠিত। আমার গুণে তেল তামাকে
পিভনাশ, নেশার রাজা গাঁজা, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি
বাড়ে। পাণস্থপারি, পাণে চূণ [ও পিপারমিট], পাণের
দোনা, এলাচলবঙ্গ, জৈত্রীজায়ফল, দারুচিনি কাবাবচিনি,
কর্পরপুগ, [সেন-সেন] ইত্যাদিও আমি সরবরাহ করি।

(৩৬) এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। ভক্ষ্যভোজ্যেও
আমি আছি। কমলাকান্তের মত ব্রাহ্মণ-ভোজননের নিয়ন্ত্রণ
গ্রহণ করিয়া ভূরিভোজন কর, গণ্ডে পিণ্ডে গেল, কুঁচকিকুঁচ
বোঝাই কর, গাবণ্ডটো করিয়া খাইয়া আইচাই কর, সাত
তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গৌজ, আর যৎকিঞ্চিৎ ফলযোগ
বা একটু মিষ্টিমুখ কর, পেটপুজা যেখানে আমি সেখানে।
দখোদর বা পোড়াপেটের জন্ত বা কিছু বোণাড় কর, আমান
ঠেলিতে পারিবে না। চা'লচিড়ে বেঁধে ধাপধাড়াই যাও
আর দিল্লীকা লাডুই খাও, আমি সঙ্গে সাথী। আবায়
জঠরজালা বা জঠরযজ্ঞহার ছটকট কর, দাঁতে দড়ি দাও,
ভাতে হাতে না কর, হাওলা খাওয়ার খুঁী থাক, সেখানেও
আমি।

খাস্তপ্রস্তুত-প্রক্রিয়ার জন্ত 'পাকপ্রণালী' বা 'অমিষ ও
নিরামিষ আহার' খুঁজিলে আমাকেই পাইবে। পনিপাক,

পাকসাক, পখাপখা, খানাপিনা, খাইখরচা, পলাপপাতা,
পাতাপাতা, সবাসাজান, ছাঁদাবাঁধা, খড়কেকাঠী ও শেষেব
সম্বল গাড়ুগামছা—সবই আমার প্রসাদে। আনন্দআশ্রমে,
বাবুর্জি [বটলাবে], রাধুনী বামুনে, চা-চিনিতে, চামচেতে,
কড়াবেড়ি, হাঁড়িবেড়ি, হাঁড়িসরা, হাঁড়িকুড়ি, হাঁড়িহৈশেল,
হাঁড়িচড়ান প্রভৃতি রন্ধনেব তাঁতবীতে পর্যন্ত আমি।

হোমবা চোমরা আমার ওমরা ও ইংবাজী-জানা
বাবুভয়েদেব শিক-কাবাব, পোলাও পাঠা, পোলোয়া
কালিয়া, কালিয়াকাবাব কোণ্ডা কোন্দী [কাটলেট অমলেট
মটনচপ-], মশমাংস বা মদমাংসে, [রুটিবিস্কুট কেক
কমফিটসে] আমার যেমন কচি, খাটি সৌধীন খাণ্ডব্রব্য
লুচিচিনি, লুচিকচুবি, পাপব, খাজাগজা জেলাপি, মিঠাই-
মণ্ডা গণ্ডা চ গণ্ডা, মতিচূব মিহিদানা, বাবড়ীবসগোজা,
সরভাজা সবপুবিয়া, লবঙ্গলতিকা, মনোমোহিনী বিলি,
চমচম, আবাব-খাবো, সবস সন্দেশেও আমার তেমনি রুচি।
অদেবী পায়সপিষ্টক, দধিহুঙ্ক, ক্ষীরসব, ক্ষীবখণ্ড, নবনীত,
মুড়ামাখন, মাখনমিছরিতেও আমার বিলক্ষণ টান আছে।
শেষে সুস্বাদু আচারচাটনী, আমেব আচার, কাহ্নলি কুলের
আচার, স্নিগ্ধ সরবৎ, সোডা লেমনেড।

মধ্যবিস্তের অন্রব্যঞ্জনে, চা'লডা'লে, ভালভালনায়,
খালঝোলমথলে, শাকহুস্তম, চড়চড়িতে, সবসবিতে, হাবজা
গোবজা তরকারিতে, খাড়াবড়িখোড়ে খোড়বড়িখাড়া,
মৎস্তমাংসে, মাছমাংসে, ঝালের ঝোলে, (ওলে ঝোলে
খেওনা), আটার রুটি পরোটার, আব পালেপার্কণে—
পিঠেপুলিতে, শামসারা গুড়ে, চিড়ের ফলাবে, ক্ষীব-
চিড়িতে, সবচিড়ে শুকো দইএ, উড়কি ধানের মুড়কিতে,
মর্ডমান পাকাকলায়, খৈদৈএ, ভোজ্যভাতে, নবানে, নেমস্তনে,
অন্নশনে, (দাঁতে ভাতে খেতে) সর্বত্র আমি আছি।
আবার দীনহুঃখী মুটেমজুবেব দানাপানিতে, ভুজোভাজে,
ভাজাভুজোয়, গুড়মুড়িতে, চিড়েমুড়িতে, চিড়েমুড়কিতে,
মুড়িমুড়কিতে, ফুটকড়াইমুড়কিতে, কটকটেয়, চাণাচুরে,
গরমমুড়িতে, ছোলায় ছাতুতে, গাছছোলায়, ভাততবকারীতে,
হুণেকেনে, ভাতের পাতে, ভিজ্জোভাতে, পান্তাভাতে,
বীচেবড়িতে, পটোলপোড়ায়, আমি আছি। পিত্তপ্রধান
ধাতুর চা'লজলও আমার ব্যগ্রস্থায়।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-সন্ধ্যা

নীবব বিহঙ্গ-গীতি, পশ্চিম-অচলে
ববি অন্ত যায় ;
মিশে গেল দিবসেব শেষ আলো-বেধা
দিগন্ত সীমায়।

দূব বনবাজি-শিবে নেমে আসে যেন ধীরে
কৃষ্ণ যবনিকা,—
সন্ধ্যা বুলাইয়া দিল বিশ্ব-দৃশ্যপটে
তিমির-ভুলিকা।

এমনি একদা সন্ধ্যা আসিবে নামিয়া
জীবনের 'পরে,
নিবিবে আঁধার আলো, বাসনার ঢেউ
খামিবে অন্তরে,

ক্ষান্ত যত গীত গান হৃৎ-হৃৎ ভবা তান ;
শুধু চুপে-চুপে
ককণ মরণ আসি বিরিবে আমার
অন্ধকার রূপে।

নিখিল ধরণী ক্রমে লুপ্ত বজ্রনীর
অন্ধকার গ্রাসে,
কোথা হ'তে উঠে হুটে' অগণ্য তাবকা
অসীম আকাশে।

কে জানিত রবি-করে ঢাকাছিল নীলাশ্বরে
জ্যোতির্কনিচয়।

নিবিড় আঁধার ঘোরে অনন্ত লোকের
দিল পরিচয়।

ওই মত পরিশ্রান্ত জীবনের শেষে
সন্ধ্যায় যখন

মৃত্যুব শীতল কোলে জনমের মত
মুদিব নয়ন,

আঁধারে মিশিবে ভব, দেখিব কি নব নব
জ্যোতির্কর দেশ—

এ জীবনে কোন দিন স্বপনেও নাব
পাইনি উদ্দেশ।

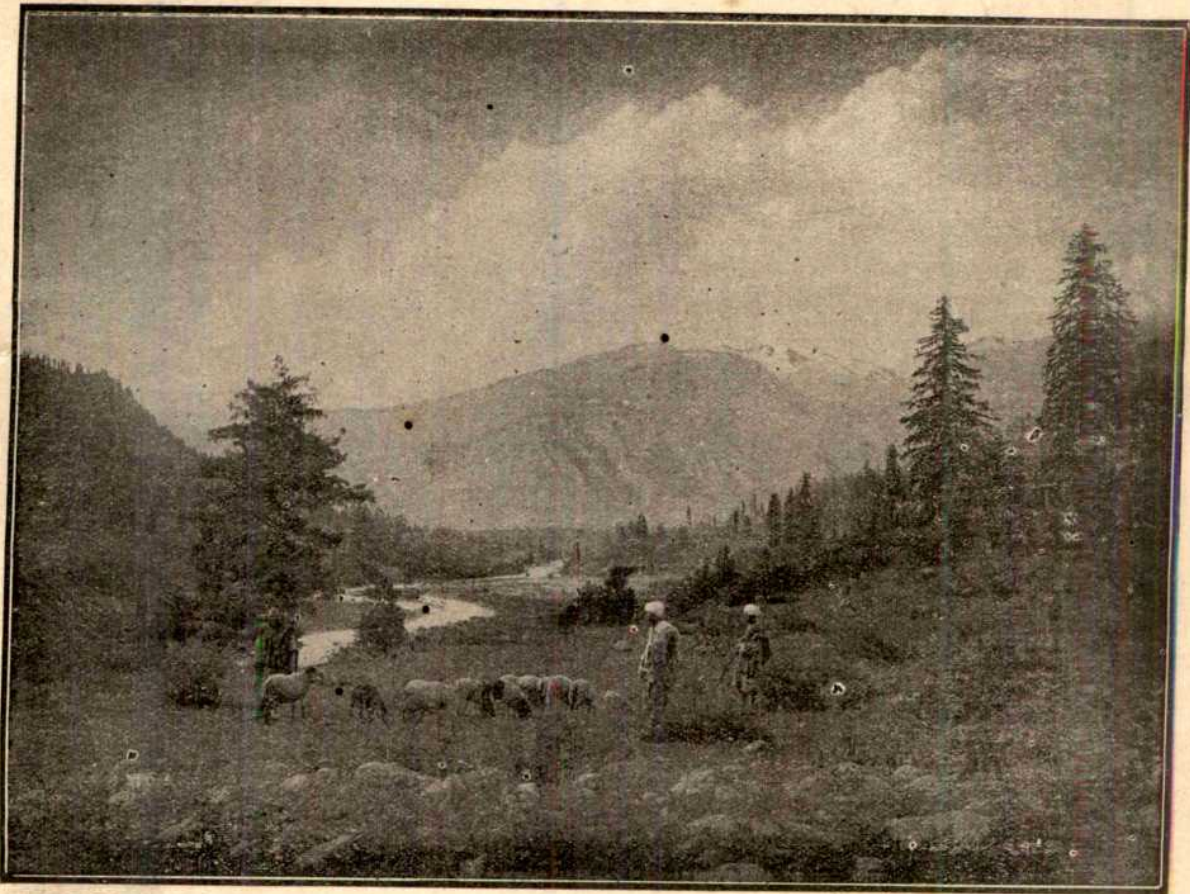
শ্রীমণীমোহন ঘোষ।

কাশ্মীরী পণ্ডিত

পণ্ডিত কথার অর্থ সচরাচর আমরা শাস্ত্রজ্ঞ ও বিদ্বান বলিয়াই বুঝি কিন্তু কাশ্মীরে এই কথাটির অর্থ বিভিন্ন রকমের। ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের মধ্যে যে যত বড় বিদ্বান হউক না কেন তিনি যে বাবুজী সেই বাবুজীই থাকিবেন ; পণ্ডিতজী তিনি কিছুতেই হইতে পারিবেন না। কিন্তু কাশ্মীরের আদি-ব্রাহ্মণ-সন্তান নিরক্ষর হইলেও পণ্ডিতজী।

আখ্যা উপনিবেশীদিগের খাঁটি বংশধর—ইহাদিগের আখ্যাচিত্র শ্রী দেখিলেই ইহাদিগকে চেনা যায়।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন সমস্ত কাশ্মীর এক হিন্দু রাজার অধীনে ছিল, তখন কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই একটি অবিভক্ত হিন্দু জাতি ছিল। তারপর কাশ্মীর মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইলে কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক, মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে



কাশ্মীরের একাংশের দৃশ্য।

তবে কাশ্মীরনিবাসী সকল ব্রাহ্মণই পণ্ডিত নহেন। পঞ্জাব বা সনতল ভূমির ব্রাহ্মণগণ বাহারা কাশ্মীরে গিয়া বাস করিতেছেন তাহারা পণ্ডিত আখ্যা পাইতে পারেন না। কাশ্মীরের পণ্ডিত ব্রাহ্মণজাতির একটি শাখাবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা শতকরা বড়জোর ৫ হইবে। ইহারা আদি

নাই, হিন্দুধর্ম কোনরূপে রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া যায়। এই হিন্দু অধিবাসীগণের বংশধরেরা এখন কাশ্মীরী পণ্ডিত। সুতরাং এখন কাশ্মীরের আদিম অধিবাসীদিগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কাশ্মীরী মুসলমান ও কাশ্মীরী পণ্ডিত। ইহারা উভয়েই এক আখ্যাজাতি-সমূহ।



কাশ্মীরী পণ্ডিতের পরিবারমণ্ডলী—দেবপূজাস্তে গৃহীত চিত্র।

পূর্বে যে কাশ্মীরী মুসলমানগণ ও পণ্ডিতগণ একজাতিরই অন্তর্গত ছিল এখন তাহা তাহাদের নামের উপাধি হইতে অনেকটা বুঝা যায়—জম্মুর গভর্ণরের নাম বাবু নরেন্দ্রনাথ কউল; ইনি একজন হিন্দু পণ্ডিত। মুসলমানদিগের মধ্যেও অনেককে কউল উপাধিধারী দেখা যায়। কাশ্মীরী পণ্ডিতানদিগের মুখশ্রী মোঙ্গলীয় ছাঁচের; তাতার ছাঁচও ছুঁপা নহে; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে আদিম আর্য-উপনিবেশীরা স্থানীয় মোঙ্গল ও তাতার জাতীয় রমণীদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারই চিহ্ন কতকালে এখনো স্পষ্ট রহিয়াছে।

কাশ্মীরী পণ্ডিত ও কাশ্মীরী মুসলমানদিগের মধ্যে বহিরাবৃত্তিতে বিশেষ কিছু পার্থক্য না থাকিলেও পণ্ডিতেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে তাহাদের মুসলমান ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও অধিকতর সুন্দর দেখায়। এখানকার মুসলমান অধিবাসিগণ বড়ই

অপরিষ্কার। সে কারণে বোধ হয় তাহাদের মুখাবৃত্তিতে অপরিষ্কার ও বুদ্ধিহীনতার ভাব দৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরে পণ্ডিতদের এখন জীবিকা উপার্জন করা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নক্ষর সম্বলহীন পণ্ডিতগণও হাতের কাজ করিয়া বা অথকোন রূপে খাটিয়া খাইতে রাজী নহে। সামান্য জমী জমা থাকিলেও তাহা মুসলমানগণের দ্বারা চাষ করাইয়া লয়, নিজেরা কখন কোন কাজে হাত দেয় না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক বাহারী সংস্কৃত পাঠ পূজা বা জ্যোতিষ চর্চা করিয়া কোনো মতে জীবিকা উপার্জন করে তাহারা ছাড়া বাকী পণ্ডিতদের অবস্থা সচ্ছল নহে। লেখাপড়ার চর্চা নাই বলিলেই হয়; কাজেই কাশ্মীর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কর্মচারী সবই প্রায় বিদেশী। ক্রমশঃ লোকের চৈতন্য হইতেছে।

যদিও কাশ্মীরের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান ও তাহার উপর প্রায় চারিশত বৎসরের উপর



কাশ্মীরী পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ।

হিন্দু-দেবী মুসলমান নরপতিদিগের অধীনে ছিল, তবুও কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ এখনও হিন্দু ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি মানিয়া পালন করিয়া চলে। পণ্ডিতেরা মাথায় হিন্দুপদ্ধতিতে পাগড়ী বাঁধে ও কপালে রক্তচন্দন ও জাকরানের তিলক পরে ও অপেক্ষাকৃত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া শ্রীনগরের অসংখ্য মুসলমান জনসমুদ্রের মধ্য হইতে একজন হিন্দুপণ্ডিতকে চিনিয়া লওয়া খুবই সহজ।

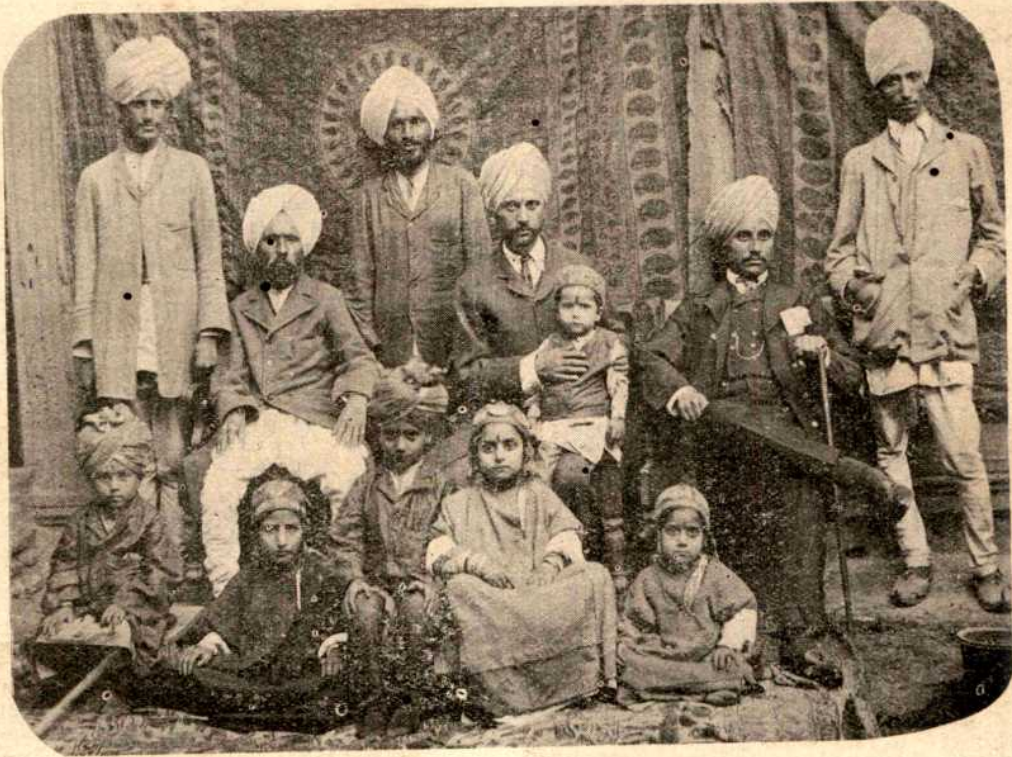
শ্রীনগরের হাতেকাদাল একটি হিন্দু পল্লী। এইস্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের নিবাস বলিয়া এইস্থানের প্রভাতকালটি বড়ই মনোরম। তখন দেখিতে পাওয়া যায় স্থূঁয়া উঠিবার পূর্ব হইতেই হিন্দু নরনারী দলে দলে স্নান করিতে চলিয়াছে। কেহ বা স্নান করিয়া পূজার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে ঘরে ঘরে স্নগন্ধি ধূপ জ্বালাইয়া শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির সহিত বেদপাঠ হইতেছে। সেই মৌরভ ও সেই ধ্বনিতে জড়াইয়া তখনকার দৃশ্য



কাশ্মীরী পণ্ডিত পুজারী।

বড়ই মধুর বলিয়া মনে হয়। বেলা যত বাড়িতে থাকে ক্রমশঃ নগরের কোলাহল জাগিয়া উঠে। বেদ পাঠের মধুরধ্বনি আর শোনা যায় না। অসংখ্য মুসলমান-জনসমুদ্রের মাঝে পণ্ডিতদের তখন আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ যেন সকলে যে-যার আপনার ঘরে লুকাইয়া পড়িল বলিয়া মনে হয়।

কাশ্মীরী হিন্দুদিগের মধ্যে ক্ষেত্রী বলিয়া একটি শ্রেণী আছে। পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ক্ষেত্রী, বোরা ও পণসারী



কান্দীরী পণ্ডিত—আধুনিক ধরণের পোষাক।

বলে। কিন্তু আকারে ও আচারে ইহাদের সহিত পণ্ডিত-দের বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

পণ্ডিত ও পণসারীদিগের মধ্যে চালচলন বা আকৃতি ও পরিচ্ছদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। ইহারাও পণ্ডিত-দিগের মত হিন্দু-ক্রিয়াকর্ম করে। প্রায় সকল মুদীর দোকানগুলি ইহাদের বলিয়া ইহাদিগকে পণসারি বা পসারি বলে। ইহারাই দেশের ব্যবসাদার। এক একজন করিয়া ধরিলে ইহাদের অবস্থা পণ্ডিতদের চেয়ে ভাল। পণ্ডিতেরা ব্যবসাদি করা বা জমীজমা দেখা বড়ই স্বণাজনক মনে করে। ইহাই ইহাদের আর্থিক অবনতির কারণ। কিন্তু স্বথের বিষয় এখন তাহাদের মতের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। এখন ছ একজন পণ্ডিতকেও ব্যবসা করিতে দেখা যাইতেছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে কান্দীরী পণ্ডিতেরাও সময়ের সহিত চলিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

কেবলমাত্র একটি লম্বা পিরান কান্দীরী পণ্ডিতদের ও পণসারীদের প্রধান পরিচ্ছদ। মুসলমানগণ ও আধুনিক ধরণের হিন্দুরা ইহার সহিত পায়জামা পরে। কিন্তু পুরাতন

ধরণের পণ্ডিতেরা কেহই পায়জামা পরে না, ধুতি পরে। আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত লোকেরা বিলাতী পোষাকও পরিতেছে। সম্ভ্রান্ত জ্বীলোকেরাও পার্সী বা ব্রাহ্ম ধরণে শাড়ী পরিভে আরম্ভ করিয়াছে। তবে সাধারণ জ্বীলোকের পোষাক এখনো সেই লম্বা পিরানই আছে।

ছবিগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহারা কত বড় লম্বা ঝুলওয়ালা পিরান পরে। এই পিরানের হাতাগুলিও হাতের চেয়ে বেশী লম্বা। খাজদ্রব্যাদি ধরিতে হইলে পিরানের হাতাটি হাতের উপর টানিয়া দিয়া, হাতের আঙ্গুলগুলি হাতাটির দ্বারা ঢাকিয়া জামার আঙ্গিনে করিয়া খাজদ্রব্যাদি ধরিয়া মুখে দেয়। নগ্নহস্তে খাজদ্রব্যাদি স্পর্শ করা বা মুখে দেওয়া ইহাদের মতে অহিন্দু আচরণ, তাহাতে খাজদ্রব্যাদি কলুষিত হইয়া যায় বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। অতের উচ্ছিষ্ট বহুসংখ্যক চায়ের পিয়লা একে একে ঐরূপভাবে আঙ্গিনের নীচে আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া সরাইয়া সরাইয়া নিজের পেয়লা ঐরূপভাবে ধরিয়া চা বা কুলচা নামক বিষ্কট খাইতে ইহারা বিধা বোধ করে না।



কাশ্মীরী ক্ষেত্রী।



কাশ্মীরী পণ্ডিতানী।

এইরূপ ভাবে জামার আস্তিন বা কাপড়ের সংস্পর্শে অল্প জিনিষ আসিলে তাহার সকল দোষ কাটিয়া যায় বলিয়া একখানি শাল বা মোটা কব্বলের উপর বসিয়া বা শাল কব্বলের উপর থালা রাখিয়া পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের জাতির সহিত এক সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে আপত্তি বোধ করে না। শাল বা কব্বলখানি থাকার দরুণ ইহাতে আর কোনও দোষ থাকে না। এই থানা-থাওয়া শাল বা কব্বল করিন কালেও কাটা হয় না।

কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে আবার কতকগুলি পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ আছেন। ইহারা পূজাদি সম্পন্ন করেন ও সকলে ইহাদিগকে গুরু মতো ভক্তি করে।

এই পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদিগের যজমান বা শিষ্যেরা “নমস্কার” বলিয়া প্রণাম করে। গুরুও “জয়কার” অর্থাৎ জয় হউক বলিয়া আশীর্বাদ করেন। এখানে বয়সে বড় বা পূজনীয় লোকদিগকেও “নমস্কে” বা “নমস্কার” বলিয়া অভিবাদন করা হয়। তাহারা প্রত্যুত্তরে “ওরজু” (ওর-জীব) বা

জীবন বুদ্ধি হোক বলিয়া আশীর্বাদ করেন। বহুবাহুব ও সমবয়স্কদিগের মধ্যে “বন্দেগি” বলা প্রথা। বন্দেগির প্রত্যুত্তরে বন্দেগি বা জীন্দেগি বলে। জীন্দেগি মানেও জীবন বাড়ুক।

পণ্ডিতগৃহে পুত্র জন্মান বড়ই আনন্দের। পণ্ডিত-বধু অন্তঃসত্ত্বা হইলে পর পঞ্চম বা সপ্তম মাসে বধুর পিতৃগৃহ হইতে গহনা কাপড় ও ছুধের তত্ত্ব পাঠাইতে হয়। ভাবী সম্বানের নিমিত্ত শুভভুক্ত সঞ্চয়ের হুচনা করিয়া ছুধ পাঠান হয় বলিয়া এই তত্ত্ব ছুধ বড়ই প্রয়োজনীয়। এই তত্ত্বটিকে দ্বয়ন (দোহদ ?) বলে।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয়স্বজনকে সেই সংবাদের সহিত প্রস্থতির পিতৃগৃহ হইতে প্রাপ্ত বাদাম পাঠাইতে হয়। পঞ্চম দিনে আত্মীয়স্বজনদিগের মধ্যে তিলের লাড়ু বিতরণ করা হয়, ইহাকে তাহারা ক্রই বলে। সপ্তম দিনে পুত্রকে



কান্দীয়া পণ্ডিত বর—পূর্ণসজ্জায়।

জ্ঞান করান হয়, সেই দিন পুত্রের পিতা নূতন পোষাক পরিয়া স্বভাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে ভোজন করায়।

শুভাশৌচ বা সূতিকাগৃহ-নিবাস-কাল পণ্ডিতদিগের মধ্যে দশ দিন। সেই দিন শুদ্ধীকরণ হয় ও জাফরান-রঞ্জিত ভাত আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ান হয়। তাহার পর-দিন নামকরণ হয়। মন্ত্রপাঠের সহিত যজ্ঞ ও হোম হয়। সেদিনও একটি ভোজ হয়।

এক হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে একটি দিন স্থির করিয়া পুত্রের জড়কাশ বা কেশ কর্ত্তন হয়। সেই দিন বালকের চুল ছোট করিয়া কাটিয়া মাথায় পাঁচটি শিখা রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কান্দীয়া বালকদিগকে অত্যন্ত

কুৎসিত দেখায়। কত্থার বেলায় কিন্তু চুল ছোট না করিয়া চুল সুন্দরভাবে বিকশিত করিয়া দেওয়া হয়। সেদিনও সন্তানের শুদ্ধির জন্ত হোম করা হয় ও পুত্র বা কন্যাকে নূতন পোষাক পরান হয়।

পাঁচ হইতে বার বৎসরের মধ্যে পুত্রের উপনয়ন হয়। উপনয়নের তিনদিন পূর্বে হইতে সমস্ত গৃহ সজ্জিত ও পরি-ষ্কার করা হয়। সেইদিন হইতে রমণীগণ প্রত্যাহই শুভসঙ্গীত গাহিতে থাকে। এই রমণীদিগকে মঙ্গলমুখী বলে। প্রথম দিনে বালকের হস্তপদ মেথিপাতায় রাঙান হয় ও দ্বিতীয় দিনে দীবাগোন বা গৃহদেবতার পূজা করা হয়। সে দিন ব্রহ্মচারী মাতুলগৃহ হইতে প্রাপ্ত পোষাক পরে ও সেইদিন নিমজ্জিত আত্মীয়স্বজনেরা পুত্রের পিতাকে একটি করিয়া বজ্রমুদ্রা উরবল বা উপহার দেয়। তৃতীয় দিনের দিন যাগযজ্ঞ হয় ও সেইদিন ব্রহ্মচারী প্রথম উপবীত ধারণ করে। তাহার পর নবোপবীতধারী ব্রহ্মচারী আত্মীয়স্বজনের নিকট ভিক্ষা করিতে যায়। কেহ বা গহনা কেহ বা পরিধেয় ভিক্ষা দেয়। গহণাগুলি মন্ত্রদাতা গুরু পান। কাপড়গুলি ব্রহ্মচারীরই থাকে। এইদিন হইতে ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাহ প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে একবার করিয়া গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। এক্ষণে ব্রহ্মচর্যা নামসার হইয়াছে।

উপনয়নের মতো বিবাহের ক্রিয়াদিও বিবাহের পূর্বে হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতেও প্রথম দিনে মেথিপাতা রাঙান ও তাহার পর দিন উরবল হয়। তৃতীয় দিনের দিন বর বরযাত্রীর বরাত বা মিছিল লইয়া কত্থাগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে। শ্রীনগরে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা বলিয়া নগরে নৌকা করিয়া বর যায়। বরের নৌকায় নর্ত্তকীদের নাচ গান হয়। মফঃস্বলে বর ও বরযাত্রীগণ প্রত্যেকে এক একটি ঘোড়া ঘোগাড় করিয়া তাহাতে চড়িয়া যায়। বরকে ঢল্‌হা বলে। তাহাকে চোগা, পাগড়ীর সম্মুখে ডেকাটিক নামক বড় তিলকের মতো সোনার গহনা, ও পাগড়ীর উপর কলঙ্গ পাখীর পালক পরিতে হয়। পূর্বোক্ত তিনটি জিনিষ বরের পোষাকের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, এ তিনটি বরের পরা চাই-ই। কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত কান্দীয়া বিবাহে চারিজন বর বিবাহ করিতে যাইত; কিজানি মানুষের ক্ষণভঙ্গুর শরীরগতিকের



কাশ্মীরী বর ও বধু।

কথা তো বলা যায় না—এক বর মারা গেলে পর পর চতুর্থ বর মজুদ আছে, কতটা অল্পপূরী হইবে না। প্রধান বরকে বলিত জুল্হা বা মহারাজ ; দ্বিতীয়, পুত্র মহারাজ ; তৃতীয়, শাগাজী বা মিতবর ; চতুর্থ মোরছল-বরদার বা ময়ূরপুচ্ছের চামরধারী। বর বরযাত্রীদের সহিত কত্যাগৃহের দ্বারদেশে পৌঁছিলে পর কত্যাগৃহের রমণীগণ গান করিতে আরম্ভ করে এবং বরের পিতা কত্যাগৃহের দ্বার পূজা করিয়া কত্যাগৃহে প্রবেশ করে। তাহার পর কলস পূজা হয়।

বরপক্ষীয়েরা কত্যাগৃহে উপবেশন করিলে পর প্রথমে তাহাদের সকলকে চা পান করান হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরে চাঁদোয়া-ঢাকা একটি খোলা জায়গায় তাহাদের সকলকে অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি সহ ভাত খাওয়ান হয়। সুন্দরভাবে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে কাশ্মীরীগণ সিদ্ধহস্ত। পুরি বা লুচি খাওনের

প্রথা এখানে নাই। কাশ্মীরী-গণ সন্দেশ প্রস্তুত করিতে জানে না।

পণ্ডিতগণ মাংস, বিশেষতঃ ভেড়ার মাংস, খাইতে বড় ভালবাসে। পূর্বে অন্ততঃ এক শত ভেড়া না বধ হইলে কোনও পণ্ডিতের বিবাহভোজ ঠিকমত সম্পন্ন হইত না। তখন মাংস খাইবার জন্ত বর-যাত্রীর সংখ্যাও অনেক হইত, এমন কি অনেক অনিমন্ত্রিত ও অনাহূত ব্যক্তি পর্য্যন্ত পথ হইতে মাংসের লোভে বর-যাত্রীদের সহিত জুটিয়া যাইত। তখন তাহাদের মধ্যে নিজে কম মাংস পাইয়াছে ও তাহার পাশের লোক বেশী মাংস পাইয়াছে বলিয়া প্রায়ই কথা কাটাকাটি হইত এবং তখন সত্যি হউক বা কাল্পনিকই হউক একরূপ কারণে অপমানিত

বোধ করিয়া বরযাত্রীদের সহিত কত্যাগৃহীয়দের মনো-মালিন্য ঘটিত। এইজন্ত বিবাহভোজে এখন আর মাংস খাওয়ান হয় না। এখন কেবলমাত্র নিরামিষ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাওয়ান হয়। খাওয়াদাওয়া শেষ হইলে পর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে নানা প্রকার প্রেম-ভক্তি করুণ-বীর-রসপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গান শোনান হয়। এইরূপ আমোদ আত্মানন্দে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়।

পরদিন প্রভাত হইতে বিবাহের ক্রিয়াদি আরম্ভ হয়। কত্যা গলরঙের শালে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্দাঙ্গ ঢাকিয়া বরের সহিত হোমাগ্নির সম্মুখে দাঁড়ায়। কত্য়ার মাতুল তখন কত্যাকে ধরিয়া থাকে। পুরোহিত চার পাঁচ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত বেদ হইতে সংস্কৃত শ্লোক ও মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন ও মাঝে মাঝে অগ্নিতে আহুতি দান



কান্দীরী বিবাহভোজ ।



কান্দীরী বর ও বরযাত্রী অভ্যর্থনার জন্ত নদীতীরে কল্যাণক ও দর্শকের সমারোহ ।



কাশ্মীরী রমণীর বেল্লীবন্ধন।

করেন। এইরূপে হোমাগ্নির সন্মুখে অগ্ন্যাত্ত ক্রিয়াদি শেষ হইলে বিবাহ শেষ হইয়া যায়। তাহার পর উভয় পক্ষীয় পুরোহিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া নবদম্পতিকে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া আশীর্বাদ করে। শ্লোকগুলি পূর্ব-কালের আদর্শ নরনারীর চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ বিবৃত করিয়া রচিত। সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বাদ শেষ হইলে পর অবশেষে কাশ্মীরী ভাষায় কথাকে—“তুমি সীতার মতো হও” ও বরকে “তুমি রামের মতো হও” বলিয়া আশীর্বাদ শেষ করে। রাম ও সীতার আদর্শ ইহাদের নিকট সবচেয়ে মহান।

ইহার পর কন্যা লালশালের সেই বিবাহবেশ পরিত্যাগ করিয়া বধূবেশ পরিধান করে। তাহার পর আত্মীয়স্বজন ও পিতামাতার নিকট হইতে অশ্রুজলে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিবাহের সমস্ত যৌতুক ও উপঢৌকনাদি সঙ্গে লইয়া স্বামীর সহিত স্বামীগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

দিদি

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেদিন আর সুরমা চাকর নিকটে ঘেসিল না। বৈকালে চাকর ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে বলিল “কই দিদিতো সমস্ত দিনেও এলেন না! তুমি তাঁকে একবার ডাক্তে পাঠাও না?”

“কেন, তোমার কি কিছু অসুবিধা হচ্ছে চাকর? আমি তো আজ সমস্ত দিন বাইরে যাইনি। এইখানেই আছি। কি চাই বল না?”

চাকর বিষম অপ্রস্তুত হইয়া বলিল “না তা না, চাইনে তো কিছু।”

“একখানা বই টট কিছু পড়ব।”

“না, তুমি এমনি গল্প কর।”

রাত্রে চাকর জ্বর ছাড়িয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চাকর বেশ ঘুমাইল। প্রভাতে অমরনাথ বলিল “আর তো এখন কিছু অসুখ নেই? এই বইখানা নিয়ে পড় শুয়ে শুয়ে। আমি বাইরে চললাম। দশটার সময় এসে আর একটা পিল দেব। কিছু অসুখ কল্লো ডেকো।”

চাকর অভিমান করিয়া বলিল “আমি বুঝি কাল তোমায় সমস্ত দিন ধরে রেখেছিলাম? যাওনি কেন বাইরে? আমি তো ডাকিনি।”

চাকর অভিমান-ফুরিত গণ্ডে একটু মুছ টোকা মারিয়া অমরনাথ চলিয়া গেল। চাকর শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পারিল পড়িল। আর মধ্যে মধ্যে এক একবার সচকিত ভাবে দ্বারের পানে চাহিতেছিল যদি কেহ আসে।

বহুক্ষণ পড়িয়া কেমন মাথা ব্যথা করিতে লাগিল। তখন পুস্তক ফেলিয়া চাকর চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

নিকটে কেহই নাই। যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে একবার ডাকিল ‘দিদি’। কেহ আসিল না। অভিমানে চারুর চোখে জল ভরিয়া উঠিল।

বিন্দি ঝি কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল “ছোটবোদি, ডাকছ? বালি কি এখন এনে দেব?” চারু একটু বিস্মিত হইল, কেননা ঝিদের এত কর্তব্যবুদ্ধি এতদিন তো কই দেখা যায় নাই। বলিল “আমি বালি খাবনা।”

“খাবে না সেকি? না খেলে কি হয়! আনি গে।”

“না আমি খাব না। যাও তুমি, আমার কাছে কাউকে আসতে হবে না।”

অপ্রস্তুত ও রুষ্ট ভাবে ঝি চলিয়া গেল। চারু বইখানা আবার টানিয়া লইয়া পড়িতে গেল, পারিল না, বড় মাথা ব্যথা করিতেছিল। এক হাতে মাথা টিপিতে টিপিতে অগ্ৰ হাতে বই খুলিয়া চারু পড়িবার চেষ্টা পাইতে লাগিল; একা সে যে থাকিতে পারে না। “মাথা ধরেছে তাও বই পড়া হচ্ছে?” চারু সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিল গৃহমধ্যে বালির বাটা হাতে করিয়া প্রসন্নহাস্তে শোভাস্বিতা সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিবামাত্র চারুর অভিমান হৃদমনীয় হইয়া উঠিল। বইখানা ছুই হাতে ধরিয়া তাহার অন্তরালে যথাসাধ্য মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

“আবার বই পড়ছ? রেখে দাও। ওতেই আরও মাথা বেশী ধরে।”

চারু পূর্ববৎ রহিল। সুরমা ব্যাপার বুঝিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া বলিল “রাগ হয়েছে বুঝি? বালিটুকু খাও দেখি।”

“না, আমি খাবনা।”

“আর বাগে কাজ নেই। ওঠ, জুড়িয়ে হিম হয়ে যাবে। ওঠ—”

চারু উঠিয়া বসিয়া ভাল ছেলের মত সুরমার আজ্ঞা পালন করিল। মুখের জলটা মুছাইয়া দিয়া সুরমা তাহার পানে চাহিয়া সম্নেহ হাস্তে বলিল “এত রাগ করেছিলে কেন? কি হয়েছে?” চারু মুখ ভার করিয়া রহিল।

“বলবে না?”

“কাল সমস্ত দিন তুমি আসনি কেন!”

“ওঃ এই জন্তে? আমি বলি না জানি কি।”

সুরমাকে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিতে দেখিয়া চারুর অভিমান আরও বাড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ডাগর চক্ষে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সুরমা দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত কণ্ঠে বলিল “সত্যি সত্যি কাঁদলি চারু?”

চারু মুখ সরাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বিস্ময়ের কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সুরমা জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া পালকে চারুর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অগ্ৰমনস্তভাবে তাহার উজ্জ্বল আয়ত চক্ষে গবাক্ষপথে চাহিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহা সেই বলিতে পারে। একবার অশ্রুটকণ্ঠে বলিল “এমন কিন্তু কখনও দেখিনি,—ভাবতেও পারিনি।”

অনেকক্ষণ অতীত হইল। কেহ কাহারো সহিত কথা কহিলনা। চারু কয়েকবার চাহিয়া চাহিয়া দেখিল সুরমা স্নান গম্ভীর মুখে গবাক্ষপথে চাহিয়া আছে। তাহার মনে হইল নিশ্চয় দিদি রাগ করিয়াছে। ধীরে ধীরে নিকটে সরিয়া গিয়া মুহূর্ত্তে ডাকিল “দিদি।”

অগ্ৰমনস্তভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া সুরমা উত্তর দিল “কেন?”

“রাগ করলে দিদি?”

সুরমা মুখ ফিরাইয়া উজ্জ্বল চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল “কেন কব্ব না? আমাকে এরকম অপদস্থ করা কি তোমার উচিত? তোমার কি একটু বোঝা উচিত নয়? তোমার এ কী ছেলেমানুষী—এ কী খেলা? আমি তোমার কে তাকি তুমি জান না? আমাকে—” সহসা সুরমার উদ্বেজিত স্বর থামিয়া গেল। দেখিল চারুর স্নান মুখশ্রী একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে; ভীত হর্কল চারু একহাতে খাটের রেলিং চাপিয়া ধরিয়া অগ্ৰ হাতে সুরমারই স্বন্ধ অবলম্বন করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরমা তাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল। পাখা লইয়া ত্রস্তে বাতাস করিতে করিতে ভীতকণ্ঠে ডাকিল “চারু, চারু!”

চারু ক্রমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। চোখ বুজিয়া উত্তর দিল “দিদি।”

“আমি বড় খাবাপ লোক। আব ব'ব না, চাক!

আব তোমায় কিছু বলব না।”

বালিকার মত ছুকরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া চাক বলিল—

“তুমি কেন রঙ্গ করলে দিদি? আমি তো কোন দোষ করিনি।”

চাকর চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে কঙ্করবে সুরমা বলিল,
“চুপ কর—চুপ কর দিদি।—তোমার দোষ? দোষ তোমার
কাছে কখন হেসতেও পাবেনি বোধ হয়। দোষ আমার,—
আর কার বলব? নইলে তোমার সঙ্গে আমার এ
সম্বন্ধ কেন হ'ল।”

“কি সম্বন্ধ দিদি?”

“কিছু না। তুই এখন একটু ঘুমো দেখি।”

“ঘুমলে তুমি উঠে পালাবে না?”

“না। তোব সঙ্গে আমার কিছুদিন থাকাব দবকাব
দেখছি। তোব কাছে থাকলে আমার মনেব এ কয়লাব
কালোও বোধ হয় কঁসা হয়ে উঠবে। যত দিন তা না
হয়—তাকে আমি একটা কথা বলব তা রাখিস যদি তবেই
আমি সব সময় তোব কাছে থাকব—বল রাখিবি?”

“রাখিবি।”

“নিশ্চয়?”

“নিশ্চয়।”

সুরমা একটু থামিয়া একবার নিজেকে সামলাইয়া
লইয়া বলিল “কখনো স্বামী—তোর স্বামীর কাছে আমার
সম্বন্ধে কোন কথা গল্প করতে পাবি নে।”

“তোমার সম্বন্ধে কি কথা?”

“যে কথাই হোক না কেন, যাতে আমার সংশ্রব আছে।

যেমন, আমি তোর সঙ্গে কি কথা কই, কি ব্যবহার করি,
কখন তোর কাছে আসি, বা তুই কখন আমার কাছে
থাকিস। এই সব?”

চাক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল “কেন দিদি?”

“সে যে জন্তেই হোক না—তুই এখন আমার কথা
রাখিবি কি না?”

নিভান্ত ক্ষুব্ধস্বরে চাক বলিল “আচ্ছা।” তার
পরে একটু ভাবিয়া বলিল “যদি তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা
করেন?”

সুরমা বলিল “কখনো তা জিজ্ঞাসা করেছেন কি?”
বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চাক ভীত ভাবে বলিল “না।”

“তবে কখনো করবেন না। যদি কখনো কবেন তো
তখন যা করা উচিত তা ভেবে দেখা যাবে। যাক এখন
শুয়ে শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি। আমি এখন
যাই।”

চাক ব্যস্ত ভাবে বলিল “না দিদি, ব'স না কেন।”

“তোব বব যে এখনি আসবে।”

“তা এলেনই বা।”

“এই বুঝি তোমার এতক্ষণ ধবে বোঝালাম? ঐ বুঝি
আসছেন।”

চাক ব্যস্তভাবে বলিল “যদি জিজ্ঞাসা কবেন কাছে
কে ছিল?”

সুরমা অস্ত্র কক্ষেব দ্বার উদ্বাটন করিয়া মুহূর্ত্তে বলিল
“বলিস্ বিন্দি। না হয় কিছু বলিস্ নে—সে জিজ্ঞাসা
করবে না।”

“যদি করেন—ওদিদি—বলে যাও—দিদি—”

দিদি ততক্ষণ সে মহল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অমর-
নাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল “কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে—
বিন্দির সঙ্গে বুঝি?”

চাক নীরবে রহিল। ভয় হইল, যদি স্বামী পুনর্বার
জিজ্ঞাসা করেন?

“কেমন আছ? মাথাটাখা ধরেনি তো আর?” বলিতে
বলিতে অমরনাথ তাহার শীতল ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল।
“না বেশ ঠাণ্ডা আছে।” একটা পিল লইয়া অমরনাথ
চাককে সেবন করাইয়া বলিল “আমি এখন নাইন্ডে
যাচ্ছি। বিন্দিকে ডেকে দিয়ে যাব নাকি?”

অমরনাথ বেশী তথ্যসন্ধান না করায় মুক্তিব নিশ্বাস
ফেলিয়া চাক বলিল—“বিন্দি ঝিকে?—আচ্ছা দাও।”

অমরনাথ চলিয়া গেলে অনতিবিলম্বে বিন্দি গুরুর
বৃন্দাবলী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। “বাতাস করব কি
বৌদিদি?”

“না—তুমি ব'স। আমি গল্প করব। দিদি কোথায়
গেলেন জান?”

“রাশ্রাবাত্তীর দিকে গেছেন হয়ত।”

“কখন আসবেন?—তুমি ততক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প কর না।”

“কি গল্প বলবে? শোলোক?”

“না। তোমাদের দেশের গল্প কর।”

“আমাদের দেশের কিই বা গল্পের মত আছে বৌদিদি। তার চেয়ে তোমাদের কলকাতার গল্প কর। তুমি কলকাতার মানুষ—এখানে কি মন বসে না ভাল লাগে?”

“না বিন্দু ঠাকুরি—কলকাতার চেয়ে আমার এইখানেই ভাল লাগে। সেখানে আর কেইবা ছিল—সেখানে ভাল লাগবার মত কিছুই ছিল না—”

“ওমা সেকি—এই বলে মস্ত সহর—তা মানুষ নেই? এই আমাদের এখানে কত বউ কি সব দোপোব বেলায় বড় বৌদির কাছে আসত—গল্প করত—তাস খেলত।”

“কই আমি এসে তো কিছুই দেখতে পাইনে? আর বুঝি তারা আসে না?”

“আর কাব কাছে আসবে। যার কাছে আসত তিনি আর ওসবে মেশেন না কাজেই আসে না।”

“কেন, মেশেন না কেন? তুমি তাদের আসতে ব’লো আমি স্নান দিদির সঙ্গে তাদের সঙ্গে বসে খেলা করব—তারা আসবেনা?”

বিন্দি ঘাড় কাত করিয়া বলিল “আসবে বই কি—বল্লেই আসবে।”

“দিদিকে তোমরা খুব ভালবাস, না? তিনি আমার ভারি আদর করেন, কত ভাল বাসেন—তিনি বড় ভাল লোক—না ঠাকুরি?”

বিন্দি তখন সাড়ম্ববে আরম্ভ করিল—“বড় বৌদির কথা বলছ ছোট বৌদি। ওঁর বা কতটুকুই তোমরা জান, আমরা ওঁকে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেছি—সেই থেকে ওঁর বুদ্ধি বিবেচনা দয়ার কথা কত বা একমুখে বলবে। কর্তাবাবুর তো উনি প্রাণ ছিলেন, তিনি ‘মা’ ‘না’ করে একেবারে গলে যেতেন। ওঁরই কর্তাবাবুকে বা কত ছেঁকা ভক্তি, ঠিক ছেলের মতন যত্ন করা—এমন কেউ পারবে না—” ইত্যাদি ইত্যাদি বহুক্ষণ চলিতে লাগিল। চাকরও মাঝে একান্ত মনোযোগের সহিত তাহার সুদীর্ঘ

বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিতে লাগিল। সুরমার কখনো শাস্ত স্নিগ্ধ স্নেহপূর্ণ, কখনো তীব্র তেজঃপূর্ণ নিতান্ত নিঃসম্পর্কের মত, ব্যবহার মধ্যে মধ্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। কখনো তাহাকে দেখিলে—তাহার উদার একান্তসহানুভূতিময় ব্যবহার, স্নেহকরণার উৎসের জ্বালা মুখ ও স্নেহকণবর্ষী আয়ত চক্ষু দেখিলে তাহাকে নিতান্ত আপনায় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদেব মত জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে; আবার কখনো তাহার গভীর অস্বাভাবিক জ্যোতিপূর্ণ চক্ষু দেখিলে অকাবণেও ভীত হইয়া পড়িতে হয়। এ প্রেহেলিকা চাকর নিকট অত্যন্ত নূতন। একটা মানুষ যে কখনো কখনো এমন পরিবর্তিত হইতে পারে ইহা তাহার সংস্কারের অতীত। রাগ বা অসন্তুষ্ট হইলে লোকে বড়জোর মুখ ভার করিয়া পাশ ফিরিয়া বসে এই পর্য্যন্ত তাহার বিশ্বাস। রাগ না হইলেও লোকে যে কিরূপে এত গভীর হয় এবং গভীরই বা কেন হয় ইহা তাহার বুদ্ধির অতীত। সুরমাকে অমরনাথের পবই পৃথিবীতে একমাত্র আপনায় বলিয়া তাহা ধারণা হইয়াছে এবং তাহার মত সরলা এবং সাংসারিকবুদ্ধিলেশমাত্রহীনাব এ ধারণা হওয়াও স্বাভাবিক, কেননা সে ইতিপূর্বে মাতা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনও কখনো দেখে নাই বা তাহাদের ভালবাসাও কখনও পায় নাই। সুরমাকে দিদি জানিয়া মাণিকগঞ্জে আসিবার সময় হইতে তাহার স্নেহাকাজী মন তৃপ্তিত হইয়াছিল। তাহার পরে স্বপ্নের সম্মুখে আত্মীয়দের সঙ্গে সুরমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করার সেও একান্ত বিশ্বস্ত চিত্তেই সুরমার উপরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। চাকরের সেখানে পদার্পণ করার পরে সুরমার ব্যবহারে ও স্বপ্নের প্রতি ক্রান্তিশূন্য আন্তরিকতাপূর্ণ যত্নে চাকর নিকটে সুরমা সত্যই দেবীর আসনে বসিয়াছিল। সুরমার প্রতি স্বপ্নেরও প্রকাণ্ডক বাক্যে চাকর সে ভক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। একরূপ দৃষ্ট চাকর নিকট অত্যন্ত নূতন। এই কার্যকুশলা, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, করুণাময়ী যে তাহার আপনায় কেহ ইহা মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত জ্বালাদ হইত। তাই সময়ে সময়ে কাজে কাজে কারণে অকারণে বড় আনন্দে সে ডাকিত ‘দিদি’।

তাহার গরে খণ্ডের দেহান্তে সুরমার ব্যবহারে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একি। কাল যে এমন সম্মেহ ব্যবহার কবিয়াছে, আজ তাহার একি পরিবর্তন? কিসে এমন হইল ভাবিয়া চাক আকুল হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে স্বামীকে সে তার দ্বিজ্ঞাসা কবিত, স্বামী গভীর মুখে বসিয়া থাকিতেন। চাক অগত্যা নীবব হইয়া পড়িত এবং সুরমার নৈদাঘ মেঘেব মত মুখকান্তি দেখিয়া তাহার নিকট আগ্রসন্ন হইতেও সাহস হইত না।

আজ চাক তাই তাহার দিদিকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সুরমার অত্ৰকার ব্যবহারও তথিকতব নূতন, এতখানি মেহ যে তাহার মধ্যে আছে ইহা যেন চাকও আর আশা করিতে পারিতেন না। তাই তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিতেও তাহার অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হইতেছিল। বিন্দিব মুখে তাহার খণ্ডের সমরকার সংসারের সমস্ত অবস্থা ও কার্য্য শুনিতে শুনিতে তাহার মানস নেত্রে যে একটা স্বন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল সে চিত্র শুধু স্তম্ভময় শক্তিপূর্ণ তনাবিল স্নেহমাখা। চাক জানে পিতাকে দেখে নাই এবং কল্পাস্নেহ বা পিতাকে কতখানি ভালবাসা যায় তাহাও জানেনা, তাই এই চিত্র তাহার বড় ভাল লাগিল। সবার এই চিত্রের মধ্যে সুরমাই যেন প্রধান নায়িকা। চাক গর্বে, আনন্দে, উৎফুল্ল হইয়া বলিল “দিদি আম রও খুব ভালবাসেন বিন্দু ঠাকুরি।”

সেই সবরে অমরনাথ কক্ষে প্রবেশ করায় চাক মাথার কাপড় টানিয়া দিল। অগত্যা বিন্দি দাসী বাক্যপ্রোত বন্ধ কবির ও বাজানী রাখিয়া উঠিয়া গেল। অমরনাথ সহাস্ত মুখে বলিল—“এত গল্প হচ্ছে কিসের? বিন্দুর সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছ দেখছি যে।” চাক উৎফুল্ল মুখে সাগ্রহে বলিল “আমরা দিদির গল্প কচ্চিলাম।” অমরনাথ একটু নীরব হইল। বারে বারে একজনের কথা সন্মুখে উত্থাপিত হইলে সব কথার মধ্যে উদাসীন থাকাও যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমরনাথ বলিল—“গল্প কন্সবার মত এমনি কথা নাকি?”

“সে গল্প নয়। এমনি এও তার কথা। দিদি বড় ভাল লোক, নয়?”

অমরনাথ মুছ হাসিয়া বলিল “আমি তা কেমন করে জানব?”

“সবাই জানে আর তুমি তা জাননা? দিদিকে সবাই খুব ভালবাসে। বাবা ভাবী ভাল বাসতেন দিদিকে তিনি মা বলে ডাকতেন।”

অমরনাথ একটু নীরব থাকিয়া মুছস্বরে বলিল “তা জানি।”

“দিদির বাবা দিদিকে কতবার নিতে এসেছেন তা বাবার কষ্ট হবে বলে, আর পাছে সংসার চিশ্জল হয় বলে তিনি ছুদিনের জন্তেও কোথাও যেতেন না।”

অমর অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু হাসিয়া বলিল “আমি বলি না জানি কত নিরীহ দৈত্য দানবদের ঘাড়ের বত আঁজগুবি কাণ্ডের দায়িত্ব চাপিয়ে কত নতুন নতুন ঘটনাই শুদ্ধ—”

চাক সে কথা কানে না তুলিয়া পূর্ব্বের মত বলিয়া বাইতে লাগিল “দিদি চাকর চাকরাণীদের পর্য্যন্ত খুব ভালবাসেন। বিন্দু ঠাকুরি কত যে গল্প কচ্চিল। আর তাঁর মতন সংসারের হিসেব করতে, সকলকে যত্ন করতে, কাজ কর্ম্ম করতে কেউ জানেনা।”

অমরনাথ জীবৎ হাসিয়া বলিল “তবে আমার চেয়েও তুমি বেশী জান বল। আমি তো দেখছি তার সম্পূর্ণ উল্টো। যাক এখন তুমি কেমন আছ বল দেখি? কোন অসুখ বোধ হচ্ছে না তো?”

“না বেশ ভাল আছি। আচ্ছা তুমি উল্টো কি দেখলে বলছ?”

“যাক আর সব কথায় কাজ নেই। কি পড়লে দেখি?”

“না তা হবেনা। কাকে উল্টো দেখলে হল।”

“এই তোমার দিদির কথা যা বলছিলাম। আগে তিনি ঐ রকমই ছিলেন চাবদিকে শুনতে পাই, কিন্তু চাক্ষুবে যা সব দেখছি তাতে উল্টোই তো বোধ হয়।”

“চাক্ষুবে কি দেখছ? বগনা—বলতেই হবে তোমায়—নইলে বই কেড়ে নেব।”

অমরনাথ পুস্তকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছিল। পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল “তিনি এখন তো কোন কিছুই দেখেন না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্কই

ছেড়ে দিয়েছেন। সে জন্তে সংসারে ভাবী বিশৃঙ্খলা হয়েছে।
কাকা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে বলতে আমি সেদিন
বলতে গিয়েছিলাম তা—”

“তা—কি? দিদি কি বলেন?”

“সে সব তুমি ছেলে মানুষ বুঝবেনা। মোট কথা এই
যে তিনি মনে করেন এখন আর তাঁর সঙ্গে কারু—অর্থাৎ
সংসারের কোন সংশ্রবই নেই। সম্ভব বাধ্যতায় তিনি
অনিচ্ছুক।”

চারু বিস্মিতভাবে বসিয়া রহিল। আবার তাহার
নিকটে সুরমা অত্যন্ত প্রহেলিকা হইয়া উঠিতে লাগিল।
জোর করিয়া সে ভাবটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চারু
বলিল “তা হোক, আমার তিনি কিন্তু খুব ভাল
বাসেন।”

অমরনাথ মুহূর্তকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিল। নিতান্ত
অসম্মত স্থানে বেমানান একটা কথা শুনিলে লোকে
যেমন ধমকিয়া যায় সেইভাবে কিছুক্ষণ বাকহীনভাবে
থাকিয়া শেষে দীর্ঘ বাত্বের সুরে বলিল, “তা’ হবে।”

চারু বুঝিল না। উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া বাইতে লাগিল,
“আমার মাথা ধবেছিল বলে কত মাথা টিপে দিতে
লাগলেন, বড় নরম হাত, আর কত ঠাণ্ডা। তাঁর
কেলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আমার মাথা যেন তখনি ছেড়ে
গেল। আমিও আমার দিদিকে খুব ভালবাসি।”

অমরনাথ মনে মনে সত্যই বিস্ময়াবিত হইয়া উঠিতেছিল
—একি রহস্যচিহ্ন তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে।
এ যে নিতান্ত আরব্য-উপভাসের গল্প। অমরনাথ জোরে
হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “তোমার কাছে তো আমিও তোমার
খুব ভালবাসি। তোমার মতন লোককে ভালবাসা বোকান
বা শক্ত তা আমার তো বেশ জানা আছে—”

“কেন আমি কি কিছু বুঝতে পারিনে? এত বোকা
আমি?—আচ্ছা সত্যি কি তুমি আমার খুব ভালবাস না?
সত্যি ক’রে বল। না বল ভেবে আঁখ।”

অমরনাথ একটু গম্ভীরভাবে রহিল। তারপর সপ্রশ্ন
হাস্তে চারুর গাল দুটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল “এই
যে দিবি বুদ্ধি হয়েছে দেখছি। বলতেও শিখে
ফেলেছ।”

“আমি ভালবাসাটাও বুঝতে পারি না তুমি এত বোকা
ভাব আমার?—আমি নিশ্চয় বলতে পাবি দিদিও আমার
খুব ভালবাসে।”

“তোমার মত লোকই স্ত্রী চাক। তুমি কখনো
হুঃখ পাবে না।”

“কেন?”

“অতি সহজে নিজের মত সবাইকে করে নিতে পার।”

“তবু বলবে? আমি বুঝতে পারি কি না তোমার
শোনাচ্ছি দাঁড়াও। এই শোনো—দিদি কিন্তু তোমার
ওপরে একটু বাগ ক’রে আছেন।—”

অমরনাথ সম্বোধন হাসিয়া বলিল “সত্যি নাকি?
বড় আবিষ্কার করেছে যাহোক এবার। না, তোমার
বুদ্ধি আছে তা অবশ্যকার করবার যো নেই।”

“কেবল ঠাট্টা! নইলে দিদি তোমায় কেন ওরকম বলেন
বলতে পার?—” বলিতে বলিতে চারুর সহসা মনে পড়িল
সুরমা তাহাকে কি নিষেধ কবিতা দিয়াছিল। একদিনও
সে কথাটা সে রাখিতে পারিল না বলিয়া চারু সহসা
অত্যন্ত ক্ষণ ও ভীত হইয়া পড়িল।

অমরনাথ কণেক অপেক্ষা করিয়া বলিল “কি
কথাটা?”

চারু ভীতস্বরে বলিল “আর বলব না। দিদি
শুনলে আমার ওপরেও হয় তো খুব রাগ করবেন।”

“তা তো করবেই। আমার যদি কিছু বলে থাকে—
তা শোনার আমার এমন জরুরি দরকার ছিল না কিন্তু
তুমি আজ এইসব কথা ছাড়া আর যে কিছু কইবে এমন
সম্ভাবনা তো দেখছি না—”

চারু বাধা দিয়া বলিল “না তা না, তোমায় কিছু নয়,
দিদিরই কথা—”

বিবস্ত্রপূর্ণ স্বরে অমরনাথ বলিল “আর না চারু—
আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। দুটো একটা অল্প কথা থাকে
তো বল। একটু হার্মোনিয়মটা বাজাই, শোন—”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ নিজে সংসারে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে না পারিয়া
এবং কতকটা সুরমার উপর অভিমান করিয়া তারিণী-

চরণকে ডাকিয়া সংসারের ভাব দিল। তারিণীচরণের কর্মকুশলতাও প্রতি তাহান অগাধ বিশ্বাস। তারিণী আসিয়া কর্তব্য খানেকের উচ্চ পদবীর দায়িত্বপূর্ণ অধিকার তাঁকাইয়া সাব্যস্ত করিতে পারিয়া গেল। এবং তাহাতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সংসারের চাকর দাসী আত্মীয়-স্বজনগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তাবিণী এমনি রাশভারী কর্তব্যপালয়ণ মন্বন্তর লোক

ভিতরে এইরূপ গণ্ডগোল। সহসা একদিন সূরমা শুনিল বৃদ্ধ শ্রামাচরণ বয়স হ্রাসে নিকাশ পরিষ্কার করিয়া অমরেন্দ্র নিকট বিদায় লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। সূরমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিয়া যান নাই। শুভিত সূরমা ভাবিল, “আর নয়—কর্ণধাবহীন নৌকা এইবার ডুবিবে।”

অমরেন্দ্র কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া তারিণীর সাহায্য চাহিলে তারিণী বলিল, “ভয় কি? আমি এসব কাজ খুব ভাল পারি। যত পুখোণো লোকগুলো একদিক থেকে তাড়াতে হবে! অনেক দিন হবে ক্ষমতা হাতে থাকায় তাদের ভারি আত্মপক্ষা বেড়ে গেছে।—”

সন্নিহিতস্থে অমরেন্দ্র বলিল ‘তাইত’। এভাবে তারিণী আসিয়া সংবাদ দিল নতুন ব্যবস্থা জারি করিতে গিয়া সে দেখিল সকলের উপরে বড়বড়াকুরাণীর নাম-আঁকা পতাকা উড়িতেছে। সহসা আজ বড়বড়াকুরাণী সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব হাতে লইয়াছেন তবে আর তাহাকে দরকার কি?

কিন্তু এ নালিশে উল্টা ফল হইল। অমরেন্দ্র সাগ্রহে বলিল, “সত্য নাকি? তিহি ভার নিয়েছেন? আঃ বাঁচা গেল—পুরুষে গৃহস্থালীর বিজ্ঞানে ভাই—আর তুমিও তো নতুন লোক।”

অভিযানে ফুলিয়া তারিণী বলিল, “তবে বিষয় কাজেও তো ভাই।”

এমন সময়ে সূরমাকে সহসা সেট কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সূরমা অসঙ্কেতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, “তুমি নতুন লোক, এখানকার কিছু জান না সত্য কিন্তু তবু তুমি আপনাদের লোক—তুমি দাওমানের পদ নাও—যদি কিছুই সাহায্য দরকার হয় আমি

বলে দিতে পারব—বাবা কাকা আমার সমস্ত জ্ঞানাতেন, সেজন্তে আমি অনেকটা জানি।”

সূরমাকে কর্তৃত্বের অধীনে তাহাকে দাওমানের পদ গ্রহণ করিতে হইবে। তাবিণী বিষমভাণে অমরেন্দ্রের পানে চাহিল। অমরেন্দ্র যেন অধিকতর বিস্মিত আনন্দিত ও ঈর্ষা-লব্ধিতভাবে বলিল, “তা’হলে তাবিণী আব তোমার কোন আপত্তি নেই।”

সূরমা তাবিণীকে বলিল “তোমার আপত্তি আছে?”

তাবিণী মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—“না”, কিন্তু মনে মনে বলিল “তোমার ক্ষমতা কিছু কমানো দরকার।”

সূরমা চলিয়া গেল। তাবিণীও কর্মান্তরে পথান করিল। অমরেন্দ্র সহসা সূরমার এই পবিবর্তনে বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিল “এব অর্থ কি?”

সংসার বেশ সূনিয়মে চলিতে লাগিল। বিষয়কার্যে তারিণী সাহায্য চাহিত না, তথাপি সূরমা অস্বাচ্ছন্দ্যে তাহাকে উপদেশ দিত। নিরুপায় তাবিণী নীরবে স্তব্ধ কব ভিন্ন উপায় দেখিল না।

চাক এখন যেন বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সাম্রাজ্য হইতে গৃহসমাজ পর্যন্ত যেন নতুন কচিৎ পবিচর দিতেছে। নতুন নতুন শিল্পশিক্ষা, লেখাপড়ার চর্চা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নতুন কার্যে সে একান্ত মনে নিজেই সমর্পণ করিয়াছে। অমরেন্দ্র দাতব্য চিকিৎসায় নিজেই অধীত বিস্তার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে বন্দুক ঘাড়ে শীকাব করিয়া আসিয়া চাককে তাহার কার্য হইতে যে সময়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয় সে সময়টিই চাকর বা বিশ্রামের কাল। সূরমা অমরেন্দ্রের সঙ্গেও পূর্বের মত নিঃসম্পর্ক ব্যবহারে আর চলে না। তবে চাকর নিকটে সে যেমন অকুণ্ঠিতভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দেয় সেখানে সেরূপ নয়। যখন বৈষয়িক কোন গোলমাল উপস্থিত হয়, কোন বিশৃঙ্খলা হয় বা অবশ্রমজাতব্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় সেই সময়েই সূরমা অকুণ্ঠিতভাবে অমরেন্দ্রের সহিত সে বিষয়ের আসোচনা কবে, অন্তর্গত গৃহীণীপণা ও চাককে লইয়াই তাহার সময় কাটে। বিষয়েরও ক্রমশ উন্নতিই দেখা যাইতেছিল। চারিদিকে সুশৃঙ্খলা। যে ক্ষণেকের ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ সংসারটার উচ্ছৃঙ্খল গতি নির্গুণ কর্ণধারের মত ফিনাইতে

পারে তাহাব ক্ষমতা এমন কোন অন্ধ ব্যক্তি নাট যে
হৃদয়ঙ্গম কবিত্তে না পাৰে। বিশেষতঃ অমব যে বিষয়ে
অত্যন্ত অক্ষম। স্বৰমাকে এখন সে মনে এবং বাহ্যতও
অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহিত মাজ্জ করিয়া চলে। অমব কিছুদিন
পূর্বে স্বৰমাব সম্বন্ধে বেক্সপ মনোভাব বহন করিয়াছিল
তাহা মনে পড়িলে এখন সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।—স্বৰমার
উল্লেখমাত্র তাহাব মস্তক এখন সুসন্মানে অবনত হইয়া
আসে—বেখানে আশ্রয়ানি সেখানে শ্রদ্ধাও বেশী।

দ্বিপ্রহরের বিরামস্থখে অবসরে চাক ও স্বৰমা
হুইজনে বসিয়া নিপুণভাবে শিল্পকার্যে মনোনিবেশ করিয়া-
ছিল। নিকটে দোলনায ফুলকুসুমতুল্য শিশু ঘুমাইতেছিল।
চাক অস্ত চারিমাংস হইল একটা পুত্র প্রসব করিয়াছে।

স্বৰমা বলিল “আব পাবিনে, চাক তুই এটুকু
শেষ কব।”

“না তা হবে না দিদি—তাহলে হয়ত ভাল হবে না।”

“বেশ হবে। থোকা উঠেছে আমি ওকে নি, তুই
বোন।”

“আঃ একটু কাঁছক না দিদি—শেষটুকুতেই তোমার
যত আলিঙ্গি।”

স্বৰমা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। চাক অভিমানে
বলিল “তবে আমিও করব না।”

“আচ্ছা বেধে দে—কাল হবে। থোকাকে একটু
মাই দে দেখি।”

“তুমি কেবল আমার একটা-না-একটা করমাস
করবেই।”

“আচ্ছা তবে বল না—যাও তোমাব ঘরে যাও।”

চাক হাসিয়া কেলিল “তাই বুঝি? তিনি শীকারে
গেছেন।”

স্বৰমাও মুহু হাসিয়া বলিল “এক শীকারে তো এই
হরিণটি ধরে এনেছেন আবার কি শীকারে চেষ্টায়?”

“আমি বুঝি হরিণ? তবে এবার একটা বাঘ ধরে
আনবেন হয়ত।” নিজের কথায়, চাক নিজেই অত্যন্ত
হাসিতে লাগিল। স্বৰমা একটু গম্ভীরভাবে বলিল “বাঘ
তো ঘরেই আছে—একটা ফেউ হলে ঠিক হ’ত।”

চাক বুঝিতে পারিল না। “বাঘ? ও—চিড়িয়া-

খানার বাঘটা বুঝি? তা কেউ কি হবে? সে বাঘ
তো কাউকে কিছু বলে না—মাহুষকে কি জন্তকে সতর্ক
করতেই না ভগবান কেউ কবেছেন।”

“তাকে যে খাঁচায় পূর রেখেছ!—নইলে সে
শীকারী ঘাড় ভাঙত হয়ত।”

“তা সে বাঘটাকে তো আমাদের শীকারী ধরেনি, সেটা
যে কেনা বাঘ।”

“তা বটে।” বলিয়া স্বৰমা থোকাকে আদর করিতে
লাগিল। চাক আলস্তে শুইয়া পড়িয়া বলিল “কিছু ভাল লাগছে
না দিদি। সেই ভাবে গেছেন, শীকার কি ফুবাঁয় না?”

স্বৰমা নিদ্রিত শিশুকে পুনরায় শয্যায় শোয়াইয়া
বলিল “এখন কি! আগে সন্ধ্যা হোক, না খেয়ে নাকী
চুইয়ে যাক, মুখময় কালীর দাগ পড়ুক—তবে তো।”

“দেখ দিদি অস্তায় দিদি। তুমি একটু বাবণ
কর না কেন?”

“এইবার ঠিক কথা বলেছ!—সে বারণ একেবারে
অকাটা।”—বলিয়া স্বৰমা সেলাইটা পুনর্বার হাতে তুলিয়া

লইল। চাকর এখন অনেকটা জ্ঞান হইয়াছে। স্বৰমাব
কথায় সে ব্যথিত হইল। কিন্তু কি বলিবে উত্তর না পাইয়া
নীরবেই রাইল। চাককে নীরব দেখিয়া স্বৰমা হাসিমুখে
তাচার পানে চাহিয়া বলিল, “রাগ কল্লৈ নাকি?”

“তুমি মধ্যে মধ্যে এমন একএকটা কথা কেন বল
দিদি?”

“কি জানি? আমার গুটা স্বভাব চাক—আমি চিরকাল
কুঁচুলে।”

“আমি কি তাই বললাম।”

“না বলিস্ দেখ্তে পাসনে? এই তোর সঙ্গে এক
প্রস্তুত হয়ে গ্যাল। আমি ছোটবেলায় আমার বাবার
সঙ্গে কি করে ঝগড়া কর্তাম শোন।”

“তোমার বাবা! আচ্ছা দিদি তোমার বাপের বাড়ী
যাবাব জন্তে মন কেমন করে না।”

“না।”

“আমার যদি কেউ থাকত আমার কিন্তু করত দিদি।”

“বলেছিই তো, আমি এক রকমের মাহুষ। এখন
ঝগড়ার কথা শোন।” চাককে ব্যাখ্যা দিয়াছিল বলিয়া

অনুতপ্তা সুরমা গল্পটাকে নানারকমে কেনাইয়া তাহার ক্লিষ্ট মনটিকে উৎফুল্ল করিতে চেষ্টা করিল। বর্ণনার ধুমে চারু হাসিয়া গড়াইতে লাগিল।

“ব্যাপার কি—এত হাসি—” উভয়ে আত্মসংবরণ করিয়া ধৌল সন্মুখে অমরনাথ। চারু চকিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, “কখন এলে?”

“খানিক আগে। এত হাসিব কারণটা কি? সিঁড়ি থেকে হাসি শোনা যাইছিল। ব্যাপার কি?”

“ও এমনি একটা গল্প শুনে। দিদি, উঠ হু কেন?”

“খাওয়ার বুদ্ধি ব্যবহার নেই?”

বাধা দিয়া অমর বলিল, “খাওয়া যথেষ্ট হয়েছে—এখন আর কিছু খাব না।”

“তবে আর কি—ব’স দিদি।”

অমর ও চারুর একুণ গল্পশুভবের মধ্যে সুরমা কখনো বসিত না এবং তাহাবাও অনুমোদন করিতে সাহস করিত না। আজ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে সুরমাব একটা অতর্কিত কথা উচ্চারণে চারু ব্যথিত হইয়াছিল, এখন সহসা সে এই অনুবোধ কবায় আবার তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে সুরমার মন উঠিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবিল আর কখনো এমন অসতর্ক ভাবে থাকিবে না। চারু অমরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, “বোস না।”

সুরমার বিপন্ন ভাব অমর বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সেও ইতস্ততঃ করিতেছিল। এক্ষণে চারু কুণায় উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্য বসিয়া পড়িল। সুরমা যুগ্ম শিশু টানিয়া কোলে লইল।

“কি শীকার করে? দিদি বলছিল কেউ ধরে আনবে।”

“কেউ?”—ঈবং হাসিয়া অমর বলিল, “কি বকম? কেউ কেন?”

“আমি নাকি হবিণ। খাঁচাব বাঘটা যদি কাউকে ধরে তাই ফেউটা নাকি অমরদেব সতর্ক করে দেবে।”

“তুমি হরিণ আর আমি? ববাহ টরাহ নাকি?”

“তুমি তো শীকারী।”

“তা সে বাঘটা খাচার আছে—তাকে এত ভয় কেন হঠাৎ?”

বিপদ দেখিয়া সুরমা ত্রস্তে বলিয়া ফেলিল, “না না

সে কথা হয় নি? চারু এক ব্যুত্রে আর বোঝে। শীকারের কি হ’ল?”

অমর একটু খুসী হইয়া একেবারে সুরমার পানে চাহিয়া বলিল, “গোটা কত হাসি—আর বটের। দেখবে?”

সুরমা মুখ নত করিল। চারু বলিল, “না ও আমাদের ভাল লাগে না—আহা বেচারারা কি দোষ করে যে ওদের মার?”

অমর বলিল, “তা মাছটাও ততো শীকার কবেই খেতে হয়।”

সুরমা শিশুকে শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

“উঠলে কেন দিদি—এসনা শেলাইটা শেষ করি।”

“তুমি কর। আরও কাজ আছে—”

সুরমা কথা শেষ করিতে না করিতে অমর উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “একটু জিরুতে হবে—বড় গা ব্যথা কচে।” সুরমার সে সভায় বসিতে অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়াই যে অমরনাথ চলিয়া গেল সুরমা তাহা বুঝিল।

চারু বলিল, “হুজনেই যাচ্চ আর আমি একা নসে থাকব বুঝি?”

“আর তবে শেলাইটা শেষ করি।”

“বেশ তাই এসো।” উভয়ে কার্যে নিবিষ্ট হইল। কিছু পবে থোকা কাঁদিয়া উঠায় সুরমা চারুর হস্ত হইতে শেলাই কাড়িয়া লইয়া বলিল, “তুই ওকে নে আমি এটা শেষ করে আনি গে।”

“আমি একা থাকব?”

“একা কেন—ওদিকে যাও না।”

“তবে আমি যাব না।”

“ঠাট্টা নয়—যাও—যদি কোন দরকার হয় দেখগে। আর খাওয়ার কথাটাও বলো—”

“আচ্ছা” বলিয়া শিশুকে লইয়া চারু উঠিয়া গেল।

শেলাই হাতে লইয়া সুরমা ভাবিতে বসিল। সে কেন একুণ ব্যবহার কবিয়া অমরনাথকে বিপন্ন করে? এই সন্ধোচে কি অমরের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ আছে তাহাই অমরের মনে জাগাইয়া দেওয়া হয় না। সে সম্বন্ধ যে মুহিয়া ফেলিয়াছে তাহার মনে তাহাই জাগাইয়া দেওয়াব অস্বেক্ষা লজ্জার কথা কি আছে। জগতে তাহার পক্ষে এর চেয়ে

লজ্জাকর কি আর কিছু নাই!—সে কথা দূর হোক—সে চাকর স্বামী। চাকর স্বামীর মনে এরূপ একটা গ্লানি জাগাইয়া দেওয়া কি তাহার পক্ষে আরসঙ্গত? যে সরলা তাহাকে তাহার স্বামীর সঙ্গে একটু আত্মীয়ভাবে মিশিতে দেখিলেও আনন্দে অধীর হইয়া উঠে সেই চাকর সর্বস্ব যে স্বামী তাহার মনে মুহূর্ত্তেব অস্ত্রও লজ্জা বা অস্ত্রতাপেব আকাবে অস্ত্র তাব আসিতে দেওয়া সুরমাব চক্ষে আজ নিজের একটা অমার্জ্জনীয় অপবাদ্য বলিয়া গণ্য হইল। যদিও অমব তাহার কাছে যে অপবাদ কবিরাজে সে অবহেলার ইহাই প্রতিশোধ! কিন্তু চাকর স্বামীর উপবে সে অস্ত্রাঘেব প্রতিশোধ লওয়া তাহার ভাগ্য নাই। নহিলে সে আবার নিজ কর্তব্য সংসারে দান কবিল কেন? প্রতিশোধ লইব না, মনে করিয়াও এটুকু জুয়াচুবী কবা কি তাহার উচিত হইতেছে? দিদিব কর্তব্যটুকু সে কেন যথার্থ ভাবে কবিয়া উঠিতে পারে না? এ দুর্বলতাটুকু তার আব কতদিনে যাইবে!—সুরমা শেলাই ফেলিয়া উঠিল। কক্ষান্তরে গিয়া থালে খাদ্যদ্রব্য গুছাইয়া লইয়া একেবারে চাকর শয়নকক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল। মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তিদের দেখা যাইতেছিল।—চাকর শিশুকে কোলে লইয়া স্বামীর বক্ষে হেলিয়া রহিয়াছে। অমবনাথ শয্যাব উপবে অর্দ্ধশায়িতভাবে উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে উভয়কে চুশন কবিতোছে।

নিঃশব্দে সুরমা সবিস্মা আসিল। সে সঙ্কোচ তাপ করিয়া আত্মীয়ের উপযুক্ত ব্যবহাবে চলিবে প্রতিজ্ঞা কবিয়া আসিয়াছে—তাই কি ভগবান তাহাকে এমন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিলেন? পা যে আর চলে না!

কিন্তু তাহার অস্তরে কি এতটুকু শক্তিও সঞ্চিত হয় নাই? জীবনের প্রথম অধ্যায়েই যৌবনের আকুল বাসনা দীপ্ত হোমানলে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াও তাহার হৃদয় কি এতটুকু বলিষ্ঠ হয় নাই? জীবনের প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, আশা, ভৃষা এতগুলি জিনিষ এক নিমেষে পান কবিয়া তাহার মৃত্যুঞ্জয় কঠিন প্রাণ কি এখনো এত দুর্বল? না, এ প্রাণকে সবল করিতেই হইবে!

রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুরমা ডাকিল “চাক।” তন্ত্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাকর বলিল “কে? দিদি?” কস্তে সে

থোকাকে শয্যার উপরে ফেলিয়া দিল। থালা হস্তে অনির্দিষ্ট সময়ে অপ্রত্যাশিত রূপে সুরমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অমরনাথও বিস্ময় দমন কবিতো পারিল না। সেও শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। থোকা পতনেব ভয়ে কাদিতে লাগিল।

সুরমাও অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। একে নিজেই সামলাইতেই তাহার অনেকখানি বলের প্রয়োজন হইতেছে তাহাতে আবাব তাহাদেব এই বিস্মিতভাব তাহাকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিল—তথাপি সে চাঞ্চল্য সম্বরণ কবিয়া অতিকষ্টে ভূমিতে থালা রাখিয়া চাকর মুখের পানে চাহিয়া দান মুখে হাসিয়া বলিল “খাওয়ার কথা মনে নেই বুঝি?”

চাকর বলিল—“মনে ছিল—তা খেতে যে চান না—আমি কি করব।”

রোক্তদ্যমান বালককে শয্যা হইতে বক্ষে তুলিয়া লইতে লইতে মুহূর্ত্তেব সুরমা বলিল “তবে খাওয়ার দবকাব নেই?”

“ভূমি একবার বলে জ্ঞাথ।”

অমরনাথ তাড়াতাড়ি বলিল—“তা খাচ্ছি—খিদেটা ছিল না তাই বলেছিলাম।”

সুরমা দেখিল অমরনাথ তাহাকে বিপর করিতে চাহে না। নিজের অক্ষমতায় দিক্কার দিয়া অমবনাথের উপব ঈষৎ ক্লান্তভাবে চাহিয়া সুরমা বলিয়া ফেলিল “খেতে বসলেই খিদে পাবে।”

অমরনাথ আর বাক্যব্যয় না কবিয়া আসনে বসিয়া পড়িল। চাকর পাখা লুইল দেখিয়া বলিল “না না ওতে দবকার নেই।” চাকর সুরমাব ইঙ্গিত পাইয়া বারণ শুনিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে চাকর বলিল “খিদে ছিল না বলেছিলো যে?”

“খেতে বসলে খিদে পায় এখন দেখছি।”

তবু সুরমা কথা কহিতে পারিতেছিল না। বালককে লইয়া অস্ত্রমনে খেলা কবিতো লাগিল। চাকর বলিল, “আব কিছু খেলে না?”

“আব খাব না।”

সুরমা চেষ্টায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল “খিদে নেই বলে বেশী খেতে লজ্জা হচ্ছে।”

অমরনাথও হাসিয়া ফেলিল। সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—“সেটা বোকাটির লক্ষণ।”

চারু মধ্য হইতে বলিল “তুমিই বা বুদ্ধিমানের লক্ষণ কই দেখাচ্ছ?”

“দেখালাম না? খাব না বলেও এতটা খেয়েছি।”

সুরমা পুনর্বার বলিল “খাবার ঘরে এল তাইতো, নইলে—”

চারু বলিল “নইলে আলিস্তির জন্তে অননি থাকতেন—এত বুদ্ধি।”

“বুদ্ধি নয়? অক্লবের পেছনে কে এত দৌড়ায়? কিন্তু যেটা ক্রব এসে পৌছয় সেটাতে যে অনাদর করে সেই বোকা।”

সুরমা এবার নিতান্ত সহজ ভাবে অমরনাথের পানে চাহিয়া সহাস্ত মুখে বলিল, “অন্ততঃ ওর অর্ধেকটা শেষ করলে ওকথা মানি।”

“বেশ”, বলিয়া অমরনাথ নিরাপত্তিতে আহাৰ শেষ করিয়া উঠিল। দ্বারের নিকটে দাসী দাঁড়াইয়া ছিল। ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করিয়া গেল। অমরনাথ পান খাইতে খাইতে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চারু টেবিলের উপরটা শুছাইতে লাগিল। এখন সুরমা কি ছলে গৃহ ত্যাগ করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। ইতস্তত করিয়া শেষে বলিল—“চারু, খোঁকাকে ছুধ খাওয়ানো হয়েছে?”

“এখনও সময় হয়নি দিদি।”

“তোমার তো সময়ের ঠিক কত! থিড়ে পেয়েছে বোধ হচ্ছে—” শিশুকে লইয়া সুরমা চলিয়া গেল। চারু বলিয়া ফেলিল, “দিদির ছুতোব অভাব হয় না—ও এখন ছুধ খাবে না তবু চলে গেছেন।”

অমরনাথ নীরবেই রহিল। ক্ষণপরে চারু বলিল, “কি ভাবছ?”

অমরনাথ জড়িতকণ্ঠে বলিল, “কই এমন কিছু নয়—তোমার দিদি যে বড় মিস্তনে হয়েছেন হঠাৎ! এমন তো কখনো দেখা যায় নি।”

“মিস্তনে আবার উনি কবে নন। তবে তোমার সঙ্গে মেশেন না বটে। কি জানি হঠাৎ হয় ত মনটা ভাল হয়েছে।”

“তাই তো দেখছি। আচ্ছা ছাখ চারু, তোমার দিদি লোকটা বড় নতুন ধরণের, না? কখন কি রকম যে চলে তা গোকা যায় না।”

“বোঝা যাবে না কেন? আমি তো চিরকালই জুকে ওই রকম দেখে আসছি। তবে আগে মধ্যে মধ্যে এক রকম পর পর ব্যবহার কতেন বটে। তা তখন আমি নতুন। কিন্তু তুমি যে আমার চেয়েও পরের মতন ছিলে।

বাধা দিয়া অমর বলিল, “আমিও কবে না নতুন? আমার সঙ্গে কবে কোন সম্বন্ধ ছিল?”

চারু গম্ভীর ভাবে কি ভাবিল। তার পরে মুহূর্ত্তে বলিল, “অজ্ঞায়টা কি তাঁরই? তাঁর সমালোচনা করার চেয়ে নিজের অজ্ঞায়ের—”

অমর তাড়াতাড়ি চারুকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, “হয়েছে হয়েছে গুরুমশায়, বকতে হবে না বেশী!—সে অজ্ঞায়ের ফল যদি এই হয় তো আমি তাতে অমূল্য নই।”

চারু নিজেকে টানিয়া লইয়া অনিচ্ছায়ও একটু হাসিয়া বলিল, “তুমি বড় ছুট্ট।”

অমর মুখে বলিল, “বটে,” কিন্তু সে কথা কি সত্যি কখনো তাহার মনে জাগিত না? সুরমার ব্যবহার, তাহার সকলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ দয়া মায়া ও কর্তব্যবোধনে দৃঢ় কোমল একটা কত বড় হৃদয়ের প্রতি সে কত বড় বিচার করিয়াছে সে কথা কি একবারও তাহার মনে হইত না? চারুর প্রতি তাহার অকপট স্নেহে অমর কি বিম্মিত হইত না? শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে একটা অতি সুন্দর অথচ তীব্র অমূল্যতাপব্যথাও সময়ে সময়ে কি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিত না? উঠিত! তবে সে ভাবকে অমরনাথ হাস করিয়া বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান দিতে পারিত না। বড় বেগমামী সে প্লাবন—যেন বজ্রার মত! তাহার আভাস মাত্রে তাই অমর কাঁপিয়া উঠিত, সজোরে সে ভাবটাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া অমর ভাবিত, চারু—চারু—চারু! চারুই তাহার জী—চারুই তাহার একমাত্র—চারুই তাহার সব! সুরমার কাহারো সহিত বিবাহ হয় নাই, হইতে পারে না, কেননা পৃথিবীর কেহ কি সে? না। সে দেবী—শুধু স্নেহ দিবার জন্তই সে সংসারের সহিত আবদ্ধ। অমরের

সহিতও তাহার ঐক্যমাত্র সম্বন্ধ, আর কিছু না! আর
কোনো কথা যেন তাহার মনে না জাগে! সে জন্ত অমর
প্রাণপণে সচেষ্ট থাকিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

শরৎ-প্রভাতে

আজকে এই সকাল বেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
স্মৃতি মেলাতে।

আকাশে ঐ অরুণ-রাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলো-ছায়ার
মায়ায় খেলাতে—
আজিকে এই সকাল বেলাতে ॥

নীলিমা এই নিলীন হল
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হতে
কে উদাসী বায়ুর শ্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ
মেঘের ভেলাতে—
আজিকে এই সকাল বেলাতে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা চীনাবাসনের কারখানা

(কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্)

ইতিহাস।

আজ প্রায় ১২ বৎসর হইল কাশিমবাজারের মহারাজা
মাননীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ও
জমিদার রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও হাইকোর্টের
উকীল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়গণ কর্তৃক এই

চীমের বাসনের কারখানা স্থাপনের হুচনা হয়। সাঁওতাল-
পরগণার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ রাজমহলের নিকটবর্তী মঙ্গলহাট
নামক স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে।
সেই পাহাড়গুলি সাধারণতঃ স্থল ও শ্বেতবর্ণের বিশুদ্ধ
বালুকা দ্বারা গঠিত। সেই স্থল বালির সহিত চীনা মাটির
অংশ বহুলপরিমাণে লক্ষিত হয়। কারখানার সঙ্গাধিকারী-



মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

গণ পানিয়া বালি ও মাটি বিক্রয় উদ্দেশ্যে ঐ পাহাড়গুলি
ক্রয় করিয়া Rajmehal Quartz Sand & Kaolin
Co. নামক একটি কারবার স্থাপন করেন। পাটের কল,
কাপড়ের কল, কাগজের কল, ইত্যাদিতে বিলাত হইতে
আনীত চীনা মাটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিলাতীর
পরিবর্তে দেশী মাটি চালানো এই কোম্পানীর একটি বিশেষ
উদ্দেশ্য। তা'ছাড়া ইমারতের জন্ত বালিও বিশেষ উপযোগী
বলিয়া বিক্রয় করা হয়। পাহাড় হইতে মাটি কাটিয়া
বালি ও মাটি ধৌত করিয়া পৃথক করিবার জন্ত মঙ্গলহাটে
৩০ হাজার টাকা খরচ করিয়া কল চৌবাচ্চা ও ইমারত



মাননীয় রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

প্রস্তুত করা হইয়াছে। পরে এই মাটি হইতেই চীনের বাসনের তায় জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে জানিতে পারিয়া ১৯০৩ সালে ৬নং মাণিকতলা রোডে কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্ স্থাপিত হয়। তখন দেশীয় কুমারদের দ্বারা ও কৃষ্ণনগরস্থ কারিকরদিগের দ্বারা পুতুল ও (Glaze) কাচের মত সামান্য চক্চকে করা চায়ের পেয়ালা, ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। কিন্তু উপযুক্ত লোক অভাবে প্রায় ২৫০০০ টাকা খরচ করিয়াও দ্রব্যাদি আশাহুয়ারী উন্নতি লাভ করিল না; কিন্তু তাহাতে ইহার কোনরূপ নিকৃৎসাহ না হইয়া ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় কারখানার বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে ১৯০৬ সালের প্রথমে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র দেব



শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন।

জাপান হইতে বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীর কুম্ভকারের কাথ শিক্ষা করিয়া আসেন এবং এই কারখানার ভার গ্রহণ করেন।

ইনি এই কারখানায় যোগদান করিয়াই, এই রাজ-মহলের মাটি ও বালি হইতে যে পোৎসলেন বা চীনা মাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিলেন। তৎপরে এই কারখানায় কেবল চীনা মাটির জিনিষ প্রস্তুত হইবে ইহাই স্থির হইল, এবং মাণিকতলা রোডে স্থান নিতান্ত অসঙ্গুলান হওয়ায় বেলিয়াঘাটা স্টেশনের নিকটবর্তী বর্তমান ঠিকানা টেংরা রোডে প্রায় ৯ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয়। এই জমির উপর প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করিয়া এঞ্জিনঘর, কলঘর, ছাঁচ তৈয়ারের ঘর, চুল্লী (furnace) ঘর, রং করিবার ঘর প্রভৃতি ইষ্টকনির্মিত পাকা ইমারত প্রস্তুত করা হয়। এই সঙ্গে জারমেনি হইতে ২০ হাজার টাকার এঞ্জিন কল ইত্যাদি আনয়ন করা হয় এবং ৬ হাজার টাকা খরচ করিয়া কী পোয়ান (kiln) প্রস্তুত করা হয়। ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে এই কারখানার কার্য আরম্ভ হয়।



ঐযুক্ত সত্যেন্দ্র দেব।

প্রথমে ১০ জন মাত্র লোক লইয়াই কার্য আরম্ভ করা হয়। ক্রমশঃ এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া বর্তমান সময়ে ১১০ জন লোক কার্য করিতেছে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ভারতে এই প্রথম চীনের বাসনের কারখানা স্থাপিত হয়; এই কার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক একজনও দেশে ছিল না। কাজেই খুব অল্পসংখ্যক লোককেই প্রথমে শিখাইতে আরম্ভ করা হয় এবং পরে পরে আরও লোক নিযুক্ত করিয়া এত দিনে ১১০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। ১৯০৭ সালে এই কারখানায় সম্বৎসরে ৩ হাজার টাকার মাত্র জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং উত্তর উত্তর তাহা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান বৎসরে মাসিক প্রায় ৫ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

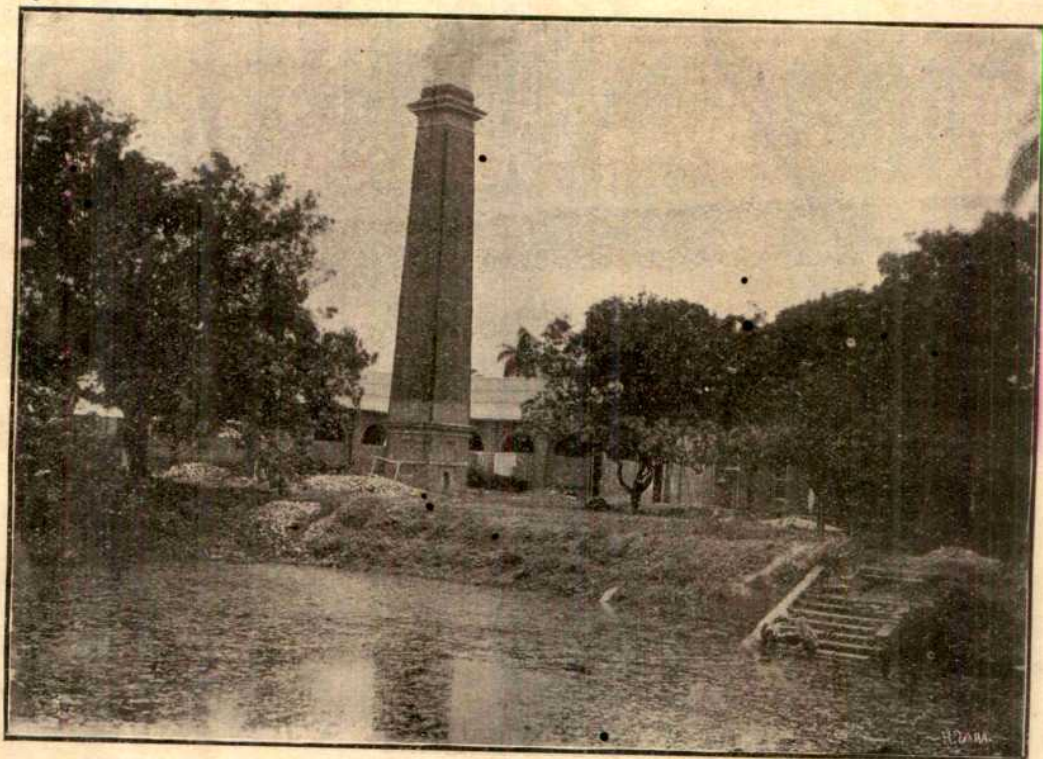
কারখানার প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র স্বদেশী দোকানদারগণ ও স্বদেশসেবকগণের উপর ইহার জিনিষের কাটতি নির্ভর করিত। কারণ তখন দ্রব্যাদি তত উৎকৃষ্ট হয় নাই এবং তা ছাড়া তখন যে টাকার মাল

প্রস্তুত হইত তাহাতে স্বদেশী দোকানদারগণের ফরমাইশের জিনিষও সব জোগাইতে পারা যাইত না। কাজেই মূর্গীহাটার জারমেনী হইতে আনীত জিনিষের সমকক্ষতা করিবার কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু ক্রমশ মাল প্রস্তুত দেখা হওয়াতে বিদেশী আমদানী বন্ধ করিতে চেষ্টা করা হয়। বর্তমান সময়ে হাঁসপাতালের আবগারীয় দ্রব্যাদি এত বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে যে তাহার বিদেশ হইতে আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।* এই কারখানা এখন জারমেনী হইতে আনীত ৫, ১০, ও ১০ মূল্যের ছোট ছোট খেলনা পুতুলের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমকক্ষতা করিতেছে। তবে এইসকল খেলনা পুতুলের ক্রটি এত অধিক যে তাহার আমদানি একেবারে বন্ধ করিতে হইলে কারখানাটি চতুর্ভুজ বৃদ্ধি করিতে হয়। দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি নির্মাণ কার্যে বিদেশী অপেক্ষা এই কারখানা সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এইসকল দ্রব্য ব্যতীত অত্যাবশ্যক বৈজ্ঞানিক কার্যের ব্যবহারোপযোগী পাত্রাদিও প্রস্তুত হইতেছে। শিবপুর সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্ত অনেকগুলি পাত্র প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। ভবিষ্যতে কারখানার স্বাধিকারীগণ তাহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অধিক মূলধনে এই কারখানাটি যৌথ কারবারে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তবে যে পর্যন্ত অন্ততঃ শতকরা ৬ টাকা হারে লাভ দেওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারেন, ততদিন তাহা করিতে ইচ্ছুক নন।

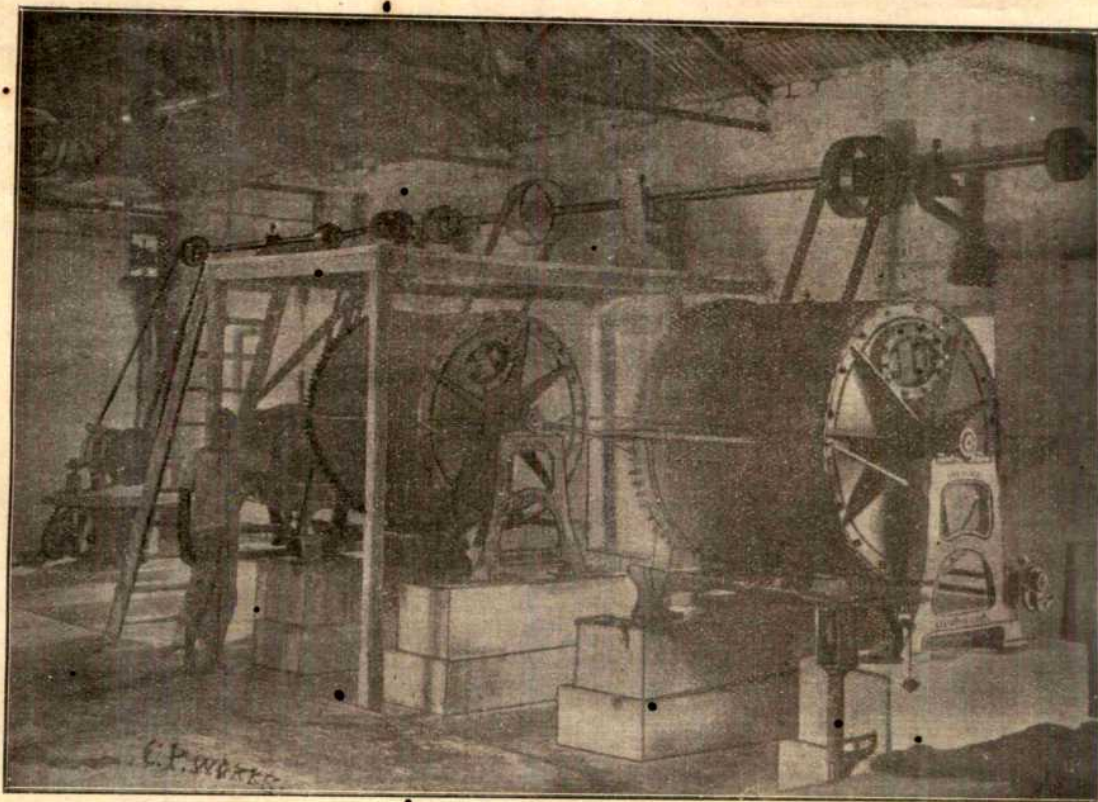
কারখানার বিশেষত্ব।

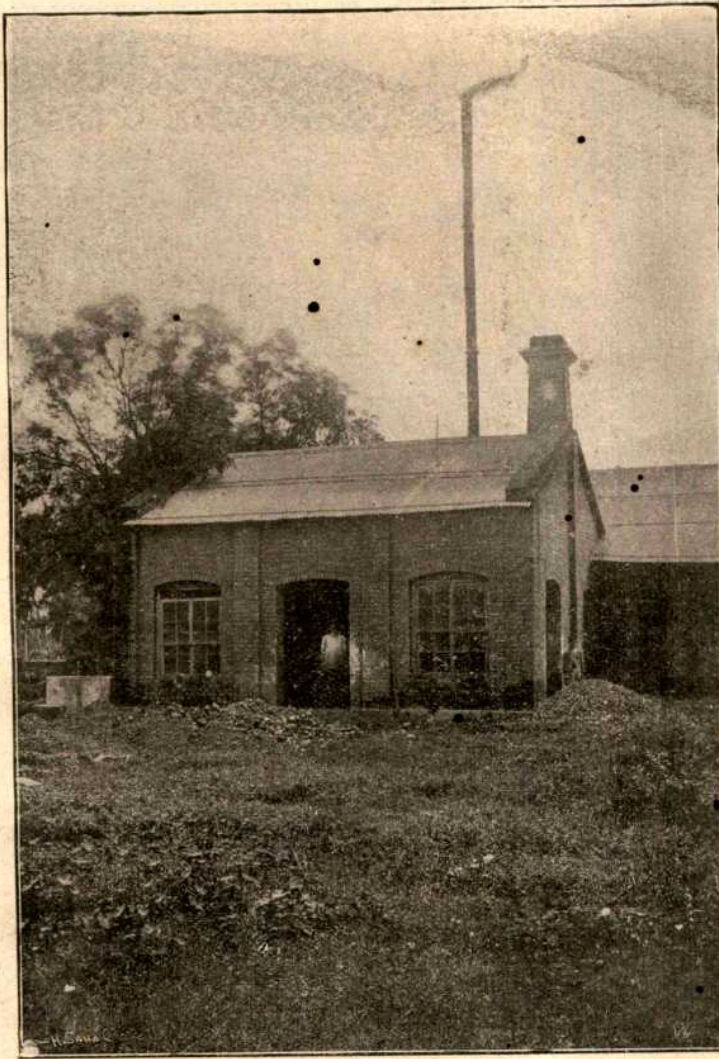
আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যেসকল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের নির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের অধিকাংশ উপাদানই বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই কারখানায় যে মাটি ও অত্যাশ্চর্য উপাদান ব্যবহৃত হয় তাহা সমস্তই বঙ্গদেশজাত এবং অধিকাংশই কারখানার নিজের সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত।

* মেসার্স বটক্ক পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধালয়ে, এমন কি মেসার্স স্মিথ স্টেনিষ্ট এণ্ড কোম্পানি প্রভৃতি সাহেব কর্তৃক পরিচালিত ঔষধালয়েও আমাদের প্রস্তুত গ্যালিপট, ইউরিনাল, কিডিকাপ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে।



কারখানার একাংশের দৃশ্য।





এঞ্জিনঘরের দৃশ্য।

মাটি হইতে জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী ও কারখানা পরিচালনের নিয়মাবলী।

মাটির সহিত যে যে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উহাকে “চীনে মাটিতে” পরিণত করা হয়, তাহা সমস্তই খনিজ। এই খনিজ পদার্থগুলি বিশেষভাবে বাছিয়া ও জলে উত্তমরূপে দ্রবীভূত করিয়া লইতে হয়। পরে উহাকে খুব মিহি করিয়া চূর্ণ করা হয় এবং তৎপরে মাটির সহিত নিজ নিজ অংশানুযায়ী জলে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রিত জলীয় পদার্থটা হইতে জলীয়ভাগ শক্তিশালী ছাঁকনী দ্বারা

(Filter Press) দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ঘন চীনে মাটির ভাগটা তৎপরে ঝাঁতা হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। উক্ত চীনে মাটির অংশ তখনও কার্যের উপযোগী হয় না। তৎপরে উহা শানিবার কলের (kneading machine) সাহায্যে কার্যোপযোগী করা হয়। উপরোক্ত কার্যগুলি সমস্তই কলের সাহায্যে করা হয়। এই প্রস্তুত মাটি হইতে সাধারণতঃ ৩টা উপায়ে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, যথা :—

(১) Pressing—অর্থাৎ যন্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া গঠন করা।

(২) Throwing—অর্থাৎ চাকের সাহায্যে গঠন করা (সাধারণ কুম্ভকারগণের স্থায়)।

(৩) Casting—অর্থাৎ ছাঁচে ঢালাই দ্বারা গঠন করা। উপরোক্ত উপায় দ্বারা গঠিত দ্রব্যগুলি কিঞ্চিৎ শুক করিয়া পরিকর্ম (Finishing) বিভাগে যায়।

সেখানে পরিষ্কৃত ও যথাযথভাবে

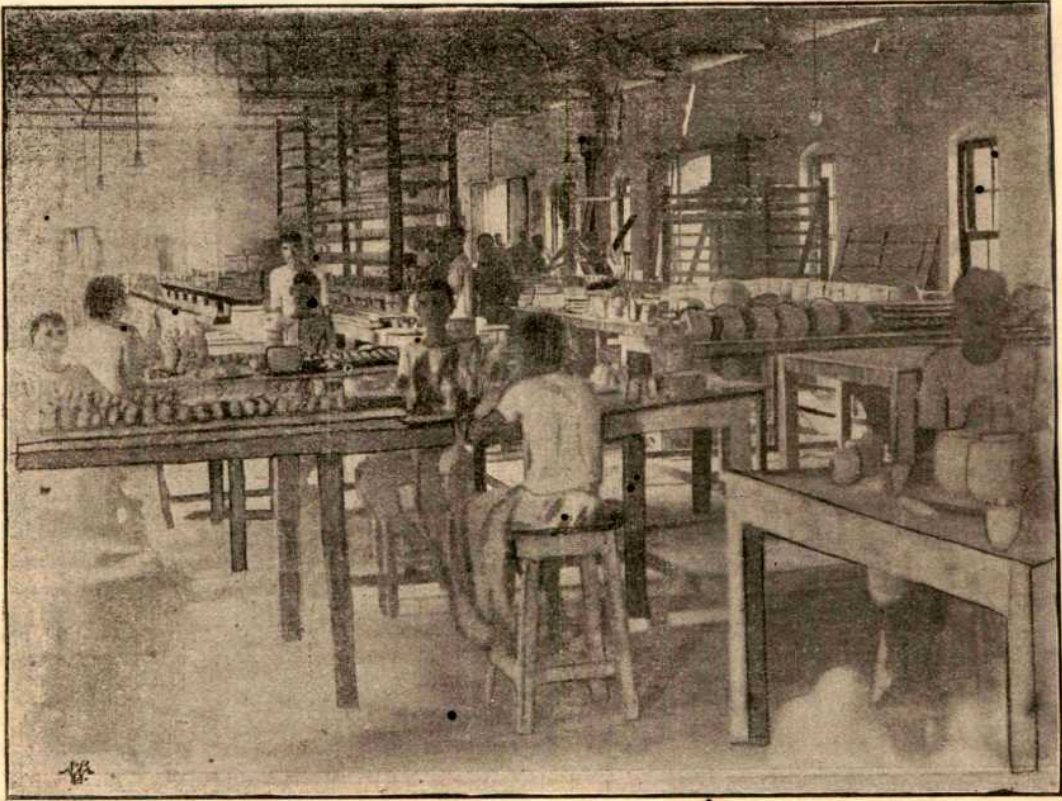
গঠিত হয় এবং তৎপরে ভাল করিয়া শুকাইবার জায় কিছুদিনের মত রাখিয়া দেওয়া হয়। সম্পূর্ণভাবে শুক হইলে জিনিষগুলি একবার সামান্য উত্তাপে পোড়াইয়া অধিক পরিমাণে শুক ও শক্ত করিয়া লওয়া হয়,—ইহাকে বিস্কুট (Biscuit) করা বলে। তারপর ঐসকল বিস্কুট-করা জিনিষগুলি, একটা কাচের উপাদান (Glaze) মিশ্রিত জলের মধ্যো ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে জিনিষগুলির উপর তৎক্ষণাতঃ একটা সাদা পাতলা আবরণ পড়ে। এই চুবান জিনিষগুলি, আগুনের খুব বেশী উত্তাপেও গলিয়া কামা হইয়া যায় না এইরূপ মাটি (fire clay) দ্বারা



বিস্কুটখরের দৃশ্য।



পেট্র এবং ছাঁচ তৈরী করিবার ঘরের দৃশ্য।



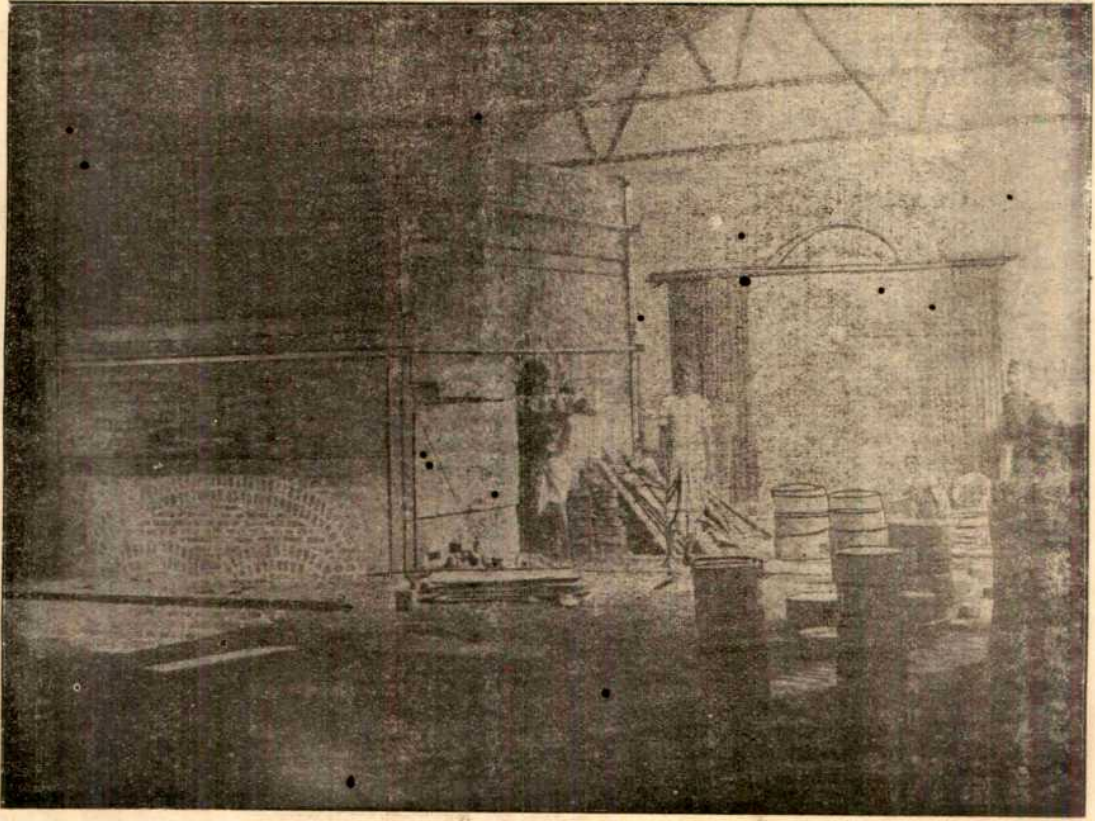
জিনিষ প্রস্তুত করিবার হলের দৃশ্য।

নির্মিত পাত্রের মধ্যে সাজাইয়া ঐ পাত্রগুলি kiln অর্থাৎ পোয়ানের ভিতর উপরিউপরি থাক্ দিয়া সাজান হয়। তৎপরে ১৩০০°C . উত্তাপে পোড়ান হয়। ইহাতে জিনিষ শক্ত হয় এবং পূর্বোক্ত Glaze অর্থাৎ কাচের উপাদানটা গলিয়া যায়। এই উত্তাপ সচরাচর মাটির রাসায়নিক উপাদানের (Chemical Composition) উপর নির্ভর করে। মাটি যতই বিশুদ্ধ হয় ততই উত্তাপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে—এবং উত্তাপ যতই বৃদ্ধি হয় জিনিষের উৎকর্ষ ততই বৃদ্ধি হয়। ইউরোপের অনেক বিখ্যাত কারখানায় ১৪০০°C . হইতে ১৫০০°C . উত্তাপে জিনিষ পোড়ান হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত Scores ফ্যাক্টরী, বারলিনের Royal Porcelain Factory ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। Scores Factoryর প্রস্তুত একটি একটি জিনিষ দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। পোড়াইবার পর ৩৪ দিন পর্যন্ত জিনিষগুলি ঠাণ্ডা হইবার জন্য পোয়ানেই

রখিয়া দেওয়া হয়। পরে উহা বাহির করিয়া রং করিবার ঘরে প্রেরিত হয়। তৎপরে চিত্রিত দ্রব্যগুলি পুনরায় এনামেল পোয়ান (Enamel kiln) নামক এক প্রকার পোয়ানে পোড়াইয়া রংগুলি পাকা করা হয় এবং যথারীতি প্যাক করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হয়।

উপরোক্ত বিভাগগুলি ঠিক একরূপ ভাবে পরপর স্থাপিত যে কারখানার এক প্রান্ত হইতে জিনিষ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া ঠিক অপর এক প্রান্তে সম্পূর্ণতা লাভ করে। ইহাতে পরিশ্রমের অনেক লাভ হয় ও গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। ইহা একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

প্রত্যেক কারিকরের দৈনিক কার্য, মাত্রা ও অস্ত্রাণ্ড খরচ, যন্ত্রাদি পরিচালনের গড় দৈনিক খরচ ইত্যাদির হিসাব অতিশয় সাবধানতার সহিত পৃথক্ পৃথক্ ছাপান ফারামে লিপিত হইয়া থাকে এবং এইসকল হিসাবের সাহায্যে জিনিষের পড়তা Cost of Production বাহির করা হয়।



কিলন বা পোয়ান-ঘরের দৃশ্য।

বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার চীনে মাটির জিনিষ ভারতে আমদানি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কলিকাতা ও চট্টগ্রামেই প্রায় অর্দ্ধেক জিনিষ ব্যবহৃত হয়। এই ১৫ লক্ষ টাকার জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইলে শুধু বঙ্গদেশেই অন্ততঃ প্রত্যেকটি তিন লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ১০টি চীনে মাটির জিনিষের কারখানা স্থাপিত হওয়া দরকার। একপ জিনিষের উপাদান দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং পাইপ, টালি, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বৎসরে কত লক্ষ টাকা লাভ করিতেছেন এবং তাঁহাদের কারখানা জগতের একটি বৃহত্তম কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে উৎসাহ বা উদ্ভম দেশের লোকের খুব কমই আছে। চীনে মাটির জিনিষের কারখানা চালানো একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। কারণ ইহার উপাদান অল্প-মূল্যে পাওয়া যায়। অনেক জিনিষ কলেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়

এবং পোড়াইবার জন্ত স্বল্প মূল্যে কয়লাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এযাবত কাল বঙ্গদেশে অনেকানেক শিল্পের স্থাপন ও উন্নতির চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু এই কারখানা স্থাপনের পূর্বে উন্নত শ্রেণীর মাটির পাত্র পুতুল আদি প্রস্তুত করিবার সমবেত চেষ্টা কখন হয় নাই। ইং ১৮৬০ সালে ভগল-পুরের নিকটবর্তী কহলগাঁ [Colgong, E. I. Ry. (Loop)] নামক স্থানে গঙ্গার উপর পাথরঘাটা পাহাড়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী মতিলাল শীল প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মিঃ জি ম্যাকডোন্ডাল্ড কর্তৃক একটি বৃহৎ পটরি ওয়ার্কস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮৬ সালে উক্ত সাহেব চলিয়া যাওয়ায় কারখানাটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বাহারা ভারতের মাটির পাত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন উন্নত শ্রেণীর মাটির জিনিষ প্রস্তুত কার্যে বঙ্গদেশ সর্বাপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইতি,



কলিকাতা চীনাবাসনের কারখানায় প্রস্তুত সামগ্রী।

কলসি, সরা, জালা, মালসা ভিন্ন আমাদের গোরবের জিনিষ কিছুই নাই। কাচের স্বচ্ছতাচ্ছাদিত চক্চকে মাটির জিনিষ (Glazed Pottery) তো দূরের কথা, খসখসে মাটির জিনিষেরও (হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদির) অবস্থা শোচনীয় এবং তাহা উন্নত করিবার কোনই চেষ্টা দেখিতে পাই না।

কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্ এই প্রথম বঙ্গদেশে উন্নত শ্রেণীর চক্চকে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া সকলের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। এই কারখানার উন্নতিতে দেশের একটা বিশেষ অভাব দূরীভূত হইবে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমরা এই কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। সত্যসুন্দর বাবু আমাদের লোকের মাটি প্রস্তুত করা হইতে আরম্ভ করিয়া প্যাক করা পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। আমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখিলাম ও আনন্দলাভ করিলাম। সমস্ত কারখানাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ঐক্যে একত্র ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত পরে

পরে নির্মিত হইয়াছে, যে, এক প্রান্তে মাটি প্রস্তুত হয়, এবং আর এক প্রান্তে বিক্রয় করিবার উপযোগী জিনিষটি বাহির হয়। আমাদের দেশে এইরূপ একটি কারখানা স্থাপন ও পরিচালন সোজা কাজ নয়। শুধু টাকা দিলে হয় না, কিম্বা কিছু কেতাবী জ্ঞান থাকিলেও হয় না। সত্যসুন্দর বাবুকে ঘর তৈয়ার করান, কল বসান, কারিগরদিগকে শিখাইয়া কাজের লোক করা, বাজারে পাইকারদিগকে এই কারখানার জিনিষ লইতে স্বীকার করান, সমস্তই করিতে হইয়াছে। স্মরণ্য তিনি যে কৃতী পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যাহারা, লোকসান হওয়া সত্ত্বেও, লাভ না হওয়া সত্ত্বেও, বৎসরের পর বৎসর, এই কারবারে টাকা ঢালিয়া আসিয়াছেন, সেই সম্ভাবিকারীগণও সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এখন কারখানায় যে পরিমাণ লাভ হইতেছে এবং উহা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে উহা শীঘ্রই অগ্ৰাণ বেশী লাভের ব্যবসার সমকক্ষ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা হয়। উহার মূলধন বাড়াইলে

উহাৰ লাভের পরিমাণ ও অস্থাপত্য দুইই বাড়িবার সম্ভাবনা। সূতবাং যদি উহাকে যৌথ কাববারে পরিণত করা হয় তাহা হইলে উহার অংশীদারবাব অভাব না হইবারই কথা। এই কারখানাটী বাঙ্গালী মাত্রেই আদরের জিনিস, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

নিবেদন

পুষ্প যদি কর মোরে করো শতদল,
তোমার চরণে, প্রভু। এই নিবেদন ;—
বারি যদি কর শব্দে করো গঙ্গাজল ;
কবো দুর্গা, দাঃ যদি তুণের জীবন ;
তুলসী করিও যদি দাও পত্র করে ;
বৃক্ষ করি রাখ যদি করিও চন্দন ;
জীব যদি,—করে নব নত ভক্তিভরে ;
জন্মে জন্মে দিও পদ করিতে বন্দন।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম—শ্রোত এবং স্মার্ত ।*

“গহনা কর্মশো পতিঃ।” গীতা।

১। বৈদিক কর্ম ।

ঋণাদি শব্দের জ্ঞান কর্ম শব্দেরও নানা প্রকার অর্থে ব্যবহার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যে বাহ্য কবে, তাহাই তাহার কর্ম—“কর্ম ব্যাপ্যাবৈবৎ ন্যায়তে।” জ্ঞান মতে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃষ্ণন, স্ফারণ, গমন ইত্যাদিবই নাম কর্ম। কিন্তু সাধাবণ অর্থে এসকল লৌকিক কর্ম। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার কর্মের উল্লেখ আছে—লৌকিক এবং বৈদিক। স্মার্ত কর্ম বৈদিক কর্মেরই অন্তর্গত মনে করা হয়। বৈদিক কর্ম বলিতে প্রধানতঃ যাগযজ্ঞকেই বুঝায়। তবে অধ্যয়ন, ইজ্যা (যজ্ঞ), এবং দান এই তিন প্রকার কর্ম বা “ধর্ম-স্বক্কেরঙ” উল্লেখ আছে। কোথাও বা কর্ম বলিতে “ইষ্টাপূর্ত্ত”—অর্থাৎ যাগযজ্ঞ এবং কুপ-তড়াগাদি

খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য বুঝায়। কর্ম-সীমাংসার যজ্ঞকার জৈমিনির মতে “অগ্নিহোত্র-দর্শ-পৌর্ণমাসাণি” যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, এবং যেসকল ক্রতিবান সেইসকল ক্রিয়াকে লক্ষ্য করেনা, সেসকল নিরর্থক, অথবা অর্থবাদ বা প্রশংসাবাক্য মাত্র—“আমায়ত্র ক্রিয়ার্থস্বাদানর্থক্য মত মর্থানাম্।” জৈমিনির এই মতই জ্ঞান এবং কর্মের বিরোধের মূল।

২। বৈদিক হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ ।

বৈদিক যজ্ঞ দুই প্রকার—হবির্যজ্ঞ, এবং সোমযজ্ঞ। হবির্যজ্ঞের আহুতি দুগ্ধ, ঘৃত, এবং মাংসাদি, এবং সোম-যজ্ঞের আহুতি সোমরস। অগ্নি বা কাষ্ঠখণ্ডদেব মন্ডন বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া বিধিপূর্বক অগ্ন্যাধন অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। গার্হপত্য অগ্নি হইতেই অগ্নি গ্রহণ করিয়া আহবনীর এবং দক্ষিণাগ্নি নামক আবও দুইটা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। শ্রোত এবং সঙ্ঘািকালে এইসকল অগ্নিতে দুগ্ধাদি আহুতি প্রদানের নাম অগ্নিহোত্র। বৈদিক অগ্নিহোত্রের অন্তর্গত দেশ প্রচলিত না থাকিলেও অগ্নিহোত্রী নাম অত্য়াপি প্রচলিত আছে। সোমযজ্ঞে বিধিপূর্বক প্রস্তর দ্বারা পেরণ করিয়া সোমলতার রস প্রস্তুত করিতে হইত। ঋগ্বেদেই সোমযজ্ঞের বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সোমরস অগ্নিতে আহুতি রূপে প্রদত্ত হইত, এবং বৈদিক ঋগ্বেদে দধি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া সোমরস পান করিতেন। আধুনিক বিয়াব (beer) প্রভৃতির জ্ঞান ইহারও কিঞ্চিৎ মাদকত্ব গুণ ছিল। “অপাম সোমমমুতা অমৃতম্।” সোম-যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম, রাজসুয়, এবং অশ্বমেধাদি বিখ্যাত। দিনে তিনবার অগ্নিতে সোমরসের আহুতি প্রদত্ত হইত। ইহারই নাম “ত্রিসবন”—প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিন সবন, এবং তৃতীয় সবন। বৈদিক যজ্ঞের বেদী নির্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম ছিল, এবং তাহা করিতে জ্যামিতি-জ্ঞানের প্রয়োজন হইত। কঠোপনিষদে মন-চিকিত্তা-সম্বাদে উক্ত হইয়াছে :—

“লোকাদিমগ্নি তমুবাচ তন্নৈ, বা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা না”—

ইহা দ্বারাও দেখা যায় কত সহস্র ইষ্টক যজ্ঞবেদীর বোন

* মাৎস্যসংহিতা উপলক্ষে জিন্সা ব্রহ্মসমিতির প্রদত্ত বক্তৃতা।

অংশে কিরূপে বসাইতে হইবে, তাহার বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। সোমযজ্ঞের বেদী পক্ষীর আকারে নির্মিত হইত, কারণ এরূপ বৈদিক প্রবাদ ছিল যে গায়ত্রী নামক ছন্দ স্ত্রেনপক্ষীরূপে স্বর্ণ হইতে সোমলতা আনয়ন করিয়াছিল :—

“না পতিরা সোম-পালান্ ভাবয়িতা পত্যাং চ মুখেন চ সোমং রাজানম সমগৃহ্মনং।” ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

দেশের আধুনিক ব্রতধর্মাদিকে স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম বলা বাইতে পাবে কিন্তু এসকলের সহিত যজ্ঞাদি বৈদিক কৰ্ম্মের কোনরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। এবং এ সকলকে বৈদিক কৰ্ম্ম মধ্যে গণ্য করাও সম্ভব হয় না। এসকল স্মার্ত্ত কৰ্ম্মাভ্যুত্থান দ্বারা প্রভূত স্বর্গাদি ফললাভ হইবে এরূপ আশাও ভিত্তিশূন্য।

৩। অগ্নি এবং প্রাচীন ইরাণীদিগের আবেস্তা।

মানবজাতির ইতিহাসের আদি ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদের আদিম্বক :—

“অগ্নিনীলে পুবেহিতঃ যজ্ঞস্ত দেব যুজিমাং। হোতারঃ রত্নধাতমং।” “যজ্ঞে পুরোহিত, ঋষিক, হোতা, উৎকৃষ্ট রত্নের আকর সেই অগ্নিদেবের সম্বর্ধনা করি।”

অগ্নির এত মাহাত্ম্য এত গৌরব কোথা হইতে? উক্ত দুই আমাদের বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে নয়,—গ্রীক, লাতিন এবং আদিম ইরাণ বা পারস্যদেশে, এমন কি প্রাচীন মিসর দেশেও অগ্নিদেব এইরূপে পূজিত হইয়াছেন। প্রাচীন ইহুদিদিগের একেশ্বরের পূজারও অগ্নির ব্যবহার ছিল। কিন্তু আদিম ইরাণ দেশের অগ্নি-পূজকদিগের কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ইরাণীদিগের সন্তান অধুনাতন বর্ষবাসী পার্সী নামে আমাদের নিকটে সুপরিচিত। তাহাদের আবেস্তা নামক প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের অগ্নিদেব হোম নামক অংশ অগ্নির স্তবে পরিপূর্ণ। তাহারাজি আমাদের বৈদিক ঋষিদিগের জ্ঞান যজ্ঞাদি কার্য করিয়া অগ্নিতে সোমরস আহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস পান করিতেন। আমাদের বৈদিক সোম তাহাদের মধ্যে হোম নামে পরিচিত ছিল।

* আবেস্তা সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক ধাই বিলাতের বিখ্যাত হইতে মুহীত হইয়াছে।

ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মালুসারেই (Grimm's laws) সংস্কৃতের ‘স’ ইরাণি-ভাষায় ‘হ’ হয়, যেমন সংস্কৃত সিদ্ধ পার্সী হিন্দু। ইরাণদেশের যেসকল পুরোহিত কাঠঘরের বর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিত, তাহাদের নাম ‘অথুবন’ ছিল। আমাদেরও ব্রহ্মার পুত্রের নাম ‘অথর্বা’, এবং ব্রহ্মা আদিতে যজ্ঞীয় পুরোহিত বিশেষেরই নাম। আমাদের অথর্কবেদ ও ‘জয়ী’ নামের বহির্ভূত, এবং বেদসকলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এইসকল কারণে অথর্কবেদের সহিত প্রাচীন ইরাণী ধর্মের বিশেষ সম্বন্ধ থাকাই সম্ভবপর আবার প্রাচীন ইরাণের দেবগণের সহিত আমাদের বৈদিক দেবগণের এত সাদৃশ্য যে তাহা উপেক্ষা করা যায় না। ঋগ্বেদে ‘অসুর’ শব্দ অর্থাৎ, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি দেবগণের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে।^১ দশম মণ্ডলের শেষভাগেই মাত্র দেবশব্দ অর্থে ‘অসুর’ শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়। ইরাণীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের নাম ‘অহুর’—‘স’ স্থানে ‘হ’ এই মাত্র প্রভেদ। বৈদিক দেবগণ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য (অধ্বিনীধর), যম প্রভৃতি পার্সী-দিগের আবেস্তা গ্রন্থে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য, যিম, প্রভৃতি নামে সুপরিচিত। বৈদিক বুজয় বা বুজহস্তা (ইন্দ্র)—যাহা মোক্ষমূলার গ্রীকদিগের বেলেরোকিনের (Bellerophon) সহিত এক করিয়াছেন, বৈদিক ‘অপাং নপাং’ (জলের বংশধর) এবং ভগদেবতা আবেস্তার ‘বেরেথ্রয়’ অপাং নপাং, এবং ভগের সহিত এক। ইন্দ্রের বৃত্তবধের আখ্যায়িকা বেদে এবং আবেস্তাতে একইরূপ। ইন্দ্রেরই আদি বৈদিক নাম জিত, আবেস্তাতে ‘খেইতোনা’। বৈদিক ইন্দ্র যেমন ‘অহি’ বা ‘বৃজকে’ বধ করিয়াছিলেন, ইরাণী খেইতোনাও বৃজকে বা অন্ধিকে বধ করিয়াছিলেন। তবে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক যে আমাদের পৌরাণিক দেবাত্মের বুদ্ধ সম্বন্ধে ইরাণীদিগের সহিত নামের বিরোধ দৃষ্ট হয়। আমাদের ‘দেবাত্ম’ ইরাণীদিগের ‘অসুর-দৈব’। পৌরাণিক দেব লোকের হিতকারক, কিন্তু ইরাণীদিগের ‘দৈব’ লোকের অহিতকারক। আবার পৌরাণিক ‘অসুর’ লোকের অহিতকারী, কিন্তু ইরাণীদিগের ‘অসুর’ লোকের হিতকারী।

* “অং বিবেযাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অহুরা যে চ মর্ত্যাসি।” ২-২৭-১০।

এই দেবাস্থর এবং অস্থবদৈব শব্দবিরোধ দৃষ্টেই প্রতিপন্ন হয় যে দেবাস্থর সংগ্রাম একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব। আবেস্তা-সম্প্রদায়ভূক্ত ইবানী আর্ধ্যদিগেব সহিত বৈদিক আর্ধ্যদিগেব বিচ্ছেদ এবং সংগ্রামই দেবাস্থবেব যুদ্ধরূপে ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে লোকে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তখন শাস্ত্রকারগণ এই দেবাস্থব সংগ্রামের আধ্যাত্মিক অথবা কাল্পনিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শব্দব তাঁহার হাম্মোগ্যা ভাষ্যে বলিতেছেন :—

“দেব অর্থে শাস্ত্রোদ্ধাতিত ইন্দ্রিবৃত্তি, অস্থব তাহাব বিপরীত। স্বীয অস্ত বা প্রাণানি ক্রিয়াকপ স্বাভাবিক বিষয়ে রমণ করে, এই অর্থে ‘অস্থব’ শব্দ স্বাভাবিক তম-অস্থক ইন্দ্রিবৃত্তি বুঝায়। তাহাদেব পবন্যব একে অস্তেব বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাই দেবাস্থব-সংগ্রাম। শাস্ত্রীয একাংশবৃত্তির অভিত্তেব অস্থ প্রবৃত্ত স্বাভাবিক তমোঁকপ ইন্দ্রিবৃত্তিই অস্থব। আবার তদ্বিপরীত শাস্ত্রার্থ-বিষয়বিবেকরূপ দ্রোতিত্বভাব দেবগণও স্বাভাবিক তমোঁকপ অস্থব-অভিত্তেব প্রবৃত্ত। এই অস্তোস্ত অভিত্তেব চেষ্টাই সংগ্রাম। সকল জীবের, ঐতি দেহে, অনাদিকাল হইতে, এইকপ দেব-স্থব-সংগ্রাম চলিতেছে।” ১-২ ॥

৪। অগ্নির মাহাত্ম্য এবং যজ্ঞের মূলতত্ত্ব।

সে বাহা হউক অগ্নিব পূর্বোক্তঃ দিগদিগন্তব্যাপী সর্বজাতীয় মহাগৌরবের কারণ কি ?

• “৩৩০৯ দেবগণ অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছেন, হৃত দ্বারা সিন্ত কবিরাছেন, তাঁহার জন্ত বর্হি (কুণ) বিস্তার করিয়াছেন, হোতাওগণ তদুপরি কসাইরাছেন।” *

ঋষি বিশ্বামিত্র অগ্নিকে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন :—

‘কামরমানো বনা স্বঃ,’—হাঁহাতে দাবানলেরই উল্লেখ।

“স স্ববাসনিস্বরনামিমাখা তিরোহিতিং। এনং নরন্ মাতরিখ পত্রাবতো দেবেভ্যো মধিতঃ পরি।—‘চলিয়া গেলেও যেমন পুত্রকে ধরিব; আনে, সেইরূপে তিরোহিত অগ্নিকে মাতরিখা মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করিব। দেবগণের জন্ত আনয়ন করেন।’

এদলে অগ্নি নির্দোষিত হইলে অরুণিষয়েব মন্থন দ্বারা তাহার পুনরুৎপাদনের উত্থে দেখা যায়। গ্রীকদিগেব মধ্যে একপ প্রবাদ যে প্রমেথুজ (Prometheus) লৌকহিতেব জন্ত স্বর্গ হইতে অগ্নি চুবি করিয়া আনিয়াছিলেন। প্রমথন—(বলপূর্বক অবগিহঃস্বঃ মন্থন) শব্দেব সহিত

তাঁহার নামের বিশেষ সাদৃশ্য। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে :—

“অগ্নিই সকল দেবতা, বিষ্ণুও (মধ্যাহ্ন স্বর্গ) সকল দেবতা, এই অগ্নি এবং বিষ্ণু শরীরই যজ্ঞের দেবগণের আদি ও অবস্থানায়। অতএব যখন অগ্নি ও বিষ্ণু যজ্ঞ পুরোচারণ অর্পিত হয়, সেই পুরোচারণ সবস্ত দেবগণের স্থখবিধান করে।” *

দেবগণেব মধ্যে অগ্নিব এইরূপ উচ্চ অধিকার লাভেব প্রকৃত কারণ নির্দেশ কবিত্তে ইতিহাস অক্ষম। ইতিহাসেরও জন্মেব বহুপূর্ব হইতেই অগ্নির গৌরব সূর্যের সুরপ্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসেব অতীত দেখিয়াই কি শাস্ত্রকারগণ বেদকে ‘অপোকষেয়’ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন ? অগ্নির দেবত্ব বিঘ্নে কোন প্রস্ত্রের অবতারণা কবিত্তেই কেহ কখনও সাহসী হন নাই। অগ্নিপূজাব প্রকৃত কারণ নির্দারঃ অসম্ভব হইলেও, অগ্নির অভাবে বৈদিক ঋষিগণ যে কত দৃষ্ট পাইতেন, তাহা ঋগ্বেদেবই ছই একটি স্মৃক্ত হইতে অনুমান করা যায়।

“অগ্নি জলমধ্যে তিরোহিত হইলেন। পশু পলারন কবিলে যেমন পদচিহ্ন দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করে, সেইরূপ পরিচর্যাকারীরা অগ্নির অনেক অনুসন্ধান করিল। বীর ভৃগুবংশীরেরা অগ্নিলাভের ইচ্ছাব স্তব করিতে করিতে তাঁহাকে পাইলেন। বৈভূবস জিত অনেক কামনা করিয়া এই অগ্নিকে ভূমির উপরে লাভ করিলেন।” †

দুর্ভাতাই চাক্তার নিদান। অধুনা দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বল-কেরও পকেটে দিয়াশালাই, মুখে ধূমায়মান সিগারেট। আমাদের পক্ষে বৈদিক ঋষির “অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ” উপহাসের কথা হইবে আশ্চর্য্য কি ? আজকালও বিলাতে পর্যন্ত জলের দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায়, কিন্তু জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে অগ্নির দুর্ভিক্ষ সভ্যজগতে অসম্ভব হইয়াছে। আদিম মানবের অবস্থা অন্ধরূপ ছিল, হরত লৌকিক কোশল দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি এক সময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আর্ধ্যজাতির আদিম নিবাস ইরাণ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে অগ্নির অভাব একবার করনা কখন। হরত ফল মূল আহাব দ্বারা জীবন মাত্র ধাবণ সম্ভব ছিল, কিন্তু রাত্রিকালে শীত এবং অন্ধকারে তাঁহাদের কষ্টেব সীমা ছিল না। হরত

* অগ্নিই সর্বা দেবতা, বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতা।

এতে বৈ যজ্ঞজ্যোত্বোবো বরশিত বিষ্ণুঃ, তজ্জগাদ্যাবৈকবঃ

পুরোচারণ নির্বপন্ত্যত এবতদেবাস্থববৃত্তি ১১-৫

† ইমং বিশ্বস্তো অগ্নাং মধেহ পশুন নষ্টং পদৈরনুগমন্। শুভা চতন্ত মুশিভো এনমোতিবিজ্ঞস্তো বীরা ভৃগুবোবিশমন্। ২। ইমং ত্রিতো ভূর্যাবিশিদ্ধিষেভূবনে সূর্য্যা স্যারাতা। ৩। ১১-২-৪৬ ॥

* “জীনি শতা জীসব্রাণানি ত্রিংশত দেবানব চাসর্গয়ন্। ঔকনুত্বৈ বত্ণবহিরঙ্গা আদিকোতান্ স্তসাবরজ্।” ৩-২-৯। স্ববেদ।

নিবিড় অরণ্য মধ্যে বৃক্ষের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি তাহাদের মধ্যে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিল, হয়ত তিনি নিজের হস্ততলঘর্ষণ করিয়াও দেখিলেন ঘর্ষণ দ্বারা হাত উষ্ণ হয়। হয়ত নানাপ্রকার শুষ্ক বস্তু পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া দেখিলেন, যতই ঘর্ষণ করা যায়, ততই উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। প্রস্তুত্রে প্রস্তুত্রে ঘর্ষণ করিলে অগ্নিফুলিঙ্গ বাহির হয়। হয়ত ক্রীড়াচ্ছলে বালকেরা শুষ্ক কাষ্ঠদ্বয় লইয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে সহসা দেখিল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে,—এবং ইন্ধনযোগে সেই অগ্নি তাহার সঞ্চারিত্ব বিস্তার করিয়া সূক্ষ্ম উত্তাপ এবং উজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক অল্পপম সূত্র এবং শোভায় উদ্ভাসিত করিয়াছে। ধূমকলের আবিষ্কারে লোক বিস্মিত হইয়াছিল, ফনোগ্রাফের আবিষ্কারে লোক বিস্মিত হইয়াছিল, পুস্পকবানের (Airship) আবিষ্কারেও লোকে বিস্মিত হইয়াছে। কিন্তু অরণিঘর্ষের মন্থনে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া আদিম মানবের মনে যে অপার আনন্দ এবং বিশ্বরের উদ্বেগ হইয়াছিল, তাহার সহিত এসকলের তুলনা হয় না। তখন স্বভাবতঃ প্রাচীন ঋষির উদ্বেলিত হৃদয় বলিয়া উঠিল “অগ্নিমীলে।” যখন তাঁহারা দেখিলেন খজোত-সমান কণামাত্র অগ্নি ইন্ধনযোগে সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ কবিত্তে সক্ষম, অথবা যখন দেখিলেন পার্শ্বত্যাগ নিবিড় অরণ্যে বিদ্যুৎযোগে অথবা বাত্যান্দোষিত বৃক্ষশাখার ঘর্ষণে নিরাকার হইতে সাকারেব উৎপত্তি হয়, সহসা অগ্নি উদ্দীপ্ত হইবা মহাপরাক্রমের সহিত দিগ্দিগন্ত দগ্ধ করিয়া মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা দেখাইয়া, পুনরায় যেন নিরাকারে বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে—যেন পুনরায় কাষ্ঠমধ্যে লুকাইয়া হইয়া, সেই বলেব পুঞ্জ অগ্নি শিথিল হয় শয়ন করিয়াছে,—তখন প্রাচীন ঋষির মন নিশ্চয়ই যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, হর্ষ এবং ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিল। এই মহা-প্রভাবশালী অগ্নি কোনরূপে কোথায় লুকাইয়া ছিল, কি করিয়া আবার আবির্ভূত হইল, আবার কি করিয়া কোথায় তিরোহিত হইল! তাহাদের স্বাভাবিক কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই অগ্নি দেবতা অথবা নিরাকারে সাকাররূপ ভিন্ন কি হইতে পারে? বিশ্বদেবতাব প্রতীকস্বরূপ,—অথবা তাহারই রূপভেদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? স্বভাবতঃই

তাঁহারা স্তুতাদি বিবিধ আহুতি দ্বারা সেই দেবতার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

“যন্নঃ পুত্রবো রাধনু তদ্রাস্তস্ত দেবতাঃ।” রামায়ণ ॥ “যে লোকের বাহা অন্ন, সেই লোকের দেবতারও তাহাই অন্ন।”

ইচ্ছাদি অপরাপব বৈদিক দেবগণের কল্পনাও এইরূপ। ইহাই বৈদিক যাগযজ্ঞের মূলভাব। কিন্তু পরিচয়ই — অনাদরের নিদান — “Familiarity breeds contempt”—অগ্ন্যাদি দেবগণ বহিল, যাগযজ্ঞও রহিল, কিন্তু যতই লোকে অগ্ন্যাদির সহিত সুপরিচিত হইতে লাগিল, ততই সেই প্রাথমিক বিস্ময়, ভক্তি, আনন্দ, ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। ক্রমে অগ্ন্যাদি দেবগণের দেবত্ব সম্বন্ধেও লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলেই আমরা দেখিতে পাই ইন্দ্রেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঋষি মনে সংশয় হইয়াছে :—

“যদি সত্যই ইন্দ্র থাকেন, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যতোম (ভক্তি) কর্ত্তন কর। যেম ঋষি বলেন :—ইন্দ্র নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? কাহার স্তব করিব?” ১০০-৩।

সেই সংশয় দিন দিন গাঢ়তর হইল।

৫। যজ্ঞের পরিণতি এবং জ্ঞানকর্ম্মের বিবাদেব সূত্রপাত।

দেবগণের প্রতি সংশয়। “কাহার স্তব করিব?” কাহাকে আহুতি প্রদান করিব? সংশয়ের সঙ্গেই অগ্ন্যাদি দেবগণের প্রতি লোকের অন্তরের প্রজ্জ্বলিত হ্রাস হইতে লাগিল। অপর দিকে যেন সেই ক্ষতি পূরণের জন্যই যজ্ঞাদি বাহ্যমুঠানের আড়ম্বরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পৌরোহিত্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাহারা পরস্পরাগত স্তোত্র এবং অনুষ্ঠান-বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী তাহারা পুরুষপরম্পরায় পুরোহিত-শ্রেণীতে পরিণত হইল। প্রাচীন ইরাণে যেরূপ প্রাচীন ভারতেও সেইরূপই—হইয়াছিল। পৌরোহিত্য ব্যবসায়ের শ্রীবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের সমারোহও বৃদ্ধি পাইল। পুরোহিতগণ ব্যবসায় বিস্তারের জন্য যজ্ঞের সঙ্গে ঐহিক পারত্রিক ফল-বিষয়ক নানা প্রকার উপকথা “পুণ্ডিত্য বাচঃ” প্রচার করিল। কালক্রমে তাহা ঐতবেয়

* অনুষ্ঠানঃ ভরত বাহ্যমুঠ ইন্দ্রায় সত্য যদি সত্যমিতি। নেত্রোজ্জ্বলিত নেত্র উৎসাহক ইং মর্শ্ব কমতিঃ বাম। ৮-১০০-৩।

প্রভৃতি ব্রাহ্মণেব আত্মাবে লিপিবদ্ধ হইয়া পৌৰোহিত্য ব্যবসায়ের বিশেষ সহায় হইল। যজ্ঞাদির প্রকৃত মর্ম বতই লোকে ভুলিয়া গেল, ততই দিন-রাত্রির খেলা আরম্ভ হইল। এইরূপে যজ্ঞেব বাহ্যভাব বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে বিস্তীর্ণ অর্থমেধ এবং রাজস্ব প্রভৃতিব আকার ধারণ করিল। আমবা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলেই দেখিতে পাই যজ্ঞোপলক্ষ রাজাগণ পুরোহিতদিগকে কিরূপ অকাতবে ধনদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন :—
ঋষি শোভবি চিত্র নমক রাজাব ধনদানেব স্তুতি করিতেছেন :—

“এই ধন কি আমার ইন্দ্র কীবা স্রবতী দিরাছেন? অথবা হে চিত্র (রাজা), তুমি দিরাছ। স্রবতীভীরে অস্ত্র যে যে আছেন, পর্জন্যের বারিধারার জায় চিত্র সহস্র এবং অমৃত ধনদানে তাহাদিগকে কৃপা করেন।” ৮-২১-১৭, ১৮।*

দানস্তিহি অনেক ঋগ্বেদেব দেবতা হইয়া পড়িয়াছিল—
বশ ঋষি পৃথস্বার দানের স্তুতি কবিত্তেছেন :—

“আমি যন্তি সহস্র অমৃত অব, বিশ শত উষ্ট্র, এবং বশ সহস্র গো লাভ করিয়াছি।” ৮-৪৬-২২।†

এইরূপে যজ্ঞেব সহিত পুরোহিতদিগেব স্বার্থ অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বন্ধ হইল। পুরোহিতেরা কখনও অপনাদিগের ব্যবসায় নষ্ট হয় এরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন না। বরং পৌরোহিত্য ব্যবসায়কে বৃদ্ধপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য তাহারা যথাসম্ভব উপায় অবলম্বন করিলেন। যজ্ঞ আর পূর্বের মত সহজসাধ্য রহিল না। যজ্ঞমান এবং যজ্ঞমানপত্নী নিজেরাই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্নির আসনের জন্য কুশ বিস্তার করিয়া অগ্নিদেবকে “অগ্নি আগমন কর” “অগ্ন আরাহি” বলিয়া ডাকিয়া “কুশোপরি উপবেশন কর” “নিষৎসিবর্হিসি” “হব্যাদাতার হব্য গ্রহণ কর” বলিয়া তাহাকে নিজ হস্তেই স্তুতাদি আহুতি প্রদান করিবেন—
যজ্ঞ আব সেরূপ সহজসাধ্য বহিল না। পুরোহিত হইল ক্রমে চারিজন, তাহার পব সাত জন, তাহার পর বোলজন পুরোহিত। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন যজ্ঞের

* “ইন্দ্রো বা খেদিরদ্রব্য স্রবতী বা স্রবতী দিবিবহ। ঋ বা চিত্র দাণ্ডয়ে।” ৮-২১-১৭।

† “চিত্র ইন্দ্ৰাজ্ঞা রাজকাইদশকে যকে স্রবতী সন্তু। পর্জন ইব তনুদ্বিষ্টো সহস্রমুতা দদৎ।” ৮-২১-২৮।

+ “যন্তিঃ সহস্রখন্তাত্তান যুটীণাং বিশংতি শতা। দশত্বাণীণাং শতাবশ, ত্র্যশ্বাণীদশ গবঃ সহস্রা।” ৮-৪৬-২২।

খুঁটিনাট কত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে বাহা পুরোহিত ভিন্ন কেহ জানিতে পারে না। চক্ৰ, পুরোডাশ কিরূপে প্রস্তুত করিবে, কত খণ্ড কপালে বা চাড়াতে তাওয়া প্রভৃতি পাত্র অর্পণ করিবে,—“একাদশ খণ্ড কপালে পুরোডাশ প্রদত্ত হয় অথচ তাহার ভোক্তা ছই জন দেবতা—অগ্নি ও বিষ্ণু—ইহা কি সূত্রানুসারে, কি প্রকারে বিভক্ত হয়।”—ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের বিচার! অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপের সময় কোন্ ঋগ্বেদ, কোন্ পুরোহিত উচ্চারণ করিবে, যজ্ঞমানকে কিরূপে সংস্কার করিতে হয়; কত মুষ্টি কুশ দ্বারা যজ্ঞমানের শরীর পরিষ্কার করিতে হয়; বজ্র দ্বারা দীক্ষিতকে কিরূপে গর্ভস্থ শিশুর উদ্বোধন হয় আচ্ছাদন করিতে হয়, কিরূপে কৃষ্ণ মুগচর্ম দ্বারা জরায়ুব জায় দীক্ষিতকে বেষ্টন করিতে হয়, দীক্ষিতকে কিরূপে গর্ভস্থ শিশুর জায় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকিতে হয় ইত্যাদি বিষয়েব গভীর গবেষণা! তাহার সঙ্গে আবার এসকলের সাঙ্কেতিক (Symbolical) ব্যাখ্যা :—

“যে ব্যক্তি পূত্র-পত্নী-অবলম্বন-রহিত সে ব্যক্তি যুতপক্ষ তুল্য দ্বারা চক্ৰ অর্পণ করিবে। সে চক্রেতে যে যুত তাহা স্রোতী হানীর, এবং তাহাতে যে তুল্য তাহা পুরুষশক্তি হানীর। সেই যুতযুক্ত চক্ৰ দক্ষিণে সদৃশ”—ইত্যাদি।

এইরূপে যজ্ঞেব আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ বহুত্বপূর্ণ নহ্ন হইতে সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করিল। পুরোহিত-ত্রৈলী ভিন্ন অন্য কাহারও তাহাতে প্রবেশাধিকার রহিল না। যজ্ঞের ঐট “বার হাত শসার তের হাত বোচির” অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :—

“অগ্ন্য-কর্ষ-কলপ্রদাং, ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভৌগৈশ্বৰ্য্য-পতিং এতি।”

অপব দিকে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ত নামে অভিহিত ৯০ সূক্তে আমবা দেখিতে পাই যে দেবগণ বিশ্বপুরুষকেই হবি কল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞের আধ্যাত্ম্য বসন্ত, যজ্ঞকাষ্ঠ গ্রীষ্ম, স্তুত শরৎ। দেবগণ সেই আদিপুরুষকে যজ্ঞরূপে অগ্নিতে প্রদান করিলেন। তাহা হইতে পশুাদি এবং বেদসকল উৎপন্ন হইল। দেবগণ সেই পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিলেন। তাহাবই এক এক খণ্ড হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, চক্ৰ, সূর্য্য, ইন্দ্ৰাণি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, জ্যোত্বক, মিত্র এবং দিকসকল উৎপন্ন হইল। যজ্ঞ আর সামাজ্য

বাহু-অস্থান রহিল না। শুক্ল কবি উপাসক বিশ্বসংসার-ময় এক মহাবজ্র দেখিতে লাগিলেন এবং বলিয়া উঠিলেনঃ—
“যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ।” যজ্ঞ একপ্রকার শুষ্ক আধ্যাত্মিক ব্যাপার হইয়া পড়িল। গীতাতে আমরা অসংখ্য-প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা :—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, এবং জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি (৪-২৮)। আধুনিক মহাসংহিতাতেও আমরা ঋক্ মহাযজ্ঞের বিধি দেখিতে পাই, যথা :—অধ্যাপন বা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ বা পিতৃযজ্ঞ, হোম বা দৈবযজ্ঞ, বলি বা ভূতযজ্ঞ, অতিথিপূজা বা নৃযজ্ঞ। বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের পূর্বেই অনেক জ্ঞানী ঋষি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—

“কীধে পুণ্যে মর্ত্য লোকং বিশস্তি”—“যজ্ঞলভ্য পুণ্যের করে মর্ত্যালোকে পুনঃপ্রবেশ করে।” “নাক্ত পৃষ্ঠে, তে স্ক্রুতে বৃহস্পত্য লোকং হীনতরং বা বিশস্তি।” “যদি সংকর্ষের ফল অশুভব করিয়া পুনরায় তাহারা এই মর্ত্যালোকে অথবা নরকাদি হীনতর লোকে গমন করে।”
এইরূপে কালক্রমে আমাদের দেশে জ্ঞানকর্মের বিধিদের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদল পুরোহিত-শ্রেণীর মুখপাত্র হইয়া বলিতে লাগিল :—“কর্ম হইতে জীবনের জন্ম” “কর্ম-প্রতিষ্ঠাই বেদের লক্ষ্য।” আর একদল জ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া বলিতে লাগিল :—

“তর্মেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমজ্ঞা যাতো বিশ্বকথায়তশ্চৈব সেতুঃ”—
“একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, অন্য কথা পরিত্যাগ কর।
আত্মজ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের উপায়।”
পরে একদলের নেতা হইলেন জৈমিনি। তাঁহার মতে কর্মই মুখ্য,—জ্ঞান আত্মসঙ্গিক মাত্র। অপর দলের নেতা হইলেন বাদরায়ণ। তাঁহার মতে জ্ঞানই মুখ্য—কর্ম আত্ম-সঙ্গিক মাত্র। কর্মীর মতে জ্ঞান-বিষয়ক শ্রুতি অর্থবাদ মাত্র। জ্ঞানীর মতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের সহায়তা করা ভিন্ন কর্মের অজ্ঞ কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। এই উভয়দলের সন্ধিস্থলে তৃতীয় একদলেরও অভ্যুদয় হইল। তাঁহার কর্ম এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্য স্থাপনে যত্নবান হইলেন। তাঁহাদের মতে জ্ঞান ও কর্ম দুইই এক :—

“সাধ্যা-বোধো পৃথগালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।” “জ্ঞান এবং কর্মের ভিন্নত্ব বাগকোচিৎ প্রলাপমাত্র।” গীতা। “পক্ষয দ্বারা যেমন পক্ষী আকাশে গমন করিতে সক্ষম হয়, মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান এবং কর্মও সেইরূপ দুইটি পক্ষস্বরূপ।” “উভাত্যমেব পক্ষাত্মা যথা যে পক্ষিপো গতিরিত্যাদি।” বোধ-বাণিত।

৬। বৈদিক কর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের সংগ্রাম।

*অপরদিকে বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত প্রভাব দাবানলের মত দেশময় বিস্তৃত হইল। বুদ্ধদেবের উদার সার্বভৌমিক প্রেম এবং সমতার আদর্শের সমক্ষে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বালির অট্টালিকা আব দাঁড়াইতে পারিল না। যেন আকস্মিক বিজ্ঞাপাতে পুরোহিত-শ্রেণীর মুখের গ্রাস হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু তাহা দেখিয়াও পুরোহিত-শ্রেণী নিরাশ হইল না। তাহারা সময়ের প্রতীক্ষায় বহিল। কালক্রমে যখন বৌদ্ধ-শিক্ষা প্রেমভক্তিবিহীন শুষ্ক তৈলুকবাদে পরিণত হইল, তখন সুযোগ বুঝিয়া পুরোহিত শ্রেণী স্বীয় ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। শব্দ স্বামী জৈমিনিরূপিত কামীমাংসা সূত্রের এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য রচনা করিলেন। বিখ্যাত কুমারিলভট্ট সেই ভাষ্যের এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাস্তিক রচনা করিলেন। পণ্ডিতবর কুমারিল প্রথমে বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে অনেকবার পরাজিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধশিক্ষা লাভ করিলেন। পুনরায় তিনি বৈদিক কর্মমार्গের পক্ষে বৌদ্ধদিগের বিপক্ষে সমর ঘোষণা করিয়া দ্বিধিজয়ে বাহির হইলেন। তখন তিনি “অসংখ্য বৌদ্ধ এবং জৈনদিগকে নানাবিজ্ঞাবিষয়ক বিচারে পরাজিত করিয়া, বাজাব আদেশক্রমে পরন্তু দ্বারা তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিলেন, এবং বহু উলুথলে নিক্ষেপ করিয়া মুঘলাঘাতে তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিলেন। এইরূপে হৃষ্টমতসকল ধ্বংস করিয়া তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।”^{*} কিন্তু এত করাতেও উৎসর্গ বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি, অথবা বিলুপ্ত বৈদিক দেবতা পুনর্জীবিত হইল না। পুরোহিত-শ্রেণী নিষ্ঠুরদণ্ডনীতির বলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিনাশ সাধন করিয়া তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্টকে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার মানসে কুপানীতি অবলম্বন করিলেন। কঠোরের পর ক্রোমল সর্বদাই কার্যকরী

* ভট্টাচার্য্যাব্দো বিজয়ঃ কচ্ছিন্নদেশাং সমাগত্য দ্বষ্টমতাবলম্বিনো বৌদ্ধান্ জৈনানসংখ্যাতান্ রাজমুখাদনেকবিজ্ঞাপ্রসঙ্গভেদৈর্নিক্রিয়া তেবাং শিবাণি পরভূতিশ্চিদা বহু উলুথলেনু নিক্ষিপ্য কটপ্রমণৈ শূন্যকৃত্যচৈব দ্বষ্টমতধ্বংসমচরন্ নির্ভয়ো বর্ততে। শব্দবিজয়—একরূপ ৫৫।

হয়। যদিও বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজার কোনও স্থান নাই, তথাপি পুর্বোক্ত-শ্রেণী বৌদ্ধদিগের বুদ্ধমূর্তিপূজার অনুকরণে দেশের সর্বত্র নানাপ্রকার পরিচিত অপরিচিত দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধকেও বিষ্ণুবই অবতারবিশেষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবতাবদিগের মধ্যে বুদ্ধ স্থানলাভ করিলেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার পক্ষে গোঁববেব কিছুই নাই। পদ্মপুরাণে মহাদেব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন :—“দৈত্যাদিগের বিনাশের জন্য বুদ্ধরূপী বিষ্ণু ক্ষণিক জৈন প্রভৃতি অসং বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।” এইরূপে বৌদ্ধধর্ম দেশ হইতে তাড়িত হইল। কিন্তু বৈদিক দেবগণ অথবা লুপ্ত বৈদিক ষাণ্ডবজ্ঞ পুনর্জানিত হইল না। বাহা হউক ক্ষুদ্র আশাশ্রয়, সময় অনুকূল, দেশ হস্তগত—পুরোহিত-শ্রেণী সেই সুযোগ হাবাইলেন না। তাঁহারা প্রাচীন পুৰাণ-সকল পবিত্রীকৃত এবং পবিত্রীকৃত করিয়া অথবা বৈদিক ধর্মের কথঞ্চিৎ আভাস গ্রহণ করিয়া, ব্যাসের নামে নূতন পুৰাণ বচনা করিয়া অথবা মহাদেবের নামে তন্ত্রাদি বচনা করিয়া এবং অঙ্কলোকের চিত্র আকৃষ্ট হয় একরূপ দেবদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগের ব্যবসায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখিতেছি নারদ ব্যাসকে কাম্য ফল লাভের জন্য নামরূপাদিসূক্ত কল্পিত দেবতাপূজায় লোককে প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন :—“জুগুপ্সিত বা নিন্দনীয় কাম্যকর্মাদিতে লোক স্বভাবতঃই অনুরক্ত। সেক্ষণ কাম্য কর্মকেই ধর্ম বলিয়া উপদেশ করা তোমার পক্ষে অজ্ঞান হইয়াছে। তোমার বাক্যকে আশ্রয় করিয়া সাধারণ লোকে এইসকল কাম্য কর্মকেই ধর্ম মনে করিবে। কোন তত্ত্বজ্ঞানী যদি তাহাদিগকে সেই-সকল কাম্য কর্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করে তাহারা সে নিষেধ গ্রাহ্য করিবে না।” “জুগুপ্সিতং ধর্ম কৃতং হুশাসতঃ স্বভাব-রক্তস্ত মহান ব্যতিক্রমঃ। যদ্যক্যতো ধর্ম ইতীতবঃ স্থিতঃ ন মন্যতে তস্ত নিদারণ্যং জনঃ॥” সে বাহা হউক স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবলে পুরোহিত-শ্রেণী লোকের ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। কুমারিলের ভ্রাতৃত্বের শেষভাগে শঙ্করাচার্যের

অভ্যাস। বৈদিক জ্ঞানমার্গের প্রতিষ্ঠা, অথবা উপনিষদব্রহ্মের জ্ঞান প্রচার করাই শঙ্করের জীবনব্রত। তিনি যে কর্মমার্গের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন একরূপ বলি যায় না। তবে চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্য ভিন্ন যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি বলেন “চিত্তশুদ্ধির বশ্য” চিত্তশুদ্ধি সাধন দ্বারা জ্ঞানার্গম্ভের পথ সুগম করা ভিন্ন কর্মের কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। শঙ্কর কাম্যকর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐহিক অথবা পাবিত্রিক সম্পদ-লাভের উদ্দেশ্যে কর্মানুষ্ঠানের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। এই জন্যই কর্মিগণ সময়ে সময়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া শঙ্করের বিন্দা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণ শঙ্করাচার্যকেও একান্ত অতি দৌর-ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। মহাদেব তাঁহার প্রচারিত অশ্বৈত মত নৈকর্ম্য মত এবং মায়াবাদ সম্বন্ধে পার্শ্বতীকে বলিতেছেন :—“হে দেবি, কলিকালে আমিই ব্রাহ্মণের রূপে (শঙ্করাচার্য) মায়াবাদ নামক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ অসংখ্য প্রকাশ করিয়াছি। আমি তাহাতে শ্রুতিবাক্যের লোক-নির্দীকৃত অর্থ প্রদর্শন করিয়াছি, কর্মের স্বরূপ-ত্যাগ্য প্রতীপাদন করিয়াছি। সর্বকর্মপরিভ্রষ্ট হইয়া নৈকর্ম্য লাভ, জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্ব এবং পরব্রহ্মের নিঃশব্দ প্রতীপাদন করিয়াছি। সমস্ত জগতের বিনাশের জন্য আপাততঃ বেদার্থের অনুযায়ী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবৈদিক মায়াবাদরূপ মহাশাস্ত্র জগতের বিনাশের স্তম্ভ কলিকালে আমিই বলিয়াছি।” ইহাতে দেখা যায় পদ্ম-পুরাণাদি কত আধুনিক গ্রন্থ।

আমরা শ্রোত বা শ্রুতি (বেদ)-বিহিত এবং স্মার্ত বা স্মৃতি-বিহিত কর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণন করিলাম। শ্রোতকর্ম বহুকাল হইতে বিলুপ্ত; স্মার্ত কর্ম মাত্রই দেশে কথঞ্চিৎ প্রচলিত। মহাসংহিতা বলিতেছেন :—“বেদোহধিলো ধর্মমূলঃ” ২-৬—বেদই সকল ধর্ম-কর্মের মূল। স্মৃতিরও মূল শ্রুতি। “ধর্মঃ জিজ্ঞাসমানান্য প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ” ২-১৩ ॥ তাঁহার টীকায় কল্পক বলিতেছেন :—“শ্রুতি এবং স্মৃতির অর্থের বিরোধ হইলে স্মৃতির অর্থ আদরের অযোগ্য, এবং প্রমাণ-স্বরূপ জাবালের মত :—“শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধেতু শ্রুতিরৈব পরীক্ষ্যমী” এবং জৈমিনীর মত :—“বিরোধেত্বেনৈক্যং তদসত্যং তদ্ব্যবহাৰং” উল্লেখ করিতে

ছেন। আমাদের শাস্ত্রমতে যদিও শ্রুতি স্বয়ং এ সম্বন্ধে নীরব, একমাত্র শ্রুতিই অপৌরুষেয়, প্রত্যক্ষবৎ এবং অপ্রাপ্ত ঈশ্বর-বাণী। দেশের প্রচলিত ব্রতপুঞ্জাদির শ্রুতিগত কোন ভিত্তি নাই। শ্রুতি অনুমান মাত্র এবং অপরাপর অনুমানের ভ্রাম্য পরীক্ষার যোগ্য। টাকা যেমন লোকে বাজাইয়া লয়, শ্রুতির বচনও সেইরূপ বাজাইয়া লইতে হয়। স্বতঃ-প্রমাণতা একমাত্র শ্রুতিরই অধিকার। শ্রুতির সেরূপ কোন অধিকার নাই। দৃষ্টান্তস্বলে বলা যায়। মনুশ্রুতি বলিতেছেন ‘ন শূদ্রায় মতিং দত্তাৎ’ শূদ্রকে জ্ঞমতি দান করিবে না; এই নিষেধ বচনের শ্রুতিগত কোন মূল দৃষ্ট হয় না। শ্রুতি ঈশ্বরবাণী হইলে ঈশ্বরের পক্ষে এরূপ শূদ্র-বিষেব অসম্ভব। আবার মনু ঋগ্বেদেরও মনু বা আদিম মানব। তাঁহাব ভাষা বৈদিক সংস্কৃত না হইয়া আধুনিক সংস্কৃত হইতে পারে না। কোন আধুনিক শূদ্রবিষেবী মনুর নাম দিয়া উক্ত বচন প্রচার করিয়া থাকিবে ইত্যাদি কাণে ‘ন শূদ্রায় মতিং দত্তাৎ’ এবম্বিধ শ্রুতিবচন প্রমাণের অযোগ্য। এরূপ অবস্থার আমাদের দেশের অধুনাতন প্রচলিত ব্রতপুঞ্জাদি দ্বারা শ্রুত্যুক্ত পারলৌকিক স্বর্গাদি ফললাভের কতদূর সম্ভাবনা, আপনানাই বিচার করিবেন। আমরা দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধ অভ্যাসের পরে, লুপ্ত বৈদিক কর্মের স্থান পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রুতিপূরণাদি প্রবর্তিত হইয়াছিল। গীতা যথার্থই বলিয়াছেন, “গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ” কর্ম্মের তত্ত্ব অতি জটিল। কৰ্ম্ম বলিতে এখানে গীতাও শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কৰ্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছেন।

বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি “চিত্তস্ত শুদ্ধয়ে কৰ্ম্ম।” যে কার্য্য করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় তাহাই যথার্থ কৰ্ম্ম, তাহাই কর্তব্য। বাণী তড়াগাদি খনন বা পূর্ত্তকার্য্য অথবা অশ্রু প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। মানুষ জ্ঞানে মানুষ-মাজেরই প্রতি প্রেম এবং মর্যাদা প্রকাশ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, অতএব এসকলই যথার্থ কৰ্ম্ম। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলে, তাঁহারই সেবাব উদ্দেশ্যে তাঁহার নরনারীর সেবারূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে, চিত্ত শুদ্ধ হয়, অতএব তাহাই যথার্থ কৰ্ম্ম। ব্রহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র “তস্মিন প্রীতিঃ স্তুতঃ প্রিয়কার্য্য সাধনকঃ”—ইহাই

যথার্থ কৰ্ম্ম-বীজ। “শ্রুতিধিকোহহং স্বপচক্রজ্ঞেতি”—বলিয়া স্বীয় ধর্ম্মাভিমাানে স্মৃতি হইয়া চণ্ডাল কিংবা মেধবের প্রতিও যুগাপ্রদর্শন করিলে, চিত্ত অশুদ্ধ হয়, অতএব তাহা কুকৰ্ম্ম। অহ্মার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে, অথবা শক্তি থাকিতে প্রত্যাপকার না করিয়া পরের তত্ত্বল ধ্বংস করিলে, চিত্ত অশুদ্ধ হয়, অতএব তাহা কুকৰ্ম্ম। বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধিই মূলই অন-স্তম্ভি। উদার দৃষ্টিতে বিচার করিলে লৌকিক এবং বৈদিক কৰ্ম্মেও ভেদ তিরোহিত হয়। ইহাই কৰ্ম্মের সার-তত্ত্ব।

শ্রীবিজ্ঞানাস দত্ত।

কফিপাথর

ভারতী (ভাদ্র)।

আমার বাল্যকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

হেলেবেলায় বড়দাদা আমার সঙ্গে সঙ্গী ছিলেন। বড়দাদা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাঁর ছবি আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। সেই বাল্যকালের কবিত্বোচ্ছ্বাস হতে ছোট কাব্যরত্ন প্রসূত হয়—মেঘদূতের পঞ্চমুখবাদ ও যশপ্রাণ; তা ছাড়া শুষ্কাক্রমণ কাব্য ও অন্যান্য ছোটখাটো কবিতাও অনেক আছে। শুষ্কাক্রমণ কাব্যের নমুনা—

পড়ে বেই লোক এ মোক,

পায় সে শুষ্কলোক ইহার পরে

যথা শুষ্কধারী ভারি ভারি

গোঁপের সেবা করি যথেষ্ট বিচরে।

তারপরে কিজানি কেম সহসা তিনি শুষ্কবিদ্যামুগ্ধীলনের দুরহ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন হলেন, কাব্য ও চিত্রকলা চর্চা এখানে থেমে গেল।

তৎকালে আলোচনার সঙ্গ সঙ্গে আর ছুটি সৌখীন কলা তাঁকে অধিকার করে বসল—কাগজের বাস্তব রচনা-প্রণালী, আর রেখাঙ্কর বর্ণমালা। তাঁর মতে এ শুধু হেলেখেলা নয়, এ ছই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লেখার সরঞ্জাম আর সহজ লিখনপ্রণালী দুইই তো দরকার। বাস্তবের লক্ষ্য তাঁকে অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসার সহকারে সমস্ত গণিতশাস্ত্র মন্বন করতে হয়েছে এবং বাস্তবত্বের নবগণিতশাস্ত্র আবিষ্কার করে এক আমেরিকান গণিতের হাতে পরীক্ষার লক্ষ্য সন্মতি দেওয়া হয়েছে। রেখাঙ্করও এক অগূর্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরসম কৌশলের হুড়াহুড়ি। সন্মতি এই রেখাঙ্করগন্ধিত পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে।

আমি বাল্যকালে রেখাঙ্কর লিখনপদ্ধতি অভ্যাস করি নাই, কেবল নিজের সঙ্কেতলিপিতে টুকে নিয়ে অনেক বস্তু তা লিপিবদ্ধ করতাম। ব্রাহ্মসভ্যের বেনী হতে পিতৃদেবের উপদেশ আমি টুকে নিয়ে পরে লিখে তাঁকে দিতাম, তিনি সংশোধন করে ছাপাতে দিতেন; সেইগুলি “ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান” নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমি ইংলেণ্ড যাবার পর পিতৃদেবের বস্তু তা তুলসি দেবার কাজ আমার কবিত্ব জ্ঞাতা ছেলেদের

নিযুক্ত হন [তাঁর চৌকা মহর্ষির উপদেশ 'সাহিত্য' পত্রিকাও করেকটি প্রকাশিত হয়েছে।]

বড়দাঙ্গা আর আমি দুজনে ছিলে গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকগুলি আমাদের বৃত্তরচনা, স্তবক নিম্নরূপ রচনা।

বড়দাঙ্গা অনেকগুলি ভাষে ভাষে হৈরাণি রচনা করেছিলেন।
নমুন—

১—বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরষ্মে সবে বার বীধা ;
শেষ দু অক্ষবে আর সবে বার বীধা ;
সবটাতে চুই গারে—বীধা আর বীধা ;
মুখে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের বাধা । (= রসিক ।)

২—বল দেখি দুটি কল,—

তার ভিতরে পণ্ডরা যায

ব্রহ্মাণ্ডের বা কিছু সকল । (= ?)

৩—ইংরাজিতে বলে বাহা প্রথম অক্ষর,
বাঙলার তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথা জানার আপত্তি,
সব ভাতে বাত নাড়ে, বিষম বিপত্তি ।
দু অক্ষরে কল এ কি বল দেখি তাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই । (= নোনা ।)

বড়দাঙ্গা আমাদের বাড়ীর লবি ছিলেন। আমাদের অনেক বরাও কথা তাঁর কবিতার মধ্যে ছান পেত। তিনি তাঁর স্বপ্নপ্রায় কাব্যে আমাদের ভাইদের এইরূপ বর্ণন করেছেন :—

ভাতে বধা সত্য হেম, মাতে বধা বীর,
গুণোজ্যোতি হয়ে বধা মনের তিমির ;
নব শোভা ধরে বধা সোম আর বুবি,
সেই দেব-নিমন্তন আলো করে কবি ।

ববাহনগর উদ্ভানে ।

নিশি অবসান প্রায়, স্বপ্নে সবে নিদ্রা বার,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে ।
বা নিদ্রা হ্রস্ব নায়ে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুজনি কি মধুর তাহে ॥

দ্বিস্রাজ হেন বেলা, বাহির হ'ল একেলা
হর্ষ্য হ'তে হরম্য উদ্ভানে ।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতবতী
সনমুখ দ্বিত্ব সিদ্ধ পানে ।
শব্দী অন্ত বার বার কি হৃদশা হার হার
কেবা তব ছরবহা দেখে ।

এমন যে বহু তার, অচ্ছন্দে এখন তার
তারে কেলে বার একে একে ।
মিস্র অতি এই কাল, নাহি কোন গোলমাল
নিম্নক ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় ।
বোপে কোপে অক্ষরার, নন্তুল পরিহার,
লতাপাত্র হিমবিন্দুসর ।

পবপার বার দেখা, যেন এক চিত্রলেখা,
পশ্চিম বিগড়ে নন্তসীর ।
গাছে গাছে একাকা, মাঝে মাঝে রহে আর
কোণার প্রাসাদ সুদীর ।

শাখা পত্র চলাইরা, জলপুঞ্জ ফুলাইরা,
ফুলাইরা মাঠ মনমান ।

মুহম্বল বাবু বহে, মনে মনে দ্বিজ কহে,
আহা কি হুম্বর এই স্থান ॥

শান্তিনিকেতন ।

শান্তিনিকেতন, শান্ত হুশোন্তন,
হুত্ব হরিত ক্ষেত্র জামকান্ত নিভৃত বানন ।
বিমল শোভায, সরোবর ভায়,
নন্তসীর বনজীর স্বচ্ছ দরপণ ।

বড়দাঙ্গার সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামিনার ১৭ গড়িত 'বহুবাহা'-
নাটক-রচয়িতা। তাঁহার শিক্ষাগুণে সেই সময় বড়দাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ
রচনা করতেন—

কলিকাতা ।

ইংরাজ-রাজরাজ্যঃ বৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতঃ
রাজধানীং হুবিতীর্ণাং কলিকাতাং বিশস্তি তৎ ।
পরঃপুরপ্রবাহিতা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যঃ মেঘলিনীব না ।
রথ্যা রম্যাঃ হৃগম্যাক্ত বজ্র ভাস্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাত্রগলদ্বারি নিবারিতরজ্জ্বত বা
শতশীতযুক্তেন দুর্গেশ দুর্গ হারিভিঃ
উদ্ব্যৎবিদ্ব্যৎপ্রভাজাল সৈন্তশস্ত্রাজ্যশোভিনা ।
ত্রিলোকবিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে
হুবিতীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে ।
পূর্ণকাষা পুণ্যতোমা জাহ্নবী বাহিয়া যায,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেঘলিনী সম ভায় ।
হরম্য হৃগম্য বধ্যাপক পঞ্চ ব্যাপি রয়,
চর্চপাত্র-গলদ্বারি হুলিরাশি নিবারয় ।
শত শত তোপযুত দুর্গ ই দুর্গ-রক্ষিত,
উদ্ব্যৎ বিদ্ব্যৎপ্রভা-সৈন্তাশস্ত্রাজ্যজ্ঞত ॥

বড়দাঙ্গা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন, তার
কয়েকটি নমুন—

প্রভাত বর্ণনা ।

বৃক্ষগণ হেলিত স্থলীতল সন্নীরণে,
পুষ্প বত প্রসুটিত পুষ্পময় কাননে ।
মত্ত মধুপারীদল আহিল ডরা করি,
জাগিল বিহঙ্গমুল ভাগিল বিভাবরী ।

টঙ্কাদেবী ।

ইচ্ছা সম্যক্ জগৎ দরশনে কিন্তু পাথের নাস্তি,
পারে শিল্পী মন উড়ু উড়ু একি দৈবেয় শাস্তি ।
টঙ্কাদেবী করে যদি তৃপা না রহে কোন জালা,
বিজ্ঞাবুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভয়ে ঘি ঢালা ।
মন্দাকিনী ।

ইঙ্গবন্দেব বিলাত বাড়ি ।

• বিলাতে পালাতে হুটুট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্তে গৃহগ বিহঙ্গ গ্রীষ্ম বৌড়ে,

স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন-বশে কিছু হয় না,
বিনা ছাঁট্টা কোট্টা বৃত্তি পিরহনে মান রথ না । ১
পিতা মাতা ভাতা নবশিষ্ট অনাথা হট করি,
বিবাহে জাহাজে মসিমলিন কুর্ভা বুট পরি,
সিগারে উলসারে মুহুর-মুহুর ধূমলহরী
স্বপ্নবশে আঁধারে মলুকপতি মানে হরি হরি । ২
বিবাহে নীহারে বিবিজন সনে স্বেচ্ছা করি,
বিবাহে প্রাসাদে দুখীজন রহে জীবন ধরি ।
কি মেলে কীমেলে অমুনর করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবসিরিতে । ৩
কিরে এসে দেশে গল-কলর বেশে হটহটে,
গৃহে চোকে বোখে উলপতনু সেখে বড় চটে,
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলঝাড়ী সব ছিঁড়ে
ছুটা লাখে ভাতে হরকট করে আসন পিঁড়ে । ৪
শিখরিণী ।

বসন্ত ।

(রেখাকর বর্ণমালা হইতে)
মধু খড়্গ এল ধরণী মাঝে ।
হেলে দোলে লতা মোহন মাঝে ।
অমৃত বরিষে মুহুর সন্নীর
পরশ লভরে সুত শরীর ।
বৃক্ক বৃক্ক বৃক্ক বহিছে বার ।
খরিতা পড়িছে বকুল তার ।
মধুমালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
শুন শুনানিছে নব রসিক ।
পহরে পহরে কুহরে পিক ।
কুলের কে পাখি কুল কিনারা
অঙ্গণ বেন পগন-তারার ।
তরো তরো ফুল রঙ বেরঙ
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ
কেহ বা দোলে কেহ বা বোলে
কেহ বা গন্ধে মাতারে তোলে ।
কদম ছড়ার কনক-রেণু
রাখাল বখায় বাজার বেণু ।
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি ।
হরে ফিরি চল আর না আজি ।

মমুরা ।

জাতিতে যদিও বনের টিএ
রতন মাণিক মমুরাটি এ ।
ছার কোএলিরা ছার পাপিরা ।
মমুরাটি মোর লাখ রুপিয়া ।
কেবা জানে কুহু কে জানে পিউ ।
গাহে রসভরে চাহে বা জিউ ।
কানে বাহা শুনে ছ একবার,
মন থেকে তাহা নড়েনা আর ।

পেন্সিল-প্রকরণ ।

লেখনী গুজিয়া কানে পেন্সিল ধর
এখন লেখ' যা বলি—লেখ "হর হর" ।
পেন্সিল কবিতা হয় মত কি ছুঁচালো ?
অতিশূন্যে কোন কাজ উত্তরে না ভাল ।
সহজ মধ্যম হয়ে বাঁধিবে সেতার ।
সপ্তমে বাঁধিলে হবে সামলানো ভার ।
বেশী খাট ভাল না, ভাল না বেশী জিল ।
না সর না মোটা করি কাটিবে পেন্সিল ।
রেখাকর হবে তবে আঁজাব অধীন ।
চাপ দিলে মোটা হবে—চিল দিলে কীপ ।
পেন্সিল খণ্ড তোমার মাসেক চুমাস—
নলপত করিয়া চলিবে বেন হীস ।
কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধা,
অবাধে চলিবে যেন রজকের পাখা ।
ঐ জন্তুর মত মাস চাবি খাটি
নূতন পেন্সিল দণ্ড লবে যবে 'কাটি'
তখন তাহাকে হবে ধামানো কটিন ।
ছুটিবে—প্রাণ-ভরে বেগতি করিণ ।

সাধন-পদ্ধতি ।

কেমনে পাকাইবে হাত শুন সাবধানে ;
শিষ্য যুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কানে ।
শিষ্যটিবে কাছে ডাকি সভাবিবা মিষ্ট
সারস্বত বোগাসনে হ'রে উপবিষ্ট—
লেখনী ফিরিয়া হাতে সাজিবে লেখক,
শিষ্যটি হইবে আর উত্তর-সাধক ।
আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচারপত্র ।
তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছু ছত্র ।
ছিটা কেঁটা দিবে না রেখাই যাবে টানি ।
সজ্ঞপণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাণী ।
রেখাই পোকামাকড় কুমি বিটকাল,
উচ্চিড়ি কড়ি পিঁপড়া পালে পাল,
ক্ষান্ত হোক রোঙ্গো আগে করি কিলিবিলা ;
ধীরে হুহু কোরো শেষে ফুটকুনি বিলা ।
এক-মেটে করিয়া করিবে কাজ ফতে ।
দো-মেটে করিবে শেষে অবকাণ-মতে ।

সিদ্ধিলাভ ।

প্রথমে প্রথম খণ্ডে পাকাইবে হাত ।
ষষ্ঠীয় খণ্ডের তবে উলটিবে পাত ।
মন্তকে মথিরা লনে পুস্তকের সার ।
হস্তকে করিবে তার তুলক সোবার ।
হইবে লেখনী বোড়-বোড়ের বোড়া ।
আগে কিন্তু পাকা করি ঠাঁধা চাই গোড়া ।

বড়দাদা পল্লভ প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন । তাঁর পদ্ধতি-লেখা
সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—দার্শনিক ও সাংবাদিক ।
তাঁর সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বিজ্ঞা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়
কিন্তু গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ । সম্রাতি করেকমাস

যে 'গীতাপাঠ' নামক যে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসী' মাসিকপত্রিকার আমরা উৎসাহকাসহকারে পাঠ করেছি—গীতাশাস্ত্রের এই যে অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—এটি সম্পূর্ণ অব্যবহৃত জ্ঞান বেরবে, তখন ইহা গীতাশাস্ত্রের পরম আদরের সাধনী হবে নন্দে নাই। 'তত্ত্ব-বিজ্ঞান' হতে আরম্ভ করে এই 'গীতাপাঠ' যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য করা যায়—এই দুইয়ের মাধ্যমে বড়দাদার লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে, যেমন "সার সত্যের আলোচনা," "বিজ্ঞান এবং জ্ঞান," "হারাশপির অর্থবোধ," "ঐত্যা-বৈত্যা," "বিবর্তবাদ" (evolution), "বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যাতিবাস্ত," ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক ছাড়া সামাজিক প্রবন্ধও অনেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, যেমন "সোনার কাটি রূপার কাটি," "অধ্যাপি ও সাহেবিবানা," "একটি প্রশ্ন ও উত্তর" ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ ও সুপাঠ্য।

পদ্মই বল, গজই বল, বড়দাদার লেখার যে একটি মাধুর্য, প্রসাদ-গুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মেলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অল্প কোথাও দেখা যায় না। দুইদশ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল অতি সহজ ভাষায় জলের জ্ঞান প্রাচলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্রমতা। তাঁর লেখা যে পর্যন্ত নিরঙ্কুশ সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা, যার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককেও ডেকে শোনাতেন তিনি উৎসুক। এই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটা পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ করেছিল), আমরা সকলে তাকে কালো' দ্বাই বলে ডাকতুম—বড়দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রদায়' থেকে একটা কবিতা শোনাইলেন; তার কানে ঐ ঠাণ্ডার দেবতার কথার মত কি যে স্বপ্নমাখা মিঠি শাশল, সে শুনিব সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।

বড়দাদার দৃষ্টি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অটহাস, শিশুর জ্ঞান সেই সমস্ত জড়করণ, ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণো' সে দিনের সে সব কথা কি কখন ভোলা যায়? সে কালের ছোটকটি ঘটনা এখন মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটা স্ত্রী ছিল, তরু নাম কালী। তাঁর উপর কত রাগ, কত ভাবী, কত শুচি তুফান গুলি বর্ষণ হচ্ছে, আশ্রিতা দেখছি অনেক সময় অকারণে; চশমা বুঁজে পড়েছেন না তাকে কত ধমকানো হচ্ছে, চাঁৎকার ধনিত্তে আকাশ কেটে যাচ্ছে অথচ সেই চশমা হরত নিজের পকেটে—পকেটে বলাটাও ঠিক হল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠাকান রয়েছে—আমরা দেখিতাম দিলে শেষে হেসে অস্থির। এ দিকে এক হাতে যেমন তিরস্কার, পরদক্ষে অল্প হস্তে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ কতিসূর্যের কাজ চলছে, কালীও এই পালি পালান চড়টা চাপড়টার কোন ফলক্ষণ না—হঠাৎ মনের হুখে কাজ করে বাচ্ছে।—বড়দাদার ভোলা স্বভাবের ধরণে যে কত লোকে বিপথে পড়ত তার ঠিক নেই। হঠাৎ কড়িকে খবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে বখাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার ফিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ারো দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাওয়ার পেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারী প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্তে খাবার আসে—এ দিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল স্তম্ভে গেলে ঐক্যাত্মিক ডাকাডাকি পড়ে গেল।—একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্দেশ্যে আছেন—তাঁর বন্ধুর পাড়ী জনের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে—অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু তখনো সেখানে

বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অশ্রুজল হয়ে হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পাঠ চাপড়ে তাকে সাধনা করলেন।

যনের জন্ত পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য্য ক্রমতা, কেনন নাথু তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অল্প পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই-পাকী চাউল খাকী আরনা প্রেরণী' এই আছুরে ভাবার চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর পারের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইঁহুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের তো কথাই নেই, ওরা নাই পেলেতো মাথার চড়বেই কিন্তু কাককে প্রেরণ দিলে অল্প পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড়কীকে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন সে কাক বখাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হস্তুল বেধে গেল। সে কোথায় ধোঁজ ধোঁজ। বৃদ্ধিতে নানা নিকৈ চর পাঠনো হল, তারা জ্ঞাথে সে কাক কোস একটা দূরের গাছ গলে আছে—তাকে আনিরে বড়দাদা তবে হুহির।

বড়দাদার যা নিত্য নিবনিত প্রাতঃস্নান ঠাণ্ডা জলে—হা ভিন্ন-কালই সমান চলছে—দীতে প্রীয়ে রোগে আরোগে তার খার বিনাম নাই। ব্যাধার সময় তাঁকে ঔষধ পণ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাঁর লেখার মধ্য হয়ে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার নিম্ন ভুলে যান।

হাকেকের সহিত একদিন—শ্রী প্রবোধচন্দ্র মৈত্র—

কানুনকে হোমানলে পুত করিয়া ধারার তাহাকে সাধীর সীমন্তে সিন্দুরবিন্দুর মতো মনোমোহন এবং উজ্জল করিয়া তুলেন তাঁহানাই প্রকৃত কবি, এবং এহিসাবে হাকেকের স্থান অতি উচ্চে। কখনকি তিনি শুধু তাহার বীভৎসতার দিক দিয়া না দেখিয়া, তাহাব স্বেয়া বিশ্বসৌন্দর্যের যে একটি ছায়া প্রকটত হয়, তাহারই ধ্যান মুগ্ধ হইতেন; তাই পানপাত্র, দ্বারা এবং রমণী তাহার বর্ণনার প্রাণ বিবর হইলেও কোনটিকেই তিনি বিলাসীর বর্ণনার পর্য্যবসিত কানন নাই। আনন্দের তিনি চিরন্তন, এই তিনটির ভিতরকার আনন্দের অনুভূতিই তাহাদিগকে তাহার নিকট বরঞ্জী করিয়াছিল। তিনি হেরের মধ্যেও প্রের দেখিতে পারিতেন—আমরা যে সকল বিষয় হইতেই আনন্দের পূর্ণবাহ পাইতে পারি, ইহাই হাকেকের কাব্য-জীবনের মূলমন্ত্র।

হাকেকের সহিত চণ্ডিদাস ও বর্ণসের কবিতার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হাকেক আনন্দের পূর্ণবতার; চণ্ডিদাসের হয় বিবাহময়।

বিষে চাঁলতে হইবে, নিত্য নুতন পথ আবিষ্কার করিবা, নুতন আনন্দ আশ্বাসন করিবা,—এমন কথা হাকেক বহবার বলিয়াছেন। ঠিক এমনি কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও পাই।

হাকেক ভগ্নাঙ্গি দেখিতে পারিতেন না। তিনি প্রেমের চির-উপাসক ছিলেন বলিবা বিশ্বাস করিতেন প্রেমই স্বর্গের সোপান। তাই তিনি সেই ধর্মীজ্ঞতা বস্তুও আল্লাকে শ্রিয়ার পারের ভূতা ও স্বর্গ-ক শ্রিয়ার বিহারভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দৌলদ্য যে-আকারেই আহুক না কেন হাকেক তাহা পূজা করিতেন।

দুই একটু কথায় ক্ষমতার মধ্যে একটি বধুর রাসিণী স্বজন করিত হাকেক সিদ্ধহস্ত। দুই একটু তুলিকাশ্পর্কে হাকেক নরনসমক্ষ যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া যেন তাহাও অতি অপূর্ণ।

হাক্কেজের এমের কবিতা বিষয়সাহিত্যে অভুলনীয়। প্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন—

হাড়ার রাজ্যের পথে তার।
মণিমুগ্ধা কতই না জানি;
আমি কিন্তু মোব প্রিয়া লাগি
আঁখিতে বাঁধাব পথখানি।

তব কৃক কেশপাশে ডুবি
দিন মোর রাত হরে বার—
ওঠেই বেঠেই মাঝে পড়ি
আজ্ঞা মম প্রার্থনা হারায়।

মামুদের প্রাসাদের চেয়ে
বড় করি পড়িলাম বাড়ী।
একি দেখি? অন্ধি-ভারকাব
বাঁসা নিলে মে সমাবে ছাড়ি।

হে সিরাজি, হে হুন্দরী, হে তরুণ সাখী,
এমন জীবন বন্ধু, মোহিয়াছ তুমি;
তব কপোলের ক্ষুর কৃক তিল লাগি
বুধারা সমরকল্প দিতে পারি আমি।

ইমার্সন বলিবাছেন যে, হাক্কেজ নিজের মধ্যে পিণ্ডাব, আনাফ্রিন, হোরেস এবং বাসস্কে সম্মিলিত করিবাছেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে একটি দার্শনিকের ভাব আছে, তাহা তাঁহার নিজস্ব।

চতুঃষষ্টি কলা—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল—

অতীত যুগে ভারতবর্ষে কলাবিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়া ৬৪ বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। (১) গীত। শাক্তদেব-কৃত সঙ্গীতরত্নাকর, দ্যামোবর-কৃত সঙ্গীতমণ্ডপ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তিন গ্রাম, সমুদ্র, স্বাধিশেতি প্রভৃতি, ছব রাগ ও ছত্রিশ বাসিন্দী ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতির সাক্ষী। (২) বাঁজ; চার ভাগে বিভক্ত—বীণা প্রভৃতি তত-বস্ত্র, বৃন্দ প্রভৃতি আনন্দ-গায়, বাঁশী প্রভৃতি শুবির বস্ত্র ও কাশতাল প্রভৃতি বন-বস্ত্র। (৩) নৃত্য; যিবিধ—পুঙ্খের উচ্চাঙ্গ নৃত্য তাণ্ডব, ও রমণী ললিত চরণক্ষেপের নাম লাভ। নৃত্যাসুর প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্যের বিবিধ কৌশল ও সঙ্গীর পরিচয় আছে। (৪) আলোচ্য; ভাবতবর্ষে এই বিদ্যা যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহাব পরিচয় প্রাচীন কাব্যাদিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। (৫) তিলক-বচনা; এই তিলকবচনার উদ্দেশ্য কাহারো মতে ক্রমধ্যে বা নাসিকায় দৃষ্টি স্থির রাখিতে সহায়তা করিবার জন্য, কাহারো মতে মুখের শোভাসম্পাদনের জন্য। (৬) ভণ্ডুল-কুহুম-বলি-বিকার; যিবিধ বর্ণে রঞ্জিত তণ্ডুল বা যিবিধ বর্ণের পুষ্প ভূমিতলে ছড়াইয়া চিত্ররচনা—[আলিপনার রূপান্তর]। (৭) পুষ্পান্তরণ; যিবিধবর্ণের পুষ্প যুজ্জে প্রথিত কবিবা শয্যারচনা। (৮) মণনবসনান্তরণ; বস্ত্র, বস্ত্র ও অঙ্গ কুহুম চন্দনাদি রঞ্জন দ্রব্যে ছোপানো। (৯) মণিমুসিকাকর্ষ; যিবিধ প্রকারের প্রস্তরাদির দ্বারা ঋতু-সমরোপযোগী কবিবা কঙ্কতল-নির্মাণের বিদ্যা। (১০) শযন-রচনা; ঋতুভেদে উচ্চতা বা নীতলতা-জনক শয্যাবিভাস। (১১) উদকবাত্ত; জলে হৃদমাদিবৎ বায়ুধ্বনি করা; এক ললপূর্ণ পাত্রে ক্রিয়াক্রমে ঝাঁড়িয়া তন্তুস্থিত এক পাত্র হইতে জলনিক্ষেপ দ্বারা ধ্বনি উৎপন্ন করা; জলতরঙ্গ প্রভৃতি। (১২) উদকবাত্ত; জলবিহার-সময়ে যিবিধ প্রকারে সলিল তাড়না

ও সলিলনিক্ষেপ। (১৩) চিত্রযোগ; যিবিধ উপারে শব্দর কেশ গুল্ল করিয়া বা রোগ উৎপাদন কবিবা শব্দর অনিষ্ট ঘটানো। (১৪) মালাগ্রন্থন। (১৫) শেশর ও আপীডক-বোজন; নানা বর্ণের পুষ্পে মণ্ডকে ধাবণযোগ্য মালা রচনা। (১৬) নেপথ্য প্রয়োগ; দেশ ও ঋতুভেদে বস্ত্র ও মালা পরিধানের নিয়ম। (১৭) কর্ণপত্র রচনা; বস্ত্র শব্দ প্রভৃতি দ্বারা কর্ণজ্ঞান নির্মাণ। (১৮) পঙ্কযুক্তি। (১৯) জুঘণবোজন। (২০) ঐন্দ্রজালিক কৌড়াদি। (২১) কোচুমার-যোগ; কুচুমার কর্তৃক কথিত দেহরত্ননামির যিবিধ উপায়। (২২) হস্তলাঘব, অর্থাৎ কণ্ঠে কি প্রকার কবিতা। (২৩) বিচিত্র-পাক-বৃক-ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া, বা রত্ননবিদ্যা। (২৪) পানক-রস-রাগাসব-বোজন বা পানীয় মদ্যাদি প্রস্তুত। (২৫) স্থতীকর্ষ। (২৬) স্থজ-কৌড়া বা ঐন্দ্রজালিক কৌড়ার প্রকারভেদ। (২৭) বোণাডমল্লাস্ত। (২৮) অহেলিকা বা হৈয়ালি। (২৯) প্রতিমালা, হৈয়ালির দ্বারা বিচিত্র উপারে রচিত মোক; ইহার অপর নাম অঙ্ক-অঙ্করিকা। (৩০) দুর্ধ্বাচকবোণি অর্থাৎ প্রতিমাটুকু বা কটোচাণ্ড শব্দবিভাস। (৩১) পুস্তক-বাচন অর্থাৎ উপযুক্তবরে পুস্তক পাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতি। (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা মর্শন। (৩৩) কাব্যসমস্তাপুরণ। (৩৪) পট্টিকা-বেত্রাণবিকল্প অর্থাৎ বেত্রাসন ইত্যাদি নির্মাণ। (৩৫) তক্ষকর্ষ বা কাঠ কুঁড়িয়া দ্রব্যনির্মাণ। (৩৬) তক্ষণ। (৩৭) বাস্তবিদ্যা। (৩৮) রূপারত্নগরীকা। (৩৯) ধাতুবাধ। (৪০) মণিরাগ ও আকর-জ্ঞান। (৪১) বুদ্ধাধিকারযোগ। (৪২) মেঘ-কুট-লাবক-বুদ্ধ। (৪৩) শুকসারিকা প্রলাপন। (৪৪) উৎসাদন, সংবাহন ও কেশমর্শন; পদ দ্বারা গজ মর্দনের নাম উৎসাদন, হস্তদ্বারা মর্দন সংবাহন। (৪৫) অক্ষরমুষ্টিকাকখন বা একপ্রকার গুপ্ত সংকেত [Mnemonics জাতীয়] যেমন মেমরিকসিংকতুধুমকুম্মী দ্বাদশ রাশি নামসংকেত। (৪৬) স্নেহিতবিকর্ষ বা স্নেহভাবাজ্ঞান। (৪৭) দেশভাবাজ্ঞান। (৪৮) পুষ্পশকটিকা; পুষ্প দ্বারা শকট আভরণ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার বিদ্যা। (৪৯) নিমিত্তজ্ঞান বা শব্দশাস্ত্র। (৫০) যন্ত্রযাত্ৰকা বা যিবিধ যন্ত্র নির্মাণের বিদ্যা। (৫১) ধারণ-যাত্ৰকা বা পুস্তকাদি স্রবণে রাখিবার কৌশল। (৫২) সংপাঠ্য বা অনেক ব্যক্তির মিলিত হইয়া পাঠ [Chorus]। (৫৩) মানসী কাব্য-ক্রিয়া বা যিবিধ সংকেত মোক রচনা। (৫৪) অভিধানকোষ। (৫৫) ছানোজ্ঞান। (৫) ক্রিয়াকল্প বা সাহিত্যে অলঙ্কারবিদ্যা। (৫৭) চলিতকবোপ বা ছন্দবিশেষাঙ্গ শিলা। (৫৮) বস্ত্রপোশন বা স্ত্রীকৌশলে বৃহৎবস্ত্র স্বাক্ষরকারে পরিধান। (৫৯) দ্রুতবিশেষ। (৬০) আকর্ষ কৌড়া বা পাশাখেলা। (৬১) বালকৌড়নক বা খেলনা তৈরি। (৬২) বৈদ্যিকী বিদ্যা বা হস্তিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র প্রভৃতিতে জ্ঞান। (৬৩) বৈজ্ঞানিকী বিদ্যা বা অস্ত্রজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, প্রভৃতি। (৬৪) ব্যায়ামিকী বিদ্যা।

এই চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ বাৎসায়ন কৃত কামমুদ্র হইতে সংগৃহীত। অনেকে বাৎসায়নকে চারণকা হইতে অভিন্ন মনে করেন, তাহা হইলে কামমুদ্র খ্রী-পু ৪র্থ শতাব্দীর রচনা। শ্রীধরবাসী-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাতেও চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ আছে—এরূপ তালিকার সহিত তাহাব বিশেষ প্রস্তেদ নাই। কিন্তু শুক্রনীতিসার গ্রন্থে বর্ণিত চতুঃষষ্টি কলা বর্ণিত তালিকা হইতে অনেকাংশে পৃথক। হাবভাবযুক্ত নৃত্য, যিবিধ বাসকরণে জ্ঞান, বস্ত্র ও অলঙ্কার-বিন্যাস, যিবিধ বেশধারণ, শয্যা-সম্পূর্ণ নির্মাণ ও মালাগ্রন্থন, দ্রুতাদি কৌড়া ও যিবিধ রতিবন্ধ, এই সাতটি কলা পাঞ্চকর্ষবরে অন্তর্গত। যিবিধ মদ্যপ্রস্তুতপ্রণালী, ব্রণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ছেদন, রত্ননবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ধাতু প্রভৃতি ভক্ষ্যকরণ, ইন্দ্রব বিকার কবণ, ধাতুসংযোগ ও ঔষধাদি প্রস্তুত, ধাতুর

মেলন ও পার্শ্বব্যবহার, বাতুমিশ্রণ ও ত্রব্য হইতে দ্রব্য বহিষ্করণ, এই দশটি কলা আয়ুর্বেদের অন্তর্গত। বিবিধ ভঙ্গীতে শস্ত্রনিক্ষেপ, ময়যুদ্ধ, দূরে স্থিত লক্ষ্যে যাত্রাশি ও গোলা প্রভৃতি নিক্ষেপ, বাস্তবক্ষেত্রে সৈন্যগণের বিবিধ শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হওয়া (drill), গজ অথ ও রথের যুদ্ধে প্রবেশ,—এই পাঁচটি কলা যমুর্বেদের অন্তর্গত। বিবিধ আসন ও মুদ্রা অবলম্বনে দেবতা ভোষণ, সারথ্য ও গজাধার গতিশিক্ষা যুদ্ধিকা-কাঠ-প্রস্তরের পাত্রাদি নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন, কুণ প্রাসাদাদি নির্মাণ, ষড়যন্ত্র-নির্মাণ, রত্ননবিদ্যা, জল বায়ু ও অগ্নিবোশে বাপ্পীর যন্ত্রের ক্রিয়া, নৌকা রথাদি নির্মাণ, বজ্রপ্রস্তর-প্রণালী, বস্ত্রবরন, রত্নক্রিয়া, বাতুবিজ্ঞান কৃত্রিম স্বর্ণাদি রচনা, প্রলেপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান, চর্মাদির মার্জবকরণ (tanning), পশুর অঙ্গ হইতে চর্ম উন্মোচন, চর্ম দোহন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রুত পর্যন্ত প্রস্তুত, সৌন্দর্য্য, সম্ভবণ, পাত্র প্রভৃতি পরিষ্কার করণ, বস্ত্রমার্জ্জন, ক্ষৌরকর্ম, তিল প্রভৃতি হইতে তৈল প্রভৃতি আবিষ্কার, লাঙ্গল করা, বৃক্ষারোহণ, সেবানুষ্ঠান, বংশ বা তৃণ দ্বারা পাত্রাদি রচনা, কাচপাত্রনির্মাণ, জলসেচন ও জলবোধ, অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণ, গজ ও অশ্বের পধ্যান প্রভৃতি নির্মাণ, শিশুরক্ষণ ও শিশুজীবনে জ্ঞান, অপরাধীকে তড়ান-জাল, বহুবিধ ভাবার বর্ণলেখন-প্রণালী, তাবুলরক্ষা, ক্ষিপ্রকারিত্ব ও বিদ্রোহকারিত্ব,—এইসমস্ত কলা মিলিয়া সর্ব্বদৃষ্টি ৬৪ কলা।

প্রাচীন নাট্যাঙ্গি পাঠে জানা যায় যে এইসমস্ত কলা কেবল পুস্তকস্থ ছিল না, কার্যে প্রয়োগ করা হইত। এইসকল কলা হইতে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উৎকর্ষ অনুমিত হইতে পারে।

শাব্যবস্থাস্থা-বিধান (পানীয়)—শ্রীচুনীলাল বসু—

শরীর ধাবণের জন্য ষাণ্ড ও জল উভয়েই প্রয়োজন। আমাদের শরীরে গড়ে শতকরা ৭০ভাগ জল। এই জল প্রাণের, ঘর্মে, মলমূত্রে ক্রমাগত বাহির হইয়া যায়। শরীরে জলের অভাব হইলে তৃষ্ণা অনুভব করি। রক্ত তরল রাখিবার জন্য জলের প্রয়োজন, ষাণ্ড পনিপাকের জন্য জলের প্রয়োজন; ভুক্ত জন্মের অঙ্গীর্ণ ভাগ, পনিপাক ও পানীয়ের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ, মলমূত্র ও ঘর্মেব আকারে শরীর হইতে বাহির করিবার জন্য জন্মেব প্রয়োজন। সকল প্রকার পানীয়ের মধ্যে জল শ্রেষ্ঠ। অপরিষ্কার না বীজাণুদূষিত জল ত্যাগ। বৃষ্টির জলই সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট; গভীর কূপ বা প্রস্তরশের জল পানের পক্ষে প্রশস্ত। জলশরের নিকটস্থ স্থান সম্পূর্ণ পনিপাক বাধা উচিত; জলেও কোনো দূষিত পদার্থ ফেলা উচিত নয়। নদী প্রভৃতিব জল বাসি ও কবলা দিয়া ছাঁকিয়া পান করা উচিত। জল ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করা সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট নিরাপদ। ফুটনো জল বিধায় হয়; কিন্তু বাবকতক এক পাঁজ হইতে অন্য পাঁজো ডালোচালি করিলে পুনরায় সুস্বাদু হয়; অল্প কপূর যোগ করিলে আবে ভালো হয়। সমস্ত দিনে বেড দেয় জল পান করা আবশ্যিক হয়—তাহার কতক ষাণ্ডের সঙ্গে কতক পানীয় রূপে গ্রহণ করি। আহাবেব অব্যবহিত পরে জলপান অপকারী; প্রত্যবে ও বাত্রে পয়নের পূর্বে জলপান উপকারী; মধ্যে প্রাতরাশের ৩৪ ঘট্টা পরে জলপান উপকারী। ঘন ঘন জলপান অঙ্গীর্ণের কাবণ। অঙ্গীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি বোগে উষ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করিলে রোগ উপশম হয়। শবনের পূর্বে উষ্ণ জল পান করিলে সুস্থিরা হয়। কবিরাজী মতে বায়ুপ্রধান ব্যক্তিব উষ্ণজলপান অবিধেয়। অন্যান্য পানীয়ের মধ্যে ঘোল, ডাবের জল, সরষণ, উৎকৃষ্ট। গ্যাস-ভরা পানীয় সমস্ত ব্যবসায়ীদের তৈরি অল্প বয়স্কায় করা যাইতে পারে। চা, কাকি, কোকো সহজ শরীরে স্বাস্থ্য রক্ষায় জন্য নিস্তরোজন; নিবসিত পান উপকারক; অল্পবয়স্কের পক্ষে অপকারী; কড়া চা ব্যবহারে অঙ্গীর্ণ

ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়। চা ও ককির হারা ও অহিকেনের মাদকতা নষ্ট কবিবার ক্ষমতা আছে; চা পান করিয়া অনেক হারাপানের অজ্ঞাস ভাগ কবিত্তে সমর্থ হন। অপরিষ্কার জল চায়েব সঙ্গে ফুটাইয়া পান করা ভালো। হারা সর্ব্বথা বর্জনীয়, স্বাস্থ্য বন্ধাব জন্য হারাপানের কিছুমাত্র আবশ্যিকতা নাই। হারা মহোপকারী ঔষধ; কিন্তু চিকিৎসকের লক্ষ্যচিন্তা হেতু অনেক পনিপাবের স্বথসম্পন্ন প্রতিগতি চিরদিনেব জন্য অন্তর্মিত হইয়াছে দেখা গিয়াছে—হুতরা চিকিৎসকেরও শীঘ্র হারা ব্যবহা করা উচিত নয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (ভাদ্র)।

আলো-ছায়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন ঘারে রয়ে কেন পাড়াইয়া
কি আছে, কি চাহে নিতে।
রাতের আঁধারে কিরে বাঁধে জানি,
নিখে বায় বহি' মেঘ-আবরণ খানি
নয়নেব জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে।
নব নব রূপে বরণে বরণে ভবি
বুকে লও তুলি, সেই মেঘ-উত্তরী।
লবু সে চপল ক্রামল কোমল কালো
হে নিবন্ধন, তাই বাস তারে ভালো
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনাব আলো
সকল্য ছায়াটিতে।

খেলা ও কাজ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

পোর্টসেবদে অনেকগুলি নূতন আরোহী উদ্ভাবন কথা। পূর্বাতনেব দল এই সংবাদে সিনেব ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আব সমস্ত নূতনকে মানুষ বীজিয়া বাহিব কবে কিন্তু নূতন মানুষ। এমন উত্তেগের বিষয় আর কিছুই নাই। সে কাহে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে বাহিবে বোঝাপড়া কবিয়া লইতেই হইবে। সে তো কেবলমাত্র কোতুহলেব বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অন্তরের মনকে টোলাঠেলি করে। মানুষের ভিতরের মত এমন ভিত্ত আর নাই।

যুবোপীষ নবনাবীদেব প্রতিদিনের কালযাপন দেখিলে প্রথমটাই চোখে পড়ে ইহার সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যস্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আসবা কোনো মতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই—চোখের সামনে অস্ত্র কেহ অস্ত্রিবতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। চুপ কব, স্থির থাক, মিছানিহি কাজ বাড়াইয়ো না, ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অনুশাসন। আর, ইহার কেবলি বলে, একটা কিছু করা যাক। এইজন্ত ইহার ছেলেনুড়া সকলে মিলিয়া কেবলি দাপাধাপি করিতেছে। হাসি গল্প পেলা আমাদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

আমরা যখন ছোট ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া বাই তখন কিছু খেলনাব আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে পাশ্চ রাখা শস্ত হয়। কেন না, তাহার প্রাণেব স্রোত তাহার প্রয়োজনেব সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণেব বেগ আপনাব লীলাব উপকরণ না পাইলে অশ্রীর হইয়া উঠে।

এই যে যুবোপীষ বাজীরা জাহাজে চড়িয়াছে ইহাদের অস্ত্রও কত রকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহাব আর সংখ্যা নাই।

আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অভ্যস্ত ঠাণ্ডা বেলা ছাড়া এসমস্ত বৌদ্ধধর্মের খেলাব ব্যবস্থা কবাব দিকে আমণা দুকপাতমাত্র কবিতাম না। বিশেষত কবরিনেব জন্ত পঞ্চচলার মুখে এসমস্ত অনাবশ্যক বোকা নিশ্চয়ই বর্জন কবিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

ছেলেদেব খেলাব বয়স বলিখাই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়—কাজেব বয়সে এতটা খেলাব উৎসাহ যতন্ত অসঙ্গত বলিখা আমাদের মনে হয়।

কিন্তু যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি যুগোপীক্রেয় পক্ষে এই চাকল্য এবং খেলাব উদ্ভূত নিত্যন্তই স্বভাবসঙ্গত তখন ইহাব একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসন্তকালের অনাবশ্যক প্রাচুর্যের মত। যত কল ধবিলে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াকে। কিন্তু এই অনাবশ্যক ঐশ্বর্য না থাকিলে আবশ্যকে পদে পদে কুপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিবর নাই কেননা এই খেলা অলসেব কালবাগন নহে—কেননা আমরা দেখিয়াছি ইহাদের প্রাণেব শক্তি কেবলমাত্র খেলা কবে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্ভূত, ইহাব অপ্রতিহত প্রভাব। সেখানে শরীর মনোব কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্বদা জাগ্রত; যুগোপেব তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্মের উদ্ভোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত কবিতোহ সেই শক্তিই খেলার চাকল্যে আপনাকে ভরদ্রিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মত অবজ্ঞা কবিতো পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিযাকে। ইহা নিজেই দিকে দিকে অনায়াসে অজ্ঞপ্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজে বহু ক্ষণে কিংবা পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না—চলন্তের রক্ত ঘাবে অহোবাত্র প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে।

এই যে উদ্ভূত শক্তি, বাহার একদিকে জীড়া ও অস্ত্র দিকে কর্ম ইহাই বখার্ব হৃদয়। বসন্তের মধ্যে যেখানে আমবা লক্ষীর প্রকাশ ঘোঁতে পাই সেখানে আমরা একদিকে দেখি সাম্রাজ্য লীলা-মাধুর্য, আর একদিকে দেখি অস্ত্রাস্ত্র কর্মপবতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশী। বসন্ত শক্তিই সৌন্দর্য্যবেগে আপনাকে প্রকাশ করে; আর শক্তিহীনতাই শৈথিল্য ও অব্যবহাব মধ্য দিয়া কেবলি কর্মব্যতার পক্ষেব মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন কবে। কর্মব্যতাই মানুষেব শক্তির পবাত্তব; এইখানেই অধ্যায়, দারিদ্র্য, অক্ষসংস্কার; এইখানেই মানুষ বলে আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে। এইখানেই পরস্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরক কর্ম শেষ হয় না এবং বাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিলিষ্ট হইযা পড়ে। শক্তিহীনতাই বখার্ব শ্রীহীনতা।

ইহাদের সমস্ত খেলাধূলাব ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা যাবে। এইজন্য ইহাদের আমোদপ্রমোদও কোনোমতে বিশৃঙ্খল হইযা উঠে না।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইযাকে সে দুঃখ আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমই দেখা বাইত কোনো একই ব্যবস্থা দুইজননের মধ্যে ঋণ্ডিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনায় মিল করিতে জানে না। যুগোপীক্রেয় মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহার স্বভাব, আর একটা জায়গা আছে যেখানে ইহাব সকলোব। যেখানে ইহাব স্বভাব সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট, সেখানটা প্রজ্ঞয়। সেখানে সকলের অব্যবহিত অধিকার নাই এবং

সেই অনধিকার সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহার নিজেব ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুসারে আপনাব ব্যক্তিগত জীবন বহন কবে। কিন্তু যখন সেখানে হইতে তাহাবা বাহির হইযা আসে তখন সকলের বিধানের মধ্যে ধবা দেব—সে জায়গায় কোনোমতেই তাহার আপনাব প্রাইভেটকে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিখা সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের প্রয়োজনমত চলিতাম। পোটলা পুটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহবা দাঁতন করিতাম, কেহবা যেখানে খুসি বিছানা পাতিয়া পথরোধ করিযা নিজে িতাম, কেহবা হকার জল ফিরাইতাম ও কালকটি উগুড় করিয়া ছাই ও গোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় চালিযা দিতাম, কেহবা চাকবকে দিয়া শরীর ডলাইয়া সপক্ষে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিষপত্র কোথাব কি পড়িয়া থাকিত তাহাব ঠিকানা পাওয়া বাইত না এবং ডাবাডাকি হাঁকাইকি অস্ত্র থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা জ্ঞানিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অভ্যস্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগরাগিরি পালা পড়িযা যাইত। তাহার পবে অস্ত্র লোকেব যে লেখাপড়া কাজকর্ম থাকিতে পারে, কিংবা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পাবে সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না। হঠাৎ দেখা বাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দুখানটা পাঁচজননের হাতে হাতে ফিরিতেছে সেটা আমাব হাতে ফিবািযা দিবায কোনো ভাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবিলেব উপর হইতে আমার খাতটা লইযা কেহ টানিযা দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিযা গল্প জুড়িযা দিতেছে এবং রসিক্ত ব্যক্তি সময় অসময় বিচাব না করিযা উঠেঃযবে গান গাহিতেছে, কঠে বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল বাইতাম তবে তাহার খোসা ও বীচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত—এবং ঘটিবাটি চাদব মোজা গলাবন্দ হাজার-বার করিযা খোঁজাখুঁজি করিতে কবিতোই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পবস্পবেব অনুবিধা ঘটিত তাহা নহে, ব্রহ্ম স্বাভা ও সৌন্দর্য্য চারিদিক হইতে অস্ত্রধারন কবিত। ইহাতে আমোদ আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্মের তো কথাই নাট। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সকল হব সেই শক্তিই আমোদ আহ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা করিযা তাহাকে সরস ও হৃদয় করিয়া তোলে।

শক্তি এই যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবায জন্ত নহে, আপনাকেই মানিবায জন্ত। আব শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে, তখন সে ভবে হোক, মোতে হোক, বা কেবলমাত্র চিবাভ্যাসের জড়ত্ববশত হোক নিয়মকে নতমাত্র হইযা শিরোধার্য্য করিযা লব। কিন্তু যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিবেই নিয়ম স্বীকার কবিতো হব চরুর্লতা সেইখানেই নিয়মকে কঁাকি দিবা দিয়া নিজেই কঁাকি দেয়। সেইখানেই তাহার সমস্ত কুশী ও বদুচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরেব শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা কবে নাই এবং রাজা গুপ্ত ও শাস্ত্র বিনামুক্তিতে মানুষকে তাহাব হিতসাধনে বলপূর্বক প্রবৃত্ত কবির্যছে সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাঁধিয়া কাজ করানো

একবার অজ্ঞান করাইলেই বাধন কাটিয়া আব তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এইজন্য যেখানে আমবা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মত মানি, যেখানে মানিনা সেখানে দাসের মতই কঁাকি দিই। সেই জন্য যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাশীতে শিকার, পাখিশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত—যখন সামাজিক বাহ্যশাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই, সাধারণের অভাব ঘূব ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো বাস্তবিক শক্তি কোথাও উদ্বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নির্দা করিতেছি, নয় সরকার বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু এসকল বিষয়ে কোনটা যে কার্য এবং কোনটা কারণ তাহা ঠাহর করিবা বলা শক্ত। বাহ্যের বাহিরের নিয়মকে অবোধে শৃঙ্খল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাধে,—বাহ্যের নিজের শক্তির প্রাবল্য সে নিয়মকে কোনমতেই অক্ষতাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্ভাবিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিষ নহে ভিতরের জিনিষ, হুতরাং তাহা কাহারো কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের বাস্তবিক শক্তির দ্বারা আমরা সে স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে তুলি দিয়া ও গলার হাড়ি বাধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ, আমরা, মুখে বাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনি হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেখানেই অস্ত্রের প্রতি অস্থশাসন প্রদর্শিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারলাভের বেলায় যুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব আর সমাজনৈতিক পূহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলি ঘোঁঠা বিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল বিনি তিনি চর্যবলের অধিকারকে সঙ্কুচিত করিতে থাকিব। আমরা এখন কাহারো ভাল কবিত্তে চাহিব সে আমাদেরই নিজের মতে, আমাদেরই নিজের নিয়মে; বাহার ভাল করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভাল হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমন করিয়া চর্যবলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে গোবধ করিলে থাকি অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে বন্ধনদ্ধ দৈব সম্পত্তির মত লাভ করিতে চাই।

এইজন্যই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজের নিয়মের দ্বারা নিজের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি সেখানেই পরে পড়ে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত হারবার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শক্তির হাত হইতে নহে কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আমাদের রক্ষা করা ইহাই আমাদের একটি মাত্র সমস্ত। যে নিয়ম মানবের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া গরিব না, এই কথা একদিন আমাদেরকে সমস্ত মনোবল সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হোক মানিতেই হইবে। কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনই তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনই তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখনই বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে, সেজন্য যেমন বাহিরকেই বিচার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে ক্ষুণ্ণিত দিবার চেষ্টা না করি।

ব্যবসা ও বাণিজ্য (প্রাণ)।

মানকচু—শ্রীনাগেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার—

মানকচু ছাড়াইয়া হুইয়া প্রোড়ে শুকাইয়া শুঁড়া করিলে উত্তম

স্বাস্থ্য পালো হয়। কচু-খোরা জল হইতে একপ্রকার এসিড পাওয়া যায়। খোরা ও এটে চোলাই করিলে মেথিলেটেড শিরিট প্রস্তুত হয়।

কলার চাষ—শ্রীশবচন্দ্র সাম্যাল—

কলা কল, কলার আঁশ, কলাব মবদা, কলার গুড় সমস্তই সর্বত্র সমাদৃত। বীচা কলা চটকাইয়া চুনের জল মিশ্রিত করিলে কল হইতে রস বাহির হয়; সেই রস জাল দিলে সুবাস্ত্র গুড় পাওয়া যায় কলা বারমাসে কল, পাছও বহুকাল স্থায়ী। গলি ঘোঁরাশ মাটি কলান চাষের উপযোগী। বৈশাখ হইতে ক্ষেত তৈরি করিয়া বর্ষার সমা তেটু লাগাইতে হয়। কলার মূলদেশের কল্লু অংশ পূর্ব বা পশ্চিম মুখে করিয়া বুসাইলে কাঁচিও পূর্ব বা পশ্চিম দিক পড়ে, তাহাতে রোঁয় পাইয়া কলা হুপুট হয়। কার্তিক ও কান্তন চৈত্রে জমির ও পাছের পাট করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে ১০০ পাছের বেশি লাগানো উচিত নয়; কি বিঘার ১০০ কাঁচি কলা হইতে ৫০ টাকা আয় হইতে পারে। কলার চাষে কখনো লোকসান হয় না। কলার কিছুই অপচয় হয় না, পাছ পাটা খোঁড় মোচা কল আঁশ সবই বিক্রয়যোগ্য।

মানসী (ভাত্র)।

শ্রীমাদ্রী বর্ধাসুন্দরী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন—

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ওই রূপসী?

জলধর ঘুরয়ে ঘুরয়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ারে।
রিম্ব রিম্ব রিম্ব রিম্ব করি,
সারাদিন, সারারাত্রি বারিরাশি পড়িছে কব্বরি।

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা।
এ আলোকে যুগ্মরাহি, এ নারীতে চিনিরাহি;
এ বে সেই সত্য সত্য

ভুবনমোহিনী বনী রূপসী বরবা।
ভ্রামাঙ্গী বরবা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি,
এলায়ে দিরাছে তার মনিবর্ষ কালো কালো চুল,
শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালা, অপরাধিতার মালা,
দুর্কণ্ঠে ঘোঁড়ল ধোঁলে নীলবর্ণ রুমকার ফুল।

নীলাধরী সাড়ীখানি পরি,
অপূর্ণ মল্লারঙ্গ ধবেছে হুন্দরী।
প্রস্তুত কেশরাশি হতে বেলকুল চৌমিকে ঝরিছে;
কালোরাগ কাটিকা পড়িছে।
বাই বলিহারি,
কে দেখেছে কবে ভবে বেন বরনারী?

প্রতিভা (আষাঢ়)।

ভাটিয়াল গান—শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত—

ভাটিয়াল গানগুলি পূর্ববঙ্গের নিজস্ব জিনিস। গ্রাম্য কবিতা এই ভাটিয়াল হর অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রাণের সরল কবিতামায়া ভাবগুলি অতি মর্দঙ্গপার্বী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের পথে প্রান্তরে, পল্লিতে পল্লিতে, খাল বিলে, নদী নালার কুবক ও নাবিকের কঁচি কঁচি এই গানগুলি প্রতিটি ভাবে গিবানিগি গীত হইয়া থাকে।

এই বিশেষ হরের আবিষ্কার কে তাহা জানা যায় না। তবে সাধারণতঃ নৌকা যখন ভাটি চমকিত থাকে তখনই এইসকল গান গাওয়া হয় বলিবা হবত এই হরের “ভাটিরাল রাগিণী” নাম হইয়াছে। ভাটি ছাড়িয়া দিলে নৌকা পরিচালনে মাঝিদিগের অঞ্চল মনোযোগ ও বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন থাকে না। তখন তাহারা এই ক্রান্তি-হরা রাগিণীতে মনের আনন্দে গান গাহিয়া থাকে। ভাটি অঞ্চলে—বরিশাল প্রভৃতি জেলায়—এই হর আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিবা এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

যেমন “কীর্তন” বলিলে এক শ্রেণীর অনেক রকমের গান বুঝায়, “বাউল হরের গান” বলিলে আর এক শ্রেণীর বহু প্রকারের গান বুঝায়, সেইরূপ “ভাটিরাল গান” বলিলেও অল্প আর একজাতীয় বিবিধ হরের গান বুঝায়। কিন্তু “ভাটিরালে”র রাগিণী-স্বাতন্ত্র্যটুকু “কীর্তন” ও “বাউল” হর অপেক্ষা বহুত্বপূর্ণ নহে। এই রাগিণীর প্রধান গুণ, অতি সহজে লোকের মর্মস্পর্শ করিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা উদ্বাস ভাব জাগাইয়া তোলা। এই বিশেষ গুণের জন্তই এই রাগিণীটিকে একেবারে এত জনপ্রিয়।

ভাটিরাল হরের অসংখ্য গান আছে। সংগ্রহ করিলে বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে। নমুনা—

(১)

বামনার লইয়া যায় বৈদেশী বজ্রবার নার।
আবে কইও কইও কইও গো খপর বগুরের আগে,—
আমারে যেন তালাস করে গালের কুলে কুলে।
আরে কইও কইও কইও গো খপর শাশবীর আগে,
কোলের ছাওয়াল শুইয়া রইছে মশৈরের তলে রে।
আরে কইও কইও কইও গো খপর ননদীর আগে,—
অখন যেমন কাইল্যা করে জলের কলসীর লগ্নে।
আরে কইও কইও কইও গো খপর সোমারীর আগে,
পালের বলদ বেইচা যেন আরেক বিয়া করে রে।

এই সহজ সরল গানটিতে অপ্রতিভনামা কবি একটি বিশেষগামিনী রমণীর মনের বিবিধ বিরুদ্ধভাবের উত্থানপতনের করুণ ছন্দর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

(২)

জান, তরে মৈবে মারবো।
মৈবাণ মৈবাণ বলি রে আমি—
মৈবাণ কাচা সোন,
বল্লের বনে আইলা মইব্,
বাড়ীত্ বাইল্যা খুইও রে।
আরে আমার বাড়ী বাইওরে মৈবাণ,
বসতে দিমু রে পীড়ি,
আরে জলপান করিতে দিমু রে মৈবাণ,
শাইল ধানের মুড়ি রে।
শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈবাণ,
বিগ্নিধানের রে খই,—
আরে পেট-মোটা সবরি কলা রে মৈবাণ,
গামছা বাস্কা দইও রে।

এই গানটিতে মহিষের রাখালের প্রতি কুবকবালিকার হৃদয়ের প্রেমের স্বাভাবিক উদ্বেগভাবটি স্নিগ্ধ সরল ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

(৩)

হারে কোন্ না জাউলার মাহ রে খাইরা
না দিহিলাম রে কড়ি—

হায রে তাব জন্তে হইলাম বুঝি
অল্প বইসা বাড়ী রে।
আমার পাংল কইরা গেলা—
আমাব অনাথ কইবা গেলা রে প্রাণনাথ
আমার পাংল কইরা গেলা।
আরে কোন্ না জাউলার মাহ রে খাইরা
না দিহিলাম রে কড়ি—
হার বে তার জন্যে হইলাম বুঝি
অল্প বইসা বাড়ী রে।
আরে কাঁর জানি ডরা রে কেতে
দিয়াহিলাম রে হাত,—
হারে তাইতে বুঝি আমার মাথায়—
এমন বজ্রবাত রে।
আবে কোন আরতীর সখীর রে সিন্ধুর
আমি কেইলাছি মুইছা,
হার বে তার শাপে রাক্ষস রে বিধি
তোমার গেল লইয়া বে।

গ্রাম্য কবি কেমন তীর অনুভূতির সহিত একটি শোকাহতা বালবিধবার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিয়াছেন। নিরক্ষরা, জ্ঞানহীন তরুণী হৃদয়ে এই সঙ্গীতোক্ত আত্মকৃত কর্তৃসমূহই তাহার এই দাবণ বৈষম্যের কারণ বলিবা অনুভূত হওয়া অতি স্বাভাবিক।

(৪)

প্রাণের হুবল রে
আবে কার কামিনী জলে বাধ।
সোনার নুপুর রাঙা পায়ে
ফণু খুঁতু বাঁধা শুনা যায়;
হাউলুকা (হালুকা) মাঝা পবনে হেলায়।
উপটা খোপায় বাস্কা চুল,
খোপায় শোভে নানান জাতি ফুল,
ওরে মধুর গোষ্ঠে ভ্রমর আসে যায়।
দুই সখী জলে রে যায়,
আরেক সখী হেইলা গড়ে যায়,—
ওরে অনুভবে বুঝি রাখা বাধ।

(৫)

জীবনের নাই রে আশা,
কর শ্রীমুরার চরণ ভরসা।
মেহের শুমান কর মিছে,
নিখাসের কি বিশ্বাস আছে?
কাল শমনে জাল পেতেছে,—
ভাঙ্গবে রে তোরে হৃদয়ে বাসা।
ভাই, বন্ধু, দার, হত
সকল পথের পরিচিত।
যখন প্রাণ তোরে হ'বে হত
কেউনা রে করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে
কেউত সজে যাবে না রে।
গুরু ভঞ্জন হইল না রে
কেবল ভবে বাওয়া আসা।

মস্তকশূন্য। পরিধানে পাজামা
ও আজমুর্বিবলম্বী চাপ্কান;
তাহার উপর আবার তদপেক্ষা
কিঞ্চিং অবলম্বিত চোগা।
কোমরে কোমরবন্ধ, পদদ্বয়ে
উপানয়। মূর্তিটি পাঁচ ফুট এক
ইঞ্চি লম্বা।

মূর্তিটির জাম্ব-বরাবর চোগা
চাপ্কানের গায়ে এক পংক্তি
একটি লিপি খোদিত আছে।
এই লিপিই ইহার মূল্য। এই
লিপি লিখিয়াছে এই মূর্তির নাম
ও উপাধি। ইহাতে লেখা আছে

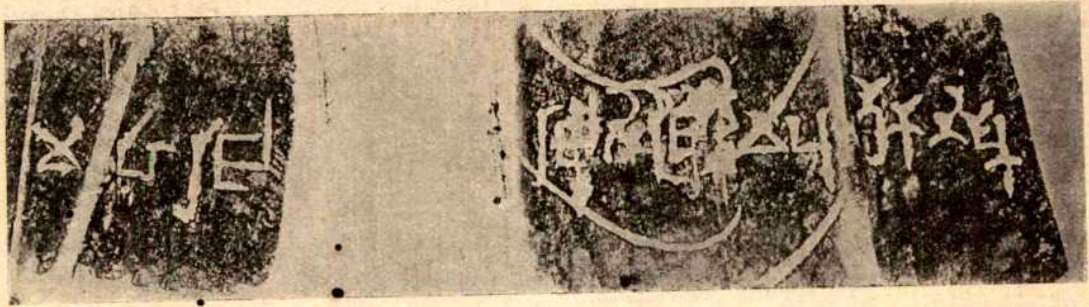
গত শ্রীতকালে ইহা আবিষ্কৃত
ও মথুরা বাহুবরে রক্ষিত
হইয়াছে। কানিকের চেহারার
একপূর্ণ নিদর্শন ইতিপূর্বে আর
পাওয়া যায় নাই। মূর্তিটি যদি
মস্তকবিহীন না হইত তাহা
হইলে নিদর্শনটি একেবারে
সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর ও আজ কালকার
memorial statueর মত
হইতে পারিত।

ইতিপূর্বে আমাদিগকে প্রথমে
কানিকের মুদ্রায় কানিকের মূর্তির
কতকটা আভাস পাইতে হইত।



কানিক-প্রতিমূর্তি (মথুরায় প্রাপ্ত)।

“মহারাজা রাজাতিবাজ দেবপুলো কানিকো” স্মরণ্যং নিঃ- তাহার পর যখন ১৯১০ সালে অপরান্ত প্রদেশের সারভেয়ার
সন্ধেছে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে ইহা কানিকের প্রস্তরময়ী মূর্তি। ডাক্তার স্পনার ডাক্তার কুসের ইঙ্গিত অনুসারে চীন



কনিষ্ক-প্রতিমূর্তির লিপি।

পরিব্রাজকগণ কর্তৃক বর্ণিত রাজা কনিষ্কের নির্মিত বৃহৎ স্তূপের ও তৎসংলগ্ন বিহারের অনুসন্ধানে পেশোয়ার নগরীর গঞ্জদ্বারের বহির্ভাগস্থিত সাহ-জী কী ঢেরী অর্থাৎ রাজার ঢিবি বলিয়া অভিহিত দুইটা উচ্চ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করেন ও একটিতে একটি ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপ আবিষ্কার করেন এবং তাহাই কনিষ্কের স্তূপ বিবেচনা করিয়া হিউনসাঙ্গের কথামুসারে তাহাতে রক্ষিত গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ফলে জগতের আনন্দজ্ঞাত একটি মিশ্রধাতুর স্থালী ও তন্মধ্যে মৃদঙ্গাকার স্ফটিক-খণ্ডের অভ্যন্তরে তিনখানি বুদ্ধাঙ্গি প্রাপ্ত হইলেন। তখন হইতে ঐ স্থালীগাত্রে খোদিত কনিষ্কের একটি ছই ইঞ্চি পরিমিত দণ্ডায়মান মূর্তি দেখিতে পাই। ইহাই এই মথুরামূর্তি আবিষ্কারের পূর্ব পর্য্যন্ত কনিষ্কের দীর্ঘ ও পূর্ণ মূর্তি। পেশোয়ারের সে মূর্তিটি যে কনিষ্কের তাহা তাহাতেই খোদিত আছে। মূর্তিটির উভয়পদের উভয় পার্শ্বে খরোষ্ঠী অক্ষরে ‘কনি’ ও ‘ক’ এইরূপ ভাগাভাগী রূপে লিখিত আছে। তাহা ছাড়া এই ধাতুপাত্রটি যে কনিষ্ক-সংশ্লিষ্ট তাহার প্রমাণলিপিও তাহাতে আছে। “দস অগিশল নবকস্মি কনকস বিহরে মহসেনস সংবরমে” বলিল কথামূলি তাহাতে লিখিত দেখা যায়। ডাক্তার স্পুনার ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন, দাস অগিশল মহা-সেনের সজ্জারামস্থিত কনিষ্ক-বিহারের তত্ত্বাবধায়ক। মূলে ও অনুবাদে অর্থগত কোন না কোন গোল থাকিলেও “কনকস বিহরে” অর্থাৎ কনিষ্কের বিহার এ কথাটা নির্বিকারে পাওয়া যাইতেছে।

যে মহারাজা রাজ্যভিত্তিক দেবপুত্র আজ প্রত্নমূর্তিতে আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছেন ইনি কোথাকার, কবেকার

ও কোন বংশের এবং ভারতেরই বা কে ছিলেন তাহা বলিতেছি।

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধারীরা ইহাকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এসিয়ার যাবাবর ইউচি জাতীয় কুষাণবংশীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন এক সময়ে চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তবাসী ইউচি ও হিউন নামক জাতিদ্বয়ে একটা বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ইউচি জাতিকে পরাজিত ও একেবারে দেশদ্রষ্ট হইতে হয়। তখন ইউচিরা আরও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে ও পশ্চিমমধ্যে বুষুন নামক আর এক দল যাবাবরের সহিত সংগ্রাম করে। এই সংগ্রামে ইউচিরা জয়ী হয়। বুষুনরা এই সংগ্রামে শুধু যে পরাজিত হয় এমন নহে, তাহাদের রাজা “নন্তেওমি” ইহাতে নিহত হয়। বিজয়ী ইউচিরা কিন্তু আরও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং “সে” বা “সোক্” নামক জাতির রাজ্য আক্রমণ করে। সোক্‌রা তাহাদের এই আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ইউচিদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করতঃ সুদূর দক্ষিণদিগবর্তী “কিপিন” নামক স্থানে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল। ইউচিরা এদিকে যখন সোক্‌দিগের রাজ্যে বসবাস করিতে থাকে তখন নিহত বুষুনরাজ নন্তেওমির পুত্র “বেনমো” পিতৃহত্যার পরিশোধ লইতে হিউন নামক এক জাতির সাহায্যে ইউচিদিগকে প্রবল-বেগে আক্রমণ করে। ইউচিরা সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা তাহাদিগের নূতন রাজ্য পরিভ্রমণ করতঃ তাহিয়ায় বা বাক্ত্রিয়াতে (Tahia or Bactria) আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এইখানে নিরাপদে বাস করিতে করিতে ক্রমে তাহারা তাহাদের সেই প্রাচীন

যাযাবর ভাব পরিত্যাগ কবে এবং হিওউমি, চোরাংমো, কোই-সৌরাং, হিথুন্ ও কাভকু নামক পাঁচটি রাজবংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদেয় মধ্যে কিছু কোইসৌরাং-রাজ কিউংসিউকিও ক্রমে অপব চাবটিকে অধীন করিয়া নিজে সর্বপ্রধান হইয়া পড়েন। পার্থিয়া (পারদেশ) ও কাবুল ক্রমে তাঁহার হস্তগত হয়। এই প্রবলপরাক্রান্ত কোই-সৌরাং-রাজ অশীতিবর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া আপনার বীরত্ব দেখাইয়া যান। তাঁহার পুত্রের নাম ইয়েন্ কাওসিন্। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ইহারই দ্বারা সিদ্ধদেশ অধিকৃত হয় ও ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ইউচি-রাজের নামে সে প্রদেশ শাসিত হইতে থাকে। ইহা ঘটিয়াছিল খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে যখন উক্ত প্রদেশ ভারতীয় গ্রীকদিগের শেষ রাজবংশের অধীন ছিল।

এখন হইতেই এই ইউচি বংশের সহিত ভারতবর্ষের পবিচর। ভারতে আসিলে শব এই ইউচিদিগের নাম হয় তুবার বা তুখাব। বিষ্ণুপুরাণে আমরা তুবারদিগের নাম দেখিতে পাই।

এই তুবারদিগেরই অপর একটি নাম কুবাণ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ইহার ইউচি জাতিব কোইসৌরাং রাজবংশীয়। কোইসৌরাং চীনদেশীয় কথা। সেই চীনের কথাটি চীনদেশ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভারতে আসিলে কুবাণ এই কথায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাই এই বংশীয় রাজা প্রথম কদ-ফাইসেস (Kadphises =) মূর্তায় "মহরজস মহতস কুবন কুমলককস" লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। লিপির অর্থ মহান্ মহারাজ কুবাণ কদফাইসেসের (মূর্তা)। কদ-ফাইসেস খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত-প্রান্তের রাজা ছিলেন।

কুবাণবংশীয় ভারতসংস্পর্গী প্রথম রাজা ইয়েন্ কাওসিন্ ব্যতীত আমরা নিম্নলিখিত কুবাণরাজগণের মূর্তা দেখিতে পাই।

কাদফাইসেস ১ম

কাদফাইসেস ২য়

কনিক

হবিফ

বাহুদেব

এই প্রথম কাদফাইসেস ইয়েন্ কাওসিনের পুত্র কিনা বলা যায় না। দ্বিতীয় কাদফাইসেস প্রথমে পুত্র ও উত্তরাধিকারী; ইহার নাম ইয়েন্ কাও চিং বা হিম কাদ-ফাইসেস। কনিক এই দ্বিতীয়ের উত্তরাধিকারী কিং পুত্র নহেন। কনিকের পিতার নাম বসিঙ্গ*। হবিফ ও বাহুদেব কনিকের পব পর উত্তরাধিকারী-পুত্র হি পৌত্র তাহাব কোন ঐমাণ নাই।

এই পঞ্চ কুবাণবংশের মধ্যে কনিকই বিশেষ বিখ্যাত ভারতবাসীর সহিত বিশেষভাবে মিশ্রিত হইয়া ইনি ভারত-বাসী অনেকের আপনার লোক হইয়া গিয়াছিলেন বিশেষ ইনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার বৌদ্ধগণের বড়ই প্রিয় হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে বৌদ্ধদিগের যে প্রসিদ্ধ চতুর্থ মহাসঙ্ঘীতি বসিয়াছিল তাহা কনিকেরই উদ্বোধন ঘটিয়াছিল। কনিক তাই বৌদ্ধদিগের চক্ষে অশোভের সমশ্রেণীর একজন রাজা।

এই কনিক কোন্ সময়ে বিজ্ঞান ছিলেন তাহা লক্ষ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ অনেক। অতি কম এগ'র রকম মত ইহার সময় নির্ধারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইসব মতে খৃষ্টপূর্ব ৫৮ বৎসর হইতে খৃষ্টপূর্ব ২৭৮ বৎসর পর্যন্ত ইহার অভ্যেককাল কথিত হয়। যে বিক্রম সংবৎ আমরা আমাদের রাজা বিক্রমাদিত্যের সংবৎ বলিয়া থাকি, কেহ কেহ বলেন তাহাই কনিকের সংবৎ। বিক্রম বা বিক্রমাদিত্য বলিয়া বাস্তবিক কেহ ছিল না। উক্ত সংবৎ ৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে আবদ্রা বলিয়া পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মতে তিনি ৫৮ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের রাজা। এইরূপ কাহারও মতে তিনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চমাব্দের, কাহারও মতে খৃষ্টপূর্ব ৬৫, ৭৮ বা ৯০ অব্দে। এই ৭৮ অব্দাব্দীরা তাঁহাকে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই মতটিই অনেকটা প্রসিদ্ধ মত + ইহার বিরুদ্ধে সম্প্রতি কেনেডি নামক একজন ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দই কনিকের রাজ্যভিষেক, ও সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে অধিষ্ঠিত বৌদ্ধ চতুর্থ মহাসঙ্ঘীতি,

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসোপাধ্যায়ের Scythian period of Indian History, plate I and its reading.

+ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসোপাধ্যায় এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। Scythian period of Indian History দ্রষ্টব্য

কাল বলিয়া ৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দাব্দী প্রসিদ্ধ কানিংহাম ও ডাক্তার স্ক্রিটকে সমর্পণ করিয়াছেন। এবং আমাদের বিজ্ঞানবিত্যকে উড়াইয়া দিয়া কনিষ্কেই সংবতের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় কনিষ্কেব স্মরণরূপে কালনির্ণয়ের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া তিনি খৃষ্টের পূর্বে বা পর প্রথম শতাব্দীতে বিস্ত্রমান ছিলেন ইহা বুঝাই ভাল।

এখন, ভারতের তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল কতদূর দেখা

- • বাউক। এ সম্বন্ধে শিলালিপির সাহায্যে জানিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার পৈতৃক সাম্রাজ্য গান্ধার ও কান্দীর ব্যতীত, দক্ষিণে সিন্ধু ও পূর্বে বারাণসী লইয়া সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশটাই তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যু তৎকালে এতই প্রচলিত ছিল যে তাহা বারাণসীর আরও পূর্বদিগবর্তী গাজীপুর ও গোরখপুরে পাওয়া যায়।

কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ঠিক বলা যায় না। তবে তাঁহার পৈতৃক সাম্রাজ্য গান্ধার ও কান্দীর মধ্যে কান্দীরেই কনিষ্কের ও তৎবংশীয়ের অনেক কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কান্দীরেই যে তাঁহার রাজধানী ছিল তাহা কতক নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। তিনি কান্দীরে কনিষ্কপুর, বলিয়া এক নগর নির্মাণ করান, তাঁহার উত্তোগে কান্দীরেই বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্ঘাতি আহুত হয়, তাঁহার পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হবিষ্ কান্দীরেই হক্কপুর নামে নগর ও যথেষ্ট মঠ এবং বিহার প্রস্তুত করাইয়া যান। গান্ধারে কনিষ্কের কার্যের ভিতরে পেশোয়ারে এক স্তূপেরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

গান্ধার ও কান্দীর ব্যতীত কনিষ্কেব অপর ভারতীয় সাম্রাজ্য তিনি ক্ষত্রপ* (Satrapa, the Governor) নিযুক্ত করিয়া শাসন করিতেন।

ইউচিবংশের বর্ণনাকালে দেখান হইয়াছে যে কনিষ্ক তৎবংশীয় কোইসোয়া (কুশাণ) দ্বারার লোক। তবে যে তাঁহাকে শক বলা হয় তাহা ভ্রম। ইহার উত্তরবেও মতভেদ আছে। যে মতে ইহাকে সংবতের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, সে মতে ইনি শক নহেন। ইহাকে শক বলেন

শকাকের-প্রতিষ্ঠাতা-বাদীরা। ইহারা বলেন কনিষ্ক খৃষ্টীয় ৭৮ পরায়ে মথুরায় আসিয়া অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিষেক বৎসর হইতে যে অঙ্গ প্রচলিত হয় তাহাব নাম শকাব্দ। শকাব্দ নাম হইবার কাণ্ড প্রান্ততাবতবাসীবা প্রান্তচীনবাসী ভারত-আক্রমণকাণ্ড-দিগকে শক নামেই অভিহিত করিত।† সূত্রাং কনিষ্কও যখন মূলতঃ একজন প্রান্তচীনবাসীবংশীয় তখন ইনিও একজন শক, ইহাই তৎকালে ভাবতের সিদ্ধান্ত। তাই তদভিষেক বৎসরই শকাকের আবির্ভাব-বৎসব বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে টনি শক, কিন্তু প্রকৃত শক নহেন।

মথুরায় কনিষ্ক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ইহা বাহারী বলেন মথুরায় এই মানবপ্রমাণ কনিষ্কমূর্তি পাওয়া যাওয়ার তাঁহাদের মতটি বেন দৃঢ়ীভূত হইয়া পড়িতেছে। বিদেশীয় রাজা ভারতে আসিয়া ভারতের প্রসিদ্ধস্থান মথুরায় অভিষিক্ত হইয়া উহা চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্যই তাঁহার একটি মূর্তি রাখিয়া গেলেন, ইহাই বেন মথুরায় এই মূর্তিটির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অভ্যন্তরে ইহা বেন তাঁহার Memorial।

শ্রীবিনোদবিহারি বিজ্ঞাবিনোদ।

জলটুঙি

(William Butler Yeats)

এবার আমি নিছি ছুটি,—ছুটিছি এবার জলটুঙিতে,—
ছোট্টো আমার পাতার কুঁড়ে তুলব সেথা কাদার ভিতে;
হোগলা দিয়ে ছাইব তারে,—কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁশা,
পাহাড়তলীর নিদ্রমহলে মৌনান্ধদের গুণ্ণ ভাষা।

সুখ নাহি পাই স্বপ্নি পাবই,—শান্তি হুখেব খেলব খেলা
ধোঁমুটা-ঘেরা ভোরটি হ'তে নাগার ঝিকি-ডাকার বেলা;

† এ শক বলিবার কারণ আমার বোধ হয় যখন সে বা সোকেরা ইউচিবংশের আক্রমণে স্থানান্তরিত হইয়া বাক্ত্রিয়াতে (Bactria) আসিয়া লব ও তথা হইতে ইহাদিগের দ্বারা পুনরাক্রান্ত হইয়া আকপানিস্তান ও পঞ্জাবে আসিয়া পড়ে, তখন প্রান্তভারতবাসীরা সৌকুমিল্যে শক বলিত। উহাতেই ভারতের শক শব্দের আবির্ভাব, ও যে-কেহ চীনপ্রান্তবাসীরা তাহাদের চক্ষু তখন শক।

* ক্ষত্রপ কথাটি প্রাচীন পারস্তভাষার Satrapa কথার সংস্কৃত রূপ, ইরোজীতে ইহাকে গবর্নর বোঝায়।

রাত জুপুরেব ঝিক ঝিকি আব দিন জুপুরেব আলোর মেলা
দেখব;—সাঁথে আকাশ ভুড়ে সবুজ পাখীর হেলাফেলা।

এবার আমার উঠতে হ'ল—ছুটতে হ'ল জলটুঙিতে

বাঁধা জলে চেঁউ উঠেছে মন মুহু,—তটেব ভিতে;

শুনতে আমি পাচ্ছি আজাজ,—ঢাকবে তাবে কোন্

আওয়াজে

শুন্ছি তাবে পথের ধারে,—শুন্ছি আমার বুকের মাঝে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হেমকণা

পঞ্চনদ যবনসেনার পদানত হইয়াছিল, তাহা বহুপূর্বেই
প্রবণ করিয়াছি। বিপনাতীবে প্রাচীবিভীষিকা যখন
যবনেব বিজয়উল্লাস নির্দোষিত কবিতা দিয়াছিল, মগধ-
রাজের বিজয়বাহিনীর বিনয় গুনিয়া যবন যখন পশ্চাদ্গত
হইয়াছিল, তখনও আমি যবন সৈনিকের বজ্রভাঙ্গবে
ছিলাম। বলদৃষ্ট গৌরবেব উচ্চশিব নত হইয়াছিল,
মরুগুপ্ত দুর্জয় সকল পূর্বতর্জ ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা
আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। যবনসেনা প্রত্যাবর্তনের পথে
যখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল তখন আমার অবিকারী
স্থলপথগামী সেনাদলের দহিত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর
হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্তের সিংহধারের অর্গলস্বরূপ পুন্ড-
পুন্ড-দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্ত যবনসেনা যখন পশ্চি-
ভাগ কবিতা বিশ্রামলাভের আদেশ পাইল তখন আমার
অধিকারী দ্রুতপদে পুরুষের নগরের রাজপথে অবস্থিত
উজ্জল আলোকমাগার স্ফুটিত একটি বিপনী মধ্যে প্রবেশ
কবিল। গৃহমধ্যে একটি স্থলকায়া রমণী উচ্চ কাষ্ঠাসনে
উপবেশন করিয়া মুগ্ধভাবে সুরা বিক্রয় করিতেছিল, গৃহের
চতুর্পার্শ্বে বহু মানবমানব মৃগয়পাত্র হইতে আসব পান
কবিতাছিল। বিপনীস্থানিনী আমার পরিবর্তে এই যবনকে
দুইটি অতি বৃহৎ মৃৎকলসপূর্ণ মস্ত প্রদান কবিল এবং যখন
আমাকে কাষ্ঠাধারে আসিয়া করিতেছিল তখন দেখিলাম
যবন কক্ষে বসিয়া এক-এ মনে সুবাপান কবিতাছে।
কাষ্ঠাধারের মধ্যে থাকিয়া বিপনীতে ভ্রমণ কলবব শুনিতে-
ছিলাম, অল্পমানে বুঝিলাম বহুক্ষণ ধাবৎ শত শত ব্যক্তি

গৃহে গমনাগমন করিতেছে। উষাকালে যখন বিপনী-
স্থানিনী কাষ্ঠাধারে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া অঞ্চলে বদ্ধ
কবিল, তখন দেখিলাম দীপমালা নির্দোষিত হইয়া
আসিয়াছে, মাদকেব মোহিনীশক্তিব প্রভাবে শতাব্দিক
নবদেহ হৃদয়তলে অবলুপ্ত হইতেছে। ভীষণ নাসিকা-
গর্জন গৃহটিকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে এক-
একজন জড়িতকণ্ঠে বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। গৃহস্থানী
বিপনী হস্তে নির্গত হইল। প্রশস্ত রাজপথে অগ্নিকুণ্ডের
পার্শ্বে যবনরাজের সেনাগণ আপাদমস্তক বজ্রাঘাত হইয়া
নিভ্রা হইতেছিল; নিশাশেষে অস্পষ্ট আলোকে তাহাদিকে
যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত শববাণি বলিয়া ভ্রম হইতেছিল; পুন্ডর
আচ্ছাদনের পাশাণে তাহাব লৌহকীলকবদ্ধ চর্মপাছুবাহার
শব্দে আগরিত হইয়া কোন কোন যবন মস্তকোচ্ছিন্ন
কবিতাছিল, তাহা দেখিয়া গান্ধারী রমণী পাছকা নোটন
করিতা তাহা হস্তে গ্রহণ করিল ও অবিলম্বে প্রশস্ত বাস্তব
পরিত্যাগ কবিতা অন্ধকাবময় সন্ধ্যা পথ অবলম্বন কবিল।
বহুদূর গমন কবিতা সুবাবিক্রেত্ৰী নগরপ্রান্তে একটি
ধ্বংসোন্মুখ গৃহের দ্বারে করাঘাত কবিল। বারমার
করাঘাতেও যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল না রমণী তখন ক্রুদ্ধ
হইয়া কবাটে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। মৃদু
আঘাতে জীর্ণদ্বার ভগ্ন হইল, রমণী স্থানহীন অস্ত্রায়
দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে দ্বিতীয় কক্ষ
কঠিন ভূমিশষার একটি অপক্লপ স্তম্ভরী বালিকা ম্রন
করিতা ছিল, রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাহাব কেশনশি
হস্তে গ্রহণ করিতা সবলে আকর্ষণ করিল, স্তম্ভ-
স্থপ্তোদ্ধিতা বালিকা আতঙ্কে চীৎকার করিতা উঠিল, বলিষ্ঠা
গান্ধারী রমণী বালিকাকে নিক্ষেপ করিতা গৃহ হইতে
নিভ্রাস্ত হইল। গৃহেব দ্বিতীয় তলে একটি বৃহৎ কাষ্ঠাধারে
রমণী তাহার কঠোপার্জিত অর্থ রক্ষা করিতা কক্ষাধারে
চলিতা গেল।

কাষ্ঠাধার যখন পুনরায় উন্মুক্ত হইল তখন পুনরায়
রমণী আসিয়াছে, গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যগুলি অন্ধকারে প্রাণ
হাইতেছে না। কক্ষমধ্যে ধীরে ধীরে অস্পষ্টস্বরে ছটফট
মল্লয় কণ্ঠোপকণন করিতেছিল। তাহার নিকটে আসিলে
দেখিলাম একজন পূর্বপরিচিত তরুণী, দ্বিতীয় ব্যক্তি জনক

অপরিচিত যুবক। তাহার কাঠাধার হইতে প্রাচীনার কষ্টসঞ্চিত অর্থগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল ও নগর পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। বহুদূর পথ চলিয়া উভয়ে গিরিপথে প্রবিষ্ট হইল, বহুদূর শিলাসঙ্কুল পথ তাহাদিগের গতিবোধ করিল, শ্রান্ত হইয়া যুবক যুবতা পর্বতের পাদদেশে বৃহৎ শিলাখণ্ডের পার্শ্বে আশ্রয়গোপন করিয়া উভয়ে উপবেশন করিল, মুহূর্তমধ্যে মোহিনীমায়ার জায় নিষ্কর আসিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল; তখন নীলাকাশে চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত হইতেছিল, গিরিপথে অন্ধকার-আচ্ছন্ন শিলাখণ্ডগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, আলোক পাইয়া পাঙ্কগণ একে একে অন্ধ ও উদ্ভূপুষ্ঠে গিরিপথে প্রবেশ করিতেছিল; পুঙ্কপুঙ্ক হইতে নগবহার তিন প্রহরের পথ, সূর্যালোক প্রথব হইলে পথচাৰণ অসম্ভব হইয়া উঠে।

ক্রমে গিরিপথে সার্থবাহগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, গিরিপথ পণ্যবাহী অন্ধ ও উদ্ভূচালকগণের কোলাহলে সজীব হইয়া উঠিল, তরুণী ও তাহার সহচরের নিজাভঙ্গ হইল, তাহাবা গুত হইবাব ভয়ে অন্ধকাব মধ্যে লুক্কায়িত হইল। কিন্তু তাহাদিগের দূরদৃষ্টবশতঃ একজন বণিক উদ্ভূত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিতেছিল, শিলাখণ্ডের পার্শ্বে ক্ষীণ অন্ধকার মধ্যে খেতবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্ভূ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বণিক তাহার কারণ অহুসঙ্কান করিতে যাইয়া পান্যপের ছায়ার মন্থমুষ্টি দেখিতে পাইল। তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যুবক ছায়ার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিল, কিন্তু যুবতী কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বণিক তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আলোকে আনয়ন করিল এবং তাহাকে স্নানবী দেখিয়া সাদরে একটি পণ্যবাহী উদ্ভূপুষ্ঠে বসাইল, সার্থবাহগণ পুনরায় পথ চলিতে আবস্ত করিল। গিরিপথ অতিক্রান্ত হইল, শিলাসঙ্কুল বালুকামর পথে উদ্ভূ ও অন্ধশ্রেণী চলিতে লাগিল, পশ্চাতে চন্দ্রালোক স্নান হইয়া আসিতেছিল, পথের চতুঃপার্শ্বে পর্বতশ্রেণীর বর্ণ ক্রমশঃ নীলাভ হইয়া আসিতেছিল। উষা-আগমনে দৃষ্ট হইয়া ভাববাহী পশুগণ দ্রুতবেগে গমন করিতেছিল, তরুণী তখন বজ্রাধার হইতে গোপনে এক এক খণ্ড সূবর্ণ লইয়া পরিচের

বজ্রমধ্যে গোপন করিতেছিল। কিন্তু দিবালোক ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল, যুবতী একাদশটি সূবর্ণ মুদ্রাব অধিক গ্রহণ কবিত্তে পারিল না। শুভ্র উষা আসিয়া যখন অন্ধকাবকে পর্বতকন্ডেরে বিভাড়িত করিল, তখন সার্থবাহগণ পণ্যসম্ভারবাহী পশুদিগকে বিশ্রাম প্রদান করিবার জন্য অর্দ্ধদণ্ডকাল অপেক্ষা করিল, তখন সকলে অন্ধ ও উদ্ভূপুষ্ঠ হইতে অবতরণ কবিল। তরুণীর আশ্রয়দাতা তাহার ক্ষীণ কটিদেশ হইতে বিলম্বিত গুরুভার বজ্রাধার দেখিয়া সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিল ও তাহার মধ্যে হস্তাংশ করিয়া এক-মুষ্টি সূবর্ণ বাহির করিল। সূবর্ণের বর্ণ দেখিয়া সে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহার সহযাত্রীগণ তাহাকে বেটন করিয়া দাঁড়াইল। কেহ বলিল শ্রেষ্ঠী নাগসেন শুভ মুহূর্তে যাত্রা করিয়াছিল, আমরাই কেবল অন্তঃভের ভাগী হইলাম। কেহ বলিল নাগসেন ভাগ্যক্রমে যৌতুক সহ স্নানবী পত্নী লাভ করিয়াছে, কেহবা নিলজ্জ হইয়া তরুণীর স্তম্ভিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিল এইরূপ অপক্লপ রত্নের মূল্য সহস্র সূবর্ণের অধিক। নাগসেন বজ্রাধারটি স্বীয় কটিদেশে রক্ষা কবিল এবং তরুণীকে উদ্ভূপুষ্ঠে স্থাপন কালে তাহার হস্তধর বন্ধন কবিত্তে বিম্বত হইল না।

দুবে নীলাগিরিশিখর প্রথমসূর্য্যাকিরণস্পর্শে যখন সূবর্ণঃ মণ্ডিত হইয়া গেল, সার্থবাহগণ তখন পুনরায় যাত্রা করিল। পর্বতসঙ্কুল পাদপবীন মরুসম ভূমি শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, চালকগণ নির্দিষ্ট হইয়া পশুদিগকে চালনা করিতে লাগিল। দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইলে তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, পশু ও মন্থগণ তাপদগ্ন ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। চালকগণের বিষম পীড়ন সত্ত্বেও পশুগুলি দ্রুতবেগে চলিতে পারিত্তেছিল না, অগ্নিময় বস্ত্রাভ বালুকাক্ষেত্রে তাহাদিগের পদ দগ্ন হইয়া যাইতেছিল, তৃণপাদপবিনীন পর্বতগাত্র হইতে অসহ্য উত্তাপ বায়ুচালিত হইয়া জীবগণকে দগ্ন করিতেছিল। একটি উদ্ভূ ভূপুষ্ঠে পতিত হইল, তাহাব আরোহী দ্রুতপদে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে একটি একটি করিয়া ছয়টি অন্ধ ও উদ্ভূ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মরুপথে পতিত রহিল। স্থানে স্থানে পশু ও মানবের কঙ্কাল বস্ত্রবর্ণ মরুভূমিকে খেঁচ আঁড়া প্রদান করিতেছিল।

ধীরে ধীরে পণ্যযাত্রা পরিত্যক্তপথ পরিত্যাগ করিয়া সমতল বালুকাক্ষেত্রে উপনীত হইল। দ্বিতীয় গ্রহর অতীত হইলে দূরে মরুপ্রান্তে শ্রামল ভূগর্ভস্থ ও পানপশ্রেষী ব্যক্তি হইল, তখন শৃঙ্খলা স্থিত হইয়া, তাড়না বিস্তৃত হইয়া বর্ধাসম্ভব ক্ষতবেগে পশুগুলি তাহাব দিকে অগ্রসর হইল। অর্ধ গ্রহর পরে মৃতপ্রাণ মানবগণ ও পশুগুলি ভীষণ মরু-মধ্যে মৃতসঞ্জীবনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। মরুমধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর অর্ধক্ষেত্রাধিক ভূমি ভূগাছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে অসংখ্য ধর্ম্মরবুক্ষ জন্মিয়াছিল। অতীত যুগে কোন আচ্য শ্রেষ্ঠী পশু ও মানবের হিতার্থ প্রস্তরবর্ণের চতুর্দিকে জলসঞ্চয়ের জল পায়ণনির্মিত সুবৃহৎ কুণ্ড নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, বালবশে কুণ্ডের আচ্ছাদন জীর্ণ হইলেও তাহা নির্মল স্থলিত বাবিপূর্ণ হইয়া থাকিত, অবশিষ্ট জল ভূগর্ভস্থ মধ্যে প্রবাহিত হইয়া মরুমধ্যে জীবনসঞ্চাব করিত। কুণ্ডের পাশ্বে উপস্থিত হইয়া প্রভু ও ভৃত্য, পশু ও মানব আকর্ষিত জলপান করিল ও ধর্ম্মরবুক্ষের ক্ষীণ ছায়ায় বিশ্রাম লাভার্থ উপবেশন করিল। তৃতীয় গ্রহর অতীত হইলে পণ্যযাত্রা ভূগর্ভস্থ পরিত্যক্তপথ করিয়া মরুপথ অকলম্বন করিল। যখন দিবালোক ম্লান হইয়া আসিতেছিল তখন ক্রান্ত সার্ববাহগণ দূরে পরিত্যক্ত নগরহাওয়ার পুরের উচ্চচূড় সৌধমালা দেখিতে পাইল। অন্তর্গামী স্বর্ঘ্যের রক্তাভ কিরণমালা যখন সন্ধ্যারবেগে পশ্চিম প্রাসাদ-শিখরসমূহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল তখন পণ্যযাত্রা ধীরে ধীরে নগরবতোবশে প্রবিষ্ট হইতেছিল। দক্ষিণ তোরণের পাশ্বে বৃহৎ পাহাশালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বণিকগণ বজ্রনী অতিবাহিত করিল। তরুণী রাজিকালে পাহাশালার কক্ষমধ্যে আবদ্ধা রহিল। অশ্বসংহর হেয়ারবে, হস্তী বৃহৎ ও উষ্ট্রের কক্ষ ধ্বনিত যখন পাহানিবাসের প্রাঙ্গণ কলববর্ণ হইয়া উঠিল, তখন নাগসেন তরুণীকে কক্ষ হইতে বহির্দিশে আনয়ন করিল। পাহানিবাসের অপর পাশ্বে রাক্ষসগণে দাস-বিক্রয় হইতেছিল, পথের উভয় পাশ্বে বিক্রোতাগণ তাহাদিগের স্বর্ণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ঘোঁ-দেশের সুন্দরী তরুণী, ভৃত্যহাওয়ারক্ষাসমর্থ্য বলিষ্ঠ বাহ্লীক-রমণী, কপিশাবাসী পিকলকেশ অর্ধা, বাহ্লীকনিবাসী দীর্ঘকায় শক, মীনাকী পাত্রারী, সবলদেহী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র

প্রভৃতি নানা দিগ্দেশ হইতে আগত দাসদাসী শরতের প্রান্ততে নগরহাবের বাজপথে বিক্রোত হইতেছিল। সম্পূর্ণ উল্লস অবস্থায় বালকবালিকা ও পুরুষগণ, এবং ক্ষুদ্রবয়স্ক পরিহিতা রমণীগণ প্রদর্শিত হইতেছিল। নাগসেন যুবককে এইস্থানে প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহার রূপে মোহিত হইয়া নগরহাবাসী জনৈক ধনশালী বৃদ্ধ বণিক সহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া বালিকাকে ক্ষেত্র কবিল, আমরা সার্ববাহগণের সাহচর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। ছিন্ন বস্ত্রপণ্ডে কটিদেশ আবৃত কবিতা, লজ্জায় অবনত হইয়া বালিকা সতরে বৃদ্ধের পশ্চাদ্ভ্রমণ করিল। বৃদ্ধ অবিলম্বে তরুণী সমভিব্যাহারে নগরহাবের প্রধান বাজপথের পার্শ্বস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তরুণী অত্যন্ত কালমধ্যে বৃদ্ধ স্বামী বনের রণ করিল ও বৃদ্ধের বিস্তৃত প্রাসাদের কর্তা হইয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাকালে পুরুষপুত্র হইতে পলায়ন-বিবরণ বন্ধ হইলে বালিকা যুবতী ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল হইতে আত্মদিককে নইয়া বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিল, বৃদ্ধ আত্মদিককে গ্রহণ করিয়া সবল লৌহপেটিকা মধ্যে আবদ্ধ করিল।

তাহার পব বহুকাল স্বর্ঘ্যালোক দেখিতে পাই নাই। প্রত্যাবর্তনের পথে ইতিহাসবিশ্রুত বাবিরুখ নগরে অল্পে যবনরাজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাহার মিশ্র সাত্রাজ্যে তাব শিশুপুত্র ও যুবতী বিধবার হস্তে লাগু হওয়ার অনতিবিলম্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার কৃত্য অব্যবহিত পবেই মুষ্টিময় যবনসেনা পঞ্চনদ হইতে তরুণী হইয়াছিল। অবিলম্বে মগধনাথ প্রাচীন পোরব, যাদব ও মাজবাজ্য ধ্বংস করিয়া পঞ্চনদে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। যবনরাজের বিশাল সাম্রাজ্য তাহার সেনানীগণের উপভোগ্য হইয়াছিল। মহাসেনাপতি সিলিউক আধ্যাবর্ত ও ঘোঁনদীপেব মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া যবনরাজের বিজয়যাত্রার অগ্রকরণে উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যবনাভিব্যাসের প্রথম তরঙ্গ বাহ্লীকের নগরপ্রাকার স্পর্শ করিয়া ফুট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তরঙ্গের পুত্র তরঙ্গ আসিয়া নগরপ্রাকার বিধ্বস্ত করিয়া দিল, তখন বাহ্লীক হস্ত

মহারাণী কপিলা নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যবনসেনা কপিলা নগরে উপস্থিত হইবার পূর্বে সংবাদ আসিল সম্রাট স্বয়ং পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়াছেন। যবনসেনাও বাধা মানিল না, বিজয়োল্লাসে উন্নত হইয়া যবনসেনা চূর্ণের পব হুর্গ নুগবের পর নগর কবায়ত্ত করিতেছিল। দাসী-পুত্রের শাসনকর্তারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কপিলা হুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই, পানীর জ্বলের অভাবে যখন হুর্গবাসীগণ আত্মসমর্পণ করিল তখন বিস্মিত যবনসেনা দেখিল অনাহারে শীর্ণ মৃতপ্রায় শতাবধি পদাতিক হুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইল, যবনরাজ দয়াপবন হইয়া তাহাদি কে মুক্তিপ্রদান করিলেন। সিলিউকের বিজয়-বাহিনী কপিলা পশ্চাতে রাখিয়া মরুবেষ্টিত নগরহাট হুর্গ অবরোধ করিল। নগরহাটে মৌর্যসেনা এই সংবাদ পাইল, যে, সম্রাট শতক্রোধে উপস্থিত হইয়াছেন। ভীষণ মরুবেষ্টিত স্রুতপ্রাকারগুপ্ত নগরহাট কিয়ৎকালের জন্য যবনসেনার গতিরোধ করিয়াছিল। নগরহাট, পুরুষপুত্র, উত্তান ও গান্ধার অধিকৃত হইল, দুস্তর সিদ্ধনন্দ অতিক্রান্ত হইল। যখন দুবে তক্ষশিলার পশ্চিম তোষণ দৃষ্ট হইল তখন যবনসেনা মুখ শুক হইল, কারণ নগরহাটে মৌর্যসম্রাটের সিংহাসিত রক্তবর্ণ পতাকা প্রবলবায়ুভাবে উড়িতেছিল। সিলিউক অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই, তক্ষশিলার এক যোদ্ধা দূরে যবনশিবির স্থাপিত হইয়াছিল, নগরোপকণ্ঠ বজ্রবাসে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, নগরপ্রান্তরে দ্বিতীয় যবনাভিব্যানের ভাগ্যপরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফল যাবনিক ইতিহাসে দেখিতে পাইবে।

যবনসেনা যখন নগরহাট লুণ্ঠন করিয়াছিল, তখন তাহার নবীনা ক্রীতদাসী যবনের উপভোগ্য হইয়া স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেট সময়ে বণিকের পুরুষাঙ্কুরে সজ্জিত সুবর্ণরাশি যবনরাজের কোষভুক্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় যাবনিক অভিযানে যবনসেনার সহত আমি পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

যখন বিশ্ববিজয়ী যবনসেনা সর্বপ্রথমে আর্ঘ্যাবর্তে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন শত শত ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত উত্তরাপথ অল্লাসে যবনরাজের পদানত হইয়াছিল। দ্বিতীয় যাবনিক অভিযানের সময়ে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ

সমবেত হইয়া যবন সেনার সম্মুখীন হইয়াছিল। বৃদ্ধব্যবসারে শুক্লকেশ সিলিউক বুরিয়াছিলেন বাহ্লীক, কপিলা ও গান্ধার সহজে জিত হইলেও পঞ্চনদ অধিকাংশ সহস্রাধ্য হইবে না, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা পবাজিত হইলেও যবনসেনা সাম্রাজ্যের সুশিক্ষিত সেনাদলেব সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বৃদ্ধ সিলিউক সহস্রযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ী যবনসম্রাট কর্তৃক হৃদযন্ত্র শিক্ত হইয়াছিলেন, ভয় তাঁর হৃদয় হইতে বহুপূর্বে অন্তর্হিত হইয়াছিল। অদৃশ্য সেনানায়কগণ হয় তো অভিযান শেষ করিয়া পশ্চাদ্গত হইতেন, কিন্তু সিলিউক বুরিয়াছিলেন বিনায়ুদে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে যবনসেনার একজনও তাহার নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে না। তিনি তক্ষশিলা নগরের অদূরে প্রান্তবন্যে পরিধা খনন করিয়া ও যুগ্ম প্রাকার রচনা করিয়া আত্মরক্ষা ব্যবস্থা করিলেন, অর্দ্ধাধিক সৈন্য দুর্গমধ্যে বহিল, অবশিষ্ট সিদ্ধনন্দ পর্যন্ত পথরক্ষায় ব্যাপৃত হইল। তক্ষশিলানগরবে প্রাসাদে অবস্থান করিয়া চন্দ্রগুপ্ত সকল সংবাদ অবগত হইতেছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যবন আক্রমণ করিবে না, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, তখন অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। পত্রপালের জ্ঞায় মৌর্য পদাতিকসেনা প্রান্তরমধ্যস্থিত যুগ্ম হুর্গ অবরোধ করিল, অশ্বাবোহী, গজারোহী ও রথারোহীগণ অবিবাহিত পথবক্ষী যবনগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সপ্তাহকাল মধ্যে হুর্গভিক্ষপীড়িত হইয়া যবনসেনা পবিধাপাবে যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। তখন চন্দ্রগুপ্ত দূর হইতে অশ্বাবোহী সেনা দ্বারা যবনসেনার উত্তর পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন, দুব হইতে লক্ষ লক্ষ পদাতিকসেনা কৌতুক দেখিতে লাগিল। বিপদ বুরিয়া সিলিউক প্রত্যাবর্তনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ধীবে ধীবে স্রুতপ্রায় যবনসেনা হুর্গে লাগিল, পথ তখনও স্থানে স্থানে যবনাধিকৃত ছিল। ধীরে ধীরে পশ্চাদ্গত হইয়া সিলিউক সিদ্ধনন্দে উপনীত হইলেন। যবনসেনা যখন তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন মৌর্যসম্রাটের অসংখ্য অশ্বাবোহী সুবিধা পাইলেই চতুর্পার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল, কোনও যবন এক মুহূর্তের জন্য স্থান পরিত্যাগ করিলে, আর ফিরিতেছিল না। যবনরাজ

বিনাযুদ্ধে সিদ্ধি পায় হইয়া পলায়ন করিলেন। মৌর্য অশ্বারোহীগণের অবিশ্রান্ত আক্রমণে দিন দিন যবনসেনার সংখ্যা হ্রাস হইতেছিল। পুরুষপুত্র নগরে আহার্য্য পাইয়া যবন সেনা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিল। কেহ কেহ সুদৃঢ় পুরুষপুত্র-দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া সিলিউককে মৌর্য সেনাব আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সিলিউক তক্ষশিলার প্রান্তবে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন বিশেষে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইলে অসম্ভাব্যে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, উদ্ধারের কোন আশাই থাকিবে না। যবনসেনা পুরুষপুত্র হইতে নির্গত হইয়া গিরিপথের প্রবেশদ্বারে শিবির স্থাপন করিল। শিলাসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ গিরিপথে অশ্বারোহী সৈন্য চালনা করা অসম্ভব, তাহা বুঝিয়া সিলিউক একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পুরুষপুত্র নগরোপকণ্ঠে উভয়সেনা মধ্যস্থে প্রস্থিত হইতে লাগিল। যবনরাজ কোষ, অরোধ ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে গিরিপথে রাখিয়া লৌহবন্দীভূত দুর্জয়ের পদাতিকসেনা গিরিপথের দ্বারে স্থাপন করিলেন। অগ্ন্যসংখ্যক যবন অশ্বারোহী গিরিপথের অপর দ্বার অধিকার করিয়া রহিল।

ভীষণ বেগে বাব বার আক্রান্ত হইয়াও অশিক্ষিত যবনসেনা হিমবানের জায় অচল রহিল, সহস্র চেষ্টা করিয়াও মৌর্য পদাতিকগণ তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না, ক্রোধে ক্রোধে অধীর হইয়া সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং সৈন্যচালনা করিতেছিলেন। যবনসেনার সম্মুখে মৃতদেহের প্রাকার রচিত হইয়াছিল, বিস্তৃত বিশ্ববিদিত ব্যুহ রচনা করিয়া যবনসেনা পাষাণের জায় নিশ্চয় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সময়ে সময়ে সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে পুরুষপুত্র-দুর্গের উচ্চ চূড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, হঠাৎ দুর্গদ্বিধে হবির্ঘণ আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, একই সময়ে গিরিপথমধ্যস্থিত পর্কতশিখরে অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইল। উল্লাসে অগ্ন্যধ্বনি করিয়া সহস্র সহস্র মৌর্য পদাতিক যবন-ব্যুহ আক্রমণ করিল, শবদেহের সেতু নির্মাণ করিয়া মৌর্য পদাতিক সেনা যবনব্যুহে অতিক্রম করিল, অকস্মাৎ নিশ্চল যবনসেনা কম্পিত হইয়া উঠিল, গিরিপথে উচ্চ কোলাহল শ্রুত হইল, যবনগণ পশ্চাদ্গত হইতে লাগিল, ব্যুহ নষ্ট হইল;

পংক্তি ভঙ্গ হইল, বিশৃঙ্খল হইয়া যবনসেনা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্তের আদেশে প্রাদেশিক মহাসম্মা-গণ গাঙ্কাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ হইতে গিহি-পথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় যবন অশ্বারোহীসেনা গাঙ্কার বীরগণের গতিবোধ করিতে পারে নাই, উভয় সৈন্য হইতে আক্রান্ত হইয়া যবনসেনা পবাস্রিত হইল। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধনভাণ্ডার ও অশিক্ষিত সেনা হাবাইয়া যবনরাজ সিলিউক, মৌর্যসেনা কর্তৃক ধৃত হইলেন, দ্বিতীয় বাবনিক অভিযান শেষ হইল।

শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

“জেনারেল” বুথ

“Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest”—St. Matthew, XI, 28.

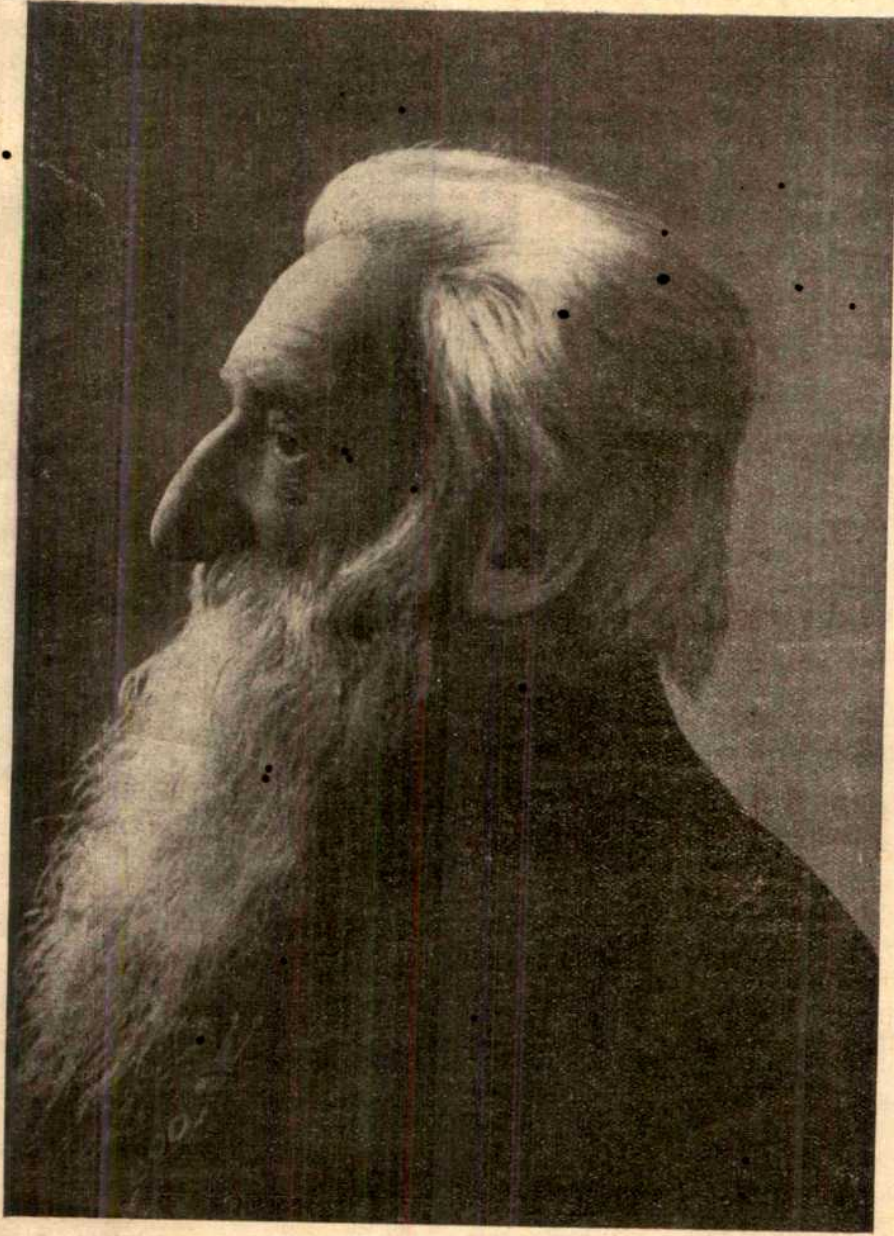
বিধাতার বিধে যখনই কোন বিশেষ অমঙ্গল প্রকল ভাবে জাগিয়া উঠে তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি-বিধায়কও আপনা হইতেই দেখা দেয়। মানবজাতির ইতিহাস এ কথাই সাক্ষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ইংল-ও রাজশক্তির অপব্যবহারে প্রপীড়িত, তখন বীৰবর ক্রমোল্ডে অমিতভেদে প্রজাশক্তির অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স যখন বিলাসবাসনমত্ত বূর্বোবংশের অত্যাচাবে ও অহি-জাতবর্গের স্বার্থপরতার অধঃপতনের চব্বসসীমায় উপস্থিত, তখন ফরাসীবিপ্লবের তাণ্ডবনৃত্য তাহার মৃত প্রাণে চেহনা সঞ্চার করাইয়া দিল। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে যখন আর্য্যগণের সর্বল বৈদিক ধর্ম জিয়াগাণ্ডাবাহুল্যে গল্ল ও নিষ্ঠুর যজ্ঞ, জীববলিতে পরিণত হইল তখন নবোদিত বৌদ্ধধর্মের প্রবল বজ্রা আসিয়া তাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল। বর্তমানকালেও আমাদের দেশে একদিন যখন রাষ্ট্রিকৃত প্রাণহীন সংস্কার ও অর্থহীন আচারপদ্ধতি প্রাচীন সমাজপ্রাণকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়া তখন পশ্চিম হইতে একটা বিপ্লবী অভিশ্রুতি আসিয়া সেই সুপ্ত জাতীয় জীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়া দেশে

ও সমাজে নরনারীর স্বত্বপাত করিয়া দিল। এইরূপে সমস্ত জাতির কি রাজ্যীয়, কি ধর্ম, কি সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব যখন পৃথিবীর যে অংশে কোন বিশেষ অমঙ্গল মস্তক উত্তোলন করিয়াছে তখনই সেখানে তাহার প্রতিবিধানের আয়োজন হইয়াছে।

এক সময়ে যখন ইংল্যান্ডের দরিদ্র ও নিরশ্রম, ধর্ম, প্রেম, করুণা প্রভৃতি মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া পাপের পঙ্কিলাবর্তে পতিত, তখন আজ এ স্থলে যে পুণ্ডরিক মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রুত কবিত্তে বাইতেছি—তিনি তাহাদের তমসাচ্ছন্ন প্রাণে ধর্মের বিমল জ্যোতি সঞ্চার করিয়া দিয়া সেই হীন অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াব অল্প অপনার জীবন উৎসর্গ করেন। তাহার সেই আত্মোৎসর্গেব ফলে পাপের চরম অবস্থার উপনীত লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ নবজীবন লাভ করিয়া শতকণ্ঠে সেই মহতোমহীয়ানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

বিশ্ববিস্তৃত ধর্মপ্রচারকমণ্ডলী “যুক্তি-কৌজের” প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, কর্মবীর, ধর্মপ্রাণ “জেনাবেল” বৃথ ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে ইংল্যান্ডের নটিংহাম নগরে এক অতি দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাবিত্যিক দারিদ্র্যবশতঃ তাহার বাল্যজীবন অতি দুঃখবহুতেই অতি-বাহিত হয়। অনেক ধর্মবাক্যের অনুগ্রহে তাহার যৎসামান্য শিক্ষালাভ হয়, বিদ্যালয়ে কিবা কলেজে পড়িবার সুযোগ তিনি পান নাই। শৈশবে বৃথ তাহার পরিবার মধ্যে “গ্রেটে গার্ট চার্চ অব ইংল্যান্ডের” ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিপালিত হন। কিন্তু বালক বৃথের স্বাভাবিক ধর্মস্বরাগী প্রাণ “চার্চ অব ইংল্যান্ডের” সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ক্ষুণ্ণি পাইল না। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই প্রকাজভাবে “ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট” (Wesleyan Methodist) ধর্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া তাহাদের প্রচারক নিয়োজিত হইয়া নটিংহাম নগরেই ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। প্রায় পাঁচবৎসরকাল এই স্থানে প্রচার করিয়া ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশিষ্ট বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনে আসিয়া নানাস্থানে “উজ্জ্বল সভার” জনসাধারণের নিকট ধর্মোপদেশ, বক্তৃতা ও সঙ্গীতের সাহায্যে, প্রচার করিতে লাগিলেন। কি

“ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট” সম্প্রদায় এই সমুদয় “উজ্জ্বল সভার” উপকারিতায় বিশেষ আস্থা বান ছিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই বৃথের সহিত এ বিষয়ে তাঁহাদের মতান্তর হওয়াতে তিনি “ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট”দিগের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া “মেথডিস্ট নিউ কনেক্সন” (Methodist New Connexion) নামে “মেথডিস্ট”দেরই আর একটি সম্প্রদায়ে প্রচারকের কার্য গ্রহণ করিলেন। কয়েক বৎসর প্রচারের পরে এই সম্প্রদায় বৃথের অক্লান্ত কার্য-কুশলতা ও অপূর্ব ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কোন স্থলের স্থায়ী আচার্য্যের পদে বরণ করিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ স্থলে আবদ্ধ থাকিয়া আচার্য্যের কার্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। বৃথের বহুদিনের বাসনা তিনি ইংল্যান্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া যেখানে আবশ্যক বোধ হইবে সেইখানেই ধর্ম প্রচার কবিবেন। তিনি এই বিষয়ে আপনার অভিমত “মেথডিস্ট নিউ কনেক্সনের” কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাব এই প্রস্তাবেব অনুমোদন না করায় তাঁহাকে আচার্য্যের পদ ত্যাগ করিতে হইল। পদত্যাগ করিয়া বৃথ কর্ণওয়ালে (Cornwall) আসিলেন। এই স্থানে পুরুষদিগের মধ্যে তিনি ও রমণীদিগের মধ্যে তাঁহার সহধর্মিণী, প্রচারকার্যে ব্রতী হইলেন। কিছুকাল পরে কর্ণওয়াল হইতে তাঁহার কার্ডিফে (Cardiff) এবং অবশেষে কার্ডিফ হইতে ওয়ালস-অলে (Walsall) গমন করিলেন। ওয়ালস-অলে আসিয়া বৃথ ও তাঁহার পত্নী কয়েকটি লোকের সাহায্যে “Hallelujah Band” নামে একটি ধর্মপ্রচারের দল গঠন করিয়া দরিদ্র ও পতিতা-পন্নীতে, কারামুক্ত অপরাধীগণের গৃহে হে, থিয়েটার ও সর্বাবস্থানার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া “পাতকীশরণ” ও “দীনবন্ধুর” নামগান শুনাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই—চৌধ্য, মস্তপান, কুৎসিত বচসা ও জুরাখেলার বাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, ভ্রমেও যাহারা কখনো ভগবানের নাম লইত না—তাঁহারা বৃথের উপদেশে ও তাঁহার ধর্মপ্রাণতার সংস্পর্শে আসিয়া “Hallelujah Band” ভুক্ত হইয়া পড়িল। বৃথের এই “Hallelujah Band” উজ্জ্বল প্রান্তরে এবং আ



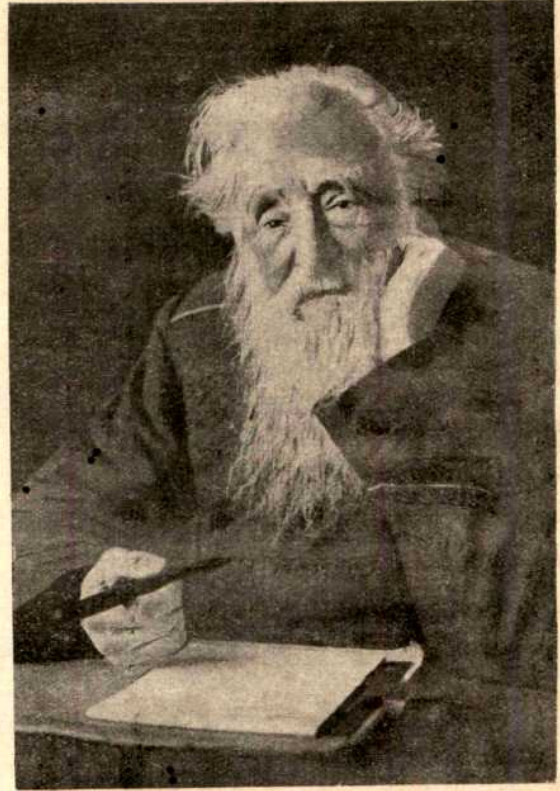
জেনারেল বুথ (৭৮ বৎসর পূর্বকার ফটোগ্রাফ) ।

প্রকাশস্থানে ধর্মসঙ্গীতের তালে তালে নানাবিচিত্র বাস্তবায়ন বাজাইয়া ধর্ম প্রচারের এক অভিনব পন্থা খুলিয়া দিল। কিন্তু ওয়ালস্-অলের কুদ্র সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবাব জন্ত এই মহৎ অমুষ্ঠান স্থচিত হয় নাই একথা বুথ অতি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। জগতে যে দিব্যরাত্রি বহুশত অভাগা, আশ্রয়হীন, শোকজীর্ণ ও রোগশীর্ণ পাপী-

তাপীর ক্রন্দন উঠিতেছে তাহা তিনি জানিতেন, তাঁহার বিশালহৃদয়ে এইসকল দুঃখকাতর, অনশনক্লিষ্ট, পাপপথের পথিক নরনারীর আন্তরধ্বনি পৌছিয়া তাঁহাকে আর স্থির থাকিতে দিল না। তিনি লণ্ডনের পূর্বপ্রান্তের [East End] বিশাল কার্ষক্ষেত্রে আপনার আরক্ত কশ্মীর প্রতিষ্ঠার জন্ত ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ালস্-অল ত্যাগ করিলেন।

লণ্ডনের পূর্বপ্রান্তে বুথ তাঁহার কার্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া বৃদ্ধিতে পারিলেন যে দারিদ্র্যই এইসকল স্থানের অধিবাসীগণের শোচনীয় নৈতিক ছরবছার একমাত্র কারণ। বুথ বুদ্ধিলেন ক্ষুধার তাড়নাতেই পুরুষ চৌধ্য ও নরহত্যা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকথন আশ্রয় করে ও রমণী আপনার শালীনতা বিসর্জন দেয়; রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নাতেই জননী, পিশাচীর ছায় আচরণ করে, আপন সন্তানের মুখ হইতে আহার কাড়িয়া লয়, আপন গর্ভজাত কন্যাকে পাপপথে পরিচালিত করে। কিন্তু এই নৈতিক ছরবছার মূল কারণ যে দারিদ্র্য তাহা দূর করা অল্পদিনের কিম্বা সহজসাধ্য কার্য নয় বুদ্ধিয়া বুথ একদল উৎসাহী লোক সংগ্রহপূর্বক “স্ট্রিট এণ্ডোর” নানা স্থানে সভা, সংকীর্তন, ধর্মোপদেশ, বক্তৃতা—এমন কি পুষ্টিকর স্ব্থাচ্ছ পর্যন্ত বিতরণ করিয়া ধর্মপ্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। এই ধর্মপ্রচার-মণ্ডলীর নাম হইল “The East London Revival Society”; ভবিষ্যতে এই সোসাইটী হইবার নাম পরিবর্তনের পর “The Salvation Army” উপাধি গ্রহণ করে।

“পূর্ব লণ্ডন পুনরুজ্জীবন সমিতি” গঠিত হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু দরিদ্র, সমাজ-পরিভ্রষ্ট, কারা-মুক্ত, পাপনিমজ্জিত পতিত ও পতিতা বুথের বৃথাবাগাড়ম্বর-হীন, প্রাণম্পর্শী ধর্মোপদেশ শ্রবণে ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে নবজীবন পাইয়া ক্রমে ক্রমে এক মহামণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বুথ এই বিরাট মণ্ডলীকে এক সম্পূর্ণ নূতন আকার ও আখ্যা দান করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগের আদর্শে তাঁহার প্রচারমণ্ডলীর নিয়মপ্রণালী গঠনপূর্বক তাহার কার্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটা বিভাগের উপর এক একটা কার্যের ভার দিলেন। মণ্ডলীর সভাগণকে সৈনিকবেশে সুসজ্জিত করিলেন, সৈনিকবিভাগের ছায় মণ্ডলীর কর্মচারীগণের “কাপ্তেন,” “মেজর,” “কর্নেল” প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইল। রণসঙ্গীতের অমুকরণে “March onward Christian Soldiers.” প্রভৃতি ধর্মসঙ্গীত রচিত হইল। এমন কি সভাগণের শাসের জন্ত ইংল্যান্ডের নানাস্থানে



জেনারেল বুথ (শেষ ফোটোগ্রাফ)।

“ব্যারাক” পর্য্যন্ত নির্মিত হইল; আর এই “সৈন্যদলের” নাম হইল “The Salvation Army” বা “মুক্তিফৌজ” এবং তাঁহাদের কর্ম হইল পাপের বিরুদ্ধে অভিযান। বুথ এই মুক্তিফৌজের অধিনায়ক হইয়া “জেনারেল” উপাধি গ্রহণ করিলেন। “জেনারেল” বুথের পরিচালনায় “মুক্তিফৌজ” পতিত ও হীনকে পাপতাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত বহু কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রকাশ্য সভায় অতি সরল ভাষায় বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশ দান, বিরাট শোভাযাত্রা, পানশালা ও কারাগার পরিদর্শন, দরিদ্র-পল্লীভ্রমণ এবং রোগীর পরিচর্যা, নৈশবিভাগ স্থাপন ও পতিতা উদ্ধার প্রভৃতি নানা বিচিত্র মঙ্গল অমুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু সকল দেশে ও সকল যুগে যাহা ঘটিয়াছে এ ক্ষেত্রেও তাহার পুনরতিনয় হইল। বুথের প্রচার-মণ্ডলীর এইরূপ অভিনব আকার ধারণে দেশমধ্যে একটা কুসুম বিরুদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। কতিপয় সংবাদপত্র

এই আন্দোলনে যোগদানপূর্বক তাহার পুষ্টিসাধন করিয়া "মুক্তিকৌজের" বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা মিন্দাবাদ ও কুৎসা প্রচার আরম্ভ করিলেন। গভর্নমেন্ট পর্যন্ত কৌজের নামে ভীত হইয়া উঠিল এবং "মুক্তিকৌজের" সভা ও শোভাযাত্রা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইল। "মুক্তিকৌজের" কর্মচারীগণের মধ্যে অনেককে সাধারণের শাস্তিভঙ্গের অপরাধে রাজস্বারে অভিযুক্ত হইয়া অর্থদণ্ড এবং কোন কোন স্থলে কারাদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিতে হইল। কিন্তু বুথ ইহাতে ভীত বা নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি জানিতেন ক্ষমতার মদে মাতাল লোকেরা তাঁহার গুরু বীভূতকে প্রত্যহ অপমান করিয়াছে এবং অবশেষে তাঁহাকে জুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছে, তথাপি তিনি সেই হতভাগ্যদিগকে নীরবে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। "Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for His sake," এই উপদেশ সম্মুখে রাখিয়া বুথ বিপুল উৎসাহে "মুক্তিকৌজের" অধিনায়কতায় তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন; সমুদয় ইংল্যাণ্ডে বিপুল আন্দোলনের তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

কিন্তু বুথকে স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা অধিক দিন বহন করিতে হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চমৎকৃত স্বদেশবাসীগণ বিস্তৃতনেত্রে দেখিল "মুক্তিকৌজ" সহস্র সহস্র দরিদ্র, নিবন্ধর, পাষাণ জ্বরহীন মস্তপায়ী ও প্রবঞ্চক এবং দুর্দশাব চরমনীমায় পতিত পতিতাগণের মধ্যে আশ্রয় পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। এইরূপে বুথের নাম ও কার্যের কথা ক্রমে সমুদয় সমাজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়াতে ও ইউরোপের অন্তান্ত দেশে "মুক্তিকৌজের" শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার অল্পদিন পরেই ভাবতবর্ষে ও লঙ্কাবীপেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় ছাপান্ধটা দেশে ইহার কার্যক্ষেত্র এবং একবিংশতিসহস্র কর্মচারী এই সমুদয় শাখাতে কার্য করিয়া থাকেন। পতিতা ও অনাথ-আশ্রম, আত্মশ্রমালয়, হাসপাতাল ও রাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই "মুক্তিকৌজ" মানবের সেবা করিতেছে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে "জেনারেল" বুথের পত্নীবিয়োগ হয়। বুথের পত্নী তাঁহাবি উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। "মুক্তিকৌজের" মহিলা-প্রচারবিভাগের কত্রীরূপে তিনি প্রায় দশবৎসরের অধিককাল স্বামীর কার্যের সহায়তা করিয়া ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে পতিতারমণী-উদ্ধারকল্পে এই নারী বাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইংল্যাণ্ডের সাবান্দ্রিক ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরগৌরবগাথার উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। পত্নীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই "জেনারেল" বুথের "In darkest England and the way out" পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়া আব একটা আন্দোলনের স্রষ্টি করিল। বুথ তাঁহার এই পুস্তকে ইংল্যাণ্ডের অসুন্নতশ্রমীর অবনতি ও দুঃখদারিত্যের জলন্ত চিত্র আঁকিয়া ভ্রাতৃর প্রতিবিধানের যে সমুদয় পন্থা নির্দেশ করিলেন তাহা ঘৃণ্ট করিয়া ইংরাজসমাজ বুঝিতে পারিলেন যে সমাজের নিরস্ত্রবের অভ্যন্তরেই জাতীয় জীবনের মূলশক্তি নিহিত, আব সমাজ ও জাতিকে যথার্থ শক্তিশালী করিতে হইলে সমাজেব নিরস্ত্রের অবস্থিত

"ওই সব মুষ্টি মান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা

"ওই সব শ্রীকৃত কৃৎ তর বৃকে ধনিয়া তুলিতে

হবে আশা।"

আর তাহাদেরি জন্ত—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল পরমায়ু,

সাহস-বিজুত বক্ষপট"—

তাই তিনি তাঁহার পুস্তকে ইংল্যাণ্ডবাসীর নিকট এই নিরস্ত্রের জন্ত যথেষ্ট পুষ্টির আহাৰ্য্য, উপযুক্ত পরিচ্ছন্ন, মুক্তস্থানে পরিচ্ছন্ন বাসগৃহ, দরদ্রের জন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধবিতরণ, পতিতারমণী মস্তপায়ী ও ব্যক্তি-প্রস্তের জন্ত বাসস্থান প্রভৃতি নানা অসুস্থতানের প্রস্তাব উপস্থিতপূর্বক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সহস্র সহস্র মুঢ়া আসিয়া তাঁহার সংকল্পিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা বরিকা দিল।

মুক্তিকৌজগঠনে দেশে যে একটা বিরুদ্ধতাব জাগিয়াছিল তাহা এতদিনে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সমুদয় পৃথিবীভ্রমণের পব বৃথ যখন স্বদেশে ফিবিলেন তখন লণ্ডনের এলবার্ট হলে তাঁহার যে সম্বর্ধনাসভা হয় সেই সভায় ইংল্যান্ডেব বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও দশসহস্র দর্শক তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তিপূজাঞ্জলি অর্পণ করবেন।

“জেনারেল” বৃথ অক্লান্তপরিশ্রমী সদাহাস্তোজ্জল ও অতি মধুরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন প্রকার গর্ব বা অহঙ্কার তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইত না। অথচ তাঁহার জ্ঞান সম্রাট সমাদব অতি অল্প ধর্ম্মনেতাবই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ইউরোপেব অধিকাংশ রাজস্ববর্গ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও দার্শনিকগণ তাঁহার সহিত সাগ্রহে আলাপ করিয়াছেন। প্রচারকাণ্ডে বৃথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচবাব, অষ্ট্রেলিয়াতে তিনবাব, ভারতবর্ষে দুইবার ও ইউরোপের সমস্ত দেশে কয়েকবার কবিতা ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্তমানকালের জড়বাদ ও নাস্তিকতাৎ যুগে “জেনারেল” বৃথ তাঁহার “মুক্তিকৌজ” লইয়া যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন একমাত্র মধ্যযুগের মঠপ্রতিষ্ঠাতাদিগের কার্য্যাবলীসহ সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। আজ সমস্ত ইউরোপ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন যে তিনি “বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনেতা।”

কিন্তু বৃথ শুধু ‘ধর্ম্মনেতা’ ছিলেন না, তিনি অসংখ্য নরনারীর আশাহীন, লক্ষ্যহীন, অন্ধকার হৃদয়ে আনন্দ-উজ্জল-আলোক আনিয়া দিয়াছেন, পতিতানাবীব চির-দুঃখের জীবনকে নিজেব ভালবাসা দ্বারা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, ক্ষুধিতকে নিজহস্তে করুণামাখা অন্ন তুলিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বমানবেব এই হিতৈষী বন্ধু গত ২৩শে আগষ্ট, রাজি দশ ঘটিকার সময়, ৮৩ বৎসব বয়সে দেহত্যাগ করিয়া বিপদ-দুর্গম দীর্ঘ জীবনযাত্রাব অবসানে “ক্লান্তপদে রক্তসিক্তবেশে” এক চিবশান্তি স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যু আসিয়া মহৎজীবনের পুত প্রবাহকে কদ্ধ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তাঁহাদেব বাণী কি কার্য্যকে কখনই লুপ্ত কবিতো পাবে নী; শত শত শতাব্দীর স্তব ভেদ

করিয়া তাহা প্রচ্ছন্নভাবে মানব-অন্তঃকরণকে উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

বিশ্ব-কর্ম্মীর বিজয়-যাত্রা

(William Morris)

কিসেব এ গোল ? কাণ্ড কি এ ? ইল্লা কিসেব লোকের
মেলার ?

পাহাড়তলীব ঝোড়ো হাওয়া গর্জে যেন উঠছে হেলার !

গর্জে যেন উঠছে সাগর ভয়ে-ভরা সন্ধ্যা বেলায় !

—জগৎ-জন-সাধারণ ওই গর্ব ভরে

বেরিয়েছে আজ টহল দিতে পথের 'পরে !

কেমন ওরা ? যাচ্ছে কোথা ?—কোথা হ'তে হ'চ্ছে আসা ?

স্বর্গ নরক—দুই ফটকের—মাঝে ওদেব কোথায় বাসা ?

টাকায় ওদেব যায় কি কেনা ? কর্ম্মে কাজে কেমন ? খাসা ?

জনরবেব নেইক অন্ত,—হাওয়ার ভরে

বেরিয়েছে সব টহল দিতে বিশ্ব 'পরে !

ওই শোনো—ওই ! যন যন বজ্র ইঁাকে,

ওই দেখ—ওই ! সূর্য্য হাসে মেঘের ফাঁকে !

ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে,—চমক লাগে !

জগৎ-জন-সত্ত্ব হেথা গর্ব ভবে

টহল দিয়ে ফেঁবে সাঁবা ভুবন 'পরে !

বর্জে শোচন, শাসন, পীড়ন, স্বাস্থ্য হুথের অভিমুখে

চলেছে সব,—বাঁধতে বাসা, ছাটতে জগৎ সহজ স্রুখে ;

ধনেব হাটে কিন্বে ওদের ? দেখ না হয় বুকটা ঠুকে !

সময় কিন্তু যাচ্ছে চলে পাখার ভরে,

নুতন হাওয়া দিচ্ছে টহল জগৎ 'পরে !

ওবাই সবে তোমা'ব আমা'ব অন্ন জোগায়, বজ্র বোনে,

পাহাড় কেটে রাজ্য বানায়, ভগব বসায় বিজ্ঞ বনে,

তিস্তে ওরা মিষ্ট কবে ;—কিন্বে ওদেব কোন্ সে ধনে ?

দলে দলে ডাসছে ওবা গর্ব ভরে

টহল দিতে মুক্ত হাওয়ার পথেব 'পরে !

ওই শোনো—ওই ! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে,
ওই দেখ—ওই স্বর্ঘ্য হাসে মেঘের ফাঁকে !
ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে,—চমক লাগে !
জগৎ-জন-সত্ত্ব হেব গর্জ ভরে
টহল দিতে বেরিয়েছে আজ ভুবন 'পরে !

মুখটি বুজে আসছে খেটে হাঙ্গাম হাকার বছর ধরে,
ভবসা কড়ু পায় নি তব,—আসছে খেটে মর্মে মরে ;
ঝড়ে এবার বোল ছুটেছে—বার্তা আসে হাওয়ার চড়ে ।
ঝড়ের বুলি আসছে বোড়ো হাওয়ার ভরে,
টহল দিগে ফিরিয়ে কেবল ভুবন 'পরে !

গুন্ড ? গুণো পুঁজির মালিক ! ভয়ের কথা গুন্ড নাকি ?
বলছে ওরা "জ্যাস্তে ম'রে খাটব না আর পরের লাগি",
বলছে ওরা "মাজুঘ মোরা, সুখেব দাবী মোরাও রাখি ।"
কৃষাণ, কুলি, মজুর, সুটে গর্জ ভরে
টহল দিগে ফিরিয়ে কেবল পথের 'পরে !

ওই শোনো !—ওই ! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে !
ওই দেখ—ওই স্বর্ঘ্য হাসে মেঘের ফাঁকে !
ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে,—চমক লাগে !
জগৎ-জন-সত্ত্ব আজি গর্জ ভরে
টহল দিগে ফিরিয়ে সারা ভুবন 'পরে !

মুজ দেবে ?—তা হ'লে তো সমিধ মম ভস্ম হ'বে,
শান্তি ?—ভবে ভের রেখনা, কঠ মিলাগু কঠববে ;
আশার সঙ্গে ইচ্ছা মিলুক,—নবীন জীবন জাগছে ভবে !
নূতন বাণী ছুটেছে বেন হাওয়ার ভরে !
আশাদেবী আবিস্কৃত বিখ 'পরে !

টহল দিগে চলছি মোবা বিশ্বলোকের কর্ম্ম মত,
অব্যাহতির হর্ব-পীতি গুন্ড না কি অব্যাহত ?
ধ্বজায় মোদের আশাব বাণী—কর্ম্মজনের মনেব মত !
জগৎ-জন-সত্ত্ব আজি গর্জ ভরে
বেরিয়ে প'ল টহল দিতে ভুবন 'পরে !

ওই শোনো—ওই ! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে,
ওই দেখ গো স্বর্ঘ্য আবার মেঘের ফাঁকে !
আশার সঙ্গে শক্তি জাগে—চমক লাগে !

বিষভূমিব কর্ম্মার কুচ্-কাওয়ার ক'বে
গর্জ ভবে দিচ্ছে টহল ভুবন 'পরে !

ঐসত্যোক্তনাথ দহ ।

আলোচনা

পরভূত ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশীতে শ্রীযুক্ত জগদ্বর দেব মহাশয় লিখিত "কোকিল দ্বার মাস আমাদের দেশে থাকে না, ইহা সকলকেই বাক্য করিতে হইবে" ইত্যাদি ।

জগদ্বরবাবু বঙ্গের বাহিরে অবস্থিত কোন সাহেবের সেবাদি অগ্রহণ করিয়া থাকিবেন না। নতুবা বঙ্গবাসী আর এখন কোকিলকে ঘৃণা পাবী বলিতে পারেন না। কোকিল বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, এখানে একরূপ চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। চিরবঙ্গবাসী অত্যন্ত পক্ষীর সঙ্গে কোকিল সম্বন্ধে আসন লাভ করিবার দাবী উত্থিত করিতে পারে ।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় "আবার" প্রকাশীতে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার প্রথম প্রবাসীতে পাঠানোর আর তত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি নাই। সম্ভ্রান্তি ভ্রমের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিদ্যাস মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে ভ্রমের বস্তব্য প্রকাশ করার আবশ্যকতা দেখিতেছি। "পরভূত" প্রবন্ধের স্তম্ভ দীর্ঘাঙ্গ হওয়া উচিত, অন্ততঃ হইলে ভাল ।

কালীপ্রসন্নবাবুর "শিরিকিরিটি" দ্বিগুণার পর্যন্ত একুতিন রম্যকল্প মধ্যে বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়" এই কথার উপর জানকীবাবু লিখিয়াছেন, "কিন্তু ইহার দ্বারা বঙ্গের শিরিহীন সবল ক্ষেত্রে সকল সময় কোকিল দৃষ্টপোচর হয়, তাহা অসম্ভব বলিয়া লইবার উপায় নাই। প্রকৃতই কোকিলকুল বঙ্গের অনেক গুলি হইতেই বসন্ত আস্তে বিদায় গ্রহণ করে। এটি প্রত্যক্ষ সত্য। দ্বিগুণা হইত বার মাসই কোকিলের বসবাসের উপভুক্ত; সমগ্র বঙ্গভূমি তাই বলিয়া উহাদের পক্ষে সেইরূপ উপভুক্ত তাহা অসম্ভব করা চলে না।"

জানিা জানকীবাবু কোথা হইতে এই "প্রত্যক্ষ সত্য" পাইয়াছেন। পক্ষীজাতির বৃত্তাঙ্গ অবগত হইবার জন্য কোতুল ব-তঃ বিগত সাত বৎসরের অধিক কাল হানে হানে ঘুরিয়া, নিজের পর্যবেক্ষণে যে ব্যাভ্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা "প্রতিভা" পত্র* প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্বে "ভোবিধী"তে কোকিলের সম্বন্ধেও শিশুপাঠ্য কিছু লিখিয়াছিলাম। "পাখী" নামে অন্তান্ত পাখীর ইতিহাস সম্বন্ধে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইবে। আরি কোনও ইংরেজী পুস্তকের ব্যাভ্য গ্রহণ করি নাই; শুধু নিজ পর্যবেক্ষণের ফলে বাহা লিখিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি। সমস্তাবহার আমার সাক্ষ্যের উপর জানকীবাবুর "প্রত্যক্ষ সত্য" বিখ্যা না হউক, অন্ততঃ বিপরীত ভাবের দুইটি সত্য বঙ্গদেশে স্থানলাভ করিবে ।

সংখ্যার হিসাবে বার মাস এদেশে সমান পরিমাণে কোকিল দৃষ্ট হয় না। মাঘ মাসের শেষার্ধের স্বর্ঘ্যকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে ও প্রাতে কোকিলের কুহরব একএক বার বনভূমিকে সুধরিত করির শোলে। ফাল্গুন, চেত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই চারি মাস যথাতথ্যা কোকিলের কঠোরনিশানা যায়। বর্ষার প্রথম দ্বাদশপাতের সময় কোকিল, গণিা,

* "সারক পাখী"—প্রতিভা ।

বোলে প্রভৃতি গায়ক পাখীর শব্দ কদাচিত্ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। বর্ণ-
শেষে বধন স্বর্গাকরণ শ্রমসাধ্য। প্রকৃতির সিক্ত বহু হুইয়া দেয় তখন
কোকিল পাখির মনোহর সঙ্গীত আবার শুনা যায়। শরৎকালেও
কোকিল ডাকে। শরৎের শেষ হইতেই কোকিলের সংখ্যা বেশ অনেক
কমিয়া আসে এবং হেমন্ত ও শীত ঋতু কোকিল আর নীরবেই অস্তি-
বাহিত করে। তখন যে দিন আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার থাকে, সেদিন
কখন কখন কোকিলের ডাক শুনা যায়। শীতের একোপে সমস্ত
প্রাণীই অল্পশব্দ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ পক্ষী ও পুষ্প। কোকিল একটু
বেশী মাত্রায় সৌধীন এবং একটু ছুর্লল; কখনই শীতে বেশী অল্পশব্দ
হইয়া থাকে। তখনও কোকিলকে আমাদের দেশে দেখা যায়, তাহার
গানও শোনা যায়। এমন কি তখন এদেশে কোকিল না থাকিলে
কাকের বাসায় তাহার পক্ষে ডিম পাড়িবার ব্যবস্থাই বাদ দিতে হয়।
প্রবাদ আছে, “কাক সকলের আগে বাসাঘ কুটা নের” অর্থাৎ খড়কুটা
ঘারা কাক আগেই বাসা প্রস্তুত করে এবং তাহাতে ডিম পাড়ে।
অগ্রহাষণ মাসের শেষভাগে কাক বাসা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে
এবং মাঘ মাসের শেষ ভাগে কখন কখন কাকের মাসের মাকামাখি ডিম
পাড়ে। মাঘ মাসের শেষভাগে মাকী কোকিলগুলি আসলদিগায়
পুকোকিলের ডাক শুনিয়া, তাহাদের কাছে যায় এবং ‘কু-উ’ ও অন্ত
একরূপ শব্দ করে। অন্য সময় মাকী কোকিল আর দৃষ্ট হয় না;
অথবা আমরা তত মনোযোগ করিয়া তাহার সন্ধানও করি না। কারণ
মাকী কোকিলের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে আকৃতিগত পার্থক্য অনেক রহিয়াছে।
মাকী কোকিলকে কোকিল বলিয়া চিনিতে পারাই কঠিন। ‘বো-কথা-
ক’ এবং পাখিবার সমিশ্রণে গঠিত একটা নূতন পাখী বলিয়া বোধ হয়।
মাকী কোকিল কদাচিত্ বনাস্তবাল হইতে বাহিরে আসে।

জানকীবাবু “এদেশে বন্য টিয়ার নাম গন্ধও নাই” বলিয়াছেন,
ইহাতে আমাদের মত হত অনেকেই বিস্মিত হইবেন। বন্য আর্থে
জানকীবাবু কি বুঝিয়াছেন জানি না, কিন্তু স্বাধীন স্বচ্ছন্দে ভ্রমণকারী
টিয়ার এদেশে অভাব নাই। শহরে, মক্খলে উচ্চ মঠের গাত্রস্থিত,
কাক, দালানের কার্পাস আলো প্রবেশের জন্য রক্ষিত স্তূপ খোঁজে,
উচ্চ বৃক্ষশিখরের গর্ভে (কার্টোকার পক্ষী এই গর্ভ বা ‘খোঁড়ল’ নির্মাণ
করে) আমরা টিা পাখীর স্থায়ী বাসস্থান ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া
আসিতেছি। এবং এইসকল টিা প্রতিপালন করিয়া রাখাক্ষক বুলি
শুনিবার আকাঙ্ক্ষা মিটান যায়। মবনা, চন্দনা প্রভৃতি আমাদের দেশে
বাসা করে না, এমন কি ব্রহ্মও বেড়াইতে আসে না।

জানকীবাবু বলিয়াছেন “স্বধীগণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দাবা যির
করিবাহেন যে গণনাঘারা বস্তুর সমষ্টি নির্ণয় করিবার শক্তি নিরন্তর
ইতর প্রাণীর নাই।” পরক্ষণেই বলিয়াছেন “কোকিল কাকের বাসায় ডিম
পাড়িবার কালে, নিজের যতটা ডিম পাড়ে, কাকের ততটা ডিম ভাঙ্গিয়া
ফেলে,” স্ততরাং কাক ও কোকিল হইতর প্রাণী নহে; নতুবা স্বধীগণের
সিদ্ধান্ত ভুল হইয়াছে। জানকীবাবু প্রমাণ করিতেছেন, উভয়েই
গণনাঘ স্নাক। হাঁস মোগণ প্রভৃতি পক্ষী ব্যতীত অনেক পক্ষীই তিনটা
হইতে পাঁচটা ডিম প্রসব করে। কাক প্রায়ই দুই তিনটা ডিম প্রসব
করিয়া থাকে; কোকিলও তিন চারটা মাত্র ডিম প্রসব করে। এই
অবস্থায় ত কাকের বেশ লোপ হওয়ার বোঝা দেখা যায়। কাক
ঘোড়ার সবগুলি ডিম কেলিয়া দিলে কাকেরও বেশ মাপ, অবশেষে
কোকিলেরও ধাতী লোপ। আমরা জানকীবাবুর এইমত সমর্থন
করিতে পারি না। তাহার লিখিত ‘স্বধীগণের’ পরীক্ষার ফলই
বাস্তবিক সত্য। কাক ৩+৩=৬টা ডিম বা বাহা তাহার অষ্টম থাকে
ততগুলি ডিমেই তা দেয় এবং ততগুলি শ্রাবকেরই আহার বোগাণ।

কিয়ার বাসায় ‘বো-কথা-ক’ ডিম পাড়ে (কিলা ও বো-কথা-ক

এবং—প্রতিভা)। আমরা পাখিয়ার সম্বন্ধে ঠিক কিছু জানিতে পারি
নাই (পাখিয়ার এবং—প্রতিভা)। জানকীবাবু হাতাবে বা সাতভাই
পাখীর বাসায় পাখিয়ার ছানা দেখিয়াছেন। তাহার নিকট এ তথ্য জ্ঞাত
হইয়া উপকৃত হইয়াছি। আরও ২১টা পাখী পরেও উপর সন্ধান
পালনের ভার দিয়া বড়লোকের মেয়েদের মত স্বর্গ করিয়া দিন কাটায়।
জলজর বাবু এবং প্রতিবাহবোগ্য কথার অভাব নাই। সকল
কথা লিখিতে গেলে এবং অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আমরা
মাত্র তাহার এবং হইতে করেকটা ছান উদ্ধৃত করিয়া এবং
উপসংহার করিব।

১। “কোকিল আমাদের দেশে মার্চ হইতে জুলাই পর্যন্ত
অবস্থান করে।”

ইহা যে ঠিক নহে, উপরে তাহা বলা হইয়াছে।

২। “কাক বর্ষার আরম্ভে জুনমাসের মধ্যভাগে বাসা নির্মাণ
করিতে আরম্ভ করে।”

কখনও নহে। উপরে তাহার উল্লেখ আছে।

৩। “কাকের সহিত কোকিলের.....আকারেও সামান্য পার্থক্য
বলিলে চলে।”

মোটাই চলে না। বর্ষগত সাদৃশ্য আছে। আকারগত সাদৃশ্য
মোটাই নাই।

৪। “কোকিল ... কিছুকাল এদেশে অবস্থানের পর ডিম
পাড়িয়া চলিয়া যায়।”

এ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

জলজর বাবুর এবং সর্বত্রই পর্য্যালোচনার অভাব দৃষ্ট হয়।

ঐপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

গত ভাষ্যের “প্রবাসীতে” প্রবৃত্ত জানকীবাবুর বিশ্বাস মহাশয় পরিত্র
সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাহার এবং এবং একস্থানে
লিখিয়াছেন, “গিরিকিরাটিনী ত্রিপুরার পর্বত প্রকৃতির রম্যভূমধ্যে
বারমাস কোকিল দেখিতে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু ইহার ধারা বঙ্গের
গিরিহীন সমতল ক্ষেত্রে সকল সময় কোকিল দৃষ্টপোচ হয়, তাহা
অসম্ভব করিয়া লইবার উপায় নাই।” কিন্তু আমি বলি, কেবল যে
গিরিশ্রোভিত ত্রিপুরার রম্য পর্বতমালায় বারমাস কোকিল দেখিতে
পাইব এমন নয়, প্রকৃতির লীলাকানন বঙ্গের অনেক স্থানেই বারমাস
কোকিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য সময় তাহার কুহতান
গ্রীষ্ম ও বসন্তের ন্যায় তত ভালরূপে কুটরা উঠে না বটে কিন্তু তাহার
তাল লর একবারে বিলুপ্ত হয় না। মধ্যে মধ্যে কোকিলকে এক
একবার দমক ডাকিয়া উঠিতে শোনা যায় মাত্র।

কাক যে সর্বদাই কোকিলশাবককে বহু করিয়া পালন করে এমন
নয়। কোকিলশাবক বড় হইলে, কাক বধন তাহাকে চিনিতে পারে,
তখন তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। কাক অবিরত চুপ ও
নখের আঘাতে কোকিলশাবককে মৃতপ্রায় করিয়া বৃক্ষতলে কেলিয়া
যেয়। সময় সময় তাহাকে একবারে মারিয়াও ফেলে। কাকের ন্যায়
ভীমরাজ, কিলে, কোকিলের প্রধান শত্রু। তাহার তাহাকে দেখিতে
পাইলে তাহার পক্ষাঘ্রসরণ করিবেই করিবে। তখন কোকিলের বৃক্ষ-
বোপ ভিন্ন আশ্রয়কার আর দ্বিতীয় উপায় থাকে না। কোকিল বাসা
প্রস্তুত করিতে জানে না, ইহারা বৃক্ষবোপে রাতিবাসন করে।

ত্রিপুরা।

ঐবিলাসলোহন চক্রবর্তী।

ক্ষয়িত্য—এ সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা
গৃহীত বা প্রকাশিত হইবে না।—সম্পাদক।

চিত্রপরিচয়

আমাদের এই জাতিভেদ-পীড়িত ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে আমরা যে অধর্মের প্রতিও করুণা ও সাম্য ভাব দেখিতে পাই তাহার মাহাত্ম্য চিন্তা করিলে মন তাঁহার প্রতি ভক্তিতে সন্নত হইয়া আসে। তিনি পতিতা অহল্যাকে, গৃহক চণ্ডালকে, সামান্য শবরীকে, বনের বানরকে, আততায়ী রাক্ষসকে দ্বুণা করেন নাই—সকলকেই তিনি সমাদরের সহিত সখ্যভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মহত্বের প্রধান উপাদান।

এইবারকার মুখপত্ররূপে মুদ্রিত চিত্রখানিতে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে শবরী বা ব্যাধরমণী রামচন্দ্রকে ক্লান্ত ক্ষুধিত দেখিয়া নিজের আহৃত বদরী ফল দিতেছে, এবং শ্রীরামচন্দ্র সেই সামান্য দানও সবহুমানে গ্রহণ করিতেছেন, এই দৃশ্যটি অঙ্কিত হইয়াছে।

এই চিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের উদার মহত্ব এবং ব্যাধরমণীর সিন্ধু বাৎসল্যভর ভাব চমৎকার নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। আর সুন্দর হইয়াছে ইহার বর্ণসম্পাত। বনের জটিল গহনতার মধ্যেও ব্যাধরমণীর হৃদয়ও যে দয়াপ্রেম-বাৎসল্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—মানবহৃদয়ের এই মহৎ-তত্ত্বটি এই চিত্রে বিশেষ ভাবে সূচিত দেখা যায়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

লর্ড কার্জন, সার বাম্‌ফোল্ড ফুলার, প্রভৃতির কড়া শাসনে একটি এই সুফল ফলিয়াছিল, যে, লোকে উন্নতির জন্য আত্মশক্তির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। লর্ড কারমাইকেল বেশ ত্রায়বান্ ও সহৃদয় লোক। তাহাতে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আমরা বড় অলস-প্রকৃতির লোক। তাই ভয় হয়, পাছে আমরা ভাবিয়া বসি, যে, শাসনকর্ত্তা যখন এমন ভাল লোক, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে শাসক সহায় হইতে পারেন বটে, কিন্তু কোন জাতি বা দেশকে বড় করিতে পারেন না, যদি সেই



আর্থার এল্যান হিউম।

জাতিতে বস্তু না থাকে এবং যদি সে জাতি আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করে। মহামতি হিউম “Awake,” “উদ্বোধন,”—শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন; তাহার ধূয়া, “Nations by themselves are made,” “নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ।” তিনি ঐ কবিতায় ভারতবাসীদিগকে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

উদ্বোধন।

(A. O. Hume.)

কেন তুমি উদাসীন ভারতসন্তান,

এখনো কি আছে হায় দৈবের প্রত্যাশ?

দাঁড়াও দাঁড়াও উঠি বাধো মনপ্রাণ,

নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ!

কি করিবে ধন মান উজ্জ মহাজনী
কি করিবে অর্থহীন উপাধির রাশ,
শাসন স্বায়ত্ত্ব যার তারে শ্রেয় গণি;
নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ।

অন্ধকায়ে গুপ্ত কীট করে কানাকানি
তারে দিয়ে পূরিবে না কোনো অভিশাপ,
সে কভু নাটুবে দিতে কাম্য ফল আনি;
নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ।

কর্ম্মী হও কায়মনে ভারতসন্তান,
নাহি ত্রাস, বাধা পেলে হয়ো না নিরাশ,
পূর্বাশে হের ওই আলোর নিশান;
নিজ তেজে চিরদিন জাতির বিকাশ।

কাশ্মীরের মহারাজ, দরবারে আর বাইনাচ হইবে না, এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ইহা শুল্কগণ। রাজশাহীতে লর্ড কাবমাইকেলের অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে আমোদ উৎসব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বাইনাচও ছিল, ইহা একটি লজ্জাকর সংবাদ। সংপ্রতি কলিকাতা টাউনহলে একটি স্মৃতিসভা উপলক্ষে কোন কোন মাছুগণ্য ব্যক্তি কলিকাতার কোন কোন থিয়েটারের প্রশংসা করিয়াছিলেন, কাগজে এইরূপ দেখা গেল। ইহা সত্য হইলে গভীর পরিতাপের বিষয়।

পুজার-ছুটি সম্মুখে। হাইকোর্টের ছুটি ত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সময় কেহ স্বাস্থ্যভাভের জন্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবেন, কেহ দেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন, কেহ বা পৈত্রিক ভিটায় বংশরাস্ত্রে পদক্ষেপ করিবেন। বাহারা দেশভ্রমণ করেন, তাঁহারা যদি নানাস্থান ও নানাদৃশ্য অট্টালিকা আদি দেখিয়া কেবল ক্ষণিক তৃপ্তিভাভের চেষ্টাই করেন, তাহা হইলে তদ্বারা তাঁহাদের নিজেরও বথোচিত উপকার হয় না, দেশেরও লাভ হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস না জানিলে ভারতবর্ষকে জানা হয় না, ভারতবর্ষকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা যায় না। কিন্তু দেশভ্রমণ ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসও ভাল করিয়া জানা যায় না। রাজাদের

জন্ম, সিংহাসনলাভ, যুদ্ধে জয় পরাজয়, মৃত্যু, প্রভৃতির তারিখ, কেবল এইরূপ বৃত্তান্তকে ইতিহাস বলে না। সর্ববিষয়ে দেশবাসীর সভ্যতার বিকাশ, উন্নতি অবনতি প্রভৃতির ইতিহাস জানা একান্ত আবশ্যিক। ঐতিহাসিক যে-কোন ঘটনা বা পরিবর্তনই আমাদের জ্ঞাতব্য হউক না কেন, যে স্থানে বা দেশে তাহা ঘটিয়াছিল, তাহা না দেখিলে তদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মে না। আর শুধু জ্ঞান লাভ করিলেই ত হয় না। প্রাণে নূতন প্রেরণা, নবশক্তি লাভ করিতে হইবে। চিতোরের ইতিহাস মানুষকে উন্নত করে, কিন্তু মানুষ যেদিন চিতোরের মাটি স্পর্শ করে, সেদিন তাহার নবজীবন, নীক্ষা হয়। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পড়িলে ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব যে যে স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন, ভক্তিতে তথায় ধ্যানস্থ হইবে। বিশ্বের মহৎ-জীবনের সহিত মানুষ যোগস্থাপন করিয়া নিজ ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা পরিহার করিতে সমর্থ হয়।

দেশভ্রমণ বলিতে কেবল ভারতবর্ষ ভ্রমণ বুঝিলে চলিবে না। মানবের সর্ববিধ শক্তির বিকাশ ভারতবর্ষেই হইয়াছে এমন নয়। মানবের মহত্ত্ব, মানবের আত্মোৎসর্গ নানা দেশে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের অনেক ধনী অবসর কাল আমোদে কাটাইবার জন্ত বিদেশে যান। কিন্তু তাহা একটা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য। যাওয়া উচিত নিজ নিজ অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে উদ্ভূত করিবার জন্ত। বড় জাতির শক্তিকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় হইলে তবে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহারা কিসে বড় এবং কেন বড়, আমরা কিসে ছোট এবং কেন ছোট।

কাজের বৈচিত্র্যেই কর্ম্মী মানুষ বিশ্রামস্থল লাভ করেন। মফঃস্বলে পিতৃভূমিতে গিয়া আমরা নিদ্রা বা বাসনে কাল-যাপন করিলে, সময়ের সদ্ব্যবহার তো হয়ই না, নির্মলতম সুখ হইতেও আমরা বঞ্চিত হই। গ্রামবাসীদের সহিত সমসংস্পর্শভাগী না হইলে গ্রামগুলির উন্নতির প্রতি কখনও আমরা মনোযোগী হইব না। এবং গ্রামগুলির উন্নতি না হইলে, বঙ্গের উন্নতি হইবে না; কারণ গ্রাম লইয়াই বাঙ্গলা দেশ, শহর আর ক'টি আছে?

কেহ যদি ধর্মপ্রচাৰ করিতে চান, মানুষের জীবনকে ধর্মনিরম্বেব অমুগত করিতে চান, তাহা হইলেও তাঁহাকে জাতীয় চৰিত্ৰেব গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়। মুক্তিফৌজের “সৈন্যপতি” বৃথ নাহেব ইংরাজচৰিত্ৰ বেশ ভাল করিয়া বুঝিতেন। সেইজন্য তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত ঋষ্টধর্ম-প্রচারক সম্প্রদায়কে সৈন্যবলের অল্পরূপ করিয়া গড়িয়াছিলেন এবং উহাব নিয়মাদিও তদনুসারে কবিয়াছিলেন। কশ্মিঠ ও উত্তেজনাপ্রিয় জাতিরা একটা কিছু কবিতো চায়, একটা কোন শত্রু য বাধাব বিকল্পে সংগ্রাম করিতে চায়। কেবল ধ্যানধাবণার জীবন তাহাদের ভাল লাগে না। তাই তিনি দাবিত্রা, বাতলামি, দুর্নীতি এবং জাতিক-জীবনের বিকল্পে যুদ্ধবোধন কবেন। পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীতপ্রধান দেশে, মানুষ অন্নাতাবে বা অনাহারে ক্লিষ্ট হইলে অসাড়বৎ হইয়া যায়। তখন ধর্মের কথা কে শুনে? তাই তিনি দরিদ্র উপবাসী লোকদিগকে ধর্মের কথা শুনাইবার পূর্বে তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তিব বন্দোবস্ত কবিয়াছিলেন। দলগঠননৈপুণ্যে এবং অশৃঙ্খলাব সহিত কার্য-সাধনদক্ষতায় তাঁহাব সমকক্ষ তাঁহান্ন জীবিতকালে কেহ অনুগ্রহণ করে নাই। ভারতবর্ষেও তাঁহাব অমুচরেরা কোন কোন বাধাবব চৌর্যাব্যবসায়ী জাতিকে সংপথে আনিবাব চেষ্টা কবিতোছেন, এবং তাহাদের সংপথে থাকিয়া জীবনযাপনের উপায় করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা উন্নতপ্রণালীর হাতের উত্ত প্রবর্তিত করিবারও চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদের দেশী লোকে কেহ মুক্তিফৌজের অল্পরূপ একটা কিছু দল গড়িবার চেষ্টা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ টিক্‌টিকি লাগিবে এবং হয়ত বা ছ একটা মোকদ্দমাও তাহার বিকল্পে খাড়া করিবে।

আমরা ছেলে বেলা পড়িয়াছিলাম, “শবীরমাণ্ডঃ খলু ধর্মসাধনম্।” আমাদের দেশে রোগের এত প্রাদুর্ভাব, এবং যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং অজ্ঞাত কারণে আমাদের শরীর এত দুর্বল, যে শরীরের উন্নতির দিকে মন দেওয়া সকলেরই কর্তব্য। তবে, ছুঃখের বিষয় এই যে বাহাবা শরীরের উন্নতির দিকে মন দেয়, তাহারা

“ধর্মসাধনব” জন্ত অর্থাৎ মনুষ্যোচিত জীবন যাপনের জন্ত দেহে বল সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। বাহা হউক, দেহটা বলিষ্ঠ হইলে, মানুষকে সংকাজে লাগাইতে পারিলে তাহার নিকট যতটা কাজ পাওয়া যায়, দুর্বল লোকের কাছে ততটা পাওয়া যায় না। সুতরাং দৈহিক বস্ত্রের দিকে বোঁক থাকা ভাল। কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসের ওলিম্পিক ক্রীড়া পুনঃপ্রবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন ওলিম্পিক ক্রীড়ায় দৌড়, লাফ দেওয়া প্রভৃতিব প্রতিযোগিতায় বাহারা শ্রেষ্ঠ হইত তাহারা অলিম্পিক-বিরচিত জয়যুক্তো ভূষিত হইত। আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বৎসরে সুইডেনের বাজধানী ষ্টকহল্ম নগরে ঐ ক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। উহাতে মার্কিনেরা সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক খেলায় জিতিয়াছে। ইংল্যান্ডে আরও কয়েকটি জাতির নিয়ে স্থান পাইয়াছে। ছুঃখের বিষয় যে ভারতবাসী কেহ কোন প্রকার প্রত্ন-যোগিতায় জয়লাভ করা দূরে থাকে, কেহ উহাতে প্রবৃত্তও হয় নাই। আগামী ওলিম্পিক ক্রীড়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন সহরে হইবে। কোন কোন ইংরাজ মনে করেন যে বাঙ্গালীবা ফুটবল খেলায় বেরূপ দ্রুত দৌড়িতে পার, তাহাদের পা বেরূপ লম্বা ও শরীর বেরূপ লম্বা, তাহাতে তাহারা এখন হইতে চেষ্টা কবিলে বার্লিনে অন্ততঃ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে।

আমাদের দেশে অনেক ছেলে পড়াশুনার অবদেয়া করিয়া ফুটবল, ক্রিকেটে মতিয়া থাকে; ইহা ভাল নয়। কিন্তু অনেককে যে এইসকল ক্রীড়া করে, তাহা ভাল। তবে, এই যে হাজার হাজার লোক নিজের কাজ ফেলিয়া রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ফুটবল খেলা দেখিতে থাকে ও হৈ হৈ রৈ রৈ কবে, তাহাতে কাহাব মদল হয়? দর্শকদের শরীরের বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় কি? না, তাহাদের ঐহিক পারত্রিক কোন সুবিধা হয়? এটা জল্পক মাত্র। আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি।

গত শনিবার ২৮শে ভাদ্র কলিকাতায় পাস্তির মাঠে দ্বিতীয় বর্দেশী মেলা খোলা হইয়াছে। ইহা অতি বৃহৎ

অমুঠান। এবার ইহা কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে ও ট্রামের স্রাভার ধারে হওয়ায় দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হইবার সম্ভাবনা।

স্বদেশী মেলা শুধু কলিকাতায় নয়, প্রত্যেক জেলায় হওয়া উচিত।

“গৌড়রাজমালা” নামক পুস্তকের পবিচয় প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই ববেস্ত্র অমুসন্ধানসমিতির উল্লেখ করিয়াছি। লর্ড কারমাইকেল যখন রাজসাহী যান, তখন এই অমুসন্ধান-সমিতি তাঁহাদের সংগৃহীত প্রাচীন মূর্তি আদি পুরাঙ্গব্য-সংগ্রহ লাটসাহেবকে দেখান। তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। বাস্তবিক সন্দেহ হইবারই কথা। কলিকাতা মিউজিয়মে যেসকল প্রাচীন মূর্তি, স্তম্ভ ও শিলালিপি আদি পুরাঙ্গব্য আছে, তৎসমুদয় সাফাং বা পরোক্ষ ভাবে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতির কার্য ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিতেছে যে ইতিহাসের এবিধ উপাদান সংগ্রহে এবং সংগৃহীত উপাদান সকলের সাহায্যে ইতিহাস-রচনা-কার্যে বেসরকারী চেষ্টারও যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। দুই দিক্‌জয়ী বীর যেমন বলিয়া ছিলেন, আমাদের উভয়েরই জন্ত পৃথিবী যথেষ্ট বিশাল, তেমনি আমরাও বলি, যে, সরকারী, বেসরকারী, উভয় প্রত্নতাত্ত্বিক দলেবই জন্ত ভারতবর্ষে একান্ত ন্যূনকণ্ঠে একশত বৎসরের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে মজুত বহিয়াছে। অতএব যদি সরকারী ও বেসরকারী প্রত্নতত্ত্ব কবিত্তে চান ত বন্ধুভাবেই করিতে পারেন। অবস্থানভাবে প্রত্নতত্ত্ব, প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদের প্রপৌত্রেরা কবিত্তে পারিবেন।

প্রাচীন বাবিলোনিয়া, আসীবিয়া, মিশর, গ্রীস, ইটালী, ক্রীট প্রভৃতির পুরাতত্ত্ব উদ্ধাবের জন্ত অনেক বৎসর পূর্বে হইতে যাহা চেষ্টা কবিত্তেছেন, তাহা বা অধিকাংশই তত্ত্বদেশের সরকারী কর্মচারী নহেন; নানা জাতির নানা বেসরকারী লোকে নানাভাবে এই অমুসন্ধান কার্যে ব্যাপ্ত আছে। আমাদের দেশেও

যত দিন পর্যন্ত বেসরকারী লোকে বা একপ কার্য করিতে অগ্রসর হন নাই, ততদিন সরকার বাহাদুরের হাতে সম্পূর্ণরূপে এই কাজের ভার থাকার একটা সার্থকতা এবং প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন এরূপ একচেটিয়া ভাব থাকার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা সমর্থনও করা যায় না। বরং এই বলা যায়, যে, ক্রমে ক্রমে দূর ভবিষ্যতে এই কাজটা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী লোকে হাতে আসাই সঙ্গত। তবে, এই আইন অবস্থাই করা উচিত যে ভারতবর্ষের কোন পুরাঙ্গব্য ভারতবর্ষের বাহিবে কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না। সেরূপ চেষ্টা করিলে গবর্নমেন্ট সেই দ্রব্য তাহাব নিকট হইতে লইয়া ভারতবর্ষেই রাখিবেন। কারণ, এপর্যন্ত ভাবতের অনেক অমূল্য ঐতিহাসিক দ্রব্য ইউরোপের নানা মিউজিয়মে চালান দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সাফাংভাবে জানা আমাদের পক্ষে হুঃসাধ্য হইয়াছে। এখন অনেক বিষয়েই আমাদের পক্ষে ঝাল খাইতে হইতেছে, এবং একদেশদর্শী ইতিহাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ কবিত্তে হইতেছে।

কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে স্তম্ভ কার্যের অমুঠান করিয়াছেন, আশা করি তাহাতে তাঁহারা ভগবৎকৃপায় সিদ্ধিলাভ করিবেন।

গবর্নমেন্টের বিকল্পে যত্নবস্ত্র কবা, ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েষ্টন সাহেবকে মাঝি ফেল্ডার চক্রান্ত কবা, বোমা নির্মাণ করা, ইত্যাদি অপরাধে মেদিনীপুরের সমুদয় গণ্যমান্ত বলশালী লোককে দণ্ডিত করিবার একটি আয়োজন হয়। শেষে কমিতে কমিতে অভিযুক্তের সংখ্যা তিনটিতে গিয়া ঠেকে। এই তিন জনও হাইকোর্টে বিচারে নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করে। মহামান্য প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় বিচারপতি আন্তোষ মুখোপাধ্যায় রায়ে একপ মন্তব্য প্রকাশ কবেন যে পুলিশের আবিষ্কৃত বোমাটা পুলিশেরই তৈরী, এরূপ সন্দেহটা একেবারে অমূলক না হইতেও পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হাইকোর্টের মতে প্রজাপক্ষের কেহ কোন অপরাধ করে নাই। আবার সেদিন মাননীয় বিচারপতি উদ্ভূত প্রমুখ জজের রায়

দিয়াছেন যে ওয়েষ্টন, মজ্জরব হক্ এবং লালমোহন গুহ, এই তিন জন বাঙ্গালীরাই নিরপরাধ। সুতরাং, সরকারী বেসবকারী উভয় সক্ষই যখন নির্দোষ, তখন বলিতে হয় মেদিনীপুরের ব্যাণাঘাট একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র;—

“নিশার জপনসম তোর এ বাবতা, বে দূত।”

মেদিনীপুরের পৌর ৬ জনপদবর্গ, তোমাদের শত লালনা ও নির্যাতন অলৌকিক হুম্মাত্র।

হিন্দুসমাজ জাতিবিশ্লেষ নানা স্তরে বিভক্ত। কতকগুলি জাতিকে উচ্চ স্তরে এবং কতকগুলিকে নিম্ন স্তরের লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিছুদিন হইতে “নিম্ন” স্তরের অনেক জাতি নিজ নিজ উন্নতি চেষ্টা করিতেছেন। যে যে উপায়ে উন্নতির চেষ্টা হইতেছে তাহা প্রত্যেক স্থলেই যে যে উচিত তাহা বলি না গেলেও, এই উন্নতি-প্রয়াস যে আশা প্রদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক জাতি উন্নতির ঠিক পথ ধরিয়াছেন। যেমন, নাপিত সমাজের মুখপত্র “সম্মিলন” বলিতেছেন যে, ঐ সমাজের হীন অবস্থার প্রধান কারণ শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব। তাহাদের অমুঠের কার্যের একটি তালিকাও এই কাগজে বাহির হইয়াছে। যথা:—

- (১) কলিকাতার সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া মূল সভা গঠন। এই সভার অধীনে স্থানে স্থানে শাখা সভা স্থাপন। এই সকল সভায় যোগ্য লোক পাঠাইয়া স্বজাতি-গণকে সম্ববদ্ধ করা ও তাহাদের কর্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া।
- (২) স্বজাতিব মধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তার।
- একস্র—(ক) তৃত্যেকে বাহাতে নিজ নিজ সম্ভান-দিগকে লেখাপনা শিক্ষা দেয়, তাহার ব্যবস্থা করা।
- (খ) নৈশবিজ্ঞান স্থাপন। (গ) প্রতিভূ গ্রহণ করিয়া যোগ্য বিজ্ঞানীকে বিদেশে প্রেরণ। (ঘ) উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্রের পাঠে সাহায্য করা। (ঙ) বালকগণ শিক্ষার সহিত বাহাতে প্রথম হইতে বিনয়াদি-গুণসম্পন্ন ও ধর্ম-পবায়ণ হয়, তাহা চেষ্টা। (৩) বাহাতে বিভিন্নশ্রেণীব মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া জাতীয় বলবৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা-করা। (৪) জাতীয় ইতিহাস সম্বলন। যিনি সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, ইংবাজীতে সুপণ্ডিত, সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং বয়সে প্রবীণ, তিনিই এই কার্য করিবার

যোগ্য। এরূপ লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলে অন্য উপযুক্ত লোকে দ্বারা লিপ্যন্তে হইবে। (৫) বাহা বা যীর গুণ ও কার্যসমূহ দ্বারা সমাজের মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণকে উৎসাহিত করা হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে যে কয়জনের জীবনী সংগ্রহ করিতেছি, তাহাদের নাম—(ক) ৬ জশানচন্দ্র দাস (খ) ৬ রেভাবেণ্ড নন্দলাল দাস (গ) ৬ গোরচাঁদ দাস। (ঙ) যত্নসম্বৎ পণগ্রহণ-প্রথা রহিত করা। (৭) অসহায় বিধবা স্ত্রীলোক ও অসমর্থ বৃদ্ধদেব সম্ভবমত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। (৮) কলিকাতায় ‘সম্মিলনের’ কার্যালয় নির্মাণ। এই স্থানে আমাদের জাতীয় অভাবাদি আলোচনা, প্রকৌ-কাবের উপায়, নৈশ-বিজ্ঞান স্থাপন প্রভৃতি হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

ধূপছায়া—

শ্রীচরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কাস্টিক প্রেসে ছাপা। ডবল ক্রাউন, বোডপাশিত ১৬০ পৃষ্ঠা; মূল্য দশ আনা, ছাপা কাগজ উত্তম; প্রচ্ছদপট রঙীন ও হচার শিল্পরচিত।

এই সংগ্রহে লেখকের দ্বয়টি মৌলিক এবং আটটি বিদ্যেগঞ্জের অমুসরণে লিখিত গল্প আছে। “চীনদেশে” ও “অপরাজিতা” দুইটি ‘বোম্বাই’ গল্প,—একটির ভিত্তি চীনদেশে, অপরটি কান্টন-কেন্দ্র এবং অবস্থা-প্রাথমিক স্বয়ং গায় মাথিয়া আমাদের নবনে ও মনে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটিতে লেখকের কাচা হাতের পরিচয় আছে, ‘অপরাজিতা’ গল্পটি পাকা হাতের রচনা। সবচেয়ে উপভোগ্য বিষয় হইয়াছে ইহার ভাব। এই ভাবের বাস্তবতানে ‘কুমারী’ গোলাপ-কুমারীর ফাঁকে ফাঁকে বকুলবীথির তলে তলে মণিমালা পথে পথে অরণ্যরাজ্য চরণ ফেলিয়া নাচিয়া বেড়ায়, সেখানে “বপ-দোবনের ঢেউ লাগিয়া ফুলের মুখে হাসি ফুটে, কলহান্তে কোকিল-পাখির কণ্ঠ ধুলে,” “হাজার হাঁপের শিখার মাঝে কোয়ারার জল তরল হাঁপের মালায় মতো গলিয়া পড়ে,” আর “সাম্রাণিবিড়-পল্লবচ্ছন্ন পথের উপর পরীরা সব হাকা হাতে চাঁদের আলোর আলপনা” দেয়; এই ভাবের বাস্তবতানে “বনের ফুলে শোভিত, চাঁদের জ্যোৎস্নায় ও কপের জ্যোৎস্নায় প্রাণিত, পাখীর কলকূজনে ও তরুণীর কলহান্তকৌতুকে মুগ্ধ, ফোয়ারার অজস্র ধারা ও ফলের অজস্র স্বীতিতে অভিভূত, মণিমালা আলোকে ও ভাস্কর চোখে পুগকে উজ্জ্বল।” বসন্ত এই বাস্তব চিরকল্প, নায়ক ইহার প্রবর্ত বোবন; এই বাস্তব “বিজয়িনী” বা, কেহ বা বোবনগর্ভে দৃষ্ট, কেহ বা তাহার ভায়ে আনন্দিতা—এখানে শুধু ফুলের জয়েরই লীলাধারা—কেহ বা জয় করিয়াও এখানে হারিয়া বসে, কেহ বা হাবিবাও সমস্ত জয় করিয়া লয়। সব গল্পটিকে যৌনব নারিতাবোধী প্রেমাম্বলিত বাজা বলিলে অতুষ্টি হয় না। পদ্যের মটটিও হৃদয়। ইন্দ্রি, গুলা এবং আনন্দিতার পরস্পরের মধ্যে কোনো চরিত্রবাহিত্য

প্রাণ সানান্য হইয়াও অসামান্য নরকবুজের প্রতিও যেমন, বিদে-
সস্থি, ঠেঙ ও নিবেদিতার প্রতিও তেমনি প্রগাঢ়। এবং যে
মুগ্ধ হইয়া তিনি বাধা নোয়াইয়াছেন, যেখানে তাহা অপ-
ষ্টা, যেখানে তাহা আচ্ছন্ন করিবার ইচ্ছা, যেখানে তাহার
বিস্থাছেন সেখানেই তাহার স্বাধীন চিত্ত নির্ভীক ভাবে
বা তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিয়াছে।

স্বাধীন নির্ভীক প্রেম এক দিকে যেমন বিবসমানবকে বন্দনা
করে, “পথের পক্ষে” পতিত যুগিদের মধ্যেও মহৎ ও প্রাণেব
ধরিয়াছে, অপর দিকে তেমনি স্বদেশ ও স্বদেশীকে অবলম্বন
—নে প্রেম একই কালে বজ্রাধিপতি কঠোর ও কুহখাদপি মৃদু।
প্রাচীন মহত্ব কবিস্বপ্নের পঙ্কিত উৎফুল্ল, বর্তমানের অবসাদে
মর, ভবিষ্যতের আশার ভরপুর তেজস্বী। “মধু চরেও
বদেগকে উন্নত দেখিবার ব্যগ্র বাসনার “ওই আমাদের আশার
ওই আমাদের ছেলের দল”কে ডাকিয়া কবি বলিতেছেন “বন্দরে
ফরে বাহাঙ্গ, বেরিয়ে পড় বন্দুল।” এখনো ইতস্তত কেন?
“সাগর-পথে বাজা নিবেশ?—লক্ষ্মীছাড়ার মুক্তিও,
লক্ষ্মী আছেন সিদ্ধি মারে—মুক্ত্যভা গুণ্ডি ও।

হিন্দু বধন সিদ্ধিপারে করলে দখল যবদীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদীপ?

তাদের ধারা লুপ্ত হবে? থাকবে শুধু পঞ্জিকা?

ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হল পঞ্জিকা?

পালের হিন্দুরা শুধু আপনাদের সকলতাব নিবর্নই রাখিয়া যান নাই,
তার সিদ্ধির উপায়ের সন্ধানও হিন্দুদের পূর্ব পিতামহগণ যবদীপের
দাতা” গণেশ মুর্জিতে আভাষ দিয়া

“গড়ে গেছে পাথর কেটে মুর্জিখানি জীবন্ত,
শবাসনে সিদ্ধিলাভ—শোকের দহন নিবন্ত।”

রখাবের” বলির সেও—

“গ্রামকাষোজে কনকাস্তোজ হিন্দুর প্রতিভার।”

সমস্ত “নটোদ্ধার” করিতে হইবে, আত্মবিসর্জন করিয়া, “কাটা-
খেলিয়া। তাহা হইলে যে প্রাণেবতা অুকোঁদিয়ে দেখা দিয়া-
হার পূর্ণোদয়ের আশা হইবে, “দেবদর্শন” করিয়া স্বদেশ ও
সহিত কবিও ধন্ত হইবেন।

ই প্রেম বধন গার্হস্থ্য চিত্রে ফুটিয়াছে তখনও ইহা নূতন,
ই ইহা মনোরম। “সাড়ে চুরান্তর” “অস্তঃপুরিকা” প্রভৃতি কবি-
ম্পত্য প্রেম, “নূতন মালু” ও “প্রথম হাসি” কবিতার বাৎসল্য,
“পারান্তে” ও “হিম মুকুল” কবিতার সঙ্গদ্বন্দ্ব শোক যে মুক্তি পারিত্রহ
II দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থ আপনাদি অন্তরের
ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন মুগ্ধ হইবেন নিঃসন্দেহ।

মগ্র কাব্যব্যাপী এই প্রেমমূলক স্বাধীনতার ভাবধারা যে বিচিত্র
এ প্রবাহিত তরঙ্গিত হইয়া গিয়াছে তাহাব এমন একটি বেগ ও
আছে যে পাঠকে বরাবর তাহা সমাপ্তি দিকে বহন করিয়া
চলে, কোথাও তাহাকে ক্রান্তি অশুভব করিবার অবসর দেখ না।
অনুসারী বিচিত্র ছন্দ অনাহত স্বচ্ছন্দ গতিতে “হরের ফুলে
খেলাইয়া “ভুবনে বুলাব মদিব মাথা।” “পাকী ব গানে”
হাজার গতি ও বহনঅনিব ওলে তাল রাখিবা পাকীবাত্রীর
ও ভাববর্নন হৃদয়ের সাহায্যে পারাকাতী লাভ করিয়াছে।
হর” ক্রান্ত অবসর অথচ অসঙ্গীতীততা হুচনার যথোপযুক্ত
II ছাড়া সঙ্কত হৃদয়ের অনুকরণে যে কয়েকটি ছন্দ (মালিনী,

মলাক্রান্তা ও ক্রটিয়া) রচিত হইয়াছে তাহার প্রথম বিশেষত্ব ভাব ও
হৃদয়ের সামঞ্জস্য বলা এবং দ্বিতীয় ও প্রধান বিশেষত্ব বাংলা ভাবাব
(genius) ধাতু অনুসরণ করিয়া স্বাভাবিক ব্রহ্ম দীর্ঘ স্বরসংঘাতে সঙ্কতের
সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তোলা—কোথাও বাংলা-উচ্চারণ-বিবোধী কৃত্রিম
ব্রহ্মদীর্ঘ স্বরের আশ্রয় লইতে হয় নাই। আগাগোড়া কোনো হৃদয়ের
কোথাও একটি অলন পতন ক্রটি নাই।

ভাবের বাহন ভাবা, ভাবার ব্রাহ্মছন্দ। কাব্য রচনার এই তিনের
সুসমঞ্জস সংযোগ না ঘটিলে তাহা কাব্য নামেব অধিকারী হয় না।
সংকৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে কাব্যের ভাষা হইবে অপরিবর্তনসহ—
অর্থাৎ যে কথটি কবি ব্যবহার করিবেন সেটির বদলে ছন্দ ও ভাব
বজ্রা যুগিয়া আর কোনো কথা ব্যবহার করা যাইবে না। এই
কাব্যধ্যানিতে সেই গুণটি প্রচুর আছে। ইহার ভাষা ভাবভৌতিক এবং
সঙ্গীত। আভিধানিক শব্দ অপেক্ষা চলিত শব্দের ভাবব্যঞ্জনার
শক্তি সমধিক; সেইজন্য কবি নির্ভয়ে বর্থাহানে যেসমস্ত চলিত শব্দ
প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে কবিতাগুলির ত্রোতনশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি
পাইয়াছে—সেইজন্য এই কবির কবিতাগুলি বলে বাহা তাহা অপেক্ষা
ভাবার অনেক বেশি। প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ, মাধুর্য ও সরসতা,
কাব্যের অপর যে সমস্ত গুণ তাহাও ইহাতে আছে—জানা কথাও
নূতন করিয়া মধুর কবিয়া সত্য করিয়া তোলাই এই কবির প্রধান
বিশেষত্ব।

বিশ শতাব্দীর হৃদয়ঙ্গম কবির কাব্যে বৈজ্ঞানিক সত্যও কাব্যের
ইচ্ছাশক্তির মোহন হইয়া দেখা দেয়। কবি ও কবিত্রিয়ার যে মিলন
সে যে আশ্রকের ক্ষণিকের খেলায় ঘটে নাই, তাহা যে জল্পজল্পান্তরের
আকাঙ্ক্ষার ফল, ভাবিতে গিয়া কবি দেখিতেছেন—

“তুমি আমি—আমরা দৌঁছে বৃক্ষ হিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জ্ঞানমে,—হিলাম বধন পাগড়ি-বেরা সিংহাসনে;
আমার ছিল সোনার রেণু, রিদ্ধ মধু তোমার হানে,
তুমি ছিলে মধ্য-কেশর, আমি তোমার হিলাম পাশে।”

এই তবুটিকেই কবি আর এক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন—

“পানী শাখী মাথুব হল, তবু
মনের মতন মন হল না কতু,
ভেঙে আমার গড়তে হবে প্রভু।”

ইহা কল্পনা নব, বৈজ্ঞানিক সত্য। তবে সে কথা না মানিবার মতো
মুচেরও অভাব নাই।

কবির কাছে—

“এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণশূন্যমথ—

তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই বলে এ তুচ্ছ মথ।

মাটির মাথোঁ যা আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,

তাড়ৎহতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই।”

এত বড় একখানি কাব্যের সকল কবিতাই অত্যাশ্চর্য বা সর্বজন-
স্বন্দব হইবে ইহা কেহ আপা কবিত্তে পারে না; কোনোটি বা ভাবের
নিক দিখা চমৎকার, প্রকাশ তাহার সম্পূর্ণ হয় নাই; কোনোটি বা
রচনার পরিপাট্য স্বন্দব, কিন্তু তাহার প্রাণ ক্ষীণ; কিন্তু অসংখ্য উৎকৃষ্ট
কবিতাব মধ্যে এই ভাবে যে কবিতাগুলিকে খাটো বলিয়া মনে
হয় তাহার কবির নিজের নিরিখের অনুপাতেই খাটো,—যেমন
একগাহ গোলাপ ফুলের সকল ফুলগুলিই বর্ণে গন্ধে মাধুর্য্যে বিকাশে
অনবদ্য না হইলেও সবগুলিই গোলাপ, অন্ত ফুলেব সহিত তাহার
তুলনা চলে না, তেমনি এই কবির কাব্য সুধকেও সে কথা বলা চলে।

সমগ্র কাব্যখানি বারবার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিয়া

ইহা আমরা অসম্বোধে বলিতে পারি তাঁহার সমসাময়িক কবিসভায় শ্রেষ্ঠ আসনধারিণী হইয়া কবি পক্ষে কাব্যে হইয়া গিয়াছে।

অনুভূতি—

ঐশ্বর্য্যোক্ত্যনাথ প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কালিকাতা প্রেসে ছাপা। ডঃ ক্রঃ ১৬ অং ১৫১ পৃষ্ঠা। মূল্য বাবো আনা।

এই উপন্যাসগানি নরোয়ের দ্বিবিখ্যাত উপন্যাসিক জোনাস লাই রচিত উপন্যাসের অনুবাদ। ইহা প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের এক কাল ছিল যখন বাহা রূপ, বাহা বর্ণনা, বাহা আশা, বাহা আকাঙ্ক্ষা সহিত আমাদের পরিচয়-সাধন হয় নাই—শীঘ্র হইবে তেমন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না, কারণ আমরা “ভ্রমলোক”, “চায়া” “ছোটলোক”দের সংসর্গে বাঁচিয়া খুব সাবধানে আপনাদের ইচ্ছিত রক্ষা করিতেছি। কিন্তু বাঙালী লেখকদের দুই বিভাগের দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক—রবীন্দ্রনাথ ও বীনবন্ধু—তাহাদিগকে উপেক্ষা করবেন নাই—পরে ও নাটকে তাহারা “চায়া”র মনুষ্য উদ্ধার করিয়া আঁকিয়াছেন।

আমাদের দেশে বাহা বুদ্ধি বাহিষ কবিত্তে হয়, যুরোপে তাহা তেমন দূরভ নহে। ইংলণ্ডে ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট; ফ্রান্সে ভিক্টর হ্যুগো, জোলা, বালজাক; রুশিয়ায় গোরকী, টলষ্টয়; প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের মুক মানবে ও কালজী লইয়া তাহাদিগকে ভাষা দিয়া উচ্চ শ্রেণীর উপেক্ষাপটুদের সহানুভূতি আদায় করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ একখানি দ্বিবিজ্ঞানবনের করণ কাহিনী ভাষান্তরিত করিয়া সত্যোক্ত্যনাথ কবিরূপেরই পরিচয় দিয়াছেন—আমাদের নিজস্ব বাহা অভাব ছিল তাহা পবের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন,—একজন বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আবাল্য মেহবর্ত্তিত নিকোলাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আরাম-লোলুপ মাতা, কোপনবস্ত্রা হলাম্যানগ্রহিণী, দুর্বলপ্রকৃতি সীলা, বখাটে ধনীপুত্র লাডভিস প্রভৃতির চিত্র নিজেব নিজের বিশেষত্ব দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ তো গেল আসল প্রস্তর গুণ।

অনুবাদের গুণ যে ভাষা আগাগোড়া বাংলা হইয়াছে—পলাত-গন্ধামোদিত দেবতার ভোগের মতো উৎকট ভাষা হয় নাই। বাক্য ভাষা অতিরিক্ত বাংলা হইয়াছে। চলিত কথায় সাধারণ ভঙ্গিতে পুঙ্খ রচনা কেহ কেহ গ্রাম্যরীতি বলিয়া অপ্রিয় করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে-সমাজের বর্ণনা করা যায় ভাষা সেই সমাজের উপযুক্ত এবং ভাবপ্রকাশক হওয়া উচিত। ছুতার কামার মূদী মালা যদি অভিধান খুলিয়া কথা কহিতে লাগিয়া যাব তবে ভটপল্লী ও নবদীপের উপায় থাকিবে কী। অবশ্য সাহিত্যে ভাষা একটি শালীন শোভন নীমা থাকি দরকার। বাহা অতিক্রম কবিত্তে তাহা ভ্রম সাহিত্য হইয়া দাবি কবিত্তে পারে না। এই গুণটি ছিল বীনবন্ধু নাটকগুলিতে যথেষ্ট। কিন্তু বীনবন্ধু সময়কাল রচিত হইতে বর্তমান সমাজের কতি পুঙ্খ হইয়া পড়িয়াছে। সেই রূচি সহিত সামঞ্জস্য বাধিয়া সত্যোক্ত্যনাথ যে সাধু ভাষার সহিত যত্রোয়া কথা মিশাইয়া এবং সেই মিশ্র রচনাতেও গভীর ছন্দ বজায় রাখিয়া এই উৎকৃষ্ট উপন্যাসগানি অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে অনুবাদের কৃতিত্ব ও মর্যাদা ঢেব বাড়িয়াছে।

এই আশ্রমে আমাদের দেশী নিবন্ধর দ্বিবিজ্ঞান সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইলে আমরা দেশকে প্রাণ দিয়া চিনিতে পারিব, স্বাভূতি ও স্বাভূত্যা সম্ভানের সেই সেবাব লক্ষ উৎকৃষ্ট হইয়া আছেন।

বাঁপি—

ঐশ্বর্য্যোক্ত্যনাথ প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কালিকাতা প্রেসে ছাপা। ডঃ ক্রঃ ১৬ অং ১৫১ পৃষ্ঠা। মূল্য বাবো আনা।

ছাপা কাগজ উত্তম ব্যবহারে; মলাট বেতে-বোনা ঝাপি, করণ—হৃদয় সমঞ্জস।

এখানি ছোটগল্পের বাঁপি, ইহার মধ্যে আটটি রক্তকণিকা। এই গল্পগুলি বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যে ঘটনার ইটগোল-জটিল মানবজীবনের একটি সমস্তা, মানবচরিত্রের একটি মানবচিত্রের একটি সত্য বৃত্তি মাত্র আশ্রয় কবিয়া গল্পটি এমন হস্তে আনন্দে ভরাট হইয়া অমিরা উঠে যে তাহাতেই আগাগোড়া মুগ্ধ ও কৌতুহলী করিয়া বাখে। এবং এই নিপুণ কুশলতার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে গল্পগুলি বচন-ভঙ্গি ও বহু সমস্তার খাঁটি বাংলা ভাষা। ঘটনাবাহ্য্য বর্ণনায় কবিয়া একটি রূপ দিতে পাইয়া ছোটগল্পের চবম আর্ট—এই আর্টে গল্পই গঠিত। কিন্তু স্বাধরাহ্য্য তাব মাত্র লইয়া গল্প রচনা হইয়াছে—সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা অর্থহীন জটিল ইহা বার আশঙ্কা থাকে। হৃদয় আর্ট বাহা, তাহা সাধারণের কোনো দিনই নহে, তথাপি তাহা আপনাব আন্তরিক সৌন্দর্য্য অবস্থ আনন্দ সকার কবিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হয়। গল্পটি গুলি আন্তরিক ভাবটি বাঁহার স্বয়ংস্বয় করিবেন তাহা মুগ্ধ বাঁহার তাহা পারিবেন না তাহাও গল্পের বর্ণনা ও পরিণতি হইতে বঞ্চিত হইবেন না। আটটি গল্পই হৃদয়, বাঁপি হৃদয় গল্পের আধার।

আলেখ্য—

ঐশ্বর্য্যোক্ত্যনাথ প্রণীত। প্রকাশক চন্দ্রবর্ত্তী চন্দ্রনাথ কোম্পানি। উইলকিন্স প্রেসে ছাপা। ডঃ ক্রঃ ১৬ অং ১৫১ মূল্য বাবো আনা, বাঁপি এক টাকা।

এখানি বাক্যচিত্রের সংগ্রহ কতকগুলি দ্রাব্য ও ভ্রমণ, কতকগুলি ব্যক্তিবিষয়ক চিত্র। মোট ১২টি চিত্রবর্ণনা এবং ছবি আছে।

লেখক অল্পদিন হইল সাহিত্য-দরবাবে আসিয়া দেখা দিয়া কিন্তু একেবারে পাকা হাতেব পরিচয় দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া। ইহাব তাহা স্বচী তবল, আপনাব আনন্দে আপনি বহিষা চলে এবং গভীর মুখে যে প্রচ্ছন্ন গুচি হাস্যবস করিয়া উঠে তাহা একেবারে সোনার কুচির মতোই উজ্জ্বল দুলভ।

বাংলা সাহিত্যে লেখক অনেক, হলেখক অত্যন্ত। সাময়িকপত্রের সংশ্রবে থাকিয়া আমাদের দেশে বস্তু অবস্থান হয় তাহার মধ্যে যদি একটি খাঁটি দামি জিনিষ হাতে একে আনন্দ বাধিবার ঠাই থাকে না। এই আনন্দব আশ্রিত হইয়া হইতে হইবে না—পক্ষপাতমূলক অত্যাধিক হইবারও আশঙ্কা এই নূতন লেখক আপনাব ক্ষমতার প্রমাণ লাভ কবিয়া কবিয়া বসেন যে আমাব সকলতা চবম এবং সাধনা অনাবশ্যক এবং তাহাব কল তাঁহাব মনকে যদি গর্বি বা আশ্রিতাধায়ে কবে তব সব নষ্ট হইবে। আলেখ্য যে গভীর আভাসের নমুনা তাহা সাধনা ও সতর্কতার পরে বঙ্গসাহিত্যকে নব নব ভূষিত কবিবে আশা করি।

আলেখ্য বাঁহার পড়িবেন তাঁহারাই শ্রীত হইবেন—বর্ণনার

হুগোই কিছুনা, কেবল বর্ণনার ভঙ্গি ও স্বচ্ছ স্বরবরে ভাবের
না হস্তরশটি তুচ্ছকেও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

সম্পর্ক—

এই বিশ্বশেষের শাস্ত্রী প্রণীত। একাশক ইন্দুশেখর ভট্টাচার্য্য,
ঠাক্কানা বেড়, কলিকাতা। ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত।
স্বামী।

এই প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক। বোলপুর
লায়ে শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ
করেন তাহারই ফলে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তিকা-
না করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শিক্ষার একটি অনিদিষ্ট
স্বত্ব হইয়াছে। এখানে অক্ষিরা পদ ও ব্যাক্য প্রথমা প্রভৃতি
সে সম্বন্ধিত হইয়াছে—এবং ক্রমশ বিভিন্ন বিভক্তির জ্ঞানের
দ্রবল হইতে কঠিন গণীয় ধাতু ও প্রত্যয় শিক্ষার ব্যবস্থা
কৃত্যক পঠের প্রথমে পাঠ্যক কঠিন শব্দের ইংরেজি অর্থ
দেওয়া পথে পঠ রচিত হইয়াছে—ইহাতে অল্পক পাঠকের
সাধ্য হইবে। অনেক পাঠ প্রাচীন সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত
ক পণ্ডিত মহাশয়ের নিজের রচনা—সকল পাঠগুলিই সরস
ব মধ্য দিয়া প্রাচীন ভাববৈব স্তকর স্নেহময় ভাব ও শিষ্যের
স্বপ্ননি নিবিশিষ্ট তপস্রার চিত্রটি পাঠকের মনে ফুটিয়া আনন্দ
প্রদ। গ্রন্থ-পবিশিষ্টে পণ্ডিত মহাশয়ের স্বরচিত ও সংগৃহীত
শব্দ হুগোই প্রণীত বহু কবিতা বালকদের আকৃষ্টি ও অবসর-
প্রদ হইয়াছে। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল এবং ললিত।
অর্থ না বুঝিলেও হুগোই বাক্যের সাধারণ আনন্দ
ইংরেজিতে ব্যাখ্যা দেওয়াতে ইহা ভাবতবর্ষের সকল প্রদেশের
উপযোগী হইয়াছে। ইহা সমাধব লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

মুদ্রাক্ষস।

স্বান—

বপিনবিহারী ঘোষ, মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক
প্রকাশিত। এজেন্ট—চক্রবর্তী চ্যাটার্জি কোম্পানি, কলিকাতা।
ক টাকা। এখানি ঐহুস্ত বাধাকুমুদ যুগোপাধ্যায়, ঐহুস্ত
র সরকাব, ঐহুস্ত বিশ্বশেষের শাস্ত্রী প্রভৃতির লিখিত ১১টি
অনুসন্ধান-মূলক বিবিধ প্রবন্ধের সংগ্রহ পুস্তক। প্রায় সকল
বিশেষত্ব-সম্পন্ন। পণ্ডিত ঐহুস্ত বিশ্বশেষের শাস্ত্রী মহাশয়ের
নাট্যিকদর্শনের ইতিবৃত্ত ও “সীমাংসা দর্শনে ঐহুস্তবাব” নামক
পাঠ করিয়া পবম প্রভাতাঙ্গন ঐহুস্ত বিজ্ঞেননাথ ঠাকুর মহাশয়
সাতনা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া
—প্রবাসী-সম্পাদক।

তবর ঐহুস্ত বিশ্বশেষের শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত “নাট্যিকদর্শনের
খানি পাঠ করিয়া বশেষ্ট আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহার মতো
ব্যুৎপন্ন শ্রেণীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত একপ আমি অল্পই দেখিমাছি—
কবারই পক্ষপাতশূন্য হইবা আমাদের দেশের প্রকৃত পুরাতত্ত্ব-
ব অঙ্কাবময় প্রদেশে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তির জ্ঞানের প্রবেশ-পথ
কবিবা শিবার জন্য আগ্রহবান। আমি নিজে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি-
দলভুক্ত বলিবা তাঁহাকে ব্যাখ্যাব ব্যথী। বর্তমান শ্রেণীর স্থলিখিত
সুপবিলক রচনা পাঠ করিলে পিপাস্য ব্যক্তি স্বর্গীর জল পান
একপ স্থ অশুভব করে, সরস কথায়ুত পান করিবা আমি
প স্থ অশুভব করি। কিন্তু তাহাছত আমার জিজ্ঞাসার নিবৃতি
ইহা আরো আরো জিজ্ঞাসার কোয়রা খুলিয়া যায়। শাস্ত্রী

মহাশয় তাঁহার গবেষণার বিষয়টি অতি নিপুণভাবে অঙ্ককারময় ওহা-
গহবেব মধ্য হইতে আলোকে টানিবা তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।
তাঁহার লেখা-দৃষ্টে এটা আমার প্রবজ্ঞান হইয়াছে যে, বাস্তবিকই, প্রথম
প্রথম বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বাঁহারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন
তাঁহাবাই নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইতেন। আমাদের দেশের পূর্বতম
ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্রাটাবের অনেকপ্রকার উচ্চশ্রেণীর সদাণ ছিল একথা
কাহারো সাধ্য নাই যে, তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু এটাও তেরি
কেহ যে অস্বীকার কবিবেন তাহার জো নাই যে, একট দোবে
তাঁহাদের অনেকানেক গুণ মাটি হইয়াছে;—সেটি হুগোই আমাদের
দেশের সেই চিরকেজল রোগ—ইংরেজি-ভাষাব বাহার নাম Priest-
craft। যেমন বোপ তেরি তাঁহাব চিকিৎসা—লোকাস্থিতিক, চার্বাক,
পাণ্ড প্রভৃতি বাহ্যেব আস্থবিক চিকিৎসক বোগীকে বিবিধ দাঁড়াইয়া
রোগীবা প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবা তুলিয়াছে। ধর্মের পাত্র হইতে কলুষ
মার্জনা করিতে গিবা ধর্মের প্রাণ পণ্ডিত পবিসার্জন করিবা ফেলিতে
তাঁহাব একটুও বস্ত্রের ত্রুটি করেন নাই;—প্রকৃত তাঁহাব জন্য তাঁহারা
বিজ্ঞাবুজি ব্যব করিয়াছেন রাশি বাশি। যদি ও রোগের প্রকৃত
চিকিৎসক কাঠাকেও বলিতে হব—তবে তিনি ছিলেন বুদ্ধদেব।
পাশ্চাত্য প্রদেশের জহরী শ্রেণীব পণ্ডিতেরা তাই তাঁহাকে মাধার করিবা
পূজা কবেন।

শাস্ত্রী মহাশয়েব নবপ্রণীত গ্রন্থ পাঠে কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে
উদিত হইয়াছে; সে কবেকটি প্রশ্ন এই:—

মহাভাবত-প্রণেতা বেদবাসের প্রতি কেন এত ক্রুদ্ধ? ভগবদ্গীতার
বেদজ্ঞানবত মূচব্যাস্তিমিরের নিম্পাবাদ রহিয়াছে ধুবই স্পষ্ট। অথচ
গীতাশাস্ত্র আস্থিক শাস্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। ইহাব ভিতবের ঐতি-
হাসিক রহস্টা কিরূপ? তত্ত্ব-শাস্ত্র অর্থববেদের ধর্ণপাশে আপাদ-মস্তক
অডিত—অথচ তত্ত্বশাস্ত্র শিবের উস্তির দোহাই দিয়া বৈদিক আচার
ব্যবহারের প্রতি খড়গহস্ত। ব্রহ্মাব বেদের দুর্গের মধ্যে শিবের উস্তি
আসিবা স্কুড়িয়া বসিল কোথা হইতে? বর্তমান গ্রন্থপ্রণেতা যিনি এই-
সকল অঙ্কবাচ্ছন্ন গুহাগহবের ভিতরকাব রহস্ত-কাহিনী জানিবার
অভিলাষ আমাদের মনে জাগাইবা তুলিয়াছেন—তিনি যদি আমাদের
প্রতি সদয় না হ'ন—অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং যদি আমাদের পাণ্ডা না হ'ন—
তবে আমরা নিরুপার।

ঐহুস্তজ্ঞেননাথ ঠাকুর।

হানাবি—

ঐহুস্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই। কাঙ্ক্ষিক প্রেসে
মুদ্রিত, ইণ্ডিয়ান পারিগিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

“হানাবি” জাপানী কথা, অর্থ গল্প। সুরেশ বাবু অনেকদিন
জাপানে ছিলেন; জাপানের নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার
“জাপান” নামক গ্রন্থে নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—সে পুস্তক
পাঠকসমাজে বিশেষভাবে আদৃতও হইয়াছে। এবার তিনি আমাদের
জাপানী গল্প উপহার দিয়াছেন। যদিও ইহাব পূর্বে ঐহুস্ত মণিলাল
গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম আমাদেরকে জাপানী গল্পের সহিত পরিচিত
করিয়াছিলেন।

অল্প দেশের গল্পের সহিত জাপানী গল্পের বিশেষ পার্থক্য আছে।
জাপানী গল্প সাধারণত এই মাটির সংসারের কোনো ধবর ঘেঁষ না;
স্বপ্নরাজ্য বলিবা যে একটা অসম্ভব রাজ্য আছে—বেখানকার সবই
কেমন এক-স্বকমের; ভালো, কবিয়া, স্পষ্ট করিবা বরিবার ছুইবার
বেখানে কিছুই নাই—বেখানকার সকল দৃষ্ট কল্পনার রঙিন পাখা

মেলিয়া কেবল হাওবার উপর উড়িয়া বেড়াই প্রকাশ কবে এবং অধিকাংশই গোপন রাখে—জাপানী গল্প সেই রাজ্যের সবাই আমাদের আনিবা দেখে স্পষ্ট করিয়া কিছু না দেখিলেও এবং না বুঝিলেও একটা অনির্বচনীয় আনন্দ হৃদয়তরীতে স্পন্দিত হইতে থাকে। সুতরাং এই জাপানী গল্প আমাদের সমুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বাংলা দেশের পাঠকমণ্ডলী এই বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে উপভোগ করিবেন বলিয়া আমাদের আশা আছে।

জাপানী গল্প ভাবান্তরিত করা সহজ নহে;—ইহাব মধ্যে এমন মিহি জিনিষ আছে যাহা খুব মোলায়েম হাতে না পড়িলে মোটা হইবা ভোঁতা হইবা যায়। সুতরাং সকল স্থানে যত্নসহকারে নিখুঁতভাবে বজায় রাখিতে পাবেন নাই;—সেইজন্য গল্পের স্থানে স্থানে স্বেচ্ছায় হানি হইয়াছে। ভাবা জাপানী গল্পের উপযোগী স্বচ্ছ তরল হান্কা হয় নাই, ভাবের সঙ্গে ভাবা যেন শ্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে নাই, স্ফোটে যেন আউট হইয়া আছে। এইটুকু দেখা থাকিলেও পাঠকগণ গল্পের আন্তরিক রসায়নের আনন্দলাভে বঞ্চিত হইবেন না। ইহা আমরা স্বজ্ঞে বলিতে পারি।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভালো। প্রচ্ছদপটের উপর জাপানী হাঁদের বাংলা অক্ষরে গ্রন্থের নাম সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

শ্রী :—

সোণাবিবি—

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)—শ্রীশশিভূষণ বিবাস প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে শ্রীশ্রীদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, সাম্য প্রেসে মুদ্রিত। ডবলক্লাস্টন বোডশাং-শিত ২৩৪ + পবিশিষ্ট ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৪০ টাকা।

বিক্রমপুর-রাজহুহিতা বিধবা স্বর্ণময়ীর সহিত তদীয় রূপে লুক্কৃত স্বর্ণপ্রাচীরের মুসলমান নৃপতি ঈশা খাঁর পরিণাম ব্যাপার অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে তদানীন্তন কালের পাঠান ও মোঘল রাজত্বের কিঞ্চিৎ ইতিহাস এবং স্বাধীন বিক্রমপুর ও স্বর্ণপ্রাচীরের অবস্থা আনুমানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসের হিসাবে বর্ণনা উপাদানের হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সর্বত্র সত্যমূলক বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমবা জানি, কেদার রায় চাঁদ-রায়ের পিতা; পরিশিষ্টে স্বয়ং গ্রন্থকারও তাহা একপক্ষের মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জাত, 'বর্তমান গ্রন্থে ইহাঙ্গিরের যে সমস্ত নির্ণয় করা হইয়াছে তাহাই অধিকাংশের মত'—কেবলমাত্র এই নজীর দেখাই-বাই তিনি কেদার রায় চাঁদরায়ের মধ্যে আত্মসম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই মত বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত আমবা গ্রহণ কবিত্তে

অসম্মত। পরিণয়-সম্বন্ধে স্বর্ণময়ীর সম্মতি পাইবার পূর্বে যে মুষ্টিতে গ্রন্থলেখা দেখা দিয়াছেন, তাহাও ইতিহাসের অ-নহে। কিন্তু গ্রন্থকার এই চরিত্র অঙ্কনের সুযোগে হিন্দুধর্মকে ইঙ্গিত করিয়া আবার বলিয়া গিয়াছেন—'হিন্দু, গণ্ডিব বাহি-দিতেই জানে।' হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এ সম্ভাব্য কালবিশেষে ৪ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকায়ে প্রবোজ্য নহে। হিন্দুধর্ম স্ব-ধর্ম—সমাজের অস্পৃশ্য চণ্ডালকেও ইহা আশ্রয় প্রদান ক-এমন কি, নিম্নোক্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বশতঃ বাহারা স্বীকারে অনিচ্ছুক, সনাতন হিন্দুধর্ম তাহাদিগকেও বর্জন করি-নহে।

উপন্যাসের হিসাবে গ্রন্থখানির রচনাকৌশল মন্দ নহে; স্থানে স্থানে বাহুল্য বর্ণনা, অস্বাভাবিকতা ও অপবিত্র ভাব-গোঁরব কিঞ্চিৎ হানি কবিয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে কতিপা-শ্রীকৃষ্ণায়কে উৎফুল্লসেবায় প্রেমকাহিনী বুঝাইতে চাহিবার-স্বাভাবিকতার সীমা অলম্বন করিয়াছে। তেলিগাড়ির দুই-শত প্রকোটে উৎফুল্ল যখন গলিলাজের দেখা পায় তখন সে-লোকসঙ্গবিরহিত ছিল; তাহার এই নিসঙ্গ অবস্থা খে-বটিয়াছিল বলিয়াই প্রকাশ আছে। অথচ সেই অবস্থার-জীবনধারণের উপায় কি ছিল এবং উৎফুল্লের প্রা-আমি—গলিলাজ—ইত্যাকার ভাষায় উত্তর প্রদান করিবার-সে কোথাব লাভ কবিল, গ্রন্থলেখা তাহার কিছুমাত্র আভাস-না থাকায় সমস্ত ব্যাপারটাই নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়া প-মত্ৰণাপূর্বে অবস্থান কালে বৃদ্ধ কেদার রায় ডায়ের (—) ,-বাক্যের স্বচ্ছতা ও বার্তিকাজনিত দুর্বলতা বুঝাইতে চাহিয়াছে-অত্যন্ত হাত্তাক্ষিপক। স্বরূচি ও মীলতা রক্ষা করিবা যে স্থানে-সমাবেশ করা চলিত, সেখানে অনর্থক ও অযথা অপবিত্র ভাবের-দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে সোহনারা ও রোসিরার স্ব-কৃতজ্ঞ-ভবনের নিয়ন্ত্রণে উপেক্ষিত। উৎফুল্লের বর্ণনা এবং উ-বাক্য ও ব্যবহারে যে চিত্র ফুটিয়াছে তাহা অস্বস্তি রচির প-এবং অযথা বাহুল্য বর্ণনার দোষে কলঙ্কিত। গ্রন্থের ভাষা ও-তবে দু এক স্থলে ইংরাজী-ভাষা বাংলার (যথা, 'কষ্টদায়ক অ-অববববিরহিত সন্দেহ' ইত্যাদি) ও ব্যাকরণগত বাক্যের- 'মনোকষ্ট,' 'কৌশল কার্যকরী,' ইত্যাদি) ব্যবহার ঘটনা-মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট মজার-প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

—শ্রীধাত্তির-নন্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী

আমরা ২৬শে আশ্বিন ডাকে বওনা কবিব। পূজাব ছুটি উপলক্ষ্যে কোনো গ্রাহক তাঁহাব প্রবাসী পাই-নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত গেলে এবং প্রবাসী পাঠাইবার ঠিকানা বদল করিতে হইলে অ-১৫ই আশ্বিনের মধ্যে গ্রাহক নম্বর সহ জানাইবেন। অনেকে গ্রাহকনম্বর লেখা অনাবশ্যক মনে করেন; গ্রাহকনম্বর ব্যতীত অনেক নামেব ভিত্তব হইতে একটি নাম খুঁজিয়া বাহির করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। বিশেষ একনামের একাধিক গ্রাহকও অনেক আছেন। গ্রাহকনম্বর প্রত্যেক গ্রাহকের প্রবাসী মোড়কব উপর লেখা থাকে। ১৫ই আশ্বিনের পরে বা গ্রাহকনম্বর-শূন্য পত্র পাইলে আমরা কোনোই প্রতিকার করিতে পারিব না; সেজন্য কাহাবো প্রবাসী পাইতে গোলমাল হইলে আমরা সেজন্য দায়ী হইব না।

প্রবাসী-সম্পাদক।

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

দ্বাদশ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্তিক—চৈত্র

১৩১৯

২১০/৩১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

P30019

(কার্ডিক—চৈত্র, ১৩১১)

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অধর্মেব লভ্য (কবিতা)—শ্রীমদেবেশ্বনাথ দ্বিজ ...	১৭৫	কবিতার প্রারম্ভ (কবিতা)—শ্রীগবিন্দনাথ মুখো- পাধ্যায় ...	১৭৫
তত্ত্বগোচনা (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	২১২	কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাশালা—শ্রীবিজয়চন্দ্র নন্দ ...	২১২
অপূর্ণ (কবিতা)—শ্রীবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৪	বি-এল ...	২১২
সমুদ্র ও দ্বীপ—শ্রীজগদানন্দ রায় ...	৩৫৮	কষ্টিপাণব—নগেন্দ্র—১২৬, ১২৫, ৩০৫, ৩৮৬, ৫৪১, ৫৮০ ...	৩৫৮
অধঃস্থল (গল্প)—শ্রীঅগ্নিকুমার শর্মা ...	৬৭	কাশ্মীরী পণ্ডিত (সচিত্র)—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ড ...	৬৭
আত্মপন (কবিতা)—বাজকুমারী শ্রীঅনন্দমোহিনী ...	১৭১	এম-এ, বি-এল ...	১৭১
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ গুপ্ত, এম-এ ...	৪১১	কাশ্মীরী পণ্ডিতাবলী (সচিত্র)—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ড ...	৪১১
আনন্দমোহন দাবিদ্রা ও অর্থবিজ্ঞানের সাংখ্যিকতা— শ্রীবাধকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ ...	৫৪২	এম-এ, বি-এল ...	৫৪২
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (নাটক)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	২৬	কাশ্মীরী মুসলমান (সচিত্র)—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ড ...	২৬
আনন্দমোহন দাবিদ্রা উপনিবেশ ও প্রবাস (সচিত্র)— শ্রীজগদানন্দমোহন দাস ...	৩৭১	এম-এ, বি-এল ...	৩৭১
আনন্দমোহন দাবিদ্রা উপনিবেশ এবং সিপাহী বিদ্রোহ (সচিত্র)—শ্রীজগদানন্দমোহন দাস ...	১৬৫	কিস্তি-মাত (গল্প)—শ্রীমদেবেশ্বনাথ দত্ত চৌধুরী ...	১৬৫
আনন্দমোহন দাবিদ্রা— আনন্দমোহন দাবিদ্রা ...	১০৪, ৩১৪, ৪৮৪	কীটের শক্তি (সচিত্র)—শ্রীকান্তচন্দ্র দাস ...	১০৪
আনন্দমোহন দাবিদ্রা (বাঙ্গালীর সংস্কার) আনন্দমোহন দাবিদ্রা ...	৬২৩	কুহব (কবিতা)—শ্রীমদেবেশ্বনাথ সেন, এম-এ, ...	৬২৩
“উত্তিহাসেব আনন্দমোহন”—শ্রীবিজয়চন্দ্র নন্দদাব, ...	৬২৮	বি-এল ...	৬২৮
বি-এল, ...	৬২৮	খালসা ধর্মের অভিব্যক্তি (সচিত্র)—শ্রীবনীন্দ্রনাথ ...	৬২৮
শ্রীমদভগবদ্গীতা বাস চৌধুরী ...	৬২৬	সেন ...	৬২৮
শ্রীমদভগবদ্গীতা চন্দ্র ...	৬২৬	গীতাঞ্জলি— গীতাঞ্জলি—শ্রীমদেবেশ্বনাথ ঠাকুর ...	৬২৬
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬১৮	গীতাপাঠ—শ্রীমদেবেশ্বনাথ ঠাকুর ...	৬১৮
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	গোড়বাজনা (আলোচনা)—শ্রীবিনোদবিহারী বসু ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	গোড়বাজনা (সমালোচনা)—শ্রীবাধকমল মুখোপাধ্যায় ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	পাধ্যায়, এম-এ ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	গোড়লেপনালা (সমালোচনা)—শ্রীবাধকমল মুখোপাধ্যায় ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	পাধ্যায়, এম-এ ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	চাদ বাস ও বেদার বাস (আলোচনা)—শ্রীমদভগবদ্গীতা ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	বিশ্বাস ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	চান্দেব পেয়ালা (কবিতা)—শ্রীমদভগবদ্গীতা ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	চিত্রপরিচয়—শ্রীচাক্রকর্তা বন্দোপাধ্যায়, বি-এ ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	১০৮, ৩০৮, ৪১৭, ৫৪৩, ৬৪৩ ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	জানে বাস্তবিক (সচিত্র)—ডা. শ্রীমদভগবদ্গীতা ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	১০৮, ১০৮, ১০৮, ৩৬৮, ৪৭৬, ৫৬৮ ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	টোনের সমন্বয়—শ্রীমদভগবদ্গীতা ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	বি-এস্‌সি ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	স্বপ্ন (কবিতা)—শ্রীমদভগবদ্গীতা ...	৬২২
শ্রীমদভগবদ্গীতা বন্দোপাধ্যায় ...	৬২২	জগদ্বাদী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় বি-এ ...	৬২২

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২৮	প্রবাসী বাঙ্গালী (সচিত্র) — সম্পাদক	৫২৩
৩১০	প্রবাসী বাঙ্গালী (সচিত্র) — অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানকীনাথ দত্ত ও শ্রীনীলদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৬০
৩৮	প্রাচীন ভারতে পত্র লিখন — শ্রীশবচন্দ্র ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল, কাব্যার্থ ইত্যাদি	৪২৪
৩০৪	প্রাণ ও প্রকৃতি (কবিতা) — শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৫৪
৩১৫	বঙ্গিমচন্দ্র (কবিতা) — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৬৩৪
৮৪	বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষণীয় কি আছে? — প্রবাসিনী	২৭৪
৪৪৩	বর-কনের হাট — শ্রীহরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭২
৬৩০	বাঙ্গালার তক্ষণ-শিল্পের নমুনা (সচিত্র) — শ্রীহরি-প্রসন্ন দাস কুণ্ডু	৫৫৮
৪৮৮	বাঙ্গালীর কতক গণি সংস্কার — শ্রীহরগোপাল দাস	৪১৫, ৬২২
৩১৪	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধব, বি-এস্ সি	৪২০
২৭১	বিদায় বন্দনা (কবিতা) — শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী, বি-এ	৩১৩
২৫	বিবাহে বর্ণসঙ্কর — শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল	২৩২
১৮৪, ২৪৮, ৩৪৮, ৪৪৫, ৫৮৪	বিবাহে বর্ণসঙ্কর (আলোচনা) — শ্রীরাধাকমল মুখো-পাধ্যায়, এম-এ, ও শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল	৪৮৪
২১৭	বিশ্বাস (কবিতা) — শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী, বি-এ	৬২৮
৬০২	বিবিধ প্রসঙ্গ — ১৫১, ২২১, ৩১৮, ৪২৮, ৫৪০, ৬৩৪	৬৩৪
১৭১	বিলাতের চিঠি — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
১২২	বিশ্বের প্রার্থনা (কবিতা) — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২০২
১১০	বিশ্বপ্রেম (কবিতা) — শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল	৫১২
২২০	বীষা ভগবান — শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬১৪
২৯৪	বৈদিক দেবতা — শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল	২১৩
৩৭০	ব্যাধ ও কসাই (কবিতা) — শ্রীবসুনাথ শুল্ক	৪৫৫
৬১৩	ভাবতীর সঙ্গীত — শ্রীউপেন্দ্রকিশোর বায়, বি-এ	৪০০, ৫৩০
১৭৫	ভুলভাঙা (কবিতা) — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিষ্ঠা	৪৫২
১০৬, ২১৭, ৩২৪, ৪৩৩, ৫৬৫	মধ্য যুগের ভারতীয় সভ্যতা — শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬, ২০২, ২৪৮, ৩৪৪, ৪৫২, ৬৪৪
১১৬	মশা, মাছি এবং স্বাস্থ্য — শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বায়গা, এল্-এম্-এস্	৫২৮
৫৮২	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মদর্শন — শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ	৩৩৭
৪১২	মিলন-ভঙ্গ (গল্প) — শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্র	৭৪
৮	মুসলমান সম্বন্ধে চাই একটি কথা — শ্রীসৈয়দ শিরাজী	৪০৫
৫২৩	মৃত্যু-মিলন (গল্প) — শ্রীসৈয়দ মাহাপাত্র	৪০৫
৪৮	“বা দেসী সর্বভূতেষু” (কবিতা) — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২২১
	যক্ষশেষে (কবিতা) — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২২১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।
ববীন্দ্রনাথের দুখানি নূতন পুস্তক (সমালোচনা)—		শীতের ফুল (কবিতা)—শ্রীপ্রবন্ধনা দেবী, বি-
শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী, বি-এ...	২৮৫	সংক্রামকাবি—শ্রীবাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী
রাখী-বিসর্জন (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১২৬	সন্ধ্যাসঙ্গীত (কবিতা)—শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কপাব পাহাড় (গল্প)—শ্রীআনন্দপ্রকাশ ঘোষ ...	৫০৯	সমালোচনা - ডাক্তার ...
বোগ প্রতিবোধ—ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাণ		সাঁঝে (কবিতা)—শ্রীপরিমল ঘোষ
বাগচী, এল্-এন্-এস্ ...	৭৯	সাগরের মায়া (গল্প)—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সুন্দর-উল্লিঙ্গ বেগম (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-		স্বপ্নের অন্ধার—শ্রীশ্রবণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পাধ্যায় ...	২৬৬	অলিত পত্র (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়
শ্রেষ্ঠাতন-সুন্দর (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১০৬	স্বপ্নের অন্বেষণ (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ
শিখণ্ডদিগের উক্তি (সচিত্র)—শ্রীদীপেন্দ্রনাথ সেন ৭৮, ৩৭৬		হেমকণা—শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম

বর্ণনাত্মক চিত্র-সূচী

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।
আকবর বাদশাহের বস্ত্র গর্দভ শিকার (প্রাচীন পুস্তক-চিত্রের প্রতিলিপি) ...	৫০৮	গুণক নানক ও তাঁহার সহচরগণ ..
“আলেকজান্ডার ও ডিওজেনিস”—সাব এডুইন ল্যাণ্ডসীয়ার অঙ্কিত ...	৬	গোপালকৃষ্ণ তর্জীচাৰ্য্য .
আশগাও কোতো বাজাইতেছিল ...	৮৯	চন্দাববকাব, সাব নাবারণ গণেশ .
আশজিরো নারিকে নোকা ফিরাইবার জন্ত অল্পজা করিল ...	৯০	চীনদেশের উনিবেশী যিহুদি
আশা (বঙিন)—ওয়াটসন কর্তৃক অঙ্কিত ২২৯, ৩৪৯		চীনদেশের বুদ্ধ ধর্ম ও সমস্ত মূর্তি ও বৌদ্ধসম
“আহা! কি অপরাধ সঙ্গীত!” ...	৪	চীনা দেবতা ...
ঈশানচন্দ্র বসু ...	২২২	চীনা দেব অংগি খাওয়ার নল পুড়াইবার অ
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	১৬৯	চীনা পাগলের মাথার বেগী কাটরা ফে
ওয়ারজুলা, এম, ...	২২৩	দুঃখিত হইবা সকলকে দেখাইতেছে
কপিব পোকা ...	৫৬৮	চীনা পুলিশের কর্মচারী ও তাঁহার ছাত্রী প
কার্তিকের ...	৫৬৩	চীনা যষ্টি দেবীর জ্যোষ্ঠা ভগিনী ...
কাশ্মীরী পণ্ডিতানী ...	১৬৩, ১৬৪	চীনে মাণ্ডুশাসনকালের বর্ষের শান্তি
কাশ্মীরী বজ্রায় পণ্ডিতগণ ও পণ্ডিতানী ...	১৬১	চীনের উপদ্রোহতা ...
কাশ্মীরী মুসলমান (৬ খানি) ...	২৬০, ২৬২, ২৬৪	চীনের চেংহো সহরের লাইব্রেরী ...
কীটের শক্তি (১ খানি) ...	২৯০, ২৯২	চীনের ছাত্রী ...
কুকুরের হাসি ...	৪	চীনের ছাত্রীসৈন্য ...
ক্যান্টনের মিলিটারি গবর্নর হো-হু-মি ...	৩৬৪	চীনের পার্লামেন্ট গৃহের অভ্যন্তর ...
ক্ষীরভবানী দেবী ...	৪২	চীনের প্রাদেশিক সমিতির গৃহ ...
ক্ষীরভবানী পুষ্করিণী ...	৪১	চীনের বালক-সম্রাট ও তাঁহার জননী
খুকিব দ্বিলিপি-খাওয়া (বঙিন) ...	৩৩৩	অভিভাবক ...
খুস-বাগ ...	২৬৮	চীনের বালিকা-বিজ্ঞানগণের সুপারিশেষ্ট
খোদা নব্ব, খা বাহাডুর, সি-আই-ই ...	২৯৪	চীনের বুদ্ধাবাণী ...
গায়ত্রী দেবী ...	৪৩	চীনের বষ্টি প্রভৃতি দেবতা ...
		চীনের সীমান্ত পার্কিত্য অসভা জাতি
		বমণী ...
		জলের স্রোতে আশগাও ভাসিয়া চলিতে